দশটি উপন্যাস

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

দশটি উপন্যাস

দশটি উপন্যাস

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

করুণা প্রকাশনী / কলকাতা-৯

করুণা প্রকাশনীর পক্ষে ১৮এ টেমার লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯
থেকে বামাচরণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, বর্ণ সংস্থাপনে রেজ্ঞ ডট কম
৪২এ/১ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ এবং শ্যামাচবণ মুখোপাধ্যায
কর্তৃক করুণা প্রিন্টার্স ১৩৮ বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০ ০০৬ হইতে মুদ্রিত।
প্রচ্ছদ : গৌতম্ চট্টোপাধ্যায়

মূল্য : ২৫০.০০

শক্তিমান তরুণ কথাশিল্পী

অমর মিত্র

প্রীতিভাজনেষু

সূচী

পদ্মাবতী

১০৬৯ খ্রীস্টাব্দের শরৎকালের এক সকালে রুখ নামে এক তরুণ পাহাড়ের কাঁধে প্রকাণ্ড একটা পাথরের আড়ালে ওৎ পেতে বসে ছিল। আশা-নিরাশায় চঞ্চল তার চোখের চাউনি। তার দৃষ্টি কিছুটা নিচে একটুকরো চাতালের দিকে, যেখানে কঠিন পাথরের ফাটলে কাঁটাঝোপ গজিয়ে রয়েছে। তার হাতে নোঙরের গড়ন একটা লোহার ডাঙ্গস। সে একটা পাহাড়ী ছাগল মারবে।

সমুদ্রতল থেকে প্রায় দশ হাজার ফুট উচ্চতার জন্য এই সব পাহাড়ে এখন কনকনে ঠাণ্ডা আবহাওয়া। চূড়াগুলো ঘন কুয়াশায় ঢাকা। বাঁদিকে অনেক নিচে এবং দূরের সমতলে দুটি পাহাড়ী নদীর সঙ্গমস্থলে জলের ওপর সকালের রোদ্দুর ঝকমক করছিল। একটি নদীর নাম ঘোর অন্যটির নাম বন্দ্। এই দুটি নদী এক হয়ে যাওয়ার পর নাম হয়েছে ঘোরবন্দ্। নদীটি ক্রমশ নেমে গেছে হিন্দুস্থানের দিকে। অসংখ্য প্রপাত আর গভীর খাত সৃষ্টি করে হিন্দুস্থানের পশ্চিম অঞ্চল উষর এক সমতলভূমি পেরিয়ে মিশে গেছে বিশাল সিন্ধুনদের সঙ্গে।

রুখ ঘোরবন্দ উপত্যকাবাসী জনগোষ্ঠী কাথির সম্প্রদায়ের এক গোত্রপতি খিবস্তুর একমাত্র সন্তান উত্তর-পূর্বে পামীর অঞ্চল থেকে হিন্দুকুশ পর্বতমালার একটি শাখা কান্দাহার পেরিয়ে ঘোরবন্দ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং তারপরও শৈলশিরার রূপ নিয়ে প্রায় চক্রাকারে ওই উপত্যকাটিকে ঘিরে রেখেছে উপত্যকাটি ঘাস এবং গাছপালায় ভরা। মাটি উর্বর। কিন্তু কাথিররা এখনও পশুপালক; তারা বর্বর, দুর্ধর্ষ এবং দস্যু জাতি বলে সর্বত্র নিন্দিত। সভ্য এলাকার লোকেরা তাদের ভীষণ ভয় পায় এবং প্রচণ্ড ঘৃণাও করে। রুখ শুনেছে, তার কাকা তিরস্তু ভুল করে রাত্রিবেলায় কান্দাহার প্রদেশের এক সরাইখানায় ঢুকে পড়েছিল, তখন ভীষণ ঝড় বৃষ্টি হচ্ছিল। তিরস্তুকে কাথির বলে চিনতে পারার সঙ্গে সঙ্গে সরাইখানার লোকেরা তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছিল।

রুখ আজ একটা পাহাড়ী ছাগল মারবে। কিন্তু তার এই উদ্দেশ্যের কথা সে কাউকে বলে আসে নি। অন্য দিনের মতো ভেড়ার পাল নিয়ে কাথির তরুণদের সঙ্গে সেও উপত্যকার শেষপ্রান্তে চলে এসেছিল। নিজের পালের দায়িত্ব বন্ধুদের দিয়ে জৈবকর্মের ছলে সে কেটে পড়েছে। তারপর পাহাড়ের কাঁধে আটকে থাকা এই পাথরটার আড়ালে ওত পেতে বসে আছে।

পাহাড়ী ছাগল এর আগে বহুবার সে মেরেছে। এ সব ছাগল অতি ধূর্ত। এদের ইন্দ্রিয় খুব সজাগ। বিন্দুমাত্র সন্দেহ হলে এরা যেন যাদুবলে অদৃশ্য হয়ে যায়। রুখ বহুবার এদের অদ্ভুতভাবে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া দেখে বিস্ময়ে ও আতঙ্কে হতবুদ্ধি হয়ে গেছে। কাথিরদের বিশ্বাস, এই সব ছাগলের রক্ষাকর্তা এক দেবতা আছেন। তিনিই এভাবে মানুষ শিকারীকে বিভ্রান্ত করেন। রুখ একবার একটা পাহাড়ের চূড়ায় স্থির দাঁড়িয়ে থাকা একটা বুনো ছাগলকে হঠাৎ শূন্যে মুছে যেতে দেখেছিল। কিন্তু এখন সে রীতিমত সাবালক। সে বুঝতে পেরেছে, ওভাবে অদৃশ্য হওয়া সব ছাগলই দেবতা নয়। আসলে পাহাড়ী চাগল চোখের পলকে আশ্চর্য দক্ষতায় তিরিশ-চল্লিশ ফুট নিচের খাদে বা ফাটলে পাখির মতো ভেসে লাফ দিতে পটু। অনেক সময় পাথরের রঙের সঙ্গে তাদের গায়ের রঙ এমনভাবে মিশে যায় যে তাদের আলাদা করে চেনা যায় না। এ সব কারণেই মনে হয়, ছাগলটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

ছাগল মারার কথা কাউকে জানিয়ে আসে নি রুখ। কারণ ব্যাপারটা তার জীবনে অত্যন্ত গুরুতর ও গোপনীয়। কিছু দিন থেকে সে একটা ব্যাপারে ভীষণ অশান্তিতে কষ্ট পাচ্ছে। কিন্তু মুখ ফুটে সে কথা বলার সাধ্য তার নেই। তার মনের কথা জানতে পারলে তাদের গোত্র তার ওপর খেপে উঠবে। এমন কি, গোত্রপতি হিসেবে তার বাবা খিরস্তুও তাকে ক্ষমা করবে না। হয়তো জাতিপ্রথা অনুসারে তাকে চরম দণ্ড দিতে বাধ্য হবে। সেই দণ্ড অতি সাংঘাতিক। তাদের বস্তির ঘরগুলো পাথরের দেয়াল এবং চামড়ার ছাল দিয়ে তৈরি। সেই বস্তি থেকে কিছুটা দূরে নদীর ধারে মৃতদের পুঁতে ফেলার জায়গা। সেখানেই অপরাধীর দেহের নানা জায়গায় লোহার গোঁজ মেরে একটা কাঠের ফ্রেমে আটকে রাখা হয়। মৃত্যু হতে অনেক সময় এক সপ্তাহও লেগে যায়। মৃত্যুর পর মাটিতে গর্ত করে তাকে পুঁতে ফেলা হয়। এ আসলে ক্রুশবিদ্ধ করে মৃত্যুদণ্ড পালনের প্রাচীন প্রথা।

কাথিররা বিশ্বাস করে, তারা গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডারের পলাতক একদল গ্রীক সৈনিকের বংশধর। গ্রীকদের মধ্যেই ক্রুশবিদ্ধ করে অপরাধীকে হত্যার প্রথা ছিল কোথাও-কোথাও। তাদের কাছ থেকেই রোমানরা এই দণ্ডপ্রথা নিয়েছিল।

সেই ভয়ঙ্কর শাস্তির কথা ভেবেই রুখ তার মনোভাব গোপন রেখেছে। নিচের চাতালের ফাটলে ঝোপগুলোর দিকে একটা চোখ রেখে মাঝে মাঝে অন্য চোখে সে উপত্যকা ও তাদের গ্রামের দিকটাও লক্ষ্য করছিল। কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছে কি না, সেই উদ্বেগ। এদিকে রোজ সে দূর থেকে যে পাহাড়ী ছাগল আর তার দুটো বাচ্চাকে ওই ঝোপে চরতে দ্যাখে, তারাও আসছে না। ঠাণ্ডার মধ্যে রুখ প্রায় ঘামছিল উৎকণ্ঠায়। ছাগলদের দেবতা কি ব্যাপারটা টের পেয়ে ওদের সতর্ক করে দিয়েছে, তাই ওরা এমন লোভনীয় খাদ্য খেতে আসছে না?

ধৈর্য যখন ভেঙে পড়ার উপক্রম, তখন হঠাৎ রুখ চমকে উঠল। নিচে পাহাড়টার পাদশৈলে লাফ দিতে দিতে অবিকল পাহাড়ী ছাগলের মতো উঠে আসছে একটি তরুণী।

তার পরণে গোলাপী আঙরাখা আর চুলে জড়ানো সাদা রুমাল। দেখামাত্র রুখ ভীষণ ঘাবড়ে গেল। তার খুড়ো দিরস্তুর মেয়ে রিয়া।

রুখ সঙ্গে সঙ্গে পাথরটার সঙ্গে সেঁটে অন্য পাশে সরে গেল। কোথায় আসছে রিয়া? সে কি দূর থেকে রুখকে দেখতে পেয়ে তার কাছেই আসছে?

একটু পরে রুখ বুঝতে পারল, রিয়া তাকে দেখতে পায় নি এবং তার কাছে আসছে না। রিয়া এবার গুঁড়ি মেরে একটা গুহার ভেতরে ঢুকে গেল। রুখের মুখে ফুটে উঠল ঘৃণার রেখা। তাহলে নষ্ট মেয়ে রিয়া গোপন প্রেমের তাগিদে শেষ পর্যন্ত ওই সাংঘাতিক গুহাটাকেই বেছে নিয়েছে? ওখানে একটা অজগর সাপ থাকার কথা সকলেই জানে। মরার ভয় নেই ওর?

রুখের অনুমান সত্য হল। রিয়া গুহায় ঢোকার সামান্য পরে রাখালদের দল থেকে এসে গেল কিস্তান। রোগা লম্বাটে গড়নের যুবক। ঈষৎ কুঁজো হয়ে হাঁটে। তার মাথার পাগড়িতে পালক গোঁজা। পরনে ঢিলে কোর্তা আর হাঁটুর একটু নিচে অব্দি ঝুলের পায়জামা। তার হাতে ভেড়া-খেদানো একটা লাঠি। সেও গুঁড়ি মেরে গুহার ভেতর ঢুকে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে রুখ ঠিক করে ফেলল লোহার ডাঙ্গসটা দিয়ে দুজনকেই মেরে ফেলবে। সে শক্ত করে চেপে ধরল ডাঙ্গসটা।

কিন্তু হঠাৎ তার মনে পড়ল, এ সব অবৈধ কাজের শাস্তি দেওয়ার একচ্ছত্র অধিকারী তার বাবা খিরস্তু। কাথির প্রথা অনুসারে সে নিছক একজন সাক্ষী হতে পারে। সাক্ষী হয়ে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা তার নেই এবং তাতে উল্টে তাকেই শাস্তি পেতে হবে। সে শাস্তি অতি ভয়ঙ্কর।

রুখ দ্বিধায় পড়ে গেল। তার কথা যদি কেউ বিশ্বাস না করে? আরও কাউকে ডেকে এনে ঘটনাটা দেখাতে হলে তাকে অনেকটা নিচে নেমে কিছু দূর যেতে হবে। সেখান থেকে অন্যদের নিয়ে ওই গুহায় পৌঁছুনোতে বেশ সময় লেগে যাবে। রুখ জানে, ওরা খুব সতর্ক। কাথিরদের কাছে অবিবাহিত যুবক-যুবতীর মধ্যে তো বটেই, পরপুরুষ পরনারীর মধ্যেও প্রেম-ভালবাসা গর্হিত কাজ। তার শাস্তি মৃত্যু। তাই রিয়া কিস্তান দেরি করবে না।

রুখ ভেবে কিছু ঠিক করতে পারল না। এই নিয়ে দু'দিন ব্যাপারটা সে দেখতে পেল। এ নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো ছেলে সে নয়। কিন্তু দায়ে পড়ে ঘামাতেই হচ্ছে।

তার চেয়ে বড় সমস্যা যে তার, এ-কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। কিস্তান লাজুক এবং সরল ছেলে বলে পরিচিত। সে বুড়োদের সব সময় খুশি রাখার তালে থাকে। বুড়িরাও তাকে অত্যন্ত স্নেহ করে। বস্তিতে মেয়েদের ছোটখাটো ফাইফরমাস্ খেটে দেয় বলে মেয়েদের মধ্যেও তার জনপ্রিয়তা আছে। রাত-দুপুরে কারুর অসুখ হলে ঝড়-বৃষ্টি হোক বা হিংস্র জন্তুর গর্জন শোনা যাক বাইরে, কিস্তান তিন ক্রো (একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব) পাড়ি দিতে দ্বিধা করবে না। তারপর ওঝাকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হবেই।

এমন ছেলের বিরুদ্ধে নালিশ করতে হলে ভেবেচিন্তে পা ফেলা দরকার। তাছাড়া রিয়াও তাদের

গোত্রের সর্দারের দাদার মেয়ে। রুখের খুড়ো দিরস্তুর একটা ঠ্যাং অক্ষত থাকলে সে-ই সর্দার হত। তাই মেজভাই খিরস্তুর সে পরামর্শদাতা। রিয়ার বিরুদ্ধে কথা বলা তাই সহজ নয়।

রুখের ভাবনার খেই ছিঁড়ে গেল চাপা একটা শব্দে। ঘুরেই দেখতে পেল, নিচের চাতালের ফাটলে সেই কাঁটাঝোপে হঠাৎ ছবির মতো আঁকা হয়ে গেছে সেই পাহাড়ী ছাগল আর তার দুটো বাচ্চা। বাচ্চা দুটো সবে স্তন ছেড়ে হাই তুলছে এবং তাদের মা পাতার দিকে জিভ বাড়িয়ে দিয়েছে।

স্বাভাবিক অবস্থায় রুখ কিছুতেই দুটো বাচ্চার মাকে মেরে ফেলার কথা ভাবতেই পারত না। কিন্তু এ তার জীবনের এক ভীষণ সংকটকাল। তাই এখন সে এতটুকু ইতস্তত করল না। ডাঙ্গসটা দু'হাতে তুলে ধরল। তারপর ছাগলটার মাথা লক্ষ্য করে প্রচণ্ড জোরে ছুঁড়ে মারল।

ছাগলটা একটু শব্দ পর্যন্ত করল না। ঝোপের ওপর নিঃশব্দে লুটিয়ে পড়ল। বাচ্চা দুটোও টের পেল না কি ঘটে গেল। তারা চাপা শব্দ করতে করতে মায়ের লেজের ডগা শুঁকল। তারপর চওড়া চাতালের ওপর চার ঠ্যাঙে লাফ দিয়ে-দিয়ে পরস্পরকে ঢুঁ মেরে খেলতে থাকল।

রুখ ঢাল বেয়ে দ্রুত নেমে যেতেই বাচ্চা দুটো প্রচণ্ড চেঁচিয়ে মায়ের মৃতদেহের তলায় লুকিয়ে পড়ার চেষ্টা করতে থাকল।

রুখ তাদের গ্রাহ্য করল না। ছাগলটাকে তুলে চাতালে রাখল। বাচ্চা দুটো ঝোপের ভেতর লুকিয়ে পড়ল। মাথার পাগড়ি খুলে রুখ দ্রুত ছাগলটাকে একটা বোচকার মতো করে বেঁধে ফেলল। রক্তের ছোপ ফুটে উঠল বোঁচকার গায়ে। তারপর সেটা কাঁধে তুলে নিয়ে পাহাড়ের একটা ধাপবন্দি খন্দ বেয়ে নামতে শুরু করল।

ঘোরবন্দ্ উপত্যকার পশ্চিমের একটা অংশ ছুঁচলো হয়ে পাহাড়ের পাদদেশ ফুঁড়ে একটা সংকীর্ণ গিরিখাতে মিশেছে। খাতটা বালি কাদা আর কোথাও কোথাও ডোবার মতো জলে ভর্তি। সেই দুর্গম খাত ধরে রুখ দৌড়চ্ছিল।

সামনের পাহাড়টা পেরিয়ে যেতে পারলে সে বিরমের পৌঁছনোর পায়ে চলা একটা রাস্তা পেয়ে যাবে। বিরমের পৌঁছুতে তার সন্ধ্যা হয়ে যাবে। সে কাথির বলে বিরমেরে বিপদে পড়ারও সম্ভাবনা আছে। তবু যেন নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে বুনো ঘোড়ার মতো ছুটে যাচ্ছিল রুখ।

বিরমের অঞ্চলের মুসলমান ধর্মগুরু পীর সামন্দাশের বয়স সম্পর্কে কারুর সঠিক ধারণা নেই। অনেকের বিশ্বাস, তার বয়স তিনশো বছর। বাগদাদের বাদশাহ্ হারুন অল রশিদের রাজত্বকালে নাকি তার জন্ম। আবার অনেকের ধারণা, পীর সামন্দাশের বয়সের কোন লেখাজোখা নেই। বাদশাহ্ সেকেন্দার অর্থাৎ গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডারের সেনাবাহিনীর সঙ্গেই নাকি তিনি খ্রীস্টপূর্ব ৩২৭ সালে এই মুল্লুকে এসেছেন। সুতরাং তিনি এক অমর চিরজীবী পুরুষ।

বিরমের শহরের উপকণ্ঠে একটি টিলার মাথায় ঘন জঙ্গলের ভেতর পীর সামন্দাশের ডেরা। একটি পাথরের বাড়িতে তিনি বাস করেন। বাড়িটি বস্তুত একটি প্রাচীন ভজনালয়। দেয়ালে খোদাই করা অনেক দেবদেবীর মূর্তি আছে। সেগুলো ঘষে এবং ভেঙেও একেবারে মুছে ফেলা যায় নি। কিন্তু বর্তমানে এই ঘরটি হয়ে উঠেছে একটি মসজিদ। প্রতি শুক্রবার বিরমের শাসনকর্তা সুলতান বাহকাম, গায়ের রঙ কালো বলে যিনি 'কারা বাহকাম' নামে পরিচিত, সদলবলে এখানে এসে নমাজ পড়ে যান। সপ্তাহের বাকি দিনগুলিতে এতদূরে নমাজ পড়ার জন্যে কেউ আসে না। শহরেই বিশাল সুলতানি মসজিদ রয়েছে।

তাছাড়া পীর সামন্দাশ একেবারেই ভিড় পছন্দ করেন না। একা থাকতে ভালবাসেন। তার ইচ্ছা অনুসারে সুলতান কারা বাহকাম হুকুম জারি করেছেন, নিছক নমাজ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে কেউ পীর সামন্দাশকে বিরক্ত করতে গেলে তাঁর গর্দান যাবে।

না, গর্দান যাওয়াটা কথার কথা। কারা বাহকামের নৃশংসতার সীমা নেই। জ্যান্ত মানুষের চামড়া ছাড়িয়ে নুনঝাল মাখিয়ে ছেড়ে দেবেন এবং হতভাগ্য যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে ছুটোছুটি করে বেড়াবে, যতক্ষণ না মৃত্যু এসে তাকে বাঁচায়।

পীর সামন্দাশের আস্তানার তোরণে তাই দুজন ভীষণাকৃতি তাতার প্রহরী সব সময় সজাগ। তারা

বোবা এবং কালা। তবে ইশারায় নমাজ পড়তে যাওয়ার কথা জানালে তারা ভেতরে ঢুকতে দেয়। আর ঢুকতে দেয় স্ত্রীলোকদের। তাদের ব্যাপারে কোন বাধা-নিষেধ নেই।

একদিন সন্ধ্যার পর পীর সামন্দাশ পশুচর্বির সাহায্যে জ্বালানো প্রদীপের আলোয় পাথরের বেদীতে বসে একটা প্রাচীন প্যাপিরাস পুঁথি পড়ছিলেন। হঠাৎ কানে এলো তোরণের দিকে থেকে তীব্র আর্তনাদ। তোরণের দু'পাশে দুটি মশাল জ্বলছিল। সেই আলোয় দেখতে পেলেন তাতার প্রহরীরা এক যুবককে প্রহার করছে। যুবটি চিৎকার করে তাদের কিছু বোঝানোর চেষ্টা করছে! তারা গ্রাহ্য করছে না।

হঠাৎ সামন্দাশের কানে এলো কয়েকটি পরিচিত শব্দের বাক্য। অমনি চমকে উঠলেন, বুকের ভেতর ধাক্কা লাগল। ওই ভাষা তিনি বোঝেন। ওটা কাথির ভাষা। সুতরাং যুবকটি নিশ্চয় কাথির।

অন্য কেউ হলে সামন্দাশ এতটুকু বিচলিত বোধ করতেন না। কিন্তু তাঁর রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে এ মুহূর্তে। উত্তেজনায় অস্থির সামন্দাশ পুঁথি গুটিয়ে রেখে সিডার কাঠে তৈরি বাঁকা লাঠিটি ভর করে তোরণের দিকে এগিয়ে গেলেন।

তাঁকে দেখে তাতার প্রহরীরা ক্ষান্ত হল। যুবকটির সর্বাঙ্গ তখন রক্তাপ্লুত। সে সামন্দাশকে দেখে হু হু করে কেঁদে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। সামন্দাশ গিয়ে তাকে তুলে ধরলেন। তারপর মৃদুস্বরে কাথির ভাষায় বলে উঠলেন, আর তোমার কোন ভয় নেই। তুমি আমার সঙ্গে এসো।

তাতার প্রহরীরা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সামন্দাশ তাদের দিকে ঘৃণাপূর্ণ কটাক্ষ করে যুবকটিকে সঙ্গে নিয়ে পা বাড়ালেন। তখন যুবকটি মৃদুস্বরে বলল, আপনার জন্য উপহার।

বিস্মিত সামন্দাশ দেখলেন, কাছেই একটি বোঁচকা পড়ে আছে এবং তার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে কোন মৃত পশু। সামন্দাশ একটু হেসে বললেন, কি আছে ওতে?

একটা পাহাড়ী ছাগল। আপনার জন্যে মেরে এনেছি।

সে কী! কেন?

শুনেছি, আপনি পাহাড়ী ছাগলের মাংস খেতে ভালবাসেন।

হেসে ফেললেন সামন্দাশ। .... বড় অদ্ভুত এই গুজব। যাই হোক, তোমার নাম কি?

রুখ।

গোত্র কি? সম্প্রদায়ই বা কি?

অস্তু গোত্র। আমার বাবার নাম খিরস্তু। বাবা সর্দার। আমবা রামগুল সম্প্রদায়ের লোক।

দেশ?

ঘোরবন্দ্।

ঘোরবন্দ্! আবার চমকে উঠলেন পীর সামন্দাশ। তারপর দু'হাতে রুখকে জড়িয়ে ধরে তার গলায় চুম্বন করলেন।

রুখ সব যন্ত্রণা ও আতঙ্ক মুহূর্তে ভুলে গিয়ে তাঁর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। সামন্দাশ শ্বাস ফেলে বললেন, এসো আমার সঙ্গে। আর হ্যাঁ, তোমার উপহারটিও নিয়ে এসো। পারবে তো? তুমি রীতিমত জখম হয়েছ মনে হচ্ছে।

রুখ দু'হাতে বোঁচকাটি তুলে নিল। মুখে হাসি এনে বলল, বুজুর্গ সামন্দাশের ছোঁয়ায় আমার আঘাত সঙ্গে সঙ্গে সেরে গেছে। এখন যদি আদেশ দেন, ওই দুই তাতার বাচ্চাকে আমি এই পাহাড়ী ছাগলটার মতোই মেরে ফেলতে পারি।

সামন্দাশ হাসলেন। কাথির বীরত্ব দেখানোর উপযুক্ত জায়গা বিরমের নয়। এসো।

রুখ বুদ্ধিমান ও আত্মসচেতন যুবক। পীর সামন্দাশের পিছু-পিছু মৃত পশুটিকে বয়ে নিয়ে যাবার সময় এতক্ষণে তাঁর হুঁশ ফিরল, কি আশ্চর্য! সামন্দাশ তার সঙ্গে কাথির ভাষায় কথা বলছেন!

তারপর তার মনে হল, পীর সামন্দাশ একজন বুজুর্গ—অলৌকিক ক্ষমতাধর পুরুষ। তাই এটা সম্ভব হচ্ছে। সে তো শুনেছেই, ইনি নাকি পশু-পাখির ভাষাও বোঝেন এবং হিংস্র পশুরা তাঁর পায়ের তলায় মাথা লুটিয়ে দেয়।

সে ভেবেছিল, সামন্দাশের সঙ্গে তার অল্প-জানা ফার্সি ভাষায় কথা বলব। ঘোরবন্দ্ উপত্যকার কাথিররা ভেড়া ও ছাগলের দুধ, পনির, মাখন, চর্বি ইত্যাদি বিক্রি করতে যায় দুর্গম পথ পেরিয়ে

ইরান অঞ্চলে। সেখানকার লোকেরা তাদের ঘৃণা করে না। বাবা আর খুড়োর সঙ্গে সে বহুবার ওই দেশে গেছে। সেই সূত্রে ভাঙা-ভাঙা ফার্সিও বলতে শিখেছে। কান্দাহার অঞ্চলের লোকেরা, যাদের মধ্যে আছে কিষান, তুর্কিস্থানি, তাতার, পাখতুন জাতের লোক, তারাও নাকি ফার্সি ভাষা জানে। কিন্তু তারা তো বুজুর্গ নয় যে সামন্দাশের মতো কাথির ভাষাও জানবে। যদি বা কেউ জানেও, সে ঘৃণা করে এই ভাষাকে।

মসজিদের পাশে একটা পাথরের ঘরে সামন্দাশ তাকে নিয়ে গেলেন। ঘরের ভেতর চওড়া একটা পাথরের বেদী। তার ওপর পুরনো একটা গালিচা বিছানো রয়েছে। সুদৃশ্য চীনেমাটির প্রকাণ্ড পাত্রে চর্বির ভেতর থেকে মাথা তুলে একটা সল্‌তে শান্তভাবে জ্বলছে এবং যথেষ্ট আলো ছড়াচ্ছে। তার সামনে নক্‌শা কাটা একটা 'রেহেল'—পুস্তকাধার এবং তাতে যে জিনিসটা রয়েছে, সেটো রুখ চেনে। ওকে কেতাব বলে। খোরাসান অঞ্চলের রামান শহরে এ সব জিনিস সে দেখে এসেছে। তার খুড়ো দিরস্ত তাকে বলেছিল, এই জিনিসটা খুব সাংঘাতিক। এর মধ্যে লুকিয়ে আছে এক দৈত্য, যার নাম ইল্‌ম্ (জ্ঞান)। ইল্‌ম্ দৈত্য যার বশ মেনেছে, সে নাকি ইচ্ছে করলে রাজা হতে পারে।

পীর সামন্দাশের পোষা 'দৈত্যটি'র দিকে সে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে রইল।

সামন্দাশ বললেন, বসো।

সামন্দশ তাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছিলেন। রুখ মেঝেয় বসে পড়ল। মৃত পশুটি পাশে রেখে এবার সে মনে মনে প্রস্তুত হল।

সামন্দাশ বেদীতে বসে একটু হেসে বললেন, তুমি তো কাথির। কাথিরদের মুসলমানরা বলে কাফির (বিধর্মী বাস্তিক)। তোমাদের দেশকে তাই ওরা বলে, কাফিরিস্তান।

রুখ কথার উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে তাকিয়ে রইল।

সামন্দাশ বললেন, তোমরা পৌত্তলিক। দেবদেবীর উপাসনা কর। মৃত পশুর মাংস খাও। কিন্তু মুসলমানরা পশুকে জবাই করে তবে খায়। কারণ রক্ত নিষিদ্ধ পানীয়। রক্ত বের হয়ে গেল তবে পশুর মাংস খাওয়া চলে।

রুখ অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল।

তোমার ক্ষতস্থানে ব্যথা হচ্ছে কি? সামন্দাশ জিজ্ঞেস করলেন।

রুখ বলল, না। আপনি বলছেন মৃত পশুর মাংস খাওয়া উচিত নয়?

রুখ, আমিও যে মুসলমান!

কথাটা বিশ্বাস করতে পারল না রুখ। কান্দাহার মুসলমানদের দেশ সে জানে। কিন্তু পীর সামন্দাশ মুসলমান, এটা সে ভাবতেই পারে নি। সারা ঘোরবন্দ্ উপত্যকার কাথিররা তাঁকে মনে মনে ভক্তি করে। তাঁর উদ্দেশ্যে কেউ কেউ মানতও করে। কিংবদন্তীর এই বুজুর্গ পুরুষ যে মুসলমান, তারা জানে না অথবা মানতে চায় না। রুখ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল সামন্দাশের মুখের দিকে।

সামন্দাশ একটু চুপ করে থাকার পর নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তুমি পথশ্রমে ক্লান্ত। ক্ষুধার্ত। ওখানে চৌবাচ্চা আছে। ভালভাবে হাত-মুখ ধুয়ে এসো। তারপর কথা হবে।

রুখ তাঁর নির্দেশ পালন করল। ক্ষতস্থানগুলোতে রক্ত জমাট বেঁধে গিয়েছিল। ভেড়ার লোমে তৈরি 'সুক' কাপড় সেলাই করে ঢিলে কুর্তা আর পায়জামা বানিয়ে দিয়েছিল তার মৃতা জননী। তাতার প্রহরীরা তা ছিঁড়ে দিয়েছে। দুঃখ ও ক্রোধ মুহুর্মুহু তাকে অস্থির করছিল। ঠাণ্ডা জলের ছোঁয়ায় সেই অস্থিরতা কিছুটা দূর হল।

সামন্দাশ চীনেমাটির পাত্রে নিজের খাদ্যের প্রায় সবটাই তাকে পরিবেশন করলেন। তিনি স্বপাক আহার করেন। রুটি, একগুচ্ছ আঙুর, একটি আপেল আর মধু তাঁর রাত্রের আহার। রুখ ক্ষুধার্ত ছিল। তাই আহার শেষ করতে দেরি করল না। নইলে এই খাদ্য তার কাছে মোটেও রুচিকর নয়। সত্যি বলতে কি, এই খাদ্য খেয়ে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে, তার বিশ্বাস হয় না। মাংস, চর্বি, দুধ, পনির—এই সব হল কাথিরদের প্রধান খাদ্য। কোন কোন বেলা বৈচিত্র্য হিসেবে জংলী মালবেরি (তুঁত) ফল খায়, কেউ-কেউ বুনো গম বা যবের বীজ সংগ্রহ করে নদীর ধারে সামান্য চাষও করে এবং তা থেকে রুটিও তৈরি করে। রুখের অবশ্য রুটি খেতে ভালই লাগে।

ঢেকুর তুলে সে হাঁটু দুটো মুড়ে তৈরি হয়ে বসল। সামন্দাশ শুধু খানিকটা মধু পান করলেন। তারপর তার দিকে সস্নেহে তাকিয়ে বললেন, আশা করি এবার সুস্থ হয়েছ?

রুখ উজ্জ্বল মুখে বলল, বুজুর্গের দয়ায় আমার কোন অসুখ নেই।

দাঁড়াও, এবার তোমার ক্ষতস্থানে মলম লাগিয়ে দিই।

রুখের আপত্তি না শুনে সামন্দাশ তার ছেঁড়া পোশাক সরিয়ে ক্ষতস্থানগুলোতে হেকিমি আরক মাখিয়ে দিলেন। তারপর হঠাৎ তার বুকের জামার ছেঁড়া অংশটা সরিয়ে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইলেন।

বিস্মিত রুখ বলল, কি প্রভু?

সামন্দাশ তার বুকে আঁকা উল্কি দেখছিলেন। অস্ত্র গোত্রের এই উল্কিচিহ্নগুলো পর্বতের দেবতা 'রাখুস' এবং আকাশের দেবতা 'বাজ্‌রান' (বজ্র)—এই দুজনের সম্মিলিত প্রতীক। একটি ত্রিকোণ চিহ্নের মাঝখানে আঁকা বাঁকা রেখা।

হঠাৎ বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল পীর সামন্দাশের। দ্রুত ওই উল্কিচিহ্ন চুম্বন করলেন। রুখ একটু ভয় পেয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। তার সারা শরীর শিউরে উঠেছিল। সামন্দাশ কিছুক্ষণ আগে যখন তার গলায় চুম্বন করেছিলেন, তখন সে ভয় তো পায়নি, বরং আনন্দে আবেগে উদ্বেলিত হয়েছিল। এই মুহূর্তে সামন্দাশের ঠোঁটে যেন রক্তশোষক জানোয়ারের ক্ষুধা। তার শরীরের রক্ত যেন শুষে নিলেন সামন্দাশ। ওর শরীরে আবার ক্লান্তি এসে গেল। শরীর অবশ হয়ে গেল যেন।

সামন্দাশ মৃদু হেসে বললেন, বস রুখ। এবার বল, কেন তুমি আমার কাছে এসেছ?

রুখ ধীরে বসল পাথরের মেঝেয়। সামন্দাশ বসলেন বেদীতে।

প্রদীপের সলতে ঝুঁকে পড়েছিল। একটা কাঠির সাহায্যে সোজা করে দিয়ে সামন্দাশ ফের বললেন, বল রুখ!

রুখ আস্তে বলল, রিয়ার সঙ্গে আমার যেন বিয়ে না হয়।

কে রিয়া?

আমার খুড়ো দিরস্তুর মেয়ে। সে নষ্টা। কিস্তানের সঙ্গে তার গোপন সম্পর্ক আছে।

সামন্দাশ হাসলেন। তোমার বিয়ে কবে?

যে রাতে পাহাড়ী ছাগলের শিঙে চাঁদ ফিরে আসবে, সেই রাতে।

সামন্দাশ বুঝলেন, শুক্লপক্ষের দ্বিতীয় তিথিতে রুখ ও রিয়ার বিয়ে হবে। আর মাত্র দুটি দিন বাকি। সামন্দাশ বললেন, রিয়া যে নষ্টা, তার প্রমাণ?

এবার রুখ আগাগোড়া সব ঘটনা বলল। তারপর ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকাল সামন্দাশের মুখের দিকে। তার চোখে ক্ষোভ, ঘৃণা, দুঃখ, ক্রোধের অভিব্যক্তি। তারপর চোখের কোণায় জলবিন্দু দেখা দিল। সে মুখ নামাল তখন। তার বুকের আয়তন যেন বেড়ে যাচ্ছিল। সে শ্বাস বন্ধ করে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করল।

সামন্দাশ কিছু বলতে যাচ্ছেন, সেই সময় বাইরে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা গেল। তিনি দরজার বাইরে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই চাপা গলায় বললেন, সর্বনাশ! রুখ, তুমি মৃত পশুটিকে বেদীর পিছনে লুকিয়ে রাখ। আঃ, কি দেখছ? দেরি কোরো না। ....

ঃ

সর্বাঙ্গ কালো বোরখায় ঢাকা মূর্তিটিকে দেখে রুখ হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল। তবে পীর সামন্দাশ এক বুজুর্গ। তাঁর কাছে রাত্রিবেলা এই সব অন্ধকারের প্রাণী বা অপদেবতারা আসতেই পারে। ঘোরবন্দে ফিরে গিয়ে এই অদ্ভুত বিস্ময়কর ঘটনার কথা কি ভাবে বর্ণনা করবে, ভেবে পাচ্ছিল না রুখ।

মূর্তিটি যে ঘোড়ায় চেপে এসেছে, তাতে সন্দেহ নেই। কোন কোন এলাকায় কাথিরদেরও ঘোড়া আছে। খচ্চরও আছে। তারা অস্ত্রগোত্রের মতো গরিব নয়। রুখ দেখল, মূর্তিটি দরজায় এসে যেন তাকে দেখেই থমকে দাঁড়াল।

সামন্দাশ বললেন, কে তুমি?

বোরখা-ঢাকা রমণী মৃদুস্বরে বলল, প্রভু! সুলতানা আপনার দর্শনার্থিনী। আমি তাঁর বাঁদি। আমার

নাম জুলেখা।

সামন্দাশ ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ালেন। কই, কোথায় তিনি?

বাইরে।

সামন্দাশ লাঠি ভর করে বেরিয়ে গেলেন। রুখ অবাক হয়ে গিয়েছিল। আরও অবাক হল, মূর্তিটিকে নারীকণ্ঠে কথা বলতে দেখে।

বাইরে চাপা গলায় কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল। একটু পরে সামন্দাশ ফিরে এলেন। তাঁর সঙ্গে এবার কালো বোরখা-ঢাকা দুটি নারী। সামন্দাশ রুখকে দেখিয়ে কিছু বললেন মৃদুস্বরে। তখন ওরা বোরখার মুখের পর্দা সরিয়ে দিল। রুখের চোখ জ্বলে গেল।

উজ্জ্বল রক্তিম নারীমুখ বিস্তর দেখেছে রুখ। কাথির রমণীদের সৌন্দর্যের কথা সারা ইরান থেকে পামির পর্যন্ত কিংবদন্তী হয়ে ছড়িয়ে আছে। তাদের চোখ নীলাভ, চুল পিঙ্গল, দেহ ক্ষীণ হলেও ছন্দিত, ইরানী মেয়েদেরও দেখেছে রুখ। কিন্তু এই দুই রমণীর মধ্যে একজনের মুখের রঙ ও কাঠামো দেখে সে বিস্মিত।

এ রকম মুখের রঙ তার কল্পনায় নেই। এই রমণী নিশ্চয় কোন রঙ মেখেছে। ইরানে হাবসি খোজা নর-নারীদের দেহের রঙ কালো—ঈষৎ নীলাভ কালো। কেউ-কেউ কুচকুচে কালো। কিন্তু এই রমণীর মুখের রঙ সে-রকম কালো নয়। মেঘের সঙ্গে এর তুলনা চলে, যে-মেঘে বৃষ্টির গাঢ়তা থাকে এবং সূর্যের আলোর প্রতিফলনে যা ঈষৎ উজ্জ্বলও দেখায়।

তারপরই চমকে উঠল রুখ। শ্যামবর্ণা রমণী তার দিকেই তাকিয়ে আছে। সঙ্গিনী—তার বাঁদি জুলেখার মুখের রঙ অবশ্য এ অঞ্চলের মতো স্বাভাবিক। তার গড়নও তাগড়াই। সে অনুচ্চস্বরে পীর সামন্দাশের সঙ্গে কথা বলছে অজানা ভাষায়।

সামন্দাশ হঠাৎ ডাকলেন, সুলতানা!

শ্যামবর্ণা রমণীর সম্বিৎ ফিরল। ঘুরে বলল, এই ছেলেটি কে?

রুখ বুঝতে পারছিল না ওরা কি ভাষায় কথা বলছে। কথা হচ্ছিল তুর্কি হিন্দুস্তানী মিশ্রণে এক অপভ্রংশ ভাষায়। সামন্দাশ বহু ভাষা জানেন। বহু দেশ ঘুরেছেন সারাজীবন।

সামন্দাশ বললেন, ও একজন কাথির।

সর্বনাশ! কি সাহসে ও বিরমেরে ঢুকেছে? ওকে দিনের আলোয় দেখলে লোকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলবে যে!

সামন্দাশ একটু হেসে বললেন, ও আমার আশ্রিত। সুলতান বাহকামের হুকুমে আমার আশ্রিতরা সব সময় নিরাপদ। যাই হোক, আপনি বলুন কি সমস্যা আপনার?

আমি বিপন্না। শ্যামবর্ণা রমণী মুখ নামিয়ে হাতের আঙুল খুঁটতে থাকল। আঙুলে কয়েকটি রত্নখচিত আংটি। সে মৃদুস্বরে বলল, আজ আবার শরীরে বিষ ধরা পড়েছে। শোওয়ার আগে সুলতান যতক্ষণ না আসেন, আমি এক পেয়ালা শিরাজি পান করতে থাকি। আজ চুমুক দিতে গিয়ে হঠাৎ মনে হল, এতে বিষ মিশিয়ে দেয় নি তো? তাই আমি জুলেখাকে বিষ পরীক্ষার পাত্র আনতে বললাম, সে তখনই পাত্রটি নিয়ে এলো। একটু শিরাজি তাতে ঢেলে দিতেই ফেনিয়ে উঠল।

জুলেকা বলল, আশ্চর্য লাগছে। শিরাজি যে সোরাহিতে থাকে, সেটা বেগম সুলতানার নিজের দেশ থেকে আনানো হয়েছিল। বান্দা কাশিম অন্য সোরাহিতে শিরাজি দিয়ে যায়। আমি তা বিষ পরীক্ষার পাত্রে পরীক্ষা করে তবে ওই সোরাহিতে ঢালি। তাছাড়া পুবদেশের ওই সোরাহির গুণ তো জানেন। বিষাক্ত কিছু ওর মধ্যে রাখলে গোঁজিয়ে উঠবে। অথচ তেমন কিছু হয় নি।

সামন্দাশ বললেন, সুলতান এখনও জানেন না আশা করি?

শ্যামবর্ণা রমণী বলল, না। উনি আজ সন্ধ্যায় সমরখন্দ রওনা হয়ে গেছেন। সেখানে বিদ্রোহের খবর এসেছিল।

জুলেখা বলল, শাহি হেকিমকে তলব দেওয়া হয়েছিল। উনি এসে পরীক্ষা করে দেখে বলে গেলেন, নেকড়ের মূত্র আর অজগরের রক্ত মিশিয়ে এই বিষ তৈরি হয়েছে।

সামন্দাশ হেসে উঠলেন। হেকিম আন্দাজ খাঁর কল্পনা সব সময় বড় বীভৎস। যাই হোক, সুলতানা—

শ্যামবর্ণা রমণী দ্রুত বলে উঠল, আপনি আমার নাম ধরে ডাকুন অনুগ্রহ করে। এখন আমি সুলতানা বা বেগম হয়ে আসি নি আপনার কাছে।

তার কণ্ঠস্বর এখন কম্পিত এবং ঈষৎ ভগ্ন। তার চোখ দুটি ছলছল করছিল। সামন্দাশ আস্তে বললেন, পদ্‌মাওয়াতি!

উঁহু, পদ্মাবতী।

সামন্দাশ অস্ফুটস্বরে কয়েকবার নামটা উচ্চারণ করলেন। তারপর বললেন, পদ্মাবতী?

হ্যাঁ, পদ্মাবতী।

সামন্দাশ একটু হাসলেন। সুলতান আমাকে বলেছিলেন সব কথা। তাঁর গায়ের রঙ কালো, অথচ তিনি জাতে তুর্কি। তাই আড়ালে লোকে তাঁকে কারা বাহ্‌কাম অর্থাৎ কালো বাহ্‌কাম বলে। তাঁর বেগমেরাও তাঁর গায়ের রঙ নিয়ে পরিহাস করেন। তাই তিনি চেয়েছিলেন, তাঁর মতো গায়ের রঙ, এমন কোন মেয়েকে বিয়ে করে তাকেই প্রধান বেগম বলে স্বীকৃতি দেবেন। কিন্তু কাফ্রি বা হাবসি মেয়ে তাঁর পছন্দ নয়। তারা তাঁর চেয়েও কালো। তাই নাকি তিনি হিন্দুস্তানে লোক পাঠিয়েছিলেন।

পদ্মাবতী বলল, আমি হিন্দুস্তানের মেয়ে নই। আমি পূবী। আমাদের বাড়ির নিচে যে নদী, তার নাম পদ্মা। আপনি গঙ্গা নদীর নাম শুনেছেন হয়তো। পদ্মা তারই একটা শাখা।

তোমাকে দাসীহাট থেকে কিনে এনেছিল সুলতানের লোকেরা।

পদ্মাবতী মাথা নেড়ে দৃঢ় কণ্ঠস্বরে বলল, সুলতান মিথ্যা বলছেন। ওরা গিয়েছিল ঘোড়া ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে। বঙ্গরাজ্যে তুর্কি ঘোড়ার খুব চাহিদা। তাই সেখানে তুর্কি ঘোড়া ব্যবসায়ীরা ঘোড়া বেচতে যায়। সুলতানের লোকেরা আমাকে জোর করে ধরে এনেছিল। মরার চেষ্টা করেছিলাম বহুবার। পারি নি। মরতে আমি বড় ভয় পাই, পিতা। বাঁচতে এত সাধ বলেই তো ... পদ্মাবতী মুখ নামিয়ে কান্না সম্বরণ করল।

উত্তেজিত হয়ো না মা। তুমি আমার কন্যার মতো। আমাকে তুমি পিতা বলেই ডাকতে পারো।

আমি কি করব, পিতা?

দেশে পালিয়ে যেতে চাও তো চল, ব্যবস্থা করে দিই।

দেশে? পদ্মাবতী আত্মসম্বরণে ব্যর্থ হল। কান্না জড়ানো গলায় বলল, আমাকে আর আমার আত্মীয়স্বজন গ্রহণ করবে না। দেখা মাত্র তাড়িয়ে দেবে জাতিভ্রষ্টা বলে। এমন কি মেরেও ফেলবে।

তোমার বাবা-মা বেঁচে আছেন কি?

না। তাঁরা বাল্যেই মারা যান। আমি আমার মামার আশ্রয়ে বাস করছিলাম।

তুমি তো হিন্দু?

ব্রাহ্মণ।

ও, ব্রাহ্মণ! সামন্দাশ চিন্তিতমুখে বললেন। ব্রাহ্মণদের আমি জানি। একবার হিন্দুস্তানে গিয়ে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তারা বড় অহঙ্কারী আর তার্কিক। তবে ইরানী জরুথুস্ত্রীয় সম্প্রদায়ের ধর্মের সঙ্গে ওদের ধর্মের কিছু মিল চোখে পড়েছিল। তবে সে সব কথা থাক। রাত্রি গভীর হয়ে আসছে। এখনই একটা কিছু ভেবে ঠিক করা দরকার।

তারপর একটু ভেবে নিয়ে সামন্দাশ আবার বললেন, বুঝতে পারছি সুলতানের অনুপস্থিতিতে হারেম এখন তোমার পক্ষে আর নিরাপদ নয়। তোমার তাতার খোজা প্রহরীদের ওপর নির্ভর করাও ঠিক হবে না। ঘুস দিয়ে তাদের বশীভূত করা সহজ। হুঁ—তুমি সমরখন্দে সুলতানের কাছে চলে যাবে? তাহলে ব্যবস্থা করে দিই। রাত্রের মধ্যে রওনা হলে হয়তো পথেই সাক্ষাৎ হতে পারে।

পদ্মাবতী মাথা দোলাল। না। সুলতান এখন বিদ্রোহ দমনের জন্য ব্যস্ত। ওঁকে তো জানেন, যখন যুদ্ধযাত্রা করেন, তখন অস্ত্র ছাড়া আর কিছু ওঁর মনে ঠাঁই পায় না। এ সব সময় ওঁর মতো নিষ্ঠুর মানুষ কল্পনাও করা যায় না। আপনার কি স্মরণে নেই, গত বছর মান্দওয়ারে তিন হাজার বন্দী বিদ্রোহীর কি অবস্থা করেছিলেন?

সামন্দাশ অন্যমনস্ক ভাবে বললেন, হ্যাঁ—তাদের জ্যান্ত চামড়া ছাড়িয়ে কাঠের খুঁটিতে বেঁধে নুন ঝাল মাখিয়ে একদল কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিলেন। হতভাগাদের আর্তনাদে সারা মান্দাওয়ারের লোক

কানে তুলো গুঁজে দিয়েছিল। ওঃ! সে অতি বীভৎস ঘটনা।

অথচ সুলতান পরে অনুশোচনায় কান্নাকাটিও করেছিলেন। পদ্মাবতী মৃদুস্বরে সলজ্জ ভঙ্গীতে বলতে থাকল। প্রতিবার নিষ্ঠুরতার পর সুলতান আমার বুকে মুখ গুঁজে শিশুর মতো কাঁদেন। আমি অবাক হই। ভেবে পাই না, এ কেমন মানুষ!

কারা বাহকাম এক অদ্ভুত সৃষ্টি ঈশ্বরের! সামন্দাশ শ্বাস ছেড়ে বললেন। পদ্মাবতী, আমি জানি, তুমি তাঁকে ভালবাসো।

হয়তো বেসে ফেলেছিলাম।

এখন বাসো না?

বুঝতে পারি না।

সামন্দাশ ভ্রুকুঞ্চিত করে কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বিষণ্ণভাবে মৃদু হেসে বললেন, আমি সংসারত্যাগী ফকির। অথচ চিরদিন আমার ভাগ্য আমাকে সাংসারিক ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে ফেলে। পদ্মাবতী, আমার জীবনে এ এক বিচিত্র রাত্রি। এই যে কাথির যুবকটিকে দেখছ, এও আমার কাছে ছুটে এসেছে একটি সমস্যা নিয়ে। ওর বিশ্বাস, আমি একটা নিষ্পত্তি করে দিতে পারব।

আপনি সিদ্ধপুরুষ, পিতা। পদ্মাবতী এই কথা বলে আবার রুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল।

রুখ ওই কালো উজ্জ্বল চোখের ঝলক সহ্য করতে না পেরে মুখ নামাল। সামন্দাশ কি বলতে যাচ্ছেন, হঠাৎ পদ্মাবতী চমকিত স্বরে বলে উঠল, এ কি! ছেলেটি দেখছি আহত। ওর পোশাক ছেঁড়া!

সামন্দাশ বললেন, সুলতানের প্রহরীরা ওর এই দশা করেছে। আমি গিয়ে না পড়লে ওরা একে মেরেই ফেলত।

পদ্মাবতী বলল, আহা! বেচারা!

রুখ বুঝল। মানুষের সমবেদনার ভাষা বুঝতে হয়তো দেরি হয় না মানুষের। রুখ পার্সী মিশ্রিত কাথিব ভাষায় বলে উঠল, আপনি কে জানি না। কিন্তু একটু আগে আপনি কাঁদছিলেন দেখলাম। মেয়েরা কাঁদলে আমার খুব কষ্ট হয়। তবে বুজুর্গ সামন্দাশের কাছে যখন এসে পড়েছেন, তখন আর আপনার কোন ভয় নেই।

সামন্দাশ ওর সরলতায় হেসে ফেললেন। বললেন, ওর নাম রুখ। কয়েকদিনের মধ্যে খুড়তুতো বোনের সঙ্গে ওর বিয়ে। কিন্তু ও তাকে বিয়ে করতে চায় না। তাই আমার কাছে ছুটে এসেছে।

পদ্মাবতী কৌতূহলী হয়ে বলল, সে কি! কেন?

মেয়েটি নাকি নষ্ট। তার সমস্ত ব্যাপার রুখ স্বচক্ষে দেখেছে।

বেশ তো! মুখের ওপর বলে দিক, বিয়ে করবে না।

তুমি জানো না পদ্মাবতী। কাথিরদের সামাজিক প্রথা সম্পূর্ণ আলাদা। তাছাড়া রুখ ওদের গোত্রপতির ছেলে। গোত্রপতি এবং প্রবীণরা যা ঠিক করে দিয়েছে, তা না মানলে ওর শাস্তি হবে। কন্যা যে নষ্টা, তার প্রমাণ দিতে না পারলেও আবার ভীষণ শাস্তি বরাদ্দ।

পদ্মাবতী অবাক হয়ে বলল, প্রমাণ দিতে পারবে না? ও তো স্বচক্ষে দেখেছে বলছে।

কিন্তু সাক্ষী নেই।

হঠাৎ জুলেখা বিকৃত মুখে মন্তব্য করল, কাথিররা বর্বর। অসভ্য জংলী জাত। ওরা—

পদ্মাবতী বাধা দিয়ে দ্রুত বলল, এ কথা বলছ কেন জুলেখা?

জুলেকা বলল, ওদের জন্যই আমি নিষ্ঠুর কারা বাহকামের হারেমে বাঁদিবৃত্তি করছি। বীর সামন্দাশের ঘরে নির্ভয়ে সত্য বলা যায়। তাই বলতে দ্বিধা করছি না, সুলতানা। তাছাড়া আমি যে আজ রাত্রে আপনার সঙ্গে বেরিয়ে এসেছি, আমি আর হারেমে ফিরব না।

পদ্মাবতী চমকে উঠল। বলল, কেন জুলেখা?

জুলেখা শ্বাস-প্রশ্বাসজড়িত কণ্ঠস্বরে বলল, সুলতানা শুনুন। পীরবাবা, আপনিও শুনুন। আমি বদখশানের এক আর্মেনীয় সওদাগরের কন্যা। ইরান যাওয়ার পথে কাথির দস্যুরা আমার বাবা, মা এবং সঙ্গের লোকজনকে মেরে ফেলেছিল। আমি তখন ছ'বছরের বালিকা। উটের পেটের তলায় লুকিয়েছিলাম বলে দস্যুরা আমাকে দেখতে পায় নি। নইলে আমাকেও মেরে ফেলত। দু'দিন দু'রাত্রি

পরে আমাকে একদল আফগান সওদাগর উদ্ধার করেছিল। তারাই আমাকে বেচে দিয়েছিল কারা বাহকামের কাছে। কারা বাহকাম তখন নিতান্ত এক তুর্কি সর্দার। সুলতানকে ভাড়াটে সেনা সরবরাহ করত। ওই কালো লোকটির আগের জীবনের ইতিহাস আমি ছাড়া আর কেউ জানে না।

পদ্মাবতী ক্ষুব্ধভাবে বলল, তুমি এতদিন আমাকে এ সব কথা বল নি! ভেবেছিলাম তুমি খুব সরল।

জুলেকা একটু হাসল। কিন্তু সে-হাসিতে ঘৃণার ছাপ ছিল। সে বলল, কারা বাহকামকে আপনি ভালবেসে ফেলেছেন, সেটা লক্ষ্য করেই বলি নি। আপনাকে আমি কেমন করে বলব যে ওই কালো শয়তান আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার কুমারীত্ব হরণ করেছিল!

জুলেখা! পদ্মাবতী ভর্ৎসনা করল। তুমি বড় বাড়াবাড়ি করছ! এ দেশে আসার পর আমি জেনেছি, বাঁদি তার মালিকের ভোগ্যা। এটাই নাকি সামাজিক প্রথা। আমাদের দেশে এ সব অবশ্য আমরা কল্পনাও করতে পারি না। কিন্তু দেশের প্রথা অনুসারে সুলতান এমন কিছু অন্যায় করেছেন বলে মনে করি না।

সামন্দাশ হাত তুলে বললেন, চুপ, চুপ। বিতর্কের সময় এটা নয়।

কিন্তু জুলেকা উত্তেজিত ভাবে উঠে দাঁড়াল। আপনিও ওই কালো শয়তানের পাল্লায় পড়ে তার মতোই হবেন, আমি জানি। শয়তানটা আপনাকে জাদু করে রেখেছে। অথবা আপনি বাধ্য হয়েই এ সব কথা বলছেন।

পদ্মাবতী ধমক দিল, জুলেখা! ছোট মুখে বড় কথা বোলো না।

জুলেখা গ্রাহ্য করল না। বলল, আপনি ফিরে গেলে আপনার সমাজ আপনাকে নেবে না। তাই বাধ্য হয়ে আপনি শয়তানটাকে ভালবেসেছেন। কিন্তু আমি বাঁদি হলেও, এমন কি ধর্ষিতা হলেও আমার সমাজ আমাকে নেবে। ভাগ্যে থাকলে বাঁদিদেরও সুলতানা হওয়া সম্ভব। বান্দারাও বহু দেশে সুলতান হয়েছে।

পদ্মাবতীর দু'চোখে আগুন জ্বলে উঠল। ক্রুদ্ধস্বরে বলল, বিশ্বাসঘাতিনী! যাও, আর তোমার মুখ দেখতে চাই নে। সুলতান দুধ দিয়ে সাপ পুষেছেন জানেন না! এতক্ষণে বুঝতে পারছি, আমার হিতৈষিণী সেজে তুমিই আমাকে হত্যার চক্রান্ত করে আসছ এতদিন ধরে!

সামন্দাশ বিরক্ত হয়ে বললেন, আঃ! কেন তোমরা কলহ করছ মিছিমিছি? তোমাদের প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক হয় নি দেখছি। বলা হয়, নারীরা বড় বাচাল, বড় কলহপ্রিয়া। কথাটা মিথ্যা নয় দেখছি।

জুলেখা ঠোঁট কামড়ে ধরে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করছিল। এবার কান্নাজড়িত স্বরে বলল, আর যাই হই আমি, পূর্বদেশের এক হতভাগিনীর মৃত্যু আমার কল্পনায় ছিল না কোন দিন। কারণ, আমিও তো তেমনি এক হতভাগিনী। বিদায় সুলতানা! বিদায় পীর সামন্দাশ! যদি সুদিন ফিরে আসে জুলেখার সঙ্গে আপনাদের দেখা হবে। নইলে এই শেষ দেখা।

বলে জুলেকা দ্রুত বেরিয়ে গেল। হতচকিতের মতো বসে রইল পদ্মাবতী। সামন্দাশ গম্ভীর মুখে বাইরের অন্ধকারে দৃষ্টি রাখলেন। ঘোড়ার পায়ের শব্দ ক্রমশ দূরে মিলিয়ে গেল।

হঠাৎ সামন্দাশ নড়ে উঠলেন। চাপা গলায় দ্রুত বললেন, পদ্মাবতী! কি করতে চাও?

পদ্মাবতী দু'হাতে মুখ ঢেকে কান্নাজড়িত স্বরে বলল, তা যদি জানতাম, আপনার কাছে আসতাম না, পিতা!

তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

পদ্মাবাতী চমকে উঠল। কোথায়?

কাথির দেশে। বলে সামন্দাশ উঠে দাঁড়ালেন। তারপর রুখের উদ্দেশে কাথির ভাষায় বললেন, রুখ। ওঠ বাছা! আমার জিনিসপত্র বেঁধে নিতে সাহায্য কর আমাকে। শিগগির।

রুখ অবাক চোখে তাকাল সামন্দাশের দিকে।

ঘোরবন্দ্ নদীসঙ্গমের পশ্চিম তীরে বুনো তুঁত গাছের ঘন জঙ্গল। প্রকাণ্ড সব পাথর পড়ে আছে সেই জঙ্গলের ভেতর। কোন কোন পাথরে অদ্ভুত সব ছবি খোদাই করা। ভয়ঙ্কর সেই সব ছবি

কাথির দেবতাদের। একস্থানে জীর্ণ প্রাচীন যুগের পাথরে তৈরি একটা মন্দির। মন্দির বলতে একটা উঁচু চওড়া বেদী। চারকোণায় চারটে ফাটল-ধরা থাম। একদিকে 'ইমরার' প্রতীক একটুকরো প্রকাণ্ড বলের মতো পাথর। ইমরা কাথিরদের স্রষ্টা ঈশ্বর। ইমরার ডাইনে কালো অনুরূপ একটা গোল পাথর। সেটা যুদ্ধদেবতা 'গিশের' প্রতীক। বাঁপাশের একই আকৃতির পাথরটা শাদা। ওটা কাথিরদের পয়গম্বর 'মণির' প্রতীক। ইমরা তাঁর অনুচর গিশ এবং মণিকে নিয়ে বাস করেন। কাথিরদের এই বিশ্বাস।

প্রতি পূর্ণিমার রাত্রে এ মন্দিরে অস্তু গোত্রের কাথিররা এসে পূজো দেয়। পশুপাখি বলি দেয়। ঢোলক এবং শিঙ্গা বাজায়। যুবক যুবতীরা নাচে এবং গান গায়। পরের দিন বিকেল অব্দি সেই উৎসব চলে একনাগাড়ে। তারপর নদীসঙ্গমে স্নান করে শুদ্ধ হয়ে তারা বস্তিতে ফেরে ইমরার আশীর্বাদ নিয়ে। বাকি দিন ও রাতগুলো এই মন্দির নির্জন, খাঁ খাঁ।

কাথিরদের প্রধান সম্প্রদায় দুটি : রামগুল এবং কিশগুল। এ মন্দির রামগুল কাথিরদের। তাই অস্তু ছাড়া অন্যান্য গোত্রের কাথিরদেরও এখানে পূজোর অধিকার আছে। কিন্তু কিছুকাল যাবৎ অস্তু গোত্রের সঙ্গে কলহ থাকায় তারা আর এদিকে পা বাড়াতে সাহস পায় না।

সকালে রিয়া ইমরার মন্দিরে এসে বসে আছে। মুখে বিষণ্ণতার রেখা ফুটে রয়েছে। পাঞ্জশের (পঞ্চশির) পাহাড়ের চূড়ায় 'বোজি কুহি' (পাহাড়ি ছাগল বা আইবেক্স) যখন নবজাত চাঁদকে শিঙে বসিয়ে নিয়ে ফিরে আসবে চির-অন্ধকার মৃত্যু-পাতাল থেকে, তখন এখানেই রিয়ার বিয়ে হবে রুখের সঙ্গে। কিন্তু রুখকে সে বিয়ে করতে চায় না। রুখ গোঁয়ার। তেজী। রিয়াকে ছোটবেলা থেকেই সে গ্রাহ্য করে না। তা করলে রিয়ার আপত্তি ছিল না। কিন্তু তাকে দেখলেই যে-রুখ গম্ভীর হয়ে যায়, পথে তাকে আসতে দেখলেই অন্যদিকে হেঁটে যায়, সেই রুখকে কিশোরী বয়স থেকেই মনে মনে অপছন্দ করতে শিখেছিল রিয়া।

সে ভেবে পাচ্ছিল না, এই সাঘাতিক বিপদ থেকে কীভাবে বাঁচবে। তাই প্রতিদিন একবার করে ইমরা, গিশ ও মণির কাছে মাথা কুটতে আসছিল।

রিয়া বিষণ্ণমুখে বেদীতে পা ঝুলিয়ে বসে গাছের পাতা ছিঁড়ছিল। সেই সময় তাকে চমকে দিয়ে ঝোপের ফাঁকে মুখ বের করল কিস্তান।

কিস্তান হাসছিল। তাই দেখে রাগে জ্বলে উঠল রিয়া। বলল, হাসতে লজ্জা করছে না তোমার?

কিস্তান সাবধানে কাছে এলো চারদিকে নজর রেখে। তার হাতে পাল-চরানো লাঠি। খাটো নীলচে সালোয়ার, আঁটো হাফহাতা ধূসর রঙের কুর্তা, মাথায় যেমন-তেমন একটা পাগড়িতে কয়েকটা পালক গোঁজা। সে রাখালদের দল থেকে ছিটকে এসেছে।

কিস্তান তার পাশে বসে বলল, ইমরার দয়া হয়েছে। সেই খবর দিতে এলাম, রিয়া। আমার হাসি দেখে তুমি রাগ করলে। কিন্তু খবরটা শুনলে তুমি আমার চেয়েও বেশি হাসবে।

রিয়া আস্তে বলল, খবরটা কি?

বস্তিতে খুব কান্নাকাটি চলেছে। খিরস্তু বুক চাপড়ে কাঁদছে। তাই দেখে সব বুড়োবুড়ি, আর তোমার বাবাও কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে।

রিয়া অনামনস্কভাবে বলল, রুখ ফেরে নি?

কিস্তান খিকখিক করে হেসে বলল, ফিরবে কি করে? একটু আগে খবর এসেছে নাকি, রুখকে পাঞ্জশেরের পাঁচটা সিংহ ছেঁড়াছিঁড়ি করে খাচ্ছে।

রিয়া চমকে উঠল। বলল, সে কি! কোথায়?

পাঞ্জশেরের নিচে। সেখানে তুমি কখনও যাও নি। গাছপালা নেই, খালি পাথর।

কে খবর আনল?

খারিব।

রিয়া নড়ে বসল। তীব্রস্বরে বলল, খারিব মিথ্যাবাদী। খারিব কোন খারাপ মতলবে কথাটা রটিয়েছে। তাছাড়া পাঞ্জশেরে সে কি করতে গেল? এ আমি বিশ্বাস করি না।

কিস্তান লাঠির ডগায় মাটিতে আঁচড় কাটতে কাটতে বলল, তোমার বিশ্বাস করা-না-করায় কারুর যায় আসে না। বস্তিতে গিয়ে স্বচক্ষে দেখ গে, সবাই ওকে বিশ্বাস করেছে।

রিয়া উত্তেজনা চেপে বলল, পাঞ্জশের এলাকায় সিংহ আছে সবাই জানে। সেখানে কেন যাবে রুখ?

কিস্তান হাসতে হাসতে বলল, সিংহের সঙ্গে লড়াই করতে নিশ্চয় যায় নি। তবে পিস্তুস আমাকে ক'দিন আগে বলেছিল, রুখ নাকি পীর সামন্দাশকে স্বপ্ন দেখেছে। পীর সামন্দাশ তাকে তলব দিয়েছেন—সেও নাকি স্বপ্নে।

পীর সামন্দাশ! শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলে উঠল রিয়া।

হ্যাঁ, তাই তো বলল পিস্তুস। কিস্তান পরিহাসের ভঙ্গীতে বলল। তো আমি পিস্তুসকে বললাম, হ্যাঁ রে, তুই বললি নে কেন ওকে, স্বপ্নেই পীর সামন্দাশ তাঁর উড়ন্ত গালিচা পাঠিয়ে দিন বরং! তাহলে রুখ সেই গালিচায় চেপে বিরমের শহরে চলে যেতে পারবে।

রিয়া দ্রুত ওর মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল, এই! খবর্দার! পীর সামন্দাশকে নিয়ে তামাশা কোরো না, ক্ষতি হবে।

কিস্তান অমনি গম্ভীর হয়ে চাপা গলায় বলল, আমি মনে মনে পীর সামন্দাশকে বলে রেখেছি, তোমার সঙ্গে যেন আমার বিয়ে হয়। হয়তো সেজন্যই তিনি পাঞ্জশেরের পাঁচটা সিংহকে রুখের পথ আটকাতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সিংহগুলো তাকে খেয়ে ফেলল।

রিয়া তবু সন্দিগ্ধভাবে বলল, কিন্তু খারিব সেখানে কেন গিয়েছিল?

কিস্তান বলল, ওদের ইরাণী ঘোড়াটা পালিয়ে গেছে জানো না বুঝি? ক'দিন থেকে খারিব এক মুল্লুকে, তার বাবা আরেক মুল্লুকে খুঁজতে বেরুচ্ছে। আজ খারিব গিয়েছিল পাঞ্জশেরে। ওই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে সে ওদের ঘোড়াটার মতোই লেজ তুলে দৌড়ে এসেছে।

কিস্তান আবার হাসতে লাগল। রিয়া ধমক দিল, চুপ কর তো! এখন হাসির সময় নয়।

কিস্তান অভিমান দেখিয়ে বলল, বুঝেছি। রুখের জন্য তোমার কষ্ট হচ্ছে। বেশ।

রিয়া চিৎকার করে উঠল, না!

তাহলে এমন খবর শুনে তোমার মুখে হাসি নেই কেন?

উজবুক! রুখ না থাকলে বাবা তোমার সঙ্গেই আমার বিয়ে দেবেন, এমন কথা ভাবছ কেন তুমি?

রিয়ার কথাটা শুনে ঘাবড়ে গেল কিস্তান। অসহায় চাউনিতে তাকিয়ে বলল, দেবে না? কেন?

তোমাদের তো মোটে এগারোটা ভেড়া। তার মধ্যে ছটাই বাচ্চা। রিয়া হিসেব করে বলল। বাবা মেজকাকার কাছে আমার জন্য তেরোটা ভেড়া চেয়েছে। মেজকাকার তাতে আপত্তি হয় নি।

কিস্তান আরও ঘাবড়ে গেল। লাঠির ডগা দিয়ে নিচের মাটি ঘষতে থাকল আবার। একটু পরে ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বলল, সেজন্যই তো তোমাকে বলেছিলাম, চল, আমরা পালিয়ে যাই।

রিয়া শিউরে উঠল। কোথায় পালাব? কাখিরদের দেখলেই মুসলমানরা পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলে। ছোটকাকার কি হয়েছিল জানো না?

কিস্তান চাপা গলায় বলল, যদি আমরা ইরানে চলে যাই? ইরান খুব বড় দেশ। ইরানীরা আমাদের ঘৃণা করে না।

এখানকার সবাই ইরানে জিনিস বেচতে যায়, আমাদের খোঁজ পেয়ে যাবে।

কিস্তান হঠাৎ ব্যাকুলভাবে ওর একটা হাত চেপে ধরল। তাহলে হিন্দুস্তানে যাবে রিয়া?

সে তো অনেক দূর।

কিস্তান একদিকে লাঠি তুলে বলল, ওইদিকে হিন্দুস্তান। খুব বেশি দূর নয়, শুনেছি। তিন দিন তিন রাত্রি হেঁটে গেলে বালুচরের মুল্লুক। সেখানে পাহাড় আর বালির ময়দান। গাছপালা নেই। যতদূর যাবে শুধু বালি আর পাথর আর পাহাড়। কষ্ট করে সেটুকু পেরোতে পারলেই নাকি ঘোরবন্দের চেয়ে বড় এক নদী। তার ওপারে সোনা দিয়ে তৈরি শহর। খালি সোনা আর সোনা! হিন্দুস্তান দেশটাই সোনার।

সোনা কী? রিয়া অস্ফুট স্বরে প্রশ্ন করল।

হাসল কিস্তান। তুমি তো কখনও ইরানে যাও নি। তাই সোনা দেখ নি। সোনা খুব দামী জিনিস। এখানে তোমাদের হাতে কানে এ সব গয়না এগুলো হল তামা। আর সোনার রঙ গাঢ় হলুদ। ভীষণ

ঝকমকে। চোখ ঝল্‌সে যাবে দেখলে।

রিয়া স্বপ্নাচ্ছন্নভাবে বলল, তাহলে হিন্দুস্তানে যাব।

যাবে রিয়া?

হুঁউ।

কিস্তান চাপাস্বরে বলল, তাহলে শোন। আজ রাতে তুমি চুপি চুপি নদীর ধারে এসে দাঁড়িয়ে থাকবে। আখরোট গাছটার নিচে অপেক্ষা করবে। ক্রোতাস বুড়োর ভেলাটা ওখানে বাধা থাকে। ক্রোতাস আজ রাতে মাছ ধরতে বেরুবে না। তার খুব অসুখ। ওঝা ডাকতে গেছে ওর জন্য। আমরা ওই ভেলায় চেপে নদী পেরুব।

তুমি ভেলা বাইতে জানো তো?

কিস্তান হাসল। কি জানি না আমি? বেশি জানি বলেই তো হিংসে করে সবাই আমাকে বোকা বলে'

রিয়া ওর একটা হাত চেপে ধরে বলল, যদি আমরা ডুবে মরি?

মরব। কিস্তান একটু হাসল। পারবে না আমার সঙ্গে মরতে?

রিয়া একটু ভেবে বলল, আমার মরার ইচ্ছে নেই। তবে তুমি যখন বলছ—

কিস্তান আবেগে দু'হাতে ধরে ফেলল ওকে। লাঠিটা সশব্দে ছিটকে পড়ল। রিয়াকে শূন্যে তুলে পা বাড়াতেই রিয়া এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। মিনতি করে বলল, না কিস্তান। এখন আমার মন ভাল নেই। আর এটা ইমরার জায়গা।

কিস্তান ওর চেহারা দেখে মনমরা হয়ে বলল, আচ্ছা।

রিযা হঠাৎ দ্রুত ছুটে গেল। কিস্তান অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর লাঠিটা নিয়ে হাঁটতে থাকল পালের উদ্দেশে।

কিছুক্ষণ পরে খোলা মাঠে গিয়ে দেখতে পেল, রিয়া নদীর ঘাটে জল ভরছে। তিনটে মাটির পাত্রে জল ভরে মাথায় বসিয়ে সে বস্তির দিকে চলতে থাকলে কিস্তানও পা বাড়াল।

ভেড়ার পালটা উপত্যকার তৃণভূমিতে ছড়িয়ে রয়েছে। তার সঙ্গীরা একলা দাঁড়িয়ে থাকা একটা সিডার গাছ ঘিরে চক্রাকারে ঘুরছে। ওরা খেলায় মেতে রয়েছে। কেউ তাকে লক্ষ্য করছে না জেনে নিশ্চিন্ত হল কিস্তান। ....

রিয়া বস্তিতে ফিরে দেখল, কিস্তান যা বলেছিল, তাই। ভিড় করে লোকেরা দাঁড়িয়ে আছে এবং এক গাছের তলায় বারোয়ারি প্রকাণ্ড পাথরের চাতালে মুরুব্বির বুড়োরা গম্ভীর মুখে বসে আছে। চাতালের নিচে বুড়ি আর মধ্যবয়সীরা বুক চাপড়াচ্ছে আর শোকের গান গাইছে। তার বাবা দিরস্তু ছোট ভাই খিরস্তুকে সান্ত্বনা দিচ্ছে এবং নিজেও নিঃশব্দে কাঁদছে। খিরস্তু সর্দার। তার কান্না শোভা পায় না। সে পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে প্রার্থনার ভঙ্গীতে। তার মাথার পাগড়ি খুলে কাঁধে জড়িয়ে গেছে। লাল্‌চে একরাশ চুল ছড়িয়ে পড়েছে দু'ধারে।

রিয়াকে দেখে দাঁড়িয়ে থাকা লোকেরা চমকানো চোখের ভাষায় দুঃসংবাদ দিল। তার বয়সী মেয়েরা দৌড়ে এসে তার মাথার জলভরা পাত্রগুলো সযত্নে নামিয়ে নিল এবং তাদের ঘরে রাখতে গেল। রিয়া খুব বিব্রত বোধ করল। অবিবাহিতাদের মৃত্যুজনিত শোকসঙ্গীতে যোগ দিতে নেই। কিন্তু রিয়া কাথির প্রথা অনুসারে অর্ধ-বিবাহিতা। তাই তাকে এই শোকসঙ্গীতে গলা মেলাতেই হবে। বুক চাপড়াতে হবে একটু বেশি করেই। শোকের ভঙ্গীতে, ত্রুটি ধরা পড়লে তার নামে নিন্দা রটবে।

তার বন্ধুরা জল রেখে এসেই তাকে টানতে টানতে বিলাপকারিণীদের ভিড়ে ঠেলে ফেলার উপক্রম করল। রিয়া জানে, এবার তার দিকে তাকিয়ে তার দুর্ভাগ্য বর্ণনা করতে করতে ওরা শোকসঙ্গীত গাইবে। ওরা তার হাত টানাটানি করবে। বুকে পিঠে মাথায় হাত ঘষবে। কতটা শোক পেয়েছে, সেটাই এভাবে যাচাই করবে ওরা। রিয়াকেও সর্বাঙ্গ দিয়ে জানিয়ে দিতে হবে যে, সত্যিই তার মতো অভাগিনী এ মুহূর্তেই এই পৃথিবীতে আর একজনও নেই।

মুহূর্তে রিয়া মন ঠিক করে ফেলল। ধাক্কা সামলে নিয়ে সে রুখে দাঁড়াল। তারপর বন্ধুদের ঠেলে ছিটকে বেরিয়ে এলো। বিলাপ থেমে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্য। ভিড় স্তম্ভিত হয়ে গেল রিয়ার আচরণে।

রিয়ার নাসারন্ধ্র স্ফুরিত। চুল আলুথালু। চোখ নিষ্পলক।

গোত্রপতি খিরস্তুর চোখে পড়েছিল। হঠাৎ সে গম্ভীর কণ্ঠস্বরে বলে উঠল, যতক্ষণ না আমার হতভাগ্য পুত্র রুখের অন্তত একটুকু চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ তাকে মৃত বলি কেমন করে? খারিব কোথায়? তাকে বল, আমরা এখনই পাঞ্জশেরে রওনা হতে চাই। আমরা কয়েকজন স্বচক্ষে ঘটনাস্থল দেখে আসতে চাই। রুখের একটা হাড়ের টুকরোও নিয়ে আসব আমরা।

এক বৃদ্ধ বলল, সিংহরা তোমাদের খেয়ে ফেলবে। কিন্তু খিরস্তু বা অন্য কেউ কথাটা কানে নিল না। তারা কাথির দুর্ধর্ষ মানুষ, প্রয়োজনে সিংহের সঙ্গে লড়াইয়ে প্রস্তুত। ...

রুখ কেন পাঞ্জশের উপত্যকায় গিয়েছিল, খিরস্তু ভেবে পাচ্ছিল না। অথচ খারিব বিশ্বস্ত লোক। সে অস্তুগোত্রের দূতের কাজ করে। সেজন্য তার পাগড়িটি শাদা এবং পাগড়ির ভেতর ব্রোঞ্জের একটা চাকতি লুকানো থাকে। সেই চাকতিতে খোদাই করা আছে অস্তুগোত্রের প্রতীক বা টোটেম চিহ্ন হিসেবে একটি নেকড়ে। চাকতিটা তার পরিচয়-জ্ঞাপকও। তাছাড়া খারিবের ওপর আরেক দায়িত্ব অর্পিত। ঘোরবন্দ্ ও পাঞ্জশেরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে যে বাণিজ্য পথ আছে, সেই পথে কোন সওদাগর দল বা ধনী পথিককে যেতে দেখলে সে দ্রুত এসে বস্তিতে খবর দেবে। অমনি দুর্ধর্ষ একদল লোক লুণ্ঠনের জন্য নেকড়ের পালের মতো ছুটে যাবে। সুতরাং খারিব একই সঙ্গে দূত এবং গুপ্তচরও।

খারিব একদল সিংহকে রুখের মাংস ছিঁড়ে খেতে দেখেছিল পাহাড়ের একটা চাতাল থেকে। সেই চাতালে পৌঁছে সে নিচের দিকে পাথর ছড়ানো এবং উঁচু ঘাসে ঢাকা একটা সমভূমির দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করল। বিকেল হয়ে এসেছে। নিচের ওই সমভূমিতে পাহাড়ের ছায়া পড়েছে। এখনই পাহাড়ের কাঁধে ও চূড়ায় কুয়াশা ঘনিয়ে উঠেছে। বাতাস দ্রুত উত্তাপ হারাচ্ছে। খিরস্তু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার প্রিয় পুত্রের বধ্যভূমি দেখতে থাকল। তার সঙ্গে খারিব ছাড়াও সাতজন বাছাই করা যোদ্ধা রয়েছে। সংঘর্ষের সময় এই সাতজনই সামনের সারিতে থাকে। তারা গোত্রপতির আদেশের অপেক্ষায় চুপ করে আছে। প্রত্যেকের হাতে বল্লম বা ভল্ল, কোমরে বাঁধা ইরানি তরোয়াল, পিঠে বাঁধা চামড়ার তূণীরে প্রচুর বিষাক্ত তীর এবং কাঁধে সিডার কাঠের ধনুক।

সিংহ দেখতে পেলে আগে তারা তীর ছুঁড়ে আহত করবে। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়বে সিংহের ওপর। পাঞ্জশেরে সিংহ আছে তারা জানে। সামান্য দূরে বাণিজ্যপথে বহুবার সিংহের মানুষ শিকার তারা কেউ-না-কেউ দেখেছে। কিন্তু খিরস্তু ছাড়া আর কারুর সিংহ মারার সৌভাগ্য হয় নি। তাই খিরস্তুর একটি পদবী শেরন্দাজ। পদবীটি অবশ্য কাথির ভাষার নয়, ইরানি। ইরানি সিংহ শিকারীদের শেরন্দাজ বলা হয়। সেই শুনে সিংহ শিকারী কাথিররাও নিজেদের শেরন্দাজ বলে।

খিরস্তু খারিবের মুখের দিকে তাকাল। খারিব বলল, ইমরার দিব্য, সর্দার! যদি ইচ্ছা থাকে, চলুন ওখানে। এতদূর থেকে কিছু চোখে পড়ছে না।

খিরস্তু হঠাৎ খারিবের কাঁধে থাবা হাঁকড়ানোর মতো করে হাত রাখল। খারিব চমকে উঠল। একটু ভয়ও পেল। খিরস্তু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলল, খারিব! যদি তেমন কোন চিহ্ন ওখানে না পাই, 'ঘানিশ' (দূত বা চর) হলেও তোমার রেহাই নেই। তুমি তো আমাকে জানো।

খারিব ব্যস্তভাবে বলল, নিশ্চয় কিছু চিহ্ন আছে ওখানে। যেতেই তো বলছি আমি।

তারা চাতালটা থেকে পাহাড়ের ঢালু গায়ে আটকে থাকা ধাপবন্দি সিঁড়ির মতো পাথরগুলোতে সবে পা রেখেছে, হিন্দাস্তু নামে এক যোদ্ধা চাপা স্বরে বলে উঠল, সর্দার! কাফেলা! (বণিকদল)!

মুহূর্তে সচকিত হয়ে উঠল সবাই। থমকে দাঁড়াল। খিরস্তু বিরক্ত হয়ে বলল, যেতে দাও।

হিন্দাস্তু লুঠপাটে ওস্তাদ বরাবর। কাফেলা বা কোন পথিক দেখলেই তার চোখ দুটি জ্বলে ওঠে বাজপাখির মতো। লোভে তার রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে। সে ক্রুদ্ধস্বরে বলল, ছেলের হাড়ের টুকরোর চেয়ে কাফেলার ধনদৌলত কাথির সর্দারদের কাছে বেশি মূল্যবান বলেই জেনে আসছি এতকাল। তাছাড়া হাড়ের টুকরো পরেও কুড়িয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু কাফেলা হল নদীর স্রোত।

খিরস্তু হিন্দাস্তুর দিকে নিষ্পলক চোখে তাকাল একবার। তারপর বাণিজ্য-পথের দিকে দৃষ্টি ফেলল। পাহাড়ের গা বেয়ে আঁকাবাঁকা রাস্তায় এগিয়ে আসছে তিনটি মানুষ। একজন ঘোড়ার পিঠে, অন্য

দুজন হেঁটেই আসছে। ছায়া আর কুয়াশায় আবছা দেখাচ্ছে তাদের। স্পষ্ট কিছু বোঝা যায় না।

খিরস্তু বলল, কাফেলা নয়। সামান্য পথিক।

ঘিশান নামে আর একজন যোদ্ধা বলে উঠল, একজন স্ত্রীলোক আছে ওদের মধ্যে।

হিন্দাস্ত্ বলল, সর্দার! বাঁক পেরিয়ে এলেই ওরা আমাদের দেখতে পাবে। তখন হুঁশিয়ার হয়ে যাবে।

খিরস্তু টের পেল, দলের সবাই এ মুহূর্তে লুণ্ঠনলোলুপ হয়ে উঠেছে। বাধা দিলে সর্দারকেই হত্যা করে ফেলবে এবং বস্তিতে গিয়ে একটা মিথ্যা গল্প বলবে। তাই সে সশব্দে শ্বাস ফেলে আস্তে বলল, হুঁ—খারিব, তুমি এগিয়ে গিয়ে দেখ, লুঠ করা পোষাবে নাকি। অস্তু কাথিররা ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করলে সারা রামগুল সম্প্রদায়ের বদনাম রটবে। যাও!

খারিব একটা পাহাড়ী ছাগল বললেই চলে। তার গতি তীরের মতো। সে ছুটে গেল বাণিজ্য-পথের দিকে। খিরস্তুও দলবল নিয়ে পথের বাঁক লক্ষ্য করে ছুটে চলল।

নিচের সমভূমিতে পৌঁছেই তাদের থমকে দাঁড়াতে হল সিংহের গর্জন শুনে। খারিব ততক্ষণে বাণিজ্য-পথের ধারে উঁচু একটা পাথরে পৌঁছে গেছে। খিরস্তু বাঁদিকে ঘুরেই দেখল, ঘাসের জঙ্গল থেকে মুখ বের করে গর্জন করছে একটা কেশর দোলানো প্রকাণ্ড সিংহ। খিরস্তু চেঁচিয়ে উঠল, হুঁশিয়ার! সে বল্লম তাক করল। সাতকোটির যোদ্ধা ধনুকে তীর জুড়ে তাক করল।

সিংহটা মুহুর্মুহু গর্জন করছিল। সম্ভবত দলটা ভারি দেখে আক্রমণ করতে সাহস পাচ্ছিল না। তারপর দেখা গেল, একটা সিংহী দুটো বাচ্চা নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। দুটো সিংহই একসঙ্গে গর্জন করতে থাকল। বাচ্চা দুটো মায়ের পিছনে দাঁড়িয়ে রইল।

কাথিরদের একঝাঁক বিষাক্ত তীর ছুটে গেল সিংহ দুটোর দিকে। সঙ্গে সঙ্গে সে এক ভূমিকম্প, ঝড় আর বজ্রপাতের ঘটনা যেন। আহত সিংহ-সিংহী আকাশ-কাঁপানো হুংকার ছেড়ে এসে পড়ল কাথিরদের ওপর। খিরস্তু সামনেই ছিল। কিন্তু তার পাশ কাটিয়ে সিংহ দুটো ঝাঁপিয়ে পড়ল অন্যদের ওপর। চোখের পলকে তিনজন কাথির লুটিয়ে পড়ল। আর্তনাদে, হিংস্র গর্জনে কানে তালা ধরে যাচ্ছিল খিরস্তুর। কিন্তু সে স্থির মস্তিষ্কসম্পন্ন মানুষ। সিংহ হিন্দাস্তের মাথায় থাবা মারতেই সে তার ভল্লটা সবেগে ছুঁড়ে মারল। গায়ে বিঁধলে সিংহটা ঘুরে দাঁড়াল। হিন্দাস্ত্ তখন মাটিতে পড়ে আর্তনাদ করছে।

সিংহী ওদিকে আরেকজনের ঘাড় কামড়ে ধরে ঝোপে ঢুকেছে। সিংহ খিরস্তুর দিকে ছুটে এলো। খিরস্তু পিছিয়ে এসে একলাফে একটা পাথরে উঠে পড়ল এবং তরোয়াল বের করল। যতবার সিংহটা পাথরে ওঠার চেষ্টা করে, তার তরোয়ালের খোঁচা খেয়ে পিছিয়ে যায়। ইতিমধ্যে বাকি তিনজন কাথির পালিয়ে গেছে। খিরস্তু টের পাচ্ছে, সে একা লড়ছে সিংহের সঙ্গে। সিংহের পেটে তার বল্লমটা আমূল বিঁধে রয়েছে। মাঝে মাঝে সিংহটা মুখ ঘুরিয়ে থাবার সাহায্যে সেটা ওপড়ানোর চেষ্টা করছে। পারছে না। তখন ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে খিরস্তুর দিকে লাফ দিচ্ছে!

হঠাৎ এক অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটল। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না খিরস্তু। তার ও সিংহের মাঝখানে ঘাসের জঙ্গলে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠল।

সিংহটা ভড়কে গেল। আবার হিস করে চাপা শব্দ হল একটু তফাতে। আবার দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। তখনই সিংহটা মাথা নিচু করে অদ্ভুত কুঁই-কুঁই করতে করতে লেজ গুটিয়ে দৌড়ুতে শুরু করল। খিরস্তু দেখল, সিংহীটা যেখানে একজন কাথির যোদ্ধাকে কামড়ে-কামড়ে খাচ্ছিল, সেখানেও আগুন জ্বলে উঠল। তখন সিংহীও পড়ি-কি-মরি করে পালিয়ে এলো তার বাচ্চাদের কাছে। তারপর ধীরে-সুস্থে ঘাসের জঙ্গল ভেঙে চলতে থাকল।

খিরস্তু চোখ বুজে বিড়বিড় করে বলল, হে ইমরা! হে পয়গম্বর মণি! তোমাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু এমনি করে যদি আমার পুত্রকে তুমি রক্ষা করতে প্রভু! তুমি কি জানো না, রুখের মতো পুণ্যবান ছেলে সারা কাথিরিস্তানে একটিও নেই? তুমি কি জানো না পাপ রুখের ছায়া দেখলেই পালিয়ে যায়? রুখের জন্মের রাতে তার মাকে তোমরা স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছিলে, তোমার পেটের বাচ্চা দুনিয়ার বাদশাহ্ হবে। কাথিরিস্তান থেকে ইরান, ইরান থেকে সমরখন্দ, সমরখন্দ থেকে হিন্দুস্তান তার পায়ের তলায় মাথা নোয়াবে! হে ইমরা! হে পয়গম্বর মণি! সেই গোপন স্বপ্নের কথা আমরা কাউকে বলি

নি। যদি বলতাম, কি লজ্জায় পড়ে যেতাম আজ। সবাই তামাশা করে বলত, সিংহের মুখের এঁটো হওয়াই যার ভাগ্য, তাকে আমি দুনিয়ার বাদশহ্ দেখতে চেয়েছি। ছি ছি! আমার মতো নির্বোধ আর মিথ্যাবাদী সারা কাথিরিস্তানে থাকতে নেই!

খিরস্তুর চোখের জলে গাল ভেসে যাচ্ছিল।

হঠাৎ কেউ চিৎকার করে বলে উঠল, বাবা!

খিরস্তু গ্রাহ্য করল না। চোখও খুলল না। সে ভাবল ইমরার মায়া।

আবার পরিচিত কণ্ঠের চিৎকার শুনতে পেল খিরস্তু, বাবা! আমি রুখ।

খিরস্তু তবু গ্রাহ্য করল না। সে জানে, ইমরা বড় মায়াবী। পয়গম্বর মণি তাঁর মন্ত্রী। আসলে এ মণির চক্রান্ত। অজ্ঞতাজনিত কোন প্রাচীন পাপের শাস্তি এভাবেই তাকে দেওয়া হচ্ছে।

কিন্তু তারপরই খারিবের কণ্ঠস্বর তার কানে এলো। সর্দার আমাদের রুখ পীর সামন্দাশকে নিয়ে এসেছে! পীরবাবার অলৌকিক ক্ষমতায় ঘাসের জঙ্গলে আগুন জ্বলছে। সিংহরা পালিয়ে গেছে ভয়ে। জয় বাবা সামন্দাশ!

খিরস্তু চোখ খুলে পিছনে ঘুরল।

ঘোড়ার পিঠে এক বৃদ্ধকে দেখতে পেল প্রথমে। মাথার সাদা চুল বুকে এসে একরাশ সাদা দাড়ির সঙ্গে মিশে গেছে। পাগড়ির বদলে ধূসর রঙের ছুঁচলো টুপির শীর্ষে ঝিলিক দিচ্ছে কি এক অপার্থিব জ্যোতি। কাথিররা উপমাপ্রিয় জাতি। মুহূর্তে খিরস্তুর মনে হল, তুষার-ঢাকা পাঞ্জশের পর্বতের শ্রেষ্ঠ একটি চূড়া, যার শীর্ষে একটি নক্ষত্র স্থাপিত হয়েছে, নেমে এসেছে সমভূমির তৃণক্ষেত্রে এই দিনশেষের ম্লান আলোয়।

তারপর খিরস্তু দেখতে পেল রুখকে। সে চিৎকার করে লাফ দিল পাথর থেকে। রুখ দৌড়ে এলো। পিতা-পুত্র ঘন আলিঙ্গনে আবদ্ধ রইল কিছুক্ষণ।

খারিব বলল, বড় দুর্গন্ধ এখানে। হিন্দাস্তের পোড়া লাশ থেকেই বেশি দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। ও ছিল বেজায় লোভী আর হিংসুটে।

আগুন ধিকধিক জ্বলছে ঘাসের জঙ্গলে। কাথিরদের মৃতদেহগুলো পুড়তে শুরু করেছে। ধোঁয়ায় কিছু দেখা যাচ্ছে না ওদিকটায়।

রুখ পিতার আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হয়ে বলল, বাবা! আমি পীর সামন্দাশকে নিয়ে এসেছি। তাঁকে প্রণাম কর।

খিরস্তু শান্তভাবে এগিয়ে ঘোড়াটার সামনে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে প্রণাম করল কাথির প্রথায়। সামন্দাশ শুধু একটু হাসলেন।

সামন্দাশ ভাবছিলেন পদ্মাবতীকে কি ভাবে নেবে কাথির সর্দার। তার পরণে বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীর গৈরিক বসন। কাথিরিস্তানের দক্ষিণে ওয়াজিরিস্তানে প্রচুর বৌদ্ধ বাস করে। বৌদ্ধরা কাথিরদের পরিচিত। তাই পদ্মাবতীকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীর পোশাক পরিয়েছেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁর কাছে একখণ্ড গৈরিক কাপড় ছিল। কোনক্রমে পদ্মাবতীর দেহ তাতে আবৃত হয়েছে। ধারালো ছুরিকায় তার সুন্দর কেশরাশি কেটে ফেলতে হয়েছে। পদ্মাবতী নির্বিকার। মুণ্ডিত মস্তক না হলে বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী বলে কেউ বিশ্বাস করবে না। তবে পূর্বাদেশে বৌদ্ধদের সে ছোটবেলা থেকে দেখেছে। তাদের আচার-আচরণ সবই তার মোটামুটি জানা। বঙ্গ রাজ্যে বহু মঠ ছড়িয়ে আছে। সেই মঠ জীবনের বহু প্রথাও পদ্মাবতীর অজানা নয়।

রুখ পদ্মাবতীর দিকে ঘুরে বলল, বাবা। আমার মতো ইনিও পীর সামন্দাশের একজন ভক্ত। দেখতেই পাচ্ছ, ইনি কে।

খিরস্তু সম্মানিত মহিলাদের প্রতি কাথির প্রথা অনুসারে একটা হাত সামনে বাড়িয়ে মাথা একটু ঝুঁকিয়ে সম্ভাষণ করল। মৃদু হেসে বলল, আপনি নিশ্চয় ওয়াজিরিস্তানের মঠে থাকেন?

পদ্মাবতী শুধু ঘাড় নাড়ল। অনভ্যস্ত শ্রমে এবং দুর্গম পথ হেঁটে সে ক্লান্ত। তার কোমল পা ক্ষতবিক্ষত।

খারিব বলল, আর এখানে নয়, সর্দার। বড় বিশ্রী গন্ধ। শ্বাস নিতে পারছি না।

খিরস্তু হাত বাড়িয়ে সামন্দাশের ঘোড়ার রজ্জু ধরল। তারপর হঠাৎ দৃষ্টি গেল পদ্মাবতীর পায়ের দিকে। সে সামন্দাশকে বলল, হে বুজুর্গ! ইনি সন্ন্যাসিনী হলেও স্ত্রীলোক। কেন একে আপনার উড়ন্ত গালিচাটি দেন নি? ওর পা দুখানি একবার দেখুন! কি অবস্থা হয়েছে বেচারির।

সামন্দাশ একটু হকচকিয়ে গেলেন। লোহার গুলতিতে বারুদের পিণ্ড ঠাসা কাঠের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি গুলি ছুঁড়ে ঘাসে আগুন ধরাতে পেরেছেন। এই মারাত্মক অস্ত্র গ্রীকদের কাছে শেখা। এখনও এদেশে কেউ এই অস্ত্রের ব্যবহার জানে না। বারুদ কি তাও জানে না। কিন্তু 'উড়ন্ত গালিচা' তো রূপকথার গল্পের জিনিস। কাথিরিস্তানে তাঁর নামে কত অলৌকিক রটনা আছে, রুখের কাছে শুনেছেন উড়ন্ত গালিচার কথা খিরস্তুর মুখে শুনে তাই বিব্রত বোধ করলেন। তবে এও সত্যি, বেচারি পদ্মাবতীর পা দুটো ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। অতি কষ্টে সে হাঁটতে পারছে। কিন্তু সাহসী ও জেদী বলেই সে এতখানি দুর্গম পথ অতিক্রম করতে পেরেছে। কিন্তু তাকে ঘোড়া দিলে সামন্দাশ এক পা-ও চলতে অক্ষম।

সামন্দাশ হাসলেন। কাথির ভাষায় বললেন, অস্তুসর্দার! আশা করি তুমি ওয়াজিরিস্তানের বৌদ্ধদের কৃচ্ছ সাধনের কথাও জানো। এই কষ্ট সহ্য করাই ওদের ধর্মের বিধান। এতে পুণ্য হয়।

খিরস্তু ব্যাখ্যাটা মেনে নিল। সে বৌদ্ধদের ব্যাপার-স্যাপার স্বচক্ষে দেখেছে। তবু তার মন খুঁত-খুঁত করছিল। সামন্দাশের ঘোড়ার রাশ তার হাতে। চলতে চলতে সে বারবার পিছু ফিরে দেখছিল পদ্মাবতীকে। তার কষ্ট হচ্ছিল। আহা, নিতান্ত স্ত্রীলোক। তাছাড়া বয়সে একেবারে যুবতী।

কিছুটা চলার পর খাবির বলল, আমি বরং এগিয়ে গিয়ে বস্তিতে খবর দিই, রুখ বিবনের থেকে পীর সামন্দাশকে নিয়ে আসছে। সারা মুল্লুকে টি টি পড়ে যাবে।

খিরস্তু বলে উঠল, যাও! দেরি করছ কেন তাহলে? ওদের তৈরি হতে বল গে। ......

পীর সামন্দাশ একটা গোপন উদ্দেশ্য নিয়েই কাথিরিস্তানে এসেছিলেন। বহুদিন ধরে মনে মনে একটা পরিকল্পনা গড়ে তুলেছিলেন। সেখানে গেলে কি কি ঘটবে, রুখের কাছে নিজের সম্পর্কে সব কথা শুনে সেটাও আঁচ করেছিলেন। তাঁর অনুমানে এতটুকু ভুল হয় নি।

ঘোরবন্দ উপত্যকায় ইতস্তত বহু কাথির গোষ্ঠীর বসবাস। সে রাত্রেই গোত্রে গোত্রে খবর পাঠিয়েছিল খিরস্তু, রামগুল কাথিরদের মঙ্গলের জন্য পীর সামন্দাশের আবির্ভাব ঘটেছে। সন্ধ্যার পর দেখতে দেখতে ভিড় জমে গিয়েছিল। সামন্দাশ তাদের অলৌকিক শক্তি দেখানোর সুযোগ নিয়েছিলেন। চর্মপেটিকা থেকে নানা ধরনের বাজি বের করে রাত্রির আকাশে রঙবেরঙের আলোর খেলা দেখিয়ে কাথিরদের হতবাক করে দিয়েছিলেন।

কাথির গোত্রপতিরা উড়ন্ত গালিচা দেখতে চেয়েছিল। সামন্দাশ তখন ফানুস উড়িয়েছিলেন। চারকোনা ফানুসের পিছনে হাউই জুড়ে যখন অগ্নিসংযোগ করলেন, মুহূর্তে সেটা আকাশে পৌঁছে গেল। তারপর বাতাসে ভাসতে ভাসতে এবং আলো ছড়াতে ছড়াতে সেই ফানুস ঘোরবন্দ নদী পেরিয়ে হিন্দুস্থানের দিকে উধাও হয়ে গেল। কয়েক হাজার কাথির একসঙ্গে চিৎকার করে পীর সামন্দাশের নামে জয়ধ্বনি দিল। তারপর গোত্রপতিরা জানতে চাইল, উড়ন্ত গালিচা কবে ফিরে আসবে। সামন্দাশ মৃদু হেসে বললেন, এক কাথির যুবক যেদিন দুনিয়ার বাদশা হবে। ইমরাদেব তাকে জন্মের আগে থেকে বেছে রেখেছেন।

ওরা বিস্ময়ে আনন্দে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। খিরস্তু শিউরে উঠেছিল। তার পুত্র রুখের কথায় সামন্দাশ এদেশে এসেছেন। তাহলে কি রুখের মায়ের সেই স্বপ্ন এবার সফল হতে চলেছে? রুখই ইমরাদেবের নির্বাচিত সেই বাদশাহ্, এতে কোন ভুল নেই।

পরদিন রিয়ার সঙ্গে রুখের বিয়ে হবে। রিয়ার বাবা দিরস্তু খিরস্তুর দাদা। খিরস্তু গোপনে কথাটি দাদাকে জানাতে চেয়েছিল। রিয়া বাদশাহ্ বা সুলতানের বউ হবে।

সেরাত্রে একশো ভেড়া কেটে রামগুল কাথিরদের মহাভোজের আয়োজন। সব জায়গায় মশাল জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। কাথিররমণীরা নৃত্যগীতে মেতে উঠেছে। পথশ্রমে ক্লান্ত পদ্মাবতীকে একটি পৃথক ঘর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পীর সামন্দাশ বারোয়ারি চত্বর থেকে লাঠি ভর করে তার খোঁজ

নিতে গেছেন রুখের সঙ্গে। এই সময় খিরস্তু নিভৃতে ডেকে নিয়ে গেল খঞ্জ দাদাকে। এমন উৎসবের রাত্রে খঞ্জ দিরস্তুর শরীরে সিংহের পরাক্রম।

নির্জনতার বড় অভাব এমন রাত্রে। দুই প্রবীণ ভাই বস্তি ছাড়িয়ে নদীর দিকে যাচ্ছিল। তাদের চোখে পড়ল, অন্ধকারে কারা বসে আছে। খিরস্তু অবাক হয়ে বলল, তোরা কারা? এখানে কি করছ?

অমনি নারীকণ্ঠে কেউ হিংস্র চাপা স্বরে বলে উঠল, খিরস্তু সর্দারের সর্বনাশ হোক!

দিরস্তু লাঠি ভর করে হাঁটছিল। পারলে লাঠিটা ছুড়েই মারত। ক্রুদ্ধস্বরে বলল, তুমি হিন্দাস্তের বউ না? সর্দারকে অভিশাপ দিলে কি শাস্তি পাবে জানো না মূর্খ স্ত্রীলোক? আজ অবশ্য সর্দারের মন-মেজাজ ভাল আছে। তাই খুব বেঁচে গেলে।

হিন্দাস্তের বউ জিল্লান সাপিনীর মতো গর্জন করল। ধিক সর্দারকে! আমরা চারজন মেয়ে বিধবা হলাম। চারটি বিধবার বদলে সর্দার তার ছেলেকে ফিরে পেল। কিন্তু আমাদের কথা তার মনে রইল না?

খিরস্তু স্থিরমস্তিষ্কের মানুষ। সে দুঃখিত কণ্ঠস্বরে বলল, বোন! তোমাদেব বিধবা হওয়ার কথা আমার মনে আছে। আমি ভেবে রেখেছি, পীর সামন্দাশকে বলব, তিনি যেন তোমাদের বীর স্বামীদের ফিরিয়ে এনে দেন।

সিংহের থাবায় নিহত ঘিশানের বউ পুতান ভাঙা গলায় বলল, আমাদের শোকের গান গাওয়াও এ-রাতে বারণ। খারিব শাসিয়েছে আমাদের। বলেছে, যদি কেউ এতটুকু চোখের জল ফেলি, আমাদের ইমরার থানে কাঠের পাটাতনে বিঁধিয়ে রাখা হবে। সর্দার, তুমি তো এমন নিষ্ঠুর মানুষ ছিলে না।

জিল্লান বলল, সর্দার! আমাদের শোক জমে এখন পাথর হয়ে গেছে।

কানিজ নামে তৃতীয় বিধবা বলল, সর্দার, মিনতি করে বলছি—আমাদের কাঁদতে হুকুম দাও। আমি যে আর চুপ করে থাকতে পারছি না। বুক ফেটে যাচ্ছে।

চতুর্থ বিধবা কোন কথা বলল না।

খিরস্তু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ঠিক আছে। তোমরা যদি শোকের গান গাইতে চাও, ইমরার মন্দিরে চলে যাও। হিন্দাস্তরা ছিল আমার সেবা অনুচর। তাদের মৃত্যুতে আমিও ব্যথিত। কিন্তু পীর সামন্দাশ এসেছেন। আমি ভাবছি, তাঁকে বললেই তো তিনি ওদের ফিরিয়ে দেবেন।

চার বিধবা একসঙ্গে উঠে ইমরার মন্দিরের দিকে হাঁটতে লাগল। দিরস্তু শাসিয়ে বলল, কিন্তু খবরদার! তোমাদের গানের সুর যেন বস্তি পর্যন্ত না পৌঁছায়।

ওরা চলে যাওয়ার একটু পরে খিরস্তু বলল, এখানেই কথাটা তাহলে তোমাকে বলি দাদা।

দিরস্তু বসে পড়ল মাটিতে।

খিরস্তু ফিসফিস করে রুখের মায়ের স্বপ্নের কথা, রুখের প্রতি পীর সামন্দাশের অনুগ্রহের কথা এবং বাদশাহ্ বা সুলতান হওয়ার কতটা সম্ভাবনা, সবই বর্ণনা করল উত্তেজিতভাবে। তাই শুনে দিরস্তুও খুব উত্তেজিত হয়ে উঠল। তার মেয়ে রিয়া তাহলে বেগম বা সুলতানা হবে। এ তো চিন্তারও অতীত।

দিরস্তু বলল, কিন্তু সাবধান, এ সব কথা আর কাউকে বোলো না যেন। ঈর্ষায় কেউ রুখ বা রিয়ার ক্ষতির চেষ্টা করবে তাহলে।

খিরস্তু একটু হাসল। কথাটা তুমি রিয়াকে জানাতে পারো। সে খুশি হবে।

দিরস্তু মাথা নাড়ল। উঁহু, মেয়েদের পেটে কথা থাকে না। তাছাড়া—

দ্বিধান্বিতভাবে সে চুপ করলে খিরস্তু বলল, থামলে যে দাদা?

দিরস্তু সাবধানে বলল, রিয়া বড় বেয়াড়া মেয়ে, সে তো জানো ভাই! ভীষণ জেদী আর বেপরোয়া। অন্য মেয়ে হলে তার বরাতে কবে খারাপ কিছু ঘটে যেত।

খিরস্তু বলল, তা ঠিক। একে তোমার মেয়ে, তার ওপর রুখের পাত্রী। তাই তার কোন ত্রুটি আমি গ্রাহ্য করি না।

দিরস্তু আরও সতর্কভাবে বলল, রিয়ার হাবভাব ইদানিং আমার ভাল ঠেকছে না। বিয়ের নামে সব মেয়েরই চেহারা বদলে যায়। রিয়ার মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি। জিজ্ঞেস করলে বলেছে, ও

কিছু না। ভেবে পাই না, তার কি হয়েছে! এ বিয়ে কি তার মনঃপুত নয়?

খিরস্ত একটু বিরক্ত হল। দাদা, আমি কিন্তু তোমার দাবিমতো তেরোটা ভাল জাতের ভেড়া যৌতুক দিচ্ছি। রিয়া যদি অনিচ্ছায় বিয়ে করে, আমি তিনটে ভেড়াও দেব না।

বিব্রত দিরস্ত বলল, না, না। অনিচ্ছার কথা নয়। মুখ ফুটে তো বলে নি তেমন কথা। তাছাড়া ওর ইচ্ছে-অনিচ্ছের দাম কি? আমি যা বলব, তাই হবে।

খিরস্ত একটু ভেবে বলল, রিয়াকে বরং জানিয়ে দাও, তার ভাগ্যে সুলতানা হওয়া আছে। তাহলে তার মন ভাল হয়ে যাবে। অনিচ্ছা থাকলে তাও ঘুচে যাবে।

বলছ তুমি?

হ্যাঁ, বলছি।

ফিরে গিয়ে দিরস্ত মেয়েদের নাচ গানের আসরে রিয়াকে খুঁজল। দেখতে পেল না। আসরটা খুব বড়ই হয়েছে। কারণ অন্যান্য গোত্রের অসংখ্য মেয়ে এসে জুটেছে। সারা-রাত্রি তারা হুল্লোড় করবে। মশালের আলোয় আজ রাত্রে তাদের আশ্চর্য উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। কাথির মেয়েদের রূপের খ্যাতি আছে। ইরাণ, তুরাণ থেকে সমরখন্দ, তুর্কিস্তান পর্যন্ত সে-খ্যাতির বিস্তার। কতবার কত সুলতান কাথিরিস্তানে এসে কাথির যুবতীকে হরণ করে নিয়ে গেছেন।*

দিরস্ত খুঁজে খুঁজে হয়রান। কোথাও রিয়া নেই। কেউ দেখে নি রিয়াকে। বাড়িতেও রিয়া নেই। রিয়ার মা নাখসুন দজ্জাল মেয়ে। কিন্তু গানের আসরে সে এখন ওস্তাদনী হয়ে জমিয়ে রেখেছে। তাকে জিজ্ঞেস করতে গেলে স্বামীকে হয়তো কামড়াতে আসবে। কাথির নারীরা পুরুষদের মতোই বহু ব্যাপারে স্বাধীন।

দিরস্ত উদ্বিগ্ন হল। সে তার ঘরের সামনে এসে ক্লান্তভাবে বসে পড়ল। আকাশের নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে ইমরার উদ্দেশে মনে মনে প্রার্থনা করতে থাকল। সব যেন ভালয়-ভালয় মিটে যায় প্রভু!

কিছুক্ষণ পরে সে ঘরে ঢুকে তুঁতফলে তৈরি একপাত্র মদ নিয়ে এলো। চুমুক চুমুকে মদ পান করতে করতে যখন নেশা হল, তখন সে রিয়ার কথা ভুলে গুনগুন করে গান গেয়ে উঠল। মাত্র একটা গানই সে জানে। সেই গানটা হল এই :

'বোক্তি কুহি (পাহাড়ী ছাগল) মারতে গিয়েছিলাম পাঞ্জশের পাহাড়ে
দেখা হল তোমার সঙ্গে আখরোট গাছের ছায়ায়
বোক্তি কুহি না তুমি দাঁড়িয়ে আছ
ভাবতে ভাবতে আমার স্বপ্ন-ছুট ...

কেউ ধাক্কা দিচ্ছিল দিরস্ত বুড়োকে। গানে বাধা পড়ায় বিরক্ত হয়ে বলল, কে রে তুই? তোর কোমর ভেঙে দু'টুকরো হোক। তোর নাকের ডগায় কবুতর বসুক। তোর চুলে—

কাথিরী অভিশাপের তোড়ে বাধা পড়ল। দিরস্ত খুড়ো! সর্বনাশ হয়েছে।

কিচ্ছু হয় নি। তোর চুলে টিড্ডি ফড়িং বাসা করুক। কে তুই?

আমি পিক্রুস, খুড়ো। পিক্রুস ব্যস্তভাবে বলল। কথা শোন- -

তুই কেন, তোর মরা বাপ কাঠের সিন্দুক ভেঙে বেরিয়ে এলেও শুনব না।

খুড়ো, তোমার নেশা হয়েছে।

হবেই তো! নেশার জন্যই তো লোকে 'কাস্তিরা' খায়। জড়িত কণ্ঠে দিরস্ত বলল, ভাগ, ভাগ। নইলে তোর ঠ্যাংও আমার মতো খোঁড়া করে দেব।

সে লাঠি তুললে পিক্রুস সেটা কেড়ে নিয়ে বলল, আঃ! কথা শোন খুড়ো। রিয়া আর কিস্তান ক্রোতাস বুড়োর ভেলায় চেপে পালিয়ে গেল। তাই দেখেই দৌড়ে খবর দিতে আসছি।

কি বলছিস, কি বলছিস তুই!

রিয়া আর কিস্তান নদী পেরুচ্ছে। ওরা পালিয়ে যাচ্ছে।

কেন? দিরস্তর নেশা কেটে গেল যেন। গর্জন করে উঠল সে, কেন?

---

* পরবর্তী যুগে তৈমুর এবং আরও পরে বাবর কাথির রমণীকে বিয়ে করেছিলেন।

জানি না। পিক্রস ক্ষুব্ধভাবে বলল। আজ বিকেলে কিস্তান বলছিল, হিন্দুস্তানে চলে যাবে। সেখানকার সুলতানের সেপাই হবে।

নড়বড় করে লাঠির সাহায্যে উঠে দাঁড়াল দিরস্তু। আবার গর্জন করে বলল, কিস্তানের কোমর ভেঙে যাক। তার নামে কবুতর বসুক। তার চুলে টিড্ডি ফড়িং ঘর বাঁধুক। কিন্তু রিয়া তার সঙ্গে যাবে কেন?

রিয়া রুখকে বিয়ে করতে চায় না। তার পছন্দ কিস্তানকে।

দিরস্তু পাগলের মতো চিৎকার করতে থাকল, খিরস্তু! খিরস্তু! কোথায় তুমি? পীর সামন্দাশকে খবর দাও, রিয়া আর কিস্তান পালিয়ে যাচ্ছে। বুজুর্গকে বল, ওদের ভেলাটা হিন্দোল প্রপাতের মাথা থেকে আছড়ে নিচে ফেলে দিক। খিরস্তু, তুমি কোথায়?

তখন খিরস্তু অন্যান্য গোত্রপতিদের সঙ্গে মদাপান করছিল। আগুন জ্বেলে ঝলসানো হচ্ছে আস্ত ছাল-ছাড়ানো ভেড়া। বড় বড় মাটির জালায় ফুটানো হচ্ছে দুধ। অতিথিদের সম্মানে সুগন্ধ ঘাসবীজ সেদ্ধ করা হচ্ছে। বাতাসে লোভনীয় খাদ্যের গন্ধ ছড়াচ্ছে। একদল যুবক ঢোল বাজিয়ে উদ্দাম যুদ্ধনৃত্য জুড়েছে। পাশে মেয়েদের আসর। তাই যুবকদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছে কে কত ভাল নাচতে পারে।

দাদাকে দেখে খিরস্তু উঠে এলো। দিরস্তু হাঁউমাউ করে কেঁদে ফেলল। পিক্রস তখন দৌড়ে এসে দুঃসংবাদটা দিল। খিরস্তুও তা শোনামাত্র দৌড়ে গেল পীর সামন্দাশের কাছে।

সব শুনে সামন্দাশ গম্ভীর মুখে বললেন, কথাটা আমি তোমাকে বলব ভাবছিলাম, সর্দার। ইমরা বা মনির ইচ্ছা নয়, রিয়া রুখের বউ হোক। কারণ রিয়া বিয়ের আগেই নষ্টা।

খিরস্তু হতবুদ্ধি হয়ে গেল। কিছু বলতে পারল না।

সামন্দাশ একটু হাসলেন। শুনেছি রিয়া সুন্দরী। কিন্তু রিয়ার চেয়ে সুন্দরী মেয়ে থাকতেই পারে। তোমাদের গোত্রে না থাকে, অন্য গোত্রে আছে। তুমি ভেবো না, রুখের যোগ্য পাত্রী আমিই খুঁজে দেব।

খিরস্তু অতি কষ্টে বলল, কিন্তু রিয়া আর কিস্তানকে শাস্তি না দিলে আমার সম্মান থাকবে না, প্রভু! ওদের ভেলাটা আপনি হিন্দোল প্রপাতে আছড়ে ভেঙে ফেলুন তাহলে।

সামন্দাশ বললেন, সবই ইমরা ও মনির ইচ্ছা। ব্যস্ত হয়ো না।

ততক্ষণে দিরস্তুর মুখে সবাই খবরটা পেয়ে গেছে। অন্য গোত্রের লোকেরা হাসাহাসি করছে। অস্তুগোত্রের লোকেরা রাগে ফুসতে ফুঁসতে ভিড় করে এসে দাঁড়িয়েছে খিরস্তুর ঘরের বাইরে। দরজায় ভিড় দেখে খিরস্তু বিব্রত বোধ করল।

ইন্তাস নামে এক যোদ্ধা যুবক রিয়ার অনুরাগী ছিল। কিন্তু রিয়া তাকে পাত্তা দেয় নি। ইন্তাসের চোখে প্রতিহিংসা জ্বল-জ্বল করছিল। ভিড়ের ফাঁকে মুখ বাড়িয়ে সে বলল, হুকুম দিচ্ছ না কেন সর্দার? আমরা ওদের ধরে নিয়ে আসি। এখনও নদী পেরুতে পারে নি ওরা।

কিন্তু খিরস্তু কিছু বলার আগেই পীর সামন্দাশ তাঁর আলখাল্লার ভেতর থেকে ছোট্ট চর্কির মতো জিনিস বের করে সেটা জোরে ঘুরিয়ে দিলেন। দীপের আলোয় সেটা মুহুর্মুহু উজ্জ্বলতর হতে হতে আশ্চর্য বর্ণ বিকিরণ করতে থাকল। নানা রঙের আলোর একটা চাকা ক্রমশ বড় হয়ে সামন্দাশকে ঢেকে ফেলল। তার আড়াল থেকে সামন্দাশের গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল : রিয়া ও কিস্তানকে ইমরা হিন্দুস্তানে নির্বাসিত করেছেন। কাথিরিস্তানের মাটি তাদের জন্য নিষিদ্ধ। কারণ তারা গোপনে পাপ করেছিল।

সেই অলৌকিক বর্ণ বিচ্ছুরণ আর সুগম্ভীর ঘোষণা মুহূর্তে সব উত্তেজনাকে থিতিয়ে দিল। পাথরের মূর্তির মতো কাথিররা তাকিয়ে থাকল নিষ্পলক চোখে। তারা বশীভূত এবং মুগ্ধ। রিয়া ও কিস্তানের কথা তারা ভুলে গেল।

আলোর চর্কি থামলে বাইরে থেকে কেউ চিৎকার করে উঠল, জয় বাবা পীর সামন্দাশ!

সেই জয়ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে থাকল ক্রমশ। সম্মিলিত কণ্ঠের ধ্বনি প্রতিধ্বনি অন্ধকার রাতে ঘোরবন্দ উপত্যকার চারদিকের পর্বত মালায় কম্পন সৃষ্টি করল। ঢোলকের শব্দ হল দ্বিগুণতর। নৃত্যগীতে সঞ্চারিত হল নতুন উদ্দীপনা। কাথিরিস্তানে এ এক আশ্চর্য রাত্রি। ....

ঘোরবন্দ্ নদীসঙ্গমে জলধারার শিয়রে উঁচু পাথুরে চাতালের ওপর একটা ঘর। সেই ঘরে একসময় মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের রেখে যাওয়া হত। যারা মরতে চলেছে, তাদের প্রতি কাফির-সমাজ নির্বিকার। ওদের খাদ্য দূরে থাক, এক ফোঁটা জলও দেওয়া হত না।

সেই ঘরে অসংখ্য কংকাল আর খুলির স্তূপ জমে উঠেছিল। পীর সামন্দাশের আদেশে সব তুলে নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। ধুয়ে মুছে তকতকে করে সেখানেই এখন সামন্দাশের আস্তানা।

পাশে আরেকটি নতুন কুটির তৈরি হয়েছে। সেখানে থাকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীবেশিনী পদ্মাবতী। সে পীর সামন্দাশের উদ্দেশ্য বুঝতে পারছিল না। সামন্দাশ তাকে বলেছিলেন যথাসময়ে সুলতান কারা বাহরামকে সংবাদ পাঠানো হবে যে পদ্মাবতী বিরমের প্রাসাদে বিপন্ন বোধ করায় পীর সামন্দাশের সঙ্গে কাফিরিস্তানে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে।

কিন্তু সামন্দাশের যেন সেদিকে মন নেই। তিনি অন্য কাজে ব্যস্ত কথা তুললেই বলেন, ব্যস্ত হয়ো না। পদ্মাবতী বিরক্ত হয়। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না

সামন্দাশ ইরানের কুর্দিস্তান থেকে তাঁর দুই শিষ্যকে তলব করে এনেছেন। তারা যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী। পদ্মাবতী দেখে উপত্যকার সমভূমিতে অসংখ্য কাফির যুবককে তারা যুদ্ধবিদ্যা শেখাচ্ছে। তার মনে সংশয় জাগে। সামন্দাশ যেন একটা রণনিপুণ সেনাবাহিনী গড়ে তুলছেন। কেন? এদের দিয়ে কোন দেশ জয় করতে চান সামন্দাশ? পাপ্রশের পর সোনার পর পামির হিন্দুকুশ, কারাকোরাম পর্যন্ত বিস্তৃত যে দেশ তার অধিপতি একমাত্র সুলতান বাহরাম। তার বিরুদ্ধেই কি এই আয়োজন? পদ্মাবতী কিছু বুঝতে পারে না।

পদ্মাবতী অন্যমনস্কভাবে নদীতীরে তুতগাছের ছায়ায় একটা পাথরের ওপর বসে ছিল। ক'দিন ঝড় বৃষ্টির পর প্রকৃতি উজ্জ্বল ও পরিচ্ছন্ন। বাতাসে স্নিগ্ধ হিমের স্পর্শ। শীতের গন্ধ পেয়ে পাখিরাও অন্যমনস্ক যেন। চারদিকে স্তব্ধতা। দূরে পাহাড় চূড়ায় এখনই তুষারের শাদা মুকুট চোখে পড়ে। শীতে ঘোরবন্দ উপত্যকা নাকি শাদা হয়ে যাবে। পদ্মাবতী ভাবছিল তার আগেই একটা চরম সিদ্ধান্তে পৌঁছুনো দরকার।

পায়ের শব্দে পিছু ফিরল পদ্মাবতী। রুখ হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছে। রুখ এর অন্যরা তার সঙ্গে ভাঙা ফার্সিতে কথা বলে। পদ্মাবতী ইতিমধ্যে অবশ্য কাফির ভাষা কিছুটা বুঝতে শিখেছে। কিন্তু বলতে পারে না। রুখকে দাঁড়াতে দেখে সে বলল এসো রুখ। তোমার কথাই ভাবছিলাম। তোমাকে আজকাল কম দেখতে পাই।

রুখ এসে একটু তফাতে বসে বলল আমি কিন্তু সুলতানাকে সব সময় দেখতে পাই।

পদ্মাবতী দ্রুত বলল চুপ! সুলতানা বলছ কেন?

রুখ হাসল। এখানে তো আর কেউ নেই। তাই বলছি। আপনি তো সুলতানাই।

না রুখ। আমি আর তা নই। পদ্মাবতী প্রসঙ্গ বদলাল। বলল তা রুখ কেমন যুদ্ধ শিখছ?

রুখ চাপাস্বরে বলল বুজুর্গ আমাকে আগুনের গোলা ছোড়া শিখিয়ে দিয়েছেন কাল রাতে। বলেছেন খোরাসান থেকে মশলা আনিয়ে দেবেন। সেই মশলা থেকে কেমন করে আগুনের গোলা বানাতে হয় তাও শেখাবেন।

পদ্মাবতী একটু হেসে বলল তুমি বিরমের না সমরকন্দের সুলতান হবে মনে হচ্ছে রুখ।

রুখ মুখ নিচু করে বলল বাবার ইচ্ছা এই কাফিরিস্তানের সুলতান হই। বুজুর্গও তাই বলেন। কিন্তু আমার সুলতান হতে ভাল লাগে না।

কি ভাল লাগে তোমার?

ঘাসের জঙ্গলে ভেড়া চরাতে। মাঝে মাঝে একটা 'বোশি কুহি' মারতে। আর—রুখ হাসল। আর বাবার মতো সিংহের সঙ্গে লড়াই করতে। সুলতানা, আপনি জানেন? পাপ্রশেরে দুটো সিংহ মারা গেছে। তাদের তিনটে বাচ্চা নাকি কেঁদে অস্থির। আমি ভাবছি, অন্তত একটা বাচ্চাকে ধরে এনে পুষি। কেমন হয় তাহলে?

খুব ভাল হয়। পদ্মাবতী খুব হাসতে লাগল ওর কথা শুনে। এই সরল কাফির যুবককে দেখে তার সব দুঃখ যেন মন থেকে মুছে যায়। কি এক আনন্দ তাকে অস্থির করতে থাকে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে

রুখের রূপবান বলিষ্ঠ শরীরের দিকে তাকিয়ে থাকে পদ্মাবতী, ভাবে, কোন দেবতা এসে কি জন্ম নিয়েছেন বর্বর কাথিরজাতিতে?

পরক্ষণে লজ্জা পায় পদ্মাবতী। বিব্রত বোধ করে। ছি ছি, এ সব কি ভাবছে সে?

রুখ সিংহের গল্প শেষ করে বোজি কুহির গল্প শুরু করল। ওদের দেবতাই তো শিঙের ডগায় নিরুদ্দিষ্ট চাঁদকে বিঁধিয়ে নিয়ে আসে পাতালের অন্ধকার থেকে। সে বড় আশ্চর্য দৃশ্য!

পদ্মাবতী হঠাৎ তাকে থামিয়ে দিল। এই জংলি! খালি যত জন্তু জানোয়ারের গল্প তোমার। পীর সামন্দাশ জানলে রাগ করবেন জানো না?

রুখ অবাক হল। কেন? রাগ করবেন কেন?

তোমাকে উনি সুলতান বানাবেন যে! পদ্মাবতী বাঁকা হেসে ফের বলল, সুলতান বাহকামকে হত্যা করে তোমাকে বসাবেন কান্দারের সিংহাসনে।

ছিঃ! কি কথা বলছেন সুলতানা! কারা বাহকাম আপনার স্বামী না?

অমন নিষ্ঠুর স্বামীর কাছে থাকব না বলেই তো তোমাদের দেশে পালিয়ে এসেছি।

পদ্মাবতী খেলা করছিল রুখের সঙ্গে। রুখ সরলভাবে বলল, কারা বাহকাম যে খুব খারাপ লোক তা সবাই জানে। কিন্তু পীর সামন্দাশ যদি আমাকে হুকুম দেন, যাও ওঁকে হত্যা করে এসো, আমি সে হুকুম মানব না।

কেন মানবে না শুনি?

রুখ লজ্জিতভাবে বলল, আপনি বিধবা হবেন, তাই।

আমি বিধবা হলে তোমার কি রুখ?

আমার কষ্ট হবে।

কেন?

রুদ্ধ অস্ফুটস্বরে রুখ বলল, আপনি কত ভাল মেয়ে। কাথিরিস্তানে আপনার মতো একজনও নেই।

পদ্মাবতী ভ্রূ কুঞ্চিত করে বলল, কী বলছ রুখ! কাথির মেয়েরা কত সুন্দর! আমি ওদের কাছে তো কুৎসিত। আমার গায়ের রঙ কালো। আমার নাক ওদের মতো তীক্ষ্ণ নয়। আমার চোখ ওদের মতো নীল নয়। আমার চুল—

রুখ জোরে হেসে উঠল। আপনার চুল কোথায়?

পদ্মাবতী ক্রুদ্ধস্বরে বলল, রুখ! তুমি বড় বাচালতা করছ!

রুখ গ্রাহ্য করল না। কিছুক্ষণ হাসবার পর বলল, আপনার চুল আমি দেখেছি। কালো চুলই আমার পছন্দ। সুলতানা! ওই দেখুন, দামন্দ্ পাহাড়ের মাথায় বরফ জমেছে। তার গায়ে কত মেঘ দেখতে পাচ্ছেন?

পদ্মাবতী এতদিনে জেনেছে, কাথিররা উপমা দিয়ে কথা বলতে ভালবাসে। কিন্তু রুখের এই কথাটায় কি উপমা? সে দূরের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বলল, কি বলতে চাও রুখ?

রুখ মুগ্ধদৃষ্টিতে পাহাড়টা দেখতে দেখতে বলল, যখনই পাহাড়ের মাথায় মেঘ দেখি, আমার খালি আপনার মুখখানা মনে পড়ে। আফশোষ হয়। হায়! পীর সামন্দাশ আপনাকে পাথরের পাহাড় বানিয়ে দিলেন, যে পাহাড়ে কখনও মেঘ নামে না। অথচ বৃষ্টি পড়ে। বুজুর্গের সবই বড় খাপছাড়া।

বৃষ্টি পড়ে! পদ্মাবতী অবাক হয়ে বলল।

হ্যাঁ, সুলতানা। আমি দেখেছি, আপনি একলা বসে কাঁদেন।

তুমি ভুল দেখেছ।

না। আমি জানি আপনার মতো দুঃখী মেয়ে কেউ নেই।

পদ্মাবতী কি বলবে ভেবে পায় না। একটু পরে আস্তে ডাকল, রুখ!

বলুন সুলতানা!

তুমি পূর্বাদেশের কথা শুনেছ?

না। শুধু জানি আপনি পূর্বাদেশের মেয়ে। ওই দেশ থেকেই তো সূর্য ওঠে। তাই না সুলতানা?

রুখ শান্তভাবে বলল। পূর্বাদেশে আমার যেতে বড় ইচ্ছে করে।

পদ্মাবতী মৃদু হেসে বলল, সূর্য ওঠার দেশে জন্মেছি বলেই তো সূর্যের আলোয় আমার গায়ের চামড়া ঝল্‌সে এমন কালো হয়ে গেছে। তুমি যদি সেখানে যাও, তুমিও ঝল্‌সে কালো হয়ে যাবে। তখন আর কোন কাথির মেয়ে তোমাকে বিয়ে করতেই চাইবে না।

বয়ে গেছে! রুখ ফুঁসে উঠল। কাথির মেয়েদের গায়ে ভেড়ার চর্বির গন্ধ। আমার ঘেন্না করে দেখবেন, আমি কাথির মেয়েকে বিয়েই করব না।

পূর্বী মেয়ে পেলে করবে বুঝি?

হুঁউ।

পাচ্ছ কোথায়?

রুখ বিব্রতভাবে উঠে দাঁড়াল। আমি এবার যাই সুলতানা! 'কুচকাওয়াজের' সময় হয়ে গেছে

একটু বসো, রুখ।

রুখ কথা মেনে বসল। আনমনে সে তার নীল কুর্তার বুকের ওপর বন্ধনীগুলো নাড়াচাড়া করতে থাকল। খুলল, আবার বাঁধল। পদ্মাবতী তাকে দেখছিল। হঠাৎ বলল, তোমার বুকে ওই চিহ্ন কিসের রুখ?

রুখ কুর্তা দু'ভাগ করে বুক মেলে ধরে গর্বিতভাবে বলল, রাখুস, আর বাজরানের চিহ্ন

তার মানে?

রাখুস পাহাড়ের দেবতা আর বাজরান আকাশের দেবতা।

পদ্মাবতী হাত বাড়িয়ে চিহ্ন দুটি স্পর্শ করল। রুখ চঞ্চল হয়ে বলল, আঃ! আমার কাতুকুতু লাগছে।

পদ্মাবতী মুহূর্তে সংযত হয়ে হাত সরিয়ে নিল। কেন রুখের ওই উদ্ধত সুন্দর উজ্জ্বল-গৌর শরীর আর ওই সরল অনিন্দ্য রূপ তাকে এত আকর্ষণ করে? লজ্জিত পদ্মাবতী নতমুখে আস্তে বলল, দেখলে, রাখুস আর বাজরান আমার আঙুল পুড়িয়ে দেন নাকি। আমি তো কাথির মেয়ে নই।

রুখ জোর দিয়ে বলল, আপনি যদি রিয়া হতেন, আঙুল পুড়িয়ে দিতেন দেবতারা। কাথির মেয়ে হলেও নিষ্কৃতি নেই।

এই সময় একদল কাথির যুবতী মাটির পাত্র মাথায় সাজিয়ে নদীর ঘাটে যাচ্ছিল। তারা এদের দেখে থমকে দাঁড়াল। তারপর নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করে খিলখিল করে হাসতে লাগল রুখ ক্রুদ্ধস্বরে বলল, এই বেশরম ভেড়ীর দল! এত হাসি কিসের তোদের?

তারা রুখকে ভয় করে। ইদানিং সবাই রুখকে সমীহ করে চলে। তারা হাসি থামিয়ে কুণ্ঠিত মুখে নদীর ঘাটে গিয়ে নামল।

রুখ বলল, দেখলেন তো? এজন্যেই কাথির মেয়েরা আমার দু'চোখের বিষ!

পদ্মাবতী বলল, সে কি! হাসাটা কি দোষের?

রুখ কি জবাব দিতে যাচ্ছে, হঠাৎ সামন্দাশের ঘরের পিছন থেকে বেরিয়ে এলো খারিব। হাত নেড়ে চেঁচিয়ে উঠল সে। রুখ! শিগ্‌গির যাও, বুজুর্গের তলব হয়েছে। ইরান থেকে ঘোড়াগুলো আসছে। দক্ষিণের পাহাড়ে ওদের দেখা যাচ্ছে। অনেক ঘোড়া, রুখ! ঘোরবন্দের মাঠে সব ঘাস উজাড় করে ফেলার মতো ঘোড়ার পাল। রুখ, এত ঘোড়া কখনও দেখ নি। দেখবে তো এসো।

রুখ দৌড়ে চলে গেল খারিবের সঙ্গে। পদ্মাবতী চুপচাপ বসে রইল।

সেদিন সন্ধ্যার পর পীর সামন্দাশ যখন পুঁথিপাঠ করছেন, পদ্মাবতী তাঁর কাছে গেল। সামন্দাশ সস্নেহে বললেন, বসো মা!

পদ্মাবতী বসল। সামন্দাস ফের বললেন, তোমার পরিচর্যার কোন ত্রুটি ঘটছে না তো? আমি ওদিকে ব্যস্ত থাকছি। তোমার প্রতি তত লক্ষ্য রাখতে পারছি না।

পদ্মাবতী মৃদুস্বরে বলল, না। কোন অসুবিধে হচ্ছে না। এরা খুব অতিথিপরায়ণ।

রুখ বলছিল, তোমার মন ভাল নেই।

পিতা, আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই।

সামন্দাশ তাকালেন। কি তোমার প্রশ্ন, পদ্মাবতী?

কান্দাহারে লোক পাঠাবেন বলেছিলেন। পাঠিয়েছেন?

একটু চুপ করে থেকে সামন্দাশ বললেন, ফিঘান উপজাতির সর্দার আমার শিষ্য। কাথিরদের পাঠানো নিরাপদ নয় ভেবে ফিঘান সর্দারকে সেই দায়িত্ব দিয়েছিলাম। কিন্তু—

কিন্তু কি পিতা?

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর সামন্দাশ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, যে সংবাদ পেয়েছি, তা নিতান্ত গুজব বলেই আমার বিশ্বাস। তাই যতক্ষণ না প্রকৃত সংবাদ পাচ্ছি, তোমাকে জানানো উচিত হবে না ভেবেছিলাম।

পদ্মাবতী জেদের সঙ্গে বলল, গুজব হোক—আমাকে বলুন।

আমির সাখন্দের সাহায্যে জুলেখা নাকি সমরখন্দের দুর্গ দখল করেছে। বিদ্রোহীরা তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। আর জুলেখা নিজেকে সুলতানা ঘোষণা করেছে।

পদ্মাবতী কম্পিত কণ্ঠস্বরে বলল, আর সুলতান?

সুলতান নাকি কাবুলে পালিয়ে এসেছিলেন। তারপর আর তাঁর কোন সংবাদ নেই। কেউ বলছে, তিনি উপজাতি সর্দারদের নিয়ে সমরখন্দ আক্রমণের জন্য গোপনে চেষ্টা করছেন। কেউ বলছে, তিনি সমরখন্দ দুর্গেই জুলেখার হাতে বন্দী।

মিথ্যা! এ আমি বিশ্বাস করি না! পদ্মাবতী শ্বাসপ্রশ্বাস জড়িত স্বরে বলল। একটা বাঁদীর সে ক্ষমতা থাকতে পারে না। সুলতান বাহকামের মতো মানুষকে সে—

পদ্মাবতী দু'হাতে মুখ ঢাকল। সামন্দাশ বললেন, ঠিক তাই। নিছক গুজব। তুমি বিশ্বাস কোরো না মা।

পদ্মাবতী অশ্রুজড়িত কণ্ঠস্বরে বলল, কিন্তু যদি তা সত্য হয়, পিতা?

হয়তো সত্য নয়।

হতেও তো পারে।

তা পারে অবশ্য। সামন্দাশ চিন্তিত মুখে বললেন। তবে ফিঘান সর্দারের চর আবার গেছে। এবার যারা গেছে, তারা প্রকৃত সংবাদ না জেনে ফিরবে না। তুমি ধৈর্য ধর মা।

পদ্মাবতী ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। নিজের ঘরে গিয়ে দরজার আগড় আটকে দিল। রাত্রের দিকে ঠাণ্ডাটা প্রচণ্ড লাগে। কোণের অগ্নিকুণ্ডের সামনে বসে রইল পদ্মাবতী।

পরদিন সকালে রুখ হাঁফাতে হাঁফাতে এসে তাকে বলল, সুলতানা! আপনি বিধবা হয়েছেন। বুজুর্গের কাছে এইমাত্র খবর এসেছে, সুলতান কারা বাকহামের মাথা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে বিরমের শহরের ফটকে। লোকে ভিড় করে দেখছে। আর এক বাঁদি সুলতানা হয়েছে সে দেশে।

পদ্মাবতী মূর্চ্ছিত হয়ে লুটিয়ে পড়ল। .....

হেমন্তে ঘোরবন্দ্ উপত্যকায় পাতা ঝরার ঋতু। পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় তুষারের টুপি, কাঁধে তুষারের আলোয়ান আর সমভূমির তৃণক্ষেত্র ও তুতবন সেজেছে হলুদ পোশাকে। বাতাসের হিম তীব্র হয়ে উঠছে দিনে দিনে।

কাফিরিস্তানের রামগুল কাথিরদের সঙ্গে কিশগুল কাথিরদের বহুকালের বিবাদ মিটে গেছে এতদিনে। পীর সামন্দাশের অলৌকিক ক্ষমতায় কিশগুল কাথির সম্প্রদায়ও অভিভূত। শুধু তাদের একটাই দ্বিধা, রুখের নেতৃত্ব মেনে নিতে রাজি হচ্ছে না। তারা বলছে, রুখ এখনও তরুণ। এত কম বয়সে কাথিরদের সর্দার হওয়ার রীতি নেই।

সামন্দাশ জানেন, এটা একটা নিতান্ত অছিলা। কিশগুলরা রামগুলদের কাউকে প্রধান সর্দার বলে স্বীকার করতে চাইছে না। দীর্ঘদিন লালিত অহংবোধে আঘাত লাগছে।

তবু এতখানি যখন এগোতে পেরেছেন, চেষ্টা করে যাবেন সামন্দাশ। এদিকে কুর্দিস্তানি যুদ্ধবিদ দুই শিক্ষক রামগুল কাথিরদের অশ্বপৃষ্ঠে বসে অসি ও বর্শাচালনা শেখাচ্ছে যত্ন করে। রুখ কয়েকদিনেই ঘোড়ায় চাপা শিখে নিয়েছে। কারণ পদ্মাবতীর সেই ঘোড়াটি তার জিম্মায় ছিল। তাকে চরানো এবং দেখাশোনা করার দায়িত্ব রুখকেই দিয়েছিলেন সামন্দাশ। এখন অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অসি ও বর্শা চালানোতে রুখ সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে।

পদ্মাবতীর মানসিক অবস্থা জানেন সামন্দাশ। তাকে বলেছেন, আর কিছুদিন অপেক্ষা কর, মা। শীতের পর যখন পাঞ্জশেরে তুষার গলবে, তখন তুমি তোমার স্বামীঘাতিনী জুলেখার ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ পাবে। রুখের নেতৃত্বে সারা কাথিরিস্তান ঝাঁপিয়ে পড়বে কান্দাহার দেশে। তারপর তারা যাবে কাবুল পেরিয়ে সমরখন্দ। সেখান থেকে ফিরে হিন্দুকুশ পাহাড় পেরিয়ে তারা ঢুকবে হিন্দুস্থানে। রুখ যেদিন হিন্দুস্তানের সুলতান হবে, সেদিন তুমিই হবে তার পরামর্শদাত্রী। তুমি যদি তোমার জন্মভূমি পূর্বদেশে যেতে চাও, তখন যাবে। কিন্তু যাবে সম্রাজ্ঞীর মতো মাথা উঁচু করে।

এ একটা নিছক স্বপ্ন। পদ্মাবতী ভাবে। তবু তার লোভ হয়। বড় সাধ জাগে। শ্যামল শান্ত বঙ্গভূমি, কাজলজলের বহতা সেই নদী আর অবারিত শস্যক্ষেত্র অতীতের এক সুখস্মৃতি। তা অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আবার পরিস্ফুট হয়ে উঠছে সামন্দাশের কথায়।

রুখ এসে বলে, কি এত ভাবেন সুলতানা—যখনই আপনাকে দেখি, মনে হয় আপনি যেন কি ভাবনায় পড়ে গেছেন। আমি জানি বিধবা হওয়াটা খুব কষ্টের। কিন্তু ইচ্ছে করলেই বিধবারা বিয়ে করতে পারে। হ্যাঁ, আপনি বলবেন কাথিরিস্তানে তেমন কে আছে যে তাকে বিয়ে করবে? তাছাড়া আপনি মুসলমান, কাথিররা আপনার কাছে কাফির। তবে ইচ্ছে থাকলে বলুন, কান্দাহার থেকে একজন সুপুরুষ মুসলমানকে লুঠ করে এনে দিই!

পদ্মাবতী বিরক্ত হয়ে বলে, তুমি দিনে দিনে বড় বাচাল হয়ে যাচ্ছ রুখ! পীর সামন্দাশ তোমাকে নাকি লেখাপড়াও শেখাচ্ছেন শুনতে পাই। এ সব তারই পরিণাম।

রুখ হাসে। হ্যাঁ লেখাপড়া অনেকখানি শিখেছি, সুলতানা! আরও শিখতে হবে। যদিও লেখাপড়া শিখতে আমার ইচ্ছে করে না একটুও, তবু শিখতে হচ্ছে। কাথিরিস্তান এক গলায় বলছে, রুখ বুজুর্গ হোক। কি করি?

ফের সে চাপা গলায় বলে, কিন্তু দেখবেন সুলতানা, আমি যা শিখেছি এবং ভবিষ্যতে শিখব, সবই ভুলে যাব। কেমন করে ভুলব জানেন? একদিন নদীর জলে স্নান করতে নেমে বলব, আমার মধ্যে বাড়তি জিনিস যা কিছু আছে, নদী! তোমাকে বলছি, সব তুমি ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে হিন্দোল প্রপাত থেকে ফেলে দাও! ব্যস!

নদী তোমার কথা শুনবে?

হুঁ। শোনে তো! সেদিন তাকে বললাম—

রুখ হঠাৎ থেমে গেলে পদ্মাবতী বলে, কি বললে?

রুখ কুণ্ঠিতভাবে বলে, অপরাধ নেবেন না সুলতানা! আমি নদীকে বাগ করে বললাম, সুলতানার জন্য আমার সব সময় মন কেমন করে, তাকে দিনে অন্তত একবার না দেখলে আমার মনে হয়, কি যেন বাদ পড়ে গেছে। আর নদী! সুলতানার কাছে গেলে আমার খালি মনে হয়—

কি মনে হয় রুখ?

রুখ দম নিয়ে বলে, খালি মনে হয় দামন্দ পাহাড়ের চেরিফুলের গাছটাতে প্রচণ্ড ঝড় লেগেছে আর অজস্র শাদা ফুল ঝরে পড়ছে! আর মনে হয় পাঞ্জশেরের পাঁচটা সিংহ একসঙ্গে গর্জন করতে করতে এগিয়ে আসছে। তারপর শ্বাস ছেড়ে সে দুঃখিত মুখে আস্তে বলে, কেন এমন হয়, জানি না।

রুখ, তুমিই তো বললে আমি মুসলমান।

রুখ পদ্মাবতীর হঠাৎ বলা কথাটার মর্ম বুঝতে পারে না। অবাক হয়ে বলে, হ্যাঁ, তা বললাম।

কিন্তু আমি হয়তো মুসলমান নই রুখ!

সে কি! তাহলে কি আপনি?

আমি হিন্দু।

রুখ চঞ্চল হয়ে ওঠে। জানেন? পীর সামন্দাশ সেদিন গোত্রপতিদের বলছিলেন, পদুমাওয়াতি বৌদ্ধ হয়েছে বটে, কিন্তু তার জন্ম হিন্দুর ঘরে।

কেন এ কথা হঠাৎ বলতে গেলেন উনি? পদ্মাবতী বিস্মিত হয়।

রুখ চাপা স্বরে বলে, আপনাকে নিয়ে কথা ওঠে মাঝে মাঝে। পদুমাওয়াতিকে কেন এখানে রেখেছেন

পীর সামন্দাশ? কেন ওকে ওয়াজিরিস্তানে বৌদ্ধমঠে পাঠিয়ে দিচ্ছেন না? সবাই এ কথা বলে।

বুঝেছি। তারপর?

পীর সামন্দাশ বলছিলেন, হিন্দু আর কাথিরে কোন তফাত নেই। যারা কাথিরদের দেবতা, তারা নাকি হিন্দুদেরও দেবতা! আর তাই শুনে সবাই খুব খুশি হয়েছে। কাল যে অত ঘটা করে বিস্তান, কাস্তো আর বালা আপনাকে তুঁতফলের আচার দিয়ে গেল, তার কারণ তো আপনি জানেন না।

রুখ হাসতে থাকে। পদ্মাবতী একটু চুপ করে থাকার পর ডাকে,রুখ!

বলুন সুলতানা!

বুঝলাম শুধু তুমিই পীর সামন্দাশের কথা বিশ্বাস কর না।

কেন বলুন তো?

একটু আগে তুমি বলছিলে আমি মুসলমান।

রুখ হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। পিছন দিকে ঘুরে শ্বাসক্লিষ্ট কণ্ঠস্বরে বলে, আপনাকে মুসলমান বলে জানলে আমি আর দামান্দ পাহাড়ের চেরিফুলের জঙ্গলে ঝড় বওয়া দেখতে পাব না, শুনতে পাব না পাঞ্জশেরের পাঁচটা সিংহের গর্জন। আপনি আমার কাছে যতক্ষণ মুসলমান থাকবেন, ততক্ষণ আমার শান্তি, পদ্মাওয়াতি! হিন্দোল প্রপাতে পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়া একটা 'বোক্তি কুহির চিৎকার শুনেছিলাম সেদিন। সেই পাহাড়ি ছাগলটার কথা ভেবে আমার বড় ভয় হয়।

রুখ দ্রুত চলে যায়। একটু পরে পদ্মাবতী দেখতে পায়, সে তার সেই ঘোড়াটার পিঠে চেপে ছুটে চলেছে তৃণভূমির দিকে। তার হাতে তলোয়ার ঝকমক করছে।

পদ্মাবতী আর কিছু ভাবতে পারে না। আচ্ছন্ন চোখে সেই দৃশ্য দেখে। অপার্থিব মনে হয় দৃশ্যটা বিরামের দুর্গের জানালা থেকে সুলতান কাবা বাহকামকেও এমনি করে অশ্বপৃষ্ঠে তলোয়ার হাতে অকারণ ছুটোছুটি করতে দেখেছে কতদিন।

তবে বাহকাম ছিলেন প্রচণ্ড নিষ্ঠুর মানুষ। আর এই কাথির যুবক বড় দয়ালু।

বাহকাম মোটামুটি রূপবান হলেও ছিলেন কৃষ্ণবর্ণ এবং হ্রস্বাকৃতি। আর এই কাথির যুবকের গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল গৌর। আকৃতি বিশাল। তার চোখের তারা নীলাভ, দীর্ঘ কেশ পিঙ্গলবর্ণ। এর বুকে আঁকা আকাশ ও পর্বতের দুই দেবতার দুটি প্রতীক। ....

একদিন বিকেলে হঠাৎ পীর সামন্দাশ পদ্মাবতীকে ডেকে বললেন, আমার সঙ্গে এসো তো মা। একটা সঙ্কট দেখা দিয়েছে।

পদ্মাবতী তাকে অনুসরণ করল। একটু পরে সে অবাক হয়ে দেখল, নিষ্পত্র তুঁতগাছের জঙ্গলে ঢুকছেন সামন্দাশ। একটু পরে একটা উঁচু এবং বিশাল পাথরের বেদীর সামনে পৌঁছলেন তিনি। বেদীর চারধারে চারটি ভাঙা স্তম্ভ এবং একটামাত্র দেয়াল অবশিষ্ট রয়েছে। বেদীর একপ্রান্তে দেয়ালের নিচে তিনটি প্রকাণ্ড গোলাকার পাথর। পাথর তিনটের রঙ লাল, শাদা ও কালো।

সামন্দাশ বেদীতে উঠে বললেন, এসো। ওই দেখতে পাচ্ছ কাথির দেবতা ইমরা, পয়গম্বর মণি আর যুদ্ধদেবতা গিশ। এবার আমরা উচ্চকণ্ঠে কথা বলব। আমি যা প্রশ্ন করব, তার জবাবও তুমি উচ্চকণ্ঠে দেবে। যতটুকু কাথির ভাষা এতদিনে শিখেছ, তাতেই চলবে। প্রয়োজনে ফার্সি মেশাতে পারো, ওরা বুঝবে।

পদ্মাবতী আরও অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। তার পরণে এখন ভেড়ার লোমে তৈরি এবং গেরুয়া রঙে ছোপানো বৌদ্ধ চীবরবস্ত্র। কাথির নারীরা বুনে দিয়েছে এই পোশাক। তার মুণ্ডিত মস্তকে কেশোদগম হয়েছে। একখণ্ড গেরুয়া পশমে ঢেকে রেখেছে। ওয়াজিরিস্তানের বৌদ্ধদের এই স্থূল শীতবস্ত্র

সামন্দাশ উচ্চকণ্ঠে বললেন, তোমার জন্ম হিন্দু-ব্রাহ্মণের বংশে পদ্মাওয়াতি—সত্য কি না?

পদ্মাবতীও উচ্চকণ্ঠে উত্তর দিল, সত্য, পিতা।

সামন্দাশ বললেন, হিন্দু-ব্রাহ্মণের ধর্মগ্রন্থের নাম বেদ, জানো কি?

জানি, পিতা।

তাহলে বৈদিক দেবতা ইন্দ্রের নাম তুমি জানো?

জানি, পিতা।

তোমাদের দেবতা ইন্দ্র এই কাথিরিস্তানে হয়েছেন ইমরা। সামন্দাশ বললেন তার যষ্ঠিটি লাল পাথরের

দিকে তুলে। .... আর তোমাদের দেবতা কৃষ্ণ হয়েছেন গিশ—যিনি কুরুক্ষেত্রেরযুদ্ধে ছিলেন পাণ্ডবদের মন্ত্রণাদাতা। পদুমাওয়াতি! ওই দেখ, দূরে পাঞ্জশের পর্বতমালার পাঁচটি তুষার ঢাকা চূড়ায় অস্তগামী সূর্যের রক্তাভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। কাথিররা জানে, পাঞ্জশের বলতে পাঁচটি সিংহ বোঝায়। ওই পাঁচটি সিংহের মায়ের নামও তারা জানে। সে কুন্তী। কাথিররা বলে, কুন্তীমায়ের পঞ্চপুত্রের প্রতীক ওই পাঞ্জশের, কাথির উপকথায় আছে সেই কুন্তী মায়ের কাহিনী। পদুমাওয়াতি! কুন্তীপুত্র পঞ্চপাণ্ডবের কাহিনী নিয়ে হিন্দুস্থানে মহাভারত নামে একটি শাস্ত্র আছে।

পদ্মাবতী ভীষণ অবাক হয়ে বলল, কি আশ্চর্য! মহাভারতের কাহিনী বাল্যে আমি শুনেছি বাবার কাছে।

সামন্দাশ বললেন, আর এই শাদা পাথর যাঁর প্রতীক, তিনি পয়গম্বর মণি। তুমি ব্রহ্মণকন্যা ছিলে পদুমাওয়াতি। পরে বৌদ্ধ হয়েছ। তোমার বৌদ্ধমন্ত্রটি উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি কর। যুক্তকরে বল, ওং মণিপদ্মে হুং।

পদ্মাবতী কম্পিত কণ্ঠে করজোড়ে প্রতিধ্বনি করল, ওং মণিপদ্মে হুং।

সামন্দাশ সহাস্যে বললেন, কাথির পয়গম্বর মণিই অবতার বুদ্ধের প্রতীক। কাথিররা তাঁকে ওই মন্ত্রের অপভ্রংশ উচ্চারণে মণি বলে শ্রদ্ধা করে। আরও শোন পদুমাওয়াতি। অস্ত্র গোত্রের আরও দুই দেবতা হলেন পর্বতদেব রাখুস এবং আকাশদেব বাজরান। হিন্দুশাস্ত্রে পর্বতাধিপতি দক্ষের কথা আছে। কিশান উপজাতি তাকে দ্রাকয়ুস (দ্রাক্ষস) নামে পূজা করে। কাথিরদের কাছে অপভ্রংশে দ্রাক্ষস হয়েছেন রাখুস। এবার শোন বাজরানের কথা। হিন্দুশাস্ত্রের দেবরাজ ইন্দ্র—যিনি কাথির দেবরাজ ইমরা, তার হাতের অস্ত্র হল বজ্র। ইমরার অনুচর বাজরান—এই তত্ত্বের অর্থ হল হল ইন্দ্রের হাতে বজ্র। অতএব পদুমাওয়াতি! ইমরা, গিশ, মণি, রাখুস এবং বাজরান তোমারও উপাস্য দেবতা। তাদের সামনে নত হও তুমি। উচ্চারণ কর, ওং মণিপদ্মে হুং।

বিহ্বল পদ্মাবতী নতজানু হয়ে করজোড়ে উচ্চারণ করল আবার, ওং মণিপদ্মে হুং।

অমনি চারদিকে থেকে পিলপিল করে বেরিয়ে এলো অসংখ্য কাথির। তারা আড়ালে লুকিয়ে ছিল সামন্দাশের পরামর্শে। কাথির নরনারীরা এবার বেদী ঘিরে উদ্দাম নৃত্যগীত শুরু করল। তখন পদ্মাবতী বুঝল কি সঙ্কটের কথা সামন্দাশ বলছিলেন। পদ্মাবতীর প্রতি সংশয় ঘুচে গেছে কাথিরদের। পদ্মাবতীকে তারা আত্মজা বলে মেনে নিয়েছে। সেই স্বীকৃতি স্পন্দিত হচ্ছে তার চারপাশে উন্মত্ত নৃত্যে, সমবেত সঙ্গীতে।

হঠাৎ একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল। ভিড় থেকে রুখ বেরিয়ে একলাফে বেদীতে উঠল এবং পদ্মাবতীকে দু'হাতে শূন্যে তুলে নাচতে শুরু করল। সামন্দাশ চমকে উঠলেন। পদ্মাবতী নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করেছিল প্রথমে। কিন্তু না পেরে স্থির হয়ে গেল। সামন্দাশও বিমূঢ়।

কিছুক্ষণ নাচবার পর রুখ পদ্মাবতীর অবশ শরীর তিন দেবতার সামনে নামিয়ে রেখে হাঁটু মুড়ে বসল। ওই তুমুল চিৎকার এবং সঙ্গীত ভেদ করে তার কণ্ঠস্বর শোনা গেল— দেবাদিদেব ইমরা, দেবতা গিশ আর পয়গম্বর মণি সাক্ষী। আমি পদুমাওয়াতিকে গ্রহণ করলাম।

পদ্মাবতী দ্রুত উঠে বসেছিল, কিন্তু রুখ তাকে আবার তুলে নিল। সিংহের মুখের হরিণীর মতো নিস্পন্দ হয়ে গেল পদ্মাবতী। মনে হল, স্বপ্নের মধ্যে ঘটছে এসব।

রুখ তাকে তুলে নিয়ে ছুটে চলল বস্তির দিকে। অনুসরণ করল কাথির নরনারীরা। কাথির প্রথাতেও আছে রাক্ষসমতে বিবাহ। সামন্দাশ তা জানেন। অন্য গোত্রের নারীকে অপহরণ করে এবং গায়ের জোরে তাকে বিয়ে করলে সে বিয়ে সামাজিক স্বীকৃতিই শুধু পায় না, একটা বীরত্বকীর্তি বলে গণ্য হয়।

নির্জন মন্দিরে একা দাঁড়িয়ে রইলেন সামন্দাশ। হতচকিত তাঁর অবস্থা। এই আকস্মিকতার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। কল্পনা করেন নি এমন কিছু ঘটতে পারে। পদ্মাবতীর নিরাপত্তা ও আশ্রয়ের স্বার্থে তিনি এই পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু ব্যাপারটা ঘটে গেল।

পদ্মাবতী কি ভাববে? সে তাঁকে পিতা মনে করে। তিনি বর্বর কাথির জাতির গৃহবধূ করবেন তাকে, পদ্মাবতী নিশ্চয় কল্পনা করতেও পারে নি। এখন ভাববে, এও তাঁর চক্রান্ত।

দুঃখে অনুশোচনায় কাতর হয়ে গেলেন সামন্দাশ। কোন্ মুখে পদ্মাবতীর সামনে দাঁড়াবেন ভেবে পেলেন না।

দিনের আলো ফুরিয়ে গেছে। অদূরে কাথির বস্তি থেকে হল্লার শব্দ ভেসে আসছে। ক্রমে একটি দুটি করে মশাল জ্বলে উঠল সেখানে। ঢোলের বাজনা আর সঙ্গীতের ধ্বনি ভেসে আসতে থাকল।

হতভাগিনী পদ্মাবতী! সামন্দাশ অতিকষ্টে অশ্রু সম্বরণ করলেন। কাথির সাম্রাজ্য স্থাপনের বিরাট স্বপ্ন একটু ভুলের জন্য ভেঙে গেল। পদ্মাবতীর সামনে আর দাঁড়ানো অসম্ভব তাঁর পক্ষে। পদ্মাবতী তাঁকে কু-চক্রী বলে ঘৃণা করবেই।

অন্ধকার ঘন হলে সামন্দাশ অতিকষ্টে বেদী থেকে নামলেন। তারপর যষ্ঠি ভর করে হাঁটতে থাকলেন বিভ্রান্তের মতো।

পাঞ্জশের অঞ্চলের প্রাচীন বাণিজ্য-পথটি যেমন দুর্গম, তেমনি বিপদসঙ্কুল। কাথির দস্যুদের ভয়ে বণিকরা দলবদ্ধ হয়ে যাতায়াত করে।

একটি বণিকদল আসছিল হিন্দুস্থান থেকে পণ্যসম্ভার কিনে। তারা ইরানি বণিক। গির্জার সরাইখানায় রাত কাটিয়ে সূর্যোদয়ের পর আবার যাত্রা শুরু করেছিল তারা। পাঞ্জশের অঞ্চল সতর্কভাবে অতিক্রম করাই রীতি। অগ্রবর্তী রক্ষীরা হঠাৎ থেমে গেছে দেখে বণিকদের দলপতি চিৎকার করে জানতে চাইল, কি হয়েছে।

একজন রক্ষী দৌড়ে এসে বলল, একটি মৃতদেহ পড়ে আছে রাস্তার মাঝখানে। পোশাক দেখে মনে হচ্ছে মুসলমান ফকির।

বণিকরা দ্রুত সেখানে হাজির হল। মৃতদেহটি একজন অশীতিপর বৃদ্ধের। পোশাক দেখে মুসলমান ফকির বলেই সনাক্ত করল তারা। ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসীরা কোন মুসলমানের মৃতদেহ এভাবে পশু পাখির আহার্য হতে দেয় না। তাদের পবিত্র কর্তব্য হল মৃতদেহটিকে স্নান করিয়ে এবং নতুন শ্বেতবস্ত্রে ঢেকে কবর দেওয়া।

কাথির দস্যুদের হামলার ভয়ে শাস্ত্রীয় কাজটি দ্রুত করতে চাইল তারা। কিন্তু স্নান করানোর জন্যে মৃতদেহের পোশাক খুলেই ভড়কে গেল। মৃত লোকাটির বুকে কাথিরদেব উল্কি আঁকা।

ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করে বণিক দলপতি বলল, তওবা! তওবা! এ যে দেখছি একজন কাফির! চলে এসো সব। খোদারইচ্ছায় এই পৌত্তলিক বর্বরের উপযুক্ত ব্যবস্থা হয়ে যাবে। খোদা মাংসাশী পশুপাখির সৃষ্টি তো সেজন্যেই করেছেন।

সেই সময় একজন বণিকের দৃষ্টি গেল মৃতদেহের একটু তফাতে পড়ে থাকা সিডার কাঠের লাঠিটার দিকে। 'লাঠিটা তো ভারি সুন্দর' বলে কুড়িয়ে নিয়েই চমকে উঠল সে। লাঠির মাথায় চাঁদ-তারা খোদাই করা আছে—যা একটি ইসলামী প্রতীক এবং কিছু ফার্সি লিপিও রয়েছে। বণিক বিস্ময়ে চিৎকার করল। এ কি! এই লাঠিতে ফার্সিভাষায় লেখা আছে : কান্দাহারের সুলতান কারা বাহ্‌রামের সিংহাসন প্রাপ্তি উপলক্ষ্যে বিরমের মসজিদের ইমাম এবং প্রখ্যাত বুজুর্গ পীর সামন্দাশের কাছে অর্ঘ্যস্বরূপ নিবেদিত হল!

পীর সামন্দাশ! বণিকদল এবং রক্ষীরা ফিসফিসিয়ে উচ্চারণ করল। পীর সামন্দাশ এক অলৌকিক শক্তিধর মহাপুরুষ!

কিন্তু তাঁর বুকে কাথির উল্কি কেন থাকবে? নিশ্চয় এই কাথির বৃদ্ধ এক চোর। বিরমের মসজিদে গিয়ে পীর সামন্দাশের লাঠিটি চুরি করে পালিয়ে আসছিল। হিমে তুষারে মারা পড়েছে।

দলপতির এই মন্তব্য শুনে এক বণিক বলল, কিন্তু আমি তো শুনেছি পীর সামন্দাশ দু'মাস আগে হঠাৎ অন্তর্হিত হয়েছে। বিরমের আস্তানা দু'মাস যাবৎ খাঁ খাঁ করছে।

দলপতি বলল, সে যাই হোক। এই লাশ যে একজন কাথিরের, তাতে তো ভুল নেই?

সবাই সায় দিয়ে বলল, হ্যাঁ। তা ঠিক।

তাহলে এ ব্যাটা এখানেই পড়ে থাক। আর এখানে থাকা ঠিক নয়। চল, রওনা হই।

যে বণিক লাঠিটি কুড়িয়ে নিয়েছিল, সে সবার আগে উটের পিঠে চেপে বসল। এবার যাত্রায় খোদার অনুগ্রহে এই পবিত্র লাঠিটা তার বড় লাভ। না জানি এই লাঠির কত অলৌকিক ক্ষমতা আছে!

দলটি দ্রুত স্থানত্যাগ করল। পীর সামন্দাশের মরদেহ উলঙ্গ অবস্থায় পড়ে রইল। ততক্ষণে হিন্দুকুশ পর্বতমালা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে ক্ষুধার্ত গৃধিনীরা উড়ে আসছে পাঞ্জশেরের দিকে। রাস্তার ধারেই পাহাড়ের উঁচু চাতাল থেকে উঁকি মারছে একটা ঈগল। আর মৃতদেহের গন্ধ পেয়ে একপাল নেকড়ে গুটি-গুটি উঠে আসছে বাণিজ্য-পথের দিকে। তাদের লোলুপ রসনা লকলক করছে।

সামন্দাশ এখন নিতান্তই একজন কাথির বা কাফির। অলৌকিক শক্তি তাঁকে পরিত্যাগ করে চলে গেছে।

আর ওদিকে তখন ঘোরবন্দ্ নদীর তীরে নিষ্পত্র ওকগাছের নিচে একখণ্ড পাথরের ওপর বসে পদ্মাবতী বলছিল, তোমার যে সুলতান হওয়ার কথা ছিল, রুখ! কি হল তার? পদ্মাবতীর ঊরুতে মাথা রেখে শুয়ে ছিল রুখ। মৃদু হেসে বলল, বুজুর্গ সামন্দাশ যদি কোন দিন ফিরে আসেন, তবে ভেবে দেখব।

পিতা যদি না ফেরেন আর?

রুখ মুখ তুলে বলল, না ফিরলেই খুশি হব। আমি সুলতান হতে চাইনে পদ্মাওয়াতি। আমার বুকে এখন চেরিফুলের বন। আমি দামান্দ পাহাড় হয়ে বেঁচে থাকতে চাই।

পদ্মাবতী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, পিতার খুশি হওয়া উচিত ছিল। কেন যে চলে গেলেন!

---

* আফগানিস্তানের বর্তমান নুরিস্তান অঞ্চলের অধিবাসী কাথির জাতির উপকথা অবলম্বনে।

তখন বসন্তকাল

নওলপাহাড়ী নাম শুনে ভেবেছিলাম কী এক রুক্ষ রসকষহীন জায়গা, বেশিদিন টেকা যাবে না। কিন্তু এসেই প্রথম দৃষ্টিপাতে চোখে নেশা ধরে গেছে। একদিকে ধু ধু বিস্তীর্ণ গঙ্গা, তার এখানে ওখানে ধূসর চর। কোনো চরে ভুট্টা বা আখের ক্ষেত, কোনটায় কাশবন। অন্যদিকটায় টিলাপাহাড়। পাহাড়গুলো অবশ্য কিছুটা দূরে। ওদিকে কোথায় যেন নলিনীমামার কী একটা খনি টনি ছিল আমার জন্মেরও আগে। নলিনীমামাকে আমরা বলি গন্ধমামা। ভুর-ভুরে এসেন্সের গন্ধ ছড়িয়ে জীবন কাটিয়েছেন বলেই কি? সঠিক জানি না। তবে নওলপাহাড়ীতে এসে দেখলাম ওঁকে সবাই গন্ধবাবু বলে ডাকে।

স্থানীয় লোকে উচ্চারণ করে নৌলপাহানী। খানিকটা গ্রাম খানিকটা শহরের আদল তার গড়নে। ছড়ানো-ছিটানো একটা করে বাড়ি, বেশির ভাগই একতলা এবং প্রচুর গাছপালা দিয়ে ঘেরা। উত্তরে গঙ্গার বাঁকে— যেখানটায় গভীর দহ, তার মাথায় পুরনো স্টিমারঘাট। আগের মতো বারোমাস স্টিমার চলে না। সেই বর্ষার সময় তার ভোঁ শোনা যায়। শীতের শেষে এসে দেখলাম, ঘাট জুড়ে কতরকমের নৌকো। ঘাটের মাথায় মালের গাদা আর আড়ত। গিজগিজ করছে মানুষজন। তার এদিকে উঁচু বাঁধের ওপর রাস্তা চলে গেছে মুঙ্গেরের দিকে। ঘাটের চেয়ে বরং রাস্তাটাই আমার প্রিয়।

ওই রাস্তায় দাঁড়ালে গঙ্গাকে বিশাল করে দেখা যায়। চরের গা ঘেঁষে ভাসে হাজার হাজার হাঁসের ঝাঁক। কখনও হঠাৎ উড়তে শুরু করে। আকাশ কালো হয়ে যায় কিছুক্ষণের জন্য। তারপর হঠাৎ দীর্ঘ এক চাবুকের মতো একটা ঝাঁক সপাৎ করে জলে আছড়ে পড়ে। বুকে চমক খেলে যায়।

রাস্তার দুধারে উঁচু শিরিস সেগুন আকাশিয়া গাছ। বসতি ছাড়িয়ে বাঁয়ে এবড়ো খেবড়ো খোয়াঢাকা ছোট আরেক রাস্তায় হেঁটে গেলাম একদিন আপন খেয়ালে। কিংবা নওলপাহাড়ীকে ভাল করে দেখার জন্য চক্কর মেরে ঘুরছি এখনও। তাকে আরও ভালোবাসতে চাইছি হয়তো।

গঙ্গার দিক থেকে একটা নালা বড় রাস্তার প্রকাণ্ড ব্রিজের তলা দিয়ে পোড়ো মাঠ ভেঙে এই ছোট রাস্তার একটা নড়বড়ে পুরনো কাঠের পোলের তলায় ঢুঁ মেরেছে। তারপর হঠাৎ বাঁক নিয়ে চলে গেছে দূরের পাহাড়ে। পোলের কাছে গিয়ে দেখি, কাঠের রেলিঙে ভর দিয়ে ঝুঁকে আছে একটি মেয়ে।

আমার পায়ের শব্দে একবার মুখ ফেরাল সে। চোখে চোখ পড়ল। আমার কী এক স্বভাব। মেয়েদের চোখে বেশিক্ষণ চোখ রাখতে পারি না। আমার চোখ দুটো জ্বলে গেল যেন।

পরে ভেবেছি, এমন হওয়ার কোনো কারণ ছিল না। কলকাতায় আমি তো অসংখ্য সুন্দরী দেখেছি খুব কাছ থেকেও। বিজ্ঞাপনের সুন্দরীরা, কিংবা চিত্রতারকারা। বস্তুত কলকাতা এমন একটা জায়গা, মানুষের শ্রেষ্ঠ ভাল-মন্দ জিনিসগুলো দেখা যায়। শ্রেষ্ঠ সুন্দর কিংবা শ্রেষ্ঠ কুৎসিতকেও দেখা হয়ে যায়।

মেয়েটি নিছক শ্যামবর্ণা। গড়পড়তা চেহারা। সরু নাক, ডিমালো গাল, ভাঙা কালো খোঁপা। অবশ্য ওর চোখদুটো অসম্ভব উজ্জ্বল মনে হয়েছিল। কিন্তু সে আমার ভীরু মানসিকতার দরুন হতে পারে, অথবা তার নিষ্প্রভ শাড়ি এবং শীতের প্রহারে জর্জরিত প্রাকৃতিক পরিবেশের দরুনও হতে পারে। মানুষের চোখ এমনিতেই খুব উজ্জ্বল জিনিস।

কিছুটা এগিয়ে আমার মনে হল, এমন নির্জন জায়গায় বিকেলবেলায় একা একটি মেয়ে কী করতে এসেছে! আমার মতোই কি ও একলা-একলা কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে, যা একান্ত নির্ভয় একটি আশ্রয়?

প্রকাণ্ড কদম গাছের তলায় একটু দাঁড়ালাম সিগারেট ধরানোর ছলে। তখন খুব অবাক হয়ে দেখলাম, মেয়েটি ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটছে। এদিকে রাস্তাটা কিছু উৎরাই। মনে হল, হাঁটতে ওর কষ্টই হচ্ছে। দুধারে উঁচু লালচে মাটি থেকে ঝুঁকে রয়েছে চাপচাপ লতাগুল্ম। নীল লাল হলুদ ফুল ফুটে আছে ঝোপগুলোতে। মুখ দুপাশে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে দেখতেই যেন উৎরাইটুকু পেরুচ্ছিল ও।

পরে আরও দুটো বিকেলে ওকে দেখছি। কেন অমন করে দাঁড়িয়ে থাকে ওখানে? কে ও?

চারদিনের দিন বিকেলে এক কাণ্ড ঘটল। ঘাটের বাজারে সিগারেট কিনে বড় রাস্তায় মোড় নিচ্ছি। দশরথের সঙ্গে দেখা হল। দশরথ গন্ধমামার কৃষি-খামারে পাওয়ারটিলার চালায়। বলল, চলুন নিরুবাবু, আপনার সঙ্গে থোড়া ঘুম করে আসি। এবেলা আমার ছুট্টি!

দশরথ একসময় কলকাতায় ছিল। কলকাতা যে কোনো কারণেই ছেড়ে আসুক, সে ভুলতে পারে না। আমাকে দেখলেই তার কলকাতার কথা। তবে এই প্রৌঢ় লোকটি বড় সাদাসিদে আর স্পষ্টভাষী। এজন্য ওকে ভাল লাগে। সিগারেট দিলে খুব খুশি হয়ে বলল, আপনার মামাজীর ফার্ম তো বেশি দূরে নয়। ওই যে ধোঁয়া ধোঁয়া জিনিসটার ভেতর সাদা বাড়িটা দেখছেন, ওই। চলে গেলেই পেয়ে যাবেন আমাকে। গেলে পরে আপনাকে নিয়ে পাহাড়ে ঘুমতে যাব। বহুৎ জঙ্গল। জানোয়ার দু-একটা থাকতে পারে।

ছোটরাস্তায় মোড় নিয়ে নামার মুখে সে থমকে দাঁড়াল এবং ফিক করে হাসল। বোসেন, বোসেন একটু এখানে। মোজা দেখতে পাবেন।

কী মজা দশরথ?

বোসেন তো! বলে গাছের আড়ালে টেনে নিয়ে গেল আমাকে। অচেনা গাছগুলো ঠাসাঠাসি করে ঝোপ ঠেলে উঠেছে। তার ওধারে ঘাসেঢাকা মাটি ঢালু হয়ে নেমে গেছে সেই খালের কিনারায়। চাপচাপ দূর্বাঘাসে ঢাকা উঁচু নিচু মাটির শেষদিকটায় ভুট্টার ক্ষেত। চারপাশে পাখি ডাকছে। বিকেলের লালচে রোদ গায়ে মেখে ঘুরঘুর করছে প্রজাপতির ঝাঁক। ভাবলাম, দশরথ কি আমাকে প্রজাপতি দেখাতে চাইছে?

তার মুখে চাপা হাসি জ্বলজ্বল করছিল। হঠাৎ ফিসফিস করে বলল, দেখুন, দেখুন! বনোয়ারীর লড়কির মোজা দেখুন।

এতক্ষণে দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে গেলাম। কাঠের সাঁকো থেকে সেই মেয়েটি ক্রাচে ভর করে হেঁটে ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে শেয়ালের মতো এগিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে থেমে চারদিকে তাকাচ্ছে। সেই আশ্চর্য উজ্জ্বল চোখ!

ও কোথায় যাচ্ছে, দশরথ?

ভুট্টার ক্ষেতে ভুট্টা চুরি করতে। দশরথ ফ্যাসফেসে গলায় হাসল। ভুট্টা এখনও তত ধরেনি। লেকিন যেটা ধরেছে, সেটা নরম আর দুধে ভরা। বুঝলেন তো?

কে ও?

কাঠমিস্তিরি বনোয়ারীলালের মেয়ে রঙ্গী।

ওর পা গেল কিসে?

স্টেশনে এ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল। মালগাড়ির চাকায় একটা পা খেয়ে নিয়েছে। দশরথ খি খি করে হাসতে লাগল। দেখুন এখন ওকে কেমন মোজা দেখাব।

রঙ্গী এখন ভুট্টাক্ষেতে ঢুকতে যাচ্ছে গুঁড়ি মেরে। ক্রাচদুটো দুহাতে ধরা—কাত হয়ে ঘাসে পড়েছে। সে চমকানো চোখে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। এই সময় ঢালু ঘাসের জমিনে ফাঁকায় নেমে দশরথ চেঁচিয়ে উঠল, হে রঙ্গী! আ রী রঙ্গিয়া! উও দেখ্ পণ্ডিতজী আইলে বা— তেরি কিরিয়া রী! তারপর জোরালো প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে হাসতে লাগল হা-হা করে।

রঙ্গীকে ঘন চিকন সবুজের ভেতর মুছে যেতে দেখলাম এক পলকে। কোথায় লুকোলো, কিছুতেই বুঝতে পারলাম না।

রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে দশরথ রঙ্গীর বাবা কাঠমিস্তিরি বনোয়ারীলালের কথা বলছিল। খুব খবচে হাত বলে ওর বরাবর মুশকিল। ধুলিয়ানে ভালই ছিল। সেখান থেকে এক কন্ট্রাক্টারবাবুর সঙ্গে ফরাক্কা ব্যারেজের টাউনশিপেও প্রচুর রোজগার করেছিল। কাজও শেষ হল, পয়সাও ফুরুল। ছয় বেটি এক বেটার বাবা বনোয়ারীর এখন কষ্টে দিন কাটে। নওলপাহাড়ীতে কাঠের কাজ খুব কম।

আমি কাঠমিস্তিরির মেয়ে রঙ্গীকে দেখে ভুল করেছিলাম। ভেবেছিলাম এখানকার কোনো শিক্ষিত পরিবারের মেয়ে। কারণ তার শাড়ি ও চেহারায় সেই রকম পারিপাট্য ছিল যেন।

আসলে তা ছিলই না। সবটাই আমার দেখার ভুল। এরকম ভুল বরাবর হয়।

রঙ্গীকে এরপর সেই কাঠের সাঁকোতে যে দিনই দেখি, সেদিন আর তেমন করে তাকাইনে। বোকার মতো ভেবে বসেছিলাম, আমারই মতো সে প্রকৃতিতে এক নির্ভরযোগ্য আশ্রয় খুঁজতে বেরোয়। অথচ সে নিজেই প্রকৃতির অংশ। ...

দুই

একদিন সন্ধ্যায় পাশের পোড়োমতো বাড়িটাতে লোকজনের সাড়া পেলাম। আলো জ্বলতে দেখলাম। মামাতো বোন রূপাই বলল, নিরুদা! তুমি সুবোধ নামে কাউকে চেনো গো?

সুবোধ! কোথাকার সুবোধ?

রূপাই বলল, আমাদের ভীষণ তক্ক হয়েছে। সুবোধ রুদ্র নাকি তোমার ক্লাসফ্রেণ্ড ছিল। মিতুদি তার বোন। বলল, তোর পিসতুতো দাদা? ওকে ভীষণ চিনি। আমার দাদার সঙ্গে কত আসত!

একটু হেসে বললাম, এ নিয়ে তক্ক করার কি আছে?

রূপাই বলল, না। তোমার চেহারার যা ডেসক্রিপশন দিল, একেবারে উল্টো।

দাড়া—একমিনিট! সুবোধ রুদ্র—তার বোন মিতু, মানে মিতা—পারমিতা?

রূপাই চোখ বড় করে বলল, চেনো? সেই? কিন্তু—

আমার চেহারার কী ডেসক্রিপশন দিল বল তো!

বলল, দারুণ স্বাস্থ্য। ভীষণ লম্বা-চওড়া। আর ...

হাসতে হাসতে বললাম, আমি কি এমনি রোগাপটকা ছিলাম ভাবছিস? স্টুডেন্টলাইফে পালোয়ান ছিলাম। ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করতাম। বক্সার ছিলাম।

রূপাই হাসতে হাসতে কুঁজো হয়ে গেল। তারপর দম নিয়ে বলল, এখন ওদের ডিস্টাব করব না। সকাল হোক। তোমায় সশরীরে হাজির করব। আমি বাজি জিতে গেছি।

মোটেও না। তোর মিতুদির আসল নামটা কেমন বলে দিলাম দেখলিনে?

ওর নাম পারমিতা হতেই পারে না। রূপাই জেদ করে বলল। প্রতিবছর ওরা মার্চে এখানে আসে। কলকাতা গেলেও কতবার ওদের বাড়িতে গেছি।

বালিগঞ্জ প্লেসে তো?

রূপাই দমে গেল! মুখ চুণ করে বলল, তাহলে তো হেরে গেলাম নিরুদা।

সুবোধ রুদ্র ইউনিভার্সিটিতে আমার সঙ্গে বাংলা নিয়ে পড়ত। প্রচণ্ড ফর্সা খাড়া ঢেঙা চেহারা। একমুখ দাড়িগোঁফ নিয়ে পদ্য লিখত। পত্রিকা বের করত। সুবোধ ভাবত, মদ না খেলে পদ্য বেরোয় না! সেই সুবোধ! তারপর পাঁচটা বছর ছাড়াছাড়ি। এখন সে কোথায়, কী করছে কিচ্ছু জানিনে। শুধু অবাক লাগছে যে তার বোন পারমিতা আমাকে মনে রেখেছে।

মনে রাখার মতো কী করেছি ভাবতে ভাবতে একটা লম্বা রাত কেটে গেল। এমনিতে ইনসমনিয়ায় ভুগছি। ভেবেছিলাম নওলপাহাড়ী আমাকে নিরাপদ নিদ্রার রাতগুলো উপহার দেবে। উল্টো হয়ে গেছে একবারে! প্রথম প্রথম মনে হচ্ছিল, নতুন জায়গা বলে এবং সারারাত ভীষণ নিস্তব্ধ বলে এরকম। কিন্তু তা নয়, এ একটা অসুখ।

কবে কলকাতায় গরম পড়ে গেছে। এখানে এখনও শীতের উপদ্রব। বিশেষ করে মধ্যরাত থেকে শীতটা প্রচণ্ড বাড়তে থাকে। ভোরের দিকে চরাচর নিঃসাড় হয়ে যায়, আর সে কী কুয়াশা। বেলা নটা পর্যন্ত চারদিক সাদা হয়ে থাকে। তার ভেতর ভূতের মতো ছায়া মানুষের চলাফেরা। গন্ধমামার জিপগাড়িটাও গরগর করতে করতে ভুতুড়ে প্রাণীর চরিত্র পায়। রোজ এইসময় গন্ধমামা জিপে চড়ে কোথায় যান কে জানে! আমাকে ডাকলে যেতাম। আমার খালি পই পই করে ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে করে যেখানে-সেখানে, যা খুশি করতে ইচ্ছে করে। অথচ হঠাৎ শেষমুহূর্তে থমকে দাঁড়াই। ভাবি, কেন আর?

বাড়ির সামনের দিকটা অনেকখানি ঘেরা। তার ভেতর কিছু গাছপালা আছে। একটা মজা কুয়ো আছে কোণার দিকে। সকালে সেটাই আমার প্রিয় চা খাওয়ার জায়গা। কুয়োর ধারে পা ঝুলিয়ে বসে দূরে ঝাপসা রেললাইনের সিগন্যালপোস্ট দেখতে দেখতে চা খাচ্ছিলাম, তখন রূপাই পুরোদস্তুর একটা বাহিনী নিয়ে এল। হল্ট মার্চের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে মুচকি হেসে বলল, বলো তো নিরুদা, কে মিতুদি?

তিনটি যুবতী, দুটি বালিকা এবং একটি দুগ্ধপোষ্য বালকের চোখ আমার দিকে। যুবতীদের দিকে তাকানোর চেষ্টা করে ঢিল ছোঁড়ার মতো বললাম মিতা! কেমন আছ?

এতে চমৎকার কাজ হল। পারমিতা ধরা দিল। লাইন থেকে বেরিয়ে এসে বলল, রূপাইয়ের কথা

বিশ্বাস করিনি। জানো নিরুদা? আমি বললাম, ভ্যাট! ইমপসিবল। হতেই পারে না। নিরুদা তো স্টেটসে আছে—মানে থাকার কথা যদ্দূর জানি। বলো না ঠিক কিনা!

গম্ভীর হয়ে বললাম, স্টেট্সে? কোন মিথ্যাবাদী বলেছিল বলো তো?

বাগানের ভেতর কোথায় চেরা গলায় রুগ্ন একটা কোকিলের ডাক এবং যুবতীদের হাসি উপভোগ্য ব্যাকগ্রাউণ্ড তৈরী করল সন্দেহ নেই। পারমিতা আলাপ করিয়ে দিল। ছিপছিপে আমার মতো রোগা, কিন্তু আমার চেয়ে একটু মাথায় খাটো, সরু ধারালো নাক, সূঁচলো চিবুক, দীর্ঘ-দীর্ঘ লাবণ্যময় চোখ যার, তার নাম রঞ্জনা। পারমিতার বন্ধু সে। সঙ্গে বেড়াতে এসেছে। তৃতীয়ার নাম ঈশিতা। নওলপাহাড়ীরই মেয়ে। ওপাশে কোথায় ওদের বাড়ি। বাবা ডাক্তার। বালিকা-দুটি ও বলকটি পারমিতার মাসিমার গর্ভজাত সন্তান। মাসীমাও এসেছেন। আর এসেছেন পারমিতার বাবা জগমোহনবাবু। মা বেঁচে নেই পারমিতার সেকথা জানতাম।

আজ আসরটা অপ্রত্যাশিত ছিল আমার পক্ষে। মেয়েদের ব্যাপারে আমার আড়ষ্টতা সত্ত্বেও বেশ জমে উঠেছিল। রূপাই ওদের চাকর রঘুয়ার সাহায্যে কয়েকটা বেতের চেয়ার আনল। বালিকা-দুটি—ইতি ও তিতি তাদের ভাই-টুকুকে নিয়ে চৌহদ্দির ভেতর থেকে বাইরে ছোটাছুটি করে খেলতে থাকল। রূপাই গেল চা আনতে। রূপাই বাজি হেরেছে, তাই যেন একটা কিছু প্রাপ্য আছে। পারমিতারা তাই নিয়ে চোখের ও ঠোঁটের রেখায় কী বলাবলি করছিল।

বেশ কথা বলছিল পারমিতা। তার সঙ্গে ফোড়ন কাটছিল ঈশিতা। রঞ্জনা চুপচাপ। একটু পরে দ্বিধা ঝেড়ে তাকে বললাম, আপনি কিছু বলছেন না তো?

কী বলব? বেশতো শুনছি। রঞ্জনা পায়ের ওপর পা তুলে বসেছিল। হাঁটু থেকে একটা শুকনো পাতা আলতো হাতে ঝেড়ে ফেলল। তার চোখ দুটো এত সুন্দর!

পারমিতার রহস্য ফাঁস করার ভঙ্গিতে চাপা হেসে চোখ নাচিয়ে বলল, জানো নিরুদা ওর ডাক নাম? বুড়ি, বলব? বলি তাহলে?

ঈশিতা প্রথমে, তারপর পারমিতা হেসে গড়িয়ে পড়ল। ঈশিতা বলল, বলেই তো দিলে!

রঞ্জনা বলল, আমাকে দেখেই ভদ্রলোক বুঝেছেন আমি সত্যি বৃদ্ধা।

আমি চুপ করে আছি দেখে সে ফের বলল, আপনি সায় দিন।

পারছিনে। আপনি .... কী বলব? একেবারে বালিকা। ..... কথাটা বলেই কিন্তু একটু লজ্জায় পড়ে গেলাম।

পারমিতা চোখ বড়ো করে বলল, আশ্চর্য! আশ্চর্য!

কী আশ্চর্য, মিতা?

পারমিতা কপট দীর্ঘশ্বাসের ভঙ্গি করে বলল, নিরুদা, তুমি তেমনি আছ। তেমনি ভীতু। মুখ চেয়ে কথা।

রঞ্জনা হঠাৎ উঠে হাল্কা পায়ে হাঁটতে হাঁটতে নিচু পাঁচিলের কাছে গেল। হেঁট হয়ে কী একটা কুড়িয়ে নিল। তারপর ওদিকের কাঠের ফটকের ফাঁক গলে চলে গেল। এতক্ষণে মনে হল, ওর শাড়িটা বড় সাদাসিদে। চেহারাও প্রসাধনহীনা। মনে কি কোনো চাপা দুঃখ নিয়ে ঘোরে? রূপাই তাকে ডাকতে ডাকতে অনুসরণ করল।

পারমিতা চাপা গলায় বলল, রঞ্জনাকে দেখে কী মনে হল বলো তো নিরুদা?

তেমন কিছু না। ফিলসফার টাইপ। কী করেন উনি?

টিচার। তবে কলকাতায় না, মফস্বলের স্কুলে।

ঈশিতা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আসছি। তারপর সেও সম্ভবত রঞ্জনাদের অনুসরণ করল। সিগারেট জ্বেলে বললাম, মিতা, সুবোধের খবর কি?

তুমি জানো না কিছু?

না তো। কী ব্যাপার?

আমার গলার স্বরে উদ্বেগ ফুটেছিল। পারমিতা একটু হেসে বলল, দাদা গত নভেম্বরে বাংলাদেশে গিয়েছিল কবি সম্মেলনে। মাসদেড়েক পরে ফিরল সঙ্গে বউ।

বাঃ! ভালই তো।

পারমিতা মিটিমিটি হাসল। সবটা ভাল নয়। বউদি মুসলমানের মেয়ে।

অবাক হয়ে বললাম, তাই বুঝি?

পারমিতা নিচু গলায় ওর দাদার আরও খবর দিল। ওদের অনেকদিন থেকে চিঠি লেখালেখি চলছিল। মুখোমুখি না দেখে চিঠিতেই প্রেম এবং সশরীরে যেতেই তার বিস্ফোরণ। মেয়ের প্রকৃত গার্জেন কেউ ছিল না। একরকম চলেই এসেছে বলা যায়। সুবোধের বাবা তত কিছু গোঁড়া নন। তবু মেনে নিতে পারেননি। সুবোধ বউ নিয়ে ঠাকুরপুকুরে আছে। ওর কোনো পাকা চাকরি নেই। যখন যে পত্রিকায় সুযোগ পায়, যেমন তেমন মাইনেতে ঢুকে যায়। সুবোধের বাবার খালি ভাবনা। এ বিয়ের কথা কাগজে ফলাও হয়ে বেরিয়েছে। তাই মিতার বিয়েতে অসুবিধে হবে।

পারমিতা কথা শেষ করল এই বলে যে, সে পৃথিবীর থোড়াই পরোয়া করে। তারপর উঠে দাঁড়াল এবং আসছি বলে একই পথে বেরিয়ে গেল। আমি একা বসে রইলাম।

পায়ের কাছে একটা কাঠবেড়ালী ঘুরঘুর করে পেয়ারাগাছের তলায় গেল এবং শুকনো পাতা উল্টে সরু দাঁতে কিছু কুরকুর করে চিবুতে থাকল। জবাফুলের ঝোপের মাথায় একটা হলুদ প্রজাপতি উড়ছিল। গভীর স্তব্ধতায় আঁচড় কেটে সেই রুগ্ন কোকিলটা আবার ডাক দিল। আমি উঠে দাঁড়িয়ে দেখলাম, বাইরে পোড়ো জমিটার ওধারে শতাব্দীর পুরনো শিবমন্দিরের কাছে দাঁড়িয়ে যুবতীরা হাসাহাসি করে কিছু বলছে। ইতি, তিতি, টুক হাত ধরাধরি করে মন্দির প্রদক্ষিণ করছে। কী এক ক্লান্তি আব হতাশা আমাকে নেতিয়ে দিল।

হাঁটতে হাঁটতে গঙ্গার ধারে সেই উঁচু রাস্তায় গিয়ে ইচ্ছে করল, সামনেকার ন্যাড়া চরটায় গিয়ে বসি। গঙ্গার বিস্তার এখানে আদিগন্ত। সমুদ্র বলে মনে হয়। জলও নীলচে রঙের। দূরে ও কাছে অনেক নৌকো ভাসছে। দূরের নৌকোর পাল ফুলে আছে বাতাসের চাপে। ঢালু বেয়ে নেমে থমকে দাঁড়ালাম। কাঠমিস্তিরি বনোয়ারীজীর মেয়ে জলে নেমে কী একটা করছে। জল থেকে উঠে দাঁড়াতেই ভিজে শাড়ি তার শরীরকে নিরাবরণ করে দিল। সূর্যের ঝকমকে রোদ তার পিঠে এবং সে একপাশে কাত হয়ে খোঁপাটা ভাল করে বাঁধতে থাকল। তার গায়ে ব্লাউজ ছিল না। খাড়ির এক ফুলফোটা ঝোপের পেছনে দাঁড়িয়ে আমি চোখ ফেরাতে পারলাম না। এখন সে পরিব্যাপ্ত প্রকৃতির অংশ। কী এক স্বাদু অমর্ত ফলের মতো তার স্তন, ভাঁজে ভাঁজে সোনালী মাংসের লাবণ্য ঝলমল করছিল।

তারপরই লজ্জা পেলাম। সবুজ ঘাসের ওপর দুটো অতি সাধারণ ক্রাচ পড়ে আছে। চোখে বড্ড বাজল।....

তিন

পুরনো শিবমন্দিরের পেছনে এক জঙ্গল। জঙ্গলে কয়েকটা শিমূলগাছ আছে। লালফুলে ভরা শিমুলগাছগুলো দেখলে ভারি অবাক লাগে। অত উঁচু গাছ—যাকে বলে মহীরুহ, তাকেও ফুল ফোটাতে হয়। মানুষের সমাজের উঁচু উঁচু মানুষেরাও বংশবিস্তারের প্রাকৃতিক নিয়মের দাস। এও কম আশ্চর্য লাগে না, উঁচু মানুষেরাও কামবশে মৈথুনলিপ্ত হন! এই দাসত্ব কেউ কেউ ডিঙিয়ে যান বৈকি। তাঁরাও আমার বিস্ময়।

দুপুরের খাওয়ার পর গায়ে একটু রোদ নিতে গিয়েছিলাম বাইরে। আমি বড্ড শীতকাতুরে। শীতকালটা সপ্তাহে বড়জোর দুদিন স্নান করতে পারলেই মনে হয় আমি ক্ষমতাবান। আজ স্নান করতে গিয়েছিলাম রঘুয়াকে নিয়ে গঙ্গায়। ক্ষীণ আশা ছিল, রঙ্গীকে দেখতে পাব। মেয়েটা কি সেদিন দশরথের কাণ্ডে লজ্জা পেয়েছে—আমি ছিলাম বলে? দূর থেকে দেখলেই সরে যায়। ওই ঘাটে সে থাকবে ভেবেছিলাম। নেই।

রোদে শিবমন্দিরের চত্বরে সিগারেট খাচ্ছি, হঠাৎ দেখি কে ওপাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। চিনতে পেরে ডাকলাম, রঞ্জনা! আপনি! এখানে কী করছেন?

রঞ্জনা একটু হাসল। .... কিছু না। বেশ জায়গাটা, তাই না? জানেন? আমি নদীয়া জেলার যে গ্রামের স্কুলে থাকি, একটা আশ্রমের স্কুল—এরকম চুপচাপ শান্ত পরিবেশ। অবশ্য এখানে একটু রুক্ষতা

আছে। পাশে গঙ্গা, তবু এমন। তাই না?

অস্ফুট কণ্ঠস্বরে কথা বলছিল সে। বললাম, স্বীকার করছি নওলপাহাড়ীর তবু মাহাত্ম্য আছে।

শান্ত টানা দুই চোখ তুলে বলল, কেন বলুন তো?

আপনি কথা বলতে পারছেন।

আপনি কি সত্যি ভেবেছিলেন আমি কথা বলিনে?

না। অবশ্য আপনাকে একটু ফিলসফার টাইপ মনে হয়েছিল।

আমি ইকনমিকসের ছাত্রী ছিলাম।

ওর সঙ্গে কথা বলতে বলতে কিন্তু চোখ রেখেছিলাম গন্ধমামার বাড়ির দিকে। ভাবছিলাম ওরা এভাবে দুজনকে দেখলে কি কিছু উল্টোপাল্টা ভেবে বসবে? রঞ্জনা বুদ্ধিমতী। সহজে আমার চাঞ্চল্য আঁচ করে ফেলল। মুখ টিপে হেসে বলল, আপনার কি অস্বস্তি হচ্ছে?

আমাকে নিশ্চয় নার্ভাস দেখাচ্ছিল। ঝেড়ে ফেলে বললাম, আপনি ভীষণ স্পষ্টভাষীর মতো বলতে পারেন দেখছি। অস্বস্তি হওয়া নিশ্চয় উচিত। এটা কলকাতা নয়।

আপনি কী করেন, এখনও জানিনে কিন্তু। রূপাইকে জিজ্ঞেস করব ভেবেছিলাম। রঞ্জনা একটু হাসল। অবশ্য এ ধরনের কৌতূহল ভদ্রতাসম্মত নয় । তবু কী জানেন? কাউকে কাউকে দেখলে ভীষণ চেনা লাগে।

বলেন কী? আপনাকে আমি এর আগে কখনও দেখিনি।

কে জানে? বলে সে হেঁট হয়ে একটা শুকনো পাতা কুড়িয়ে নিল। এটা বুঝি তার একটা অভ্যাস।

আমি কিছু করিনে। বেকার বলাটা ভুল হবে। আসলে পৃথিবীতে আমার করার মতো কিছু নেই। বলতে পারেন, নিজেকে অকর্মণ্য মনে করা আমার স্বভাব। তাই পরগাছা হয়ে বেঁচে আছি। মন্দ লাগে না।....

শতাব্দীর পুরনো টুটাফাটা পোড়ো শিবমন্দিরের চত্বরে বিকেল নামছিল। তিনটে সিগারেট খাওয়া হয়ে গেল আমার। এলোমেলো কথায় নিজেকে খুলে দিলাম অনর্গল। অবাক লাগল, রঞ্জনা চুপচাপ শুনছিল সব। আর কোনও প্রশ্ন করেনি।

চার

বিকেলে গঙ্গার দহের ওপর স্টিমারঘাটের দিকে যাচ্ছিলাম। এখানেই নওলপাহাড়ীর বাজার এলাকা। অসংখ্য যানবাহন আর মানুষজন গিজগিজ করছিল। জেটিতে গিয়ে সিগারেট খাব বলে এক প্যাকেট সিগারেট কিনতে গেলাম। দেখলাম ক্রাচ নিয়ে একধারে রঙ্গী দাঁড়িয়ে আছে একা। আমার চোখে চোখ পড়তেই সে একটু হেসে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

বুঝতে পারছি না, কেন মেয়েটা আমাকে এত আকর্ষণ করে। হয়তো ওর মুখের রেখায় আদিম পৃথিবীর স্মৃতি আঁকা—কিংবা হয়তো ওর সারা শরীর জুড়ে প্রাকৃতিক স্বাধীনতাকে নিঃশব্দ জলপ্রপাতের মতো আচড়ে পড়তে দেখি মাটিতে— কে জানে কী, কিছু বোঝা যায় না। খালি মনে হয়, ওর ভেতর আমার কোনো এক চরম পাওয়া গুপ্তধনের মতো লুকানো আছে। ও যে অমন করে হাসল, সে হাসিতে হাতছানি ছিল ভেবে আমি চঞ্চল হয়ে উঠলাম।

সিগারেট কিনতে কিনতে আবার ওর দিকে ঘুরলাম। দেখলাম ও আবার হেসে মুখটা নামাল।

কিন্তু কাছাকাছি যেতে না যেতে ও ক্রাচে ভর করে দ্রুত হাঁটতে শুরু করল। আরও চঞ্চল হয়ে উঠলাম। ও কি আমাকে অনুসরণ করতে বলছে?

বাজার এলাকা ছাড়িয়ে রাস্তা উঁচু হতে হতে গঙ্গার পাড়ে বাঁধের সঙ্গে মিশেছে। দুধারে শিরিস মেহগনির সারি। দেখলাম প্রকাণ্ড একটা গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল রঙ্গী।

সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়ালাম। এতক্ষণ অত কিছু ভাবিনি। আমার ভেতরকার মধ্যবিত্তসুলভ নীতিবোধ, ভীরুতা, কপটতা এবার হৈ-চৈ জুড়ে পরস্পরকে আক্রমণ শুরু করল। বনোয়ারী মিস্তিরির মেয়ের চোখে মুখে দেহ-ব্যবসায়িনীর আদল পরিষ্কার করে ভড়কে গেলাম।

তারপর মনে হল, চারপাশে অসংখ্য চোখ আমাকে দেখছে। ঘেমে উঠলাম। পা অবশ হয়ে যাচ্ছিল।

পাশ কাটিয়ে যাবার সময় যেন রঙ্গীর খিলখিল হাসিও শুনতে পেলাম। কিন্তু আর তার দিকে ঘুরে তাকানোর সাহস ছিল না। গঙ্গার ধারে বসে থাকার আনন্দ মাঠে মারা গেল।

এভাবেই স্বপ্নভঙ্গ হয় মানুষের। হতাশা এসে ঘিরে ধরে। প্রকৃতিও আর নিষ্পাপ থাকে না মানুষের চোখে। ....

পাঁচ

আজ গন্ধমামার জিপে চেপে রূপাইরা বেড়াতে গিয়েছিল পাহাড়ে। রূপাই, ঈশিতা, পারমিতা, রঞ্জনা আর ইতি, তিতি, টুক সব্বাই। আমি ছিলাম না, নৈলে আমারও যাওয়া হত।

বাড়ির পেছনে মজা কুয়োর ধারে একা বসে আছি। শিবমন্দিরের পেছনে বড়সড একটা চাঁদ সবে উঠেছে। এমন সময হৈ-চৈ করে ওরা ফিরল।

রূপাই সবাইকে ডেকে এনেছিল চা খেতে। দশরথ চেয়ার দিয়ে গেল কয়েকটা। প্রথমে ওরা আমাকে দেখতে পায় নি। ছায়ার মধ্যে ভূতের মতো বসে আছি আবিষ্কার করে রূপাই চমকে গিয়েছিল। সাড়া পেলে ওদের মধ্যে ভীষণ হাসাহাসি পড়ে গেল।

তারপর রূপাই বলল, নিরুদা, তুমি বড্ড একালষেঁড়ে বরাবর। ইশ্! কী দারুণ ব্যাপার না মিস করলে!

পারমিতা বলল, রিয়্যাল ভালুক নিরুদা! মহুয়াগাছে সত্যিকার ভালুক দেখলাম জানো?

ঈশিতা বলল, মাত্র একটুখানি ডিস্ট্যান্স। আমার যা ভয় করছিল!

ওরা কিছুক্ষণ মহুয়া গাছের ভালুক নিয়ে বকবক করল। আমি রঞ্জনার দিকে লক্ষ্য রেখেছিলাম। রঞ্জনা কোনো কথা বলছিল না। সে লালচে রঙের চাঁদটার দিকে তাকিয়ে ছিল।

একটু কেসে বললাম, রঞ্জনা কি সেই ভালুকটাকে চাঁদে চড়তে দেখছেন?

রঞ্জনা ঘুরে দাঁড়াল। অপরিচ্ছন্ন জ্যোৎস্নায় ওর দাঁত ঝিকমিক করছিল। বলল, না—লুনাটিকদের সঙ্গে চাঁদের সম্পর্কের কথা ভাবছিলাম। লুনা মানে চাঁদ—তা থেকে লুনাটিক। কিন্তু কেন? চাঁদ দেখলে কি সত্যি মানুষ পাগল হয়?

পারমিতা খাপ্পা হয়ে বলল, ফের পণ্ডিতী? তোমায় একঘরে করব বলে দিচ্ছি। জানো নিরুদা, সারাক্ষণ শুধু পণ্ডিতী ফলিয়ে কান ঝালাপালা করে দিয়েছে রুনু।

বললাম, সে কী! উনি তো খুব কম কথা বলেন দেখেছি।

রঞ্জনা চেয়ারে বসে শরীর এলিয়ে বলল, কোনো-কোনো সময আমার ভীষণ মুখ খুলে যায়। মাস্টারি করা অভ্যাস যে।

পারমিতা আমায় নিয়ে পড়ল। তুমি কোথায় ছিলে বলো তো নিরুদা? তুমি গেলে অসাধারণ জমত।

ঈশিতা হাসতে হাসতে বলল, ভালুকটা দেখার সময় আমরা সত্যি একজন গার্জেনের অভাব ফিল করেছিলাম। ড্রাইভার গণেশজীকে দিয়ে গার্জেনগিরি চলে না। বলে কী, ভালু আছে তো কী হইয়াছে? ভালু আছে পাহাড়ে, আমরা আছে নিচে! ঘাবড়াও মাৎ, কুছু ডর নাই।

ড্রাইভারের কথা নকল করায় আবার একদফা হাসাহাসি চলতে থাকল।

বেতের টেবিল রেখে গেল দশরথ। রঘুয়া ট্রে-ভর্তি চা আর চানাচুর আনল। দশরথ এসে বলল, বোলেন—আর কুছু দরকার আছে। না থাকলে হামি এখন চলে যাবে। রঘুয়াকে মাইজি বাজারে পাঠাবেন।

ওকে জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাবে দশরথ? বাড়ি বুঝি?

দশরথ বলল, জী না বাবুদাদা! বাবুজীর ফারমে যাব। ভুট্টার ক্ষেতি আছে। মাচানে উঠব। বন্দুক লিযে বৈঠে থাকব চৌপররাত। জংলি জানোয়ার খেদাব।

উঠে দাঁড়ালাম সঙ্গে সঙ্গে। ও দশরথ, আমার যেতে ইচ্ছে করছে!

রূপাই তেড়ে এল। .... তোমার মাথা খারাপ নিরুদা? দাশুদার সঙ্গে পাঁচমাইল হাঁটতে পারবে রাতের বেলা? বাবার ফার্ম মানে তো জঙ্গল! দিনে গিয়ে একবার দেখে এসো না অবস্থাটা!

দশরথ একটু দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেল। বললাম, দারুণ অ্যাডভেঞ্চার কিন্তু।

রূপাই আঙুল দেখিয়ে বলল, এমন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মশার কামড় খেতে পারবে? দাশুদা গায়ে কেরোসিন মেখে যায়। তুমি কেরোসিন মাখতে পারবে গায়ে?

রঞ্জনা বলল, কেন, ওডোমস জাতীয় কোনো ক্রীম মাখলেই প্রব্লেম সলভ্‌ড্।

নড়ে বসলাম। .... ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়া। কালই যোগাড় করে ফেলব।

রঞ্জনা একই সুরে বলল, আমারও ইচ্ছে করছে যেতে।

রূপাইরা আবার হেসে উঠল। ঈশিতা বলল, রুণুদি দশরথকে রাতারাতি পণ্ডিত বানিয়ে ফেলবেন। বুঝলি রূপাই?

একটু পরে আমার বিরক্তি ধরে যাচ্ছিল। মেয়েরা এলোমেলো এতসব কথা বলতে পারে, ভাবা যায় না। চা খাওয়া শেষ হলে ইতি ও তিতি ট্রে-ভর্তি কাপগুলো নিয়ে চলে গেল। ঈশিতা আসি—কাল ফের দেখা হবে বলে তাদের বাড়ি গেল। পারমিতা আর রঞ্জনা পাশাপাশি বসে ছিল। পারমিতা বলল, ওঠ রুনু!

রঞ্জনা বলল, একটু বসি।

তাহলে তুমি পরে এস। রূপাই, ওকে পৌঁছে দিবি। আমার বড্ড গা ঘিনঘিন করছে। যা ধুলো মেখেছি সারাপথ! বলে পারমিতা চলে গেল।

রূপাই দাঁড়িয়ে ছিল। বলল, কী রুনুদি, হঠাৎ অমন চুপচাপ হয়ে গেলে যে?

রঞ্জনা বলল, নাঃ! ক্লান্তি।

মামীমা ডাকছিলেন রূপাইকে। রূপাই দৌড়ে বাড়ি ঢুকলে বললাম, কেমন লাগছে নওলপাহাড়ী?

রঞ্জনা শরীরকে চেয়ারে আরও এলিয়ে দিল। মুখটা উঁচু হয়ে রইল তার। দু'চোখে জ্যোৎস্না ঝকমক করতে থাকল। বলল, ঠিক বুঝতে পারছি না।

সে কী! কেন?

একথার জবাব না দিয়ে রঞ্জনা ঠোঁটের ফাঁকে আলতোভাবে বলল, আপনি কোথায় ঘুরলেন?

গঙ্গার ধারে।

ওদিকটা খুব সুন্দর তাই না?

দারুন। চর, বালিয়াড়ি, কাশবন তারপর জল। বুনোহাঁসের ঝাঁক।

ওসব দেখে আপনি আনন্দ পান?

একটু চমকে উঠে বললাম, কেন?

আপনার মনে হয় না এসব ব্যাপার বড্ড বেশি পুরনো হয়ে গেছে?

একটু চুপ করে থাকার পর বললাম, কে জানে! পৃথিবীর পুরনো ব্যাপারগুলোই আমাকে বেশি টানে। ইচ্ছে করে..

আমাকে থামিয়ে রঞ্জনা একটু হাসল—সম্ভবত এটা আপনার রি-অ্যাকশান। সভ্যতার কাছে ধাক্কা খেলে এমন হয়। অবশ্য আমিও ধাক্কা খেয়েছি প্রচণ্ড।

হাসতে হাসতে বললাম, ওরা ঠিকই বলছিল আপনি পণ্ডিত মেয়ে।

রঞ্জনা যেন একটু ক্ষুব্ধ হল। ..... আসলে কী জানেন? সবাই চায় মেয়েরা আবোল-তাবোল বকবক করবে। খালি হাসবে এবং হেসে নেতিয়ে পড়বে। অসহ্য!

সর্বনাশ! আপনি উইমেনস লিব করেন না তো?

থাকি পাড়াগাঁয়ের স্কুলে। তার ওপর সনাতন পন্থীদের আশ্রমের স্কুল। কেন এসব ভাবছেন? এগুলো তো নিছক সাধারণ কথা। রঞ্জনা সোজা হয়েছিল আবার চেয়ারে শরীর আগের মতো এলিয়ে রাখল। ফের বলল, নওলপাহাড়ীতে প্রকৃতি-টকৃতি দেখব বলে আসিনি। এসেছি নিছক বিশ্রাম নিতে। খেতে ঘুমুতে আর পৈ পৈ করে ঘুরে বেড়াতে।

হুঁ, জায়গাটা নাকি ভারি স্বাস্থ্যকর। জলহাওয়া ভাল। যদিও বাঙালীদের চেঞ্জের লিস্টে কখনও নওলপাহাড়ীর নাম দেখিনি।

আমার, পরিহাসের জবাবে রঞ্জনা কিছু বলল না। মুখ চিতিয়ে হয়তো চাঁদ দেখতে থাকল। সন্ধ্যা থেকে একটা জোরালো নাতিশীতোষ্ণ হাওয়া বইছিল। এখন হাওয়াটা আর নেই। কিন্তু একটু-একটু

শীত করছে। শীতটা আরামদায়ক। মাঠে আর গাছপালায় কুয়াশার পাতলা চাদর জড়ানো। শিবমন্দিরের দিকে ঘুমঘুম গলায় কী একটা পাখি বারকতক ডেকে চুপ করল।

জ্যোৎস্নায় শরীর এলিয়ে রাখা নারীর মধ্যে ভয়ংকর সৌন্দর্য আছে—এই প্রথম তা চাক্ষুষ করছিলাম। তারপর মনে মনে চমকে উঠলাম। আমি কি রঞ্জনার প্রেমে পড়ে যাচ্ছি? একটু অন্য ধবনের মেয়ে দেখলেই তার প্রেমে পড়াটা ভারি বিপজ্জনক নিজের মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে।

সিগারেট ধরানোর পর কানে এল রঞ্জনা গুনগুন করে কী গান গাইছে। গানের কথাগুলো কান করে বোঝার চেষ্টা করলুম। একবর্ণও বুঝলাম না। বললাম, একটু জোরে প্লীজ।

রঞ্জনা গান থামিয়ে দিল সঙ্গে সঙ্গে। ভ্যাট্! ও কিছু না! বলে সে সোজা হয়ে বসে দুর্বোধ্য কারণে শাড়ি গোছাতে ব্যস্ত হল। তারপর—আসি দেখা হবে, বলে হনহন করে চলে গেল।

ক্ষোভে আমার ভেতরটা গরগর করতে থাকল। মেয়েটার ভীষণ ডাঁট আছে বোঝা যাচ্ছে। সো হোয়াট? আমি রাগী চোখে মুখ ঘুরিয়ে চাঁদ দেখতে গেলাম। কিন্তু ওই চাঁদ রঞ্জনা দেখছিল—এঁটো চাঁদের দিকে তাকানো যায় না। ক্রমশ আমার রাগ বাড়তে থাকল। মনে হচ্ছিল, একটা সাংঘাতিক কিছু করে ফেলতে পারলে ভাল হত। কিন্তু কি করতে পারি— ভেতবে নিজেরই আরও খানিকটা রক্তঝরানো ছাড়া?

রূপাই এসে বলল, এ কী? রুনুদি কৈ?

ও তো চলে গেছে কখন।

রূপাই রঞ্জনার চেয়ারটাতে বসে বলল, ভদ্রমহিলা বদ্ধ পাগল জানো নিরুদা?

কেন?

রূপাই ব্যাখ্যা করতে না পেরে হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গিতে বলল, কেমন যেন। সব কিছুতে কেমন একটা উল্টোপাল্টা স্বভাব। ঠিক বোঝাতে পারব না। তুমি লক্ষ্য করলেই টের পাবে।

মিতার সঙ্গে ওর চেনাজানা কি করে হল, জানিস রূপাই?

রূপাই একটু বিরক্তভাবে বলল, কে জানে! মিতুদি বলছিল, ওর ক্লাসফ্রেণ্ড ছিল।

তাহলে নিশ্চয় কলকাতার মেয়ে?

রূপাই অবাক হল। মুখ তুলে তাকিয়ে থাকার পর বলল, এ মা! এত যে গল্প করছ, জিজ্ঞেস করোনি?

নাঃ। কারুর পার্শোনাল ব্যাপারে আমার নাক গলানো স্বভাব নয়।

রূপাই হাসল। এই যে গলাচ্ছ তাহলে?

মোটেও না। সিগারেটে কয়েকটা টান দিয়ে ধোঁয়ার ভেতর থেকে বললাম, ছেড়ে দে।

রূপাই হঠাৎ একটু ঝুঁকে গলা চেপে বলল, রুনুদির সঙ্গে বেশি মিশো না কিন্তু। মিতুদির মুখ ফসকে আজ বেরিয়ে গেছে, রুনুদির বিয়ে হয়েছিল। ওঁর স্বামী ভদ্রলোক ওঁকে ডিভোর্স করেছে। আমার ধারণা, তাই পাড়াগাঁয়ের স্কুলে কুমারী সেজে চাকরি করছে। কী ডেঞ্জারাস মহিলা দেখ তাহলে!

আস্তে বললাম, তাই বুঝি? তারপর আমার হাসি পেল রূপাইয়ের সিদ্ধান্তে। ডিভোর্স ব্যাপারটা মফস্বলের মেয়েদের কাছে এখনও সাংঘাতিক ঘটনা। রূপাই ধরে নিয়েছে, রঞ্জনা কুমারীব ছদ্মবেশে আছে। আমি হাসতে লাগলাম।

রূপাই বলল, হাসছ যে নিরুদা?

রূপাই, অন্যের সম্পর্কে খামোকা খারাপ ধারণা করতে নেই।

রূপাই কী বলতে যাচ্ছিল, মামীমা আবার তাকে ডাকলেন। সে রাগতস্বরে 'ধ্যাব্বা' বলে চলে গেল।

একা বসে রঞ্জনার কথা ভাবতে থাকলাম। রূপাই যা বলল, সত্যি হলেও আমার কি এসে যায়? কিন্তু অবাক লাগছে, রঞ্জনাকে দেখে একটুও টের পাইনি কিছু। এখন মনে হচ্ছে, এই ছন্দপতনের কারণ হয়তো ওর জেদ আর খেয়ালিপনা।

ছয়

আজ গোটা দিনটা গন্ধমামার ফার্মে কাটিয়েছি। কয়েকটা জঙ্গুলে টিলার মধ্যিখানে দেড়শো একর জমি। ভুট্টা, গম, যব, আখ এসবের চাষবাস হচ্ছে। একটা পুকুরে মারকিন রুইমাছ ভর্তি। ছিপ দিয়েছিল দশরথ। এক ঘণ্টার মধ্যে চারটে মাছ ধরলাম। পুকুরের একপাড়ে আছে ছোট্ট একটা আদিবাসী গ্রাম। ঝাঁকড়াপালি নাম। গন্ধমামা বললেন,পালি কথাটা আসলে পল্লী। লোকগুলোর স্বাস্থ্য হয়তো ভাল না—কিন্তু গড়ন দেখছ তো? ভাল খেতে পরতে পেলে একেকজন তাগড়াই জোয়ান হয়ে উঠবে। কিন্তু বড্ড কুঁড়ে। ক্ষেতে কাজ করতে করতে খরগোস দেখতে পেলে সে-বেলার মতো তার পেছনে লেগে যাবে। শিকার পেলে আর কিছু চায় না। কিন্তু আর কোথায় তত শিকার? সব উজাড় করে ফেলেছে।

গন্ধমামা একটা টিলার জঙ্গলে দেখিয়ে বললেন, ওখানে এখনও একজোড়া শম্বর হরিণ আছে শুনেছি। লোহাগড়ার জঙ্গল থেকে পালিয়ে এসেছে। লোহাগড়া রিজার্ভ ফরেস্টে তোমাকে নিয়ে যাব একদিন।

ফার্মের লোকগুলো সারাক্ষণ ব্যস্ত। দশরথ ছুটি পেয়েছিল আমার খাতিরে। আমাকে সমস্ত এলাকা ঘুরে ঘুরে দেখাল। দেখার মতো কিছু না। ভুট্টার ঘন ঝাড়ের ভেতর সরু রাস্তায় যথেষ্ট পাঁক ছিল। জুতো আর প্যান্টে কাদা লেগে গেল।

গঙ্গা থেকে একটা ক্যানেল এসেছে এঁকেবেঁকে এতদূরে। ক্যানেলে আদিবাসী মেয়েরা স্নান করছে। কাপড় কাচছে। ড্রাইভার গণেশজীকে দেখলাম ওদের দেবতার থানে বিশাল আমগাছের তলায় চুপচাপ বসে আছে একা। দশরথ ফিক্ করে হেসে বলল, গণেশজী কেন বসে আছে বোলেন তো বাবুদাদা? বহুৎ হারামী।

সে কেন বসে আছে, খুঁজে পেলাম না। তখন দশরথ বলল, গণেশজী এক অঠান্নি দেবে ঠাকুরবাবার থানে, ঔর এক অঠান্নি হাতে লিয়ে বসে থাকবে মালতীর জন্যে। মালতীকে আপনি চেনেন না তো? ঠিক আছে। চিনহিয়ে দেব। বনোয়ারীজীর লেড়কি রঙ্গিয়ার মতো হারামী! ভুট্টা-উট্টা বহুৎ চুরি কোরে মালতী। ধরা পড়ে। শরম নাই।

মালতীকে দেখে কিন্তু হতাশ হলাম। মধ্যবয়সী, দেখতে-তেমন কিছু না একটি মেয়ে। দশরথের সঙ্গে মস্করা করে ক্যানেল নামল। গণেশজী আমতলার থানে একটা পাথরে বসে সিগারেট টানছিল প্রেমসে।

একতলা কয়েকটা ঘর টিলার নিচে। খোয়াছড়ানো একটা রাস্তা ওখান থেকে এগিয়ে গেছে ক্যানেলের ব্রিজ পেরিয়ে বড় রাস্তায়। এই ঘরগুলো গন্ধমামার ফার্মহাউস। পশ্চিমের জানালা দিয়ে পুরো একটা ন্যাড়া পাহাড় দেখা যাচ্ছিল। ঢেউ-খেলানো রুক্ষ প্রান্তর তার পেছনে। ফার্মহাউসের সামনের জমিটায় ফুলের বাগান। দুপুরে খাওয়ার সময় বললাম, আমি বরং ফার্মেই থাকব।

গন্ধমামা হাসলেন। .... একঘেয়ে লাগবে দুদিনেই। শহরের ছেলে তোমরা। এত বেশী প্রিমিটিভ লাইফে হাঁপিয়ে উঠবে।

বললাম, কোথায় প্রিমিটিভ? এই তো ইলেকট্রিসিটি রয়েছে।

গন্ধমামা শেষে সায় দিয়ে বললেন, বেশ তো, থাকবে।

দশরথ আমাকে দক্ষিণ ক্যানেলের ওপারে বড় রাস্তায় নিয়ে গেল। সুন্দর পিচঢালা হাইওয়ে। দুধারে বিশাল বিশাল গাছ। কিছুদূর এগিয়ে ওপাশে জঙ্গুলে টিলার দিকে চললাম আমরা। দশরথ বলল, পাতালকালীর মন্দিরে যাচ্ছি বাবুদাদা। ভেতরে এখন ঢুকব না। আলো কমে গেছে। বহুৎ আধার হবে ভেতরে।

টিলার নীচে একটা গুহা দেখতে পেলাম। ভেতরে অন্ধকার থমথম করছে। জনমানুষ নেই। দশরথ পাতালকালীর অলৌকিক গল্প শোনাচ্ছিল। আমি অন্যকথা ভাবছিলাম। এই যে সারাদিন ঘুরে বেড়াচ্ছি, চারপাশে সবুজ সজীব গাছপালা, প্রকৃতির অভ্যন্তরে এই ভ্রমণ, অথচ বারবার কোনো এক নারীর জন্য সারাক্ষণ পিছুটান। সে কি রঞ্জনা? নাকি রঞ্জনার মতো কেউ?

একটা ব্যর্থতাবোধ আমাকে চিমটি কাটছিল। নওলপাহাড়ী আসার সময় আমি ছিলাম অন্য এক নিরুপম। এখন যেন অনেকটা বদলে গেছি। আসলে ভিড়ের বাইরে অনেকটা দূরে নির্জনে এলে হয়তো

এমন একটা মৌলিক চেতনার সঞ্চার হয়।

গুহার মুখে লতার ঝালরগুলো ছিঁড়ে সাফ করছিল দশরথ। বলল, চোত মাসের শেষে পূজো হবে পাতালকালীর। বছর-কাল ঐ এক দফা। তারপর এরকম সুনান পড়ে থাকবে। কাহে—কী, কালী মাই নরবলি খায়।

বলে কী দশরথ?

জী হাঁ। মামাজীকে পুঁছবেন। সব বাতলাবেন উনহি।

সে গড় করে উঠল। একটু পরে আমরা হাইওয়েতে ফিরে এলাম। বেলা পড়ে এসেছে। এই দিনশেষে আমার সবকিছু উদ্দেশ্যহীন লাগছিল। বড় বড় পাথরের ফাঁকে বুনো ফুলের একরাশ খুশি দেখে আর চমক জাগছিল না। খালি মনে হচ্ছিল, আমি কী বিশ্রীভাবে একা এবং নিষ্কর্মা!

নওলপাহাড়ী ফিরতে সন্ধ্যা হয়েছিল। রূপাইরা আজ দলবেঁধে গঙ্গার ধারে বেড়াতে গেছে শুনলাম। মামীমা উদ্বিগ্ন মুখে বললেন, দিনকাল ভাল নয়। নওলপাহাড়ী আর আগের মতো হয়ে নেই। ওদের বুদ্ধিসুদ্ধি আছে? রঘুয়াকে পাঠিয়েছি। সেও এখনও ফিরল না।

বললাম, আমি যাই মামীমা।

দাশুকে সঙ্গে নিয়ে যাও। দেখ তো ওরা কোথায় ঘুরছে।

দশরথ থাক। ওকে আবার এখনই ফার্মে ছুটতে হবে। আমি দেখছি।

প্রথমে গেলাম বাজারের দিকে স্টিমারঘাটে। জেটির দিকটা খুঁজলাম। তারপর বাজার ছাড়িয়ে গঙ্গার ধারে বড় রাস্তায় এগিয়ে গেলাম। এদিকটায় আলো নেই। ডাইনে গঙ্গার বিস্তার। ঘন কুয়াশার ভেতর কোথাও একটু আলো জ্বলজ্বল করছে। নিশ্চয়ই নৌকোর আলো। একটা ট্রাক আসছিল সামনে থেকে। তার তীব্র আলোয় দলটাকে দেখতে পেলাম হল্লা করে ফিরে আসছে।

ওরা দাঁড়িয়ে গেল। অন্ধকারে মেয়েদের দলবেঁধে হাসি কখনও শুনিনি। এই প্রথম শুনলাম। মনে হল আজ সারাদিন ঝাঁকড়াপালির ফার্মে শস্যের ক্ষেত, জল, সবুজ সজীব উদ্ভিদ, পাথর কিংবা নরবলি খাওয়া পাতালকালীর গুহা যা দিতে পারেনি, এই হাসি তাই দিল।

বেচারা রঘুয়াকে ওরা ভাগিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া নৌকো ভাড়া করে একটা চরে গিয়েছিল। চরে প্রচুর হাঁস ছিল। হাঁসগুলোর সঙ্গে ওরা বন্ধুত্ব করার চেষ্টা করেছে। এইসব শোনার পর আমার আক্ষেপ জাগছিল। অন্ধকারে আসতে আসতে ফার্মের গল্প করছিলাম বেশ খানিকটা ফেনিয়েই। হঠাৎ হাতে কোমল-কিছুর সুড়সুড়ি লাগল। চমকে উঠতেই রঞ্জনার হাসি শুনলাম পাশে।

তখনও ব্যাপারটা বুঝিনি। চলতে চলতে আরও কয়েকবার সুড়সুড়ি খেয়ে খপ করে ধরে ফেললাম জিনিসটা—হাতসুদ্ধ। রঞ্জনা আস্তে বলল, হাঁসের পালক!

হাত ছেড়ে দিলুম। রূপাই, পারমিতা, ঈশিতা হেসে গড়িয়ে পড়ল। রঞ্জনার উদ্দেশে বললাম, তাহলে স্বীকার করছেন হাঁসের পালক-টালক পুরনো ব্যাপার নয়—কুড়িয়ে এখনও আনন্দ পাওয়া যায়?

রঞ্জনা বলল, বারে! জানেন না, স্কুলে দিদিমণিদের ওয়ার্ক এড়ুকেশান করাতে হয়? পালকগুলো কাজে লাগবে।

সঙ্গে নিয়ে যাবেন তাহলে?

নিশ্চয়।

রাস্তার মোড়ে আলোয় এসে হঠাৎ নিজের ডানহাতটার দিকে তাকালাম — যে হাতে রঞ্জনার হাত ধরেছিলাম। এ এক আশ্চর্য অনুভূতি! মনে হচ্ছিল এখনও হাতটা হাতে ধরা আছে।

সাত

কাল রাতে খাওয়ার পর বাগানে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছি, তখন পুবের মাঠে শুকনো চাঁদটাকে দেখা গেল। হয়তো আমার চোখের ভুল। হতাশাব্যঞ্জক তার ফিকে হলুদ আলো। ঘুম-ঘুম স্বরে মন্দিরের অন্ধকারে সেই রাতপাখিটা ডাকছিল। মামীমা হৃদয়েশ্বরীর সাড়া পেয়ে সিগারেটটা লুকিয়ে ফেললুম। .... এদিকটায় সন্ধ্যা হতে না হতে নিশুতি হয়ে যায়। মামীমা বললেন, আজকাল আর আগের মতো তো নেই। মাঝে-মাঝে ডাকাতি লেগেই আছে। তোমার মামা কোনো-কোনো রাতে ফার্মে থাকেন।

তখন সত্যি বলতে কী, আমার সারারাত একটুও ঘুম হয় না।

মামীমা নিজের ভয়ের কথা বলতে নিজেই হেসে ফেললেন। বললুম, বসুন মামীমা। চেয়ার নিয়ে আসি।

থাক! বলে মামীমা নিচু পাঁচিলের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ..... তবে নওলপাহাড়ীর উন্নতিও হয়েছে অনেক। যখন এ বাড়ির বউ হয়ে এলুম, তখন ওই যে জায়গাগুলো দেখছ, ঘন জঙ্গল আর জঙ্গল। শীতের সময়টা সারারাত বাঘ ডেকে বেড়াত। শ্বশুরমশাই সাড়া দিয়ে বলতেন, ভাগ্ ভাগ নলিনীর বাড়ি যা। যেন ওঁর কথা শুনে বাঘ সত্যি নলিনীবাবুর বাড়ি যাবে। মামীমা আরেক চোট হেসে বললেন, ঈশিতার ঠাকুর্দা। বুঝলে নিরু? উনিও ডাক্তার ছিলেন। তবে পাশ করা নয়। কিন্তু তাতে কী হয়েছে? খুব নামডাক ছিল এ তল্লাটে। তাছাড়া তখন বিহার প্রভিন্সে বাঙালীদের রমরমাও প্রচণ্ড।

মামীমা, নওলপাহাড়ীতে নাকি ভীষণ ভূত? রূপাই বলে ....

মামীমা ঘুরে চাপা গলায় বললেন, তাও ছিল। একবার তোমার মামা গঙ্গার চরে খানিকটা জমি কিনেছিলেন। কিন্তু সে জমি বেচে দিতে হল শেষ পর্যন্ত। যা অত্যাচার!

ভূতের?

মামীমা ছমছমে কণ্ঠস্বরে বললেন, সে বলব'খন। তারপর এগিয়ে এসে আমার মুখোমুখি দাঁড়ালেন। দুই ভুলে মুখের কাছে হাত রেখে কী যেন জড়িয়ে-মড়িয়ে আওড়ালেন। হয়তো ভূত তাড়ানো মন্ত্র। তারপর আস্তে বললেন, আচ্ছা নিরু, একটা কথা বলতে এলুম তোমায়।

একটু অবাক হয়ে বললুম, বলুন। কিন্তু আমার হৃদপিণ্ডে এক সেকেণ্ডের জন্য রক্ত ছলকে উঠল।

মামীমা শান্তভাবে বললেন, ঈশিতাকে তো তুমি দেখছ। মেয়েটিকে কেমন লাগে?

কেন, ভালই তো লাগে।

হুঁ। দেখতে শুনতে ভাল। স্বাস্থ্যবতী। মামীমা ষড়যন্ত্রসংকুল স্বরে বললেন। .... ভারি মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে। সেই এতটুকু থেকে দেখছি তো। বি এস সি পাশ করেছে। ওর বাবার ইচ্ছে ছিল মেডিকেল পড়াবে। কিন্তু হয়ে ওঠেনি নানা কারণে, মোটে তো ওই একটি সন্তান। বাবা-মা ওকে ছেড়ে থাকতে পারে কি? বলো তুমি!

ঈশিতাকে ডাক্তার মানাত না। হাসতে হাসতে বললুম। সুন্দরী মহিলা ডাক্তার নেই তা নয়। কিন্তু ঈশিতা ব্যাং দেখেই ভয় পায়।

মামীমা আমার হাসিতে যোগ দিলেন। তারপর বললেন, তোমার মামা তোমায় বলবেন। পরশু ঈশিতার বাবা সুধাকরবাবু তোমার মামার কাছে খুঁটিয়ে জানতে চাইছিলেন। কাল ওকে আসল কথাটা বলেছেন।

আসল কথাটা কী মামীমা?

মামীমা একথায় কান না করে গলায় একটু দৃঢ়তা এনে বললেন, জীবনটা নিয়ে আর ছিনিমিনি খেলো না নিরু! যা হবার হয়ে গেছে, নতুন করে শুরু করো। কিসের অভাব তোমার? বাবা মার দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছ। তাছাড়া তোমার ভবিষ্যৎ ভালমন্দের দায়িত্ব এখন আমরা নিয়েছি। ঈশিতাকে বিয়ে করলে ওদের সবকিছু তোমার হয়ে গেল। খাওয়া পরার ভাবনা তো তুচ্ছ কথা, ইচ্ছে করলে গাড়ি হাঁকিয়ে বেড়াতে পারবে।

পূবের মাঠের সেই স্থবির চাঁদ ঠুক ঠুক করে হেঁটে এখন মন্দিরের মাথায় এসেছে। তার দিকে তাকিয়ে একটা অসম্ভব শাদা মোটরগাড়ি দেখতে পাচ্ছিলুম। মোটরগাড়িটা যে রাস্তায় ছুটে চলেছে, সেটা সম্ভবত বোম্বে রোড।

মামীমার স্বভাব এরকম। শান্ত, চঞ্চল, অমায়িক—আবার হঠাৎ লোহার মতো ভারি, কিংবা বিদ্যুতের মতো ঝকমকে। .... এ দেহাতী মুল্লুকের প্রবাদ : 'কাচা কাপড় আর যাচা কনে। যেযে ঠেলে সে বড় উচ্ছন্নে।' নিরু, ভগবান যা করেন, ভালর জন্যেই করেন। সেই কবে ছেলেবেলায় একবার এসেছিলে, এতকাল পরে জোয়ান ছেলেটি হয়ে এসেছ। এ আসার মধ্যে ভগবানের লীলা আছে বৈকি। শুনেছি, অত কাণ্ডের পর জব্বলপুরে তোমার দিদি জামাইবাবু তোমার যাবার জন্যে মাথা ভেঙেছিলেন, তুমি

যাওনি। তোমার মামা কলকাতা যাওয়া মাত্র তাঁর সঙ্গে তুমি চলে এলে। বলো তাহলে?

আমার পেটে যেখানে ড্যাগারের দাগ দড়কচা মেরে আছে লম্বালম্বি সেলাইয়ের ওপর, সেখানে এতদিন পরে অস্পষ্ট একটু ব্যথা টের পেলুম। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য। ব্যথাটা চলে গেলে রক্ত গরম হয়ে উঠল যেন। আমার শরীরের সব রক্ত আমার নয়, মনে পড়লেই এরকম হয় দেখেছি। বিখ্যাত এক প্রাইভেট নার্সিং হোম থেকে গোপনে চারশো টাকা বোতল দরে রক্ত কিনতে গিয়েছিলেন জামাইবাবু। পিছিয়ে এসেছিলেন। এদিকে অতনু, আলাপন, মৃগাংক তখন মাথা ভাঙছে ডাক্তারের কাছে। আমাদের ব্লাডগ্রূপটা দেখুন দয়া করে। আশ্চর্য, আলাপন আর মৃগাংকের ব্লাডগ্রুপ মিলে গেল আমার সঙ্গে। আমার শরীরে তাদের রক্ত। তাই কি হঠাৎ হঠাৎ এমন এমন উত্তেজনা, পৃথিবী ঝাপসা করে দেওয়া হঠকারী ক্রোধ এসে ফেটে পড়ে? অনেক কষ্টে নিজেকে শান্ত করি। বলি, তবু পৃথিবীতে এখনও ভাল জিনিসগুলো আছে। আছে নারীর ভালবাসা আর সৌন্দর্য। এবং প্রকৃতি এখনও দুঃখভোলানো অজস্র খেলনা ছড়িয়ে রেখেছেন জীবনের চারপাশে। নিরুপম, তুমি সুখে থাকার চেষ্টা করো।

ঘুম-ঘুম সুরে মন্দিরের রাতপাখি আবার ডাকল। বড় করে একটা শ্বাস ফেললুম! .... মামীমা! আমার ....

মামীমা আস্তে বললেন, রূপাইরা ওবেলা জঙ্গলে বেড়াতে গিয়েছিল। তখন রূপাই ঈশিতাকে আড়ালে ডেকে কৌশলে কথাটা তুলেছিল। রূপাই বললে, নিরুদাকে ওর পছন্দ। ডিরেক্টলি কিছু না বললেও হাব-ভাবে আঁচ করেছে।

হাসবার চেষ্টা করে বললুম, ঈশিতার আমায় পছন্দ?

মামীমা জোরালো ভঙ্গীতে বললেন, হবে না? তোমার মতো এমন স্বাস্থ্য চেহারা ক'জন ছেলেব আছে এখানে?

যাঃ! কী যে বলেন আপনি! জামা খুলে সামনে দাঁড়ালেই ..

মামীমা ধমক দিলেন। .... চুপ করো তো বাপু!

মামীমা, আমার কিন্তু ঈশিতাকে মোটেও পছন্দ নয়।

মামীমা হালকা ধূসর হয়ে ওঠা জ্যোৎস্নায় আমাব চোখের দিকে কটমটিয়ে চেয়ে বললেন, কী বলছ নিরু? ঈশিতার মতো নাক মুখের গড়ন, অমন চোখ, ক'টা মেয়েব তোমাদের কলকাতায় আছে? নেহাত দেহাতী মুল্লুকে পড়ে আছে তাই। এখানকার রোদ বাতাস একটু কড়া বলেই না? এই যে আমায় দেখছ, বহরমপুরের মেয়ে আমি। গায়ের যে রঙ সঙ্গে করে এখানে এসেছিলুম, তা কি আছে? সব হাওয়া-বাতাসের ব্যাপার। কলকাতা একটা বদ্ধ জায়গা। সব সময় ছায়ার মধ্যে থাকে মানুষ। তো ...

গন্ধমামার সাড়া পেয়ে চুপ করলেন। গন্ধমামা ডাকছিলেন। .. খোলামেলায় রাত্তিরে কতক্ষণ থাকবে নিরু? ঠাণ্ডা লেগে অসুখ হবে যে। ঘরে এস না তোমরা।

একটু শীত-শীত করছিল বটে। এ এক অদ্ভুত আবহাওয়া। দিনের বেলাটা বেশ ঝমকালো গরম। রাত্তিরে তেমনি ঠাণ্ডা। শেষ রাতের দিকে এখনও কম্বল টানতে হয় গায়ে। মামীমা বললেন, শুয়ে পড়ো গে।

বিছানায় শুয়ে ঈশিতার কথা ভাবতে থাকলুম। কিন্তু যতবার তাকে সামনে দাঁড় করাই ভাল করে দেখব বলে, রঞ্জনাকে দেখতে পাই। তারপরই আমার ডান হাতটা শিউরে ওঠে। টের পাই, এই হাত দিয়ে রঞ্জনার হাতটা শক্ত করে ধরে আছি। ...

আট

সকালে বিছানায় বসে বাসিমুখে চা খাওয়া এখন আমার সবচেয়ে সুখের ব্যাপার। রাতে শুয়ে পড়ার সময় এ-কথাটা ভাবলে কী যে আনন্দ হয়। রূপাই মশারি তুলে চায়ের কাপটা রেখে যায়। দেয়ালের দিকে সরে গিয়ে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে চা খাই এবং তার সঙ্গে সিগারেট টানি। আশ্চর্য স্তব্ধতা, পরিচ্ছন্ন রোদ এবং জানালার পাশে ছোট্ট আমগাছটার জোরালো মুকুলের গন্ধ চিরে কোথায় একটা কোকিল চেঁচিয়ে ওঠে। কবিতার লাইনের মতো মনে ভেসে ওঠে একটা বাক্য :

'এখন বসন্তকাল'।

রঞ্জনা ঘরে ঢুকে বলল, রূপাই বলছিল আপনি বাসিমুখে চা খান!

হঠাৎ তাকে দেখে একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলুম। প্রথমে যে কথাটা মাথায় এল, তা হল ঃ কাল রাতে আপনাকে দেখে দেখে ক্লান্ত। কিন্তু তা কি বলা যায়? পা দুটো গুটিয়ে ভদ্রভাবে বসলুম। রঞ্জনা পেছন ঘুরে চেয়ার দেখে নিয়ে বসল। গলা চড়িয়ে ডাকলুম, রূপাই! ঘরে গেস্ট্।

রঞ্জনা হাত তুলে বলল, চা খেয়ে আসছি। এতক্ষণ গল্প করছিলুম ভেতরে। তারপর সে আমার পায়ের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসল। .... আপনি কি কলকাতায় চাযবাস করেন?

কেন বলুন তো?

ছেলেদের পা অমন ফাটে কেন? মিসট্রিয়াস! মেয়েদের চামড়া নরম। শীতে ফাটে।

নিজের পায়ে হাত বুলিয়ে এবং লক্ষ্য করতে করতে বললুম, স্কুলের দিদিমণির চোখ! সত্যি আমার এরকম হয়। এতকাল অবশ্য লক্ষ্য করিনি।

এক কাজ করবেন। স্নানের সময় ঘষার পর ক্রিম লাগাবেন। বলে রঞ্জনা স্লিপার থেকে নিজের একটা পা বের করে দেখাল। দেখলুম, ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন পায়ের গোড়ালি এবং পাতা। এক মুঠো পা। আমার হাতে নিতে ইচ্ছে করছিলো। বড় সুন্দর পা রঞ্জনার। নাকি সব মেয়েরই এরকম পা? আমি মেয়েদের পায়ের দিকে কখনও তাকাইনি। জীবনে কত কিছুর দিকে মানুষের তাকানো হয় না। যে বাড়িতে থেকেছি তার সিঁড়ির ধাপ গুণে দেখিনি। অথচ লোডশেডিংয়ের সময়ও অন্ধকারে নির্ভুল পদক্ষেপে উঠে যাই।

রঞ্জনা বলল, কতগুলো প্রাইমারি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা উচিত। যেমন ধরুন, বাসি মুখে চা না খেয়ে অনায়াসে ওই জলের গ্লাস থেকে কুলকুচি করে নিতে পারেন। পাশেই জানালা।

সর্বনাশ! তাতে চায়ের টেস্ট সম্পূর্ণ বদলে যাবে যে। আপনি কখনও বাসিমুখে চা খেয়ে দেখবেন।

আসার দিনে ট্রেনে ভোরবেলায় কী একটা স্টেশনে গাড়ি থামল। রঞ্জনা একটু হাসল। ভোরবেলা অজানা স্টেশনে ট্রেন থামার পর শুনতে পেলাম চায়' চায় গরম! দারুণ লাগে না? পারুরা কিন্তু গিলতে শুরু করল। আমি বাথরুমে গেলুম। তারপর চা ফা। ওসব আমার ঘেন্না করে।

আপনি টিপিকাল দিদিমণি তাহলে।

নাঃ। বরাবর এরকম। .... রঞ্জনা পায়ের কাছে শাড়ির পাড় অকারণ গুছিয়ে নিল মুখ নামিয়ে। তার গালের ওপর একগোছা চুল আছড়ে পড়ল ব্যাকুলতার মতো। কানের রিঙটা ঝলমল করল। তার হাল্কা গোলাপী ঈষৎ পুরু ঠোঁটের একপাশে কুঞ্চন ফুটে উঠল। আমাকে ভিখিরি করে ফেলল ওই রহস্যময় সৌন্দর্য - যেন বিলাস-প্রাসাদের ভেতর টুংটাং মাদকতাময় ধ্বনিপুঞ্জ, ঝাপসা কাচের জানালার ভেতর আপার্থিব কয়েকটা বাতি, আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি। রঞ্জনা মুখ তুলে সিধে হয়ে বসে বলল, পারু বলেছিল দারুণ জায়গা নওলপাহাড়ী। আমার হাঁফ ধরে যাচ্ছে, জানেন? কিন্তু একা ফিরে যেতেও দেবেন না মাসীমা। কী করি বলুন তো?

বুঝেছি, বৈচিত্র্য চান।

হুঁউ। রঞ্জনা ঠোঁট টিপে হাসল। আপনার মামার ফার্মে যাবেন না আজ?

কিছু ঠিক নেই। ... ওর ইচ্ছেটাকে আরও খুঁটিয়ে বোঝার জন্য বললাম একথা।

আপনার কী ঠিক আছে? বলে রঞ্জনা কেজো মানুষের ভঙ্গি করল। .... রূপাই আর পারু প্ল্যান করছে কাল—যখন গঙ্গার চরে যাচ্ছিলুম আমরা, তখন। সাইট সিলেকশান করতে পারছে না। পারু বলছে, যে চরে গেলুম, সেখানে। কিন্তু ঈশিতা বলছে, চরে নাকি বুনো শুয়োরের ভয় আছে। রূপাইয়ের ইচ্ছে, তাদের ফার্মে হোক। আপনি কী বলেন?

বুঝলুম না। কী ব্যাপার?

কপট মুখ ঝামটা দিয়ে রঞ্জনা ভুরু কুঁচকে হাসল। ভাট্! আপনি একেবারে কিছু বুঝতে পারেন না। পিকনিক।

~~খুব ভাল~~, খুবই ভাল। আমি নড়ে বসলুম। ... চরেই হোক। শুয়োরটুয়োর বাজে কথা। মামার বন্দুকটা নিয়ে যাব। মেম্বার কতজন?

ধরুন, সাত। কাচ্চাবাচ্চা এবং নৌকোর মাঝি সহ।

তিনটে হাঁসই যথেষ্ট। বলে তিনটে কল্পিত হাঁসের উদ্দেশ্যে ফায়ার করলুম। টাস্! ...টাস্! ....টাস্!

আপনি বন্দুক ছুঁড়তে পারেন নাকি?

কী পারি না? মানে আপনার ভাষায়। ... পোড়ো সিগারেটে ঠেকিয়ে আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে হেলান দিলুম। বাসিমুখে চায়ের পরই বাথরুমে যাওয়া অভ্যাস। অভ্যাস ঠেকিয়ে আরাম করে বসলুম। একই সুরে বললুম ফের, বন্দুক কেন? রাইফেল, পিস্তল, রিভলবার, স্টেনগান, মেশিনগান সব।

রঞ্জনার চোখে কৌতুক টলটল করছিল। বলল, ডাকাতদলে ছিলেন বুঝি?

আমার ভেতরটায় ঝাঁকুনি দিল বাক্যটা। হয়তো কয়েক সেকেণ্ডের জন্য চামড়ার রঙ রক্তশূন্য হয়ে গেল। টের পেলুম, আমার হাসিটুকুও মুছে গেছে। আস্তে বললুম, হঠাৎ ডাকাতের কথা আপনার কেন মাথায় এল বলুন তো?

রঞ্জনা আমার বৈলক্ষণ্যটুকু টের পেয়েছিল। দ্রুত একঝলক হাসি ছড়িয়ে বলল, জাস্ট জোক।

আমায় কি ডাকাতের মতো দেখায়? আর্মির কথা কেন ভাবলেন না?

আঃ ছাড়ুন তো। আপনি সবসময় বড্ড বেশী সিরিয়াস। ... রঞ্জনা তার হ্যাণ্ড-ব্যাগের ভেতর থেকে কাল সন্ধ্যার সেই হাঁসের পালকটা বের করল। দুষ্টু হেসে বলল, সাবধান।

কাল সন্ধ্যায় আমি ভীষণ চমকে উঠেছিলুম পালকটার সুড়সুড়ি খেয়ে, একথা ঠিক। রঞ্জনা ধরেই নিয়েছে তাহলে, পাখির পালকে আমার অ্যালার্জি আছে। কারুর-কারুর থাকে অবশ্য। আমি যে চমক খেয়ে ওর হাত ধরে ফেলেছিলুম। ... সেও অবশ্য ঠিক। এখন পালকটা বের করে যে ভঙ্গিতে সে শাসাল উত্তেজনাটুকু চলে গেল আমার। শান্তভাবে একটু হাসলাম। .... চরেই ভাল হবে। কোন চরটাতে, যদিও জানি না। যাই হোক, এনি চর।

রঞ্জনা ব্যাগে পালকটা ঢুকিয়ে চেন এঁটে বলল, আপনি চর সিলেক্ট করলেন, রূপাইও তাই। শুধু বইল ঈশিতা। এবার ঈশিতাকে আপনাকে ম্যানেজ করতে হবে—রূপাই বলল।

সে কী!

হ্যাঁ। রূপাই বলল, নিরুদা বললেই ও যাবে।

কেন? আমি বললে যাবে কেন?

ন্যাকামি ছাড়ুন তো। রঞ্জনা উঠে দাঁড়াল। সে দরজার দিকে পা বাড়াল।

ডাকলুম, রঞ্জনা! শুনুন!

সে ঘুরে বলল, বলুন?

কেন একথা বললেন?

আমি শুনেছি। বলে রঞ্জনা ভেতরে চলে গেল।

চুপচাপ বসে সিগারেট টানতে থাকলুম। একটু পরে মামীমা ঘরে ঢুকে বললেন, আর কতক্ষণ বিছানায় থাকবে নিরু? মুখটুখ ধোও গিয়ে। রূপাই লুচি ভাজতে বসেছে তোমার জন্য। গরম গরম খাবে চলো। তারপর বাইরে বাগানের দিকের দরজা খুলে উঁকি মেরে কী দেখে নিয়ে ফের দরজা বন্ধ করে দিলেন। চাপা গলায় বললেন, পারুর বন্ধু কী বলছিল অতক্ষণ ধরে? যাই বলো বাপু মেয়েটি কেমন যেন। আমার পছন্দ হয় না।

তারপর গলা আরও নামিয়ে বললেন, ডিভোর্সড মেয়ে। পারেও বাবা সব একালের মেয়েরা। আবার বড়মুখ করে ঘুরে বেড়ায়। স্কুলে মাস্টারিও করে। কেমন স্কুল কে জানে! এখানকার স্কুল হলে টেঁকা দায় হত। ...

নয়

নৌকোর মাঝির নাম হাজারু। আরা জেলার লোক। সে দূরের আরেকটা চর দেখিয়ে বলল, সেখানে তার জমি আছে একটু। ছোলা আর ভুট্টা দিয়েছে এ মরশুমে। চরে যাতায়াত করতে এই নৌকো তার দরকার হয়। এখন ছেলে, ছেলের বউ সেখানে কুঁড়ে ঘর বেঁধে বাস করছে। বাকি সময় সে নৌকো ভাড়া খাটিয়ে রোজগার করে।

আমরা যে চরে নেমেছি, সেটা মাইল তিনেক লম্বা, মাইলটাক চওড়া। এলাকার সবচেয়ে বড় চর। কিন্তু এখনও অনেকখানি বালিতেই ভর্তি। কাশবন, ছোট গাছের জঙ্গল আছে জায়গায়-জায়গায়। বালির ঢিবির পর ভুট্টা, আখের ক্ষেত। ক্ষেতের মধ্যে উঁচু মাচান দেখা যাচ্ছিল। ওদিকে কয়েকঘর বসতি আছে। মাল্লাসম্প্রদায়ের লোক তারা। চাষবাস করে, মাছও ধরে।

হাজারু হাতজোড় করে ক্ষমা চেয়ে নিল। দিদিরা তাকে বলছেন বটে, তার থাকার উপায় নেই। বিয়ের মরশুম লেগেছে। এক চরের বর অন্য চরে পৌঁছে দিতে হবে। তবে গঙ্গামাই কী কিরিয়া, সে ঠিক সূর্য ডোবার আগে হাজির হবে এখানে। শোচনেকা কৈ বাত নেহি।

রঞ্জনা বলল, তোমার আসার দরকার নেই। আমরা দেখবে এখানেই একটা কলোনি বানিয়ে ফেলব। ঈশিতা ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকাচ্ছিল। বলল, কাল পড়লুম ভালুকের পাল্লায়। আজ শুয়োরের পাল্লায় পড়া বরাতে আছে।

রঞ্জনা চোখে ঝিলিক তুলে বলল, সঙ্গে বীরপুরুষ এনেছি না? বন্দুক দেখতে পাচ্ছেন তো? তাকান! আহা, বন্দুকটার দিকে তাকাতে বলছি!

এই এক উপদ্রব আজ। ঈশিতা ও আমার মধ্যে হঠাৎ একটা দেয়াল এসে দাঁড়িয়েছে। সে মফস্বল—একেবারে এই দেহাতের মেয়ে, তার পক্ষে এ সংকোচ স্বাভাবিক। আমার কেন এমন বিশ্রী অবস্থা হবে? বেঁটে চ্যাপ্টা পাতাওয়ালা কয়েকটা গাছ আর ঘন ঘাসে ঢাকা একটুকরো মিনি উপত্যকার মতো জমি। তিনদিকেই উঁচু মাটি ও বালিয়াড়ি! দক্ষিণ দিকটা ঢালু হয়ে জলে নেমে গেছে। একঝাঁক হাঁস খেলা করছিল ওখানে। নৌকো দেখেই পালিয়ে গেছে দূরে! বড় সতরঞ্চি বিছিয়ে দিচ্ছিল পারমিতা। হাঁড়ি, থালা, একবোঝা লকড়ি, খাদ্যদ্রব্যও প্রচুর জমা হয়েছে! রূপাই বলল, আমার সঙ্গে কেউ মাল্লা বস্তিতে এস। ওদের কাছে মাছ পাওয়া যাবে।

বন্দুক দেখিয়ে বললুম, ওয়েট, ওয়েট! এটা কী জন্যে তবে?

রূপাই নাক খুঁটতে খুঁটতে বলল, ধুস্! ওসব হাঁস মারা যায় না। বাবা কতবার চেষ্টা করে দেখেছেন।

ঈশিতা বলল, এই রূপাই! পুলিশের নৌকো চরে যাতায়াত করে। ওরা টের পেলে বিপদ হবে। ওয়াইল্ড লাইফ প্রিজার্ভেশন অ্যাক্টে গঙ্গার চরে পাখি মারা বারণ কিন্তু।

রঞ্জনা তেড়ে এল। .... আপনি তো দেখছি বড্ড হিসেবি মেয়ে। ছাড়ুন তো আইনকানুন। এই প্রিমিটিভ ওয়ার্লডে আইন-ফাইন কিচ্ছু নেই। উই আর বর্ণফ্রি এখানে।

বললুম, আপনার মধ্যে আজ আশ্চর্য পরিবর্তন দেখছি রঞ্জনা!

কী রকম?

ইউ লুক ওয়াইল্ড!

রঞ্জনা চোখ পাকিয়ে বলল, এতগুলো মেয়ের মধ্যে একজন মাত্র ছেলে। ওয়াইল্ড হওয়া দরকার।

মিটমিটে চোখে তাকিয়ে আমার মামাতো ভাই ছোট্ট টুকাই বলল, আমিও তো ছেলে!

ইশ! তুমি এসব শুনছ বুঝি? রঞ্জনা দিদিমণির ভঙ্গিতে বলল। তুমি তো বড্ড পাকা হয়ে গেছ!

টুকাই হঠাৎ ঘাসের ওপর ডিগবাজি খেতে শুরু করল। আমি উঁচু বালিয়াড়ির দিকে পা বাড়িয়ে বললুম, তাহলে এই প্রাণীদের রক্ষার ভার রঞ্জনা নিচ্ছেন। বুনো শুয়োর এসে পড়লেও উনি ঠেকাবেন। আমি কয়েকটা হাঁস মেরে আনি।

রঞ্জনা বলল, হাঁসকে গুলি করবেন—কুড়িয়ে আনার লোক চাই না? ঈশিতাকে নিয়ে যান সঙ্গে। তাছাড়া ওঁরই শুয়োরের ভয়টা বেশি।

হাসতে হাসতে দৌড়ে বালিয়াড়িতে ওঠার চেষ্টা করলুম। কিন্তু বালিতে ওঠা সহজ নয়। কতটা হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে হল। ওপরে দাঁড়াতেই অনেকটা দূর অব্দি চোখে পড়ছিল। গঙ্গার এ বিশালতা কল্পনা করতে পারিনি। মরুভূমি আর সমুদ্রের যেন গলাগলি শুয়ে থাকা। দক্ষিণে ঘুরে নওলপাহাড়ীকে দেখতে গিয়ে চোখে পড়ল একটা নৌকো এগিয়ে আসছে এই চরের দিকে। বুকটা ধড়াস করে উঠল। তারপর দেখি, দশরথ দাঁড়িয়ে আছে ছইয়ে হেলান দিয়ে। নৌকোটা যতক্ষণ না চড়ায় এসে ভিড়ল, দাঁড়িয়ে রইলুম। দশরথের হাতে একটা বল্লম আর লম্বা কাটারি। তাকে সবাই হাঁ করে দেখছিল। ... আমি চেঁচিয়ে বললুম, কী ব্যাপার দশরথ?

দশরথ চেঁচিয়ে জবাব দিল, কুছু না বাবুদা! মাইজি বলল কী, তুমি ভি যাও। কাহে কী লড়কিলোগ সব গেছে।

বুঝলুম, মামীমার মনের ধুকুপুকু ঘোচেনি। চরে ডাকাতরা ঘুরে বেড়ায়। মেয়েদের লুট করে নিয়ে গেলেই হল! মামীমার অমত সত্ত্বেও জোর করে আমরা এখানে এসেছি। তাই দশরথকে পাঠিয়েছেন।

দশ

এদিনটা ছিল একটা সত্যিকার অ্যাডভেঞ্চারের দিন। অনেকদিন পরে আবার একটু হিংসার স্বাদ পেয়ে মনের ভেতরকার ক্ষুধার্ত বাঘ গর গর করে উঠেছিল। হয়তো রক্তে স্বাধীনতার টান থাকলে এমন হয়। এই প্রাকৃতিক পটভূমিতে যথেচ্ছ স্বাধীনতা ছিল। উঁচু বালিয়াড়ির উত্তরের ঢাল বেয়ে নেমে গেলুম যেখানে, সেখানে একটুকরো নরম ঘাসের জমি। কিছু কাশঝোপ। তারপর ভুট্টা আর আখের একটানা সবুজ জঙ্গল। কাশঝোপের ওধারে খাড়ির মতো গঙ্গার খানিকটা অংশ এসে ঢুঁ মেরেছে। সেই খাড়ির জলে একঝাঁক হাঁস চুপচাপ ভেসে আছে— যেন ছবিতে আঁকা। আমি বন্দুক ছুঁড়েছি বহুবার। কিন্তু সে তো মানুষের দিকে তাক করে। এই প্রথম আমি প্রকৃতিকে গুলিবিদ্ধ করতে যাচ্ছি ভেবে একটু হকচকিয়ে গেলুম। আমার সামনে এক আশ্চর্য ল্যাণ্ডস্কেপ। প্যান্টের পেকেটে বাড়তি সতর্কতার জন্য দুটো এলজি কার্তুজ এবং কয়েকটা নিছক ছররা। এই সুন্দব ল্যাণ্ডস্কেপ টুকরো টুকরো হয়ে যাবে ভেবে দোনামনা করছিলুম। কিন্তু তারপর মনে পড়ে গেল রঞ্জনার কথা। আমাকে বীরপুরুষ বলে ঠাট্টা করেছিল ঈশিতার সামনে। নিরীহ পাখী মেরে বীরপুরুষ হওয়ার মানে হয় না। কিন্তু আমি যে সত্যি বন্দুক চালাতে জানি এবং আমার লক্ষ্যও প্রায় নির্ভুল, শুধু এটুকু জানাতেই কাশঝোপের ভেতর গুঁড়ি মেরে, তারপর উপুড় হয়ে জলের ধার পর্যন্ত এগিয়ে গেলুম। দো'নলা বন্দুকটা নিঃশব্দে ঘাসের উপর রেখে দুটো ছররা গুঁজে দিলুম তার গর্ভে। তারপর অপেক্ষা করতে থাকলুম যতক্ষণ না কয়েকটা হাঁস একলাইনে আসে।

দরদর করে ঘামছিলুম। বুকের ভেতর ধকধক করছিল। সারা শরীর নিঃসাড় হয়ে গিয়েছিল। বন্দুকের নলের মাথায় বসানো লক্ষ্যভেদের মাছিটার দিকে নিষ্পলক তাকিযে থাকতে থাকতে মনে হচ্ছিল, নিশ্চয় পেছনে কোথাও রঞ্জনা আমাকে লক্ষ্য করছে। কিছুক্ষণ পরে কয়েকটা হাঁস নিঃশব্দে ভাসাভাসি করতে করতে আনমনে একলাইনে এসে যেতেই দুপাশের হ্যামার দুটো টেনে পরপর দুটো ট্রিগার টেনে ধরলুম।

প্রাকৃতিক শান্তি খান খান হযে গেল। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য প্রচণ্ড একটা আলোড়ন ঘটল। হাঁসগুলো চিৎকার, বারুদের গন্ধ, আকাশের নীল গায়ে আঁকাবাঁকা কালো চাবুকের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে হাঁসের সঞ্চালন। তারপর দেখলুম, একটা হাঁসের ঠোঁটে রক্ত— সে বিভ্রান্ত হয়ে আমার দিকে ভেসে এসে দামে আটকে গেল। আরেকটা হাঁস বাঁদিকে ডানা ঝটপট করতে করতে একটু জলছাড়া হয়ে কাশঝোপের ভেতর ধুপ করে পড়ে গেল।

অমানুযিক কী এক আনন্দে রঞ্জনা রঞ্জনা বলে চিৎকার করতে ইচ্ছে করছিল। ঝটপট উঠে বন্দুকের নল বাড়িয়ে দাম থেকে মরা হাঁসটা টেনে নিলুম। তারপর বাঁহাতে তার ডানা ধরে ঝুলিয়ে বন্দুক ঘাড়ে রেখে বাঁদিকে তাকাতেই বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল।

একটু তাকাতে কাশঝোপের ভেতর থেকে এইমাত্র সোজা হয়ে দাঁড়াল বনোয়ারি মিস্তিরির মেয়ে সেই রঙ্গী। ক্রাচটা বগলে চেপে সে আমার চোখে চোখ পড়া মাত্র অদ্ভুত হাসল। তার হাসিতে কী একটা ছিল, আমার শরীর শিউরে উঠল। ভিজে শাড়ি সেঁটে আছে শরীরে। সেই আদিম বন্য নারীর শরীর, তীব্র এক স্বাধীনতার স্রোত বয়ে যাওয়া নদীর মতো শরীর! আমি চোখ ফেরাতে পারছিলুম না।

কিন্তু ও কি সাঁতার কেটে এতদূর চলে এসেছে। ওদিকে কোনো নৌকো নেই। একটু অবাক হলুম। একপায়ে কীভাবে সাঁতার কেটে এতখানি দূরত্ব পেরিয়ে আসা সম্ভব বুঝতে পারলুম না। সে নিষ্পলক তাকিয়ে সেইরকম নিঃশব্দে হাসছিল। তারপর সে একটা হাত তুলে দ্বিতীয় হাঁসটাকে দেখাল। অমনি আমি ছুটে গেলুম তার দিকে।

রঙ্গী হাঁসটা পেছনে লুকিয়ে এবার খিলখিল করে হেসে উঠল। তার খুব কাছে গিয়ে পড়েছিলুম। তার জলে ভেজা শরীরের তীব্র গন্ধ আমাকে আচ্ছন্ন করছিল। হঠকারী উত্তেজনায় তার কাঁধে হাত রেখে শ্বাসপ্রশ্বাস জড়ানো কণ্ঠস্বরে আস্তে বললুম, রঙ্গী!

সেই সময় পেছনে কেউ ডাকল, কিংবা কিছু বলল। বাতাসের উল্টোদিকে বুঝতে পারিনি—দ্রুত ঘুরে দেখি রঞ্জনা বালিয়াড়ি থেকে দৌড়ে নেমে আসছে।

রঙ্গীর কাঁধ থেকে হাত তুলে নিলুম সঙ্গে সঙ্গে। তারপর রঞ্জনার উদ্দেশে হাসতে হাসতে বললুম, দেখছেন কাণ্ড? শিকার নিয়ে পালাছে মেয়েটা।

রঞ্জনা এসে একটু তফাতে দাঁড়াল। সে রঙ্গীকে দেখতে দেখতে ঠোঁটের ডগায় বলল, ও কে?

রঙ্গী। বনোয়ারী মিস্ত্রি বলে একজন আছে নওলপাহাড়ীতে। তার মেয়ে। রঞ্জনা একটু হেসে বলল, চেনেন?

একটু একটু। গম্ভীর হয়ে বললুম, ভীষণ চোট্টা মেয়ে—দশরথ বলছিল।

রঙ্গী ভুরু কুঁচকে রঞ্জনাকে দেখছিল। ফোঁস করে উঠল। এ বাবু চোট্টা মাৎ বোলো। আমি চোট্টা না আছি।

রঞ্জনা হাসতে হাসতে বলল, লিঙ্গ ভুল হচ্ছে নিরুবাবু! হিন্দিতে চোট্টার স্ত্রীলিঙ্গ চুট্টিন।

অমনি রঙ্গী হাঁসটা ছুঁড়ে ফেলে বলল, তুম চুট্টিন। তারপর সে ক্রাচে ভর দিয়ে হন হন করে এগোতে থাকল। মনে হচ্ছিল, রুষ্টা সাপিনী ফোঁস ফোঁস করে ফণা তুলে এগিয়ে যাচ্ছে।

আমি ডাকলুম, রঙ্গী! রঙ্গী! শোনো শোনো।

রঙ্গী ঘুরল না। কাশঝোপের ভেতর তার আন্দোলিত কালো মাথাটা একটু পরে মিলিয়ে গেল। রঞ্জনা অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। বলল, ভীষণ ডাঁটিয়াল মেয়ে তো!

হাঁসটা কুড়িয়ে নিয়ে বললুম, যাক্ গে। চলুন, হাঁসদুটো ব্যবস্থা করা যাক্। দশরথ আছে যখন, তখন ভাবনা নেই।

রঞ্জনা ছোট্ট একটা শ্বাস ফেলে পা বাড়াল। সে কি উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল! নিহত পাখি দুটো দেখে? নাকি অন্য কোনো কারণে? আমার জিগ্যেস করতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু তার মুখটা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠেছে। বালির ঢিবির পাশ কাটিয়ে যাবার সময় বেঁটে চ্যাপ্টা পাতাওয়ালা ঝাঁকড়া গাছটার তলায় একটু থেমে সিগারেট ধরালুম। তারপর বললুম, হাঁসদুটোর জন্যেই কি আপনার খারাপ লাগছে?

বড় চোখে তাকিয়ে রঞ্জনা বলল, না তো!

তবে অমন দেখাচ্ছে কেন আপনাকে!

রঞ্জনা কী বলতে যাচ্ছিল, বালির ঢিবি ঘুরে রূপাই, ঈশিতা আর টুকাই হইচই করতে করতে এসে পড়ল। রূপাই বলল, তোমাদের খুঁজে সারা! তারপর হাঁসদুটোকে দেখে দুর্বোধ্য ভাষায় চেঁচিয়ে আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিল। বুঝলুম, গন্ধমামার শিকারের স্বাদ তাঁর মেয়ের অবচেতনায় আছে। কিন্তু টুকাই ভয়ে ভয়ে একটু তফাত রেখে চলল। ঈশিতা সম্ভবত বন্দুকের শব্দের পরিণাম যাচাই করতে এসেছিল, তবে নিহত পাখিদের জন্য মুখে কোনো বিকার ফুটে উঠতে দেখলুম না। তারা তেমনি হইচই করে হাঁটছিল।

শুধু রঞ্জনা অস্বাভাবিক চুপচাপ।

দশরথ না এলে অসুবিধে হত। চরে জোরালো বাতাস বইছে সারাক্ষণ। সঠিক জায়গায় উনুন তৈরী থেকে শুরু করে সব কাজ প্রকৃতপক্ষে সেই করল। একটা গাছের ছায়ায় বসে তার সঙ্গে গল্প করছিলুম। উনুনে লকড়ি গুঁজে দিতে দিতে দশরথ এই চরের নানান ঘটনা শোনাচ্ছিল।

গঙ্গার এসব চরকে হিন্দিতে বলে দিয়াড়। এই চরটায় নাম হড্ডুক দিয়াড়। হড্ডু ছিল মাল্লাজাতের মানুষ। দুর্ধর্ষ মানুষ বলতে যা বোঝায় ঠিক তাই। এ দিয়াড়ে প্রথম বসত করেছিল সে। গবরমেণ্টের সঙ্গে খুব লড়াই ফ্যাসাদ বেধেছিল তার। পুলিশের বন্দুকের সঙ্গে টাঙি বল্লম তীর ধনুক নিয়ে লড়াই। তবু হড্ডুকে বাগ মানাতে পারেনি সরকার। শেষে নওলপাহাড়ীর বাঙালী নায়েব গোবর্ধনবাবু তাকে ধরিয়ে দেন। হড্ডুর জোয়ান ছেলে দুধিরাম নায়েববাবুকে খুন করে ফাঁসিতে মারা যায়। হড্ডুর যাবজ্জীবন কারাবাস হয়েছিল। ফিরল যখন তখন একেবারে বুড়ো। দশরথ বলল, হড্ডু বড় বানের বছর ভেসে

গিয়েছিল। তখন দশরথ নাদান লেড়কা। এখন হুজুর নাতিন্না আছে মাল্লাবসতিতে। তারা কমজোর মানুষ। মাছ ধরে খায়।

অন্য একটা গাছের তলায় মেয়েরা লুডো খেলছিল। রঞ্জনাকে দেখলুম একটা বই এনেছে সঙ্গে। থামে পা ছড়িয়ে বসে বইটা পড়ছে আর মাঝে মাঝে চোখ তুলে দূরে দেখছে। হয়তো কিছু দেখছে না, কিছু ভাবছে।

কিছুক্ষণ পরে রূপাই, ঈশিতা, পারমিতা ভুট্টাক্ষেতের ভেতের দিয়ে মাল্লাবসতিতে কলাপাতা আনতে গেল। টুকাই হাঁসের পালক কুড়িয়ে রঞ্জনার কাছে জমা রাখছিল। তখন আমি ওর কাছে গেলাম। আমার দিকে মুখ তুলে একটু হাসল সে। নিছক ভদ্রতাসূচক হাসি।

বললুম, ওদের সঙ্গে গেলেন না যে?

সে কথার জবাব না দিয়ে রঞ্জনা একটা ঘাস ছিঁড়ে বলল, এওলো কী ঘাস বলুন তো?

জানি না।

দূর্বা। বছরের এসময়টা গজায়। আর কী দারুণ দেখতে! মখমলের মতো। রঞ্জনা দূর্বাঘাসের ওপব হাতের তালুর চাপ দিয়ে বুঝি কোমলতা পরখ করলো। আপন মনে বলল, ফের, ন্যাচারাল কার্পেট। কিন্তু কার জন্য?

হঠাৎ দূর্বাঘাসের কথা কেন?

রঞ্জনা হাসল। ... হাড়ে দুব্বো গজান বলে একটা কথা আছে জানেন তো।

শুনেছি।

আমার সেই অবস্থা।

কেন?

এ কথারও জবাব দিল না সে। হঠাৎ একটু ঝুঁকে উত্তেজিতভাবে বলল, টুকাই! ওই দেখ আবার এসেছে।

টুকাই পালক গুণছিল। ঘুরে বসে বলল, কৈ?

ওই দেখ, ঝোপের মাথায়।

একটু তফাতে কাঁটাঝোপে সাদা ফুল ফুটে রয়েছে। টুকাই দৌড়ল। হলুদ রঙের একটা প্রজাপতি উড়ছিল। বললুম, আপনার কী হয়েছে বলুন তো?

রঞ্জনার চোখে কৌতুক ঝিলমিল করতে দেখলুম এবার। বলল, টুকাইকে লাইফ সায়েন্স পড়াচ্ছি। আচ্ছা, আপনি যে অত প্রকৃতি-প্রকৃতি করেন, বলুন তো প্রজাপতি কীভাবে জন্মায়?

শুনেছি, এভলিউশনারি প্রসেসে।

টুকাই প্রচণ্ড চীৎকার করে উঠল চেরা গলায়, পাকড়েছি! পাকড়েছি! রঞ্জনা দৌড়ে গেল তার কাছে।

ছেলেমেয়েরা মাঝে মাঝে দেহাতী শব্দ উচ্চারণ করে বলে মামীমা রেগে যান। বিশেষ করে টুকাই মাকে রাগাবার জন্য ইচ্ছে করেই দেহাতী হিন্দি বলে ওঠে। কিন্তু এখন সে এখানে স্বাধীন ছেলে। দেখলুম, হিন্দি বাংলা মিশিয়ে রঞ্জনাকে কী সব বলছে। তার দু' আঙুলে হলুদ প্রজাপতিটা ছটফট করছে। রঞ্জনা সাবধানে প্রজাপতিটা নিল। তারপর টুকাইকে বুঝি লাইফ সায়েন্স শেখাতে থাকল। বাতাসের অস্থিরতায় কিছু কানে আসছিল না। একটা পাতায় কয়েকটা আণ্ডার লাইন। পাশে আঁকা বাঁকা হরফে কেউ লিখেছে, ন্যাকা! ভাজা পুঁটিমাছ উল্টে খেতে জানেন না। প্রেমিক প্রেমিকা কিংবা স্বামী-স্ত্রীর সংলাপ যেখানে। বইটা তেমনি করে রেখে দিলুম ঘাসের ওপর।

ঘড়িতে একটা বেজেছে। নির্মেঘ আকাশের রঙ হাল্কা নীল। উজ্জ্বল রোদে কিছুটা দূরে গঙ্গার ব্যাকওয়াটার ঝলমল করছে। রঙ্গীর কথা মনে পড়ল। রঙ্গী কীভাবে এ চরে এল এখনও রহস্য। দশরথ অবশ্য বলছিল, কোনো জেলে নৌকায় এসেছে। ও তো সাঁতার কাটতে পারবে না। কিন্তু ওদিকে কোনো নৌকো নেই। রঙ্গী কি এখনও চরে কোথাও আছে? নাকি দশরথ যে নৌকোয় এসেছে, তার মাঝির সঙ্গে ফিরে গেছে।

তারপর আমার রক্ত ছলকে উঠল। রঞ্জনা হঠাৎ গিয়ে না পড়লে কিছু কি ঘটত? আদিম ধরনের

বিস্ফোরণ? বুঝতে পারিনে, কেন ওই জংলী মেয়েটাকে দেখলেই আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়? আমি তো লম্পট চরিত্রের ছিলুম না কোনোদিনও— মেয়েদের দেখলেই আমার রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে না। বরং মেয়েদের মুখোমুখি ভীষণ ভদ্র হয়ে যেতে ইচ্ছে করে। অথচ রঙ্গীর মধ্যে কী আছে যেন-- কোনো এক গূঢ় আদিম সংকেত। আমার রক্ত দ্রুত সাড়া দেয়। কোনো এক ঐতিহাসিক সময়ে প্রকৃতির কিছু কোড যেন ওর আর আমার মধ্যে রয়ে গেছে-- কোনো জন্মান্তরে। জন্মান্তর ছাড়া আর কীভাবে একে ব্যাখ্যা করা যাবে?

রঞ্জনা হাত মুছতে মুছতে ফিরে এল। টুকাই ছুটে গেছে দশরথের কাছে। দশরথ ডেকচিতে খুন্তি নাড়ছে। মাথায় গামছা জড়ানো।

আঙুল দেখিয়ে রঞ্জনা বলল, রঙগুলো দেখছেন? প্রজাপতির ডানার রঙ।

বললুম, ধুয়ে ফেলুন। বিষাক্ত হতে পারে।

রঞ্জনা বেঁটে গাছটার গুঁড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। স্নান করব, তখন ধুয়ে যাবে। ওরা আসুক।

স্নান করবেন নাকি?

পিকনিকে এসে স্নান করব না—পায়ের কাছে এত সুন্দর জল! রঞ্জনা মুখ তুলে গাছের ডালপালার ভেতর কিছু দেখতে থাকল। তারপর ফের বলল, একটা পার্থক্য লক্ষ্য করছি কিন্তু।

কিসের?

এই চরের গাছগুলোর সঙ্গে অন্যসব গাছের।

কী পার্থক্য?

লক্ষ্য করুন, কেমন ভীষণ—ওয়াইণ্ড। রুক্ষ! কিন্তু খুব লিভিং মনে হচ্ছে না? রঞ্জনা তাকাল আমার দিকে। .... এ কেমন জানেন? গৃহপালিতে আর বন্যে যেমন তফাত সেই রকম।

হাসতে হাসতে বললুম। গৃহপালিত গাছ আর বন্য গাছ। দারুণ বলেছেন!

রঞ্জনা জোরালো গলায় বলল, ঠিক তাই। আসা-অব্দি মনে হচ্ছিল, কী যেন নতুন ভারি নতুন অবজেক্ট চারপাশে। এতক্ষণে বুঝতে পারলুম। প্রকৃতির ভেতর চলে না এলে ওটা বোঝা যায় না। আর জানেন? কেউ কেউ প্রকৃতির ভেতরে এসে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। অসহ্য লাগে। ভাবে, কখন ফিরে যাবে নিজের পরিবেশে। আবার কেউ ভীষণ লাইভলি হয়ে ওঠে। হঠাৎ হঠাৎ ফেরোসাসও হয়ে যায়।

যেমন আপনি!

রঞ্জনা একটু হাসল। ..... ঠিক বুঝতে পারছিনে। আমায় কি সত্যি হিংস্র দেখাচ্ছে?

কিছুক্ষণ আগে আপনাকে খুব বন্য দেখাচ্ছিল বলেছিলুম, মনে পড়ছে?

কে জানে! কিন্তু আপনাকে .....

কী হল? বলুন?

আপনি যেভাবে ওই মেয়েটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, আমার বুক ধড়াস করে উঠেছিল। রঞ্জনা হেসে উঠল। কিন্তু হাসিটা শুকনো মনে হল। তারপরই সে হাসি মুছে ফেলল। ফের বলল, সরি। আপনি যেন অন্যভাবে নেবেন না।

তাহলে বলা যায়, আপনিই বাঁচিয়ে দিয়েছেন রঙ্গীকে।

আমার কথা শুনে রঞ্জনা কয়েক সেকেণ্ড নির্বিকার ভঙ্গীতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর আস্তে বলল, বললুম তো অন্যভাবে নেবেন না। অন্য কিছু মীন করিনি আমি।

মুখ নামিয়ে একটা সিগারেট ধরালুম। সকালের কথাটা মনে পড়ল। রঞ্জনা এমনি হাসতে হাসতে বলেছিল, ডাকাতদলে ছিলেন বুঝি? তখন এমন কথা শুনে ক্ষোভ জেগেছিল।

তাহলে কি আমি ওর কাছে ধরা পড়ে যাচ্ছি বারবার! কিছুক্ষণ পরে দেখি, সে দশরথের কাছে যাচ্ছে। তীব্র অপমানবোধে আমার মাথার ভেতরটা গরম হয়ে উঠল। সিগারেটটা দ্রুত পুড়িয়ে ঘাসের ভেতর ঘষটে নিভিয়ে দিলুম। তারপর দেখলুম, রঞ্জনা হাসিমুখে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে ফিরে আসছে। তার হাসি দেখে সব ভুলে গেলুম।

রঞ্জনা গাছতলায় পৌঁছুনোর আগে গান থামিয়ে বলল, ওই দেখুন! বীরাঙ্গনার দল কলাগাছ হত্যা করে ফিরে আসছে। তারপর আমার সামনে ঝুঁকে বলল, কই, হাঁ করুন তো। শিগগির।

তার হাতের মুঠোয় কী একটা ছিল। জোর করে গুঁজে দিতেই টের পেলুম এক টুকরো হাঁসের মাংস। হেসে বললুম, আপনি সত্যি অদ্ভুত।

রঞ্জনা চোখ পাকিয়ে বলল, নুন চাখতে দিলুম—আর বলে কিনা অদ্ভুত! শিগগির বলুন।

বেশি সিগারেট টানলে স্বাদ বোঝা যায় না।

ফের বাজে কথা! বলুন হয়েছে নুন?

হয়েছে মনে হচ্ছে।

দশরথ এদিকে তাকিয়ে ছিল, হাতে খুন্তি। রঞ্জনা তার উদ্দেশে বলল, ঠিক আছে দশরথদা। তারপর আমার পাশে ধুপ করে বসে ফের বলল, এই, আমরা আড্ডা দিচ্ছি আর ওরা খেটে হন্যে হচ্ছে—ভাল দেখাচ্ছে না কিন্তু। তাছাড়া আরও গণ্ডগোল আছে। আসুন লুডো খেলি। ওরা এসে দেখুক, আমরা অন্তত একটা কিছু নিয়ে আছি!

সে ঝটপট লুডো বিছিয়ে গুটিগুলো এঘরে-ওঘরে সাজিয়ে ফেলল, যেন বহুক্ষণ ধরে খেলা চলেছে। আমি আস্তে বললুম, ওরা কি ভাববে যে আমরা প্রেমালাপ করছিলুম?

রঞ্জনা একবার তাকিয়েই মুখ নামাল। গলার ভেতর বলল, ভাবতেও পাবে। নিন, চাল দিন। বি সিরিয়াস।

রঞ্জনা মুখ নামিয়ে গুটির চাল লক্ষ্য করছিল। আমার পর পর তিন ছক্কা। ফের চাল দিতে হল। কিন্তু রঞ্জনা চুপ। আগের মতো গাঢ়তা তার উজ্জ্বল গায়ে ছায়া ফেলেছে। কানের রিঙ দুটোও যেন নিষ্প্রভ। হয়তো আমারই চোখের ভুল। তারপর আমাকে নিষ্ক্রিয় দেখে সে মুখ তুলল। কিছু বলতে ঠোঁট ফাঁক করল। কিন্তু সেই সময় দুদ্দাড় শব্দে মাটি কাঁপিয়ে রূপাইরা পৌঁছে গেল। প্রত্যেকে একগাদা করে কলাপাতা এনেছে।

তারপর রূপাই হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, নিরুদা রঙ্গীকে তুমি কী বলেছ গো? মাল্লাদের তিনটে ছেলে আমাদের শাসাল। চমকে উঠে বললুম, শাসাল মানে?

পারমিতা বলল, ওখানে ওরা বসে আছে এখনও। ওই ভুট্টাক্ষেতের কাছে। ইস্। এখনও আমার বুক কাঁপছে।

ঈশিতা বলল, ছেড়ে দাও! ওসব ব্যাডক্যারেক্টার মেয়ের স্বভাবই ওইরকম।

রঞ্জনা উঠে দাঁড়িয়ে হইচইটা থামিয়ে দিয়ে রূপাইকে বলল, কী ব্যাপার ডিটেলস বলুন তো?

রূপাই চোখমুখ লাল করে বলল, নিরুদা নাকি রঙ্গীকে কী বলেছে। রঙ্গী মাল্লাবস্তীতে গিয়ে ওদের লাগিয়েছে। তাই শুনে নিরুদাকে মারতে আসছিল। তারপর আমাদের সঙ্গে ওখানে। ফিরে গিয়ে বাবাকে বলে দেখাচ্ছি মজা।

রঞ্জনা বলল, সে কী। রঙ্গী তো গুলিকরা হাঁস নিয়ে পালাচ্ছিল। তাই নিরুদা ওর কাছে থেকে হাঁসটা কেড়ে নিলেন। তখন তো আমিও ছিলুম, আমার সামনে ঘটেছে ব্যাপারটা।

আমি আস্তে-সুস্থে উঠে পা বাড়িয়ে বললুম, পারু! কোথায় ওরা?

রূপাই ব্যস্ত হয়ে বলল, যেও না নিরুদা। ওরা ডেঞ্জারাস! ওদের আমি চিনি—সব কটা ক্রিমিনাল। তুমি ওদের সঙ্গে পারবে না।

দশরথ কান করে শুনছিল। হা-হা করে হেসে বলল, ছেড়ে দিন বাবুদাদা, হামি এখানে আছে জানে। ওরা এখানে ঘুষতে পারবে না। এই দেখেন না, আমি হাঁক মারলে সব ভেগে যাবে।

এই বলে সে একটা ঢিবিমতো উঁচু জায়গায় উঠে বাজডাকা গলায় হাঁক দিল, হৈ শিদ্ধড়কা ভাতিজা! কাঁহা রে? তারপর ফের হা-হা করে হাসতে লাগল। .... চুহাকা মাফিক সব গাড্ডায় ঘুষে গেছে।

এগারো

কাল সন্ধ্যায় পিকনিক থেকে ফিরে অবাক হয়ে গিয়েছিলুম আলাপনের চিঠি পেয়ে। সে কেমন করে জানল আমি এখানে আছি? ইনল্যাণ্ড লেটারে সে সংক্ষিপ্ত কয়েকটা লাইন লিখেছে ঃ

'নিরু,

অনেক খুঁজে তোর পাত্তা পেয়েছি। আমার অবস্থা শোচনীয়। আমি তোর কাছে যাচ্ছি! খুব জরুরী কথা আছে। চিঠিতে সব লেখা যাবে না।

ইতি,

—আলাপন

ডাকঘরের ছাপটা অস্পষ্ট। বুঝতে পারিনি আলাপন কোত্থেকে লিখেছে। আমার তৃপ্তি এবং আকাঙ্ক্ষাকে খুন করে আলাপন গায়ে রক্ত মেখে আসতে থাকল সারা রাত। সে খোঁড়াচ্ছিল। তার পায়ে বুলেটের দগদগে ঘা। আমি ভয় পেয়ে গেলুম।

বরাবর এরকম দেখে আসছি। আমার বরাতে শান্তি আর সৌন্দর্য নেই। বসন্তকালের নওলপাহাড়ী ধীরে ধীরে আমার চারপাশে শান্তি ও সৌন্দর্যের পরিমণ্ডল গড়ে তুলছিল। হঠাৎ সেখানে আলাপনের আবির্ভাব হতে চলেছে।

সকালে গন্ধমামা জিপ নিয়ে ফার্মে রওনা হচ্ছিলেন। জিপ স্টার্ট দিয়েছে আমি চেঁচিয়ে উঠলুম, গণেশজী! রোখো, রোখো! হাম যায়েগা!

গন্ধমামার মুখেচোখে হাসি ছলকে উঠল। ..... নিরু দেখছি দুদিনেই আমাদের মতো খোট্টা হয়ে উঠল!

গেট পেরিয়ে জিপে উঠতে যাচ্ছি, সেই সময় আমার পেছন থেকে কেউ বলল, এক মিনিট। আমিও যাব। ঘুরে দেখি, রঞ্জনা। আমি হকচকিয়ে গেলুম। গন্ধমামার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, যেন বিরক্তিব চিহ্ন ফুটে উঠেছে। আমার এই হতচকিত অবস্থার প্রতি এতটুকু দৃক্‌পাত না করে রঞ্জনা জিপের পাশে এসে গন্ধমামাকে একটা নমস্কার ঠুকল। অমনি গন্ধমামার মুখ আবার উজ্জ্বল হয়ে গেল। নেমে এসে সামনের সিট ভাঁজ করে দিয়ে বললেন, তাহলে তোমরা ভেতরে গিয়ে বসো। আমার এই বৃহৎ শরীর কিঞ্চিৎ আরাম নিক।

গন্ধমামা হাসতে লাগলেন। আমরা ভেতরে গিয়ে দু'ধারে লম্বাটে সিটে মুখোমুখি বসলুম। জিপ চলতে থাকলে রঞ্জনার দিকে তাকিয়ে দেখি, সে ঠোঁট টিপে হাসছে। মামার কান বাঁচিয়ে বললুম, বলে এসেছেন তো? ওরা খুঁজে হুলুস্থুল না বাধায়।

রঞ্জনা বলল, আপনি থামুন তো!

পাঁচ মাইল দূরত্ব আমরা নিঃশব্দে অতিক্রম করলুম। স্বীকার করছি, আমার ভাল লাগছিল। আমাব বুকের ভেতর চাপা উত্তেজনা গরগর করছিল। আলাপনের আসার কথাটা ভুলিয়ে দিয়েছিল এই ভাললাগা এবং দুর্বোধ্য উত্তেজনা। ক্যানেলের কাছে এসে একটা লোকের সঙ্গে কথা বলার জন্য গন্ধমামা জিপ দাঁড় করালেন। সেই সময় রঞ্জনা বলল, আপনি পাতালকালীব মন্দিরের কথা বলেছিলেন। সেটা কোথায়?

বললুম, ওই যে বড় রাস্তার ওপারে পাহাড়টা দেখছেন, ওখানে।

রঞ্জনা চোখে ঝিলিক তুলে বলল, নেমে পড়ুন!

গন্ধমামা লোকটাকে ঠ্যারো বলো জিপ থেকে নেমে গেলেন। তারপর বললেন, গণেশজী! তুম গাড়ি লেকে ফার্মমে যাও। হাম পায়দল লোটেগা।

আমরাও নেমে গেলুম। বললুম, মামাবাবু! ইনি পাতালকালী দর্শন করতে চান। এঁকে নিয়ে যাচ্ছি।

রাস্তার লোকটার দিকে গন্ধমামার মনোযোগ। ঘাড় নাড়লেন। আমি ও রঞ্জনা ক্যানেলের ব্রিজ পেরিয়ে বড় রাস্তায় গেলুম। নিরিবিলি পিচের রাস্তার দুধারে বিশাল সব গাছ। কোনো কোনো গাছে ফুলের মেলা বসেছে। পিচের ওপর উজ্জ্বল সকালের বোদ পড়ে আছে। পাখি ডাকছে চারদিকে। ভারি নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেল আমার। এতক্ষণে চাপা উত্তেজনাটা থিতিয়ে গেল। শরীর অসম্ভব হাল্কা লাগছিল।

রঞ্জনা আস্তে বলল, আপনার অস্বস্তি কাটেনি নিরুবাবু?

না।

না? রঞ্জনা পাশ থেকে জ্বলন্ত চোখে তাকাল।

একটু হেসে বললুম, অস্বস্তি আপনার জন্য হয়তো নয়।

ঈশিতার জন্য তো?

যাঃ! কী বলছেন?

রঞ্জনা হাসল। আমার বদনাম আছে বেহায়া বলে।

আপনি আসলে বেপরোয়া।

খুশি হলুম। রঞ্জনা একটু সরে দাঁড়াল রাস্তা থেকে। একটা ট্রাক আসছিল। সে আমার হাত ধরে টেনে ফের বলল, সরে আসুন। হাইওয়ের ট্রাকগুলো আমার চেয়ে বেপরোয়া!

ট্রাকের লোকগুলো চেঁচিয়ে সম্ভবত অশ্লীল কোনো রসিকতা করে গেল। রাগী দৃষ্টিতে ট্রাকটার দিকে তাকিয়ে ছিলুম। একটু পর ফের পা বাড়িয়ে বললুম, আমাদের দেশে এই এক অদ্ভুত স্বভাব লোকের, নির্জন রাস্তায় যুবক যুবতীদের দেখলেই কুকুরের মতো কামড়াতে আসে।

রঞ্জনা বলল, আপনি বললেন না কার জন্য অস্বস্তি হচ্ছিল!

সভ্য সমাজ থেকে অনেক দূরে এই নির্জন রাস্তায় রঞ্জনাকে সব কথা বলতে ইচ্ছা করছিল। কিন্তু তাব কী প্রতিক্রিয়া হবে আঁচ করতে পারছিলুম না। সিগারেট জ্বেলে নিয়ে শুধু বললুম, একটা দুর্ধর্ষ ছেলে যে কোনো সময় নওলপাহাড়ী এসে হাজির হবে আমার কাছে। সেটাই আমার অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছে, বঞ্জনা।

রঞ্জনা একটু অবাক হল। ... কে সে?

আপনি চিনবেন না। ছেলেটা মারাত্মক।

রঞ্জনা ঝাঁঝালো স্বরে বলল, যা বলার স্পষ্ট করে বলুন, নয়তো থাক। কই, আপনার পাতালকালীর মন্দির?

রাস্তা থেকে নেমে জঙ্গল ঢাকা পাহাড়টার দিকে এগিয়ে বললুম, মুশকিল হয়েছে যে এই ছেলেটা রক্ত দিয়ে আমাকে মৃত্যু থেকে বাঁচিয়েছিল। অথচ সে নিজে একজন মার্ডারার। আপনি তাব নাম শুনলে ভীষণ অবাক হয়ে ভাববেন, এত মিষ্টি—এমন পোয়েটিক নাম যার, সে কেমন করে পেশাদার খুনী হয়! অথচ ঠিক তাই।

রঞ্জনা মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। বলল, কেন সে আসছে এখানে?

আমার সঙ্গে কী একটা জরুরী কথা আছে।

তার সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক?

বন্ধুতাব।

শুধু বন্ধুতার?

আমি চুপ করে থাকলুম মিনিট দুয়েক। গাছপালা ঝোপঝাড়ের ভেতর নানা আয়তনের পাথব পড়ে রয়েছে। তারপর খানিকটা ফাঁকা জায়গা। তারপর পাহাড়ের সেই গুহামুখ—পাতালকালীব মন্দির। রঞ্জনাকে সেটা দেখিয়ে দিলেও সে মন দিলনা। তার মন আমার দিকে। ফের বলল, আমার কথার জবাব দিলেন না?

আপনি ইনটেলিজেন্ট মেয়ে, রঞ্জনা।

রঞ্জনা ছোট একটা শ্বাস ফেলল। বুঝলুম সে উত্তেজিত হয়েছিল। বলল, অন্যের প্রাইভেট ব্যাপাবে নাক গলানো আমার স্বভাব নয়। তবে প্রথমে আপনাকে দেখেই মনে হয়েছিল, আপনি আমার মতই পোড় খেয়েই শান্তি খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

মন্দিরের গুহার সামনে দশরথের সেদিনকার ছেঁড়া লতাপাতাগুলো মিইয়ে পড়ে আছে। সেখানে কয়েকটা গাঁদাফুল পড়ে রয়েছে। কেউ পুজো দিতে এসেছিল। বললুম, এই গুহার ভেতর পাতালকালী আছেন।

আপনার কাছে তো দেশলাই আছে। আসুন না ভেতরে যাই!

গুহার অন্ধকার মুখ দেখে আমার গা ছমছম করছিল সেদিনকার মতো। বুকের ভেতর প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকার নিয়ে এক আদিম পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। বললুম, কী দরকার ভেতরে গিয়ে? ভক্তি থাকলে এখান থেকেই প্রণাম করুন।

রঞ্জনা হাসল। দর্শনেই বেশি পুণ্য। আসুন না।

চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে বললুম, ভেতরে ঢোকা নাকি নিষেধ দশরথ বলছিল। কেউ দেখতে পেলে ঝামেলা হতে পারে।

রঞ্জনা জেদী মেয়ের মতো আমাকে হ্যাঁচকা টান মেরে গুহার মুখে নিয়ে গেল। ভেতরে ঢুকেও সে হাতটা ছাড়ল না। কয়েক পা এগিয়ে দেখলুম মেঝে মোটামুটি মসৃণ। ছাদটা মাথার ওপর হাতখানেক উঁচু। আরও কয়েক পা এগিয়ে দেশলাই জ্বেলে দেখি, ছাদটা ক্রমশ নিচু হয়েছে এবং মেঝেও নিচের দিকে নেমে গেছে। সুড়ঙ্গ বলে মনে হল। ভীষণ গা ছমছম করতে থাকল। বললুম, আর এগিয়ে কাজ নেই। বরং ফার্ম থেকে টর্চ নিয়ে পরে আসা যাবে।

রঞ্জনা বাধা মানল না। বলল, অত ভয় কেন? দেশলাই জ্বালুন।

ক্ষীণ আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। ঢালু জায়গায় ধাপ শুরু হয়েছে। ধাপে নামার পর দেশলাই নিভে গেল। রঞ্জনা আমার একটা হাত ধরে গা ঘেঁষে দাঁড়াল। গুহার ভেতরটা প্রতিধ্বনিময়। আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ দ্বিগুণ হয়ে শোনা যাচ্ছিল। বললুম, চলুন। ফিরে যাই।

রঞ্জনা শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, দর্শন না করে ফিরছি না। আসুন।

আমি শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিলুম। সে একধাপ নেমে গেল। সেই সময় আমার মধ্যে একটা চমক খেলে গেল। প্রাগৈতিহাসিক আদিম অন্ধকারে দাঁড়িয়ে এতক্ষণে নারীর শরীরের ঝাঁঝালো গন্ধ টের পাচ্ছি যেন। সে কি রঞ্জনার চুলের গন্ধ? তার শ্বাস-প্রশ্বাসের সৌরভ? আবিষ্ট হয়ে পা বাড়িয়ে নামতে গেলুম এবং তার সঙ্গে ধাক্কা লাগল। রঞ্জনা পড়ে যাবার মুহূর্তে আমাকে ধরে সামলে নিল। অস্ফুট স্বরে সে বলে উঠল, এই! পড়ে যাব যে!

আমার মুখের ওপর তার শ্বাস-প্রশ্বাসের ঝাপটা লাগল। ইচ্ছে করল, ওকে চুমু খাই কিন্তু আমার সহজাত এক বোধ আমাকে নিবৃত্ত করল। দেশলাই জ্বেলে বললুম, চলুন।

রঞ্জনা আস্তে বলল, এটা কি সত্যি মন্দির?

কেন?

যে মন্দিরে ভক্তির বদলে ভয় জাগে, সেখানে কোন পুণ্য হয় না।

এবার ভয় করছে তো?

একটু-একটু।

তাহলে ফিরে যাই, আসুন। ...

বাইরে খোলামেলায় পৌঁছে রঞ্জনার দিকে তাকালুম। তার মুখে যেন ক্লান্তি আর কেমন একটা বিষণ্ণতার ছাপ। গাছের নিচে একটা পাথরে বসল সে। বললুম, হঠাৎ কী হল বলুন তো?

রঞ্জনা অন্যপাশে ঘুরে কিছু দেখতে দেখতে বলল, আমি সত্যি ভয় পেয়েছিলুম।

কিসের ভয়?

রঞ্জনা হাত বাড়িয়ে ঝোপ থেকে পাতা ছিঁড়ে কুচি কুচি করতে থাকল। কিছু বলল না।

পাতালকালীর ভয়?

সে সোজা হয়ে আমার চোখে চোখ রেখে কেমন হাসল। উঁহু মানুষের ভয়।

আমাকে ভয় পাওয়ার কী আছে রঞ্জনা?

আপনি বড় হঠকারী। ..... বলে আবার পাতা ছিঁড়তে শুরু করল।

হাসবার চেষ্টা করে বললুম, হঠাৎ যদি মনে না পড়ত যে ওটা মন্দির, তাহলে ...

রঞ্জনা মুখ নামিয়ে নিঃশ্বাস মিশিয়ে বলল, জানি।

আমি অন্যদিকে ঘুরে সিগারেট টানতে থাকলুম। একটু দূরে একদল আদিবাসী মেয়ে জঙ্গলে কাঠ আনতে যাচ্ছিল। তারা থমকে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখে গেল। রাস্তায় একটা বাস আর একটা ট্রাক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মরিয়া হয়ে ছুটে গেল। তারপর রঞ্জনার দিকে ঘুরে ভীষণ চমকে উঠলুম। সে মুখ নামিয়ে পাতা কুচি করছে এবং তার চোখ দিয়ে জলের ফোঁটা গড়াচ্ছে। কাঁধে হাত রেখে ডাকলুম, রঞ্জনা! রঞ্জনা!

রঞ্জনা আলতোভাবে আমার হাতটা নামিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর দ্রুত ব্যাগ খুলে রুমাল বের করে চোখ মুছে একটু হাসল। .... আমি হঠাৎ হঠাৎ ভীষণ এমোনশনাল হয়ে পড়ি।

এমোশনাল হওয়ার অধিকার অন্যেরও আছে, রঞ্জনা।

রঞ্জনা চোখে মিনতি ফুটিয়ে বলল, তুমি আমার ওপর রাগ করো না নিরুপম। রাগ হয়তো তুমিই

করেছ আমার ওপর। রঞ্জনা হাঁটতে থাকল। ওর পাশে গিয়ে বললুম, এদিকে কোথায় যাচ্ছ?

জানি না। চলো না একটু ঘুরি।

ওর কণ্ঠস্বর এতক্ষণে স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। হাঁটতে হাঁটতে আমরা রাস্তায় পৌঁছলুম। তারপর রাস্তা ধরে চলতে শুরু করলুম। এমনি করে হেঁটে যেতে ভাল লাগছিল। কিন্তু আর কোনো কথা বলছিলুম না আমরা। রাস্তা বেঁকে উৎরাইয়ে নেমে নিচু জলার ওপর একটা ব্রিজ পেরিয়েছে। ব্রিজের কাছে গিয়ে রঞ্জনা মুখ খুলল। .... নিরুপম, তাহলে আমরা একটা সম্পর্কে পৌঁছে গেছি—তাই না?

হয়তো।

হয়তো কেন? আমরা পরস্পরকে তুমি বলছি!

একটু হেসে বললুম, পরস্পরকে ভালবেসে ফেলিনি তো?

এবার রঞ্জনা আমার ভঙ্গিতে বলল, হয়তো।

হয়তো কেন? এ পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছে, তাতে তাই প্রমাণিত হয়।

হলেও কোনো উপায় নেই।

কেন?

তুমি তো হবু বর ঈশিতার। রঞ্জনা খিলখিল করে হেসে উঠল। তারপব হাল্কা গলায় বলল ফের, না বাবা! ওসব ভালবাসা-টাসায় কাজ নেই। দু-দিনের জন্য বেড়াতে এসে শেষে কেলেঙ্কারি! শোনো নিরুপম, ব্যাপারটা এখানেই শেষ করে ফেলা যাক। লোকের সামনে আবার আমরা পরস্পরকে আপনি-টাপনি করব কিন্তু। হুঁ—এখানেই সব শেষ।

কৌতুকের ভঙ্গি করে বললুম শেষ করা যাবে কি? এ বড় বিপজ্জনক খেলা, রঞ্জনা!

মোটেও না। যে খেলা শুরু হতে গিয়ে ভেঙে গেল ...

ভাঙল কৈ?

আমি ভেঙে দিয়েছি।

না।

আমার না বলার মধ্যে রূঢ় গর্জন ছিল। রঞ্জনা যেন ভয় পেয়ে তাকাল আমাব দিকে। তারপর চোখ নামিয়ে নিল। একটু পরে জলার দিকটা দেখিয়ে আবার হাল্কা গলায় বলল, ইস্! কত হাঁস ওখানে! বন্দুক আনলে দারুণ হত কিন্তু।

বরাবর দেখেছি, আমার মধ্যে কী একটা আছে—অবাধ্য হিংস্র প্রাণীর মতো। নারীর শরীরের জন্য সে তুমুল গর্জন করে ওঠে। আবার হঠাৎ সে চুপ করে যায়। হয়তো সে জানে শরীর শুধু ক্লান্তি দেয়। তার একটা মন থাকা দরকার, সে বুঝতে পারে। নিজের মধ্যে শুদ্ধ নিষ্পাপ মন জাগিয়ে তোলার জন্য সে মাথা কোটে। আজ অন্ধকার গুহার ভেতর তাব গর্জন শুনে মনে হয়েছিল, আসলে এ তার কান্না। আমি রঞ্জনার দিকে তাকিয়ে ছিলুম। রঞ্জনা বুঝতে পারছিল, বাইরের কোনো কিছুতে আমার মনোযোগ নেই। একটু পরে সে বলল, চলো ফেরা যাক। ....

সারাপথ আমরা আর কথা বললুম না। ফার্মে গিয়ে দেখি, গন্ধমামা মাঠে গেছেন। সুখলাল নামে ওঁর কর্মচারীটির সঙ্গে সেদিন আলাপ হয়েছিল। সে আমাদের খাতির করে চা এনে দিল। দশটা বাজে প্রায়। গণেশজী ড্রাইভার যথারীতি ক্যানেলের ধারে আমতলায় মালতীর সঙ্গে প্রেম করতে গেছে। চা খেয়ে বললুম, সুখলালজী! ছিপ বের করুন। মাছ ধরি।

খামারবাড়ির লাগোয়া পুকুরে মার্কিন রুইয়ের ঝাঁক খেলে বেড়াচ্ছিল। রঞ্জনাও একটা ছিপ নিয়ে একটু তফাতে বসল। অনবরত খ্যাঁচ মারছিল সে। শেষে মাথার উপরকার গাছে বঁড়শি আটতে গেল।

সেই সময় দেখতে পেলুম ক্যানেলের ব্রিজ পেরিয়ে আসছে দশরথ। তার সঙ্গে আলাপন। আমি তাকিয়ে রইলুম সেদিকে। তাহলে আলাপন সত্যি এসে পড়ল? আমার মাথার ভেতরটা শূন্য লাগল।

সে আগের মতো একটু খুঁড়িয়ে হাঁটছিল। দূর থেকে আমাকে দেখে সে হাসিমুখে হাত নাড়ল।

রঞ্জনার বঁড়শি ছাড়িয়ে দিচ্ছিল সুখলাল। রঞ্জনা দাঁড়িয়ে ছিল। সে দশরথদের দেখতে পেয়েছে। বললুম, রঞ্জনা! যার কথা বলছিলুম— সে এসে পড়েছে। ওই দেখ।

রঞ্জনা চমক খাওয়া গলায় বলল, সে কী! ও তো আলাপন। ও কেন আসছে? আশ্চর্য তো!

এবার আমার চমকানোর পালা। তুমি ওকে চেনো নাকি?

রঞ্জনা গম্ভীর হয়ে শুধু বলল, হ্যাঁ। ...

বার

আমাকে আরও অবাক করে আলাপন রঞ্জনাকে বলল, বউদি! তুমি এখানে? তার মুখেও খানিকটা বিস্ময় ছিল। রঞ্জনা একটু মাথা নাড়ল শুধু। তারপর আলাপনের যা স্বভাব, ধুপ করে বসে পড়ল গাছের গুঁড়িতে। আমার হাত থেকে ছিপটা নিয়ে বলল, দ্যাখ কতগুলো মাছ ধরতে পারি।

যে কোন অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নেবার ক্ষমতা তার দেখেছি। তার দিকে তাকিয়ে রইলুম চুপচাপ। কোনো প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করছিল না। সুখলাল রঞ্জনার বঁড়শি গাছের ডাল থেকে ছাড়িয়ে দিয়ে চলে গেল। রঞ্জনা ছিপটা আর ফেলল না। মুঠোয় লাঠির মতো চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রইল। তার দৃষ্টি মাঠের ওধারে ন্যাড়া টিলার দিকে। তাকিয়ে দেখে বুঝতে পারছিলুম তার ওপর আলাপনের গাঢ় ছায়া জমেছে।

স্তব্ধতাটা অস্বস্তিকর। বললুম, তুই রঞ্জনাকে বউদি বললি কেন রে?

আলাপন ছিপে একটা ব্যর্থ খ্যাঁচ মেরে হাসল। বউদিকে বউদি বলব না তো কি ঠাকুমা বলব?

রঞ্জনা তোর কোন সূত্রে বউদি হল?

দাদার সূত্রে। আলাপন মন দিয়ে বঁড়শিতে ময়দার টোপ গাঁথতে গাঁথতে বলল। .... পুকুরে প্রচুর মাছ। কিন্তু বড্ড ফিচেল। মাই গুডনেস! এগুলো অ্যামেরিকান রুইমাছ না?

পেছনে দশরথ দাঁড়িয়ে ছিল। জবাব দিল, জী বাবুদাদা ওহি আছে। লেকিন এখন সিজিন নেই, তাই হয়রান করবে আপনাকে। বিষ্টির সময় এলে দেখতেন।

বললুম, দশরথ! গিয়ে বলো, আরও একজন গেস্ট আছে। আর দাখো, যদি কয়েককাপ চা আনতে পারো।

দশরথ চলে গেল ফার্মসহাউসের দিকে। আলাপন রঞ্জনার দিকে ঘুরে বলল, একী বউদি! তুমি ছিপ ফেলছ না কেন?

রঞ্জনা আস্তে বলল, তুমি ধরো দেখি।

তুমি কি ভড়কে গেলে আমাকে দেখে? আলাপন হাসতে লাগল। আমি তোমার কাছে আসিনি। আমি কারও রিপ্রেজেন্টেটিভ নই। আমি এসেছি নিরুর কাছে। নিরু আমার ফ্রেণ্ড। নিরু, সিগারেট দে। ধরিয়ে দে, আমার হাত এন্‌গেজড .....।

রঞ্জনা কয়েক পা এগিয়ে আমার পেছনে মোটা শেকড়টার ওপর বসল। এ মুহূর্তে প্রকৃতি খুব শান্ত। হাল্কা একটানা বাতাস বইছে। পুকুরের জলে তিরতিরে কাঁপন ছড়িয়ে যাচ্ছে। ওধারে নুয়েপড়া ঝোপের তলায় এক ঝাঁক চীনে হাঁস বসেছিল। তারা সাবধানে জলে নামল। মাথার ওপর টুই টুই করে পাখি ডাকতে লাগল।

রঞ্জনা ডাকল। আলাপন!

ডিস্টার্ব কোরো না। যা জিজ্ঞেস করার নিরুকে করো বউদি! প্লিজ! আলাপন ঝুঁকে গেল ছিপের দিকে।

রঞ্জনা আবার চুপ করে গেলে ওর দিকে ঘুরে বসলুম .... হ্যাঁ, বলো রনি!

কী বলব?

আলাপন তোমাকে বউদি বলছে কেন?

রঞ্জনা এবার একটু হাসল। শুনলে তো!

আলাপন, তোর আবার দাদা-টাদা ছিল নাকি? কেমন দাদা রে?

আলাপন আবার ব্যর্থ খ্যাঁচ মেরে বঁড়শিটা মাথার ওপরকার একটা ডালে আটকে দিল, হয়তো ইচ্ছে করেই। তারপর ছিপটা দোদুল্যমান অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে বলল, অসম্ভব! আয় নিরু, তোর সঙ্গে জরুরি কথাগুলো সেরে নিই। আমি এখনই ফিরে যাব। বউদি, দু'মিনিটের জন্য নিরুকে নিয়ে যাচ্ছি।

রঞ্জনা রাগ করতে গিয়ে হেসে ফেলল। .... চিরকাল তুমি তেমনি অসভ্য থেকে গেলে অন্তু।

আমি কি ওর গার্জেন?

আলাপন বলল, ওরে বাবা! তুমি প্রচণ্ড দিদিমণি কিনা! বিশ্বসুদ্ধ তোমার ক্লাসরুম।

সে আমাকে কাঁচা রাস্তায় নিয়ে গেল। ভুট্টা আর অড়হরের ক্ষেতের মাঝখানে একটা ছোট ঝাঁকড়া গাছ। তার তলায় একটা বড় পাথর। তার গা ঘেঁষে ফার্মের নালা। পাথরটাতে বসে সে বলল, দু'মিনিট বলে এলুম। একটু দেরিও হতে পারে। আরেকটা সিগারেট দে। আমার প্যাকেটটা শেষ।

পায়ে হেঁটে এতটা পথ আসতে পারলি দেখে আশ্চর্য লাগছে আলাপন।

আলাপন সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়ার সঙ্গে বলল, তাহলেই আর্জেন্সি বুঝতে পারছিস ঃ

পারছি।

অতনুকে পুলিশ পিটিয়ে মেরে ফেলেছে।

আমার ভিতরটা হিম হয়ে গেল। কোনো কথা বলতে পারলুম না। আলাপনও অনেকক্ষণ চুপচাপ সিগারেট টানল। তারপর বলল, অতনু জেনেশুনেই সারেণ্ডার করতে গিয়েছিল পুলিশের কাছে। পানুদার পরামর্শে। তুই তো জানিস, পানুদাটা চিরদিন হিপোক্রিট। আমার ধারণা, পানুদা হায়ার অথরিটির সঙ্গে একটা রফায় এসেছে। তারপর একে-একে সবাইকে ধরিয়ে দিতে চাইছে। আমাকে বলেছিল সারেণ্ডার করতে। আমার সন্দেহ হয়েছিল। যাই হোক, নিজের জন্য আমি ভাবি না। ভাবনা ছিল শুধু মৃগাংক আর তোর জন্য।

মৃগাংক এখন কোথায় আছে?

মেদিনীপুরের গ্রামে। সেখানে ওর আত্মীয়-টাত্মীয় আছে।

আমার ঠিকানা কে দিল তোকে?

তোর ভবানীপুরের মাসীমা। কিন্তু তুই দেখছি অনেকটা সেফ। কারণ ওই লোকটা—দশরথের কথাবার্তা শুনে বুঝলুম, তোর এই মামা ভদ্রলোক খুব ইনফ্লুয়েন্সিয়াল এখানে। তবু সাবধানে থাকিস। আর . আলাপন একটু হাসল। আর এসবের চেয়েও একটা জরুরি কথা আছে তোর সঙ্গে।

অস্বস্তি নিয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম।

আলাপন বলল, কথাটা একটু আগে আমার মাথায় এসেছে। রনি বউদিকে এখানে আবিষ্কার করার পর।

কী কথা-রে?

কিন্তু আগে আমার জানা দরকার, তোরা সেটেল করে ফেলেছিস কি না।

কিসের বল্ তো?

তোরা কি বিয়ে করবি?

ভ্যাট্! কী যা তা বলছিস কিছু না জেনে। রনির সঙ্গে আমার এখানে এসে আলাপ হয়েছে। ওর এক বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে এসেছে নওলপাহাড়ীতে। একটু খামখেয়ালী স্বভাবের মেয়ে—হুট করে চলে এল ফার্মে।...

আলাপনকে আগাগোড়া সব ব্যাপারটা জানিয়ে দিলুম। শোনার পর সে বলল, রনি বউদি একটু অ্যাডভেঞ্চারার টাইপের মেয়ে। যাই হোক, তাহলে আমার আর জরুরি কথা কিছু রইল না।

কিন্তু হেঁয়ালি না করে আসল ব্যাপারটা বল্ তো খুলে।

আমাদের ফ্যামিলির সঙ্গে তোর জানাশুনো নেই। আমরা তিন ভাই, এক বোন। বড়দা থাকে দিল্লিতে ফ্যামিলি নিয়ে। আমার মেজদাকে তুই দেখিসনি। নদীয়ার একটা কলেজে লেকচারার। মেজদার বউ ছিল এই মহিলা। ছিল—তার মানে এখন নেই।

আশ্চর্য। তাই বল!

কোনো আশ্চর্য নেই। ওঠ, বউদি ভাববে ওর নামে তোকে কী লাগাচ্ছি।

কতদিন আগে ওদের ডিভোর্স হয়েছে?

প্রায় বছরখানেক হবে। মেজদা ইতিমধ্যে আবার বিয়ে করেছে। কাজেই তুই যদি রনি বউদিকে—সরি, আমার বোধ হয় আর বউদি বলাটা ঠিক হচ্ছে না। না রে?

আলাপন হাসতে লাগল। বললুম, তুই কি রনি সম্পর্কে আমাকে সাবধান করতে চাইছিলি?

ভদ্রমহিলার সব ভাল, কিন্তু ভীষণ মেজাজী। এ ধরনের মেয়েরা কোনোদিন কারুর সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে চলতে পারে না। তুই ভাবতে পারবিনে নিরু, মেজদা কী অসম্ভব সাদাসিধে আর ভদ্র প্রকৃতির মানুষ। আমার মতো কুলকলঙ্ক নয়।

কী নাম রে তোর মেজদার?

সন্দীপন। আমার চেয়ে মোটে দু'বছরের বড়। উই আর জাস্ট ফ্রেণ্ডস।

তুই কয়েকটা দিন থাক আলাপন। বুঝতেই পারছিস, এখানে তোর থাকার রিস্কটা কম। তাছাড়া তুই থাকলে আমিও ফার্মে থাকব। নওলপাহাড়ীর চেয়ে এখানটায় থাকতে আমার ভাল লাগছে। কী সুন্দর নির্জন পরিবেশ দেখতে পাচ্ছিস!

বাপ্‌স! এসব প্রকৃতি-টকৃতি আমার মোটেও ভাল লাগে না। মনে হচ্ছে, সাউণ্ডপ্রুফ ঘরে ঢুকে পড়েছি।

অন্তত আজকের দিনটা থেকে যা আলাপন।

আলাপন মুখে ভাবনা এবং দ্বিধা ফুটিয়ে বলল, দেখি। ...

রঞ্জনাকে পুকুরঘাটে দেখতে পেলুম না। ফার্মহাউসে গিয়ে দেখি গন্ধমামার সঙ্গে সে জমিয়ে ফেলেছে। বিষয় বটানি। এ ঘরটায় গন্ধমামার অফিস-কাম-বেডরুম। বেশ বড়ো ঘর। র‍্যাকভর্তি সুদৃশ্য ইংরিজী বই। সবই ফার্মিং সংক্রান্ত। গাছপালা পোকামাকড় নিয়ে লেখা বইও প্রচুর। বিদেশী ফার্মিংয়ের পত্র-পত্রিকা অসংখ্য। ঘরের ভেতরে ঢুকলে মনে হয় শহরে আছি।

আলাপনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলুম গন্ধমামার। খুশি হয়ে বললেন, খুব ভাল, খুব ভাল। কিন্তু ইয়ং ম্যান, তুমি এত রোগা কেন? আমার কথা শোনো। এখানে নির্ভেজাল পরিবেশে কিছুদিন কাটিয়ে গেলে দেখবে, আমার মতো তাগড়াই হয়ে যাবে। ওই দশরথকে দেখ। আর ঐ সুখলাল। এক মিনিট, বাবর আলিকে ডাকি। তাকে দেখলে তুমি ...

বাধা দিয়ে বললুম, কিন্তু গণেশজী রোগা।

গন্ধমামা চোখ টিপে হেসে চাপা গলায় বললেন, ও গাঁজা খায় যে। তারপর আলাপনের পায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, পায়ে কী হয়েছে?

বিব্রত বোধ করছিলুম। আলাপন ঝটপট বলল, মিছিলে পুলিশ গুলি ছুঁড়ছিল। ছাদে দাঁড়িয়েছিলুম, পায়ে গুলি লেগেছিল।

আমি রঞ্জনার দিকে তাকালে সে চোখ নামিয়ে পত্রিকার পাতা ওলটাতে থাকল। মুখটা তেমনি গম্ভীর। গন্ধমামা বিরক্ত মুখে বললেন, তোমাদের কলকাতায় খালি ওই।

তারপর ঘড়ি দেখে ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ালেন। .... তোমরা আড্ডা দাও। যত খুশি ঘোরো। আমি একবার গুরুডি ঘুরে আসি। নিরু, পরে তোমাকে গুরুডি আশ্রমে নিয়ে যাব'খন। দারুণ জায়গা।

গন্ধমামা বেরিয়ে গেল। রঞ্জনা পত্রিকার পাতায় চোখ রেখে বলল, দশরথকে চা পাঠাতে বলে উধাও হলে! কথা হল? দু-মিনিট বলে আধঘণ্টা।

আমি সুখলালকে ডেকে আবার চা দিতে বললুম। আলাপন বলল, রাত জেগে এসেছি। তারপর পায়ে হেঁটে পাক্কা ছ'মাইল জার্নি। আমার ঘুম পাচ্ছে, নিরু।

মামাবাবুর বিছানায় শুয়ে পড়।

বকবেন না তো?

দেখলিনে কেমন মানুষ। ... বরং খুশি হবেন।

আলাপন গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। চোখ বুজে বলল, চা এলে যদি দেখিস ঘুমিয়ে গেছি, ডাকবিনে।...

রঞ্জনা পত্রিকা থেকে মুখ তুলে আলাপনের দিকে তাকাল। তারপর ডাকল, অন্তু!

আঃ! প্লিজ ডোণ্ট ডিসটার্ব বউদি!

তুমি কি এখনও পালিয়ে বেড়াচ্ছ? কেস মেটেনি!

আলাপন পাশ ফিরে শুল। আমি আস্তে বললুম, কিসের কেস?

রঞ্জনা ভুরু কুঁচকে বলল। একজনের পায়ে গুলির দাগ, আরেকজনের পেটে ড্যাগারের চিহ্ন। আবার

প্রশ্ন করার মানে কী?

আলাপন মুখ ওপাশে রেখে ঘুম-জড়ানো গলায় বলল, নিরু আমার চেয়ে ডেঞ্জারাস। ডোণ্ট ট্রাই টু ট্যাক্ল হিম, বউদি।

রঞ্জনা তার দিকে তাকিয়ে রইল নিষ্পলক চোখে। তারপর উঠে গিয়ে র‍্যাক থেকে একটা বিরাট বই এনে পাতা ওল্টাতে থাকল। বইটা রঙীন ছবিতে ভরা। এইসময় সুখলাল চায়ের ট্রে রেখে গেল। প্লেটে একগাদা স্ন্যাক্স। আলাপন পাশ ফিরে থেকে বলল, আমার মুখের কাছে রেখে যা, নিরু। শুয়ে শুয়ে খাব। ক্ষিদেও পেয়েছে।

রঞ্জনা বই রেখে উঠে এল। প্লেটে কিছু স্ন্যাকস আর চায়ের কাপ আলাপনের মুখের পাশে রেখে বলল, বিছানা নোংরা কোরো না যেন।

তারপর সে আমার পাশেই বসল চায়ের কাপ নিয়ে। বললুম, আমাদের ক্ষতচিহ্নের কথা বললে, রনি। আশা করি তুমিও অক্ষত নও।

হয়তো না। রঞ্জনা শান্তভাবে হাসল। আমার ক্ষতচিহ্ন অবশ্য বুকের ভেতর। বাইরে থেকে দেখা যাবে না।

সে হয়তো তোমার ইচ্ছাকৃত। তুমি আহত হতে চেয়েছ বলে।

বাজে বোকো না।

রঞ্জনা চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বাইরে চলে গেল। দেখলুম, বারান্দার নিচে সিঁড়ির ধাপে সে দাঁড়িয়ে আছে। ওর খুব কাছ ঘেঁষে একটা বিদেশী হলুদ ক্যাকটাস, বর্শার ফলকের মতো। গাঢ় লাল কাঁটা সেই ত্রিকোণ হলুদ ফলকে। একটা সাদা গঙ্গাফড়িং বসে আছে কাঁটায়। রঞ্জনা একটা হাত বাড়িয়ে তাকে ধরার ভান করছিল।

আমার মধ্যে একটা চমক জাগল। এই কয়েকটি দিন আমার বা রূপাইদের পরিপ্রেক্ষিতে থেকে রঞ্জনাকে দেখছিলুম, বিচ্ছিন্ন করে দেখিনি। এখন যাকে দেখলুম সে রঞ্জনা তার নিজের রঞ্জনা। আমার কেমন ভয় করছিল.....।

আলাপন সারাদুপুর ঘুমোল। গন্ধমামার পাত্তা নেই। ঘুম থেকে উঠে আলাপন ফার্মের সেই পুকুরে খুব সাঁতার কাটল। রঞ্জনা বারান্দায় বসে বইপত্রে ডুবে রইল। খাওয়ার পর আলাপনের তাড়ায় বেড়াতে গেলুম ফার্মের ভেতরে। অনিচ্ছার ভাব দেখিয়ে রঞ্জনাও আমাদের সঙ্গে গেল।

ভুট্টা, অড়হর, আখ আর ধানক্ষেতের ভেতর দিয়ে পশ্চিমের সেই ন্যাড়া পাথরের টিলাটার কাছে গেলুম আমরা। সেখানে পরিচয় হল ফার্মের ম্যানেজার বাবর আলির সঙ্গে।

বাবর আলির নাম শুনেছিলুম। তাকে দেখিনি। আজ দেখে অবাক লাগল। অসম্ভব ফর্সা, লম্বা, মার্কিন গড়নের এক যুবক। অবশ্য রোদে বাতাসে একটু পোড়খাওয়া চেহারা। প্রকাণ্ড কালো অ্যালসেশিয়ান কুকুর নিয়ে পাম্পিং মেসিনের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। আমাদের দেখে আলাপ করতে এল। ওর কুকুরটা আমাদের আড়ষ্ট শরীর শুঁকে দূরে চলে গেল। রঞ্জনা এমন ভয় পেয়েছিল যে, সে আলাপনের হাত ধরে ফেলেছিল শক্তভাবে।

বাবর আলির ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ারের। অথচ সে চাষবাসের ব্যাপারে কেন এসেছে, তার কৈফিয়ত আমাদের কাছে অদ্ভুত লাগছিল। আরা জেলার গ্রামে তার জন্ম। অভিজাত বাঙ্গালী মুসলিম-পরিবারের ছেলে। চাকুরি করত গাজিয়াবাদের এক বড় সরকারী কারখানায়। কিন্তু তার রক্তে আছে খোলামেলা আকাশ, শস্যক্ষেত্র, বৃক্ষ, নদী, পাখী, প্রজাপতি। গন্ধমামা গাজিয়াবাদে ফার্মের জন্য ট্রাক্টর কিনতে গিয়েছিলেন। সেইসূত্রে পরিচয়। আর গন্ধমামার যা স্বভাব। পরকে শিগগির আপন করতে দেরি হয় না।

আমরা ইংরেজিতে আলাপ করছিলুম। আলাপন অবাক হয়ে বলল, আপনি এই প্রিমিটিভ জায়গায় চলে এলেন! ভারি অদ্ভুত লোক তো আপনি!

বাবর আলি বিনীতভাবে বলল, আমি গ্রামের ছেলে।

আলাপন হাসতে লাগল। ... আমি আপনার মতো নেচারলাভার দেখিনি মশাই। এই নিরু খুব প্রকৃতি-প্রকৃতি করে। পদ্যটদ্য লিখত একসময়। কিন্তু আপনি ধরে নিতে পারেন, আর তিনদিন পরে

সে পালাই-পালাই করবে। তারপর সে রঞ্জনাকে দেখিয়ে বলল, এই ভদ্রমহিলা অবশ্য গ্রামের স্কুলে মাস্টারী করেন। এঁর কথা আলাদা।

বাবর আলি রঞ্জনাকে বলল, দেন ইউ আর এ·টিচার?

রঞ্জনা মাথা দোলাল।

বাবর আলি ন্যাড়া পাহাড়ের দিকটা দেখিয়ে বলল, ওদিকে আদিবাসীদের বস্তি আছে। বাবুজী আব আমার ইচ্ছা আছে ওদের একটা স্কুল করে দেব।

আলাপন বাংলায় বলল, বউদি, চান্স ছেড়ো না। তোমার আশ্রমের স্কুলে বড় কড়াকড়ি। এখানে অবাধ স্বাধীনতা পাবে। তুমি তো স্বাধীনতার পূজারি, সরি, পূজারিণী!

রঞ্জনা কড়া চোখে তাকাল। বাবর আলি একটু হেসে বলল, হামি থোড়াথোড়া বাংলা সমঝাতা। লেকিন—আই কাণ্ট স্পিক।

তেরো

কাল সন্ধ্যায় ক্যানেলের স্লুইসগেটের কাছে কংক্রিট চত্বরে বসে থাকতে থাকতে আলাপন হঠাৎ উঠে গিয়েছিল। একটু পরে ক্যানেলের ওপার থেকে তার গলা শোনা গেল। বাবব আলিকে ডাকছিল সে।

বাবর আলি আর তার অ্যালসেশিয়ান চলে গেল আলাপনের কাছে। অন্ধকারে ওদের হারিয়ে যেতে দেখলাম। রঞ্জনা বলল, কোথায় গেল ওরা? তার ওপর ওঠার ভঙ্গী করল। আমি তাব হাত ধবে টেনে বসিয়ে দিলুম। তখন রঞ্জনা চাপা গলায় বলল, আঃ! কী অসভ্যতা করছ? কিন্তু সে আর ওঠাব চেষ্টা করল না।

আলাপনের কথা ভেসে এল। নিরু, তোরা একটু বস্' আমরা আসছি।

চেঁচিয়ে বললুম, কোথায় যাচ্ছিস?

বস্তিতে।

দাঁড়া, আমরাও যাচ্ছি।

আলাপনের জবাব এল না। কিন্তু আমার আর হাঁটতে ইচ্ছে কবছিল না। বাবর আলির টর্চের আলো ক্যানেলের ওপারে মাঝে-মাঝে ঝিলিক দিচ্ছিল। অ্যালসেশিয়ানটার গন্ধ পেযে ওদিকে বস্তির কুকুরগুলো চ্যাচামেচি জুড়েছে ততক্ষণে। বললুম, আলাপনটা সত্যি অদ্ভুত।

রঞ্জনা আস্তে বলল, তুমিও কম নও।

কেন?

আমাকে যেতে দিলে না যে?

আলাপন হয়তো মহুয়ার খোঁজে গেল। তাই তোমার যাওয়া উচিত হত না।

মহুয়া মানে?

মদ।

রঞ্জনা চুপ করে থাকল কয়েক মিনিট। তারপব ছোট্ট একটা শ্বাস ছেড়ে বলল, তুমি খাও না?

আমার জবাব না পেয়ে সে অন্ধকারে মুখ ঘুরিয়ে হয়তো বস্তিটাকে খুঁজল। এতক্ষণে কানে এল, ঢোলের শব্দ শোনা যাচ্ছে। বাতাস বইছে এদিক থেকে। বাতাসটা ক্রমশ জোরালো হয়ে উঠছে। আদিবাসী বস্তিতে আলাপন এক ধরনের আনন্দ লুটবে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি অস্বস্তিতে পড়ে গেলুম। মাতাল হয়ে সে ফার্মে ফিরে গন্ধমামার সামনে পড়লে কী ঘটবে কে জানে! মাতাল সম্পর্কে গন্ধমামার মনোভাব অবশ্য আমার জানা নেই। তবে উনি সমাজসেবক বা দেশসেবক মানুষ। ভোটে দাঁড়াতে হয় ওঁকে।

রঞ্জনা আমার নীরবতার দিকে লক্ষ্য রেখেছিল। সে আমার পাঁজরে খোঁচা মেরে বলল, কী? তুমি খাও না মদ?

একটু হেসে বললুম, খেলে কি তুমি ঘৃণা করবে আমাকে?

আমার ঘৃণায় তোমায় কী এসে যায়?

যায়। চপলতা করে বললুম। তোমাকে ভীষণ ভালবেসে ফেলেছি যে!

রঞ্জনা রাগের ভঙ্গী করে একটু সরে গেল। ভ্যাট্! খালি ওই আজেবাজে কথা তোমার। ভালবাসার তুমি কি বোঝো?

ব্যাপারটা খুবই প্রাকৃতিক রনি। মানুষের রক্তে আছে।

রঞ্জনা গলার স্বর বদলে বলল, এপর্যন্ত কতজনকে ভালবেসেছ?

মাত্র একজনকে। এবং সে তুমি।

রঞ্জনা হাসতে লাগল। নেহাত হাতের কাছে পেয়ে গেছ, তাই। আর তুমি কি ভেবেছ বলব?

বলো!

ভেবেছ আমি খুব সহজলভ্যা।

সিগাটে ধরিয়ে জ্বলন্ত দেশলাই কাঠির আলোয় ওর মুখটা দেখার চেষ্টা করলুম। ভীষণ বাতাস। পারলুম না। নিচে ক্যানেলের জলে নক্ষত্রপুঞ্জ ভেঙে যাচ্ছে। ঝিলিমিলি ছাড়িয়ে যাচ্ছে বহুদূর। অন্ধকারে গাছপালা দুর্বোধ্য শব্দে কিছু বলার চেষ্টা কবছে। আমাব চারপাশে প্রাকৃতিক আবেগ এবং আমার ওপর সেই আবেগ ঝাঁপিয়ে পড়ছে মুহুর্মুহু। কী এক অভিমান আমাকে পেয়ে বসছিল। চুপ করে থাকলুম।

রঙ্গনা আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, রাগ করলে নিরু?

আমার রাগে তোমার কী এসে যায়? যেহেতু তুমি তো ভালবাসার ধারে-কাছে দাঁড়িযে নেই।

হঠাৎ রঞ্জনা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে এল। আমি কংক্রিটচত্বর থেকে জলে গড়িয়ে পর্ডছিলুম আর একটু হলে। শক্ত হয়ে বসে ওর একমুখ চুম্বন নিলুম। ওর শ্বাস-প্রশ্বাসের আশ্চর্য এক গন্ধ— বড় অপার্থিব সেই সুগন্ধ, পৃথিবীর কোনো ফুলের হয়তো সেই সুঘ্রাণ। এই কি তাহলে প্রেমিকার প্রকৃত ঘ্রাণ? একটু পরে সে মুখ সরিয়ে নিল। তার শ্বাস-প্রশ্বাস তীব্র হয়ে উঠেছিল। তাবপর অন্ধকারে আবছা দেখলুম তাব মুখ দু' হাঁটুর ফাঁকে নেমে যাচ্ছে। ক্রমশ সে থিতিয়ে যাচ্ছিল যেন। হঠকাবিতাব প্রচণ্ড ধাক্কা থেকে নিজেকে সামলে নিচ্ছিলুম। এক সময় তার কাঁধে হাত বেখে ডাকলুম, বনি'

বহুদূর থেকে তার ক্ষীণ সাড়া ভেসে এল। উঁ?

আমি তার দিকে ঝুঁকে গেলুম। আস্তে বললুম, আমাব জীবন খুব অনিশ্চিত, বনি। মামাবাবু সব কিছু জানেন না। মামীমাও না। তাই ঈশিতাকে জুটিযে দিতে চাইছেন। অথচ আমার জীবন

বঞ্জনা মুখ তুলে বলল, জানি।

একটু অবাক হয়ে বললুম, কতটুকু জানো?

আলাপনকে যতটা জানি।

আলাপনের পেছনে আছে পুলিশ। কিন্তু আমার পেছনে আছে এক সাংঘাতিক বর্নকিলার।

বঞ্জনা আস্তে বলল, তার মানে?

একবাব সে চেষ্টা কবেছিল। আলাপনদের চেষ্টায় বেঁচে গেছি। আমাকে স্ট্যাব করেছিল জানো?

রঞ্জনা একটু চমকে সরে এল কাছে। আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, কেন? কী করেছিলে তুমি?

সে অনেক কথা। সিগারেটটা জলে ছুঁড়ে ফেলে বললুম, লোকটার ছোট ভাইকে আমি গুলি করে মেরেছিলুম—বিশ্বাসঘাতক ছিল ছেলেটা। ওরা দু'ভাই, দাদা এক পলিটিক্যাল দলের পোষা গুণ্ডা। ভাই বিপ্লবী রাজনীতি করত। বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ওকে খতম করতে হল। তারপর একদিন বেলেঘাটার একটা গলিতে আমাকে স্ট্যাব করল ওর দাদা।

রঞ্জনা আমার কাঁধে চিবুক রেখে বলল, কলকাতা অনেক দূর। তুমি ওসব কথা ভেবে না।

ভাবতে হয়। আসলে আমি পালিয়ে বেড়াচ্ছি, রনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পালিয়ে কেউ বাঁচে না।

রঞ্জনা আমাকে আদর করতে করতে বলল, চুপ করো।

আমার বুকের ভেতর প্রচণ্ড আবেগ চাপ দিচ্ছিল। বললুম, নওলপাহাড়ী কতদিন আমার ভাল লাগবে ভাবছ? যদি তুমি এখানে না থাকতে, কয়েকদিনের মধ্যে তেতো হয়ে যেত নওলপাহাড়ী। সত্যি বলছি রনি, এই প্রিমিটিভ জগতে বেশিক্ষণ থাকা যায় না।

রঞ্জনা আবার আমার ঠোঁটে একটা চুম্বন রাখার পর বলল, যদি বরাবর আমি থাকি নওলপাহাড়ীতে, তোমার ভাল লাগবে?

একটু হেসে বললুম, তুমি কীভাবে থাকবে?

রঞ্জনা হাসতে লাগল। ... ওই যে শুনলুম, তোমার মামাবাবুর স্কুল করার কথা। ওঁকে বললে নিশ্চয়ই খুশি হবেন। বলব, আপাতত মাইনেকড়ি চাইনে। একটু সোশ্যালওয়ার্ক করার সুযোগ চাই।

উৎসাহ দেখিয়ে বললুম, দারুণ হয় তাহলে। আমি বলব মামাবাবুকে। ...

চৌদ্দ

নওলপাহাড়ীর সেই কয়েকটা দিনের কথা ভাবলে এখন ভারি অবাক লাগে। যেন একটা টানা স্বপ্ন দেখেছিলুম—অদ্ভুত একটা রোমান্টিক বসন্তকালের কয়েকশো ঘণ্টার জীবন! ভাগ্যিস ডায়রির মতো করে লিখে রেখেছিলুম প্রতি দিন-রাত্রির বিবরণ! টুকরো সংলাপ! পারিপার্শ্বের টুকরো টুকরো নোট। দশবছর পরে সেগুলো জোড়াতাড়া দিয়ে কাহিনীর আকারে সাজিয়ে এখন পড়তে গিয়ে নিজেরই অবাক লাগে।

সেই সুন্দর বসন্তকালে নওলপাহাড়ীর পাহাড়ে-প্রান্তরে প্রাকৃতিক এক আবেগ বিস্ফোরিত হয়েছিল আগুনজ্বালা ফুলের ব্যাপকতায়। চারদিকে সব সবুজও গনগনে আঁচ ছড়াচ্ছিল। জীবজগৎ জুড়ে একটা আলোড়ন শুরু হয়েছিল। সে ছিল সত্যিকার ভালবাসার ঋতু—নওলপাহাড়ীতে।

কিন্তু শেষপর্যন্ত কোথাও পৌঁছুনো গেল না।

সে-রাতে গন্ধমামা যখন রঞ্জনাকে নওলপাহাড়ীতে পারমিতাদের বাড়ি পৌঁছে দিতে গেলেন এবং আমি মত্ত-মাতাল আলাপনকে নিয়ে হিমসিম খাচ্ছিলুম, তখনও জানতুম না আমার ভবিষ্যৎ আমার হাতে নেই।

সকালে গন্ধমামা জিপ নিয়ে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু কিছু বলেননি। ঝটপট ব্রেকফাস্ট সেরে আলাপনকে নওলপাহাড়ী স্টেশনে পৌঁছে দিতে গেলুম।

স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে নিরিবিলি একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে দু'জনে সিগারেট টানতে টানতে কথা বলছি, হঠাৎ দেখি স্টেশন ঘরের গেট দিয়ে রঞ্জনা আসছে। তার সঙ্গে পারমিতা। দু'জনেরই কেমন রাগী রুক্ষ চেহারা। রঞ্জনার কাঁধে একটা কিটব্যাগ। পারমিতা তাকে যেন কিছু বোঝাবার চেষ্টা করছিল।

হনহন করে এদিকে এসেই রঞ্জনা আমাদের দেখল। আমি ব্যস্তভাবে বললুম, কী ব্যাপার?

পারমিতা গম্ভীরমুখে বলল, রনি চলে যাচ্ছে।

সে কী! কেন?

পারমিতা তেমনি গাঢ় মুখে বলল, বাড়ি ফিরে শুনবে নিরুদা! তোমার মামীমা ভদ্রমহিলা সত্যি একটি জিনিস! খামোকা ওকে যাচ্ছেতাই অপমান করলেন কাল রাত্তিরে। আবার সকাল বেলা এসে শাসিয়ে-টাসিয়ে....

রঞ্জনা ওকে থামিয়ে দিয়ে টানতে-টানতে সরিয়ে নিয়ে গেল দূরে। আমি ওদের অনুসরণ করলুম। আলাপন মুচকি হেসে বলল, তুই চিরকাল একটা রামছাগল মাইরি! কোথায় যাচ্ছিস?

ওর কথা গ্রাহ্য করলুম না। রঞ্জনার সামনে গিয়ে বললুম, মামীমা তোমাকে অপমান করেছেন—সেজন্য তুমি চলে যাচ্ছ কেন রনি? তুমি তো মামীমার বাড়ি আসনি!

রঞ্জনা দূরে তাকিয়ে রইল। ওকে দেখে চমকে উঠলুম এতক্ষণে। এ কোন রঞ্জনা? এ তো সেই প্রেমিকা নয়, এ এক রুক্ষ কঠিন মহিলার প্রতিমূর্তি! বয়সও বেড়ে গেছে যেন।

পারমিতা চাপা গলায় আমার দিকে ভর্ৎসনার দৃষ্টি ফেলে বলল, তোমারও একটু ভেবে দেখা উচিত ছিল নিরুদা। সারাদিন সেই রাত অব্দি ফার্মে থাকলে, এদিকে কত বিশ্রী কথাবার্তা তোমাদের বাড়িতে! রূপাই পর্যন্ত! তাছাড়া তুমি যখন জানো, ঈশিতার সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা হচ্ছে

চুপ করো তো পারু!

পারু রাগী চোখে দূরের দিকে তাকিয়ে রইল। আমি রঞ্জনাকে ডাকলুম, রনি!

রঞ্জনার ঠোঁটের কোণায় অদ্ভুত একটা হাসি ফুটে উঠল। বলল, বলুন নিরুপমবাবু!

আস্তে বললুম, কিন্তু আমার কি দোষ রনি?

রঞ্জনা ঘড়ি দেখে বলল, পারু, ট্রেনের সময় তো হয়ে গেছে। সিগন্যাল দিচ্ছে না কেন?

পারমিতা বলল, সব স্টেশনে থামে যে! দেখবে পৌঁছুতে রাত দুটো হয়ে যাবে। বরং দুপুরের

ট্রেনে গেলেই পারতে। কথা শুনলে না—পরে পস্তাবে। অত রাতে পৌঁছে কীভাবে তোমার স্কুলে যাবে এখনও ভেবে দেখ রনি!

রঞ্জনা হেসে বলল, ওই তো আলাপন আছে। ওকে সঙ্গে নেব।

পারমিতা একটু দূরে আলাপনকে দেখে নিয়ে বলল, কে ও? চেনো নাকি ছেলেটাকে?

আমার প্রাক্তন দেওর।

সে কী! পারমিতা আকাশ থেকে পড়ল। এখানে কোথায় এসেছিল ও? বলে পারমিতা আমার দিকে তাকাল।

আমি বললুম, আলাপন আমার কাছে এসেছিল। ও আমার বন্ধু।

পারমিতা রহস্যে পড়ে হকচকিয়ে গেল। কী বলবে ভেবেই পেল না।

আমি রঞ্জনাকে চার্জ করার ভঙ্গীতে বললুম, কিন্তু আমি কী করলুম রনি? আমার সঙ্গে কথা বলছ না কেন?

রঞ্জনা চাপা শ্বাস ফেলে আস্তে বলল, সিন ক্রিয়েট করার কী আছে?

আছে। নিশ্চয় আছে।

পারমিতা ফ্যালফ্যাল করে একবার আমার দিকে একবার রঞ্জনার দিকে তাকাচ্ছিল। সে একটা কিছু আঁচ করার চেষ্টা করছিল এতক্ষণ। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বলে, আঃ! কী হচ্ছে নিরুদা! কেলেঙ্কারি যা হবার হয়েছে, আর বাড়িও না তো।

রঞ্জনা মুখ নামিয়ে আঙুল খুঁটছিল। হঠাৎ মুখ তুলে হাতের ইশারায় আলাপনকে ডাকল। আলাপন চোখে হাসি নিয়ে এগিয়ে এল। আমি বললুম, আলাপন! তুই সঙ্গী পেয়ে গেছিস। আমি চলি।

একটু দাঁড়া! ট্রেনটা আসতে দে।

না। বলে হনহন করে চলে এলুম।

গেটের কাছে পৌঁছে একবার ওদিকে ঘুরে তাকালুম। রঞ্জনা তেমনি মুখ নামিয়ে আছে। আমার ইচ্ছে করল, ছুটে গিয়ে ওকে প্রচণ্ড আঘাত করি। কিন্তু বুকের ভেতরটা খালি মনে হল। মাথা ঘুরছিল। ...

পনের

নওলপাহাড়ীতে এখনও প্রতি বছর বসন্তকাল ফিরে আসে। বিশাল গঙ্গার চরে কাশবন আর কালো জলের ওপর বুনোহাঁসের ঝাঁক হয়তো তেমনি ওড়াউড়ি করে বেড়ায়। হয়তো প্রকৃতিকন্যা রঙ্গীও ভুট্টার ক্ষেতে বা চরের কাশবনে তার প্রেমিকদলের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে।

কিন্তু রঙ্গীর বয়স হয়েছে। দশটা বছর খুব সামান্য সময় নয়। এমনও হতে পারে রঙ্গী কারুর বউ হয়ে গেছে। ছেলেমেয়েদের জন্ম দিতে দিতে তার শরীরের আদিম-সরল সৌন্দর্য ক্ষয়ে গেছে। নওলপাহাড়ী স্টেশনের ধারে রোগা কুৎসিত কোন মেয়ে ক্রাচে ভর করে যদি কয়লা কুড়িয়ে বেড়ায় সে-ই রঙ্গী।

আর ঈশিতা? শুনেছি তার বর ভাগলপুরের ছেলে। নওলপাহাড়ীতে ডাক্তার শ্বশুরের টাকায় ব্যবসা করে। নওলপাহাড়ী আর যাওয়া হয়নি। যেতে ইচ্ছে করে না। তাছাড়া জব্বলপুর থেকে নওলপাহাড়ী অনেক দূর। জামাইবাবুর চেষ্টায় ব্যাংকের চাকরিটা জুটিয়ে ভালই আছি। শুধু মাঝে-মাঝে বুকের ভেতরটা টনটন করে ওঠে—ড্যাগারের ক্ষতচিহ্ন সেখানেই কি?

বুঝতে পারি না। বুকের ভেতরটা খালি লাগে।

এখানেও বসন্ত আসে! যখনই ভাবি তখনই চমকে উঠি। সত্যি কি? সত্যি আসে?

এ বসন্ত—এইসব বসন্তকাল বড় মিথ্যা আর অর্থহীন মনে হয়। জীবনে একবার প্রকৃত বসন্তকাল দেখেছি, সে ওই নওলপাহাড়ীতে। টিলার মাথায় চাঁদ উঠলে এবং রাতপাখি ডাকলে তখন আমি মনে মনে বলি, রঞ্জনা, তুমি ভাল আছ তো? তোমার সব মনে পড়ে তো?

কিন্তু রঞ্জনার কোনো সাড়া পাই না। অথচ আশা আছে, আবার কোথাও কোনো এক বসন্তকালে ঠিকই তার সঙ্গে আমার হঠাৎ দেখা হয়ে যাবে। কারণ আমরা পরস্পর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। .....

জলতরঙ্গ

এক

বাবলতলীর গল্পে অনেকগুলো বাঘ আসবার কথা আছে। আগেরবার যেটা এসেছিল, সেটা নাকি অবিকল হরিণের মত দেখতে ছিল। শঙ্কর বাঁড়ুয্যের বসবার ঘরের দেওয়ালে তার চামড়া এখনও ঝোলান আছে। শঙ্করবাবুর কাছেই লোকে জেনেছে, মাদী হরিণের শিঙ থাকে না।

আসলে একটা রামছাগল। যতসব.....! প্রাইমারী সেকশনের দিদিমণি জয়ার মন্তব্য এটা। হরিণের মত সেই বাঘটা, না স্বয়ং শঙ্কর বাঁড়ুয্যে, রামছাগল কে জয়ার মুখ দেখে বুঝে নাও। কিন্তু মারা পড়েছিল, এটা ঠিক। নিরুপদ্রব জীবনের আরাম সবাই চায়। সন্ধ্যা-সকাল পথ চলা, হাটবাজারে মাঠেঘাটে ঘোরা, তাছাড়া চাষাভুষো ইতর-ছোটলোক মানুষের তো পোড়ো পেটের জন্যে জলে-জঙ্গলে পড়ে থাকতে হয়। বাঘের চেহারা যেমনই হোক, সেটা মারা পড়েছিল, সেই রক্ষে।

জেলাবোর্ডের খচ্চর রাস্তা শায়েস্তা করে দেওয়া হল জাতীয় মহাসড়ক।

এদিকে জাতীয় মহাসড়ক হয়ে যেতে লোকের ধারণা ছিল, শঙ্করবাবুর দেয়ালে লটকানো চামড়া যার, সেই বাবলতলীর শেষ বাঘ। শীতকালগুলো বৃথাই চলে যাচ্ছিল উত্তেজনাবিহীন।

হঠাৎ এতদিন পরে এই হেমন্তে কি তার চামড়া কাড়তে পুনরাবির্ভাব? লোকের সাহসের দফা রফা! বিলের ওদিকে বাঁধ থেকে হঠাৎ পাখি-চমকানো বন্দুকের আওয়াজও বন্ধ। মাঠের দিকটা নিঃঝুম খাঁ খাঁ। হলুদ হয়ে ওঠা ধানের পাতায় রোদের খেলা (রোদ না ধানের রঙ? খেলাটা তার এই।) দেখতে ভুলেছে মফেজ সরদার। মহাসড়কে গোধূলি নামতেই সতীশ ঠিকেদারের সাইকেলের চাকা জ্যাম ধরে গেছে একেবারে।

মানকু সাঁওতাল কি প্রথম দেখেছিল, না, জয়া? সাঁওতাল মানুষের কথা অন্য রকম, তীরের ফলায় শান দিচ্ছে কিংবা বাইশ গেরামী ডেকেছে তলেতলে! জয়া কাঠ। তাহলে সত্যি? সত্যিকার বাঘ দেখেছিল? 'কাগুজে বাঘ' বলে হাসতে কোথায় খচখচ করে কাঁটা বেঁধে। কারণ স্বচক্ষে দেখা শুধু নয়, একটা চঞ্চল অস্তিত্বও অনুভব করেছিল।

—পথে নোটিশ লটকে দিক্ ওরা। দিপ্তী বলে। সহকর্মীণী প্রিয়বান্ধবী দিপ্তী।

জয়া আনমনে শুধোয়— কিসের?

দিপ্তী ভেঙে ভেঙে হাসে— সাবধান, এখানে বাঘ আছে।

—ফাজলামি করো না। আমার অনেক দেখা আছে।

— কী? বাঘ না বাঘের চামড়া?

— দুই-ই।

কোয়ার্টারের পিছনের সেকেলে পাঁচিলটা ভাঙা হয় নি। এক দঙ্গল ম্যাগ্নোলিয়া-পাতাবাহারের ঝোপ, তার পিছনে মাধবীলতা। চৌচির ফটক পেরোলে অজস্র দেশী-বিদেশী গাছপালা। শঙ্কর বাঁড়ুয্যের পূর্বপুরুষ রাজাগজা কেউ ছিলেন নিঃসন্দেহ। নকল হ্রদ, নকল পাহাড়, নকল পরী। প্রাঙ্গণের মধ্যিখানটা নকলে নকলে ধূলপরিমাণ। বসবার ঘরের দেয়ালে সলমাচুমকীর কাজ করা পোশাক, জরীর ঝালরকাটা পাগড়ী, মুক্তোর হার, সিংহাসন গোছের চেয়ারটা- ছবি, কেবলই ছবি। ইমিটেশন! লোকে বলে— ঐ ছবির লোকটি রাজা হতে যাচ্ছিলেন, পথে হার্টফেল করে মারা যান।

রাতে ফুটফুটে জ্যোৎস্না ছিল। হেমন্তকাল। সুতরাং শিশির আর নীলরঙা কুয়াশায় সে জ্যোৎস্না কবিতার রবীন্দ্রযুগে নিয়ে যায় একেবারে। তা সত্ত্বেও জয়ার নাকি গরম আর ঘাম। (এই শীতের প্রারম্ভে!) ভিতরের ছোট জামাটাও খুলে হাঁসফাঁস করছিল, রাতদুপুরে জলের তেষ্টা পেয়েছিল। দিপ্তীর মত মুটকি মেয়েও এমন বিদেশে বিভুঁয়ে গোগ্রাসে ঘুম গিলতে পারে, আশ্চর্য! 'জ্যোৎস্নারাতে সবাই যাবো বনে'— গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে জয়া জানালায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ দেখেছিল, পুরানো পাঁচিলের পাশে ডোরাকাটা একটা শরীর ভৌতিক জ্যোৎস্নায় নড়ে উঠেছে!

— বাঘের গায়ে জোনাকি পোকা লেপটে থাকে। গাময় জুগজুগ করে জ্বলে! দেখেছিলে? শঙ্করবাবুর স্ত্রী সরোজিনী বলেন।

জয়া বলে— কী জানি, মনে নেই।

— হাঁসের গুয়ের মত বোঁটকা গন্ধ পাচ্ছিলে না?

— খেয়াল করিনি।

— বারে! কী দেখলে তবে?

— বাঘ।

— চোখের ভুল হতে পারে। আমার শ্বশুর ছিলেন শিকারী। স্বামী শিকারী। ছেলে শিকাবী। আমি জানি, ভুল অনেক সময় হয়।

তা কেন? ওটাকে লাফ দিয়ে যেতে দেখেছি। হ্যালুসিনেশন নয়।

মেয়েরা দিপ্তীর মতই ভাঙে। কাছেই মণ্ডপে জগদ্ধাত্রীপুজো হয়। তাব কাঠামো অবিকৃত আছে। সেই বাহনমশাই নির্ঘাৎ!

সরোজিনী বলেন— ওনাদের নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করতে নেই। তোমরা আজকালকাব মেয়েরা বড্ড নাস্তিক, মেলেচ্ছ!

জয়ার চীৎকার শেষঅব্দি বাবলতলীর অনেক অনেক মধ্যরাত্রির প্রহসনের গল্পে আব একটি সংযোজন হত মাত্র। হতে দিল না মানকু হাড়াম। একটা কাঠবেড়ালি পবদিন যদুবাবুর বাগান থেকে সোজা মাঠে নামল। মাঠে পাকা ধানের জমি তখনও জলে টুবটাব করছে। আলে অবশ্যি ঘাস ছিল। কোন অজ্ঞাত কারণে কাঠবেড়ালিটা সব অগ্রাহ্য করে ডহরের নাবাল জায়গায় জঙ্গলে দৌড়ে গেল। তাবপব আর কী! ডোবামত গর্তের এক-পাশে শুকনো মাটি— তার উপর লতাপাতার ঝালর। আলোছায়াব সতরঞ্চিতে বাঘটা নাকি হাত পা ছড়িয়ে ঘুমুচ্ছিল। মানকু 'বোঙার' দিব্যি কেটেছে।

পবদিন সকালে রহস্যপূর্ণ ভঙ্গীতে দিপ্তী জয়ার কাছে হাজিব হয়েছে।— দিদি, একটা জরুরী কথা আছে।

— বলো। জয়া অর্ধশায়িতা। কনুই ভব করে কিছু লিখছে। চিঠি কি? এ্যাদ্দিন একবাবও চিঠি ফিঠি আসতে দেখা যায় নি। ব্যাপার নিঃসন্দেহে গুরুতব। কিন্তু জানতে চাইবাব অধিকার হয়েছে বলে দিপ্তীব মনে ধারণা নেই। জয়ার মধ্যে একটা কিছু আছে – ভয় পাবাব মত, ঠিক বাঘ নয় কতকটা গবিলা।

তবু বলে— চিঠি-ফিঠি এখন বাখো তো! কথা আছে।

জয়া হঠাৎ মিষ্টি হাসে। ওব চোখেব পাতায় সবসময় সদা-ঘুমেব ছাপ অক্ষয থাকার ফলে কেমন সুন্দর দেখায়। অথচ সারারাত নাকি ঘুম হয় না, ইনসমনিয়া। ওষুধ খায়। ডাক্তাববাবু বলেছিলেন— কোষ্ঠ সাফ বাখা চাই। তবে কি না বাঙালী মেযেদের কোষ্ঠকাঠিন্য তো জন্মব্যাধি। হ্যাঃ হ্যা· হা।

দীপ্তি বলে— আজই চিঠি পেলাম। আমার ভাই উৎপল। উৎপলের আজ পৌঁছানোর কথা। কী হবে জয়াদি!

জয়া হঠাৎ ওকে জড়িয়ে ধরে। গালে গাল ঘযে বলে,— উৎপলকে বাঘে ধরবে না। সে পুরুষ।

— উপেনকে দিয়ে একবার খোঁজ নিলে হত, বিনোদের গাড়ি কাল কখন-কখন ট্রিপ দিয়েছে। জয়া রামটিপুনীতে টিপে ধরে আছে। তাই দীপ্তি হাঁসফাঁস করেই কথাটা বলে।

জয়া বলে— উপেনের ঘণ্টা না বাজিয়ে সময় হবে না। কিন্তু দীপু, তোমার ভাইটা তো কচি খোকা নয়, যে জেনেশুনে পাঁচ মাইল বাঘের সঙ্গে হাঁটবে।

ওটা সান্ত্বনাবাক্য। উৎপল ঝড়বাদল গ্রাহ্য করে না। তবে আশার কথা ছিল— বিনোদ ড্রাইভার ও তার গাড়িও সেই রকম বেপরোয়া। ইসমাইলের চাকা বন্ধ— সুতরাং বিনোদ চান্স ছাড়বে বলে মনে হয় না।

মেনকার মারফৎ খবর পেয়ে উপেন আসে। ওর ওই এক দোষ. জোড় হাতে নতমুখে পদযুগলে চক্ষু সমর্পণ করে দাঁড়িয়ে থাকা। মা-মাসি বুঝি ছিল না! সঙ্ একটা। জয়ার রাগ হয়।

সব শুনে উপেন বলে— সমিস্যে দিদিঠাকরুণ। বাবলতলীতে অনেকবার বাঘ এসেছেন। নদীর ওপারে তো জঙ্গল দেখেননি— সে এক সমুদ্দুর! ফ্যাঁক ফ্যাঁক করে উপেন হাসে। কাঁচাপাকা চুলে তেল জবজব করছে। স্নান করে খাওয়াদাওয়া করে পান চিবুতে চিবুতে ঠিক সাড়ে নটায় হাজরে। আজ বিশবছর চলেছে এই কাণ্ড। বাবলতলী হাই ইস্কুলেই তো জেলার প্রথম হাই ইস্কুল। গত বছর

থেকে এলাকার মেয়েদেরও পড়াশুনার ব্যবস্থা হয়েছে। সেই সঙ্গে প্রাইমারী সেকশন জোড়া হয়েছে। বিজ্ঞান, কারুশিল্প,— মায় কার্পেন্টারী অব্দি— যাকে বলে মালটিপারপাস স্কুল এখন। উপেনের চুলে-চুলে অভিজ্ঞতা বা 'ইতিহেস' গিজগিজ করছে। চুল যেমন পাকে, ঘটনা তেমনি পাকে। তখন সেটাই 'ইতিহেস' হয়। সুতরাং সে বলে— তাঁতীরা উলুকাশের ফুলন্ত বনে সাঁতার কেটেছিল। কারণ কিনা, জোস্না রাত্তির— যেন সমুদ্দুর। বাতাসও বইছিলেন।

—বইছিলেন? দু'জনে প্রচণ্ড হাসে।

সম্ভ্রান্ত ক্রিয়াপদ ব্যবহার কোথায় কোথায় করতে হবে, সে উপেনের নিজস্ব বাছাই। বেশীর ভাগই হচ্ছে প্রাকৃতিক বস্তু— যারা তার এই সম্মান লাভ করে। সে বলে— আজ্ঞে হ্যাঁ। নদীর ওপারে সেই রকম খড়ের বন আর বিস্তর ঝোপঝাড় আছে। আগের দিনে বাঘ তো তুচ্ছ— হায়না, শুয়োর, পাহাড়ে চিতিসাপের সুখের রাজ্যি ছিল। বললে পরে বলবেন যে, বলছে...

ফের হাসিতে টইটম্বুর এরা। এও উপেনের একটা মারাত্মক বাগ্‌ভঙ্গিমা— এক'খানা ফ্রেজ।

উপেন বলে— আজ্ঞে সেকথা নয়, একটা হরিণও মরেছিল।

— সত্যি মরেছিলেন?

ভুল টের পেয়ে উপেন জিভ কাটে। হাত জোড় করে কাকে প্রণাম দেয়। দিয়ে বলে— রূপে হরিণ, আসলে দেবদেবতার ব্যাপার। বাঁড়ুয্যে রাজা তাকেই মেরে বসলেন বিলিতি বন্দুকে। মেলেচ্ছ গুলি খেয়ে হরিণটা বাঘ হয়ে গেল।

দীপ্তি অধৈর্য হয়ে বলে— রাখো কেচ্ছা। কাল সন্ধ্যার পর বিনোদের গাড়ি স্টেশন থেকে ফিরছিল?

— আজ্ঞে, তা তো জানিনে!

— একটু খবর নিয়ে জানাবে?

উপেন ইশারায় হেডমাশইয়ের কথাটা তোলে। বুঝতে পেরে জয়া বলে— সে আমি দেখছি। যাবে আর আসবে। আধঘণ্টা হলেই তো চলবে?

— আজ্ঞে, দেরী হলে ঘণ্টা কে দেবে তাহলে?

— কেন? দেরী হবে কেন?

বিব্রত উপেন ঘাড় চুলকোয়। একটু থেমে বলে— তা যদি বলেন, সংসারে কত কী তো ঘটে যায়। যায় না দিদিঠাকরুণ? এবং হাসে একটু।

তার মানে?

— মানে একটা সমিস্যে। এই দাঁড়িয়ে আছি, পা ফেললেই কী হবে কেউ বলতে পারে?

—উপেন, তুমি দার্শনিক।

— কী বললেন?

— কিছু না, যাও। এই নাও চিঠি, তোমার হেডমশাইকে দিও। এক্ষুনি কিন্তু।

চিঠি নিয়ে উপেন আস্তে আস্তে করুণ পা ফেলে চলে যায়। প্রাঙ্গণ পেরিয়ে স্কুলবিল্ডিং-এর গেটে ঢোকা অব্দি তার হাঁটা দেখতে পাওয়া যায়। পদাটা ফাঁক হয়ে আছে বহিরাগতদের আক্রমণে। জয়া সেটা টেনে দিয়ে এসে দেখে দীপ্তির চুলখোলা সারা।

খানিক পরে উপেন ফিরে এল হন্তদন্ত হয়ে।

সে বলল— আজ্ঞে, চাওলা জগা মেকদার বললে যে, রাত বারোটা-একটা আন্দাজ হাইরোডে যেন বিনোদের গাড়ির শব্দ শুনেছিল। তখন অবিশ্যি শুয়ে পড়েছিল জগা।

দীপ্তি বলল— শব্দ শুনে বুঝতে পারে?

— তা বৈকি। উনারা হাইরোডের ধারে চব্বিশঘণ্টা আছেন, উনাদের কানই আলাদা।

— গাড়ি স্টেশন থেকে ফিরছে, না স্টেশনের দিকে যাচ্ছে বুঝতে পেরেছিল?

— সেটা তো বললে না। বুঝতে পারছেন না দিদিঠাকরুণ, সন্ধ্যা না লাগতেই সব ঝাঁপ ফেলে ঘরে ঢোকে। চারপাশটা খাঁ খাঁ করে। কেবল রক্ষে ওই ইলেকটিরি। তাও যা পোকার উপদ্রু, বাতির পাশে গিজগিজ করে। কালীপুজো পেরিয়ে গেছে, পোকা পালানোর কথা। ঘোর কলিকাল গো!

ঘণ্টা বাজাচ্ছে কে? এরই মধ্যে পঁয়তাল্লিশটা মিনিট কেটে গেল? তার মানে দীপ্তিদের বয়স

আরও পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাড়ল। এমন কি বাঘের ভয়পাওয়া বাবলতলীর বাঘটা মারা পড়বে অথবা পালাবে এই সম্ভবনার দিকে আরো পঁয়তাল্লিশ মিনিট এগোল। উপেন ভারি সুন্দর ও নিখাদ সত্যি কথাটা বলছিল। পা ফেলতেই কত কী ঘটে যেতে পারে। পা ফেলা আর নতুন নতুন ঘটে যাওয়া মানেই কী জীবন?

উপেন একগাল হাসল।— অঙ্কের স্যার বাজিয়ে দিলেন। তাহলে চলি আজ্ঞে?

— এসো।

উপেন চলে গেল।

উৎপল কি সত্যবাদী ছিল কোনদিন? দীপ্তি খোঁজে। যা বলেছে, তাই করেছে, এমন কোন নজির আছে? আছে, আছে! ওর গা শিউরায়। ভেজা নিঙড়ানো গা থেকে অডিকোলনের গন্ধ (জয়ার পরামর্শ) নিজেই শোঁকে।

সেই সময় বিজ্ঞানের মাস্টার বিদ্যুতবাবু আসেন।

— উপেন বলছিল, আপনার ভাই না কার আসার কথা ছিল, আসেন নি?

— না। কী হল বুঝতে পারছিনে। বসুন।

— না, ক্লাস আছে। ব্যাপারটা গুরুতর মনে হল, তাই খোঁজ নিতে এলাম। দীপ্তি অস্বস্তিতে উসখুস করে—না, তেমন কিছু না, আসবে লিখেছিল.....

— আচ্ছা, ইনি কি আপনার সেই ভাই, কিছুদিন আগে যিনি এসেছিলেন?

— হ্যাঁ।

— ওঃ হো! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। যিনি....। বিদ্যুৎ থামে। প্রশংসা এখন নিন্দার কটু ঝাঁজ ছড়াতেও পারে। সেই কথায় কথায় বোমা মারা ছোকরাটি, পলিটিকাল বুলিতে আকণ্ঠ ঠাসা, অথচ ননপলিটিকাল অ্যাটিচুড— যেন বস্তীর গুণ্ডা। ওই মুখে-এ্যাটমবোম-রাখা ভাইটি নিয়ে দীপ্তিরও কম গর্ব জমে নেই! যতসব আনসোস্যাল বাস্টার্ডস! মস্তান তো এদেরই বলে।

তবু সহানুভূতি আসার কারণ এ হেন ভদ্র সুস্থ শিক্ষিত বোনটি হাবামজাদাব আছে! —আচ্ছা চলি। দরকার হলে বলবেন।

মেনকা বামনী অপাঙ্গে চলমান বিদ্যুতকে দেখে নিয়েছে। এবার পর্দা তুলে ঢোকে।—ভাত খড়খড়ি হয়ে গেল যে গো! খাবে কখন? বড় দিদিমণির চান সারতে এতক্ষণ লাগে! ধন্যি, যাই বাবা!

জয়া বেরিয়ে বলে—যাচ্ছি।

— ওবেলা কিন্তু সরষের তেল নেই। আগেই জানিয়ে দিচ্ছি। মেনকা জানায়।

দীপ্তি বলে— বাজারে যাবে না ওবেলা? দিনদুপুরে আর বাঘ বেরুচ্ছে না।

— অম্মা! তেল যে বাজারেও বাড়ন্ত। শুনছ কী গো!

জয়া সংক্ষেপে বলে— সুশীলবাবুকে বলেছি। ওবেলা দিয়ে যাবে।

—কোন সুশীলবাবু? দীপ্তি শুধোয়।

— কো-অপারেটিভের।

বাবলতলীর কত লোকের সঙ্গে আলাপ জয়ার। দীপ্তি এত ভীতু হয়ে পড়েছে কেন, নিজেই টের পায় না। যাদবপুরে থাকতে তো...যাক সে আলাদা কাহিনী। কোথায় কলকাতা, কোথায় বাবলতলী। সে চুলে চিরুনী চালিয়ে জল ঝাড়ে। জয়া আসতে আসতে বলে— এতক্ষণ কী করছিলাম, শুনবে? চৌবাচ্চার জলের নীচে সেই বাঘটা দেখবার চেষ্টা করছিলাম। সত্যি দীপু, বিশ্বাস করো। 'গা'-চমকানো নামে কি কোন রোগ আছে বলে শুনেছ? নিশ্চয় শোননি। আমি গেলাম, নির্ঘাৎ গেলাম তাই। তখন মোহের কথা বলছিলে, আমার মোহ দেখছি একটা আস্ত বাঘ। এটা ভাঙলে কোথায় আছাড় খাবো কে জানে! মানুষ, বুঝেছ দীপু—কোন মানুষই জানে না, তার নিজের মোহটা কী। জানলেই তখন বিপদ ঘাড়ে এসে পড়ে। যতক্ষণ জানতে পারছে না, ততক্ষণ সে নিরাপদ। কারণ জানলেই তো তাকে ভাঙবার জন্যে লড়াই শুরু। রক্তক্ষয়।.....

কথার জের খাওয়া অব্দি চলমান। সেই সময় ফের বাইরে উপেন এসেছে। টেবিলে শহুরে মেয়েরা খাচ্ছেন। মোড়ায় ভাঁজ করা হাঁটু দুলছে, সে জন্যেও নয়; উপেন পুরুষ মানুষ, এসব ক্ষেত্রে লজ্জাবোধ

স্বাভাবিক। বাইরে থেকে জানাল— যদুবাবুর ছেলে সুনীল বললে, কাল রাত্তিরে বিনোদের ভ্যানে বাবা বাড়ি ফিরেছেন। পিঠে অবিশ্যি বন্দুক ছিল।

গলায় ভাত আটকে যাবার দশা দীপ্তির।— ক'জন নেমেছিল গাড়ি থেকে? তারা কে কে?

— সেটা তো শুধোইনি। থামুন, আসছি। ফের উপেনের প্রস্থান।

অপদার্থ! কেন ওটাকে মাইনে দিয়ে পুষছে ওরা! দীপ্তির মন্তব্য।

জয়া বলে—যারাই আসুক, তোমার ভাই যে আসেনি, এটা জানা গেল।

নাটকীয় পদক্ষেপে ফের উপেন আসে।—অ দিদিঠাকরুণ, বড় সমিস্যে! একজন ছোকরা মত নেমেছিলেন! যদুবাবু বলেছেন— কলকাতার লোক মনে হল। বাঘের কথা শুনে নাকি গোঁ ধরে বললে— পাড়াগাঁয়ে সব ব্যাপারই অদ্ভুত। তারপরেতে ছেলেমানুষের আক্কেল দেখুন, বুক চিতিয়ে বললে বাঘটা যে গুজব, আমি দেখিয়ে দোব। তেনাকে যদুবাবু আর দেখেন নি। তিনিই কি উনি?

দুই

যেন ঝড় একটা উঠবেই। আকাশ জুড়ে চাপাচাপা মেঘ, বিদ্যুৎ, কয়লা খনিতে আগুন লাগলে যেমন দেখায় এবং হঠাৎ উত্তরের বাতাস বন্ধ, তাই ছবিতে আঁকা ল্যাণ্ডস্কেপ বাবলতলী, স্থির শব্দহীন।

দীপ্তি ভায়ের খোঁজে বেরিয়েছে। যেন ঝড়ের মুখে আরেক ঝড় খুঁজতেই বেরিয়েছে। সঙ্গে কো-অপারেটিভের সুশীলবাবু।

কথামত দু'কেজির টিন থলেয় পুরে এনেছিল সুশীলবাবু! মেনকা যেন কোলে ছেলে পেল। আর উপেন বলেছিল তিনিই কি উনি, সুশীলবাবুর ধারণা তিনিই উনি। এবং দীপ্তিরও। কারণ সুশীল চৌধুরীর বর্ণনামত উস্কোখুস্কো চুল, ডোরাকাটা পুলওভার, (বাবলতলীতে সব বহিরাগতই বাঘ) লিকলিকে প্যাণ্ট, পায়ে 'ছে-ছে রূপেয়া বালা' বোম্বে স্যাণ্ডেল এবং কাঁধে শান্তিনিকেতনী ঝুলি। নির্ঘাৎ উৎপল না হয়ে যায় না।

— তাছাড়া মজাটা কোথায় বুঝলেন? সুশীল বলল।— যতীন গোমস্তার ছেলে শিবনাথের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছেন সাইকেলের দোকানে। দীপ্তিদি, শিবনাথের নাম শোনেন নি?

— না। জয়ার সঙ্গে সঙ্গে জবাব। কারণ সুশীলের মুখে দিদি সম্বোধন, কোন্ দিক থেকে কী আলো ফেলে কে জানে! বড্ড খারাপ লাগত আগে। আধবুড়ো রোগাপটকা লোক একটা। সে জয়াদের দিদি বলে। এখন অবস্থা ভিন্নরূপ। বেশী ঘনিষ্টতায় সব কিছু সহজ হয়ে ওঠে একদিন।

সুশীল বলল—শিবনাথ তো এখন বাবলতলীর রূপকথার হিরো। জানেন নিশ্চয়, লুকোচ্ছেন।

জয়া শুধু মাথা নেড়েছিল।

— তাহলে পরে বলব সে সব হিসট্রি। কিন্তু আমাকে অবাক লাগল। ওর সঙ্গে দীপ্তিদি, আপনার ভাইয়ের আলাপ ছিল?

— নাঃ। দীপ্তি বলল।

— না থাকলেও যেভাবেই হোক, হয়েছে। সেটাই চিন্তার কথা। যাক্‌গে চলুন।

আধঘণ্টা পরে হঠাৎ আকাশ বদলেছে। ঈশানে কালো নিশান উড়িয়ে দিয়েছে প্রকৃতি। তারপর চুপিসাড়ে পা টিপেটিপে জানালায় ডেকেছে শঙ্কর বাঁড়ুয্যের মেয়ে তপতী। জয়াকে ভয় না সমীহ করে, জয়া খোঁজে না, বরং অমর বাঁড়ুয্যের বোন তাকে অবিশ্বাস্য রকমের পাত্তা দেয়। জয়া এতেই খুশি। উঁচকপালে, দাম্ভিক, তাছাড়া জমিদারবংশ-সুলভ স্মার্টনেশ, তপতীকে কেউ পছন্দ করে বলে জয়া শোনেনি।

তপতীর জ্বালাতন প্রথাসিদ্ধ নাকি। অথচ জয়ার কাছে উল্টে দেওয়া গুবরেপোকা। তাই জয়া মনে মনে খুশী।

সেই খুশী দিয়ে অনার্সের বই থেকে কবিতা শোনাল কতক্ষণ। ফাঁকে ফাঁকে তপতী বারকয় 'যাই' বলেছে, জয়ার কান নেই। শেষে বিরক্তি আসে। ক্লাস নাইনের মেয়ে, কবিতার কী বোঝে? বিদ্যুৎবাবু বলেছিলেন—কবিতা আর পদ্যে তফাৎ আছে। সুতরাং জয়া বলে—মা কী করছেন?

— মা? তপতী আঙ্গুল মুচড়ে বলে। বহরমপুর থেকে ছোড়দি এসেছে, ওকে নিয়ে গাঙ্গুলিবাড়ি

গেছে।

— বাবা?

— বাবা? কপিগাছে জল দিচ্ছেন।

— তোমাদের সব্জিক্ষেত আছে নাকি?

— আছে তো! জানেন জয়াদি, ব্লক অফিস থেকে বীজ দিচ্ছে গাদা-গাদা! আপনারা করুন না একটা!

জয়া আড়ামোড়া দিয়ে শরীর ছড়ায়। ফের হাই তুলে গড়াগড়ি দেয়, হাতের মুঠোয় বালিশের কোন খামচায়। তপতী যে বুকটা দেখেছে, জয়া বুঝতে পারে। বলে—দাদাও বুঝি কী কাজে ব্যস্ত।

— সেই ফাঁকে বেরোন হয়েছে দুষ্টু মেয়ে! আজ স্কুলেও যাওনি মনে হচ্ছে।

তপতী দু'হাতে মাথার দু'পাশ টিপে ধরে বলে— জ্বর মত হয়েছে। তাছাড়া ছোড়দি এল অনেব দিন পরে।

জয়া বলে— দাদা কোথায়?

তপতীর চোখ বড় হয়।— ওরে বাবা, দাদা সেই সকালবেলা বন্দুক নিয়ে ওদিকে চলে গেছেন যে।

— কেন? বাঘ মারতে?

— হ্যাঁ, মানকু ফের বাঘটা দেখেছে। চরে থাবার দাগ দেখেছে। আমাদের বাড়ি এসে খবর দিয়ে গেছে সে।

জয়া হাত বাড়িয়ে তার হাত ধরে। আঙুলে আঙুল জড়িয়ে বলে—কার হাত শক্ত?

— আপনার।

— উঃ! গেলুম, গেলুম....আঃ...!

ছাড়া পেয়ে তপতী হাসি-কান্নার রেখায় ভরা মুখে আঙুল বুলিয়ে হাত ঝাড়ে কয়েকবাব। জয়া হসে না। বলে—চা খাবে?

— খেতে পারি। সঙ্গে সেই....

— আচার? ফুরিয়ে গেছে। ফের বহরমপুর গেলে আনব। স্টোভ ধরাতে পারবে?

— ইস! কী এমন কঠিন কাজটা বললেন। আপনি শুয়ে থাকুক না, আমি কেমন চা করছি দেখুন। তপতী ধুড়মুড় করে ওঠে। এগিয়ে যায় কোণের দিকে। জয়া চিত হয়ে চোখবুজে শুয়ে থাকে। ঘুমের আমেজে শরীর অবশ হয়ে আসছে। হঠাৎ ঝড়ের কথা মনে পড়ে। বলে—ঝড় এল না তো? তপতী, বাইরে একবার দেখবে?

কোণে টবের পাশে দেশলাই জ্বালছে তপতী। বলে—এখন ঝড় আসবে কী? জানালার বাইরে তাকাতে গিয়ে কাঠির আগুন, আঙুল কামড়ায় তক্ষুনি। এম্মা, বলে সে হেসে ওঠে। ইস্ জয়াদি, স্পিরিট নেই? কোরোসিনে স্টোভ জ্বালেন?

— রাখো, তোমার কম্ম না। জয়া ওঠে।

তপতী হাত নাড়ে—না, না। আপনার দিব্যি, দেখুন না....

একটা আবেগ এসেছিল। বাইরের অপেক্ষমান ঝড় থেকে, কিংবা নিজের মধ্যেকার অজ্ঞাত চাপে ঝর্ণার পাথরচাপা মুখটা খুলে যাওয়ার মত, যেখান থেকেই হোক। স্টোভের শোঁ শোঁ শব্দ আর নীলাভ আগুন দেখতে দেখতে জয়া সেটা টের পায়। তারপর ঝিমিয়ে পড়ে। তপতী পা ঝুলিয়ে বসেছে বিছানায়। পাদুটো নাচাচ্ছে। হলদে ছাপাশাড়ি, গোলাপী ব্লাউজ, রুক্ষ চুলে তপতীর কিশোরী শরীর জীবজগতে একটা জায়গায় নিজস্ব আশ্বাস নিয়ে বিভোর। জয়ারটা কী? মগজে স্টোভের আগুন ঢুকে যায়, যদি ভাবো তোমারটা কী? পঁচিশটে বছরের প্রাণধারণ, পঁচিশটে দিকে আশ্বাস খুঁজেছে। কী পেয়েছে? এবং সোজাসুজি যদি ধরো, কেন তুমি এখানে পড়ে আছো? কেন অনার্সের বই মুখস্থ? কেন এম. এ. পাশ করার সাধ? তপতীর অন্য কিছুও ঘটতে পারে, অথাৎ উপেনের পা ফেলবার ফিলসফি মানলে; তবে আপাতত যা দেখা যাচ্ছে, শঙ্কর বাঁড়ুয্যের মত বাপ, অমরবাবুর মত দাদা, কিংবা সরোজিনীর মত মা যার, সে এম. এ. পড়বার সাধ নিয়ে একশো মাইল দূরে, নিঃসঙ্গ অনাত্মীয়

জীবনের নির্বাসন বাছাই করবে না। এম. এ. পাশ করলে হয়ত ডানা গজায় না, মাইনে তো বেশী পাওয়া যায়। অবিশ্যি স্কুলের সেক্রেটারী যদুবাবু আড়ালে বলে থাকেন—মেয়েমানুষ ইজ মেয়েমানুষ— সে মন্ত্রীই হোক, আর সুলতানাই হোক।

তপতীর কাছে কোথাও সে হেরে আছে— শুধু অর্থনীতির খেলায় নয়, সেটা অন্য কোথাও— হয়ত আত্মবিশ্বাস, জগৎ ও জীবনসম্পর্কে একটা ধারণার নিশ্চয়তায়—বাইরের লোকের কাছে তার দাম থাক বা না থাক। তপতী জানে, পৃথিবী তার একান্ত আপনার জন—চেনামুখ। জয়া জেনেছে, কোন দোকানে মুখোস কিনতে পাওয়া যায়। তফাৎ এত বেশী যে দু'পক্ষ পরস্পরের কাছে উদ্ভট।

চা খেতে গিয়ে চমকে ওঠে— দেখছ কাণ্ড!

তপতী খুক খুক করে চোখে জলবিন্দুসমেত কাশে। সামলে নিয়ে বলে—কাপড় পুড়েছে? দেশলাই কাঠি অসাবধানে ফেলেছিলেন। জানেন, ছোড়দি একবার কী করেছিল? কাপড়ে আগুন ধরে প্রায় ব্যাঙ পোড়া হয় আর কী! আর আমার বৌদি ... হঠাৎ থেমে যায় তপতী।

আঁচলের খুঁটে গোল কালো একটা দাগ মাত্র। কাঠিটা জ্বলন্ত ছিল না ভাগ্যিস, অঙ্গারের কীর্তি! জয়া হাসে।—তোমারই হউক জয়। সত্যি আমি এখনও খুব আনাড়ি। মেনকাকে রেখেছি—মাসে চাল লাগছে কত জানো। এক মণ প্রায়। তিনজনে এ-ক-ম-ণ।

—দুবেলাই ভাত খান বুঝি?

—খাই। আটা পাবো কোথায়? মেনকা একদিন আটা নামে কী একটা এনেছিল। উঃ কী দুর্গন্ধ..

— কেন, সুশীলবাবুকে বলবেন। ওদের কো-অপারেটিভে অনেক আটা রয়েছে।

জয়া কাজের কথায় কান করে। খরচ ভীষণ বাড়ছে। চড়া দর জিনিসপত্রের। গ্রামে যা শহরেও তাই। দাদাতো খুব গল্প করে বেড়াচ্ছেন ওদিকে। জয়া ভাগ্যিস কেটে পড়েছিল! আর কিছু না হোক, দু'বেলা দু'মুঠো ভাত অন্তত মিলবে পাড়াগাঁয়ে। তাছাড়া তরিতরকারীও টাটকা, দুধ নির্ভেজাল, বিশুদ্ধ আলো-হাওয়া......।

বাবলতলী পাড়াগাঁ? রক্ষে করো বাবা! এ যদি পাড়াগাঁ হয়, কলকাতাও পাড়াগাঁ। কবে সারা বাংলাদেশ ক্যান্সার কোষের মত শহরকোষে বিস্তৃত হয়েছে। কাগজে খবর বেরোয়নি। গত মার্চে নদীর ওদিকে বেড়াতে গিয়েছিল। সঙ্গে দীপ্তি, বিদ্যুৎবাবু, অমরবাবু, হাসপাতালের নার্স ছন্দা আর মাধবীদি। আর ছিল উৎপল—দীপ্তির সেই ছোটভাই। বাঁধ ধরে অনেকদূর তারা হেঁটেছিল। শুকনো কাশের বন, ব্যানাখড়, হিজ্জল-বাবলার জঙ্গল আর খালবিল। হঠাৎ সেখানে শঙ্খচিলের ডাকের সঙ্গে লতা মুঙ্গেশকর একাকার। ভেল্কী না ভোজবাজী? পাত্তা পাওয়া গেল শেষে। উধোম—আধন্যাংটা এক গয়লা, মাথায় লাল গামছার ফেট্টি, ত্রিভঙ্গঠামে লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারই কোমরে ঝুলন্ত ছোট্ট ট্রানজিস্টার। সামনে ইতস্ততঃ ছড়ানো একদঙ্গল মোষ।

শুধু সেই নয়, উৎপল বলছিল, বিলে বোরোধানের জমিতে চাষ দিচ্ছিল এক চাষা। তার লাঙলের জোয়ালেও অনুরূপ বস্তু থেকে মহম্মদ রফি আর আশা ভোঁসলে এনতার চেঁচাচ্ছে। কে জানে কেন্দ্রীয় কৃষি বিশেষজ্ঞ সূত্রে স্থানীয় বি.ডি.ও. অফিসের উৎপাদন বৃদ্ধির ওটা এক কর্মসূচী পালন কিনা। চাষীদের বিনামূল্যে ট্রানজিস্টার বিতরণ! উৎপলের গম্ভীর মন্তব্য।

—যাই বলুন, আমাদের এই সব চাষীরা খুবই সরল মানুষ। কারণ, গাছপালার সঙ্গগুণে ওরা কালক্রমে নৈঃশব্দ ও সহনশীলতা অর্জন করে। একথা অমরবাবুর।

আর সরলতার প্রশংসাপত্রের মূল্য নেই। রাতের দিকে নাকি সবাই জল-জঙ্গল ভেঙে গাড়ি ভর্তি ধানচাল নিয়ে যায় বেলডাঙার দিকে। বাবলতলীর বাজারে চাল ক্রমশ দুর্লভ হয়ে আসছে। পউষ আসার আগেই সর্বনাশ!

শুধু চাল আর চাল! জয়া হঠাৎ ফুঁসে ওঠে—ওদের কাণ্ড দেখছ?

তপতী বলে—কাদের?

—দীপুদের। কখন ঝড় মাথায় বেরিয়েছে, ফেরার নাম নেই।

বাইরে দেখে নিয়ে তপতী বলে—নাঃ, ঝড় এল না। বাতাস উঠছে।

ঝড় ভাঙলে বাতাস। আঃ, হিম হিম বাতাস! ডাইনী মায়ের কোল থেকে ছুটে বেরিয়েছে একপাল

খাঁইখাঁই ছেলে। বাবলতলীতে তাদের চীৎকার। গাছপালা দোলে। শাখায় হলুদ পাতায় ছেঁড়া মেঘের ছায়া সরে যায় সাঁৎ সাঁৎ করে। পাতা ঝরে পড়ে ঝরঝর খরখর সরসর। পশ্চিমে টেরচা আলোর পিচকিরী, ছবির সূর্যের মত সূর্য। চোখ ঝলসায়। তবে সেজন্যেও নয়, হয়ত ধুলোবালির ভয়ে চোখে সানগ্লাস দীপ্তির। তার দ্রুত পদচালনা দেখে জয়া হাসে। সুশীলবাবু প্রায় দৌড়ঝাঁপ করে কাঁপতে কাঁপতে পিছনে এগোচ্ছে। র‍্যাপারে ঠাসা। কী সুখে দু'কেজির টিন বয়ে আনে এবং কী সুখেই বা বাউণ্ডুলে শহুরে ছেলেকে খুঁজতে অশেষ পরিশ্রম করে? নির্ঘাৎ জানে—বস্তুত কিছুই আর ঘটবার মত নেই তার মত মানুষের পক্ষে। কারণ, প্রাপ্তিযোগ অনেকখানি নির্ভর করে আকারের উপর। প্রকার আজকাল খোঁজে না মানুষ। কোনদিন খুঁজত নাকি? অবিশ্যি, কোনো কোনো মেয়ে অন্যের ঘামাচি গালতে বা চুলে উকুন খুঁজতে ভালবাসে।

—খুঁজে পেলে? জয়া অবিকল গ্রাম্য মেয়ের মত দাঁতে আঁচল কামড়ে হাসে।

দীপ্তি সানগ্লাস খুলে রুমালে মুখ মুছতে ব্যস্ত। কোন ফাঁকে তপতী বেরিয়ে গেছে। সুশীল পর্দা সরিয়ে এক পা ভিতরে এক পা বাইরে রেখে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। এতক্ষণে কপালে ছোট্ট ব্যাণ্ডেজ দেখতে পায় জয়া। ব্যাপার কী!

দীপ্তির মুখ থমথম করছে। নিশ্চিত কিছু ঘটেছে। কী ও কেন? জয়া ফের বলে—কী হল?

জবাব সুশীলের গলায়।—হবে কী? উৎপলবাবু অভয় পাগলার সঙ্গে বাজার পেরিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। হাইওয়ে ধরে পাগলরা যেমন হাঁটে, সেইরকম ... টেনেটেনে হাসল সে।

—তারপর?

—আমরা নাগাল না পেয়ে ফিরে এলাম। সামনে বৃষ্টি, সেদিকে কারুর ভ্রূক্ষেপ নেই।

—আপনার কপালে কী হল?

কপালে আলতো হাত ছুঁইয়ে সুশীল বলে—তখন বুঝি দেখেন নি? ফোঁড়া। আজ হয়নি তো, সাতদিন পেরিয়ে গেল। নিজেই ডাক্তারী চালাচ্ছি।

জয়া বলে—লক্ষ্য করিনি তো।

—তা করবেন কেন? সুশীলের অনুযোগ কিংবা পরিহাস।—গরীবের মুখ সব সময় বাসী।

— বোরিক কমপ্রেস করবেন।

ভীষণ হেসে সুশীল ভিতরে পুরোটা ঢোকে। কিন্তু বসে না। দাঁড়িয়ে থাকে। দীপ্তি এতক্ষণে বলে—বসুন, চা খেয়ে যাবেন।

জয়া হাতের তালু উল্টে বলে—ভদ্রলোককে ঠাট্টা ক'রো না। চিনি নেই।

দীপ্তি দ্রুত উঠে কোণের দিকে চলে যায়। কৌটো হাতে নিয়েই হঠাৎ কী ভেবে সানগ্লাসের ফাঁক দিয়ে জয়ার মুখটা একবার দেখে নেয়। পরমুহূর্তে রেখে দিয়ে বলে—তাই তো! মনে ছিল না।

—একটুখানি ছিল। তাই দিয়ে তপতী আর আমি এতক্ষণ মৌজ করলাম। জয়া শান্তকণ্ঠে বলে।

সুশীল হাত সামনে প্রসারিত করে বলে—আর কী কী নেই, জলদি দেখুন চটপট। লিস্ট করে দিন। হরলিকস্ চাইলে তাও বলবেন। নিজের কথার গরমিতেই ওর র‍্যাপার খুলে কোমরে জড়িয়ে যায় অলক্ষ্যে।

দীপ্তি এগিয়ে এসে বলে—সুশীলবাবুর কুবেরের ভাণ্ডার।

সত্যি সত্যি গম্ভীর মুখে মোড়ায় বসে লিস্ট করতে ব্যস্ত জয়া। আইটেম দীর্ঘ হতে থাকে। শেষে হাসিমুখে এগিয়ে দেয়।—ভাবছেন, মেয়েদের সামনে গল্প করে পার পেয়ে যাবেন। জানেন না তো আমরা কী জিনিস!

সুশীল বিনীত ভাবে ঝুঁকে বলে—জানি বলেই তো নিরাপদ দূরত্বে আছি। কই দিন ...

উৎপল তাহলে সেই বৈরাগী পাগলটার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শহুরে স্টান্ট ছাড়া আর কিছু নয়। ও দিয়ে আজকাল চিঁড়ে ভেজে না। জয়া বলে—হ্যাঁ দীপু, ও কাল থেকে ঘুমোচ্ছে কোথায়, খাচ্ছে কোথায়?

জবাব পুনরপি সুশীলের।—শুনলাম রাতে মুসলমান পাড়ায় কার বাড়ি মুরগির মাংস দিয়ে ভাত খেয়েছেন। সকালে ও দুপুরে ক্লাবের ছেলেরা নেমন্তন্ন করেছিল ফিষ্টিতে। আজ ওদের ক্লাবের জন্মদিন

কি না। তা, জমিয়ে ফেলেছেন বলতে হয়। গান গেয়ে, গল্প বলে ওদের মাতিয়ে দিয়েছেন। আজ রাতে আবার থিয়েটারও আছে। উৎপলবাবুর জায়গা উৎপলবাবু নিজেই খুঁজে পেয়েছেন। ওঁর জন্যে ভাবনার কিছু দেখছিনে।

—দিদিকে দেখতে পায়নি নিশ্চয়।

—বলা কঠিন। তাতে কী হয়েছে? দিদি তো বহালতবিয়তে আছেন, সুবিধেমত এসে পড়লেই হল।

গল্প এসে গেল কথায় কথায়। বাঘটা আজ মুসলমানপাড়ায় গোয়ালে ঢুকে একটা বাছুর নিয়ে গেছে। মেঝেয় রক্ত আর থাবার দাগ। ওদিকে শৈল নামে একটা কুনাইদের মেয়ে গিয়েছিল খালে না বিলে মাছ ধরতে, সে নাকি বাঘটাকে দেখে ভয়ে পালিয়ে এসেছে। আরও খবর আছে। এইমাত্র শোনা গেল, দু'মাইল দূরে বিল পারের গ্রামে নদীর ধারে একটা মেয়ে কাপড় কাচছিল। বাঘটা তার পিঠ খামচে পালিয়ে গেছে। অবস্থা গুরুতর। অথচ উৎপলবাবুর এই বেপরোয়া ঘুরে বেড়ানো!

সুশীল চলে যায় একসময়। তারপর টিপটিপ করে বৃষ্টি আসে সন্ধ্যার মুখোমুখি। জয়া গুন্‌গুন্ করে গান গেয়ে ওঠে। দীপ্তি চুপচাপ বসে তো আছেই, ধ্যানাসনে ভৈরবী।

ভৈরবী—কারণ ওর কাপড়টা অমনি লাল। চোখ জ্বলে ওঠে জয়ার। — তোমার হয়েছে কী?

—কিছু না।

লুকিও না দীপু। ভাল হবে না।

—ভাল হতে আর কিছু বাকি আছে? আঃ! ছাড়ো, লাগছে।

— মেরে ফেলব একেবারে। বলো, কী হয়েছে?

—-বলছি তো, কিছু হয় নি।

— ফের মিথ্যা কথা! পাজী হতচ্ছাড়া মেয়ে ....

কী অবাক, দীপ্তি ঝুঁকে পড়ে সত্যি সত্যি কাঁদছে যে! টিপুনি বা পেষণের দৌরাত্ম্যে? দু'হাতে মুখটা তুলে ধরে জয়া। ঠিক বৃষ্টিভেজা বড় একটা সূর্যমুখী, গাল ছপছপ করছে জলে। এবং সেই মুখে জয়া বারকয় চুমু খায়।—লক্ষ্মীটি, আমার সোনা, মাণিক, ...

কথা বেরলো গভীর রাতে। একই শয্যায় পরস্পর বাহুবন্ধে। বাইরে বৃষ্টির বিরাম নেই। বাতাস বেড়েছে। প্রচণ্ড শীত। যিনি আসবার, এসে গেলেন তাহলে। অকালবর্ষণের রাগী দৈত্য।

উৎপলের একটা খবর আনবার কথা ছিল। দীপ্তির জীবনের চাকা কোন পাকে ঘুরবে, যেন তার নির্দেশ ছিল এই খবরে। দু'দিন থেকে একটা সুতো টান রাখা হচ্ছিল— সেটা কালক্রমে টাগ অফ ওয়ারে পর্যবসিত হয়। ছিঁড়ল কিনা, খবরে তার প্রকাশ থাকত। অন্তত এই হচ্ছে দীপ্তির সুনিশ্চিত ধারণা।

এই ব্যাপার তাহলে! তাই চাকরী করে বি.এ. পাশ করার সাধনা দীপ্তির? কিন্তু জয়ার? ...জয়ার লড়াই নিজের সঙ্গে নিজের।

—দেখ দীপু, অত ইমোশনাল হওয়া তোর উচিত নয়। জীবনটা খুব জটিল। আমি উপদেশ দিচ্ছি না ভাই, যা বুঝেছি, তাই তোকে বলছি। সব ছেড়ে এতদূরে এসে পড়ে আছি, এর কারণ কী জানিস? কারণ হচ্ছে, এমনি করে আমার এখানে থাকার ব্যাপারটা শুধু দেখার ভুল। আসলে আমি কিছু ছেড়ে আসিনি, এমন কি কোথাও আসিনি। তাই আমার ফিরে পাওয়া বা ফিরে যাওয়ার ব্যাপার নেই। এই থাকাই আমার থাকা, এই আসাই আমার কাছে আমার বয়স বাড়ার ব্যাপার। আমার কাছে স্থান বলতে একটিই। সে হচ্ছে, আমি। কাল বলতে আমার বয়স বুঝি। এর বাইরে কোন কিছুর সঙ্গে নিজেকে জড়াতে পারিনে। চেষ্টা করলেও পারব না।...

জয়া ফের বলে—তাছাড়া কী হাস্যকর ব্যাপার, কে কোথায় বসে আমার জীবনের চাকা ঘোরাবে, কেন? কিসের অধিকার? ঘর সংসার চাস্? ছেলেপুলের মা হতে চাস্? আমার বৌদি কী বলেন জানিস? আমার মত অবিবাহিতা থাকলে সে স্বর্গ পেয়ে যেত হাতের মুঠোয়। সংসারে গ্লানি, দুঃখ, যন্ত্রণা চারপাশ থেকে ওকে নাকি অক্টোপাসের মত পিষে মারছে। ছেলেপুলে ঘর সংসার এখন নাকি ওর মারাত্মক বোঝা। বলে, নরক, শুধু নরক! ভগবান, আর জন্মে যেন মেয়ে করে পাঠিও না পৃথিবীতে।

দীপু, 'নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস' কবিতা আছে না একটা?....অবিশ্যি, বৌদি মুখেই বলেন হয়ত; ভিতরে সংসারের মায়া বড় কম নেই। চিরদিন হয়ত মেয়েরা পুরুষের সঙ্গী হয়ে তারপর এই বুলিই আওড়ায়। আমি জানি, ওটা অভ্যাস। ওর সুখ আর যন্ত্রণা সবই অভ্যাসগত। এর বাইরে যেতে যদি কেউ চায়, সে কি খুবই অস্বাভাবিক, খুবই অন্যায় হবে দীপু?

দীপ্তি আজ ঘুমোয় না। কথা শোনে নিঃশব্দে। কিন্তু বুকের ভিতর সেই বিকেলের নিসর্গ—ঝড়ের পূর্বেকার মেঘাচ্ছন্ন থমথমে পৃথিবী। বাইরে শেষ অব্দি ঝড় এলই, দীপ্তির কথায়? সেই একই স্তব্ধতা, সমাসন্ন প্রস্তুত মেঘভারে আচ্ছন্ন আকাশ। সেই প্রচণ্ড শৈত্য। উৎপলের কাণ্ড দেখে আরও বিমূঢ় হতে হয়েছে। সহোদর ভাই এমন হতে পারে? এত নিষ্ঠুর, কৌতুকপ্রিয়! অবশ্য অমন সতর্ক চতুর ছেলে, মনে মনে হাসছে না তো?

হঠাৎ পাশ ফেরে দীপ্তি। তারপর মুখ তোলে। কনুই গুঁজে দেয় বালিশে। মাথার কাছের টেবিলে হেরিকেনের দম বাড়িয়ে দিয়ে বলে—আচ্ছা জয়াদি, এমনও তো হতে পারে, আমার ভয় মিথ্যে, উৎপল দেখেছে, সব ঠিক আছে, তাই—

জয়া শান্তকণ্ঠে বলে—হতে পারে।

আত্মবিশ্বাসে দীপ্তির মুখ উজ্জ্বল দেখায়।—ঠিক তাই-ই।

—একটা কথা দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে। যে কথা ডাকযোগে জানানো যায়, তার জন্যে ভাইটাই একশো হ্যাঙ্গামার কী দরকার বুঝছিনে। তোদের কি পত্রালাপ বন্ধ? মান-অভিমান চলছে?

দীপ্তি লজ্জা পেয়ে বলে—হুঁ। ও আমাকে ভুল বুঝেছিল।

—খুকি! গালে ঠোনা মেরে জয়া বলে।—কিন্তু তাই বলে ভাইকে জড়ানো কেন এর সঙ্গে?

— সে তুমি বুঝবে না।

—খুলে না বললে কী করে বুঝবো, বল্?

—তরুণরা আর আমরা একই গ্রামের লোক ছিলাম নাকি। অবিশ্যি তখন আমি নিতান্ত কচি। মায়ের কোলে দুধ খাচ্ছি। পরে কোলকাতায় এসেও কী ভাবে একেবারে প্রতিবেশী হয়ে গেলাম।

— তোদের দেশ কোথায় ছিল, ফরিদপুর না বরিশাল?

—বরিশাল।

জয়া লাফিয়ে ওঠে। —বরিশাল! যাঃ, বাজে বকিস না। বরিশালের মেয়েরা নাকি বন্দুক ছুঁড়ে লড়াই করতে পারে। তুই হাসালি দীপু।

—কী মুশকিল, আমি তো কলকাতাতেই বড়ো হয়েছি। বরিশালের কী আছে আমার মধ্যে?

—রক্ত আছে। জয়া গুছিয়ে বসে।—মরুকগে, তারপর?

—দু'জনে পাশাপাশি বড় হয়েছি।....

—বাল্যপ্রেম। সংক্ষেপে বল্।

—না, ব্যাপারটা তা নয়। ওসব দু'জনের একজনও স্বপ্নেও ভাবিনি, বিশ্বাস করো। হঠাৎ একদিন...

—বুঝেছি, কিউপিডের দুষ্টুমি। তারপর?

—অবিশ্যি প্রেম-ট্রেম বলে দু'জনে জিনিসটে দেখিনি মোটেও। নিতান্ত সাদামাটা একটা প্রস্তাব ও প্রস্তুতি। কে কী ভাবে প্রসিড করবে, ইত্যাদি। তার মানে, এ বাজারে একজনের আয়ে নিশ্চয় কুলোবে না। তাই ও বললে—আমি কোয়ালিফিকেশন বাড়াই, তুমিও বাড়াও— যে ভাবেই হোক্, এর জন্য যদি কামস্কাটকা যেতে হয়, আপত্তি ক'রো না।

—বুঝেছি, তারপর?

কথাটা দু'জনে পরস্পর নিজের ফ্যামিলিতে পাচার করে দিলাম। দু'পক্ষই রাজী হলেন। এমন কি শুভকর্ম যত শীগগির হয়, চুকিয়ে ফেলতে তৎপর হলেন। কিন্তু তরুণ বলল—না, অপেক্ষা করো। আমিও বললাম—না, অপেক্ষা করো। দীপ্তি সিলিঙের দিকে তাকিয়ে অক্লেশে কথাগুলো বলে যাচ্ছিল—মুখস্থ করা বাক্যপঙ্‌ক্তির মত।

—অদ্ভুত বলেছিস্। ঠিক রেডিওর কথিকার মত। থুড়ি! সংবাদসমীক্ষা।

ঝড় যেন হাত দিয়ে কপাট ঠেলছে। গুমগুম শব্দে বাইরেটা অলৌকিক জগৎ মনে হয়। জয়া

দরজার খিলের দিকে তাকায়। বন্ধ জানালা চুঁইয়ে টুপটাপ জল ঝরছে। জিনিসপত্র কিছুই রাখা যায় না ওখানে—দশ ইঞ্চি মাপের এক ইটের দেয়াল।

না, কেউ নিশ্চিত ধাক্কা দিচ্ছে দরজায়। দীপ্তির বুক টিপটিপ করে। জয়া এগিয়ে গিয়ে দরজায় কান পাতে। তারপর এদিকে সন্দিগ্ধ মুখে তাকায়। দীপ্তি বলে—খুলো না, যে হবে হোক।

— উৎপল হয়ত। তাছাড়া কে আসবে?

— যেই হোক্। মেয়েদের ঘরে ঝড়বৃষ্টিতে রাত দুপুরে ইয়ারকি কেন?

দীপ্তি ঘরময় চোখ ছড়িয়ে খোঁজে বঁটি বা ছুরি। মাখনের কৌটোর ওপর ওই যে, হেরিকেনের দম আরও বাড়িয়ে নামে সে। জয়া দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে আছে। ওদিকে দরজা ভেঙে পড়ার উপক্রম।

দীপ্তি তাকে টানে।— মরুকগে, খুলো না।

জয়া নিরুত্তর। ভঙ্গী দেখে দীপ্তির ভয় ক্রমশ বাড়ছে কী সর্বনেশে চাউনি। সরে আসবারও তো নাম নেই!

দীপ্তি মরীয়া হয়ে বলে-- টেবিল বাকসো সব এনে দরজায় রাখি, শীগগীর! এই জয়াদি, জয়া!

বাঘ নয়। নিশ্চিত নয়। জয়া জানে বাঘ এমন করে না, তাছাড়া বাঘটা এখনও মানুষখেকো হয়ে ওঠেনি। উঃ, মেয়ে হয়ে জন্মানোর মানে হাজার বার ষান্মানিক পরীক্ষা দাও।

—জয়া, বাঁদরটা ফিরে যাক সেই শিবনাথের বাড়ি। সরে এসো। তাছাড়া, যদি এখন উৎপল হয়, সেও সমস্যা, না হলেও সমস্যা!

— কেন? জয়া চাপাস্বরে প্রশ্ন করে। এতক্ষণে ওর দু'চোখ ভরা কৌতুকের উজ্জ্বলতা দেখা যাচ্ছে।

—প্রথম সমস্যাটা শোয়ার। দ্বিতীয়টা তো বুঝতেই পারছ।

—তার মানে, আত্মরক্ষার।

ততক্ষণে ধাক্কা থেমেছে। ধৈর্যের পরীক্ষায় নিশ্চিত হার মেনেছে ওপক্ষ। সুতরাং চাপা হেসে জয়া দরজা খোলে। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির ছাঁট নিয়ে দমকা ঠাণ্ডা বাতাস বুকে ছুরি মেরেছে। শূন্য বারান্দা থেকে আবও একটু ভীত আলো নীচে প্রাঙ্গণে পৌঁছেছে। সেই আলোয় দেখল দুটো অভিমানী পা উল্টো দিকে হাঁটছে। দীপ্তি চিৎকার করে—উৎপল, এই উৎপল! নিউমোনিয়া হবে যে!

তিন

রেলস্টেশনের কাছ থেকে বাবলতলী—এই পাঁচ মাইলের যোগসূত্র যে সড়ক, সেটা অবিশ্যি জাতীয়তার সম্মান পায়নি। বুনো রাস্তা, পীচ ঢেলে ভদ্র করা হয়েছে মাত্র। বাবলতলীর চাষাগেরস্থের ছেলেরা যেমন আজকাল প্যান্টসার্ট পরে, ঘড়ি বেঁধে সিনেমা যায়, শহরে যায়, মেলায় যায়।

নাবাল কয়েক মাইল জায়গা, নদীর অববাহিকা যাকে বলে। তার উপর সতেরটা ব্রীজ বানাতে হয়েছে পি. ডব্লিউ. ডি. কে। জাতীয় মহাসড়কের সঙ্গমে বাজার, বি.ডি.ও. আপিস, ইলেকট্রিক সাবস্টেশন, হাসপাতাল, থানা, আবগারী, আর যা যা সব থাকা উচিত। যথা—ইট ও টালির চিমনীভাটা, ধানকল, তেলকল, কাঠগোলা, তাঁত-সমবায়। সুতরাং শিল্প ও মজুর আছে। শহরতলীর সমস্যাগুলোও কিছু কিছু আছে। তাছাড়া বিশেষ পল্লীটল্লীর সুযোগ সুবিধাও আছে; মন চাঙ্গা থাকলে গঙ্গাও হাতের কাছেই মেলে।

মহাসড়কে রাতের গাড়ি বলতে সবই মালবোঝাই ট্রাক। দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, বোম্বে, নাগপুর আসে যায়। কয়লা খনিতে যায়। গুঁফো বা দেড়েল তা'বড়ো বড়ো জোয়ান শরীর ড্রাইভারগুলোর। বিকট শব্দ—চাকায় যেমন, তেমনি হর্নে। হাসপাতালে রোগীরা কেন যে হার্টফেল করে না, এই এক ধাঁধা।

শিবনাথের মন্তব্য। সুতরাং বাঘ কেন, বাঘের পিতৃপুরুষও সে পথে হাঁটছে না। স্টেশন রোডেই তার যত বীরত্বপনা। তবে ইসমাইল কাবু হলেও বিনোদ কাবু হয়নি। সন্ধ্যার আগে স্টেশনে যায়, ফেরে মধ্য রাত্রে।

—একটা দিন মাত্র ঘুরে কী দেখলেন? কালও থাকুন। একটা জবর খেলা দেখে যান।

—নাঃ। কাজ আছে।

শিবনাথ বলে— বোমা তৈরী না থিয়েটার?

উৎপল জবাব দেয় না। টেবিলে পা তুলে সিগ্রেট টানে। ধুঁয়োর রিঙ পাকিয়ে লক্ষ্য করে।

— থেকে যান, কেমন? থাকছেন তো? ... শিবনাথ ঝুঁকে আসে মুখের কাছে। ... থাকবেন না?

গ্রে বাব্বা! একেবারে মেয়ের মত নাঁকিস্বরে নিবেদন ... তা হোক্‌, ওর মধ্যে যথেষ্ট সরলতা আছে স্বীকার করতে বাধা নেই। যত আলাপ হচ্ছে, ভালই লাগছে ওকে। কেবল সমসাময়িক ঘটনার নানা ব্যাপারে ওর মতামত দেওয়াটাই যা বিরক্তিকর।

ফের সেই রাজনীতি এসে যায় কথায় কথায়। উৎপল যেন ওকে খোঁচাতে আনন্দ পায়। তখন একটু চুপ করে থেকে ভেবে শিবনাথ বলে—কাল আপনি বলছিলেন, কলকাতাই সব সময় রাজনীতির কেন্দ্র ; সেই নাকি আন্দোলনের ডাক দেয়, তখন আন্দোলন শুরু হয় বাংলাদেশে। প্রথম আলাপ, তাছাড়া অত সুন্দর করে বলেন, জবাব দিতে ইচ্ছে করেনি। এখন দিচ্ছি। আপনার ও-কথাটাই দারুণ ভুল। আন্দোলনের মধ্যেও আসল-নকল আছে।

—তাই নাকি?

—সব সত্যিকার আন্দোলনের শুরু মফঃস্বলে, শেষ কলকাতায়। এখানে উত্থান, ওখানে পতন। এখানে বিশ্বাসের জন্ম, ওখানে বিশ্বাসের বার্ধক্য, পতন ও মৃত্যু।

—চমৎকার!

—উৎপলবাবু, শূন্যে কিছু হয় না। এখানে মাটি, ওখানে আকাশ। রঙবেরঙের আলোর খেলা, ঝড়-বৃষ্টি, বজ্রপাত! আমরা চমৎকৃত হই, উড়তে যাই, আছাড় খেয়ে মরি। দিনের পর দিন এই হ্যালুসিনেশান্‌, আমাদের সর্বনাশ হচ্ছে ...

—অতএব?

টেবিল চাপড়ে শিবনাথ বলে—গ্রামে আসুন।

—রাজী। সঙ্গে সঙ্গে উৎপলের জবাব।

বিষণ্নমুখে শিবনাথ বলে—আমার হয়েছে জ্বালা। সব দলই আমাকে ভালবাসে, বিশ্বাস করে! তাই সব সময় আপস আর মধ্যস্থতার জন্যেই আমার ডাক। বিশ্বাস হচ্ছে না? আমার বয়স এসবের পক্ষে খুব কম মনে হচ্ছে?

—না, না। আপনার সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি।

—অনেক কথা? বলুন না, কী কী শুনেছেন?

—উঁহু। দুষ্টুমি করে মাথা দোলায় উৎপল।

— কোন মেয়েঘটিত দুর্নাম নিশ্চয়। বলুন না, রাগ করব না।

—এই রে! সঙ্গে সঙ্গে কবুল। না মশাই, আপনার দ্বারা সত্যি কিস্যু হবে না। কারণ, রাজনীতি করা এক ধরনের.... যাকে বলে আউটল'র কাজ। যারা প্রচলিত আইন ভাঙতে চায় বা ভেঙে ফেলে।

—তা যদি বলেন, আমরা জন্মগত ভাবে প্রত্যেকে আউট ল। দেখুন না জন্মের পরই তো হাজার রকম আইনের বেড়া চারপাশে একটার পর একটা দেখা দিতে থাকে। বাবা-মা, আত্মীয়স্বজন, পরিবার, সমাজ, সরকার, রাষ্ট্র, এমনকি নিজের জন্যে আইন বানাই। কারণ আমি তো জন্ম ক্রীতদাস মশাই। সবার দখলে আমি, আষ্টেপিষ্টে আইনের রশিতে বেঁধে রাখে। বাপ্‌স! কী সাংঘাতিক হিংস্র জীব, কী ভয়ানক অন্ধ শক্তি! উৎপলবাবু, মানুষের জীবনে তো ওই একটি মাত্রই কাজ—যার নাম আমৃত্যু আইন ভঙ্গের যোগ্যতা অর্জন করা। এ একটা রীতিমত সাধনা। যে যত সমর্থ বা যোগ্য, তত আইন ভাঙতে পারে। কিংবা বলতে পারেন, আইন ভাঙার পরিমাণ দেখেই বলা যায়, কে কতটা সমর্থ বা যোগ্য ব্যক্তি। তাছাড়া, আইন ভাঙার আনন্দের নামই তো জীবনের আস্বাদ। অ্যাম আই রাইট?

—রাখুন তত্ত্বকথা। কাজের কথা বলুন। কাল কী খেলা হবে?

—ব্যাঘ্র শিকার।

—বেশ, দেখব। কিন্তু বাঘটা সত্যিকার, না কাগুজে?

—কে জানে মশাই! গুজব তো জোর ছুটেছে। আমার কেমন সন্দেহ হয় ...

—কেন?

—ধানকাটার মুখে চাষাদের ভয় দেখানোর তামাসাও হতে পারে। তাছাড়া প্রথম তো রটেছে, আপনার দিদির কোয়ার্টার থেকে। না, আপনার দিদি কেন রটাবেন? ওঁর সঙ্গে আরেক ভদ্র মহিলা থাকেন ...

—জয়াদি?

—হ্যাঁ। তিনিই দেখেছিলেন নাকি। পাতাবাহারের ঝোপে চাঁদের আলো পড়লে বাঘ মনে হওয়া স্বাভাবিক।

—কিন্তু পরে যে অনেকেই দেখেছে!

—কী জানি! শিবনাথ মাথা নাড়ে। ফের বলে—সে কালই দেখা যাবে। কয়েক শো লোক বিলের দিকে নামবে। অমরদা যদুবাবুরা থাকছেন। এদিকে সরকারী শিকারীও কে যেন এসেছে। বি.ডি.ও'র বাংলোয় আছে। বাঘ যে মিলবে না, এ আমি দিব্যি কেটে বলতে পারি। একটা উৎকট ফোবিয়া!

হঠাৎ উৎপল বলে— মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন?

—দুর, দুর! আচমকা প্রশ্নে শিবনাথ ভ্যাবাচ্যাকা খায় যেন। আরতি আমার ক্লাসফ্রেণ্ড ছিল ছেলেবেলায়।

—আর কিছু নয়?

— কে জানে কী! এ নিয়ে গোলমাল বিস্তর হয়ে গেছে! ফল কিছুই হয় নি। আসলে পুরো ব্যাপারটাই ভুল বোঝাবুঝি। মশাই, ও একটা ময়রার মেয়ে। তিনকুলে কেউ নেই। বিয়ে যার সঙ্গে হয়েছিল, সে আমার বাবার বয়সী। তাতে আবার ঘরজামাই। এদিকে আরতির নামে কিছু বিষয় সম্পত্তি আছে। একটি ছেলেও রয়েছে।

—তারপর?

—তারপর আর কী! বাবুপাড়ার কলির কেষ্টরা সচরাচর এসব ক্ষেত্রে চিরকাল যা করেন, তাই ঘটতে যাচ্ছিল। তখন আরতি আমার হেল্প চাইল। বুড়োকে তো ভয়টয় দেখিয়ে তাড়ালুম। এখন আরতি একা থাকে। সুতরাং খোঁজখবর নিতে যেতে হয় কখনও সখনও। সেটা সবারই চক্ষুঃশূল।

কখন বেলা বেড়েছে। আজ তাজা রোদ। গত রাতের বৃষ্টিতে সব ময়লা ধুয়ে গেছে পৃথিবী থেকে। ঝকঝকে পরিষ্কার দেখাচ্ছে বাবলতলীকে। কিন্তু বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গেছে। অসম্ভব ভালো লেগে গেল শিবনাথকে, এই দ্বিতীয়বার। উৎপল ব্যাগটা দেয়ালের একটা হুকে আটকে দিয়ে বলল—আজ স্নান করব না! ভীষণ ভিজেছি গতরাত্রে।

—দিদিকে খবর পাঠিয়ে দেব নাকি? ভাববেন না তো?

—নাঃ।

—এ বেলা পুকুরে জাল ফেলে মাছ ধ'রব। চলুন, হরি জেলেকে ডেকে নিয়ে আসি।

খানিক পরে জেলেপাড়া থেকে হরিকে ডেকে আনে। হরি শোলার ভেলা ভাসিয়ে জাল ফেলে। উঁচু পাড়—দীঘি বলাই ভালো। বুকভরা টলটলে জল। পাড়ে অজস্র তেঁতুল গাছ। রোদের দিকে সরে গিয়ে পা ছড়িয়ে বসে উৎপল হরির জাল ফেলা দেখছে, সেই সময় সুশীল আসে। অ্যাটেনশন দাঁড়িয়ে করজোড়ে নমস্কার—সুশীলের যা চিরাচরিত প্যাটার্ন।

উৎপল হাত তোলে মাত্র। ওখানে হরিজেলের জালে একদঙ্গল পোনা। ছটফট করছে। জ্যান্ত? সত্যি জ্যান্ত? নির্ভেজাল তাজা মাছ। মা—ছ! কলকাতার কোন মার্কেটের ছবি দীঘির জলে ভাসে। কাদের হাত? দুমড়ে ভেঙে ফেলব না? খবরদার! রি রি করে ক্রোধের জ্বালা ছুটে যায় মাথার দিকে।

—মাছ ধরা দেখছেন? ছিপ পেলতে পারেন? ওবেলা নিয়ে যাব'খন। দেখবেন, ভাগ্যে থাকলে সতের সেরও এসে টোপ গিলবে। এ তো পিঁপড়ের বাচ্চা। অবিশ্যি, ছিপের মরশুম চলে গেছে। তা হোক...

উৎপল বলে—খবর বলুন।

সুশীল পাশেই কাঁকুরে মাটিতে বসে পড়ে।—খবর আপনার জন্যে। শুনলাম, রাতে বৃষ্টির মধ্যে দিদির বাসায় গিয়েছিলেন .... ফিক করে হেসে ফের বলে— মেয়েদের বুদ্ধি! ভেবেছে, চোর-ডাকাত নাকি! ওদের দোষ কী বলুন, ওই জায়গায় একাদোকা থাকেন। .... দিদি ভীষণ দুঃখ করছিলেন। শুধু

কি দুঃখ, প্রায় কাঁদো কাঁদো অবস্থা। আমি বললুম, হাজার হোক্, মায়ের পেটের আপন ভাই, যাবেন কোথায়? এক্ষুনি ধরে আনছি।

উৎপল ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলে—ধরে আনার কী আছে? ইচ্ছে হলেই যাবো।

সারা বিকেলটা আজ আঠারো পাড়া গ্রামের নানান পাড়ায় কাটল। সঙ্গে শিবনাথ তো ছিলই, সুশীলও রয়েছে! পিছনে আরো জনা চার-পাঁচ তরুণ। সম্মানিত বিদেশী অতিথির মত, অনেক ব্যাপার জেনেও না-জানার ভান করে ও অহেতুক উৎসাহ দেখিয়ে একসময় ক্লান্ত হচ্ছিল উৎপল। এ একটা বিচিত্র মুখোস পরে থাকা কিছু সময়ের জন্য। মুখোসের নীচে গড়িয়ার সেই নিরীহ কেরানীর হারামজাদা ছেলে উৎপল। কদাচিৎ সুযোগ পেলে পুলিশের গাড়ির টায়ারে বোম মেরেছে—কিংবা রাতদুপুরে মাঠে বার পাঁচেক টেস্টের আওয়াজ দিয়ে পড়শীদের জীবনযাত্রার উইকেট ফেলে দেওয়া যার ক্রিকেট ছিল একদা। সেবার দুটি বিবদমান দলের মধ্যিখানে পুলিশের গাড়ি, চাদরের ভিতরে স্টেনগান নিয়ে যারা পুলিশের সঙ্গে বচসা করছিল, তাদের একজনই ছিল উৎপল।

সেই উৎপল! আভাঁ গার্দে হতে চেয়েছিল সব ব্যাপারেই। তারপর দেখা গেল একদিন খুবই সভ্য হয়ে উঠেছে। দরখাস্ত হাতে লাইন দিয়েছে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে। সব রকমের তীব্রতর কার্যকলাপ এখন তার নিতান্ত ইচ্ছার ঝাঁপিতে সাপের মত রাখা। এখন সে দেখে ন্যাংটো ছেলেপুলের পাল, গামছা পরা চাষাভুষো, হাল-জোয়াল, মুরগী, আমড়াগাছে শুকোতে দেওয়া জাল। আরে দেখ দেখ, করগেট টিনের চালে-চালে তালগাছের মাথায়-মাথায় এরিয়েল! দেখছ, দেয়ালে পোস্টাব ভূমি সমস্যাব সমাধান চাই। যদি শোন মফেজ সরদারের ছেলে হঠাৎ গাল ফুলিয়ে হেঁকে ওঠে—ইনকিলাব .

সেই সময়ে এক মজা হয়ে গেল। দুলেপাড়ার প্রান্তে লম্বা টানটান ভরা পুকুরের কোন কোণে জঙ্গলে গরুর মুখ ঃ মেরা মনকা গঙ্গা তেরে মনকী যমুনা বোল রাধা .. স—ং—গ—ম, সুশীল চৌধুরী চিৎকার করে— নেহী নেহী কভী নেহী এবং ঘাটে পা ঝুলিয়ে বসে থাকা তুখোর মাতাল নন্দ দুলে, গা-ময় ধুলো, আশ্বাস দেয়— হোগা হোগা, হোগারে বাবা, হোগা এবং হাজার বছরেব নাকি সনাতন বৌদ্ধপীঠ বাবলতলীর হিমধূসর জলাশয়ে প্রচণ্ড ঝাঁপ, আলোড়ন, চাষাড়ে হাসি হা হা-হা-হা-হা' পাড়ে পরবর্তী ঝাঁপে প্রস্তুত জনাকয় মজুর গোছের লোক— কেউ চিমনীভাঁটার লালধুলো গায়ে, কেউ ধানের জমিতে কাদায় নিড়ান দিয়েছে, কোমর দুলিয়ে টুইস্ট কিংবা হুলাহুপ চালায। বাবু ভদ্রলোক দেখেও ভ্রূক্ষেপ নেই। জলের দাঁতও ওদের রক্ত ঝরাতে পারে না।

তা সত্ত্বেও ঘোষ এ্যাণ্ড বোস সলিসিটার্স-এর অভিজ্ঞ কেরানী ভবেশ সেনেব ছেলে উৎপল সেনকে রাজধানী থেকে আসা প্রতিনিধির সম্মান দিতে বাবলতলী মুখর। মুখরতা বাড়ে একটা হোমিওপ্যাথিব দোকানে। অমিয় দাশ মশাইয়ের সঙ্গে পরিচিত হয় উৎপল।

—এই ভদ্রলোক, যাঁকে দেখছেন, এলাকার নাম্বার ওয়ান। প্রাক্তন বিপ্লবী, নির্যাতিত....শিবনাথ ফিসফিস করে পূর্বাভাস দিয়েছে। বলেছে—এখনও এলাকার রাজনীতির পাণ্ডা। কলকাতায় বসে বুঝি ভাবেন—সর্বকিছু সেখানেই ঘটছে?

দ্রুত চশমা পরে অমিয়বাবু বলেন—আরে আসুন। আসুন। বাবা সুখেন, শীগ্‌গির কাকীমাকে বলে আয় এক কেটলি চা পাঠিয়ে দিক্। বসুন আপনি। দীপ্তির ভাই, তাই না? দীপ্তি আমাকে আবার দাদা বলে ডাকে! বেশ মেয়ে, চমৎকার! শিবনাথ, তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন? .... অব্বিশ্যি চেয়ার বেঞ্চ নেই, মেঝেতেই বসো সব। ওহে সুশীল, একটা সিগ্রেট দাও .....

কিছুদিনের মধ্যে রোগা মানুষটি গরিলা হয়ে ওঠেন। উৎপলের শরীর আস্তে আস্তে শক্ত হয়। পেশী ফোলে। অগ্নিকোণে যে উজ্জ্বল তারাটি দেখে কিছুদিন থেকে তার এক জোচ্ছাসের যাত্রা, সেই তারার ওপর, প্রকাণ্ড উজ্জ্বল শতকোটি বিস্ফোরণে সূর্যের মত অবিনশ্বর। চূড়ান্ত আনন্দের মধ্যে যে যন্ত্রণা আছে, তা তাকে জড়িয়ে থাকে।

—না হে, আমার দ্বারা আর কিস্যু হবে না। অমিয় দাশের রুগী এসে গেলে ক্যালেণ্ডুলার শিশি হাতড়ান। গরিলাটা হঠাৎ মমির খড়ি খড়ি বাসী, হাত লিক্‌লিকে, মরামাস, টান টান আঙুল, ছোট শিশির রাজ্যে বিব্রত দেখে কষ্ট পায় উৎপল।—সুকান্ত, বাবা আলোটা জ্বেলে দে। দেখিস, সুইচ টিপে হয়েছে, কারেণ্ট না মারে! আর উৎপলবাবু, কী যে বলছিলুম .... গ্রামগুলো সব ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

একটা কিছু করা বড্ড দরকার।....

সুশীল উৎপলের কানে কানে বলে—আজ আবার থিয়েটার। ছেলেরা একটু সকাল সকাল নিয়ে যেতে বলেছে আপনাকে।

— কেন? আমি কী করব?

— কী আর করবেন? উৎসাহ দেবেন। পাড়াগাঁয়ের ছেলে সব।....

পথে সুশীল ফের বলে—শিক্ষিত মানুষ, আপনাকে উপদেশ দেব কী!

উৎপল বলে—বুঝতে পারছি না!

শিবনাথ সামনে কিছুটা এগিয়ে আছে। সুশীল বলে—ওই আড্ডাটা কিন্তু বাঘের। সাবধান!

— কেন বলুন তো?

সুশীল হাসে—আপনি দাদা দু'দিনের অতিথি, কী দরকার ওসব আজেবাজে লোকের সঙ্গে? আচ্ছা, এখান থেকে সোজা ক্লাবে যাবেন, না শিববাবুর বাড়ি?

শিবনাথ দাঁড়িয়ে পড়ে।—কিঞ্চিৎ জলযোগের আয়োজন আছে। তুমি বরং এগোও সুশীলবাবু, আমিই পৌঁছে দেব'খন।

সুশীল এ্যাটেনশন দাঁড়িয়ে জোড়হাতে নমস্কার করে। অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। উৎপল বলে—এই লোকটি কেমন বলুন তো?

—কে, সুশীল? শিবনাথ খিকখিক করে হেসে ওঠে।— কেন?

—লোকটিকে ভাল মনে হয়।

—বলা মুশকিল। সুশীল আমার গাঁয়ের লোক, আমার চেয়ে বয়সে বেশ কিছু বড়। সারাজীবন দেখছি, নানা ব্যাপারে মিশছি। সত্যি বলতে কি, আমি ওকে একটুও বুঝতে পারিনে। কখনও মনে হয় সাক্ষাৎ শয়তান, ভণ্ডের রাজা। আবার কখনও বুঝলেন উৎপলবাবু, কখনও মনে হয়েছে, ও দিলদার,

—দিলদার?

—হ্যাঁ। সাজাহান নাটকের সেই ভাঁড়—আসলে যে ছিল এক প্রখ্যাত পণ্ডিত।

উৎপল জোর হাসে।—গোলাম হোসেন মনে হয় না তো?

—সিরাজউদ্দৌলার? বিচিত্র কী! মানুষের কতটুকু মানুষ নিজেই জানে? তবে একথা সত্যি, সুশীলের আচার-আচরণ যা, তাতে ওকে সরল চোখে ভাঁড় বলতে পারেন নিঃসন্দেহে। কারণ আজ অব্দি প্রত্যক্ষত আমি ওকে কারুর ক্ষতি করতে দেখিনি।

—কী করে ও?

—মালটিপারপাস কো-অপারেটিভের কেরানী। কর্তাদের হাতের লোক। হাসবেন না যেন, আমিও ওই কো-অপারেটিভের একজন ডিরেক্টর মশাই।

রাস্তার এপারে মুসলমান—ওপারে হিন্দু পল্লীর শুরু। শিবনাথ বলে— নোম্যানস ল্যাণ্ড এই রাস্তাটা। এপারে দরগা, ওপারে শিব-মন্দির। ইতিহাস বলে বুদ্ধ মন্দির।

বসবার ঘরে আলো জ্বলছিল—ব্যাপার কী, বলে শিবনাথ লম্বা পা ফেলে। বারান্দায় উঠেই চেঁচায়—আরে ও উৎপলবাবু, মজা দেখে যান!

দরজা-জানালায় পর্দা। কে আছে দেখতে পাওয়া যায় না। দীপ্তিদি? জয়াদি? উৎপলের পা এলোমেলো পড়ে। রাতের প্রচণ্ড অভিমান ফের পা দুটোকে জড়িয়ে ধরে! সে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। সীন ক্রিয়েট করতে আসা হয়েছে এখানে! ছোড়দিটার বুদ্ধিসুদ্ধি আর কবে হবে?

বাঘের মত যেন ঘাড় কামড়ে নিয়ে যায় শিবনাথ।—এই যে আলাপ করিয়ে দি, আমার নতুন বন্ধু উৎপল সেন। উৎপলবাবু, এই দেখুন বাবলতলীর সর্বনাশ আমাদের ঘরে ঢুকে গেছে....কতক্ষণ এসেছ তোমরা?

—নমস্কার! উৎপল সামনাসামনি বসে। আপনি বুঝি সেই....

—আপার নাম আরতিরাণী দাসী।

ছোট্ট ছেলেটির গালে ঠোনা মেরে শিবনাথ বলে—বাপী পটকা ফাটাবে?

বাপী চোখ কচলায়। বোঝা যায়, পটকাকে ওর বেজায় ভয়।

—কী খাবি?

—বিস্কুট।

—ছ্যাঁঃ! বিস্কুট খাবি? আজ আমি দাতাকর্ণ রে বাবা, নরমাংস খাবি?

আরতি? সেই আরতি! উৎপল টের পায়, এতক্ষণ বাড়ির মেয়েরা এ ঘরে কথা বলছিল, এদের দেখে সরে গেছে। ভিতর দরজার পর্দার নীচে আলতা পরা এবং আলতা না পরা খসখসে কয়েকটা পা। কৌতূহলে মন কুটকুট করে—আর কোনদিন কি আসা হয়েছিল এ বাড়িতে? ছেলেবেলার কথা নয়— কেলেঙ্কারীর পরে? আড়চোখে তাকিয়ে ওর চাউনী বিশ্লেষণ করে। নাঃ, ডাকাত নয়, ডাকাতকালীও নয়। ঘাসের ঘেরাটোপে শিসিয়ে ওঠা ছিপছিপে অসহায় রজনীগন্ধা। উৎপল একটু কেশে বলে—শিবনাথবাবুকে বলেছিলুম আপনার বাড়ি গিয়ে আলাপ করিয়ে দিতে...

শিবনাথ থামিয়ে দেয়—শিবনাথবাবু কি মশাই! অবিশ্যি ডাকনামটা বেশ ভালোই মনে হবে—সানু। সানু বলেই ডাকবেন।

আরতি বলে— বেশ তো, যখন ইচ্ছে যাবেন।

শিবনাথ চোখ কপালে তোলে—যখন ইচ্ছে যাবেন! যখন ইচ্ছে যাওয়া গেলে তো সারা ভারতবর্ষ গান্ধী হয়ে উঠত।

আরতি হঠাৎ ওঠে।—অনেকক্ষণ এসেছি! খবর পাঠিয়েছি, বলেনি তোমাকে?

—না তো! শিবনাথ বলে। হয়ত যেপথে তোমার লোক গেছে, আমি সেপথে ফিরিনি। কাকে পাঠিয়েছ?

—তোমার ভাই ভানুকে।

—ও একটা মস্তান। সস্তুদের সঙ্গে জুটেছে সম্ভবত। যাক্ গে...

ছেলের হাত ধরে আরতি বাইরে যায়। পিছনে, উৎপলের দিকে একটু হেসে, শিবনাথও চৌকাঠ ডিঙিয়ে যেতে যেতে ফের ফিরে আসে। টেবিলের দেরাজ খুলে বড় একটা টর্চ তুলে নেয়। বেরিয়ে যায়।

উৎপল চুপচাপ বসেছে। দেয়ালের অনেকবার দেখা ছবি, ক্যালেণ্ডার আর ফোটো, সিঙ্গেল বা নানান ফাংশনের গ্রূপ ফোটো। বেশীর ভাগই রাজা-উজির গোছের অভ্যাগতদের সঙ্গে শিবনাথ। আর, ওইটে হচ্ছে যতীন গোমস্তা। সেকেলে রাজাদের মত চেহারা। প্রকাণ্ড গোঁফ। বাঘের মত চাহনি।

বাবলতলীর মাটিতে, আকাশে-বাতাসে কী আছে। ভীষণ রোমাণ্টিক হয়ে পড়ছে। উৎপল বুঝতে পারে। যে নীলিমা ছিল মাত্র শূন্যতা, শূন্যতায় ছিল মোটরের চাকার ধুলো, কারখানার ধুয়োয়, কখন সে নীলিমা হয়ে উঠেছে জীবনের অবচেতনায় লক্ষ বছরের প্রাণের ইতিহাস ধরে থাকা পাত্র ; অমৃতে-বিষাদে সুখে-শান্তিতে ষড় ঋতুর নানা রঙের আলোয় পূর্ণ মনে হয় সেটা। তার নৈঃশব্দকে মনে হয় অর্থের গভীরতা। বুঝতে পারছে প্রথম তরঙ্গ অনেক তছনছ করে যাবাব পর ফের এ দ্বিতীয় তরঙ্গের ঝাঁপিয়ে আসা।

উনিশশো বছরেরও আরো আগে আকাশের কোণে হঠাৎ একটা তারা ফুটেছিল, ন্যাজারেথের দিগন্তে। বেথেলহেমের দিকে প্রাচ্য জ্ঞানীরা ছুটে গেলেন যে তারা লক্ষ্য করে, ওঁরা কি ভুল করেছিলেন? কোথায় শান্তি ক্ষমা আরোগ্য গরীবের স্বর্গ লাভ? কাঁটার মুকুট শিরে, কাঁধে ক্রুশকাঠ নিয়ে নিজেই চলি নিজেকে রক্তাক্ত শরীরে ঝুলিয়ে দিতে! হিরোশিমা পুড়ে যায়। ফের অজস্র হিরোশিমা পুড়বার জন্যে তৈরী হয়। ... তবু ফের নক্ষত্র দেখি দিগন্তে। কখনও মনে হয় মাথার উপর। চোখ জ্বালা করে। গা জ্বলে রি রি করে। লোমকূপ থেকে বিষদাঁত গজায়। নকল নক্ষত্র দুলিয়ো না, দোহাই তোমাদের। হাঁটতে হাঁটতে আমাদের পা ধরে গেল। পাড়ার দাদা বলেন, বুজরুকি স্রেফ! একটা উপগ্রহ ছেড়েছে ওরা! তৃতীয় যুদ্ধের প্রস্তুতি। এবার রণ হবে, মহারণ। সভ্যতার কবর বানানো হবে। নক্ষত্র বিপ্লব মহামার! খের, তোমার আত্মায় পাপ ঢোকেনিতো?

পর্দা তুলে যতীন গোমস্তার উদয়।—শিবু কোথা?

উৎপল নড়ে বসে। আঙুল তুলে বাইরেটা দেখায়।

যতীন গোমস্তা পা বাড়িয়ে বাইরেটা একবার দেখে নিয়ে গজগজ করতে করতে উৎপলের পাশ

দিয়ে ভিতরে ঢুকে যায়। উৎপল শোনো, ফের একটা ঝঞ্ঝাট না বাধিয়ে ছাড়বে না!

লোকটাকে বড্ড অসভ্য মনে হয়েছে উৎপলের। শিবনাথ বলেছে, বাবার ব্যাপারে নজর দেবেন না। সেকেলে মানুষ। আজীবন রাজা-উজির ছাড়া কাকেও পাত্তা দেন না।

কথাটা ও নিজে না বললে কি উৎপল এখানে রাত কাটাত, না খেত? সেকালে এরাই তো ছিল সেই প্রাচ্যদেশীয় স্থূলবুদ্ধি এবং একাধারে শিশ্নোদর ও ধর্মপরায়ণ ব্যারণদের দুর্ধর্ষ অনুচর। একদল রক্তচোষা ভ্যাম্পায়ার। ইঙ্গিতমাত্র ছুটে গেছে ভূমিদাসের দিকে। অথচ কী চাকর ...পা-চাটা কুত্তা....নফর।

বাইরে সুশীল ও শিবনাথের গলা। উৎপল সিগ্রেটের প্যাকেট বের করে। কখন শূন্য করে ফেলেছে। উঠে গিয়ে টেবিলের ওপাশে দেরাজ টানে। শিবনাথ বিড়ি সিগ্রেট খায় না, কিন্তু রাখে। বিড়িই রাখে। দিনরাত নানারকম লোক আসে, বেশির ভাগই চাষাভুষো।

সুশীল নমস্কারের আগেই চেঁচিয়ে উঠে—দেখুন, দেখুন কাণ্ড উৎপলবাবুর!

উৎপল বলে—অভ্যাস করছি।

—রাখুন মশাই। এই নিন সিগ্রেট।

শিবনাথ বলে—আরে বাবা, জাত যাবে না। ইনটেলেকচুয়ালরা গাঁজা-গুলিও খায়। বিড়ি তো নস্যি!

উৎপল বলে—বাড়ি অব্দি গিয়েছিলেন নাকি?

শিবনাথ সুশীলের দিকে কটাক্ষ করে। চোখ টেপে।

চার

—এই, দেখ, দেখ!

—কী? বাঘ?

—যাঃ! অভ্যাসমত গালে ঠোনা মেরে জয়া হাসে। ফের মন্তব্য—জন্মান্ধ!

দীপ্তি জানালা দিয়ে ভাঙা গেটটার দিকে তাকায়। মুখ ফিরিয়ে বলে—কই, কিছু নেই তো!

জয়া অত সহজে কোনদিন রহস্য ভাঙবার পাত্রী নয়। বরং নিজেও প্রতিদিন প্রত্যেকটি আনকোরা পাটভাঙা শাড়ির ভাঁজে একটি করে নতুন-নতুন রহস্য রাখছে যেন। আজকের শাড়িটা ক্রীমরঙের। সিল্ক নিঃসন্দেহে। ম্যাচকরা ব্লাউজ—হাতা একটু লম্বাই। এত টাইট যে হাত তুললেই বগল ফর্দাফাঁই হবার তালে। অবিশ্যি তা হয় না। মস্ত ডাঁই চুড়ো-খোঁপা। গলায় সরু চেনের লকেটহার। গজমুখী কাঁকন। কতকটা মধ্যবিত্ত গৃহিণীদের মত আত্মবিশ্বাসী চেহারা। হাতায় লাল সোয়েটারটা ঝুলিয়ে আয়নায় মুখ দেখছে সে।

জয়ার সঙ্গে প্রথম আলাপের পর মনে হয়েছিল, ভালো খেতে পরতেই—তার মানে প্রতিদিন একটা করে অন্য রকম শাড়ি পরবার জন্যেই চাকরী করা। মাইনে পেয়ে ভুল ভাঙল। দেড়শ টাকায় এসব চলে না। ক'মাস পরে অবিশ্যি কর্তৃপক্ষ সদয় হয়ে দু'শোতে পৌঁছে দিলেন। লাভ হল কই? লোকসান সমানে চলছে। তাছাড়া জয়া যে হালে থাকবার চেষ্টা করছে, দীপ্তির পক্ষে সেটা বেশ খানিক বাড়াবাড়ি। ভাগ্যিস, জয়ার সংসারে টাকা যোগাতে হয় না। দীপ্তিকে অবিশ্যি আগে টাকা পাঠাতে হত। উৎপলের পড়ার খরচ চালাত সে একা। বি. এ. পাশ করার পর সে-দায়টা থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে। এখন নিজের জন্য কিছু জমাতে হয়।

—দীপু .... জয়া কাঁধে হাত রাখে।

—উঁ!

—আমার মুখে কি পাউডার লেগে আছে?

দীপ্তি হাসতে হাসতে মুখ দেখে।—নাঃ।

পর্দা তুলে দিয়ে এসে জয়া বলে—এবার?

নাঃ। কিন্তু যাবে কোথায়?

বলব না গোছের চোখ টিপে ও ভ্রূ নাচিয়ে জয়া কাপড়ের কুচীর ভাঁজে বাঁ হাতের আঙুলগুলো শিল্পীর মত রাখে এবং ডানহাত ঝুঁকিয়ে দেয় নীচের দিকে। ফলে শরীরও ঝোঁকে। পায়ের কাছটা

টেনে এপাশ ঘোরে। যেন পাছার দিকটা দেখে নেয়।

দীপ্তি মনে মনে আহত। না, হিংসে-টিংসে নয়। মন খারাপ হয়ে আছে। বেরোতে ভালো লাগে না। সে বলে—পড়াশুনোয় বসতে হবে। কিস্যু এগোচ্ছে না।

—মন দিয়ে পড়। আমার ফিরতে বিকেল হয়ে যাবে। আরে! ওকি করছ?

ট্রানজিস্টারের চাবি ঘোরায় দীপ্তি। মুখ ফিরিয়ে বলে—ব্রেনটা ক্লিয়ার করে নিই। তুমি তো ফ্রেশ হাওয়া খেয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ফিরবে।

—না রে, না। জয়া গাল টিপে দেয়।

—যাবে কোথায়, বললে না তো! বেশ, যাও....

—অভিমান করো না, মানিক আমার, সোনা ...

—ধ্যাৎ!

—অভিসারে যাচ্ছি রে, বুঝলি? তাই তোকে সঙ্গে নিলুম না। জয়া বেরোয়।

—পথে বাঘ আছে।

বাইরে থেকে জয়ার স্বর আসে—বাঘের কাছেই যাচ্ছি।

যতসব বাজে গুজব। কয়েক বর্গমাইল তোলপাড় করে চযে ফেলা হয়েছে। বনবাদাড়, মাঠঘাট কোনোটা বাদ যায়নি। শিকারীরা গোমড়া মুখে ফিরে এসেছে।

খবর বলতে এখন ওই উপসংহারটুকুই। কিন্তু সব জায়গায় সব মুখে বাঘটা যেমন ঘোরাফেরা করছিল, এখনও তদ্রূপ। বরং আরো জোরদার হয়েছে ব্যাপারটা। তার ফলে প্রাগৈতিহাসিক আমলের বুনো জন্তু, এমনকি সেই হরিণটা থেকে শুরু করে দেবদানব ভূতপ্রেত ইত্যাদি মিলেমিশে বাঘটা এখন ভীষণ-ভয়ঙ্কর এক অলৌকিক অস্তিত্ব পেয়ে গেল। শিবনাথ কথিত চাষী-রাজনীতির গন্ধও বাদ পড়েনি। রয়েছে।

যাই হোক, স্বীকার করা ভাল শুধু বাবলতলী কেন, সর্বত্রই এমন বাঘের কথা শোনা যাচ্ছে। কেবল বিলপারের গ্রামে কোন কাপড়কাচুনে মেয়ের পৃষ্ঠক্ষত এবং ফজল সেখের বাছুরের অন্তর্ধান রক্ত, পায়ের দাগ—এই চারটি প্রত্যক্ষ বাস্তবের খুঁটি থেকে যাচ্ছে। উপেন ফাঁকতালে এসে বলে যায়—জগদ্ধাত্রীর প্রতিমায় একটা বাঘ আছেন। বিসর্জনের পর তেনার টাটখানা তুলে এনে ফের মণ্ডপে রাখা হয়। দেখেছেন দিদিঠাকরুণ? গেছেন উদিক পানে? দেখবেন, চারখানা বাঁশের পরে বাবাজীবন বাহনমশাইটি, ... খেড়ো গতর, কাদামাটির চিহ্নটি নেই। তবে হ্যাঁ, .. চারখানা বাঁশে ভর করে রয়েছেন আজ্ঞে!

আফিম খায় নিঃসন্দেহে। খাক্। বলেছে ভালো। বাঘের খেড়ো গতর, বাঁশের খুঁটি . হাসতে হাসতে দীপ্তি হঠাৎ দেখে ক্লাস ভেঙে বেরোন একদঙ্গল মেয়ে প্রাঙ্গণে হেঁটে আসছে। এ ঘরেই নাকি?

মাস্টারনীসুলভ গাম্ভীর্যে দীপ্তি প্রস্তুত হয়। কতক চেনা, কতক অচেনো। তবে, তপতীটা নেই, এই বক্ষে। ও বাঁকাচোরা কথায় যেন প্রতিপদে অপমান করতেই আসে। অথচ জয়া বলে—বাবলতলীতে ওই একটিমাত্র মেয়েই আছে। বাকি সব ফাজিল, গ্রাম্য, বাজে মার্কা জলছবি।

— এস, এস। অভ্যর্থনা করল দীপ্তি।

—বড়দি নেই?

— বেরিয়েছেন। খবর বলো সব।

কেউ বসে পড়েছে তক্তাপোষে। কেউ দাঁড়িয়ে আছে। মোড়া দেখায় দীপ্তি। একজন মাত্র একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসে। বয়সে সবচেয়ে বড় অঞ্জলি বলে—থিয়েটারে দেখলাম না যে? যাননি বুঝি?

দীপ্তি মাথা নাড়ে।—শরীর ভালো ছিল না।

—আচ্ছা দীপ্তিদি, স্টেজে এক ভদ্রলোক গান করছিলেন, উনি নাকি আপনার ভাই?

দীপ্তি নিঃশব্দে তাকায়। চারপাশে কয়েক জোড়া উৎসুক চোখ লক্ষ্য করছে এবং মুখটেপা হাসি ফিসফিস। পরক্ষণে হাসির ঝড়। ঝড়ে একরাশ ফুল তোলপাড়।

—হেরে গেল, অঞ্জলি হেরে গেল! দুয়ো!

—দে পাঁচটাকা। শীগ্গির দে।

—এই নিনা, মিষ্টি খাওয়া চলবেনা কিন্তু। ফিস্টি করব। দীপ্তিদির নেমন্তন্ন।

—জয়াদিরও।

—যাঃ, পাঁচ টাকায় কী ফিস্টি হবে!

—চাঁদা দেব।

—বেশ, লিস্ট করে ফ্যাল্ এক্ষুনি। দিদি, একটু কাগজ দিন তো।

—সত্যি, অত সুন্দর গান করেন ভদ্রলোক, দেখেই বুঝেছিলাম...

—প্রীতির সবটাতেই বাড়াবাড়ি। কী বুঝেছিলি?

—রেখা, এবার বল না কার মত চেহারা?

ফের হাসির দমকা হাওয়া। সেই ফাঁকে একজন বলে—দিদি, উনি সিনেমায় নামেন নি? দীপ্তি কাঠ। জয়া থাকলে সব সামলাত।

—এই, কত বই দেখছিস?

—বই তুই দেখিস নি, ভালো করে দ্যাখ। আচ্ছা, দীপ্তিদি, আপনি গান করতে পারেন না?

—না না। নিশ্চয় পারেন।

— তোর চেয়ে ভালো পারেন। রেখা, তোর চুলের কাঁটা পড়ে গেল....

— দীপ্তিদি, আমাকে একটা জিনিস শেখাবেন?

— বুঝেছি খোঁপা বাঁধতে?

— পাখির বাসা, পাখির বাসা!

— যাঃ! অজন্তা!

— না, ইলোরা।

— শিখা ফের একটা বাজী হোক। অজন্তা-ইলোরা......

— তার মানে?

— কোন্‌টা কোন্ দেশে? ভারতে না পাকিস্তানে?

— দুটোই ভারতে।

— ও তো পারবেই ফাস্ট বয়.......

— এ ভাই, বয় বললে। গার্ল গার্ল....

— দীপ্তিদি, একটা কথা শুনলাম....থাক্, পরে বলব।

— অত ঢাকচাপ বুঝিনে। বলবি তো বলেই ফ্যাল না বাবা।

— থাক্।

— আমি বলছি। আপনার ভাই......

— যাঃ! উনি কী করে জানবেন? নতুন এসেছেন।

— ময়রাদের সেই মেয়েটার বাড়িতে আপনার ভাইকে নাকি কারা সব দেখেছে!

ঝড় নয়, বেলুন চুপসে গেল এতক্ষণে। স্তব্ধতা। তারপর ফিসফিস। মুখটেপা হাসি। তারপরই উপেন ঘণ্টা দিয়েছে। টিফিন পিরিয়ড শেষ হল।

— এম্মা! উপেনদার মাথার ঠিক নেই। এই, ওঠ।

— চলি দীপ্তিদি।

— চলি দিদি।

— চলি।.......

— চলি।......

— চলি।.......

ঝড় ঢুকে ঘরের ভিতরটা সব তছনছ। রাজ্যের ধুলো মেঝেয়। স্যাণ্ডেল খুলে ঢোকবার ভদ্রতাও শেখেনি। দীপ্তি তার মাথা ধরা টের পায়। হতাশ ভাবে তাকায় মেঝের দিকে। মেনকার আসতে দেরী আছে। তার আগে জয়া এসে পড়লে— বাপস্! দীপ্তি তক্তাপোষের নীচের থেকে ঝাড়ন বের করে অগত্যা।

মেনকা এল বেলা গড়িয়ে। তখনও জয়ার পাত্তা নেই। বহরমপুর গেল নাকি? স্কুলবাড়ির ওপারে আম বাগানের মধ্যে মস্ত উঁচু শিরীষের ডালপালা। সূর্য সেখানে আড়াল হয়েছে। সামনে প্রাঙ্গণের শেষে ছোট্ট গলিমত—এক পাশে বোর্ডিং, অন্যপাশে লম্বা রান্নাঘর। তার বাঁহাতি ফুল ও শাকসব্জির খেত। ফাঁকা জমিটায় ইজিচেয়ার পেতে রঘু মুখুয্যে হেড মাস্টার তামাক খাচ্ছেন। আরো দুটো চেয়ারে অঙ্কের যদুবাবু, সংস্কৃতের পন্ডিত মশাই। চায়ের কাপ গোলটেবিলে। কাগজপত্রও আছে।

তার ওদিকে পথ। পথ ধরে টানা পাঁচিল। একহাতে গরুর খুঁটি ও দড়ি, অন্যহাতে মুগুর, প্রৌঢ়া চলে গেল তাকাতে তাকাতে। দু'চারজন মুটেমজুর চাষাভুষোও গেল। শেষে গেলেন বাঁড়ুযোগিন্নি সরোজিনী। সঙ্গে ওই বুঝি তপতীর দিদি। এক দঙ্গল ছেলেমেয়েও পিলপিল করে যাচ্ছে।

সেই পথ তাকিয়ে বসে থাকা। নোটের খাতা হাতে ধরা। বারান্দায় মোড়া পেতে দীপ্তির অবেলায় ঘুম ধরে চোখে। মেনকা ঠাকরুণ উনুনে আঁচ দেয়নি। জয়া আসবে বলেও না, খাবার সময় টাটকা গরম গরম পাতে দেবে। ভাত নয়, রুটির ব্যবস্থাই হয়েছে সুশীলের দৌলতে। ওর পাশে কৌটা তরকারীতে এলামেলের কড়াইটা ভর্তি। পা ছড়িয়ে বসে কৌটা থেকে পান বানায় মেনকা।

—দাদাবাবু ইদিকপানে এলেন না তাহলে? না কি গো?

—কেন? দীপ্তি চমকে ওঠে।

—দেখলাম না তো। নাকি এসেছিল?

দীপ্তি অশ্বত্থামা হত ইতি গজর মত হুঁ দিয়ে সারে।

—ছেলেটা কিন্তু বেশ, বুঝলেন! বাবলাতলীকে মাতিয়ে দিয়েছে।

—কেন? ফের চমক দীপ্তির।

—সব জায়গায় ওরই কথা। বাঘের কথার পিঠে ওই কথা।

—কী কথা?

মেনকা হেসে ফেলে।— বাব্বা, শুহুরে ছেলে, চোখে মুখে ধার,গান বাজনা, তায় অমন রূপ। মর্ মুখপোড়ারা, তোদের গাঁয়ে এমনটি পাবি? উপোসী পেরাণ দেখেই লুফে নিয়েছে। খাসা ছেলে বাপু!

—তাই বলো। দীপ্তিও হাসে।

—শুনলাম, আজ বদুবাবুর বাড়ি নেমন্তন করেছিল। আমি কেমন করে জানব? ওনাদের চাকর জেলেপাড়ায় জেলে ডাকতে যাচ্ছিল, শুধোলাম। বললে,.... কী নাম তোমাব ভাইটির যেন?

দীপ্তি গলা ঝেড়ে বলে—উৎপল। উৎপলেন্দু।

—হ্যাঁ। উৎপলবাবু...উৎ বলতেই পান ছিটকে পড়ে। মেনকা হাসে দুলে দুলে। শেষে বলে দোখো বাপু, আবার জামাই করে না ফেলে। ঘরে দু'দুটো বাঘিনী পোষা...তা তোমরা তো বামুন নও গো। বদুবাবুরাও অবিশ্যি বামুন না, কায়েত। কায়েত তাতে কী? আজকাল ছত্রিশ জেতে একঘাটে জল খাচ্ছে। চক্কোত্তি বাড়ির খিটকেলে কাণ্ড বলিনি? না, বলেছি?

— মনে পড়ছে না।

— কেন, পোয়াতি নার্স বিয়ে কল্লে চক্কোত্তির ছোট ছেলে। ও বামুন, কনে কিন্তু শূদ্দুর! আমাদের কাল হলে তো পিত্থিমী মাথায় উঠত! দ্যাখো, কেউ টুঁ শব্দটি কল্লে? করেই বা আর কী হবে! যে যাব আপন আপন। দেখো দিদি, কথা যদি পাড়ে, আপত্তি করো না। ...চাপা হতে থাকে মেনকার স্বর— বদুবাবুর একমাত্তর ছেলে। অঢেল সম্পত্তি। আজকাল মেয়েবাও অংশ পায়।

যেমন উপেন তেমনি মেনকা। দুটোতেই আফিং-টাফিং খায় হয়ত। দিপ্তীর ঘুমের আমেজ চটে যায় ইত্যবসরে। সে বলে— তরকারিটা রেঁধে ফেললেও পারতে।

মেনকা বলে,— সে আর কতক্ষণ! সাতটা বাজতে সব শেষ। অত সকাল সকাল খাবে নাকি?

— তা হোক্। আঁচ ধরাও।

— রুটি ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। তখন পাঁঠার কান বলে ফেলে দেবে বাপু।

— বেশ তো, রুটি পরে করবে। জয়াদি আসুক।

— ততক্ষণ মিছিমিছি কয়লা পুড়বে? যে বাজার, হুঁস করা ভালো। রোজগার কত্তেই তো এসেছ

দুটো পয়সা।

গা জ্বলে ওঠে দীপ্তির। কিন্তু কথাটা সত্য। সুতরাং সে উঠে গিয়ে হেরিকেন জ্বালে। ধূপবাতি জ্বেলে ছবির ঠাকুরের সামনে গুঁজে দেয়। প্রণাম করে। তারপর ট্রানজিস্টার খোলে।

মেনকা পিছনেই এসেছে। —কই দেশলাই দাও।

—থাক্। একটু পরে আঁচ দেবে।

—যা ভালো বোঝো বাপু... বলে মেনকা গিরগিটির মত রঙ বদলায়। ফিকফিক করে হাসে এবং ঘরের মেঝেতে অভ্যাস মত পা ছড়িয়ে বসে পড়ে। ফের বলে— টকীর গান কোথায় হচ্ছে, ধরো না সেই জায়গাটা। আমার মেয়ে রাইমণি; কুতুবপুরে বে দিয়েছি। ওদেরও আছে একটা। পুজোয় এয়েছিল সঙ্গে নিয়ে। আওয়াজ কী! কান পাতা যায় না। ওদের আবার অনেক সব বড়লোক যজমান রয়েছে। শিষ্য হয়েছেন খোদ জজসায়েব। তেনারাই দিয়েছেন।

জানতে ইচ্ছে করে, মেনকা ঠাকরুণ সিনেমা দেখেছে কিনা। দেখেছে নিশ্চয়। দীপ্তি সেটা আর জানতে চায়না। কৌতূহল নয়, নিতান্ত কৌতুক। অথচ মেজাজ প্রতিকূল। কিছু ভালো লাগে না, কিছু মনের মত নয়। কিছু ঘটছে না। যা ঘটছে, সে তার বাইরে। আড়চোখে মেনকাকে দেখে, তারপর ট্রানিজিস্টারটা দেখে নিয়ে, হঠাৎ এতক্ষণে ওর মনে পড়ে যায়—আরে তাই তো! তরুণকে চিঠি একটা লিখবেই এবং জয়া না থাকায় অঢেল সুযোগ; কখন অলক্ষ্যে এই ইচ্ছাটা করে চলেছে সে!

ক্ষিপ্রহাতে প্যাড বের করে বাক্সো থেকে। বিছানায় উপুড় হয়ে শোয়। বুকে বালিশ চেপে দীপ্তি কলম ধরে। সামনের হেরিকেনের কাচে পোকা জমছে একটা একটা করে।

লাজলজ্জা করে লাভ নেই। সংসার ও মানুষের জীবন জটিল হোক্, যাই হোক্, ইট মাটি কাঠের মত প্রত্যাক্ষ্য বাস্তব একটা আছে। বাস্তববাদী হওয়াই ভালো।

একসময় কাঁধের কাছে পরিচিত গরম নিঃশ্বাস ও গন্ধ পেয়ে দীপ্তি চমকাল। দ্রুত উল্টে দিল প্যাডটা। —যাও, কী অসভ্য তুমি!

—তোর দিব্যি, একটা শব্দও পড়ার সুযোগ পাইনি।

সব সামলে দীপ্তি পা ঝুলিয়ে বসে।— এত দেরী হল কেন? আমি ভাবলাম বাঘ বুঝি গিলেই ফেললেন বেচারীকে।

—বাঘিনীকে বল্।

—ইস! সব দেখা আছে আমার।

—না রে, অনেক রক্তপান করে এলাম। বাই দি বাই, দীপ্তি, উৎপলের সঙ্গে দেখা হল পথে। বললে— দিদিকে বলবেন, রাগ করিনি। আমাকেও দিব্যি কেটে বললে, ভীষণ হাসাহাসি করলাম সে রাতের ব্যাপরাটা নিয়ে।

—আর?

—বললে, দিদি যেন চুটিয়ে পড়া চালিয়ে যায়। তরুণবাবু এখনও কিছু গোছাতে পারেন নি।

—আর?

—থাম, মনে করি। হ্যাঁ— ওর কলকাতা ফিরতে দেরী হবে। অনেক কাজ পেয়ে গেছে করবার মত।

দীপ্তি গুম হয়ে বসে থাকে। জয়া উঠে গিয়ে কাপড় ছাড়তে থাকে। দু'জনেই মেনকার আঁচ ধরানো পোড়া ঘুঁটের গন্ধ পায়।

পাঁচ

না, উৎপল যা ভেবেছিল, তা নয়। আরতিরাণী হপ্তায় তিনদিন শহরে সিনেমায় যায়। ছেলে থাকে সীতু ডোমের বৌ-এর কাছে। আরতিরাণী রাণীর মতই সাজগোজ করে সময়বিশেষে। শুধু তাই নয়, ভীষণ মৎস্যমাংস প্রিয়। বাবা নাকি এলাকার সেরা সন্দেশ-কারিগর ছিল। কিন্তু কে বলে ময়রা সন্দেশ খায় না? অমন সন্দেশপেটুক মেয়ে ভূ-ভারতে দেখা যায় না।

অবিশ্যি এই সমীক্ষা রিপোর্ট কতক সুশীলবাবুর, কতক নিজের, কিছু অংশ শিবনাথের। শিবনাথ

শুধু এককথায় বলেছে—ভীষণ খরুচে হাত। আয় বুঝে ব্যয় জানে না। তার ওপর জেদ—জেদ ধরলে শেষ অব্দি যাবেই।

পরে আরতির প্রতিবাদ— না মশাই, ব্যয় যা করা উচিত, ঠিকই করি। তবু দেনা করতে হয়। একি আমার দোষ?

দেনার সূত্রেই উদ্বেগ ও অধীরতায় সে রাতে শিবনাথের বাড়ি আগুনঝাঁপ দেওয়ার মত আবির্ভাব। ব্লক থেকে কিংবা কো-অপারেটিভে চৈতালিবাবদ ক্রপলোন দেওয়া হচ্ছে নাকি! শীগ্‌গির টাকা না পেলে চলেছে না। এখন পেটের ভাতের সমস্যাই তীব্র।

ব্যক্তিগত জামিন একটা চাই-ই দেনা পেতে হলে। বাবলতলীতে শিবনাথ ছাড়া সবাইকে শত্রু করে ফেলেছে। কারণ, দেখতে যত মিনমিনেটি হোক্, সাক্ষাৎ বিছুটি। অনেক মানুষের দুর্মর আশার মুখে ছপাং ছপাং ঘায়ের জ্বালা ও ক্ষত রয়েছে।

নাঃ ডোবালে! উৎপল পর্দা তুলেই ধারণার উপর ঘা খেয়ে হটেছে। ধ্যাৎ, নায়িকা-টায়িকা বাস্তবজীবনে আর অসম্ভব ব্যাপার! শহর, এমনকি কলকাতার মত জায়গায়, যেখানে চুটিয়ে প্রেম চালানোর বাধাহীন সুযোগসুবিধা, সেখানেও এই কর্কশ বাস্তবতা। দেখে দেখে ত্যক্তবিরক্ত সে। টাকাপয়সা খাওয়াদাওযা আরাম আর নিরাপত্তা— প্রেম এইসব মালখানার দরজায় চোরের মত ঘুরঘুর করে।

যা খাঁটি বলে বুঝেছে সে—তাই অর্থাৎ চূড়ান্তভাবে বদলে দেওয়া বাদে সবই পাপ। প্রেম, বিয়ে, ছেলেপুলের বাপ হওয়া, শৌখিনতা, লেখাপড়া সবই শিকেয় তোল।' এ্যাদ্দিন তো ব্যাখ্যা করেই কাটালে বাছারা, এবার সব বদলে দাও দিকি!' কে যেন বলেছিল কথাটা, মনে পড়ে না সে মুহূর্তে।

ভীষণ বিরক্ত হয়ে সোজা অমিয় দাশের ডাক্তারখানায় হাজির হয়ে বলেছে— হোমিওপ্যাথিতে এমন কোন ওষুধ আছে কি, যাতে বেশ ঘুম হয়?

বাস্তবতাটা কী, বাবলতলীর মত গ্রামে? একটা বিচিত্র কৃস্টাল, অজস্র রঙের ছোপ, কনট্রাস্ট,, বিচিত্র এক জীবের মত—যার মধ্যে মানুষ, জন্তু ও উদ্ভিদের সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গই রয়েছে। নাকি দেখার ভুল? সুররিয়্যালিস্টিক দেখা? কতদিন থাকতে হবে তাকে, যদি চরম আবিষ্কার বলে কিছু ঘটে, তার জন্যে?

উৎপল তার জেদের সঙ্গেই প্রথম লড়াই শুরু করে। সব শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশতে থাকে। অভয় বৈরাগীর বাড়িও রাত কাটাল। কালাই বাউরীর সঙ্গেও জমিয়ে ফেলল। এই নিম্ন শ্রেণীর লোকগুলো যত গরীবই হোক, খুবই অতিথিপরায়ণ। মেয়েগুলো এমন ফ্যালফ্যাল করে তাকায় যে বুকের কাপড় সরে গেলেও টের পায় না।

পাশেই কোথা থেকে হারমোনিয়ামের সুর কানে এল। অক্ষয় স্বর্ণকারের সেই ছেলে দুটি। বেশ গায় কিন্তু। উৎপল উঠে দাঁড়ায়। তবলার টুং টাং কানে আসে। দু'পা এগিয়ে যেতেই অক্ষয় মুণ্ডু বাড়িয়ে ডাকে—আরে আসুন, আসুন।

—সকাল থেকেই শুরু আজ?

—এই দেখুন না, কাজকম্ম নেই, কী আর করা। হাতুড়ি বন্ধ থাকতে চায় না। তাই তবলায় ঠুকি।

বাবলতলীর জীবনের কোন প্রান্তে এই ভৈরবীর আবহমান কালে সুর বয়ে চলেছে মনে হয়। চারপাশে হাজার রকম কাজ অকাজের মধ্যে, শান্তি ও অশান্তির আড়ালে অক্ষয় ও তার ছেলেদের স্বর বাবলতলীকে কোথয়ে যেন পৌঁছে দিতে চায়। ব্যর্থ হাতুড়ি তবলার কানায় এসে সুরে সার্থকতা খোঁজে।

একসময় সবই মনে হয় পারম্পর্যহীন, যোগসূত্রবিহীন। উৎপলের সঙ্গে এদের কোনও মিলই নেই। দূরত্বটা শুধু ভৌগোলিক নয়, মানসিকও নয়, অন্যরকম দূরত্ব। চশমা নাকের ডগায় রেখে তবলায় চাটি মারে অক্ষয়। ছেলেরা সুর চড়া পর্দায় নিয়ে যায়। হঠাৎ উৎপলের সব হাস্যকরভাবে তুচ্ছ আর অপ্রাসঙ্গিক ঠেকে। কোথায় ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি-শান্তা প্রসাদ, কোথায় বাবলতলীর অক্ষয় স্বর্ণকার আর ভৈরবী। দু'টো রোগা ছেলে, দু'বেলা পেটপুরে খেতেও পায় না। উদোম গায়ে পেট টানটান গলার শিরা ফুলিয়ে....ধ্যাৎ!

অন্যমনস্ক হাঁটতে গিয়ে কানাইয়ের সঙ্গে দেখা। কানাই বাউরী।— বাবুদাদা যে, কোন পান চললেন?

— তুমি কোথায় যাচ্ছ? উৎপল শুধোয়।

—মাঠের পানে যাই, আজ্ঞে। বাঘের ভয়ে এ্যাদ্দিন তো কবাট এঁটে বসেছিলাম।

—মাঠে কী? ধানের জমিতে?

কানাই হেসে খুন।— কী যে বলেন! ধানের জমি আমার বাবাও চোখে দেখেনি। যাচ্ছি জঙ্গল খুঁজে কাঠ আনতে।

—কাঠ কী হবে?

কানাই সকৌতুকে বলে—অই গ, কাঠে কী হয়? তা যদি বললেন, মূল কথাটা বলি। মেয়েছেলের সন্তান পেসব হলে কাঠের আঙার লাগে, বুঝলেন? যে সে কাঠ নয় বাবা, কুলকাঠ চাই। সোতরাং...

উৎপল মাথা নেড়ে বলে— বুঝেছি। চলো, তোমার সঙ্গে যাবো।

—যাবেন? কানাই একটু ইতস্তত করে। পরক্ষণে কী ভেবে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাবার মত আনন্দে বলে—চলেন, কত কী দেখিয়ে আনব! কিন্তু এক কথা বাবুদাদা, ভয়ে বলি কি নির্ভয়ে বলি?

—নির্ভয়ে বলো।

—বাঘটাঘে যদি খায়, বাড়িতে খবর দেবেন। ঘরে পোয়াতি বৌ। সে ছাড়া আর কাঁদবার লোক নেই।

ফের নিজের রসিকতায় হাসতে হাসতে হাঁটে কানাই বাউরী। উৎপল সঙ্গ নেয়। আশেপাশে অনেকে মুখ তুলে দেখে। কেউ কথা বলে। প্রশ্ন করে। উৎপল হাঁটে। হঠাৎ যেন অন্য একটা জায়গা দেখতে পেয়েছে। নতুন জায়গা। চমকপ্রদ অভিজ্ঞতার স্বাদ।

কানাই যেন তাকে পরিচিত অশান্তি-অস্বস্তিময় দ্বিধাদ্বন্দ্ব সমাকীর্ণ পৃথিবী ও তার সকল রকম এবসার্ডিটি থেকে অন্য কোথাও ছুটির জগতে উড়িয়ে নিয়ে চলেছিল, পরীদের মত।

নদীর ধারে জঙ্গলের প্রান্তে এসে হঠাৎ অমর বাঁড়ুয্যের মুখোমুখি।

—আরে উৎপল! তুমি এখানে?

—বেড়াতে এলুম। ভালো আছেন?

—তোমাদের সাহসের বাহাদুরী আছে!

—ওই লোকটা যদি আসতে পারে, আমার না-পারার কারণ থাকে না!

হাত ধরে একটা ছায়াভরা জায়গায় নিয়ে আসেন অমরবাবু। —এসেছে, শুনেছি। ব্যস্ত ছিলুম ক'দিন বাঘটাঘ নিয়ে, তাই দেখা হয়নি। আরে উৎপল, শুনলাম এবার এসে বাবলতলীর মেয়েদের নাকি মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিয়েছো! ব্যাপার কী! দেখো, সাবধান!

উৎপল নিঃশব্দে হাসে। তারপর অমরবাবুর হাত থেকে বন্দুকটা তুলে নিয়ে দূরে কোথাও নিশানা করে। অমরবাবু বলেন— গুলিপোরা আছে।

হাতে ফিরিয়ে দিয়ে উৎপল বলে— আচ্ছা অমরদা, বদুবাবু লোকটা অমন অসভ্য কেন বলুন তো?

—কেন? বদুবাবু কি করলেন তোমার?

উৎপল চুপ করে থাকে।

— আমি তো কিছু শুনিনি ভাই। বললাম না, ক'দিন ধরে বাঘ ছাড়া মাথায় কিছু ছিল না। শুধু রাত্তিরটুকু বাড়ীতে থেকেছি। তারপর সারাটা দিন এখানে কেটেছে! কী ব্যাপার বলো তো?

উৎপল ক্ষুব্ধ ভাবে বলে— অমিয়দার সঙ্গে আমার মেশা নিয়ে দিদিকে শাসিয়েছে।

বাধা দিয়ে অমরবাবু বলেন— বুঝেছি বুঝেছি। আর বলার দরকার নেই। হার্টে হাত লাগলে মানুষ নড়বে না বলতে চাও? বলতে বলতে হাসেন হা হা করে।— বদুবাবু আর আমরা অবিশ্যি আঞ্চলিক রাজনীতির ক্ষেত্রে পরস্পর শত্রুপক্ষ। রীতিমত প্রতিদ্বন্দ্বী। সুতরাং তুমি আমার উৎসাহ পেতে পারো। শিবনাথের উৎসাহ তো আগেই পেয়েছ।

সে তো বটেই।

—মরুকগে। এস, চা খাওয়া যাক।

—খাবেন কিসে?

—নাঃ, তোমার দ্বারা বিপ্লব হবে না হে। ওয়াটার বোট্‌লের মুখটা খুলে এগিয়ে দেন— ধরো। ফ্লাস্কের মুখ খুলে ফের বলেন—কেমন!

— তাই বলুন!

নরম হলুদ ঘাসে পা ছড়িয়ে বসে গায়ে রোদ নিয়ে দু'জনে মুখোমুখি চা খায়। তারপর বাঘের কথা। দু'চারবার খেদান দিয়ে কোন পাত্তা মেলেনি। সম্ভবত এলাকার বাইরে কোথায় কেটে পড়েছে। কিন্তু খবর আর একেবারেই নেই। অভিজ্ঞতা অন্যরকম বলে। একবার মানুষের সম্পর্কে এলেই ওব জাতিঃপাত ঘটে। সুতরাং বারে বারে আসতেই হয়—যতক্ষণ না মারা পড়ে। সুতরাং একটা সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। সত্যিকার বাঘ, না অন্যকিছু? বাছুরের লাশটা পাওয়া যায়নি, রক্ত রয়েছে। ওদিকে একটি মেয়ের পিঠে তাজা ঘা। হ্যালুশিনেশনে এগুলো আসে কোত্থেকে। অবিশ্যি দুটো ব্যাপার সম্পূর্ণ পৃথক ঘটনাও হতে পারে । কিন্তু ঘা ওলা মেয়েটি হলপ করে বলেছে—ওটা বাঘ।

বাঘ বাবলতলীর আগের দিনে অজস্রবার এসেছে। সুতরাং এবারও যে আসেনি, তার মানে নেই। কেবল আশ্চর্য লাগে তাব রহস্যময় গা-ঢাকা দেওয়াটা।

গতিক দেখেই যেন কানাই কেটেছে। তাকে কাছাকাছি কোথাও দেখা যাচ্ছে না। উৎপলের একটু খারাপ লাগল। কানাই ভাববে কী?

—চলুন, ফিরি।

অমরবাবু বলে ওঠেন।— ফিরব কী? ফেরবার যো আছে! মগজে বাঘেব বাসা— উৎকট গন্ধে ঘুম পালিয়েছে হে। শুনলে অবাক হবে, সারারাত বিছানায় ছটফট করি। একটুও ঘুম আসে না। ব্যাটা আমাকে খেলে, বুঝেছ?

সত্যি একটু অবাক হয়ে তাকায় উৎপল। খাকি প্যান্ট, গামবুট আব খাকি শার্ট, মাথায় শোলার টুপি, বগলে-বোঝা, বুকে টোটার মালা, হাতে বন্দুক—একটা ক্লাউনের মত দেখায় অমববাবুকে। অথচ কী বিষণ্ণ, কী বিপন্ন! পাগল, পাগল একটা!

তুমি হয়ত বুঝবে আমাব ব্যাপারটা। এই যে নাবাল বিস্তীর্ণ এলাকাটা দেখছ, এক সময় গোটাটাই আমাদের ছিল। ছেলেবেলা থেকে এখানে বাবার সঙ্গে এসেছি। উপর থেকে সাযেবসুবো এলেই এই জঙ্গল মহলে তাদের শিকার করতে নিয়ে আসতেন বাবা। এতে খাতিব বাড়ত। প্রতাপও বাড়ত। চারপাশে ঘন দুর্ভেদ্য জঙ্গল, কোথাও ঘাসের জমি, উলুকাশ, নলখাগড়ার ঝোপ। জন্তু-জানোয়ারের অভাব ছিল না। ক্যাম্প করে ফুর্তি হই-চইতে সব মেতে থেকেছে। বিকেলে বিলের জলে নৌকায় চেপে পাখি শিকার। সন্ধ্যায় রান্নাবান্না করে কেউ ঘুমোচ্ছে, কেউ আগুন জ্বালিয়ে জেগে পাহারা দিচ্ছে। শিকারীরা কোথাও গাছের উপর বসে বাঘের জন্য রাত জাগছে। আমি চুপচাপ শুয়ে থাকতাম। ঘুম আসত না। সেই ছেলেবেলায় যেন প্রকৃতির কিছু আদিম ভাষা বুঝতে শিখেছিলাম। ঝিঁ ঝিঁ পোকাব ডাক, শেয়ালের চিৎকার, গাছের পাতায় রাতের অন্ধকারে পাখিদের ডানা নাড়ার শব্দ, কখনও নানাবকম ভুতুড়ে কণ্ঠস্বর.... স্বপ্নের মত এক অদ্ভুত স্বাদে মনকে নেশাগ্রস্ত কবে ফেলেছে। দিনের বেলায় দূরের বিলে কুয়াশা দেখেছি। ফাঁড়ি-ঘাসের বনে দলপিপি হেঁটেছে। বক উড়েছে হিজল গাছের মাথায়। আমাকে সব কিছু মিলে টেনে নিয়ে যেত এক গভীর দুর্গমতার দিকে। তারপর বড় হলাম একদিন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষদিকে হঠাৎ কী খেয়ালে যুদ্ধে নাম লেখালাম। ফ্রন্ট অব্দি গিয়েছি। কিছু লড়াই করার অভিজ্ঞতাও আছে। শরীরে গুলির দাগ খুঁজলে পাবে।..... তারপর ফিরে এলাম। কিন্তু একদণ্ড স্বস্তি পাইনে। একটা প্রচণ্ডতা ছাড়া বাঁচবার কোন অর্থই নেই। আমি পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম প্রায়। বাবা হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন বললেই হয়। বিষয় সম্পত্তি দেখাশোনা করার লোক নেই। কারণ তিনি বুড়ো হয়েছেন। মা জেদ ধরলেন—বৌ এনে শায়েস্তা করবেন ছেলেকে। ছেলে এদিকে বন্দুক হাতে বিলে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পাখি খরগোস শেয়াল যা সামনে পাচ্ছে, গুলি করে মারছে।

উৎপল বাধা দেয়।— বিয়ে করলেন না?

—সে কথাই বলছি, শোন। বিয়ে না করে উপায় ছিল না। শুধু মায়ের মুখ চেয়ে নয়, ভেবেছিলাম যদি হালে পানি পেয়ে যাই। দুর ছাই! ভাগ্যে যা লেখা নেই তা হয় না। অনেক ঠেকে শিখেছি।

—ভাগ্যটাগ্য বাজে। আপনার হাতেই আপনার সব কিছু। উৎপল অধীর হয়ে ওঠে হঠাৎ।

—না, তা নয়। আমি তো নিজেকেই কর্তা ভেবে আসছিলাম এতদিন। একদিন দেখি, দুর! আমার শরীর-মন নিয়ে একজন হাঁটছে, হাতে বন্দুক। সে আমার স্ত্রীর বুক মাড়িয়ে হেঁটে যেতে চাচ্ছিল। আমি টের পাইনি। ব্যাপারটা একটু ট্র্যাজিক হয়ত। আমি জানি, যা স্বাভাবিক তাই ঘটেছে। ও সতীন সইতে পারল না।

—তার মানে?

—রাতের পর রাত আমি বিছানা ছেড়ে ছাদে চলে যেতাম। তাকিয়ে থাকতাম এই বিল-জঙ্গলটার দিকে। মাথাখারাপ হবার উপক্রম। বিলের আকাশে হাউই উড়ত। শেয়াল ডাকত। প্যাঁচার চিৎকার আবছা শুনতে পেতাম। নিশির ডাক কাকে বলে জানো? শুনেছ, ঘুমন্ত মানুষকে নিশিতে ডেকে নিয়ে যায়?

–অবসেসন।

—যাঃ! অবসেসন না হাতি। তুমি বুঝবে না হে, কারণ তুমি আমি নও।

— বেশ, বলুন।

—ভালো লাগে শুনতে? বেশ শোন। একরাতে বন্দুক হাতে বেরিয়ে গেলাম বিলের দিকে। যেন বাঘের ডাক শুনতে পেয়েছিলাম। সারারাত বনেবাদাড়ে ঘুরে সকালে ফিরলাম। জ্যোৎস্নার রাত ছিল সেটা। অভিজ্ঞতা যা হয়েছিল, তা অপূর্ব। বিলের জলে দূরে হাজার হাজার হাঁসের ডাক, পাখনার শব্দ, জলভাঙার শব্দ, আমার গুলির শব্দ। সকালে ফিরে দেখি বৌ ব্যাঙপোড়া হয়ে মরে আছে।

— সে কি!

— হ্যাঁ। সারা গায়ে কেরোসিন ঢেলে ছাদে উঠেছিল। মজার কথা কী জানো, একবার আমি দূর থেকে বাবলতলীর আকাশে আগুন জ্বলতেও দেখেছিলাম। অবিশ্যি, এ ব্যাপারটা ভাবিনি। ভাবলেও কী করতে পারতাম। তখন তো আবুহোসেনের কিছুক্ষণের জন্য বাগদাদের খলিফা হবার পালা।

—কী আপনি! অবিশ্বাস্য।

—ঠিক তাই। আমি নিজেকেই বিশ্বাস করিনে হে। গুলিভরা বন্দুক আজকাল কাঁপে। উৎপল দেখে অমরবাবুর জামায় কয়েকটা লালপোকা হাঁটছে। কাঁধের কাছে মস্তো একটা ঘাসফড়িং। পিঠের দিকে একটা মথ। তারপর আচম্বিতে শুঁয়োপোকা দেখে গুটিকয় প্যান্টের পকেটের পাশেই। শিউরে উঠে ফের তাকায়। মাথার উপর প্রজাপতি উড়ছে। হ্যাটে একরাশ পাখির গু।

অস্বস্তিতে রোম শিরশির করে তার। অমরবাবু আগের চেয়ে অনেক বদলে গেছেন! সে বলে—জামাটা ঝাড়ুন। পোকা।

—তাই নাকি! ঝেড়ে ফেলে দিয়ে অমরবাবু ফের বলেন—কানাই বেশ সাহসী বলতে হয়। এ্যাদ্দিন এদিকে জনপ্রাণীটি আসতে দেখিনি!

— গেল কোথায় ও? উৎপল খোঁজে।

—যাবে কোথায় আর? আছে কোন খালে শুয়োরের মত জলকাদায়। নির্ঘাৎ মাছ ধরছে।

—না। কাঠ আনবে বলছিল।

—ওকে চাই তাহলে? এস, খুঁজে দেখি।

কিছুদূর যেতেই কুলের জঙ্গল থেকে কানাই মুখ বাড়াল। মুখ নয়, একটা প্রকাণ্ড হাসি।—আছি আজ্ঞে। কাঠ বিস্তর পেয়েছি। ফিরে যাবেন তো? পিছনে অমরবাবুকে দেখে নমস্কার করে তক্ষুনি।—ছোটবাবুও আছেন দেখছি। সেই সাহসেই সাহস না!

অমরবাবু দাঁত খিচিয়ে বলেন—থাক্, আর সাহসে কাজ নেই। পালাও। বাঘে ধরবে।

কানাই মাথা নেড়ে বলে—আজ্ঞে না। আপনি আছেন।

—দূর ব্যাটা, তোর মত জীবকে বাঁচানো যা, মারাও তাই! উৎপলের দিকে ফিরে বলেন—সঙ্গীকে পেয়ে গেছো, আসি তাহলে, পরে দেখা হবে। কেমন?

—আপনি কোনদিকে যাবেন?

—মাইলখানেক এগোব। বাঁওড়ে একটা দেউড়বাঁশের জঙ্গল আছে, সেখানটা একবার দেখব। আর

দেখেই বা কী হবে? এই নিয়ে চারবার হবে দেখা। শয়তানটা গেল কোথায় বুঝতে পারছি না। শালা আমাকে ডোবাবে!

অমরবাবু গটগট করে ফাঁড়ি ঘাসে ভরা খালে নেমে গেলেন। ওপারে উঠে টুপি খুলে বললেন—গুডবাই।

উৎপল হঠাৎ একলাফে কাছে গিয়ে হাজির।—আমিও যাবো।

—পাগল নাকি? ও কম্মো করো না। শিকারে—বিশেষ করে বাঘ শিকারে কাকেও সঙ্গে নিইনে। ওরে বাবা, এনিমি নাম্বার ওয়ান। গো ব্যাক এ্যাটওয়ান্স।

—নেভার। যা আছে বরাতে, আমি যাবই।

—ছেলেমানুষী করোনা উৎপল। ছিঃ।

বলল—না অমরদা, প্লীজ। আপনাকে একটুও ডিস্টার্ব করবো না। বিশ্বাস করুন আমি একটু থ্রিল চাই। আমার কিছু ভাল লাগছে না। কোথাও ফিরতে ইচ্ছে করছে না।

অগত্যা রাজী। যেতে যেতে পিছন ফিরে দু'জনেই একবার দেখে নেয়, মাথায় কাঠের বোঝা নিয়ে কানাই এখনও এদিকে তাকিয়ে আছে।

বাঁশের বন, ঘাসের বন, নদীনালা, বিলডোবা ঘুরে হতশ্বাস, কোটরগত চোখ, ক্লান্তি ও বিষণ্ণতার ছাপ মুখে, কাঁটায় ছড়ে যাওয়া শরীর, শেষ রোদে ধানক্ষেত ভেঙে দু'টিতে যখন ফিরছে, সে এক দৃশ্য। ঠোঁট-মুখ শুকনো, বাতাসে ফেটে চরফাটা। যেন দুটো কয়লা খোদাই করা মূর্তি।

—হ্যাল্লো অমরদা, হ্যাল্লো উৎপলবাবু! সাইকেল থামিয়ে হাইওয়ে থেকে শিবনাথ ডাকছিল।

কাছে আসতেই শিবনাথ বলে—বাঘ কই?

অমরবাবু বলেন—বাঘফাগ পরে হবে! একটা সিগ্রেট দে তো....পরক্ষণে ধুপ করে বসে পড়েন।—তুই তো খাঁটি বৈষ্ণব—নো স্মোকিং এর দলে। সাইকেল করে শীগ্‌গির সিগ্রেট নিয়ে আয়। প্রাণটা বাঁচা। পয়সা নেই কিন্তু আমার কাছে।

সিগ্রেট আনলে কয়েকটি প্রচণ্ড টান মেরে ধুঁয়ো ছেড়ে বলেন,—তুই বাঞ্চোত একটা গাধা। আরতিকে বিয়ে করে ফেলতে পারলিনে? কী হবেরে? মাথা নেবে বদুবাবু?

—মাথায় জল দিন্ আগে। শিবনাথ বলে।

— ছোঁড়াটা মরবে, বলে দিলাম। যার মাটি নেই, আকাশও নেই, সে কী? না মর্ত, না স্বর্গ। ত্রিশঙ্কু? বাঁচবি কী নিয়ে? বেঁচে আছিস কেমন করে তাই ভাবি।

শিবনাথ মুচকি মুচকি হাসে শুধু।

—বল্, বিয়ে করবি আরতিকে?

—বাঘের কথা বলুন।

—লুকোস্‌নে বাবা। বিয়ে তো ওই একটি কারণেই করলিনে, সে বুঝেছি। কী হে উৎপল, ভুল বলছি?

উৎপলও মুচকি হাসে মাত্র। ক্লান্তিতে সে হতশ্বাস।

—দাদা, দোহাই ওসব আজেবাজে কথা বলবেন না।

—মাই গড! আরতির স্বামীও রয়েছে যে। কোথায় গেল রে সে বুড়োটা? তাড়িয়ে ভালোই করেছিস।

—ছি ছি, আমি কেন তাড়াতে যাবো! শিবনাথ সলজ্জ জিভ কাটে।

—আরে বাবা, বুঝি। তোমার চেলারা জ্বালাতন করলে ও আর কী করে! শুনছিলাম, নিষিদ্ধ হাড়-টাড়ও নাকি ফেলেছিল ওর মশারিতে। সত্যি রে?

— বোগাস! গাঁজা। আপনি বিশ্বাস করেন অমরদা?

—বিশ্বাস? কে জানে!

তিনজনে হাঁটতে হাঁটতে বাজার পাশে রেখে গ্রামে ঢোকে। শিবনাথ হঠাৎ থেমে বলে—উৎউপলবাবু কি দিদির ওখানে আছেন?

উৎপল মাথা নাড়ে।

—তবে?

উৎপল অবহেলায় বলে দেয়—কিছু ঠিক নেই। দু'দিন ক্লাবেই কাটালুম। তারপর ছিলুম অভয় বৈরাগীর আখড়ায়।

অমরবাবু উৎপলের হাত ধরে টানেন।—খবরদার। আমার সঙ্গে এস। যে ক'দিন আছো, আমার সঙ্গে। আপন গড়, বুঝলে শিবু, জীবনে এই প্রথম একজন গুড কম্পানিয়ন পেলাম! আজ সারাদিনটা সুন্দর কেটেছে।

তার মানে এখন দিদির ঘরের সামনে দিয়ে যেতে হবে। ক্লান্তি এত বেশী যে অসহায়ভাবে নিজেকে অমরবাবুর হাতে ছেড়ে দেয় উৎপল। গেটের কাছে এসে মুখ ফিরিয়ে তাকায়। মোড়ায় বসে জয়া কী বই পড়ছে। দীপ্তিকে দেখতে পায় না। চোখ ফেরাবার আগেই জয়া কিন্তু দেখেছে। হাত তুলে ইশাবা করে। উৎপল জবাব না দিয়ে গেটে ঢুকে যায়। নকল সামনে নকল হ্রদ, নকল পাহাড়, পরী আর অজস্র বিদেশী গাছপালা। অযত্নে জঙ্গল হয়ে আছে একেবারে। কোনকালে সুরকী ও পাথরের নুড়ি বিছানো হয়েছিল পথে। এখন তার স্মৃতিটুকু মাত্র পড়ে রয়েছে। গোল পথ ঘুরে বাড়ির সদর গেটে পৌঁছে যায় ওরা।

বাইরের ঘরে নয়, একেবারে সোজা দোতলায়। অতবড় বাড়িটা যেন খাঁ খাঁ করছে। লোকজন কোথায় গেল কে জানে? উৎপল অমরবাবুর ঘরের দেয়ালে চোখ রাখে। শিকারীর ঘরে যা সব থাকে, ঠিক তাই। মরা জানোয়ারের ছবি, ছাল, দাঁত, মুণ্ডু। কিছু ল্যাণ্ডস্কেপ। বুক শেলফে ঠাসা বই। কিন্তু বেশ গোছানো! কে গোছায়? লোকটাতো আদৌ গোছগাছের পাত্র নয়। গাময় পাখির পালক, লালপোকা, মথ, প্রজাপতি ঘাসফড়িং!....

জানালা খুলে অমরবাবু বলেন—আলো একটু পরে জ্বালছি। খানিক চোখ রাখো এখানে। সুন্দব, তাই না?

দূর বিলের দিগন্তে সূর্য ডুবেছে। খানিক ফিকে লাল রঙ ছড়িয়ে আছে চারপাশে। নীচে অলৌকিক আয়নার মত জলভাগ হতে কুয়াশার নীলাভ বিস্তার।

একসময় সে মুখ ফেরায় সুইচ টেপার শব্দে। আলোয় ঘর ভরে ওঠে। তপতী বলে—নিন, চা খান। দাদা স্নান করছেন। আপনি স্নান করলে, বলবেন।

'তুমি' বলতে গিয়ে পারে না। বলে—আপনি বুঝি অমরদার বোন?

—হ্যাঁ। আমার নাম তপতী। কী ভাগ্যি, ঘরেই পেয়ে গেলুম। গান না শুনে ছাড়ছিনে। মা গাঙুলীবাড়ি খবর পাঠিয়েছেন। ওঁরা আসবেন। ছোড়দি আছে। জানেন, ছোড়দিও গায়?

ধুড়মুড় করে উঠে বসে উৎপল। অন্ধকার ঘর। বাইরে সবে ফিকে জ্যোৎস্না ফুটছে। হলুদ আলোর একটা আভা গাছপালার মাথায় ছড়িয়ে আছে। বিলের দিকটা কুয়াশায়-কুয়াশায় নীলাভ। বস্তুবিশ্ব মাঠের বিস্তারে রূপের বিশ্ব হয়ে উঠেছে। নির্জনতার রূপ— নৈঃশব্দের রূপ। এ রূপের কোন তুলনা নেই। মানুষের তুলিতে এই রূপ অ্যাবসার্ডিটিকেই তুলে ধরে।

শীতে ঠকঠক করে কাঁপে সে। জলতেষ্টায় জিভ শুকনো কাগজ মনে হয়। পরক্ষণে বুকের ভিতর ফুসফুস কাঁপিয়ে কী নড়াচড়া করে। টেবিলল্যাম্পের সুইচ টিপে আলো জ্বালে। গ্লাসে জল রাখা আছে। ঢকঢক করে গিলে নেয় সবটা। তারপর পায়ের দিক থেকে লেপটা টেনে গায়ে জড়ায়। মাথার ভিতরটা অসম্ভব খালি মনে হয় তার। শীত ক্রমশ বাড়তে থাকে। তখন জানা যায়, জ্বর এসেছে। এবং জ্বর আসবার তাড়াহুড়োয় অজস্র স্বপ্নও দেখা হয়ে গেছে।

দেয়ালঘেঁষা বড় টেবিলে দামী হারমোনিয়ামটা কুকুরের মত বসে আছে। একে একে সব মনে পড়ে যায়। নিজের উপর ঘেন্না আসে। রাজ্যের বাজেমার্কা গান শুনিয়ে একদঙ্গল মেয়েকে সন্তুষ্ট রাখার জন্যে কি বিশ্রী চেষ্টাই সে করেছে।

কিন্তু অমরদা কোথায়? পায়ের দিকে ও পাশের দেয়ালে জানালার দিকে তাকায়। জানালাটা বন্ধ। অমরদার বিছানা শূন্য। দরজা ঠেস দেওয়া রয়েছে। ছাদে নাকি? এই শিশিরের মধ্যে? আচ্ছা পাগলের

পাল্লায় পড়া গেল যাহোক।

তখন জলতেষ্টা ফের। কুঁজো আছে কি ঘরে? এবং বাবলতলীর মাঠঘাট বিলজঙ্গলের নিসর্গের সঙ্গে এক মাথা খারাপ ছোটবাবুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একাকার করে দিতে দিতে অজস্র লালপোকা, শামুকখোল, হরিণ, হাতির দাঁত, বাঘের মুণ্ডু নিয়ে দেয়াল, তার চার দেয়ালকে আকাশের গভীর দুর্গমতার বিম্ববৎ ছড়িয়ে যেতে দেখে, ফুসফুসে কুকুরের ধকানি ও উপদ্রব সমেত উৎপল স্বপ্নের দিকে চলে যাচ্ছিল। যাবার পথে সামনের দরজা ফাঁক হয়েছে, ছিপছিপ হলুদ রঙের মেয়ে কে এসে আধখানা শরীর ঢুকিয়ে দিয়েছে মনে হওয়ায় চোখ খুলতেই চেষ্টা করেছিল। অথচ মাথায় ভালুক এসে বসেছে। উৎপল অতল অথৈ বস্তুবিহীন, অবাস্তব শূন্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। সঙ্গে ওই কাঁধ আঁকড়ানো ভালুক সিন্দবাদের কাঁধের ঘাটার মত।

—কেমন বোধ করছ এখন?

—মাথায় যন্ত্রণা।

দুয়ো! হেরে গেলে হে! আমি জানি আমার সঙ্গী মেলা অসম্ভব। গুডবাই, চলি। কিছু ভেবোনা। বিছানা ছেড়ে নোড়োনা কেমন? নবা হাতের কাছে রইল। তপু আছে। নিজের বাড়ি একেবাবে। ইজ ইট?

—কোথায় যাচ্ছেন?

—অভিসারে নয় হে। নিজের জায়গায়।

বন্দুক হাতে সেই চেনা বেশভূষা নিয়ে অমরবাবু বেবিয়ে গেলেন। মেঝেয় বসে আছে, ওই বুঝি নবা? উৎপল বলে—তুমি নবা?

—আজ্ঞে বাবুদাদা!

—তুমি এখন যাও। দরকার হলে ডাকব।

নবা চলে গেলে জানালা দিয়ে দৃষ্টি ফেলে সে। উজ্জ্বল সকাল এসে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ মনে পড়ে যায় রাত্রির কথা। কে দরজা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে ছিলেন যেন। সত্যিও, না স্বপ্নে—বিশ্বাস হয়না।

খানিক পরেই তপতীর উদয়। ঘরের ভিতরটা ভালো করে দেখে নিয়েছে। তারপর সটান পাশে এসে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসেছে। —মা খবর নিতে বললে। কেমন আছেন?

উৎপল শুধু হাসল। সারা শরীরে ভীষণ যন্ত্রণা। কথা বলতে ভালো লাগে না।

— দেখি কত জ্বর? থার্মোমিটারটা টেবিল থেকে নিয়ে ফের রেখে দেয় তপতী। সাক্ষাৎ হাত বাড়িয়ে দেয় কপালে। ঠাণ্ডা হাত। অস্বস্তিতে উৎপল চোখ বোজে। —ইস্ দারুণ জ্বর যে! মাথা টিপে দেব?

—না, না!

—ভয় পাচ্ছেন না তো! ফিক ফিক করে হেসে ওঠে তপতী।—আমি কি রাক্ষুসী?

—না, থাক্।

—হাত দিলেই কিন্তু জ্বর পালাবে। অবিশ্যি, যদি পর না ভাবেন, তবেই।

ম্লে বাব্বা! উৎপল বিরক্তি চাপতে চেষ্টা করে। পাশ ফেরে। এমন বেহায়া মেয়ে তো দেখা যায় না কোথাও।

—আপনি নিতান্ত নাবালক, মশাই! বুঝলেন? দাদাকে দেখলে সবাই যমের মত দূরে সরে যায়। আর আপনি গিয়ে একেবারে তারই পাল্লায় পড়লেন! তপতী ঝুঁকে বসে।

—দীপ্তিদিকে বলে এসেছি। ক্লাস শেষ হলেই আসবেন। জয়াদিও আসবেন নিশ্চয়। আচ্ছা উৎপলদা, এবাড়ি আসবার সময় বুঝি ভেবেছিলেন, একরাত্তির থেকেই পালাব। তাই না? সেটি হচ্ছেনা বাবা। জানেন, এ বাড়িতে যে একবার নিজের লোক হয়ে আসে, সে চিরকালের মত নিজের লোক হয়ে যায়। মন্ত্রপূত কিনা!

চমকে ওঠে উৎপল। ছাঁৎ করে ওঠে বুক। কী ভুতুড়ে লোকজনের পাল্লায় না পড়া গেল যাহোক।

নবা একটু কেশে ঘরে ঢোকে।—ডাক্তারবাবু এসেছেন।

—নিয়ে আয়। বলছিস্ কী?

ডাক্তার আসবার ফাঁকে ফের আরেকদফা তপতীর ভাষণ—বাবা বলেছেন, ওকে অসুস্থ শরীরে বেরোতে দিওনা! জানেন তো, বাবার নামে একসময় দেশের লোক কাঁপত! আর জানেন, আমার দাদু রাজা টাইটেল পেতে যাচ্ছিলেন সম্রাট পঞ্চম জর্জের দরবারে। পথেই মারা যান হঠাৎ। নৈলে..

উৎপল বলে—নৈলে তুমি হতে প্রিন্সেস। রাজকুমারী।

ডাক্তার এসে বাঁচালেন।—নাঃ, সামান্য জ্বর। ক্লান্তি থেকেই এ্যাটাক। অনভ্যাসের ফোঁটা কপালে শুধু চড়চড় করে না, ঘাও গজায়। একচোট হাসলেন ডাক্তারবাবু।—এই ট্যাবলেটগুলো খাবেন তিনঘণ্টা অন্তর। নবার হাতে একটা মিকশ্চার পাঠিয়ে দেব। ট্যাবলেটের দশমিনিট পর পর খাবেন।

তপতী বলে—পথ্যির কথাটাও বলে যান!

—পথ্যি? মুখে যা ভালো লাগে, খাবে!

—মাংস ভাত?

ফিরে দাঁড়িয়ে ডাক্তারবাবু বলেন -হ্যাঁ, তাও।

—দই?

—উঁহু?

—শাক চচ্চড়ি? মুড়িঘণ্ট? মুগের ডাল? পায়েস?

—ফাজিল মেয়ে! সব খাবেরে বাবা, সব খাবে। কই হে নবচন্দ্র, চলো, ব্যাগ নাও।

ডাক্তারবাবু বেরিয়ে যেতেই তপতী প্রায় গায়ের ওপর ভেঙে পড়ে। উৎপলের মাথা রাগে জ্বলে ওঠে হঠাৎ। মুহূর্তে তার হাতটা শক্ত করে ধরে বলে ওঠে—তপতী, প্রেম করবে। আমার সঙ্গে?

ছাইমুখ খড়িখড়ি, তপতী ভেজা কাশের মত নুয়ে, পলকে উঠে দাঁড়ায়, এবং অন্যদিকে চেয়ে কী যেন ভাবে। মাত্র কয়েক মুহূর্ত। পরক্ষণে ছুটে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

বাঁচা গেল! উৎপল নিঃশ্বাস ফেলে। অনেক সময় চুপ করে শুয়ে থাকে। ছোড়দি এসে দেখবে বাঁড়ুজ্যে বাড়ির জামাইটি যেন—শুয়ে আছে দামী পালঙ্কে রুগ্ন রাজপুত্র। কী মজাই না হবে!

মজা কিসেব? বুক চড়চড় করে ওঠে। সবই তো ঘটে চলেছে এক মুখোসের রাজ্যে। আবুহোসেনী কাণ্ড কারখানা। খেলাকে যদি আসল বলে মেনে নেওয়া হয়, তবে এইরকমই দাঁড়ায়। প্রেম, তপতী আর বিলজঙ্গলের রোমান্স ঘিরে বাবলতলীর বাঘটার সন্তর্পণ অদৃশ্য অবস্থিতি! আর সেইসব রুগ্ন ন্যাংটো ক্ষিদেয় কাঠ লোকগুলো, পোড়া ভিটের জীবনটাকে কবর দিয়ে দলে দলে খোলস কাঁধে নিয়ে হাইওয়েতে হেঁটে চলেছে দূরের শহরে, তাদের জন্য যে ভাবনা জমছিল, তা কোথায় গেল? ব্যাখ্যা? ব্যাখ্যার বাকী কিছু নেই। ইলিউসন? মানুষের কাছে আর কোন ইলিউসন নেই। কোনমতে চমকসৃষ্টি অসম্ভব। নতুন কী আর দেখাবে হে? চাঁদে যাচ্ছো—যাও, বিস্মিত হই না। সসার দেখেছ? বিস্মিত হওনি। ব্যাখ্যা অবান্তর! এখন যা করার আছে, তা শুধু বদলে দেওয়া। মাথায় হাঁটা নয়, পায়ে হাঁটা।

এই রে, যা ভেবেছিল! ছোড়দির চোখে জল। বাগে পেলে বুঝিয়ে দেওয়া যেত, এখানে যা কিছু করেছে, তা ওকে শাস্তি দিতে নয়। ওর নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার জন্য নয়। সে রাতে ঝড়জলে গিয়ে ডেকেছিল, দরজা খোলা হয় নি সময় মত—তার জন্যেও কোন অভিমান আসলে নয়। উৎপল কি অতখানি ছেলেমানুষ? ছোড়দি বুঝতে পারে, পুরোপুরি না হলেও অমরবাবুর সঙ্গে তার কোথাও একটা গভীরতর স্তরে সূক্ষ্ম রকমের মিল রয়েছে। প্রচণ্ডতা—হ্যাঁ জীবনে একটা অবিশ্বাস্য প্রচণ্ডতা তারও ভারী দরকার। এই কথাই কি সে কলকাতার মিছিলে শুনেছিল—রাইফেলই শক্তির উৎস, ভেঙে ফেল সব, বিশৃংখল করে দাও?

তরুণের খবরে তার মাথাব্যথা ছিল না। নিরীহ সুবিধাসন্ধানী স্বার্থপর আত্মবিলাসী নির্বিবাদী ভোগী পুরুষ তরুণকে সে মনে মনে কী ঘৃণাই না করে! কী ঘৃণা করে জয়াদিকে! আর ছোড়দি, তোমার জন্যও কম ঘৃণা মনে জমে নেই! কোন জীবন তোমরা আকাঙ্ক্ষা করচ, বুঝতে পারছ না। দেখতে পাচ্ছ না, সে জীবনের গোড়াটা আসলে ছেদিত। আগায় জল ঢেলে কৃত্রিম রসায়নে জারিত করে জিইয়ে রাখার অপচেষ্টা মাত্র। তাসের ঘরের মত মুহূর্তে সব ধসে পড়বার জনাই তৈরী। এ সভ্যতার অমৃত তোমার জন্য নয়। কোন ব্যক্তিমানুষ এ অমৃত পাবে না। তোমার জন্য পড়ে আছে ওই গরল।

আশিতলা স্কাইক্রেপার নয়, ওই ফুটপাতই তোমার আশ্রয়।... আসলে বহুবচনের দিকে পৌঁছে গেছে সব—সুখ সব শান্তি সব আনন্দ। একবচনের জন্য যন্ত্রণা আর বিষাদ। তুমি হারিয়ে গেছ "তোমারই"র মধ্যে। তোমার কোন অস্তিত্বই নেই, আছে শুধু 'তোমরা'।

—ছোড়দি, রোবট দেখবি? পার্কসার্কাসে একজিবিশনে দেখানো হচ্ছে। ছুটি নিয়ে চলে যা।

এই কথায় দীপ্তির এতদিনের সব অভিমান হঠাৎ জল। চোখের জল হাসির টানটান গাল গড়িয়ে নিঃশব্দে ঝরে যায়। জয়া বলে— রোবট? আমি দিনরাত্রি দেখছি এখানে।

—যান, শুধু বাঘ দেখেছেন!

—একই কথা।

—হ্যাঁ জয়াদি, সেদিন অমন সেজেগুজে কোথায় যাচ্ছিলেন?

—খুব জ্যাঠা হয়ে গেছ দেখছি।

—বয়স বাড়ছে। যাক্ গে, আচার খাওয়াবেন?

—লেবু, না হত্তুকীর?

—নাঃ, লঙ্কার।

—বেশ, পাঠিয়ে দিচ্ছি। এই তপতী, আমার সঙ্গে একবারটি যাবে ভাই?

—নবাকে পাঠাচ্ছি।

শেষ অব্দি দেখা গেল, নবা নয়, তপতীই এনেছে। ভয়ে ভয়ে দূরে সন্তর্পণে টেবিলে রেখে বলে—আচার। তারপর শরীর ঘুরিয়ে দেয় দরজার দিকে। অসচেতন কী বিহ্বলতায় পূর্ণ জলাশয়ের মত টলমল করছে সে!

—তপতী, রাগ করেছ?

—যান্। আপনি অসভ্য।

—হাতে হাতে না দিলে খাবো না কিন্তু।

—ওসব আমি পারব না, যান্।

—আহা, কিছু পারা না পারার কি আছে? আচারের কথা বলছি। কই দিলে না?

—যে খাবে, সে নিক্। আমার কাজ আছে।

—বেশ, খাবো না। কিচ্ছু খাবো না। অনশন করলুম। তপতী আচারটা তুলে কাছে আসে। উৎপল বলে—আহা প্রজাপতি।..

—কী বললেন?

উপল কনুই ভর করে মাথায় হাত রেখে বলে—প্রজাপতি। তুমি প্রজাপতি।

—এই, চুপ। ছোড়দি পাশের ঘরে আছে।

খেলায় খেলায় বেলা ফুরিয়ে আসে। কুয়াশার কাপড় পরে সন্ধ্যা আসে বাবলতলীতে। আলো জ্বলে ওঠে ঘরে। ছোড়দিরা বিকেলের দিকে এসে অনেকক্ষণ বসে থেকে গেছে। জ্বর ছাড়লেই উৎপল যেন ফেরার কথা ভাবে। বাড়িতে চিঠি লিখে দিয়েছে দীপ্তি। যাবার সময় জয়া কানে কানে বলে গেছে বাগে পেলে ছেড়ো না। বাবলতলীতে বাঘ যে সত্যি সত্যি এসেছিল, জানিয়ে দিয়ে যেও।

জয়াদিটা এমন অশ্লীল কথাবার্তা বলতে পারে আজকাল! খানিক পরেই অমরদার গলা শোনা যায় বাইরে।—ও কেমন আছে তপু? তারপর ঘরে ঢুকেই এ্যাটেনসন দাঁড়ান। বিলবাদাড় ভেঙে এলাম, এখন ছোঁবনা। আসছি। জ্বর কেমন?

পিছনে তপতীর স্বর।—ছাড়েনি।

—কী খেলে?

—ওষুধ।

—না, খাবার দাবারের কথা বলছি।

উৎপল বলে—রুটি আর মাংস।

—চমৎকার! একটু সেরে উঠলে মুসলমান পাড়ায় আকবরের বাড়ি যেতে হবে। বুঝেছ? কাবাব খেয়েছ, কাবাব?

—রোস্ট খেয়েছি।

—আমার জাতটাত নেই হে...এদিক ওদিক চেয়ে জিভ কাটেন অমরবাবু। তারপর বন্দুকটা টেবিলে রেখে বেরিয়ে যান। উৎপল বন্দুকটা মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করে।

যে উৎসাহ ফিকে হয়ে আসছিল—হয়ত এক সময় সব মিইয়ে যেত, উৎপলকে বাঁচিয়ে দিল তার অসুখ এবং সে উৎসাহ নতুন গতিশক্তি পেয়ে গেল হঠাৎ। শিবনাথ এল, সুশীল তো এলই এবং বারবার আসতে লাগল। আর এলো ক্লাবের ছেলেরা। মা পিসিমাদের সঙ্গে নানারকম উপলক্ষ্য নিয়ে মেয়েরাও উঁকি দিয়ে গেল দু'চারবার। এমনকি এলেন ডাক্তার অমিয় দাশও। কানাই বাউরী দোর গোড়ায় এসে কিছুক্ষণ বসে থেকে ও দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে গেছে। বলে গেছে—আমিই বাবুদারা শনি। ধিক্ বাঞ্চোৎ আমার পোড়া চোখে। অভয় বৈরাগী—যা কেউ ভাবেনি কোনদিন, বাঁড়ুয্যে বাড়ির দোতলায় দোতারায় গান শুনিয়ে গেছে।

একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য রইল মনে। গ্রামের জীবনে এখনও কিছু মানবিক গুণাবলী অবশিষ্ট আছে। তাছাড়া কী?

কিন্তু এও কি ধ্বসে যাচ্ছে না একটু একটু করে? কান পাতলে মধ্যরাতের আকাশে যেমন গুরুতর ধ্বনিগুলি শুনতে পাবে, যেমন কি না পাখিরা দলে দলে উড়ে যায়। অমরদার বুক্‌নি এটা। বুঝলে উৎপল, এ একটা উড়ে যাওয়ার মরশুম। দূরের হিমালয় থেকে পাখিরা আসে আর চলে যায়। যদ্দিন থাকে, ছলছল গমগম শব্দে জীবনের জলায় পাখনা নাড়ে, আঁচড় কাটে, ঠোঁট ঘষে। ভালবাসাগুলো বুকের শব্দে ভাঙে ও গড়ে ওঠে—গড়ে ওঠে আর ভাঙে। অন্তবিহীন যুগযুগান্তের খেলা।

সেই নভেম্বরে চার পাশের মাঠে পাকা ফসল, হাইওয়ের কংক্রিটে মিছিলের পর মিছিল দেখে সে। দুর্বল শরীর। আকাশে শিশিরের সময় ঘনিয়ে এসেছে। সঙ্গে শিবনাথ আর সুশীল চৌধুরী। উৎপল দেখে গ্রাম ছেড়ে আধন্যাংটো ছেলে-বুড়ো-মেয়ের বেরিয়ে পড়া দূরের শহরের দিকে। উৎপল দাঁতে দাঁত চেপে তাকিয়ে থাকে। কিছু করা গেল না! সে এত অকিঞ্চিৎকর হয়ে পড়ছে। এত তুচ্ছ তার অস্তিত্ব।

এক ফাঁকে শিবনাথ বলে—আরতি আপনাকে নেমন্তন্ন করেছে। সব্বায় করে ফেললে, তখন ও বাদ থাকে কেন?

উৎপল থমকে দাঁড়ায়। —তাই নাকি? কিন্তু...

শিবনাথ মুখ টিপে হাসে—বুঝেছি। সম্মান যাবার ভয় আছে।

এ পর্যন্ত শুনেই উৎপল ফুঁসে ওঠে — দেখুন শিবনাথবাবু, আমি বাঁদর নই, মানুষ। কী ভাবেন আমাকে, বলুন তো? আপনারা যত লেখাপড়াই শিখুন, গ্রাম্যতা একটা ভীষণ ব্যাধি।

অনেক সময় স্তব্ধতা। কেউ মুখ তুলতে পারে না। নিঃশব্দে হেঁটে আসে। চারপাশে আলোর উজ্জ্বলতায় গাছপালার ছায়াগুলোকে বিষণ্ণ গ্রামবুড়োদের মত দেখায়। পথের পাশে কুকুর কী শুঁকে বেড়ায়। তার ছায়া দীর্ঘ হতে হতে, অতিকায় হতে হতে, ফের ছোট হয়। একটা ছায়া দুটো হয়। তীব্র আলো ও হর্নের শব্দে ভারী ট্রাক অতিক্রম করে। নাবাল জমিতে টালি ভাটার বিস্তীর্ণ অন্ধকারে কোথাও ছোট্ট ঘরে আলোর বিন্দু ফোটে। অদ্ভুত ছোট দেখায় মানুষগুলোকে। প্রকাণ্ড বাঁজা ডাঙার উপর একটিমাত্র বাজপড়া মুণ্ডবিহীন তালগাছ। পিছনে নক্ষত্রের আকাশ। ঠাণ্ডা, মড়ার মুখের মত আকাশে সব নক্ষত্রই যেন মমীর আবরণে কারুকার্যের বেশী কিছু নয়!

— ফেরা যাক্। সুশীল বলে। ফের ঠাণ্ডা লেগে অসুখে পড়বেন।

—শিবনাথবাবু?

—বলুন।

—রাগ করেছেন?

—রাগী ছোকরাদের কথা পড়েছিলুম কাগজে।

—তাহলে দেখলেন এতদিনে?

সুশীল বাগে পেয়ে মুখর তক্ষুনি।—আরে জানেন, আজ বাঘটার খবর পাওয়া গেছে আবার। রাগের কথায় মনে পড়ে গেল। বাঘটা এবার রেগে লাল হয়ে গেছে।

শিবনাথ হেসে ওঠে।— তোমার মাথায় বাঘপোকা আছে।

—না, মাইরি তোমার দিব্যি। অভয় বৈরাগীর বাড়ির পাশে ভীষণ হাঁকডাক করেছে নাকি। অভা সকালে অনেক লোক জড়ো করেছিল। ঝোপঝাড়ে নখের আঁচড় আর পায়ের দাগও স্পষ্ট। বাঘটা এবার রেগেছে।

—শিবনাথবাবু, আরতির বাড়ি খেতে আমার আপত্তি নেই।

—শুনে খুশী হলাম।

সুশীল বলে—তা খেলে দোষ কী? খাবেন বৈ কি। উনি বিদেশী মানুষ, চিরদিন কি থাকতে এসেছেন? শিবুদা, দরকার হলে বলো। আমিও খানিক ফাই ফরমাশ খেটে আসব। কে কী করবে, দেখা যাবে!

শিবনাথ বলে—সে কি হে সুশীলবাবু, হঠাৎ ব্রহ্মজ্ঞানী হলে কবে থেকে?

সুশীল জোড় হাতে বলে—চিরদিনই। বিলিভ মি শিবুদা, আমি মনে মনে তোমাদের সাপোর্ট করি।

—ওকথা বলো না, চাকরি যাবে।

—তুমিও তো একজন ডিরেক্টার। বাঁচাবে।

—বাঁচাবো?

—আলবাত।

—সত্যি, সুশীল, তোমাকে চেনা বড্ড কঠিন। কী তুমি?

সুশীল দাঁড়িয়ে যায়।—আমি,.... আমি কী... শিবনাথ, আমি শালা একটা কুকুর, পা-চাটা কুত্তা হে। লাথি মারতে পারো মুখে? দেখবে, ফের কেঁউ কেঁউ করে লেজ নাড়ব। আমার জীবনটাই একটা চাকর, জুতোর চাকর।

মুখের ওপর আলো পড়েছে টেরচা হয়ে। চোখ দুটো জ্বলছিল যেন। গুটিকয় বীভৎস রেখা মুখটাকে জন্তুর অধিক ভয়ানক করেছিল। শিবনাথ হঠাৎ হাত ধরে টানে।—পাগল! চলো।

—যাবার উপায় আছে তোমাদের সঙ্গে? ছ'টা বাজল, না কী?

ঘড়ি দেখে শিবনাথ বলে—ছ'টা পনের।

—একবার কাঠগোলার দিকে যেতে হবে।

—ব্যাপার কী?

— কে জানে কী! বদুবাবুর আদেশ। কারা সব আসবার কথা আছে। শালারা স্পষ্ট করে তো কোনদিনই কিছু বলল না। অন্ধকারে কলের মত কাজ করায়, কিছুই বুঝি না। একবার বলা হল, জাফর মিঞার সাইকেলের দোকানে রূপপুরের হারু বকসী থাকবে। আমি গেলেই খামে মোড়া কাগজ দেবে। সেটা একজনকে পৌঁছে দিতে হবে। পরে টের পেলাম, আমার হাত দিয়ে হাজার টাকার কারবার হল! আমার ভাগ্যে কাঁচকলাটি! চিরদিন ঠকেই আসছি হে।

অন্ধকারের দিকে সাঁৎ করে মিশে গেল সুশীল। শিবনাথ বলে—দিলদার বা গোলাম হোসেনও নয়, ব্যাটা বলদ। আর, বিবেকবুদ্ধি দেখাল আমাদেরকে, ওটা গাঁজা। বিশ্বাসই করিনে।

—কেন?

—মশাই, বিবেকবুদ্ধি থাকলে ওসবে জড়াতে যাবে কেন জেনে শুনে? তাছাড়া ও যে বললে, ওর ভাগ্যে কাঁচকলাটি জোটে,—সেটা অবিশ্যি ঠিক। ওর দারিদ্র্য সবাই জানে, কিন্তু তাতেও কিছু প্রমাণ হয় না।

উৎপল বলে—ওর কথা থাক্। তাহলে কাল সকালে আমি আপনার ওখানে যাচ্ছি। নাকি আপনি আসবেন আমার কাছে? তারপর দু'জনে আরতির ওখানে যাবো। যদি আপনিই আসেন আমার কাছে, দিদির কোয়ার্টারে আসবেন কিন্তু।

—কেন? অমরদার ওখানে থাকা কী হল?

—নাঃ। বেশ তো ক'দিন থাকলুম জামাই আদরে। আর উত্যক্ত করার মানে হয় না।

—এই রে, অমরদা চটে যাবেন আমার উপর। ভাববেন, আমিই কুপথ দেখিয়েছি।

—কী যে বলেন! উৎপল বলে। দিদির কাছে থাকতে হবে না শেষ দুটো দিন?

—যা ভালো বোঝেন করবেন। কিন্তু অমরদার মত মানুষের মনে আঘাত দেওয়া বোধ হয় ঠিক না।

কথা বলতে বলতে ওরা স্কুলের কাছে পৌঁছে যায়। স্কুল এলাকাটায় ইলেকট্রিক নেই বলে নিঃঝুম দেখায়। দীপ্তিদের কোয়ার্টারের সামনে এসে শিবনাথ বলে—তাহলে চলি! গায়ের চাদর নিয়ে বেরোইনি। এত তাড়াতাড়ি শীত পড়ে গেল!

জয়া বাইরে দাঁড়িয়েছিল! বলে—কে? উৎপল?

উৎপল এগিয়ে যায়।—হ্যাঁ!

—ফের অসুখে পড়বার মতলব, তাই না? জয়ার কপট ধমক। —নাকি অনন্তকাল সেবা পাবার ইচ্ছে?

—যান্, আপনি ভীষণ দুষ্টু হয়ে গেছেন জয়াদি।

—তোমার সঙ্গে কে?

—এই যে, আলাপ করিয়ে দিই। আসুন শিবনাথবাবু...

তার আগেই জয়া ফের ধমক দেয়—থামো! স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির মাননীয় সদস্যদের সঙ্গে আর তোমাকে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে না। কী বলেন শিবনাথবাবু?

শিবনাথ নমস্কার করে বলে—দিদি, ভালো আছেন?

জয়া বলে—এইমাত্র সুশীলবাবু এসেছিলেন। আপনার খোঁজ করছিলেন।

দুজনেই বলে ওঠে—সুশীল চৌধুরী!

—হ্যাঁ। তোমরা আসবার মিনিট পাঁচেক আগে।

জয়া দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে ডাকে—দীপু, ব্যাপার কী? বেরোচ্ছো না যে? ও দীপু, এই দেখ, কারা সব এসেছে।

দীপ্তির সাড়া নেই। জয়া পর্দা তুলে ঘরে ঢুকে যায়।—কী হল? উৎপল এসেছে।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। মেনকা রুটি বেলতে বেলতে হঠাৎ থেমে উৎপলকে দেখে। ফ্যালফ্যাল করে তার ফ্যাকাসে চোখদুটো। ভিতরে অস্পষ্ট ফিসফিস, চাপা গুঞ্জন।

আধোআলো অন্ধকারে শিবনাথ উৎপলের হাত ধরে টেনেছে। তার আগেই উৎপল অনুমান করে নিয়েছে সব।

জয়া বেরিয়ে এসে বলে—ওর মাথা ধরেছে। বাইরেই বসো তোমরা।

উৎপল বলে—থাক্। তারপর এবার সে নিজেই শিবনাথের হাতটা টেনে নিয়ে হন্‌হন্ করে পথের দিকে চলতে থাকে।

শিবনাথ ফুঁসে ওঠে একবার—ভণ্ড, দালাল কোথাকার!

ছয়

যত ইলেকটিরি থাক, সামনেটা শোভন ; পিঠে বাঘের থাবার পৃষ্ঠক্ষত। বাবলতলীতে অনেকগুলো মান্ধাতার আমলের বট-অশ্বত্থ আছে গা জড়াজড়ি করে। বহুধাবিস্তৃত তাদের শাখাপ্রশাখা ও ঝুরি। কোটরে অন্ধকার, নুড়ি, মড়ার মাথা আর প্যাঁচা। আলোছায়ার ঝালরে শেয়াল এসে গা গড়ায়। সব আলো তো পথে।

আরতির বাড়ির পাশেই বিরাট দালান। বাবলতলীর বড়বাবুদের কতিপয় জ্ঞাতির বাস। দোতলায় প্রহরে প্রহরে কনসার্ট চলে। রীতিমত কনসার্ট। বেহালা ক্ল্যারিওনেট সেতার হারমোনিয়াম আর তবলা। লোকে বলে পঞ্চপাণ্ডবের পুরী। পাঁচ ভাই সঙ্গীতের ইন্দ্রপ্রস্থে সমাসীন। আরতি বলে—রাত দুপুরেও শুনি ভ্যাঁ ভোঁ সমানে চলেছে। কান ঝালাপালা করে দেয়। দেখছেন, পাড়ায় ঘুঘু চরছে। সব পালিয়েছে একে একে।

—কেন? উৎপল বলে।

—অত্যাচারে। গানের অত্যাচারে।

শিবনাথ বলে—যাঃ। যে যার নিজের দায়ে ভিটে ছেড়েছে। কোন গ্রামে না গণ্ডায় গণ্ডায় মড়ার মুণ্ডুর মত পোড়া ভিটে দেখা যাবে! তাছাড়া আরতি, একটা কথা। ছেলেবেলা থেকে যা চার বেলা গিলতে হচ্ছে, তাই হঠাৎ এ্যাদ্দিনে বদহজম হয় কেন?

—বয়সের দোষে।

—তুমিও কি পালাতে চাও নাকি?

—নাঃ। বদহজম যদি থাকে, তার ওষুধও আছে!

একেবারেই পাশে, মাথার উপর বললেই চলে—সেতারের প্রবল ঝংকার। উৎপল কান খাড়া করে শুনে বলল—মন্দ নয় হাত!

একথা-ওকথার পর শিবনাথ একটু কেশে বলে—গলাটা ব্যথা করছে। হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগেছে। আমি উঠি। একবার ডাক্তারবাবুর ওদিকে যাবো।

উৎপল উঠে দাঁড়ায়।—চলুন, আমিও যাই।

—যাবেন কী! খাওয়া দাওয়া করবে কে?

—কেন? আপনি থাকবেন না?

শিবনাথ চোখ টিপে বলে—দেখুন উৎপলবাবু, সাহস যথেষ্ট বাড়িয়ে দিয়েছেন আমার। সচরাচর একা এখানে আসি নে। এলে সীতুর বাড়ি ছেলে পুলেরা আড্ডা দেয়। পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে একজন অর্জুন আছেন, তিনি খাণ্ডব দাহনের জন্যে সবসময় তৈরী।

আরতির দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে উৎপল বলে—আমার বুঝি অগ্নিভয় থাকতে নেই?

—না নেই। আপনি বাবলতলীর সম্মানিত অতিথি।

আরতি কী বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় সীতু ঢোকে। হাতে থলি ভর্তি হাট বাজারে। মাছের লেজ, শাকসব্জির পাতা। এসেই বলে—কাঠগোলার সামনে ফেলুবাবুর সঙ্গে দেখা। ডোমের পোয়ের হাতে এসব আসবাবপত্তর দেখে টনক নড়েছিল। শুধোতেই কিন্তু ভয়ডর করলাম না। বলেই পেললাম সব। অন্যায় করেছি?

শিবনাথ কিছু বলার আগেই আরতি বলে—অন্যায় কী?

সীতু বারান্দায় ঝোলা রেখে একের পর এক জিনিস বের করে। প্রথমে লম্বা এক বোতল সবষেব তেল। আরতি ছুটে গিয়ে বলে—সত্যি পাওয়া গেল?

শিবনাথ চোখ বড় করে বলে—তেল কোথায় পেলি রে? দোকানে তো শুনছি সামনাসামনি দেয় না।

—দিদি যেখান থেকে বলেছিলেন। সেখানে পেয়ে গেলাম।

—সে আবার কোথায়?

—সুশীলবাবুর কাছে।

শিবনাথ গুম হয়ে যায়। আরতি বলে—কাল রাত্তিরে এসেছিল হঠাৎ। আমি তো চমকে উঠেছি প্রথমে। তারপর হাজার রকম কথা—যা ওর অভ্যেস, বলার পর.

—বুঝেছি। লোকটার উদ্দেশ্য কী? আশ্চর্য।

সীতু বলে—দিদি এখন বাবলতলীর প্রাণভোমরা গো, বুঝেছ? এট্টুখানি নড়লেই সাতশো রাক্ষস চেঁচিয়ে আকাশ পাতাল একাকার করে। দ্যাখোনা কাণ্ড, সীতের হাতে বাজার-টাজার দেখে রাজ্যের লোকে চারপাশ থেকে কম খোঁচানি খোঁচালে না। জবাব দিতে মুখের রসকষ শুকিয়ে গেছে। কী রে সীতে, ব্যাপার কী? কে খাবে? সীতে মিষ্টি নাকি রে? ....চালা বাবা, চালা ফুর্তি।

আরতি ধমকায়—থামো থামো। খাজনা দিয়ে বাস করি, কে বলল না বলল, কিছু আসে যায় না।

—আসে যায়। শিবনাথ বলে। যাক্ গে, চলি। তিনটের মধ্যেই আসছি আবার।

—তুমি যাবে? খাবে না?

—আমি খাবো? ভাগ্যিস, এতদিন পরে কথাটা বলতে পারলে! শিবনাথ হাসে। তা, বলেছ ওই যথেষ্ট। তোমার সাহসও যে আমার সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে।

—মানুষ মানুষের বাড়ি আসবে—খাবে, এতে অন্যায় কী আছে? আরতি জিনিসপত্র গোছাতে ব্যস্ত হয়। এবং সেই ফাঁকে উৎপলকে কটাক্ষ করে শিবনাথ বেরিয়ে যায়। বাইরে তার সাইকেলের ঘণ্টার শব্দ শুনতে পায় এরা। আরতি একবার মুখ তোলে মাত্র। কিছু বলে না। উঠোনে চাঁপাগাছের

নীচে বাপী খেলায় মত্ত। তাকেই ডেকে বলে—এই, সোয়েটারটা ধুলোয় মেখে যাচ্ছে না? খুলে ফ্যাল এক্ষুনি।

সীতু উঠে গিয়ে খুলে দেয়। বাপী প্যান্টের বোতাম দেখিয়ে বলে—খুলে দাও, পেচ্ছাব পেয়েছে।

সীতু বলে—দেখ গো, ছেলে কেমন ভদ্দরলোক হয়েছে।

উৎপল বলে—লেখাপড়া করছে তো?

—বাড়িতেই। ক্লাস ওয়ানে দিয়েছিলাম ভর্তি করে। যে নচ্ছার জায়গা, অতটুকু ছেলেকেও ওরা রেহাই দিতে চায় না।

উৎপল নড়ে বসে।— কেন, কেন?

সীতু বলে—বুঝতে পারছেন না দাদাবাবু। ওই ওট্টুকুন ছেলেকে যদি প্যাঁচার পিছনে রাত্তির কাক লাগবার মত জ্বালাতন করে....শুধু কি জ্বালাতন? পথেঘাটে খেলবারও যো নেই ছেলেটার।

একসময় সীতু কেটে পড়ে। বাইরে থেকে চেঁচিয়ে বলে যায়—এক্ষুনি আসছি।

উৎপল চেয়ারটা উঠোনের রোদে তুলে নিয়ে যায়। গা এলিয়ে বসে। আরতির ঘরসংসারটা নিবিষ্টমনে লক্ষ্য করে। হঠাৎ এই মেয়েটি তার কাছে এক-একরকম আবিষ্কারের গৌরব নিয়ে আসে যেন। জীবনে কত কী জানবার বাকি থেকে যেত—যদি না বাবলতলী আসত!

পশ্চিমে সেই সঙ্গীতপুরী। সেতার থেমে গেছে ইত্যবসরে। হেঁড়ে গলায় কালোয়াতীর চর্চা শুরু। তরকারী কুটতে কুটতে আরতি বলে—বড়বাবুর কণ্ঠ। উৎপলবাবু, ও বলে গেল না, চারবেলা যা গিলছি?...চারবেলা গিলছি ঠিকই। তবে চার গিলছি। কান ঝালাপালার কথা বলছিলাম। সেটা ঠিক নয়! গানটান আমি ভীষণ ভালবাসি। খু—ব। সপ্তায় তিন-চার বার সিনেমা যাই সে তো শুনেছেন। কাজেই সঙ্গীতপুরী আমার কাছে ইন্দ্রপুরী হওয়াই স্বাভাবিক।

উৎপল বলে সুখেই আছেন তা'হলে!

—আছি। ছিপ ফেলা অভ্যেস আছে আপনার? বঁটিতে বসে হাঁটুর কাপড়ে নাকের ডগাটা একবার ঘষে নিয়ে ফের বলে আরতি— থাকবার কথা নয়। কলকাতার লোক, পুকুর কোথা, যে মাছ ধরবেন?

না। আছে! লেক-টেকও আছে। ছিপ ফেলা যায়। অবিশ্যি পয়সা লাগে।

তাহলে বুঝবেন। এক একটা চালাক ঘা খাওয়া মাছ থাকে, তারা প্রাণ ভরে চারই খায়—বড়শী গেলে না। চারবেলা প্রাণভরে আমিও চার খাই। কী সুখে আছি দেখুন।

উৎপল জোর হাসে। চেয়ারের হাতল চাপড়ায়।—দারুণ বলেছেন কিন্তু।

—ভয় আবার করে না? করে। যতই মুখে বলি, মেয়ে তো বটে। একরকম খ্যাচ আছে, তাকে পাড়াগাঁয়ে বলে উড়নখ্যাচ। মাছ চারে আছে, বঁড়শি ছোঁয় না—তখন কী করে জানেন? হঠাৎ জোরে ছিপ তুলে .এই যাঃ!

—হাত কাটল?

আঙুল টিপে ধরে নাকমুখ খিঁচিয়ে যেন যন্ত্রণা সয় আরতি। মেঝেয় রক্তের ফোটা পড়ে। উৎপল হন্তদন্ত হয়ে বলে—ধরে ডেটল নেই?

—নাঃ। অভ্যেস নেই, কাটাকুটি একেবারে পারিনে। সীতুর বৌ এসে সব করে দেয়। কাল থেকে বেচারীর জ্বর হয়ে এই দুরবস্থা। মা বলত—হারামজাদী মেয়ে শ্বশুরবাড়ির লাথিঝাটা খেয়ে মরবে। কিছু পারে না। বাবা বলত—একটিমাত্তর সলতে, ওকে লেখাপড়া শেখাব। ভিটে আলো করে বসে থাকবে। হলও তাই ভাগ্যে। ভিটে আলো করে বসে রইলাম।

—পড়াশুনো ছেড়ে দিলেন কেন?

—বাবা মারা গেলেন। তাছাড়া তখন স্কুলে মাইনর অব্দি মেয়েদের পড়ার ব্যবস্থা ছিল।

—তারপর বুঝি বিয়ে করে ফেললেন?

—আরতি ফিক করে হাসল।—হ্যাঁ। আপনার বন্ধুর পরামর্শে।

উৎপল অবাক হয়ে বলে—শিবনাথের?

—কেন বা কেমন করে ঘটল আমি নিজেই বুঝতে পারিনে। লোকটা ছিল যাত্রাদলের মাষ্টার। চালচুলোহীন বাউণ্ডুলে গোছের। আরতি হেসে গড়িয়ে পড়ে। বড়বাবুদের একটা যাত্রাদল ছিল। সেখানে

নতুন পালা ধরলে তার ডাক পড়ত। সেবার এল—আর গেলনা। প্রথমে বড়বাবুরা শিবুদাকে ধরলেন। ও আমার কানভারী করল। কে জানে কী মতলব ছিল আপনার বন্ধুর, নইলে বাপের বয়সী এক ইয়ে...

—আপনিও তো রাজী হলেন।

—হলাম। খুব হাঁফিয়ে উঠেছিলাম, নাকি ভূতে পেয়েছিল। কে জানে কী হয়েছিল আমার।

—উনি এখন কোথায়?

জানিনে। বলে আরতি উঠে যায়। ঘুঁটে সাজায় উনুনে। থরে থরে পরিপাটি সাজায়। কয়লা দেয়। তারপর ছাই ভর্তি একটা কাপে কেরোসিন ঢেলে বলে—দেশলাই আছে? আমারটা ফুরিয়ে গেছে সীতুকে বলতে ভুলে গেছি।

উৎপল দেশলাই ছুঁড়ে দেয়। আরতি পেয়ালাটা উনুনের নীচে ঢুকিয়ে দিতেই ধুঁয়োয় ভরে যায় ছোট্ট উঠোনটা। আরতি বলে—ঘরে গিয়ে গড়ান। গল্পের বই আছে পড়তে পারেন।

উৎপল পকেট থেকে সিগ্রেটের প্যাকেট বের করে। এই এক বদ অভ্যাস, কখন অজ্ঞাতে খালি প্যাকেট রেখে দেওয়া। উঠে বলে—সিগ্রেট নিয়ে আসি।

—সীতু আসুক, এনে দেবে'খন।

কথা কানে না নিয়ে উৎপল বেরল। তারপর যা ঘটে গেল, তা অচিন্তিত-পূর্ব তো বটেই, বীভৎস, ভয়ানক কুৎসিত। এটা কলকাতার সেইসব বোমা মারা, ছুরি চালাচালি, ইটপাটকেল ছোঁড়া, টিয়ার গ্যাস, গুলি ইত্যাদি হলে গা করার ছিল না। এটা অন্য কিছু। ঘৃণার সঙ্গে রক্ত বা হাঙ্গামার কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। রক্ত বা হাঙ্গামা উৎপলের গা সওয়া। যার মূলে থাকে হিংসা—হননেচ্ছা থেকে যার উৎপত্তি। ঘৃণার সঙ্গে বুঝিবা জড়িয়ে থাকে সত্যকে সঙ্গতকে শোভনকে তীব্র অস্বীকৃতিই। ঘৃণার চিত্রকল্প উৎপলের জীবনে এসে গেল।

দরজার বাইরে বাঁহাতি একটা বারান্দাওলা দোকান। যাকে বলে ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর। বারান্দায় জনাকয় লোক বসেছিল। উৎপলকে দেখেই তাদের একজন বলে—মশায়ের নিবাস?

উৎপল বলে—কলকাতা।

—আরতিরাণীর কুটুম্ব নাকি? অন্য একজন বলে—ওর কুটুম্ব সবাই। ইনি হচ্ছেন স্কুলের সেই দিদিমণির ভাই।

—তা মশায়, সব থাকতে এ খানকির বাড়ি কি কারণে?

উৎপলের হাত মুঠো হয়ে ওঠে।—কী বললেন?

—বলছি, ভদ্রলোকের ছেলে, এখানে কেন?

অন্য একজন বলে, বেশী বলো না হে। বাঁড়ুজ্যেবাবুদের গেস্ট।

—আরে, রাখো তোমার গেস্ট। ওসব বন্দুক দিয়ে চিঁড়ে ভিজবে না।

—ছিঃ, মান ইজ্জত রাখলেন না মশাই...

—আমরা সব মা-বোন নিয়ে ঘরকন্না করি। পাড়ার মধ্যে গণিকালয় চলবে না বলে দিচ্ছি।

—আরে মশাই, ভাত কখনও চোকে দেখেননি? এসেছেন এক মাগীবাড়ি ভাত খেতে। ছ্যা ছ্যা..

উৎপল ঘামছিল। উত্তরোত্তর ওর শরীর শক্ত হয়ে উঠছিল। একসময় সে গর্জে ওঠে।—থামুন!

—রাখুন দিকি। ওসব কলকাতার থিয়েটারে দেখাবেন, বাবলতলীতে নয়। খানকিবাড়ি মৌজ করা হচ্ছে দিনদুপুরে। আবার ভদ্রলোকের পোশাকটি দিব্যি গায়ে রয়েছে।

কেউ শিস্ দিয়ে ওঠে। কেউ উলুধ্বনি দেয়। এক ফাঁকে শিবনাথের নামেও খিস্তি শুরু হয়ে যায়। ওদিকে দোতলার জানালা খুলে গুটিকয় মুখ। সেই সঙ্গীতশিল্পীরাই।—কী র‍্যা জনার্দন, ব্যাপার কী?

উৎপল ঘামছিল। স্পষ্টতঃ এটা কলকাতার রাজপথ বা গলিপথ কোনটাই নয়। সামনে নেই পুলিশের গাড়ি। হাতে নেই দু'পাউণ্ডের বোমা। আশে-পাশে বন্ধুরা নেই। এটা বাবলতলী। এবং হয়ত সনাতন ভারতবর্ষের চণ্ডীমণ্ডপে সমাজনীতির মিছিল ফুঁসছে অতি বৃদ্ধ বাস্তুসাপের মত। দাঁতে হাজার বছরের সঞ্চিত বিষ।

দোতলায় হাসির রোল। একদঙ্গল কুমড়ো গড়াগড়ি ফাটাফুটি—মুণ্ডুগুলো ভীষণ নড়ে। আশ্চর্য, ওই বীভৎস কদাকার মুণ্ডু থেকে প্রহরে প্রহরে ভাঁইরো বেরিয়ে আসে। ভৈরব আসে। টোড়ী আসে। ফের বেলাশেষে পূরবী। পূরবী ছড়িয়ে দিতে দিতে ইমন-বাগেশ্রী-বেহাগ-মল্লার-খাম্বাজ মধ্যরাত্রে বাবলতলীতে। দরবী কানাড়ায় প্রাচীন প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ শিউরে উঠে জীবন ও মৃত্যুতে নিশ্চিত অর্থের মধ্যে পূর্ণ করে।

উৎপল আস্তে আস্তে পা ফেলল। এত অসহায় এত নিঃসঙ্গ কোনদিন নিজেকে মনে হয়নি। এখানে যেন তাকে কত প্রয়োজন, তেমনি তার নিজেরও কত প্রয়োজন বলে ধারণা হচ্ছিল, সব প্রয়োজন অর্থহীনতায় নিঃশেষ হঠাৎ। সে বাবলতলীর কেউ নয়। সে বাবলতলীর অনিবার্য ভবিষ্যৎ থেকে উল্টোচাপে বাবলতলীর বর্তমানে ছিটকে পড়েছে।

মাথু নীচু করে হেঁটে যায় সে। অনেকটা দূরে গিয়ে মুখ তোলে। সামনেই হাইওয়ে। দ্রুত পা চালিয়ে, যেন কেউ তাকে চিনে ফেলবে, কে পিছন থেকে আঙুল তুলে দেখিয়ে দেবে—বিপন্ন তাড়া খাওয়া বিদেশী কুকুরের মত ছুটতে চায়!

টালিভাটা পেরিয়ে কাঠগোলার সামনে আসতেই কে পাশ থেকে চেঁচিয়ে তার নাম ধরে ডাকে—উৎপলবাবু, ও উৎপলবাবু।

জবাব দিতে গিয়ে বুঝতে পারে একটা বিচিত্র অভিমান তার গলা চেপে ধরে আছে। এখানে এসে মানুষকে আপন ভাববার কিছু প্রশ্রয় পেয়েছিল—মানুষ সম্পর্কে বিশ্বাসের বহুবার নাচানো বাঁদরটাকে একবার লাই দেওয়াতে সে মাথায় উঠে বসেছিল। ভেবেছিল বুঝি মানুষকে ব্যাখ্যা করা সম্পূর্ণ হয়নি,—এখনও কিঞ্চিৎ বাকী রয়েছে এবং বদলানোর আগে একটুকুও সামনে রেখে ভাবতে হয়।

এখন একটিমাত্র ধাক্কাতেই সব ভণ্ডুল হয়ে সে আগের জায়গায় পৌঁছে গেছে। সেই রাইফেলের ট্রিগারে। সব মূলসুদ্ধ উপড়ে দাও। কিছু অবশিষ্ট রেখোনা। বেথেলহেমের আকাশে সে ফের নক্ষত্র দেখে। তখন কে চিৎকার করে বলে ওঠে—ঈশ্বর, ওরা জানে না ওরা কী করছে। করুণা করো এইসব মূঢ়দের!

এবং সবকিছু করুণায় উড়িয়ে দেবার ছলে সে হঠাৎ হেসে ওঠে। হো হো করে হাসে পাগলের মত। সুশীল চৌধুরী কাছে এসে বলে—কী ব্যাপার? এত হাসি কেন?

অক্লেশে কিছু না ভেবেই গড়গড় করে এক নিঃশ্বাসে উৎপল সবটা বলে যায়। সুশীল গুম হয়ে শোনে। তারপর বলে— দেখুন উৎপলবাবু, এটা সম্ভব হয়েছে—তার কারণ আপনি বাইরের মানুষ, দ্বিতীয়ত পয়সাওলা মহাজন লোক নন। ওসব ঢের দেখা আছে দাদা, এযুগে সমাজ-ফমাজ বাজে কথা। সে আপনি শহরেই বলুন, আর গ্রামেই বলুন। চক্কোত্তির ছেলে নার্সটাকে প্রেগন্যান্ট করে তারপর বিয়ে করলে। কই? কোন টুঁ শব্দটি তো শুনিনি মশাই। কারণ ওরা পয়সাওলা লোক। কার সাধ্যি মুখ ফুটে প্রতিবাদ করে? দেখুন না, আপনার এই অপমান থেকে কী গড়ায়। এর নাম বাবলতলী।

উৎপল চমকে উঠে বলে, দোহাই মশাই, আপনি আবার শিবনাথকে কিছু বলবেন না যেন।

সুশীল বলে, যে বলার ঠিকই বলবে। দেখুন গে, এতক্ষণ হয়ত সাজো সাজো রব পড়ে গেছে!

উৎপল আঁতকে উঠে, ছ্যাঃ কী সব করে ফেললুম!

—নিন, সিগ্রেট কিনতে বেরুবেন—না, এই বিপত্তি হবে। খান, সিগ্রেট খান।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে সিগ্রেট টানে উৎপল। তারপর বলে, চলুন, যাচ্ছি যখন, দিদিকে একবার দেখা দিয়েই যাই। আপনি যা সব কাণ্ড করেন সুশীলবাবু, ধ্যাৎ।

সুশীল ফিক্ ফিক্ করে হাসে, ভুল শুনেছেন! আমি আপনার দিদিকে কিছু লাগাইনি। জয়াদি কথায় কথায় ওটা বেফাঁস করে দিলেন। মাইরি উৎপলবাবু, জয়াদিটা যেন ডিটেক্টিভ। আমাকে বোকা তো বানালেনই, মাঝখান থেকে আপনার দিদির সঙ্গে আপনার মন কষাকষি হয়ে গেল। আমাকে আপনারা অবিশ্বাস করলেন। বাস্তবিক, এত ঠকেও শিক্ষা হল না আমার। সরলতার কোন মূল্য নেই।

—কাল সন্ধ্যায় এখানে এসেছিলেন কেন? উৎপল প্রায় জেরা করে।

—আরে, তাও বলি। এই কাঠগোলায় আসছিলাম—পথে খবর পেলাম, আমাকে আর যেতে হবে

না। তখন আপনাদের নাগাল পেতে দৌড় দিলাম। ঘুরপথে গিয়েছিলেন, ফলে দেখা পেলাম না। তাই আপনার দিদির ওখানে গেলাম, যদি আপনারা থাকেন..

বাধা দিয়ে সকৌতুকে উৎপল বলে—কিন্তু কেটে পড়লেন কেন, তক্ষুনি?

সুশীল কাঁচুমাচু মুখে বলে—যখন টের পেলাম যে কথা বেহাত হয়েছে, আর দীপ্তিদির মুখ ব্যাজার—সত্যি বলতে কী, ভয়েই অমনি সটান কাটলাম। আরতি শব্দটা বাবলতলীর বন্দুকের ঘোড়া, আপনার দিদির এতদিনে জানা হয়ে গেছে তো!

মন হাল্কা হয়ে গেছে তখনকার মত। উৎপল জোর হাসে।—অদ্ভুত লোক আপনি!

সবে ক্লাস শেষ হয়েছে। জয়া বারান্দায় রোদে বসে আছে। দীপ্তি ঘরে।

উৎপল জোর গলায় ডাকে—ছোড়দি, এ—ই ছোড়দি! আরতিরাণীর নেমন্তন্ন ভাগ্যে নেই ভাই, ঘরের ছেলে ঘরে চললুম।

দীপ্তি বেরিয়ে এল।

—রাগ করেছিলি? এই ছোড়দি?

—দায় পড়েছে। আয়, বোস।

—বসব না রে। বারোটা পাঁচে ট্রেন। ঘণ্টাটাক সময় হাতে আছে। বাস ক'টায় সুশীলবাবু?

সুশীল বলে, সাড়ে এগারোটায় এখানে পৌঁছায়।

—ট্রেন ধরা যাবে তো?

—ধরা যাবেনা মানে? ওটা তো ট্রেন ট্রিপ।

দীপ্তি বলে, এক্ষুনি যাবি কী? খেলি কোথায়?

পেটে হাত বুলিয়ে উৎপল বলে, বাবলতলীর আজব চানাচুরে পেটে গ্যাস হয়ে গেছে।

জয়া বলে, সেকি! বাস্তব জগতে একটা নায়িকার দেখা পেয়ে গিয়েছিলে, তাকে কি মনের জগতে তুলে নিলে এরই মধ্যে?

—যান! উৎপল ভুরু কুঁচকে বলে।

জয়া বলে, ছবি আঁকতে হলে আগে ডিটেল অবজার্ভেশন দরকার। জানোনা বুঝি?

—আজকাল ওসব দরকাব হয় না। মনের ভিতর সব ছবিই এ্যাবস্ট্র্যাক্ট্।

দীপ্তি বারান্দার নীচে নেমে আসে।—বুকনি রাখ্। জামাকাপড় ছেড়ে স্নান করে নে। এসে অব্দি তো চরকির মত ঘুরলি, নাগালও পেলাম না। আসবার ইচ্ছে হলে, এমন করতে আসবিনে কিন্তু।

উৎপল জোড়হাতে নুয়ে বলে—কোন অপরাধই করিনি ভাই। দেখে গেলুম, কেমন জায়গায় আছিস্। আগের বারে এসে অনেক কিছু দেখবার বাকী ছিল। সব দেখা হয়ে গেল। এখন টা টা কর এবার।

দীপ্তি একটু চুপ করে থেকে বলে, এইমাত্র বাবার চিঠি পেলাম। তোকে শীগগির যেতে লিখেছেন।

—এই তো যাচ্ছি রে বাবা, ব্যস্ত কী!

সুশীল বলে, তাহলে উৎপলবাবু, আমি একটু ওদিকে যাই। ফের আসব। আজ আর নাই বা গেলেন।

উৎপল জবাব দেয় না। সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে হঠাৎ। এতক্ষণ আরতিদের ওখানে আর কী কী সব ঘটছে? নিশ্চিত আরতি টের পেয়েছে। সীতু চলে গেছে শিবনাথের কাছে। শিবনাথ কি সত্যি অতখানি অভদ্র হতে পারবে? ওর আচরণ-আলাপে তো তা মনে হয় না।

সুশীল চলে যাবার অনেকক্ষণ পরেও মনস্থির করতে পারে না উৎপল। বুঝতে পারে, কৌতূহল—হ্যাঁ তীব্র একটা কৌতূহল, ন্যাক্কারজনক একটা চোরা প্রবৃত্তি তাকে এখানে ফিরিয়ে এনেছে। হাঁটু ঘুরিয়ে দিয়েছে এদিকে। সে ওই লোকগুলোর ওপর একটা মারাত্মক প্রতিশোধ আশা করে বসেছে অসচেতন দুঃখে। এও তো ঘৃণার বদলে ঘৃণা। হিংসার পোশাক পরে ঘৃণা এসেছে এগিয়ে। বলছে, দরকার হলে হাতে তুলে নাও বোমা, লাফ দিয়ে পড়ো। প্রচণ্ডতার প্রতি, চরমের প্রতি লাফ দিতে সংগুপ্ত এষণার গভীর এ একটা ষড়যন্ত্র। সব চুরমার করে ফেলো, বাছ-বিচারবিহীন। ধর্ম ভাঙো। উপাসনার ঘরগুলো গুঁড়িয়ে ফেলো। আগুন জ্বালিয়ে দাও হাজার বছরের সংস্কারে। সারা পৃথিবীর রাষ্ট্রসীমানা উপড়ে ফেলো। সব একাকার করে দাও।

হঠাৎ ছোড়দির দিকে চোখ পড়ে। বদুবাবু যে স্কুলের সেক্রেটারী, কলকাতা থেকে একশো মাইল

দূরে অবস্থিত যে স্কুল, ওই স্কুলে সামান্য কিছু টাকার জন্যে, ভবিষ্যৎ জীবনে 'প্রতিষ্ঠা' নামক ঘটনার মুখোমুখি হবার সাধনায় এই মেয়েটি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে। এই বিরাট পৃথিবীতে কোথাও অঢেল সুখ নিরাপত্তা শান্তি ও ভোগের আরাম আছে—সেই বিরাট প্রাসাদের দ্বারে তার দিদি এক ক্লান্ত ভিখারিণী। হাত বাড়িয়েছে—দয়া করো। মমতায় দুঃখে করুণায় উৎপলের বুক ভরে ওঠে। হঠাৎ মনে হয়, ছোড়দির মত অসহায় পৃথিবীতে কেউ নেই। ইচ্ছে করে দু'হাত বাড়িয়ে ওকে তুলে নিয়ে পালিয়ে যায়। কেন তুই তরুণ নামে এক জানোয়ারের পরামর্শে নিজেকে এমন দীন অভাগা করে তুলবি? তোর প্রেমের দিক নির্দেশ? প্রেম কী রে ছোড়দি? আমি জানি না, জানতে চাই না। আমি জানি, এ সমাজে এই পৃথিবীতে এখন প্রেম ভুল, ভুল জন্মদান, ভুল অপত্যস্নেহ, আহার-নিদ্রা-মৈথুন। আনন্দ ভুল, স্বপ্ন ভুল, ইচ্ছা পদক্ষেপ বেঁচে থাকা হাসি গান করুণা মানবিকতা...

তবে কী? সত্যটা কী? মনে মনেই জবাব দেয়—আমি। আমার এই থাকা। আমার অস্তিত্ব। সব কিছু ইলিউশনের নীচে, একেবারে কেন্দ্র স্থিত এক সত্তা। এর জন্যই সব বদলানোর ফরমান জারী। এর খাতিরেই মানুষ নামক নির্বিশেষকে পৃথিবীতে ঠিক জায়গায় বিন্যস্ত করে তোলার সাধনা। শুধু এই আমিটার জন্যই।

উৎপল বলে, ছোড়দি, তুই রোগা হয়ে যাচ্ছিস কেন রে?

জয়া হেসে ওঠে, রোগা? আমি তো দেখছি, ও দিনে দিনে মুটিয়ে যাচ্ছে।

—আপনার স্বাস্থ্যও খুব ভালো দেখাচ্ছে না। রঙ কালচে হয়ে গেছে।

—রঙ বদলাচ্ছি বলো।

—থামুন! মোল্লার দৌড় মসজিদ অব্দি।

—পৌঁছে গেছি ভাই।

তাহলে যা দেখা গেল, উৎপলের যাবার তাড়া নেই। দিদির কথা রাখল। দীপ্তি তোয়ালে বের করে আনে। হাত নেড়ে বারণ করে সে।—আছে।

জয়া বলে, তুই পাগল হয়েছিস দীপু, মেয়েদের তোয়ালেতে ও গা মুছবে কী?

খেতে বসে হঠাৎ বুকের ভিতরটা কেমন করে ওঠে। আরতির বঁটি আর রক্তের কথাটা মনে পড়ে যায়। কী সাধে তাকে খাওয়াতে চেয়েছিল, কে জানে! কী তৃপ্তি পেত আরতি? অতগুলো বাজার করে আনাল! টাকা পয়সার অভাব বলে সরকারী ঋণের জন্যে তদ্বির করছে সে। এ কি সেই চিরকেলে বাঙালী মেয়ের টাইপ মনোবৃত্তির ব্যাপার?

শিবনাথ যার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে, বস্তুত কোন অভাবই তার থাকতে পারে না। কিন্তু ভাবতে মন কেমন করে, বুঝি সামনে বসে খাওয়াত। ভেজা এলোচুল, সদাস্নাত শরীর, সুন্দর একখানি শাড়িতে ঢাকা। কপালে টিপও পরত। সিঁদুর...কী মুশকিল, আজ অব্দি একবারও ওই সিঁথিটা লক্ষ্য করতে মনে ছিল না। মায়ের কথা মনে পড়ে যায় উৎপলের। তার অদেখা মা, ঠিক এই দীপ্তির মতই—এমনকি যে পরিবেশনরতা আরতির চেহারা দেখতে পেল না, তার মতই বুঝি আত্মীয়জনের সামনে বসে বলতেন, এটা খাও ওটা খাও। আঃ আরতির বুকটা ওরা ভেঙে দিলে না তো?

—ও কি রে, খেলিনে যে! দীপ্তি ঝাঁপিয়ে আসে।

—বুঝেছি। আমার পাশে খেতে লজ্জা হচ্ছে। মেয়েদের পাশে খাওয়া....জয়া হেসে ওঠে।

উৎপল জলের গ্লাস রেখে বলে—গ্রামে থেকে আপনিও বেজায় গেঁয়ো হয়ে গেছেন। মেয়েদের সঙ্গে খাওয়া....কী সব বলেন মাথামুণ্ডু নেই।

জয়া ভুরু নাচিয়ে বলে, ভুলে গেছি। রেঁস্তোরা-কাফেতে ওতে সারাবেলা চলে তোমার।

—তোমাদের বলুন। অলওয়েজ বহুবচন। আমি খেতে যাবো কোন্ দুঃখে? আমরা যাই।

খাওয়া শেষ হলে জয়া মোড়া নিয়ে রোদে গিয়ে বসে। চুল খুলে দেয় পিঠের উপর। উৎপল দীপ্তির বিছানায় হাত পা ছড়ায়। কৌটো থেকে মৌরী ভাজা বের করে নিজের মুখে ফেলে দীপ্তি। তারপর বলে—খাবি?

উৎপল হাত বাড়িয়ে নেয়। মুখে ফেলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে বলে—ছোড়দি, আমার সঙ্গে যাবি?

—তোর সঙ্গে? কোথায়?

—কলকাতা।

— কেন, কলকাতা কেন? এই তো একমাস কাটিয়ে এলাম পুজোয়।

—তুই এখানের চাকরীটা ছেড়ে দে। আজই। এক্ষুনি।

—তারপর?

—তারপর আর কি। সে দেখা যাবে'খন।

এই অব্দি শুনেই দীপ্তি যেন হঠাৎ অগাধ জলে পড়ে হইচই করে ওঠার মত, এবং সামনের কাষ্ঠখণ্ডরূপ জয়াকে আঁকড়াতে ব্যস্ত।—এই জয়াদি, জয়া, শুনছ উৎপলের কথা? পরক্ষণে দীপ্তির ভয় কিংবা কৌতুক তাকে হাসির প্রচণ্ড ভারে গুঁড়ো করে ফেলেছে একেবারে।—আরে, কী বলছে, শুনলে না? বলে—চাকরী ছেড়ে এক্ষুনি কলকাতা চলো। ইস্। উৎপলটা এখনও সেই খোকা হয়ে রইল—ইস্ কী বলে... মরে গেলাম জয়াদি....উঃ!

জয়া শান্তকণ্ঠে মুখ ফিরিয়ে বলে, খোকা ভয় পেয়েছে। এতদিনে বাবলতলীর বাঘটা দেখেছে কি না। দীপ্তি হাসতে হাসতে প্রায় বমি করে ফেলে আর কী। বারান্দার ধারে বসে পড়েছে একেবারে।

সেই সময় সামনের পথে হইহই করে একদল লোক দৌড়ে কোথায় যাচ্ছিল। তাদের সঙ্গে শঙ্কর বাঁড়ুজ্যেকেও দেখা গেল। লাঠিতে ভর দিয়ে চলেছেন। গায়ে চাদর, পায়ে চটি। তপতী, তার মা, তার ছোড়দি, আরও অনেকে গেট থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল। স্কুলের ছেলেরাও ছুটে বেরিয়ে গেল। প্রাঙ্গণে মাস্টারমশাইরা জটলা পাকালেন এসে।

জয়া হাত তুলে ডাকতেই তপতী দৌড়ে কাছে চলে এসেছে। তারপর ব্যাপারটা জানা গেছে। সুশীলের অনুমান মিথ্যে হয়নি। যদুবাবু আর শিবনাথের দল মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেছে এতদিন পরে। একটা তুচ্ছ ঘটনা শুধু উপলক্ষ্য মাত্র।

উৎপল বেরিয়ে এসেছিল সঙ্গে সঙ্গে। পা ফেলেছিল পথের দিকে। তপতী সামনে দাঁড়িয়ে বলল, উৎপলদা যাবেন না। মারামারি হচ্ছে। উৎপলদা...

উৎপল তীব্রদৃষ্টিতে তার দিকে একবার তাকাল মাত্র। তারপর প্রায় দৌড়ে চলে গেল। পিছনে দীপ্তি আর জয়া হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সাত

—আসলে সময়টার দোষ। সবাই বেজায় রেগে আছে। শত্রু একটা নিশ্চিত আছে, বুঝতে পারছে, ডিটেক্ট করতে পারছে না। খুন চড়ে থাকা মাথা নিয়ে আপনি করবেন কী বলুন? দিনমানে বস্তা বস্তা বুলি ওগরাবেন, সুযোগ পেলে মারপিট করবেন, গ্যাস ছাড়বেন, বমি করবেন। তারপর কী? যদি মেয়েমানুষ থাকে রাত্তিরটা শোবেন তার কাছে। অন্ধকারে শরীর নিয়ে কামড়া-কামড়ি তারপর। হ্যাঁ, যাদের অন্যকিছু সম্ভবে না, নিরীহ ভীতু মানুষের পক্ষে ওই মেয়েমানুষই নিদেন। ফলং? জন্মহার বৃদ্ধি। খাদ্যাভাব। দেখুন মশাই, মদ-আফিম-গাঁজাতেও আজকাল নেশা হয় না। বড্ড পুরনো হয়ে গেছে সব। নতুন কিছু নেশা আছে?

—আছে। এল এস ডি।

—ওই, ওই দেখুন তাহলে। শেষ অব্দি নিজেকেও ফাঁকি দিয়ে পালানোর কায়দাটা দেখুন!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। হিপি হওয়াও মন্দ না।

—হিপ্পি? সে আবার কী?

—আছে। অ্যামেরিকায়।

—যাক্ গে। সিগ্রেট দিন একটা। বাপস্, বাবলতলী হল কি দিনে দিনে! টুক্ করতেই হাঙ্গামা লাঠি-পাটকেল দা-টাঙি-বন্দুক। যা ঝড় বয়ে গেলে মাথার'উপর। বদলির জন্যে কত পাঁঠা মানত করলুম, যাশ্ শালা....নিভে গেল যে! দিন দেশলাইটা।...

শুনেছি, আগের দিনেও এখানে মারপিট খুনখারাবি বিস্তর হয়েছে এর নামই তো হল রক্তগঙ্গার পাড়। কিন্তু তার মজাটা ছিল—একটা ফাঁকা জায়গায় দিনক্ষণ দেখে দু'পক্ষ দাঁড়াও। তারপর হুকুম পেলেই ব্যাস....ঘ্যাচাং ঘ্যাচ্! তাতে আমাদের—মানে পুলিশের পক্ষে একটা সুবিধে ছিল যে

একবার মধ্যের নোম্যান্‌সল্যাণ্ডে দাঁড়াতে পারলেই হ্যাঙ্গামা থামাতে এক মিনিট দেরী হত না। আর আজকাল? শহরেই বলুন, গ্রামেই বলুন, কোন পার্টিকুলার রণক্ষেত্র নেই।

—আমাকে কি আর দরকার হবে?

—বলেন কী মশাই? দরকার হবেনা মানে? আপনাকে নিয়েই তো যত ঝামেলা। ওহে বক্‌সী, তোমার হল? ন'টার ট্রিপ ফেল করলে চলবে না, মাইণ্ড্‌ দ্যাট্‌। দয়া করে গা তুলুন শিবনাথবাবু।

—ওঁকে কোথায় নিয়ে যাবেন আপনারা?

ফ্যাক ফ্যাক করে টাক নাচানো হাসি।—সদরে।

—কেন, ও কী করেছে?

—দেখুন মশাই কচি খোকার মত প্রশ্ন করবেন না। বয়সের তো গাছপাথর নেই এদিকে। এই হে বক্সী, এই নাও ফাইল। রাধেশ্যাম আর রামজয়কে ডেকে নাও।

শিবনাথ ম্লান হেসে বলে, তাহলে আসি।

উৎপল বিস্ময়ে-দুঃখে-ক্রোধে নিরুত্তর হয়ে বসে থাকে।

শিবনাথ বলে, নিরাপত্তা আইনের নাম শুনেছেন উৎপলবাবু?

মধুসূদন দারোগা বলে, দিব্যদৃষ্টি অসাধারণ। তবে বড় দেরীতে ফুটল চোখ দুটি। অলরাইট, ডোণ্ড মাইণ্ড। আমার মশাই কর্তার ইচ্ছায় কর্ম।

থানার ঢালু প্রাঙ্গণ দিয়ে হেঁটে ওরা অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। উৎপল বলে, আমি কী করব?

মধুসূদন দারোগা মুণ্ডুটা একটু কাত করে এক গাল হেসে বলে, ক'দিন এ বাড়ি-ওবাড়ি নেমন্তন্ন খেয়ে কাটালেন। আমরা কি আপনার পর উৎপলবাবু? না হয়, থেকেই গেলেন রাত্রিটা। কম্বলের অভাব, মশাও দুচারটে থাকতে পারে। তবে আরাম পাবেন নিশ্চয়। তাছাড়া, নতুন বলে তো মনে হয় না, লালবাজারের ওদিকে যেতে-টেতে হয়েছে বই কি দু'চার দফা।

—আমি কী করেছি?

—উৎপলবাবু, ভদ্রলোকই পুলিশ হয়। পুলিশ কখনও ভদ্রলোক হয় না। পেনাল কোড একটা সাংঘাতিক জিনিস। আপনার ওই এল এস ডির চেয়েও কড়া।

জব্বর কেস দাঁড় করানো হয়েছে—যা বোঝা যায়। আশ্চর্য, অমরদা তো একবারও এলেন না এদিকে। সুশীলের পাত্তা নেই। ছোড়দি এতক্ষণ কেঁদে কেটে সারা হয়ে যাচ্ছে—যা ভীতু মেয়ে। কিন্তু জয়াদি.....ও কেন আসবে! গোমস্তাও এল না। হয়ত ছেলের উপর ক্রোধে। শঙ্কর বাঁড়ুয্যে বুড়ো মানুষ। বেশীদূর হাঁটতে পারেন না। অবশ্যি, তাঁর আশা করাও বৃথা। কী দায় পড়েছে, কোথাকার উৎপল না কে—তাকে পুলিশ অকারণে ডেকে নিয়ে এসে হয়রান করুক বা না করুক। উৎপল টের পায়, যে বাবলতলী এক সময় তার মুখে চুমু খাচ্ছিল, সে এখন দাঁতের কামড় দিতে ব্যস্ত।

মাঝখান থেকে ছোড়দির চাকরিটা যাবেই। আহা, বেচারা! স্বপ্ন নয়, ঘুম নয়, অনেক অদ্ভুত কথা--অনেক আশ্চর্য দৃশ্য ভাবতে ভাবতে, কল্পনায় পৃথিবীতে হাজার বার ভাঙচুর করেও ইচ্ছে মতো বদলে, সুন্দর আনন্দিত শান্তিময় পৃথিবীকে বুকে নিয়ে সে বসে থাকল ঠাণ্ডা রাতে জড়োসড়ো অপরিসর ঘরটাতে—যার তিনপাশে দেয়াল, একদিকে লোহার রেলিং—ওপাশে কনস্টেবেলদের গুটিকয় কাট। কোনটা খালি, কোনটা ভর্তি। এই খাটগুলোর খালি-ভর্তি পৃথক পৃথক এ ও বি চিহ্ন ধরে নিয়ে দারুণ সমস্যা। এ বি হয়। বি এ হয়ে ওঠে। ন্যায়শাস্ত্রের গোলমালে রাতটা কখন কেটে গেল।

অমরদা এলেন সকালে। হন্তদন্ত।—কী সর্বনাশ! একটুও জানতাম না ভাই। সারাদিন সারারাত কাল বাঘটার পিছনে ঘুরেছি। কিছুতেই ওকে গুলি করার সুযোগ পেলাম না। তবে একটা ব্যাপার তাহলে ঘটল—বাঘ ইজ রাইট এবং তাকে আবিষ্কার করতে পেরেছিলাম, ইট ইজ অলসো এ ফ্যাক্ট।

খানিক পরেই ছাড়া পাওয়া গেল। সমন বাড়ির ঠিকানায় যাবে কোর্ট থেকে। ছোটবাবুদের খাতিরে ওকে পাবলিক উইটনেস হিসেবেই রাখা যেতে পারে। শিবনাথের জন্যে কিছু করা যাচ্ছে না আপাতত। অনেক দিন থেকেই পুলিশের উপর বিভিন্ন মহল থেকে চাপ আসছিল, ওকে নানা অসামাজিক অপরাধের চার্জে গ্রেপ্তারের জন্যে। ইতিমধ্যে বাড়ি সার্চ করে কিছু চোরাই মালও নাকি পাওয়া গেছে। উৎপল তাজ্জব। আরতির সাহায্যে শিবনাথ চোরাকারবার করত। দেহ ব্যবসা, গণিকালয়! অনেক কিছু

প্রাসঙ্গিকও নাকি ছিল।

এদিকে আরতি—আরতি আছে। যাবে কোথায়? তবে এই গোলমালের ফাঁকে গুজব রটেছে, সেই যাত্রা দলের মাস্টার নাকি শিবনাথের উপর মামলা করেছে। তার স্ত্রীর সতীত্বহানির মামলা। সত্যমিথ্যা আপাতত জানবার উপায় নেই। আরতি নাকি বলেছে—তা যদি হয়, মেঘ না চাইতেই জল। কোর্টে যা বলার আমি বলব।

দীপ্তিদের ঘরের দিকে যেতে পা উঠল না। মুখ দেখাতে লজ্জা করছে। এতো ইনকেলাবী হাজতবাস না কোথায় একটু মেয়েঘটিত দুর্গন্ধ এর আষ্টেপিষ্টে জড়ানো আছে যেন।

অমরদার সঙ্গে আবার সেই ঘরে আসতে হল। এল তো যেতেই হবে। কেবল দীপ্তির জন্যে ভাবনা। ওকে অসহায় অবস্থায় ফেলে গেলে বাবা কী বলবেন? ওকে সঙ্গে নিয়েই বেরোবে। অজ বারোটা পাঁচের ট্রেন কোনমতে ফেল করছে না সে।

—তাহলে ভালছেলের মত চুপচাপ বসে থাকো, কেমন? খবরদার, বাইরে পা দিয়েছ কী মরেছ। সাবধান।

—আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

—আমার থাকবার যো আছে ভাই! একবার যখন ও চাঁদমুখ দেখে ফেলেছি, আর রক্ষে নেই। —আনটিল আই গেট দি অপরচুনিটি টু প্রেস মাই ট্রিগার আই অ্যাম টু মার্চ এ্যাণ্ড মার্চ অন।

—আজই আমাকে বারোটা পাঁচে ট্রেন ধরতে হবে অমরদা।

—চলে যাবে? অমরদা যাত্রাদলের নায়কের মত সামনে সোজা এগিয়ে আসেন।—এতগুলো অপমানের জ্বালা একশো মাইল দূরে বয়ে নিয়ে গিয়ে শান্তি পাবে ভেবেছ? ঘুম আসবে চোখে? হাত নিসপিস করবে না?

—কী করব?

—লজ্জা করছে না একথা বলতে? ভীতু, কাওয়ার্ড কোথাকার! উৎপল মুখ নীচু করে।

— বোম মারার গল্প করেছিলে ওই মুখে। রাইফেল ছাড়া পথ নেই বলেছিলে! দেখ উৎপল, কলকাতা শহরে বসে আজ আর বাংলা দেশের কোন ভালমন্দ করা যায় না। এক নিরাপদ জায়গায় বসে বোতাম টিপে হ্যাঙ্গামা বাধাবে, অত সহজে সিদ্ধিলাভ হয় না ভাই। কারণ তোমার হাতে তো পরমাণু বোমা নেই। তুমি তো আসলে নিরস্ত্র প্রোলেটারিয়েট!

উৎপল এবার মখ তোলে মাত্র। কথা বলে না। বলার মত কথা খুঁজে পায় না।

—সহজে সিদ্ধিলাভ হয় না। ক্ষিদে বাড়লেই বিপ্লব ঘটে না। তাহলে তো প্রতিটি দুর্ভিক্ষে প্রতিবার বিপ্লব হত। পঞ্চাশ সালের দুর্ভিক্ষ তুমি দ্যাখোনি। আমি দেখেছি। পঞ্চাশ লাখ লোক না খেয়ে মরেছিল। তবু কোন বিপ্লব হয়নি। কল্পনা করতে পারো ওই পঞ্চাশ লাখ মানুষ মানে কী প্রচণ্ড সাংঘাতিক শক্তি? মরুক গে....বাঘটা আমার মাথা গরম করে দিয়েছে। বুলি কপচাচ্ছি। তুমি চানটান করে খেয়ে ঘুমিয়ে নাও। মাইণ্ড দ্যাট, আমি না আসা অব্দি কোথাও বেরিও না। দিদি দরকার বুঝলে এখানে এসে দেখা করবেন।

উৎপল শুধু বলে, তারপর?

—ফিরে তো আসি। তারপর দু'ভাই বসে কিছু ঠিক করে ফেলব।

অমরদা সেজেগুজে বেরিয়ে যেতেই তপতী হাজির।

তারপর বলা কওয়া নেই, আচমকা দুম্ করে পিছন ফিরেছে এবং টেবিলটা দু'হাতে আঁকড়ে ধরেছে সে। পরক্ষণেই ফুঁপিয়ে কেঁদেকেটে একসা। উৎপল বিষফোঁড়ার উপর হাত বুলানোর মত আরামে জড়িয়ে জড়িয়ে বলে—প্রজাপতি আমার, কেঁদোনা। আমি ভালো আছি।

আট

যেন বাইরে বেরোলেই তেড়ে আসবে হাজার হাজার রাক্ষস, যাদের প্রাণভোমরায় হাতের ছোঁওয়া লেগেছিল। কিংবা মুখোমুখি পড়ে যাবে সেই অলৌকিক বাঘটার—সারা বাবলতলী যার স্বপ্ন দেখে হিমকুয়াশার রাতে। বাইরে যেন একটা ভয়ঙ্কর প্রতিকূল পৃথিবী—পা বাড়ালে কী হবে সেই ভাবনা।

উৎপল ভাবনার মধ্যে কুয়োতলায় গিয়ে স্নান করল। অন্যদিনের মত নবাকে জল তুলতে দিল না। এমন কি তপতীর সঙ্গে গল্পও করল না। শেওলাধরা দেওয়ালের খাড়া গায়ে গায়ে অজস্র ফাটল দেখে আজ বরং তার মনে কেন একটা মমতাবোধ জেগে উঠছিল। বাড়িটা ভিতরে ভিতরে ক্ষয়ে আসছে একটু একটু করে। একটা ইতিহাস মাড়িয়ে আরেক ইতিহাস হেঁটে আসছে। এই নতুন ইতিহাসটা বাইরের সেই ভয়ঙ্করের দূত। শঙ্কর বাঁড়ুয্যে শিকারী হিসেবে হয়ত একদিন দক্ষ ছিলেন, অনেক বাঘ তিনি মেরেছেন; কিন্তু এখন তো বুড়োমানুষ। নড়বড়ে দাঁতে শুধু অলস ক্রোধের স্খলিত ভাষা—যার মধ্যে এতটুকু বিষও অবশিষ্ট নেই। তাঁর ছেলেও নিঃসন্দেহে দক্ষ শিকারী ; কিন্তু শিকারের প্রেমে যে পড়ে যায়, সে কি যথার্থ শিকারী? সে কোনদিনই বাবলতলীর এই শেষ বাঘটাকে মারতে পারবে না। বিদূষকের মত বনের রাজার পিছনে সে সারাজীবন ভাঁড়ামি করেই কাটিয়ে দেবে। তারপর দেখা যাবে হিজল বাবলা জারুলের সঙ্গে জড়াজড়ি করে একদা সে গাছের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একাকার হয়ে গেছে—পাতায় পাতায় তার পাখির বিষ্ঠা, শাখায় লালপোকা মথ, গুঁড়িতে শুঁয়োপোকার বুনুনি, প্রজাপতি ওড়ে চারপাশে।

এ মমতা কেমন করে এল উৎপল বুঝতে পারল না। কী ঘৃণাই না সঞ্চিত ছিল এইসব গৃহস্থ জীবনের প্রতি, স্বার্থপর নির্বোধ বনেদীপনার প্রতি। হঠাৎ সে আজ দেখেছে, তপতীর প্রতিও তার মমতা। আর এই ধ্বংসোন্মুখ বাড়ির দেয়ালগুলোও তাকে বলছে—করুণা করো।

প্রথামত রান্নাঘরের বারান্দায় খেতে বসে সে। ঝিয়ের বদলে তপতী নিজেই পিঁড়ি পেতে দেয়। সরোজিনী বাতের কামড়ে উপরের ঘরে শয্যাশায়িনী। শঙ্কর বাঁড়ুয্যে উপরের বারান্দায় রোদে বসে তামাক খাচ্ছেন। তপতীর দিদি সুমিত্রা পরিবেশন করে। পিছনের ঘরে এক দঙ্গল ছেলেমেয়ে ক্যারাম খেলছিল। উৎপলকে দেখে তাদের গুটির আওয়াজ বন্ধ হয়। দরজার কাছে তারা উঁকি মারে। মুখ ফিরিয়ে উৎপল একটু হাসে। তারপর শোনে—ফিসফিস করে তাদেরই কেউ বলছে—ও সারারাত থানায় ছিল।

তপতীর চোখ টিপে, ভঙ্গী করে তাদের দিকে তেড়ে যাওয়াও বুঝতে পারে উৎপল। খেতে গিয়ে বুকটা কেমন করে বাজে। শিবনাথকে ওরা কতদিন আটকে রাখবে কে জানে। পরক্ষণে ক্ষোভে দুঃখে হাতের মুঠো শক্ত হয়। অপমানবোধ ভিতরে শুঁয়োপোকার মত জ্বালা দিতে দিতে চলাফেরা করে। ফের আরতির মুখ মনে পড়ে। দীপ্তির ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত মুখটাও তার মনে ভেসে ওঠে। বদ্যবাবু কি এমন সহজ মানুষ? ছোড়দির চাকরীটা থাকবে? যার ভাই হাঙ্গামার মধ্যে ছুটে গিয়েছিল, নিছক দর্শক হিসেবে নয়—বিপন্ন শিবনাথকে বাঁচাতে সে লাঠি কেড়ে নিয়েছিল একজনের হাত থেকে। এগিয়ে না গেলে শিবনাথকে ওরা হয়ত খুন করে ফেলত।

—কী হল? খাচ্ছেন না যে? তপতী ছুটে আসে।

সুমিত্রা রান্নাঘর থেকে বলে, খাবে কী! আজ তো মায়ের হাতের রান্না নয়। আমি ভাই রান্নাবান্নায় খুব কাঁচা। আমার ওখানে রাঁধুনি বামুন রেখেছি। সেই সব করে। অথচ আমাদের পরিবারে অন্য রকম প্রথা।

তপতী বলে, জয়াদির কাছ থেকে আচার এনে দেব? ·

উৎপল মাথা নাড়ে।

এদের কথা কানে গিয়েছিল শঙ্কর বাঁড়ুয্যের। বারান্দার রেলিঙে ঝুঁকে বলেন—লজ্জা করোনা বাবা। পুলিশে ধরে থানায় নিয়ে গেছে তো কী হয়েছে? জানো, যখন জমিদারি ছিল, নিজে শুধু লাঠিবন্দুকই ধরিনি, মানুষও মেরেছি। পুলিশ থানায় নিয়ে গেছে। কত বিচিত্র ঘটনা ঘটেছে ... তোমরা একালের ছেলে, এতে লজ্জা পাও—লজ্জা পাবার কিচ্ছু নেই। পুরুষ পুরুষোচিত কাজই করে।

একটু পরে ফের বলেন—আমার একটা ঘোড়া ছিল। তার নাম কালাচাঁদ। কালো মোষের মত চেহারা। ভয়ানক তেজী আর শিক্ষিত ঘোড়া। একবার হয়েছে কী জানো? .... আমার নামে তখন তিনটে খুনের মামলার গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ঝুলছে। বাবা সব ঠেকিয়ে রাখছেন। ওই বদুবাবুরা তিনপুরুষ ধরে আমাদের শত্রু। তাদের চাপে পড়ে শেষ অব্দি জেলার ম্যাজিস্ট্রেট স্টুয়ার্ট আর পুলিশ সুপার মোরেল—দু'জনেই খাস ইংরেজবাচ্চা, নিজেরা দলবল নিয়ে হাজির হল বাবলতলী। আমি সেদিন

ঘটনাচক্রে বাড়ি ছিলাম না। ফিরছি যখন, তখন রাত্রিকাল। তাতে বর্ষা। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। বদুবাবুদের বাগান পেরিয়ে এসে গেটের দিকে চোখ চলে গেল। কিছু দেখতে পেলাম না। কিন্তু কেমন সন্দেহ হল হঠাৎ। কালাচাঁদ কিন্তু স্থির অটল। একপাও এগোতে চায় না। পরক্ষণেই টর্চের আলো এসে পড়েছে গায়ে। মুহূর্তে কালাচাঁদ মুখ ফিরিয়ে ছুটতে লাগল। পিছনে ওরাও ছুটে আসছে। জেলা-বোর্ডের ওই রাস্তাটা তখন কাঁচামাটির পথ—লোকে বলত বাদশাহী সড়ক। বর্ষায় অনেক জায়গায় ধ্বসে গর্ত হয়ে থাকত। কালাচাঁদ সেই সব গর্ত ডিঙ্গিয়ে আমাকে একেবারে বিলের ওদিকে নিয়ে গেল। বিশ্বাস হচ্ছে না? তোমরা আজকালকার ছেলে। কালাচাঁদের কথা বুঝবে না।

উৎপল একটু হাসে। কালাচাঁদকে সে চেনে। কালাচাঁদ আজও বেঁচে আছে— তেমনি প্রভুভক্ত। শঙ্করবাবু বলেন—না, আমাকে বিপাকে ফেলতে পারেনি ওরা। বাবার হাত খোদ লাটসায়েব অব্দি পৌঁছত। তবে একটা কথা বাবা, এযুগে এমনতর কাণ্ড যে না চলছে তা নয়। ইতিহাসে রূপভেদ আছে, বস্তুভেদ নেই। এখন জমিদার নেই ; কিন্তু তাদের জায়গায় যারা আছে, তারাও খুন করে। স্লো পয়েজিনং। মিথ্যে বলছি না তো?

উৎপল বলে—আজ্ঞে না।

অমরদার বাবা কতকটা অমরদার মতই। কথা বলার ঢঙ শুধু নয়, মেজাজেও।

বুড়োকে এতদিন যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলেছে, আজ যেন বেশ ভালোই লাগল। তাছাড়া উৎপল বুঝতে পাবে, হাঙ্গামায় তার অংশগ্রহণ দেখেই সম্ভবত বুড়ো বেশ সন্তুষ্ট হয়েছে। এদের রক্তে হিংসাব বিষ আছে। কোথায় হিংসা দেখলে ভয় পায় না, উত্তেজনার আনন্দ পায়। রক্ত দেখলে এরা বাঘের মত অস্থির হয়।

কিন্তু কাদের খুন করেছে, জানতে ইচ্ছে করে। তারা কি তার প্রজা ছিল? নিরীহ চাষাভুযো? নাকি কোন বিদ্রোহী? কোন রবিন হুড? কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রেম বা সম্পদের! ঘরে এসে সিগ্রেট টানতে টানতে অপমানবোধটা ফেব চনচন করে ওঠে। লজ্জা তাকে আড়ষ্ট করে। এরা তার কে? কে ওই শিবনাথ বা আরতি? কে অমরবাবু— যে তার কথায় এখানে চুপচাপ পড়ে থাকতে হবে? দীপ্তিদি যদি তার চাকরি রাখতে চায়, নিশ্চয় তাকে বদুবাবুর কাছে নির্বোধ হারামজাদা ভায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনাই করতে হবে। কেন ছোড়দিকে সে এক গ্রাম্য অর্ধশিক্ষিত মাতব্বরের কাছে ছোট হতে দেবে?

বাইরে পা বাড়াতে সংকোচবোধ ছিল হয়ত একটু সাহসের অভাবও ছিল। বদুবাবুব অসীম প্রতাপ— যা বোঝা গেল এই ঘটনায়। তবু সে স্থির থাকতে পারল না। সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখে তপতী মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়ে হঠাৎ।

পরমুহূর্তে সকৌতুক বলে—কী খবর, প্রজাপতি?

তপতীর মুখটা একটু দেখায়। সে বলে—বাইরে যাবেন না। দাদা কী বলে গেছেন, ভুলে গেছেন নাকি?

—আহা প্রজাপতি, অমন করে শাসন করা কি ভালো?

—যান, আপনার সবসময় ফাজলামি।

—সরো, দিদির ওখানে যাচ্ছি।

—যাবেন না। বদুবাবুরা লোক ভালো না। এই দেখুন না, আমি আব ও স্কুলে যাব না।

উৎপল অবাক হয়।—যাবো না? কেন?

তপতী মুখ নামিয়ে বলে—গার্জেনের বারণ। আমি ছোড়দির কাছে গিয়ে থাকব বহরমপুরে। সেখানে ভর্তি হবো। পরক্ষণে দুঃখিত কণ্ঠে ফের বলে—একটা বছর পিছিয়ে যাবো, এই, যা।

উৎপল পা বাড়ায়— সেই ভালো।

তপতী বলে—আপনি....আপনি খুব..

—কী?

—নিষ্ঠুর। বলেই তপতী দ্রুত উপরে উঠে যায়।

উৎপল হাসতে হাসতে নেমে আসে। আজ একবার ওকে চুমু খেতে ইচ্ছে করছিল, কেন কে জানে। চুমু সত্যি সত্যি খেলে কী ঘটত। উৎপলের জানতে ইচ্ছে করছিল, তার আরতির বাড়ি যাওয়া

বা তার সঙ্গে মেলামেশা নিয়ে তপতীর ধারণাটা কী।

গেটের উপরটা ফাটলে ফাটলে একাকার। মাধবীলতার চাপে পাঁচিল যেন ধুঁকছে। বুগানভেলিয়া ও রোডেডেনড্রন অযত্নে ছড়িয়ে পড়েছে গেটের মাথায়। নীল ঝালর নিয়ে ল্যাভেণ্ডার ভাঙা খাঁচায় শুয়ে বিষণ্ণভাবে তাকিয়ে আছে। প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত সম্পদগুলো যেন একটা ইতিহাসের সমাধির গর্ভে নিষ্পন্দভাবে খণ্ডখণ্ড স্তূপীকৃত এবং এইসব উদ্ভিদ তাদের ধূলিলুণ্ঠিত পতনের দ্বারা গঠিত সমাধির আব্রু রক্ষায় তৎপর। যে প্রকৃতি ক্ষয় ও হননে উন্মুখ, সেই আবার যেন করুণায় মমতায় কণ্ঠমূলে চুম্বন করে বারবার।

স্কুলের সীমানায় পা দিতে গিয়ে একবার শিউরে ওঠে সে। কোন ক্ষতি হবে না তো? কোন মিথ্যা চার্জে ফেলে হয়রানি করবে না তো? তপতী যেন একথাটাই বলতে চেয়েছিল। তবু সে হনহন করে হেঁটে যায়। মুহূর্তে সঙ্কল্প স্থির করে নেয়। যে ভাবেই হোক, দিদিকে সব গুছিয়ে নিতে বলবে। কোন কথা শুনবে না। এক্ষুনি সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। স্টেশনে তুলে দেবে ট্রেনে। কিন্তু নিজে যাবে না। ফিরে আসবে। ফিরে আসবে অমরদার কাছে—যে তাকে বলেছিল, এই অপমানের জ্বালা বুকে নিয়ে একশো মাইল দূরে পালিয়ে কি রেহাই পাবে? গ্রামে বেড়াতে এসে হঠাৎ অসুস্থ যে—তার অসুস্থতার কী ওষুধ অমরদা বাতলাবেন, সেই কৌতূহল উৎপলকে অস্থির করে রেখেছে সকাল থেকে।

স্কুলবাড়ির সীমানায় পা দিয়ে উৎপল থমকে দাঁড়ায়। প্রাঙ্গণে এখানে ওখানে ছেলেরা জটলা করছিল। কাঞ্চন গাছের নীচে গোল চত্বরে গুটিকয় মেয়ে বাঘবন্দী খেলছিল। এপাশে সব্জীখেতের বেড়ার পাশে দাঁড়িয়ে কেউ আঙুল তুলে ফুল দেখাচ্ছিল সম্ভবত। টিফিন পিরিয়ডের খোলামেলা অবসর—ছড়ানো ছিটানো বিশৃঙ্খল ছাত্রযূথ। নরম রোদের রঙ গায়ে মেখে বয়স্ক মাস্টার মশাইরা স্বাস্থ্যের আশা করছিলেন যেন— চোখগুলো পর্দা খোলা দরজার মত রহস্যময়, সুন্দর আর গভীর।

এই আবেশস্নিগ্ধ অবসরের উপর উৎপল বাঘের মত দৃপ্তভঙ্গীতে হেঁটে আসতেই মুহূর্তে সব ছত্রখান। অজস্র আঙুল ও দৃষ্টির চাঞ্চল্য তাকে চারপাশ থেকে আঘাত করে। তপতীদের ঘরের সেই কিশোর কণ্ঠের প্রতিধ্বনি হিসহিস করে ওঠে চারদিকে, এই সেই লোকটা—যে থানায় ছিল।

প্রাঙ্গণ এড়িয়ে সে ডানহাতে ঘুরে বোর্ডিং-এর পিছনের দিকে চলে আসে এবং সোজা দীপ্তিদের কোয়ার্টারে পৌঁছে যায়।

নীচে বেড়ার গায়ে ওদের জামা রুমাল বালিশের ঢাকনা রোদে শুকোতে দেখে। ছোট্ট বারান্দায় রোদ পোহাতে দেখে একটা বেড়ালকে। মোড়ায় গুটানো লেপ ও কম্বলও দেখে রোদে রাখা। স্যাণ্ডেলের সঙ্গে ছেঁড়া জটপাকানো কিছু চুলের পিণ্ড জড়িয়ে যেতেই মাথা ঝুঁকিয়ে এবং বিনা বিরক্তি ও ঘৃণায় বাঁ হাত দিয়ে ছাড়িয়ে ফেলে উৎপল। এখানে বেশ খানিক স্বাভাবিকতা তার কৌতুকবোধে সুড়সুড়ি দিচ্ছিল। কোথায় আগুন লেগেছে জেনেও এ যেন নিশ্চিন্তে শুয়ে ঘুমানো।

উৎপল পর্দা তুলতে গিয়ে একটু থামে। দরজা আটকানো আছে। একবার কেশে নিয়ে ডাকে সে। জয়ার নাম ধরেই ডাকে—জয়াদি, ও জয়াদি, দরজা খুলুন।

প্রথম ডাকে ভিতর থেকে কোন সাড়া পাওয়া যায় না। সে ফের ডাকে। বেশ ব্যস্ততার সঙ্গেই ডাকে।—শীগগির দরজা খুলুন তো, জয়াদি।

এবার ভিতরে যেন ঘুমজড়ানো স্বর শোনা যায়।—কে, উৎপল নাকি?

উৎপল হেসে ফেলে। দিনদুপুরে ঘুম—বেশ আরামেই কেটে যাচ্ছে দিনগুলো তাহলে। মূলছাড়া ওপড়ানো গাছ, ভাসতে ভাসতে কোথায় আটকেছে এসে—সেদিকে হুঁশ নেই কারুর। নাকি স্বর্ণলতার মত—পরগাছা, গাছ পেলেই আঁকড়ে ধরে রক্ত শোষণ করে বাঁচে। উৎপল কিছু হিংসার গরমি নিয়ে যাবে—রোসো। দেখাচ্ছি মজা!

খুট্ করে প্রায় নিঃশব্দে দরজা খুলে যেতেই সে দীপ্তিকে দেখতে পায় মুখোমুখি এবং তক্ষুনি হঠাৎ চুপসে যায়। নার্ভাস বোধ করে। মুখ নামিয়ে নেয়। দীপ্তি বলে—ওরা ছেড়ে দিলে তোকে?

না, নিশ্চিত পরিহাস করছে না দীপ্তি। তার মুখটা অস্বাভাবিক কঠিন ও উজ্জ্বল। ফের মুখ তুলেই নামিয়ে নেয় উৎপল। দীপ্তি বলে—ভেবেছিলাম তোর একটা হিল্লে হল। আমিও বাঁচলাম। বাবাও বেঁচে গেলেন।

উৎপল হেসে এই জমাট মেঘটা তাড়াতে চায়। বলে—ভীষণ বলছিস্ যে ছোড়দি। মাথা খুলে গেছে রাতারাতি। যাক্ এবার তোর পাশ-টাশ আটকায় কে?

দীপ্তি হাসে না। কঠিন মুখেই বলে—তোর পাশ-টাশ তো আটকানোর ভয় নেই।

— খোঁটা দিচ্ছিস না তো?

— উৎপল, তোর লজ্জা করে না—বুড়ো বাবা এখনও দু'বেলা হাঁফাতে হাঁফাতে অফিসের সিঁড়ি ভাঙছেন। এখনও এই বয়সে তাঁকে বিশ্রামের আরাম দিতে পারলাম না.....

বাধা দিয়ে উৎপল বলে—তুই তো বাবার মেয়ে। তুই পারিস নে?

—পারতাম। পারিনি তোর জন্যে।

উৎপল ঘেমে ওঠে। কথা বলে না।

দীপ্তি ফের বলে—এবার তোর সেটা দায়িত্ব। তোরই পারার কথা। আমি মেয়ে—আমি তোদের সংসারের দায় কেন নেব? আমার নিজের ভবিষ্যৎ নেই?

এতক্ষণে জয়ার আবির্ভাব। —এই, কী হচ্ছে রে সব? ভাইবোনে ঝগড়া? উৎপল, ভেতরে এসো। দীপ্তি, তুই থাম।

দীপ্তিকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে জয়া উৎপলের হাত ধরে টানে। উৎপল হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে—ছোড়দি, সত্যি আমি দায়িত্বহীন। হয়ত আমি নিজেও এর জন্যে দোষী নই। কিন্তু আর যাই বল, আমি স্বার্থপর তো নই। আমার জীবনে কী হবে, না-হবে, আমি ভাবিনি। অথচ তুই... ভেবে দেখেছিস, তুই কী ভীষণ স্বার্থপর হয়ে গেছিস্?

দীপ্তি ঝাঁঝের সঙ্গে বলে—আমি তোর সঙ্গে ঝগড়া করতে পারব না। কথায় কথায় মানুষের মুণ্ডু নিতেও পারব না, বোমাটোমাও বানাতে জানিনে। আজই টেলিগ্রাম করেছি—যাঁর ছেলে তিনি এসে যা হয় করবেন।

উৎপল প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে—বাবাকে টেলিগ্রাম করেছিস আমাকে কি খোকা ভাবছিস্ তুই?

জয়া ধমক দেয়—আঃ কী হচ্ছে তোদের! ওই দ্যাখ, ওরা সব হাঁ করে এদিকে তাকিয়ে আছে।

উৎপল বলে—ভেবেছিলাম, তোকে এখনই এখান থেকে চলে যেতে বলব। এমনকি ট্রেনেও তুলে দিয়ে আসব। কিন্তু বুঝতে পারিনি, তুই কী ভীষণ....ইয়ে হয়ে গেছিস্। মুখোস পরে বাঁচতে চাস। ওই সুশীলটার মত। ঠিক আছে। থেকে যা। একজনের হাতে বাঁদরের মত নেচে যদি সুখ পাস্.....

দীপ্তি গর্জে ওঠে—উৎপল! আমাকে যা খুশী বল, অন্য কাকেও অপমান করবার অধিকার তোর নেই।

উৎপল পা তুলে নেয় চৌকাঠের উপর থেকে। দ্রুত নেমে আসে। জয়ার ডাক কানে নেয় না। তারপর প্রাঙ্গণের কাছে এসে থমকে দাঁড়ায়। কয়েকটি ছেলে ক্রিকেট খেলছিল। একজনের হাত থেকে ব্যাটটা নিয়ে হাত বাড়ায়। ছেলেটি নির্দ্বিধায় তাকে ব্যাট ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়ায়। বোলার ছেলেটি বল ছুঁড়তে এসে হঠাৎ থামে এবং উৎপলকে সামনে দেখে সে বুঝতে পারে এ প্রতিপক্ষ বেশ সবল। তখন সে ফের প্রস্তুতি নেয়। ছুটে এসে বল ছোঁড়ে। বলটা একবার ড্রপ করে লাফিয়ে আসতেই উৎপল যথাশক্তিতে ব্যাটের আঘাত করে। বল পলকেই গিয়ে লাগে ওপাশের দেয়ালে। তারপর প্রতিহত বলটা যেন দ্বিগুণ বেগে সোজা গিয়ে ঢোকে হেডমাস্টারের ঘরে।

উৎপল শুকনো হাসে। ছেলেগুলো পরস্পর মুখ তাকাতাকি করে। খেলার পরিণতিটা শুভ হল না টের পায়। ওঘর থেকে বল আনা প্রায় এভারেস্ট বিজয়ের সামিল। বিশেষ করে টিফিন-পিরিয়ডের আরাম পেতে দরজার মুখোমুখি রোদ গায়ে নিয়ে বসেছেন পণ্ডিত মশাই। পিঠের দিকটা খোলা—গাছের বাকলের মত খসখসে।

খেলা ভেঙে দেবার দুঃখে উৎপল বিষণ্ণভাবে ব্যাট ছেড়ে দেয়। বলে—আমি এনে দিচ্ছি বল। তারপর সপ্রতিভ ভঙ্গীতে বোর্ডিঙের বারান্দায় ওঠে সে। লম্বা বারান্দা ধরে এগিয়ে যায়। কিন্তু পণ্ডিত মশাইয়ের মুখোমুখি পৌঁছতেই তিনি হঠাৎ উঠে দাঁড়ান। পরক্ষণেই ঘরে ঢুকে যান।

দরজার সামনে গিয়ে উৎপল দেখে, তক্তপোষে বসে নিবিষ্টমনে ছাতু খাচ্ছেন হেডমাস্টার রঘুবাবু। একহাতে প্রকাণ্ড জামবাটি, অন্যহাতে কিছু কাগজপত্র। কোন হাতে খাচ্ছেন ধরতে পারে না সে। এবং

খুবই অন্ধকারে হঠাৎ দূরে কোথাও আলো পড়ার মত সে তার কৈশোরের দিনগুলোকে দেখতে পায়। কুয়াশা জড়ানো শান্ত হলুদ রোদে তার ছেলেবেলাকে বিড়ালের মত আপনমনে খেলা করতে দেখে। কেন সে বুঝতে পারে না, এক বিচিত্র অপরাধবোধে তার মন ভারী হয়ে উঠছে। এবং এক অন্যমন বিহ্বলতায় হঠাৎ তার ইচ্ছে যায়, টিপ করে একটা প্রণাম করে বসে।

কী করে বসত কে জানে, পরক্ষণে পণ্ডিতমশাই আকর্ণ হেসে সেই বলটা তক্তপোষের নীচে হতে এনে সামনে দাঁড়িয়েছেন। বলেছেন—এই যে!

এই বলা বা বল খুঁজে ত্বরিতে সামনে দাঁড়ানোর মধ্যে একটা কিছু নিশ্চিত ছিল। অপমানে উৎপলেব কান গরম হয়ে উঠেছিল। সে আশা করেছিল—তাকে কিছু প্রশ্ন করা হবে। হয়ত ইচ্ছা ছিল, সুযোগ পেলে জানাবে, ওগো মাস্টারমশাইরা, আসলে আমি কোন দোষই করিনি এ বিরাট পৃথিবীর কাছে। কিংবা এই ধরনের একটা অস্পষ্ট কোন ধারণা—যা তক্ষুনি প্রত্যাঘাত পেয়েছে।

বলটা হাতে নিয়ে বারান্দা ধরে আসবাব সময় এবার বিদ্যুতবাবুর মুখোমুখি হতে হয় তাকে। বিদ্যুৎবাবু শুধু বলেন—কী খবর? তারপর পাশ কাটিয়ে যান। প্রাঙ্গণে নামবার সময় সে শোনে, পণ্ডিতমশাই ভীষণ রসিকতা করে বলেছেন—মশাই, গুণ্ডাফুণ্ডা আমি ভীষণ ভয় পাই। অন্য একজন কে বলল—গুণ্ডা না বিপ্লবী।..... টেররিস্ট? ওরে বাবা, আমাদের যুগে সেসব কাণ্ড যা ঘটেছে!

তাহলে এই হচ্ছে তার সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা বাবলতলীতে। হঠাৎ উৎপলের মনে হয়, কী দরকার ছিল তার অতখানি বাড়াবাড়ির? শিবনাথকে তার লোকেরাই বাঁচাত। মাঝখান থেকে উৎপল দোষী হয়ে রইল একদল মানুষেব চোখে। সে বিদেশী, তার সব পক্ষেরই সমান ভালবাসা পাওয়া উচিত। ক'দিন বেড়াতে এসে একটা অদ্ভুত জেদের বসে কী সব ঘটে গেল জীবনে। যাবে নাকি বদুবাবুর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে? উৎপল বদুবাবুর ছেলে সুনীলকে খুঁজছিল। সুনীলই তাকে সেদিন নেমন্তন্ন করেছিল।

সুনীলকে কোথাও দেখল না সে। একটি ছেলেকে জিজ্ঞেস করতে সে বলল—সুনীল আজ স্কুলে আসেনি। ডেকে আনব নাকি উৎপলদা?

তাও ভালো। খুশীমনে উৎপল বলল—তোমার নাম কী?

—শান্তনু।

—শান্তনু কী?

—শান্তনু দাশ।

—বাবাব নাম?

—অমিয় দাশ।

উৎপল লাফিয়ে উঠল—অমিয়দার ছেলে তুমি? কোন্ ক্লাসে পড়ো?

—ক্লাস নাইন।

—বাবার খবর কী?

—বাবা? শান্তনু অদ্ভুত হাসল। —বাবার কাছে তো আপনি ভয়ে যান না!

—কী বললে? উৎপল এক পা এগিয়ে যায়।

শান্তনু যেন ভয় পেয়ে গেছে। আড় চোখে চাইতে চাইতে কেটে পড়ে। উৎপল ভাবে—তাব কণ্ঠস্বরটা কি খুব কর্কশ শোনাচ্ছিল?

ছেলেগুলো তার বলের জন্যে অপেক্ষা করে নি। খেলা ভেঙে দিয়েছে। ব্যাটে ঠুকে উইকেটগুলো তুলছিল। বলটা ছুঁড়ে দিয়ে উৎপল হনহন করে হেঁটে যায়। দীপ্তিদের ঘর এড়িয়ে যাবার জন্য স্কুলের পিছনটা ঘুরে যাবার সময় বাঁ হাতি ক্লাসের জানালায় একদল মেয়ে দেখে। ফিসফিস করে কথা বলছিল ওরা। কয়েক জোড়া চোখের বিস্ময় মাড়িয়ে যেতে যেতে উৎপল হঠাৎ ফিরে একবার হাত তোলে ও গার্ডসায়েবের সবুজ পতাকার মত নাড়ে। হাসে। মুখ ফিরিয়ে ফের চলতে থাকে। পিছনে হাসিব ধুম। যতদূর যায়, ওই হাসি তাকে খুশী করার চেষ্টা করছিল। তার নাগাল পেতে চাইছিল।

হ্যাঁ, করুণা। করুণা করা ছাড়া পৃথিবীতে বাঁচা বড় কঠিন। পৃথিবী বড় ভয়ঙ্কর। তাকে করুণা করার নাম যদি নির্বুদ্ধিতা হয়, সে নির্বুদ্ধিতা মানুষের প্রজ্ঞা থেকেই উৎসারিত। যে মানুষ বিশ্বের

সবটুকু দেখে ফেলেছে—জেনেছে, কিছু বাকি রাখেনি। বাবলতলীর সকলের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনার ছলে সে করুণা করে যাবে।

অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে উৎপল কখন কো-অপারেটিভ দোকানের সামনে এসে পড়েছিল। মুখ তুলে দেখেই এখন তার সুশীলের কথা মনে হল। সুশীল কি তার সঙ্গে প্রকাশ্যে আর মেলামেশা করবে?

যেন হাতে নাতে যাচাই করার জন্য সে এগিয়ে গেল। ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে যে ভদ্রলোক নিক্তি দিয়ে বিস্কুট ওজন করছিলেন, তাঁকে প্রশ্ন করল—সুশীলবাবু আছে?

—সুশীল? দাঁড়ান দেখছি।

একটু পরেই ফিরে এলেন ভিতর থেকে। বললেন—সুশীল একটু বেরিযেছে। কিছু বলতে হবে?

উৎপল একটু ভেবে নিয়ে বলে—তেমন কিছু না। বলবেন, উৎপল আপনার খোঁজ করছিল।

—উৎপল? ভদ্রলোক বেশ নাটুকে ভঙ্গীতে বলেন—মানে....ও হরি, কী কাণ্ড দেখুন' ভুলেই গিয়েছিলাম আপনার চেহারাটা। তাই বলুন!.....আসুন, আসুন! ভেতরে আসুন। আমার নাম কানাই দাশগুপ্ত। লোকে কানুবাবু বলে।

উৎপল এবার ভদ্রলোককে খুঁটিয়ে দেখে। চেনা মনে হয়। কোথায় যেন দেখেছিল, স্মরণ করতে পারে না। পাকা শশার মত হলদেটে রঙ, ফ্যাকাশে—যেন রক্তাল্পতায় বহুদিন ভুগছেন। খাড়া নাক, চওড়া উঁচু কপাল, পাতলা ঠোঁট। কানদুটিও বেশ লম্বা! মুখের চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে অনেক—তবু বোঝা যায়, যৌবনে অসামান্য সুপুরুষ ছিলেন। চুলে এখনও মোটেই পাক ধরেনি—বেশ লম্বা কাঁধছুঁই চুল, রুক্ষ্ম কটা। দুটি চোখের মণি নীল-ঘোলাটে, কোটরগত—রাত্রি জাগরণ ও নেশাখোরেব স্পষ্ট পরিচয় রয়েছে।

—ওঃ হো! উৎপল অর্ধস্ফুট কণ্ঠে বলে। —আপনাকে চিনেছি! থিয়েটারে.....

কানুবাবু বলেন—ভবশঙ্করের পার্ট করেছিলাম। এরই মধ্যে ভুলে গেছেন, দেখছি।

উৎপল জিভ কাটে—ছি, ছি! অত সুন্দর পার্ট করেন। তবে একরাত্রির দেখা তো!

কানুবাবু বেরিয়ে আসেন।—ক্লাবে মশাই হামেশা যাওয়া-টাওয়া সম্ভব হয় না। এই যে কী নচ্ছার চাকরী করি, দেখুন না! সকাল আটটা থেকে একটা অব্দি হাজার রকম কাজের হাঙ্গামা। একটি ঘণ্টা অবকাশ। বাড়ি সেই হাইওয়ের লাগোয়া।.কোনমতে কাকস্নান সেরে দুটো গিলে ফের এই যজ্ঞিশালায়। তারপর রাত্তির দশটাও হতে পারে, বারোটা হলে অবাক হই না।...আসুন, ভেতরে বসে চুটিয়ে গল্প করা যাক্। সত্যি, কী ভাগ্যি এদিকে এলেন।

উৎপল ভিতরে যায়। একটা টুলে বসে পড়ে কাউন্টারের ওপাশে। কানুবাবু বলেন—ভুলো, শীগগির দুটো চা। আর শোন্ .....ইয়ে, উৎপলবাবু, মুখ রাঙানো অভ্যেস আছে? জরদা না সাদা?

নির্দ্বিধায় উৎপল বলে—হ্যাঁ। সাদা।

—শোন্, ভুলো, দু'খিলি পান, একটা জরদা, একটা সাদা। দুটো সিগ্রেটও আনিস্। পানামা কিন্তু আমার ব্র্যাণ্ড, আপনার?

—চারমিনার।

—ওরে! একটা পানামা, একটা চারমিনার।......যাক্ মশাই, আলাপ তো হল। ব্যাপার কী? সেই রাত্তির থেকে কোথায় গা ঢাকা দিয়েছিলেন বলুন তো?

উৎপল অবাক হয়। কানুবাবু কি বাইরের খবরাখবর কিছুই রাখেন না! নাকি তামাসা করছেন? সে বলে—কেন? এখানেই আছি। কত কাণ্ড ঘটাচ্ছি।

কানুবাবু বলেন—কাণ্ড? তা বাবলতলীতে কাণ্ড তো দিনরাত্তির ঘটছে। অত কান করিনে মশাই। আমি আমার নিজের তালেই থাকি। তাতে আবার এক দায় কাঁধে চেপেছে। পাশের গ্রাম রূপপুরের পার্টির একরাত্তির প্লে হচ্ছে নবান্নের রাত্রে। দুশো নম্বর মেইন পার্ট মশাই....এইসব কুকর্ম করব, না যে.....যাক্ গে।

কানুবাবু অনর্গল বলে যান। উৎপল কিছু শোনে, কিছু শোনে না। সুশীলকে পেলে একবার ভালো হত। তার কাছ থেকে আরতির খবরটা একবার জেনে নিত।

যদি সুশীলের সঙ্গে দেখা না হয়, বরং নিজেই যাবে সীতুর বাড়ি। ও এলাকায় তাকে দেখলে ফের কি কোন গোলমাল ঘটতে পারে? উৎপল চিন্তিত হয়।

কাউন্টারে আরো দু'জন সেলসম্যান রয়েছে। এদিকটা স্টেশনারী। তারপর কিছুটা জুড়ে জামাকাপড়ের দোকান। শেষ অংশে গ্রোসারী। পিছনে একটা গোডাউন আছে—তার লাগোয়া এই কো-অপারেটিভের অফিস। সেখানে ধানচাল রবিশস্যের বেচাকেনা হয়। এলাহি কারবার। সুশীল একদিন সঙ্গে এনে সব দেখিয়েছিল। সেদিন এই কানুবাবু কোথায় ছিলেন? ছিলেন না নিশ্চয়। হয়ত কোথায় বায়না ছিল কোন দলে।

কানুবাবু বলেন—শুনলাম, কাল ভীষণ মারপিট হয়ে গেছে ময়রাপাড়ায়। শিবু নাকি কলকাতা থেকে গুণ্ডা ভাড়া করে এনেছিল। শিবু—শিবনাথকে চেনেন?

উৎপল চমকে উঠেছিল। বলে—চিনি।

—আমি মশাই এটা বিশ্বাস করিনে। ছেলে হিসেবে অমন সুন্দর স্বভাবের কেউ নেই বাবলতলীতে। অত কম বয়সেই জনসাধারণের আস্থাভাজন কি সাধে হয়েছিল? আপনি তো শিক্ষিত লোক, অনেক ভালো ভালো নাটকেরও খবর রাখেন। বলুন তো, মানুষের উন্নতির প্রতিবন্ধকটা কী?

উৎপল শুধু তাকায় মাত্র। জবাব দেয় না।

কানুবাবু বলেন—বলুন তো স্বর্ণলঙ্কার ধ্বংস হল কেন?....মশাই, নারী, নারী! ইতিহাস বলুন, নাটক বলুন সবকিছুকে ক্লাইম্যাক্সের চূড়ায় তুলে দেয় নারী। শিবুকে শেষ করে ফেললে ওতেই। হঠাৎ ক্ষেপে ওঠেন কানুবাবু।—কেউ ওই মাগিটার চুলের ঝুঁটি ধরে মারতে মারতে গ্রামছাড়া করে দিতে পারছে না?

পরক্ষণে ফিক করে হাসেন।—মরুকগে। শিবুর জন্য বড্ড কষ্ট হয়। সত্যি বলতে কী, ও যদি এখানে আমাকে এই চাকরিটা না জুটিয়ে দিত, আমায় গ্রামে গ্রামে যাত্রা-থিয়েটারে রাত্তির জেগে বেড়াতে হত। তাতেও কি অন্ন দু'বেলা সমানে জুটত? আজকাল তো সবখানেই দুর্ভিক্ষ লেগেছে। লোকে সিনেমা দেখবে, না যাত্রা-থিয়েটারের মর্যাদা দেবে? তাছাড়া জমিতে ফসলও ফলেনা আগের মত। ঋতুগুলোও গোলমাল করছে বড্ড। আইন নেই শৃঙ্খলা নেই দেশে। চতুর্দিকে শুধু দলাদলি, বদমাইসি, স্বার্থপরতা। ভাগাড়—মশাই, পৃথিবীটা ভাগাড় হয়ে গেছে। রাজ্যের চিলশকুন, মড়া, কুকুর, দুর্গন্ধ....ছ্যা ছ্যা, মানুষের বাঁচার মত কী আছে আর?....নিন, চা খান।

ভুলোর হাত থেকে চায়ের কাপ নিয়ে নিজেরটাতে চুমুক দেন কানুবাবু। ফের বলতে থাকেন—সত্যি উৎপলবাবু, অভিনয়ের লাইনে না থাকলে নির্ঘাৎ, সুইসাইড করতাম ভাই। কিছুক্ষণের জন্যে রঙচঙ মেখে কল্পনার জগতে চলে যাই, তার স্মৃতি বাকী অবসর সময়টুকু ভরিয়ে রাখে। ওই আমার বাঁচবার জগৎ। অথচ কিছুকাল থেকে তাও জুটছিল না বরাতে। গত ইলেকশানে সুশীলের সঙ্গে হঠাৎ আমার বাড়ির দরজায় দেখা। ও পিনাকীবাবুর ক্যানভাসিঙের লোক খুঁজছিল। পিনাকীবাবু আবার আমাদের চেয়ারম্যান বদুবাবুর মুরুব্বী। তা সুশীল হঠাৎ আমাকে বুদ্ধি বাতলে দিলে। বললে—কানুদা, ইলেকশানে খাটবেন? আপনার তো গ্রামাঞ্চলে বেশ নামটাম আছে। আমি বললাম—দেখ সুশীল, চিরকাল মাথা উঁচু করে রাজা রাজড়ার পার্ট করেছি। ওই উঁচু থাকার দেমাকই বলো, অভ্যাসই বলো—আমার পুরোদস্তুর আছে। কারুর কাছে হাত জোড় করে বলতে পারবনা—মশাই, অমুকবাবুকে একটি ভোট দেবেন? সুশীল বললে—বরং এক কাজ করুন না! নাটক করুন। নিজেই লিখুন নিজেই করুন। সঙ্গে দু-চারজন ছেলে-ছোকরার দরকার হলে তাও পাবেন...কথাটা, ভাই, মাথায় এসে গেল। পোস্টার-ড্রামা কখনও করিনি নিজে—তবে এলাকায় ভোটাভুটির সময় দেখেছি বিস্তর। হেসেছি বা তুচ্ছতাচ্ছিল্যও করেছি ও নিয়ে। কিন্তু যাই বলুন, ও একটা রীতিমত আর্ট!.....তারপর তো লেগে গেলাম আদাজল খেয়ে। ভীষণ পপুলার হয়ে উঠল আমার দল। যেখানে মিটিং হয়, সেখানেই ওই অভিনয়। পিনাকীবাবু উঠতে বসতে আমার পায়ের ধুলো নেবার তাল করেন। বদুদা তো প্রায় কাঁধে করে নিয়ে ঘুরতে চান। কল্পনা করুন, যে এলাকায় পিনাকীবাবু একেবারে ড্রাই যেতেন, সেখানে তিনি পেয়েছিলেন শতকরা আশিটি ভোট। যাক্ সে কথা। জিতিয়ে তো দিলাম। এবার আমার ভবিষ্যৎ? সব দলের লোকের কাছেই প্রিয়পাত্র ছিলাম। সকলেই দাদা বলে সম্ভাষণ করেছে। ও হরি, তারপর দেখি আমি একটা

দলের লোক হয়ে পড়েছি যে।....এখন ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হয়। সরাসরি পিনাকীবাবুকে ধরলাম। বললেন—হবে, হচ্ছে। কয়েকটা মাস প্রায় নিরন্ন ধুঁকছি সপরিবারে। বায়না স্বভাবত কমেছে। বেদলের প্রভাব যেখানে আছে, সেখানে তো পা ফেলতে পারিনে। তারা ঘৃণা করছে আমাকে। অগত্যা বদুদাকে ধরলাম। আরও কয়েক মাস গেল। মশাই, অবাক হয়ে দেখলাম, আমাকে কেউ মুখ তুলে একটা কথাও বলতে চায় না! বেশ রে নেমকহারাম! সুশীলকে বললাম—সুশীল, এ কি হল হে? সুশীল বললে কি জানেন? ওর এক জ্যাঠা ইংরিজীর ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট এম. এ.। হঠাৎ অন্ধ হয়ে গেছেন। একটা বড় পরিবার। লায়েক বলতে একটি মেয়ে। বহরমপুরে আই. এ. পড়ছিল সে-সময়। তার পড়াশুনা বন্ধ হয়ে গেছে। সুশীল ঠিক আমার মতই ধরেছিল পিনাকীবাবুদের—মেয়েটিকে একটা চাকরি না দিলে পরিবারটা অন্নাভাবে ভিক্ষা করতে বাধ্য হবে। তারপর কী হল জানেন? এই ডিপার্টমেন্টাল স্টোরটা তখন সদ্য খোলা হয়েছে। কয়েকজন সেলসম্যান দরকার ছিল। সুশীলের সেই জ্যাঠতুত বোন দরখাস্ত করল। আমিও অবশ্যি একটা দরখাস্ত ইতিমধ্যে করেছিলাম। তারপর ইন্টারভিউ নেওয়া হল। দিন যায়, সপ্তাহ যায়, খবর নেই। সুশীল বললে—দাদা, সীমার জন্যে ওরা কি বলছে জানেন? বলছে—ওর চেহারা সুন্দর নয়, কুৎসিত! কুৎসিত মেয়ে চলবে না।..... সুশীলের কথা আলাদা। ও কী চালে চলে, আমি জানিনে? কিন্তু ভাবুন, একটি অসহায় পরিবারের মেয়েকে তার রূপ নিয়ে কী মর্মান্তিক পরিহাস করা হল। এ নিষ্ঠুরতার তুলনা নেই। সুশীল এ-সব ঘৃণা হজম করল কীভাবে!

উৎপলের চা জুড়িয়ে গিয়েছিল। এতক্ষণে কাপে চুমুক দিয়ে বলে—আপনার চাকরিটা বুঝি হল শেষে?

—হল। কানুবাবু বিকৃত মুখে বলেন।—কিন্তু হল কেমন করে জানেন? ওই শিবনাথের চাপে। শিবনাথকে কথায় কথায় একদিন সব বলেছিলাম। ও ছিল একজন ডাইরেকটার। ও তো কোনোদলের লোক নয়—নিরপেক্ষ। সকলেরই প্রিয়। ও আমার জন্যে জেদ ধরেছিল।

উৎপলবাবু প্রশ্ন করে—শিবনাথের সঙ্গে বদুবাবুর বিরোধের কারণ কী?

কানুবাবু হেসে ফেলেন—কী শুনলেন? ওই নারী—মানে ময়রাদের মেয়েটা নিয়েই তো ওর স্বর্গের সিঁড়ি ভাঙল। বাবলতলীর পঞ্চপাণ্ডবের কথা শোনেননি? ওঁরা বদুবাবুর জ্ঞাতি। ওঁরা শিবুর বিরুদ্ধে প্রথম অস্ত্রে শান দেয়। পরে বদুবাবু। তাছাড়াও আর একটা কারণ অবিশ্যি ছিল। শঙ্কর বাঁড়ুয্যেকে সব ব্যাপারে সাপোর্ট করা শিবুর অভ্যাসে দাঁড়িয়েছিল যে! শঙ্করবাবুর দাদুর প্রতিষ্ঠিত হাইস্কুল—বদুবাবুরা সেখানে দলের জোরে মাতব্বরী করবেন, ওঁরা সইবেন কেন? শিবু বলেছিল—এটা ঘোরতর অন্যায়। স্কুলের নামে যত জমি আছে, সবই বাঁড়ুয্যেদের দান। এদিকে বদুদা স্কুলের নাম থেকেও শঙ্কর বাঁড়ুয্যের দাদুর নাম মুছে দিয়ে বসলেন। বললেন— সে হাইস্কুল তো আর নেই। এটা মালটিপারপাস স্কুল। সে স্কুল কবে কাগজপত্রে উঠে গেছে। এটা সম্পূর্ণ নতুন স্কুল। আমাদের জনসাধারণের সহাযতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত। তাছাড়া সে কোন প্রাচীন কালের ঘটনা। স্কুলের রেকর্ডপত্রে নামটা তো রইল। বুঝুন, মানুষ কী সর্বনেশে জীব! ইতিহাস বদলে দিতে চায়। তা কি হয়, না হয়েছে?....আমি ইতিহাসের মধ্যে জীবন কাটিয়ে এলাম। আমার কী মনে হয় জানেন? মানুষ কিংবা তারপরের জেনারেশন ঠিকই কবরের তলা থেকে, মাটির ভাঁজ থেকে ফসিলের হরফ পাঠ করে ফের সেই সত্যকার ইতিহাসকে প্রতিষ্ঠিত করে। আমি আপনি কতটুকু মশাই মহাকালের কাছে? আমরা সই, মহাকাল সয় না। ক্ষমা করে না। একদিন সুদসহ আদায় করে নেয়।....

কানুবাবুকে অভিনয়ের কণ্ঠস্বরে কথা বলতে শোনে উৎপল। মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর বলে—চলি তাহলে! আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে ভীষণ খুশী হলাম। সুশীলবাবুকে বলবেন আমার কথা।

কাউন্টারের দিকে গিয়ে দাঁড়ান কানুবাবু। খদ্দের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। মুহূর্তে ভুলে যান যেন উৎপলের অস্তিত্ব। উৎপল নেমে আসে। হাঁটতে থাকে। মনে পড়ে—পানটা রয়ে গেছে। খাওয়া হয় নি।

সামনে বটতলা। বারোয়ারী পুজামণ্ডপ। পিছনে দীঘি। দীঘির পাড়ে সীতু ডোমের বাড়ি। ঢালু পথ বেয়ে একটুখানি নামলে ময়রাপাড়া। একটু ইতস্ততঃ করে উৎপল ডোমপল্লীতে ঢুকে পড়ে। ভাঙাচোরা

দেয়াল, ধূসর খোড়ো চাল—ঝাঁঝরা হয়ে গেছে গত বর্ষায়। কোথাও তালপাতার গোঁজ দেওয়া। বিকেলের রোদে পিঠ দিয়ে মেয়েমদ্দ সকলে ঝুড়ি বুনছে। টোকা বুনছে। পাশে কাঁচাবাঁশের বাতা। কেউ বাতা চাঁছছে। উৎপলকে দেখে তারা হঠাৎ নামে। এক বুড়ো বলে—সীতের কাছে নাকিন গ? অ সীতে, সীতে রে! হুই দ্যাখ, তুর ঘরে অতিথ্ এসেছেন।

মেয়েরা ত্বরিতে মাথায় ঘোমটা দেয়। বুড়োর ইঙ্গিতে একটি কিশোর—অসম্ভব রোগা হাড্ডিসার শরীর, ছোট্ট একটা বাঁশের তৈরী আসন দেয় বসতে। বুড়ো বলে—অই! সীতেটা বুঝি গরল গিলে পড়ে রয়েছে গ। দাশু, বাপ্পোতের গা খামচে দে দিকিন। অই সীতে, সীতেনাথ! বাবুমশাই, বসুন আজ্ঞে।

এদের সরলতায় অভিভূত হয়ে বসে পড়ে উৎপল। আমড়াগাছে শেষবেলার লালচে রোদ পড়েছে। গুঁড়িতে হেলান দিয়ে সদ্যস্নাতা এক যুবতী এলোচুলে ঠকঠক করে কাঁপবার ভান করছিল। ভান-- কারণ, তার ঠোঁটের কোণে একটু হাসির ঝিকিমিকি, শরীরে কাঁপুনির চেয়ে যৌবনোচিত চাঞ্চল্যেরই প্রকাশ বেশী। স্বাস্থ্যের বিচারে যাই হোক, দেহটি তার হয়ত নিটোল বলা চলে না। কিন্তু ছিপছিপে শ্যামলা সুরূপা ডোম মেয়েটিকে নিটোল করে রাখতে চেয়েছে তার যৌবনের অহঙ্কার। সুন্দর ভাঁজগুলো ভেঙে ভেঙে অন্য কী গভীর নিটোলতার ছবি চোখের পর্দায় আঁকে সে। উৎপলকে সেদিকে চেয়ে থাকতে দেখে বুড়ো বলে—উটি তো সীতের বৌ গ বাবুমশাই। এত ডাকছি, কানে যায় কথাটো? অঃ, দেমাগ বটে!

সীতুর বৌ বলে—কী বল নাড়ুকা?

উৎপল অবাক। অতক্ষণ কী ভাবছিল? কী দেখছিল চোখে? বেশ অদ্ভুত মেয়ে তো!

নাড়ুডোম বলে—অই গ, মরেছে! বিটির দিষ্টিতে কি আঠামাখান আছে, এ্যাঁ? কে বসে আছেন, দেখছে না এটু?

সীতুর বৌ গ্রাহ্য করে না। –আমার কাছে তো আসেন নি বাবুমশাই। যার কাছে এসেছেন, তিনি এখন স্বগ্‌গে।

নাড়ু হা হা করে হাসে।—তুর কথার দিকদিশে নাই বাছা। অই বাবুমশাই, আপনি বরঞ্চ পরে আসে গ, বোঝালেন? ছোটোজেতের বাড়ি কি সাধে আসতে নাই? হুঁ হুঁ বাবা.....

উৎপল একটু অপমানিত বোধ করছিল। সীতুর বৌকে সে এর আগে দেখেনি। কিন্তু তার সম্পর্কে সব কথাই তো সীতুর বৌর জানা সম্ভব! সে একটু কেশে বলল—ঠিক আছে। ওকে বলো, বাঁড়ুয্যেবাড়ি গিয়ে আমার সাথে একবার যেন দেখা করে। বিশেষ দরকার। আজই। বলবে তো?

সীতুর বৌ অসম্ভব মাথা ঝুঁকিয়ে বলে—আচ্ছা, আচ্ছা। বলব গো বলব। অবেলায় জ্বর গায়ে জল করেছি—তাতে পান্তাভাত; শীতে কামড়ে কামড়ে খেতে লাগছে বাঘের মতন।

আসবার সময় সীতুর ঘরটা অনুমান করে সে একবার তাকায়। দেখে, বারান্দায় ধূলিধূসর দেহে উপুড় হয়ে সীতু পড়ে আছে। এবং ভিতরের ঘরে বিছানায় জামাপ্যান্ট পরা বাপীকেওযেন ঘুমোতে দেখল। বাপী এমনি করে এখানে ঘুমিয়ে থাকে এসে? তাহলে বুঝি আরতি বাড়ি নেই?

ময়রাপাড়ার পথে গেল না উৎপল। যে পথে এসেছিল, সেদিকেই চলল। পাড় থেকে নামবার মুখে যেন মাটি ফুঁড়ে গজাল সুশীল। একগাল হেসে সে বলে—এইমাত্র কানুদার কাছে শুনলাম আপনি এসেছিলেন। জিজ্ঞেস করতে করতে এদিকে খুঁজতে চলেছি। যাক্, দেখা হয়ে গেল।

উৎপল তার হাতটা ধরে হাঁটতে থাকে। বলে—অমরদার নিষেধ অগ্রাহ্য করে বেরিয়ে পড়েছি। ভেবেছিলুম, বের হলেই আপনার কর্তৃপক্ষের লোকজন ঝাঁপিয়ে পড়বে: দেখলুম—না, তেমনি কোন ভয়ের কারণ নেই।

সুশীল বলে—আপাতত সেটা বলা মুশ্‌কিল। কাল যাদের গায়ে আপনার লাঠির আঘাত লেগেছে, তারা যে সুযোগ খুঁজবে না—এ কথা হলপ করে বলা যায় না। বেরিয়ে ভুল করেছেন। যাক্ গে, চলুন।

উৎপল দাঁড়িয়ে পড়ে। বলে—সুশীলবাবু, কলকাতার অনেক গুণ্ডা আর তাদের দলবল এমনি করে আমাকে শাসিয়েছে। আজ অব্দি কেউ একবিন্দু ক্ষতি করতে পারে নি। কারণ কি জানেন? মনের

জোর বা নিজের উপর অসম্ভব বিশ্বাস। কারণ আমি নিজেকে খুব ভালবাসি বলেই নিজেকে ভালভাবেই চিনি। আর চিনি বলেই বুঝি—একে বিশ্বাস করলে ঠকব না।

সুশীল বলে—এটা অবশ্যি কলকাতা নয়, বাবলতলী। তাছাড়া মনের জোরও সবসময় ভালো কাজ করে না। যাক্‌গে, ও কথা শুনে কিছু মনে করবেন না। আমি যতক্ষণ সঙ্গে আছি....

উৎপল আহত হয়ে বলে—ঠিক অছে। দেখুন, এখনই আমি আরতির বাড়ি যেতে পারি কি না।

সুশীল হাসে।—তাহলে সেদিন অমন করে হার মেনে চলে এলেন কেন?

—আপনি কি আমাকে বাগে পেয়ে অপমান করছেন সুশীলবাবু?

সুশীলবাবু হো হো করে জোর হেসে ওকে জড়িয়ে ধরে দু'হাতে।—আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেল দেখছি। নাঃ, আপনি ভীষণ ছেলেমানুষ। চলুন, কোথায় যাবেন?

—আমার সঙ্গে গেলে আপনার চাকরি যাবে না তো?

—যাবার ব্যবস্থা তো আগেই করে এসেছেন দাদা। কানুদার কাছে আমার খোঁজ করেছেন। উৎপল গুম হয়ে হাঁটতে থাকে।

সুশীল বলে—না, তামাসা করছি। এখন খবর বলুন।

উৎপল বলে—আপনি আমার সঙ্গে যদি অভিনয় না করেন সুশীলবাবু, আপনাকে কিছু কথা আমার বলার আছে।

—অভিনয়! ছিঃ, আমি দুঃখিত দাদা। রিয়্যালি, আই অ্যাম হেল্‌পলেস।

কথা বলতে বলতে ওরা হাইওয়েতে এসে পড়ে। উৎপল সোজা হাঁটতে থাকে— যেমন করে একদিন অভয় পাগলার সঙ্গে অনেকদূর হেঁটে গিয়েছিল। সুশীল একবার পিছন ফিরে বলে—গায়ের কাপড় আনলাম না, বেশ শীত করছে কিন্তু। কদ্দুর যাবেন আর?

একটা ব্রীজের পাশে চত্বরে বসে পড়ে উৎপল। বলে—আরতির খবর রাখেন?

সুশীল বেশ কিছু সময় জবাব দেয় না কথাটার। নিবিষ্ট মনে সিগ্রেট টানে। সামনে পিছনে দু'পাশে হলুদ ধানের মাঠ। বিস্তৃত অসমতলে শেষ রোদের ঝিকিমিকি। বিলের দিকে বুনোহাঁস উড়ে চলেছে শনশন করে। মাথার উপর অবেলায় প্লেনের গুঞ্জন। দু'জনেই মুখ তুলে একবার দেখে নেয়। ফের চুপ করে থাকে। বাবলতলীর দিকে তাকায়। আসন্ন হিম রাত্রির কথা ভেবে যেন বাবলতলী ধূসরবর্ণের আলোয়ান জড়িয়ে নিচ্ছে গায়ে। লম্বা গাছগুলো দেখে মনে হচ্ছে, টুপিপরা ফকির—কাঁধে ঝুলি, হাতে যষ্টিখণ্ড। উৎপল আস্তে আস্তে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। হেমন্তের নিসর্গ তাকে এক বিচিত্র রিক্ততা বা শূন্যতার দিকে নিয়ে যেতে চাচ্ছিল। যেন কুয়াশার টুপিপরা বৃদ্ধ ফকির গাছগুলো পাতা ঝরে ঝরে আলাদা হয়ে যাচ্ছে পরস্পরের কাছ হতে। নিঃসঙ্গতার দিকে সর্বত্যাগী যাত্রা তাদের। আঙুল তুলে বলতে চায়—আয়, বেরিয়ে পড়ি। বেরিয়ে পড়ি বিষাদের দিকে, নির্জনতায়। অখণ্ড থেকে খণ্ডে পৌঁছে যাই।

মাঠে কোথাও কোন লোক নেই। ফসল কাটার সময় হয়ত আর দু'একদিনের মধ্যে শুরু হয়ে যাবে। গ্রামের পাশাপাশি জমিগুলো অবশ্য এখনই ফাঁকা হয়ে গেছে নিরন্ন কোন চাষার তাগিদে। সেখানে ভেজা মাটি, কাটা ধানের গোড়ায় আকণ্ঠ শিশির, হলুদ বিশীর্ণ কিছু ঘাস— যেন সদ্যপ্রসূতি চাষী মেয়ের মত শুয়ে আছে রোদে, অনেক যন্ত্রণার পর অনেক শান্তির আরাম তাদের স্যাঁতসেতে দেহে।

হাইওয়ের দু'পাশে ঝরাপাতার স্তূপ। পুঞ্জপুঞ্জ ঝরাপাতায় সমাধির শান্তি। বাতাস নেই। ঠাণ্ডা শান্ত ধূসর আকাশ পাখির ডিমের মতো নিটোল। পাখির ডিমের মত রঙ। পাখিরা সেই শান্ত নিঃঝুম নিঃসঙ্গতাময় আকাশে জীবনের অনন্ত ভালবাসাকে ছড়াতে ছড়াতে চলেছে ঘরের দিকে। এখন নামবে নীল অন্ধকারের রাত। ঝুঁলি খুলে নিয়ে বসবে বিবাগী ফকিরের দল। লাল-নীল-হলুদ পাথরের মালার মত নক্ষত্র। শোনা যাবে শুধু শীতে কাতর খেঁকশিয়ালের চিৎকার, শুধু কঁকিয়ে ওঠা লক্ষ্মীপেঁচার ডাক। আর কোন শব্দ নেই। আর কোনই শব্দই নেই যখন শেষ রাতে বিশীর্ণ বাবলাগাছের ডালে ঝুলন্ত চাঁদ—পাণ্ডুর তার আলোয় প্রতিফলিত একদা-জীবন্ময়-পৃথিবীর স্মৃতির মত, একটা অবাস্তব ব্যাপকতা—হলুদ মাঠের, ধূসর গ্রামের, সাপের খোলসের মত এই হাইওয়ের।

পৃথিবীর এ বিচিত্র অস্তিত্বের দিক, জীবনের এই নিসর্গ নির্জন হাতের মৃদুস্পর্শ কোনদিনই অনুভব করেনি উৎপল। আলো হল্লা উত্তেজনা মুখোস নির্লিপ্ততা ও করুণাহীন জীবনের বাইরে এর অস্তিত্ব আবহমানকাল ধরে টিকে আসছে পৃথিবীতে। সময় আজ এতদিনে যেন তার নিগূঢ় ঝাঁপি খুলেছে। দেখিয়ে দিয়েছে তার গোপন রত্ন। উৎপল বলে ওঠে ফের—সুশীলবাবু, আমার মনে আর দুঃখ নেই। কোন অপমানবোধ নেই। সব হিংসাদ্বেষের বাইরে আমি পৌঁছতে যাচ্ছি। আরতির খবর কী? ভাববেন, একটি অসহায় মেয়ের জন্যে বীরত্বপনা দেখাতে গিয়েছিলুম। কিংবা এখনও লজ্জা ভয় না মেনে এখানে পড়ে রইলাম। ভাববেন, আরতির জন্য কিছু করতে চাই। তাই নয়?

বাধা দিয়ে সুশীল বলে—মানুষ অবিশ্যি জানে না, কেন সে কী কাজ করে—এপথে না হেঁটে কেন ওপথে হাঁটে। আসলে যাই করে বা যে পথেই হাঁটে—লক্ষ্য তো একটাই। সেই লক্ষ্যটা কী সেকথাও বলা বড় মুশকিল। মানুষের লাইফ আমার কাছে একটা ভৌতিক ব্যাপার উৎপলবাবু। ওই যে আপনি বলছিলেন, নিজের সবটুকু জেনে ফেলেছেন, সেটা একটা মিথ্যে অহঙ্কার। শূন্যকুম্ভ বড় মিষ্টি সুরে বাজে। আপনি এর আগেও এসেছেন, এবারও এসেছিলেন—কিন্তু কেন এসেছিলেন হলফ করে বলতে পারেন? দিদি একটা উপলক্ষ্য মাত্র। নতুন জায়গার আনন্দ পাওয়া? সেও হয়ত উপলক্ষ্য। উৎপলবাবু, আমার মনে হয় কী জানেন—আমাদের সব কাজ ও সব ইচ্ছে-অনিচ্ছের আসল লক্ষ্য শান্তিকে কেন্দ্র করে। যদি বলেন, শান্তি কী—আমি বলতে পারব না মশাই। লেখাপড়ায় গোমুখ্য ছিলাম। তবে হ্যাঁ--ওইরকম একটা ব্যাপার যে নির্ঘাৎ আছে সেটা পদে পদে বুঝতে পারি— যেমন ঘুমন্ত জন্তুও মানুষের পায়ের শব্দ পায়। এ বুঝতে পারা আমাদের জন্মগত হয়ত। কেউ কেউ করে, কেউ করে না। আবার কেউ টেরও পায় না। বছরের পর বছর হাজার রকম শব্দ, হাজার রকম আলো, হাজার কথার ঝড়, লক্ষটা স্বপ্ন ইচ্ছে ভাবনা আনন্দ দুঃখ মানুষকে ক্রমশঃ ঘায়েল করে ফেলছে। ছোট পাত্রে বেশী জল চাপ দিয়ে ভরলে হয় ফাটবে নয় ওপচাবে। দেখুন না, আজ আমরা অবাকই হই না। এ ব্রহ্মজ্ঞান নয় মশাই, এ হচ্ছে স্রেফ কানে কালা চোখে কানা মানুষের ব্যাপার। আপনি কি সত্যিসত্যি কোনকিছু দেখে অবাক হন উৎপলবাবু?

উৎপল কিন্তু অবাক হয় সুশীলের কথা শুনে। ওর শীর্ণ রোগাটে শরীরের দিকে তাকায় নীরবে। মড়ার চামড়ার মত ওর মুখের রঙ, কোটরগত জ্বলজ্বলে চোখ, ভাঁজপড়া কপাল লক্ষ্য করে। কাঁধে কলারের কাছটা ছেঁড়া- – সেলাই করা। খদ্দরের সাদা ধুতি পাঞ্জবীটা যেন যথার্থই ভাঁড়ের পোশাক। সাবানে কাচা ইস্তিরিবিহীন ওই পোশাকে একটা উদ্যমী গরীব লোকের লক্ষণ অবশ্য আছে। পায়ের নেতিয়ে পড়া স্যাণ্ডেল হাঁটলেই বকলেসের চিৎকারে ওর একটা দুর্দমনীয় ইচ্ছাশক্তিকে যেন প্রতিবন্দ করে। বলে— দোহাই তোমাকে। ক্ষান্ত হও। কী চায় সুশীল? শুধু সামান্য চাকরী করে জীবনধারণ? দিদিমণিদের তোতাপাখির কণ্ঠে একটুখানি মিথ্যে সান্ত্বনা? উৎপল হঠাৎ বলে—আচ্ছা সুশীলবাবু, বাড়িতে আপনার কে আছে?

সুশীল হাসে।—কেন, এতদিন পরে হঠাৎ একথা?

—জানতে ইচ্ছে করে।

—আমার বাড়ি আপনাকে নিয়ে যাইনি একদিনও। কারণ, নিয়ে গিয়ে দেখানোর মত কিছু নেই আমার। পোড়ো ভিটে, খালি ঘর, উঠানে জঙ্গল। চামচিকে ইঁদুর আর আরশোলার রাজত্ব সেখানে। খোড়ো চালের বাতায় ঘুঘুর বাসা। একরাত্তির শুলে স্রেফ মমী হয়ে যাবেন। সারারাত ঘুণপোকার শব্দ। তক্তপোষ কাটছে, পৈতৃক আসবাবপত্র কাটছে, কপাটজানালা কাটছে। অথচ মনে হবে, ঠিক মাথার ভিতর শুনেছেন। মগজ কুরে কুরে খাচ্ছে। আঃ, বড্ড অশান্তি মশাই। না ঘুমিয়ে চোখমুখের কী দশা করেছি দেখুন না। আচ্ছা, বলুন তো আমার বয়স কত?

উৎপল একবার ওর শরীরে চোখ বুলিয়ে বলে—কত, বলা মুশকিল।

—মিথ্যে বলছিনে, গত আশ্বিনে আমি আটত্রিশ পেরিয়েছি।

—আপনাকে অবিশ্যি আরও অনেক বেশী বয়সের দেখায়।

— দেখায়। পোকার দাঁতে আমার আয়ু ক্রমশ ঝরে যাচ্ছে ঝুর ঝুর করে। নাকি একটা কাঠঠোকরা? দেখেছেন বাজপড়া গাছে কাঠঠোকরা পাখির কাণ্ড? অথচ আমি অন্যরকম চেয়েছিলাম। অন্যরকম

জীবন, অন্য পৃথিবী। ছেচল্লিশ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেছি। তার আগে থেকেই রাজনীতি করতাম। সাতচল্লিশে দেশভাগ হল, স্বাধীনতা এল। নেতারা বললেন, এখন শব আন্দোলনের মুখ ফেরাও। দেশ গঠনের কাজে লাগো। নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। একদিন দেখি, ওম্মা! আমার কাঁধে ভারী তন্ত্রী, শরীর অসম্ভব ক্লান্ত—আমার সব পরিশ্রম দশজনের স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে না। আমার সব রক্তের মূল্যে স্বাস্থ্যবান হয়েছে অন্য একজন। প্রশ্ন করলাম— কেন, কেন এমন হবে? এমন তো কথা ছিল না। আমার উপর প্রথম চাবুক পড়ল। সেদিন জানলাম—আসলে আমি কেনা গোলাম হয়ে গেছি কবে। আদর্শের ফাঁদ পেতে আমাকে শেকলে বাঁধা হয়েছে। তারপর মুখে পরিয়ে দেওয়া হয় মজার মুখোস। সেই ছিল রক্ষে। মুখোসটা সযত্নে আঁকড়ে রইলাম। মুখোসের নীচে মগজ কুরে খায় বিষপোকা। জ্বালা বড় কম নয় উৎপলবাবু। তবু ভাগ্য ভালো, আমার সংসারে আমি একা। দয়া করে অবিশ্যি একটা চাকরিও দেওয়া হল.....

উৎপল হঠাৎ বলে—আপনার এক অন্ধ জ্যাঠামশাইয়ের কথা শুনেছি। তাঁরা কোথায়?

—অশোকজ্যাঠা এখন এখানে আছেন। যাবেন কোথায়? এই স্কুলেরই হেডমাস্টার ছিলেন একসময়। চারটি ছেলে, একটি মেয়ে। মেয়েই বড়। আই এ পড়ছিল। পড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল।

— সে সব শুনেছি কানুবাবুর কাছে।

—তাই নাকি? আমি মশাই দমিনি। ফের সীমাকে কলেজে ভর্তি করে দিয়েছি। খরচপত্র দেখাশুনা আমাকেই করতে হয়। ছেলেগুলোও এখানে স্কুলে পড়ে। জ্যাঠার সংসার আমার ঘাড়ে পড়ে গেল। কী আর করা? মাসান্তে যা পাই, জেঠিমার হাতে তুলে দিই। আমার মশাই একটা প্রাণ, যা-তা করে চলে যায়।

—শিবনাথ আমাকে অবিশ্যি এসব কিছুই বলেনি।

—শিবু? সুশীল হেসে ওঠে। শিবু আমাকে এড়িয়ে চলে পারতপক্ষে। তাছাড়া আমার সবকিছু বাইরের কারুর জানবার কথা নয়। জ্যাঠামশাইয়ের সংসারের দায়িত্ব নিয়েছি—এ তো আর ঢাকঢোল বাজিয়ে প্রচার করার মত ব্যাপার নয়।

—আমাকে যে বললেন!

—বললাম, কারণ আপনি বাইরের লোক, একদিন চলে যাবেন।

— গেলেও কি ভাবছেন, আপনাকে আমি মহৎ লোক মনে করব? উৎপল কৌতুক করে।

সুশীল আরও জোরে হেসে ওঠে—না, আমি মহৎ লোক একথা আপনাকে জানাতে চাই নি। এবং পরক্ষণে মুখটা গম্ভীর হয় তার। ফের বলে—জমানো গ্যাস বের করে দিলাম দাদা। নইলে বাঁচব কী করে?

দু'জনে হাঁটতে থাকে। রোদ ফুরিয়ে গেছে। ধূসর বুনোপায়রার ডানার মত সন্ধ্যার ছায়া বাবলতলীর মাঠে। ট্রাক আসে পরপর কয়েকটা। বাস যায় শহরের দিকে। আলোর মালা পরে অন্ধকার বাবলতলী ঠাণ্ডা হয়ে হাসে। একসময় উৎপল বলে—আরতির কথাটা বললেন না?

সুশীল বলে—শুনেছি আরতি আজ বহরমপুর গেছে সকালে। ফিরেছে কিনা জানিনা। হয়ত শিবনাথের ব্যাপারেই উকিলের কাছে গেছে। যতীন গোমস্তা কড়া লোক। ছেলে জাহান্নামে গেলেও ভ্রূক্ষেপ করে না। ও বলে কি জানেন—শিবু, হয় আমি আগে চিতেয় উঠি, নয় তুই।

—আশ্চর্য! শিবনাথ তো তেমন ছেলে নয়?

সুশীল বলে—শিবনাথ প্রথম পক্ষের ছেলে। যতীন গোমস্তার প্রথম বৌ মারা গেলে দ্বিতীয়বার বিয়ে করে। শিবনাথ মা-মরা ছেলে। দুরন্ত বিচ্ছু ছিল, ভাবতেও পারবেন না। পাড়াজ্বালানে যাকে বলে। বহরমপুর কলেজে পড়তে গেল। সেখানেও হাজার বদনাম।...

—নারীঘটিত নয় তো?

সুশীল জিভ কাটে।—না, না। অন্যরকম। মারামারি গোলমাল বিশৃঙ্খলা।

—কিন্তু আমি তো একটুও টের পেলুম না। যে ক'দিন মিশলুম....

— পেলেন না সেকথা ঠিক। ও একেবারে বদলে গেছে কিছুদিন থেকে। একেবারে উল্টো।

— কেন?

—তা জানিনে মশাই। হয়ত আরতি...

পাশের দোকান থেকে সেই সময় কে ডেকেছে—সুশীল নাকি হে? তোমাকেই খুঁজছিলাম। শোন। সুশীল বলে—উৎপলবাবু এক মিনিট। আসছি।

নয়

অনেকক্ষণ সুশীলের জন্য একটু দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে উৎপল। সুশীলের দেখা নেই। দোকানের ভিতর ঢুকে গেছে, কিংবা অন্য কোথাও। উৎপল চারপাশে তাকায়—কেউ তাকে লক্ষ্য করছে কি? পরক্ষণে ভাবে—নিজেকে বড্ড বেশী বড় করে ফেলছে সে। দোকানে-দোকানে ব্যস্ততা, পথে পথে চলাফেরার চাঞ্চল্য—এখানে হাইওয়ের দু'পাশে নতুন গড়ে ওঠা বাজার। পিছনে ব্লক আপিস হাসপাতাল ইলেকট্রিক সাবস্টেশন। স্টাফ কোয়ার্টারগুলোর দিকে তাকালে হঠাৎ মনে হয় কলকাতারই শহরতলী। কো-অপারেটিভ ট্রেনিং সেণ্টারের সামনে লম্বা পার্ক। পার্কে ইউক্যালিপটাসের চারাগাছ। দেশী-বিদেশী বাসিন্দারা, প্রবাসী মেয়েরা ছেলেপুলের হাত ধরে হাঁটছে। স্যুট পরে এই ঠাণ্ডা সন্ধ্যায় কারা সব বসে আছে। এরা বাবলতলীর কেউ নয়। নাগরিক জীবনের স্বাদ বাবলতলীর মাটি খোদাই করা সুডৌল পাত্রে তাদের সামনে রাখা হয়েছে। উৎপল পারতপক্ষে এদিকে আসেনি। ভালো লাগেনি। সে এসেছিল গ্রাম দেখতে। সনাতন প্রাচীন ভারতবর্ষের গ্রাম। আগোছাল গাছপালা, এবড়ো খেবড়ো মাটির পথ, ডোবায় সবুজ শ্যাওলাভরা জলে হলুদ বাঁপাতা, আশ-শেওড়ার ঝোপ, শেয়ালের ডাক, বাঁশবনে জোনাকি, পুকুরের জলেহাঁসের ডাক ; পল্লীবধূদের ঠোঁটে দেখতে চেয়েছিল সাদা শঙ্খ। মন্দিরে ঘণ্টা, মসজিদে আজান। মাতৃ গাভীর হাম্বা রবে সনাতন পিতৃপুরুষের ভারতবর্ষ-হৃদয় বুঝি চঞ্চল হয়ে ওঠে বাছুরের মত।

কিছু আছে, কিছু নেই। সব মিলিয়ে সেই কৃস্টাল। হাজার-রঙা অদ্ভুত একটা বস্তুখণ্ড। সকল কালের রঙে রঙীন।

নাঃ, সুশীলের পাত্তা নেই। হঠাৎ সুশীলকে ফের ভণ্ড মনে হয় তার। মনে হয়, মতলববাজ কুকুর একটা। সে বুঝতে পারে না, কেন এ অহেতুক ঘৃণা। সুতরাং বিরক্তভাবে পা বাড়ায়।

স্কুলের কাছে আসতেই হঠাৎ একঝলক টর্চের আলো। চমকে ওঠে সে। হাত মুঠো করে। পরক্ষণে অমরদার কণ্ঠস্বর শোনে।—তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না। ধেৎ! তুমি কী হে?

উৎপল দু'হাতে আলো আড়াল করে বলে—আগে টর্চের সুইচ অফ করুন।

অমরবাবু বলেন—তোমাকে দেখছি।

—চলুন, ঘরে গিয়ে দেখবেন।

—পাগল একটা! দস্তুরমত পাগল!

দু'জনে গেট পেরিয়ে নিঃশব্দে প্রাঙ্গণে হাঁটতে থাকে। সিঁড়ির পাশে তপতীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় উৎকণ্ঠিত মুখে। জনান্তিকে একটা হেসে উৎপল জানাতে চায়—প্রজাপতি, আমি অক্ষতই আছি ভয় পেয়ো না।

ঘরে ঢুকে ধুপ করে বসে পড়েন অমরদা। বলেন—মরুক গে। বাঘটার কথা শোন। আজ জীবনের সর্বপ্রথম গুলি মিস্ করেছি। খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম কি না!

উৎপল তীব্রদৃষ্টে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে—অমরদা, সত্যি কি আপনি বাঘ দেখেছেন, না হ্যালুসিনেশন?

অমরদা লাফিয়ে ওঠেন—হ্যালুসিনেশন? ফাজিল কোথাকার। আমার চোখ আমাকে কোনদিন বঞ্চনা করে নি। আজও করে না, আমি বুঝতে পারি। ঘটনাটা শোন্। দেউড় বাঁশের জঙ্গলটাতো সেদিন দেখেছিস্। দুর্ভেদ্য কাঁটায় ভরা বাঁশবনের ভিতর যে একটা আলাদা রাজত্ব আছে, আগে জানতুম না। কারণ এদিক ওদিক ফাঁক-টাক দেখে আমরা ঢুকেছি। যেখানে কাঁটা-জঙ্গল বেশী, ঢুকিনি। আজ ঢুকেছিলুম। অবিশ্যি হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটুর কাছটা ছেঁদা হয়ে গেছে। একটা খাল আছে ওখানে। খালটা শুকনো। খাল দিয়ে এগোলে ওই ফাঁকটুকু পাওয়া যায়। প্রায় ঘণ্টাখানেক চেষ্টার পর ভিতরে পৌঁছে গেলুম। মাথার উপর চারপাশে কাঁটা-লতা আর কঞ্চির ঢাকনা। কোনমতে চিত হয়ে বা উপুড় হয়ে

থাকা চলে। সেখানে কী সব মজার কাণ্ড হয় শোন। খরগোস তিতির, বেজী, খটাশ, শেয়াল—সব রকমের ক্ষুদে জানোয়ার বা পাখির নিরাপদ আশ্রয়। রাজ্যের বিষ্ঠায় মাটি স্যাঁতেসেতে আর দুর্গন্ধ। কতক্ষণ পরে হঠাৎ আমার খেয়াল হল—আমি মানুষ! আরে তাইতো আমি মানুষ! আমার হাতে গুলি ভর্তি বন্দুক! ...অমরদা হঠাৎ চুপ করেন।

—তারপর?

—মাঝে মাঝে আমার ওইরকম হয়ে যায়। স্বপ্নের মধ্যে চলে যাই যেন—সেটা হ্যালুসিনেশন নয়। এ একরকমের অদ্ভুত সেনসেশন। অন্য একটা গভীর চেতনার কাজ শুরু হয়। নিজেকে মনে হয় এই জীবজগতের এক দলভ্রষ্ট শরীক। জানিস উৎপল, পশুপাখিদের মধ্যে যদি কেউ একবার মানুষের হাতের সংস্পর্শে বেশ কিছু সময় কাটিয়ে যায়, নিজের জগতে ফিরে গেলে তার আর ঠাঁই হয় না। সে তখন জাতভ্রষ্ট বোরেগী—ওই অভার মত—যার বৌ ম'লে লোকের অভাবে নিজেই পায়ে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে ফেলে দিয়েছিল নদীতে। সবাই দাঁড়িয়ে মজা দেখেছিল। তাই বলছিলুম, যে বাঘ মানুষের সংস্পর্শে একবার আসে, বারবার তাকে আসতে হয়—যতক্ষণ না মারা পড়ে। নিজেব জগতে তার ফেরার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়!...উৎপল, এ নিয়ম জীবজগতের কঠিন নিয়ম। মানুষেরও রেহাই নেই এর থেকে। আমি...আমি সেই দলভ্রষ্ট জাতনাশা বোরেগী।

তপতী চা আনে। দু'জনে চা খায় কিছুক্ষণ নিঃশব্দে। তপতী একটু দাঁড়িয়ে থেকেই চলে যায়। অমরদা ফের বলেন—মাঝে মাঝে আমি স্বপ্নে দেখি, পথে পড়ে আছি, পথেই আমার সংসার। কখনও দেখি গাছের ডালে বসে রয়েছি। কখনও মাঠে বা জঙ্গলে। দেহবিহীন আশ্চর্য এক চেতনাব সাহায্যে আমি সব দেখতে পাচ্ছি, জানছি। স্বপ্ন ভেঙে বিষণ্ণ হযে পডি। দূর ছাই, কী সব বিচ্ছিবি ব্যাপাব দেখলুম। বলবি—আজীবন জঙ্গলে থেকেছি। যৌবনে ট্রেঞ্চে থাকাব অভিজ্ঞতাও আছে। স্বপ্নে বুঝি সেই সব স্মৃতির কারসাজি।...উৎপল, যেটাকে কাবণ বলছি, সেটাই যে কার্য নয়, কে বলতে পাবে? শেষ অব্দি আমরা তো পথের। পথেব ধুলোর। ফুটপাতই আমাদেব শেষ আশ্রয়।

—বাঘের কথা বলুন।

—হ্যাঁ, যখন টের পেলুম, আমি বাঞ্চোত অমর বাঁড়ুয্যে—হাতে বন্দুক। গায়ে কাঁটা দিল। শিবশিব করে উঠল মগজ। বুকে হেঁটে আবো খানিক গিয়ে দেখি দিনদুপুবে গভীব বাত। অন্ধকাব। সাপেব খোলস।

—সাপের ভয় করল না আপনার?

—করছিল। কিন্তু বাঘ ছাড়া আমার কোন ভবিষ্যৎ দেখছিলুম না। আমাব সামনেব সবটা সময় জুড়ে সে শুয়ে আছে প্রকাণ্ড বুড়ো বাঘ—ডোরাকাটা শবীর। আমাব ভবিষ্যৎ স্বয়ং।

—তারপর?

—গুলি করলুম। আশ্চর্য, বাঘটা গর্জাল না। নিঃশব্দে অদৃশ্য হল। আঃ, জীবনে এই প্রথম হাব। আমাব মরতে ইচ্ছে করে।

খানিক পরে উৎপল বলে—আমি কী করব?

—তুই? অমরদা তাকিয়ে থাকেন ওর দিকে।

—আমি ফিরে যাই। হযত বাবা এসে পড়বেন। দিদি টেলিগ্রাম করে বসে আছেন।

—তাই নাকি? আমি অবিশ্যি তোকে মারামাবি করার জন্যে থাকতে বলিনি, উৎপল।

—সে আমি জানি।

—অমরদা চোখ বন্ধ করে এক হাতের মুঠোর পিঠে অন্য হাতের আঙুল বাজান। ঠোঁট দুটো ছুঁচলো হয়ে থাকে। কিছুক্ষণ নীরবতার পর হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে আসেন। যেন একটা কিছু পেয়ে গেছেন।—উৎপল, তুই যেন বলেছিলি, চাকরি চাই।

—বলেছিলুম।

—চাকরি করবি?

উৎপল হাসে—খবর আছে নাকি? এখানে নয় তো?

—এখানে হলে করবি নে?

উৎপল গা এলিয়ে বসে।—আমার তথাকথিক কোন অ্যাম্বিশ্যান নেই, সে তো জানেন। আমি কেরিয়ারিস্টদের ঘৃণা করি। তাহলে তো দু'বেলা টিউশনি জুটিয়ে হাজার রকম গাধার খাটুনি খেটে যাচ্ছেতাই করে ফেলতুম—আজকালকার ওই সব ইয়ংম্যানদের মত। তারপর একদিন হয়ত বসতুম একটা আলাদা ঘরে—হাতের কাছে টেলিফোন, পাশে সুন্দরী স্টেনো, দরজায় বেয়ারা—ছোট সায়েব। বাইরে যেতুম, মেয়ে নিয়ে ফষ্টিনষ্টি করতুম। মাঝরাতে মাতাল হয়ে ফিরে বলতুম—আঃ! (উৎপল দু'হাতে বুক চেপে ধরে) যন্ত্রণা, যন্ত্রণা ..জীবন অর্থহীন, উন্মূল, বিচ্ছিন্ন! স্নবারির আড়তে লিষ্টির খাতায় আরেকটা নাম ওরা জুড়ে দিত।

অমরদার করতালি।—বাঃ, হিয়ার হিয়ার!

—ওই লিমিটেশনেব প্রচণ্ডতায় বিস্ফোরণ ঘটে না। অসম্ভব। কারণ, অমরদা, আমার মনে হয় কী জানেন—আধুনিক সভ্যতা বলতে যা আমরা বুঝি, তার একটা মারাত্মক দিক হচ্ছে—সে মানুষের ভিতরের বিস্ফোরক শক্তিটাকে যেমন তিলে তিলে অন্য খাতে ক্ষয় করতে পারে, তেমনি মানুষের জীবনের ফ্রেমটাকেও গড়েছে ভীষণ মজবুত করে। শুনেছি, প্রথম এ্যাটম বোম তৈরীর সময় নাকি পাইল ঠাণ্ডা রাখতে মিশিসিপি-মেশৌরী নদীর এক মরশুমে যত জল বয়ে যায়, ততখানি জল দরকাব হয়েছিল। মানুয বুঝতে পারে, তার ফ্রেমেও এই অসম্ভব ঠাণ্ডা রাখার সযত্ন চেষ্টা। এবং বুঝতে পারে বলেই সে ছটফট করে। হাঁফায়। অথচ কিছু করার নেই। এই ফ্রেম গড়তে তার নিজের অবদান ও নিষ্ঠাও তো খুব কম নেই!

—তুই বেজায় ভাবিস-টাবিস্। ওসব বাদ দে। এখন বল, যদি চাকরি পাস্ এখানে, করবি কি না?

--কবব এই কারণে যে আমাকে প্রাণে বাঁচতে হবে তো। না, না, আদর্শ আমার নেই।

নেশা আছে?

--কে জানে কী। আমার সঙ্গে খাপ খায়, এমন কিছু পেলেই চলবে।

- -আদর্শ মানেই নেশা রে! কেউ মাতাল, কেউ নাবীসঙ্গ করে, কেউ পলিটিকাল, ফাঁসি যায় জেল খাটে—কেউ সাহিত্য করে, গান গায়, নাচে...সবই আসলে রক্তের নেশা। তোর রক্তের নেশাটা অবিশ্যি খানিকটা ইয়ে. .

—বিমূর্ত! উৎপল ফের হাসে।—কী চাকরি?

—ধর, আমি যদি এখানে একটা কিছু করি...ধব্ কোন ইণ্ডাস্ট্রিয়াল. কিংবা এগ্রিকালচারাল ফার্ম. .তার সঙ্গে একটা পোলট্রি...

—গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল!

—না রে, আমার একটা দিক তুই জানিস নে। যে কাজ মাথায় চাপে, শেষ না হওয়া অব্দি থামিনে। ভীষণ একরোখা। উৎপল, বাবলতলীতে অনেক মন্দ জিনিস যেমন ছিল, তেমনি ভাল জিনিস অনেক ছিল। হাইওয়ের পাশে যে নতুন বাবলতলী গড়ে উঠেছে, তার মধ্যেও অমনি ভালমন্দ গলাগলি থাকবেই। কিন্তু চিন্তা কর, এলাকার চারপাশের গ্রাম থেকে যারা শহরে পালিয়ে যাচ্ছে, তাদের জন্য একটা কিছু করা যায় কি না।

—ফের আদর্শ?

—ওটা কলা বেচতে গিয়ে রথ দেখার সামিল। কৃষিতে উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা নিয়ে একটা লেখা সম্প্রতি পড়েছিলুম। তখন থেকে মাথায় ঘুরছে কথাটা। তুই আমার সঙ্গে লাগবি? আমার রিসোর্স খুবই নগণ্য। জমিদারী গিয়ে যা পেয়েছিলুম আমরা সবই সুমির বিয়েতে, কিছু সংসার খরচে নিঃশেষ। কিছু সামান্য জমি ভাগচাষে দেওয়া আছে। বাবা বিষয়বুদ্ধিতে তেমন পাকা ছিলেন না। চিরদিন শিকার টিকার করেই জীবন কাটালেন। সেই সঙ্গে রাজ্যে খুনখারাবি, দাঙ্গা। মামলায় পূর্বপুরুষের সব সঞ্চয় নিঃশেষ। শুধু টিকে আছে নদীর ওদিকে ওই বিলজঙ্গলটা। অবিশ্যি সাত শরীকের জায়গা। আমাদের ভাগে আছে কয়েকটা নামে পঞ্চাশ একরের মত। আইনের ফাঁকে বাবা ওই কম্মটি করে রেখেছেন। ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন তুলিস নে ভাই। বাঁচবার জন্যে এ-ছাড়া উপায় ছিল না। তাছাড়া, ওই পোড়ো জমি থেকে খড় ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। বাঁধ দিলে পর্যাপ্ত ফসল পাওয়া যায়। বুঝছিস তো

সাত শরিকের চৌদ্দ রকম মত। ভয় হয়, কতদিন ঠেকিয়ে রাখা যাবে এমনি করে! সরকার দখল করে নিতে পারেন যে কোন মুহূর্তে। সরজমিন তদন্ত হলেই দেখা যাবে—ওখানে চৈতালী ফসল ফলে না, ফলে বাঘ শুয়োর খরগোস আর সাপ।...হ্যাঁ, খুঁচিয়ে দেবার লোকের অভাব নেই। আর আজকাল তো চাষাভুষোরাও পলিটিকস্ বলতে অজ্ঞান। কল্পনা কর, দিল্লীতে এয়ারকণ্ডিশনড্ ঘরে বসে ঠিক করা হল, বদুবাবু আর আমি পরস্পরকে ছুরি মারব কি না!...নাঃ, এ পোড়ো জমির ব্যাপারে আমাদের সব পক্ষের একটা নাড়ির মিল আছে। তদন্তের গন্ধ পেলেই আমরা চাঁদা তুলে ঠেকাই। অথচ চাঁদা তুলে একটা বাঁধ দিতে পারি নে। শমন নিকটে না দেখলে তো কেউ ওষুধের কথা ভাবে না! গ্রামের মানুষ ঠিক এই ধাতুতে গড়া।...উৎপল, আমার দুই হাতই অকেজো; কারণ সেখানে বন্দুক। অন্য একটা হাত বড় দরকার ছিল। তুই কি সঙ্গে থাকবি?

—তারপর?

—তারপর? ধর্, পোড়ো জমি বেচে দিলুম। হাইওয়ের ধারে একটা কারখানা খুললুম। সেখানে হাড়ের সার তৈরী হবে।

—আমি কী হবো? ম্যানেজার? রাজ্যের মরা জানোয়ারের হাড়ের পাহাড়ে চূড়ামণি। দিগ্বিজয়ী লুঠেরা চেঙ্গিস!

—তামাসা নয়। নে, কাগজকলম নিয়ে স্কীম ছকে ফেল্। একদিকে আয়, অন্যদিকে ব্যয় লেখ্। একটা বাজেট গোছের আর কী! আগে ব্যয়...দাঁড়াও, প্রসেসিং এর একটা স্কীম আছে, দেখি।

অমরদা উঠে গিয়ে আলমারি খুলে একটা বুকলেট নিয়ে আসেন। দু'জনে ঝুঁকে পড়ে টেবিলে। উৎপলের গা ঘুলিয়ে হাসি আসছিল। সে প্রচণ্ড শক্তিতে সেটা প্রতিরোধ করছিল। একসময় তপতী এসে বাঁচাল।

—খেয়ে যাবে না কী? সব ঠাণ্ডায় জমে গেল যে!

খুব বাঁচাল তপতী! সুতরাং তদ্দণ্ডে গিয়ে আহার। প্রত্যাবর্তন। ফের মধ্যরাত্রি অব্দি স্কীমেব লেখাজোখা। উৎপল হাই তুলে হাত মোচড়ায়। অমরদা বলেন—ঘুম পাচ্ছে। ঠিক আছে। সকালে ফের বসব।

—কেন? বাঘ মারতে যাবেন না?

—না।

—আমি...আমি কী করব? বাবা এসে পড়বেন নিশ্চয়...

অমরদার মুখটা হঠাৎ অসম্ভব শক্ত আর ফ্যাকাসে দেখায়। দু'চোখ সাদা হয়ে আসে। তারপর আস্তে আস্তে বলেন—ও। আচ্ছা...

'আচ্ছা' শব্দটা গলার ভিতর, পাহাড়ের চূড়া থেকে অতলের দিকে খাঁজে খাঁজে গড়িয়ে পড়াব মত মিলিয়ে যায়। পিছু ফিরে অমরদা দরজার দিকে হাঁটেন। দুটো হাত পিছনে পরস্পরকে ধরেছে শক্তভাবে। দরজা খুলে বেরিয়ে যান। অভ্যাসমত বন্ধ করতে ভোলেন যেন।

উৎপল মুখ ফিরিয়ে নেয়। দুটো হাতে মাথা চেপে ধরে টেবিলে বাখে। সারা শরীর জুড়ে এক অব্যক্ত যন্ত্রণা পেঁচিয়ে ওঠে বাইরের নীলাভ কুয়াশার মত। অমরদার মুখ, 'আচ্ছা' বলে চলে যাওয়া, কবাট বন্ধ করতে ভোলা—এসবের মধ্যে একটা গভীর কাতর আঘাত ছিল। গত ক'দিনের তীব্র ঘটনাপুঞ্জ অলক্ষ্যে গোপনে সঞ্চিত করছিল অপমানবোধ ও প্রত্যাখ্যানের প্রচন্ড বেদনা। ওই আঘাতে যেন এই বেদনার দরজা খুলে যায়। চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ে। গাল ভেসে যায় উৎপলের। বাবার উদ্দেশ্যে বলতে চায়—কেন আমাকে এ পৃথিবীতে এনেছিলে? আমি খুবই অসহায়। খুবই দিশেহারা। এখানে যা দেখি, তা বুঝতে পারি নে। খেলার বয়স ফুরিয়ে গেছে টের পাইনে। খেলনা ভাঙতে হাত ওঠাই। হাতে আমার বারুদের গন্ধ এসে লাগে। কানে বিস্ফোরণের শব্দ শুনি।...

শেষ রাতে জানালা খোলে সে। দেখে বিলের আকাশে ক্ষয়ের চাঁদ। অন্ধকারের হৃদয় যেন ঘোরতর অসুখের স্রোতে দূরের দিকে অপসৃয়মান। ধীরে গলে পড়ছে শিশিরের মত। জলেস্থলে আকাশে একাকার সেই হৃদয়স্রাব। আর শেষ-কার্তিকের শেষ রাতের নিঃসঙ্গ কোন পাখি সেই আর্তিকে প্রকাশ করে চলেছে—ট্টি...ট্টি...ট্টি! ট্টি...ট্টি...ট্টি।...

শেষ রাতে কখন ঘুমের আচ্ছন্নতা এসেছিল চোখে। সেই আচ্ছন্নতার মধ্যে বুঝি বা স্বপ্ন দেখল উৎপল। বাবাকে দেখল। অবিশ্বাস্য সবল স্বাস্থ্যবান বাবা। চারপাশে রেলগাড়ির মধ্যে বাবা হেঁটে আসছেন। ছুটন্ত রেলগাড়ি থেকে বাবার হাত ধরে ওঠার ব্যর্থ চেষ্টায় উৎপল অস্থির। উৎপল চেঁচিয়ে বলল—কেন আমাকে এনেছিলেন?

—তুমি এসেছিলে। বাবা মানুষের ভিড়ে হাঁটছেন। নাগাল পাচ্ছেন না।

—মেরে ফেলেন নি কেন?

—পারি নি। খুনের দায়ে পড়তুম বলে না, তোমার মধ্যে আমার প্রতিবিম্ব ছিল।

—আপনি নিষ্ঠুর!

—প্রতিবিম্ব কে ভাঙতে পারে? সাধ্য কার? বেঁচে থাকার মূল্য তো এইটাই।

—আমি কী করব?

—তুমিও প্রতিবিম্ব দেখতে প্রস্তুত হও।

হয়ত সবটা স্বপ্ন নয়—আচ্ছন্নতার মধ্যে নিজের সঙ্গে নিজেই অনর্গল কথা বলছিল। কারণ, দেখল তার চোখ খোলা, চিৎ হয়ে সে শুয়েছে। চেতনায় পরবর্তী প্রশ্নও প্রস্তুত। প্রশ্নটা তাকে বিস্মিত করছিল। সে বিড়বিড় করে উচ্চারণ করল সেটা ঃ যদি তার আগেই আমি...গা শিউরে উঠল। কেন? ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকল কিছুক্ষণ। গরমে গা ঘামছিল। লেপটা নামিয়ে দিল পায়ের দিকে। সে ফিসফিস করল—কেন, কেন মরব?

বাবা যদি আসেন, তাকে নিয়ে যাবেন সঙ্গে করে। বলবেন—সতুবাবুকে তোর কথা বলেছিলুম। কিছুদিনের মধ্যেই চাকরিটা হয়ে যাবে। ....তারপর? দশটা-পাঁচটা ভিড়ে ট্রামবাসে ঝুলতে ঝুলতে মৃত্যু ও জীবনের মধ্যেকার সূক্ষ্ম সুতোয় সার্কাসের মতো ব্যালেন্সের খেল দেখিয়ে দোতলা-তিনতলা বা চারতলা-দশতলায় ওঠা-নামা। ছোট সায়েব-বড় সায়েব। ফাইল। রসিকতা। বারোটা বাজতেই নীচের ফুটপাতে শকুনের মত এক দঙ্গল টিফিনরত মানুষের মধ্যে কলা-পাউরুটি চিবানো।....তারপর? বাবাকে লালন-পালন। কর্তব্য। দায়িত্ববোধ। শ্মশানব্যবস্থা। হয়ত নিঃসঙ্গতার দুঃখ ভুলতে বিবাহ। সন্তান। প্রতিবিম্ব দর্শন। বিশ্বরূপ।

—কেন?

—তাহলে মরে যাও।

—কেন?

—তাহলে আগুন জ্বালো, চুরমার করো, ভেঙে ফেল পৃথিবীকে।

—তাই বা কেন?

—তারপর নতুন পৃথিবীকে জীবনের নতুন মানে খুঁজে পেতে পারো।

—মানে খুঁজে পেলেই আমি সুখী হবো?

—হতে পারো।

– বাজে বলোনা। মানে যথেষ্ট খুঁজে পাওয়া গেছে। জানতে কিছু বাকি নেই। আমার চোখে হাজার বছরের অভিজ্ঞ দৃষ্টি। মানে মিললেই সুখী হওয়া যায় না। জীবনের সবকিছু জেনেছি বলেই তো যন্ত্রণা। জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে মানুষ অভিশপ্ত।

—তাহলে মরে যাও।

—ভয় পাই।

—তাহলে.....তাহলে জানোয়ারের মত বাঁচো। শয়তানের হাত ধরো। মাতাল হও, নারীসঙ্গম করো। সব প্রবৃত্তি দ্বিধাহীনভাবে মেটাতে থাকো। প্রচণ্ড উত্তেজনায় ছড়িয়ে থাকো পাপের রাজ্যে। টাকার দরকার? চোরা কারবার করো। পকেট মারো। জালিয়াতি করো। পারবে না ফ্রেমের বাইরে যেতে?

উঠে বসে উৎপল। জলতেষ্টায় বুকটা খুবই শুকনো লাগে। মাথার কাছ থেকে জলের গ্লাস নিয়ে ভীষণ ঠাণ্ডা জল খায় ঢকঢক করে। সিগ্রেট জ্বালে। ধুঁয়োয় ঘর ভরে যায়। বাবা খুব সম্ভব আজই এসে পড়বেন। সে যাবে না। কোন মতেই যাবে না। সুশীলকে বলবে—কাজ দিন। সেদিন তো দেখেছেন,

এ বাঙ্গাল হাতের কব্জিতে সবকিছুই সম্ভব।....তারপর সীতুর কাছে গিয়ে মদ খেতে থাকবে। গণিকাপল্লীতে যাবে। শেষে বরাতে থাকলে নিজেই একটা কনসার্নের মালিক হয়ে যেতে পারে। বসবে ঘর বানিয়ে হাইওয়ের ধারে। সারা ভারতবর্ষের সব শহরের যোগাযোগ যেখানে দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। আর তপতী....আহা প্রজাপতি, তোমার ডানার রঙ আঙুলে ভীষণভাবে মাখতে আর একটুও কষ্ট হবে না আমার।

উৎপল নামে বিছানা থেকে। সুইচ টিপে আলো জ্বালে। ব্যাগটা নামিয়ে নেয় আলনা থেকে। সোয়েটার বের করে পরে নেয়। আন্ডার প্যান্ট ঢেকে ক্ষিপ্রহাতে টেবিল থেকে প্যান্টটা নিয়ে পরে। পকেট থেকে চিরুনি টানে। চুল আঁচড়ায় আয়নার সামনে। নিজের দিকে তাকিয়ে একবার হাসে সে। খুবই ভদ্র দেখাচ্ছে কি চেহারাটা?

এবং সেই সময় বাইরে কয়েকটি মেয়েলী গলাব আর্ত চিৎকার হেমন্তের নীলাভ ভোরের ঠান্ডা আকাশকে—সারা বাড়িটাকে ঘিবে ফেলেছে হঠাৎ। পা বাড়াতেই দবজায় ঝাঁপিয়ে এসেছে তপতী। উৎপলের বুকে লাফিয়ে পডবাব মত নুয়ে দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছে। —আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে উৎপলদা।

উৎপল ওকে সোজা করে ধরে বলে—কী হয়েছে তপতী?

তপতী দরজা আঁকড়ে ধরে ককিয়ে ওঠে—দাদা... দাদা ওঘরে মরে গেছেন।

উৎপল লাফ দিয়ে বেরিয়ে যায়।

তারপর দেখে অমরবাবুকে। ভয়ঙ্কর ফোলা মুখ, ঠিকরানো চোখ, লম্বা জিভ। দুটি হাত দু'পাশে ঝুলছে। গলায় মাফলার আটকানো। কড়িকাঠের সঙ্গে সেটা বাঁধা। পায়ের খুব কাছেই ওল্টানো চেয়াব। রক্তের ফোঁটায় পাযের নিচে মেঝেটা ভর্তি। নাক দিয়ে ঝরছে। নাকেব ফুটোয় চাপ বেঁধে কালো রক্ত। বন্দুক থাকতে....ধ্যাৎ। কোন মানে হয় না, কোন মানে হয় না!

আরো একটু এগিয়ে সে দেখে রক্তের সঙ্গে একরাশ পায়খানা। প্যান্টের পিছনে, পা অব্দি গড়িয়ে পড়েছে। দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে।

তাহলে কি শেষ মুহূর্তেও জীবনের সেই পরম বন্ধু ঈশ্বরের মত নেপথ্যচারী—মমতার মুখোশ পরে যে থাকে, সেই ভয় এসে তাঁর হাত ধরেছিল? বলেছিল—করুণা করো, করুণা করো?

উৎপল কাঁধেব ঝোলা ফেলে দেয়। পাগলেব মত চিৎকার করে—সরে যাও, সরে যাও সব। আমাকে নামিয়ে আনতে দাও। তারপর হিংস্র ভয়ঙ্কর এক বাক্ষসেব মত দু'হাতে দেহটা তুলে ধবে মাফলার খুলে ফেলে। প্রচন্ড শক্তিতে শূন্যে ভাসিয়ে লাফ দিয়ে নামে টেবিল থেকে। ভারে হাঁটু দুমড়ে বসে পড়তে বাধ্য হয় সে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বিপন্ন আহত নিরস্ত্র কর্ণ যেমন করে মাটিতে বসে যাওয়া রথের চাকা ধরে তুলতে চেষ্টা করছিলেন, তেমনি করে ওই দেহটা তুলে ধরার চেষ্টা করে উৎপল।

দশ

আকাশের রঙ এখন হট্টিটি পাখির ডিমের মত ধূসর—কোথাও বেগুনীরঙের ছিটে। দলে দলে বুনোহাঁস উড়ে চলেছে বাবলতলীর বিলের দিকে। মাঠে মাঠে ধান কাটার ব্যস্ততা। নবান্ন হয়ে গেছে। তরুণ সংঘ প্রথামত থিয়েটার করেছিল। খুব বেশি একটা হয়নি দর্শক। শিবনাথের সমর্থক পরিবারগুলো তো আসেই নি। কেবল আমন্ত্রিত কিছু হাইওয়ের ওদিক থেকে, কিছু বাজারপাড়ার, কিছু চাষাভুষো সাধারণ। তারাও শীতের মধ্যে বেশিক্ষণ টিকতে পারেনি। বেশ শীত পড়ে গেল হঠাৎ। উত্তুরে বাতাস এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল ক'দিন থেকে। পঞ্চপান্ডব এবার নিজেরা এসে কনসার্ট বাজিয়ে গেছেন। তবু সাড়া পড়েনি। সুশীল বলছিল—এতেই বোঝা যায়, শিবু কী দারুণ পপুলার ছিল তলে তলে।

সে রাতে আরও কিছু মারাত্মক ব্যাপার ঘটে যায়। হাইওয়ের ধারে যেখানে নতুন বাজার বসছে, লোকে বলে নয়াপট্টি, একটা চায়ের দোকানে বেশ গন্ডগোল হয়ে গেছে। রীতিমত বোমা ফাটানো, ছুরি চালাচালি। সবে একটা অবাঙালী ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের ব্রাঞ্চ খোলা হয়েছে—তাদের দূরগামী লরিগুলোর বিশ্রাম ও আড্ডা। এক পাঞ্জাবী ড্রাইভার নাকি তরোয়ালও বের করেছিল। বাঙালী-অবাঙালী

দ্বন্দ্ব কিছুটা। তবে কাঠগোলার ফেলুবাবু আবার অবাঙলীদের কড়া সমর্থক। ফেলুবাবুও বাবলতলীর প্রাক্তন জমিদারদের অন্যতম বংশধর। হাইওয়ের দু'পাশে অনেক পোড়ো জায়গার মালিক। সব জমি তিনগুণ দামে বেচে আজকাল লাখপতি লোক। সুশীল ছড়ার সুরে বলছিল—বদুবাবুরা গেলেন, ফেলুবাবুরা এলেন।

গন্ডগোলের চেহারা যাই হোক্, বাবলতলীতে গা সওয়া। ইটভাটা এবং চালকলের মজুরণীবা যে পাড়ায় বাস করে, গণিকাপল্লী বলতে লোকে সেইটাই বোঝে। প্রাচীনকালে ওখান থেকেই মেলার মরশুমে ঝুমুরওয়ালীরা গজাত। সঙ্গে হারমোনিয়াম মাস্টার তবলচী বা খলিফা আর একজন মাসী। আজকাল ঝুমুরের পসার কমে গেছে। সুতরাং মাটিতে শিকড় গজিয়ে বৃক্ষবৎ বাঁচা। ফুল ফোটাও, ফল ধরাও—রসিকের অভাব হবে না। গন্ডগোল এখানেও হয়। বিশেষ করে গ্রীষ্মকালের সন্ধ্যাগুলোতে। অজস্র ফেনিয়ে ওঠা তালরসের কুম্ভ ফাটে। ফের মধ্যরাত্রে কেউ আলো-আঁধারিতে শুয়ে কেঁদে গান করে--মেরেছ কলসীর কানা, তা বলে কী প্রেম দেবনা...

এখন শীত। তায় অজস্র লোকের হাতে টাকা। চড়া দরে ফসল বেচা গেরস্থ হাতেই হোক, বা বাণিজ্যের লক্ষ্মী—দুলালদের হাতেই হোক, টাকার দাম সমান। ফেলুবাবুদের দৌলতে সকলে রাম চিনেছে, হুইস্কি চিনেছে, বীয়ার চিনেছে। ছেলেছোকরা চোঙা প্যান্ট আর উস্কোখুস্কো চুল নিয়ে চায়ের দোকানে আড্ডা মারতে শিখেছে। কদাচিৎ সন্ধ্যারাত্রে পিছনের ঘুপটি ঘরে বা পুকুরপাড়ে ঘাসে বসে চুমুক মারে। কেউ দেবদাস হয়ে ককিয়ে বলে—আর কতদূর?

এ সবই সুশীলকথিত ভাষ্য।

আছে, আছে! তাহলে বাবলতলীর বৃদ্ধ বটের কোটরে আরেক সুড়ঙ্গ আছে। যার চোখ আছে, সেই দেখে—অন্যে নয়। এ সুড়ঙ্গে নেমে গেলে নবকালের পাতালপুরী।

ওখানে স্কুলবাড়ির এলাকা থেকে প্রাচীন দীঘির পাশে ময়রাপাড়া অব্দি পুরাকালের ইন্দ্রপুরী। ধ্বসে পড়ছে ক্রমশ। পাঁচিল ফাটছে। দেউড়ি ভাঙছে। ম্যাগনোলিয়া শুকিয়ে আসছে। তাই তার পাতায় এসে অশ্রুপাত করে যায় মধ্যরাতে বাবলতলীর প্রাচীন বাঘ। জয়ারা দেখে। মানকু হাড়াম দেখে। মাঠচরাণী শৈল দেখতে পায়। কাপড়কাচুনে মেয়ের পিঠে পৃষ্ঠক্ষত গজায়।

আর সেই বিষণ্ণ বুড়ো বাঘের পিছনে ঘুরে ক্লান্ত কোন ছোটবাবু ফসলের মাঠের স্বপ্ন অসম্ভব জেনে একটা কড়িকাঠ থেকে শূন্যে ঝাঁপ দেন।

দীপ্তিই বলে একদিন—জয়া, দেখ, দেখ!

জয়া সবে স্নান করেছে। পরেছে ফিকে হলুদ রঙের শাড়ি, লালচে জংলা ব্লাউস। পিঠে উপচে পড়েছে ভেজা চুল। ঘরভরা ছুটেছে অডিকোলনের গন্ধ। জানালার পাশে এসে সে বলেছে—তাহলে দেখলি এতদিনে!

—দেখলাম। ভারী অদ্ভুত তো! দীপ্তি বলে। —এ্যাদ্দিন কানেই শুনতাম, বিশ্বাস করিনি।

সেই কনডিশনড্ রিফ্লেক্স'এর পাভলভী তত্ত্ব দীপ্তির প্রশ্নপত্রে থাকতে নেই। তবু বেশ আশ্চর্য লাগে ভাবতে।

—আমিও কি তাই? সবই অভ্যাস শুধু? দীপ্তি ভয়ে-উৎকণ্ঠায় ভেবেছে। গা শিরশির করে ভিতরে জুটে গেছে এক ডাউন ট্রেনের ঠান্ডা শিস্—আগামী কালের এক রেলগাড়ি। প্লাটফরমে যেদিন অপেক্ষা করবে একজন—হাতে তার একগুচ্ছ রজনীগন্ধা কি একটি পাতার করতলঘেরা প্রদীপের মত রক্তগোলাপ—জীবনবীমার প্রতীকটার মত; দীপ্তির জীবনদীপ্তির নিরাপত্তা।

—আমিও কি? তাই? অভ্যাসের বশে তরুণের আশা করছি, তাকে ভালবাসছি? বারবার ভেবেছি দীপ্তি। ঘণ্টা শুনলে কুকুরের নোলায় জল ঝরানো। আর বিদ্যুৎ স্যার বিলক্ষণ কবিতা বোঝেন? বিষ্ণু দে'র শুনিয়েছেন ঃ

অভ্যাস, শুধু অভ্যাস
লিলি তাইত আসি
অভ্যাস, শুধু অভ্যাস
ভালো তাইত বাসি।

স্কুলের ঘন্টা বেজেছে বারোটার বারোবার। এখনই জানালায় দাঁড়ালে দেখা যায় ম্যাগনোলিয়ার ঝোপের আড়ালে চুপিচুপি পাঁচিলের সমান্তরাল হেঁটে আসে দুটিতে। ওপাশে বাগান পেরিয়ে শুকনো পাতার মৃদু শব্দ তুলে আসে। কুকুর ডাকে একবার। কখনও ডাকে না। ওরাও দীপ্তির মত অবাক হতে জানে।

গেটের বাঁ পাশে মস্ত ফোঁকর পাঁচিলে। মাধবীলতার কুঞ্জে ঢাকা। দুটিতে গলিয়ে যায় নিঃশব্দে। আগাছাভর্তি প্রাঙ্গনের এককোণে বঙ্গদেশের মিহি বাঁশের ছোট্ট একগুচ্ছ ঝোপ। সামনে একটুকরো বেদী। কলাপাতায় অন্ন। মাটির পাত্রে জল। গলাগলি খেয়ে যায় দুটি বনচর। এ বাড়ির ছোটবাবু বলতেন—মানুষের সংস্পর্শে যে জানোয়ার একবার এসেছে, বারবার তাকে আসতে হয়—যতক্ষণ না মারা পড়ে।

ঘন্টা বাজলেই আসে। গেট বন্ধ থাকে। বাড়ির লোকেরা অন্দরে অবস্থান করে। ভুলেও সে সময় এদিকে পা বাড়ায় না। জানালায় বসে বুড়ো বাঁড়ুয্যে দেখেন। প্রণাম করেন করযোড়ে একটিবার। ওরা চলে যায়। অন্য কিছু নয়—নিতান্ত দুটো শেয়াল।

—কিন্তু সত্যি কি ওরা খেতে আসে? দীপ্তির প্রশ্ন।

জয়া বলে—শুনেছি, তপতী বলেছে। অমরবাবু বলতেন। গ্রামের সবাই জানে। বিশ্বাসও করে।

—অভ্যাস! হঠাৎ দীর্ঘশ্বাসে ভরা মন্তব্য দীপ্তির।

জয়া বলে—এবার কিন্তু মারা পড়বে ওরা। দীপ্তি চমকে ওঠে—কেন?

—অমরবাবু বলেছিলেন। জয়া আলনা থেকে ব্রেসিয়ারটা টেনে নিয়ে অকারণ ভাঁজ করতে থাকে।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। ফের জয়া মুখ তুলে বলে—সিনেমা যাবি?

দীপ্তি অস্ফুট হাসে—বহরমপুরে?

—হ্যাঁ

—ভালো লাগে না।

—চল্। ভালো লাগবে।

—এক্ষুনি?

জয়া দেয়াল থেকে হাত বাড়িয়ে রিস্টাওয়াচটা নামায়। দেখে বলে একঘন্টা পরে বেরোলেও চলবে। আধঘন্টার জার্নি মাত্র। খেয়াপারে মিনিট দশেক। তারপর পৌঁছে গেলাম।

—ফিরব কিসে?

জয়া কপালে চোখ তোলে— কেন, বাসে! হাইওয়েতে বাস এগারোটা অব্দি চলে।

—আমরা দু'জনে?

—সঙ্গী চাই আরো? জয়ার চোখে হাসি টলমল করে।

—পেলে মন্দ কী! দীপ্তি গা করে না কৌতুককে।

—বল্ কাকে চাই, কেমন চাই। আমি কিন্তু স্ত্রীলিঙ্গ বলিনি, টেক কেয়ার। পুংলিঙ্গে সঙ্গী হয়।

দীপ্তি কটাক্ষ ক্রোধে। —সব তুমিই ভালো বোঝো আমার চেয়ে।

—পাগল! আমি কোথায় আছি রে!

কথাটা হুট করে থেমে গেছে। জানালায় তপতীর উদয়? জয়া বলে—দরজায় কি কাঁটা দিয়ে রেখেছি তপতী? ওই ঘাসের মধ্যে কেন?

তপতীর চেহারাটা ভীষণ বদলে গেছে। উস্কোখুস্কো চুল, শুকনো মুখ, চোখের নীচেটা কালচে—শাড়িটাও বিশৃঙ্খল। যেন পরিবারের শোকের ঝড় সবটাই তার উপর দিয়ে বয়ে গেছে। সে একটু হাসে। বলে—অনেকদিন আপনাদের দেখিনি। তা দেখতে এলুম জয়াদি। কেমন আছেন? দীপ্তিদি, ভালো আছেন? আপনারা আমাদের বাড়ি যাবেন না, জানি। কিন্তু....

জয়া একটু ধমক দিয়ে বলে—এদিকে না এলে গিয়ে ধরে নিয়ে আসব। দীপ্তি শুধু তাকিয়ে আছে তপতীর দিকে।

তপতী বলে—তারপর সেক্রেটারীকে বলে থানায় চালান দেবেন।

জয়া স্তম্ভিত হয়। —তপতী! কী বলছো তুমি?

—বলচি, বাঁড়ুয্যেদের স্কুলের মাটিতে আজকাল বাঁড়ুয্যে বাড়ির মেয়েদের হিসেব করে পা ফেলতে হয়। আমাদের ভাগ্যের কথাই বলছি, জয়াদি।

জয়া দুঃখিত স্বরে বলে—এই কথা নিয়ে কি আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে এসেছ তপতী?

—ঝগড়া? তপতী বলে। —ছিঃ, কী যে বলেন!

দীপ্তি মুখ তুলে বলে—তোমার সঙ্গে আমার দেখা করার একটু দরকার ছিল, তপতী। এসেছ, ভালই হয়েছে। আসবে না ভেতরে?

—নাঃ! তপতীর ঠোঁটটা একটু কুঁচকে যায়। —বলুন না, এখান থেকেই শুনছি।

জয়া মনে মনে বেশ আহত। তপতীর ঝগড়াটে দেমাকি মেয়ে বলে জনশ্রুতি ছিল—সেটা তাহলে মিথ্যা নয়। সে চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর সেলফ্ খুলে একটা বই নিয়ে বসে।

দীপ্তি জানালায় ঝুঁকে বসে। চাপা কণ্ঠস্বরে বলে—উৎপলের খবর জানো?

তপতীর চোখদুটো হঠাৎ একবার চঞ্চল হয়েই স্থির হয়েছে। পরক্ষণে যথাসম্ভব গম্ভীর হয়ে জবাব দেয়—না।

—কবে গেছে তোমাদের এখান থেকে?

—আপনি তার বোন, আপনারই খবর রাখবার কথা। আমার কিছু মনে থাকে না বাবা!

গতিক বুঝে দীপ্তি হাসবার চেষ্টা করে—তোমার মা নিশ্চয় জানেন। সময় করে একবার যাবো'খন।

তপতীও হাসে। কিন্তু তার হাসিটা কিছু বিকৃত দেখায়। তার বয়সের পক্ষে অশালীন; প্রগলভ। সে অক্লেশে বলে—যাবেন? সত্যি সত্যি! ওরে বাবা, তাহলে বদুবাবু সঙ্গে সঙ্গে....

জয়া চকিতে সোজা হয়—পায়ের চাপ থেকে হঠাৎ-মুক্ত কাশের মত। কথা কেড়ে বলে—কী করবেন বদুবাবু? চার্কারি খাবেন? তপতী, তোমার বয়সের পক্ষে কথাগুলো বেমানান। একে বলে বড়দের সঙ্গে ডেঁপোমি! দুষ্টু মেয়ে, স্কুল কামাই করে এইসব করে বেড়ানো হচ্ছে। রোসো, যাচ্ছি তোমার মায়ের কাছে।

তপতী বিকৃত মুখে বলে—কেন আপনি তাহলে দীপ্তিদিকে বদুবাবুর বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন। কেন ক্ষমা চাইতে হল দীপ্তিদিকে? কার পরামর্শ সেটা, আমি জানি। আর আমি কচি খুকীটি নই জয়াদি। কেন যে এই দুঃখের সময় আমাদের বাড়ি আপনারা একবারও যান না, সেও আমি জানি।

দীপ্তি বলে—ছিঃ তপতী। ঝগড়া করতে নেই। তুমি আমাদের ছোট বোনের মত।

--বয়ে গেছে বোন হতে! কথাটা দাঁতের ফাঁকে কামড়াচ্ছিল, বলে গেলুম। ব্যস! জানালা থেকে সাৎ করে সরে গেল তপতী। হনহন করে হেঁটে গেটে ঢুকল। একবার মুখ ফিরিয়ে তাকিয়েও গেল সে। এখানে জয়া বসে নিঃশব্দে ফুঁসছে। দীপ্তি কিছুটা ভ্যাবাচ্যাকা। সে বলে—দিলে মেজাজটা মাটি করে। সিনেমায় যাবো ভেবে বেশ খুশি হয়েছিল মনটা। হাজার ভাবনায় দিনরাত্রি অশান্তি.....

অবিশ্যি জয়া তখনই জোর হেসে উঠেছে।—পাগল! পাগলের বংশ। মা বাবা দাদা মেয়ে—সবাই পাগল! শুনলি কী বলে গেল? ... নে কাপড়চোপড় পরা যাক্। তুই কোন কাপড়টা পরবি রে? দেখি?

দীপ্তি বলে—তোমার মত অত সুন্দর নেই-টেই। যা আছে, পরব।

—দেখি না একবারটি। আমি বেছে দিই।

বলতে গেলে ভীষণ সেজেছে দুটিতে। চোখে সানগ্লাস। ডাঁই ডাঁই মস্তো ফুটবল খোঁপা। দেহের ভাঁজ গাছের মত অকৃপণভাবে দেহকে ছন্দের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে। হাঁটলে ছলক ছলক ঢেউ ভাঙা তটের কথাও মনে পড়ে। ছায়ার রোদে নকশাকাটা ধুলোর পথের কিনারায় হেঁটে চলে ওরা। কিনারায় ম্লান হলুদ ঘাস। খানিক চলেই পীচের পথ। দু'ধারে ইলেকট্রিক পোস্ট। একবার থেমে পা ঝেড়ে নেয়। জুতোর শব্দে পথের বুক কাঁপে। পীচের পথে এখানে ওখানে ধানের কণা মাড়িয়ে ওরা চলতে থাকে। নীলপালক বুনোপায়রা, শালিক, ঈর ছাতারে পাখিরা দূরে সরে গিয়ে পথ ছাড়ে।

হাইওয়েতে পৌঁছতেই জয়া দেখে সুশীল হাজির। সে পানের দোকান থেকে এগিয়ে আসে। আসতে আসতে আঙুলে চুন তুলে গালে রাখে। হাতে দেশলাই, আঙুলের ফাঁকে সিগ্রেট। অর্থাৎ শুধু পানে জমবে না। নতুন রসিক আজ। রস রঙ হচ্ছে না।

জয়া লক্ষ্য করে তাকে। দীপ্তি অবাক হবে নিশ্চিত। সে জানে না, এ্যাপয়েমন্ট ছিলই একটা।

অনেকদিনই থেকেছে। অনেকদিন এমনি সেজে একা এসেছে জয়া। এটা হাইওয়ে—হার্টের চলাচল। নির্বিশেষে মন সবার ভরে থাকে। বিশেষভাবে কেউ বেছে পরখ করে না।

দীপ্তির কানের কাছে মুখ এনে সে বলে—এতদিনে তুই সাবালিকা হয়েছিস্।

দীপ্তি প্রশ্ন করে—কেন?

—তুই অবাক হতে ভুলেছিস।

—তার মানে?

—মানে তো সামনেই দাঁড়িয়ে।

সুশীলের নমস্কারের প্রত্যুত্তর এখন দেয় দীপ্তি। একটু হাসিতে ধন্য করার সহজাত রীতি। সুশীল বলে—মিস্ সেন ভালো আছেন? অনেকদিন যাওয়া হয়নি আপনাদের ওখানে।

দীপ্তির মাথায় জয়ার কথাটা ছিল। ফলে সুশীলের মিস সেন সম্ভাষণও তার মন ছোঁয় না, পাশ কাটায়। সে একটু অস্বস্তি বোধ করে। জবাব দিতে চেষ্টা করার আগেই জয়া বলে—আপনি ফিজিক্যালি অ্যাবসেন্ট ছিলেন বলুন। নইলে অত কাঁড়ি কাঁড়ি হরলিকস খেয়ে দীপ্তি মুটিয়ে যাচ্ছে কেন? মেনকাব মাথার চুলই বা নির্ভেজাল বিশুদ্ধ সরষের তেলে কালো কুচকুচে হয় কেমন করে? আপনি সব সময়ই ছিলেন সুশীলবাবু। দীপ্তিটাকে কি সাধে জন্মান্ধ বলি?

সুশীল ফের নমস্কার করে বলে—ওটা বেশি করে সানগ্লাস ব্যবহারের দোষ!

শুনেই ইয়ারকির ছলে, চপলতায় দীপ্তি সানগ্লাসটা ক্ষিপ্র হাতে খোলে। জবাব দিতে গিয়ে সুশীলের জামা-কাপড়টাই দেখে আগে। একটুখানি থামতে হয় তাকে। না, এমন জামা-কাপড় সুশীলকে কোনদিন পরতে দেখেনি সে। সাদা ভাঁজ ভাঙা খদ্দরের পাঞ্জাবী,—কাঁধটা কেন, কোথাও ছেঁড়াফাটা নেই, আনকোরা ঝকঝকে। ধুতিটা মিহি তাঁতের। পায়ে বাটার চপ্পল। কাঁধে গরম চাদব। ভোলবদল করা এ সুশীল অন্য সুশীল। দীপ্তি বলে—কোথাও যাওয়া হচ্ছে বুঝি!

অপ্রস্তুত হেসে কামানো গালে হাত বোলায় সুশীল। জয়া বাঁচায়—বহবমপুবে নিশ্চয। চলুন, একসঙ্গেই যাওয়া যাক্। দীপ্তি, এ ভদ্রলোককে ছাড়ছিনে আমরা। কী বলিস? বাবলতলীর বাঘটা এখনও মারা পড়েছে বলে শুনিনি। তাছাড়া অবলা স্ত্রীলোক....

দীপ্তি বরং খুশিই হয়। বলে—ওঁকে ছাড়লে সত্যি চলবে না জয়া। আমি এতদিন আছি এখানে একদিনও এমন করে বেড়াতে যাইনি কোথাও।

ফের হাঁটতে হাঁটতে বলে—বাপস্! হাঁফিয়ে উঠেছিলাম। জয়াটা এতদিন বড্ড নিষ্ঠুর মেয়ে ছিল দেখছি।

বাসে কোন কথাবার্তা আর হল না। গঙ্গা পেরিয়ে শহরে ঢোকার মুখে দীপ্তি রিকশোর কথা তুলল। জয়া বলল—থাক। তারপর সিনেমা। তখনই দীপ্তি জানল ব্যাপারটা। তার মাথায় বহুদিনের অন্ধকাবটায কয়েকবার বিদ্যুতের মত আলোর ছটা খেলল। তবু বিস্ময় তার বিশ্বাসের দোলনাকে ক্রমাগত দোলাতেই থাকল, দিল না স্থির হতে।

সে পাশ ফিরে হলের অন্ধকারে জয়াকে দেখবার চেষ্টা করছিল। সবাই আপন আপন ক্ষেত্রে স্থির। কোন চাঞ্চল্য নেই। বুঝি দেখতে চেয়েছিল—একটা মরা মানুষের হাতের মত শুকনো বাসী হাত জয়ার নিটোল হাতের ভাঁজ ঘিরে। করতলে করতল, আঙুলে আঙুল জড়ানো। হয়ত বা চুপিচুপি গালে গালের স্পর্শ দিতে দুটি ছায়া পলকের জন্যে একাকার হওয়া। চোখে পড়ল না কিছু। হিসেবের ভুল কি? হয়ত তাই। জয়ার মত সফিস্টিকেটেড মেয়ে.....!

সিনেমা শেষ হলে বেরিয়ে পড়ে ওরা। কিছু কেনাকাটা সেরে এবং একটা রেস্তোরাঁয় কিছুক্ষণ বসে চা খেয়ে ঘাটের দিকে আসে। রিকশো করেই আসে। বাসের সময় হয়ে গেছে। পিছনের রিকশোয় সুশীল একা, সামনে জয়া আর দীপ্তি। সেই ফাঁকে দীপ্তি উস্‌খুস করছিল। এতক্ষণে ব্যাপারটা তার বেশ খারাপ লাগছিল। জয়া যেন টের পেয়েই বলে—তুই বিরক্ত হয়েছিস দীপু?

দীপ্তি বলে—নাঃ। বলে স্কার্ফটা ভালো করে জড়ায়। রিকশো বেশ জোরে চলেছে। আধ মাইল পথ। দু'পাশে টানা দোকানপাট, আলো, লোকের ভীড়। ঠাণ্ডার রাতে সবকিছু দেখাচ্ছে কাচের ভিতর

দৃশ্যাবলীর মত। সকল চাঞ্চল্য জুড়ে কেবল একটা বিরাট নিস্পন্দতার স্বাদ। বাইরে আসতেই মাথার উপর চাঁদ ভেসেছে। গঙ্গার ধারে বনবিভাগের যত্নে রচিত দীর্ঘ বনানী। ভাঙন রোধে মূল বিস্তার করছে মাটির গভীরে। বাতাস নেই। মনে হয় নিস্তরঙ্গ জলের মধ্যে পথঘাট সব ডুবে রয়েছে। ওপারে আলো জ্বলছে। বাসের হেডলাইট গঙ্গার কালো জলে সাঁৎ সাঁৎ করে আলো খেলে গেল। রিকশো থেকে নেমে ওরা দ্রুত হাঁটে। নৌকোয় চাপে।

এতক্ষণে সুশীল বলে—মিস সেনের সঙ্গে কিছু কথা ছিল। চলুন, সুযোগ বুঝে বলব।

দীপ্তি কথাটা শোনে মাত্র। কে জানে কেন, সুশীলকে তার খুবই খারাপ লাগছিল। ভাবছিল, আর কোনদিনও আসবে না এমন করে। জয়া মাথা ভাঙলেও না।

আজ ফিরে গিয়েও কি সহজে ছাড়বে ওকে? একটা ব্যাখ্যা খুবই জরুরী হয়ে উঠেছে। সঙ্গী হিসেবে লোক কী বাবলতলীতে আর কেউ নেই? তাছাড়া এই লোকটাকে দেখলেই কেমন যেন ধড়িবাজ মনে হয়। একদিন ওকে সঙ্গে নিয়ে দীপ্তি উৎপলকে খুঁজতে বেরিয়েছিল—সেটার মধ্যে যথেষ্ট স্বাভাবিকতা ছিল। এমন কি জয়ার সঙ্গে আজ না এলে আগামী কালও সে কোন কাজে সুশীলকে নিয়ে বেরোতে পারত। মোটেও খারাপ লাগত না তার। এই খারাপ লাগার মূলে জয়ার বিচিত্র আচরণ। সুশীলের সঙ্গে তার গোপন মেলামেশা—যা দীপ্তি এতটুকু টের পাবে না!

জয়া একটা স্বাভাবিকতাকে বিশ্রী ভাঙচুর করে ফেলেছে। দীপ্তি জয়ার উপর অভিমানে চুপ করে থাকে।

বাসে ভীষণ ভীড়। পরের ট্রিপ একবারে ন'টায়। পুরো দেড় ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয় তাহলে। মেনকাকে ঘরের চাবি দিয়ে এসেছে। চুরি করবে কি না—বিশ্বাস করা কঠিন। সদ্বংশের মেয়ে হলে কী হবে, বুড়ি মাঝে মাঝে আঁচলের আড়ালে এটা ওটা নিয়ে যায়, তা জানতে পারে ওরা।

জয়াও কিন্তু ওম হয়ে আছে। দীপ্তি কি অন্য কিছু ভাবল তার সম্পর্কে? বিছানায় শুয়ে একটি টিপুনিতেই বুঝিয়ে দেবে—এ সেই উপেনকথিত তাঁতিদের কাশবনে সমুদ্র সাঁতার নয়।

—তাহলে? সুশীল বলে।

দীপ্তি বলে—রিকশো যায় না?

—বেশী ভাড়া দিলে যাবে হয়ত। কিন্তু ছ'মাইল পথ এই ঠাণ্ডার রাতে যাবেন কেমন করে? অসুখে পড়বেন যে! তাছাড়া সহজে কি যেতেও চাইবে? বাঘের গুজবে এলাকা মাত হয়ে আছে।

দীপ্তি বলে—তা হোক্। চেষ্টা করে দেখুন।

জয়া বলে—এমন তাড়া করবি যদি, এলি কেন দীপু? তোর সবতাতেই বাড়াবাড়ি। মাত্র দেড় ঘণ্টায়, কী আসে যায় শুনি?

সুশীল রসিকতা করে—পড়াশুনো কামাই হচ্ছে না?

—থামুন, পড়াশুনা! দিনরাত্রি তো ট্রানজিস্টার আর চিঠি লেখা...জিভ কেটে মুখ ফেরোয় জয়া। মুখভরা হাসি আলোয় ঝলকে উঠে মিলিয়ে যায়।

দীপ্তি কচি মেয়ের মত ওর হাতটা খামচায়।—তুমি তো বলবেই। প্রিপারেশন শেষ করে ফেলেছ!

মেঘ জমেছিল—সেটা এতক্ষণে কাটে। সুশীল বলে—ওইটে পরের বাস। আসুন, জায়গা নিয়ে বসি। পা ধরে গেল।

দীপ্তি সকৌতুকে বলে—আপনি লেডিস সিটে বসবেন না তো!

—বসবার সুযোগ পেলে সবাই বসে। এই বলে সুশীল এগিয়ে যায়। ড্রাইভারের পেছনের সিটগুলো দেখিয়ে বসতে ইঙ্গিত করে দীপ্তি। তারপর সে বসে সামনা সামনি।

গাড়ি অন্ধকার। অন্ধকারে দীপ্তি বলে—কী কথা বলছিলেন সুশীলবাবু?

জয়া বাধা দেয়—কথা পরে হবে। রাতের গঙ্গার সিনারি দেখ্।

সুশীল বলে—হ্যাঁ। পরে হলেও ক্ষতি নেই। বলব বলব করে বলা হয়নি এতদিন। যাবার সময় পেলাম কই?

—বলুন না! দীপ্তি জেদ ধরে যেন জয়ার কাছে আমার কোন কিছু লুকোনো নেই। ওর সামনেই বলতে পারেন।

একটু ঝুঁকে সুশীল অনভ্যস্ত চপ্পলের বকলেসটা ঢিলে করে নিতে নিতে বলে—আপনার সম্মতি পেলে বলতে আপত্তি কি? আচ্ছা, তরুণ সেনগুপ্ত নামে কাকেও আপনি চেনেন?

পলকে দীপ্তির বুকে হাতুড়ি পড়ে। সে সোজা হয়ে বসে।

—কেন? তার প্রশ্নটা কাগজ নাড়বার মত খসখসে শোনায়। মুখ ফিরিয়ে হাসি চাপে।

—সম্প্রতি এক ভদ্রলোক বাবলতলীর হাইওয়েয়ের ধারে কিছু জমি খোঁজ করছিলেন। একটা কারখানাগোছের কিছু খোলবার মতলব আছে। তাঁকে ফেলুবাবুর কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। দেখেশুনে বায়নাপত্র করে গেলেন। দিন দশেক আগে জায়গাটা রেজেস্ট্রিও হয়েছে। গত বুধবার বিকেলে দেখি মস্তো গাড়ি করে ওঁর ফ্যামিলির লোকজনকে জায়গাটা দেখাতে এনেছেন। ওঁর স্ত্রী, দুই মেয়ে, একটি ছেলে—উৎপলবাবুর চেয়ে বয়সে কিছু বড়ই হবেন সম্ভবত। পরিচয় করিয়ে দিলেন সকলের সঙ্গে।

—তারপর?

—ওঁর ছেলের নাম শতদল। শতদল মৈত্র। কথায় কথায় উনি বললেন আপনার কথা। আমি বললাম—ওঁকে খুবই চিনি। আপনার পরিচিত নিশ্চয়? বললেন—না। আমার এক বন্ধু আছে। ইণ্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে চাকরি করে। তরুণ সেনগুপ্ত। তার কাছেই শুনেছি ওঁর কথা। তরুণ বলেছিল .

—কী বলেছিল?

—স্পষ্ট কিছু বললেন না শতদলবাবু। বোঝা গেল—এখানে যে আপনি আছেন, সেইটুকুই জানিয়ে দিয়েছেন তরুণবাবু। যাই হোক, এবার এলে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেব।

এতক্ষণে জয়া বলে—তরুণের সঙ্গে দীপুর কী রকম পরিচয়, সেটা জিজ্ঞেস করলেন না সুশীলবাবু?

সুশীল অন্ধকারে হাসল কি না বোঝা গেল না। বলল—হয়ত বুঝেছি কিছু, হয়ত বুঝি নি। ওটা মিস সেনের পার্সোনাল এ্যাফেয়ার।

এই প্রথম দীপ্তি অনুভব করছিল সুশীলের একটা বিশেষ ধরনের ব্যক্তিত্ব আছে। যত খারাপই লাগুক, যত ধড়িবাজই মনে হোক, সঙ্গী হিসেবে কিছু গুণ যেমন আছে—তেমনি আছে ওকে ঘিরে একটা রহস্যময়তা। হাতছানি দেবার মত অস্পষ্ট আলো-অন্ধকার।

সুতরাং বুক ছমছমও করে। ওকে বিশ্বাস করলে ভরসা পায় যেমন, তেমনি দোলায় দোলে মন।

কিন্তু তরুণ যদি তাকে অলক্ষ্যে থেকে নিয়ন্ত্রণ করার সাধ রাখে, আজ অব্দি একটি চিঠিরও জবাব দেয় না কেন? পুজোর সময় বাড়ি গিয়ে শুনেছিল—ও গেছে বাইরে। গত বছরের মত শিমুলতলা। অথচ সেবার দীপ্তি আর উৎপল তার সঙ্গে ছিল। এবার গেল একা। মনে সন্দেহের কাঁটা তখনই গজিয়েছিল। কৈফিয়ৎ যতই থাক, কাঁটা বিঁধেছে রাত্রিদিন। অগত্যা দীপ্তি নানান জায়গায় আত্মীয়বাড়ি ঘোরাঘুরি করে সটান চলে গিয়েছিল মাসির বাড়ি—চুঁচুড়া। সেখান থেকে ফিরে বাড়ি যাবার অবকাশ আর হয়নি। বাবার সঙ্গে চুঁচুড়াতেই দেখা হয়ে গেল। বাবা তাকে নিয়ে যেতে এসেছিলেন। দীপ্তি যায় নি। বলেছিল—কালই স্কুল খুলছে। সঙ্গে জিনিসপত্র তো কিছুই আনিনি। অসুবিধে নেই। বাবা হয়ত বুঝতে পেরেছিলেন। আপত্তি করেন নি। মা-মরা মেয়ে বিদেশে-বিভুঁয়ে পড়ে থাকে জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে। পরে চিঠিতে লিখেছিলেন—বুঝিয়া কার্য করিবে। সংসারে কেহ কাহারো নয়। আমার আর ক'দিন। পুত্রের প্রতি ভরসা রাখিতে পারি না। সে ক্রমশ আমার শাসনের বাহিরে যাইতেছে। যাক্। তোমরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছ। নিজে যাহা ভাল বুঝিবে, করিবে। আমার তাহাতে অন্যমত নাই। তবে মাঝে মাঝে তোমাকে দেখিতে বড় ইচ্ছা হয়। ছুটি পাই না। যে কর্ম করি, উহা তো সাধারণ চাকুরি নহে, তাহা তুমি বিলক্ষণ জ্ঞাত আছ। অফিস ছাড়াও উকিল মহাশয়দের গৃহে কোন কোনদিন রাত্রি বারোটাও বাজিয়া যায়। ঠাকুর সহায়। তোমাকে বিদেশে রক্ষা করিবেন। পুনশ্চঃ বাকচি বাড়ির সেই মেয়েটি—তোমার জন্য কয়েকখানি পাঠ্যপুস্তক আনিয়াছিল। বাসায় পড়িয়া আছে। চুঁচুড়া গিয়া তোমাকে বলিতে ভুলিয়াছি। দরকার হইবে কি? জানাইও। ডাকযোগে পাঠাইয়া দিব।...এবার পূজায় একসপ্তাহও ঘরে থাকিলে না!

জয়া বলে ওঠে—দীপ্তি, তোর গার্জেন ভারি কড়া দেখছি রে! র‍্যাডারের সামনে বসে আছে দেখছি।

দীপ্তি সেকথায় কান করে না। বলে—সুশীলবাবু, উৎপলের খবর জানেন?

সুশীল এতক্ষণে সিগ্রেট জ্বালে। বলে—উৎপলবাবু ছেলেটি শিক্ষিত এবং ভীষণ ভদ্র। তবে কি জানেন, এযুগে নখদন্তহীন ছাপোষা নিরীহ জীবের কোন ঠাঁই মেলেনা পৃথিবীতে। সুতরাং উনি নিরাপদে ভালো পজিশনেই আছেন। ওঁর জন্যে ভাববেন না।

—কোথায় আছে ও? কী করছে?

—পাশ করে বসেছিলেন চুপচাপ। চাকরি খুঁজছিলেন। তাই না?

দীপ্তি অধীর হয়ে বলে—আঃ, স্পষ্ট বলুন না!

—ফেলুবাবুর নানারকম ব্যবসাপত্তর আছে। দিল্লী-বোম্বে নানান জায়গায় যোগাযোগ রাখতে হয়। একজন রিপ্রেজেনটেটিভ খুঁজছিলেন। শিক্ষিত স্মার্ট চালাকচতুর লোক হওয়া চাই। অভিজ্ঞতা না থাকলেও চলবে। শিখিয়ে নেবে দু'দিনে। সেখানে জুটিয়ে দিলাম ওঁকে। উৎপলবাবু আজ এখানে, কাল সেখানে করে ঘুরছেন। স্টেশন ওয়াগেন গাড়িও রয়েছে একখানা। ভাবছেন কী, বাবলতলী পুরো শহর হয়ে যাচ্ছে! হাইওয়ের দু'পাশে একটুকরো জায়গা আর পড়ে নেই। তারপর গঙ্গায় ব্রীজটা শেষ হলেই বাবলতলীর গুরুত্ব আরও বাড়বে। ব্লক অফিসের ওদিকটায় কত বাড়ি হচ্ছে দেখেছেন?

কিছুক্ষণের স্তব্ধতার পর একসময় জয়া বলে—শিবনাথবাবুকে জামিন দিয়েছে?

সুশীল বলে—শুনছি, আরতি হেবিয়াস কর্পাস করছে। শীগগির জামিন হয়ে যেতে পারে। হয়েও যাবে? বদুবাবুরা মামলায় তেমন উৎসাহ দেখাচ্ছেন না।

—অমরবাবু মরে গেলেন!

দীপ্তি ও সুশীল দু'জনেই চমকে ওঠে। সুশীল বলে—হ্যাঁ? মাথার গোলমাল আর কি!

বাবলতলী পৌঁছতে সাড়ে নটা বেজেছে। শীতের রাত। লোকজন চলাচল কমেছে। আলো-আঁধারে শান্ত বাবলতলী ঝিমোচ্ছে আফিঙখোরের মত।

চায়ের দোকানে একটা রিকশো দাঁড়িয়েছিল। সুশীল ডাকে—লালটু নাকি? এঁদের স্কুলের ওখানে পৌঁছে দিয়ে আয়। আমি এখানেই রইলাম। তারপর কাছে গিয়ে চাপাস্বরে বলে—ভাড়া চাইবিনে। আমার কাছে এসে নিবি। যা শীগগিরি।

জয়া বলে—সে কি! আপনি? আমাদের বাঘের মুখে ফেলে দেবেন?

কৌতুক এড়িয়ে সুশীল বলে—একটুখানি জরুরী কাজ আছে। আপনারা এর রিকশোয় চলে যান। আমার কথা বাদ দিন। আমি একটা ইয়ে...

জয়াদের নিয়ে রিকশোটা বাঁহাতি পীচের পথে মিলিয়ে যেতে থাকে—যতদূর যায়, যেন জলের ভিতর কাচপোকার মত কেঁপে-কেঁপে সবুজ ঝাঁঝরির দিকে ডুব দেয়। চোখের আড়াল হলে সুশীল জগার চায়ের দোকানের বারান্দায় ওঠে। বেঞ্চে বসে আড়ামোড়া ছাড়ে। বলে—জগা, চা দাও।

দাঁড়িয়ে টেবিলের ওপর গরম জল গেলাসে ঢালে জগা। হালকা বাষ্পে টেবিলটা ভরে ওঠে। ছাকনি ঠুকে বলে—শেষ দুধ। আপনার ভাগ্যেই ছিল সুশীলবাবু। এত রাতে কোত্থেকে?

সুশীল একটু ঝুঁকে বলে—তুমি একটু খোঁড়াচ্ছ মনে হচ্ছে। ফোঁড়া নাকি?

জগা অদ্ভুত হাসে। দাঁত বেরিয়ে পড়ে।—ফোঁড়াই বটে।

—কোথায়?

—তলপেটের নীচে। সাতদিন দোকানে ছিলাম না, দেখেন নি?

—তাই নাকি?

যেন ঠাণ্ডা রাতকে গরম করতেই জগা ফেটে পড়ে। রহস্যের হাঁড়ি ভাঙে। বলে—দাদা, বুঝলেন না। ভেসেকটমি করেছি। ছ'টা ডিম পেড়ে বৌ কাৎ—বাচ্চা, বত্রিশেই বাহাত্তুরে দশা! আর শালা বরাতখানা দেখুন, ছ-ছটাই কন্যা! ভিটেয় বাতির কথা তুলবেন না। সাতটার বেলায় যে খোকা এসে বাবা বলবে, তার মানে আছে? কাজেই দোহাই বাবা!...

ফের রসিয়ে জগা বলে—কী বিচ্ছিরি ব্যাপার দেখুন। ব্রহ্মচর্য করি। নিরামিষ খাই। যেই শালা শীত আসে, বুঝলেন, মাসখানেক পরে বৌ কলতলায় মাথা চেপে ধরে ওয়াক ওয়াক...ধুর শালা, কী রসিকতা!

সুশীল ধমকায়—এঁড়েমি করোনা হে। যা হবার, তা তো হয়েই গেছে। বড় মেয়ে এবার ম্যাট্রিক দিচ্ছে না?

—দিচ্ছে।

—আর পড়াবে তো? নাকি এখানেই ইতি?

—নাঃ। পারব না। সুশীলদা, যদি পাশ-টাশ করে, দেবেন কোথাও ঢুকিয়ে? মাইরি—বড্ড কষ্ট চলেছে।

চায়ে চুমুক দিয়ে সুশীল বলে—সে হবে'খন। মন দিয়ে পড়তে বল। পথে ঘাটে ফষ্টিনষ্টি করতে শিখেছে। নজর রেখো।

রিকশোওলা ফিরে এলে তাকে পয়সা দিয়ে সুশীল ওঠে। কাঠগোলার দিকে যায়। কাঠগোলায় দুখুবাবু খাতা লিখছিলেন। মুখ তুলে বলেন—উনিশ বাই উনিশ ইঞ্চি শাল...মাথা খারাপ! ব্লকের ওভারশিয়ারবাবুর মাথায় রাজ্যের ভুলের বাসা। এলাকায় বড়লোক কম নেই। দালানকোঠাও অগুনতি। মশাই, কোন জায়গায় তো দেখিনি এমন মাল দরকার হয়। হবে একটা গোডাউন চল্লিশ বাই বাহাত্তর ফুট লম্বা বারো ফুট উঁচু—তার জন্যে...!

সুশীল বলে—শিলিগুড়ি থেকে গাড়ি ফেরেনি?

—নাঃ। পাগল হয়েছেন আপনি! পাবে কোথায়? নৈনিতাল পাঠাক্‌। একটা ভুতুড়ে প্লান-এস্টিমেট দিয়ে তো কালীবাবু ওভারশিয়ার দেড়শো টাকা পকেটস্থ করে বসে রইলেন। আবার ত্রিসন্ধ্যা ধ্যানট্যানও করা হয় দেখছি। কাঁড়ি কাঁড়ি মুরগীর ডিমও গেলেন।

—তাহলে ফেলুদা ফেরেন নি!

—নাঃ।

—উঠি তাহলে।

—উঠবেন? চা খাবেন না?

—নাঃ, এইমাত্র খেলাম।

ফেলুবাবুর গদীতে ফিরে আসে সুশীল। সামনে কয়েকটা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। কোনোটা খালি, কোনোটা মাল ভর্তি। গো-ডাউনের সংলগ্ন অফিসমত স্বল্পপরিসর একটা ঘর। কপাটের ফাঁকে আলো দেখা যাচ্ছিল। বন্ধ কপাটে হাত রেখে সুশীল ডাকে—উৎপলবাবু আছেন নাকি?

ঘরে স্টোভ জ্বলছে। ওদিকের দরজাটা খোলা। তার ওপাশে ছোট্ট বারান্দা। সামনে খানিক ফাঁকা জায়গায় শাকসব্জি আর ফুলের বাগান। ব্যারান্দার ওদিক থেকে সাড়া আসে—খুলছি। সুশীলবাবু নাকি?

একটু পরেই দরজা খোলে উৎপল। প্যান্ট-গেঞ্জী পরনে, খালি পা। হাত ভেজা। দরজা ভেজিয়ে একটু হাসে।—ঘণ্টা-খানেক আগে বহরমপুর থেকে ফিরেই রান্না চাপিয়েছি।

—তাই নাকি? কী রান্না হচ্ছে?

—পারিনে মশাই! ধুপ করে তক্তপোষে বিছানায় বসে উৎপল।—ডিম আর আলুসেদ্ধ স্রেফ। রতনটা আজ আসে নি। অবিশ্যি আজ আমার ফেরারও কথা ছিল না। ও জানবে কেমন করে?

—ও রান্না করছে কেমন? চলবে?

—আপনার মাল। চলবে না মানে? ছেলে দারুণ এক্সপার্ট। বলে কি জানেন...যাক্‌। তারপর, খবর কী?

সুশীল দুম্‌ করে বলে—আচ্ছা, তরুণ সেনগুপ্ত কে?

উৎপল চমকে ওঠে। স্থিরদৃষ্টে তাকিয়ে বলে—কেন? ওকে আপনি চেনেন নাকি?

দীপ্তির কাছে যা-যা সব বলেছিল, সুশীল জানায়। তারপর বলে—শতদলবাবু সামনে রোববার আসছেন। ওদিন আপনার কোথাও প্রোগ্রাম আছে নাকি!

—দাঁড়ান। এক মিনিট—দেখছি। ফোলিওব্যাগ থেকে ডায়ারী বের করে কিছুক্ষণ দেখে নেয় সে। ঠোঁটে তর্জনী চেপে মৃদু আঘাত করে। একসময় বলে—আসানসোল যাবার কথা। তবে আমার না গেলেও চলে। যাব না বরং। ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করতে কৌতূহল হচ্ছে। এক শতদলকে আমি চিনি। মৈত্র কি না মনে পড়ছে না। গোফ-দাঁড়ি কামানো, বছর ত্রিশ-বত্রিশ বয়স...বেশ ভালো স্বাস্থ্য। সায়েব-সায়েব চেহারা...

সুশীল বলে—প্রায় পাশ ঘেঁষেই যাচ্ছেন। সম্ভবত উনিই ইনি।

—ভদ্রলোকের সঙ্গে এক অদ্ভুত অকেসনে পরিচয় হয়েছিল। তখন আমি প্রায় নিম-গুণ্ডা হয়ে উঠেছিলুম বলতে পারেন। ওয়াগেনব্রেকারদের দলে আমার এক বন্ধু ছিল—তার নাম সত্যেন। সত্যেন বেচারা পুলিশের গুলিতে মারা যায় একরাত্রে। উল্টোডাঙ্গা স্টেশনের ওদিকে ওরা একটা ওয়াগন থেকে মাল পাচার করছিল। বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, আমি সত্যেনের সঙ্গে গিয়েছিলুম নিতান্ত দর্শক হিসেবে। নিছক কৌতূহল ছাড়া অন্য কোন অভিসন্ধি আমার ছিল না। একটু দূরে একটা পোস্টের পাশে দাঁড়িয়ে ওদের কাজকর্ম দেখছিলুম। হঠাৎ সেই সময় কোত্থেকে পুলিশ গুলি করে বসল। সত্যেন গুলি খেয়ে মালগাড়ির তলায় ঢুকে পড়েছিল। আমি পালিয়ে যাবার জন্যে পা তুলেছি। হঠাৎ শুনি গাড়ির নীচে থেকে সত্যেন কাতরাচ্ছে।...কী সর্বনেশে পরিস্থিতি দেখুন! ওকে টেনে বের তো করলুম। দেখি ডান উরুটা রক্তে ভাসছে। হাত ধরে ওকে টেনে প্রায় দৌড়ে নীচে নয়ানজুলিতে গেলুম। কচুরীপানার জঙ্গলে এককোমর জল পেরিয়ে ওপরে পথে উঠলুম। সেই সময় একটা প্রাইভেট গাড়ি আসছিল। 'ভাগ্যে যা থাকে' বলে গিয়ে গাড়িটার সামনে দাঁড়ালুম। গাড়ি ড্রাইভ করছিলেন শতদলবাবু। বিনাবাক্যে গাড়িতে তুলে নিলেন। জিজ্ঞেসও করলেন না, কী ব্যাপার...আশ্চর্য! পথে সত্যেন মারা যায়। ওর লাশ বাড়িতে পৌঁছে দিতে তখন রাত্তির দুটো। কলোনি এলাকায় লোক ছিল না অত রাত্রে। সেই রক্ষে।

সুশীল পিঠ চাপড়ে দেয়—সাবাস্।

—অদ্ভুত সাহস ভদ্রলোকের। তেমনি অদ্ভুত তাঁর আচরণ। পরে খুবই ভাবতুম, আলাপ করে আসি। ঠিকানাও দিয়েছিলেন। লজ্জায় আর যেতে পারি নি। তাছাড়া ক্রমশ ওঁকে ঘৃণা করা যায় কি না, সেকথাও ভাবছিলুম। আনসোশ্যালদের উপর সহানুভূতি, না মানবিকতা—কোন কারণটা তাঁর সে আচরণের মূলে, বুঝতে পারছিলুম না।

– ওঁদের পৈতৃক বাড়ি কিন্তু বহরমপুর। শতদলবাবুর বাবার বাবা ছিলেন জেলার নামকরা উকিল। সৈদাবাদে গঙ্গার ধারে এখনও বিরাট বাড়িটা রয়েছে।

—তাই নাকি! উৎপল ওঠে। দেখি, ভাত ধরে গেল নাকি। গন্ধ ছুটেছে।

খানিক পরে সুশীল বেরিয়ে আসে। বলে যায়, সকালে ফের আসবে। দরজায় দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ উৎপল সুশীলবাবুর চলে যাওয়া লক্ষ্য করে। সুশীল হঠাৎ ধোপদুরস্ত ফিটবাবুটি হয়ে গেছে। চেহারা বদলাচ্ছে। কিছু কি ঘটছে তার? ফাঁকা মাঠ থেকে ঠাণ্ডা এসে বুকে লাগছে যেন। কুয়াশায় জ্যোৎস্নার রঙ ধূসর হয়ে গেছে। শব্দহীন শান্ত আকাশে অল্প অল্প নক্ষত্রের আভাস। দূর থেকে ভেসে আসছে গরুর গাড়ির চাকায় চাকায় কংক্রিটে একটানা ঘষা খাওয়া আওয়াজ, গাড়োয়ানের শীতে কাঁপা স্খলিত কণ্ঠে দেশোয়ালী গান। পথের ধারে শুকনো পাতার স্তূপে আগুন জ্বেলে গোল হয়ে ঘিরে বসে আছে কারা। দপ্‌কে ওঠা শিখায় তাদের ঝলসানো মুখগুলো দেবদূতের মত অমানবিক দেখাচ্ছে।

দরজা বন্ধ করে দেয় উৎপল। স্টোভের সামনে এসে হাঁটু ভাঁজ করে বসে। গুনগুন করে গানের সুর টানে। এবং একটু পরেই হঠাৎ কেমন করে তার খাওয়ার নিষ্ঠা কেটে যায়। বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায়। বিকৃত মুখে বলে—পোষায় না, পোষায় না!

তক্তপোষে মাথার নীচে দু'হাতের মুঠো রেখে সে কিয়ৎক্ষণ শুয়ে থাকে। কংক্রিটের সমতল সাদা সিলিঙে আংটাটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অমরদার কথা মনে পড়ে। ধুড়মুড় করে ওঠে তক্ষুনি। গজগজ করে ওঠে—গোল্লায় যাও।

ঠিক অমরদার মতই একহাত মুঠো করে তার উপর অন্য হাতের আঙুল তালে তালে বাজিয়ে সে খোঁজে—কী যেন করার আছে, মনে পড়ছে না। অনেক—অনেক কাজ সামনে তার দাঁড় করানো আছে না? কী তারা? ফেলুবাবুর না নিজের? সনাক্ত করতে পারে না। একাকার হয়ে আছে অনেক পরিচয়হীন গুরু দায়িত্ব। ওঃ হো! আঙুলে তুড়ি দিয়ে লাফিয়ে ওঠে সে। তপতীর মা ডেকেছিলেন, যাওয়া হয়নি। কালই যেতে হবে। আসবার দিন মনে হচ্ছিল ওঁরা যেন একান্ত আপনার জন। তারপর সব ভুলে গেল, এত দায়িত্বহীনতা তার!...আরে! বাবা দীপ্তির টেলিগ্রাম পেয়ে যে চিঠিখানা লিখেছিলেন, সেখানা অমরদার ঘরে টেবিলের ড্রয়ারে রেখেছিল। জবাব দিতে হবে না? বরং দেরী হয়ে গেল! ঠোঁট কামড়ে উৎপল ফের সনাক্ত করে।...শিবনাথকে এখনও বহরমপুরে রেখেছে। কবে না আলিপুরে

পাঠিয়ে দেয়। দেখা করার দরকার ছিল। কারণ যদি সাক্ষী দিতে হয়, এমন বেফাঁস কিছু বলবে না যাতে শিবনাথ ফেঁসে যায়।...নাঃ, আরতির মুখোমুখি হওয়া বড় লজ্জার ব্যাপার হবে। সেদিন পথেই দেখা হয়ে যেত ওর সঙ্গে। ও রিকশোয় আসছিল। হঠাৎ মধ্য পথে চাকা ফেঁসে রিকশোওলা বিপদে পড়ে যায়। উৎপলের গাড়ি পাশ কাটিয়ে চলে গেল। আরতি কি দেখেছিল তাকে?...কথাটা হচ্ছে, ওই ব্যাপারটা যেন মাথায় গোঁজ মেরে কে বসিয়ে দিয়েছে—বেচারা উৎপলকে খাওয়াতে চেয়েছিল। এখন তো সে সহজেই ওর বাড়ি যেতে পারে, ফেলুবাবুর লোক হয়েছে সে...হতাশ হয়ে ওঠে উৎপল।...আরতি দরজা খুলবে না। সত্যি এ ভীরুতার ক্ষমা নেই।

তারপর ব্যাগ খুলে একরাশ কাগজ বের করে সে। উপুড় হয়ে চোখ রাখে। অনেকগুলো কনসাইনমেন্টের কাগজপত্র। অর্ডার ইনভয়েস চালান ভাউচার। কালেকশানের হিসেব। চেন খুলে তার থেকে একটা লম্বা খাম বের করে একশো টাকার নোটের বাণ্ডিলগুলো কিছুক্ষণ নিবিষ্টমনে গোনে।...এত টাকা!

ফেলুবাবু নেই। দাশুবাবুকে রাখতে দিলেই ভালো হত। সেটা ঠিক হবে কি? এত টাকা নিজের কাছে কোনদিনই দেখেনি। বুক কাঁপে। আশ্চর্য, দাশুবাবুর কাঁপে না। পাথরের মুখ নিয়ে টাকা গোনে। বাকসে রাখে। বাকসে মাথা দিয়ে বিশ্রাম করে। পাথর হওয়া সত্যি বড় শক্ত। নির্বিকার হবার কথা মুখে যতই বলা যাক্, পারা কঠিন আছে। রাস্তার ধারে মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছে দেখে তুমি পাশ কাটিয়ে চলে যাও। ঐ তোমার নির্বিকার চলা নয়। এ চলা ভয়ে পালিয়ে যাওয়ার প্রেতমূর্তির মত একদঙ্গল বাচ্চাওলী ভিখারিণী পয়সা চাইলে নিঃশব্দে আর্তনাদ করে আতঙ্কে সরে যাও দু'হাত তুলে। অথচ পৃথিবীতে এইরকম বা অন্যরকম জিনিস আছে। থাকে। থাকবে। এই নিয়েই পৃথিবী। তুমি তো অন্য পৃথিবীর মানুষ—যে পৃথিবী তোমার মনে মনে বাঁচে, সুখী সহাস সুন্দর নিরুদ্বেগ নিরাপদ সে বিশ্বভুবন। সেখান থেকে এখানে তোমার আসা। এবং তুমি বহিরাগত। তুমি আগন্তুক। ভয়ে দুঃখে ঘৃণায় বেদনায় শিউরে ওঠ। হাতে মুখ ঢাকো। তুমি বহিরাগত!

অথচ এই হচ্ছে বাস্তব জীবনের পৃথিবী। এখানে পাঠানো হয় তোমাকে চিরনির্বাসিতের মতো। তোমার বংশপরিচয় ভোলো। কখন নিজেকেই সনাক্ত করার ক্ষমতা তোমার হারিয়ে যায়। তুমি বহুবচনে বেঁচে থাকো।

ক্রীতদাস, ক্রীতদাস! তোমার পিঠে প্রভুর চাবুক, তোমার বুকে নিজের চাবুক! পালাতে পারো? পালিয়ে যাবে? অন্য কোথাও—যেখানে জীবজগতের আদিম চেতনায় দেউড়বাঁশের নিভৃত অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে তলদেশে সাপের খোলস, খরগোসের আয়ত চক্ষুর বিস্ময়, খেঁকশিয়ালের ধূসর শরীরে অঘ্রানের হিমহিম স্বাদ, তিতিরের চিত্রিত বুকে মাতৃজঠরের উষ্ণতা এবং সামনে ডোরাকাটা বাঘ শুয়ে আছে! আর তোমার সারা গায়ে ঘাসফড়িং মথ শুঁয়োপোকা প্রজাপতি পাখির বিষ্ঠা...বাবলতলীর ছোটবাবু তুমি। তোমার শরীরের কালো লোমগুলো একদিন সবুজ ঘাস হয়ে যাবে। কবরের ধূসর আয়তন যেমন করে ঘেরে তারা তেমনি করে ঘিরবে তোমার ধূসর দেহটা—এই প্রতীক্ষায় দিন গোনো।

হাতে বন্দুক নিলেই ভুল। গুলি ছুঁড়লে ভুল। একশো বছরের পুরনো কড়িকাঠ থেকে প্রবীণ পশমী মাফলার তোমার দিকে ছুটে এসে বলবে—প্রায়শ্চিত্ত করো!

উৎপল টাকাগুলো আর কাগজপত্র ব্যাগে রাখে। ব্যাগটা বালিশের নীচে ঢোকায়। এইতে বালিশ যথেষ্ট উঁচু হয়েছে। শুতে অসুবিধা বুঝতে পেরে সে বিরক্ত হয়। বলে—আমার দ্বারা কিস্যু হবে না।

সেই সময় হলো বেড়াল ঢুকেছে ঘরে। ওপাশের দরজাটা খোলা ছিল। ডিম দুটো সাবাড় করেছে। উৎপল লাফিয়ে উঠতেই সে ছুটে পালায়। কিছুদূর তাড়িয়ে যায় উৎপল। পরক্ষণেই মনে পড়ে দরজা খোলা। ব্যাগে টাকা রয়েছে। তক্ষুনি সে দৌড়ে ঘরে ফিরে আসে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। রূপকথার গল্পের মত। রামায়ণের মত। বেড়ালটা কি সোনালী ছিল? স্বর্ণমারীচ? ভাগ্যিস রাজার মেয়ে সীতা হারায়নি। ফের ব্যাগটা খোলে। খাম বের করে টাকা গোনে। গুনতে গুনতে উঠে গিয়ে এ-দরজাটাও বন্ধ করে দেয়।

ফের দরজায় করাঘাত। ক্ষিপ্র হাতে সব সামলে নিয়ে দরজা খোলে সে।—ব্যাপার কী? আবার কে?

সুশীলের মুখটা তেলতেলে আর উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। সে বলে—এইমাত্র একটা সাংঘাতিক কাণ্ড হয়ে গেল!

—কী?

—প্রসাদজীর গদীতে ডাকাতি।

—সে কি!

—আপনার ঘরে ছিলাম, তখন একটা জিপের শব্দ পান নি? আমি শুনেছি! প্রসাদজী সবে দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছে, হঠাৎ নাকি একটা জীপ এসে দাঁড়ায়। বলে—আমরা পুলিশের লোক। তারপর...আমার তো মশাই বুক কাঁপছে। বাইরে লোক জটলা করছে। পুলিশে খবর পাঠানো হয়েছে। থানাটা আবার এমন বাজে জায়গায় রয়েছে, হঠাৎ কিছু হলে টলে বড় ভয়ের কথা।

—প্রসাদের লোকেরা বাধা দেয়নি?

- আর বাধা! বলছে--সবার হাতে পিস্তল বন্দুক ছিল।

উৎপল গুম হয়ে যায়।

সুশীল বলে—যাবেন নাকি দেখতে?

—নাঃ।

—না যাওয়াই ভালো। আমি কেটে পড়লাম। পুলিশ এলেই তো জিজ্ঞেসপত্তর করবে সকলকে! কিন্তু আপনার দিব্যি, ভীষণ ভয় লাগছে। বাড়ি যাব কেমন করে?

—এখানে থেকে যান বরং।

—নাঃ। পকেটে জেঠিমার হাঁপানির ট্যাবলেট রয়েছে। এতক্ষণ পৌঁছে দেওয়া উচিত ছিল। মহেশ্বরের পাল্লায় পড়ে দেরি করে ফেললাম।

উৎপল একটু ভেবে নিয়ে বলে—আপনার সঙ্গে আমি যেতে পারি, আপত্তি নেই। কিন্তু...সে হেসে ফেলে।...আপনার কথা শুনে আমারও যে বুক কাঁপছে।

—সে কি মশাই। আপনি না নিমগুণ্ডা ছিলেন। সুশীল পরিহাসের চেষ্টা করে। পরে কাঁচুমাচু মুখে বলে—প্লীজ দাদা, তাই চলুন। আমার বাড়ি আবার রাজ্যের শেষ দিকে। পুরো মাইলটাক রাস্তা। গ্রামটাতো কম বড় নয়। না হয় থেকেই যাবেন গরীবের বাড়ি রাতটুকু। এখানে তো দারোয়ান আছেই। লোকজনও কম নেই।

অগত্যা উৎপল ওঠে। ভাত খাওয়া হয়নি।—এ প্রসঙ্গ তোলে না সুশীলের কাছে। দরজায় তালা এঁটে দারোয়ানকে ব'লে বেরিয়ে পড়ে।

হাইওয়েতে শান্তি প্রসাদজীর গদীর চারপাশে লোক গিজগিজ করছে। এখানে ওখানে জটলাও চলছে। ওরা ভীড়ের পাশ কাটিয়ে গ্রামের পথে মোড় নেয়। যেতে যেতে সুশীল একবার বলে—এরকম ডাকাতি এখানে এই নতুন। তবে দেশোয়ালি ডাকাতি অনেকবারই হয়েছে। সে হয়েছে গ্রামের ভিতরে।

উৎপল চাপা গলায় বলে--সুশীলবাবু, আপনি এসে বাঁচালেন। আমার এই ব্যাগে পনের হাজার টাকা রয়েছে।

—বলেন কি! সুশীল একটু দাঁড়িয়ে ফের হাঁটতে থাকে।—ঠিক আছে। আপনি আর আমি ছাড়া আর কেউ তো টের পাচ্ছে না।

বোঝা গেল, তখনও গ্রামের ভিতর খবরটা পাচার হয় নি। ঠাণ্ডা রাতের কুয়াশা মেশানো জ্যোৎস্নায় ঘরবাড়িগুলো রূপকথার নিঝুমপুরীর মত দেখাচ্ছিল। কোথাও কোন লোক নেই। কোন শব্দ নেই। কেবল দু-একবার কুকুর ডেকে উঠল কোথায়। মাথার উপর গাছের ডালে প্যাঁচা ডাকল। পীচের পথ ছাড়িয়ে শিশির ভেজা ধুলোয় নেমে উৎপল বলল—আঃ! বেশ নিরাপদ বোধ করছি এতক্ষণে।

যেন এতক্ষণ পরে এক অপার শান্তির শুচিতায় অবগাহন করতে করতে তার চেতনা গভীর আরাম ও নিরাপত্তার দিকে পৌঁছতে চলেছে।

অপরূপ তন্ময়তায় সে হাঁটতে থাকে। বাদ-নতলীর মাটির ধুলোয় ফের তার অভ্যর্থনার শুরু। হাস্নুহেনার গন্ধ তাকে বরণ করে। গাছের হৃদয় থেকে আনন্দের মত চুইয়ে পড়ে শিশির। তাকে ভিজিয়ে

দেয়। আর জ্যোৎস্না তাকে নীরব হেসে দরজা খুলে দেয়। কুয়াশা ধূপের মত ঘেরে।

আস্তে আস্তে টাকার কথা ভুলে যায় সে।

এগার

খুব ভোরে ঘুম ভেঙে উৎপল বুঝতে পারে, এমন ঘুম জীবনে হয়ত এই প্রথম ঘুমিয়েছিল সে। শরীর আশ্চর্য হাল্কা লাগে তার। পাশ ফিরে দেখে সুশীল তারও আগে উঠেছে। বাইরে বারান্দায় গাড়ুর জলে মুখ ধুচ্ছে সে। উৎপল ওঠে। সিগ্রেট জ্বালিয়ে বাইরে আসে। সুশীল হেসে বলে—উঠেছেন? বালতিতে টাটকা জল এনেছি। টিউবয়েলের জল। বেশ গরম। স্নান করার অভ্যাস আছে ভোরে?

—নাঃ। শীত করছে। উৎপল বলে।

—তাহলে মুখ ধুয়ে নিন। একটু দুধ নিয়ে আসি গয়লাবাড়ি থেকে। চাও আনতে হবে। সুশীল মুখ মোছে। তারপর গ্লাস হাতে বেরিয়ে যায়।

সুশীলের নির্জন বাড়িটা যেন ছায়ার জগতের। উঠোনভরা ঘাস আর আগাছা। মাটির পাঁচিল ঘেঁষে নানারকম দেশী ফুলের গাছ। জবা শিউলি চাঁপাগাছ মরশুমি ফুলের ঝাড়ও গজিয়েছে। দোপাটি মোরগঝুঁটি গাঁদা। বোঝা যায়, এরা পুরুষপরম্পরা এমনি করে জন্মায়। ফুল ফোটায়। মরে যায়। ভেজা স্যাঁতসেতে মাটির জঠরে বীজ ঘুমিয়ে থাকে। জেগে ওঠে বর্ষায় তাদের অঙ্কুর। শিউলির হলুদ শুকনো পাতায় ঘাসের মুখ এখনও ঢাকা। দূর্বা আর বড় বড় মোথা ঘাসের উপর লাল জবা শুয়ে আছে। সারারাত ধরে শিশির এই উঠোনকে সিক্ত করেছে। রোদ না আসা অব্দি ফুলের চোখ থেকে, ঘাসের বুক থেকে জল শুকোবে না। পাঁচিলের ঝাঁঝরা ধূসর খোড়ো চালে শালিখ এসে বসেছে। উৎপল উঠোনে নেমে যায়। নিমগাছের চারা থেকে একটা ডাল ভাঙতে গিয়ে একবার ভাবে। পরক্ষণে নির্দ্বিধায় একটুকরো দাঁতন সংগ্রহ করে নেয়। ছাল ছাড়ানো কিছু ডাল—দুধের সরের মত রঙ এবং বিচ্ছিন্ন পাতাগুলো নুয়ে ঘাসের উপর পড়ে থাকে। ছন্দচ্যুতির মত দেখায় তাদের। সে দাঁতন ঘষে—যদিও অনভ্যস্ত। তবু ভালো লাগে। শালিক পাখিদুটোকে হাতের ইঙ্গিত করে। তারা দ্রুত হেঁটে পালিয়ে যায় দূরে। উঠোন থেকে সে ঘরের চালের দিকে তাকায়। ঝাঁঝরা খয়েরী খোড়ো চাল—অবসন্ন হাতির পিঠের মত—যে হাতির পাঁজরের হাড় গোনা যায়; ক্ষুধার্তদের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। ভাবরাই দাসের ছবি সাঁৎ সাঁৎ করে পর্দায় সরে যায়। উৎপলের প্রশ্ন করতে সাধ যায় বাড়িটাকে—তুমি কি খুবই দুঃখিত? এই দুঃখই কি তোমার সুখ?

উঁচু বারান্দায় কোন্ আদ্যিকালে সিমেন্ট করা হয়েছিল। ফেটে ফুটে গেছে। কাঠের খুঁটিগুলো ধুঁকছে। সে একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে মুখ ধোয়। সেই সময় ওদিকে দরজা খুলে যায়। তপতীর চেয়ে বয়সে হয়ত কিছু বড়, ছিপছিপে ফরসা রঙের একটি মেয়ে—আগোছাল চুল, সাদা ছাপা শাড়ি পরনে, নগ্ন পায়ে এগিয়েই উৎপলকে দেখে থমকে দাঁড়ায়।

উৎপল বলে—সুশীলবাবুকে খুঁজছেন? বাইরে গেছেন। এক্ষুনি এসে পড়বেন। কিছু বলতে হবে?

—না। মেয়েটি অপ্রতিভ হাসে। আমি পরে আসছি'খন।

মেয়েটি পেছন ফেরে। হঠাৎ ফের উৎপল বলে—আচ্ছা, আপনি কি সুশীলদার জ্যাঠতুত বোন?

সীমা ঘোরে না। মুখ ফিরিয়ে থেকেই বলে—হ্যাঁ।

—আপনার নাম সীমা।

—আপনি কেমন করে জানলেন? আমার নাম অসীমা। সীমা বলে দাদা ডাকেন।

ওর মুখের হাসির রেখা পাশ থেকে দেখা যায়। উৎপল বলে—বিলক্ষণ জানি। বহরমপুরে পড়াশুনা করেন?

সীমা মাথা দোলায়।

—এখান থেকে যাতায়াত করেন নাকি?

—হ্যাঁ। বাসে মান্থলি ব্যবস্থা করা আছে। সীমা বাড়তি জানায়।—ডিগ্রিকোর্সের ফাইনাল ইয়ার।

উৎপল বলে ওঠে—আপনার দাদার বাড়িতে অচেনা লোক দেখে ভয় পান নি তো?

সীমা ঘোরে এবার। সলজ্জে বলে—আপনাকে আমি চিনি।

—তাই নাকি। তাই বুঝি ভয় পেয়ে পালাচ্ছেন? আপনাদের গ্রামে তো রটে গিয়েছিল—শিবনাথবাবু কলকাতা থেকে একটা গুণ্ডা এনেছেন।

সীমা কী জবাব দিতে যাচ্ছিল, সেই সময় সুশীল দুধের গ্লাস হাতে ঢোকে। সীমাকে দেখেই সে সোল্লাসে বলে—আরে এই যে, ভালোই হয়েছে। নে, চা কর দিকি। আমার হ্যাঙ্গামা পোষায় না।...তারপর দ্রুত বারান্দায় হাঁটতে থাকে।—দাঁড়া, দেখি স্টোভে তেল আছে নাকি।

সীমা বলে—হ্যাঙ্গামার দরকার কী বাবা! দিন না আমাকে, বাড়ি থেকে করে আনছি।

—বাঁচালি! কেটলিটা ধুয়ে নিস্। ফের উৎপলের দিকে ঘুরে সে বলে—একবার কী হয়েছিল জানেন? কেটলিভরা চা করে খেতে যাচ্ছি, হঠাৎ বদুবাবুর সমন। ভুলেই গেলাম চায়ের কথা। ক'দিন আর বাড়িমুখো আসবার অবসর হল না। একদিন এসে কেটলি খুলে দেখি এক গুচ্ছের পোকা লিকলিক করছে। দুধ খেতে বাইরে থেকে ঢুকেছিল—না দুধেই গজাল, আমি মশাই তার হদিস জানি না। কিন্তু ব্যাপারটা ভাববার মত। বেশ কিছুদিন ভাবতাম। এ একটা রহস্য।

সীমা পণ্ডিতী করেই বলে—পৃথিবীতে জীবন আসাই একটা রহস্য।

শুনে সুশীল চেঁচায়—অই শুনুন, শুনুন মশাই। একেবারে আপনার জুটি। দেখতে মিনমিনেটি হলে কী হবে, মুখ খুললে বিদ্যের ব্রহ্মপুত্রে বান ডাকে। কলেজে ডিবেটে ফার্স্ট হয়েছিল। সাবজেক্ট কী ছিল রে সীমা?

সীমা কপট ক্রোধে বলে—আজেবাজে নামে ডাকলে জবাব দেব না। কই, কেটলি দাও।

সীমা চলে গেলে উৎপল বলে—বেশী দেরী করব না সুশীলবাবু। ফেলুদা এসে পড়বেন। দু'জনে আজ কলকাতা যাবার কথা। ফেলুদার মাথায় একটা ম্যানিওর ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান ঘুরছে। অদ্ভুত লোক। এলাকায় নাকি অজস্র ভাগাড় রয়েছে। সব হাড় তো স্টেশনের ওখানে এক মাড়োয়ারী কেনে। বাই দি বাই, যাবা হাড়টাড কুড়োয়, ওদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ করিয়ে দেবেন?

সুশীল বলে—সাওতালরা কুড়োয় দেখেছি। বলব'খন।

উৎপল একটু চিন্তিত মুখে বলে—ঝোঁকের মাথায় ফেলুদাকে বলে ফেলেছি, ইণ্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেণ্টে আমার নিজের লোক আছে..

সুশীল কথা কেড়ে নেয়—সেই তরুণবাবু?

সুশীলের মুখের দিকে তাকায় উৎপল। তারপর বলে—ওই ছোট লোকটার কাছে যেতে আমার বড্ড বিশ্রী লাগছে কিন্তু। কথাটা বলা ভালো হয় নি ফেলুদাকে।

সুশীল নির্বিকার মুখে বলে—বেঁচে উন্নতি করতে হলে একটু অন্যরকম লাইন দরকার উৎপলবাবু। সেই লাইনে যখন পা দিয়েছেন, তখন আর দ্বিধা করে কী হবে? সারা পৃথিবী এইভাবে চলেছে—আপনি আমি তার তুলনায় পোকার চেয়েও তুচ্ছ। কী ক্ষমতা আছে আমাদের, বলুন।

উৎপল সকৌতুকে বলে—গ্র্যাণ্ড! বুঝলেন সুশীলবাবু, যখনই দ্বিধায় পড়ব, আপনি আমাকে প্রেরণা দেবেন। কেমন?

—আমি তো পাশেই রইলাম দাদা।

সীমা এল। কেটলিভরা চা নয় শুধু, বড় কাঁসার থালায় তেল মাখানো একরাশ মুড়ি, কাঁচা লঙ্কা, আদার কুচি, বেগুন ভাজা। সুশীল বলে—দেখুন কাণ্ড! আমার এত সব লোকজন রয়েছে, তা সত্ত্বেও বোকার মত স্টোভ, কুকার, কেরোসিন তেল করে হন্যে হই।

সীমা বলে—থামুন। বিদেশী ভদ্রলোকের সামনে অন্যের কেলেঙ্কারী করতে হবে না। বাড়িতে পুজোআর্চার দিনও তোমার সময় হয় না, জ্যাঠার বাড়ি পাতে বসতেই মানা...

সুশীল হাত জোড় করে বলে—দোহাই সীমা, ক্ষান্ত দে! প্রসাদের গদীতে রাত্রে ডাকাতি হয়েছে শুনেছিস?

একসময় দু'জনে বেরোবার উপক্রম করছে, তখন সীমা ফের এসেছে। সে বলে—দাদাকে তো বলার মানে হবে না উৎপলবাবু, মা আজ দুপুরে আপনাকে খেতে বলেছেন। বাবাও আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চান।

উৎপল ইতস্তত করে।...

সুশীল বলে—চলুন না, ফেলুদা এসেছেন কি না দেখি। আজকের প্রোগ্রাম ব'লে ক'য়ে বাতিল করা যাবে। সীমা, তুই বল্ গে যা, গ্রান্টেড।

ফেলুবাবু ফেরেন নি। পরাশর ড্রাইভার উৎপলের জন্যে অপেক্ষা করছিল। উৎপল বলে—আজ তুমি ছুটি এন্‌জয় করো, পরাশর। স্টেশনে পৌঁছে দেবার কথাই ওঠে না আর। ফেলুদা এলেন না।

কিছুক্ষণ বসে সুশীল ওঠে। বলে—বারোটা নাগাদ আসছি। রেডি থাকবেন। কাল দুপুর থেকে সোসাইটি অফিসে যাই নি। ওখানেই চললাম।

উৎপল হঠাৎ পিছু ডাকে।—সুশীলবাবু, একটু পরামর্শ দিন তো। টাকাটা কী করা যায়? আপনি রাখতে পারেন না?

হাত নাড়ে সুশীল।—না। বহরমপুরে ব্যাঙ্কে রেখে এলেও চলে। ফেলুদার এ্যাকাউন্টে। পরাশরকে তো ছেড়ে দিলেন। বাসে চলে যান।

উৎপল মাথা নাড়ে।—ফেলুদার ব্যাপার আমি বুঝিনে মশাই। কিসের টাকা কোথায় রাখবো না জেনেশুনে? কোন স্পেশাল নির্দেশও দেন নি।

সুশীল চিন্তিতমুখে বলে—সেও ঠিক। ওঁর আবার অনেক অদ্ভুত ব্যাপার আছে।

হঠাৎ চিন্তিতমুখে বলে—সেও ঠিক। ওঁর আবার অনেক অদ্ভুত ব্যাপার আছে। হঠাৎ উৎপল যেন অন্ধকারে আলো দেখতে পেয়ে বলে—ঠিক আছে। ব্যবস্থা হয়ে যাবে। বুঝলেন?

সুশীল বলে—কোথায় রাখবেন, ভাবছেন?

—জয়াদির কাছে। উনি তো আমাদের মত কাজের লোক নন। স্নান সেরে এসে চুপচাপ ঘরেই থাকেন পড়াশুনা নিয়ে।

—আপনার দিদির কাছে রাখুন বরং।

—ও একই কথা। কিন্তু দিদি...পাগল হয়েছেন আপনি? উৎপল দুলে দুলে হাসে। ও যা চটে আছে আমার উপর। মুখ দেখাতেই চাইবে না। তাও ভীষণ ভীতু টাকা-পয়সার ব্যাপারে। হার্টের অসুখ ধরিয়ে বসবে। জয়াদি দারুণ মেয়ে। ওর কথা আলাদা।

সুশীল চলে যায়। দশটা অব্দি চুপচাপ বসেও পায়চারী করে উৎপল বেরোয় ব্যাগ নিয়ে। সবে ক্লাস শেষ করে জয়া কাপড় ছেড়েছে। বাইরে থেকে উৎপলের ডাক শুনে সে বেরিয়ে আসে। দীপ্তি ঘরেই গুম হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে।

সব শুনে জয়া একবার ইতস্তত করে। বলে—গত রাতে ডাকাতি হয়ে গেছে। তুমি আবার এক দায়িত্ব কাঁধে চাপাতে এলে। সত্যি উৎপল, ও যখের ধন বুকে নিয়ে থাকা ভীষণ কষ্টকর। তা, কখন ফেরত নিয়ে যাবে?

—ফেলুদা ফিরে এলেই।

—ঘরে এস।

উৎপল প্রস্তুত হয়ে ঘরে ঢোকে। সে দেখে দীপ্তি জানালার দিকে মুখ করে বসে আছে। উৎপল পিঠে হাত রেখে ডাকে—ছোড়দি, দ্যাখ কে এসেছে!...এই দিদি!

জয়া মুখ টিপে হেসে বাইরে যায় আবার।

উৎপল বসে পড়ে গা ঘেঁষে। দু'হাতে কাঁধ ধরে দীপ্তির মুখটা ঘোরায়। বলে—তুই কাঁদছিস্? কেন রে? এ্যাদ্দিন আসিনি বলে? তুই অত অবুঝ কেন ছোড়দি। তোরা যা চেয়েছিলি, আমি তো সেই পথেই চলেছি ভাই। মাসে তিনশো টাকা রোজগার করছি। এবার তোকে আর এমনি করে পড়ে থাকতে হবে না। তোর পড়ার খরচ এবার আমি চালাবো। তোকে বাড়ি রেখে আসবো। এবার তো আমাকে অবিশ্বাস করতে পারবি নে। আমি এখন ভীষণ সংসারী, রীতিমত কাজের লোক হয়ে গেছি রে! ফের কান্না?...শোন্, বাবাকে মাসে-মাসে টাকা পাঠাবো ভাবছি...

উৎপলের চোখেও জল এসে যায় কোত্থেকে! দীপ্তি চোখ মুছে বলে—ভালো আছিস?

যেন গন্ধ পেয়েছিল বাতাসে। গেটে ঢুকেই উৎপল দেখে—তপতী বাঘিনীর মত ফুঁসছে।—কী

দরকার ছিল আজেবাজে লোকেদের বাড়ি আসবার।

উৎপল তামাসা করে—তাহলে চলি।

তপতী বলে—যাবেন বৈকি। যার কাছে আসতেন, সে তো নেই।...পরক্ষণেই কান্না চাপতে মুখ ফেরায় সে।

উৎপল বলে—যা বাব্বা! এ পাড়ায় ব্যাপারটা কী হয়েছে! যেখানে যাই, সেখানেই কান্নাকাটি। এ-ই আজেবাজে মেয়ে! এ-ই, হাসো তো দেখি একবারটি! হাসো, হাসো...বাঃ, এই তো চাই!

হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় উৎপল। দরজার কাছে গিয়ে ছেড়ে দেয়। তপতী আগেই ভিতরে ঢুকে ডাকাডাকি শুরু করেছে—মা, ছোড়দি! এই দেখ কে এসেছে!

সরোজিনী নীচের বারান্দায় রোদে বসে ছিলেন। উৎপলকে দেখে বলেন—আজই তোমার কথা ভাবছিলুম। ছেলেটা ফেলুবাবুর ওখানে চাকরী করছে শুনেছি, আসে না কেন।

উৎপল নতমুখে বলে—সময় পাইনে, ভীষণ কাজের চাপ।

শঙ্কর বাঁড়ুযোর সাড়া পাওয়া যায় না। তপতী ফিসফিস করে বলে—বাবা সেই থেকে বাইরে বেরোন না। চুপচাপ জানালায় বসে থাকেন। হাতে বন্দুকের বদলে লাঠি। দাদার বন্দুকটা তো পুলিশ এসে নিয়ে গেছে। বাবা বলেন—এই লাঠিই এখন বন্দুক তাঁর। ওই দিয়ে বাঘটা মারবেন। উৎপলদা, লোকে বলছে—বাবা নাকি পাগল হয়ে যাচ্ছেন।

—ডাক্তার দেখিয়েছ?

—হ্যাঁ। ডাক্তারও তাই বলেছেন।

সুমিত্রা বেরিয়ে আসে।—কী সৌভাগ্য আমাদের। ভেবেছিলাম ঈশ্বর বিমুখ হয়েছেন, গ্রামের লোকও এ বাড়ির ছায়া মাড়ায় না, উৎপলবাবু কি আসবেন আর এ অভিশপ্ত বাড়িতে!

কথাটা যেন আচম্বিতে বিরাট ড্রামের মত গুম গুম করে বেজে উঠেছে বাড়িটার ভিতর। যথেষ্ট রোদ পড়ে আগে উঠোনের চত্বরে। উপরে নীচে বারান্দায় আঁকড়ে ধরে সকাল থেকে রোদ নামছে থামের গা বেয়ে। তবু হঠাৎ এই বাইরের উপ্‌চে আসা আলোটাকে অভিসন্ধিপরায়ণ দেখায়। ভিতরের ছায়ায় খসখস করে নড়ে ওঠে অশরীরী মাফলার। গড়িয়ে-গড়িয়ে কোণের দিকে সরে যায় শূন্যগর্ভ বন্দুক। বনের রোমশ হাত পাঁচিলে দেয়ালে। সবুজ শ্যাওলা আমরুল পরগাছা বুগানভেলিয়া ল্যাভেণ্ডার ম্যাগনেলিয়া মাধবীলতা ঝাউ বর্মীবাঁশ আর মুথোঘাসের ছবি আঁকতে আঁকতে হঠাৎ থেমে থাকে। পাথরের হৃদয় নিয়ে স্তম্ভের পরী আর দেবদূত ছুটে পালাতে চায়। শিশির মোছা তাঁদের শুদ্ধ শরীরে কাকের ভীষণ উপদ্রব। অজস্র রকম অতিবাস্তবতার অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হতে হতে শোনে বাইরে সেই সব কাকের ডাক। আশিব ঘোষিত হয় বাড়ি ঘিরে।

—ওকে ওপরের ঘরে নিয়ে যা তপু। সরোজিনী বলেন।

দরজা খুলতে খুলতে তপতী বলে—সেই অব্দি বন্ধ। আপনি চলে গেলেন, আর এলেন না।

—আমি কি চিরকালই এ ঘরে থাকতে পারি তপতী?

উৎপলের হঠাৎ মনে হয়, এইমাত্র অমরদা সেই স্কীমের কাগজগুলো টেবিলে ফেলে রেখে চলে গেলেন! সে টেবিলে দেখে, পেপারওয়েট চাপা সে রাতের সব হিসেবপত্তর অবিকৃত আছে। কেউ সরায়নি।—একটি চিঠি রেখে গেছি ড্রয়ারে! উৎপল বলে।

তপতী বলে—তাছাড়া কি আর আসতেন?

—আসতুম। তেমন জরুরী চিঠি কিছু নয়। উৎপল চেয়ারে বসে। তপতী জানালাগুলো খুলে দেয়। ঘরে যথেষ্ট আলো আসে। আলোয় তপতীর দিকে তাকায় সে। তপতী চোখ ফেরায়।

তপতী বলে—ভাগ্যিস এলেন। দু'দিন পরে এলে আর আমাকে দেখতে পেতেন না। রোববার দিদির সঙ্গে বহরমপুর চলে যাচ্ছি। ওখানেই থাকব আমি।

—তোমার দিদির ঠিকানাটা দাও। বহরমপুর গেলেই তোমাকে দেখে আসব!

—দেখে আসবেন? কী আছে দেখবার মত—একটু কুচ্ছিত পেঁচী মেয়ে...

—তুমি সুন্দর। প্রজাপতি!

তপতী নড়ে ওঠে—যান্, শুধু অসভ্যতা।

—কাছে আসবে?

—এই! চুপ এক্ষুনি ছোড়দি আসবে।

—আসবে না কাছে? তপতী!

—এই তো আছি কাছে।

—তোমার হাতটা দাও।

—হাত গুনতে জানেন? সত্যি?

—জানি, দাও।

তপতী নির্দ্বিধায় তার হাত এগিয়ে দেয়। খাটে বসে মুখোমুখি। উৎপল হাতের চেটোয় কিছুক্ষণ হাত বোলায়। দু'পাশে টিপে মাঝের রেখাগুলো স্পষ্ট করে দেখবার ভান করে। তারপর করতলে করতল আঙুলে আঙুল—ওর মুখের দিকে তাকায়। তপতী বলে—কই, বলুন কী দেখলেন?

—তোমাকে একজন ভীষণ ভালবাসে।

—দায় পড়েছে কারুর।

—তুমিও তাকে অসম্ভব ভালবাসো।

তপতী হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ব্যস্তভাবে বলে—হয়েছে, হয়েছে! অমন হাত দেখা আমিও দেখতে জানি। কই, দিন আপনার হাত।

উৎপল হাত তুলে দেয়। তপতী দেখে বলে—আপনাকে একজন ভীষণ ভালবাসে।

—তারপর?

—আপনি কিন্তু তাকে মোটেও ভালোবাসেন না।

কপটতা করে উৎপল ভুরু কোঁচকায়। বলে—সে তো বড় বিচ্ছিরি ব্যাপার! বল তো কী প্রকারে তাকে ভালবাসা যায়? কোন গ্রহ কুপিত দেখছ?

—গ্রহ-ট্রহের ব্যাপার আমি জানি নে বাবা! আমি শুধু জানি—ভালবাসলে ক্ষতি কী?

—ক্ষতি? সত্যিই তো ক্ষতি কী? বেশ—ভালবাসব।

—ইস্! তপতী হাতটা ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। আলমারির সামনে গিয়ে কী যেন খোঁজে। তারপর বলে—দাদার একটা অদ্ভুত বই ছিল। নামটা বড় বিচ্ছিরি—ভালোবাসার রহস্য। ডাক্তারের লেখা বই। আমি কিন্তু লুকিয়ে অনেকটা পড়ে ফেলেছিলাম। বইটা আর দেখতে পাইনি হঠাৎ। কী যে হল!

উৎপল দুম করে উঠে যায় কাছে। আলমারিটা ছিল কোণের দিকে। ভৌতিক ছায়া থমথম করছিল সে আলমারির। সেখানেই সে তপতীকে ধরে ফেলে ও বারবার চুমু খেতে থাকে। তপতীর মাথা আলমারির কাচে ঘষা খাচ্ছিল। সে বেদনায় কিংবা সুখে মাথাটা ঘষছিল এপাশে ওপাশে। মাকড়সার জাল জড়িয়ে যাচ্ছিল টালমাটাল খোঁপায়। একসময় উৎপল তাকে ছেড়ে সরে আসে। সামনে দাঁড়ায়। দেখে তপতী মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে। তার পায়ের কাছে কাপড় কাপছে। ঠোঁট ঈষৎ বিস্ফারিত। দু'পাশটা ভেজা। উৎপল বলে—রাগ করলে তপু? আমি তোমাকে ভালবাসতে চাই। বিশ্বাস করো, ভালবাসা আমার জীবনে কত প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। কিন্তু আমি জানি না, কেমন করে ভালবাসতে হয়। ভালবাসা কী, তাও বুঝতে পারি না। ভিতরের প্রবল কাকুতি হঠাৎ আজ ভালোবাসার দরজা খুলতে চাইল। দেখ তপতী, এ আমার প্রথম দরজা খোলা। জানিনে, কী আছে ভিতরে। কী পাব। তবু...তপতী, তুমি কি রাগ করলে? তুমি রাগ করবে? ঘৃণা করবে আমাকে?

তপতী মাথাটা একটু দোলায়। তারপর বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। তার এ চলায় যেন কিছু আভিজাত্যের ছন্দ ছিল। কিছু অহঙ্কার ছিল। আর ছিল কিছু আশ্বাস। কিছু বিশ্বাস।

আরও কিছুক্ষণ থেকে উৎপল উঠল। সুশীল বাসায় গিয়ে বসে থাকবে। সীমাদের বাড়ি নেমন্তন্ন। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামবার সময় তার একবার ইচ্ছে করছিল, যে ঘরে অমরদা আত্মহত্যা করেছিলেন, সে ঘরটা একবার দেখে যায়। কিন্তু পাছে এদের স্মৃতিতে শোকের ঘুমন্ত পাহাড়ে উত্তাপ লাগে এবং কান্নাকাটি পড়ে যায়, তাই সে ইচ্ছাটা দমন করল। শঙ্করবাবু ওপরের ঘরে জানালার কাছে বসে আছেন। হাতে লাঠি। উৎপলকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। কথা বলেন নি। দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্তের মত। অস্বাভাবিক। সুমিত্রার ইচ্ছা—বাবাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে। চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে ওখানের হাসপাতালে।

সরোজিনী বলেছিলেন, এখানকার সম্পত্তি ঘরবাড়ি বেচে ওরা বহরমপুরে গিয়েই থাকবেন। কথাটা এত খারাপ লেগেছে উৎপলের।

বাসায় গিয়ে দেখে সুশীল বাইরে অপেক্ষা করছে। তাড়াতাড়ি টিউবলে স্নান করে নেয় উৎপল। আশ্চর্য এক উত্তেজনা তার রক্তকে বারবার চঞ্চল করছিল। অলক্ষ্যে ঠোঁটের দিকে উঠে যাচ্ছিল তার আবিষ্ট আঙুল। তপতীর বিস্ফারিত ঠোঁট, কাঁপন, নিশ্বাসের প্রশ্বাসের গন্ধ, চুলের স্পর্শ স্নানের পরও তার স্মৃতি শরীরে জড়িয়ে থাকে। সেই প্রাচীন মেহগিনি আলমারি ভৌতিক ছায়া নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায় বারবার এবং রহস্যময় কাচে প্রতিফলিত দুটি একাকার প্রতিবিম্ব ভয়াল ময়ালসাপের মত জড়াজড়ি করে যেন অরণ্যের দুর্গম স্যাঁতসেঁতে অন্ধকারে চলে যায়। খরগোসের বুকের নীচে, তিতিরের পায়ের কাছে সেই একাকার সাপের খোলস পড়ে থাকে। খেঁকশিয়ালের ধূসর ঠাণ্ডা পা থেকে ব্যাঙের ছাতার মত ফুল ফোটবার আয়োজন শুরু হয়। সামনে ঘুমিয়ে থাকে ডোরাকাটা বাঘ।

---সুশীলবাবু, বাঘটার কী হল? হঠাৎ উৎপল প্রশ্ন করে।

সুশীল বিরক্তভাবে বলে---ছেড়ে দিন। সব ধোঁকাবাজি!

উৎপল গম্ভীর হয়। বলে---তা না হতেও পারে!

অন্ধ অশোক চৌধুরী পায়ের শব্দে টের পেয়ে অভ্যর্থনা করেন ওদের। উৎপল অনেক দরিদ্র সংসারের ছবি দেখেছে। কিন্তু এ তার এক নতুন অভিজ্ঞতা। সুশীলের মতই একখানি খোঁড়া ঘর দুটো কামড়া, উঠোনোর কোণে রান্নাঘর। ঝকঝকে তকতকে উঠোন। ফুলের গাছ প্রথাসিদ্ধ তুলসীমঞ্চ। পাঁচিলের ওপাশে বাঁশবন। হাওয়ার শব্দে মেশা নানারকম ভৌতিক কান্নার সুর। বুঝি মধ্যরাত্রে পেঁচা ডাকে। তক্ষক ডাকে। শেয়াল হাঁটে শুকনো পাতায়। অথচ ঘরের ভিতর এ এক অন্য জগৎ। যে দিকে তাকায় শুধু বই আর বই। আসবাবপত্র বলতে দু-একটা টেবিল, চেয়ার, তক্তপোষ। তাক ভর্তি দেয়ালে তক্তায় স্তূপাকৃতি মেঝের বিছানায় চারপাশে শুধু অজস্র বই।

জানালা দিয়ে আলো আসছে, তা বই পড়ার উপযুক্ত নয়। এবং একজন এই বইয়ের জগতে চুপচাপ বসে থাকেন সারা দিনমান। কোথাও বেরোন না। বেরোতে চান না। বাইরের জগতের প্রতি চিরকালের কী অভিমান একদা এই লোকটিকে ঘরের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। শুধু ঘরের দিকেই নয়, মনের ভিতর বন্দী করেছিল। সে মনের ভিতর দেখল এক সর্বব্যাপী বিচিত্র বিশ্বলোক, না, তার আর বাইরের চোখের প্রয়োজন ছিল না।

---হয়ত সে অহঙ্কারের সবটুকু ছিল আমার অভিমান। যে পৃথিবীকে আমি ছেলেবেলায় জেনেছিলাম সত্য শিব আর সুন্দর বয়ঃপ্রাপ্ত হলে দেখি সব মিথ্যা অশিব অসুন্দরের এক ভয়ঙ্কর সর্বগ্রাস। কোথাও দেখছিলাম না একটু আশ্বাস। ভাবছিলাম---এ যদি হয়, তাহলে মানুষ বাঁচবে কেমন করে? একটা ছোট্ট ঘটনার কথা বলি। বাবলতলী হাইস্কুল ক'বছর আগে মালটিপারপাস স্কুল করা হল। এর উদ্যোক্তা ছিলেন বদুবাবু। আমি তখন বাইরে দূরের একটা স্কুলে ছিলাম। বলাবাহুল্য আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে পারিনি। তারপর এসে সব জেনে শিউরে উঠলাম বাঁড়ুযো পরিবারের নাম তো মোছা হলই, ম্যানেজিং কমিটির জনাকয় সদস্য গুম করে তাঁদের স্বাক্ষর এনে যেভাবে বদুবাবু সেক্রেটারী হলেন, আমি অবাক হয়ে গেলাম। তারপর একের পর এক নানান ঘটনা...,ভাবছিলাম, কী করা যায়। ঈশ্বর হঠাৎ মুখ ফেরালেন আমার দিকে। চোখ দুটো মুছে দিলেন,।...প্রথমদিকে দুঃখ পেয়েছি। দারিদ্র্য এসে আঘাত করেছে চারদিক থেকে। তবু কী আশ্চর্য, অহঙ্কারের যে কুশ্রীতা, তাই আনন্দ হয়ে আমার সামনে এল। হ্যাঁ, আমি মনের অহঙ্কারকে বরণ করে নিলাম। সে আমাকে বলল---এস, আমরা ভিতরের জগতে চলে যাই।

...তবু যন্ত্রণা। সে জগতে স্মৃতির বড় উপদ্রব। তুমি দেখেছ, পুরনো বাড়ির ভিতর যেমন পায়রা ডানা নাড়ে। তোমার ভয় করে। তুমি চমকে ওঠ। অথচ স্মৃতিই ফের করুণা করে। তার করুণায় জীবন বিশ্বাস ফিরে পায়। অবিশ্যি সুশীল না থাকলে সে বিশ্বাস মাটি পেত না। করুণা---মানুষের করুণা, ভাইপোর করুণাই আসলে বাঁচিয়ে রেখেছে।

স্থিরভাবে মুখ তুলে অশোক চেধুরী কথা বলেন। উৎপল শোনে। যেন এক ঘুমন্ত ভিসুসিয়াস তার চোখের সামনে ফোটে! আত্মপ্রবঞ্চক আগ্নেয়গিরি!

সুশীল জনান্তিকে বলে—সীমা বই পড়ে শোনায়। ও না থাকলে অন্য কেউ। পড়াশোনা ছাড়া আর কিছু কাজ নেই জেঠুর। শুধু বই আর বই। তাছাড়া একখানা আত্মজীবনী লিখছেন। সে বড় অদ্ভুত। উনি মুখে বলেন, সীমা লেখে।

যেন ভয় পেয়েই উৎপল ওঠে। কালো চশমা ঢাকা মুখ, যেন ত্রিকালদর্শী বিধবার দুটি ভয়ঙ্কর চক্ষু দিয়ে তাকে কোথাও আকর্ষণ করছে ভিতরে। কী আছে ভিতরে? আছে যা তা জানে উৎপল। জেনেছিল বাবলতলীর এক ছোটবাবু। জেনেছে হয়ত তপতীর মত মেয়ে—যে ভালবাসার রহস্য অন্বেষণ করতে ব্যস্ত। কাঁড়িকাঁড়ি বই তোমাকে যোগায় অজস্র প্রতিবিম্বগুলো—প্রিজমের ভিতর আলোর মত সরলরৈখিক কাটাকুটি বিপ্রতিক ত্রিভুজ সমান্তরাল নানা রশ্মিতে তারা বিমূর্ত একাকার। বহির্বিশ্বকে ছাড়িয়ে তুমি যেতে পারো না। অবোধ তুমি!

মন কেমন করে অনেকক্ষণ। ভারী হয়ে থাকে। হাঁটতে হাঁটতে অনামনে সে স্কুলবাড়ি পেরিয়ে যায়। জয়াকে ভুলে যায়। দিদির কথা ভোলে। তপতীর কথাও মনে পড়ে না। শুধু খচখচ করে কাঁটা বেঁধে মনে। হঠাৎ যদি একদিন সেও অন্ধ হয়ে যায়! সেও যে চেয়েছিল এ কুৎসিত কদর্য পৃথিবীর বাস্তবতা থেকে বাঁচতে। কিন্তু এ কি বাঁচা? অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকবে, তাকে মুষ্টাঘাত করবে কারা, তাদের খুঁজে পাবে না। অক্ষম ক্রোধে সে শুধু আর্তনাদই করবে।

ফেলুবাবু টেলিগ্রাম করেছেন। শিলিগুড়ির ওদিকে কোন দুর্গম জায়গায় গিয়েছিলেন। এক চা বাগিচায় অংশ রয়েছে। সেটা পুরোপুরি কেনবার সুযোগ এসেছিল। ফেরার পথে উনিশ বাই উনিশ কাঠের অর্ডার দিয়ে আসবার কথা। দাশুবাবু জানালেন।

টেলিগ্রাম মর্ম : পথে কোথায় ধস ছেড়ে যাতায়াত রুদ্ধ। তাতে ভীষণ বরফ পড়ছে। আটকে গেছেন। পথ মেরামত অবশ্য শুরু হয়েছে। কবে নাগাদ আসতে পারবেন, সেটা অনিশ্চিত।

কিছু নিদেন আশও রয়েছে। কোড ল্যাঙ্গুয়েজ। সেটা দাশুবাবু ভালো বোঝেন। জানালেন—আপাতত কালেকশান বন্ধ রাখতে হবে। ইতিমধ্যে যদি কিছু হয়ে থাকে, কাছেই রাখতে বলেছেন।

—আমার কাছে, না আপনার কাছে? উৎপল প্রশ্ন করে।

দাশুবাবু চশমা মুছে নিয়ে বলেন—সেটা তো কিছু বলেন নি দেখছি। রেখে দিন না।

—নাকি আপনি নেবেন? হাজার পনের আছে কালেকশান।

দাশুবাবু একটু ভেবে বলেন—যদ্দিন অপানার মারফত কালেকশান হচ্ছে, কোথায় কী রাখা হয়, আমি খবর রাখিনে। কাজেই ধরে নিচ্ছি, আপনিই রাখবেন। ফেলুবাবু মশাই মেজাজী লোক, পান থেকে চুন খসলে ক্ষেপে যান। যা হুকুম, টায়ে টোয়ে পালন করা চাই।

হঠাৎ ঝুঁকে চাপা গলায়, একটু ফ্যাকফ্যাক করে হেসে, দাশুবাবু বলেন—ফেলুবাবুর সব টাকার রঙই সাদা নয়। এ্যাদ্দিন রয়েছেন, এটা বোঝেন না? হঠাৎ এদিক ওদিক হলে কাঠ গোলায় কাঠের তক্তা সরিয়ে পুলিশ খুঁজবে—আপনি তো নবাগত। তায় যুবাপুরুষ! ছেলেছোকারাব কাছে ফেলুবাবুর গুপ্তধন গচ্ছিত থাকবে। ভূতেও বিশ্বাস করবে না। এদিকে আমি হলাম পুরনো লোক...

এ এক বিশ্রী সমস্যায় পড়া গেল। বোঝা যায়, দাশুবাবুর গদীর নীচে এমনিতেই বেশ কিছু জমে আছে। প্রতিদিনই জমতে বেচারা আর বোঝা নিতে রাজী নন। তার ওপর সদ্য পথের ধারে-পাশেই বিচিত্র ডাকাতি! এখনও তার উষ্ণতা কমেনি বিন্দুমাত্র।

বরং জয়াদির কাছে, নিরাপদেই আছে। মেনকা...নাঃ, সে কেমন করে টের পাবে!

ছোট দিনের বেলা। কখন ঘুমের মধ্যে ফুরিয়ে গেছে। রতন এসে ডাকছিল। সন্ধ্যা নেমেছে বাবলতলীতে। দরজা খুলে উৎপল চা করতে বলে তাকে। তারপর মুখ ধোয়।

সেই সময় বাইরে তপতীর গলা। কাকে জিজ্ঞেস করছে—এখানে উৎপলবাবু থাকেন? কোন ঘরে?

উৎপল বেরিয়ে আসে।—এই যে! কী খবর?

তপতী বলে—উঃ, কী জায়গায় থাকেন! ঘুম হয় আপনার? একগাদা মোটর গাড়ি!

তপতী তক্তপোষে বসে ঘাড় ফিরিয়ে চারপাশটা দেখে। উৎপল বলে—হঠাৎ সশরীরে যে, ভয় করল না।

—ভয় কিসের?

—তোমাদের গ্রামে আবার অদ্ভুত কাণ্ড হয় কি না!

—এটা তো গ্রাম নয়। গ্রামের বাইরে। তাছাড়া পরশুতো চলেই যাচ্ছি একেবারে। যতক্ষণ আছি, যা খুশী করে যাবো!

—তাই নাকি! পারবে তো? উৎপল একটু তফাতে বসে। রতন আড়চোখে তাকাচ্ছে। তপতী বলে—ওটা কে? কোত্থেকে জোটালেন?

—তোমাদের গ্রামেরই। চেনো না? পাণ্ডাদের বাড়ির ছেলে।

—খবর রাখিনে বাবা!

—কী খাবে বলো। উৎপল পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে।—রতন, এদিকে আয়তো।

তপতী ব্যস্তভাবে হাত নাড়ে—না, না। আমি কি খেতে এসেছি নাকি? এসেছিলাম মাধবীদির ওখানে।

—হসপিটালের...

—হ্যাঁ। তারপর ভাবলাম, দেখে যাই কী সুখে আছেন!

উৎপল ওর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর বলে—আলো জ্বালি। অন্ধকার হয়ে এসেছে। সুইচ টিপতেই আলোয় ঘব ভরে যায়। তপতী উঠে গিয়ে ক্যালেন্ডারের ছবি দেখে। মুখ ফিরিয়ে একটি মারাত্মক কটাক্ষ করে এবং মুখ টিপে হাসে।

উৎপল রতনের দিকে ইঙ্গিত করে চোখ টেপে। তাকে অস্বস্তি এসে ঘিরে ধরে। যেন তপতী পালালে বেঁচে যায়।

কিন্তু তার চেয়ে যদি বরং রতন চলে যায়...!

ফের চুমু খাবে কী তপতীকে? দরজা বন্ধ করে দেবে? দোটানায় উৎপল ঘেমে ওঠে। অথচ একটা চঞ্চলতা তার রক্তে খেলা করছে। কোথাও ঘৃণা নেই। শুধু প্রবৃত্তির খেলা কি। শুধু কি জৈব তাগিদ? আর কিছু নেই?...তাহলে, তাহলে তো অনেক মেয়ে ছিল! কেন তপতী? নাকি হাতের কাছে সহজে মিলছে! যেচে পড়ে এসেছে! সে তপতীর গায়ের পড়াটুকুই দেখতে পায়। খুবই ছোট মনে হয় ওকে। খুবই তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর। হঠাৎ করে ফিরে আসে প্রতিধ্বনি—কী সুখে আছেন, দেখতে এলাম!

—দেখলে, কী সুখে আছি? উৎপল বলে।

কেটলি নামিয়ে রতন বাইরে যায়। কিছু খাওয়াতেই হবে তপতীকে। না খাওয়ালে, সেটা অভদ্রতার বাড়া হবে। উৎপল বলে ফের—জবাব দিলে না? তপতী!

—উঁ? তপতী অন্যমনা ছিল।

—সুখ দেখলে আমার?

—কই সুখ?

—নেই?

—না।

—কেন নেই বলছ?

—আপনাকে এখানে এই ঘরটাতে মানায় না।

—কোথায় মানায়?

—সে জানি না। অন্য কোথাও।

—কেন একথা তোমার মাথায় এল? আমাকে কী ভেবেছ তুমি, তপতী?

—জানিনে, যান। তপতী হেসে ওঠে।...ইস্ মা...গো। ফেলুবাবুর গদী—যে ফেলুবাবু একদিন ভুঁষি বেচত, এইসব আজে বাজে মালগাড়ি টাকাপয়সা জমাখরচ, খাতালেখা...ছ্যা ছ্যা!

—তবে কী করতে বল তুমি? উৎপল কৌতুকের ভান করে।

—অত বুঝিনে বাবা!

রতন আসে। ঠোঙায় মিষ্টি। প্লেটে সাজিয়ে নিয়ে আসে। তপতী একবার মুখে দেয় মাত্র। পরক্ষণে একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে সে। রতন বাইরের বারান্দায় চা ছাঁকছিল কাপে। সেই অবসরে তপতী এঁটো

মিষ্টিচা আচমকা উৎপলের মুখে গুঁজে দেয়। উৎপল নির্বোধ বলে চিবোয়। হাসতে চেষ্টা করে। তপতী বলে—জাত মেরে দিলাম। আমার মেরে দিয়েছেন যে!

দু'জনে হেসে ওঠে। তারপর উৎপল বলে—আরও মারতে পারি বাগে পেলে।

—পাবেন না। পরশু ফুড়ুৎ করে উড়ব।

—আহা, বহরমপুর চিনি না তো!

—ছোড়দির দেওরগুলো কিন্তু ভীষণ গুণ্ডা। সাবধানে।

—আমিও কলকাতার গুণ্ডা।

তপতী হঠাৎ ওঠে।—চলুন, বাড়ি পৌঁছে দেবেন।

সারা পথ ওরা হাল্কা কথায় ভরে দিতে দিতে পাশাপাশি হাঁটে। জ্যোৎস্নায় ওদের অস্তিত্ব বাবলতলীর সব বাস্তবতা পায়ে মাড়িয়ে এক অবাস্তব অনুভূতির রাজ্যে চলে যেতে থাকে। গেট পেরিয়ে ক্যাকটাসের জঙ্গলটার কাছে থেমে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে চুমু খায়। বেশ কিছু সময় ওরা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর এগিয়ে যায় দরজার দিকে।

তপতীকে পৌঁছে দিয়ে এসে উৎপল দেখে সুশীল হাজির। ফেলুবাবুর খবর নিতেই এসেছিল। ওকে চিন্তিত দেখাচ্ছিল।

উৎপল বলে—সুশীলবাবু, ঘাবড়ে গেলেন মনে হচ্ছে।

—এ্যাঁ! সুশীল যেন চমকে ওঠে।—না। ঘাবড়ানোর কী আছে? কেবল, ফেলুদার কথা ভাবছি। বড় সমস্যা।

কিন্তু রোববার এসে গেল, ফেলুবাবুর খবর নেই। কাগজে খবর বেরিয়েছে উত্তরের পাহাড়ে কোথাও কোথাও ধস ছেড়েছে। প্রচণ্ড বরফ। কয়েকটা গ্রাম নিস্মার করে চূড়া থেকে নেমে এসেছে বরফের চাঁই। হিমবাহের উপদ্রব। ফেলুবাবুর গদী কর্মশূন্য বললেই চলে। খালি ট্রাকগুলো আর ভর্তি হয় না। বাইরে থেকে এজেন্সীর মাল নিয়ে যে কয়েকটা গাড়ি এসেছিল, উৎপল তাদের খালাস করে। গোডাউনে মালগুলো রেখে দেয়। ওদিকে বহরমপুর থেকে অর্ডারসাপ্লায়াররা ঘনঘন আসছে। উৎপল তাদের ঠেকিয়ে রাখছিল। কর্মচারীরা চিন্তিত। এ মালিক এমন মালিক, নিজের কাজ নিজেই দেখাশুনা করতে অভ্যস্ত। কর্মচারীরা শুধু অন্ধকারে হুকুম তামিল করে মাত্র। তাছাড়া ফেলুবাবুর ছেলেপুলে বা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনও নেই। শৈশবে অনাথ এক জমিদার সন্তান—নামেই জমিদার সন্তান, মাত্র কিছু বাস্তু ডাঙ্গার মালিক—সে একদা ভুষি বেঁচত বাদশাহী সড়কের ধারে আটচালায়। সড়কে অজস্র গরুমোষের গাড়ি যাতায়াত করত মাল নিয়ে এদেশ থেকে ওদেশ। এইখানে চটিতে জিরিয়ে নিত। ফেলুবাবু শুধু ভুষিই বেচতেন না—নুনতেলও যোগাতেন। কালক্রমে এই বিরাট যজ্ঞশালা গড়ে উঠেছে। অধ্যবসায়। ফেলুবাবু পঞ্চাশ পেরিয়ে ভাগ্যলক্ষ্মীর কোলে ঠাঁই পেয়েছেন। এই হচ্ছে মোটামুটি ইতিহাস। এখন সংসারে থাকবার মধ্যে শুধু স্ত্রী। কিন্তু দীর্ঘকাল স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা নেই। তিনি আছেন বাপের বাড়ি কান্দি শহরে। হঠাৎ খেয়াল হলে হুট করে দু'দিনের জন্যে আসেন। ফের ঝগড়াঝাঁটি করে কেটে পড়েন। সুতরাং ফেলুবাবু বসতবাটি তৈরীর দিকে মন না দিয়ে ব্যবসায়ের ঘর বানিয়েছেন অজস্র। তার মধ্যে একটিতে থাকেন। উৎপলের ঘরের পাশেই সে ঘর।

তবে নামেই বড়লোক বা হাঁক ডাক। আচরণে পথের মানুষ। রাজ্যের লোকের সঙ্গে গলাগলি আলাপ-পরিচয়। এলাকার ডাকসাঁইটেরা সব অনুগত কুকুর। কয়েক ডজন গুণ্ডা প্রকৃতির ছেলেছোকরা আশেপাশে নিয়ে দিন কাটে।

উৎপল প্রথমে দমে গিয়েছিল—পরে সয়ে গেছে সব। বিশেষ করে ওদের আশেপাশে দেখলে তার মনে কতরকম বেয়াড়া সাধই না গজায়। ইনকেলাব, রাইফেল, রবিনহুডী কার্যকলাপ...এইসব অদ্ভুত এ্যাডভেঞ্চার!

সেই শতদল মৈত্র আর তার বাবা।

সুশীল খবর দিতেই সোৎসাহে ছুটে যায় উৎপল। এক ভয়ঙ্কর রাত্রে ঘণ্টাখানেকের দেখা মুখ, তাও আলো যথেষ্ট ছিল না। বর্ণনার সবটুকুই হয়ত উৎপলের স্মৃতির ঘষা দাগ ধরে আঁকা রঙবুলনো ছবি। কেবল মিলে যায়—সায়েব-সায়েব চেহারা! তবু সংশয় ঘোচে না। সুশীল বলে—মিস দীপ্তি

সেনের ভাই উৎপল সেন। ফেলুবাবুর রিপ্রেজেন্টেটিভ।

শতদল নমস্কার করে মাত্র।

উৎপলের রক্ত চনমন করে। এই কি সেই রাতের বন্ধু? আগে থেকেই প্রশ্ন করা অভদ্রতা। প্রসঙ্গটা সুবিধেমত উত্থাপন করা যাবে। ঢালু বাঁজা ডাঙাটা ফিতে দিয়ে মাপজোকে ওরা ব্যস্ত। এক ফাঁকে সুশীল বলে—মিঃ মৈত্র, আসুন, ফেলুদার ওখানে একটু বসা যাক্। বাবা তো রইলেন।

—চলুন।

বেশ কায়দা করে কথাটা বলে শতদল মৈত্র। নাঃ, সে রাতের লোকটির সঙ্গে মেলে না। উৎপলের ভালো লাগে না—কোথাও যেন একটু অগ্রাহ্য করা হামবড়াইপনা রয়েছে ভদ্রলোকের। চাঁছাছোলা দুরস্ত কেশবিন্যাস, মেপে-কথা বলার চেষ্টা, ঠোঁটের কোণে ও চিবুকে খাঁজ কেটে কাজের ভাবনায় ব্যস্ত লোকের ভঙ্গী, মনে মনে রেগেই ওঠে উৎপল। এখানে থাকবে তো? টের পাইয়ে দেব—রোসো।

উৎপল নিজের ঘরেই বাঁক নেয়। সুশীল শতদলকে বলে—বরং উৎপলবাবুর এখানে ঢোকা যাক্, আসুন।

—বেশ তো! শতদল বলে।

রতনকে খাবার আনতে বলে উৎপল বেশ সপ্রতিভ করে তোলে নিজেকে। সুশীল হঠাৎ বলে—উৎপলবাবু, আপনি এক ভদ্রলোকের কথা বলছিলেন, ইনিই কি তিনি?

উৎপল কঠোর মুখে সুশীলের দিকে তাকায়। শতদল বলে—ব্যাপার কি?

সুশীল কথাটা তুলতে যাচ্ছিল। বাধা দিয়ে উৎপল বলে—এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তাঁর নামও শতদলবাবু। না, আপনি নন।

শতদল শুধু বলে—ও।

সুশীল পরক্ষণে ব্যাপারটা আঁচ করে নিয়েছে। কোন এক রাতে ওয়াগন ব্রেকারদের দলে উৎপলকে যে দেখেছিল, তার চোখে উৎপলের একটি নির্দিষ্ট চেহারাই ফুটে থাকবে। এখন দিনের আলোয় এতদিন পরে একশো মাইল দূরে যে উৎপল বসে আছে, তাকে অপমান করা কেন? সে একটু হেসে অন্য কথা পাড়ে। বাবলতলীর আবহাওয়া বাজারের গতি ইত্যাদি নিয়ে কথা বলে। উৎপল চুপ করে থাকে।

একসময় দীপ্তি ও তরুণের কথা এসে যায়। শতদলই তোলে।—আচ্ছা সুশীলবাবু, মিস সেনের সঙ্গে আলাপ করবার কথা ছিল যে? কোথায় থাকেন উনি?

সুশীল বলে—ভায়ের কাছে যে থাকেন না বা ভাই দিদির কাছে থাকেন না, সে তো বুঝতেই পারছেন। দু'জন দু'টো আলাদা লাইনের লোক। চলুন, যাওয়া যাক্।

উৎপলের ইচ্ছে করছিল—জনান্তিকে সুশীলকে ডেকে নিষেধ করে। কিন্তু সুশীলটা বেশ অদ্ভুত লোক। গায়ে পড়ে আলাপ করার চেষ্টা তো ওর মজ্জাগত। সে বলে—আপনারা থাকুন, আমার একটু কাজ আছে।

সুশীল ছাড়ে না—পাগল! আসুন। আমাদের নতুন প্রতিবেশী। সম্মানিত অতিথি।

শতদল ঠাট্টা করে হঠাৎ—দিদির সঙ্গে বুঝি ঝগড়া করেছেন?

গা জ্বলে যায়। তবু শান্তভাবে উৎপল ওদের সঙ্গে হেঁটে যায়। স্কুলের কাছে গিয়েই কেটে পড়বে। তপতীদের আজ যাবার দিন।

কিন্তু কাটতে দিল না সতর্ক সুশীল। হাতটা পেঁচিয়ে ধরে আছে সারাক্ষণ। দীপ্তিদের কোয়ার্টারের সামনে এসে সে চীৎকার করে—আপনারা একবার বেরিয়ে আসবেন কি?

শতদল ওর ভঙ্গি দেখে একটু হাসে।

আগে বেরিয়েছে জয়া। তারপর দীপ্তি। সুশীল পরিচয় করিয়ে দেয়: সবাই ঘরে গিয়ে বসে।

শতদল বলে—তরুণ আমার ক্লাসফ্রেণ্ড ছিল স্কুলে। পরে দীর্ঘকাল কোন যোগাযোগ ছিল না। হঠাৎ ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে একটা কাজে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা। বাবলতলীতে আমাদের আণ্ডারটেকিং-এর কথা শুনেই ও মিস সেনের কথা বলছিল।

জয়া বলে—তারপর তো মিস সেনকেও দেখলেন। রীতিমত রোমাণ্টিক ড্রামা, শতদলবাবু! তাই না?

—রিয়্যালি। শতদল কাঁধ উপরে নীচে করে একটু চমৎকৃত হবার ভঙ্গী করে। তারপর বলে—বন্ধুর বান্ধবী; সুতরাং আমারও প্রিভিলেজ রয়েছে। না কি মিস সেন?

জয়া অক্লেশে কথার জবাব দেয়—প্রিভিলেজটা অবিশ্যি ঘরের দরজা অব্দি।

সুশীল টিপ্পনী কাটে—কোন্ ঘরের?

জয়া মুখ ফিরিয়ে বলে—সেটা দীপ্তি আর তরুণের জানবার কথা।

উৎপল বাদে সবাই হাসে। দীপ্তিও হাসে। উৎপলের মনে হয়—ছোড়দিটা কী বেহায়া মেয়ে।

জয়া বলে—শতদলবাবু, তাহলে আপনি বাবলতলী এসে একটা ফালতু কাজও পেয়ে গেছেন বলতে হয়।

শতদল কৌতূহলী কণ্ঠে বলে—কী, কী?

—ফরেন এ্যামবাসাডারের চাকরী।

ফের কলকণ্ঠে হাসি। ফের উৎপলের গা জ্বলে। শতদল বলে—মাই গুডনেস! সত্যি তো!

একসময় শতদল ওঠে।—অসংখ্য ধন্যবাদ। ভারি আনন্দিত হলুম আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে। এরপর তো সবসময় এখানে থাকবার কথা। আমরা একটা বোনমিল চালু করব।

উৎপল চমকে ওঠে। পরক্ষণে একটু হেসে বলে—ইউ আর মাই ইয়ংগার ব্রাদার উৎপলবাবু। কমপিটিশানে গেলে দু'পক্ষই মার খাব। কী দরকার।

উৎপল বলে- আমি তো মালিক নই। ফেলুবাবুর টাকা—তাঁরই প্লান।

—সে ম্যানেজ করে নেব'খন। লেট হিম কাম ব্যাক।

জয়া বলে—উৎপলটা যে ভীষণ কাজের লোক হয়েছে, তার প্রমাণ এখানে না দিলেও চলবে। এই বলে উৎপলের দিকে কটাক্ষ করে।

সুশীল বলে—সে তো ঠিকই। কাজের কথা বাদ নিন। মিঃ মৈত্র, আপনাদের বন্দুক আছে?

—কেন? আছে।

—হাঁস মারতে যাবেন একদিন?

—কোথায়?

—বিলে। অজস্র পাবেন। তারপর ক্যাম্প গোছের করে পিকনিক...কী বলেন? রাজী? শতদল সোৎসাহে বলে—ওয়াণ্ডারফুল! আপনারা যাচ্ছেন তো, মিস সেন, মিস. .জয়া বলে—গুড়।

—দিন ঠিক করা যাক্ তাহলে। সুশীল্ বলে।

শতদল বলে—উৎপলবাবু আমাদের দলপতি হবেন কিন্তু।

উৎপল শুধু হাসে।

দীপ্তি বলে—আরো কয়েকজনকে নেওয়া যেতে পারে। কী বল জয়া?

জয়া বলে—নিশ্চয়। ছন্দা আর মাধবীদিকে বলব। উৎপল, তুমি তপতীকে বলে রেখো। বেচারা মনমরা হয়ে আছে।

উৎপল বলে—তপতী আজই বহরমপুর চলে যাচ্ছে। সেখানেই থাকবে।

কিছুক্ষণের নীরবতা। শতদল সেটা ভেঙে দেয়—আচ্ছা, এখানে বাঘ এসেছিল নাকি শুনেছিলাম!

সুশীল বুঝি জয়ার বাঘ দেখার ব্যাপারটা তুলে ফেলত। বুঝতে পেরে জয়া বলে—জোর গুজব। বরং ভালই হবে মিঃ মৈত্র, পিকনিকে গিয়ে যদি বাঘটা পেয়ে যান। মারতে পারবেন না?

শতদল অবহেলায় আঙুলে ট্রিগার টেপার ভঙ্গী করে।—লেট হিম কাম ফরওয়ার্ড! আদারওয়াইজ আই ওন্ট বদার!

মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়েছিল উৎপল। তপতীর সঙ্গে দেখা হল না যাবার সময়। ঠিকানা অবিশ্যি দিয়েছিল। কিন্তু কী ছলে হুট করে বহরমপুরে সেখানে যাওয়া যায়!

পরদিন বিকেলে জয়া হাজির। বলে—পারছিনে ভাই, এ দায় থেকে বাঁচাও। ক্লাসে যেতে হয়, তখন সারাক্ষণ বুক কাঁপে। কখন কী ঘটে যায়।

অগত্যা নিতে হয় উৎপলকে। ব্যাগে রেখে দেয়। জয়া বলে—গুনে নিলে না?

উৎপল বলে—তুমি কি গুনে নিয়েছিল জয়াদি?

—না। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি।

—আমিও তোমাকে বিশ্বাস করি, জয়াদি।

জয়া একটু হেসে বলে—তাহলে উৎপল, তুমি যা বলতে, তা ঠিক নয়। বরং কতকগুলো জায়গায় কিছু মানুষকে এখনও বিশ্বাস করা যায়। ঠকতে হয় না।

উৎপল একটু চুপ করে থেকে বলে—কি জানি!

জয়া ব্যস্তভাবে বলে—তা'লে ভাই গুনে-টুনে নাও। তোমার মনে কী যেন একটা আছে।

—আছে। উৎপল শান্তকণ্ঠে বলে।—সেটা এ টাকার প্রসঙ্গে নয়। অন্য।

—কী সেটা শুনি?

—তুমি শুনে কী করবে?

জয়া চোখ নাচিয়ে বলে—ওফ্! বুঝেছি!

—কী?

—তপতী।

—যাঃ!

—দেখ উৎপল, আমাকে লুকিও না। আমি সব দেখেছি!

—দেখেছ? কী দেখেছ?

—সেদিন সন্ধ্যায় ওদের বাইরের বাগানে ক্যাকটাসের ঝোপে...উৎপল বাধা দেয়—তুমি কোথায় ছিলে?

জয়া চোখ টিপে বলে- গেটের পাশে। তোমাদের দেখেই পিছু নিয়েছিলুম চুপটি করে।

—যাও! কী ভীষণ গোয়েন্দা তুমি!

—কিছুকাল থামো দিকি খোকা। ওর পড়াশুনো শেষ হোক্। বেচারাকে জ্বালিও না।

—পড়াশুনোর কী দরকার? শুধু পণ্ডশ্রম।

- আর প্রেম করাতেই যত সার্থকতা! বাহাদুর ছেলে!

খানিক পরে সুশীল আসে। জয়া বলে—বাঁচলুম। একা একা সন্ধ্যায় বাসায় ফিরতে ভয় করত।

সুশীল বলে—পিকনিকের দিন আগামী কালই ঠিক হয়েছে। শুভস্য শীঘ্রম। মিস্ জয়া, আপনি একটু সকাল-সকাল ক্লাসের ছুটি দেবেন। উৎপলবাবুর এখান থেকেই যাত্রা শুরু। আমি হস্পিটালের ওদিকে বলে আসব আপনার বন্ধুদের। নাকি এখনই যাবেন?

জয়া ওঠে।—চলুন, এখনই যাই। উৎপল যাবে?

—নাঃ। উৎপল বসে থাকে চুপচাপ।

ওরা চলে গেলে সে কর্তব্য স্থির করে ফেলে। টাকা কালই ব্যাঙ্কে রেখে আসবে ফেলুবাবুর একাউণ্টে। আর রিস্ক্ নেওয়া যায় না। মাথায় ঘুণপোকার মত ওই এক কুরে খাওয়া শব্দ।

বারো

পরাশরকে ডেকে গাড়ি বের করেছিল উৎপল। রতনকে বলে যায়—ঘর খোলা রইল। সুশীলবাবুরা আসবেন। ওদের বলবে, আমি ফিরে এসেই বিলে পৌঁছব। আমার জন্য যেন অপেক্ষা না করেন। তুমিও ওদের সঙ্গে যাবে। ঘরে তালা দিয়ে যাবে।

ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়ে ফেরার সময় ভেবেছিল—যাবে নাকি তপতীর ছোড়দির বাড়ি? শেষ অব্দি লোভ দমন করেছিল। এবেলা আর ছাড়া পাবে না। ওদিকে ওরা বিলে অপেক্ষা করবে। কী ভাববে!

পথে তার মাথায় একটা অদ্ভুত ইচ্ছা খেলে গেল। বাবলতলীর এক ছোটবাবু হাইওয়ের ধারে বোন্ মিল ইন্ডাস্ট্রি বসাতে চেয়েছিল। সে তাকে উড়িয়ে দিয়েছিল অবহেলায়। ঠাট্টা করে বলেছিল—দিগ্বিজয়ী লুঠেরা চেঙ্গিস খান। হাড়ের পাহাড়ে চূড়ামণি। কী আশ্চর্য, সেই ছোটবাবুও টের পেয়েছিল। জীবজগতে কোনকিছুই নিষ্ফল নয়। হাড়ের গুঁড়ো থেকে ফের আত্মা আসে। নিঃশব্দ চেতনায় ফের

ধরা দেয় বিশ্বজগৎ। এখন মনে হচ্ছে, ওই টাকাগুলো যদি তার নিজের হত, সে এখনই শতদল মৈত্রদের আগেই ম্যানিওর ইণ্ডাস্ট্রি চালু করে ফেলত রাতারাতি। উৎপলের হাত নিসপিস করছিল। একবার এক শতদল তাকে যেন কোথাও হারিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, এবারও এই শতদল তাকে হারিয়ে দিতে চাচ্ছে। চোয়াল শক্ত হয়ে এল উৎপলের। সে বলে ওঠে—পরাশর, গাড়ি যেন চলছে না!

পরাশর নিঃশব্দে স্পীডোমিটারের কাঁটার দিকে আঙুল তোলে। নতুন গাড়ি। কাঁটা ষাট থেকে সত্তরের ঘরে চলছে। হাইওয়ের এই অংশে এ স্পীড খুবই বেশি। রাস্তা খুব চওড়া নয়। অজস্র গরুর গাড়ি চলছে। রিকশো চলছে, লরী যাচ্ছে আসছে। উৎপল দাঁতে দাঁত চাপে।

এক সময় পৌঁছে যায় বাবলতলী! দেখে সুশীল তার জন্যে অপেক্ষা করছে। উৎপল গাড়ি থেকে নেমেই বলে—ওঁরা চলে গেছেন নিশ্চয়।

সুশীল হঠাৎ দৌড়ে আসে কাছে। চাপাস্বরে বলে—ব্যাপার গুরুতর। এইমাত্র টেলিগ্রাম এল কার্সিয়াঙ হাসপাতাল থেকে। ফেলুদা এ্যাকসিডেন্টে মারা গেছেন!

চোখ জ্বলে ওঠে মুহূর্তের জন্য। বুকে প্রচণ্ড আঘাত পড়ে। উৎপল ফিসফিস করে বলে—টু লেট!

—বিপদের ঝুঁকি নিয়ে বেরিয়েছিলেন সম্ভবত। পথে গাড়ি উল্টে যায় ধস ছেড়ে।

কে জানে কেন, ব্যর্থতার ধিক্কারে, কী অনুশোচনায়, ক্ষোভে ক্রোধে উৎপল অস্থির হতে থাকে। সুশীল তার হাতে ধরে টেনে নিয়ে এল মাঠের পরিচিত পথে। সে যেন নাচতে নাচতে আগে হাঁটে। উল্লাসে ভাঙচুর হয়। উৎপল তার কারণ বুঝতে পারে না। এ কথা ঠিকই, ফেলুবাবুর মৃত্যুতে বাবলতলী শোকে অধীর হবে না। কোন রক্তের বন্ধন ফেলুবাবুর নেই। বরং আনন্দিত হবার মত মানুষও থাকবে। কিন্তু সুশীল—সে তো হৃদয়বান মানুষ বলে উৎপলের কাছে পরিচিত!

সুশীল বলতে থাকে—রূপকথার গল্পে আছে, ঘোড়া তুমি কার? না—যে পিঠে চেপে আছে তার।...তবে নিয়ে চল অমুক দেশে, যেখানে সোনার পালঙ্কে রাজকন্যা শুয়ে আছে। উৎপলবাবু, ফেলুবাবুর অনেকগুলো ঘোড়া ছিল। তাদের মধ্যে পক্ষীরাজও কম নয়।

—তার মানে?

—মানে না বোঝবার মত ছেলেমানুষ তো আপনি নন। ঘোড়া কি আপনার কাছেও নেই একটা?

উৎপল বুঝতে পারে। বলে—ছিল। এইমাত্র ব্যাঙ্কে তাঁর এ্যাকাউন্টে জমা দিয়ে এলুম।

সুশীল থমকে দাঁড়ায়।—করেছেন কী! বেমক্কা হাতছুট করে ফেললেন টাকাগুলো? উৎপলবাবু, এতে নীতি, ন্যায়-অন্যায়, ধর্মাধর্মের প্রশ্ন অবান্তর। জীবনে এটুকুই বুঝেছি—টাকার গায়ে ওসব খোদাই করা নেই। এ সমাজে মানুষের সঙ্গে টাকার কি কোনো রক্তের সম্পর্ক আছে উৎপলবাবু? বলুন, চুপ করে থাকবেন না। বলুন!

—কী জানি!

—আত্মপ্রবঞ্চনা করবেন না। টাকা আপনার ভাই নয় বোন নয় মা-বাবা নয়—কেউ নয়। আপনি কি গ্যারান্টিতে ওকে আটকে রাখতে পারবেন বলুন? সমাজে লটারীর উপর আপনার জীবনের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা নির্ভর করছে। লটারীতে কোন গ্যারান্টি থাকে না। টাকা আপনার পরমাত্মীয় সাজে মাত্র কিন্তু আসলে ও এক ছদ্মবেশী রাক্ষস—মায়াবী মারীচ। দেখুন না, ফেলুবাবুর ঘরে, আরো কতজনের ঘরে, এমন কি আমার ঘরে!

উৎপল বিস্মিতভাবে ওর দিকে তাকায়।

—হ্যাঁ। আমার কাছে পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি টাকা উনি রেখে গিয়েছিলেন যাবার সময়। আমাকে বিশ্বাস করতেন। এখন এই সব গচ্ছিত টাকার মালিক—যা যাদের কাছে, তারাই। আমি মোটামুটি বড়লোক হয়ে গেছি বলতে পারেন। আঃ, এই কদ্দিন কী ভীষণ যন্ত্রণায় না কেটে গেছে! আমি লটারীতে জিতে গেছি!

সুশীল অস্বাভাবিক ভাবে হাসে। ফের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলে—কোন গ্যারান্টি নেই। টাকার সঙ্গে মানুষের জীবনের সম্পর্কে যতদিন থাকছে, এই উঠতি-নামতি, লটারীর স্রোত চলবেই। কে ঠেকাচ্ছে!

নদীর ধারে ইতিমধ্যে সুন্দর পিকনিকের পরিবেশ গড়ে উঠেছে। ট্রানজিস্টার বাজছে। ব্যাডমিন্টন

খেলছে জয়াদি মাধবীদি আর অন্যপক্ষে শতদল মৈত্র। দীপ্তি আর ছন্দা বাদাম ভাজা খাচ্ছে রোদে অর্ধশায়িত। রতন উনুনে কয়লার আঁচ দিয়েছে। প্রচণ্ড বাতাস বাঁচাতে সে ঝোপের আড়ালে নিয়ে গেল সেটা।

সুশীল বলে—ভালো জায়গা বেছে নিয়েছেন। উৎপলবাবু, আসুন—মুরগীগুলো কেটে ফেলি।

উৎপল বলে—না, না। ওসব আপনিই ভাল পারবেন।

চারটে বড় বড় মুরগী ব্যানাঝোপের পাশে ঠ্যাঙ বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। সুশীল বসে পড়ে ও ওজন দেখে প্রত্যেকটার। জয়া ছুটে আসে র‍্যাকেট হাতে।—কে কাটবে?

সুশীল বলে—আপনি পারবেন না?

জয়া কোমরে আঁচল জড়িয়ে বলে—না পারবার কী আছে। তবে মেয়েদের কাটা বোধ করি বিধিবহির্ভূত। বরং আমি ঠ্যাঙ টেনে ধরছি। আপনি কাটুন।

দীপ্তি হাত পা ছোঁড়ে—এ-ই, খরবদার! চোখের আড়ালে যাও সব।

ছন্দা বলে—দেখবেন, ডানা উড়ে না আসে এদিকে। ডানা দেখে আমার ভীষণ ভয় হয়।

শতদল এগিয়ে আসে।—কই দিন আমাকে। ওসব আমি ভালই পারি। কই, ছুরি কোথায়?

উৎপল হঠাৎ বলে—পিকনিকে মুরগী! ধ্যাৎ! হাঁস মারবার কথা ছিল না?

শতদল বলে—রাইট ইউ আর। পিকনিক মানে একটা প্রিমিটিভ এ্যাফেয়ার। অলরাইট, মিস্ গুহ, মুরগী তো স্টক রইলই। আমরা যেয়ে দেখি, হাঁস মারা যায় কি না।

সুশীল বলে—কোনদিকটায় মেলে, না জানলে কী মারবেন?

উৎপল বাধা দিয়ে বলে—বা রে! আমি অমরদার সঙ্গে বিলের সবটুকু চিনে গেছি না?

দীপ্তিদের পায়ের কাছে পড়ে ছিল বন্দুকটা। শতদল অবহেলা ভরে তুলে নেয়। একটা কিড্‌ব্যাগও কাঁধে ঝোলায়। কার্তুজ তার মধ্যে। দু'জনে সামনের ব্যানাঝোপের ভেতর দিয়ে হেঁটে বাঁধে পৌঁছে যায়।

জলাশয় প্রায় আধমাইল দূরে দেখা যাচ্ছিল। এতদূর থেকে অজস্র হাঁসের ওড়াউড়ি দেখতে পাচ্ছিল ওরা। চলতে চলতে এক সময় শতদল কৌটা খুলে সিগ্রেট বের করে। তারপর উৎপলকে এগিয়ে দেয়।

বেশ জোরে উত্তুরে বাতাস বইছে। কিছুটা ফাঁকা জায়গা পেরিয়ে ওরা ডান দিকে নামে। হিজল, বুনো জাম-জারুলের ঘন জঙ্গল ভেদ করে চলতে থাকে।

চলতে চলতে শতদল বলে—অমরদা না কার কথা বলছিলেন, তিনি কে?

উৎপল জবাব দেয়—বাবলতলীর এক শিকারী। সম্প্রতি সুইসাইড করেছেন।

শতদল দাঁড়ায়—স্ট্রেঞ্জ! কী ব্যাপার?

—সত্যি স্ট্রেঞ্জ। উৎপল মুখোমুখি দাঁড়ায়। আপনি বোন প্রসেসিং করবেন বলছিলেন, অমরদারও এই রকম একটা প্লান মাথায় ছিল। তারপর—ইতিমধ্যে শুনেছেন কিনা জানি না, ফেলুবাবু—যাঁর জমি আপনারা কিনেছেন...

বাধা দিয়ে শতদল বলে—হ্যাঁ, আসবার সময় শুনেছি। স্যাড ডেথ!

—সেই ফেলুবাবুও বোন প্রসেসিং ইণ্ডাস্ট্রি করতে চেয়েছিলেন আমারই পরামর্শে। অমরদার কথাটা মাথায় বিঁধে ছিল।

—হ্যাঁ, আপনি তো বলছিলেন।

—ফেলুবাবুও মারা গেলেন। আমার চাকরি গেল। অমরদার গচ্ছিত স্বপ্নটাও গেল! আঃ, কী ব্যর্থতা!

শতদল লাফিয়ে উঠে বলে—মাই গুডনেস! অভিশাপ-টাপ নয় তো! বলেন কী মশাই!

উৎপল জবাব না দিয়ে ফের হাঁটতে থাকে। কতকটা আপন মনেই বলে যেন—ফেলুদা অবিশ্যি বাঘ দেখেননি। অমরদা দেখেছিলেন নাকি। আসলে বাঘটাঘ কোন ফ্যাক্টরই নয়। গুলি মিস্ করাটাই এক মারাত্মক কিস্তি মাত। টু লেট।

শতদল বলে—কী সব বলছেন মশাই! বুঝিয়ে বলবেন?

ঘন কাঁটাঝোপে ঢাকা ঢিবিমত জায়গা একটা। তার গা ঘেঁষে পুরনো বটগাছ। অজস্র ঝুরিতে সমাকীর্ণ। একটিও পাতা নেই গাছটাতে। এক দঙ্গল শামুক খোল বসে আছে উঁচু ডালে। উৎপল বলে—শামুকখোল মারবেন না?

—না! আপনার ইচ্ছে হলে মারুন। মারবেন? পারেন বন্দুক ছুঁড়তে?

—পারি। আমি এন.সি.সি-তে ছিলুম। রাইফেল ছুঁড়তেও পারি। তাছাড়া চোরাগোপ্তা যে সব ফায়ার আর্মস আজকাল শহরাঞ্চলে পাওয়া যায়...

—তাও অভ্যাস আছে নাকি! শতদল সকৌতুক হাসে।

উৎপল গম্ভীর মুখে বলে—আছে। একসময় পুলিশের দিকে লক্ষ্য করেই টার্গেট প্র্যাকটিস করতুম।

—বলেন কী মশায়!

উৎপল বলে—আচ্ছা শতদলবাবু, এমন ঘটনার কথা কি আপনার মনে আছে—কোনো এক রাত্রে উল্টোডাঙ্গা স্টেশনের ওদিকে খালের ধারে দুটি ছেলে দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের একজন আহত, আপনি গাড়ি চেপে আসছিলেন, তারপর...তারপর কোন প্রশ্ন না করে তাদের বাড়ি পৌঁছে দিলেন, এবং পথেই আহত ছেলেটি মারা পড়েছিল...?

শতদল কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঁচকে মাটির দিকে তাকায়। সিগ্রেট জ্বালে আবার। ধুঁয়ো ছাড়ে। তারপর মাথা নাড়ে।

—এতে লজ্জার কিছু নেই মিঃ মৈত্র। যদিও ওরা ছিল আসলে ওয়াগনব্রেকার এবং পুলিশের গুলি একজনের উরুতে লেগেছিল...হ্যাঁ, আমি চিনেছি আপনাকে। তিনিই আপনি। আমাকে আপনার নাম-ঠিকানা দিয়ে গিয়েছিলেন। আমিও লজ্জায় যেতে পারিনি কোনদিন। শতদলবাবু, আপনিই তিনি।

শতদল অপ্রস্তুত হাসি হাসে—তা যদি সত্যি হয়ে থাকত, লুকাবার কারণ কী ছিল উৎপলবাবু? ইন্‌ফ্যাক্ট, আমি নই ভাই। আপনি ভুল করছেন।

—আমি মোটেও আর লজ্জিত হবো না। আপনি আমাকে যত ছোটই ভাবুন, আমি আপনাকে ক্ষমা করব। মিঃ মৈত্র, প্লীজ বলুন...

—দুঃখিত। আপনি মিস্‌পার্সোনিফাই করছেন মশাই। ছেড়ে দিন ওকথা। সবার জীবনেরই একটা না একটা ব্ল্যাক সাইড থাকে। এ নিয়ে উৎকণ্ঠার কিছু নেই। চলুন।

উৎপল গোঁ ধরে দাঁড়ায়।—জানেন; তারপর আমি কতবার ভেবেছি আপনার কাছে যাবো। যাওয়া হয় নি। ঠিকানাটা হারিয়ে গিয়েছিল। শুধু নামটাই মনে টিকে গেল। আচ্ছা বলুন তো, সে রাতে আপনার আচরণের অর্থ কী? অনুকম্পা না সহানুভূতি? করুণা না বেদনাবোধ? মানুষ যে চোখে আহত কুকুরকে দেখে দয়া করে—মৃত জন্তুকে ভাগাড়ে ফেলে দেয়? নাকি এ্যাডভেঞ্চারিজম!—কী?

—পাগল। হাত ধরে টানে শতদল।—কই, কোথায় হাঁস পাওয়া যাবে, চলুন।

অনেক সময় ধরে ওরা নিঃশব্দে হেঁটে যায়। তারপর কাশবনের ভেতর হামাগুড়ি দিয়ে জলায় পৌঁছয়। প্রায় উপুড় হয়ে বন্দুক ধরে থাকে শতদল। উৎপল পাশে বসে।

হাজার বছরের একটা স্বাভাবিক ওয়াটার ড্যাম। নীলাভ জলে অজস্র দাম, শালুক, পদ্মফুল। পুরু দামের ওপর গজিয়েছে চিরোলপাতা শোলাগাছ। প্রজাপতি উড়ছে। গাঙ্ ফড়িং উড়ছে। আর উড়ছে হাজার হাজার জলহাঁস—চক্রাকারে ছড়িয়ে যাচ্ছে জলে। ফের উড়ছে। ঘূর্ণির মত দেখাচ্ছে। ছলছল শব্দে জল কাঁপছে। রোদের রেণু চূড়ায় ছড়িয়ে জলকন্যাদের মত ঢেউ আসছে, ফাঁড়িঘাসের তটের দিকে।

গুলি করে শতদল। পলকে বিশৃঙ্খল হাঁসের পাল শীতের ধূসর আকাশ কালো কালো রেখায় বিচিত্র করে। দলপিপি উড়ে পালায়। পানকৌড়ির ডাক থামে। আশেপাশের ঘাসের ভেতর তিতির ছুটে পালায়। ক্ষিপ্তশব্দের চাবুক বিলের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত আকাশে ছড়িয়ে নিসর্গের অপার নির্জন বুকে দাগ আঁকে। একটাও পড়তে দেখা যায় না।

শতদল বলে—ব্যাড লাক্! চলুন, অন্য দিক থেকে দেখতে হবে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা না করলে ওরা ফের বসবে না।

ফের কিছুক্ষণ দূরে এসে অপেক্ষা। ফের হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটা। ফের গুলির শব্দ। বিশৃঙ্খলা। অশান্তি।

শতদল বিরক্ত মুখে বলে—ব্যাপার কী! এমন তো হবার কথা নয়। পরক্ষণ সে কিড়ব্যাগ থেকে হুইস্কির বোতল বের করে। গলায় ঢেলে নেয়। বলে—চলবে?

উৎপল হাসে। তারপর আচমকা হাত থেকে কেড়ে নেয় বোতলটা। অনেকক্ষণ ধরে চুমুকে চুমুকে গিলে ফেলে।

একমুখ ঘাম আর হতাশার চিহ্ন নিয়ে শতদল প্রায় সারা বিলটাই প্রদক্ষিণ করে। বেলা ঢলে পড়ছে। জলাশয়ের বুক শূন্য করে দূরের দিকে চলে যাচ্ছে সব পাখি।

একসময় উৎপল বলে—আমাকে একবার দেবেন? লাস্ট চান্স?

—পারবেন? শতদল যেন বন্দুকটার দায় মুক্ত হতে পারলে বেঁচে যায়।

উৎপল বন্দুকটা হাতে নেয়। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। তারপর বলে—বাবলতলীর এই জলা জঙ্গলটার বেশ দুর্নাম আছে। অনেকবার বাঘ দেখ গেছে এখানে। শেষবার যেটা এসেছিল, সেটা নাকি হরিণের মত চেহারার ছিল। অবিকল হরিণ—বাঁড়ুয্যেবাড়ির দেয়ালে তার চামড়া আছে। কিন্তু দেখা গেল সেটাই শেষ নয়। ফের একটা বাঘ এল। বড়বাবু বুড়ো, তাই ছোটবাবু মারতে গেলেন। গুলিটা মিস হয়েছিল। টু লেট।...আচ্ছা মিঃ মৈত্র, যা মানুষ দিবারাত্র ভেবে উত্তেজিত থাকে, অস্থির হয়, অনিদ্রায় ভোগে—একসময় তা কি হ্যালুসিনেশনে সামনে আসতে পারে না?

—খুব পারে। হ্যালুসিনেশন তো তাই। একটা উৎকট ফোবিয়া আসলে।

—এবার যখন বাবলতলী এলুম, আমার গায়ে একটা হলুদকালো ডোরাকাটা জাম্পার ছিল। অমরদা ঠাট্টা করতেন। তুই সামনে থেকে সরে যা ভাই, বাঘের মত দেখাচ্ছে। বেফাঁস গুলি করে বসব হয়ত।

শতদল লাফিয়ে ওঠে—কী মুশকিল, আমার গায়েও তো সেই রকম জাম্পার!

—আপনাকে বাঘের মত দেখাচ্ছে। হ্যালুসিনেশন!

—সর্বনাশ! কই, দিন মশাই, বন্দুক দিন। আপনি ভীষণ ছেলেমানুষ দেখছি। নেশা হয়েছে।

উৎপল একটু পিছিয়ে বলে—মিঃ মৈত্র, সে রাত্রে সত্যেনের লাশ নামিয়ে দিয়ে আপনি কি নির্বিবাদে চলে গেলেন। দুর্ভাগ্য, আমার হাতে কোন পিস্তল বা বোমা ছিল না। গাড়িতে আসবার সময়ই আমি ভাবছিলুম, সাথে যদি একটা কিছু থাকত, আপনাকে ফিরে যেতে দিতুম না। কোন বুদ্ধিমানই দেয় না এসব ক্ষেত্রে। তাছাড়া আপনার নির্বিকার মুখ দেখে ধরে নিয়েছিলুম—আপনি একটা আহত কুকুরকে দয়া করছেন। নিজেকে মানুষ ভেবে প্রচণ্ড গর্ব আপনাকে ঘিরে ছিল। আঃ ঘৃণা, ঘৃণা!

শতদল প্রায় হাত-পা ছোঁড়ে।—প্লীজ উৎপলবাবু, প্লীজ...মিছেমিছি কী সব বলছেন। আমি নই, মোটেও নই। দেখি, বন্দুকটা দিন।

উৎপল বুকের ওপর তাক করে বলে—বাবলতলীর শেষ বাঘটা আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, আই অ্যাম দি লাস্ট ম্যান টু মিস দি চান্স। শতদল মৈত্র! আই শ্যাল কিক ইউ আউট অফ দি ওয়ার্ল্ড।

লাফ দিয়ে এসে বন্দুকের নল ঘুরিয়ে দেয় শতদল। প্রচণ্ড শব্দে গাছপালার ভেতর গুলি চলে যায়। পাতা ছিঁড়ে পড়ে। বারুদের গন্ধে বাতাস কটু হয়। শতদল বন্দুকটা কেড়ে নিয়ে উৎপলের চোয়ালে ভীষণ একটা ঘুঁষি মারে। উৎপল পড়ে যায়। শতদল গর্জে ওঠে—ইউ ব্যাস্টার্ড, গেট আউট, গেট আউট, অফ মাই সাইট। ফর হেভেন্স্ সেক্, আই শ্যাল কিল ইউ। আই মাস্ট, আই প্রমিস...।

বন্দুক তাক করে নলটা ঘুরিয়ে ইশারা করে শতদল। উৎপল উঠে দাঁড়ায়। ফালফাল করে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর পিছন ফিরে আস্তে আস্তে হেঁটে জঙ্গলের আড়ালে চলে যায়। জল কাদা ঘাসের জঙ্গল মাড়িয়ে লক্ষ্যহীন চলার পর পেছনে তাকায়। অভিমানে চোখ ছলছল করে। আরো কিছু সময় চলার পর ধানের জমি পেরিয়ে হাইওয়ে পেয়ে যায়। পশ্চিমে বাবলতলী। উৎপল তার ঘরের দিকে যায়। তালা খুলে ঘরে ঢোকে। ক্ষিপ্র হাতে ব্যাগে নিজের জিনিসপত্র ভরে নেয় সে। দাশুবাবুর কাঠগোলায় যায় সেখান থেকে। নিঃশব্দে কাগজপত্রগুলো এগিয়ে দেয়। ব্যাঙ্কের চালানটা সামনে রাখে। দাশুবাবু বলেন—আর একটা দিন সবুর করতে পারলেন না। উৎপল মাথা নাড়ে। বেরিয়ে আসে। চলন্ত বাস থামিয়ে পা-দানীতে উঠে দাঁড়ায়। হাইওয়ের মসৃণ কংক্রিটে প্রায় নিঃশব্দে চাকা গড়িয়ে বাসটা বাবলতলী ফেলে ক্রমাগত দূরে এগিয়ে যাচ্ছিল। সেই বর্ধমান দূরত্বে দাঁড়িয়ে

উৎপল মনের ভেতর বাবলতলীকে দেখতে থাকে। শতদল মৈত্রের হাড়ের কারখানার দিকে তার দিদি দীপ্তি লোলুপ চোখে তাকাচ্ছে। জয়াদির হাত ধরে সুশীল চৌধুরী হাঁটছে। সুশীল চৌধুরী টাকা আর ভালবাসা পেয়েছে। শিবনাথকে পেয়েছে আরতি। অমিয় দাশ লাল পতাকা নিয়ে মাঠের দিকে চলেছেন। বাবলতলীর শেষ বাঘটা এবার মারা পড়তে হয়ত দেরী নেই। শুধু উৎপল—উৎপলের কোন ভূমিকা নেই সেখানে। সে ব্যর্থ। ব্যর্থতা তাকে অবশেষে কোথায় নিয়ে চলেছে, জানে না।

তপতীর ছোড়দির ঠিকানা খুঁজে পেতে কষ্ট হয় নি। দরজার কড়া নাড়তেই একটি ছেলে এসে বলে—কাকে চাই?

উৎপল বলে—তপতীকে। শুধু তপতীকে।

মিউনিসিপ্যাল পার্কের কাছে এসে উৎপল বলে—তাহলে আসি। অনেক দূর চলে এসেছ তুমি।

তপতী বলে—এই রাত্তিরে না গেলে চলত না?

—না।

—কেন চলবে না? আব তো চাকরি নেই যে আজেবাজে কৈফিয়ত দেবে।

—তপু, ওই ঝোপটার কাছে একবার যাবে?

—ইস্, কী লোভ! অত লোভ যার, সে একরাত্রি বাসায় থেকে যাক্।

—তাহলে পাবো? কী পাবো তপতী?

—চুমু।

—আর কিছু না?

—আর কি চাই?

—দেবে তা?

—তোমাকে আজ সব দিতে পারি। ওই আজেবাজে জায়গা ছেড়েছ, তোমাকে আমার এত ভাল লাগছে। প্রণাম করতে ইচ্ছে হচ্ছে!

—যাঃ! প্রণাম কেন? আমাকে শুধু একবার চুমু দাও।

নিঃসংকোচে তপতী ক্যাক্টাসের ঝোপের কাছে যায়। কিছুক্ষণ ওরা পবস্পরকে পাগলের মত চুমু খায়। তারপর সরে আসে।

তপতী বলে—রাত্রে থাকলে আর কী দিতে হত?

—তুমি অত ছোট হয়োনা তপতী!

—বা-রে, তুমিই তো বললে!

—একটা জিনিস আমি চাইতুম তোমার কাছে।

—কী?

—বিশ্বাস।

—তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না?

—করি। তুমি আমার কথা মেনেছ।

—আমিও তোমাকে বিশ্বাস করি। তুমিও আমার কথা মেনেছ।

—তারপর?

—তারপর আর কী? আর কিছু নেই। কিছু থাকতে নেই।

—তাহলে পেয়েছি। আসি।

—এসো।

এক অভাবিত আনন্দ হঠাৎ মনটাকে হাল্কা করে দিয়েছে। সারা দেহের ভেতর বাজছে মৃদু জলতরঙ্গের বাজনা। উৎপল হন্‌হন্ করে হাঁটতে থাকে স্টেশনের দিকে।

যেতে যেতে যতবার পিছন ফেরে, দ্যাখে তপতী স্থির দাঁড়িয়ে আছে। একটা লাল নক্ষত্রের মতো নিষ্কম্প সে।

দাবানল

লাল রঙের গেন্‌জি

মনোহরপুরের গা ঘেঁষে যে পিচঢাকা পথ, তার দু'ধারে জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তির বিকেলে মনসাপূজোর মেলা বসেছিল। পুকুরপাড়ে মনসার থান বিশাল বটের তলায়। বহুকালের পুরনো বট। তার জটিল শেকড়-বাকড়ের ভেতর বাস করে দুধে খরিস সাপ। এটাই জরৎকারু মুনির পত্নী এবং আস্তিক মুনির জননী সেই ভয়ংকরী দেবীর থাকার প্রমাণ।

সকাল-সকাল বর্ষা আসছে। এবেলা ওবেলা দু-চার ছিটে করে বৃষ্টি ছড়াচ্ছে। ক্ষেতে বীজ ধানের চারা মাথা তুলেছে। এ'সময় সাপেরা জোড় বাঁধেন, পাখিরা ডিম পাড়ে। পৃথিবীর বুক কোমল হয়ে ওঠে। চাষী পুরুষ চাষা রমণীরা কোমর বাঁধে পৃথিবীকে কিছু দেবে বলে। ঘরে জোয়ান ছেলে থাকলে তার দিকে সারাক্ষণ চোখ! হাম্বি তম্বি। কারণ, সময় এসে গেছে। আকাশে বাতাসে তারই লক্ষণ।

গউরকে তার বাবা কেদার বলেছিল, যাচ্ছিস যা। রাত করিস না। টর্চ বাতিটা সঙ্গে নে! মনসাপূজোর মেলায় গান বাজনার আসর বসবে। লোভ করিস না। আর শোন গউর, তোর মায়ের জন্য দুটো মসনার ধাগা আনিস। ভুলিস নে যেন।'

ধাগা মানে সুতো। বটতলার থানে মন্ত্রপূত কালো সুতো সার সার ঝুলিয়ে বসে থাকেন নরহরি পান্ডা মশাই। ওই সুতোর গুণের শেষ নেই। গউরের মায়ের কোমরে বাত। কুঁজো হয়ে হাঁটে। বীরভূমের বেলে গিয়ে পবিত্র পুকুরে নেমেছিল। শ্যাওলা আর কয়েক রকম তেল-পড়া এনেছিল। সারে নি।

কেদার তার জোয়ান ছেলেকে আরও কিছু কাজের ভার দিয়েছিল। মনোহরপুরের সাটুবাবুর সঙ্গে দেখা করে যেন খবর দেয়, নদীর গায়ে কাঁধা জমিতে বেগুন ক্ষেত করার সময় এসে গেল। খামোকা আগাছার ঝাড় গজিয়ে রয়েছে। সোনাফলা মাটিটা ফেলে রাখা উচিত হচ্ছে?

আর গউর যেন অবশ্য করে যায় মোমিন পাইকারের বাড়ি। বাঁয়ের হেলে গরুটার গতিক ভাল নয়। পাইকার কি হরিণমারার দিকে আসবে আজকালের মধ্যে?

গউর খাপ্পা হয়ে বলেছিল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ। আর কিছু থাকে তো বলো। বছরে এই একটা দিন একটা বেলা একটুখানি আমোদ ফুর্তি করতে-যাব, তাও তোমার কাজের শেষ নেই।'

কেদারের বরাবর এই এক ধুয়ো। চাষাকুলে জন্মেছ বাবা, আমোদ ফুর্তি করবে কোত্থেকে?' আসলে তার কথাটা হল, মাটির সঙ্গে তোমার সম্পর্ক। মাটির দিকে সারাক্ষণ দৃষ্টি রাখো। মাটিতে হাঁটো, মাটিতে ঘুমোও। হাতে পায়ে সারা শরীরে মাটি মাখো। মাটিকে ফুলে ফলে লতাপাতায় উদ্ভিদে সাজাও। তুমি চিরকালের এক জন্ম-রূপকার এই পৃথিবীর। মাটিই তোমার নিয়তি।

বিকেলের আকাশে এদিকে-ওদিকে কিছু মেঘ ছিল। পুবের হাওয়া বইছিল উথাল পাথাল বেগে। কিন্তু বৃষ্টিটা এল না। এলে মেলার মজা পন্ড হত। আশেপাশের গাঁয়ের নানা বয়সের মানুষ জন এসে জুটছিল। ভিজে জবুথবু হয়ে যেত। গাছপালার কাছে আশ্রয় যদি বা মিলত, বাজ পড়ার ভয়ে সারাক্ষণ বুক কাঁপত। সেবার আঁদুলিয়ার পটল পীরপুকুরের হারুন, কেশেডাঙ্গার রঞ্জন স্যাকরার একসঙ্গে মরণ হল অর্জুন গাছের তলায়।

বৃষ্টি না আসাতে মনসাপূজোর মেলা দারুণ জমেছিল। বট তলায় চাষীরা পাঁঠাবলীর বাজনা বাজাচ্ছিল উদ্দাম নাচের সঙ্গে। ধোঁয়ায় ধূসর করে ফেলেছিল। গোয়ালারা সারা বটতলা ঘুঁটের আগুনে দুধের সরা চাপিয়ে ঘন ক্ষীর তৈরী করছিল। মায়ের পূজোর ভোগ সেগুলো। দম আটকানো ধোঁয়া আর ঘুঁটে পোড়ার গন্ধের মধ্যে মায়ের জন্য ধাগা কিনতে গিয়ে গউর কার সঙ্গে জোর ধাক্কা খেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'কোন শালা রে?'

অমনি কেউ তার গেঞ্জির কলার খামচে হ্যাঁচকা টান মারল। ফর ফর করে ছিঁড়ে গেল গেঞ্জিটা। এই সুন্দর লাল গেঞ্জিটা সে শহর থেকে কিনে এনেছিল কদিন আগে। মেলায় আসবে বলে কতদিন থেকে তৈরি হচ্ছিল গউর। গেঞ্জিটা তার একটা নমুনা। গউর প্রচন্ড রাগে ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়ে থমকে দাঁড়াল।

গউরের চোখ দুটো নিষ্পলক হয়ে গেল। তার শরীর আতঙ্কে কাঠ হয়ে গেল। তার সামনে দাঁড়িয়ে

আছেন কেয়াতলার ছোটবাবু। পরনে ঘিয়ে রঙের প্যান্ট, পায়ে গাম বুট, মাথায় নীলচে টুপি, গায়ে ছাই রঙা বুশসার্ট এবং পিঠে খাপে ভরা বন্দুক।

গউর বিড়বিড় করে বলে উঠল, 'ক্ষ্যামা দেবেন মশাই ভুল হয়েছে।'

গউরের ছেলেবেলা কেটেছে গরু চরিয়ে কেয়াতলায় বিস্তীর্ণ বিলাঞ্চলে—কাশকুশ ফাঁড়িঘাসের বনে। তখন থেকেই সে ছোটবাবুকে দেখেছে সেখানে। ছোটবাবুর বন্দুকের গুলিতে জলচরা পাখিরা মারা গিয়েছে। গউর পাখিগুলো কুড়িয়ে দিয়েছে ছোটবাবুকে। তার বদলে একটা পাখি পেয়েছে সে। সিগারেটও পেয়েছে চাইলে। গউরের চোখের সামনে কেয়াতলার বিল ভরাট হয়ে উঠল। বাঁধ বাঁধা হল! আবাদ হল জলা মাটি। বাঁধের ধারে মাটি ফেলে একতলা দালান হল ছোটবাবুর। সেখানে কতবার গেছে। ভাগে চাষ করার জমি পেয়েছে। ছোটবাবু বড় দুর্দান্ত প্রকৃতির লোক। তাকে সারা এলাকার মানুষ বড় ভয় পায়।

ছোটবাবু পকেট থেকে সিগারেট প্যাকেট বের করলেন। 'গেঞ্জিটা ছিঁড়ে গেল এক টানেই। কী গেঞ্জি কিনেছিলি রে? এ্যাঁ!'

ছোটবাবু সিগারেট দিয়ে বললেন, 'আয়। মাথা ঠান্ডা কর। এদিকে ফাঁকায় আয় যা ধোঁয়া এখানে!'

গউর আড়ষ্টভাবে ছোটবাবুকে অনুসরণ করল। মেলার পেছনে সেই বাজপড়া অর্জুন গাছের তলায় ওঁর ভটভটিয়া গাড়িটা রয়েছে। গউর বিব্রতভাবে ফের বলল, 'চিনতে পারিনি আজ্ঞে। মাফ দেবেন ছোটবাবু।'

'কাল যাস্। একটা গেঞ্জি কিনে দেব। দ্যাখ গউর‍্যা, আমার এই স্বভাব। কেয়াতলার মাঠে একটাও সাপ দেখতে পাবিনে আজকাল। সব শেষ করে দিয়েছি। কেন জানিস? ফোঁস করে ওঠে বলে। খর্বদার খামোকা ফোঁস কর্বাবি নে। নে সিগারেট খা।'

গউরের সিগারেট নিতে ইচ্ছে করছিল না। মনের ভেতর ক্ষোভ না হয় ধোঁয়ার চোটে দেখতে পায়নি, শালা বলে ফেলেছে। তাই বলে এমন করে গেঞ্জি ছিঁড়ে দেবে? কত লোকের চোখের সামনে এই অপমান!

সে একটু ঝুঁকে সিগারেটটা দু'হাত পেতে নিল— অবিকল তার বাবার ভঙ্গিতে। কেদার এমনি করে বাবুমশাইদের কাছে বিড়ি-সিগারেট নেয়। ছোটবাবু লাইটার জ্বেলে দিলেন। সিগারেটে টান দিয়েই গউরের ক্ষোভটা হঠাৎ সরে গেল। না—লোকে যতটা খারাপ ভাবে ছোটবাবুকে, এতটা খারাপ তিনি মোটেও নন। গউর একটু হাসল আপন মনে।

ছোটবাবু বললেন, 'এবার মনে হচ্ছে তত বেশী পাঁঠা পড়ল না? কতগুলো পড়ল বল তো গউর‍্যা?'

গউর গোনেনি। উঁকি মেরে সরে এসেছে। তবু ছোটবাবুর মন রাখতে বলল, 'তা দু'কুড়ি হবে মশাই।'

'তোর মাথা খারাপ? সে লাজুক দৃষ্টিতে মুখ নামাল। ছোটবাবু বললেন, 'তোর হাতে ওটা কী রে মোড়কে?'

'আজ্ঞে, পুজোর ধাগা। মায়ের জন্য।'

'কী হয়েছে তোর মায়ের?'

'বাত টাত হবে। কুঁজো হয়ে হাঁটে মা। খুব কষ্টে-আছে মশাই।' গউর তার মায়ের কষ্টের বিবরণ দিতে থাকল।

ছোটবাবু এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিলেন। আনমনা ভঙ্গি। গউর সেটা টের পেয়ে চুপ করল। ছোটবাবু কাকে ডাকলেন, 'ফজল! এ্যাই ব্যাটা ফজলা। শোন শোন এদিকে।' তারপর গউরের দিকে ঘুরে বললেন, 'কাল যাসখন। গেঞ্জি নিতে আসিস। এনে রাখব। বিকেলে যাস বরং।'

ছোটবাবু ভিড়ের দিকে চলে গেলে অর্জুনতলায় দাঁড়িয়ে গউর ব্যাপারটা ভাবতে লাগল। গেঞ্জি না হয় দেবেন ছোটবাবু,. কিন্তু এমন গেঞ্জিটা নিজের পছন্দে কেনা—এমন করে ছিঁড়ে গেল। আবার সেই ক্ষোভটা জেগে উঠল তার মনে। সে সিগারেট ছুড়ে ফেলল। স্যান্ডেলের তলায় পিষে নেভাল। তারপর মেলার দিকে পা বাড়াতে গিয়ে গেঞ্জিটা খুলে ফেলল গা থেকে। কোমরে বাঁধল।

মেলায় অত আনন্দ হইচই। তার মধ্যে খালি গায়ে ঘুরতে হবে ভেবে গউর মনমরা হয়ে গেল। ধুতির খুঁটে কয়েকটা টাকা আর খুচরো পয়সা বাঁধা আছে। কিছু কেনাকাটা করবে ভেবেছিল। এখন আর কিছু কিনতেই ইচ্ছে করছে না তার। চারপাশে খুশী খুশী মুখে লোকেরা ঘুরছে। বাচ্চা ছেলেমেয়েরা একহাতে পাঁপড়ভাজা, অন্যহাতে তাল পাতার বাঁশি নিয়ে হাঁটছে। মেয়েরা সেজেগুজে চোখে ছটা নিয়ে ঘুরছে। কথায় কথায় খিলখিল করে হেসে উঠছে। ওদিকে মনসাতলায় ঢাক বাজছে। গউরের কাছ থেকে এইসব শব্দ, ছটা, হাসি, বাঁশির সুর, মানুষজন, যুবতীরা ক্রমশ যেন অনেক দূরে সরে যেতে থাকলো। মনে হল, তার চেয়ে অপমানিত আর দুঃখী মানুষ এ পৃথিবীতে আর একটিও নেই।

না হয় ঝোঁকের মুখে বলেই ফেলেছিল, 'কোন শালা রে,' তাই বলে এত সুন্দর সাধের গেঞ্জিটা ছিঁড়ে যাবে তার?

চোখে জল নিয়ে গউর মেলা ছেড়ে চলে যাচ্ছিল। খালি গা, পায়ে স্যান্ডেল, কোমরে লাল ছেঁড়া গেঞ্জিটা জড়ানো—মাথায় ঝাকড় মাকড় চুল, হরিণমারা গাঁয়ের কেদারের এই জোয়ান ছেলের সঙ্গে মেলায় আসার সেই সময়কার সেই তেজী যুবকের কোন মিল নিই। মাথা নিচু করে হাঁটছিল গউর।

বেলা পড়ে এসেছিল। মনোহরপুর মাঠের আলপথে খুব আস্তে হাঁটছিল সে। আসার সময় সে সারা পথ দুধারের চযা ক্ষেতে বন চড়ুই, বগাড়ি আর পায়রার ঝাঁককে উত্যক্ত করতে করতে এসেছিল। এখন দুধারে শেষ বেলায় ধূসর আলোয় পাখিগুলো শেষ বারের মতো শস্যকণা খুঁটছে। গউর তাদের দিকে তাকাচ্ছিল না। কচি আখের ক্ষেতে যে সারসটা বসেছিল, সেও গউরকে গ্রাহ্য করছিল না। মাঠের শেষে কালো দীঘি। দীঘির পাড়ে ভাঙা মন্দির আর বকুল গাছ। সেখানে এসে তার জল তেষ্টা পেয়েছিল।

ঘাটের মাথায় দাঁড়িয়েছিল একটি মেয়ে—জলের দিকে ঘুরে কাকে তাড়া দিচ্ছিল। বকুল তলায় গিয়ে গউর থমকে দাঁড়ায়। তাদেরই পাড়ার পঞ্চাননের বউ দুর্গা দাঁড়িয়ে আছে— আঁচলে বাঁধা সন্দেশের ঠোঙা, অন্যহাতে পাঁপড় ভাজা। এক হাঁটু জলে নেমে জল খাচ্ছে কম, ছিটোচ্ছে বেশি এবং খিলখিল করে হেসে উঠেছে তার বোন চপলা। চপলার স্বামী চপলাকে নেয় নি বলে দিদির কাছে থাকে। গউর একটু বিব্রত বোধ করে। গেঞ্জিটা এমন করে কোমরে জড়ানো কেন জিজ্ঞেস করলে সে সমস্যায় পড়ে যাবে।

দুর্গা হঠাৎ ঘুরে গউরকে দেখতে পায়। বলে, 'ও গউর। মেলায় যাচ্ছো, নাকি এলে?'

গউর গলার ভেতরে বলে 'এলাম'। তারপর থমথমে মুখে পাশ দিয়ে ঘাটে নেমে পড়ে। চপলা আড়চোখে তাকে দেখে নেয়। গউর একটু বেশী ঝুঁকে জল খেতে থাকে। চপলা উঠে যায় ঘাটের মাথায়।

গউরের দিকে দুই বোন তাকিয়ে থাকে। গউর ছিল চঞ্চল, তেজী, হাসি খুশী ভাবের ছেলে। সেই গউরের হাবভাব তাদের অবাক করে। সে জল খেয়ে উঠে এলে দুর্গা মুখ টিপে হেসে বলে, 'কী গউর তুমি কি আমার ওপর রাগ করেছ নাকি?'

গউর মাথাটা সামান্য দোলায়। তারপর পাশ কাটিয়ে হন হন করে চলে যায়। দুই বোন অবাক হয়ে তার চলে যাওয়া দ্যাখে। তারা টের পেয়েছিল, গউরের কি যেন হয়েছে।

পরে দুর্গা থানার বড়বাবু মাধু দারোগাকে বলেছিল, 'তারপর থেকে গউরকে আর দেখেনি। আমার ব্যাটার দিব্যি হুজুর। শেষ দেখা আর দেখিনি।'

গউরের বাবা কেদার মুখ নিচু করে বলেছিল, 'গউর মনোহরপুরের মনসাপুজোর মেলায় গেল। গোটাকতক কাজের ভার দিয়েছিলাম। তাই রাত্তির হচ্ছে দেখে ও কিছু একটা ভাবিনি। গান বাজনার আসরও বসতে পারে। শেষ রাত্তিরে ঘুম ভেঙে গেল। গউরের মাকে ওঠালাম—গউর কি ফিরেছে? না—গউর ফেরেনি।' কেদার চোখে জল নিয়ে ফোঁস ফোঁস করে নাক ঝেড়ে ফের বলেছিল, 'হুজুর, আমার ছেলে ছোটবাবুকে খুন করেনি। আমার গউর বড় ভাল ছেলে হুজুর। আজ তিনদিন তার দেখা নাই। আমাদের মুখে অন্ন ওঠেনা। আর হুজুর, গউরকে ছোটবাবু খুব ভালবাসতেন। গউরও ওনাকে ভয়ভক্তি করত। আমার মন বলছে, যে ছোটবাবুকে খুন করেছে, সে গউরকেও খুন করে বিলের তলায় পুঁতে রেখেছে। নৈলে গউর লুকিয়ে বাড়ি আসত। অন্তত মায়ের ছেলে মাকেও দেখতে

আসত।'

মাধু দারোগা কালো কুচকুচে বিশাল মানুষ। কোমরে চামড়ার খাপে পিস্তল। হাতে বেতের ছোট্ট লাঠি। হরিণমারার লোকেরা তাঁকে দেখলে ভয়ে মরা হয়ে যায়। মাধু দারোগা বলেছিল, ' তোর ছেলে ফেরারী আসামী, কেদার। বাড়ি এলে তক্ষুনি সঙ্গে করে থানায় নিয়ে যাবি। খুনী আসামীকে মারধোরের হুকুম নেই। ওকে বুঝিয়ে বলবি। কেমন?' কেদার শ্বাস ফেলে বলেছিল, 'বলব হুজুর।'.......

কালো স্বাদু জাম

এ নদীর নাম দ্বারকা। বৈশাখ মাসে হাঁটু জলও থাকে না। শেষ জৈষ্ঠ্যের বৃষ্টিতে অল্প একটু জল এসেছিল তার বুকে। এখন আষাঢ় এসে গেছে। বহু দূরে পাহাড়ে নাকি এখন দলে দলে মেঘেরা নেমে এসেছে শালবনে। তারা শালপাতা খায়। গাঁয়ের রাখাল আর কাঠকুড়োনি মেয়েরা সেই সব কথা বলাবলি করে। শালপাতা খেয়ে মেঘেরা পাহাড় ধুয়ে দিতে থাকে। ওরা বলে, এই জল সেই জল। পাহাড় ধোয়া গেরুয়া রঙের গাঢ় ঘোলাটে জল। নদী এখন গায়ে-হলুদের কনেবউ। তার দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

কেয়াতলার বিলের শেষ দিকটায় দ্বারকার বাঁকে বাঁধ। বাঁদের দুধারে ঘন জামবন। আষাঢ়ের বৃষ্টিতে জাম পেকে কালো হয়েছে। পঞ্চানন মাঠচরা মানুষ। জমিজমা নেই। এর ওর ভুই ক্ষেতে খেটে বেড়ায়। খাটুনি না থাকলে চলে আসে বিলের দিকে। মাছ ধরে। হিজল জিয়ালা জামের জঙ্গলে ঢুকে শুকনো কাঠ ভেঙ্গে নিয়ে যায়। কখনও কখনও তার বউ দুর্গাও সঙ্গে আসে। ছেলেটাকে গাছতলায় বসিয়ে রেখে তারা এদিকে ওদিকে ঘোরে।

এখন জামের মরশুম। কয়েকদিনেই গাছগুলো প্রায় শেষ হয়ে গেছে। তলায় অজস্র ভাঙা ডাল পড়ে আছে। মাটি থকথক করছে গলা পচা জামের ঘন বেগুনি রঙের রসে। পোকামাকড় ভন ভন করছে। সবচেয়ে উঁচু গাছটার ডগায় এখনও কিছু কালো নিটোল জামের থোকা ঝুলছে। পঞ্চানন দেখে গিয়েছিল আগের দিন।

পঞ্চানন আজ গাঁয়ে মাঠে কার ক্ষেতে তিল ওপড়াচ্ছে। মজুরিটা ভালই জুটবে। দুর্গার মনে তাই সুখশান্তি। দীঘির পাড়ে খেজুর গাছের জঙ্গলে খেজুর পাতা কেটে বেড়াচ্ছে। তালাই বুনে বেচে আসবে হাটে। তার বোন চপলা বলেছিল, ' অহলে আমি যাই দিদি। জামাই দাদা কাল বলছিল না জামের কথা? আঁকশিটা নিয়ে আমি যাই।'

যুবতী মাঠকুড়োনী একাদোকা সচরাচর মাঠ বিলে যায় না। দুর্গা বলেছিল,'একা যাবি কি করে? কাউকে ডেকে নিয়ে যা। আলোপুরী নয়তো সরলাকে ডাক।'

'হুঁ। সঙ্গে নিয়ে যাই আর ভাগ দিই মুখপুড়ীদের,'চপলা বলেছিল। 'একা যাব। একা পাব।'

দুর্গা বলেছিল, ' তোর বড় বাড় বেড়েছে না? এত তোদের সানকিভাঙা কাঁশুলি নয়— কেয়াতলার বিল। জন না, মনিষ্যি না—খাঁ খাঁ জায়গা। মাথা ভাঙলে লোক পাবি নে। মনে নেই ওমাসে কেমন বাঁচা বেঁচেছিলি।'

চপলা বলেছিল,' বেশ। তাই ডাকছি কাউকে।'

কিন্তু সে ডাকেনি। দ্বারকার ধারে জামবনটার খবর তার জানা। দেখেও এসেছে কী অবস্থা হয়েছে গাছগুলোর। রাক্ষস রাক্ষসীদের পাল গাঁয়ে গাঁয়ে বাড়ছে। তাঁদের জ্বালায় কিছু কোথাও ফলে থাকার যো নেই। টনক নড়বেই।

আকাশে টুকরো টাকরা মেঘ আছে। হাওয়া বইছে বিস্তীর্ণ মাঠে। মাঠের শেষে বিলাঞ্চল। বহুদূরে ছোটবাবুর আবাদী এলাকা বাঁধের মাথায় হলুদ রঙের দালান। পাশে পাশে কিছু নতুন বসতি।

চপলার কাঁখে একটা ঝুড়ি, হাতে আঁকশি। জামবনে ঢুকে সে সব চেয়ে উঁচু গাছটা খুঁজতে থাকল। তলার ভিজে গলাপচা জাম থকথক করছে। কাঁচা আধপাকা জামগুলো খামোকা নষ্ট। জাম পাড়তে এমনি করে ডাল ভেঙে ফেলে লোকে! চপলার রাগ হচ্ছিল।

কিন্তু কোথায় সে উঁচু গাছ? সব গাছই সমান লাগে। মুখ তুলতে ঘাড়ে ব্যথা। একটু পরে সে সবচেয়ে মোটা একটা গুঁড়ি দেখতে পেল। এগিয়ে গেল সেখানে।

গিয়েই সে চমকে উঠল। থমকে দাঁড়াল। চোখ নিষ্পল হয়ে উঠল। গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে আছে গউর। একটা ঝাঁকড়া ডাল ভেঙে সামনে রেখেছে। ডালটা মোটা মোটা পাকা জামে ভরা। ছিঁড়ছে আর মুখে ভরছে। আঁটি ফেলছে ছুড়ে। তার মুখের ভেতরটা বাসি রক্তের মতো কালচে বেগুনি দেখাচ্ছে। শুকনো পাতায় মচমচ শব্দ শুনেই সে ঘুরল এদিকে। তারপর তাকিয়ে রইল।

চপলার চমকটা কাটলে, একটু হাসল। তারপর এগিয়ে গেল গউরের কাছে। গউর মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে বলল, 'জাম পাড়তে এসেছ? সঙ্গে আর কে আছে?'

চপলার বুকের ভেতরটা কাঁপছিল অবশ্য। বড়লোককে খুন করে পালিয়ে বেড়াচ্ছে গউর—এটা কম কথা নয়। গউর খুনী। খুনীর মুখোমুখি পড়েই গেছে যখন, তখন আর ভেবে লাভটা কী? মুখে হাসি ফুটিয়ে মাথা দোলাল সে। আবার কে আসবে? আমি একা এসেছি।'

গউর সন্দিগ্ধ দৃষ্টে তার মুখটা দেখে নিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে নিশ্চিন্ত হল। তারপর বলল, 'গাঁয়ে ফিরে কাউকে বলো না, আমাকে দেখেছ।'

চপলার সাহস বাড়ছিল। সে চোখ নাচিয়ে বলল, 'যদি বলি তুমি আমাকে খুন করবে তো?'

'হুঁ উ।'

'পারবে?'

গউর তাকাল ওর দিকে। 'না পারার কী আছে?' বলে পাশে মাটিতে ডগা বিঁধিয়ে রাখা প্রকান্ড হেসোটা তুলে ফের কোপ বসাল মাটিতে। তেমনি করে রেখে দিল। 'এই হেসো দিয়ে শালাকে কেটেছি। আমার হাত খুলে গেছে।'

চপলা নাকছাবি খুঁটতে খুঁটতে আস্তে বলল, 'কেন খুন করেছ ছোটবাবুকে?'

গউর শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, 'বিনিদোষে কেউ কারুর গলায় কোপ মারে? তেমন কাজ করেছিল বৈকি।'

'আহা, কী করেছিল বলো না বাপু?'

'সে তুমি শুনে কী করবে?'

চপলা একটু তফাতে, ভিজে মাটিতে বসে পড়ল। 'হুঁ। তা এমন করে পালিয়ে কতদিন বাঁচবে ভাবছ? পরশু দারোগাবাবু আবার এসেছিল।'

'এসেছিল?'

'আসবে না?' চপলা একটু জোর গলায় বলল। 'বড় লোককে খুন করেছ। পিথিমীকে টলিয়ে দিয়েছ। হুলস্থুলুস চলছে।'

গউর হাসল। 'সত্যি বলছ?'

'রাত্তিরে গিয়ে শুনে এস না, তোমার বাবার কাছে। দারোগাবাবু শাসিয়ে গেল কাল। ধরা না দিলে তোমাদের বুড়োবুড়িকে ধরে নিয়ে যাবে। ঘর বাড়ি কোরোক করবে।'

'কোরোক (ক্রোক)?'

'হ্যাঁ। তাই বললে।'

'দারোগাবাবু বললে?'

চপলা চুপ করে রইল। গউর জামের ছোপ লাগা হাত আর মুখ, জাম পাতা ছিঁড়ে মুছতে থাকল। একটু পরে চপলা বলল, 'দারোগাবাবু পাড়ার লোককেও শাসাল। বললে, ওকে ধরে না দিলে সবাইকে ধরে নিয়ে যাবে। ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দেবে। জামাইদাদা বলছিল, গর্মেন্টের খুব রাগ হয়েছে। গর্মেন্ট কে জিগ্যেস করলাম তো জামাইদাদা রেগে গেল। জানো তুমি গর্মেন্ট লোকটা কে? ছোটবাবুর কেউ হয় নাকি গো?'

গউর মুখ নিচু করল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'আগুন তাহলে আমিও লাগাব। ছোটবাবুর খামার পোড়াব। ওর জমির ফসল কেটে দেব। এই হেসো দিয়ে।'

'বোকামি করোনা বাপু! তুমি পারবে ওদের সঙ্গে?

'যতটুকুন পারি।'

চপলা একটা শুকনো ডাল মট করে ভেঙে মাটিতে দাগ কাটতে থাকল। 'এত রাগ ক্যানে তোমার

বলো তো?'

গউর আস্তে বলে, 'রাগ একদিনের না। আর সে সব কথা শুনে কী করবে বলো? জাম পাড়তে এসেছ, এই ডালের গুলো ছাড়িয়ে নাও। ঝুড়ি না ভরলে বলো তো গাছে উঠে আরও ডাল ভেঙে দেব।'....একটু চুপ করে থেকে সে ফের বলল, 'গাঁয়ে গিয়ে যদি বলে দাও গউর এখন বিলের জঙ্গলে লুকিয়ে আছে তাহলে....।'

তাকে থামতে দেখে চপলা একটু হেসে বলল, 'তাই তোমার মনে হয় বুঝি?'

'কী জানি। তোমার সঙ্গে তো আমার ভাব নেই।' গউর হাসতে লাগল।

চপলা রাঙা মুখে চোখ নামাল।

গউর হাসির মধ্যে ফের বলল, 'তাছাড়া তুমি পরের বউ। আমার সঙ্গে কী সম্পর্ক তোমার? এ্যাদ্দিন পথে ঘাটে দেখা হয়েছে। কখনও পঞ্চাদার বাড়ি গেছি তোমাকে দেখেছি। তোমার চোখে চোখ পড়লে হেসেছ। কেন হেসেছ তুমিই জানো। আর কোনো পুরুষ মানুষ হলে কবে ভাব করে বসত। করত না?'

চপলা কাঠিটা ওর গায়ে ছুড়ে মারল। 'থামো! ভারি ভাবের পুরুষ তুমি?'

'নই? ক্যানে বলো তো চপলা?' বলেই গউর মুখ তুলে দূবে কী দেখতে থাকল।

চপলা বলল, 'কী?'

'একটা লোক।'

চপলা দেখে নিয়ে বলল, 'তোরাপ—মুসলমান পাড়ার। ওকে চিনি। নদীর ধারে কুমড়ো ক্ষেতে যাচ্ছে এদিকে আসবে না।'

দুজনে দেখতে থাকল। তোরাপ অনেকটা দূরে নদীতে নামলে গউর বলল, 'তুমি এরই মধ্যে সবাইকে চিনে ফেলেছ দেখছি—গাঁ সুদ্ধ। তোমার মতো মেয়ে হরিণমারায় একটাও নেই।'

চপলা বলল, 'চিনতে হয়েছে। কপালের দোষে, দিদির কাঁধে এসে চেপেছি। মাঠ-ঘাট কুড়িয়ে খাচ্ছি। কেমন লোক, কে কোথায় কী কাজে ঘুরছে—দেখতে দেখতে ঝট করে জানা হয়ে যায়। তবে সে কথা থাক। এ্যাদ্দিন তুমি খাচ্ছ কী, শুচ্ছ কোথায় বলো তো শুনি?'

গউর বলল, 'মেলার দিন দীঘির ঘাটে তোমাদের সঙ্গে দেখা হল। সে রাতে অনেকক্ষণ মাঠে বসেছিলাম। তারপর বাড়ি গেলাম। পা টিপে টিপে দাওয়ায় উঠে হেসোখানা নিলাম। বাবার কালঘুম। জানতে পারল না। হেসো নিয়ে বেরোলাম কেয়াতলাব ঝিলের দিকে। ছোটবাবুর বাড়ির কাছে যেতে সাহস হল না। দুটো বিলিতী কুকুর ছাড়া থাকে। সারারাত একটা হিজল গাছের ডালে শুয়ে থাকলাম। ছোটবেলা থেকে এ অভ্যাস আছে। সকালে ছোটবাবু জমি দেখতে বেরুল। আমিও ওত পাতলাম। ঘুরতে ঘুরতে ছোটবাবু এসেছে হিজল তলায়, আমিও ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম সামনা সামনি। বললাম, কী রে শালো—আমাকে লাল গেঞ্জি দিবি বলেছিলি?'

'গেঞ্জি! লাল গেঞ্জি!'

'সে অন্য কথা।' গউর বলতে থাকল! 'ছোটবাবুর চেঁচানি শুনেছিল কেতো বাগদি। সে দৌড়ে আসতে আসতে ছোটবাবু খাবি খাচ্ছে। আর আমি বিল ভেঙে দৌড়চ্ছি। কখনও তো মানুষ খুন করি নি!' গউর হাসতে লাগল।

'মানুষ খুন কি ভাল কথা? কেন এ কাজ করলে তুমি?'

'বেশ করেছি।' বলে গউর উঠে দাঁড়াল। হেসোটা হেঁট হয়ে হাতে নিল।

চপলার বুকটা ধড়াস করে উঠেছিল। সে ভয়ে ওকে দেখতে দেখতে বলল, কিন্তু 'তুমি কোথায় খাচ্ছ? খিদে পায় না? রাত কাটাবার না হয় জায়গা আছে। খাওয়া?'

গউর দূরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মাঠে আর বিলে আছে—তারা ছোটবাবুর মরণে খুব খুশী জানো তো? অনেক লোকের জমি গায়ের জোরে হরেহন্নে দখল করছিল। তারা আমাকে খেতে দেয়। ওই দেখছ মড়িরামের কুঁড়ে। মড়িরাম কাল আমাকে ভাত দিয়েছিল। নদীর ধারে ওর বেগুনগাছে খুব বেগুন ধরেছে। সেই বেগুন পোড়া, আর খাল ডোবায় ধরা শোল মাঝের ঝোল। পেট ভরে খাইয়েছে বুড়ো।'

'এখন যাচ্ছ কোথায়?'

'তুমি দেখে ফেললে। আর বিল বাদাড়ে থাকা চলে না।' গউর হাসল।

'আমাকে বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'না।'

চপলা চেঁচিয়ে উঠল। 'তুমি জানো, ছোটবাবু সাপের দংশনে মরুক বলে আমি মানসা করতে গিয়েছিলাম মনসার থানে?'

গউর অবাক হয়ে গেল। 'মানসা করেছিলে? ক্যানে?'

চপলা মুখ নামিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, 'একদিন সে আমার হাত ধরেছিল এই জঙ্গলে। দিদি আর জামাইবাবু ওই খালে মাছ ধরছিল। আমি গাছতলায় দিদির ছেলেটাকে কোলে নিয়ে বসেছিলাম। হঠাৎ কোত্থেকে এসে আমার সঙ্গে ভাব করতে লাগল। তারপর ....'চপলা নাক ঝেড়ে বলল, ভগবান বাঁচালেন। আমাকে টানাটানি করলে দিদির ছেলেটা ঘুম থেকে উঠে কাঁদতে লাগল। তখন চলে গেল মুখ পোড়া পাপিষ্ঠি।'

'বলো নি পঞ্চাদাকে?'

'দিদিকে লুকিয়ে বলেছিলাম। দিদি কাঁদল। কেঁদে বলল, আমাদের ছোটলোকের কপালই তো এই রে। মাঠে ঘাটে বিলবাদাড়ে চরে খেয়ে বেড়াই পেটের জ্বালায়। কু-লোকে বাঘের মতন ওত পাতে। তবে ছোটবাবু বড়লোক। জমি জিরেতওলা লোক। উল্টে এমন বিপদে ফেলবে যে মাঠ ঘাটে আর যাওয়াই যাবে না। তার চেয়ে চেপে থাক। ভগবানের বিচের একদিন হবে।' চপলা চেঁচিয়ে উঠল ফের। 'হল। সাজা পেল কারুর না কারুর হাতে।'

গউর বসে পড়ল ফের। শান্ত গলায় বলল, 'হ্যাঁ। তাই বলছিলাম না? আমার রাগ অনেক দিনের। ছোটবেলা থেকেই। তবু মুখে হেসে হুকুম তামিল করতাম। দেখে ভয়ও পেতাম। হঠাৎ কেমন করে এতকাল বাদে ভয়টা কেটে গেলো।'

চপলা মুখ নামিয়ে বলল, 'তুমি যদি বলো, ওবেলা তোমার জন্যে লুকিয়ে দুটি ভাত নিয়ে আসব। দিদি মনে মনে খুব খুশী হয়েছে, জানো তো?'

সে কথায় কান না দিয়ে গউর বলল, 'গত সনে ভাল ধান হয়নি। ছোটবাবুর আড়াই বিঘেতে ভাগে চাষ দিয়েছিলাম। ধান উঠল শালার খামারে। ভাগের সময় বলে, আগে এক বস্তা ধান আলাদা রাখো। বাবা বলল, কিসের? শালা বলল, পূজোর। বেশ—তাই রাখা হল। তারপর বলে, আধ বস্তা আলাদা রাখো। কিসের? না ইস্কুলের। এমনি করে অদ্ধেক ধান সরিয়ে বাকি অদ্ধেক ভাগ হল। তাও ছোটবাবুর দুভাগ, আমাদের একভাগ। পথে আসতে আসতে বাবা কেঁদে ফেলল। আমি ভুলি নি।'

একটা বাতাস এল নদী পেরিয়ে। বাতাসটা জাম বনের ভেতর হুলস্থূল বাধিয়ে বিলের দিকে চলে গেল। তারপর গউর বলল, 'আমি যাই। আর শোনো, এই জিনিসটা মাকে দিও। বোলো, আমার জন্য ভাবে না যেন।'

মোড়কটা নিয়ে চপলা বলল, 'কী?'

'মনসার থানের ধাগা!'

'তুমি এখন কোথায় যাচ্ছ?'

'বিলে আর থাকব না। দেখি কোথায় যাই।'

'একটু বসো না বাপু!'

গউর কয়েকটা জাম ছিঁড়ল ভাঙা ডালটা থেকে। চপলার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'খেয়ে দেখ। দারুণ স্বাদ। উঁচু ডালে ছিল বলে কারুর ভোগে লাগে নি। আহা, খেয়েই দেখ না।'

চপলা জাম খেতে থাকল। তারপর জিভ বের করে দেখে বলল, 'যেন পানের রস।'

'তোমার ঠোঁট দুখানা রাঙা হয়ে গেল। কী সুন্দর দেখাচ্ছে চপলা!' চপলা লজ্জায় মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'যাঃ। আমি পরের বউ। ওকথা কেন?'...।

রাক্ষসের প্রাণ ভোমরা

দুঃখহরণের জীপগাড়ি গাঁয়ে ঢুকতে দেখে হইচই পড়ে গিয়েছিল। হরিণমারায় জীপগাড়ি ঢোকে ভোটের বছর। ঢোকার রাস্তাটা মোটেই জুতসই না। পিচরাস্তা থেকে এবড়োখেবড়ো সঙ্কীর্ণ কাঁচা রাস্তায় জীপগাড়িটা যখন ধুলো উড়িয়ে টলতে টলতে আসছিল, তখন দূর থেকে দেখতে পেয়ে ছোট ছেলেমেয়েরা অতিথি বরণ করার ভঙ্গিতে গাঁয়ের মুখে এসে জড়ো হয়েছিল। পিট পিট করে তারা চিৎকার করছিল, 'ভোটের বাবু! ভোটের বাবু!' গাড়ি সামনে এলে তাদের কোলাহল থেমে গিয়েছিল। পিটপিট করে তাকিয়ে দেখছিল তারা।

বয়স্করা বেরিয়ে এসে চমকে উঠেছিল। ছোটবাবুর ভাই বড়বাবু এসে পড়েছেন। জীপগাড়ির ভেতর জনাকতক জোয়ানবাবু বসে আছেন বড়বাবুর পাশে আফজল। কেয়াতলার দুর্ধর্ষ একটা লোক। ছোটবাবু প্রাণরঞ্জনের ডান হাত বলতে যা বোঝায়, সে আফজল। তার পরনে নীলচে লুঙ্গি। গায়ে ডোরাকাটা গেঞ্জি। মাথার চুলগুলো বেজায় ছোট করে কামানো। তাকে দাড়ি রাখতে দেখেনি কোনোদিন কেউ। কিন্তু তার ভয় জানানো গোঁফ আছে। লালচে কুতকুতে এক জোড়া চোখ আছে। সেই চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলা সহজ নয়।

মাথাহরিণমারা তত কিছু বড় গ্রাম নয়। ঘর পঁচিশেক হিন্দু আর ঘর দশেক মুসলমানের বাস। চাষা-ভুষো নিরক্ষর মানুষ—ক্ষেতমজুরের সংখ্যাও বেশী। এখন আষাঢ় মাস, মনের ভেতর সবার সাজো সাজো রব—মাঠে ঝাঁপিয়ে পড়ার ক্ষণ গুণছে। মাঠে যেন উৎসবের সময় হয়ে এল। অথচ আকাশ কদিন থেকে সেই উৎসবের প্রস্তুতি হঠাৎ গুটিয়ে ফেলেছে। মেঘের পর্দা গেছে সরে। পূবের হাওয়া বইছে ঝড়ের বেগে। কেউ কেউ বলছে, এ কি তাহলে আকালের হাওযা?

দু'পাড়ার মধ্যেখানে ঠাকরুণতলা। বট পাকুড়ের গাছ। ভাঙাচোরা মন্দির। বিশাল উঠান ন্যাড়া হয়ে আছে খেলাধুলোর চোটে। বিকেলে ছেলেরা 'মালামো' লড়ে। হা-ডু-ডু খেলে। ছোটরা নিমডাল ভেঙে মুখে ঢাক বাজিয়ে পূজো পূজো খেলে। মুসলমানপাড়ার ছেলেরাও এসে খেলায় যোগ দেয়। এই ঠাকরুণতলায় ভোটের বাবুরা এসে 'বক্তিমে' করে যান। মোড়লরা গাঁয়ের সমস্যা নিয়ে কথা বলতে জোটে। বিচার সভা বসায়। এখানেই এসে থামল বড়বাবুর জীপগাড়ি। বড়বাবু আর তাঁর সঙ্গীরা জীপ থেকে নামলে ড্রাইভার গাড়িটা ঘুরিয়ে একপাশে দাঁড় করাল। বড়বাবুর পরনে উজ্জ্বল সাদা ধুতি, পাঞ্জাবি, আঙ্গুলে লাল নীল পাথর বসানো সোনারুপোর আংটি। পায়ে পাম্পসু। সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'কই রে, তোদের মোড়লকে ডাক।' পরনে ময়লা লুঙ্গি, রোগাটে চেহারা, চিবুকে দাড়ি—একটা লোক কাস্তে দিয়ে পিঠ চুলকোচ্ছিল। বড়বাবু তাকে বললেন, 'তুই আবদুল না?'

'জী বড়বাবু। সালাম!' আবদুল সেলাম জানাল সবিনয়ে।

'তোদের মাথা কে?'

'জী, জাফর মোল্লা।'

'তাকে ডেকে নিয়ে আয়।'

আবদুল তক্ষুনি হনহন করে চলে গেল পাড়ার দিকে। জাফর মোল্লাকে বাড়িতে পাবে কিনা সে জানে না। কিন্তু বড়বাবুর হুকুম।

কিছুক্ষণের মধ্যে ঠাকরুণতলায় হরিণমারার প্রায় তিনভাগ লোক এসে ভিড় করল। মেয়েরাও এল। বড়বাবু বললেন, 'কেদার আছে এখানে? কেদার?'

কেদার আসেনি। হরি মোড়ল সবিনয়ে বলল, 'কেদারের শরীর ভাল না বড়বাবু। বিছানায় শুয়ে আছে কদিন থেকে। পিরিমল বদ্যি তার চিকিচ্ছে করছে।'

'মিথ্যা বলছ মোড়ল।' আফজল চোখ পাকিয়ে বলল। 'কাল ক্যাদরা শালাকে দেখেছি কেয়াতলা থানায় বড়বাবুর সামনে বসে ছিল।'

হরি মোড়ল চুপ করে গেল। দুঃখহরণ সিগারেট জুতোর তলায় ঘষটে নিভিয়ে বললেন, 'মোড়ল, একটা কথা বলতে এসেছি তোমাদের গাঁয়ে। মোল্লা, তুমিও শোনো। সাতদিন সময় দিচ্ছি, কেদারের ছেলেকে যেখান থেকে পারো হাজির করো। তাকে আমার কাছে পৌঁছে দাও। তা যদি না করো, তাহলে পরিণাম খুব খারাপ হবে। কেদারের ছেলের দায়িত্ব তোমাদের নিতে হবে। বুঝেছ সব?' মোড়ল

আর মোল্লা মাথা দোলাল। বুঝেছে।

দুঃখহরণ দুঃখিত স্বরে বললেন, 'ছোটকু—তোমাদের ছোটবাবু, সারাজীবন তোমাদের জন্যে কি না করেছে। বিল এলাকায় ডুবো জমিতে ফসল পেতে এক মুঠো। ছোটকু কত তদ্বির করে সরকারকে ধরে স্টেট রিলিফের গম যোগাড় করেছে। তাই এমন একটা মজবুত বাঁধ হয়েছে। জমিগুলোতে সোনা ফলছে। ছোটকু তোমাদের আপদে-বিপদে সাহায্য করেছে। অভাবের সময় গম টাকা পয়সা দিয়ে উপকার করেছে। সত্যি না মিথ্যা বলছি?'

মোড়ল আর মোল্লা গাঁয়ের পক্ষ থেকে ফের মাথা দোলাল। সত্যি। গর্জন করে উঠলেন দুঃখহরণ, 'আর সেই ছোটকুকে তোমাদের গাঁয়েব এক পুঁচকে ছোঁড়া মেরে ফেলল। নেমকহারাম! লজ্জা করে না তোদের, এমন শুয়োরের বাচ্চা জন্ম দিয়েছিস, তোরা বেইমান।'

দুঃখহরণের চোখে আগুন ঝরতে থাকল। আবাব সিগারেট ধরিয়ে নিজেকে কিছুটা সংযত কবে ফের বললেন, 'শুধু হরিণমারা কেন, আশেপাশে প্রত্যেকটি গাঁয়ের লোকের জমি কেয়াতলার নাবাল এলাকায় রয়েছে। ছোটকু, পৈত্রিক বাড়ির সুখস্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে এতসব চাষাভূষোর জন্য তেপান্তরের মাঠে গিয়ে বসত বেঁধেছিল। আগের বছরে আশ্বিনে বাঁধ ভাঙল। কত গ্রাম ডুবে গেল। হরিণমারায় পর্যন্ত জল ঢুকেছিল। ছোটকুর চেহারা দেখে সেদিন আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। পাগলের মতো ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। রিলিফের নৌকা নিয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে কাপড়-চোপড় খাদ্য বিলি করে বেড়াচ্ছে। আমার নিজের ভাই—তবু আমার ইচ্ছে করছিল, ওর পা ছুঁয়ে প্রণাম করি।' দুঃখহরণ চোখে জল নিয়ে ধরা গলায় বললেন, 'আর সেই দেবতুল্য লোকটাকে তোরা মেরে ফেললি?'

ঠাকরুণতলা চুপ। বট গাছের ডালে পাখিরা বটফল খাচ্ছে। এঁটো বটফল ঝরে পড়ছে—তারই শব্দ দমকা পূবের হাওয়ার। মন্দিরের উঁচু বারান্দায় দুটো ছাগল ঢুঁ খেলছে। পাশে আপন মনে ঘুটিঙ নিয়ে লোফালুফি করছে একটা বাচ্চা মেয়ে। মাঝে মাঝে আনমনে সে সভার দিকে তাকাচ্ছে। এক কোঁচড় কচুশাক তুলে আনছিল ডোবার পাড় থেকে এক যুবতী মেয়ে—সে চপলা। থমকে দাঁড়িয়ে গেছে দূরে।

দুঃখহরণ রুমালে নাক চোখ মুছে থুথু ফেলে ফের গর্জালেন। 'কী করেনি ছোটকু তোদের ভালর জন্য? নিজের ঘরের কথা বলতে নেই—তবু বলছি, তেপান্তরে গিয়ে থাকতে পারবে না বলেছিল বলে স্ত্রীকে পর্যন্ত ত্যাগ করেছিল ছোটকু। কে পারে? বল তোরা শুনেছিস কখনও এমন কথা? জীবনের স্বাদ আহ্লাদ ত্যাগ করে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়িয়েছে এমন করে—গাঁয়ে গাঁয়ে লোকের সুখ দুঃখের খবর নিযে বেড়িযেছে এভাবে, এমন লোকের কথা কখনও শুনেছিস তোরা শুওরের বাচ্চারা?'

মোড়ল শ্বাস ছেড়ে বলে উঠল, 'বড় ভাল মানুষ ছিলেন ছোটবাবু।'

দুঃখহরণ ভেংচি কেটে বললেন, 'বড় ভাল মানুষ ছিলেন! বুড়ো হনুমান কোথাকার। এ তোদেরই ষড়যন্ত্র আমি বুঝিনা? মনোহরপুরের সাটু হারামজাদার কথায় কেদারের ছেলেকে দিয়ে খুন করিয়েছিস তোরা।'

মোড়ল মোল্লা এক গলায় বলল, 'ভুল বড়বাবু, ভুল কথা।'

বড়বাবু শাসালে, 'সাত দিন সময় রইল। সাত দিনের মধ্যে রাস্কেলটাকে ধরে আমার বাড়ী হাজির করবি। নৈলে দেখবি কী হয়।'

বলে আফজলের দিকে ঘুরলেন। 'আফজল! এই শালাদের বুঝিয়ে দে কথাটা।'

আফজল গোঁফে অভ্যাস মতো তা দিয়ে বলল, 'বড়বাবুর মনে শান্তি নেই, বুঝলে তো বাবা সকল ভাই সকল? ছোটভাই। তার রক্ত দেখলে কি মানুষের মাথার ঠিক থাকে? কাজেই যা বললেন সেই মতো কোরো। আমি বেশি কথার মানুষ না। বুঝে কাজ কোরো। ব্যস!'

মোল্লা সাহস করে বলল, 'বাবা আফজল! তুমি মরদ বটে। তবে কথা কি, আমরা কোথায় পাব কেদারের ছেলেকে? বরঞ্চ থানার বাবুমশাইরা দারোগা পুলিশরা তো চেষ্টা করছেন।'

দুঃখহরণ জীপে গিয়ে বসেছেন। আফজল ঠোঁট বাঁকা করে বলল, 'পুলিশ! কেয়াতলার বড়বাবু যা বললেন, তাই আইন। পুলিশ টুলিশ নিয়ে মাথা ঘামিও না চাচা।'

বলে সেও জীপে গিয়ে বড়বাবুর পাশে বসল। সঙ্গের তিন জোয়ান বাবুও পেছন দিয়ে উঠে

বসল। জীপটা ঠাকরুণতলাকে কাঁপিয়ে ধুলো উড়িয়ে চলে গেল। চপলার পাশ দিয়ে জীপটা গেলে চপলা বলল, 'সঙ!'

তারপর একটা কোলাহল উঠল সভায়। সবাই কিছু বলতে চায়। দুপাড়ার দুই মাথা বারবার চুপ করতে বলেও গণ্ডগোল থামাতে পারছিল না। কেদারের ভাইপো গণেশ প্রচণ্ড চেঁচিয়ে বলল, 'চ ও-প।'

সে গউরের চেয়ে স্বাস্থ্যবান। গউর একটু তামাটে রঙের ছেলে। গণেশ কালো। সে বর্ষার সব গাঁয়ের মালামোর আসরে মালামো বা কুস্তি লড়ে। বাহুতে চাঁদির তাগা আছে। তার চিৎকারে সবাই চুপ করলে সে বলল, 'কেয়াতলার বাবুদের জোর আছে বটে। ওনারাই যেন দেশটার রাজা। তবে ছোটবাবুর গুণের কথা বলছিল—এতগুলো মাথার লোক থাকতে কেউ বলতে পারলে না, ছোটবাবু উপকারের বদলে কতজনকে পথে বসিয়ে গেছে? হুঁ, নাবাল মাটিতে ফসল ফলেছে ছোটবাবুর জোরে। বুকে হাত দিয়ে বলো দিকিনি, সে-ফসলের কতটুকু তোমাদের ঘরে আসে কতটা যায় ছোটবাবুর ঘরে?'

হরি মোড়লের ছেলে কানু সায় দিয়ে বলল, 'ওনারই তো পেরায় সব জমি। আরও যত জমি – সেও ওনার মতো বাবুমশাইদের। আমাদের কটুকুন?'

সায় পেয়ে গণেশ বলল, 'টেসরিলিপের (টেষ্টরিলিফ) কথা বলছে? টেসরিলিপের কত মণ গম মেরে ছোটবাবু লাল হয়েছিল, সে হিসেব যদি করি? আর বলছে বানের বছরকার কথা! আমরা জানি না বানের রিলিপের কত টাকা মেরেছিল ছোটবাবুরা? যত বাবু রিলিপ করেছে, সবাই আঙ্গ ল ফুলে কলাগাছ হয়েছে। আমরা শালা মুরুক্ষু লোক। আমরা পেয়েছি লবডংকাটি!'

হরি মোড়ল দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলল, 'তা এতক্ষণ কি বলতে মুখে ইয়ে পড়েছিল? এখন তো খুব পালোয়ানী দেখাচ্ছিস!'

গণেশ বলল, 'তোমরা মাথার লোক থাকতে আমরা মুখ খুলব ক্যানে মোড়ল জ্যাঠা?'

মুসলমানপাড়ার আকুল আরেক জোয়ান। সে বলল, 'আফজলকে দেখে সবাই ভয় পেয়ে গেল। আফজল কি বাঘ? বলতে পারলে না--দেশে আইন আছে?'

জাফর মোল্লা এক ধমকে তাকে থামিয়ে দিল। সে উঠে দাঁড়াল এতক্ষণে। হিতপ্রাজ্ঞ বলে গ্রামে এই বুড়োর প্রতি শ্রদ্ধা আছে সকলের। সে বলল, 'সাত দিন সময় দিয়ে গেল বড়বাবু। শাসিয়ে গেল। এখন কথাটা হল, থানা পুলিশ করেও লাভ নেই। শুনলে না সেদিন মাধু দরোগামশাই ঠিক একই কথা বলে গেল? ওনারা ভেতরে ভেতরে এক। কাজেই বলি বাবাসকল, মন দিয়ে শোনো। মোড়ল, তুমিও শোন। কেদারের ছেলে যদি আদালতে গিয়ে ধরা দেয়, তবেই সব দিক রক্ষে হয়।'

হরি মোড়ল সায় দিল। 'খুব খাঁটি কথা। কিন্তু গউর্যাকে পাচ্ছি কোথা? পেলে তো বুঝিয়ে বলব।'

মোল্লা বলল, 'তোমরা জানো, মামলামোকদ্দমার ব্যাপারে একটু আধটু জ্ঞানগম্যি আছে। তাই বলি যেভাবে হোক গউরকে খুঁজে বের করো। আমার জিম্মায় এনে দাও। আমি ওকে সঙ্গে করে একেবারে মণিবাবু মোক্তারের বাড়ীতে তুলব। সেখান থেকে আদালতে হাজির করে দেব। তাহলে আর গউরের মারধোর খাবার ভয় নেই, জেল হাজতে থাকবে। মামলায় যা হবার হবে—সে গউরের কপাল। কী বলো?'

সভা চুপচাপ। পরামর্শ মনে ধরেছে। ঠাকরুণতলায় আবার পাকা বটফল পড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ পেছনের দিক থেকে কে বলে উঠল, 'মামলায় গউরের যদি ফাঁসি হয়?'

সবাই ঘুরে দেখে অবাক হয়ে গেল। পঞ্চাননের শালী কোঁচড়ে কচুশাক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটা ইতিমধ্যে এ গাঁয়ে মুখরা আর তেজী বলে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। পঞ্চানন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল। চপলা মুখ টিপে হেসে ফের বলল, 'মামলায় গউরের যদি ফাঁসি হয় তাহলে কেউ আটকাতে পারবে তোমরা?'

'এ্যাই চপ্‌লি। বেহায়া মেয়েমানুষ কোথাকার।' পঞ্চানন তেড়ে গেল। তার বউ দুর্গা এখানে থাকলে বোনের চুল ধরে কিল মারতে মারতে নিয়ে যেত।

চপলা বলল, 'আমার বাপু সোজা কথা। গউরের সঙ্গে সেদিন বিলে জামতলায় দেখা হয়েছিল।

বললে, ধরা দোব না।'

পঞ্চানন কী বলতে যাচ্ছিল, হরি মোড়ল তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'দেখা হয়েছিল গউর্যার সঙ্গে?'

'হুঁউ।'

'এখন সে কোথা আছে?'

চপলা বাঁকা হাসল। 'তা জানি না। বললে, বিলে আর থাকবে না। অনেক দূরে চলে যাবে।'

'অ।' হরি মোড়ল চিন্তিতভাবে বলল। 'তাহলে গউর্যা এ্যাদ্দিন বিলেই লুকিয়ে বেড়াচ্ছিল?'

চপলা হনহন করে চলে গেল। একটু পরে পঞ্চানন তাকে বকবে বলে লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল। জোয়ানরা চোখ টেপাটিপি করছিল। এই মেয়েটার সঙ্গে তাহলে কি করে—কবে গউরের ভাব হয়েছিল কেউ টের পায় নি? গণেশ গউরের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল, 'মরুক গউর্যা।'

ঘনশ্যামের হাতে একটা জালের খেই। এতক্ষণ জাল বুনছিল চুপচাপ। দ্বারকায় বর্ষার ঢল নামলে সে মাছ ধরবে। মনে সেই স্বপ্ন। এতক্ষণে বলল, 'মোল্লাকে একটা কথা বলি। আদালতে গউরকে হাজির হবার কথা বলছ। তাতে না হয় গউর বাঁচল। কিন্তু আমরা?'

মোল্লা তাকাল। সভা আবার চুপ। একটা প্রচণ্ড আতঙ্ক সবাইকে শিহরিত করল।

ঘনশ্যাম বলল, 'বড়বাবু গউরকে চায়। গউর তার হাতছাড়া হয়ে আদালতে গেলে কী হবে ভেবেছ? আগুন জ্বেলে দিয়ে যাবে গাঁয়ে। বরঞ্চ তাই বলি, গাঁ বাঁচানোর কথা ভাবো মোল্লা। মোড়ল, তুমিও ভাবো। গউর আমাদের গাঁ কে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে। বোকা ছেলেটা রাক্ষসের প্রাণ ভোমরায় হাত দিয়ে বসে আছে।' ঘনশ্যাম দার্শনিকের ভংগীতে বলতে থাকল, 'সাতশো রাক্ষস এবারে জেগে উঠেছে ভাই সকল! সাবধান!'

সারা হরিণমারা আতঙ্কে কাঠ হয়ে গেল শুনতে শুনতে। এদিক থেকে তো তারা ব্যাপারটা ভাবেনি।

মধুগন্জের কাদের আলি

আকালের হাওয়া মাঝরাতে ঘুরে গেল। শেষ রাত থেকে বৃষ্টি। সকাল হতে না হতে কাড়ান মাঠ ঘাট জলে থৈ থৈ। দুপুরে আকাশ একটু ক্ষান্ত হয়েছে। কিন্তু এখনই ঝিরঝিরিয়ে বর্ষা এলেই হল। কোনো ভরসা নেই। জলভরা মাঠে ব্যাঙ ব্যাঙনীদের ডাকে কান পাতা দায়। ঝাঁকে ঝাঁকে সাদা বক উড়ে বেড়াচ্ছে এখান থেকে ওখানে। প্রকৃতিতে কী এক আলোড়ন চলেছে...সেখানে যারা আছে, তারা সবাই চঞ্চল। গ্রাম থেকে মানুষজন বেরিয়ে পড়েছে। মাঠে কালো-কালো ছায়ার মতো মানুষ ঘোরে ধূসর আকাশের নিচে।

বদরু মাঠে গিয়েছিল। বীজধানের ক্ষেত থেকে জল বের করে কাদা মেখে ফিরল। হাতে কোদাল, মাথায় মাথালি। উঠানে দাঁড়িয়ে দাওয়ার দিকে তাকিয়ে সে প্রথমে অবাক, পরে অস্বস্তিতে নড়ে ওঠে, 'মিতে, তুমি!' বলে কোদালটা একপাশে ছুড়ে ফেলে লাফ দিয়ে দাওয়ায় ওঠে। সামনে হাটু দুমড়ে বসে ফের বলে, 'কী ভাবা যে ভাবছি তোমার জন্যে, উরেব্বাস। ইদিকে দেখি তুমি আমার বাড়িতেই হাজির।' সে হাসতে থাকে।

গউর দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে ছিল। পাছার নিচে তালপাতার চাটাই। বদরুর মা তার কোঁচড়ে চিঁড়ে-গুড় দিয়েছে। গউর চিবুচ্ছে। চোখ দুটো কোটরে ঢোকা। লালচে হয়ে আছে। উস্কোখুস্কো চুল। চিঁড়েটা মুড়মুড় করে চিবুচ্ছে।

তাই দেখে বদরু আরও খুশি হয়। এই গউর কেয়াতলার বিলের জলে গামছায় বেঁধে চাল ভেজাতে দিত। ফুলে ঢোল হত চালগুলো। রঙটা সাদা হয়ে উঠত। সে কী আশ্চর্য স্বাদ তখন! গউর বলত, 'খাও মিতে। জাত খেলে যায় না, বললে,যায়।' রাখালী জীবনের সেই দিনগুলো রয়ে গেছে কেয়াতলার কুশকাশের বনে, হিজল-জাম-জিয়ালার ছায়ায়, দ্বারকা নদীর বুকের বালিতে। যেখানে হিন্দু-মুসলমান ছিল না। সবাই গেরস্থের রাখাল। একসঙ্গে ভাগ করে খেয়েছে গেরস্থের দেওয়া 'জল খাবার'। খেয়ে খালের নীলচে জল পান করে তেষ্টা মিটিয়েছে। নদী খাল-বিলের জলও হিন্দু-মুসলমান হয়ে ওঠেনি।

গউর হাসে। ঢোক গিলে বলে, 'সোঁদরপুর গেলাম মামার বাড়ি। মামা বললে, তুই পালা বাবা!

তোকে এখানে পেলে বিপদ হবে। মামা জায়গা দিতে পারল না। তা'পরে গেলাম দিদির বাড়ি কাপাসী। দিদি ত ভয়ে কাঠ। কোঠাঘরের ওপর ঘুমটি ছাদে লুকিয়ে থাকতে বলল। ধুস্ শালা! কতক্ষণ আঁধারে অমন করে পড়ে থাকব? আমি মাঠচরা মানুষ। বিলে মাঠে বেশ ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। লোক দেখলেই আড়ালে চলে যেতাম। কখনও শেয়ালের গর্তে, কখনও জল ছুঁচোর গর্তে। কখনও গাছের ডালে। কিন্তু হঠাৎ এই বৃষ্টি!'

বদরু বলে, 'বুঝলাম অবস্থাটা। ভালই করেছ মিতে।'

গউর একটু হাসে, 'এখন তুমি তাড়িয়ে দিলে আবার এক জায়গায় যাবো।'

বদরুর মা দাওয়ার কোণায় উনুনে ভাত রাঁধছিল। বদরুর বউ মাথায় ঘোমটা টেনে গোয়ালঘরের ছোট্ট দাওয়ায় গরুর জন্য খড় কাটছিল বঁটিতে। বদরুর মা বলে, 'ব্যাটা আমার এমন একটা কাজ করেছে, শুনে অব্দি ব্যাটাকে দোওয়া করছি মনে মনে। ওই হারামী ছোটবাবুর জন্যেই না বদরুর বাপ মাথাখারাপ হয়ে কবরে গিয়ে শাস্তি পেলে! আমার কি কম রাগ—কম দুখ মোনে পোযা আছে ব্যাটা?'

বদরুর বাবার সাত বিঘে জমি ছিল কেয়াতলার নাবাল মাঠে। জমিদারের ঘরে ইস্তফা দিয়েছিল জমিগুলো। বন্যায় ফসল হয় না। খাজনা দেবে কেমন করে? বাঁধ হলে সেই জমি সরকার থেকে ফিরিয়ে দেবার আইন হয়েছিল। ছোটবাবু প্রাণরঞ্জন একলপ্তে সাতবিঘে জমিটা গ্রাস করে নিয়েছিলেন আইনের ফাঁকে। সেই জমির শোকে বদরুর বাবা পাগল হয়ে গিয়েছিল। আধন্যাংটা হয়ে ঘুরে বেড়াত। বিড়বিড় করে কী সব বলত। বদরুর মা উনুনে চাল দিতে দিতে সেইসব করুণ কাহিনী শোনায়।

পেতলের বদনা আলগোছে মুখের ওপরে তুলে গউর ঢকঢক করে জল ঢেলে খায়। তারপর বলে, 'বিড়ি দাও মিতে।' বদরু কোঁচড় থেকে বিড়ির কৌটো বের করে। উনুন থেকে একটুকরো অঙ্গার আনে দু-হাতে লোফালুফি করতে করতে।

নিজেও একটা বিড়ি ধরায় বদরু। তারপর ঝমঝমিয়ে ফের বৃষ্টি নামে। চিকনপুর গাঁয়ের শেষ দিকটায় এ বাড়ি। চারপাশে ঘন গাছপালা। তার ওধারে দ্বারকা। বাড়ির তিনদিকে মাটির পাঁচিল। খড়ের চাল ঝাপানো আছে পাঁচিলে।

দুই মিতে চুপচাপ কিছুক্ষণ বিড়ি টানে। তারপর বদরু বলে, 'মা আমার বাঘিনী। মায়ের জোরে জোর মিতে! নিশ্চিন্তে থাকো। সেই কবে একবার এসেছিলে, আর আজ এলে। তবে কথা কী, কেউ দেখে ফেললেই চৌকিদারকে খবর দেবে। সেই যা ভাবনা। আসার সময় কেউ দেখেছিল নাকি?'

গউর আস্তে বলে, 'দেখে থাকবে। তবে চিকনপুরে আমাকে কেউ চেনে না।'

বদরুর মা চাপা গলায় বলে, 'কুটুম সেজে থাকো, বাছা। বদরুর মামু—আমার ভাইয়ের ব্যাটা সেজে থাক। ধুমগঞ্জে আমার বাপের বাড়ী। আমি ডাঙ্গা দেশের বেটি, বাপ! এই ডুবোদেশে বিয়ে হয়েছিল আমার।'

গউর একটু হাসে। 'তোমার সেই ভাইপোর নামটা বললে না?'

'কাদের আলি।'

'কাদের আলি?' নামটা আওড়াতে থাকে গউর।

'হ্যাঁ বাছা, ওই নাম। তোমার মতন সোমত্ত জোয়ান। ওই রকম গড়ন। ওই যে তুমি হাসছ, ঠিক ওই রকম হাসি।'

বদরু খিকখিক করে হাসে। 'আমার আবার মুখ ফস্কে মিতে না বেড়িয়ে যায়। কাদেরকে আমি কাদু বলে ডাকি। তুমি এখন হলে কাদু।'

বদরুর মা বলে, 'শুধু একটুন কষ্ট হবে বাপ, খাওয়া দাওয়ার। হাত পুড়িয়ে খেতে হবে। পেতলের সরা দেব। লকড়ি রাখা ঘরটার ওখানে উনোন করে নাও।'

গউর বলে, 'দরকার কী মাসি? তোমাদের দুমুঠো দিও খাব।'

'সে কী কথা?'

'মাসি, জাত খেলে যায় না, বললে পরে যায়।'

বদরু খুশি হয়ে বলে, 'গউর্যা বরাবর এরকম মা, ওর একই কথা। একদিন ছোটবেলায় খুব

বৃষ্টির সময় আমরা দুই মিতে ডাইনির খালের ধারে হেজলতলার বনে কী করেছিলাম শুধোও ওকে!'

গউর স্মৃতির দিকে তাকিয়ে বলে, 'ওঃ! সে বিষ্টিতে চাল ভেজাতে দিয়েছিলাম খালে। জলের তোড়ে ভেসে গেল। খুঁজে পেলাম না। তখন মিতের কোঁচড়ে হাতভরে মুড়ি খেলাম। মিতে তো হকচকিয়ে গিয়েছিল।'

বদরুর মা উনোন থেকে ভাত নামিয়ে ফ্যান গালতে থাকে। তারপর হঠাৎ ঘুরে কৌতুকে তাকে 'বাপ কাদেব আলি?'

গউরও হাসে। 'বলো মাসি!'

'ওইতো। হল না যে বাপ! বলো—ফুফু। বাপের বহিনকে বলে ফুফু।'

'ফুফু! হুঁ, ফুফু।'...গউর খিকখিক করে হাসে। বলে, 'ফুফু ফুফু....ফুফু।'...

নির্জন নদীব ধারে

রাত জেগে ঘনশ্যাম তাব জাল শেষ করেছে। গাবের রস মাখিয়ে পোক্ত কবেছে। সে ববাবব একটু একলা স্বভাবের মানুষ। বউ ছেলেপুলে নেই। বার দুই বিয়ে করেছিল। বউ টেঁকেনি। রোগে ভুগে মারা পড়ে। সে ধরেই নিয়েছে, কারুর কারুর এ সংসারে বউ সয় না। সে এখন বুড়ো বয়সে মাথায় লম্বা চুল রেখেছে। গলায় পরেছে তুলসী কাঠের মালা। বোশেখে—ধর্মের মাসে খোল বাজিয়ে সারারাত কেত্তন গায়। দিনের বেলা সে আরও পাঁচটা ক্ষেত মজুরের মতো এ-গাঁ ও-গাঁ গেরস্থ বাড়ি কাজ টুঁড়ে বেড়ায়। না পেলে মাছ ধরে পুকুর ডোবায় খালেবিলে—যেখানে সুযোগ পায়। কখনও জলে নেমে কাদা হাতড়ে ধরে। কখনও বাঁশের তৈরী 'পলুই' দিয়ে, কখনও বঁড়সিতে—আবার কখনও জাল ফেলেও। ঘনশ্যাম তার নতুন জালের 'সাইত' করতে এসেছিল। কাড়ানের পর নদীর আর্দ্ধেকটা জলে ভরেছে। তোড়ে বইছে ঘোলাটে হলুদ জল। সেই জলে বড় নদী আব দূরের বিল থেকে উজিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ আসে। ঘনশ্যাম নদীর ধারে জলের অবস্থা দেখছিল। মাছের আভাস সে টের পায়। জলেব হালচাল বোঝে সে, নিরাশ হয়ে কতদূর হাঁটল। একখানে বাঁকের মুখে একটু ইতস্তত করে জাল ফেলল। নতুন জাল। প্রথম খেপেই যদি অন্তত একটা ক্ষুদে মাছও ওঠে, জালটার ভবিষ্যত পোক্ত হয়ে যায়। জালটা জল থেকে টেনে তুলতে তুলতে সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টে চোখ রাখল। কিন্তু ক্রমশ পুঞ্জ-পুঞ্জ নিবাশায তার মনটা ভারি হয়ে গেল। কোনো স্পন্দন প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল না তাব হাতে। জলটাও পৃথক কোনো শব্দ করছিল না। শুধু নদীর যৌবনের শব্দ ছল ছল কল কল ধারাবাহিক। জালটা টেনে তুলতে তুলতে ঘনশ্যাম টের পেলে সে ভীষণ বুড়ো হয়ে গেছে। প্রথম খেলটাই বৃথা। ভেজা জালটার দিকে সে দুঃখিত চোখে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বাঁশবনটার দিকে এগোল। তার বগলে একটা ছোট্ট মাছ রাখা 'খালুই' ঝুলছিল। তার ভেতর ন্যাকড়ায় বাঁধা চকমকি আর কয়েকটা বিড়ি আছে। আকাশ আজ পরিষ্কার। বাঁশবনের ছাযায় ক্লান্তভাবে বসে সে চকমকি ঠুকে শোলায় আগুন ধরাল। তাবপর বিড়ি টানতে থাকল। হরিণমারা গ্রাম থেকে প্রায় দু'ক্রোশ দূরে সে চলে এসেছে। বিস্তীর্ণ বিল আর মাঠের শেষে গ্রামটা দিগন্তে ধ্যাবড়া কালির পোঁচের মতো নজর হচ্ছে। আর কতদূর সে নদীর ভাটিতে এগিয়ে গেলে মাছের দেখা পাবে? ঘনশ্যাম ক্লান্তভাবে নিজের গ্রামটা দেখে নিয়ে নদীর দিকে তাকাল। সারা জীবন দেখা এ নদীকে তার বড় নিষ্ঠুর মনে হল।

কতক্ষণ পবে সে বিড়িটা নিভিয়ে কানে গুঁজল। লম্বা সন্ন্যাসী চুলকে ফের চুড়ো করে বাঁধল। তারপর ভেজা ভারি হয়ে ওঠা জালটাকে একহাতে ঝুলিয়ে নদীর ভাটির দিকে হাঁটতে থাকল। কিছুদূর গেলে আরেক ছোট নদী ট্যাংরামারি এর সঙ্গে মিশেছে। সেখানে একবার অনেক মাছ ধরেছিল সে।

সামনে নদীর ধারে বটগাছ। সেখানে গিয়েই চমকে উঠল ঘনশ্যাম। পঞ্চাননেব শালী চুপ করে বসে আছে। ঘনশ্যামকে দেখে সেও চমকে উঠেছিল। তারপর হাসল, 'ঘনাকাকা নাকি গো? মাছ পেলে?

ঘনশ্যাম সন্দিগ্ধ দৃষ্টে তাকিয়ে বলল, 'তুমি এখানে কী মনে করে গো মেয়ে?'

'নদী পেরুব, তাই।'

'এই আঘাটায় নদী পেরুবে ক্যানে গো? এখানে পেরুবে কেমন করে? খুব তোড় বইছে দেখছ না?' ঘনশ্যাম নদীর দিকে হাত বাড়াল। 'তাছাড়া এখানটায় দহ আছে জানো না? খুব খারাপ জায়গা।'

চপলা ভুরু কুঁচকে নদীর দিকে তাকিয়ে রইল।

ঘনশ্যাম বলল, 'তা নদী পেরিয়ে যাবে কোথা শুনি?'

'মাসির বাড়ি।'

'সে কোথা?'

'চেকনপুর।'

'তা চেকনপুরের ঘাটে যাও।' ঘনশ্যাম উদ্বিগ্ন মুখে বলল। 'এই খাঁ খাঁ জায়গায় একলা মেয়ে বসে আছ—এটা ভাল কথা নয় বাপু। চেকনপুরের ঘাটে তালের ডোঙা পাবে।'

'তা যাচ্ছি।' চপলা বাচ্চা মেয়ের মতো বটফল কুড়িয়ে লোফালুফি করতে থাকল।

ঘনশ্যাম পঞ্চাননের এই শালীটির হাবভাব আগেও লক্ষ্য করেছে। কেমন যেন পাগলাটে বুদ্ধির মেয়ে মনে হয়েছে তার। বড্ড খামখেয়ালী। আবার তেজীও বটে। সেদিন ঠাকুরতলায় গাঁশুদ্ধ লোকের সামনে কেমন করে গউরের সংগে দেখা হওয়ার কথা বলল ও!

ঘনশ্যাম বলল, 'হ্যাঁ গো মেয়ে, তা এমন করে আপথে বেপথে মাসির বাড়ী যাচ্ছ যে হঠাৎ? উঁহু— কোনো গন্ডগোল আছে, বাছা! খুলে বল দিকিনি আসল কথাটা!'

চপলা খেলতে খেলতে নির্বিকার মুখে বলল, 'আমার কপাল ঘনাকাকা। যে দুয়োরে যাই, সেই দুচ্ছাই করে তাড়িয়ে দেয়!'

'তাই বলো!' ঘনশ্যাম বসে পড়ল বটের ছায়ায়। 'দিদির সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে?'

'তা হয়েছে!'

ঘনশ্যাম একটু ইতস্তত করে বলল, 'তোমার বে হয়েছিল কোথা যেন?'

'গোবিনপুর কাউখলিতে।'

'তা সোয়ামীর সঙ্গে বুঝি মিটমাট হল না?'

চপলা তীব্র দৃষ্টে তাকাল। 'অত কথা কিসের বাপু? ওসব কথা তুলো না। মাথা খারাপ হয়ে যাবে।'

ঘনশ্যাম হাসতে লাগল অপ্রস্তুত হয়ে। ব্যথার জায়গায় ছোঁয়া লেগেছে মেয়ের। সে হাসি থামিয়ে আকাশে সূর্যের অবস্থান দেখে নিয়ে বলল, 'বেলা অনেক হয়ে গেল। উঠি এবারে। কে সঙ্গে যাবে তো এস গো মেয়ে। আমি যাব ট্যাংরামারির মুখ অব্দি। দেখি যদি জালের সাইত হয়।'

চপলা হাত ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়াল। তারপর একটু হাসল। 'ও ঘনাকাকা একবার এই দহে জালখানা ফেল না দেখি। আমি তোমার জাল ছুঁয়ে দিচ্ছি। আমি খুব পয়মন্ত গো। দেখই না ফেলে'।

চপলা জালটা সত্যিই ছুঁয়ে দিল। ঘনশ্যাম হাসতে হাসতে জলের ধারে গেল। তারপর জালটা সামনে পেছনে দোলাতে দোলাতে জলের দিকে ছুঁড়ল। পেখম তুলে জালটা চড়িয়ে পড়ল জলের ভেতর। এখানে স্রোত নেই। জালের ঘেইটা শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়ে রইল ঘনশ্যাম।

চপলা দম আটকানো গলায় বলল, 'এবারে তোল দিকিনি।'

খানিকটা গুটিয়ে আনতেই জালটা জানিয়ে দিল মাছ পড়েছে। আশা নিরাশায় চঞ্চল ঘনশ্যাম সাবধানে গুটোতে থাকল। একটু পরে জালশুদ্ধ লাফিয়ে উঠল। চপলা খিলখিল করে হাসতে লাগল বালিকার মতো। কিলো দুই ওজনের কালবাউস মাছটা তুলে ঘনশ্যাম হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, 'তোর জয় মা। তোরই জয়। তুই দেবতার মেয়ে রে। সতী লক্ষ্মী তুই।'

চপলা বলল, 'উঁহু, আমি অলক্ষ্মী-অপেয়ে! তা ও ঘনাকাকা মাছটা খাবে, না বেচবে বলো দিকিনি?'

ঘনশ্যাম ক্লান্তভাবে বসল বটতলায় গিয়ে। চকমকি ঠুকে আগুন ধরাল। কানে গোঁজা আধপোড়া বিড়িটা জ্বেলে টানতে টানতে বলল, 'খাব—সে কপাল আমার নয় রে মা! বেচতে যাব কেয়াতলায় বাবুদের বাড়ি। দুদিন ভাতের মুখ দেখিনি, মা—খুলেই বলছি তোকে।'

চপলা নাকছাপি খুঁটতে খুঁটতে মাছটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কেয়াতলার বাবুদের কেন বেচবে বাপু? ওনারা তো তোমাদের শত্রু এখন। হয়তো কেড়েই নেবে মাছটা। মারধরও করবে।'

ঘনশ্যাম ভারি মুখে বলল, 'গউরটা কী কান্ড বাধালে দেখ দিকিনি। সত্যি বলেছ মা। আজকাল কেয়াতলামুখো যেতে বড্ড ভয় করে। নবীন কাল কেয়াতলার হাটে গিয়েছিল পাটের শাক বেচতে। কার পাটের ডগা ছিঁড়ে এনেছে বলে ওকে মারধর করেছে।'

'হরিণমারার লোক দেখলেই বাবুরা নাকি তাড়া করছে। জামাই দাদা বলছিল।'

'তাহলে কী করি বলো দিকিনি? এত বড় মাছটা!' বুড়ো হতাশ ভঙ্গিতে তাকাল চপলার মুখের দিকে।

চপলা একটু ভেবে বলল, 'আমার মাসির গাঁ চেকনপুরে অনেক গেরস্থ আছে, কাকা। চলো না সেখানে! নগদ পয়সা হয়তো পাবে না—তবে চাল পাবে তার বদলে। ভাত রেঁধে খাবে।'

ঘনশ্যাম একটু হাসল। 'সেই চাল দিয়ে তোমার মাসির বাড়ি ভাত রেঁধে খাব।'

চপলা হাসতে হাসতে বলল, 'মাসি গরীব হতে পারে, অমানুষ না। দু'মুঠো ভাত তোমাকে দেবে না বুঝি? এস ঘনাকাকা।'

সামনে চপলা, পেছনে জালের ভেতরে মাছ নিয়ে ঘনশ্যাম বাঁধের পথে হাঁটতে থাকল। নদী বাঁক নিতে নিতে দক্ষিণে ঘুরেছে ক্রমশঃ। বাঁধেব পিঠে ঘন গাছপালা। তার ছায়ায় যেতে ঘনশ্যাম হঠাৎ বলল, সেদিন বললে গউরের সঙ্গে দেখা হয়েছিল বিলে। তারপরে আর দেখা হয়নি বুঝি?'

চপলা দ্রুত ঘুরে বলল, 'ক্যানে?'

ঘনশ্যাম অপ্রস্তুত হল। 'খারাপ ভাবে নিয়ো না মেয়ে। ইটা কথার কথা শুধোচ্ছি।'

'আব দেখা হয় নি।' বলে চপলা হাঁটতে থাকল।

ঘনশ্যাম আনমনে বলল, 'দুখোবাবু এক সপ্তা সময় দিয়েছিল। আর দুটো দিন বাকি। ভেতরে ভেতবে লোক পাঠিয়ে এ-গাঁ, সে-গাঁ খোঁজ করেছে হরি মোড়ল। মোল্লাও পাঠিয়েছে। গউরেব খবব নাই।'

চপলা শক্ত গলায় বলল, 'জানি।'

'খোঁজ যদি পেয়েও থাকে কেউ, কী হবে? গউব ধরা দিলে তো?'

'হু—ভেবেছে, গউরকে বলবে মোড়লরা ডেকেছে এস, আর গউরও ভাল ছেলেব মত গাঁযে হাজিব হবে। কী বুদ্ধি মিনসেদেব।' অচলা বাঁকা হাসল।

ঘনশ্যাম খসখসে গলায় বলল, 'গাঁ জ্বলে যাবে দেখবে। গাঁ জ্বালিয়ে দেবে।'

চপলা সকৌতুকে বলল, 'তাই বুঝি এতদূবে পালিয়ে এসে মাছ ধবছিলে ঘানাকাকা? শুধু তুমি না—সবাইকে আজকাল দেখি গাঁ ছেড়ে মাঠে পথে থাকতে। আ-মরদার দল! হেসোতে শান দিয়ে বসে থাকতে পারে না? দা কুড়ুল নেই ঘরে? সাঁওতাল ডাঙা থেকে তীর ধনুক যোগাড় কবে আনতে পারে না কেউ? গণশাদের বলতে গেলাম তো তাই নিয়ে দিদি জামাই দাদাব সঙ্গে ঝগড়া বাঁধল। এখন মব গে সব বেগুন পোড়া হয়ে। আমি ভিন গাঁয়ের মেয়ে। আমার কী?' ঘনশ্যাম ভয পাওয়া ভঙ্গিতে বলল, 'চুপ, চুপ। বাতাসের কান আছে। বলতে নেই।'

'আমার অত ভয নেই।'

'বড়বাবুদের বন্দুক আছে মা! পুলিশের লোক ওনাদের হুকুমে চলে।'

চপলা হঠাৎ থেমে নিচে নদীর দিকে আঙুল তুলে বলল, 'ওই দেখ ঘনাকাকা মাছ ঘাই মারছে। আরেকবার ফেলবে নাকি জালখানা?' ঘনশ্যাম নদীর দিকে তাকাল কয়েক মুহূর্ত। তারপর জাল থেকে মাছখানা বের কবে বলল, 'ধরো তো মা। দেখি, আরেক খেপ।'

সে নদীর ঢালু পাড়ে একটা জায়গা খুঁজে নিয়ে লাথি মেরে পা রাখার জায়গা করল। তারপর জাল ফেলল। একটু পরে জালটা টানতেই নড়ে উঠল জাল। এবার মাছটা বেশ বড়। অনেক কষ্টে টাল সামলে ঘনশ্যাম একটা রুই মাছ তুলে আনল জালের ভেতর। তিন কিলোর কম নয় মাছটা! চপলা খিলখিল করে হাসছিল। ঘনশ্যাম হাঁফাতে হাঁফাতে ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে চপলাকে দেখছিল। একি সত্যি পঞ্চাননেব শালী—পেটের দায়ে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায় যে, স্বামী যাকে তাড়িয়ে দিয়েছে মা বাবা নেই বলেই এমন হাঘরে হয়ে ঘুরছে, একি সেই চপলা? নাকি কোন দেবী ঘনশ্যামের ও[illegible]। দয়া করে নির্জন নদীর ধারে সঙ্গ নিয়েছে!

আনন্দে অথবা কি একভাবে বুড়োর চোখে জল এসে গেল। নির্জন নদীর ধারে হিজল গাছের ছায়ায় বসে ঘনশ্যাম ডাকল, 'আয় মা! খুব হয়েছে। একটু জিরিয়ে নিই। তুই আমার আর জন্মোতে বেটি ছিলিস মা। আয়, কাছে বোস।'

চপলা অবাক হয়ে বলল, 'তুমি কাঁদছ ক্যানে ঘনাকাকা?'

'সুখে মা, বড় সুখে।' থ্যাবড়া হাজা ধরা আঙ্গুলে চোখের জল মুছে ঘনশ্যাম আবার চকমকি ঠুকতে থাকল।...

চপলার নতুন জীবন

চপলার মাসি বিধবা হয়েছে যৌবনে। ছেলেমেয়ে ছিলো গোটা দুই। ছেলেটা গেরস্থ বাড়ি রাখালী করত। সাপে কামড়ে মারা যায়। মেয়েটার বিয়ে দিয়েছিল হরিশচন্দ্রপুরে। বাচ্চা হবার সময় মারা পড়ে। চপলার মাসি চিন্তামণির জীবনে এই দুটো বড় ক্ষতচিহ্ন। তবু কোমর বেঁধে বেঁচে আছে। বাড়ির উঠোন আর পাশের টুকরো জমিতে সে তরিতরকারি ফলায়। কিছু ফলের গাছও লাগিয়েছে। ঝুড়ি যায় নন্দীগ্রাম বাজারে। ভাত কাপড়ের অভাব নেই চিন্তামণির। চপলাকে আদর করে কোল দিয়েছে।

চিন্তামাসি মেয়েটার রুক্ষ চুলে তেল চিরুণীর ছোঁয়ায় সৌন্দর্য ফিরিয়ে বলে, 'থাক তুই আমার কাছে। আমি যদ্দিন আছি তদ্দিন তোর কিসের অভাব? আমি মলে এই সব গাছ-গাছালি ফল পাকড রইল। ফলাবি, বেচে আসবি নন্দী গাঁয়ের বাজারে। পয়সা পাবি। ভাবনা কিসের?'

'নন্দীগাঁয়ের বাজারে আমাকে নিয়ে যাবে মাসি?'

'যাব বৈকি। কালই চ, সঙ্গে।' চিন্তামাসি একটু চুপ করে থাকার পর ফের বলে, 'পরনে আর তো বস্তর নেই দেখছি। কালই একখান বস্তর কিনে দোব। পরবি। সেজেগুজে থাকবি। এই তো সাজের বয়স, মা।'

চপলা ভাবে, কেন এতদিন সে মাসির বাড়িতেই ওঠেনি! মরতে গিয়েছিল দিদির কাছে আশ্রয় নিতে। খুব ভুল হয়ে গেছে হিসেবে। আসলে মাসি বিধবা মানুষ। তার নিজের কিভাবে চলছে, এই ভাবনায় চপলা আসেনি মাসির কাছে। কিন্তু এসে দেখে, মাসি ভালই আছে।

বর্ষার রসে মাসির উঠোনে ঘন সবুজ রঙ ধরেছে। সন্ধ্যামণি ফুল ফুটেছে থোকা থোকা। সন্ধ্যায় জোনাকি পোকারা আলোর মালা পরায় গাছ গাছালিতে। মাঝরাতে বৃষ্টি নামে ঝমঝমিয়ে। চপলার হঠাৎ ঘুমটা কেটে যায়। গউরের কথা মনে পড়ে! কোথায় আছে এখন সে? এমন করে কতকাল লুকিয়ে থাকবে আর? আবোল-তাবোল ভাবতে গিয়ে কতক্ষণ ঘুম আসে না।

নন্দীগ্রামের বাজারে গিয়ে চপলা মাসি.. পাশে বসল আনাজ পাতির ঝুড়ি নিয়ে। পীচরাস্তার দু'ধারে বাজার বসেছে। কত গ্রামের লোক এসেছে শাকসব্জি আনাজপাতি নিয়ে। চিন্তামণির সঙ্গে কতজনের আলাপ! কখনও রোদ, কখনও মেঘের ছায়া—কখনও ঝিরঝিরি বৃষ্টি। ছেঁড়া ছাতির তলায় মাসি-বোনঝি একটু আধটু ভিজলও! দুপুর গড়ালে বাজার ভাঙার সময় এল। খালি ঝুড়ি নিয়ে দু'জনে গেল ময়রার দোকানে। সঙ্গে মুড়ি ছিল। তেলেভাজা কিনে রাস্তার ধারে টিউবেলের কাছে বসে দু'জনে খেল। টিউবেলে জল খেয়ে মাসি বলল, আয়, তোকে একখান আঙাবরণ শাড়ি কিনে দিই।'

ফেরার সময় বিকেলের মাঠে আলপথে রাঙাবরণ শাড়িটা ঝুড়ির ভেতর হাত ভরে কতবার ছুঁয়ে দেখল চপলা। মাসি আগে হাঁটছিল। মাসির মুখে পান। মেঘের ফাঁক গলিয়ে গলা সোনার মতো হলুদ রোদ উপচে পড়ছে চিকনপুরের মাঠে। ক্ষেতে হাঁটু গেড়ে বসে বীজধান ওপড়াচ্ছে কোন একলা চাষী। সে মুখ ঘুরিয়ে তাদের দেখে হাসি মুখে বলে, 'ও চিন্তেমাসি বাজারে যেইছিলা নাকিন গো? সঙ্গে উটি কে?'

চিন্তামাসি জবাব দেয়, 'আমার বোনঝি গো, বোনঝি!'

বাড়ি ঢুকেই চপলা বলে, 'চান করে আসি মাসি। তুমি চান করতে যাবে তো এস।'

চিন্তামাসি বলে, 'আন্না চাপিয়ে তবে না? তোর ইচ্ছে করে তো যা বাছা। কিন্তুক সাবধান নদীতে বড্ড সোঁত। আঘাটায় ডুবতে যাস না যেন মা!'

চান করে দিনের আলো থাকতে থাকতে কখন শাড়িটা পরবে, চপলার মনে সেই ব্যস্ততা। নদীর এপাড়টা ঢালু হয়ে নেমেছে, ওপাড়টা খাড়া। বুক ভরে গেছে জলে। আসবার দিন এত জল ছিল না। শ্যাওড়া হিজল ভাঁড়ুলে গাছের ভেতর দিয়ে ঘাটের পথ। সূর্য ডুবুডুবু। নদীর জলে লাল ঝিকিমিকি ছটা খেলছে। ঘাটের ডাইনে একটু দূরে কে বসে আছে ঝোপের পাশে ঘাসের এপর। তার পাশে বাঁধা বীজধানের প্রকান্ড একটা বোঝা রাখা আছে। আরেকজন আঘাটায় কোমর জলে নেমে গা কচলাচ্ছে আর গল্প করছে পাড়ের লোকটার সঙ্গে।

এখানে ঘাটে কয়েকটি মেয়ে নেমেছে। চপলাকে দেখে কেউ একটু হেসে নীরব সম্ভাষণ করে। পাড়ার সব মেয়ের সঙ্গে এখনও চেনাজানা হয় নি চপলার। কিন্তু তার চোখ আঘাটায় ঝোপের ধারে, সেই ঘাটে বসে থাকা লোকটার দিকে। তার মুখের একটা পাশ দেখা যাচ্ছে।

একটু পরে সে এদিকে ঘুরলে চপলার বুকটা ধড়াস করে ওঠে। হরিণমারার সেই গউর বসে আছে।

চপলা হনহন করে এগিয়ে গেল কুমড়োর ক্ষেতের ভেতর দিয়ে।

গউর নিষ্পলক চোখে তাকে দেখছিল। জল থেকে ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল বদরু। সে একটু হেসে বলে উঠল, 'কি হলো হে কাদের আলি? অমন করে কাকে দেখছ? মেয়েটা কে বটে হে!'

কাদের আলি! চপলা কুমড়ো ক্ষেতের মধ্যিখানে থমকে দাঁড়াল। তার ভুল হচ্ছে না তো? একই চেহারার মানুষ থাকা সম্ভব? তাছাড়া যাকে গউর ভেবেছে, তার মুখে পাতলা দাড়িও রয়েছে! অথচ সে হরিণমারার গউব ছাড়া কেউ হতে পারে না।

চপলা আরও গন্ডগোলে পড়ে গেল। গউরের পরনে মালকোচ করে পরা সবজে রঙের লুঙি। লুঙি হিন্দু মুসলমান সবাই পরে। সেটা কথা নয়— কিন্তু 'কাদের আলি' বলে ডাকছে যে ওকে?

তারপর সে দেখতে পায়, 'কাদের আলি' হাসছে। ওই হাসিটা তার চেনা। চপলা ঠোঁট বাঁকা করে তাকিয়ে থাকে। গউর হাত তুলে ডাকে, 'কী হল চপলা? দাঁড়ালে ক্যানে? এস।'

চপলা কাছে গিয়ে বলে, 'মোছলমানে জাত দিয়েছ প্রাণের ভয়ে? বাঃ, খুব মানিয়েছে দেখছি।'

গউর হো হো করে হাসে। 'জাত দিলেও কি শালারা আমাকে ছাড়বে, চপলা? মোছলমান সেজে আছি। বুঝলে না। তবে কথা কী, আমি জানি তুমি চেকনপুরে এসেছ।'

চপলা বলে, 'কে বলল?'

'ঘনাকাকা।' গউর ঘাসের দিকে আঙ্গুল তুলে বসার জায়গা দেখায়। বলে, 'না বসলে ঘাট থেকে ওদের দৃষ্টি পড়বে। পাঁচ কথা জানতে চাইবে। এখানে বসো।'

চপলা ঘাটের দিকটা দেখে নেয়। এখান থেকে ঝোপঝাড়ের আড়ালে পড়েছে ঘাটটা। সে বসে পড়ে। জলে বদরু মাছের মতো সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে আপন মনে।

গউব বলল, 'পরশু ঘনাকাকার সঙ্গে ওপারে দেখা হল। মাছ বেচতে এসেছিল। সব কথা শুনলাম। তোমাব কথাও শুনলাম। ঘনাকাকা চলে গেলে ভাবলাম যাই তোমার সঙ্গে দেখা করে আসি। কিন্তু সাহস হল না।'

চপলা অবাক হয়ে গেল, 'ক্যানে? সাহস হল না ক্যানে, শুনি?'

'এমনও তো হতে পারে, তোমাকে ওরা আমার খোঁজে পাঠিয়েছে!' গউর খিক খিক করে হাসতে লাগল।

চপলা দুঃখিত ভাবে মুখ নামিয়ে বলে, 'জানো তুমি বড্ড স্বার্থপর। বড্ড নেমকহারাম।' একটু চুপ করে থাকার পর সে ফের বলে, 'তাই যদি হত, তাহলে এখনও তুমি এমন করে বেড়াতে পারতে না।'

গউর হাসির মধ্যে বলে, 'ঘনাকাকার কাছে শুনলাম সেদিন গাঁ শুদ্ধ লোকের সামনে বলে দিয়েছ, আমার সঙ্গে বিলে তোমার দেখা হয়েছে।'

'বলেছি। রাগ করে বলেছি। বলেছি, ও কিছুতেই ধরা দেবে না! একথাটা বলেনি ঘনাকাকা?'

'হুঁ বলেছে।' গউব আস্তে বলে। 'আসল কথা বলি। তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাই নি তোমার মাসির ভয়ে। তোমার মাসি তো নানা জায়গায় যায়—বাজারে যায়, টাউনে যায়। তাই।'

'মাসি তেমন মেয়ে না।'

গউর চোখে চোখ রেখে বলে, 'জানতাম এখানে যদ্দিন আছি, তুমিও আছো যখন—তখন দেখা হয়ে যাবেই। এই তো হল।'

'এমন করে চিরকাল লুকিয়ে বেড়াবে?'

'ধরা আমি কিছুতেই দেব না জেনে রাখো।'

'গাঁয়ে তো ফিরতে পারবে না!'

গউর চুপ করে থাকে। ঘাস ছিঁড়ে চিবোয়।

'তোমার বাবা-মার উপর অত্যাচার হবে। গাঁয়ের লোকের ওপর জুলুম হবে। জানো না, বড়বাবু শাসিয়ে গেছে, গাঁ জ্বালিয়ে দেবে?' বলেই চপলা একটু চমকায়। ফের বলে, 'এই জানো? আজ শেষ দিন তোমাকে ধরে দেবার। আজকের দিনটা দেখে বড়বাবু শোধ নিতে আসবে তোমাদের গাঁয়ে।'

'জানি! ঘনাকাকার কাছে সব শুনেছি।'

'শুনেও চুপচাপ বসে আছো?'

গউর নদীর এপারে দৃষ্টি রেখে বলে, 'বসে নেই। শোনা অব্দি মাথায় আগুন ধরে গেছে। আজ রাতে আমি হরিণমারা যাব। ওই দেখছ আমার মিতে বদরু। সেও যাবে। বদরু হরিণমারা গিয়েছিল কাল। আমাদের গাঁওলারাও চুপচাপ বসে নেই। আশেপাশের সব গাঁয়ে খবর দিয়েছে। বড়বাবুরা আসুক না গাঁ জ্বালাতে। দেখবে কি হয়!' সে শব্দ করে নিশ্বাস ফেলে।

চপলা মুখ নামিয়ে বলে, 'যদি তেমন কিছু হয় তুমি পালিয়ে এস। আমার মাসিব বাড়ি আমি আছি।' বলে সে হাত তুলে গাছপালার আড়ালে বাড়িটা দেখিয়ে দেয়। 'ওই দেখ মাসির বাড়ি। রাতবিরেতে যখন হোক, এসে আমার নাম ধরে ডেকো। কেমন?'

গউর বলে, 'বেঁচে থাকলে এসে ডাকব।' তারপর সে একটু হাসে! 'তা তুমিও কি এমন করে পালিয়ে বেড়াবে চপলা? সোয়ামীর ঘরে ফিরবে না?'

'অমন সোয়ামীর মুখে আগুন। ভাত দেবার ভাতার না, কিল মারবার গোঁসাই।' বলে চপলা উঠে দাঁড়ায়। সন্ধ্যার ধূসরতা নদীকে ঘিরেছে। সে পা বাড়িয়ে হঠাৎ ঘুরে বলে যায় ফের, 'সাবধানে গাঁয়ে যেও।'

বদরু উঠে এসে গা মুছতে মুছতে বলে, 'মেয়েটা কে হে মিতে।'

গউর বলে, 'আমাদের গাঁয়ের পঞ্চাদার শালী।'

'তোমাব সঙ্গে ভাব আছে নাকি হে মিতে?'

'ভাব? তা একটু আছে!' গউর হাসে। 'তবে করেই বা কী লাভ? করে সোয়ামী এসে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।'

বদরু সুর ধরে ছড়া গেয়ে ওঠে, 'পরের সোনা দিওনা কানে, কেড়ে নেবে হ্যাঁচকা টানে।'

ওদিকে ঘাট থেকে চান করে ফিরতে দেরি দেখে চিন্তামাসি ভেবে সারা হচ্ছিল। নদীতে জোরালো তোড় বইছিল। চপলাকে ফিরতে দেখে সে তেড়ে যায়। 'ঘাটে এতক্ষণ কি করছিলি রে মুখপুড়ি? বিদেশ বিভুঁই জায়গা। জোয়ান মেয়ে হয়েছিস—দিনকাল বড্ড খারাপ জানিস না?'

'একটা পুরনো কাপড় দাও না মাসি, পরি।'

'নতুন খানা পরবি বলছিলি যে?'

'বাজারে যাবার দিন পরব। এখন রাতের বেলা নতুন কাপড় পরে নাকি কেউ?'

চিন্তামণি মুখ টিপে হেসে পেঁটরা খুলে বহুকালের পুরনো নিজের সধবা জীবনের শাড়িটা বের করে আনে। লম্পের আলোতে দেখিয়ে বলে, 'এটাই পর তাহলে। খুব মানাবে তোকে।'

শাড়িটা গায়ে জড়িয়ে দাওয়ার চালের বাতায় ভেজা শাড়িটা মেলে দেয় চপলা। তারপর বাতা দিয়ে প্লাষ্টিকের লাল বড় চিরুণীটা পেড়ে চুল আঁচড়াতে থাকে। মাসি তার জন্য কিনে এনেছিল বাজার থেকে।

চিন্তামাসি বোনঝিকে দেখতে দেখতে ধরা গলায় বলে, 'আঁটকুড়ো মিনসের চোখে পোকা পড়েছিল। এমন মেয়েকে দুটো ভাত দিয়ে ঘরে রাখতে পারল না কেন? শুনলাম, এখন কেয়াতলার ইঁটভাটায়

ইট বইছে। পুণ্য চৌকিদারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল কাল বাজারে। সেই বলল। তোকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম বাছা।'

চপলা ঝাঁঝালো স্বরে বলল, 'চুপ করো তো মাসি! সন্ধ্যেবেলা বাজে কথা শুনতে ভাল লাগে না।'...

একটি কথোপকথন

'আপনারা শুধু মুখেই আশ্বাস দিচ্ছেন, কাজে কিছুই করছেন না মশাই!' বড়বাবু দুঃখহরণ সখেদে বললেন। কিন্তু দামী সিগারেটের প্যাকেটটি এগিয়ে দিতে ভুললেন না। 'আজ প্রায় দু'সপ্তার বেশী হতে চলল। আসামীকে এ্যারেস্ট করতে পারলেন না। একটা পুঁচকে ছোঁড়া—একটা জংলী ভূত! তার কাছে পুলিশ ফোর্স হার মানল।'

মাধব দারোগা সিগারেট নিয়ে লাইটার জ্বেলে একটু হেসে বললেন, 'আর কয়েকটা দিন ওয়েট করুন বড়বাবু। জাস্ট কয়েকটা দিন। আবার এমনও হতে পারে, আজ রাতেই আসামী পাকড়াও হয়ে যাবে। চারদিকে লোক লাগানো আছে ভাববেন না।'

'ধুস মশাই!' দুঃখহরণ ভুরু কুঁচকে বিরক্তি প্রকাশ করলেন। 'খালি লম্বা চওড়া বাত।'

মাধব দারোগা মিটিমিটি হেসে বলল, 'মুশকিলটা কি হয়েছে জানেন বড়বাবু? ওই যে আপনি আফজলদের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে শাসিয়ে এসেছেন, এটাই গন্ডগোল বাধিয়েছে। খুলে বলি শুনুন। শাসানোর খবর সারা এলাকায় রটেছে। এটা ওদের শ্রেণীর লোকেরা অন্যভাবে নিয়েছে।'

দুঃখহরণ ঠোঁট ফাঁক করলেন। কিন্তু কিছু বললেন না।

মাধববাবু বললেন, 'দ্বারকা নদীর দু'ধারে নাবাল এলাকায় গ্রামের হাবভাব আপনি আমার চেয়ে বেশী করে জানেন। ওরা ইল্লিটারেট, বোকাসোকা, সরল ধরনের মানুষ। কিন্তু বড্ড সেন্টিমেন্টাল। এদিকে প্রাণরঞ্জনবাবু—আই মিন, ছোটবাবুর ওপর এলাকার কয়েকটা গ্রামের লোকের চাপা ক্ষোভ ছিল—সেও হয়তো আপনার জানা।'

দুঃখহরণ ফুঁসে উঠলেন। 'ব্যাটা ছোটলোকরা হাড়ে হাড়ে নেমকহারাম! ছোটকুর দয়ায় ওরা '

হাত তুলে মাধু দারোগা বললেন, 'জানি। কিন্তু যা ঘটেছে তাই বলছি। এরা দারুণ একাট্টা কোনো কোনো ব্যাপারে। এমনিতে নিজেদের মধ্যে মারামারি করে মাথা ফাটাচ্ছে, খুনোখুনি করছে। কিন্তু স্বভাবে একাট্টা সব। এর ফলে হয়েছে কী, আসামী গাঁয়ে লুকিয়ে থাকলেও বের করা কঠিন। একটা কচি বাচ্চাও মুখ খুলতে নারাজ। প্রব্লেমটা বুঝলেন?'

বড়বাবু বললেন, 'গোঁত্তা মারুন, তবে তো খবর বেরুবে! সোজা আঙ্গুলে কি ঘি ওঠে?'

মাধু দারোগা হতাশ ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে বললেন, 'আসামীর বাবা-মাকে পাকড়াও করতে পাঠালাম তারা গা ঢাকা দিয়েছে। ঘরে তালা বন্ধ। ঘনশ্যাম বলে একটা লোককে নিয়ে এল। ব্যাটাকে ভাল মতন দুরমুস করেও মুখ খোলানো গেল না। তবে একটা খবর আছে হাতে। রাতের মধ্যেই জানা যাবে কী হল।'

দুঃহরণ উঠে দাঁড়ালেন। 'আর আপনাদের ভরসা করতে পারছি না মশাই, যাই বলুন আপনি। ওপরে ম্যুভ করতে হবে। আপনি নিশ্চয় জানেন, মিনিষ্টার আমার আত্মীয়। এম এল এ আমার ভায়রা ভাই।'

মাধু দারোগা বললেন, 'আহা, সেটা জানি বলেই তো এত গা ঘামাচ্ছি স্যার। তবে শুধু একটা রিকোয়েষ্ট, যেন নিজের হাতে আইন তুলে নিয়ে প্রব্লেম বাধাবেন না। প্লীজ বড়বাবু।'

দুঃখহরণ থানার বারান্দা থেকে নেমে গিয়ে জিপে উঠলেন। জিপটা চলে গেল। মাধু দারোগা বারান্দা থেকে নেমে হাঁক দিলেন, 'সমাদ্দার আছে নাকি?'

এস আই রমেন সমাদ্দার বেরিয়ে বললেন, 'বলুন বড়বাবু!'

'আমারে আর বড়বাবু কইও না। ক্যায়াতলার বড়বাবুরে সামলাও গিয়া।' মাধু দারোগা মাতৃভাষায় ক্রোধ প্রকাশ করলেন। 'হালায় গন্ডগুল না বাধাইয়া ছাড়ব না!'...

একটি রিপোর্টাজ

'...দু-দুটো পাঁচশালা যোজনাতেও এ এলাকার আদিম দশা ঘোচেনি, বাসের ঝাঁকুনিতেই সেটা মালুম হচ্ছিল। কোন মান্ধাতা আমলে পিচ পড়েছে রাস্তায়, জানি না। জায়গায় জায়গায় পিচের চাবড়া সরে গেছে। খানাখন্দ আর পাথরের টুকরো ছড়ানো, মাঝে মাঝে খানিকটা পিচ টিকে আছে। ছোকরা কন্ডাক্টর বলল, খুব ফেলাড হয়েছিল স্যার। অর্থাৎ ফ্লাড। সে দুধারের গ্রামগুলো দেখিয়ে বলল, সব চাষাভুষোর বাস। আপনি হরিণমারা যাব বললেন তো স্যার? তাহলে গাছতলায় নামিয়ে দেব। ভাববেন না।

গাছতলা মানে বিশাল গাব গাছ। সেখানে নেমে দেখি জনা চার পাঁচ কনস্টেবল দাঁড়িয়ে আছে। খবরের কাগজের লোক শুনে তারা আকাশ থেকে পড়ল যেন। তারপর বলল যে, কেন অত কষ্ট করে মিছিমিছি এলাম? হরিণমারায় তেমন কিছু ঘটেনি—যা কলকাতার কাগজে ছাপা যায়। বললাম, ঘটেনি তো আপনারা এখানে কি করছেন? তারা জানাল, এস পি, ডি এম—ওনারা সব আসবেন। ভাবলাম, একটু অপেক্ষা করে দেখি, যদি পরিচয় দিয়ে ওঁদের গাড়িতে লিফ্‌ট পাই। অবশ্য কণ্ডাক্টর বলেছিল, মাইল দুই এই কাঁচা রাস্তায় হাঁটলে পৌঁছে যাবেন।

পিচ রাস্তার দু'ধারে বড় বড় গাছ। ছায়ায় দাঁড়িয়ে ফাঁকা মাঠের গনগনে রোদ্দুর দেখে আতঙ্ক জাগছে। কুড়ি মিনিট অপেক্ষা করেও যখন দেখলাম কারুর পাত্তা নেই, তখন কাঁচা রাস্তায় এগিয়ে গেলাম। কনেস্টবলরা আড় চোখে তাকিয়ে আমাকে দেখতে থাকল। দু'ধারের জমি শুকিয়ে খটখটে হয়ে আছে। ধানের চারা মিইয়ে গেছে। সারা মাঠ হলুদ হয়ে রয়েছে। বুঝলাম বর্ষা এসেই দূরে সরে গেছে, আকাশ প্রচন্ড নীল। তবে বাতাস বইছিল উদ্দাম বেগে। আধঘন্টার মধ্যে গ্রামের কাছে পৌঁছে গেলাম। তারপর চমকে উঠলাম। গাছপালার আড়ালে ন্যাড়া দেয়াল নিয়ে ঘরগুলো দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও কিছু গাছও একেবারে ন্যাড়া। ডালপালায় একটিও পাতা নেই। পোড়া ডাল নিয়ে কঙ্কালের মতো ভয়ঙ্কর হয়ে আছে। একটা নেড়ি কুকুর আমাকে দেখে ঘেউ ঘেউ করে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে গেল। গ্রামে ঢুকে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

কদাচিৎ দু' একটা টালি বা মরচেধরা জীর্ণ টিনের চাল ছাড়া আর কোনো বাড়িতে একটু কারো চাল নেই। সব পুড়ে গেছে। কোথাও কোনো লোক দেখলাম না। একটা ফাঁকা জায়গায় পুরনো ভাঙাচোরা মন্দির দেখলাম। সেখানে যেতেই অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় আবার একদল পুলিশ দেখতে পেলাম।

তাদের মধ্যে ছিলেন কেয়াতলা থানার ওসি মাধব চন্দ্র ঘোষ দস্তিদার। পরিচয় পেয়ে ভদ্রলোক বাঁকা মুখ করে বললেন, এই জংলী এলাকায় এমন হামেশা হচ্ছে মশাই। লোকগুলো বড় হিংস্র প্রকৃতির। এক গ্রামের লোক অন্য গ্রামের লোকের সঙ্গে দুর্দম দাঙ্গা হাঙ্গামা করে। এ আর নতুন কথা কি?

মাধববাবুর বক্তব্য হল কেয়াতলার জোতজমিওলা ভদ্রলোককে এ গ্রামের একজন যুবক খুন করে। তারপর কেয়াতলার লোকেরা গত শুক্রবার শেষ রাতে এসে গ্রামের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এরাও তৈরী ছিল। দুপক্ষে জনা তিরিশ জখম হয়। জখম লোকদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

দারোগাবাবু ক্ষুব্ধভাবে বলেন, বদলীর চেষ্টা করছি মশাই। এ খুনেদের দেশে সাত বছর কেটে গেল। নার্ভের বারোটা বেজে গেছে।

বললাম, গাঁয়ের লোকেদের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

দারোগাবাবু হাসলেন। পরশু এ ঘটনা। তারপর গ্রাম ফাঁকা। এখনও অনেকে বিলের জঙ্গলে লুকিয়ে আছে। কাকেও পাবেন না।

দেখি তো! বলে এগিয়ে গেলাম। একটা পোড়া বাড়ীর সামনে দেখি একটা ধানের বস্তা পড়ে রয়েছে। ধানগুলো আধপোড়া। মনে হল, হামলাকারীরা লুঠ করে পালাচ্ছিল। নিয়ে যেতে পারেনি। অধিকাংশ বাড়ি পাঁচিল ঘেরা নয়। বোঝা যাচ্ছে গ্রামের অবস্থা তত ভাল ছিল না। দারিদ্র্যের চিহ্ন সবখানে দেখতে পেলাম। কিন্তু ভয়ঙ্কর দৃশ্য হল বাড়ির উঠোনে ভাঙা হাঁড়িকুড়ির আবর্জনা। হামলাকারীরা নিশ্চয় গ্রামের জনসংখ্যার চেয়ে বেশি ছিল। ঘরে আগুন জ্বেলেও ক্ষান্ত হয় নি। জিনিসপত্র বের করে ভাঙচুর করেছে। যথেচ্ছ লুটপাটও নিশ্চয় করেছে।

একটু পরে ভীষণ দুর্গন্ধে নাকে রুমাল চাপা দিতে হল। দুর্গন্ধটা থেকে দূরে সরে গিয়ে একটা পোড়া বাড়ির দাওয়ায় একজন বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা হল। সে ফ্যালফ্যাল করে আমাকে দেখছিল।

তাকে যখন বললাম, খবরের কাগজ থেকে এসেছি খবর নিতে, মনে হল সে কিছু বুঝল না। বোবা ধরা গলায় বলল, ভগবান নাই!

একটা সিগারেট দিলে সে হাত নেড়ে প্রত্যাখ্যান করল। তাকে বুঝিয়ে বললাম, কাগজে আসল কথাটা লিখলে সরকারের টনক নড়বে। তখন সে বলল, তাতে কী হবে? আমার জোয়ান ছেলে দুটোকে ফিরে পাবো? আমার খোরাকি ধানচাল ফেরত দেবে। সব যে লুঠে নিল কেয়াতলার বড়বাবুরা।

বৃদ্ধের সঙ্গে কথা বলতে বলতে অনেক কথা জানা হল। কেয়াতলার যে জোতদার ভদ্রলোক খুন হলো, বড়বাবু তাঁর দাদা। একদিন গুন্ডাদের নিয়ে শাসিয়ে যান ভদ্রলোক। গত শুক্রবার শেষ রাতে দুটো ট্রাক ভরতি পঞ্চাশ-ষাট জন লোক নিয়ে...হামলা কারীদের কাছে বোমা বন্দুক আর পেট্রল ছিল। তারা ঘর জ্বালিয়ে দেয়, গ্রামের পাঁচজন লোককে খুন করে। বোমায় অনেক লোক জখম হয়। বউঝির ইজ্জত যায় গুন্ডাগুলোর হাতে। জিনিষপত্র লুঠ করে তারা। খাসি গরু মুর্গি হাঁস যা পায় লুঠ করে নিয়ে যায়। গ্রামবাসীরা বেগতিক দেখে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়। ছোট ছেলেমেয়েদের আগে থেকে পাশের গ্রামে আত্মীয় স্বজনের বাড়ি রেখে এসেছিল। তাই তারা প্রাণে বেঁচেছে।

জিগ্যেস করলাম, দুর্গন্ধটা কিসের?

গোয়াল ঘরে আগুন দিয়েছিল। গরু পুড়ে মরেছে।

কোন সাহায্য আসেনি সরকার থেকে?

বৃদ্ধ মাথা দোলাল।

হামলা হবে জেনে পুলিশে খবর দাও নি কেন?

দিয়েছিলাম।

পুলিশ আসে নি?

এসেছিল।

ঘটনার সময় কোথায় ছিল তারা?

ঠাকুরণতলায়। বৃদ্ধ একটু পরে ফের বলল, চারজন সেপাই ছিল। কিন্তু তাদের তো পেরাণের ভয় আছে বাবু মশাই।

বুঝলাম পুলিশের বিরুদ্ধে কিছু বলতে চায় না সে! বললাম, তোমার নাম কি?

পশুপতি। আমার ছেলে হরিপদ এ গাঁয়ের মোড়ল।

সে কোথায়?

বৃদ্ধ ধরা গলায় বলল, হাসপাতালে। তার বুকে বল্লম মেরেছিল। কেয়াতলার ভদ্রলোককে কে খুন করেছিল। ক্যাদারের ছেলে গউর‍্যা। গউর। কেন খুন করেছিল? তা জানি না মশাই। ছিল মনে কোনো রাগ। তাকে পুলিশ ধরেছে কি? ধরতে পারেনি বলেই তো এই হাঙ্গামা। বলে বৃদ্ধ ঘোলাটে চোখে এদিক ওদিক তাকাল। তারপর চাপা গলায় বলল, হাঙ্গামার সময় গউরা গাঁয়ে ছিল। ধনুক আর কাড় ছিল গউর‍্যার হাতে। সেই কাঁড়ে বড়বাবুর দলে অনেক লোক জখম হয়েছে। গউর এখন কোথায় বলতে পারো? বৃদ্ধ পশুপতি মাথাটা জোরে দোলাল।

তার সঙ্গে কথা বলার পর গ্রামটা ঘুরে দেখলাম। তারপর মুসলমান পাড়ায় ঢুকে শুনি কেউ সুর ধরে কাঁদছে। ঠিক কোন বাড়ি থেকে কান্নাটা শোনা যাচ্ছে হদিস করতে পারলাম না। সারা পাড়ায় কোথাও কোনো লোক নেই। একটা অক্ষত বাড়ির দরজা ভেতর থেকে আটকানো। ধাক্কা দিলাম। কিন্তু কেউ খুলল না। যখন চলে আসছি, তখনও সেই কান্নাটা শুনছি। কান্নাটা ঠাকুরণতলা অব্দি যেন আমার পিছন পিছন এল। একি কোনো মানুষের কান্না, নাকি হরিণমারা গ্রামের কান্না?..'

লাল রঙের ছেঁড়া গেন্‌জি

চপলা মাসির সঙ্গে নন্দীগ্রাম বাজারে যাবে। চিন্তামণি মাসি বেচবে ছাতু আর চিঁড়ে। চপলা বেচবে ঝিঙে লাউ ট্যাঁড়োস আনাজপাতি। যাবার সময় উঠোনের কোণায় দাঁড়িয়ে ষষ্ঠিতলার উদ্দেশ্যে প্রণাম করে চোখ খুলতেই দেখে, নদীর ঘাট থেকে গউর আসছে।

চোখ জ্বলে ওঠে চপলার। কাছাকাছি এসে গউর থমকে দাঁড়াল। তখন চপলা ঝাঁঝাল স্বরে বলে ওঠে, 'এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছ তুমি? লজ্জা করে না তোমার?'

গউর গলার ভেতর বলে, 'ক্যানে?'

চপলা ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। 'তোমার জন্যে আমার দিদি বিধবা হয়ে গেল? গাঁ শুদ্ধ লোক ঘরছাড়া হল। আবার বলছ ক্যানে? যদি না পারবে কাকেও রক্ষে করতে, ক্যানে তুমি সাপের ন্যাজে পা দিতে গিয়েছিলে?'

চিন্তামণি বাঁকা মুখে ডাকল, 'অ চপলা। দেরি হয়ে যাচ্ছে যে!'

দুর্গা দাওয়ার মাটিতে এলোচুলে শুয়েছিল। হাতের শাঁখা নোয়া ঘুচে গেছে। সিঁথি শূন্য। কোলের ছেলেটাকে মাই দিচ্ছিল সে। ছেলেটার মুখ ঠেলে দিয়ে রাক্ষুসীর মতো তেড়ে যায়। তারপর হিংস্র মূর্তিতে অভিশাপ দিতে থাকে গউরকে।

গউর আস্তে আস্তে ঘোরে। ঘাটের দিকে হাঁটতে থাকে ফের। চপলা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে চোখে জল নিয়ে।

গউর নদীতে যায় মোষের মতো। সাঁতার কেটে নদী পেরোতে থাকে। নদীর ঘাটে দাঁড়িয়ে চপলা দেখে গউর স্রোতের টানে অনেকটা ভাটিতে চলে গেছে। তবু সে দাঁড়িয়ে থাকে।

ওপারে উঠে গউর হনহন করে চলতে থাকে। তার ময়লা মালকোচা করে পরা ধুতিটা লেপ্টে গেছে কোমরে। জল চোঁয়াচ্ছে ঝরঝর করে। ওপরে বাঁধের পথে সে হিজল গাছের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেলেও অচলা দাঁড়িয়ে থাকে।

গউর কি কিছু বলতে এসেছিল তার কাছে? চপলা ভেবে কূল পায় না। এখন তার মাথা কুটতে ইচ্ছে করে।

গউর হাঁটছিল বাঁধের পথে। কতদূর গিয়ে সে কাশবনে নেমে যায়। কাশবন ভেঙে হনহন করে চলতে থাকে। বহুদূরে কেয়াতলার বিলে বর্ষার জল চকচক করছে। সবুজ ঝাড়ি ঘাসের মধ্যে সাদা বক দাঁড়িয়ে আছে দল বেঁধে। এই সব হিজল জামরুলের ছায়া, কাশকুশ, ঝাড়িঘাসের বনে তার জীবন কেটেছে। এই জগতটা তার খুবই আপন। খুবই চেনা। অথচ এখন যেন সবকিছু দূরে সরে গেছে। এক অচেনা জগতে হেঁটে চলেছে।

ওই বিস্তীর্ণ মাঠ হরিণমারার প্রান্ত থেকে নকসি-কাঁথার মতো বিছানো—ধু ধু করছে রুক্ষতা। সবুজ ধানের চারা শুকিয়ে গেছে। অনেক জমিতে এবার চাষবাসও হল না। হরিণমারার বুকে এখনও দগদগে ঘা শুকোয় নি।

গউরের মাথা ঝুলে গেল। সে হেঁট হয়ে জলকাদা ভেঙে এগোচ্ছিল। তার চোয়াল আঁটো, হাতের মুঠি শক্ত! অনেক দূরে দিগন্তে ছোটবাবুর দালান বাড়িটা রোদে জ্বলজ্বল করছিল। একবার করে মুখ তুলে লাল চোখে দেখে নিচ্ছিল সে।

আবার নদীর বাঁকের কাছে জামবনে ঢুকল সে। বড় জাম গাছটার গুঁড়ি আঁকড়ে ধরে ওপরে উঠল। কোটর থেকে লুকানো অনেক দিনের সঙ্গী সেই ঘাস কাটা প্রকান্ড হেসোটা তুলে নিল। তারপর লাফ দিয়ে নামল।

হেসোটার গায়ে বাদামী ছোপ পড়েছে! ধারটা পরখ করল সে। তারপর প্রচন্ড রাগে একটা হুংকার তুলে সে দৌড়তে থাকল।

মাঝে মাঝে হাঁফ সামলাতে সে দাঁড়াচ্ছিল। আবার দৌড়চ্ছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম এক বন্য মানুষের মতো দেখাচ্ছিল তাকে।.

বড়বাবু দুঃখহরণ এখন এ বাড়ির মালিক। বাড়ির পেছনের পুকুরে মাছ ধরাচ্ছিলেন। একদল জেলে শোলার ভেলায় চেপে মাছ ধরছিল। পাড়ে দাঁড়িয়ে তদারক করছিলেন বড়বাবু। চারদিকে এখানে সবুজ মাঠ। পয়সার জোরে চাষবাস হয়েছে। বড়বাবু মাঝে মাঝে মুখ তুলে সেই সবুজ দেখছিলেন। ছোটবাবুর কুকুর দুটো তাঁকে ঘিরে খেলা করছিল। কুকুর দুটোর নতুন মনিবকে খুব পছন্দ। তবে মাঝে মাঝে বেয়াদপি করতেও ছাড়ে না।

হঠাৎ দুঃখহরণ থমকে দাঁড়ালেন। পুকুর পাড়ে একটা মূর্তি ভেসে উঠল। কুকুর দুটো দৌড়ে চলে গেল তক্ষুনি। আগন্তুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই গেল। কিন্তু লোকটার হাতে ধারালো কি অস্ত্র আছে। একটা কুকুর চোট খেয়ে পড়ে গেল। অন্যটা দূরে সরে গেল।

বড়বাবু দৌড়ে গিয়ে বাড়ি ঢুকলেন। বন্দুকে গুলি পুরে বেরিয়ে এলেন।

গউর এবার জানোয়ারের মতো চিৎকার করে হেসোটা তুলে দৌড়ে এল। তারপর বন্দুকের শব্দ। জেলেরা হকচকিয়ে গিয়েছিল। এবার প্রচন্ড চেঁচাতে শুরু করল!

গউর উপুড় হয়ে পড়ে আছে। বড়বাবু জুতোর ডগায় মুখটা কাত করে দিয়ে বললেন, 'এটা সেই গউর্যা না? ওরে, আফজলকে ডাক। লাশটা বিলের তলায় পুঁতে দিয়ে আসুক...'

কেয়াতলার বিলের তলায় গউরকে পুঁতে ফেলার সময় আফজল ওর কোমরে জড়ানোর একটা সুন্দর লাল গেঞ্জি দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু গেঞ্জিটা ছেঁড়া দেখে সে নেয়নি। গেঞ্জিটার জন্য একটু পস্তানি হয়েছিল আফজলের।

গঙ্গাপুত্র

আকাশ কালো করে আবার বৃষ্টি এসে গেল। মন খারাপ হয়ে গেল গোপালের। কিছুক্ষণ আগেও দিব্যি ঝরঝরে রোদ্দুর ছিল। ভাত-ঘুম থেকে জেগে উঠোনোর দিকটায় সন্দেহজনক ধূসরতা দেখেই মেজাজ চটে গিয়েছিল। তার একটু পরে এই বৃষ্টি। গঞ্জের রাজবাড়িতে ঝুলনের মেলাটা আজ আর দেখতে যাওয়া হল না। এমন তুলকালাম বৃষ্টির মধ্যে নবা পাটনি ভরা গঙ্গায় নৌকো ছাড়বে বলে মনে হয় না। কালই বৃষ্টির সময় একটা নৌকো ডুবে একগাদা লোক মারা পড়েছে। কাজেই ছাতি নিয়ে বেরুলেও মেলায় পৌঁছুনোর আশা নেই। কি যে মাঝখানে একটা নদী এসে জুটেছিল। সে পতিত উদ্ধারিণী হোক আর যেই হোক, এ সব সময় তাকে ক্ষমা করা যায় না। গোপাল মনে মনে গাল দিতে থাকল। মা গঙ্গাকে, নবা পাটনিকে, বৃষ্টিকে। নিজের কপালকেও।

ভুচুমাসি পাশের ঘরে চৌকাঠের পাশে দেয়ালে পিঠ দিয়ে বৃষ্টি দেখছে আর কাঁসার গেলাসে চুমুক দিয়ে চা খাচ্ছে। গোপাল জানে, বৃষ্টি-বাদলার দিন হলে মাসির মেজাজ আশ্চর্য ভাল থাকে। উঠোন জুড়ে এবং খিড়কির ডোবার পাড়ে তার ফল-ফুল শাক-সবজীর গাছপালায় জেল্লা খোলে বলেই যেন। এই যে এত ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি হচ্ছে, যেই থামবে, ভুচুমাসি ট্যাঙস ট্যাঙস করে হেঁটে তার গাছপালার কাছে গিয়ে জুটবে। এলোমেলো বৃক্ষলতাকে কাঠি কাঠি হাত দিয়ে সাজিয়ে-গুছিয়ে ঠিক করে দেবে। সন্ধ্যা হলেই বা কি, হাতে কেরোসিনের কুপি থাকলেই যথেষ্ট। আবার নিজেই শাসিয়ে বলে, অ গোপাল! সন্ধ্যেবেলা গাছপালায় হাত দিতে নেই। কি করছিস ওখানে? এক্ষুনি সরে আয়। পোকা মাকড় বেরুবে।

পোকা-মাকড় বলতে ভুচুমাসি শুধু সাপের ইশারা দেয় না, অপদেবতাদেরও। তাছাড়া অকল্যাণ বলেও একটা ব্যাপার আছে। বাড়ির লক্ষ্মীর আসন কতদিন ধরে নড়বড়ে হয়ে আছে। বড় ভয় হয়। কি দিনকাল ছিল এ বাড়িতে, কি হয়ে গেল ক্রমশ।

গোপাল বারান্দায় বেরিয়ে গম্ভীর মুখে বলল, আমার চা কর নি?

ভুচুমাসি সুন্দর হাসল। উঠেছিস? ভাবলাম এবেলা আর উঠবি নে। রাত জেগে ফাংশান শুনেছিস। তারপরে দুপুর অব্দি কোথায় টো টো করে ঘুরলি। ঘুমুচ্ছিস তো ঘুমো। ডাকলাম না।

বারান্দার থামে হেলান দিয়ে আকাশের দিকে রাগি চোখে তাকিয়ে গোপাল বলল, ভ্যাজভ্যাজ কোরো না তো। কুকার জ্বালো।

ভুচুমাসির পাশেই কেরোসিন কুকার। হাসি মুখে দেশলাই ধরাল। কেটলিও ঠিক ছিল। চাপিয়ে দিয়ে বলল, গোপাল, বললি নে তো মৈনুলের সঙ্গে কি কথা হল? আমিও জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেলাম তখন। মিটমাট করে নেবে বলে গিয়েছিল আমাকে। এদিকে শুনছি সেনবাবু ভেতর ভেতর ওকে—

গোপাল থামিয়ে দিয়ে বলল, চুপ কর দিকি! রোজ এক কথা ভাল্লাগে না আমার।

অভিমান দেখিয়ে ভুচুমাসি বলল, আমার কি বাবা? তোমার সংসার। তোমারই বাপ-ঠাকুদ্দার সম্পত্তি। অ্যাদ্দিন ছোট ছিলে এখন লায়েক হয়েছ। যা ভাল বোঝ করবে।

গোপাল অন্য কথা ভাবছিল। শুধু ওপারের গঞ্জে ফেরার কথা নয়, পাটোয়ারিজির ছেলে অরুণের কথাও। ভাঙা কেল্লাবাড়ির ভেতর জরাজীর্ণ একতলা একটা ঘরের কথা,—যেখানে বদরু পাঠান চোলাই 'আরক' পরিবেশন করে। অরুণের সঙ্গে সেখান থেকে বেরিয়ে রাজবাড়িতে ঝুলন দেখতে ঢুকত গোপাল। প্রচণ্ড ভিড়ে মেয়েদের সঙ্গে একাকার হয়ে লাইন দিয়ে রাসলীলা দর্শন ও প্রণাম করে ফাঁকায় গিয়ে দুজনে হেসে অস্থির হত। কার বরাতে কতগুলো মেয়ে পড়েছে, তাই নিয়ে হিসেব কষতে কষতে পরস্পরকে বলত, শুঁকে দ্যাখ না রে। এখনও গন্ধ লেগে আছে। অরুণটা ভারি চালাক। তার বুকে মেয়েলি চুলের গন্ধ টের পেয়েছিল গোপাল। আসলে অরুণ তার চেয়ে তাগড়াই কি না, গোপাল ওর চেয়ে যদিও রোগা তবে ফর্সা। ওরা তো এ দেশের লোক নয়। কোন্ পুরুষে আজমির মারোয়াড় থেকে এই গঞ্জে ব্যবসা করতে এসেছিল। এখন বাঙালি হয়ে গেছে। চেহারাতেও গঞ্জের জলহাওয়ার ছাপ পড়েছে। চেনার উপায় নেই।

গঙ্গার এপারে গোপালের মেলামেশা বরাবরই কম। বন্ধুবান্ধবও বিশেষ নেই। তার ছেলেবেলায়

এপারে এখনকার মতো স্কুল ছিল না। তাই তাকে ওপারের গঞ্জের স্কুলেই পড়তে যেতে হত। সেই থেকে অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধব তার ওপারেই যত। এপারে নিজের গ্রাম সম্পর্কে ছোটবেলা থেকেই তার তাচ্ছিল্যবোধ আছে। এখন এপারের ঘাটের মাথাতেও ছোটখাট বাজার হয়ে গেছে। বিদ্যুৎ এসে গেছে আশেপাশে। গোপালদের বাড়িটা একটেরে পড়ে গেছে বলে অসুবিধে। খান চারেক শালের খুঁটি চাই তার আনতে। এখন শুধু একটাই আশা, যদি গঞ্জের পাটোয়ারিজি গোপালদের বাড়ির ওপাশে পোড়ো জংলা জমিটা কিনে এপারেও গদি খোলেন, তাহলে সেই সুবাদে গোপালও বিদ্যুৎ পাবে। ব্যাপারটা কল্পনা করে গোপাল আনন্দে শিউরে ওঠে। সারাক্ষণ ঝিঁঝিঁ ডাকা নিঝুম পুরনো এই একতলা বাড়ি থেকে আলো ঠিকরে পড়বে—কেমন দেখাবে, খুঁটিয়ে ভাবে সে। উঠোনোর ওই বেলগাছ থেকে ব্রহ্মদৈত্যটা পালিয়ে যাবে। পাঁচিলের পিছন থেকে কাঁথা-ওয়ালি প্রেতিনীর নোংরা কাঁথার দুর্গন্ধও আর ছড়াবে না, কারণ বৈদ্যুতিক আলোর সামনে অ-মানুষ জব্দ। বাঘের চোখে বিদ্যুতের আলো ফ্যালো, সে লেজ গুটিয়ে পালাবে। সাপের চোখে ফ্যালো, অন্ধ হয়ে যাবে। ভূত-প্রেত-ব্রহ্মদৈত্যেরও তো প্রাণ আছে। ভুচুমাসি বলে, কার প্রাণ নেই? মাসি অবশ্য প্রাণের বদলে 'আত্মা' বলে। ব্যাপারটা একই।

শুধু বিদ্যুৎ নয়, গোপালের আরও কল্পনা আছে—স্বপ্ন বলা হয় যাকে, এবং গোপালের বেলায় সেটা রীতিমত পরিকল্পনা বলাই ভাল, পঞ্চবার্ষিক যোজনার মতো। এই পুরনো বাড়িটার ভোল ফেরাবে সে। বাইরের ঘরে সোফাসেট আনবে। শোকেস আনবে। সুদৃশ্য পুতুল দিয়ে সাজাবে। শোবার ঘরের পুরনো প্রকাণ্ড দিশি মিস্তিরির তৈরি খাটটা ভুচুমাসির ঘরে দেবে এবং নিজের জন্যে আনবে নিচু ইংলিশ খাট। কোথায় রেকর্ড প্লেয়ার, টেপরেকর্ডার, আর হরেক রকম 'মডার্ন' সম্ভার সাজানো থাকবে, তাও গোপালের ঠিক করা আছে। অরুণের দাদা পান্নার ঘরকানা তার মুখস্থ। তার ভবিষ্যত বাড়ির ভেতর সেই আদলটাই একটু অদলবদল করে ঢোকাতে চায় গোপাল।

আর এই ছবি যখন সে দ্যাখে, তখন সে চোখ বুজে একটু একটু দোলে। চেয়ার থেকে পা ছড়িয়ে দেয় সামনে। ভুচুমাসি ডাকলে খেঁকিয়ে ওঠে। মাসি তো জানে না, ঘরে একটা ইংলিশ খাট সাজাতেই গোপালের কতক্ষণ লেগে যায়। বারবার খেই হারায়, বারবার হাতড়ে এনে আবার তাকে পৌঁছুতে হয় গঞ্জের তারা ফার্ণিচার্সে ভেলুবাবুর কাছে। ভেলুবাবুর কাঁচাপাকা গোঁফ, ফুলো ফুলো মুখ, বেড়াল চোখ, পাঞ্জাবির সোনার বোতাম পর্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পায় গোপাল। কিন্তু সে দরাদরি করে না।

এই সব ছবির ভেতর একটি সুন্দরী যুবতী থাকার প্রয়োজন আলতোভাবে অনুভব করে গোপাল, তারপরই তার বুকের ভেতরটা উদ্দীপনায় গরগর করতে থাকে। যুবতীটি তার চোখে আবছা হয়ে যায় বারবার। সে কি অরুণের বোন ধনমালা বা জপমালার মতো? কিংবা সে রাধারমণ উকিলের মেয়ে মাধুরীর মতো? নিদেনপক্ষে এপারের সেজবাবুর ছোট মেয়ে বিন্তির মতো? বিন্তিটা মন্দ নয়। কিন্তু তার বাবাটা বড্ড হারামজাদা লোক। বিব্রত গোপাল ফিল্ম স্টারদের মধ্যেও অন্বেষণ করতে যায়। যদি দৈবাৎ কোন একদিন কেউ ছিটকে চলে আসে শীতলডিহি গাঁয়ে—যার নিচে গঙ্গা বয়ে চলেছে, সবুজ গাছপালায় ঢাকা পাখি ডাকা গাঁ তার পছন্দ হয়ে যেতেও তো পারে। ভালবেসে ফেলতেও তো পারে গোপাল নামে একটি ছেলেকে— যে কলেজেও বছর দুই পড়েছে, যার চেহারা বিনোদ খান্নার মতো, এবং যে ঠিক তেমনি মারকুটে, একরোখা, কিন্তু বেজায় ভালমানুষ।

ভুচুমাসি ডাকে, গোপাল! অ গোপাল!

উঁ?

কি খালি ভাবিস বল দিকিনি বাবা? এত চিন্তা তোর কিসের?

গোপাল তাকায়। কিন্তু এসব সময়ে কখনও সে খেঁকিয়ে ওঠে না অভ্যাসমতো। কখনও কখনও সে মিঠে লাজুক হাসে। একটু যেন অপ্রস্তুত হয়। আলোর পর অন্ধকারের মতো, কোমল চিক্কণ বর্ণাঢ্য কিছু দেখার পর তার বাড়ি-ঘর, উঠোন, ছোট্ট মরাই, শাক-সবজির মাচান, ফল-ফুলের গাছ, কুয়ো, দড়ি-বালতি, পাঁচিলে বসে থাকা কালকুট্টে কাক সবকিছু মিলিয়ে একটা রূঢ় অপছন্দ বাস্তবতা তার বুকে ধাক্কা মারে। খুব অসহায় বোধ করে গোপাল। বিষণ্ণ একটু হাসে। বলে, কি ভাবব? ও কিছু না। এক কাজ কর না মাসি। একটু খানি চা দাও দিকি।

থাম বাঁদর! অসময়ে আবার চা! ভুচুমাসি কপট শাসন করে। আকাশে সূর্য দেখিয়ে বলে, যা—চান করে আয়। বেলা হয়ে গেছে। কখন রাঁধাবাড়া সারা।

চা খাওয়ার অভ্যাস ভুচুমাসিরও প্রচণ্ড। ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছে হাতে কাঁসার গেলাস, আঁচল দিয়ে ধরা। আর গোপাল তো চায়ের পোকা। ইদানীং আবার অরুণের দেখাদেখি গঞ্জ থেকে সবচেয়ে দামি চা কিনে আনে। অথচ মাসি বলে, কেমন যেন গন্ধ! অসাল চা এতদিন খায় নি বলেই ভুচুমাসি জানে না, এই গন্ধটাই চায়ের আসল গন্ধ।

বৃষ্টি বাদলার দিনেই এই চা খাওয়ার ব্যাপারটা ভাল জমে। এ সব দিনে ভুচুমাসিকে মুখ ফুটে বলতে হয় না। আজ ঝমঝমিয়ে বৃষ্টির দিনটিতে গোপাল ও তার মাসির জমিয়ে বসে গল্প করতে করতে চা খাওয়ার কথা। সেই চা খাচ্ছে বটে গোপাল, মাসিও মুখ খুলেছে—পুরনো দিনের সুখদুঃখের কাহিনী ফেঁদে বসেছে, কিন্তু গোপালের মেজাজ নেই। গঞ্জের রাজবাড়িতে সাত-দিন-সাত-রাতের ঝুলন শুরু হয়েছে শ্রাবণ মাসের ঝুলন পূর্ণিমা থেকে। আজ তার তৃতীয় দিন। প্রথম দিনটা তত জমে নি গোপালের। গত দিনটা--মানে রাতটাতে দারুণ জমেছিল। কি একটা আনন্দের সম্ভাবনা বীজের অঙ্কুর গজানোর মতো লক্ষ্য করেছিল গত রাতে---ভিড়ের ভেতর রাধু উকিলের মেয়ে মাধুরীর সঙ্গে বারবার দেখা হয়েছিল এবং গোপাল লক্ষ্য করেছিল, চোখে চোখ পড়তেই সে হাসছে—যদিও অরুণ বলছিল, আমাকে দেখে হাসছে, বুঝলি গোপাল, যখনই দেখা হয়, হাসে। কি করি বল তো? অথচ গোপালের দৃঢ় বিশ্বাস মাধুরী তাকে দেখেই হাসছে। ...

বাইরের ঘরের দরজায় কে যেন অনেকক্ষণ থেকে কড়া নাড়ছে। বৃষ্টির ঝমঝমানি আর ভাবনা-চিন্তার দরুন কানে এসেও আসছিল না গোপালের। ভুচুমাসি তো নিজের খেয়ালেই আছে। কান করে নি। এতক্ষণে দুজনেই খেয়াল করে শুনল, কেউ ডাকাডাকি করছে।

ভুচুমাসি বলল, অ গোপাল! দ্যাখ দিকি বাবা—গ্যাঁদা ডাকছে বুঝি। ওকে আসতে বলে পাঠিয়েছিলাম। আসবার আর সময় পেল না, বিষ্টি বাদলা মাথায় করে।

গোপাল সিগারেট ধরিয়ে আস্তে সুস্থে পা বাড়াল। ভেতরের ছোট্ট ঘরটা এরই মধ্যে আঁধার হয়ে গেছে। সাবধানী মাসি কখন জানালাগুলো বন্ধ করে গেছে। এ ঘরে আসবাব বলতে গোপালের বাবার আমলের খানচারেক কাঁঠাল কাঠের বেঢপ চেয়ার, একটা টেবিল, একধারে একটা আলমারি—তার ভেতর একগাদা পুরনো পাঁজি, ধর্মগ্রন্থ, খানকতক সেকেলে উপন্যাস, হিসেব লেখা জাবদা খাতা কতকগুলো—এই সব জিনিস ঠাসা। খুলেও দেখে না গোপাল।

গলার স্বর অচেনা লাগছিল। দরজার খিল খুলে গোপাল অবাক হয়ে গেল। ভিজে একসা দুটো মানুষ। কাচাপাকা চুল, মুখে একরাশ গোঁফ দাড়ি, বুড়োই বলা চলে—এমন এক ভদ্রলোক। কাঁধে ব্যাগ, এক হাতে স্যুটকেশ, অন্য হাতে গুটোনো ছাতি। বাইরের বারান্দা ইতিমধ্যে ভিজিয়ে ফেলেছেন দুজনে।

অন্য জন মেয়ে। পরনে সাদাসিধে একটা শাড়ি ভিজে লেপটে গেছে দেহে। আঁচল কোমরে জড়ানো। তার এক হাতে একটা জিনিস বোঝাই চটের থলে। অন্য হাতে ভিজে চটি।

বৃদ্ধ একটু হেসে বললেন, তুমি গোপাল না? হুঁ—ঠিক চিনতে পেরেছি। ইস্! কত বড়টি হয়ে গেছ তুমি? কৈ, ভুচু কোথায়? ও ভুচু! ভুচুরে!

ডাকতে ডাকতে তিনি গোপালের পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়লেন। গোপাল ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছিল। মেয়েটির চোখে চোখ পড়লে সে চোখ নামিয়ে আস্তে বলল, ভেতরে আসুন।

ভদ্রতা করেই বলল গোপাল। কিন্তু সে তখনও আকাশ-পাতাল হাতড়াচ্ছিল। বৃদ্ধকে কখনও দেখেছে বলে কিছুতেই মনে করতে পারছিল না।

মেয়েটি থলেটা ঠেকিয়ে রেখেছিল মেঝেয়। গোপাল বুঝল ওটা ভারি। সে ভদ্রতা করে থলেটা তুলে নিয়ে একটু হেসে বলল, কি আছে এতে বলুন তো? ভীষণ ভারি!

নারকোল আছে। কলমের আম আছে।

মেয়েটি নিঃসংকোচে জবাব দিয়ে গোপালের পিছন পিছন ঘরে ঢুকল। তারপর বলল, দরজাটা

আটকে দিচ্ছি।

গোপাল ঘুরে বলল, হ্যাঁ—দিন।

ভেতরের বারান্দায় ততক্ষণে বৃদ্ধের সঙ্গে ভুচুমাসির জমে গেছে। গোপাল ঢুকলে ভুচুমাসি খুশিতে চঞ্চল হয়ে বলল, অ গোপাল! গেনুমামাকে চিনতে পারিস নি! এ কি কথা রে—অ্যাঁ? পোড়ামাতলার গেনুমামা তোর—সেই যে কাঠের ঘোড়া কিনে এনেছিলেন তোর জন্যে কাটোয়া থেকে। বলে ভুচুমাসি ঘুরল বৃদ্ধের দিকে। তা গোপালেরও দোষ নেই বাপু! সেই যে গেলেন তো গেলেন, না চিঠিপত্তর, না আসা-যাওয়া।

বৃদ্ধ বললেন, বারো বছর হয়ে গেল প্রায়।

তবে! ভুচুমাসি উঠে এসে মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরল। তিন্নি রে তিন্নি। তুই এত বড় হয়েছিস! ওরে, তোদের দেখে আমার কি যে আনন্দ হচ্ছে!

ভুচুমাসি ফোঁস ফোঁস করে কাঁদতে লাগল। গোপাল থলেটা ঠেস দিয়ে রেখে একটু ইতস্তত করছিল। কাঠের ঘোড়াটা তার সব মনে পড়িয়ে দিয়েছে। আপন মামা নন জ্ঞানেশ্বর। গোপালের মা ও মাসির কোন সহোদর ভাই ছিল না। আবার জ্ঞানেশ্বর ঠিক জ্ঞাতিও নন। মা ও মাসির বাপের বাড়ির নিছক প্রতিবেশী। কিন্তু কুটুম্বিতার দরুন সেটা বোঝবার উপায় ছিল না। গোপাল বারবার পোড়ামাতলা যেতে চাইত ছোটবেলায়, তার কারণ ট্রেনে চাপার আনন্দ শুধু নয়, কাটোয়া শহরে জ্ঞানেশ্বরের সঙ্গে দারুণ সুখের ভ্রমণও নয়, স্বয়ং জ্ঞানেশ্বরের মধ্যেই একটা ব্যাপার ছিল যেন। উনি এলে গোপাল নেচে উঠত।

অথচ এমন বোকার মতো ভুলে যাওয়া। আসলে বারোটা বছর তত বেশী সময় না হলেও হয়তো মানুষের জীবনে বয়ঃসন্ধি কালটাতে একটা কিছু ঘটে যায়। স্পষ্ট দুটো ভাগ হয়ে যায় দু'দিকে। গোপালের বয়স এখন চব্বিশ পঁচিশ। গত দশটা বছরে সে একটু-একটু করে এমন জায়গায় এসে ঢুকেচে, যেখানে দাঁড়িয়ে ছোটবেলাটা খুব অস্পষ্ট লাগে।

অপ্রস্তুত গোপাল ঢিপ করে একটা প্রণাম করে ফেলল। জ্ঞানেশ্বর দাড়ি খামচে ধরে বললেন, চিনবে কি করে? মুখে তো এগুলো ছিল না। তাছাড়া যা দিনকাল পড়েছে, মানুষের মধ্যে আর মানুষ টানুষ থাকার যো নেই। সবাই বখে যাচ্ছে। এই দেখ না, সেই সকাল দশটায় ট্রেনে চেপেছি। বাজার সাউতে এসে দাঁড়িয়ে গেল। বাহারুল হল্টে .মালগাড়ির ইঞ্জিন খারাপ হয়েছে। আপ থেকে ইঞ্জিন এলো। মালগাড়ি টেনে নিয়ে গেল। তার খবর হল তবে কিনা ট্রেন ছাড়ল। শীতলদি পৌঁছুতে সাড়ে চারটে বেজে গেল। কয়েক পা হেঁটেছি, হঠাৎ এই বৃষ্টি। গাছতলায় দাঁড়িয়ে কতক্ষণ ভিজলাম। শেষে তিন্নি বলল, ভিজে তো গেছি। আর কতক্ষণ দেখব? তাই হাঁটতে শুরু করলাম। ওদিকে তিন্নির যা ভুলো মন—ছাতি ফেলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে।

খিক খিক করে হাসতে লাগলেন জ্ঞানেশ্বর। গোপাল এবার ব্যস্ত হয়ে উঠল। ভিজে কাপড় ছেড়ে ফেলুন মামাবাবু। বলে সে ভুচুমাসিকে তাড়া লাগাল। ওঁকে কাপড়-টাপড় ছাড়তে দেবে তো—না কি? গোপালের মুখেও হাসি ফুটল এতক্ষণে। তিন্নির দিকে তাকিয়ে বলল, যান, যান! কাপড় ছাড়ুন আগে। যা বিষ্টি।

জ্ঞানেশ্বর বারান্দাতেই হেঁট হয়ে স্যুটকেশ খুলে কাপড় বের করতে যাচ্ছিলেন। বললেন, তিন্নিকে আপনি-আজ্ঞে আর কোরো না বাবা গোপাল। বরঞ্চ তিন্নি যদি তোমাকে তুমি-টুমি করে, সেটা দোষের হবে। তোমারটাতে দোষ হবে না।

ভুচুমাসি তিন্নিকে একহাতে টেনে পা বাড়িয়েছিল। স্যুটকেসটা ছোঁ মেরে তুলে নিজের ঘরে রেখে এলো। তারপর বাইরের কুলুঙ্গি থেকে হ্যারিকেন নামিয়ে জ্বালতে বসল। ঘরের ভেতরটা আঁধার হয়ে আছে। তিন্নিকে বলল, যাও মা, কাপড় ছাড়ো গে। আলো দিচ্ছি। আর শোন, বাবাকে কাপড় বের করে দিয়ে যাও।

উৎসাহ দেখিয়ে গোপাল বলল, ধুতি দেব মামাবাবু? ধোপার বাড়িতে কাচা আছে।

জ্ঞানেশ্বর বললেন, থাক থাক।

নিরানন্দ চুপচাপ বাড়িতে শেষবেলার এই বৃষ্টিতে কুটুম্ব এসে পড়াতে গোপালের মন ভাল হয়ে

গেছে। সে মানুষজনের সঙ্গে মিশতে ভালবাসে। তাছাড়া ওই তিন্নি নামে এক যুবতী। যুবতীর সান্নিধ্যে থাকলে যুবকদের খুশি হওয়াই তো স্বাভাবিক। তিন্নি যদি আপন মামাতো বোন হত, তবু খুশি হত গোপাল। এই খুশি হওয়াটা অন্যায় কিছু নয়। কাছাকাছি বয়সের নরনারীর মধ্যে একটা সুসম্পর্ক শিগগির গড়ে ওঠে। তার ভেতর কু না-ও থাকতে পারে।

আলো জ্বেলে ভুচুমাসি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। সেই সকালে জ্ঞানেশ্বররা খেয়ে বেরিয়েছেন। আর এ লাইনের যা অবস্থা, কোন প্ল্যাটফর্মে খাবার পাওয়া যায় না। ঝটপট চা করে দিল। থালা সাজিয়ে মুড়ি আনল ভাঁড়ার থেকে। জ্ঞানেশ্বর চটের থলে থেকে চারটে বিরাট কলমে আম আর দুটো নারকেল বের করেছেন ততক্ষণে। গোপাল বাইরের ঘর থেকে তিনটে চেয়ার এনে দিল। বেশ জমে উঠল বৃষ্টির সন্ধ্যাটা। কয়লার উনুনে আঁচ ধরিয়ে দিয়ে এসে ভুচুমাসিও জ্ঞানেশ্বরের সঙ্গে হারানো দিনের গল্পে জমে গেল।

তিন্নি থামের কাছে চেয়ার টেনে বসে বৃষ্টি দেখছিল। মুড়ি বিশেষ খায় নি। অনামনস্কভাবে দু-এক মুঠো। তার চা খাওয়ার ভঙ্গী দেখে গোপাল টের পাচ্ছিল্, চা খেতে ভাল লাগে না তার। আর কেমন যেন একটু চুপচাপ ধরনের মেয়ে ও। কপালে তিনটে যেন ভাঁজ, ঈষৎ লম্বাটে মুখ, সরু থুতনি, চোখ দুটো চেরা আর শান্ত। ওই চোখে যেন অবাক হওয়ার কোন চিহ্নও ফোটে না। বাঁ কানের লতিতে হ্যারিকেনের আলোর ছটায় ছোট্ট দুটো সোনার রিঙের ঝিকিমিকি দেখতে দেখতে উঠোন আবছা হয়ে গেল। বৃষ্টি সামান্য ধরেছে। ঝমঝমানির বদলে সরু ধারায় ঝিরিঝিরি পড়ছে। হঠাৎ গোপালের দিকে ঘুরে তিন্নি একটু হাসল। এখানে কোথায় যেন ঝুলনের মেলা বসেছে?

গোপাল জানাল, ওই তো ওপারে। মোতিগঞ্জের রাজবাড়িতে।

যাওয়া যায় না?

গোপাল হাসতে লাগল। যায় তো। কিন্তু বিষ্টি। বিষ্টি না হলে কি আমিই বসে থাকতাম? এতক্ষণে গঙ্গা পেরিয়ে—আজ আবার নাটমন্দিরে কলকাতাব থিয়েটার।

বৃষ্টিব জন্যে থিয়েটার হবে না হয়তো। তিন্নি কালো আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল।

গোপাল ব্যস্তভাবে বলল, না না। নাটমন্দিরের ছাদ আছে সিনেমা হলের মতো। এতক্ষণে ঝেঁটিয়ে মেলার লোক সেখানে ঢুকে বসে আছে। শুধু প্রবলেম হল গঙ্গা পেরুনো। কাল সাংঘাতিক অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গিয়েছে।

কথাটা কানে গিয়েছিল জ্ঞানেশ্বরের। কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, ট্রেনে শুনলাম। নৌকো উল্টে নাকি একগাদা লোক মরেছে।

ভুচুমাসি রান্নাঘরের বারান্দার দিকে পা বাড়িয়ে বললেন, অ্যাক্সিডেন্ট তো প্রতি বছর। আর ঠিক এই ঝুলনের মেলার সময়। প্রতি বছর মা একগাদা করে টেনে নেবে।

উনুনে আঁচ প্রায় মুখিয়ে উঠেছে। ভুচুমাসি ভাতের জল চাপাতে ব্যস্ত হল। গোপাল বলল, বুঝলেন না মামাবাবু? পাড়াগাঁয়ের লোকের কারবার। ঘাটের নৌকোয় কম পয়সা লাগবে। আলগা ডিঙিতে গেলে তার চারগুণ। তাই করে কি, হুড়োহুড়ি করে ঘাটের নৌকোয় ওঠে। ব্যস! তারপর মাঝগঙ্গায় গিয়ে—

তিন্নি বলে উঠল, আচ্ছা, এখন আলগা ডিঙিতে বেরুনো যায়না? বৃষ্টি তো কমে গেছে।

জ্ঞানেশ্বর হো হো করে হাসলেন। আসল কথাটা তবে খুলে বলি। ভুচু, তুমিও শোন। তিন্নি মোতিগঞ্জের ঝুলন দেখার জিদ না করলে এমন করে আসাই হত না।

ভুচুমাসি অভিমান করে কিছু বলল। শোনা গেল না। তিন্নির কথার জবাব গোপাল জ্ঞানেশ্বরের কথার সঙ্গে মিশিয়েই দিয়েছে। কাল নৌকোডুবির পর মেলার কয়েকটা দিনের জন্যে পুলিশ আর স্থানীয় কর্তালোকেরা মিলে আলগা ডিঙিগুলোকে ঘাটের নৌকোর যা ভাড়া, সেই রেটে লোক বইতে বাধ্য করেছিল। কিন্তু আজকাল অবস্থা অন্যরকম। আলগা ডিঙিওয়ালাদের পক্ষে দাঁড়ানোর লোকও আছে। তাদের কথা হল, সারা বছর তাদের রোজগার খুবই কম। এই সব মেলা পার্বণের সময় তারা বাড়তি কিছু রোজগার করে। কাজেই তাদের রুজিতে হাত দেওয়া চলবে না। আলগা ডিঙিওয়ালারা ধর্মঘট করে বসে আছে দুপুর থেকে। সব ডিঙি সরিয়ে নিয়ে গেছে আঘাটায়। দুপুর অব্দি গোপাল

সেই সব ঝামেলা দেখে বেড়াচ্ছিল।

ভুচুমাসি এ বারান্দায় এসে বলল, মেলা তো উঠে যাচ্ছে না বাপু! এই দুয্যুগে বেরুতে চাইলেই কি বেরুতে দেব? দিনসবরে যাবি—আমিও যাব। বছরকার দিন। প্রতি বছর যাই। এবারই পেথ্থুম দিনটা ঠাকুরকে পেন্নাম করে আসা হল না। ওই গোপলার জন্যে।

গোপাল বলল, যাব্বাবা!

ভুচুমাসি হাত-মুখ নেড়ে বলল, আমি যে যাব, তোর সংসার পাহারা দেবে কে? তুই থাকবি, তবে তো আমার যাওয়া হবে? তা হাপিত্যেশ করে বসে রইলাম, গিরিবালারা ডাকতে এলো, সুধন্যর মা এলো, কলকাতার জামাই পর্যন্ত। এদিকে হা গোপাল হা গোপাল করে বসে আছি। কোথায় সে? নেই। গ্যাঁদা এসে বললে, তাকে নবার নৌকোয় ওপারে যেতে দেখেছি। বুঝুন তাহলে গেনুদা!

জ্ঞানেশ্বর বুঝলেন। দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, তা যোয়ান বয়সে আমরাও তাই ছিলাম বলতে গেলে। বরং আরও এককাঠি সরেস। ও ভুচু! মনে নেই, রাতদুপুরে সেবার গঙ্গায় সাঁতার কেটে—

ভুচুমাসি নির্মল হাসল। হ্যাঁ— সে সাধ্যি আমার গোপালের নেই, তা মুখে যতই কট্টাই করুক।

গোপাল বলল, কি?

জ্ঞানেশ্বর বলতে লাগলেন গল্পটা। মোতিগঞ্জে একবার গোপালের বাবা দীনবন্ধু আর জ্ঞানেশ্বর তাসের আড্ডায় রাতদুপুর করে দিয়ে ঘাটে এসে দেখেন, নৌকো নেই। ডাকাডাকি করে সাড়া পাওয়া গেল না। দুজনে খানিকটা উজিয়ে জেলেপাড়ার ঘাটে গেলেন, যদি জেলেডিঙি পাওয়া যায়—চুপিচুপি ভাসিয়ে নিয়ে আসবেন। তাও পাওয়া গেল না। কতক্ষণ পরে একটা ডিঙি আসতে দেখলেন। আলো টালো ছিল না তাতে। কিন্তু ততক্ষণে চাঁদ উঠে গেছে। সেই ডিঙিকে ডাকাডাকি করলে ঘাটে এসে ভিড়ল। লম্বা কালো একটা লোক। বোবা না কালা বোঝবার উপায় নেই। তার ডিঙিতে তো ওঠা গেল। কিন্তু মাঝগাঙে গিয়ে দেখেন কি, ওপারে যাওয়ার কোন চেষ্টা নেই, সোজা ভাটিতে নিয়ে চলেছে। চ্যাচামেচি, শাসানি, কিছুতেই কালো মাঝির গ্রাহ্য নেই। ততক্ষণে বৌড়ুবির দহ ছাড়িয়ে প্রায় একমাইল দক্ষিণে চলে গেছে ডিঙি।

তখন দু'জনের খেয়াল হল। দীনবন্ধু চিমটি কাটলেন জ্ঞানেশ্বরকে। দু'জনেরই গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে বুক টিপ টিপ করছে। কার পাল্লায় পড়েছে। প্রাণের আশা ছেড়ে দিয়েছে।

গোপাল বলল, কার?

ভুচুমাসি খেঁকিয়ে উঠল। আবার কার? গাল টিপলে দুধ বেরুচ্ছে! ন্যাকা!

তিন্নি মুখে আঁচল চেপে হাসতে লাগল। জ্ঞানেশ্বর শ্বাস ছেড়ে বললেন, দীনুকে ইশারায় বললাম, ঝাঁপ দাও। দীনু আমার চেয়ে ভাল সাঁতার জানত। কিন্তু সে দোনামনা করছে দেখে তাকে এক ধাক্কায় জলে ফেলে আমিও 'জয় মা' বলে দিলাম ঝাঁপ।

তিন্নি বলল, নৌকোটা? আর সেই কালো লোকটা?

আর কি ও সব দেখার খেয়াল ছিল? ভরা গঙ্গা। সবে পুজো গেছে। প্রচণ্ড স্রোত।

গোপাল বলল, আপনি তাহলে ভাল সাঁতার জানেন মামাবাবু?

জানতাম। ভাল না হলেও মোটামুটি জানতাম। তবে তখন কি না প্রাণের দায়ে মরিয়া।

তিন্নি বলল, আপনি জানেন না গোপালদা?

গোপাল অন্তরঙ্গতায় খুশি হয়ে বলল, জানি। একবার দশ মাইল সুইমিং রেসে ডিস্ট্রিক্ট চ্যাম্পিয়ন হয়েছি। আর ও সব ভাল্লাগে না।

ভুচুমাসির মন ভূতপ্রেতের রহস্যে ডুবে গেছে। সেদিকে সবাইকে টানবার চেষ্টা করে বলল, গেনুদারা তো রাতদুপুরে বিপদে পড়েছিলেন। আর আমি? সাক্ষাত দিনদুপুরে। গঙ্গায় চান করতে যাচ্ছি, রাস্তার ওপর বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ এসে পড়ল। হাওয়া নেই, বাতাস নেই।

গোপাল মুচকি হেসে সিগারেট খেতে তার ঘরে ঢুকল। টেবিলের শেজবাতিটা জ্বেলে দিল। সুদৃশ্য চীনা বাতিটা অরুণের সঙ্গে কলকাতা গিয়ে কিনে এনেছে। খাটে বসে সে সিগারেট টানতে থাকল।

বারান্দায় থামের কাছে তিন্নির একটা পাশ দেখা যাচ্ছে। সে তিন্নিকে দেখছিল। ভুচুমাসির ভূতের গল্প হলেও মেয়েটা খিলখিল করে হেসে উঠেছে। যতটা চাপামেয়ে মনে হয়েছিল, তা হয়তো নয়।

আবার ঠিক গ্রামের মেয়ে বলতে যা, তাও নয়। বরং শহুরে স্মার্টনেসের আদল ঝিলিক দিচ্ছে ওর মধ্যে। তিন্নিকে পছন্দ করা যায় কিনা ভাবছিল গোপাল। ভূতের গল্প শুনতে শুনতে তিন্নি হঠাৎ তার দরজার দিকে মুখ ঘুরিয়ে তাকে খোঁজার চেষ্টা করল, আর তখনই ওকে গোপালের ভীষণ পছন্দ হয়ে গেল।.......

রাতে তিন্নি বলেছিল, আপনাদের এখানে প্রচুর ভূত।

ঠিকই ধরতে পেরেছে গেনুমামার মেয়ে। শীতলডিহি সম্পর্কে অবশ্য ওপারের মোতিগঞ্জেরও এই ধারণা। ওখানে কেউ কেউ গোপালকে দেখলেই বলে, এই যে ভূত! আসলে গ্রাম সম্পর্কে শহরের এই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য বরাবর। তাতে গোপালের নিজেরও সায় আছে। কিন্তু তিন্নির মন্তব্যের 'ভূত' অন্য ভূত। প্রকৃত ভূত। গেনুমামার মতে, ভূত দু'রকম। একদল হল মানুষের আত্মা—যাদের কোন কারণে মুক্তি হচ্ছে না। আরেক দল মনুষ্যের জীবের আত্মা। অথচ পাশেই মা গঙ্গা। তিনিও হতভাগ্যদের কেন উদ্ধার করেননি বা করছেন না' এটা চিন্তার বিষয়।

জ্ঞানেশ্বর লোকটিই এ রকম। অদ্ভুত-অদ্ভুত বিষয়কে ভীষণ গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন। রাতে বারান্দায় ভাঁজ করা ক্যাম্বিসের খাট পেতে মশারি খাটিয়ে নিয়েছিল গোপাল। ভুচুমাসির ঘরে তিন্নি। গোপালের ঘরে গেনুমামা। বিছানায় শুয়ে শুয়ে গেনুমামা আর ভুচুমাসির গুরুতর ভৌতিক আলোচনা। গোপালের ঠিক ভয় নয়, অস্বস্তি হচ্ছিল। মশারির বাইরে কেউ যেন শাদা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার দিকে দুটি নিস্পলক চোখ মেলে। সে রাতের অশরীরিকে তিন্নির শরীর দেখার চেষ্টা করছিল।

সকালে গোপাল সেজেগুজে মাঞ্জা দিয়ে বেরুল। মাছের জন্যে জেলেপাড়ায় গিয়ে নিবারণকে খবর দিয়ে গেল, বাড়িতে কুটুম্ব। আকাশ মেঘলা হয়ে আছে। বেশ গুমোট ভাব। আবার হয়তো বৃষ্টি নামবে।

ঘাটের মাথায় দরমাপাতার বেড়া আর খড় বা টালিতে ছাওয়া চাল নিয়ে চা, পান, বিড়ি আর ময়রার দোকান। একটা গমভাঙানি কল। ছোট্ট দুটো মণিহারি। একটায় আধুনিকতা, অন্যটায় মেঝেয় বিছোনো নানা রঙের জিনিষ, যা গ্রামে মেয়েদের মন কেড়ে নেয়। মুদিখানাও খান দুই। রাধু কোবরেজের আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়। পাঁচু মাস্টারের হোমিওপ্যাথি। ছকড়ি হাজরা কোথায় যেন কম্পাউণ্ডারি করতেন। অবসর জীবনে গ্রামে ফিরে ঘাটের মাথায় এলোপ্যাথি ডিসপেন্সারি খুলেছেন। সুখলালজির খন্দের গদিটির বয়স অবশ্য তিনপুরুষের। খন্দ আর পাটের ওপর দাদনি কারবার আছে। মহাজনি প্রথায় কিছু বন্ধকির কারবারও। একটা সম্ভাবনাপূর্ণ বাজারের অঙ্কুর থেকে চারা গজিয়েছিল গোপালের জন্মের আগেই। এখন ডালপালা মেলতে পেরেছে। রাতে ঝিকিমিকি বিদ্যুৎ জ্বলে।

ঘাটে গিয়ে দাঁড়াল গোপাল। কি এক রোখের মাথায় বেরিয়ে এসেছিল বাড়ি থেকে, যেন ওপারেই যাবে। কিন্তু হঠাৎ মনে হচ্ছে, কি দরকার। বাড়িতে কুটুম্ব।

সে পুটুনের টাটের সামনে গিয়ে বলল, চা দাও পুটুনদা। যদিও এখনই চায়ের ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু একটা কিছু করা দরকার। কেমন একটা চাপা অস্থিরতা তাকে উত্যক্ত করছে।

নোলে ভটচাযের সঙ্গে পুটুনের ঝগড়া চলছিল। ভটচায নিশিভোরে গাডু নিয়ে বেরিয়েছেন। গঙ্গা তীরে ঝোপেঝাড়ে নিত্যকর্ম সেরে গঙ্গাস্নানে শুদ্ধ হয়েছেন-- -পরনে খাটো সবুজ লুঙ্গি, খালি গায়ে গিঁট দেওয়া ময়লা পৈতে। পায়ে রবারের দু'ফিতের চটি। ভাটার পাশ দিয়ে আসার সময় একখানা ইটও অভ্যাস মতো এনেছেন। গাডু আর সেই ইট পায়ের কাছে রেখে বাঁশবাতার বেঞ্চে বসে চা খেতে খেতে ঝগড়া করছেন। ঝগড়ার কারণ চা বাবদ তাঁর দেনার পরিমাণ। পুটুন এক্সারসাইজ খাতাটি খুলেই রেখেছে এবং সেই অবস্থায় চা তৈরী করছে। তার দশ বছর মেয়ে কচুরাণী একটু তফাতে এঁটো গেলাস ধুতে ধুতে বারবার ভটচাযকে দেখছে এবং ফিক করে হেসে ফেলছে। তাতেও চোখ গেল ভটচাযের। আরও খাপ্পা হয়ে বললেন, তোর মেয়েকে বারণ কর পুটনা। আমি কি গাজনের সঙ যে রাস্তাঘাটে দেখলেই দাঁত বের করা? কাল বিকেলেও এমনি করে—ঘেঁটি ধরে দোব গঙ্গায় ঝপাস করে ছুঁড়ে।

পুটুন বলল, ফালতু কথা রাখুন ঠাকুরমশাই, ওবেলা দয়া করে তিন টাকা চার আনা মিটিয়ে দিয়ে যাবেন।

ভটচায প্রচণ্ড মাথা নেড়ে বললেন, আগের ছিল দু'টাকা বারো আনা। এখনকার এইটে নিয়ে

দু'টাকা পঁচাত্তর আর কুড়ি—তোর হল গিয়ে দু'টাকা পঁচানব্বই।

পটুন গম্ভীর হয়ে বলল, তিন টাকা পঁচিশ।

ভটচায লাফিয়ে উঠে বললেন, তিন টাকা পঁচিশ? কাল বললি দুই কুড়ি, আজ তিন পঁচিশ! ইস! গরমেণ্টো! হুকুম জারি কবলাম আর—ভটচায শূন্যে অদৃশ্য কাগজে খসখসে করে হুকুম লেখার ভঙ্গী কবলেন. তারপর সমর্থনের আশায় ঘুরেই গোপালকে দেখতে পেয়ে বললেন, গলাকাটার মজাটা দেখছ গোপাল!

গলাকাটা বলায় পটুন খাতাটা আছড়ে ফেলে চিলচ্যাঁচানি চেঁচাল। মুখ সামলে কথা বলবেন মশাই! ঠাকুর-টাকুর বলে আর খাতির করব না। বাকিতে নোলা ডুবিয়ে খেয়ে আবার বড় বড় কথা?

ভটচায এবার নিজের মূর্তি ধরলেন, গাড়ু আর ইটখানা তুলে পর্যায়ক্রমে তাক করতে করতে বললেন, ব্যাটা ছোট জাত! তোর চায়ে পেচ্ছাপ করে দিই, বল্ আরেকবার নোলা ডুবিয়ে খেয়েছি!

পটুন উঠে দাঁড়িয়েছিল। এক লাফে টাট থেকে বেরিয়ে ভেংচিয়ে বলল, খেয়েছ আর বলতে পারব না? অত যদি মুখের চোপা ছোট জাতের হাতে খেতে লজ্জা করে না? মোছলমানেও আমার চা খায়, জানো না? সেই এঁটো গেলাসে মুখ দিয়ে—

এবার ভটচায আর্তনাদের সুরে বললেন, শালা চামার! চোট্টা শালা। শালা ছোটলোক।

পটুন হুংকার দিয়ে এগোতেই গোপাল ধরল। ছিঃ পটুনদা। তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? যাও, ভিতরে গিয়ে বসো। বলে পটুনকে ঠেলে দিয়ে ভটচাযের কাছে গেল। চলুন তো ঠাকুরমশাই। চলুন আমার সঙ্গে।

সে নোলে ভটচাযকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলল। ভটচায ইটখানা নিয়েই পা বাড়ালেন। এঁটো গেলাসের ব্যাপারটা সবাই জানে। তবু অমন করে ঢাকঢোল বাজিয়ে বলায় দমে গিয়েছিলেন। ঘাটে খানিকটা ভিড় থাকে। সেই ভিড় হাসাহাসিও করছে।

নির্জনে পৌঁছেই চোখ মুছে ধরা গলায় বললেন, শালার পয়সা হয়েছে। সেই দেমাক তো? হুঃ সবাই জানে আমি ওসব মানিটানি না। কাজেই ওসব যত খুশি বল, গায়ে লাগে না। সামান্য চা—বলে কিনা নোলা ডুবিয়ে! রাগের কারণ তো সেটাই।

গোপাল হাসল। পটুনটা বড্ড টেটিয়াবাজ হয়েছে ঠাকুরমশাই!

ভটচায গলা চেপে বললেন, তোমারা জানো? শালা ওপারে বেশ্যালয়ে যায়? আরও ফিসফিস করে ফেব বললেন, হিরু ডোমের বউ রাতে ওর কাছে শুতে আসে? কালীর দিব্যি, আমি স্বচক্ষে দেখেছি। অ্যাদ্দিন হিরুকে ইশারা দিই নি। আজই দোব।

গোপাল বলল, ছেড়ে দিন। কী দরকার ঝামেলা বাড়িয়ে।

গোপাল ভটচাযের সামনে আজকাল সিগারেট খায়। শৈশবে উনি কিছুদিন প্রাইমারি স্কুলে মাস্টারি করেছিলেন। সেজন্যে গত বছর পর্যন্ত খাতির করে সামনে সিগারেট খেত না। সিগারেটের প্যাকেট বের করতেই ভটচায ইট নামিয়ে রেখে হাত বাড়িয়ে বললেন, ছোট্টলোকের সঙ্গে মুখ করে মুখটা পচে গেছে। দাও একটা, টানি।

ভটচাযকে সিগারেট খেতে দেখেছে বলে মনে পড়ে না গোপালের। সিগারেট দিল। দেশলাই জ্বেলে ধরিয়ে দিয়ে বলল, সিধে বাড়ি চলে যান ঠাকুরমশাই।

ভটচায টুকফুক করে কয়েকটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে ফ্যাঁচ করে হাসলেন। গোপাল বুঝল, রাগ কমে গেছে। মাথায় বরাবর ছিট। ইটটার দিকে তাকিয়ে বলল, ইট কী হবে ঠাকুরমশাই?

অব্যেস। দালানিতলার ওখানটায় বড্ড সাপ। ভটচায কবে সাপের পাল্লায় পড়েছিলেন এবং হাতে কিছু ছিল না। সেই থেকে অভ্যেস করেছেন, হাতে ইট। গোপাল মুচকি হেসে লাঠির কথা তুললে আবার ফ্যাঁচ করে হাসলেন। রথদেখা কলাবেচা দুই-ই হয়। এসো না, দেখাচ্ছি।

গোপালের হাত ধরে টানলে সে এগোল। ভটচায ইটটা তুলে নিয়ে হন্তদন্ত হাঁটতে থাকলেন। কাঁচা রাস্তার ধারে ভাঙাচোরা কয়েকটা শিবমন্দির আর আগাছার জঙ্গল। তার একটেরে ভটচাযের একতলা ইটের ঘর। পুরানো আমলের ছোট ইটের তৈরী বাড়িটা। দেয়ালে পলেস্তারা বলতে কিছু নেই। কালচে শ্যাওলা লেপ্টে আছে সবখানে। ফাটাফুটি কার্নিশে অশ্বত্থ, বট আর আগাছা গজিয়েছে।

বারান্দায় একটা কড়াই, একটা তোবড়ানো নীলরঙের প্লাস্টিকের বালতি ভর্তি জল। গোপাল অনেক দারিদ্র্য দেখেছে। কিন্তু এই দারিদ্র্যটা অস্বস্তিকর। বাড়িটা যদি মাটির হত, ভটচায যদি ভদ্রলোক না হতেন, তাহলে কিছুই মনে হত না। এই বাড়িটার দারিদ্র্য আরেক রকম সাংঘাতিক ভূত যেন। ভটচায যখন ষড়যন্ত্রসংকুল গলায় কথা বলছেন, গোপাল তখন তাকিয়ে আছে কার্ণিসের দিকে, যে কোন মুহূর্তেই ধসে পড়তে পারে। এমন একটা ঘরে বস্তুত রাতে থাকার কথা ভাবাই যায় না।

নোলে ভটচায হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন গোপালকে। ঘরের ভেতরটা আবছা অন্ধকার। সামনের দিকটা ছাড়া জানালা বলতে কিছু নেই। দৃষ্টি স্বচ্ছ হলে গোপাল যা দেখল, আতঙ্কে শিউরে উঠল।

একটা কড়িকাঠ ভেঙে গেছে। টালি নেমে রয়েছে। ঘরের মেঝে থেকে পাশাপাশি ইট সাজিয়ে উদ্ভট একটা থাম তুলে ভাঙা কড়িকাঠটার পড়ে যাওয়া আটকানো হয়েছে। ভটচাযের ইট রহস্যের কিনারা হল এতক্ষণে। বললেন, দু'খানা করে কাদা দিয়ে গেঁথে তুলেছি। শেষে ভাবলাম, ওতে হবে না। তাই দেখেছ, আর দু'খানা করে সাজাচ্ছি। ক্রমে ক্রমে কড়িকাঠটাতে ঠেকিয়ে দোব। খান নব্বুই ইট হলেই কাজ শেষ।

গোপালের ভয় করছিল। নেমে এলো উঠোনে। একটু হেসে বলল, একখানা করে ইট আনতে আনতে—

দুটো আঙুল দেখিয়ে ভটচায ফ্যাঁচ করে হাসলেন। দু'বেলা দালানিতলার দিকে যাই। দু'খানা করে আনি। তাও সিঙ্গিদের কারুর চোখে পড়লেই হয়েছে। ওদের তো জানো। কেলেঙ্কারির চূড়ান্ত করে ছেড়ে দেবে। অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়েছে বটে, কটু কথা সইতে পারি না হে গোপাল। মাথায় খুন চেপে যায়।

এই সময় ডানদিকের ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে ভিজে জবজবে এবং খাটো শাড়ি জড়ানো কেউ বেরিয়েই থমকে দাঁড়াল। ভটচায বললেন, আমাদের গোপাল। দীনুর ছেলে গো— অবিশ্যি দীনুকে তুমি দেখ নি। আমার সঙ্গে খুব খাতির ছিল।

নোলে ভটচাযের বউকে গোপাল কখনও দেখে নি, তা নয়। একেবারেই আলাপ পরিচয় নেই, তাও নয়। কতদিন ভুচুমাসির কাছ থেকে লাউ, কুমড়োর ফালি বা এটা-ওটা নিয়ে এসেছে। তবে তখন অত কিছু লক্ষ করে নি। আসলে শরীরে মানুষকে না দেখলে মানুষের চেহারা হয়তো দেখা যায় না। ভটচায-গিন্নির গায়ের রঙ ফর্সা। পাতাচাপা ঘাসের মতো। ভিজে কাপড় ঠেলে রক্ত মাংসের শরীর ঠেলে বেরিয়ে পড়েছিল। গোপাল সেদিকে তাকাতে লজ্জা পেল। দুঃখও।

এমন পড়ো-পড়ো ঘরে এমন একটা বউ ছিটগ্রস্ত আর নেশাখোর লোকের সঙ্গে শুয়ে রাত কাটায় ভাবতে তার খারাপ লাগছিল। নোলেবাবুর বৌ শংকরীর বয়স স্বামীর অর্ধেক তো বটেই। তিন্নির চেয়ে সামান্য বেশি হতে পারে। ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া পেলে আর প্রতি রাতে ভেঙে পড়ার ভয় নিয়ে কাটাতে না হলে চেহারা হত, ভাবলে সত্যিই খারাপ লাগে।

ঘোমটা টেনে এবং পিছনের ভিজে কাপড় টানতে টানতে শংকরী গোপালের সামনে দিয়ে বারান্দায় উঠল এবং ঘরে ঢুকল। ভটচায কোন রকমে বললেন, গরু-ছাগলের মতো বেঁচে আছি হে। এক কালে একটুকুন যজমানিও ছিল। শালারা হাজার কথা রটাতে তাও করে ঘুচে গেছে। জাতিভ্রষ্ট বলে পতিত করেছে। করুক। আমার লবডঙ্কাটি। কেউ পারছে? পারল আটকাতে?

গোপাল এ কথা জানত না। বলল, আজকাল ও সব চলে না।

ভটচায হঠাৎ এগিয়ে খপ করে গোপালের হাত ধরলেন। চাপা সুরে বললেন, তোমার তো পাটোয়ারিজির ছেলের সঙ্গে খুব ভাব দেখেছি। বল না একটু আমার জন্যে।

গোপাল অবাক হয়ে বলল, কি?

যদি ওদের গদিতে একটু কাজকম্মো দেয়। ক অক্ষর গো মুখ্যু তো নই। পেটে কিঞ্চিৎ বিদ্যে আছে।

গোপাল আনমনে বলল, আচ্ছা—দেখব।

দেখব নয় বাবা! এ কাজটা তোমাকে করতেই হবে। নোলে ভটচায ফিসফিস করে বললেন

ফের, তোমাকে লুকোব না। খুব টানাটানি— খুব। পঞ্চায়েত অফিসে সাহায্য দিচ্ছে সবাইকে। দরখাস্ত করেছিলাম। বললে আমার হবে না।

কেন? হবে না কেন? ফুঁসে উঠল গোপাল? সেজবাবু কি বাপের সম্পত্তি বিলি করছে? গভমেণ্টের জিনিস।

শুকনো শাড়ি পরে শংকরী বলল, খামাকো নিন্দে কোরো না তো! দু'কিলো মাইলো দেয় নি?

ভটচায খাপ্পা হলেন। মাইলো গরু ছাগলে খায়। চাইলাম টাকাকড়ি, দিলে দু'কিলো মাইলো। আর সাবাইকে যে গুনে টাকা দিলে শালারা।

শংকরী বাঁকা হেসে গোপালকে শুনিয়ে বলল, চোখেও দেখলাম না সেগুলো। কানেই শুধু শুনলাম।

ভটচায বললেন, পারতে খেতে? ওসব খায় ভদ্রলোকে?

না, ভদ্রলোকে গাঁজাগুলি খায়। বলে শংকরী বারান্দার একপাশে উনুন ধরাতে বসল।

ভটচায সামলে নিলেন। বললেন; মাইলো না ভুষি—সেগুলো হিরুকে দিয়েছি, তাতে ওর রাগ পড়ছে না। বুঝলে তো গোপাল রাগের কারণ?

শংকরী মুখ ঘুরিয়ে বলল, আজ্ঞে না। মাইলো দিয়ে গাঁজা চরস কিনে খাওয়া হয়েছে। সেখবর পাই নি ভেবেছো?

বেগতিক দেখে খ্যা খ্যা করে হাসতে লাগলেন নোলে ভটচায। গোপাল বলল, চলি ঠাকুরমশাই।

পিছন পিছন এসে আবার পাটোয়ারিজির কথাটা মনে করিয়ে দিয়ে গেলেন ভটচায। গোপাল রাস্তায় পৌঁছে ফোঁস করে শ্বাস ছাড়ল। কোথায় গিয়ে ঢুকেছিল - নোলে ভটচাযের এমন অবস্থা, আব এমন সব ব্যাপার থাকতে পারে, সে ভাবতেই পারে নি।

ঠাকুরপো! ঠাকুরপো।

গোপাল ঘুরে দেখল নন্দগোপালের বউ সুমতি টিউবওয়েলের কাছে দাড়িয়ে ওাকে ডাকছে। পায়েব কাছে রাখা একটা পেতলের ঘড়া। টিউবওয়েলে একজন মুনিশ চেহারার লোক জল খাচ্ছে। গোপাল যেতে যেতে লোকটার জল'খাওয়া হয়ে গেল। সে চলে গেলে সুমতি টিউবওয়েলটাকে ধুতে শুব করল। হাসি মাখানো মুখটা গোপালের দিকে।

গোপাল বলল, জল নেবে বউদি? সরো। টিপে দিই।

সুমতি চোখে ঝিলিক তুলে বলল, তোমাদের বাড়িতে কে এসেছে গো ঠাকুরপো?

কুটুম্ব। গোপাল এগিয়ে হাতল ধরল টিউবওয়েলের।

সুমতি পেতলের ঘডাটা নলের মুখে রেখে বলল, খিড়কিতে দাঁড়িয়ে আছে দেখলাম। কখনও তো আসতে দেখি নি। তাই জিজ্ঞেস করছি। বলে হঠাৎ সে মুখ ঘুরিয়ে খি খি করে হেসে উঠল।

গোপাল বলল, হাসছ যে?

ভাবলাম বুঝি ঠাকুরপো চুপি চুপি কোত্থেকে কাকে—

গোপাল হাসতে হাসতে জোরে মাথা দুলিয়ে বলল, ভ্যাট! তোমার খালি ওই। পোড়ামাতলার গনুমামা বলে একজন আসতো আগে। তুমি তাঁকে দেখ নি। তাঁর মেয়ে।

মামাতো বোন বুঝি?

কতকটা। গোপাল টিউবওয়েলের জলের শব্দের ভেতর বলল। আমাব নিজের মামা নেই। পাশের বাড়ি থাকেন ভদ্রলোক। পাড়াতুতো মামা।

সুমতি বলল, মেয়েটি বেশ।

বেশ মানে?

স্বজাতি হলে তোমার সঙ্গে মানাবে ভাল।

তোমার মাইরি খালি অ্যাবসার্ড কথাবার্তা!

গোপাল টিউবওয়েল থেকে সরে দাঁড়াল। জল ভর্তি হয়ে গেছে। সুমতি আঁচলের ডগায় কলসিটার কানা আর পেট মুছতে থাকল।

তারপর কলসি কাঁখে তুলে বলল, গিয়ে আলাপ করে আসব'খন। তা তুমি ওদিকে কোথায় গিয়েছিলে?

গোপাল দ্রুত বলল, আরে বোলো না। নোলেবাবুর পাল্লায় পড়ে—টানতে টানতে বাড়ি নিয়ে গেল। -

সুমতি পা বাড়িয়ে বলল, তোমাকে একটা কথা বলি ঠাকুরপো। ঠাকুরমশাইয়ের সঙ্গে মাখামাখি কোরো না। লোকটা ভাল না।

গোপাল পিছনে হাঁটতে হাঁটতে বলল, সে আর আমি জানি না!

কি জানো?

গোপাল অবাক হল। তোমার মাইরি সব সময় হেঁয়ালি, বউদি!

রাস্তা থেকে একফালি পায়ে চলা রাস্তা নেমে গেছে দুধারে রাঙচিতা বেড়া নিয়ে। তারপর একটা বাঁশবন। বাঁশবনের ভেতর বৃষ্টিভেজা প্যাচপেচে কাদা ছড়িয়ে আছে। রাস্তার ফালিটায় একটু একটু জল কাদা। সুমতি কাদা বাঁচিয়ে পাশ কাটাতেই কবেকার ওপড়ানো এতটুকুন একটা শেয়ালকাঁটাব ঝাড় পায়ের কাছে আটকে গেল। সুমতি আর্তনাদের সুরে বলল, ঠাকুরপো!

গোপাল গিয়ে টানাটানি করে কাঁটার ঝাড়টা ছাড়িয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলল। সুমতি রাগ করে বলল, নির্ঘাত ওই বেশ্যা মাগিটার কাজ! রোজ দু'বেলা টিউবেলে জল আনতে যাই জানে। তাই রাস্তায় কাঁটা ফেলে রাখে। পরশু আস্ত খেজুরকাঁটার ডাল ফেলে রেখেছিল।

গোপাল বলল, নাও! তোমার মাইরি খালি—

সুমতি ফিসফিস করে বলল, তোমার দিব্যি ঠাকুরপো! ওই নষ্টা মাগিটা আমার সর্বনাশ না করে তো দেখ কি বলেছি! তবে আমিও বাবা কম নই। বুঝিয়ে দোব সময় মতো।

হাঁটতে হাঁটতে গোপাল বলল, কে?

সুমতি গলার ভেতর বলল, কে আবার? ওই রাঁড়ি বেহুলা।

গোপাল বুঝতে পারল। ওদের পাশের বাড়ির বিধবা স্ত্রীলোকটির কথাই বলছে সুমতি। অমর মালাকার গত বছর মারা গেছে সাপের কামড়ে। শোলার কাজে খুব নাম ছিল এ তল্লাটে। রাজবাড়ির প্রতিমার সাজ প্রতি বছর তার হাতেরই তৈরী। আজকাল রাজাদেরও অবস্থা সঙিন। এখনকার দিনে শোলারও বড় অভাব। সব বিল-খাল-জলা বাঁধে বাঁধে আবাদ করা হয়েছে। শোলা খুঁজে পাওয়া সমস্যা। ধানক্ষেতের ভেতর টুঁড়ে টুঁড়ে কয়েক গোছা করে যোগাড় করে বেড়াত মালাকার। গত বছর ভাদ্রমাসে পুবের নিচু মাঠে ধান ক্ষেতের ভেতর শোলা কাটতে গিয়ে কেউটে সাপে কামড়েছিল। ওপারেব হাসপাতালে নিয়ে যাবার আগেই মারা যায়।

মালাকারের বউয়ের নাম রাধারাণী। শীতলডিহির ধারণা, মালাকার তাকে ভাগিয়ে এনেছিল বীরভূমের মল্লারপুর এলাকা থেকে। ওদিকে এক সময় ঝুমুর দলের খুব রেল্লা ছিল। মোতিগঞ্জের রাজবাড়িতে ঝুলনের সময় বাইরের চত্বরে ঝুমুর দলের আসর বসত। মেয়েগুলো কোমর দুলিয়ে নাচত গাইত। সে নাকি অশ্লীলতার চূড়ান্ত। মেয়েগুলো আসলে ছিল বেশ্যা।

রাধা নাকি সেই ঝুমুর মেয়েদেরই পেটে জন্মেছিল। কোথায় কোন্ বাবুর কাছে থাকত। ভাগিয়ে এনেছিল অমর মালাকার।

তবে এও সত্যি আজ অব্দি রাধার বাপের বাড়ির লোকের কোন খবর নেই। চার বছর এসেছে মালাকারের বউ হয়ে। তিন বছর পর মালাকার মারা গেল অপঘাতে। তবু কেউ আসে নি।

তাই অমর মালাকারের মৃত্যুর পর রাধা বিপদে না পড়েছিল এমন নয়। শেষে একটা অদ্ভুত পেশায় ঢুকে জোরালো মাথা তুলেছে।

এই সীমান্ত জেলায় পদ্মা পেরিয়ে প্রচুর বিদেশি জিনিষপত্তর আসে। লোকে বলে 'ফরেং মাল'। গঙ্গার ওপারে মোতিগঞ্জে ওই সব ফরেং মালের ঘাঁটি আছে। রাধা কিভাবে ঘাঁটিদারদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল কেউ জানে না। রেডিমেড ফরেং পোশাক নিয়ে আসে। ছিট, প্যান্ট, ফ্রক, নাইটি পর্যন্ত। ঝিলঝিলে ছোট্ট একটা বোঁচকা বগলদাবা করে সে বেরিয়ে যায় সেই কাক-জাগা ভোরবেলায়। গাঁলয়ালে বেচতে যায়। ফিরে আসে সন্ধ্যাবেলা। তখনও তাকে ভোরবেলাকার মতো টাটকা দেখায়। ঠোঁটে বাঁকা হাসি। বেপরোয়া চাউনি। হাতে একটা মিটার মাপা সরু কাঠের স্কেল। এপারের গাঁওয়ালে গেলে সন্ধ্যায় ফেরার মুখে ঘাটে ওখানে চা না খেয়ে আসবে না। পুটুনের চায়ের দোকানে সন্ধ্যাবেলা গেলেই তাকে

দেখা যাবে। পুরুষমানুষদের ভেতর উবু হয়ে বসে আছে। ট্যাকর ট্যাকর কথা বলছে। শুধু তাই নয়, কথায় কথায় পুরুষমানুষের মতো শালা-বাঞ্চোত পর্যন্ত!

গোপাল বার দুই প্যান্টের কাপড় কিনেছিল রাধার কাছে। একটা জাপানি ঘড়ির বরাত দিয়েছিল। রাধা হয়তো ভুলে গেছে। গোপালেরও খেয়াল ছিল না। তার হাতে যে ঘড়িটা আছে, অরুণের সঙ্গে কলকাতা গিয়ে কিনেছিল। সুমতির কথায় হঠাৎ মনে পড়ে গেল বরাত দেওয়া জাপানি ঘড়ির কথাটা।

বাঁশবনের শেষ হয়েছে একেবারে গঙ্গার পাড়ে। একটু আগে নন্দগোপালের টালির বাড়ি, মাটির দেয়ালের ঘর। বাইরে থেকে বোঝবার উপায় নেই, পলেস্তারা চুণকামে ইটের বলে ভুল হয়। বাড়িতে কুয়ো থাকায় টিউবওয়েল দেবার গরজ নেই তার। কিন্তু সুমতি কুয়োর জলটা পছন্দ করে না খেতে। অতখানি রাস্তা ভেঙে সদর রাস্তায় গিয়ে টিউবওয়েল থেকে দু'বেলা জল সে আনবেই— যত দুর্যোগই হোক।

সুমতি পিছু ফিরে ডাকল, দাঁড়ালে যে? এসো ঠাকুরপো।

গোপাল পা বাড়িয়ে বলল, মিতে বুঝি অফিস গেছে?

নন্দগোপালের সঙ্গে নামের মিল থাকায় সে তাকে মিতে বলে। নন্দগোপালের ওপারে জে এল আরও অফিসে পিওনের চাকরি করে। আগে ছিল ওদিকেব একটা ব্লকে কৃষি অফিসারের পিওন, তদ্বির করে বদলি বাগিয়েছে। খুব চালাক চতুর যুবক। বয়সে গোপালের দু-এক বছরের বড়।

সুমতির শাশুড়ি বারান্দায় বসে নাতিকে দোল খাওয়াচ্ছিল। গোপালকে দেখে বলল, আয় ডাকরা। তোর মজা দেখাচ্ছি।

গোপাল হাসল। কি হল মাসিমা?

নন্দগোপালের মা সাবিত্রী বলল, হ্যাঁ রে বাঁদব। নন্দ বলছিল, সেজবাবুর লাই পেয়ে মৈনুল আবার জোর করে ধান বুনেছে তোর জমিতে? তুই ওকে জব্দ করতে পাবিস নে? নন্দ বলল, একটু মুখের কথা বলে দেখুক, আমি কী করি!

সাবিত্রী জমি-অন্ত প্রাণ। এ সব ব্যাপারে সে শীতলডিহির কূটবুদ্ধি পুরুষদেরও কান কাটতে পারে। নন্দর জমি তত বেশী নেই। যতটা আছে, তার দেখাশুনা তার মা-ই করে থাকে। হাতে একটা ছিপটি নিয়ে মাঠে চলে যায়। জমির আলে বসে মুনিশদের তম্বি করে। সাব, বীজ, লাঙ্গল, মুনিশ— সবই সাবিত্রীর তদারকে।

গোপাল নন্দর ছেলেকে একটু আদর করে সিমেন্টের বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসল। সিগারেট ধরাল। সাবিত্রী তার সেই জমিটা নিয়ে বকবক করতে থাকল। কানে নিচ্ছিল না গোপাল। সুমতি ঘড়াটা রেখে কাপড় বদলে বেরিয়ে বলল, মা! আজও মাগি কাটা ফেলে রেখেছিল বাস্তায়। ঠাকুবপোকে জিজ্ঞেস করুন।

সাবিত্রী গম্ভীর হয়ে বলল, শীতলডিহিতে কী মানুষ আছে আর? থাকলে পরে কবে মাগির চুলেব ঝুঁটি ধবে মারতে মারতে— তা তোমাকেও বলি বাপু, টিউবেলের জল কি সগ্গের অমৃতি? এতটা কাল কুয়োর জল খেয়েই আমরা বেঁচে আছি। তোমাব হয়েছে এই এক ফ্যাশান।

শাশুড়ি বউয়ে খুব এক প্রাণ এক মন, তা গোপাল জানে। বলল, বউদি! কেন মিছিমিছি মাসিমাকে খেপাচ্ছ?

মিছিমিছি? সুমতি পাশের বাড়িটার দিকে আগুনজ্বালা চোখে তাকিয়ে চড়া গলায় বলল, আঁটকুড়িব কাণ্ডটা দেখলে না —কত বড় কাঁটা? কাপড় ছিঁড়ে ফালাফালা। পায়ের তলাতেও ফুটত। ভাগ্যিস পায়ে স্লিপাব ছিল।

সুন্দরী যুবতীর মুখে খিস্তি শুনলে গোপালের মেজাজ বিগড়ে যায়। কিন্তু আজ মেজাজ দারুন ভালো। বলল, কী হচ্ছে? ছেড়ে দাও!

সুমতি শাশুড়ির লাই পেয়ে গেছে, অন্তত এ ব্যাপারে পেয়েই থাকে। বলল, ছেড়ে দেব? দেখ না কি করি আজ! বেশ্যা মাগি! ছোটলোক! বাজারি। গাঁয়ে গাঁয়ে ইয়ে করে বেড়াচ্ছে!

গোপাল হাসল। কাকে শোনাচ্ছ? সে তো এখন গাঁওয়ালে।

এবার সাবিত্রী ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করে বলল, চুপ কর! আমরা কি ওর মতো ছোটলোক? ভদ্দরলোকের

যেমন হওয়া উচিত, তেমনি জবাব দোব। নন্দকে আসতে দাও আজ।

সুমতি ক্লান্তভাবে বলল, বসো ঠাকুরপো, চা করি।

হাই তুলে গোপাল উঠে দাঁড়াল। নাঃ। চা খাব না। বলে সে বেরিয়ে এলো। বাঁশবন দিয়ে ঘুরে গঙ্গার ধারে যেতে যেতে খুব রাগ করে মনে মনে বলল, লোকেদের শালা খালি গণ্ডগোল লেগেই আছে। তারপর তাদের বাড়ির পিছনে বেগুন ক্ষেতটার শেষে ফুলে ভরা আকন্দের জঙ্গলের ধারে জলের শিয়রে হিজলগাছটার তলায় তিন্নিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখামাত্র বুকটা ধড়াস করে উঠল। তিন্নিকে জলের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে— অথবা অমন একলা দেখে।....

কিন্তু বৃষ্টিটা আসবার আর সময় পেল না।

আচমকা পিছন থেকে দড়বড়িয়ে এক জোরালো বৃষ্টি। চারিদিক ঝাপসা। ছাগলের চিৎকার। মানুষের চিৎকার। একমুহূর্তে হুলুস্থুলু। গোপাল হকচকিয়ে গিয়েছিল। ঝাপসার ভেতর একটা হাত ওপরে তুলে, সম্ভবত চোখ বাঁচিয়ে চলা ছুটন্ত তিন্নিকে আঁচ করেই সে ফুঁসে উঠল এবং রুখে দাঁড়ানোর ভঙ্গীতে ভিজতে লাগল।

বাঁদিকে ভরা গঙ্গার ওপর গাঢ় ছাইরঙা পর্দায় ওপারের জৈন মন্দিরের পেতলের চুড়োটা ঢেকে গেছে। মোতিগঞ্জের দালান বাড়িগুলো দীর্ঘ কালো পেঁচার মতো দেখাচ্ছে। ভিজতে ভিজতে আস্তে আস্তে হাঁটছিল গোপাল। বেগুনক্ষেত ঘুরে ফুলে-ভরা আকন্দের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে রাগী মূর্তিতে সে খিড়কির দরজার কাছে গিয়ে খঞ্জনী আর গানের এলোমেলো সুর শুনতে পেল।

বাড়ি ঢুকলে ভুচুমাসি চিলচাঁচানি চেঁচাল। অই, অই! দেখছ? দেখছ বাড়খানা? এই সেদিন উঠল সর্দিজ্বর থেকে। আবার বাহাদুরি করে ভিজে বেড়ানো হচ্ছে!

গোপাল কানে নিল না। বারান্দা দিয়ে এগিয়ে বাইরের ঘরের দরজায় উঁকি মারল। অভয় বৈরাগী আর তার অন্ধ মেয়েটা খঞ্জনী বাজিয়ে গান ধরেছে। জ্ঞানেশ্বর চেয়ারে চোখ বুজে বিভোর হয়ে গান শুনছেন।

ভুচুমাসি তখনও চেঁচাচ্ছে। নিমুনি হয়ে মরবি যে হতভাগা? গা-মাথা মুছবি না কি?

গোপালের মনে হল, জ্ঞানেশ্বর আর তাঁর মেয়ে আসার পর থেকে ভুচুমাসির দাপটটা বেড়ে গেছে। তার ওপর এত বেশি কর্তৃত্ব ফলানোর সাহস ভুচুমাসির সচরাচর থাকে না। ভুচুমাসি এগিয়ে এসে খপ করে তার কাঁধ আকড়ে ধরে খ্যা খ্যা করে হেসে ফেলল হঠাৎ।

হাসির কারণ বুঝতে পারল না গোপাল। বলল, ছাড়!

ভুচুমাসি বলল, বেলা হয়েছে। চান-টান করবি তো করে নে এইসঙ্গে। বলে বাইরের ঘরে ঢুকল জ্ঞানেশ্বরকে তাড়া দিতে।

গোপাল ঘুরেই দেখল ভিজে কাপড়ে তিন্নি থামের ওপাশে দাঁড়িয়ে। কাঁধে তোয়ালে। চোখে চোখে পড়তে সে হাসল। গোপালদা, গঙ্গায় চান করা যায় না?

গোপাল বলল, ঘাট দেখে কি মনে হল?

তিন্নি চমকানোর ভান করে বলল, ও মা! আপনি দেখতে পেয়েছিলেন নাকি?

গোপাল বলল, হুঁ।

তিন্নি মুগ্ধ হবার ভঙ্গীতে বলল, ঘাটটা খুব সুন্দর কিন্তু। জল খুব ডিপ নাকি গোপালদা?

ডিপ। তবে ঢালু পাড়। সাঁতার জানলে অবিশ্যি ভয় নেই।

তিন্নি উৎসাহ দেখাল। প্ররোচনা দেওয়ার মতো চাপা গলায় বলল, চলুন না গোপালদা! আপনি তো সাঁতারে চ্যাম্পিয়ান। আমি আপনার সাহসে নামব।

ভুচুমাসি বা জ্ঞানেশ্বর পাছে বাধা দেন, তাই গোপাল বারান্দার তার থেকে তোয়ালেটা টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেল খিড়কি দিয়ে। তিন্নিকে ডাকার দরকার মনে করল না। খানিকটা এগিয়ে সে পিছু ফিরল। ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে তিন্নি এগিয়ে আসছে। অনেকক্ষণ পরে গোপালের মন আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল

কিন্তু ঘাটের মাথায় হিজলতলায় পৌঁছে গোগাল একটু দ্বিধায় পড়ে গেল। তার পরনে আঁটো জিন্‌সের প্যান্ট, গায়ে শাদা গেঞ্জি। হাতের ঘড়িটা খুলে রেখে আসতে ভুল করেছে। তিন্নির সামনে

প্যান্ট খোলাটা কেমন দেখাবে ভেবে পাচ্ছিল না সে।

ঘাটে জনপ্রাণীটি নেই। এ ঘাটে পাড়ার লোকেরাও স্নান করতে আসে। কিন্তু এখনও তাদের সময় হয় নি। দুপুর সবে গড়াবে যখন, তখন থেকে তারা আসতে থাকবে।

তিন্নি হিজলগাছের গুঁড়ি সেঁটে দাঁড়ালে গোপাল বুঝল, ও এ সব গ্রামীণ অভ্যাসে একান্ত নয়। বৃষ্টিতে ভেজা, জল-কাদায় হাঁটা, নদ-নদীতে নামা—কিংবা আরও অনেক কিছু ব্যাপার আছে, যা গ্রাম জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য। অরুণের বোনদের মতো হাবভাব তিন্নির। গোপাল একটু হাসল। ব্যাপারটা তার পছন্দসই বলেই।

তিন্নি বলল, আপনি আগে নামুন। আপনার সাঁতার কাটা দেখি।

গোপাল ততক্ষণে উপায় বের করেছে। সে কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে প্যান্ট আর গেঞ্জি খুলল। ঘড়িটা খুলে তার ভেতর ঢুকিয়ে গাছটার গোড়ায় পুঁটুলি পাকিয়ে রাখল। তারপর মুচকি হেসে বলল, চোখ বুজে থাকতে হবে একটু।

অবাক তিন্নি বলল, কেন গোপালদা?

সার্কাস দেখাব।

বেশ। 'বুঁজলাম।'

উঁহু, ফাঁক হয়ে আছে। আরও টাইট।

এবার?

গোপাল তোয়ালেটা একটানে খুলে তিন্নির গায়ের ওপর ফেলেই দৌড়ে গেল ঘাটের দিকে। শূন্যে একপাক ঘুরে ঝপাং করে জলে পড়ল। তোয়ালেটা আচমকা গায়ে পড়তেই তিন্নি আঁতকে উঠে চোখ খুলে ফেলেছিল। সেই চোখ খোলাই রইল। গোপালের শূন্যে ডিগবাজি সে দেখেছে। কিন্তু যতটা উচ্ছ্বসিত হওয়া উচিত ছিল, হল না। শুধু বলল, বাঃ! জলের শব্দে শুনতে পেল না গোপাল।

স্রোতের সীমানায় গিয়ে সাঁতার কাটতে কাটতে ফিরে এলো গোপাল। এক বুক জলে দাঁড়িয়ে চোখের জলটা মুছে থুথু ফেলে তাকাল ঘাটের দিকে। তিন্নির প্রশংসা চাইছিল সে

তিন্নি তখনও দাঁড়িয়ে। গোপাল চেঁচিয়ে বলল, কি হল? তুমি নামবে না?

ভয় করছে।

ভাট! আমি তো আছি। চলে এসো।

তিন্নি তার এবং গোপালের তোয়ালে গাছের গোড়ায় রেখে দ্বিধান্বিত ভাবে ঘাটে এলো। গোপাল তার গলার চেনটা ঘষতে ঘষতে বলল, পোড়ামাতলার কাছেই তো গঙ্গা। তাই না?

তিন্নি ভিজে মাটিতে বসে জলে পা ডুবিয়ে বলল, কাছে কোথায়? প্রায় এক মাইল।

এক মাইল কোন ডিসট্যান্স নয়। কিন্তু পুকুর তো মনে পড়ছে।

তিন্নি ভুরু কুঁচকে হাসল। আছে তো। আমি কি পোড়ামাতলায় থেকেছি যে পুকুরে সাঁতার কাটব?

গোপাল অবাক হয়ে বলল, সে কি!

ছোটবেলা থেকে বর্ধমান টাউনে থেকেছি।

কে আছে সেখানে?

মামাবাড়ি। তিন্নি জল ছেটাতে ছেটাতে বৃষ্টির ভেতর বলল, আমার যখন ছ'বছর বয়স তখন মা মারা যান। তাই বাবা আমাকে মামার কাছে রেখে আসেন।

তাই বল। গোপাল উপুড় হয়ে জলে ভেসে দুটো হাত ছড়িয়ে সাঁতার কাটার ভঙ্গীতে তিন্নির অনেকটা কাছে চলে এলো।

তিন্নি বলল, কই, সার্কাস দেখাবেন বলছিলেন, দেখান।

দেখিয়েছি তো। গোপাল দু'হাতে মুখ-চোখের জল মুছে জলের ভেতর হাঁটু দুমড়ে বসে বলল, তোমার ভাল নামটা কি?

অনুরাধা।

অনুরাধা? শব্দটা গোপাল উচ্চারণ করল। গঙ্গার জল ও বৃষ্টির ভেতর শব্দটা টংটং করে বাজছিল।

হুঁ—কই, সাঁতার কাটুন দেখি।

তুমি নেমে আসছ না কেন? ডুবে যাবে না আমি থাকতে।

সাহস সঞ্চয় করতে দিন। ততক্ষণ আপনি—

গোপাল জোরে পিছিয়ে গেল বুক চিতিয়ে সাঁতার কাটতে। বৃষ্টিটা আবার জোরে এলো। গঙ্গার বুকে দুলন্ত আবছায়ার ভেতর গোপালের মাথা আর দুটো হাত সিল্যুট হয়ে নড়াচড়া করতে থাকল।

একটু পরে সে আবার ঘাটে ফেরার সময় দেখল, তিন্নি অল্প জলেই গলা ডুবিয়ে বসেছে। গোপাল কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল।

তিন্নি ওপারের দিকে তাকিয়ে বলল, ওইটে বুঝি মোতিগঞ্জ?

ওই তো!

ঝুলনের মেলা বসেছে ওখানে?

গোপাল হেসে ফেলল। আবার কোথায় বসবে?

আমরা কখন ঝুলন দেখতে যাব, গোপালদা?

মাঝে মাঝে কচি মেয়ের মতো কথা বলে তিন্নি। গোপাল সেটা লক্ষ্য করেছে। সে ঝুলনের মেলার বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করল। তার মধ্যে বার তিন-চার মাথা ডোবানোর ছলে দু'হাতে মাথায় জল ছেটাল তিন্নি। খোঁপাটা খুলে ফেললে গাঢ় রঙের জলের ওপর অনেকটা জায়গা জুড়ে কালো চুল ছড়িয়ে গেল। গোপাল মুগ্ধ দৃষ্টিতে চুলগুলো দেখছিল।

হঠাৎ হুড়মুড় করে জল ভেঙে তড়বড়িয়ে উঠে গেল তিন্নি। গোপাল জোরে হেসে উঠে বলল, কি হল?

তিন্নি ঘাটের মাথায় উঠে অপ্রস্তুত ভঙ্গীতে বলল, কি যেন ঠেকল।

কুমির ভাবলে বুঝি? গোপাল আরও হেসে বলল, কুমির নেই তা নয়। সেদিন নাকি তুফানগঞ্জের ঘাটে কাকে কুমিরে ধরেছিল। গুজব হতে পারে। সত্যি হতেও পারে।

তিন্নি বলল, ব্যস! হল তো? যাও বা সাহস করে নামতাম এর পরে আর নয়।

তুমি বড় ভীতু অনুরাধা!

এই! উঠে আসুন। সত্যি বলছি, কি একটা ঠেকেছে গায়ে।

গোপাল আবার পিছিয়ে গেল চিত সাঁতার দিতে দিতে। কিছুটা দূরে গিয়ে সে তিন্নিকে দেখার চেষ্টা করল। বৃষ্টির আবছায়ার ভেতর হিজলতলায় দাঁড়িয়ে আছে তিন্নি। চুলে তোয়ালে জড়ানো। গোপাল ইচ্ছে করেই মাঝগঙ্গার দিকে এগিয়ে গেল। দুর্ধর্ষ একটা জেদ ভর করেছিল তাকে।

গোপাল যখন ঘাটে ফিরল, তখন টিপটিপিয়ে বৃষ্টি ঝরছে। খুব আশা করেছিল, তিন্নি দাঁড়িয়ে থাকবে ঝাঁকড়া হিজল গাছটার তলায়। কিন্তু সে নেই। গোপালের রাগ হল।

বাড়ি ফিরে দেখল, তিন্নি হাল্কা নীল একটা শাড়ি আর শাদা ব্লাউস পরে চুলে চিরুনি টানছে। জ্ঞানেশ্বরের গানের আসর ভেঙে গেছে। বৈরাগী আর তার অন্ধ মেয়েটা বাইরের ঘরের বারান্দায় প্রসাদ পেয়েছে। জ্ঞানেশ্বর তাদের খাওয়া দেখছেন। ভুচুমাসি রান্নাঘর আর ভাঁড়ার ঘরের মাঝখানের জায়গায় পিঁড়ি পেতে খাওয়ার ব্যবস্থা করছে। কাজে ব্যস্ত থাকার মধ্যেই গোপালের উদ্দেশে সে বলল, এবার পড় শয্যাগত হয়ে। আর আমি ঘুরেও তাকিয়ে দেখছি না বাবা! নিজের দোষে অসুখ বাধিয়ে শেষে—ভেংচি কাটল সে, মাসি! অ মাসি গো! মাথা টিপে দাও। পা ডলে দাও!

তিন্নি লুকিয়ে হাসল। গোপালের দিকে চোখ। গোপাল গম্ভীর হয়ে ঘরে ঢুকল কাপড় বদলাতে।

গোপাল পাজামা-পঞ্জাবি পরে চুল আঁচড়াচ্ছে ড্রেসিং টেবিলের সামনে। তখন দরজা আড়াল করে তিন্নি দাঁড়াল। চাপা গলায় বলল, রাগ করেছেন গোপালদা?

গোপাল বলল, কেন? রাগ করব কেন?

আমি আপনাকে ফেলে চলে এসেছি বলে—

গোপাল একটু হাসল। চলে আসবে না তো কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজবে নাকি?

না—আমি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। পিসিমাকে বলতে আসছিলাম—আপনি অমন করে দূরে চলে গেলেন।

এই তো ফিরতে পেরেছি। বলে গোপাল পাউডার ঢালতে থাকল ঘাড়ে। ঢালা হলে বলল, পাউডার নেবে তো?

তিন্নি বলল, নাঃ!

জ্ঞানেশ্বরের সাড়া পাওয়া গেল দরজা থেকে। জ্ঞানেশ্বর বললেন, কদ্দূর হল রে ভুচু? বোরেগির মতো আমাকেও একটু প্রসাদ দে এবারে। একটু বেরুব। বৃষ্টি থেমে গেছে।

ভুচুমাসি বলল, এই তো আসন করে দিয়েছি দাদা। এসে বসে পড়লেই হল।

জ্ঞানেশ্বর মধুর স্বরে ডাকলেন, গোপাল কোথায় বাবা? অ গোপাল!

গোপাল ঘরের ভেতর থেকে বলল, বসুন মামাবাবু। যাচ্ছি।

তিন্নি! আয়।

তিন্নি বলল, আমি পিসিমার সঙ্গে খাব। তোমরা বসো।

ভুচুমাসি জোরালো স্বরে বলল, না, আমার অনেক দেরি। সব সামলাব, গোছাব। চান করতে যাব—তবে। আয় দিকিনি মা। টাউনে সকাল-সকাল খাওয়া অভ্যেস। পিত্তি পড়ে গেছে এতক্ষণ।

জ্ঞানেশ্বর পিঁড়িতে জাঁকিয়ে বসে বললেন, হ্যাঁ, বর্ধমান থেকে এসে ওর একটু অসুবিধে হচ্ছে, বুঝতে পারি। নিজে বাঁধতেও তো শেখে নি। এদিকে আমাকেও সেই সাড়ে সাতটায় লোকাল ধরে কাটোয়া ছুটতে হয়। ফিরতে ফিরতে রাত আটটা হয়ে যায় কোন কোন দিন। ওর দুর্দশার চূড়ান্ত।

ভাতের গ্রাস মুখে রেখে ফের বললেন, এম. এ. পড়ার জন্যে জেদ ধরেছিল। কিন্তু কলকাতা গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে দেখলাম, হোস্টেল খরচের যা বহর—তাও সিট পাওয়া অনিশ্চিত। পলিটিক্সের ব্যাপার—বুঝলে না? চেনা-জানা এম এল এ বা তেমন নেতাগোছের কেউ থাকলে এক কথাতেই—তো ভেবে দেখলাম, যথেষ্ট হয়েছে আমাদের মতো লোকের ঘরে। চাকরি-বাকরির পক্ষপাতি আমি নই। মেয়েদের চাকরি করাটা ঠিক না।

ভুচুমাসি সায় দিয়ে বলল, বিয়ের যুগ্যি মেয়ে চাকরি করবে কেন বাবা বেঁচে থাকতে? তুমি যদি অক্ষম হতে, তাও কথা ছিল।

গোপাল বলল, বর্ধমান য়ুনির্ভার্সিটিতে কি হল? সেখানে এ্যাডমিশন নিল না কেন?

জ্ঞানেশ্বর খাওয়া থামিয়ে বললেন, অসুবিধে প্রচণ্ড। তিন্নির মামা মারা যাওয়ার পর ওর মামাতো ভাইদের মধ্যে ব্যবসা নিয়ে লাঠালাঠি বেধেছিল। বুঝলে না? ভাই যদি বৈরী হয়, তাহলে তার মতো ডেঞ্জারাস কেউ থাকতে নেই। ভীষণ অশান্তি একেবারে। ভাগ্যিস তিন্নির পরীক্ষাটা হয়ে গিয়েছিল। শেষে লিখে পাঠাল, অসুবিধে হচ্ছে। তখন গিয়ে নিয়ে এলাম।

দুপুরে খাওয়ার পর ভাত-ঘুমের অভ্যাস গোপালের। শুয়ে চোখ বুজে সিগারেট টানছিল সে। হঠাৎ মনে হল মাথার খুলির ভেতর অনেকটা জায়গা খালি হয়ে গেছে যেন, আর সেই শূন্যতায় ঢিলের মতো কি একটা জিনিস বারবার গড়িয়ে পড়ছে।

তিন্নির ব্যাকগ্রাউণ্ড গোপালের মাথায় বাড়ি মেরেছে।

লেখাপড়ার ব্যাপারটা প্রেম-ভালবাসার বেলায় বাধা হতে পারে কি না, সে এতদিন ভাববার সুযোগ পায় নি। অরুণ গঞ্জে তার চেয়ে শিক্ষিত কিছু মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছে বটে, কিন্তু প্রত্যেকটা মেয়েই আহা-মরি কিছু নয়। তাছাড়া অরুণ বড়লোকের ছেলে। প্রচুর টাকা, ব্যবসা। তার ওপর দেখতেও রাজপুত্তুরের মতো—দারুণ ফর্সা আর ঝকমকে চেহারা।

গোপালের বিশ্বাস তিন্নি অন্য ধাতের মেয়ে। অরুণের মতো ছেলেকেও সে পাত্তা দেবে না তো এই গোপাল। অবশ্য গোপালের স্বাস্থ্য ভাল। বিনোদ খান্নার সঙ্গে তাকে তুলনা করা হয় প্রায়ই। কিন্তু তিন্নি য়ুনিভার্সিটিতে এম এ পড়ার জেদ ধরেছিল জেনেই গোপাল ঘাবড়ে গেছে। এ সব পণ্ডিতি ধাঁচের মেয়ের সঙ্গে কোন গোপন সম্পর্কের কথা ভাবাই যায় না।

জ্ঞানেশ ছাতি নিয়ে কোথায় বেরিয়েছেন। এই শীতলডিহিতে তাঁর অনেক চেনাজানা লোক থাকা সম্ভব। কিছুক্ষণ আগে বাইরের বারান্দায় ভুচুমাসি আর তিন্নির টুকরো কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল। তারপর আর সাড়াশব্দ নেই। গোপাল অস্থির হয়ে উঠে পড়ল।

অকারণ গলা চড়িয়ে ডাকল সে। মাসিমা! মাসিমা!

খিড়কির দিক থেকে সাড়া এলো। কি হল? চেঁচাচ্ছিস কেন রে?

গোপাল গিয়ে দ্যাখে, ভুচুমাসি ডোবার ঘাটে বাসন ধুচ্ছে। তিন্নি সেখানে দাঁড়িয়ে। গোপাল বলল, আমি বেরুচ্ছি।

ভুচুমাসি বলল, সে কী রে! আমাদের নিয়ে যাবে কে তবে?

কোথায় নিয়ে যাব?

ভুচুমাসি হাসতে লাগল। তিন্নি একটু হেসে বলল, বাঃ! এর মধ্যেই ভুলে গেলেন? ঝুলন দেখাতে নিয়ে যাবেন বলেছিলেন না?

গোপাল কথার মধ্যে বলল, কিন্তু বাড়িতে থাকবে কে? গেলেই চোর ঢুকবে। এখানে আজকাল যা চোর-ডাকাতের উপদ্রব।

ভুচুমাসি হাতের কাদা ধুতে ধুতে বলল, গ্যাঁদাকে খবর পাঠিয়েছি। এলো বলে।

গ্যাঁদা একসময় এ বাড়িতে মাহিন্দারি করত। বাবার মৃত্যুর পর কারুর পরামর্শ না মেনে গোপাল সব জমি চাষের ব্যবস্থা করেছে। গ্যাঁদাও বিঘে তিনেক ভাগে চাষ করে। খুব বিশ্বাসী লোক সে। সাহসী এবং দুর্দান্ত বলে নামডাকও আছে তার। গোপাল আস্তে বলল, গ্যাঁদা আসতে আসতে বিষ্টি এসে যাবে।

বলে সে ঘরে ফিরে গেল। ভুচুমাসি সঙ্গ না ধরলে খুব ভাল লাগত গোপালের। তিন্নিকে অরুণদের বাড়ি নিয়ে যেত। ওর বোনদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিত। ওরা সবাই শিক্ষিত মেয়ে। অরুণের মতো ফেল-করা নয়।

আকাশ আজ এ বেলা একটু পরিষ্কার। উত্তরের দিকটায় চাপ চাপ খানিকটা মেঘ আছে। কিন্তু বাকি আকাশ জুড়ে হাল্কা শাদা ফিনফিনে মেঘ। গোপাল জিন্‌সের প্যান্টের ওপর শাদা প্যারাশুট কাপড়ের জ্যাকেট চড়াল। সীমান্ত পেরিয়ে এ তল্লাটে এসব বিদেশি পোশাকের প্রবল আমদানি। দামও শস্তা। পায়ে নর্থস্টার জুতো পরে গোপাল বারান্দায় বেরিয়ে হিরোর ভঙ্গীতে দাঁড়ালে ভুচুমাসি চোখ পিটপিটিয়ে বলল, ভূত একেবারে! কি ছিরি হয়েছে!

গোপাল তাড়া দিল। দেরি করলে আমি কাটব কিন্তু।

তিন্নিও তাকে দেখছিল। একটু হেসে বলল, আজকাল সবখানে ছেলেরা এ সব পরছে। খুব স্মার্ট লাগে।

গোপাল নরম হেসে বলল, স্মার্ট টার্ট বুঝি না। বৃষ্টি এলে গায়ে জল লাগবে না। তাই পরলাম।

দারুণ দেখাচ্ছে কিন্তু গোপালদা!

গোপাল প্রশংসাটা মনে মনে নিল। তারপর তাড়া দিয়ে বলল, রেডি হও শির্গাগর। আমি গ্যাঁদাকে ডেকে আনি।

কিন্তু বেরিয়ে গিয়ে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে একটু দ্বিধায় পড়ে গেল সে। তিন্নি কি তাকে গেঁয়ো ভেবে ঠাট্টা করল? গেঁয়ো ভাবার কারণ হাতড়ে পাচ্ছিল না সে। এই এলাকার লোকের কতাবার্তায় খানিকটা অন্য রকম টান একসময় ছিল। আজকাল আর ততখানি শোনা যায় না—নেহাত কিছু সাদাসিধে লোক বাদে। কলকাতা তো বটেই, সদর শহরে যাতায়াত বেড়েছে খুব। কিংবা কলকাতা বা সদর শহরই যেন ঠেলে এসে ঢুকে পড়ছে পাড়াগাঁয়ে। আর মোতিগঞ্জ তো রীতিমত টাউন। মানুষজনের মুখের ভাষা একেবারে বদলে গেছে। আরও বদলে যাচ্ছেও। টিভি এসে গেল মোতিগঞ্জে, বেশি কথা কি।

গ্যাঁদার সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়ে গেল। গোপাল তাকে তেড়ে ধমক দিতে যাচ্ছিল, গ্যাঁদা দাঁত বের করে বলল, উদিকে এক কাণ্ড ছোটবাবু! সেজন্য একটু দেরি হয়ে গেল। নোলে ঠাকুরমশাই হারামজাদী বউটার ওপর রাগ করে আত্মঘাতী হয়েছে!

কি হয়েছে বললে?

কড়িকাঠে ন্যাংটো হয়ে—

গোপাল গলার ভেতর বলল, যাঃ!

মাইরি! চোখ ছুঁয়ে গ্যাঁদা দূরে নোলে বাবুর বাড়ির দিকে আঙুল নির্দেশ করে বলল, ওই দেখ

না, এখনও লোক যাচ্ছে। সাংঘেতি ব্যাপার ছোটবাবু। উঁকি মেরে দেখেই পালিয়ে এসেছি। এক হাত জিভ বের করে—মেঝেতে পেচ্ছাব-পায়খানা—

গ্যাঁদা দুঃখিতভাবে ঢোক গিলল। গোপাল হন হন করে হাঁটতে শুরু করে দিল। গ্যাঁদা বারণ করে বলল, যেও না ছোটবাবু। কি দরকার? ও ছোটবাবু! কথাটা শোন!

গোপাল বরাবর তার চারপাশের জীবনে দুঃখ বা কষ্টের ব্যাপারগুলো এড়িয়ে থেকেছে। সে বেছে বেছে সুখের জিনিসগুলো খুঁজে বেড়িয়েছে এতকাল। অথচ এ মুহূর্তে একটা প্রচণ্ড বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ঝড় তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। অপঘাতে মৃত মানুষের দিকে ভাল করে কোন দিনই তাকাতে পারে নি—এই তো পরশু নৌকোডুবিতে অতগুলো লোক মরে গেল। লাশগুলো খুঁজে খুঁজে জেলেদের নৌকোয় করে বয়ে এনে ঘাটের চটানে সার-সার শোয়ানো হয়েছিল। গোপালের দেখার ইচ্ছে হয় নি।

আর আজ একটা অদ্ভুত ইচ্ছের তাগিদ তাকে পেয়ে বসেছে ভূতের মতো। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে— সকালে একটা মানুষের সঙ্গে তার বাড়ি গেছে। তার পড়ো-পড়ো ঘর দেখেছে। সবচেয়ে আশ্চর্য লেগেছে একখানা করে ইট চুরি করে নিয়ে গিয়ে ভাঙা কড়িকাঠে ওইভাবে থাম বানিয়ে পড়ে যাওয়া আটকানোর দৃশ্যটা। অথচ হঠাৎ কি এমন ঘটল যে তিনি অমন করে মবণ ঝাঁপ দিয়ে বসলেন? কিছুতেই বুঝতে পারছিল না গোপাল।

ভটচার্যের বউ দু'কিলো খয়রাতি মাইলোর বদলে গাঁজা কেনার কথা বলেছিল। গোপালের সামনে বলায় ভটচায কি মনে মনে খুব আঘাত পেয়েছিলেন?

বিশ্বাস হয় না। বরাবর একটু ছ্যাঁচড়া স্বভাবের মানুষ ছিলেন উনি। মান-অপমানবোধ একটু-আধটু ক্ষেত্রবিশেষে ছিল না, তা নয়। যেমন আজ সকালে পুটুনের সঙ্গে ঝগড়ার ব্যাপারটা। কিন্তু সেটা এমন কিছু না যে আত্মহত্যা করতে হবে।

রাস্তা থেকে নেমে আগাছার জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে গোপাল দেখল, ঘাটের ফাঁড়ি থেকে দুজন সেপাই আর ছকু চৌকিদার আসছে। সামনের দিকটা ভিড় জমে আছে। সবাই ও রকম বীভৎস দৃশ্য দেখতে পারে না, অথচ কৌতূহল থাকে তীব্র। আবার অনেকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখতেও ভালবাসে।

বাড়ির সামনের দিকে গিয়ে গোপাল জনতার ভিড়ে থমকে দাঁড়াল। পুলিশ দুজন আর চৌকিদার ভেতরে ঢুকে গেলে বাইরের ভিড়ে বলাবলি শুরু হল। ওই মেয়েটাই মেরে ঝুলিয়ে দিয়েছে। বডি চালান গেলেই ধরা পড়বে হাসপাতালে।

কেউ বললে, এমন হবে আমরা জানতাম। কেন, মালাকারের কি হল? সাপের কামড়? বিশ্বাস করি না। লোক লাগিয়েছিল পেছনে। তারপর তাকে খুন করে সাপের ঘাড়ে চাপাল!

আরেকজন বলল, মেয়েটাকে ধরে নিয়ে গিয়ে হাজতে প্যাঁদাক। সব কথা বেরিয়ে পড়বে।

গোপালের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল এ সব কথা শুনে। এই লোকগুলো নোলে ঠাকুরের হয়ে কথা বলছে। অথচ ওঁকে মানুষ বলেও এতদিন গণ্য করত না। গোপালের সবচেয়ে খারাপ লাগল নোলে ভটচাযের বউকে এরা দোষী করছে বলে। হতভাগী মেয়েটার লাঞ্ছনার জন্য এরা যেন ষড়যন্ত্র শুরু করেছে।

গোপাল ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল দরজাহীন খোলা বাড়িটার ভেতর। গিয়েই থমকে দাঁড়াল। দৃশ্যটা সত্যি বীভৎস। বারান্দায় লম্বা একটা শরীর ঝুলছে। গোপাল দেখেই চোখ নামাল।

গোপাল একটা লড়াইয়ে নেমেছিল। বীভৎসতার সঙ্গে তার জীবনের এই প্রথম লড়াই। ধ্বংসস্তূপ-ছড়ানো উঠোনে তার আশেপাশে যারা দাঁড়িয়ে আছে, তাদের নির্বিকার মুখগুলো দেখে সে সাহস সংগ্রহ করছিল। এরা যদি এমন বিকারহীন চাউনিতে কদর্য বীভৎসতাকে দেখতে পারে, তবে তারও পারা উচিত। কিছুক্ষণ পরে হিরু ডোম আর তার ছেলে মদন এসে পড়ল। হিরু জিভ কেটে বলল, সব্বোনাশ, সব্বোনাশ! ঠাকুরমশাই, করেছেন কি?

চৌকিদার বলল, পাঁয়তাড়া রাখ! নামাদিনি ঠাকুরমশাইকে।

হিরু ঠাকুরমশাইকে দেখতে দেখতে হিসেব কষে বলল, ঠাকুরমশাই ওখানে উঠলেন কি করে সেটাই সমিস্যে।

চৌকিদার হ্যা-হ্যা করে হেসে বলল, ধুস শালা! গাঁজা টেনে টেনে তোর চোখ দু'খানাই টেসে গেছে। হুই দেখ একখানা চ্যার! উল্টে পড়ে আছে।

হিরু দেখতে পেল। গোপালও দেখল। হাতল ভাঙা কোন্ আমলের একটা চেয়ার উল্টে পড়ে আছে বারান্দার ঠিক নিচেই। গলায় ফাঁস আটকে পায়ের ধাক্কায় ঠেলে দিয়েছে নোলে ভটচায।

গোপাল আরও অবাক হয়ে দেখল, হিরুর ছেলে মদনলাল চেয়ারখানা তুলে মড়ার পায়ের কাছে বসিয়ে দিল। তারপর ডাকল, বাবা! ধর দিকিনি একটু।

বোঝা যাচ্ছিল, ছেলেটা এ সব কাজে পটু। কালো কুচকুচে ছেলেটি, বয়সে গোপালের চেয়ে অনেক ছোট। কিন্তু হিলহিলে হয়ে বেড়ে উঠেছে অর্জুন গাছের মতো। টানা টানা চোখ। ঠোঁটের ওপর গোঁফের রেখা। তার হাতে একটা ধারালো হেসো। সে এক হাতে মড়ার বুকটা আঁকড়ে ধরে ধুতির ফাঁসটা মাথার ওপর ঘষ-ঘষ করে কাটতে থাকল। হিরু মড়ার ঠ্যাং দুটো জড়িয়ে ধরল। প্রচুর ময়লা মেখে যাচ্ছিল হিরুর গায়ে। কিন্তু সে গ্রাহ্য করছিল না। মড়াটা নামালে টাকা পাবে বলেও হয়তো না, গোপালের মনে হল, হিরু ময়লা জানে না। সে মড়াপোড়ানো শ্মশান-চণ্ডাল। তার কাছে হয়তো জীবন আর মৃত্যু, বেঁচে থাকা আর মরে থাকার মধ্যে কোন ফারাক নেই। বহতা গঙ্গার তীরে জীবন-মৃত্যুময় এক অদ্ভুত জায়গায় তার বসবাস।

নোলে ভটচাযের মড়া চমৎকার দক্ষতায় পিতা-পুত্রে নামিয়ে এবড়ো-খেবড়ো অথচ পরিষ্কার নিকোনো বারান্দায় রাখতেই এতক্ষণে কেউ চাপা আর্তনাদ করল।

সঙ্গে সঙ্গে গোপালের চোখ গেল টুটাফাটা দাঁত বের করা থামটার পিছনে। আলুথালু চুলে বসে আছে নোলে ভটচাযের যুবতী বউ। মুখটা নিচু। চৌকিদার বলে উঠল, এখন আর কেঁদে কি হবে মাঠাকরুণ? ঠাকুরমশাই যখন মরতে উঠেছিল, তখন ছিলে কোথা গো? অ্যাঁ?

ভিড় থেকে কেউ বলল, ন্যাকামি! তলায়-তলায় কলকাঠিটি নেড়ে দিয়ে এখন কাঁদা হচ্ছে?

গোপাল ঘুরে দেখল লোকটাকে। শীতলডিহির সেজবাবু অম্বিকা সিঙ্গি। পরনে নীল লুঙ্গি আর হাতকাটা ধপধপে শাদা গেঞ্জি, বাহুতে সোনার কবচ, মুখে কচরমচর পান।

গোপাল কড়া প্রতিবাদ করতে গিয়েও সামলে নিল। লোকটা তার বাবার আমল থেকে শত্রু ওর সঙ্গে মামলা লড়তে গিয়ে দীনবন্ধুর অনেক জমি ঘুচে গেছে জলের দরে। দীনবন্ধু বেঁচে নেই। মামলা-মোকদ্দমা আর হয় না। কিন্তু তার ছেলে গোপালের ক্ষতি করার জন্য সব সময় লোকটা ওত পেতে আছে।

গোপাল আর কিছুক্ষণ থাকত। কিন্তু সিঙ্গিবাবুকে দেখে এবং তার ওই কথাটা শুনে ভীষণ রাগ হয়ে গেল। রাগটা চেপে দেওয়ার জন্যেই সে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এলো।

রাস্তায় পৌঁছে গোপাল সিগারেট ধরাল। সূর্যের উজ্জ্বল হলুদ আভা শাদা মেঘ ফুঁড়ে উঁকি দিচ্ছে, হাল্কা সোনালি রোদ উপচে পড়ছে ধারায় ধারায় পিচকিরির মতো গাছপালা আর ঘরবাড়ির মাথায়। বিদ্যুতের তারে বসে একটা নীলকণ্ঠ পাখি দুলতে দুলতে ট্যা-ট্যা করে গান গাইছে। বাতাসে দুলছে নিশিন্দাঝোপ। চারদিকে প্রচণ্ড ধারালো সবুজ রঙের সজীবতা। বড় অবিশ্বাস্য লাগে। নোলে ভটচাযের মল-মূত্র মাখা ঝুলন্ত উলঙ্গ শরীরটা এই সব ঝকঝকে তাজা জিনিসগুলোর মাঝখানে অলীক হয়ে পড়ে মুহুর্মুহু। বারবার থুথু ফেলে গোপাল।

তারপর তার খেয়াল হয়, তিন্নি আর ভুচুমাসিকে ঝুলনের মেলায় নিয়ে যেতে হবে না? আজ গোপালের দরকার খুব জোরালো ধরনের আনন্দ। ভীষণ একটা হুল্লোড়। তিন্নিদের রাসের মেলায় ঢুকিয়ে সে কেল্লাবাড়িতে বদরু পাঠানের ডেরায় যাবে। অরুণকে সেখানেই পাওয়া সম্ভব। তবে এখনই বেশি খাবে না গোপাল। তিন্নিদের সকাল-সকাল বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করে দিয়ে আবার যাবে বদরুর কাছে। তারপর নেশায় চুর হওয়ার জন্যে যতটা খাওয়া উচিত, ততটাই খাবে।

কিন্তু বাড়ি ফিরে হকচকিয়ে গেল সে। ঘর ফাঁকা। গ্যাঁদা বলল, কতক্ষণ ওপিক্ষে করবেন ওনারা? বসে থেকে-থেকে, বসে থেকে-থেকে শেযে চলে গেল।

গোপাল গুম হয়ে বলল, একা গেল?

একা কেন যাবে? গ্যাঁদা হাসল। পোড়ামাতলার মামামশাই এলো—তেনার সঙ্গে গেল।

তাহলে জ্ঞানেশ্বর নিয়ে গেছেন। গোপাল আস্তে পা বাড়াল।

ঘাটে মেলার যাত্রীদের ভিড় শুরু হয় দুপুর থেকে। বেলা যত গড়ায়, ভিড়টা বাড়তে থাকে। গোপাল ঘাটে গিয়ে দেখল, ডিঙিওয়ালাদের সঙ্গে বিরোধ কখন মিটমাট হয়ে গেছে। ফাঁড়ির সেপাইরা কড়া তদারক করছে। কোন নৌকোয় বেশি লোক চাপতে দিচ্ছে না। ওপার থেকে আসা এবং এপারের কিছু ছেলে ভলান্টিয়ার হয়ে যাত্রীদের সাহায্য করছে। তাদের বুকে আঁটা ব্যাজে বড় বড় হরফে 'স্বেচ্ছাসেবক' লেখা আছে। ছেলেদের মধ্যে অনেকেই গোপালের চেনা। গোপালকে দেখে তারা কেউ-কেউ রসিকতা করছিল। গ্রাহ্য করল না গোপাল। একজন চিমটি কেটে বলল, গোপালের মুড নেই রে! রাধু উকিলের মেয়ে হাত ফস্কে পালিয়েছে।

গোপাল পিছু ফিরল না। মাধুরীর সঙ্গে তাকে জড়িয়ে ঠাট্টা করে অনেকে। ব্যাপারটা যদি সত্যি হত, মন্দ লাগত না তার। মিথ্যা বলেই রাগ হয়। রাগের বশে একটা খালি ডিঙি ভাড়া করে বসল সে। পাঁচ টাকা রেট ডিঙি পিছু ফয়সালা হয়েছে ডিঙিওলা বলল। গোপাল এক কথায় রাজি।....

রাজবাড়ির ফটকে পৌঁছুতে বেলা আরও পড়ে গেল। আজ বৃষ্টিবাদলা নেই বলে ভিড়টাও প্রচণ্ড বেড়ে গেছে। সেই ভিড় ঠেলে ঢুকে একবার তিন্নিকে দেখার ইচ্ছা সম্বরণ করতে হল গোপালকে। সে একটা গলি-রাস্তায় হন্তদন্ত হাঁটতে থাকল। কেল্লাবাড়িটা একেবারে শেষ দিকটায় একটা ঝিলের ধারে। সেই নবাবী আমলের কেল্লাবাড়ি। টানা উঁচু পাঁচিল কবে ধসে গেছে। পাঁচিলের ধ্বংসস্তূপে গজিয়েছে প্রবল আগাছার ঝাড। কোথাও বিশাল বটগাছ ডালপালা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখনই তলায় ঘুটঘুটে আঁধার। বড় ফটকের একটুখানি টিকে আছে। সেখানে পড়ো-পড়ো দেয়ালের গা ঘেঁষে প্রকাণ্ড কাঠমল্লিকা। ভেতরে জঙ্গল, ডোবা। তার মাঝে-মাঝে একটা করে বাড়ি। ইটের বাড়ি টিকে আছে শুধু একটাই— সেটা বদরু খাঁ পাঠানের। তার ছেলেরা বাজারে দর্জিগিরি করে। বাকি বাড়িগুলো খড় পাতা বা মাটির। এ একটা আলাদা পৃথিবী—বদরুর ভাষায় 'দুনিয়া'। এই লোকগুলো নিজেদের নবাবের বংশধর বলে দাবি করে। গোপাল ছোটবেলায় তাদের ঘোড়ার গাড়ির কোচোয়ান হতে দেখেছে। পরে কেউ-কেউ রিক্‌শাওয়ালা হয়ে গেছে। কেউ-কেউ ভিক্ষেও করে। বদরু বলেছিল, কেল্লাবাড়ির অনেক মেয়ে বুড়ো হয়ে গোরে যায়, লেকিন তাদের শাদি হয় না। কেন? না—তাদের বর জোটে না। সব ঘুচেছে, লেকিন খানদানি দেমাক ঘোচে নি। আপনা খানদান না হলে শাদি দেবে না মেয়ের।

বদরু লুঙ্গি আর নক্সাদার পাঞ্জাবি পরে চেয়ারে বসে সিগারেট ফুঁকছিল। পায়ের কাছে ঝকমকে একটা লণ্ঠন জ্বেলে কমানো রয়েছে। এখনও দিনের আলো মুছে যায় নি পুরোপুরি। কেল্লাবাড়ির ভেতর পাখপাখালি তুমুল চেঁচামেচি করছে। দূরে একেবারে পিছন দিকটায় রেললাইন চলে গেছে। সেদিক থেকে চাপা ট্রেনের শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

গোপাল থমকে দাঁড়াল। বদরু তাকে দেখতে পেয়েই উঠে দাঁড়াল এবং হাত নেড়ে চলে যেতে ইশারা করল। একটু ভড়কে গেল গোপাল।

সে যাচ্ছে না দেখে বদরু উঠে এলো বারান্দা থেকে। চাপা গলায় বলল, বহুত খতরনাক বেপার গোপালবাবু! তুমি আভি চলা যাও। যবতক হামি খবর না ভেজবে, তবতক ইধার আসবে না।

গোপাল বলল, কেন বদরুদা? কি হয়েছে?

বদরু তার হাত ধরে ফটকের দিকে হাঁটতে থাকল। শালে হারামি কুত্তা জাহাঙ্গির। ওর জন্যে হামারভি সব কুছ গড়বড় হইয়ে গেল গোপালবাবু! জাহাঙ্গির 'মাগলার' ছিল, জানো তো?

শুনেছি।

শুনেছ তো বুঝে লাও। পুলিশ ঔর কাস্টমের অফসররা এসে হারামিকে পাকাড় লিয়েছে আজ ফজিরমে , বহুত ফরেং মালভি পেয়েছে। বদরু ফিসফিস করে বলল।

গোপাল বলল, তাতে তোমার কি?

বদরু চটে গেল। অরুণবাবুকে পাশ চলা যাও। সমঝা দেগা। বলে সে হঠাৎ ঘুরে চলে গেল তার বাড়ির দিকে।

গোপাল আর দাঁড়িয়ে থাকার সাহস পেল না ওর ব্যাপার দেখে। নিশ্চয় একটা গণ্ডগোল হয়েছে,

অথবা ধূর্ত বদরু পাঠান সতর্ক হয়ে উঠেছে, তার চোলাই আর গাঁজার কারবার পাছে বন্ধ হয়ে যায়। তবে পুলিশের সঙ্গে তার খাতির থাকার কথা অরুণের কাছে শুনেছে গোপাল। এমনও হতে পারে, পুলিশ অনেক সময় খাতির বজায় রাখতে পারে না ওপরওয়ালাদের চাপে।

তেতো মন নিয়ে গোপাল অরুণদের বাড়ি গেল। সাইকেল রিক্শায় চেপেই গেল সে। রাস্তা আর দোকানপাটে আলো জ্বলে উঠছে। মোতিগঞ্জের রাস্তাঘাটে আজ ভিড় উপচে পড়ছে। বৃষ্টি যে আনন্দ মাটি করে দিয়েছিল, আজ তা সুদে-আসলে উশুল করে নিতে চাইছে মানুষজন।

অরুণদের বাড়িতে গোপালের অবাধ গতিবিধি। গেটের ওপর বুগেনভিলিয়ার ঝাড়। লনে সুদৃশ্য ফুলবাগান। একটা ফোয়ারা পর্যন্ত। দারোয়ান মুচকি হেসে বলল, আসেন গোপালবাবু।

অরুণ আছে, না বেরিয়েছে বাহাদুর?

মালুম হয় কি, বেরিয়েছে।

ঠিক জানো?

বাহাদুর হাসতে লাগল। হাঁ, হাঁ। বোলেছে কি, গোপালবাবু আসলে বলবে কি, হামি নাড়ুবাবুর ওখেনে থাকব। যান, চলিয়ে যান— দেখা পাবেন।

একই রিক্শায় গোপাল চলল, নাড়ুবাবুর চপলা রেস্তোরাঁয়।

খোলা ড্রেনের ওপর কাঠের তক্তা বিছানো। চপলা রেস্তোরাঁর সামনে দাঁড়িয়ে অরুণ গল্প করছিল একটি ছেলের সঙ্গে। গোপালকে দেখে চোখ পাকিয়ে বলল, কি রে? আমি তো ভেবেছিলাম তুই নৌকোয় ছিলিস। ভেসে গেছিস। আজকের দিনটা দেখে তোর মড়া খুঁজতে যেতাম বিবিডাঙার চরে।

গোপাল রিক্শার ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে বলল, তুই ভুলে গেছিস, আমি সাঁতারে ডিস্ট্রিক্ট চ্যাম্পিয়ান।

সে যখন ছিলিস, তখন ছিলিস!

অরুণ ওর গোঁফ টেনে দিতেই গোপাল নোলে ভটচাযের উলঙ্গ ঝুলন্ত মড়া, কিংবা বদরু পাঠানের অপমানজনক ব্যবহার—সব কিছু ভুলে গেল। সে প্রাণভরে হাসতে পারল এতক্ষণে। তারপর চাপা গলায় বলল, বদরুর ওখানে গেলাম তো শালা পাঠান বাচ্চা—

কথা কেড়ে নিয়ে অরুণ বলল, আগে ওখানে গিয়ে ভাল করিস নি। আমার কাছে আসবি তো? আমি তোর জন্যে ওয়েট করছিলাম।

কি হয়েছে বল তো বদরুর?

কি হবে? ন্যাকামি। জাহাঙ্গিরকে ধরেছে। আর ব্যাটা সেই ভয়ে অস্থির। তবে আসল ব্যাপারটা হল, ওর ছেলেরা শাসিয়েছে— আর ও সব কারবার করতে দেবে না।

হুঁ। অরুণ গলা চেপে বলল, গুলাইকে চিনিস? ওই যে নহবতখানার পেছনে হোটেল।

বুঝেছি। খুব ভাল জায়গা।

হোটেলের পেছনে একটা ঘর আছে। দেখে এসেছি অলরেডি। কেলো আর গণা এতক্ষণ চলে গেছে। অমুকে খাবার সময় ডেকে নেব। তুই চা-টা খাবি নাকি?

ইচ্ছে করছে না। আমাদের ওখানে আজ এক সাংঘাতিক কাণ্ড হয়ে গেছে অরুণ! নোলে ভটচায—

অরুণ ওর হাত ধরে টেনে বলল, একটু আগে শুনেছি। বরুণ বলে গেল। আয়।

রাস্তায় নেমে গোপাল বলল, আজ হুইস্কি খাব, অরুণ। আর চোলাই-টোলাই ভাল্লাগে না!

অরুণ চমকে ওঠার ভঙ্গী করে বলল, উরেব্বাস্! দেখি, তোর কাছে কত টাকা আছে?

আছে। যদিও তোর মতো কোটিপতির ছেলে নই।

অরুণ হাসতে লাগল। কোটিপতি বাবার ছেলে পকেটে ছুঁচো ডন মারছে। সেজন্যেই তো তোর মতো মালদারের মোসায়েবি করছি—

গোপাল রাগ দেখিয়ে বলল, বাজে কথা বলিস নে।

বাজে কথা! অরুণ দাঁড়িয়ে গেল। শালা একটা মোটর সাইকেলের জন্য পিতাজির চরণধূলো চেটে জিভ ক্ষয়ে গেল। বলে কি না, মেজদা বড়দার মতো গদিতে গিয়ে বসামাত্র মোটরসাইকেল কেন, আস্ত গাড়ি পেয়ে যাব।

বসবি গদিতে?

তোর মাথা খাবাপ গোপাল! অরুণ হাঁটতে থাকল। ওটা ভদ্রলোকের কাজ না। আড়তদারি—খন্দের বস্তা, খোলের বস্তা, চিটেগুড়, ভূষি, পাটের গাঁট—ওয়াক থুঃ! অরুণ ভিড় বাঁচিয়ে সাবধানে থুথু ফেলে ফের বলল, মাতাজির মতে, আমি নাকি খাঁটি বাঙালিবাচ্চা হয়ে গেছি। বাঙালি ছেলেদের সঙ্গে মিশে মিশে এই নাকি অবস্থা।

গোপালের মনে পড়ল, অরুণ কলেজে ম্যাগাজিনে পদ্য লিখত। বলল, আর পদ্য-টদ্য লিখিস নে তুই?

অরুণ অবাক হয়ে বলল, হঠাৎ পদ্য লেখার কি হল?

গোপাল কথা বাড়াল না। সে ক্রমশ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। ভিড়েব দিকে চোখ রেখে হাঁটছিল। যদি দৈবাৎ তিন্নিদেব সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। অমুদের বাড়ির সামনে এসে তার মনে হল, তিন্নির কথা বলবে নাকি অরুণকে?

কিন্তু বলল না। এ মুহূর্তে তার ভেতর একটা দৃশ্য ভেসে এলো সে আর তিন্নি ঝুলনের মেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং প্রচণ্ড ভিড়ের চাপে তিন্নি হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে তার গা ঘেঁষে পা ফেলছে--শেষে তার একটা হাত তিন্নির হাতে।

দৃশ্যটা বেশ কিছুক্ষণ ভেসে রইল। গোপালের মনে হল গুলাইয়ের বাড়িতে হুইস্কির আসরের চেয়ে সেটা অনেক বেশি সুখের হত। কেন একগাদা টাকা খরচ করে হুইস্কি খাওয়ার কথা ভাবল সে?

গোপাল দমে গেল, সম্ভাব্য আনন্দ মাপতে তিন্নিকে সে বিশাল করে ফেলেছে বলেই।...

রাত দশটায় হোটেলওয়ালা গুলাই যখন পাঁচটি যুবককে ঠেলতে ঠেলতে বের করে দিল, তাদের মধ্যে গোপালই সবচেয়ে মাতাল। অরুণের বরাবর বেশ হুঁশ থাকে। কিন্তু মজা করার জন্য সে ইচ্ছে করেই মাতলামি করে। পিছনের গলি-রাস্তায় আলো ছিল না। আকাশে মেঘ থাকায় অন্ধকার গাঢ় ছিল। গণেশ, অমল আর অশোক ওরফে কেলো মস্তান হিসেবে ইতিমধ্যে নাম কিনেছে। তারা বেপরোয়া। তিনি নেশাতেই এখন জড়ানো গলায় কোরাস গান গেয়ে উঠতে অরুণ বেগতিক দেখে অন্ধকারে গোপালের হাত ধরে টানল। কিন্তু গোপাল ইশারা বুঝতে পারল না। সে মাতাল হয়ে একেবারে গুম, ভীষণ চুপচাপ। অরুণ তাকে ফিসফিস করে বলল, চলে আয়। গোপাল বুঝতে পারল না। সে মাটির সঙ্গে সেঁটে দাঁড়িয়ে রইল। কারণ অন্ধকার পৃথিবীটা তার চারপাশে প্রচণ্ড দুলছিল। এপাশে ওপাশে ঘরবাড়ির জানালা ঘুলঘুলির আলো ওপর-নিচ এবং এদিক-ওদিক হচ্ছিল। অরুণ আবার হ্যাচকা টান দিতেই সে পড়ে গেল।

গণা আর কেলো খিখি করে হাসতে হাসতে গান গাইতে গাইতে কোথায় চলে যাচ্ছিল, তারা নিজেরাই জানে না। অরুণ বিব্রত বোধ করল। পাটোয়ারিজি সম্মানী লোক মোতিগঞ্জে। চেনা লোকেরা তার ছেলেকে এখানে এ অবস্থায় দেখলেই কেলেঙ্কারির সম্ভাবনা। পাটোয়ারিজি তাকে তাজ্যপুত্র করে ছাড়বেন। এতদিন সে মদ খেয়েছে, কিন্তু বুঝতে দেয় নি। ঝুলনের সময় বা পুজো-পার্বণে সব যুবকই মদ খায় এবং মেলায় গিয়ে একটু-আধটু হুল্লোড় বা মস্তানি করেই থাকে। অরুণকে সেই প্রথা থেকে আলাদা করে কেউ দ্যাখে না। কিন্তু পায়ের কাছে একেবারে 'আউট' হয়ে পড়ে থাকা মাতাল। অরুণের দিকে আলাদা করে চোখ পড়তেই পারে লোকের।

সে টানাটানি করে গোপালকে ওঠাবার চেষ্টায় লেগে গেল। চাপা গর্জে বলল, বারণ করলাম শালা অত খাসনে! এবার মর। আই গোপলা! উঠবি? আমি কিন্তু ফেলে চলে যাব বলে দিচ্ছি।

গোপাল পড়ে রইল। এই সময় ভেঁপুর শব্দে অরুণ ঘুরে দেখল একটা সাইকেল রিকশা আসছে। কাছে এলে সে দাঁড় করিয়ে বলল, ঘাটে যাবে?

অরুণবাবু নাকি! আদাব!

রিক্শাওলার আদাব শুনে অরুণ চেনার চেষ্টা করে বলল, কে?

আমি আবদুল, বাবু।

অরুণ হাসল। বাঁচালি ভাই আবদুল। আয় দিকি, এ বাঞ্চোতকে ধরে ওঠা রিকশোয়। শিগ্গির।

আবদুল রিক্‌শাওলার এই রিক্‌শাটার মালিক পাটোয়ারিজি। এ গঞ্জে তাঁর অসংখ্য রিক্‌শা আছে বেনামে। সে তক্ষুণি নেমে এসে উত্তেজিত গলায় ফিসফিস করে বলল, ব্যাপার কি অরুণবাবু?

ধুস ব্যাটা! অরুণ চটে গেল। ধর দিকি আগে। ওঠা!

কে উনি?

ওপারের—তুই চিনবি নে।

টিমটিমে বাতির আলোয় আবদুল গোপালকে ওঠাতে গিয়ে চিনতে পারল। দাঁত বের করে বলল, দীনুবাবুর ছেলে! তাই বলুন।

দুজনে টেনে হিঁচড়ে গোপালকে রিক্‌শার পাদানি পর্যন্ত তুলল প্রথমে। তারপর গদিতে তার পাছা ঠেকা মাত্র অরুণ একলাফে উঠে আঁকড়ে ধরল। বলল, শিগগির ঘাটে চল। একটু ঘুরপথে চল আবদুল। মনসাতলা হয়ে তোপপাড়ার গলি দিয়ে। বুঝলি তো?

আবদুল বলল, বুঝেছি। আর বলতে হবে না। শক্ত করে ধরে থাকবেন—পড়ে গেলেই বিপদ।

রিক্‌শা চলতে থাকল। অরুণ গোপালকে বেড় দিয়ে ধরে রইল। কিছুটা চলার পর গোপাল ওয়াক তুলতেই অরুণ তার মাথাটা রিক্‌শার পাশে ঠেশে ধরল। গোপাল বমি করতে লাগল।

আবদুল বলল, বাবু, টিউবেলের কাছে দাঁড়াব নাকি?

অরুণ বলল, না।

আবদুল করুণ হেসে প্যাডেল ঠেলতে ঠেলতে বলল, গাড়িখানা গঙ্গায় চুবোতে হবে দেখছি।

মনসাতলার দিকটায় আলো নেই। কিন্তু দূরের আলোর ছটা এসে পড়েছে। এতক্ষণে গোপাল ভাঙা গলায় বলে উঠল,আমি মরে যাব! দম আটকে যাচ্ছে!

অরুণ খেঁকিয়ে উঠল। মরেছিস তো! সেজন্যে তোকে ফেলতে ঘাটে যাচ্ছি!

গোপাল করুণ স্বরে ডাকল, অরুণ নাকি রে?

তোর কর্তাবাবা, বাঞ্চোত! আমাকে বমিতে ভাসিয়ে—ছ্যা, ছ্যা! শালা গেঁয়ো ভূত। তোকে আর যদি কখনও —

গোপাল আবার ওয়াক তুললে অরুণ তার মাথাটা ঠেলে দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু গোপাল নিজেই মাথা ঝুঁকিয়ে দিল। একটু পর বলল, সব ঘুরছে। ভীষণ ঘুরছে মাইরি।

আর খাবি?

নাঃ।

অরুণ হেসে ফেলল। তোপপাড়ার গলি নির্জন হয়ে গেছে। রাত দশটা বাজে। অনেক ঘুরে ঘাটে পৌঁছুতে সময় লাগল। ঝুলনের মেলায় আজও কলকাতার থিয়েটার ছিল। ভেঙে গেছে ন'টা বাজতে না বাজতেই। সেখানে বসেছে কেত্তনের আসর। বাইরের লোকেরা থিয়েটার দেখেই চলে গেছে। দূর দূরান্ত থেকে যাঁরা এসেছে তারা সারারাত মেলায় থেকে যাবে। ঘাট প্রায় নিশুতি হয়ে এসেছে এখন। প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় বাঁশের মাচান। রাস্তার ল্যাম্পপোস্ট থেকে বটের পাতার ভেতর দিয়ে সেই আলো এসে চকরা-বকরা হয়ে পড়েছে মাচানের ওপর। বাতাসে কাঁপছে। মাচানে একলা কেউ বসে আছে। পাশে একটা বোঁচকা। রিক্‌শা থামলে অরুণ গোপালের হাত ধরে টানল। আবদুল হাত লাগাতে যাচ্ছিল। কিন্তু গোপাল নামতে পারল। অরুণের কাঁধ আঁকড়ে বলল, কোথায় এলাম রে?

অরুণ মুখখিস্তি করতে গিয়ে থামল। মাচানে যে বসে ছিল, তাকে চিনতে পেরেই অরুণ বলল, রাধাদি নাকি?

গোপাল তাকাল। বমি হয়ে যাওয়াতে নেশাটা ঘুচে গেছে। কিন্তু পৃথিবীজোড়া আকাশে-বাতাসে ঘূর্ণী থামে নি। অরুণ তাকে টানতে টানতে মাচানে নিয়ে গেল। রাধা ভুরু কুঁচকে ওদের দেখছিল। একটু হেসে বলল, বাঃ! খুব ভাল।

অরুণ বলল, বাঁচালে রাধাদি! এ বাঞ্চোতকে নিয়ে কি ঝামেলা! তুমি একটু পৌঁছে দিও ওকে—কেমন?

গোপাল অনেক কষ্টে মাচানে উঠে বলল, তুই চলে যা অরুণ! আমি রাধাদির সঙ্গে যাব।

রাধা বলল, বয়ে গেছে আমার। মাতাল-টাতাল নিয়ে রাত-দুপুরে গঙ্গার ওপর বিপদ বাধাই আর কী?

অরুণ বলল, প্লিজ রাধাদি।

গোপাল বলল, রাধাদি, আমার ঘড়ি কই?

আবদুল তাড়া দিয়ে বলল, অরুণবাবু! রাত হয়ে যাচ্ছে ইদিকে।

অরুণ একলাফে রিক্‌শায় উঠে বসলে আবদুল রিক্‌শা নিয়ে ভেঁপু বাজাতে বাজাতে চলে গেল।

গোপাল ডাকল, রাধাদি! তুমি মাইরি আমাকে ঠকিয়েছ। আমাকে শালা সবাই ঠকায়—তো তুমিই বা কম কি?

রাধা ঝাঁঝালো স্বরে বলল, মাতলামি করলে তুলে গঙ্গায় ফেলে দেব কিন্তু। পারবে না তো গিলেছিলে কেন অত?

গোপাল দুঃখিতভাবে বলল, কে জানে! কী হয়ে গেল আজ! তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, আর কখনও খাব না!

রাধা মুখ ঘুরিয়ে অন্ধকার গঙ্গার দিকে তাকিয়ে বলল, একটুর জন্যে খেয়া ফস্কে কী ঝামেলা হল! নব বলে গেল, আবার আসবে—তো কোথায়? ডিঙিওয়ালারাও ওপারে গিয়ে গাঁজা টানছে।

গোপাল বলল, সাঁতার কেটে চলে যাব। আমার নাম গোপাল। কিন্তু তুমি? ও রাধাদি, তুমি কি করবে? গোপাল খিক খিক করে হাসতে লাগল।

রাধা ওর চুল টেনে দিয়ে বলল, লজ্জা করে না হাসতে। শালা মাতাল!

গোপাল আরও হাসতে লাগল।...

কাল রাতে মাঝগঙ্গায় বৃষ্টি এসে গিয়ে গোপালের অসুখটা সেরে গিয়েছিল। পিছল ঘাটে নৌকা থেকে নেমে আছাড় খেয়েছিল। রাধার হাসিটা কানে সকালেও বাজছে। সকালে মনমেজাজ হাল্কা। নোলে ভটচাযের বীভৎস মড়াটা আবছা হয়ে গেছে ঝুলতে ঝুলতে। তার অবাক লাগছিল, কাল রাতে বৃষ্টির মধ্যে নোলে ঠাকুরের বাড়ির পাশ দিয়ে কীভাবে এসেছে সে!

আর বাধাই বা কখন ছেড়ে গেল? কুয়োতলায় দাঁত ব্রাশ করতে করতে গোপাল কাল রাতেব কথা স্মরণ কবার চেষ্টা করছিল।

ভুচুমাসির মুখ ভার হয়ে আছে। কথা বলছেন না। জ্ঞানেশ্বর রান্নাঘরের সামনে উবু হয়ে বসে তাঁর গাছের সেই নারকেলগুলো নিয়ে একটা কিছু করছেন। নিশ্চয় নাড়ু-টাড়ু হবে। তিন্নি খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে গেল। সম্ভবত গঙ্গা দেখতে।

গোপাল মুখ ধুয়ে বলল, মাসিমা, চা।

ভুচুমাসি জবাব দিল না। জ্ঞানেশ্বর মৃদু কেশে বললেন, বুঝলে গোপাল, অনেক বছর পরে কলকাতার থিয়েটার দেখলাম। আমার ভাল লাগে নি। তিন্নি তো প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তুমি দেখ নি?

গোপাল মুখ মুছছে মুছতে বলল, না।

কোথায় ছিলে তবে?

আপনাদের খুঁজে না পেয়ে এক জায়গায় গেলাম। বলে গোপাল রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল। দেখল, তার চা তৈরি। ভুচুমাসিরও। কাঁসার গেলাস থেকে ভাপ বেরুচ্ছে। গোপাল খুশি হয়ে কাপটা তুলে নিয়ে এলো। থামে হেলান দিয়ে চা খেতে খেতে বলল, মামাবাবু, মেলা কেমন দেখলেন?

জ্ঞানেশ্বর বললেন, আরে ধুর ধুর! কি ছিল, কি হয়েছে! কোন ভক্তিভাব নেই আগের মতো। খালি হল্লোড় আর বদমাইসি! মেয়েদের পেছনে লাগা। হাত ধরে টানাটানি।

বলেন কি!

জ্ঞানেশ্বর বললেন, রাসমঞ্চ থেকে কোনক্রমে বেরিয়ে বাঁচি। ব্যস! তিন্নিরও শখ মিটে গেছে। নাক-কান মলা বাবা! আর নয়।

গোপাল ভুরু কুঁচকে বলল, কেন, কেউ অপমান করেছিল নাকি অনুরাধাকে?

অনুরাধা শুনেই জ্ঞানেশ্বর হয়তো একবার গোপালের দিকে তাকালেন। বললেন, ছেড়ে দাও।

গোপাল গলার ভেতর বলল, আমি থাকলে—

এতক্ষণে ভুচুমাসি ফেটে পড়ল। কাঁসার গেলাস নামিয়ে রেখে প্রচণ্ড ভেঙচি কেটে বলল, আমি থাকলে—ইশ! পালোয়ান! ছি ছি ছি! বাড়িতে কুটুম। মেয়েটা সাধ করে অদ্দুর থেকে এসেছে। আর বাবু সেজেগুজে বেরুল তো, ব্যস! আর তার পাত্তা নেই। আমরা বসে হা-পিত্যেশ করছি তো করছি। গেনুদা যদি না আসতেন? মেয়েটার মনের অবস্থা কি হত?

জ্ঞানেশ্বর মিটমাট করে দেওয়ার সুরে বললেন, না-না। তিন্নি তত কিছু—আসলে বরাবর তো বড় টাউনে মানুষ। বরং বলে, ভিড়ভাট্টা ভাল লাগে না।

ভুচুমাসি বলল, তুমি চুপ কর তো গেনুদা!

আহা, রাস দর্শন তো হল, ভুচু! জ্ঞানেশ্বর হাসতে হাসতে বললেন। ও সেদিনকার ছেলে, রাসের কি বোঝে? আমার সঙ্গে গেলে কত কি ডিটেল্‌স বুঝতে পারত—

গোপাল কাপ নামিয়ে রেখে পা বাড়াল। ভুচুমাসি বলল, যাস নে। গরম গরম লুচি ভেজে দেব। খেয়ে বেরুবি। যেখানে খুশি।

আসছি বলে গোপাল খিড়কি দিয়ে বেরুল। বেগুনক্ষেত আর আকন্দের জঙ্গল পেরিয়ে সে দেখল, তিন্নি কালকের মতো হিজলতলায় দাঁড়িয়ে আছে। আকাশ আজ অনেকটা পরিষ্কার। গঙ্গার বুক ঝিকমিক করছে। হাল্কা বাতাসে বেশ খানিকটা স্নিগ্ধতা। গোপালকে আসতে দেখে তিন্নি হাসল।

গোপাল বলল, কাল এক সাংঘাতিক কাণ্ড। গ্যাঁদাকে ডাকতে গিয়ে শুনি নোলে ঠাকুর স্যুইসাইড করেছে।

তিন্নি ওপারের দিকে আঙুল তুলে বলল, ওটা কি মন্দির—ওই যে সোনার চূড়া?

সোনার নয় পেতলের। গোপাল আস্তে বলল। নোলে ভটচাযের ব্যাপারটা শোনাতে চেয়েছিল। তিন্নি শুনতে চায় না দেখে তার একটু খারাপ লাগল।

তিন্নি বলল, দেখতে কিন্তু সোনার মতো।

এভরিথিং গ্লিটার্স ইজ নট গোল্ড!

তিন্নি মুগ্ধ হওয়ার ভঙ্গী করে বলল, বাঃ! খুব লাগসই বলেছেন।

গোপাল সিগারেট ধরানোতে মন দিল। তারপর ধোঁয়া ছেড়ে বলল, শুনলাম, মেলার ভিড়ে কে তোমাকে অপমান করেছে—

ও কিছু না। তিন্নি জৈন মন্দিরের ঝলমলে চূড়াটার দিকে তাকিয়ে বলল। গোপালদা, ওটা কিসের মন্দির?

জৈনদের। কিন্তু কি হয়েছিল, বললে না অনুরাধা!

তিন্নি হাসল। বলার মতো কিছু না। ভিড়ের ভেতর ও-রকম হয়েই থাকে একটু-আধটু। তাই নিয়ে বাবা বিশ্রি কাণ্ড করলেন। সেকেলে মানুষদের সঙ্গে চলাফেরা করা প্রব্লেম।

গোপাল চুপচাপ সিগারেট টানতে থাকল।

তিন্নি বলল, কে স্যুইসাইট করেছে বললেন? গ্যাঁদা—না কি নাম যেন—কেন ভদ্রলোক স্যুইসাইড করলেন গোপালদা?

তিন্নি বুদ্ধিমতী, গোপাল বুঝল। বুদ্ধিমতী বলেই আঁচ করেছে তার ক্ষোভটুকু। গোপাল হাসবার চেষ্টা করে বলল, শুনলে ভয় পাবে। মন খারাপ হয়ে যাবে আমার মতো। থাক ও কথা।

তিন্নি হাত বাড়িয়ে একটা পাতা কুচি-কুচি করতে-করতে বলল, কাল রাতে আপনি কোথায় কোথায় ঘুরলেন গোপালদা?

বন্ধুদের সঙ্গে।

আপনার অনেক বন্ধু শুনেছি। পিসিমা বলছিলেন।

তার মানে বদনাম করছিল মাসিমা। গোপাল হাসল। তবে আমার বন্ধুরা সবাই ওপারের। টাউনের ছেলে। লেখাপড়া জানে। যেমন ধর, অরুণ। পাটোয়ারিজির ছেলে। তাকে দেখলে তুমি বুঝতেই পারবে না যে ওরা মাড়োয়ারি। ওর বোনেরাও খুব শিক্ষিতা। আলাপ হলে বুঝতে, আমি কাদের সঙ্গে মিশি।

তিন্নি বাধা দিয়ে বলল, না না। পিসিমা বদনাম করেন নি। প্রশংসা করছিলেন আপনার। বলছিলেন,

কোন ঝামেলায় থাকেন না আপনি। এখানে নাকি ভীষণ দলাদলি। তাই ওপারে গিয়ে মেলামেশা করাটা ভাল।

বলছিল মাসিমা? গোপাল খুশি হয়ে বলল। আসলে মাসিমার মনটা খুব ভাল। বাইরে-বাইরে দেখে মনে হবে, খুব তেরিয়া মেজাজ। কিন্তু ভেতরে নরম।

বুঝতে পেরেছি। কাল রাত্তিরে আপনাদের ফ্যামিলি হিস্ট্রি শোনাচ্ছিলেন। তারপর আপনি এলেন, আর শোনা হল না। তিন্নি হাসতে লাগল। মুড চলে গিয়েছিল পিসিমার।

কাল রাত্তিরটা যা গেছে আমার। বলেই সামলে নিল গোপাল। সিগারেটের ধোঁয়ার মধ্যে বলল ফের—মানে, নৌকো পাচ্ছিলাম না। ভাবছিলাম সাঁতরে গঙ্গা পেরুতে হবে নাকি বাবা গেনুমামার মতো। কিংবা ভূতের নৌকোয় চেপে—

তার কথা থেমে গেল। পিছনের আকন্দ জঙ্গল ভেঙে তাড়াখাওয়া প্রাণীর মতো নোলে ভটচাযের বউ শংকরী ছুটে আসছে। গোপাল নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইল। তিন্নিও অবাক হয়ে দেখতে থাকল। আলুথালু চুল, পরনের যেমন-তেমন শাড়িটা প্রচণ্ড এলোমেলো। একেবারে পাগলিনীর মূর্তি।

গোপালের সামনে এসে আছাড় খেয়ে পড়ল সে। গোপাল ঠাকুরপো! আপনার পায়ে পড়ি, আপনি একটা বিহিত করুন। আমাকে আপনি বাঁচান। ওরা আমাকে মেরে ফেলবে।

গোপাল বলল, কি ব্যাপার?

শংকরী কান্নার মধ্যে বলল, আপনি তো কাল সকালে আমাদের বাড়ি গিয়েছিলেন। আপনি সাক্ষী। বলুন তো ঠাকুরপো, আমার সঙ্গে কোন ঝগড়াঝাটি হয়েছিল কিনা। আপনি তো কতক্ষণ ছিলেন। তারপর আমি গেছি কালীর মায়ের কাছে। সেখান থেকে ঘাটে পচুর দোকানে। ফিরে এসে দেখি, উনি এই অবস্থায়।.... সে কান্নায় ভেঙে পড়ল আবার।

গোপাল শক্ত হয়ে বলল, কেউ আপনাকে শাসাচ্ছে? কে?

শংকরী আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। কান্না সামলে আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে বলল, কাল আমাকে সেজবাবুর হুকুমে ফাঁড়িতে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। ফাঁড়ি থেকে ওপারের থানায় নিয়ে গেল, তখন অনেক রাত। সারারাত আমাকে থানায় বসিয়ে রেখে ভোরবেলা বড়বাবু বললে, বাড়ি যাও। এপারের ঘাটে এসে উঠেছি, আর ভোম্বল, মাণিক, টৌটন—আরও কারা সব ছিল, আমায় খিস্তি করতে লাগল। বলে কি, মাথা মুড়িয়ে বের করে দেবে। তার ওপর খানকি-টানকি একশো গাল!

গোপাল সিগারেট ছুঁড়ে ফেলল গঙ্গায়। গলার ভেতর বলল, আপনার কি দোষ?

বলছে, আমিই নাকি লোক দিয়ে খুন করে ঝুলিয়ে রেখেছিলাম। ....শংকরী আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। ঘাট থেকে বাড়ি যদি এলাম, বাড়ির উঠোনে দড়বড় করে একশো ঢিল।

ঢিল ছুঁড়ছিল! গোপালের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল।

সিঙ্গিদের সেজবাবু একদঙ্গল ছেলেকে ঢিল ছুঁড়তে পাঠিয়েছিল। তারা হাসতে হাসতে পালিয়ে গেল। আমি কাউকে চিনিনে, ঠাকুরপো! এইটুকু—এইটুকু ছেলে—পাড়ারই হবে।

গোপাল বলল, বুঝেছি। সেই পুরনো ট্যাকটিক্স শুওরের বাচ্চাদের। রাধাদির পিছনেও ঠিক এমনি করে লেগেছিল। যখন তখন ঢিল ছুঁড়ত। প্রোটেস্ট করলে বড়রা এসে উল্টে শাসাত। কিন্তু রাধাদিকে এঁটে উঠতে পারে নি। আপনাকে নরম পেয়েছে।

শংকরী কান্নাজড়ানো স্বরে বলল, যদ্দিন বেঁচে ছিল মানুষটা, কেউ তো একটা কুটো দিয়ে সাহায্য করে নি। কতবার দু'দিন-তিনদিন ধরে না খাওয়া—তখন লোকের বাড়ি ভিক্ষে চাইতে বাকি রেখেছে। কারুর এতটুকু দয়া হয় নি। এখন সব দয়ার সাগর হয়ে উঠেছে। বলছে কি জানেন ঠাকুরপো? আমি আসতেই নাকি সুখের সংসারে দুঃখ ঢুকেছিল। নইলে আগে নাকি রাজভোগ জুটত, আমি এসে সব উড়িয়ে দিয়েছিলাম।

গোপাল বলল, মিথ্যে কথা।

শংকরী আবার গোপালের পায়ের দিকে ঝুঁকল। গোপাল পিছিয়ে গিয়ে বলল, ছিঃ! বামুনের মেয়ে না আপনি! এ কি করছেন! একটা কথা বলি শুনুন। আপনার বাপের বাড়ি কোথায়?

লালগোলায় ছিল। এখন আর সেখানে কেউ নেই। থাকলে তো কথাই ছিল না ঠাকুরপো!

কেউ নেই? আত্মীয় স্বজন?

শংকরী মুখ নামিয়ে মাথা দোলাল।

গোপাল অবাক হয়ে তিন্নির দিকে তাকাল। তিন্নি বলল, আপনি তাহলে কার কাছে থাকতেন?

স্টেশনের পেছনে থাকতাম তেরপলের ছাউনিতে।...শংকরী এলোমেলো কথায় ওর জীবনকাহিনী শোনাতে থাকল। আসলে লালগোলা শহরে ওদের বাড়ি না। কাছাকাছি একটা গ্রামে ওরা বাবা মা ভাই-বোনেরা মিলে থাকত। দু'বছর আগে পদ্মার ভাঙ্গনে ওদের গ্রামটা তলিয়ে যায়। তখন ওরা আশ্রয় নেয় লালগোলা স্টেশনের কাছে। রিলিফের দয়ায় বেঁচে ছিল। তারপর এক বছরের মধ্যে ওর বাবা-মা আগে পরে মাসখানেকের ব্যবধানে মারা যান। ভাই নৃপেন জোয়ান ছেলে। চুরি-চামারি শুরু করেছিল। বর্ডার স্মাগলিংয়ে ধরা পড়ে জেলও খেটেছিল। শেষে খুনের মামলায় যাবজ্জীবন জেল হয়েছে। শংকরী কয়লা কুড়ুত রেললাইনে। কখনও কারুর বাড়ি ঝিগিরি করত। কিন্তু যুবতী মেয়ের জীবন মোটেই নিরাপদ নয়। বছরখানেক আগে স্টেশনে তার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল নোলে ভটচাযের। আসলে একটা শক্ত আশ্রয়ের মতো একজন পুরুষ মানুষকে আঁকড়ে ধরে আত্মরক্ষা করতে চেয়েছিল শংকরী। তবে কেন সদ্যচেনা একটা বয়স্ক লোকের সঙ্গে তাকে চলে এসে ঘর বাঁধতে হয়েছিল সে দুঃখ আর লজ্জার কথা শংকরী বলতে পারবে না।

গোপাল শ্বাস ছেড়ে বলল, বুঝেছি। দেখছি কি করা যায়।

শংকরী ব্যাকুল হয়ে বলল, দেখছি নয় গোপালঠাকুরপো! এ গাঁয়ে আমি যে কারুর কাছে বিশ্বাস করে গিয়ে দাঁড়াব, তেমন কাউকে দেখছি না। আমি যাবই বা কোথায় বলুন? ভাঙা হোক, ঠেকা দেওয়া হোক, মাথার ওপর ওই একটুখানি ছাদ তো আছে।

গোপাল বলল, আপনাকে আমি থানায় নিয়ে যাব। সেজ সিঙ্গিদের নামে ডাইরি করতে হবে তখন যেন আবার পিছিয়ে আসবেন না।

তিন্নি দ্রুত বলল, ভ্যাট! পুলিশে গিয়ে কিছু হয় না আজকাল। তাছাড়া পুলিশ কি সব সময় ওঁকে পাহারা দেবে? আমার মতে, পুলিশ-টুলিশ করতে গেলে ওঁর ট্রাবল বেড়ে যাবে।

গোপাল আবার বুঝল তিন্নি বুদ্ধিমতী। তবু বলল, অরুণকে ধরলে থানাকে ম্যানেজ করে দেবে হয়তো।

তিন্নি কি বলতে যাচ্ছিল, শংকরী বলল, থানার বড়বাবু বললেন, সেজবাবুদের হাতে পায়ে ধরে মিটিয়ে নাও গে!

গোপাল ফুঁসে উঠল। কেন? আপনি কি চোরের দায়ে ধরা পড়েছেন। মেটাবেনটা কি?

তিন্নি বলল, আমি জানি। পুলিশের কাজ-কারবার নিউজপেপারে পড়ছি না প্রতিদিন?

গোপাল হেসে ফেলল। আমি নিউজপেপার পড়ি না। খালি মিথ্যে কথায় ভর্তি। যাই হোক, বউদি, আমি একটু ভেবে নিই। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কনসাল্ট করে দেখি, কি করা যায়। আপনি বাড়ি যান—আর শুনুন, ফের যদি কেউ ঢিল ছোঁড়ে বা শাসাতে আসে, আমাকে খবর দেবেন।

শংকরী চোখ মুছে গোপালদের বাড়ির রাস্তায় এগিয়ে গেল। তিন্নি তাকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিল। শংকরী খিড়কি দিয়ে বাড়িতে ঢুকলে তিন্নি বলল, একটা অদ্ভুত এক্সপিরিয়েন্স হল আমার। গ্রামে এখনও এ সব হয়?

গোপাল দুঃখিত ভাবে হাসল। হয় মানে কী? আজকাল বেশি বেশিই হচ্ছে। সেজন্যেই তো কতবার ভেবেছি, ওপারে টাউনে গিয়ে থাকব।

তিন্নি ঘাসের ওপর পায়চারির ভঙ্গীতে জলের ধারে গিয়ে বলল, টাউনেও হাঙ্গামা ভীষণ। বর্ধমানে থাকার সময় একেকদিন যা হাঙ্গামা দেখেছি, হরিবল্! তবে সবই স্ট্রেটকাট। এমন অদ্ভুত কিছু ঘটে না। কাগজে লেখালেখি হয় বলে টাউনে পুলিশ অ্যাকশান নিতেও বাধ্য হয়। গ্রামে তো দেখছি সব ব্যাপারটাই উল্টো। পুলিশ উল্টে ভদ্রমহিলাকে বলেছে মিটমাট করে নিতে। সত্যি, বড় অদ্ভুত ব্যাপার।

গোপাল আনমনে বলল, পোড়ামাতলাও তো গ্রাম। সেখানে কিছু এক্সপিরিয়েন্স হয় নি?

তিন্নি হাসল। সবে তো মাস দেড়েক এসেছি। ছোটবেলার কথা কিছু মনে নেই। তবে পোড়ামাতলাকে আর ঠিক গ্রাম বলা যাবে না। হাইওয়ে আর রেললাইনের মাঝখানে বলে রীতিমত টাউনশিপ হয়ে

গেছে। রেলের ওয়ার্কশপ তো আগে থেকেই ছিল। আজকাল বাইরের লোক এসে ভিড় করেছে। নন-বেঙ্গলিই বেশি। ... তিন্নি আনমনে ছোট্ট শ্বাস ফেলে বলল, স্মৃতিটুকু ছিল, তার সঙ্গে কিছু মিলল না। তবে আমার তাতে মেজাজ খারাপ হয় নি। জানেন গোপালদা—

কি?

আমি যেন সব জায়গাতেই আউটসাইডার। বর্ধমানে অত বছর থাকলাম, বর্ধমানকেও পর মনে হয়েছে। পোড়ামাতলায় এসেও মনে হচ্ছে না নিজের দেশ। ... তিন্নি হাল্কা মেজাজে বলল ফের, আপনার অবশ্য অন্য রকম।

গোপাল হাসল। কিছু ভেবে দেখি নি। তবে এই যে হিজলগাছটা দেখছ, এই ঘাটটা—ওই বাড়িটাও নিজের মনে হয়। মাঝেমাঝে ওপারে গিয়ে বাড়ি করার ইচ্ছে হয় বটে, কিন্তু পরে ভেবে দেখি। তখন খারাপ লাগে। এখানকার সবই বড় কাছের। ওপারে যতক্ষণ থাকি, ততক্ষণ জানি—এপারে আমার বাড়ি। তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারব না অনুরাধা—

বুঝতে পেরেছি। আপনি ভীষণ সেন্সেটিভ।

গোপাল শব্দটা জানে। কিন্তু তাৎপর্য বুঝতে পারল না।

তিন্নি ওপারের জৈনমন্দিরের চূড়ার দিকে তাকিয়ে বলল, আমার ভীষণ যেতে ইচ্ছে করছে ওখানে। ও গোপালদা, নিয়ে যাবেন আমাকে মন্দির দেখাতে?

জ্ঞানেশ্বরের ডাক শোনা গেল খিড়কি থেকে। অ গোপাল! তিন্নি রে? তোদের বুঝি ক্ষিদে-টিদে পায় নি?

গোপাল বলল, অনুরাধা! তুমি এগোও। আমি আসছি।

গোপাল আকন্দবনে ঢুকে একবার ঘুরে দেখল, তিন্নি যেতে যেতে বারবার ঘুরে তাকে দেখছে। আম-কাঁঠালের বাগান ঘুরে একলাফে একটা চওড়া জলভরা নালা ডিঙিয়ে গোপাল একটু দাঁড়াল। নন্দদের বাড়িটা এড়িয়ে যাবে কি না ভাবল। বাড়িটা ভীষণ চুপচাপ। খিড়কির দরজা বন্ধ আছে। সুমতি তাকে দেখলেই সমস্যা।

সতর্কভাবে দৃষ্টি রেখে গোপাল রাধার ঘরের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। জানালা খোলা দেখে সে আস্তে ডাকল, রাধাদি আছ নাকি?

আবছাভাবে মনে ছিল গোপালের, রাধা কাল রাতে ওপারের ঘাটে বসে বলেছিল, আজ সে বেরুবে না। শরীরটা ভাল ঠেকছে না।

রাধা ঘরের ভেতর শুয়ে ছিল। 'কে রে' বলে সাড়া দিয়ে জানালায় এলো। তারপর গোপালকে দেখে হাসল। কি রে শালা? খোয়ারি ভেঙেছে?

খিড়কি খোল—ভেতরে যাব।

কি মতলব?

আঃ খোল না—প্লিজ রাধাদি! জরুরি কথা আছে।

রাধা আলুথালু চুল বাঁধতে বাঁধতে ঘরের ভেতর অদৃশ্য হল। একটু পরে খিড়কির দরজা খুলে বলল, চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি, ঝামেলা বেধেছে।

গোপাল তার পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়ল। ছোট্ট উঠোন জুড়ে জঙ্গল গজিয়ে উঠেছে। বাড়িঘরের যত্ন করে না রাধা—কিংবা সময় পায় না যত্ন করার। বৃষ্টিতে জলকাদাও জমে রয়েছে প্রচুর। বারান্দায় উঠে গোপাল পাশের বাড়ির দিকে তাকাল। সুমতি কি টিউবওয়েলে জল আনতে গেছে? আজ আবার বাঁশবনের রাস্তায় কাঁটা ফেলে রাখলেই কেলেঙ্কারি। রাধা বাড়িতে আছে এবং তার কানে গেলেই ঝগড়াঝাঁটির সম্ভাবনা।

খিড়কির দরজা বন্ধ করে চটি ফটফটিয়ে রাধা ফিরল। তারপর সটান ঘরে ঢুকে বিছানায় উঁচু করে রাখা বালিশে হেলান দিয়ে বলল, আয় বে গোপালাশালা। ভেতরে আয়।

গোপাল ভেতরে ঢুকে বলল, শালা ছাড়া তোমার কথা নেই, মাইরি! তুমি মেয়ে না কী?

পা ছড়িয়ে রাধা বলল, পায়ের কাছে বোস্ গোপলা।

গোপাল বসে হাসতে হাসতে বলল, পা টিপতে বসবে নাকি?

দে না টিপে, এত ভক্তি যদি তোর! রাত্তির থেকে গা ম্যাজ-ম্যাজ। জ্বরজ্বালা এলো নাকি কে জানে! দ্যাখ তো কপালে হাত দিয়ে।

গোপাল কপালে হাত রেখেই তুলে নিল। তেমন কিছু না। ঠাণ্ডা লাগিয়েছ। ট্যাবলেট খেয়ে নিও একটা।

রাধা বলল, হুঁ—তা কী ফন্দি এঁটে বাড়ি ঢুকেছিস রে?

তোমার মাইরি খালি আজেবাজে কথা!

রাধা আবছা আলোয় হাসছিল। চাপা সুরে বলল, হ্যাঁ বে! এখন যদি কেউ তোকে এখানে এভাবে দ্যাখে, তোর কি অবস্থা হবে বুঝতে পারছিস?

গোপালের বুকের ভেতর সত্যি ধড়াস করে উঠল। কিন্তু মুখে তেজ ফুটিয়ে বলল, কী হবে? তোমার কাছে আসি না কখনও? কেউ আসে না কাপড় কিনতে?

এসে রাধারাণীর বিছানায় বসে! রাধা হাসতে লাগল।

গোপাল তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। আহত স্বরে বলল, কি আশ্চর্য মাইরি তুমি! তুমিই বললে বসতে। আবার—

রাধা গম্ভীর হয়ে বলল, না—বোস্। ইয়ার্কি করছিলাম রে ছোঁড়া! তুই কি মেয়ে নাকি যে ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছিস?

গোপাল বলল, তোমার হাবভাব দেখলে সত্যি কাঁপুনি হয়।

রাধা বলল, ভ্যানতাড়া ছেড়ে আসল কথাটা বল্! ঘড়ি? ঘড়ির কারবার আর করি না। পুলিশ ঝামেলা করে। ভাল প্যান্টের কাপড় আছে। দেখবি তো দ্যাখ। শস্তা করে দেব।

গোপাল বলল, উঁহু—অন্য কথা। নোলে ঠাকুরের ব্যাপারটা শুনেছ তো?

শুনেছি।

রাধাদি, তোমার বেলায ঠিক যা যা হয়েছিল, তাই শুরু হয়েছে। সেই শুওরের বাচ্চা সেজসিঙ্গি বিধবা মেয়েটার পেছনে লেগেছে। বাড়িতে ঢিল ছোঁড়া, শাসানো!

রাধা শ্বাসের সঙ্গে বলল, তা তোর কি? তুই নোলে ঠাকুরের বউয়ের জন্য দালালি করতে এসেছিস? আমি কি গাঁয়ের মাথা, না থানার বড়বাবু, না আদালতের হাকিম? তুই—

বেগতিক দেখে গোপাল বলল, আঃ! কথাটা শেষ করতে দাও।

তার আগে বল, শংকরীর সঙ্গে তোর ভাব আছে?

গোপাল চটে গিয়ে বলল, বাজে বোকো না! সবে আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে। আমি ওকে বউদি বলি, জানো!

রাধা ঠোঁট বাঁকা করে বলল, মুখে বউদি আর ভেতরে-ভেতরে—বলে অশ্লীল খিস্তি করতেই গোপাল ভীষণ খাপ্পা হয়ে উঠতে গেল। রাধা তার কাঁধ খামচে বসিয়ে দিল। বলল, আমি ছোট জাতের মেয়ে। আমার কাছে এলে খিস্তি শুনতেই হবে। আরও শোন গোপলা, তোদের মতো ব্যাটাচ্ছেলেগুলোকে আমার চেয়ে বেশি কেউ চেনে না।

গোপাল ফের রাগতে গিয়ে হেসে ফেলল। তুমি মাইরি মহা ত্যাঁদোড় মেয়েছেলে! আচ্ছা, সত্যি করে বল তো—আমি না হয় একটু মদ-টদ খাই, কাল একটু বেশি হয়ে গেছিল ঝোঁকের মাথায়—কিন্তু কখনও আমাকে ওসব ব্যাপারে বেচাল হতে দেখেছ? এই শীতলদিতে কারুর কাছে ঘুণাক্ষরেও শুনেছ, গোপাল কোন মেয়ের দিকে হাত বাড়িয়েছে?

না—না—তুই সাধু মহাত্মা বে!

না—মনে নিশ্চয় পাপ থাকে। মনটাকে তো সামলানো যায় না। গোপাল দুঃখিত ভাবে বলল। কাউকে ভীষণ পছন্দ হয়ে যায়। ভালবাসতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ওই পর্যন্তই।

রাধা খুব হাসতে লাগল। এক খোঁচাতেই শালা জব্দ! ভাই গোপলা, তোর দ্বারা কিস্যু হবে না, আমি জানি। বোস, চা করি।

গোপাল বলল, না রাধাদি। বসব না। আমি এসেছিলাম, যদি তুমি শংকরী বউদিকে—

সে দ্বিধান্বিতভাবে থামলে রাধা বলল, কি?

গোপাল বলল, তোমার ব্যবসাতে ঢুকিয়ে নাও না। নইলে মেয়েটা না খেয়ে মারা পড়বে। নয়তো পেটের জ্বালায় নষ্টই হয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত।

রাধা আবার ঠোঁট বাঁকা করে বলল, নাঃ! ভাল বলেছিস! তারপর আবার সবাই আমার পেছনে লাগুক। নিজেকে বাঁচাতেই সব সময় তটস্থ, আবার একজনের জন্য রক্তজল করতে থাকি। গোপলা, তুই এখনও নাবালক থেকে গেলি রে!

গোপাল উঠে দাঁড়াল। ভেবেছিলাম—

কথাটা শেষ না করেই সে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। রাধা ডাকল, গোপাল! শোন!

গোপাল শুনল না। খিড়কির দরজা খুলে বেরিয়ে হনহন করে হাঁটতে থাকল বাড়ির দিকে। হাঁটতে হাঁটতে চোখের কোণা দিয়ে দেখল, কেউ দাঁড়িয়ে আছে নন্দর খিড়কিতে। ঘুরতেই সুমতির সঙ্গে চোখাচোখি। গোপাল থেমেছিল কিছু বলবে বলে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সুমতি ঘরে ঢুকে দরজাটা জোরে বন্ধ করে দিল। গোপাল মনে মনে বাঁকা হেসে বলল, বয়ে গেল আমার!....

বাবা পিসিমাকে ডাকেন ভুচু বলে। আমি ভীষণ ধাঁধায় পড়ে গিয়েছিলাম, জানেন? তিন্নি বলল। ভুচু আবার নাম হয় নাকি মানুষের? শেষে বাবাকে লুকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। বাবা বললেন, ভুবনকুসুম। সেটাই নাকি অ্যাব্রিভিয়েশনে ছোটবেলায় ভুচু হয়ে গিয়েছিল। আপনার মায়ের নামও নাকি ওই রকম আনকমন ছিল?

গোপাল বলল, নয়নকুসুম। তবে মাকে নসু বলে ডাকতে শুনেছি।

তিন্নি একটু ভেবে বলল, না—তাহলে খুব একটা আনকমন বলা যাবে না। কিন্তু ভুবনকুসুম—ভাবা যায় না। তিন্নি হাসতে হাসতে একটু ঝুঁকে জলে আঙুল রাখল চিরুণির মতো।

ওরা ডিঙি নৌকোয় ওপারে জৈন মন্দির দেখতে যাচ্ছিল। মন্দিরটা শীতলডিহির ঘাট থেকে অনেকখানি ভাটিতে। গোপালদের বাড়ি থেকেও সামান্য ভাটিতে পূর্ব-দক্ষিণ কোণে। ডিঙিওয়ালা গলা-কাটা দর বলেছিল। শেষে দশটাকায় মন্দিরের ঘাটে পৌঁছে দিতে রাজি হয়েছে।

তিন্নি বলল, আপনার মাকে মনে পড়ে না গোপালদা?

গোপাল আস্তে বলল, না।

আপনাকে কেমন ক্লান্ত দেখাচ্ছে সকাল থেকে। আসতে বলে ঠিক করি নি হয়তো।

গোপাল হাসল। শরীর ঠিক আছে। আসলে ওই ভদ্রমহিলার ব্যাপারটা মাথা থেকে যাচ্ছে না।

তিন্নি হাসল। সেজন্যেই তখন বলছিলাম আপনি খুব সেন্সিটিভ।

গোপাল সিগারেট ধরাতে থাকল। গঙ্গার বুকে উত্তাল হাওয়া। আকাশে ঘোলাটে ভাব জায়গায় জায়গায়। ঘষা কাঁচের মতো। বৃষ্টি হবে কিনা বোঝা যায় না। তিন্নি বাবার তাগিদে তাঁর ছাতিটাই নিতে বাধ্য হয়েছে। আর গোপাল তো ছাতির ধার ধারে না—

গোপাল সিগারেট ধরিয়ে দূরের দিকে তাকিয়ে বলল, সেন্সিটিভ! কে জানে। তবে ব্যাপারটা আমার খারাপ লেগেছে। ভদ্রমহিলার স্যাড লাইফ হিসট্রি আমার জানা ছিল না। জানার পর কষ্ট হল।

তিন্নি শুনছিল না। চঞ্চল হয়ে উঠল, গোপালদা। ওগুলো শাদা শাদা কী পাখি?

গোপাল দেখে বলল, বক।

জানেন! এমন করে কখনও নদী দেখি নি। তিন্নি মুগ্ধভাবে বলল। পোড়ামাতলা থেকে এক মাইল দূরে মাঠ পেরিয়ে কে আর নদী দেখতে যাবে? বর্ধমানের কাছেও দামোদর আছে। সে নাকি ভীষণ নদী। যাওয়া হয় নি।

তিন্নিকে চাপা মেয়ে এবং কম কথা বলে ভেবেছিল গোপাল। ভরা গঙ্গার বুকে তিন্নি ট্রানজিস্টারের মতো বাজতে শুরু করেছে—গোপালের মনে হল। গানের সুরের মতো কথা—কিংবা প্রতিধ্বনিময়। গোপালের মাথায় কিন্তু নোলে ভটচাযের বিধবা বউয়ের কথা ছাড়া এখন আর কিছু নেই। রাধার কাছে অনেক আশা নিয়ে গিয়েছিল একটা হিল্লে করে দেবে বলে। রাধা খুব নিষ্ঠুর মেয়ে।

তিন্নি বলল, এত ভাল লাগছে—নতুন এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে। দারুণ থ্রিলিং। কিন্তু ভয়ও করছে—বুঝছেন গোপালদা? গোপালদা, আপনি শুনছেন না আমার কথা!

শুনছি। বল।

এই। যদি নৌকো উল্টে যায়! কী সাংঘাতিক দুলছে!

ও কিছু না।

তিন্নি কচি মেয়ের মতো বলল, কিছু না কি! যদি সত্যি-সত্যি অ্যাকসিডেন্ট হয়?

ছইয়ের পিছন থেকে মাঝি কান করে শুনছিল। বলল, ডরিয়ে মাত দিদিজি! কুছু হোবে না।

কি প্রকাণ্ড ঢেউ! ইস্! বলে তিন্নি মেঘলা আকাশের তলায় জলেব ছলাৎ ছলাৎ শব্দ, নৌকোব দুলুনি উপভোগ করতে থাকল। কিন্তু গোপালের মন ভাল নেই। শংকরী তার চোখের সামনে এনে ঝুলিয়ে দিয়েছে নোলে ভটচাযের উলঙ্গ কদর্য মড়াটা। তিন্নি যেমন জীবনে নদীর সৌন্দর্য দ্যাখে নি গোপালও দ্যাখে নি অমন সাংঘাতিক বীভৎসতা।

একটু পর তিন্নি জলে পা ঝুলিয়ে দিয়েই তুলে নিল। ও মা! আমি করছি কি! গোপালদা, আপনি কুমিরের কথা বলছিলেন না?

গোপাল বলল, সে তো তুফানগঞ্জে।

বাঃ! নদীটা বুঝি আলাদা?

একটু পরে তিন্নি গুন গুন করতে থাকল। তারপব গুনগুনানি থামিয়ে বলল, গোপালদা, একটা গান করুন শুনি

আমি গাইতে পাবি না। বরং তুমি গাও, শুনি।

আপনাব ঘরে ক্যাসেট প্লেয়ার দেখছিলাম?

ওটা ব্যাটাবি সেট। খারাপ হয়ে পড়ে আছে। সারানো হয় না। বলে গোপাল তিন্নির অন্য রূপ দেখছিল। চঞ্চল, হাসিখুশি বালিকার মতো হাবভাব। তাব অবাক লাগছিল। নাকি বাড়ির বাইরে এলে, যেখানে ভিড় নেই, কোন বাধা নেই— সেখানে মেয়েরা সবাই এমনি হয়ে যায়? স্মার্টনেস গুঁড়িয়ে যায় বুঝি।

তিন্নি আবার গুনগুন করতে থাকল। কিন্তু গোপাল তাকে গানের জন্যে সাধল না। ঝটপট মন্দির দেখিয়ে অরুণদের বাড়ি যাবে। অরুণের সঙ্গে পরামর্শ করবে। সেই চিন্তা তার মাথায়। আসলে বরাবর এই তার স্বভাব। যা একবার মাথায় ঢোকে, সহজে বেরুতে চায় না। তাকে অস্থির করে রাখে।

আশ্চর্য, একেকটা সময় কি যে হয় গোপালের, পৃথিবীশুদ্ধ তেতো হয়ে ওঠে। নইলে এই গোপাল ঝুলনের মেলায় মেয়েদের শরীরে শরীর ঘষে নেওয়ার জন্যে ঠেলে ঢুকে পড়েছে। যদি কেউ এজন্যে খারাপ ছেলে বলে গোপালের বদনাম দেয় সে দিব্যি কেটে বলবে, ব্যাপারটা তেমন কিছু না—নিছক খেলা। সত্যিই সে মেয়েদের ছুঁয়ে নিষিদ্ধ আনন্দ লুঠতে ওসব করে নি। তবে এও ঠিক গোপাল প্রচণ্ডভাবে ভালবাসতেও চায় কোন পছন্দমতো মেয়েকে। না—রাধুবাবু উকিলের মেয়ে মাধুরীকে নয়। মাধুরীর ব্যাপারেও তার একটা মজা আছে। তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু তিন্নি—এই অনুরাধা এসে সত্যিই তার মন কেড়েছিল। পছন্দ হয়ে গিয়েছিল তাকে। তারপর যখন শুনল, তিন্নি বি এ অনার্স পাশ করেছে এবং এম এ পড়ার খুব ইচ্ছা, তখন গোপাল একটু ভড়কে গিয়েছিল। একটু দূরত্ব রাখার চেষ্টা করছিল। অথচ তিন্নির মধ্যে কি একটা সহজ স্বচ্ছন্দ টানের ব্যাপার যেন আছে। তাব মনে হয়েছে, যদি তার ওপব তিন্নির টান ভালভাবে বুঝতে পারে, গোপাল যাবে। সোজা স্পষ্টাস্পষ্টি বলবে, তিন্নি, তোমাকে ভীষণ ভালবাসি।

গোপালের ঠোঁটে হাসি লক্ষ করে তিন্নি বলল, হাসছেন যে গোপালদা? আমি সত্যি গাইতে পারি না। জাস্ট ফর ফান!

গোপাল বলল, হাসি নি। তুমি গাও।

তিন্নি বাঁদিকের পাড়ে একগুচ্ছ মন্দির দেখিয়ে বলল, ওগুলো কি?

আটশিবের মন্দির।

গোপালদা, বাবা বলছিলেন এখানে কোথায় যেন পঞ্চানন না পঞ্চমুখী শিব আছে?

আছে। মাইল তিনেক দূরে।

আমি যাব দেখতে।

নৌকো এবার মন্দির ঘাটের দিকে ঘুরেছে। এপারে স্রোতটা বেশ তীব্র। গোপাল উঠে দাঁড়াল। তিন্নি সাহস পাচ্ছিল না। হাত বাড়িয়ে বলল, এই! ওঠান আমাকে। ভীষণ টলমল করছে যে।

গোপাল হাতটা ধরল। মেয়েদের হাত খুব নরম। এর বেশি কিছু মনে হল না তার। বাঁধানো ঘাটে নামা পর্যন্ত তিন্নি তার একটা বাহু আঁকড়ে ধবে রইল। গোপাল শুধু হাসছিল। তার অসহায় অবস্থা দেখেই।

মন্দিরের চত্বরে ঢুকে তিন্নি বলল, যা বলছিলাম গোপালদা। গ্লিটার্স ইজ নট গোল্ড। ওপারে দূর থেকে দেখে ভেবেছিলাম এক রকম, এখন দেখছি অন্য রকম।

গোপাল ডিঙির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে এসে বলল, কি রকম?

তেমন কিছু গ্ল্যামার নেই—হয়তো ছিল কখনও।

গোপাল চত্বর পেরিয়ে মূল মন্দিরের ধাপে পা ফেলে বলল, তুমি অনেক কিছু দেখেছ। আমাদের মতো গেঁয়ো লোকেদের কাছে এটাই বিরাট ব্যাপার। কত ভিড় দেখছ তো?

তিন্নি ঘুরে গোপালের মুখটা দেখে নিয়ে বলল, আপনি এত রাগী ছেলে কেন গোপালদা?

গোপাল হাসল। আমি ঢোঁড়া সাপ।

তার মানে? তিন্নি দাঁড়িয়ে গেল ধাপে।

গোপাল তার পিঠে হাত রেখে ঠেলে দিয়ে বলল, সব কথা এক্সপ্লেন করা যায় না। চল।

তিন্নি গোঁ ধরে বলল, না। কেন ঢোঁড়া সাপ বললেন, বলুন।

যদি না বলি?

ফিরে যাব।

যাবে কিভাবে? নদী। কুমির আছে।

গোপাল হাল্কা চালে কথা বলছিল। কিন্তু তিন্নির মুখ দেখে একটু হকচকিয়ে গেল। অদ্ভুত জেদি মেয়ে তো তাহলে! সে হাসবার চেষ্টা করে ফের বলল, আমাদের বংশ—মানে আমার পিতৃকুল মাতৃকুল দুই-ই নাকি ভীষণ রাগী, জেদি। গেনুমামার সঙ্গে আমাদের কোন রক্তেব সম্পর্ক নেই। কিন্তু মাসিমার কাছে শুনেছি, গেনুমামা নাকি আরও এক কাঠি সরেস। কাজেই তাঁর মেয়ে আমার চেয়েও তেজী হওয়াই স্বাভাবিক। কুমিরের পেটে যেতেও আপত্তি করবে না।

তিন্নি ফোঁস করে শ্বাস ফেলে পা বাড়াল। মন্দিরের বারান্দায় অসংখ্য সুদৃশ্য থামের ভেতব বিশাল একটা ঘণ্টা দেখা যাচ্ছিল বেদির ওপর। একদল পুরুষ ও স্ত্রীলোক ঘণ্টা প্রদক্ষিণ করার ভঙ্গীতে ঘুরে ঘুরে দেখছিল। সেখানে গিয়ে তিন্নি গোপালের চোখে চোখ রেখে মিষ্টি হাসল। আপানি সত্যি ঢোঁড়া সাপ, গোপালদা! না—আমিও এক্সপ্লেন করব না। আসুন, ওদের মতো ঘণ্টা প্রদক্ষিণ করি।

অরুণের বোন বনমালার সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়ে গেল। তিন্নির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে সে তাকে টানতে টানতে বাড়ি নিয়ে গেল। তিন্নি হয়তো আশা করে নি মফস্বলের গঞ্জে আদৌ এমন বিশাল আধুনিক ডিজানের বাড়ি আছে। অরুণের বোনেরাও মিশুকে প্রকৃতির মেয়ে। লনের সামনে ওপরের ব্যালকনি থেকে বনমালার বড় জপমালা গোপালের দিকে হাত নেড়ে হাসছিল। তারপর বনমালার সঙ্গে তিন্নিকে দেখে সে সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে নেমে এলো।

অরুণ এখন বাড়িতে নেই। থাকার কথাও না। গোপাল বলল, অনুরাধা তোমাদের জিম্মায় রইল। আমি আসছি।

তিন্নি বলল, সে কি! কিন্তু দুই বোন তাকে দু'দিক থেকে ধরে ভেতবে নিয়ে গেল। গোপাল শুনতে পাচ্ছিল, বনমালা চেঁচামেচি করে তার মাকে ডাকছে। অরুণের মা একটু সেকেলে হলেও মেয়েদের মধ্যে দিলদরিয়া মহিলা।

মোত্তিগঞ্জের জৈন পরিবারগুলো বরাবর মিশুকে এবং জনপ্রিয়। তাদের মধ্যে পাটোয়ারিজির পরিবারের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া এবং কালচারের ব্যাপরে স্থানীয় বাঙালীদের তুলনায় অনেক এগিয়ে আছে। গোপাল জানে, তিন্নিকে এমন করে অচেনা জায়গায় ঠেলে ঢুকিয়ে দেওয়াতে প্রথমে যতটা তার রাগ হবে, কিছুক্ষণ পরে ততটাই খুশি হবে। বনমালা দারুণ ভাল গান গায়। জপমালা অসাধারণ

নাচে। তাছাড়া ওদের বাড়িতে স্টিরিও, ক্যাসেট, ভিডিও, টিভি সবকিছুই আছে।

গোপাল অরুণকে খুঁজে পেল এক অদ্ভুত জায়গায়। রজনীমোহন কোবরেজের আড্ডায় তক্তপোষে পাতা গদিতে একদঙ্গল বুড়ো মানুষের মধ্যিখানে। গোপালকে দেখেই সে তড়াক করে উঠে পড়ল। তারপর রাস্তায় নেমে চাপা গলায় বলল, খুব বাঁচিয়ে দিয়েছিস মাইরি!

গোপাল বলল, ওই বুড়োহাবড়াগুলোর মধ্যে ঢুকলি কেন রে?

জ্যোতিষ।

গোপাল থমকে দাঁড়িয়ে বলল, আমার হাতটা দেখিয়ে আসব?

অরুণ তার কাঁধে থাপ্পড় মেরে বলল, ভ্যাট! যত্তো সব গুল! আমাকে টানাটানি করে কোবরেজমশাই ঘরে ঢোকালেন। আমি যাচ্ছিলাম অমুর কাছে। চল্, ঘুরপথে যাই।

গোপাল বলল, না। তোর সঙ্গে জরুরী কথা আছে। তাছাড়া আমার সঙ্গে গেস্ট।

গেস্ট জোটালি কোত্থেকে!

গোপাল হাসল। কাল রাতে তোকে গেনুমামা আর তার মেয়ের কথা বলেছিলাম না। অনুরাধা সকালে ধরল, মহাবীর-মন্দির দেখতে আসবে। ওকে মন্দির দেখিয়ে তোদের বাড়িতে দিয়ে এসেছি।

অরুণ বলল, কাল রাধাদি পৌঁছে দিয়েছিল তোকে?

কে জানে! বৃষ্টি এসে গেল। নৌকো থেকে নেমে আমি এক দৌড়ে বাড়ি চলে গেছি।

চিনতে পেরেছিলি? নেশা কেটে গিয়েছিল তো?

হুট! গোপাল হাসতে হাসতে হঠাৎ গম্ভীর হল। চল অরুণ। কোথাও নিরিবিলিতে বসি।

পায়ে চলা রাস্তায় ধোপিবস্তির ভেতর দিয়ে এগিয়ে গঙ্গার পাড়ে বটগাছের তলায় গেল দু'জনে। ভাঙা মন্দিরের ইঁট ছড়িয়ে আছে। পিছনে ধস ছেড়েছে। ঝোপঝাড় ঝুঁকে পড়েছে জলে। ঝুরি আর শেকড়-বাকড়ের ভিতর লাল বটফল পড়েছে। পাখ-পাখালি হল্লা করে পাকা বটফল কাচ্ছে। গুঁড়ির কাছে মোটা শেকড়ে বসল দু'জন। অরুণ আঁতকে ওঠার ভঙ্গী করে বলল, সামনের বর্ষায় এ গাছটাও টেনে নেবে মা গঙ্গা। তারপর আমাদের বাড়িটার পালা। এত ভাঙছে কেন বল তো গোপাল? ছোটবেলায় তো এমন দেখি নি।

গোপাল সিগারেট বের করে আস্তে বলল, ফারাক্কা।

ঠিক বলেছিস। ফিডার ক্যানেলের জলের চাপে এ অবস্থা।... অরুণ সিগারেট নিল ওর প্যাকেট থেকে। গোপাল লাইটার জ্বেলে ধরিয়ে দিলে সে কয়েকটা টান মেরে খিকখিক করে হেসে উঠল। তুই মাইরি কী! তোকে মেজে-ঘসে মডার্ণ করার এত চেষ্টা করলাম আর তুই এখনও গেঁইয়া থেকে গেলি রে গোপলা!

গোপাল বলল, থাম তো! এবার কথাটা শোন।

কয়েক পেগ হুইস্কিতেই তুই শালা—

গোপাল উরু খামছে ধরে বলল, শাট আপ! এদিকে আমার লাইফ অ্যাণ্ড ডেথ প্রব্লেম।

অরুণ গম্ভীর হয়ে বলল, তাই বল বাঞ্চোত! কত কাল পরে গঙ্গার ধারে একটু বসলাম তো লাইফ অ্যাণ্ড ডেথ প্রব্লেম। বল্। শুনি।

গোপাল শান্তভাবে আস্তে শুরু করল নোলে ভটচাযের বিধবা বউ শংকরীর কথা। অরুণ তার কথার মধ্যে রসিকতা করে ফোড়ন কাটছিল। শংকরীর কথা শেষ করে গোপাল বলল, একজ্যাকাটলি রাধাদির ব্যাপার। তুই তো জানিস রাধাদির হিস্ট্রি। কিন্তু রাধাদির কথা আলাদা। সে নাকি ঝুমুর মেয়ে ছিল। দরকার হলে নাকি গলা কাটতেও পারে। কিন্তু তুই দেখলেই বুঝতে পারবি শংকরী ভদ্রঘরের মেয়ে। দেখতে-শুনতে মন্দ না। একেবারে বাচ্চা মেয়ে মনে হবে তোর।

অরুণ হাসতে হাসতে বলল, বুঝেছি। সেইজন্যেই তোমার প্রেমদরিয়ায় তুফান ছুটেছে।

অরুণ! গোপাল শক্ত মুখে বলল। এ গোপাল বন্ধুর প্রেম খুব দামি জিনিস জানবি।

উরেব্বাস্! শালুক চিনেছে গোপালঠাকুর।

গোপাল রাগ করে বলল, সবতাতেই যদি ইয়ার্কি করিস, আমি তাহলে চললাম।

সে উঠে দাঁড়াতেই অরুণ তাকে টেনে বসাল। তারপর একটু অবাক হয়ে বলল, মেয়েটাকে তোদের গাঁয়ের লোক শাসাচ্ছে, তাতে তোর কি বুঝতে পারছি না। পৃথিবীতে অসংখ্য লোকের সমস্যা আছে। তুই কি করতে পারবি ভাবছিস?

গোপাল বলল, আমি বুঝতে পেরেছি, শুয়োরের বাচ্চা সেজ সিঙ্গির চোখ পড়েছে শংকরীব ওপর। আমি তা হতে দেব না। তুই তো জানিস, সিঙ্গিরা আমাদের পুরুষানুক্রমে এনিমি। বাবা মামলা লড়ে ফতুর হয়েছিলেন।

মেয়েটাকে নিজের বাড়ি এনে রেখে দে।

গোপাল মুখ নামিয়ে একটা পাতা গুঁড়ো করতে করতে বলল, তাতে গাঁয়ের লোক অন্য কিছু ভাববে। তাছাড়া আমার মাসিমাও ব্যাপারটা অন্য চোখে দেখবে।

তাহলে কি করবি? অরুণ একটু ভেবে নিয়ে বলল, কোন ভদ্রলোকের বাড়ি চেষ্টা কবলে-ধর, রান্নাবান্না বা এ ধরনের কাজকর্ম করতে পারে। বললি তো লালগোলায় এ সব কাজও করত।

গোপাল বলল, হাঁ, তা হয়। কিন্তু দেরি করলে ওর ক্ষতি হবে। আজকালের মধ্যেই একটা ব্যবস্থা করা দরকার।

অরুণ বলল, ধুস্ শালা! আগে খোঁজ নিতে হবে তো—মানে রাখতে তো সবাই চাইবে। দেখা দরকার, সে ব্যাটার আবার—অরুণ হাসির মধ্যে বলল, আলুর দোষ টোষ আছে কিনা—

গোপাল সোজা হয়ে উঠে বলল, হ্যাঁ রে, তোদের বাড়ি ওর কাজেব ব্যবস্থা করে দিতে পারিস নে? তোদের তো বিরাট ফ্যামিলি। অনেক লোকজন কাজ কবে দেখেছি। পাবিস নে অরুণ?

অরুণ একটু চুপ থেকে বলল, ও ভাই আমি বলতে পাবব না। তুই মাকে গিয়ে বলে দেখতে পারিস।

অরুণদের বাড়ি গিয়ে গোপাল দেখল, ওপরের ঘরে তিন্নি জাঁকিয়ে বসে ভিডিও দেখছে। গোপালেব দিকে একবার তাকাল মাত্র। অরুণ উঁকি মেরে দেখে ফিসফিস করে বলল, উবেশ্‌শালা! কি সব জিনিস সঙ্গে নিয়ে ঘুরছিস গোপলা! তোর ববাত খুলে গেছে।

গোপাল রাগ করল না। সে লম্বা বরান্দার কোণায় বসে থাকা অরুণেব মায়ের কাছে চলে গেল। অরুণ বোনদের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল। ভেতরে ঢুকল এবার।

গুণমালা দেবী আচারের বয়াম গোছাচ্ছিলেন। গোপাল গিয়ে ঢিপ কবে প্রণাম করে মেঝেয় বসে পড়ল। গুণমালা কাজ করতে করতে বললেন, জিতা রহো বেটা। বহ্ত রোজ বাদ দেখলাম তোমাকে। কুর্সিমে বয়ঠো বেটা। এ সুশীলা! গোপালকে কুর্সি দিয়ে যা।

গুণমালা ভাল বাংলা বলতে পারেন না। সুশীলা নামে ঝি মেয়েটিকে ইশাবায় বারণ করে গোপাল বলল, মাসিমা! আপনার সঙ্গে জরুরী কথা আছে।

গুণমালা মেঝেয় থপাস করে পাছা ঠেকিয়ে বসলেন। হাতে আচারের রস মাখা। একটু হেসে বললেন, তোমার মামাতো বহিনের সঙ্গে আলাপ হল। খুব ভাল। তো বললাম কি, এখানে থাকো। ভোজন করো। ঝুলুন দেখো। তারপর বাড়ি যাবে। গোপাল, তোমার ভি নেমন্তন্ন।

গোপাল বলল, সে হচ্ছে মাসিমা, আমার কথাটা আগে শুনুন।

গুণমালা একটুকরো আচার গোপালের দিকে বাড়িয়ে বললেন, খাতে খাতে বাত করো। হাত্ত বাঢ়াও বেটা—

গোপাল বলল, একজন গরিব বামুনের মেয়েকে রাখবেন মাসিমা? সব কাজ জানে। থাকবে, খাবে—হাতে তুলে যা মাইনে দেখেন, নেবে। খুব অসহায় মেয়ে, মাসিমা।

গুণমালা অবাক হলেন না, কিংবা তত মনোযোগও দিলেন না। শুধু বললেন, তোমার চেনা?

হ্যাঁ। আমাদের গ্রামের মেয়ে—মানে, সদ্য বিধবা হয়েছে। বয়স বনুর মতো। খুব কষ্টে পড়েছে।

গুণমালা এক কথায় বললেন, ভেজে দিও।

আমি ওবেলা সঙ্গে করে নিয়ে আসব, মাসিমা।

গুণমালা আবার আচারে মন দিলেন। 'আসছি' বলে আনন্দে চঞ্চল গোপাল আচারের টুকরো চুষতে চুষতে বনমালাদের ঘরে গিয়ে ঢুকল। ছবি শেষ। অরুণ তিন্নির সঙ্গে রসিকতা জমিয়েছে। গোপাল আচার চুষতে চুষতে গিয়ে পড়ায় একটা হাসির হল্লা শুরু হল। অরুণের বউদি রাজশ্রী এলো পাশের ঘর থেকে। রাজশ্রী গোপালকে বলল, অনুরাধাকে আমরা লিয়ে লিয়েছি। আর তোমার সঙ্গে যাবে না গোপাল। থানামে যাকে কেস লিখাও। পুলিস এসে লিয়ে যাক না দেখি। ছুপা রাখব আলমারির অন্দরমে।

বনামালা বলল, গোপালদা, খেয়ে যাবে কিন্তু। অনুরাধাকে আমরা সত্যি আটকে রেখেছি।

গোপাল বলল, কি মুশকিল! বলে আসি নি আমরা। মাসিমা রান্না করে রেখেছে।

অরুণ ঘড়ি দেখে বলল, সাড়ে বারোটা বাজে। এরা বলছে যখন তখন খেয়েই যা।

জপমালা বলল, খেয়ে যা মানে কী? খেয়ে বিশ্রাম করে ওবেলা দল বেঁধে যাবে ঝুলনের মেলায়। আজ কলকাতার যাত্রা, জানো তো?

গোপাল তিন্নির দিকে তাকাল। তার মুখের ভাব দেখে বুঝল, খুব আনন্দে আছে। এমন প্রাণখোলা মেলামেশা,-এমন আদর যত্ন হয়তো কোথাও পায়নি। বাঙালি পরিবারে আজকাল এমন অন্তরঙ্গতা গোপাল কোথাও দ্যাখে নি। হয়তো অবাঙালি বলেই এমনটি হতে পেরেছে। নিজেদের দেশে থাকলে কেমন হত কে জানে। অরুণের কাছে শুনেছে গোপাল, আজকাল কলকাতার শিক্ষিত মারোয়াড়ি ছেলেরা বাঙালি মেয়েদের বিয়ে করে। অরুণের মাসতুতো এক দাদার বউ বাঙালি মেয়ে।

গোপাল বলল, অনুরাধা! কি করবে?

অনুরাধা বলল, আমি তো গেস্ট। আমার কোন স্বাধীন ইচ্ছে থাকতে নেই।

সবাই হইহই করে উঠল। গোপাল বলল, তবে আর কি? কিন্তু আপনি জানেন কি, নেমন্তন্ন খাওয়াটা তত সুখের হবে না এ বাড়িতে?

অনুরাধা বলল, কেন বলুন তো?

এরা স্রেফ ভেজিটেরিয়ান।

জানি।

গোপাল আচারের খোসা ফেলতে উঠল। বলল, অরুণ! এক কাজ করলে হয় বরং। একটা সাইকেল দে। আমি সদরঘাটে নব বা কাউকে বলে আসি, বাড়িতে একটা খবর দিয়ে দেবে।

রাজশ্রী বলল, অরুণ! এক কাজ করো, বাচ্চুকো ভেজ দো— বোলকে আবেগা জলদি।

অরুণ হাসতে হাসতে উঠে গেল। গোপাল বারান্দায় বেসিনের নিচে ময়লা রাখা ঝুড়িতে চোযা আচারের টুকরো ফেলে হাত ধুয়ে এসে বলল, অনুরাধা! মামাবাবুর ছাতি?

তিন্নি চমকে উঠে জিভ কাটল। এই রে! নৌকোয় থেকে গেছে। একটুও মনে নেই, কী হবে?

গোপাল হাসল। মেরে দিতে পারবে না। গোপাল কি জিনিস সব ঘাটমাঝিই জানে! .....

রাজবাড়ির নাটমঞ্চে আর আগের মতো সারারাত যাত্রার আসর থাকে না। কলকাতার যাত্রা তো সন্ধ্যা ছ'টাতেই শুরু হয়ে যায়। আর নটা বাজতে না বাজতেই আসর ভেঙে যায়। দূর থেকে আসা লোকেদের জন্য কীর্তন বা কবির আসর শুরু হয়। যাত্রা দেখে বনমালাদের কাছে বিদায় নিতে সময় লাগল তিন্নির। গোপাল অস্থির। মেয়েদের এই সব ব্যাপার বরদাস্ত হয় না। হাজার বার 'আচ্ছা চলি ভাই' আর 'যাচ্ছি ভাই'— এইরকম প্যানপানানি।

অরুণ ঘাট অব্দি এগিয়ে দিয়ে গেল। তিন্নি অরুণকে যেন বেশি পাত্তা দিচ্ছিল—গোপালের একটু খারাপ লাগল। ভিড়ের ভেতর নৌকোয় গঙ্গা পেরোল ওরা। তারপর বাড়ির দরজায় তিন্নিকে পৌঁছে দিয়ে গোপাল বলল, আমি আসছি।

হনহন করে হেঁটে নোলে ঠাকুরের বাড়ির কাছাকাছি যেতেই গোপালের বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। নিছক ভূতের ভয়েই। ঝুলন্ত জিভ বের করা মড়াটা জোনাকি জ্বলা কালো গাছপালায় ভেসে বেড়াতে লাগল। অসংখ্য ব্যাঙ আর পোকা-মাকড়ের চিৎকার আর দমকা বাতাসের শনশন শব্দের মধ্যে নোলে

ঠাকুরের কণ্ঠস্বর যেন শুনতে পাচ্ছিল গোপাল। কিন্তু তারপর ক্রমশ সে গোঁ ধরল। প্রচণ্ড জেদের ঝোঁকে ধ্বংসপুরীর ভেতরে গিয়ে দাঁড়াল গোপাল। ডাকল, বউদি!

কোন সাড়া পেল না। আরও কয়েকবার ডেকে সাড়া না পেয়ে কয়েক পা এগিয়ে গেল। পড়ো-পড়ো বাড়িটা নিঝুম অন্ধকারে ডুবে আছে। বারান্দার দিকে তীক্ষ্মদৃষ্টিতে তাকিয়ে গোপাল ভাবছিল, লাইটার জ্বালবে নাকি। কিন্তু হঠাৎ মনে হল, ওই তো সেই বারান্দা —যেখানে নোলে ঠাকুর ঝুলছিল। মনে হওয়া মাত্র গোপাল যেন দেখতেও পেল—অন্ধকার বারান্দায় দোল খেতে খেতে নোলে ভট্টাচার্য্য খি খি করে হেসে গোপালকে ডাকছে।

তারপর হাওয়াটাও গেল বেড়ে। চারপাশে অদ্ভুত শনশন শব্দ। তারপর বৃষ্টির ফোঁটা। গোপাল ঘুরেই হাঁটতে থাকল। যেন ভয়টা ভূতের নয়, বৃষ্টিরই।

রাস্তায় যেতেই হঠাৎ টর্চের আলো পড়ল তার ওপর। গোপাল চোখের ওপর হাত আড়াল করে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। উত্তেজনা তুঙ্গে উঠেছিল। তাই প্রায় গর্জে উঠল, কোন্ শালা রে?

আলোটা সঙ্গে সঙ্গে নিভে গেল। বলল, গোপাল নাকি?

দেখতে পাচ্ছ না? আবার ন্যাকামি! কে তুমি?

বাতাস আর ছিটেফোঁটা বৃষ্টির মধ্যে হাসির শব্দ ভেসে এলো। তারপর মাটির ওপর টর্চ জ্বালতে জ্বালতে লোকটা এগিয়ে এলো। গোপাল চিনতে পেরে হাসল। মিতে, তুমি! আমি ভাবলাম—

নন্দগোপাল এগিয়ে এসে গোপালের কাঁধে হাত রেখে বলল, ভিজে যাবে। চলে এসো।

টিউবওয়েলের কাছে পৌঁছে নন্দ চাপা স্বরে বলল, সকালে কথা হবে মিতে! তবে একটা কথা এখনই বলি। অমন বোকার মতো অন্ধকারে ওখানে যাওয়া ঠিক নয়। আর কারুর চোখে পড়লে কেলেঙ্কারি হবে মিতে।

বলেই সে বৃষ্টি থেকে বাঁচতে বাঁশবনের ভেতর টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে দৌড়ে উধাও হয়ে গেল। গোপাল কিছু বলার সুযোগই পেল না। রাগে, দুঃখে সে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ভিজল। তারপর ধীরেসুস্থে হাঁটতে থাকল বাড়ির দিকে।

সকালে জ্ঞানেশ্বর বললেন, আসা অব্দি তোমার নাগাল পাচ্ছি না গোপাল। কোথায় কোথায় ঘুরছ! দুটো আলাপ-আলোচনা যে করব, তাও হচ্ছে না।

ভুচুমাসির কানে গেলে বলল, গোপালের মধ্যে আর কি সে গোপাল আছে দাদা? লায়েক হয়েছে। ফুট করতেই উড়ে গঙ্গাপার। পাটোয়ারিজির বাড়িতে কি মধু আছে বুঝি না বাবা।

তিন্নি হেসে বলল, সে মধুর খোঁজ আমিও পেয়ে গেছি পিসিমা!

হুঁ—তাহলে তুমিও ওড়ো, মা! ভুচুমাসিও হেসে ফেলল।

তিন্নি বলল, উড়ছি তো!

জ্ঞানেশ্বর ধমকালেন। ফালতু কথা রাখো দিকি! গোপালের সঙ্গে আমার কথা হচ্ছে। তোমরা আর ফোড়ন কেটো না। ও গোপাল, আয় বাবা। আমরা একটু নিরিবিলিতে গিয়ে বসি।

জ্ঞানেশ্বর গোঁফ-দাড়িতে হাত বুলিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

তারপর খিড়কির দিকে পা বাড়ালেন। অগত্যা গোপালকেও যেতে হল। পিছনে একবার ঘুরে দেখল, তিন্নি হাসি চেপে এবং চোখের ইশারায় কি যেন বলল তাকে। বুঝল না গোপাল।

গঙ্গার ধারে হিজলতলায় গিয়ে জ্ঞানেশ্বর বললেন, কাল অম্বিকার সঙ্গে দেখা হল রাস্তায়—তোমাদের সেজ সিঙ্গি। এইটুকুন রোগা প্যাঁকাটি ছিল। ফুলে কুমড়ো হয়েছে। চেনা যায় না। কথায়-কথায় দুঃখ করে বলল, গোপাল এখন বড় হয়েছে। গ্রামের সব ব্যাপারে আমরা ওকে চাইছি। ও গ্রাহ্য করে না। আরও অনেক বদনাম দিল তোমার নামে। সে-সব যে মিথ্যে, তাও বোঝা যায়। ভুচু আমাকে সব বলেছে। এখন কথা হচ্ছে, গ্রামে থাকতে হলে, তাছাড়া পৈতৃক জমিজমা রাখতে হলে, গ্রামের সাতে-পাঁচে একটু জড়িত থাকা দরকার। শুনলাম, জমিজমা সব ভাগাভাগি রেকর্ড করে নিয়েছে। ইচ্ছেমতো হাতে তোলা যা দিচ্ছে, তুমি নিচ্ছ-টিচ্ছ। এটা বোধ করি ঠিক হচ্ছে না গোপাল! একটু

তদারক করতে হবে। মাঠে গিয়ে—

গেপোল হেসে বলল, ধুস! মাঠে-মাঠে চাষবাষ আমার ভাল লাগে না মামাবাবু!

তা বললে কি চলে বাবা? জ্ঞানেশ্বর নরম করে বললেন। আমার নিজের এক ছটাক ভুঁইক্ষেত নেই। ছিল না-ও কস্মিনকালে। কিন্তু চল্লিশ বছর ধরে জমিজমার ব্যাপারে জড়িত আছি। জমিজমা রেজিস্ট্রির আপিসে মোহরারের কাজ করে প্রচুর অভিজ্ঞতা হয়েছে। তার বেসিসেই বলছি, আইন যেমন আছে, তার ফাঁকও আছে। অম্বিকা সিঙ্গি তোমার এনিমি। ঠিক আছে। ওর এনিমি যারা, তাদের পক্ষে ঢুকে পড়ো। কি করে ভাগচাষীকে জব্দ করতে হয়, তাও আমার জানা। বাঘা ওল হলে বুনো তেঁতুলও আছে।

গোপাল জোরে হেসে উঠল। তারপর বলল, মাসিমা আপনাকে এই সব বুঝিয়েছে তাহলে?

জিভ কেটে জ্ঞানেশ্বর বললেন, না, না। ভুচু কি বোঝে। তোমাদের গাঁদা, তাছাড়া আরও কিছু চেনাজানা লোকের সঙ্গে কথা বলেই বুঝে গেছি সব। বাবা গোপাল, দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা না বুঝলে আখেরে পস্তাতে হয়। তুমি তো চাকরি করতে যাচ্ছ না। গেলেও চাকরি পাওয়া কি মুখের কথা? বরং তার চেয়ে বাপের যেটুকু মাটি আছে, তাই নিয়ে লেগে থাকলে তোমার রাজার হালে দিন কাটবে। আহা, হেসো না! এ হাসির কথা নয়। বয়স হয়েছে। বিয়ে-টিয়েও করতে হবে। ভুচু দুঃখ করে বলছিল, এখনও হাত পুড়িয়ে তাকে রাঁধতে হচ্ছে। আর শরীরের যা অবস্থা, কখন কি একটা হয়ে গেলেই হল। তখন বুঝতে পারছ, কি সমস্যায় পড়তে হবে তোমাকে। মাথার ওপর আছে বলে বুঝতে পারছ না।

গোপল আর শুনছিল না। সে কাল রাতের কথা ভাবছিল। নন্দ ওখানে কোথাও ঘুরঘুর করছিল। ওর চরিত্র ভাল না, সবাই জানে। রাধার সঙ্গে নাকি একটা গোপন সম্পর্কও আছে, যদিও তা গোপালের কাছে বিস্ময়কর ঠেকে। বিশ্বাস করতে পারে না। কিন্তু কথাটা হল, কাল রাতে শংকরী সাড়া দিল না কেন? সে কি ভেবেছিল গোপাল তাকে খারাপ মতলবে ডাকতে গেছে?

এই কথাটা ভেবেই গোপাল রেগে যাচ্ছিল ভেতর ভেতর। ইচ্ছে হচ্ছিল, এখনই গিয়ে বোঝাপড়া করে ফ্যালে। জ্ঞানেশ্বরের কথায় চমক ভাঙল তার। কানে এলো জ্ঞানেশ্বর বলছেন, তা ভুচু কথাটা যখন নিজে থেকেই তুলল, আমি বললাম, ঠিক আছে। গোপালকে এতটুকুন থেকে দেখছি। আপন বৈ পর তো কোনদিন ভাবি নি। তার ওপর নসুর ছেলে। এদিকে দীনু বলতে গেলে আমার বুজম ফ্রেণ্ড হয়ে ওঠেছিল। একটু দুর্দান্ত প্রকৃতির ছিল বটে, সেটা অন্যদিকে। বাজে লাইনে নয়। তবে কথা হচ্ছে, এডুকেশান! আবে বাবা, এডুকেশান ভাল জিনিস। আমি এই একটা জিনিসের কড়া সাপোর্টার। তিন্নির এডুকেশানের জন্যে স্যাক্রিফাইস করেছি বৈকি। মা-হারা মেয়ে। তাকে কোথায় রেখে একা মনে কষ্ট চেপে—যাই হোক, গোপাল, তুমি ফাইনাল পরীক্ষাটি দিলেই পারতে। পার্ট ওয়ান দিয়েছিলে শুনলাম। আর ওইটুকুর জন্যে ডিগ্রিটা ছেড়ে ভাল কর নি! এখনও চেষ্টা করলে প্রাইভেটে—

গোপাল বলল, ধুস!

হা হা করে হাসলেন জ্ঞানেশ্বর। ভুচু তোমার ওই ধুসটা বেশ নকল করেছে। ধুস দিয়ে সবকিছু উড়িয়ে দিতে নেই রে বাবা!

গোপাল ঠিক বুঝতে পারছিল না। জ্ঞানেশ্বর তাকে কি বলতে চাইছেন। ভুচুমাসিই বা তাঁকে কি বলেছে, যার জন্য এই লম্বাচওড়া লেকচার। জ্ঞানেশ্বর তো ঠিকই বলেছেন তাকে, কিন্তু সে শোনে নি। এখন জিগ্যেস করলে উনি ধরে ফেলবেন, গোপাল কোন কথা শোনে নি।

জ্ঞানেশ্বর আবার শুরু করলেন। তিন্নির মামাবাড়ি কষ্ট করে থেকে পড়াশুনার লম্বা কাহিনী। কিছুক্ষণ পরে ভুচুমাসির সাড়া পাওয়া গেল। বকের মত পা ফেলে ছিপটি হাতে আসছে এদিকে। ছাগল কিংবা গরু সম্পর্কে কাউকে শাসাতে শাসাতে আসছে। জ্ঞানেশ্বর ডাকলেন, এসো ভুচু। এখানে এসো।

ভুচুমাসি এসে হাসিমুখে বলল, কথা হল তোমাদের?

হল একরকম। জ্ঞানেশ্বর উজ্জ্বল মুখে বললেন।

ভুচুমাসি গোপালের দিকে তাকিয়ে বলল, কি বলেছে বাঁদর?

ও কি বলবে? জ্ঞানেশ্বর বললেন। বলার আছেটা কি? ভাবছি, একটা দিনের জন্যে একবার নিমতিতেয়

দোলনদের দেখে আসি। অনেক কাল যাওয়া হয় নি। ফিরে এসে সবকিছু ঠিকঠাক করে পোড়ামাতলা ফিরব।

ভুচুমাসি বলল, নিমতিতেয় তোমার কুটুম্ব আছে বলে তো কখনও শুনি নি গেনুদা?

জ্ঞানেশ্বর চোখ নাচিয়ে বললেন, আছে রে আছে। কোথায় নেই বল? দুপুর নগাদ একটা ট্রেন আছে যেন।

ভুচুমাসি বলল, নাও! উঠল বাই তো বেন্দাবন যাই। তিন্নি মোচার ঘণ্ট খাবে বলেছিল। গাছ থেকে টাটকা মোচা কাটলাম। এখনও হাতে আঠা লেগে আছে।

আহা, তিন্নি যাবে কোথায়? জ্ঞানেশ্বর পা বাড়িয়ে বললেন। কতকাল সেখানে যাই নি। কেউ আর ওখানে আছে কিনা তাই জানি না। দুম করে ছানাপোনা নিয়ে হাজির হব, সে কি কথা? এ তো ভুচুর বাড়ি নয়।

হাসতে হাসতে জ্ঞানেশ্বর লম্বা পা ফেলে চলে গেলেন। ভুচুমাসি চোখে হেসে গোপালকে চাপা স্বরে বললেন, খুব অ্যাদ্দিন বাঁদরামি করে বেড়ালি। এবার একটু শান্তসুস্থ হয়ে ভদ্রলোকের মতো ঘর সংসারে মন দে। গেনুদার মতো পাকা মাথার মুরুব্বি আর পাবি নে। উনি মাথার ওপর থাকলে দাপটে শীতলদিতে বসবাস করতে পারবি।

ব্যাপার কি? গোপাল ভুরু কুঁচকে বলল।

ভুচুমাসি আরও কাছে এসে ফিসফিসিয়ে বলল, এমন ছিক্ষিত পাশ-করা মেয়ে আর পাবি না গোপাল। শুধু কি ছিক্ষিত? দেখতে শুনতে পাঁচটার একটা। মোতিগঞ্জ কেন, বহরমপুর কলকাতা ঢুঁড়ে আয় না। এমন চোখ-ধরা মেয়ে পারি ক'টা!

গোপাল নিষ্পলক তাকিয়ে ছিল। ঢোক গিলে বলল, ও।

ভুচুমাসি কথা বলতে বলতে এদিক-ওদিক তাকিয়ে কি খুঁজছিল। এবার টঙাস টঙাস করে এগিয়ে গিয়ে একটা শুকনো কাঠ ধরে টানাটানি করতে থাকল। কাঠটা আকন্দ ঝাড়ের তলায় একটা প্রকাণ্ড শেকড়। কেউ কবে কটে রেখে গিয়েছিল, ছাড়াতে পারে নি।

ভুচুমাসির এই রকম কাঠ কুড়নো স্বভাব আছে। গোপাল একবার বলেছিল, গতজন্মে তুমি নির্ঘাৎ কাঠকুড়ুনি ছিলে মাসিমা! ভদ্রলোকের বাড়ির মেয়েরা এসব করে না। শুনে ভুচুমাসি পা ছড়িয়ে বসে কোন্ ধাদ্দাড়া-গোবিন্দপুরে তার বড়লোক শ্বশুরের কাহিনী ফেঁদে বসেছিল। বালবিধবা হয়ে পোড়ামাতলায় বুড়ো বাবা-মায়ের গলায় আটকেছিল বলেই পরের সংসারে এসে দাসীবৃত্তি। বাবা মা মারা গেল। তখন আর কি করা? দিদি নসু বিধবা বোনকে নিজের কাছে এনে রাখল। তখনও সে জানত না, দিদির সংসারের দায় শেষে তার মাথাতেই পড়বে। জানলে কি সে এ সংসারের অন্নজল খেত আর? বরং কারুর বাড়ি ঝিগিরি করে বেঁচে থাকত।

বেগতিক দেখে গোপাল সামনে থেকে কেটে পড়েছিল। ছোটবেলায় গোপল টের পেয়েছে ভুচুমাসিকে কেন্দ্র করে তার বাবা মায়ের মধ্যে চাপা মন-কষাকষি ছিল যেন। শীতলদিতে কানাঘুষোও ছিল দীনবন্ধুর সঙ্গে তাঁর শ্যালিকার সম্পর্ক নিয়ে। তবে দীনবন্ধু দাপুটে মানুষ। গ্রাহ্য করতেন না কিছু। একবার গাজনের দিনে চাটুয্যে তাঁর নামে কেলেঙ্কারির ছড়া বেঁধে দলবল নিয়ে গাইতে বেরিয়েছিলেন। দীনবন্ধু মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিলেন চাটুয্যের।

ভুচুমাসির কাণ্ড দেখতে দেখতে গোপালের মনে ঝাঁক বেঁধে এই সব পুরনো কথা ভেসে আসছিল। তারপর যেমনি খেয়াল হল, তাহলে তিন্নির সঙ্গে তার বিয়ের কথা হয়েছে, অমনি তার বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল। তিন্নি তার বউ হবে! এ কি সত্যি?

সত্য-মিথ্যার বাইরে দাঁড়িয়ে গোপাল উদাসীন চোখে তিন্নিকে সামনে দাঁড় করিয়ে একটু দেখে নেওয়ার পর ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে পা বাড়াল।

ভুচুমাসি আধকাটা মোটা শেকড়টা ছাড়াতে না পেরে ক্লান্তভাবে উঠে দাঁড়িয়ে গোপালের চলে যাওয়া দেখে ডাকাল, ও গোপাল! চললি কোথা আবার? খেয়ে যা না বাবা!

গোপাল আনমনে বলল, আসছি। ...

গোপাল উদাসীনতা সঙ্গে নিয়ে পা ফেলছিল। সে খুশি হবে কি না বুঝতে পারছিল না। প্রথম দিনই তিন্নিকে বারান্দায় বসে থাকতে দেখেছিল তার মুখের এক পাশে নরম আলো পড়েছিল আর বৃষ্টিটাও ছিল প্রচণ্ড— হঠাৎ ভীষণ পছন্দ হয়ে গিয়েছিল তার। ঠিক ভালবাসা নয়। ভালবাসা অন্য জিনিস, গোপাল বোঝে তা কি। ভালবাসা একটা নেশার জিনিস। মাতিয়ে তোলে। গোপাল তিন্নির জন্যে মেতে ওঠে নি। বরং তিন্নি যদি তার জন্যে মেতে ওঠে, তার ভালই লাগবে। আসলে তিন্নির মধ্যে ছিমছাম একটা ব্যাপার আছে। সূক্ষ্মতা আছে। সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানটা সম্পর্কে তার মনোযোগ থাকে না—তার দৃষ্টি দূরে। তার দিকে তাকিয়ে যখন কথা বলে তিন্নি, গোপালের মনে হয়, তাকে ঠিক দেখছে না—দেখছে তার বাইরের জিনিসগুলো। এমন মেয়ের কাছাকাছি যেতে অস্বস্তি হয়।

না—এটা তিন্নির শহুরেপনা নয় বা শিক্ষাদীক্ষার সেই দূরত্বব্যঞ্জক ছটা নয়, যা গোপালের মতো ছেলেকে ভড়কে দেবে। আর গোপাল ভড়কানোর পাত্রও নয়। শহুরেপনা ও শিক্ষাদীক্ষায় পরিশীলিত বহু মেয়েকে সে দেখেছে। আলাপও হয়েছে তাদের সঙ্গে। মোতিগঞ্জ আজকাল দারুণ টাউন। লোকেরা ডেলিপ্যাসেঞ্জারি করে কলকাতায় যায়। বর্ডার পেরিয়ে আসা বিদেশি পোশাক-আশাক, হরেক ইলেকট্রনিক্স আর বিবিধ পণ্যে ভরা মোতিগঞ্জের বাজার। আশে-পাশের পাড়াগাঁয়েও তা ছড়িয়ে গেছে। আ-দেখলা, বোকা-মুখ্যু, সরলমনা মানুষজনেরা এখন আর নেই। ধড়িবাজ, আইনজ্ঞ, মারকুটে লোকেরা সবখানে বাঁকা চোখে তাকিয়ে আছে। তপ্ত রাজনৈতিক ধুন্দুমার। গোপাল এদের ভেতর বেঁচে আছে। ধরি মাছ না ছুঁই পানি, এমন গেঁয়ো কাপ্তেন না হলেও সে কতকটা পাঁকাল মাছ। তিন্নি এমন কিছু সাংঘাতিক মেয়ে নয়। তবু তিন্নি সম্পর্কে তার ভেতরে একটা চাপা অস্বস্তি আছে। তিন্নি কি তাকে পছন্দ করে? এই প্রশ্নটাও আছে।

নন্দর বাড়ির পিছন দিয়ে যাওয়ার সময় রাতের কথাটা আবার মনে পড়ল গোপালের। একটু ইতস্তত করে সে রাধার বাড়ির ওপাশ ঘুরে নন্দর বাড়ির সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেল। রাধার বাড়ির দরজা খোলা। ভেতরে চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়াল গোপাল।

উঠোনা দাঁড়িয়ে আছে শংকরী ও রাধা। গোপাল ঢুকে পড়ল।

রাধা চোখ পাকিয়ে বলল, কী রে শালা? এমন সাড়া না দিয়ে হুট করে মেয়েছেলের বাড়ি ঢুকলি যে?

গোপাল হাসল না। গম্ভীর ভাবে বলল, শংকরী বউদির সঙ্গে দরকার আছে।

রাধা খিক খিক করে হেসে একটা ভঙ্গী করে বলল, ওর জন্যে তোর দেখি দরদ উথলে উঠছে!

গোপাল গ্রাহ্য না করে বলল, বউদি, তোমার জন্যে একটা ভাল কাজ খুঁজেছি। পাটোয়ারিজীর বাড়িতে থাকবে। থাকা-খাওয়া, কাপড়-চোপড় মাইনে—সবই পাবে।

শংকরী তাকিয়ে রইল। রাধাও গম্ভীর হয়ে বলল, ওরা মানুষ ভাল। কি শংকরী? যাবে?

শংকরী একবার গোপালের দিকে একবার রাধার দিকে তাকিয়ে বলল, যাব?

রাধা খেঁকিয়ে উঠল, যাব? যাবে না তো কি রোজ রাতে ধ্বংস-পুরীতে থেকে নাকিকান্না কাঁদতে কাঁদতে এসে আমাকে ঘুম থেকে জাগাবে? তারপর আবার আমার বাড়িতে ঢিল পড়া শুরু হোক!

গোপাল বুঝল, কাল রাতে শংকরী রাধার কাছে শুয়েছিল। কাথাটা সে তুলল না। বলল, যেতে হলে রেডি হও। আমি খেয়ে আসছি। সঙ্গে করে রেখে আসব।

রাধা বলল, অন্যমত করিস নে। পাটোয়ারিজিরা লোক ভাল। পাটোয়ারিগিন্নি মাটির মানুষ। কাজকম্মো করে দিবি। আর অন্য ভয় যদি করিস, বলব— নিজের মুঠো শক্ত করে বুজে রাখলে কার সাধ্যি তা খোলে রে? আমাকে দেখছিস না তুই?

শংকরী মাথাটা সামান্য দোলায়। তারপর একটু দ্বিধার সঙ্গে বলল, আমি চলে গেলে যদি ভিটেমাটিটুকু কেউ দখল করে নেয়?

রাধা হেসে উঠল। ভিটে চিনেছে পোড়ারমুখী। ওই দূষী ভিটেতে ঘুঘুও চরতে যাবে না। আত্মহত্যার ভিটেয় জেনেশুনে কে বাস করার সাহস পাবে রে? চলে যা গোপালের সঙ্গে। ওপারে গেলে দেখে আসব কেমন আছিস।

গোপাল বলল, তাহলে রেডি হয়ে ঘাটে গিয়ে ওয়েট কর। আমি যাচ্ছি।...

বাড়ি ফিরে গোপাল ভুচুমাসিকে তাড়া দিয়ে বলল, শিগগির খেতে দাও, মাসিমা। এখনই বেরুতে হবে।

তিন্নি বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। হাতে এক মুঠো চাল। উঠোনে কয়েকটা পায়রা এসে বসেছে। চাল ছড়াচ্ছে সে। পায়রাগুলো বকবকম করে খাচ্ছে। তিন্নির মুখে বিস্ময়ের হাসি। গোপালের দিকে তাকাল সে। গোপালের মনে হল, তিন্নি কি জানে তার সঙ্গে বিয়ের কথা হয়েছে? নিশ্চয় জানে না। জানলে হয়তো—

গোপাল আর ভাবতে চাইল না। লুচি, বেগুনভাজা, আলুর তরকারিতে মন দিল। পাতে সন্দেশ দেখে জানতে চাইল, কে এনেছে। ভুচুমাসি বলল, আবার কে? তুই কি ভুলেও কিছু ভাল মন্দটা আনবি? বাড়িতে কুটুম্ব। সে খেয়ালও তো তোর নেই। আজ নিবারণকে একটু খবর দিয়ে যাস। মাছগুলান চোরে মেরে দিচ্ছে। কুটুম্বদের ভোগে লাগুক অন্তত।

তিন্নি পায়রাদের সঙ্গে খেলায় মেতে থেকে হঠাৎ বলল, ও গোপালদা, চলুন না, পঞ্চমুখী শিবের মন্দির দেখে আসি।

ভুচুমাসি মুখ টিপে হেসে বলল, সে কি এখানে। নৌকো করে যেতে হবে ভাটিতে। থামো, থামো। কতবার পঞ্চমুখী শিবমন্দির দেখবে মা। মায়ে-ঝিয়ে কতবার যাব। উজিয়ে ফিরে আসতে গোটা একটা দিন।

তিন্নি যেন একটু অবাক হল। কিন্তু কিছু বলল না। গোপাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ব্যাপারটা লক্ষ্য করল। তিন্নি পায়রাদের ঝাঁকে চাল ছড়িয়ে আপন মনে বলল, বনমালা-জপমালারা নিয়ে যাবে বলেছে। একাই চলে যাব ওদের বাড়ি। রাস্তাঘাট আমার মুখস্থ হয়ে গেছে কাল।

সেজে-গুজে সিগারেট ধরিয়ে গোপাল বেরুল।

ঘাটের সামান্য তফাত থেকে হইহল্লা শুনতে পাচ্ছিল গোপাল। ঘাটে প্রায়ই ঝামেলা লেগে থাকে। গরুর গাড়ির গাড়োয়ানদের মধ্যে মারপিট হয়। কখনও ট্রাক-টেম্পোর ড্রাইভারদের মধ্যেও ঝগড়া হয়। ঘাটমাঝিদের সঙ্গে গাড়োয়ানরা খদ্দের ভাড়া নিয়ে বচসা করে। দিনে দিনে ঘাটের ভিড়টা বেড়েছে। কিন্তু পারাপারের সুব্যবস্থা হয় নি। ঝামেলা হওয়াই স্বাভাবিক। গোপাল দেখল পুটুনের চায়ের দোকানের সামনে একটা ভিড় এবং চেঁচামেচি সেখানেই হচ্ছে।

তারপর তার কানে এলো, মদন মুদি চেঁচাচ্ছে, পাইপয়সা মিটিয়ে না দিলে কিছুতেই যেতে দেব না। তার গলা ছাপিয়ে পুটুনের গর্জন শুনল গোপাল। সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না। দেখি, দেখি তোমার স্যুটকেসে কী আছে? গয়নাগাঁটি থাকলে পঞ্চায়েত ডেকে সেগুলো বেচে হোক, বন্ধক দিয়ে হোক, দেনা মিটিয়ে তবে যেতে হবে।

ভিড় খ্যা খ্যা করে হাসছে। কেউ কেউ তাতিয়েও দিচ্ছে। চুল কেটে নাও, শোধ হয়ে যাবে বলে পরামর্শ দিচ্ছে। গোপাল ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

শংকরী জবুথবু হয়ে একটা ছোট্ট টিনের স্যুটকেস আর একটা পোঁটলা বুকে আঁকড়ে ধরে বসে আছে। গোপাল সঙ্গে সঙ্গে বুঝল, কি হয়েছে।

গোপালকে দেখে পুটুন আরও জোরে চেঁচাল। এই তো আমার পাকা সাক্ষী আছে। ওর সামনে ঠাকুরমশাই স্বীকার করে গেছে তিন টাকা পঁচিশ পয়সা বাকি।

মদনের গায়ে ফতুয়া, পরনে লুঙ্গি। গলায় তুলসীকাঠের মালা। মাথায় টিকি। সেও গলা চড়িয়ে বলল, দেব-দিচ্ছি করে সাত টাকার ওপর বাকি। এই ঠাকরুণ নিজেও নিয়ে গেছে—জিজ্ঞেস কর ওকে। কি ঠাকরুণ! মিথ্যে বলছি?

শংকরী করুণ ভিজে চোখে মুখ তুলে একবার তাকাল। তাকাতে গিয়েই গোপালকে দেখতে পেয়ে আর্তনাদ করে উঠল, ঠাকুরপো!

গোপাল পুটুনকে শান্তভাবে বলল, ঠাকুরমশাইয়ের বাকির জন্যে ওর ওপর জুলুম করছ কেন পুটুনদা? চা তো বউদি খায় নি।

পুটুন মুখ বিকৃত করে বলল ইশ! তোমার যে দেখছি বড্ড দরদ। তবে দাও না ওর হয়ে মিটিয়ে।

ভিড়ের ভেতর থেকে কেউ বলল, এখনই কি, আরও কত দরদওলা বেরুবে। গোপাল ঘুরে দেখে বুঝতে পারল না কে বলল কথাটা। সে প্যান্টের পকেট থেকে পার্স বের করে তিন টাকা আর একটা সিকি গুঁজে দিল পুটুনের হাতে।

ভিড় অবাক হয়ে চুপ করল। লোকেরা চোখ বড় করে তাকিয়ে আছে। চোখের সামনে এমন অবিশ্বাস্য ঘটনা!

গোপাল মদনকে বলল, আপনার কত?

মদন বলল, খাতা দেখতে হবে। সাতটাকার মতো হবে।

এই নিন।

স্টেশনারি দোকানের অভয় দাঁত বের করে বলল, গোপাল, আমারও কিছু আছে।

গোপাল ভুরু কুঁচকে বলল, কত?

টাকা পাঁচেক।

শংকরী উঠে দাঁড়িয়ে কান্নার সঙ্গে বলল, মিথ্যে—একেবারে মিথ্যে কথা ঠাকুরপো। দুল বন্ধক দিয়ে ওর টাকা শোধ করেছি। ঠাকুরপো, একপয়সা দেবেন না ওকে।

অভয় অশ্লীল ভঙ্গী করে বলল, মিথ্যে? ওরে আমার সতীঠাকরুণ রে! পাওডার-স্নো মেখে মেমসাহেব হবার সাধ তো ষোল আনা! আবার বলে মিথ্যে। আমি মিথ্যেবাদী?

অভয়ের দিকে, তারপর শংকরীর দিকে তাকিয়ে গোপাল বুঝতে পারল না, কে মিথ্যে বলছে। সে পার্স থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বের করেছিল। ভাবছিল কি করবে। সেই সময় তার চারিদিক থেকে অনেকগুলো হাত বেরিয়ে এলো..... গোপাল, আমার পাঁচ টাকা পাওনা।.... গোপাল, আমার পাওনা পাঁচ পয়সা। .... সঙ্গে সঙ্গে কে টিপ্পুনি কাটল, ফুটো পাঁচ পয়সা। লোকগুলো খ্যা খ্যা করে হাসছিল। চারিদিকে বাড়ানো হাতগুলো কদর্য গা ঘিনঘিন করা সাপের মতো কিলবিল করছে। হাতগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নোটটা পার্সে রেখে হিপপকেটে গুঁজল। তারপর চাপা গর্জন করে সে ছড়ানো হাতগুলোর ওপর এলোপাথাড়ি ঘুষি চালাতে শুরু করল। তারপর ওদের মধ্যে একজন 'উ রে শালা ঢ্যামনা!' বলে চেঁচিয়ে উঠতেই গোপাল রাগে হিংসায় খেপে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর।

এবার মারপিট বেধে যেতে দেরি হল না। চারদিক থেকে তার ওপর এলোপাথাড়ি চড় ঘুসি কিল এসে পড়তে থাকল। মার শালাকে! মেরে শেষ করে দে ঢ্যামনা রাণ্ডীবাজকে! এই সব প্রচণ্ড গর্জন আর মার। গোপালের ঠোঁট কেটে রক্ত। সে একলাফে পুটুনের দোকানের সামনে চটের ছাউনি থেকে একটা বাঁশ ছাড়িয়ে নিল।

বাঁশ ঘোরাতে ঘোরাতে এগোতেই একটা আধলা ইট এসে লাগল তার কপালে। রক্তে মুখ ভেসে গেল। রক্ত দেখে সে আরো ক্ষেপে গেল। হিংস্র গর্জন করে তেড়ে গেল গোপাল। লোকগুলো ছড়িয়ে পড়ে ঢিল পাটকেল কুড়ুচ্ছিল।

ঘাটোয়ারি প্রসাদজি গদিতে বসে দেখছিলেন এতক্ষণ। একবার গাড়োয়ানদের সঙ্গে গণ্ডগোলের সময় গোপাল তার পক্ষ নিয়ে কথা বলেছিল। মনে ছিল প্রসাদজির। আর স্থির থাকতে পারলেন না। দৌড়ে গিয়ে গোপালকে ধরলেন। গোপাল ছাড়ানোর চেষ্টা করছিল। প্রসাদজি বললেন, ছিঃ গোপাল! মাথা ঠাণ্ডা রাখো বেটা।

এদিকে প্রসাদজিকে যেতে দেখে তাঁর মাঝিরাও গিয়ে দাঁড়াল পাশে। নব গর্জন করে বলল, আয় বে শালারা! কোন্ বাঞ্চোত গোপালবাবুর গায়ে হাত দিবি, আয় দেখি!

ঘাট-মাঝিরা গোপালকে খুব খাতির করে। তাদের চা খাওয়ায় সে। বাড়তি বখশিস দেয়। টাকা ধারও দেয় কখনও কখনও। এতক্ষণ তারাও ব্যাপারটা নেহাত তামাশা ভেবেছিল। কিন্তু গোপালের রক্ত দেখেই তাদেরও টনক নড়ে গেছে। শম্ভু মাঝি বুড়ো মানুষ। সেও নড়বড় করতে করতে এগিয়ে এসেছে। তার হাতে লম্বা লগি।

প্রসাদজি গোপালকে ধরে টেনে আনছিলেন। তিনি গিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাঙ্গামা থমকে গিয়েছিল। তারপর দেখা গেল, আলগা ডিঙির মাঝিরাও একে-একে উঠে আসছে। এ তাদের কৃতজ্ঞতা। গোপালকে তারা চেনে। গোপালের সঙ্গে তাদেরও ভাব আছে। গোপালের রক্ত দেখে তাদের ভীষণ খারাপ লেগেছে।

তারা এসে তাদের নিত্য প্রতিদ্বন্দ্বী ঘাটোয়ারিজির মাঝিদের পাশে দাঁড়িয়ে গেল কঠিন একটা দেয়ালের মতো।

এই হিন্দুস্থানী মাঝিদের প্রতি শীতলডিহির লোকের মনে চাপা আতঙ্ক আছে। যেমন আছে সুখলালজির আড়তের হিন্দুস্থানী মুটেদের সম্পর্কে। এদের হিন্দুস্থানী বলে স্থানীয় লোকে। এরা বিহার মুলুকের বাসিন্দা। তাগড়াই স্বাস্থ্য। ভোরবেলা গঙ্গার মাটি মেখে ঘাটের চাটানে পরস্পর কুস্তি করে। প্রতি বর্ষায় এলাকার গ্রামে গ্রামে যে 'মালগো' প্রতিযোগিতা হয়, সেখানে যোগ দেয়। এ তল্লাটে এ একটা ঐতিহ্যসম্মত প্রথা। বহু পুরনো আমল থেকে চলে আসছে। শীতলডিহিতে কেউ কুস্তি লড়ার মতো মানুষ নেই। কাজেই সম্ভ্রম মেশানো আতঙ্কটা ধারাবাহিক।

হাঙ্গামাটা তখনকার মতো থেমে গেল। তবে নেহাত একটা মজা বা খেলা থেকে হঠাৎ এমন রক্তারক্তি ব্যাপার ঘটে যাওয়ার পিছনে তেমন জনসমর্থনও ছিল না। দোকানপাট ঝাঁপ বন্ধ করে নি। একা দীনবন্ধুর ছেলে এক যুবতী বিধবার জন্যে লড়াই দিতে নেমেছে এটাই আসলে বড় উপভোগ্য ছিল।

প্রসাদজির সমর্থন পেয়ে বয়স্করা এতক্ষণে এগিয়ে এসেছিলেন। ঘাটোয়ারিবাবুর গদিতে গোপাল গিয়ে বসেছে। তার প্যান্ট-শার্টেও রক্ত লেগেছে। মুখটা রক্তে ভীষণ দেখাচ্ছে। আবার ভিড় বাড়ছিল। গ্রামের ভেতর খবর চলে যাওয়ায় অনেকে দৌড়ে আসছিল।

গোপাল রুমাল বের করে রক্ত মুছতে মুছতে শংকরীকে খুঁজছিল। তারপর দেখল, শংকরী ঘাটের নিচে একটা আকন্দঝোপের কাছে প্রাণ ভয়ে লুকিয়ে থাকা প্রাণীর মতো কুঁকড়ে বসে আছে। বুকের কাছে আটকে রেখেছে ছোট্ট টিনের স্যুটকেস আর পুঁটুলিটা।

গোপাল উঠে দাঁড়াল। প্রসাদজি বললেন, গোপাল! হাজরা ডাক্তারবাবুর দাওয়াখানায় যেয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধলো একঠো। এ নবুয়া, গোপালবাবুকে লিয়ে যা।

কিন্তু গোপাল হনহন করে হেঁটে শংকরীর কাছে গেল। তারপর হ্যাঁচকা টানে তার স্যুটকেস আর পুঁটুলিটা কেড়ে নিয়ে বলল, ওঠ।

সামনের ডিঙিটায় গিয়ে উঠল সে। শংকরী মুখ নিচু করে ডিঙিতে পা রাখলে গোপাল তার একটা হাত ধরে সাহায্য করল। তারপর ডিঙির মাঝিকে বলল, চল!

অবাক মাঝি লগি ডুবিয়ে ডিঙিটা স্রোতে ঠেলে দিতে গোপাল কিনারায় বসে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে রক্ত ধুতে থাকল। শংকরী ভাঙা গলায় বলল, ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে হবে। দাঁড়ান, কাপড় দিচ্ছি। বলে সে পুঁটুলি থেকে একটা শাড়ি বের করে ফরফর করে লম্বা ফালি ছিঁড়ে ফেলল।

ঘাটের মাথায় বিরাট ভিড় স্তম্ভিত, ভীষণ অবাক। স্তম্ভিত এবং অবাক প্রসাদজিও। সারা শীতলডিহি তাকিয়ে দেখছে, গোপাল নোলে ঠাকুরের বিধবা যুবতী বউটাকে নিয়ে ভেসে চলেছে।

অরুণ বলল, তুই বরাবর এক নম্বর গেঁইয়া ভূত থেকে গেলি।

গোপাল বলল, থাম তো বাবা! খালি কানের কাছে ভ্যাজর ভ্যাজর। অন্য কথা বল।

অরুণ বলল, একটা মেয়ের মতো মেয়ে হলে না হয় লড়াই দিতিস। ওই পটকা মেয়েটা—তার ওপর এক গেঁজেল বুড়োর কাছে শুয়েছে। তার জন্যে তুই তিন কিলো রক্ত খরচ করে ফেললি!

গোপাল উঠে হাঁটতে শুরু করল। সারদা ডিস্পেন্সারিতে এ-টি-এস ইঞ্জেকশান এবং কপালে ব্যাণ্ডেজ নিতে হয়েছে অরুণের টানাটানিতে। তারপর চপলা রেস্তোরাঁয় ঢুকে কোণার টেবিলে বসে অরুণ তাকে বুকনি ঝেড়ে চলেছে। বিরক্ত হয়ে গোপাল রাস্তায় বেরিয়ে আসছিল।

অরুণ পিছন থেকে তার কাঁধ ধরল। তুই কি ভেবেছিস?

অগত্যা গোপাল হাসল। তুই কেমন করে ভাবলি, আমি শংকরীর প্রেমে পড়ে মারপিট বাধিয়েছি? বাই চান্স ঝোঁকের মাথায় হয়ে গেল। তাছাড়া ওই অবস্থায় পড়লেও তুইও তাই করতিস।

আমি তো তোর মতো বুদ্ধু নই। অরুণ তার পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলল, প্রেম ট্রেম যদি থাকে, ওকে। ওকে বাড়িতে রেখেই পয়সাকড়ি দিয়ে—

গোপাল ঘুরে দাঁড়াল। অরুণ, তা যদি ভাবিস, তোর সঙ্গে আমার সম্পর্ক থাকবে না। এই শেষ।

অরুণ মুচকি হেসে বলল, এত রেগে যাচ্ছিস কেন রে? শরীর থেকে খানিকটা রক্ত কমে গেলে মানুষকে টায়ার্ড দেখায়। তুই দেখছি উল্টো। ঠিক আছে বাবা। তা এমন করে চললি কোথায়?

বাড়ি ফিরতে হবে না?

আবার দুজনে হাঁটতে থাকল। অরুণ বলল, ঘাটে আছাড় খেয়ে পড়ে তোর কপাল আর ঠোঁট কেটে গেছে, মায়ের মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, কথাটা যেন বিশ্বাস করেন নি।

গোপাল একটু চমকাল। তাই কি?

পরে বুঝতে পারব। তবে মেয়েটাকে ভীষণ নার্ভাস দেখাচ্ছিল। মা ভীষণ ইনটেলিজেন্ট।

গোপাল একটু পরে বলল, ঠিক আছে। মাসিমা যদি রাখতে না চান, অন্য কোথাও চেষ্টা করব।

আচ্ছা গোপাল, সত্যি করে বলতো আমাকে— কেন ওকে নিয়ে তোর এত মাথাব্যথা?

বাঃ। মেয়েটাকে শীতলদির শুয়োর বাচ্চারা ছিঁড়ে খাক!

দ্যাখ গোপাল, কে কাকে ছিঁড়ে খাচ্ছে, তা নিয়ে মাথা ঘামানোর মানে হয় না। তুই তো গভমেণ্ট নোস। পুলিশও নোস। বড় জোর মেয়েটার হয়ে থানায় জানাতে পারিস।

গোপাল আর কথা বলল না। অরুণ বকবক করতে করতে ঘাট পর্যন্ত এলো তার সঙ্গে। গোপাল যখন নৌকোয় উঠতে যাচ্ছে, সে বলল, ওবেলা আসিস কিন্তু। আর--

আর কী?

এভাবে যে যাচ্ছিস, তোর সেফটির কথা ভাবছিলাম।

ধুস!

অরুণ হাসতে লাগল। সবতাতেই তোর ধুস! দেখিস বাবা।

গঙ্গা পেরিয়ে ওপারের ঘাটে পৌঁছে গোপাল দেখল সার বাঁধা ডিঙিগুলো সরকারি ঘাট থেকে একটু তফাতে ভেসে আছে। ডিঙিওলা মাঝিরা তাকে প্যাট-প্যাট করে তাকিয়ে দেখছিল। গোপাল তাদের একজনকে বলল কাল মহাবীর মন্দিরঘাটে গিয়েছিলাম একটা ডিঙিতে— কাঁচাপাকা চুল। মোটা টিকি। কি যেন নামটা—

লোকটা সে কথায় কান না করে বলল, গোপালবাবু, শুনলাম কি গাঁওমে বহত ফসুরফাসুর হোচ্ছে। হোঁসিয়ারি সে যানাআনা করবেন। আপনি তো তখন চলিয়ে গেলেন, লেকিন উসকে বাদ ফির ভি ঝামেলা হোয়েছে।

গোপাল চটে গিয়ে বলল, ধুস! হাম ক্যা পুছতা—বলে আর দাঁড়াল না। সারবাঁধা ডিঙিগুলোর ওপর দিয়ে লাফ দিতে দিতে এগোল। কালকের মাঝি জামবাটিতে ছাতু খাচ্ছিল। চিনতে পেরে গোপাল বলল, আমার ছাতি?

বুড়ো মাঝি গোপালকে অবাক চোখে দেখার পর মাথাটা একটু দোলাল। হাঁ, হাঁ, ছাতি। বলে সে ছইয়ের ভেতর গুঁজে রাখা কালো ছাতিটা দেখিয়ে দিল।

ছাতি নিয়ে গোপাল একটা টাকা ছুড়ে দিল লোকটার দিকে। লোকটা বাঁহাতে অদ্ভূত দক্ষতায় তা লুফে নিয়ে গোঁফ মুছে হাসল।

গোপাল চলে এলো। মেঘ কেটে গনগনে সূর্য খর রোদ ঢালছে আজ। বাতাস বন্ধ। গরমে দরদর করে ঘাম ঝরছে গোপালের। বাজার পেরিয়ে যাবার সময় সে কোন দিকে তাকাল না। কিন্তু টের পেল, অনেকগুলো চোখ তাকে দেখছে। নোলে ভটচাযের বিধবাকে নিয়ে ভেগে গিয়েছিল, আবার তাকে ফিরতে দেখে এবং একা লোকেরা অবাক হয়েছে হয়তো।

গ্রামের সদর রাস্তা দিয়েই বাড়ি ফিরল গোপাল।

বাইরে ঘরের বারান্দায় গ্যাঁদা বসে ছিল। ভুচুমাসি দাঁড়িয়ে ছিল খোলা দরজার কাছে। দুজনের মুখেই থমথমে ভাব। চাপা গলায় কথা বলছিল। গোপালকে আসতে দেখে দুজনেই থেমে গেল। তারপরে ভুচুমাসি ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। গ্যাঁদা তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ছোটবাবু! তুমি ঠাকুরমশায়ের—

গোপাল দ্রুত বলল, চুপ কর!

গ্যাঁদা বলল, চুপ করব কেন? তোমাকে শালারা মারবে আর আমি চুপ করে থাকব? আমাকে

নামগুলান বল, তারপর যা করার করছি।

গোপাল হাসল। মিটে গেছে গ্যাঁদা। ছেড়ে দে।

গ্যাঁদা পিছন পিছন বাইরের ঘরে ঢুকে বলল, ছাড়ার অবস্থা আর নেই ছোটবাবু। সেজসিঙ্গি ঘোঁট পাকিয়ে ফেলেছে। গাঁয়ের লোক বলছে, তোমার জন্যেই ঠাকুরমশাই আত্মহত্যা করেছে।

গোপাল দাঁড়িয়ে গেল।

গ্যাঁদা বলল, চারিদিকে ঢি ঢি। কেলেঙ্কারির চোটে অস্থির। একটু আগে মদনবাবুর বউ এসে তোমার মাসিমাকে একশো কথা শুনিয়ে গেল। বিধবা মেয়েটাকে নিয়ে তুমি পালিয়ে গেছ। আমি বললাম, এ কি অসম্ভব কথা! ছোটবাবুর সাদা কাপড়ে আজ পর্যন্ত কেউ কালির ছিটে দিতে পারে নি—আর তুমি বললেই শুনব? রাধাদি বলছিল, ওকে চাকরিতে লাগিয়ে দিতে সঙ্গে নিয়ে গেছ।

ভেতরের দরজায় তিন্নি এসে দাঁড়াল। গোপালের দিকে তাকিয়ে রইল। গোপাল একটু হেসে বলল, ছাতিটা পেয়েছি।

ছাতিটা তিন্নি আল্‌তো হাতে নিয়ে হাসল। ভদ্রমহিলাকে কোথায় রেখে এলেন?

পাটোয়ারিজির বাড়িতে।

তারপর?

গোপাল ভুরু কুঁচকে বলল, তারপর কী?

তিন্নি বলল, এ-টি-এস ইঞ্জেকশান নিয়েছেন তো?

গোপাল তার পাশ দিয়ে ভেতরের বারান্দায় গেল। ভুচুমাসি শশার মাচানের তলায় ঢুকে গেছে। খুপরি দিয়ে কি একটা করছে। গোপাল হাসল, মাসিমা! ক্ষিধে পেয়েছে।

কোন জবাব এলো না। গোপাল নিজের ঘরে ঢুকে প্যান্ট-শার্ট খুলে ফেলল। রক্তের ছিটে লেগে আছে শার্টে। গুটিয়ে মেঝেয় ছুড়ে ফেলল। তারপর আণ্ডারপ্যান্টের ওপর তোয়ালে জড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাল।

তিন্নি ঘরে ঢুকে কপাটে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে চোখে হেসে বলল, রাগ করেছেন আমার ওপর, গোপালদা?

গোপাল বলল, না।

ছেলেদের এ ধরনের সিভ্যাল্‌রি আমি পছন্দ করি।

আমি ইংরেজি বুঝি না, অনুরাধা। গেঁয়ো মুখ্যু মানুষ। বলে গোপাল সাবান-কৌটো নিয়ে তিন্নির পাশ কাটিয়ে বারান্দায় গেল।

তিন্নি বলল, সে কি! আপনি চান করবেন! জল লাগলে কাটা সেপটিক হবে যে।

গোপাল কুয়োতলার কাছে গেল। একটু ভাবল। তারপর সাবান-কৌটো সেখানেই রেখে খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে গেল। শশা মাচানের তলা থেকে ভুচুমাসি চোখ কটমটিয়ে তাকে দেখছিল। ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে হাত ধুতে গেল কুয়োতলায়।

গোপাল ঘাটে নেমে সাঁতার কাটতে থাকল। ঘাটে পাড়ার কয়েকটি মেয়ে স্নান করতে নেমেছিল। তারা অবাক চোখে গোপালকে দেখতে থাকল। গোপাল চিৎ সাঁতার দিয়ে দূরে চলে গেলে মেয়েগুলো ঝটপট স্নান সেরে চলে গেল।

গোপাল দূরে ভেসে থেকে দেখছিল ঘাট ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। সে মনে মনে হাসছিল। পাড়ার বউঝিরা গোপলের মতো লম্পট ছেলের সঙ্গে একঘাটে হয়তো স্নান করতে রাজি নয়।

বাতাস বন্ধ। গঙ্গার জলে ঢেউটা খুব কম। গোপাল জলের সঙ্গে খেলায় মেতে উঠল। কিছুক্ষণ পরে যখন সে ঘাটে ফিরল, দেখল তিন্নি এসে হিজলতলায় দাঁড়িয়ে আছে।

তিন্নি ডাকল, গোপালদা!

জলে গলা অব্দি ডুবিয়ে ভেসে থেকে গোপাল নির্বিকার ভঙ্গীতে বলল, ব্যাড ক্যারেক্টার লোকের সঙ্গে আর মিশো না অনুরাধা।

তিন্নি প্রায় চেঁচিয়ে বলল, কি হচ্ছে গোপালদা?

তুমি তখন কি বললে। পাটোয়ারিজির বাড়িতে শংকরী বউদিকে রেখে এলাম শুনে তুমি বললে,

তারপর?

আপনি ভীষণ নেগেটিভ। আমি কিছু খারাপ ভেবে বলি নি।

অনুরাধা! তুমি কি জানো, তোমার সঙ্গে আমার—

শুনেছি। থাক ও সব কথা।

থাকবে কেন? বোঝাপড়া হওয়া ভাল।

তিন্নি হঠাৎ হাসল। আপনি অদ্ভুত! সহজে এ সব ব্যাপারে বোঝাপড়া হয় না। সময় লাগে।

গোপাল এককোমর জলে সোজা হয়ে দাঁড়াল। বলল, তুমি কাল নিজের চোখে দেখেছ, মেয়েটা এসে আমার পায়ে পড়ল।

আঃ! আমি ও সব নিয়ে কিছু ভাবি নি।

তবু গোপাল বলল, একটা হেল্পলেস মেয়ে। তার ওপর কুকুরগুলো ঝাঁপিয়ে পড়বে, আর গোপাল তা দাঁড়িয়ে দেখবে, সেটা হয় না।

বলছি তো, আপনি সিভ্যালরি দেখিয়েছেন। আপনি পরোপকারী!

ঠাট্টা হচ্ছে?

তিন্নি সঙ্গে সঙ্গে রাগ করে চলে গেল।

গোপাল একটু হেসে আবার এক পাক ঘুরে এলো গভীর স্রোতের জল থেকে। তারপর যখন সে ঘাটের ওপর ঘাসে দাঁড়িয়ে তোয়ালে দিয়ে গা মুছছে, তার চোখে পড়ল, ঘাটে আসার পথে বাঁশঝাড়ের ছায়ায় একদঙ্গল বউঝি দাঁড়িয়ে আছে। তারা তার ঘাট ছেড়ে যাওয়ার অপেক্ষা করছে। গোপাল বলল, ছেনালি!

ছেনালি দেখলি কার রে গোপলা?

গোপাল পিছন ঘুরে আকন্দবনের কাছে রাধাকে দেখতে পেল। কাঁধে তোয়ালে, হাতে সাবান-কৌটো আর কাঁখে পেতলের ছোট্ট ঘড়া নিয়ে রাধা আসছে।

গোপাল হাসল। তোমার কান মাইরি রাধাদি!

রাধা বাশঝাড়ের কাছে বউঝিদের দঙ্গলটা দেখে নিয়ে বাঁকা হেসে বলল, ঢঙ মাগিদের! তারপর ওদের শুনিয়ে সুর ধরে ছড়া কাটল, 'লঙ্কাধামে রাবণ মলো/ বেউলো কেঁদে রাঁড়ি হল'—সেই অবস্থা। এ গোপাল, গঙ্গায় পাপগুলান ধুয়ে গেছে তোর। চিন্তা করিস না!

বাতাস বন্ধ। চেঁচিয়ে কথাগুলো বলেছে রাধা। গোপাল জিভ কেটে বলল, তোমার মাইরি বড্ড লুজ টাং, রাধাদি! গিয়ে বাড়িতে লাগাবে, আর তোমার ওপর ঝামেলা এসে পড়বে।

রাধা একই গলায় বলল, থাম বে! ঝামেলা হবে! শীতলদিতে কে কত সতী আমার জানা আছে। বলে সে গলা নামাল। হাঁদারামের মতো মারামারি করতে গেলি কেন? গাঁ জুড়ে ঢি ঢি পড়ে গেছে। তোর জন্যেই নোলে ঠাকুর গলায় ফাঁস দিয়ে মরেছে।

গোপাল কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে বলল, শুনলাম গ্যাঁদার মুখে।

বুকে বল বেঁধে থাক ভাই! আমি তো তোকে জানি, রাধা ঘোষণা করল। মেয়েটা যদি বুঝে-সুঝে চলতে পারে, ওর ভালই হবে। পাটোয়ারিজি লোক খুব ভাল। শুধু একটাই ভাবনা—

গোপাল বলল, কি?

রাধা হেসে উঠল। ওই অরুণটা বড্ড ঢ্যামনা। শালা মেয়েছেলের পেছন পেছন গন্ধ শুঁকে বেড়ায়! আমি নিজের চোখে দেখেছি—দু'চোখের দিব্যি। ঝুলনের মেলায়—

গোপাল চলে এলো। খিদে পেয়েছে প্রচণ্ড। রাধার পাল্লায় পড়লে এ সব খিস্তি শুনতে শুনতে কান তেতো হয়ে যাবে।

ঘরে ঢুকে পাজামা গেঞ্জি পরে কপালের ব্যাণ্ডেজটা দেখে নিল গোপাল। একটু ভিজে গেছে। ঠোঁটের কোণাটা আবার চিনচিন করছে। ফুলে রয়েছে একটু। শরীরে কিল-ঘুষির ব্যথা অবশ্য স্নানের পর আর টের পাচ্ছে না। কপালের ব্যাণ্ডেজ বাঁচিয়ে সাবধানে চুল আঁচড়াল। তিন্নির কথাটা মাথায় ছিল বলে চুল বাঁচিয়ে সাঁতার কেটেছে। পিছনটা আর পাশটা ভিজে গিয়েছিল। ঘষে মুছে ফেলেছে। গলায় ঘাড়ে প্রচুর পাউডার ছড়িয়ে সে দরজার কাছে গিয়ে বলল, মাসিমা! খেতে দাও।

ভুচুমাসি কুয়োতলায় কাপড় কাচতে কাচতে জোরালো গলায় বলল, আর আমি কারুর পাতে ভাত তুলব না। তিন্নি ওকে বলে দাও, নিজে বেড়ে নিয়ে খাবে খাক।

গোপাল বলল, নিজের পাতে তুলবে না মাসিমা?

না। তোর সংসারের অন্ন আর আমার মুখে উঠবে না। ভুচুমাসি উঠে দাঁড়িয়ে বলল। গেনুদা আসুক নিমতিতে থেকে। বলব আমাকে নিয়ে যাও। যদ্দিন বাঁচি দুটি অন্নজল দিও দয়া করে। এই ছোটলোকের সংসারে আর আমি থাকি?

ফুঁপিয়ে কেঁদে নাক ঝাড়ল ভুচুমাসি। গোপাল ঘাঁটাল না। রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াল। তিন্নি রান্নাঘরে গিয়ে বলল, খুব হয়েছে, বসুন তো চুপচাপ। আমি বেড়ে দিচ্ছি।

গোপাল শান্তভাবে বসে বলল, তুমি খাবে না?

পিসিমার সঙ্গে খাব।

পিসিমার তো অন্ন-টন্ন আর মুখে উঠবে না—কি যেন বলল?

সে আমি দেখব। খানতো আপনি।

তুমি রাগ করে চলে এলে ঘাট থেকে।

পরে হবে। এখন চুপচাপ খান।

গোপাল কয়েক গ্রাস খাওয়ার পর মুখ তুলে বলল, তুমি কি যেন বলতে গিয়েছিলে—তাই না? বলা হল না। মানে, আমি বলতে দিলাম না তোমাকে।

আবার?

গোপাল শান্তভাবে খেতে থাকল।

বিকেলে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ছিল। গোপাল ঘুমোচ্ছিল। তিন্নি চা নিয়ে এসে ডাকছিল। তখন গোপাল একটা স্বপ্ন দেখছিল। গঙ্গার জলে তিন্নিকে নিয়ে ভেসে যাওয়ার স্বপ্ন। জলের তলায় সে আর তিন্নি। তিন্নি বলল, এখানে বড্ড কুমির। গোপাল বলল, কুমির তো তুফানগঞ্জের ভাটিতে। তিন্নি বলল, গোপালদা! গোপালদা! আমাকে কুমিরে ধরেছে! গোপাল চেঁচিয়ে উঠতেই ঘুম ভেঙে গেল। কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে রইল তিন্নির দিকে। তারপর বুঝল, কুমিরে ধরলে তিন্নির মুখে হাসি থাকত না। সে তড়াক করে উঠে বসল। দেখল গঙ্গার তলায় নয়, ঘরেই শুয়ে ছিল।

তিন্নি বলল, স্বপ্ন ভেঙে দিলাম তো?

গোপালের হাত গিয়ে ঠোঁটের ক্ষতে পড়ল। বলল, ধুস্! ঠোঁটে হাত বুলোতে থাকল সে।

চা নিন। বিছানায় কাপ প্লেট রেখে তিন্নি বলল, কি স্বপ্ন দেখছিলেন গোপালদা?

গোপাল চা তুলে চুমুক দিয়ে বলল, বাঃ! তুমি করেছ?

কি স্বপ্ন বললেন না তো?

গোপাল ঠোঁটে হাত রেখে বলল, হাসতে পারছি না। ঠোঁটের কোণায় টান পড়ছে। ফুলে আছে, তাই না?

একটু। ডাক্তার কোন ওষুধ দেয় নি?

দিয়েছিল। তুমি দাঁড়িয়ে কেন? বসো। চেয়ারটা টেনে নাও।

তিন্নি চেয়ার টেনে বসল। বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে বলল, বড্ড বাজে লাগছে। ভেবেছিলাম বনমালাদের বাড়ি যাব আপনার সঙ্গে।

গোপাল তাকাল তার দিকে। তিন্নি একটু হাসল। আর ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ করে আসব।

গোপাল শব্দ করে চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, ভদ্রমহিলা এখন ঝি।

ঝি বুঝি মানুষ নয়?

গোপাল বারকতক চা টেনে বলল, তুমি কি আমাকে খুঁচিয়ে কিছু দেখতে চাইছ, তিন্নি?

তাও ভাল। তিন্নি বললেন। অনুরাধা বললে মনে হয় কে সে?

গোপাল সিগারেটের প্যাকেট টেনে নিল বালিশের পাশ থেকে। তখনও চা শেষ হয় নি। সিগারেট ধরিয়ে আবার চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, তিন্নি। তখন বলছিলে বোঝাপড়া করতে সময় লাগবে। মনে

হচ্ছে এখনই তা শুরু করেছ।

তিন্নি বলল, ভ্যাট! ওসব ছাড়ুন তো। কি স্বপ্ন দেখছিলেন বলুন!

গোপাল ধোঁয়ার মধ্যে বলল, তোমাকে কুমিরে ধরেছিল।

তারপর? তিন্নি বালিকার গলায় বলল। তারপর কি হল গোপালদা? আপনি নিশ্চয় কুমিরটার সঙ্গে দারুণ ফাইট দিয়ে আমাকে উদ্ধার করলেন?

নাঃ! তুমি ডেকে স্বপ্নটা ভেঙে দিলে। সুযোগই পেলাম না ফাইট দেওয়ার।

তিন্নি হাসতে লাগল। যা-ও গঙ্গায় নামার একটু সখ ছিল, এরপর তাও আর রইল না।

গোপাল চা শেষ করে বলল, মাসিমার খবর কি? খেয়েছে তো?

জোর করে খাইয়েছি। একটু আগে গ্যাঁদার সঙ্গে বেরুলেন।

তাহলে এই বৃষ্টির মধ্যে বাড়িতে তুমি আর আমি ছাড়া আর কেউ নেই? ভারি আশ্চর্য তো!

তিন্নি আস্তে বলল, অমন করে বলবেন না। শুনতে বিশ্রি লাগে।

ঠিক আছে। চল, বাইরে গিয়ে বসি। এরই মধ্যে ঘরের ভেতরটা অন্ধকার হয়ে গেছে দেখছি।

তিন্নি উঠল না। গোপালই আগে বেরুল। বারান্দার চেয়ারে বসে ডাকল, তিন্নি। চলে এসো চেয়ারটা নিয়ে।

সেদিনকার মতো সারা আকাশ কালো হয়ে গেছে। অঝোর ধারায় বৃষ্টি ঝরছে। গুড়গুড় করে মেঘ ডাকছে মাঝে মাঝে। তিন্নি একটু দেরি করে বারান্দায় গেল চেয়ার নিয়ে। থামের পাশ ঘেঁসে বসল। হাত বাড়িয়ে বৃষ্টির ধারা নিয়ে খেলতে লাগল। গোপাল চুপচাপ সিগারেট টানছিল। খেলা থামিয়ে তিন্নি বলল, আপনাদের ঘর থেকে গঙ্গা দেখা যায় না। এটা ঠিক হয় নি। বাড়িটা এমনভাবে করা উচিত ছিল, যেন জানলা দিয়ে তাকালেই গঙ্গা দেখা যায়। বৃষ্টির সময় নিশ্চয়ই অসাধারণ লাগে দেখতে। লাগে না?

গোপাল বলল, ঠাকুর্দা এ বাড়িটা করে গেছেন। নেহাত মেঠো লোক ছিলেন। ও সব বুঝতেন না। আর বাবার তো ক্ষমতাই ছিল না বাড়ি ভেঙে বাড়ি করার।

আপনার?

হাসতে গিয়ে ঠোঁটে টান পড়ল গোপালের। ঠোঁটে হাত রেখে বলল, তোমার কি মনে হচ্ছে?

তিন্নি গম্ভীর চালে বলল, আজকাল তো বাড়ি করার জন্যে লোন পাওয়া যায়। আমি যদি আপনি হতাম, কি করতাম জানেন? একেবারে ঘাটের কাছে ওই পোড়ো জমিটাতে সুন্দর একটা বাংলো প্যাটার্ন বাড়ি করতাম। সামনে একটু লন, ফুলগাছ, তারপর গঙ্গা অব্দি সিঁড়ির ধাপ।

গোপাল বলল, আশ্চর্য!

কি আশ্চর্য?

তুমি যা বলছ, আমিও তাই ভাবি। তোমার সঙ্গে এই একটা ব্যাপারে আশ্চর্য মিল, তিন্নি! আমিও অবিকল ওই রকম একটা বাড়ি করার কথা ভাবি। কিন্তু—

কিন্তু কি?

গঙ্গা খেয়ে নেবে। দুদিকেই ধস ছাড়ছে বছর-বছর। যে ঘাটটা দেখেছ, ওটা এ বছর হয়েছে। আগের বছর আরও তফাতে ছিল।

তিন্নি হাসল। তাহলে তেমন স্বপ্ন দেখাটা ভুল।

স্বপ্ন ইজ স্বপ্ন। দেখতে দোষ নেই তিন্নি। আমি বুঝতে পারি আমার অনেক স্বপ্ন-টপ্ন আছে— সেগুলো কোনদিনই হয়তো সফল হবে না। তবু দেখি।

আমিও!

বল তিন্নি, শুনি।

আগে আপনারগুলো বলুন।

উঁহু আগে তোমার।

তিন্নি আবার গম্ভীর হয়ে বলল, আচ্ছা, থাক ও সব কথা। আমরা অন্য কথা বলি। .... সে আবার হাত বাড়িয়ে বৃষ্টির ধারা নিল। চুপচাপ কিছুক্ষণ বৃষ্টির সঙ্গে খেলা করল। বনমালা বলছিল,

ওরা নৌকো ভাড়া করে বহরমপুর অব্দি যায়। টেপ বাজে মাইক্রোফোনে। নৌকোয় রাঁধাবাড়া—পিকনিক। কিন্তু এখন বর্ষায় নাকি রিস্কি।

তাইই।

তিন্নি ঘুরে বলল, কী হল আপনার? কেমন ঝিম মেরে গেলেন?

আচ্ছা, তিন্নি? তখন তুমি ঘাটে কি বলতে গিয়েছিলে আমাকে?

কিছু না। আপনার সাঁতার কাটা দেখতে গিয়েছিলাম।

উঁহু—তুমি জানতে চাইছিলে যা রটেছে, তা সত্যি কি না!

কেন তা জানতে চাইব? জেনে আমার কি হবে?

তোমার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা হয়েছে। জানা দরকার।

তিন্নি মুখ নামাল। একটু পরে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, গায়ের জোরে জানাতে চান?

গোপাল একটু চটে গেল। কি আশ্চর্য! গায়ের জোরের কথা আসছে কেন? আমাকে খামোকা কেউ খারাপ ভাববে, আমার তা সহ্য হয় না। কেন খারাপ ভাববে আমাকে? কি করেছি আমি?

আঃ! গোপালদা!

গোপাল আধপোড়া সিগারেটটা বৃষ্টির মধ্যে জোরে ছুঁড়ে ফেলে বলল, নোলে ঠাকুর আমার জন্যে সুইসাইড করে নি। আমার নামে মিথ্যে রটাচ্ছে শুওরের বাচ্চারা। শংকরী বউদির সঙ্গে আমার চেনা-জানা পর্যন্ত ছিল না। কাল তোমার সামনেই আমার পায়ে—

তিন্নি বাধা দিয়ে বলল, আপনি বড্ড ছেলেমানুষ, গোপালদা।

না। তুমি বল, আমাকে খারাপ ভেবেছ নাকি?

আমি আপনাকে খারাপ ভাবি নি। আপনি ঠিকই করেছেন।

সত্যি বলছ?

বলছি তো!

আমার হাত ছুঁয়ে বল!

তিন্নি হাসতে হাসতে হাতটা ছুঁয়ে বলল, আপনি একটা পাগল!

গোপাল ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, আলো জ্বেলে দিই। পাঁচটা না বাজতেই সন্ধ্যা এসে গেল যেন। ধুস!

পরের দিনটাও আকাশের মুখ ভার। যখন-তখন এলোপাথাড়ি বৃষ্টি। রাস্তাঘাটে প্যাচপেচে কাদা। খানাখন্দ ডোবায় জল থৈ থৈ। সকালে তিন্নিকে পঞ্চমুখী শিবমন্দির দেখাতে নিয়ে যাবার কথা ছিল গোপালের। বেরুনো গেল না। ভরা গঙ্গায় উত্তাল ঢেউ।

ভূচুমাসি এখনও সরাসরি কথা বলছে না গোপালের সঙ্গে। তিন্নির বুড়ি ছুঁয়ে দরকারি কথাবার্তা চলছে। গোপাল তিন্নিকে বলছিল, আমার সবচাইতে দুঃখটা কি জানো। মাসিমা আমাকে চিনতে পারল না আজ অব্দি। তুমি এডুকেটেড মেয়ে। তোমাকে সব বোঝাতে পারি। মাসিমা যে আন-এডুকেটেড। নামসই আর বড়জোর বানান করে রামায়ণ-মহাভারত পড়তে পারে। তুমি অন্য বই পড়তে দাও। পারবে না। ..... গোপাল খুব হাসছিল।

রাত থেকে তার মনমেজাজ দারুণ ভাল। এত ভাল যে গ্যাঁদা যখন এসে চুপি-চুপি খবর দিল, গাঁয়ের মাতব্বররা পঞ্চায়েতের মিটিং ডেকে গোপালের বিচার বসাবে, গোপাল তখন তাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে শুধু হাসল।

গ্যাঁদা বলল, হাসছ ছোটবাবু? কিন্তু গতিক ভাল ঠেকছে না আমার। চৌকিদার পাঠাবে ডাকতে। তুমি বরঞ্চ জ্বরজারি হয়েছে বলে কাটিয়ে দিও। ইদিকে আমি ভেতর-ভেতর আমাদের লোকগুলানকে বলে কয়ে রাখি। লাগে তো ভালভাবেই লাগুক।

ভুচুমাসি লক্ষ্য করে বলল, কি এত কানে-কানে ফুসুর-ফাসুর মন্তর পড়ছিস রে গ্যাঁদা?

গোপাল গ্যাঁদাকে চোখ টিপলে সে ঢোক গিলে বলল, ওই কাড়ানের কথা। বলছি কাড়ান এবার আগাম-আগাম হয়ে গেল তো! উঁচু মাঠের জমিতে জল বাঁধতে যাচ্ছে সবাই। ছোটবাবুকে বলছি, চল। গিয়ে দাঁড়াবে।

গ্যাঁদা ছোটবাবুর খুব ভক্ত। শীতলডিহিতে দুর্ধর্ষ আর মারকুটে বলে তার নাম আছে। কিন্তু গোপালের সামনে সে হাবাকান্ত সেজে যায়। তার মিটিমিটি হাসি আর গোবেচোরা হাবভাব দেখলে বোঝাই যায় না দরকারে সে কতটা হিংস্র হয়ে উঠতে পারে।

গ্যাঁদা চলে গেলে তিন্নি বলল, কী ব্যাপার, গোপালদা?

কিছু না। গোপাল হাসল। এ সব মেঠো ব্যাপার তুমি বুঝবে না।

ভ্যাট! আপনার বিচার না কি হবে, গ্যাঁদাদাদা বলল শুনলাম।

তোমার কান দেখছি মাসিমার চেয়েও শার্প!

না—না। সত্যি, বলুন না কি ব্যাপার?

ব্যাপার নতুন কিছু নয়। গ্রামে যা হয়।

তিন্নি একটু চুপ করে থেকে বলল, গ্রামের লোকের কি অধিকার আছে আপনার বিচার করবে?

গোপাল আস্তে বলল, পঞ্চায়েত নামে একটা গ্যাঁড়াকল হয়েছে।

পঞ্চায়েতের অথরিটি আছে বুঝি বিচার করার?

শুনেছি, আছে।

অদ্ভুত তো! তিন্নি অবাক হয়ে ক্ষুব্ধভাবে বলল, কিন্তু আপনি তো কোন অন্যায় করেন নি!

করি নি বলেই তো এত জোর আমার। গোপাল জোর গলায় মুখ উঁচু করে বলল।

এদিকে দুপুর গড়িয়ে গেলেও জ্ঞানেশ্বর ফিরলেন না কথামতো। ভুচুমাসি উদ্বিগ্ন হচ্ছিল। তিন্নি বলল, বাবার ব্যাপার তো, জানি। পৃথিবী সুদ্ধু কুটুম। পোড়ামাতলায় ফিরে অব্দি দেখছি, হঠাৎ উধাও হয়ে যাচ্ছেন, আবার হঠাৎ চেঁচামেচি হুলস্থুল করে বাড়ি ঢুকছেন। দেখবেন, রাতদুপুরে এসে বলবেন, ভূতের পাল্লায় পড়ে কোথায় যেতে কোথায় চলে গিয়েছিলেন।

বিকেলে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। গোপাল ভাত-ঘুম থেকে উঠে আকাশ দেখছিল। ওপারের জন্যে মনটা অস্থির। ভাবছিল, ছাতি নিয়ে বেরুবে নাকি। কিন্তু পোশাক পরতে পরতে বৃষ্টিটা বেড়ে গেল। হতাশ হয়ে গোপাল বলল, ধুস শালা!

তিন্নি এসে বলল, ও গোপালদা! এ কি বিচ্ছিরি কাণ্ড হচ্ছে! এলাম ঘুরে বেড়াতে টো টো করে—তা নয়, চুপচাপ বসে থাকো।

এসো তিন্নি, গল্প করি।

ভূতের গল্প কিন্তু!

গোপাল হাসল। আমি কখনও ভূত দেখি নি।

শোনা গল্পই বলুন।

গোপাল বানিয়ে বানিয়ে ভূতের গল্প বলার চেষ্টা করছিল। গল্পটা ঠিক জমছিল না। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, নাঃ, বরং তুমি বর্ধমান টাউনের কথা বল।

সেই সময় ভুচুমাসি ডাক দিল, মা তিন্নি! একবারটি এদিকে এসো দিকি!

তিন্নি এলে বলল, ফোকলা মুখে ফুঁ দিতে পারি নে। সন্ধ্যে লেগেছে। নাও দিকি, জোরে ফুঁ দাও শাঁখে। নিত্যি অকল্যাণ বাড়িতে। ঘরে লক্ষ্মীর কোপ লেগেছে। নাও মা, ফুঁ দাও।

তিন্নি শাঁখটা নিয়ে বলল, আমার যে অভ্যেস নেই পিসিমা!

সে কি কথা! ভুচুমাসি অবাক হয়ে গেল।

তিন্নি অনেক চেষ্টায় শাঁখটাকে বার দুই প্যাঁক করাতে পারল। গোপাল দৃশ্যটা উপভোগ করছিল। সে হাসতে লাগল। ভুচুমাসি আরও গম্ভীর হয়ে গেল।

একটু পরে ভুচুমাসি নিজের ঘরে ঠাকুর প্রণাম এবং পিদিম জ্বেলে এসে চাপা গলায় তিন্নিকে বলল, একটা কথা বলি তিন্নি! খালি নাম ধরে ডাকাডাকি কর—আর ক'টা দিন পরেই তো এ বাড়ির বউমা হবে। না মা, আর নাম ধরে ডেকো না। শুনতে কানে লাগে।

তিন্নি কেমন চোখে তাকিয়ে আছে দেখে ভুচুমাসি কপট ভৎর্সনার ভঙ্গীতে বলল, নাও। হাঁ করে তাকিয়ে আছে পোড়ারমুখী মেয়ে! বুঝলে না বুঝি কথাটা?

তিন্নি শুধু মাথাটা দোলাল। বুঝেছে।

ভুচুমাসি শান্তভাবে বলল, আমার আর ক'দিন? লক্ষ্মীছাড়া বাঁদরটাকে তোমার জিম্মেয় দিতে পারলেই আমার ছুটি। তখন আর এ সংসারে আমাকে দেখতে পাবে না তোমরা।

গোপাল ট্রানজিস্টার বাজাচ্ছিল নিজের ঘরে। তিন্নি আসছে না দেখে সে উঁকি দিল। দরজায় হেলান দিয়ে আবছা আঁধারে দাঁড়িয়ে আছে তিন্নি। গোপাল ডাকল। ওখানে দাঁড়িয়ে কি করছ? গান শুনবে এসো। সিলোন সেন্টার ধরেছি অনেক কষ্টে, ডিসটার্ব হচ্ছে। তাহলেও দারুণ লাগে।

তিন্নি আরও একটু পরে ভেতরে এলো। গোপাল বলল, তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন?

তিন্নি একটু হাসল। কিছু না। এমনি।

মাসিমা কি সব ভুজুংভাজুং দিচ্ছিল বুঝি?

আপনার নাম ধরে ডাকা বারণ।

ধুস! গোপাল সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়ার মধ্যে ফের বলল, কেন? বলেই সে খিকখিক করে হেসে ফেলল। বুঝেছি! তা তুমি বললে না কেন, বিয়েটা আগে হোক, তারপর তো!

তিন্নি গোপালের কাছ থেকে ট্রানজিস্টারটা টেনে নিয়ে আওয়াজটা বাড়িয়ে দিল।

সকালে গোপাল সেজেগুজে বেরুবে বলে তৈরি হচ্ছে। আকাশ পরিষ্কার। ঝলমলে রোদ্দুর উঠেছে। তিন্নিও তার সঙ্গে যাবে—আজ পঞ্চানন শিবের মন্দির না দেখে ছাড়বে না সে। ওপারে গিয়ে বংমালাদেরও সঙ্গে নেবে।

সেই সময় পাটোয়ারিজির লোক এসে হাজির। গোপাল বেরিয়ে বলল, কি ব্যাপার জনাই? এই তো তোমাদের ওখানে যাব বলে রেডি হচ্ছিলাম।

জনাই গম্ভীরমুখে বলল, গিন্নিমা আপনাকে তলব দিয়েছেন। জরুরি দরকার। সঙ্গে করে নিয়ে যেতে বলেছেন।

গোপাল বলল, কেন জানো, জনাই?

জনাই বলল, তা বলতে পারব না বাবুদাদা? আমি আড়তে ছিলাম। পান্নাবাবু গিয়ে বললে, এক্ষুনি শীতলদি গিয়ে গোপালবাবুকে খবর দাও। মা ডেকেছে।

গোপাল একটু উদ্বিগ্ন হল। তিন্নিকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয়তো ঠিক হবে না। শংকরীর ব্যাপারেই হয়তো অরুণের মা ডেকেছেন। কিন্তু কি ঘটে থাকতে পারে, আঁচ করতে পারছিল না সে। তিন্নিকে বলল, শোন! আজ আর মন্দির দেখতে যাওয়া হবে না।

তিন্নি বলল, সে কি! কেন?

গোপাল ব্যস্ত হয়ে বলল, বরং ওবেলা বৃষ্টি না হলে—নয়তো কাল সকালে নিশ্চয় নিয়ে যাব। কথা দিচ্ছি। হঠাৎ একটা জরুরি ডাক এসেছে—না গেলেই নয়। প্লিজ, রাগ কোরো না তিন্নি।

আপনি কোথায় বেরুচ্ছেন গোপালদা?

গোপাল ভুচুমাসির দিকে চোখের ইশারা করে একটু হেসে চাপা স্বরে বলল, আবার নাম ধরে ডাকা হচ্ছে! আমি আসছি।

সে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলো। জনাইয়ের সঙ্গে চলতে থাকল ঘাটের দিকে। ঘাটে আজ হাটবার। হাটতলা থেকে ঘাট অব্দি প্রচণ্ড ভিড়। আলগা ডিঙিতেই চাপল গোপাল জনাইকে নিয়ে। জনাই হেসে বলল, খামোকা পাঁচটা টাকা গচ্চা। ঘাটের নৌকোতে গেলেই হত। বাবুদাদার বড্ড খরুচে স্বভাব।

গোপাল চুপচাপ সিগারেট টানতে থাকল। শংকরীর বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই কেউ লাগিয়েছে। ওকে হয়তো রাখতে চাইছেন না অরুণের মা। এপারের কথা ওপারে পৌঁছুতে বেশি দেরি হয় না। তাছাড়া পাটোয়ারিজির গদি তো একেবারে কাগজের অফিস। নানা জায়গা থেকে লোকজন আসছে-যাচ্ছে। কাজেই শংকরীর খবর এবং গোপালের সঙ্গে হাঙ্গামা, সবকিছুই পাটোয়ারিজির গদি হয়ে অরুণের মায়ের কাছে পৌঁছুনো অসম্ভব নয়। নিশ্চয় এমন রঙ চড়িয়ে আর মিথ্যা দিয়ে সেটা সাজানো হয়েছে যে গুণমালা দেবীও চটে গেছেন।

গোপাল ঘেমে যাচ্ছিল ভাবতে ভাবতে। মেয়েটাকে যদি গুণমালা সত্যি না রাখতে চান, গোপালের

তাতে কি? গোপাল ভাবছিল, তোর তাতে কি গোপাল? সে স্বামীর ভিটেয় ফিরে যাক। কুকুর শেয়ালগুলো তাকে ছিঁড়ে খাক। তাতে তোর কি আসে যায়?

গোপাল দেখল, তার মনের অর্ধেকটা অরুণ হয়ে গেছে, সেই অরুণ তাকে বারবার বলছে,— তোর কি দায় পড়েছে রে? আজ বাদে কাল তোর তিন্নির সঙ্গে বিয়ে। তুই তিন্নির দিকে মন দে। এমন তো নয় যে তুই শংকরীর প্রেমে পড়ে গেছিস। পড়েছিস কি?

গোপাল বলল, না। পড়ি নি। তবে বড় মায়া লাগে। কেমন করুণ চোখ করে তাকায়। বুকের ভেতরটা ধড়াস করে ওঠে। তাছাড়া ভেবে দ্যাখ, শীতলডিহির এত লোক থাকতে আমার কাছে এসে পড়ল। যে এমন বিপদে পড়ে আমার কাছে এসে পড়েছিল, তাকে ভাসিয়ে দিতে আর যেই পারুক, গোপাল পারে না।

মোতিগঞ্জের সদরঘাটে পৌঁছে গোপাল রিক্‌শা করল। জনাইকে নামিয়ে দিয়ে এলো চৌমাথায়। সেখানে পাটোয়ারিজির খন্দের গদি। রিক্‌শায় যেতে যেতেও গোপালের মধ্যে তর্কাতর্কি চলছিল। গোপাল অরুণের উদ্দেশে বলছিল, সবচেয়ে বড় কথাটা হল এ আমার মান অপমানের ব্যাপার। শীতলডিহিতে পঞ্চায়েত গোপালের নামে আদালত বসাতে চেয়েছে— কেন—না, নোলে ঠাকুরের বউয়ের সঙ্গে তার গোপন-প্রেম ছিল আর সেই দুঃখে নোলে ঠাকুর সুইসাইড করেছে। এত বড় মিথ্যা বরদাস্ত করবে গোপাল কেমন করে? যা-ও শংকরীর জন্যে মাথা না ঘামাত, শুধু এজন্যেই বেশি করে ঘামাতে হবে।

পাটোয়ারিজির বাড়ির সামনে যখন রিক্‌শা থেকে গোপাল নামল। তখন সে প্রায় ঠিক করে ফেলেছে, অরুণের মা যদি শংকরীকে রাখতে না চান, ওকে সঙ্গে করে গোপাল নিজের বাড়ি নিয়ে যাবে। ভুচুমাসি হইচই করবে খানিকটা। তারপর মেনে নিতে বাধ্য হবে। বামুনের মেয়ে। রান্নাবান্না কাজকর্ম করে দেবে। ভুচুমাসির উপকার হবে তাতে। তিন্নি বরং তাকে বুঝিয়ে বলবে। তিন্নির মনটাও খুব ভাল। সে এতে খুশিই হবে। গোপালকে সমর্থন করবে। করবে না তিন্নি? গোপাল নিজেকে সায় দিল—আলবৎ করবে।

গোপালের মনে কিছু আছে বরাবর। তার সঙ্গে নতুন এই স্বপ্নটাও ঢুকে পড়ে। নতুন স্বপ্নটা নিয়ে হাল্কা পায়ে স্থিরসংকল্প নিয়ে গোপাল পাটোয়ারিজির বাড়ি ঢুকল। বনমালা দোতলার ব্যালকনি থেকে তাকে দেখতে পেয়ে চেঁচাল, গোপালদা এসেছে। জপমালা কিল দেখিয়ে বলল, এসো গোপালদা। তোমার হচ্ছে!

ওপরে গেলে দুই বোন এসে গোপালের সামনে দাঁড়াল। গোপাল বলল, কি ব্যাপার?

বনমালা বলল, চল না মায়ের কাছে। সব শুনবে।

লম্বা বারান্দার শেষ দিকে গুণমালা দেবী গম্ভীর হয়ে বসে ছিলেন। গোপালকে দেখে ইশারায় একটা মোড়া দেখিয়ে বললেন, বয়ঠো।

গোপাল বসে বলল, কেন ডেকেছেন মাসিমা?

গুণমালা বললেন, উও ছোকড়ি রাতমে ভেগে গিয়েছে। কখন গিয়েছে, মালুম নেই। গেটমে দারোয়ান ভি কুছ জানে না—কখন ভেগে গেল? মালুম, খিড়কিসে ভাগি।

গোপাল প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, পালিয়ে গেছে শংকরী বউদি?

বউদি! গুণমালা একটু হাসলেন। উও তোমার কেমন বউদি আছে গোপাল বেটা, ঘড়ি-উড়ি সামান-উমান লেকে ভেগে গেল?

বনমালা বলল, আমার ঘড়িটা খুঁজে পাচ্ছি না। দিদির দুল দুটো ড্রেসিং টেবিলের ওপর রাখা ছিল। তাও নেই।

গোপাল বলল, অসম্ভব!

থামো, থামো! আরও আছে। জপমালা বলল। রুপোর রেকাব ছিল বউদির ঘরে। হাওয়া হয়ে গেছে। সকালে বাচ্চুকে ঘুম থেকে ওঠাতে গিয়ে দ্যাখে, তার গলায় সোনার কবচটাও নেই।

অরুণের বউদি রাজশ্রী এসে দাঁড়িয়ে ছিল একপাশে। ঝাঁঝালো স্বরে বলে উঠল, যো কুছ লিয়া, লিয়া। কবচঠো কাহে লে গেয়ি চুট্টিন ছোকড়ি? গোপাল, তুমি যেমনি করে পারো, আমার বাচ্চুর কবচ এনে দাও। সেই দানাপুরের সাধুজি মহারাজের আশীর্বাদ লিখা ছিল। বাচ্চুর আবার সেই বিমার

হলে এখন কি করব বোলো তুমি?

গোপাল ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছিল মুখগুলোর দিকে। শংকরী যে চোর মেয়ে, তা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না সে। কি বলবে, তাও বুঝতে পারছিল না।

গুণমালা বললেন, পাটোয়ারিজি কাল ওর সব কথা বলছিলেন হামাকে। কোন্ ঠাকুরমোশার বহু ছিল। ঠাকুরমোশায় খুন হয়ে গিয়েছে। তুমি আমাকে কুছু বোলো নি গোপালবেটা! ছুপা করেছিলে। কাহে?

গোপালের কষ্ট হচ্ছিল কথা বলতে। আস্তে বলল, অরুণ সব জানে। অরুণের কাছে শুনবেন। ঠাকুরমশাই খুন হন নি মাসিমা! সুইসাইড করেছেন। তারপর মেয়েটার ওপর অত্যাচার করছিল শীতলডিহির লোকেরা। তাই আমি ওকে—

জপমালা বলে উঠল, ওর জন্যে তুমি মারামারি করে এসে ঝুট বললে কি ঘাটে আছাড় খেয়ে কপাল ফেটেছে!

গোপাল বলল, অরুণ সব জানে। ওকে জিজ্ঞেস করুন।

বনমালা বলল, বাবা কাল গদি থেকে এসে বকাবকি করছিলেন মাকে। মেয়েটার নাকি ক্যারেক্টার ভাল না। ওকে রাখা ঠিক হবে না। আমার ধারণা, আড়ি পেতে সব শুনেছিল। শুনে সময়মতো জিনিসগুলো হাতিয়ে রাত্তিরে কেটে পড়েছে।

গুণমালা বললেন, থানায় খবর করতেন পাটোয়ারিজি। হামি মানা করলাম—কি, গোপাল বেটাকে আগে ডেকে একটো কথা পুছ করি। কাহে কি—পুলিশ বোলবে, জান-পহচান নেই, এমন ছোকড়িকে রাখলেন কেন? তখন— গোপাল বেটা, তোমার নাম ভি বোলতে হবে কিনা বোলো তুমি?

গোপালের চোখ ফেটে জল আসছিল, অতি কষ্টে সামলে নিয়ে বলল, আপনারা আমাকে নিশ্চয় খারাপ ভেবেছেন। কিন্তু বিশ্বাস করুন মাসিমা, মেয়েটা কেঁদেকেটে পায়ে পড়ল, তাই আমি ওকে—

সে কথাটা শেষ করতে পারল না। গুণমালা বললেন, এতাদিন তুমি হামাদের বাড়ি আসছ, কভি তোমাকে হামরা খারাপ মনে করি নি গোপাল বেটা। এখনও মনে করি না। হাঁ— তোমার কুছু দোষ নেই। তুমি কি করবে?

রাজশ্রী চটে গেল। বাঁকা মুখ করে ঘরে চলে গেল। আপন মনে গজগজ করতে শোনা গেল তাকে। বনমালা বলল, গোপালদা, তোমায় মোটেই আমরা খারাপ ভাবি নি। কিন্তু ভেবে দ্যাখ, ব্যাপারটা কি দাঁড়াল শেষ পর্যন্ত।

জপমালা বলল, ট্রাব্‌লটা কি জানো গোপালদা? তুমি এতে ইনভলভ্‌ড্ বলেই থানায় এখনও জানানো হয় নি। তুমিই বল কি করা উচিত।

বনমালা বলল, বড়দা এতক্ষণে আবার থানায় জানিয়ে দেয় নি তো? দাঁড়াও, আমি গদিতে ফোন করে দেখি বড়দাকে।

বনমালা চলে গেল ফোন করতে। গোপাল বলল, আমি কি করব, বলুন মাসিমা?

গুণমালা গুম হয়ে কিছুক্ষণ থাকার পর শ্বাস ছেড়ে বললেন, কি আর করবে? আর কখনও খামোকা ঝামেলায় যেও না। দুনিয়া বহুত বুরা জায়গা বেটা! সমঝকে চল্ না।

বনমালা ঘরের দরজা থেকে চেঁচিয়ে ডাকল গোপালকে। গোপালদা, বড়দা তোমাকে ডাকছে। কথা বলবে এসো।

গোপাল গেল। ফোন তুলতে তার হাত কাঁপছিল। জীবনে এই প্রথম টেলিফোনে কথা বলছে সে। রিসিভার উল্টো করে তুলতেই বনমালা একটু হেসে শুধরে দিল। গোপাল তবু চুপ করে আছে দেখে সে বলল, সাড়া দাও। কি আশ্চর্য! তুমি গোপালদা, সত্যি একটা জিনিস।

গোপাল কাঁপা কাঁপা গলায় বলল পান্নাদা!

পান্না বলল, অ্যাই গোপাল! তুই এক্ষুনি গদিতে চলে আয়। আর শোন, অরুণ কোথায় আছে। খুঁজে তাকেও সঙ্গে নিয়ে আয়।

গোপাল ফোন নামিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখে বনমালা বলল, কি হল? বড়দা কি বলল?

অরুণকে সঙ্গে নিয়ে যেতে বলল।

যাও গিয়ে ম্যানেজ কর।

গোপাল যাবার সময় গুণমালাকে প্রণাম করে এলো।

অরুণকে চপলা রেস্তোরাঁর সামনে ড্রেনের ওপর পাতা তক্তায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল। গোপালকে দেখে বলল, আয় গেঁইয়া বৃদ্ধ। তোর জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি। সামনে রিক্সায় চলে গেলি। ডাকলাম, কানে গেল না!

গোপাল বলল, আয়, পান্নাদা ডেকেছে তোকে আর আমাকে।

ভাগ! বড়দার কাছে যাবার গরজ পড়েছে আমার! তুই চোরের দায়ে ধরা পড়েছিস, তুই যাবি।

গোপাল ওর হাত ধরে বলল, অরুণ! জোক করার সময় নয় এখন। চল—

অরুণ পা বাড়িয়ে চোখ নাচিয়ে চাপা গলায় বলল, শেষ পর্যন্ত এমন মেয়েছেলে জুটিয়েছিলি বাপ্পোত, যার জন্যে হাতকেড়া পবার অবস্থা হল। তাও যদি বডিতে একরত্তি মাংস থাকত। ছিবড়ে কাঠ। তার জন্যে মাথা কাটালি, গ্রামশুদ্ধ শত্রু করলি। শেষে —

গোপাল তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, আঃ! চুপচাপ আয় অরুণ।

অরুণ বলল, আমার ধারণা, মেয়েটা একলা ভাগে নি। খোঁজ নিয়ে দেখিস, তোদের গ্রামের পপুলেশান ঠিক আছে কিনা। মাইনাস ওয়ান হয়ে গেছে।

গোপাল গদি পর্যন্ত চুপচাপ হাঁটছিল। পান্না ওদের দেখে গদি থেকে নেমে এলো। রাস্তার ধারে শিরিন গাছের তলায় নিরিবিলিতে দাঁড়িয়ে বলল, মাঝখানে তুই থেকেই প্রব্লেম হয়েছে গোপাল! নইলে এতক্ষণে থানায় যেতাম। যাই হোক, একটা কথা বলি শোন। ঘড়ি দুল-টুল যা নিয়ে গেছে, ও নিয়ে মাথা ব্যথা নেই। মায়ের একটা শিক্ষা হওয়া উচিত ছিল। গোপাল, তোরও। কিন্তু বাচ্চুর কবচটা নিয়ে গিয়েই কেলেঙ্কারী হয়েছে। তোর বউদি সকাল থেকে কিছু মুখে তোলে নি, জানিস?

অরুণ বলল, বউদির পাগলামির কোন মানে হয় না। আরেকটা আশীর্বাদী নিয়ে এলেই হয়।

পান্না ভাইকে ধমক দিল মাতৃভাষায়। তারপর গোপালকে বলল, একটু আগে তোদের গ্রামের রতুবাবর কাছে যা শুনলাম। শুনে আমার মনে হল, চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি?

গোপাল বলল, রতুকাকা আমার বদনাম করলেন নিশ্চয়?

না। বরং তোর প্রশংসাই করলেন। তো রতুবাবু বললেন, মেয়েটার বাবার বাড়ি নাকি লালগোলায়।

গোপাল বলল, হ্যাঁ। স্টেশনের ওখানে থাকত বলেছিল।

পান্না বলল, তুই আর অরুণ চলে যা লালগোলা। সঙ্গে আরও বন্ধু-বান্ধব কাউকে নিয়ে যা। তারপর ঘড়ি দেখে বলল, এখন সাড়ে এগারোটা। বারোটা পাঁচে আপ লালগোলা পেয়ে যাবি। যাতায়াত, খাওয়া দাওয়ার খরচ আমি দিচ্ছি।

অরুণ বলল, কোন মানে হয়?

পান্না আবার তাকে ধমক দিয়ে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট গুঁজে দিল তার হাতে। বলল, যেভাবে হোক অন্তত বাচ্চুর কবচটা উদ্ধার করে আনবি। আর যা সব নিয়েছে, নিক।

গোপাল ভাবছিল। বলল, কিন্তু লালগোলায় কি গেছে ও? সেখানে তো তেরপলের ঝোপড়িতে থাকত বলেছিল।

পান্না তাড়া দিয়ে বলল, আহা! গিয়েই দ্যাখ না।

লালগোলা স্টেশনে নেমে অরুণ বলল, পেট ক্ষিদেয় চোঁ চোঁ করছে। আগে পেটটাকে ঠাণ্ডা করি, আয়।

গোপাল বলল, তুই খাবি তো খা। আমার খেতে ইচ্ছে করছে না। অরুণ ওকে টানতে টানতে নিয়ে গেল একটা খাবারের দোকানে। প্রচুর পুরি আর আলুর দম গিলে অরুণ বলল, ব্যস! এবার কাজে নামা যেতে পারে। গোপাল, তুই কিন্তু কিছু না খেয়ে ভুল করলি।

স্টেশনের কাছাকাছি সব দোকানদার, রিক্শাওলা-- এমন কি যাকে সামনে দেখল ওরা তাকেই শংকরীর কথা জিগ্যেস করল। কেউ চেনে না তাকে। সন্ধ্যা অব্দি দু'জনে চর্তুদিকে হন্যে হয়ে ঘুরে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ফিরল। সেই সময় হঠাৎ গোপালের খেয়াল হল, শংকরী বলেছিল, সে কয়লা কুড়োত রেললাইনে। রেলের কর্মীরা কি তাকে চিনবে না?

গোপাল বলল, আয় তো অরুণ, ওই উর্দিপরা লোকটাকে জিগ্যেস করি।

অরুণ গোঁজ হয়ে বেঞ্চে বসে বলল, তুই যা। আমার ঠ্যাঙে আর একটুও জোর নেই।

রেলের নীল উর্দিপরা লোকটা চোখে আকাশ দেখছিল। আকাশ আবছা অন্ধকার। মেঘ জমে আছে। গোপাল বারকতক ডাকার পর সে মুখ ঘুরিয়ে বলল, বোলিয়ে বাবু!

গোপাল বলল, আচ্ছা দাদা, এখানে শংকরী নামে কোন মেয়ে থাকত জানেন? স্টেশনের পেছনে ফ্লাড রিলফের ক্যাম্পে থাকত। তেরপলের ঝোপড়ি ছিল একটা। মেয়েটা রোগা মতো, ফর্সা। কয়লা কুড়িয়ে বেড়াত। ওর দাদা, না ছোট ভাই জেলে আছে।

লোকটা কান করে শুনছিল আর কাঁচাপাকা গোঁফে হাত বুলোচ্ছিল। গোপালের কথা শেষ হলে মুচকি হেসে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ— শংকরী তো? হাঁ হাঁ বোলিয়ে! সমঝেছি— বোলেন—

গোপাল ওকে সিগারেট দিয়ে বলল, তাহলে চেনেন?

লোকটা গোঁফ বাঁচিয়ে সিগারেট ধরাল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, আপনি কৃথা থাকেন বাবু?

মোতিগঞ্জ।

লোকটা ফিক করে হাসল ফের। কুছু লিয়ে ভেগেছে তো? পুলিশে রিপোর্ট ভেজে দিন।

গোপাল ব্যস্ত হয়ে বলল, আজ ওকে কি এখানে কোথাও দেখেছেন, দাদা?

রেলকর্মী জোরে মাথা দোলাল। আরে না না! এখানে আব আসবে কি করে? বড়া টিশনবাবু ছিল— তার কাম করত শংকরী। চোরির জন্য মারতে মারতে ভাগিয়ে দিল। ফির এখানে এলে জানসে মার দেগা না? উসকি ভাইভি বহত চোট্টা ঔর দাঙ্গাবাজ থা। খুনীভি! উও তো জেহেল্‌মে আছে এখন।

গোপাল আস্তে বলল, আশ্চর্য! ভদ্রলোকের মেয়ে। বাম্ভন—

কথা কেড়ে রেলকর্মী বলল, বাম্ভন? কৌন্ মাম্ভন?

কেন? শংকরী?

খ্যা খ্যা হাসতে লাগল রেলকর্মী। আবে বাবুসোনা। উও তো হরিদাসেব বেটি ছিল। পুছকে দেখিয়ে না হরিদাস কৌন্ থা। সেও ভি বহত চোট্টা ছিল। রেলের সামান উমান চোরি করত। বুঢ়া হইয়ে খারাপ বেমারি হল। ভাই-বহিন মিলে পাঁও পাকড়ে টানতে টানতে পদ্মায় মডাঠো ফেক দিয়েছিল। বাম্ভন! হুঁ!

বৃষ্টি এসে গেল। রেলকর্মী হাসতে হাসতে সরে গেল। গোপালের পায়ে বৃষ্টির ছাট লাগছিল। অরুন ডাকলে সে মাতালের মতো টলতে টলতে বেঞ্চে গিয়ে বসে পড়ল।

শীতলবিহির ঘাটের শিয়রে আলো জ্বলজ্বল করছিল। রাতের শেষ খেয়ায় গঙ্গা পেরিয়ে আসতে আসতে সেই আলোর দিকে তাকিয়ে বড় করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল গোপাল। এতক্ষণে মনটা হাল্কা হল তার। আলোগুলো দেখেই তার মনে পড়ল তিন্নির কথা। যদি তিন্নি নামে কেউ না থাকত, খুব কষ্ট পেত গোপাল। একটা নিরর্থক লড়াইয়ে দাঁড়িয়ে হেরে যাওয়ার দুঃখটা সহজে ভুলতে পারত না।

নৌকা ঘাটে লাগার আগেই সে লাফ দিয়ে নামল। ওপরে গিয়ে লম্বা পায়ে হাঁটতে শুরু করল। সেই সময় কেউ তাকে পিছন থেকে চাপা স্বরে ডাকল। ঘুরে দেখল, পটুনের চায়ের দোকান থেকে এগিয়ে আসছে নন্দ। তার হাতে টর্চ।

গোপাল একটু খুশি হল। অন্ধকার রাস্তায় জলকাদা জমে আছে। নন্দ মিতের টর্চের আলোয় কাদা বাঁচিয়ে ফিরতে পারবে। গোপাল বলল, এসো মিতে। আলো দেখাও।

নন্দ হাঁটতে হাঁটতে বলল, খোঁজ পেলে হারামজাদির?

গোপাল চমকে উঠল। তুমি জানো নাকি?

জানি। নন্দ হাসল। অফিস থেকে ফেরার সময় পাটোয়ারিজির গদিতে একটু কাজ ছিল। পান্নাবাবু বলল, এই-এই ব্যাপার হয়েছে। অরুণ আর গোপাল খুঁজতে গেছে লালগোলা। আমি শুনেই বললাম, আর তাকে পেয়েছে! থানায় জানিয়ে দিন। পুলিশ পারে তো খুঁজে বের করুক। নন্দ ফিসফিসয়ে ফের বলল, এদিক আরেক কাণ্ড। রাধার ঘরে সেদিন শুতে এসেছিল চুন্নী মেয়েটা। রাধা আজ আমাকে বলছিল, তার বোঁচকা থেকে দুখানা প্যান্ট-লেংথ উধাও!

গোপাল কোন কথা বলল না। ক্ষিদেয় এবার তার কথা বলতেও কষ্ট হচ্ছে।

নন্দ টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে বলল, তবে আমি জানতাম।

কি?

মেয়েটার স্বভাব। নন্দ খি খি করে হাসল। দেখেই হালহদিস বোঝা যায় মেয়েদের। বলে সে গলার স্বর নামিয়ে আনল। এবার তোমাকে বলতে দোষ নেই মিতে। মেয়েটা ছিল একের নম্বর খানকি! সেদিন কি বিপদেই না পড়েছিলাম, সবে গিয়ে ঘরে ঢুকেছি— মানে, নোলে ঠাকুরের ঘরে। শংকরী বললে, দেরী কোরো না। নাইতে গেছে, এক্ষুনি এসে পড়বে। তা শালা, হলও তাই।

নন্দ চাপা হাসতে হাসতে দুলতে দুলতে গোপালের কাঁধ আঁকড়ে টাল সামলাল। তারপর বলল, শেষে ভাঙা জানলা ঠেলে সুড়ুৎ করে ওধারে গিয়ে পড়লাম। তবে নিশ্চয় নোলে শালা কিছু দেখেছিল। তারই ঘণ্টাখানেক পরে শুনি, গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে। কোন মানে হয়, বল মিতে? তুই তো জেনেশুনেই রাস্তা থেকে খানকি কুড়িয়ে এনেছিলি! শালা গেঁড়েলের বুদ্ধি!

গোপাল আর টর্চের আলোটা সহ্য করতে পারছিল না। নন্দকে অবাক করে দিয়ে তাকিয়ে রইল সে। কাদায় জুতো-প্যান্ট নোংরা হয়ে যাচ্ছিল, তবু গ্রাহ্য করছিল না। সে এই সব কদর্যতাকে পিছনে ফেলে তিন্নির কাছে পৌঁছুতে চাইছিল। এমন দিনে তিন্নিই তার সুখের আশ্রয়। কাল তিন্নিকে নিয়ে সে যাবেই পঞ্চানন শিবের মন্দিরে। নিরিবিলি গাছপালার ভেতর বসে গল্প করবে। গল্প শুনবে। পৃথিবীর আর কোন ব্যাপারে সে নাক গলাবে না।

খুব শান্তভাবে দরজার কড়া নাড়ল গোপাল। কপাটের ফাঁকে আলোর ছটা সে আশা করল, তিন্নিই দরজা খুলবে। কিন্তু ভুচুমাসির সাড়া পেল। কে, গোপাল নাকি রে?

গোপাল বলল, হুঁ।

গোপাল?

গোপাল চটে গিয়ে বলল, হাঁ হা - আমি। দরজা খোল।

দরজা খুলে ভুচুমাসি একটু সরে দাঁড়াল। গোপাল ঢুকে গেল। বাড়ির ভেতর আর কোন আলো নেই। অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে গোপাল বলল, তিন্নি কি ঘুমিয়ে পড়েছে? তিন্নি—!

ভুচুমাসি বাইরের দরজা বন্ধ করে এসে বলল, তিন্নি নেই।

নেই মানে?

ভুচুমাসি গম্ভীর মুখে বলল, গেনুদা আমার সঙ্গে ঝগড়া করে তিন্নিকে নিয়ে চলে গেছে দুপুরবেলা।

গোপাল নিষ্পলক চোখে তাকাল তার দিকে।

ভুচুমাসি বলল, যাক গিয়ে। তুই মন খারাপ করিস নে। দেখি না, পাস করা মেয়ের বিয়ে কোথায় দেয়। কোন্ রাজবাড়ির পাত্র জোটায়, তাও দেখব। বলে কিনা, চরিত্তির ভাল না। জেনেশুনে মেয়েকে তো গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে যেতে পারি নে? নে— হাতে মুখে জল দে। সুস্থ হয়ে বোস। তারপরে সব বলছি।

ভুচুমাসি রান্নাঘরের বারান্দায় গেল। লম্প জ্বালল। তখনও গোপাল দাঁড়িয়ে আছে দেখে সে বলল, দাঁড়িয়ে রইলি কেন? নন্দ এসেছিল সন্ধেবেলায়। বললে, লালগোলা না কোথায় যেন গেছে। নোলে ঠাকুরের বউ নাকি পাটোয়ারির বাড়ি থেকে গয়নাগাঁটি—

গোপাল চেঁচিয়ে উঠল, কিন্তু তিন্নি কেন গেল? তিন্নি কিছু বলল না মামাবাবুকে? বলল না আসল ব্যাপারটা কি?

ভুচুমাসি বেগতিক দেখে গোপালের কাছে এলো। বলল, চেঁচাস নে তো বাবা রাতদুপুরে। এমন চেঁচানোর কি আছে? গেনুদা চিরকালের বাউণ্ডুলে আর হঠরাগি স্বভাব। যে যা বলে তাই বিশ্বাস করে বসে। সকালে তুই যাবার খানিক পরে দিব্যি ভাল মানুষটি হয়ে বাড়ি ঢুকল। নিমতিতের গল্প করল। কাঁচাগোল্লা এনেছিল নিমতিতে থেকে। নিজের হাতে ভাগ করে দিল। তোর জন্যে রাখল। তারপর বেরুল পাড়া বেড়াতে। ঘণ্টা দুই পরে ফিরে এলো যখন, তখন অন্য মূর্তি। বললে, ভুচু আমরা যাচ্ছি। আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম। বলে কি—গোপাল যে এমন নষ্ট হয়ে গেছে, আগে জানলে বিয়ের কথা তোলা দূরে থাক, এ বাড়ির অন্নজলই ছুঁতাম না। ছি ছি ছি! সারা গাঁয়ের

লোক আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে যা মুখে আসছে তাই বলে গেল গোপালের নামে।

গোপাল আনমনা হয়ে বলল, তিন্নি কিছু বলল না মামাবাবুকে?

তা বললে। নরম স্বরে ভুচুমাসি বলল। বললে বৈকি। বুঝিয়ে বলতে গেল যদি, গেনুদা তাকে থাপ্পড় তুলে থামিয়ে দিলে। আমি কাঁদাকাটা করে বললাম, ঠিক আছে। রাঁধাবাড়া করে ফেলেছি। দুটো ভাত অন্তত মুখে দিয়ে যাও। তুমি না খাও, মেয়েটাকে খেতে দাও। অতটা পথ যাবে। তা কানে পর্যন্ত নিলে না। তক্ষুনি সব গোছগাছ করে মেয়েটাকে টানতে টানতে বেরিয়ে গেল।

গোপাল চুপ করে রইল। ভুচুমাসি তাড়া দিয়ে বলল, যা—কুয়োতলায় বালতিতে জল রেখেছি। মুখে হাতে জল দিয়ে আয় কাপড়-চোপড় ছাড়। ভাত বাড়ি।

গোপাল লণ্ঠনটা নিয়ে ঘরে ঢুকল কাপড় ছাড়তে। টেবিলে লণ্ঠন রাখার সময় তার চোখে পড়ল, একটা ভাঁজ করা কাগজ রাখা আছে। ওপরে গোটা গোটা হরফে লেখা 'গোপালদা'। কাগজটা খুলেছে. সেই সময় দরজায় কাছে থেকে ভুচুমাসি বলল, যাবার সময় তিন্নি ওই চিঠিটা লিখে রেখে গেছে। পড়ে শোনা তো কি লিখেছে—

গোপাল চিঠিটা পড়ল। তিন্নি লিখেছে ঃ 'গোপালদা, আমাকে ক্ষমা কোরো। বাবা ভীষণ অবুঝ। আমার এত যে থাকার ইচ্ছে ছিল। ইচ্ছে ছিল বনমালাদের সঙ্গে সেদিনকার মতো ঝুলনের মেলায় ঘুরব। নৌকা চেপে চলে যাব পঞ্চমুখী শিবের মন্দিরে। সাহস করে অন্তত একটিবারও গঙ্গায় স্নান করব, না হয় তুমি আমার একটা হাত ধরে থাকবে। কিন্তু কোন ইচ্ছেই পূর্ণ হল না। একটা বিশাল অতৃপ্তি নিয়ে চলে যেতে বাধ্য হলাম। মেয়ে হয়ে জন্মেছি এ দেশে। কী করব বল? এবার যে কথাটা বলার জন্যে এই চিঠি, সেইটে বলি। বাইরে দাঁড়িয়ে বাবা তাড়া দিচ্ছেন। আমি কাপড় বদলানোর ছলে ঘরে ঢুকে এই চিঠিটা লিখছি। গোপালদা, সত্যিই তুমি এক মহৎপ্রাণ ছেলে। তোমার কোনও তুলনা হয় না। তোমার মতো ভাল ছেলে আমি সত্যি কোথাও দেখিনি। তাই তোমাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করেছি। আর সেজন্যেই তোমাকে আমার আসল কথাটা বলতে পারি নি। জানতাম তুমি কষ্ট পাবে। সেদিন ঘাটে হিজল গাছটার কাছে ছুটে গিয়েছিলাম এই কথাটা বলব বলেই। কিন্তু তোমার কষ্ট হবে ভেবে বললাম না। ভাবলাম, যাবার সময় বরং বলে যাব। এটা জেনে গেলে তুমি অকারণ একটা স্বপ্ন নিয়ে বসে থাকবে না। কষ্ট হয়তো পাবে। কিন্তু তুমি সেদিন কথায় কথায় বলেছিল, 'গঙ্গা আমার সব কষ্ট ধুয়ে দেয়'। শুনে খুশি হয়েছিলাম। কথাটা তবু আমার বুকে বিঁধে রইল গোপালদা। তোমার মিথ্যে বদনাম শুনে বাবা যে তোমাকে ঘৃণা করছেন, এইটেই কিন্তু আমার কাছে শাপে বর হয়েছে। এ বিয়ে আমি মনে প্রাণে চাই নি। কারণ আমি অন্য একজনকে ভালবাসি। শ্রদ্ধা থেকে নাকি ভালবাসা জন্মায়। কিন্তু শ্রদ্ধা আর ভালবাসা তো এক নয়। তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো। তোমার মিথ্যা কলঙ্ক আমাকে শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়ে দিয়েছে জেনে রেখো, সারা জীবন তোমার জন্যে এই শ্রদ্ধা আমার থাকবে। তুমি মহৎ। মাথা লুটিয়ে তোমার পায়ে প্রণাম রেখে গেলাম। ইতি, অনুরাধা'......

ভুচুমাসি বলল, কি লিখেছে জোরে-জোরে পড়ে শোনা না বাবা!

গোপাল চিঠিটা মুচড়ে ধরল মুঠোয়। চেঁচিয়ে উঠল, তুমি থামবে—

ভুজুমাসি গজগজ করতে করতে বেরিয়ে গেলে গোপাল জামা প্যান্ট ছাড়ল। লাথি মেরে সেগুলো একপাশে সরিয়ে রেখে বেরুল। সে উঠোনে নামলে ভুচুমাসি বলল, যাচ্ছিস কোথায় এমন করে?

গোপাল জবাব দিল না। খিড়কির দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। আকাশের ভাঙা মেঘের ফাঁকে এতক্ষণে কৃষ্ণপক্ষের টুকরো চাঁদটা বেরিয়ে এসেছে। ফিকে হলুদ জ্যোৎস্নায় ঝিলমিল করছে গঙ্গার জল। একটা রাতপাখি থেকে থেকে ডেকে উঠছে কোথায়। তিন্নির চিঠিটা আরও মুচড়ে দলা পাকিয়ে জলে ছুঁড়ে ফেলল গোপাল। স্রোত সেটা কেড়ে নিয়ে গেল। অমনি বিশাল একটা আরাম তাকে চারদিকে থেকে জড়িয়ে ধরল। তার সব কষ্ট, স্বপ্নভঙ্গের দুঃখ ধুয়ে যেতে থাকল। চিত সাঁতার দিয়ে স্রোতে এগিয়ে গেল গোপাল। তার সারা শরীরে জ্যোৎস্নাময় জল ঝিকমিক করতে থাকল। কখন কপালের ব্যাণ্ডজটা খুলে ভেসে গেছে। একটু চিনচিন করছে। গোপাল গ্রাহ্য করে না। তার নগ্ন ক্ষত ধুয়ে যায়। জলের শব্দের সঙ্গে দূরের এক আর্ত চিৎকার শুনতে পেয়ে সে মুখ তুলে তাকায়। ঘাটের শিয়রে আলো দোলে।.... গোপাল! গোপাল রে! ওরে গোপাল!

গোপাল ঘাটে ফেরে।........

আগুনের চারপাশে

মধ্যরাতে তুমুল ঝড়ের মধ্যে জীপ গাড়িটা টলতে টলতে এগিয়ে আসছিল বকুলপুরের দিকে। হেড-লাইটের তীব্র আলো ধুলোয় ধুলোয় আবছা হয়ে যাচ্ছিল। রাস্তার দু'ধারে উঁচু গাছ। প্রতি মুহূর্তে তাদের ভেঙে পড়ার ভয় ছিল। বারবার ভয়ঙ্কর শব্দে বাজ পড়ছিল। দৈবাৎ জীপ গাড়িটার ওপরও পড়তে পারত। কিন্তু সে সব কিছু ঘটল না। বাবলা নদীর সাঁকো পেরিয়ে এসে একটা বাঁকের মুখে নিরাপদে পৌঁছে গেল। মধুসূদন শুধু বলে উঠলেন, যাক। ড্রাইভার পরাশর আড়চোখে রাগে মনিবের মুখটা একবার দেখে নিল। সে সারাক্ষণ বলেছে, একটু থেমে দেখে যাই, স্যার? মনিব একগুঁয়ে মানুষ। বলেছেন, না। দুজনের মধ্যিখানে শক্তভাবে বসে আছে নৃপেন। ঝড়টা শুরু হওয়ার পর থেকে সে একবারও মুখ খোলে নি। আর পেছনের খোঁদলে মধুসূদনের বডিগার্ড লাল্টু কিছু বলবে বলে কয়েক বার ঠোঁট ফাঁক করেছে, বলে নি। হয়তো ভেবেছে, মধ্যরাতে এই হঠকারী প্রাকৃতিক হামলা থেকে মধুসূদনকে রক্ষার দায়িত্ব তার নয়। হেড-লাইটের ধুলোট আলোয় খড়কুটো ছেঁড়াপাতায় বোনা ধূসর পর্দার দিকে তার দৃষ্টি। যদি কানো আততায়ীর মূর্তি ভেসে ওঠে সে তার চোরাই ছ'ঘরা দিশী পিস্তল তাক করতে একটুও দেরি করবে না।

বাঁকের পর বকুলপুরের শুরু। বাঁয়ে যোগমায়া বিদ্যাপীঠের টানা নীচু পাঁচিল, ডাইনে আমবাগান। তারপর সুরকিকল, ইট ও টালির ভাটা, কঠগোলা এবং একটা-একটা খোলামেলা বাড়ি। তারপর বাজার এলাকা এবং ঘনবসতি। তাও সে সব এখন দূরে। বাঁকে ঘুরেই দেখা গেল, বকুলপুর কখন অন্ধকার হয়ে গেছে। নদীর সাঁকোয় উঁচু থেকে তখন দেখা যাচ্ছিল ধুলো-ওড়ানো রাতের ঝড়ের মধ্যে আবছা হলুদ আলোর অজস্র কাঁপা কাঁপা ফুটকি। এখন সব মুছে গেছে। লোডশেডিং হতে পারে। ঝড়ে বিদ্যুতের তার ছিঁড়তেও পারে। প্রতি বছর এ সময়টাতে এমন হয়েই থাকে।

লাল্টু হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, আই! পরাশরের স্টীয়ারিং ঘুরে গেল। যোগমায়া বিদ্যাপীঠের নীচু পাঁচিলের আড়াল থেকে মাথা তুলেছে দুটো ভূতুড়ে মূর্তি। ডাইনে আমগাছের আড়াল থেকে আরও দুটো আবছায়া লাফ দিয়ে রাস্তায় এসে পড়েছে। তারপর বুঝি বাজ পড়তে শুরু করল। হঠাৎ প্রচণ্ড তম আঁচ। কানে তালা ধরানো আওয়াজ। জীপ গাড়িটা টাল খেয়ে যোগমায়া বিদ্যাপীঠের নীচু পাঁচিলের শেষ কোণায় ধাক্কা মারল। তারপর উলটে গেল। আবার বাজের শব্দ। পেট্রোল ট্যাংকে আগুন ধরে গেল। দাউদাউ জ্বলতে থাকল গাড়িটা। ঝড় সেই ভয়ঙ্কর আগুন ঘিরে ঘুরপাক খেতে থাকল। শুকনো ঝোপঝাড়ে ছড়িয়ে গেল আগুনটা। ঘোড়ানিমের ডালপালা আর সবুজ পাতা কালো ধোঁয়ার ভেতর চিড়বিড় করে জ্বলতে থাকল। আবার বাজ পড়ার শব্দ। আগুন বিকট হাঁ করল। বারুদ ও পেট্রোলের ঝাঁঝাল কটু গন্ধ উড়িয়ে যেতে থাকল বকুলপুরের দিকে।

চার আততায়ী তখন আমবাগানের ভেতর টলতে টলতে দৌড়ানোর চেষ্টা করছিল। একজন আছাড় খেয়ে পড়েছিল। সে একবার পিছু ফিরে আগুনটা দেখল। তারপর আস্তে-সুস্থে অন্ধকারে পা বাড়াল। পর পর দুটো গ্রেনেডের ক্যাপসুলের মুখ দাঁতে কামড়ে ছাড়াতে জিভের ডগা ছড়ে গেছে। চিনচিন করছে। থুথু ফেলতে ফেলতে হাঁটে সে। নাকের ভিতর বিচ্ছিরি গন্ধ ঠাসা। বারবার নাকও ঝাড়ে।

ঝড় থামবার লক্ষণ নেই। রাত প্রায় সাড়ে বারোটায় যোগমায়া বিদ্যাপীঠের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে রাস্তার ধারে ঝোপঝাড়ের মধ্যে ওল্টানো জীপের চিতায় চারটে মড়া দ্রুত পুড়ছে। ঘণ্টা তিনেক আগে এখান দিয়ে মিনিস্টার গেছেন নীল রঙের মোটরগাড়িতে। পেছনে ছিল সিকিউরিটি। ছিল বকুলপুর থানার পুলিস বাহিনীও। তখনও ঝড়টা আসে নি। উত্তর-পশ্চিম দিগন্তে তার কালো মুখের মিটিমিটি হাসির ঝিলিক দেখা যাচ্ছিল। সদর শহরের সার্কিট হাউসে আগামীকাল ভোর ছ'টায় মিনিস্টারের সঙ্গে জেলা অফিসারদের জরুরী বৈঠক। সাতটা পাঁচের ডাউন ট্রেনে কলকাতা ফিরতে হবে। নেহাত নৃপেনের খাতিরে গণ্ডগ্রম বাবলবুনিয়ায় সভা করতে যাওয়া। নৃপেন বলেছিল, ওই পকেটটা কবজা করার চেষ্টা করছি অনেক বছর থেকে। প্রায় ব্রেকথ্রুর মুখোমুখি এসে গেছি। আপনাকে একবার পায়ের ধুলো দিতেই হবে দাদা। তবে সভাটা স্রেফ কালচারাল। রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী।

বকুলপুরের অঞ্চল-প্রধান মধুসূদন হাসতে হাসতে বলছিলেন, এ স্যার এক ঢিলে দুই পাখি বধ।

গাঁয়ে হিন্দু মুসলিম পপুলেশন সমান-সমান প্রায়। মুসলিমদের উঠতি জেনারেশন খুব সেল্‌ফকনসাস। ভীষণ সেনসিটিভ। নেপেনকে জিগ্যেস করুন, বলবে।

নৃপেন বলেছিল, দুই কবিকে একঘাটের জল খাওয়ানো দেখে কি বুঝতে পারছেন না দাদা?

বাবলা নদীর পাড়ে এক সময়কার জমিদারী কাছারিতে প্রাইমারী স্কুল হয়েছে। সেখানেই সভার আয়োজন। সকাল থেকে মাইক। বিশাল আকাশের নীচে মঞ্চ আর সামিয়ানা ছিল। মিনিস্টার দেখতে আশেপাশের গ্রাম থেকে লোকেরা ঝেঁটিয়ে জড়ো হয়েছিল। কিন্তু মিনিস্টার এলেন বড্ড দেরি করে। সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা নাগাদ। বাবলবুনিয়ার ছেলেরা গ্রাম থেকে দু'কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা নিজের হাতে মেরামত করেছিল। নৃপেন ক'দিন ধরে ওখানেই ছিল রবিয়ুলদের বাড়িতে। একটানা খরা চলেছে সেই বোশেখ মাস থেকে। গরমে গা ঝলসে যায় সারাদিন। রাতের দিকে নদীর ওপার থেকে একটা ঠান্ডা হওয়া আসে। ভোর অব্দি একটু আরাম। আজ জষ্ঠি মাসের এগরো তারিখেও সারাদিন এবং মধ্যরাত পর্যন্ত আবহমন্ডল ছিল শান্ত ও থমথমে। নাচ গান আবৃত্তি ভাষণ তারপর নাটক। মিনিস্টার এলাকার হাবভাব আঁচ করে এবং হয় তো বা নৃপেনের প্রতি স্নেহেও বেশ কিছুক্ষণ থেকে গেলেন। খাওয়াদাওয়াও করলেন। তারপর রওনা দিলেন। তখনও ঝড়ের সাড়া নেই। সারাপথ ভিড় করে মানুষজন ফিরে চলেছে যে যার গ্রামে। অন্ধকারে চারদিকে তাদের কথাবার্তা, কখনও গানের শব্দও শোনা গেছে। শোনা গেছে, অতি উৎসাহী রাজনীতি করা যুবকদের স্লোগান। বাবলবুনিয়ায় আজ ইতিহাস সৃষ্টি হল—বলছিলেন মধুসূদন। তাড়াও দিচ্ছিলেন নৃপেনকে। ও নেপেন, হল?

এই যে। এক মিনিট মধুদা।

মধুবাবু মনে মনে অস্বস্তির সঙ্গে হাসছিলেন। নৃপেন জানে, কিছুদিন বাদে সে তাঁর জামাই হবে, তবু এখনও মধুদা বলে। অনেক দিনের অভ্যেস আর কী! শ্যামবর্ণ, লম্বাটে, শক্ত গড়নের ছেলেটিকে তাঁর বরাবর পছন্দ। সেটা নিছক রাজনীতির জন্যে নয়। ওরা বকুলপুরের জমিদারদের বড় তরফের বংশধর। ওরা যখন জমিদার, তখন মধুবাবুর ঠাকুর্দা নেহাত এক রোড কনট্রাক্টর। তবে নৃপেন বড় জনপ্রিয় ছেলে। তার চেহারায় নেতাদের মতো মিঠে অথচ রাশভারী ভাব আছে। একটু হাসলেই মনে হয় সূর্য উঠল। একটু গম্ভীর হলেই গা ছমছম করা অন্ধকার।

কই নেপেন? এগারোটা পনের হয়ে গেল যে?

যাচ্ছি মধুদা।

লাল্টু একটু তফাতে আলো-আঁধারিতে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছিল। জহুরী জহর চেনে। এ গাঁয়ের উঠতি মস্তান-মার্কা কিছু ছেলে তার নামের গুণে অভিভূত। গুড়ের চারপাশে মাছির মত ভনভন করছিল। সেই সময় হঠাৎ তার খেয়াল হয়েছিল, বকুলপুর ফিরতে হবে। কাঁচা দু'কিলোমিটার রাস্তা ভেঙে পাকা সড়ক। তারপর প্রায় ছ'কিলোমিটার ওই টাকার কুমিরটাকে আগলে নিয়ে যেতে হবে। এই গোলমালের বছরে যেচে ঝামেলা কাঁধে নিয়েছে।

কিন্তু ঝড়ের আভাস পেয়েছিল প্রথমে পরাশর ড্রাইভার। সে তাড়া না দিলে নৃপেন আরও দেরি করত। গ্রাম পার করে দিয়ে বাবলবুনিয়ার ছেলেরা স্লোগান দিতে দিতে ফিরে গেছে। তারপর জীপ যখন পাকা রাস্তায় একটুখানি এগিয়েছে, ঝড়টা এসে পড়ল। আচমকাই এল মনে হচ্ছিল। সামনে একটা গ্রাম এবং ঘন গাছপালার আড়াল থেকে তার দৌড়ে আসাটা টের পায় নি কেউ। আর সে কী ভয়ংকর ঝড়! ধুলো, ধুলো, ধুলো! হেড-লাইটের সবটুকু ছটা ধূসর করে ফেলেছিল অনেকদিন ধরে জমে থাকা ধুলো। পরাশর বলেছিল, একটু থেমে দেখে যাই, স্যার।

মধুবাবু কড়া হয়ে বলেছিলেন, না।

মড়মড় করে ছোট-বড় ডাল ভেঙে পড়ছিল। মুহুর্মুহু ভীষণ শব্দ করে মেঘ ডাকছিল। লক্ষ লক্ষ ভোল্টের প্রাকৃতিক বিদ্যুৎ ঝলসে দৃষ্টি ধাঁধিয়ে দিচ্ছিল হতভাগ্য ড্রাইভারের। বাড়িতে তার বউয়ের প্রচণ্ড 'হেমারেজ ' দেখে এসেছিল। তার মনে সুখ ছিল না।

আর নৃপেন, একত্রিশ বছর বয়সের স্বাস্থ্যবান, ঈষৎ পোড় খাওয়া, শ্যামবর্ণ, জনপ্রিয় যুবনেতার মনে এই ঝড়ের উল্টো এক প্রকৃতি জেগে উঠেছিল। বাইরের ওই হঠকারী উপদ্রব তাকে নড়াতে পারছিল না। সে শান্তভাবে প্রস্তুত হচ্ছিল। রাজনৈতিক জীবনের একটা সুন্দর উপহার তার হাতে

এসে গেছে। বাবলবুনিয়ায় একটা শক্ত ঘাঁটি ছিল বিরোধীদের। সেটা এতদিনে পুরো গুঁড়িয়ে গেল বলা যায়। ওরা জীবনে কেউ মিনিস্টার দেখে নি। নৃপেন জানে, ওরা অনেকেই এখনও মিনিস্টারের বদলে মন্ত্রীমশাই বলতে অভ্যস্ত। ওদের বুড়ো হাবড়ারা তো যাত্রা আসরের মন্ত্রী ছাড়া সত্যিকার মন্ত্রীদর্শনের কথা কল্পনাও করে নি। বড় সরল এই এলাকার মানুষজন। সভা যতক্ষণ চলেছে, নৃপেন জনগণের হাবভাব লক্ষ্য করেছে তীক্ষ্নদৃষ্টে তাকিয়ে। নৃপেন টের পাচ্ছিল, ওরা অনেকে হয় তো একটু হতাশও হয়ে থাকবে। কারণ ওরা ভেবেছিল, যাত্রা আসরের মন্ত্রীর মত উজ্জ্বল, শ্মশ্রুধারী, ষড়যন্ত্রসংকুল, বাঁকা হাসির রেখায় জটিল ও অস্বস্তিকর কিছু দেখবে। তার বদলে এক নাদুসনুদুস গড়নের ধবধবে সাদা সুন্দর সরল ও পবিত্র কিছু দেখল। তাবে শেষ অব্দি খুশিই হয়েছে ওরা। যাবার সময় বলে গেছে, বাবা নেপেন, তোমার জোরেই এসব হল। বাবলবুনিয়ার সবচেয়ে বুড়ো মানুষ মুজঃফর মিয়া বলছিলেন, এই আঁধার গাঁয়ে রোশনি জ্বেলে দিলে বাবাজীবন! তোমার জয় হোক! আবেগাপ্লুত স্বরে নৃপেন বলছিল, না চাচাজী। আপনাদেরই জয় হোক।

এই ভয়ংকর প্রাকৃতিক প্রবাহের মধ্যেও এসব কথা স্মরণ করে নৃপেন শান্ত ও দৃঢ় থাকতে পারছিল। তার নতুন করে মনে হচ্ছিল: বেঁচে থাকাটা কত জরুরী হয়ে উঠছে। এমন কি, তার বাঁচার সঙ্গে কী এক আকস্মিক উচ্চাকাঙ্ক্ষায় জড়িয়ে গেল বুঝি আরও হাজার হাজার লোকের বাঁচা! নৃপেন ওই দমকা আবেগ হালকা করতে একটা জোরালো নিঃশ্বাস ছেড়েছিল। আর ঠিক সেই সময় পেছনের খোঁদল থেকে সান্টু আচমকা চেঁচিয়ে উঠেছিল, আাই!

তারপর রাত সাড়ে বারোটায় যোগমায়া বিদ্যাপীঠের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ঝোপের মধ্যে ওল্টানো জ্বলন্ত জীপের তলায় নৃপেনের শরীর আরও তিনটে শরীরের সঙ্গে কুঁকড়ে ছাই হয়ে গেল। রাতের ঝড়, ঘন কালো ধোঁয়া ও আগুনের গন্ধের সঙ্গে মড়াপোড়ার গন্ধ, বারুদের ও পেট্রলের গন্ধ মাখামাখি করে নিয়ে বকুলপুরের দিকে দৌড়তে থাকল।

দুই

বাবলা নদীর এ পাড়টা উঁচু আর মাটিও শক্ত। এখানে প্রায় পাঁচ একর জমির ওপর যোগব্রতের পৈতৃক বাড়ি। আসলে একসময়কার বাগানবাড়িই বটে। যোগব্রতের ঠাকুর্দা ছিলেন জজ কোর্টের নামকরা উকিল। প্রচুর পয়সা করেছিলেন। সে আমলের বনেদী বড়লোকী হাব-ভাব যথেষ্ট ছিল। ফোর্ড হাঁকিয়ে স্ফূর্তি ওড়াতে গ্রামে আসতেন ছুটিছাটায়। জেলা বোর্ডের সড়কে তাঁরই তদ্বিরে প্রতি খরায় অন্তত এই কালিকাপুর অব্দি প্রচুর পীচ ও পাথরকুচি প্রয়োগ করা হত। যোগব্রতের বাবা সত্যব্রত কিন্তু ডাক্তার হয়েছিলেন। তাঁর আমলেই কালিকাপুরের বাগানবাড়ি গৃহস্থবাড়ি হয়ে ওঠে। শহর ছেড়ে গ্রামে চলে এসেছিলেন সত্যব্রত। সায়েবী কুঠীবাড়ির ঢঙে তৈরী বাড়িটার চরিত্র বদলে গিয়েছিল। চেহারাও বদলে ছিল। সকাল-সন্ধ্যা এলাকার রুগী ভিড় করে বসে থাকত সামনেকার বিশাল লনে। ফুলের বাগান ছত্রখান হয়ে গিয়েছিল তাদের আনাগোনায়।

সত্যব্রত শেষ জীবনে জমিজিরেতের নেশায় পড়েন এবং শোনা যায়, ওষুধের দাম আর ভিজিটের টাকার বদলে অসংখ্য রুগীর চাষের ক্ষেত করায়ত্ত করেন। ষাটের দশকে নতুন অর্থে চালু 'জোতদার' খেতাব তাঁর ওপর চাপানো হয়েছিল। বুড়ো হাড়ে রাজনীতির ধাক্কা খেয়েছিলেন প্রচণ্ড। তবে তখন তাঁর একমাত্র ছেলে যোগব্রত লায়েক হয়েছেন। সরাসরি রাজনীতি না করলেও তাঁর সঙ্গে গোপন রফা করে বাঁচতে শিখেছেন। যোগব্রত শহরের হোস্টেলে থেকে লেখাপড়া করলেও মাটির সোঁদা গন্ধ থাকে আবিষ্ট করেছে বরাবর। এখন তাঁর বয়স আটচল্লিশ। ভারতের গ্রামে স্বাধীনোত্তর যুগের রাজনীতির এ যাবৎ হালচাল ও হাওয়া-বাতাস তাঁর নখ-দর্পণে। রাজনীতিওয়ালারা তাঁকে বলে ওয়েদার কক। কথাটার সোজা মানে, তিনি সবার সঙ্গে আছেন এবং কাকেও না চটিয়ে প্রত্যেকের প্রীতি অর্জনে পটু।

না, তাই বলে কেউ যোগব্রতকে চক্রী, ধুরন্ধর, পাঁকাল মাছ কিংবা এই ধরনের কোনো অশ্রদ্ধেয় খেতাব দেয় না। খেতাব বলতে শুধু ওই 'জোতদার'—একালে শব্দটি নিন্দার গন্ধ ছড়ালেও তার পেছনে ক্ষমতা নামে আরেকটি লোভনীয় শব্দের চাপা বর্ণবিচ্ছুরণ যোগব্রতকে শেষ পর্যন্ত একটা

উঁচু জায়গায় বসিয়ে রেখেছে।

যোগব্রতের উচ্চতা ছ'ফুট দুই ইঞ্চিরও বেশী। ছেলেবেলায় প্রচন্ড ফর্সা ছিলেন। কিন্তু প্রকৃতির আদিম নখের আঁচড় সেই অভিজাত উজ্জ্বলতাকে অনেক ক্ষয় করে ফেলেছে। তাঁর খাড়া নাক ও পাতলা ঠোঁটে শক্তিমান অমায়িকতা আছে। তাঁর চোখ দুটি বেশ বড়। চোখের তলায় বাদামী ছোপ এবং চওড়া কপালের কয়েকটি ভাঁজ তাঁর মুখমন্ডলকে বিষাদে ঈষৎ ক্লিষ্ট করেছে। তাঁকে দেখামাত্র কেন যেন সমবেদনা জাগে। তা ছাড়া চারপাশে ঘন সবুজের মধ্যে তাঁর ধবধবে সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি পরা মূর্তি হঠাৎ মানুষকে মুগ্ধ করে।

খুব ভোরে যোগব্রত বাইরের ঘরের বারান্দার নীচে মোটর সাইকেলের দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিলেন। এক হাতে চায়ের কাপ। কাঁধে একটা সুন্দর ব্যাগ ঝুলছে। যোগব্রত পবীক্ষা করছিলেন গাড়িটা জগাই ঠিকমত পরিষ্কার করেছে কি না। কাল রাতে ঝড়ের পর ঘন্টা দুই জোরালো বৃষ্টি পড়েছিল। খুব ভিজে গিয়েছিলেন। একবার ভেবেছিলেন, কোথাও অপেক্ষা করবেন। পরে জেদের বশে সোজা কালিকাপুরের দিকে এগিয়েছিলেন। তখনও বিদ্যুতের ঝিলিক আর বাজ পড়ার বিরাম ছিল না। তবে কালিকাপুর অব্দি এ রাস্তাটার দুই ধারে গাছপালা বিশেষ নেই। শুধু একটা ভয় ছিল চাকা স্লিপ করার। দু'ধারে নয়ানজুলিতে অতল খাদ। পড়লে বাঁচতেন না।

একটু তফাতে ফুলবাগিচায় বসে ভেজা মাটিতে খুরপি-চালাচ্ছিল জগাই। আগের আমলের বিধ্বস্ত বাগিচা যোগব্রত আবার নতুন করে সাজিয়ে তুলেছেন। রাতের বৃষ্টিতে শুকনো ঘাস ও ফুল-ফলের গাছে চেকনাই ভাব ফুটেছে। মাত্র কয়েকটি ঘন্টায় কী এক অলৌকিক স্বাস্থ্যের লাবণ্য আর পরিচ্ছন্নতা। জগাই অবশ্য প্রকৃতিকে আলাদা করে বোঝে না। সে উদ্ভিদের সবুজ রং কিংবা ফুলের সৌন্দর্যে চমকে উঠতে জানে না। হয়তো আবিষ্ট হয়। তার চোখ কাজের ফাঁকে ফাঁকে ছোটবাবুর দিকে। ওনার যা পরিচ্ছন্নতার বাতিক! মোটর সাইকেলের গায়ে কোথাও এক ফোঁটা ময়লা দেখলেই বলে উঠবেন— ও জগাই! এ কী রে?

রাতের ঝড়বৃষ্টিতে সারা বাগানে বিশৃঙ্খলা। ছেঁড়া পাতার জঞ্জাল ও ডালপালা। কিন্তু এ নিয়ে আজ কিছু বললেন না যোগব্রত। চায়ের কাপটা বারান্দায় রেখে অকারণ দুটো হাত একবার তালি বাজিয়ে সাফ করলেন। তারপর পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন। ধরানোর সময় দাঁতের ফাঁকে ডাকলেন, মায়া! ও মায়া।

মায়া ওপরের ঘরের জানলার রডের ফাঁকে নাক ঢুকিয়ে নীচে বাবাকে লক্ষ্য করছিল। আস্তে বলল, কী?

ওইতেই যেন চমকে উঠলেন যোগব্রত। মুখ তুলে মেয়েকে দেখে ফিক করে হাসলেন। আছিস?

কেন?

ছোটমামা উঠেছে?

হুঁউ।

ঝটপট রেডি হতে বল্ না মা। সাড়ে ছ'টায় ট্রেন। ছ'টা বেজে গেল যে! কখন ডেকে এসেছি।

যোগব্রত কয়েক পা এগিয়ে লনের ঘাসে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। আকাশ কোথাও পরিষ্কার, কোথাও ভাঙা-ভাঙা মেঘে ঢাকা—ছড়িয়ে পড়া দইয়ের মত। পুবে ভেজা সুরকিগুঁড়োর মত চাপ চাপ কিছু মেঘ দেখে বোঝা যায় সূর্য উঠে আসছে। কিন্তু পৃথিবীর গাঢ় ধূসরতা ঘোচে নি। নদীর ওপারে বাঁশ-বনের চোখেমুখে তখন কয়েক খাবলা অন্ধকার লেগে আছে। বাঁশবনটায় এ কয়েকটা মাস পাপিয়া ডাকে। ডাকছে। শুকনো নদীর বুকে সোনালী বালির চড়ায় গাঁয়ের এক বউঝি ঘোমটা টেনে একা দাঁড়িয়ে আছে। পেটে বাঁ হাতে মৃদু থাপ্পড় মারছে। যোগব্রত একটু বিরক্ত হয়ে ফাঁকা মাঠ ও সড়কের দিকে তাকিয়ে রইলেন। নীচের নদীর চড়া শুকনো কয়েকটা মাস মেয়েরা বড্ড নোংরা করে রাখে। দক্ষিণ থেকে বাতাস বইলে দুর্গন্ধের ঝাপটা এতদূর অব্দি এসে পড়ে। বহুবা বলেও কাজ হয়নি। আজকাল ওদের জোর দিনে দিনে বেড়েছে। কী আর করা।

যোগব্রত ঘড়ি দেখে নিয়ে বললেন, ও জগাই! দ্যাখ্ তো পান্নার হল নাকি?

জগাই বুড়ো হয়ে গেছে। সারাজীবন মাটির দিকে ঝুঁকে থাকার ফলে মাটির গভীর টান তাঁর

শরীরের কাঠামো বাঁকা করে ফেলেছে। এ সব সময় সেই টান ছাড়িয়ে দাঁড়াতে তাঁর বেশ খানিকটা সময় লাগে।

জগাই খুরপি হাতে নিয়েই পা বাড়িয়ে বলল, পান্নাবাবু এয়েছে নাকি গো? কখন এল? দেখলুম না তো!

যোগব্রত রাগেন খুব কম। এখন রেগেছেন। বললেন, অত কৈফিয়তে তোর কাজ কী বাবা?

মায়া ওপর থেকে বলল, ছোটমামা নেমেছে বাবা।

শুনতে পেয়ে জগাই খুকখুক করে গলার ভিতর কাশতে কাশতে বা হাসতে হাসতে ফিরে এল নিজের জায়গায়। বারান্দায় পান্না এসে দাঁড়িয়ে আছে। যোগব্রত মিষ্টি হেসে বললেন, চা খেয়েছিস তো?

পান্না গলার ভিতর কী বলল, বোঝা গেল না। সে কোমরে দুহাত রেখে পৃথিবী ও আকাশ দেখছিল। বারান্দা থেকে নেমে কয়েক পা এগিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। জিভ কেটে বলল, ব্যাগটা। এক মিনিট।

সে এক লাফে ফের বারান্দায় উঠে ঘরের ভেতর চলে গেল।

পান্নার বয়স পঁচিশের মধ্যে। রোগা লম্বাটে গড়ন। মাথায় বড় বড় চুল আছে। তার গায়ের রঙ যাকে বলে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। চোয়ালে উদ্ধত ভাব আছে। তার গোঁপ পাতলা হলেও মুখের চেহারায় তীক্ষ্ণতা দিয়েছে। যোগব্রত দিনের আলোয় ছোট শ্যালককে দেখার পরেই কয়েক মুহূর্তের জন্য একটু আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। অবচেতন আচ্ছন্নতা নেহাত। ওর দিদি বনশোভার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। বনশোভা—মায়ার মায়ের চেহারা অবিকল পান্নার মত। ঠোঁট কামড়ে ধরে যোগব্রত হেঁট হয়ে সিগারেটটা জুতোর তলায় ঘাসের মধ্যে চেপে ধরলেন।

ওপরে পান্না একটা ঘরে ঢুকে কিট ব্যাগটা তুলেছে, মায়া এল। ছোটমামা!

কীরে? পান্না হাসিমুখে তাকাল ভাগ্নীর দিকে।

তোমরা কোথায় যাচ্ছ গো?

পান্না ভুরু কুঁচকে বলল, তুই যাবি নাকি?

ভ্যাট! মায়া পাল্টা ভুরু কুঁচকে বলল, দায় পড়েছে আমার। এমনি জিগ্যেস করছি।

পান্না ব্যাগের ফিতে কাঁধে ঢোকাতে ঢোকাতে বলল, অজ্ঞাতবাসে।

কোথায় -কোথায়? চমক-লাগা স্বরে প্রশ্ন করল মায়া।

অজ্ঞাতবাসে। বলে পান্না দরজার দিকে পা বাড়াল।

মায়া বলল, ছোটমামা!

কী রে?

কাল রাতে ভিজতে ভিজতে কোত্থেকে এলে গো? বকুলপুর থেকে?

পান্না ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। কয়েক মুহূর্তের জন্য চোখ নিষ্পলক হয়ে উঠেছিল। তারপর সে ফিক করে হাসল। হ্যাঁ, আবার কোত্থেকে? মেজদার সঙ্গে ভীষণ ঝগড়া। বুঝলি তো? আর আমার কেমন রাগ, তা তো জানিস?

মায়ার মুখটা গম্ভীর। বলল, ও ছেলেটা তোমার সঙ্গে এসেছে, ও কে?

বাবা বলে নি কিছু?

মায়া ঘাড় নাড়ল।

ও বীরু। আমার এক বন্ধু। তোর বাবারও চেনাজানা। শহরে থাকে। পান্না কথা বলতে বলতে সিঁড়ির দিকে এগোল। মায়া তার পেছনে। কাল রাত্তিরে সে এক প্রবলেম মাইরি! বীরুকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ঢুকেছি, আর মেজদার সঙ্গে বেধে গেছে। তো প্রেস্টিজ। বুঝলি তো? তক্ষুনি বীরুকে নিয়ে সোজা বেরিয়ে পড়লুম তোদের এখানে। তারপর পড়বি তো পড় ঝড়ের মুখে। ইস! এমন বিপদে কখনও পড়ি নি রে।

সিঁড়ির ধাপে রেলিংয়ে হাত রেখে মায়া দাঁড়িয়ে গেল। ছোটমামা!

পান্না তখন নীচে। মুখ তুলে বলল, কী রে?

ও থাকবে?

হ্যাঁ, থাকবে। তোর বাবা ওকে থাকতে বলেছেন।

বাবা তো চলে যাচ্ছেন তোমার সঙ্গে।

না। স্টেশন থেকে ফিরে আসবেন।

তুমি তাহলে কলকাতা যাচ্ছ?

এতক্ষণে বুঝলি তা'হলে। বলে পান্না হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল।

মায়া কিছুক্ষণ সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে রইল। সিঁড়িটা কাঠের। তার মনে হচ্ছিল, সিঁড়িটায় ছোটমামার পায়ের শব্দ আর কাঁপন তখনও লেগে আছে। বাইরে মোটর সাইকেলের গরগর শব্দ শোনামাত্র সে দ্রুত নামতে থাকল এবং প্রায় দৌড়ে বারান্দায় গেল। তারপর বারান্দা থেকে নীচের লনে নামল।

গেট খুলে দাঁড়িয়ে আছে জগাই। যোগব্রতর মোটর সাইকেল বেরিয়ে গেল। বাড়ির চৌহদ্দি বরাবর টানা পাঁচিল। ফুট পাঁচেকের বেশী উঁচু নয়। তার সমান্তরালে খোয়া বিছানো সরু রাস্তায় জোরে ছুটে চলেছে গাড়িটা। দুটো মাথা দেখা যাচ্ছে। পাকা সড়কে পৌঁছলে পুরো দেখা গেল। তারপর গাছপালার আড়ালে মিলিয়ে গেল।

জগাই গেট বন্ধ করে এসে বলল, কী দিদি?

মায়া গম্ভীর হয়ে বলল, কী আবার?

তোমাকে অমন দেখাচ্ছে কেন গো?

মায়ার চোখ জ্বলে উঠল। কেমন দেখাচ্ছে? বড্ড বাজে কথা বলো তুমি জগাইদা। থামো, বাবা ফিরলে বলছি।

জগাই হাসছিল অথবা কাশছিল। দমে গিয়ে খুরপি সমেত হাত জড়ো করে কপালে ঠেকিয়ে বলল, দোহাই দিদি! দন্ডবত হই এট্টুখানি হাসি-ঠাট্টাও বোঝে না গা?

সে থপথপ করে পা ফেলে ফুলের বনে ঢুকল। গা বাঁচানোর ভঙ্গীতে মাথা ঝুঁকিয়ে খুরপির কোপ বসাল। এসব সময় সে পৃথিবীর খুব ভেতরটা দেখতে পায় এবং সেখানে পৌঁছবার জন্য তার মন কী যে আঁকুপাকু করে।

পিসীমা মনোরমার পুজো শেষ হয়েছে। ওপরে ছাদের খোলা অংশটায় দাঁড়িয়ে বুঝি সূর্য দেখছিলেন, কিংবা ভাইয়ের মোটর সাইকেলটাকেই। মায়া ঘুরে তাঁকে দেখতে পেয়ে ডাকল —পিসীমা।

কীরে মায়া?

তোমার পুজো হয়েছে?

নইলে দাঁড়িয়ে আছি কেন এখানে? আয়। খাবি আয়।

মায়া নীচে বারান্দায় উঠেই দেখল, ভেতরে বসার ঘরের ডান দিকে পেছনের ঘরে সেকেলে বিলিতী আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ছোট মামার বন্ধু দাড়ি কাটছে।

পর্দা আছে অবশ্য। কিন্তু বাতাসে ফাঁক হয়ে যাচ্ছে বারবার। নদীর ধারে বাড়ির এই সুবিধে। সারাক্ষণ প্রচুর বাতাস। কত হঠকারী, কত ভিজে ও কোমল, কত আড়িপাতা মেয়েলী বাতাস। আর কাল রাতে ঝড়বৃষ্টির পর সকালের এই বাতাস ঈষৎ হিমে গাঢ় এবং ভারী। মন্থরগমনা নারীর মত এবং স্নেহশীলা। আবছা কানে এল মায়ার পিসীমা জগাইকে বকছেন। বাবার বাতিক এ বাড়ি ফিরে আসার পর থেকে পিসীমাকেও পেয়ে বসেছে। ঝড়ের জঞ্জাল সাফ করার জন্য বকাবকি করছেন জগাইকে। নীচের তলায় ঘরগুলোর পেছনে এক টুকরো উঠোন আছে। সেখানে দুলে পাড়ার কাজল নামে মেয়েটা সেই ভোরবেলা থেকে কোমর বেঁধে লেগেছে। মায়া ওপর থেকে উঁকি মেরে দেখছিল উঠোনে একটা পাখির বাসা ভেঙে পড়ে আছে। তাতে কয়েকটা নীল-ধূসর ডিম। অন্য দিন হলে মায়া দৌড়ে নেমে যেত। ডিমগুলো কি তার বায়োলজির প্রয়োজন মেটাত না? কে জানে? ভোরবেলা থেকে মায়ার মন ভাল নয়।

মায়া ছোটমামার বন্ধুকে নিষ্পলক চোখে দেখছিল।

ছোটমামারই বয়সী। মায়া আন্দাজ করল। শহরের ছেলে সেটা চেহারা ও হাবভাবে স্পষ্ট। একটু ছিমছাম, একটু বিলাসী যেন। ছোটমামা কিন্তু এমন নয়। নাম কী বলল যেন? দুচ্ছাই! মায়ার এই

এক বদ অভ্যাস। শাগাগির সব ভুলে যায়। ঠোঁট কামড়ে ধরে নামটা স্মরণ করছিল সে।

ছেলেটা ডান দিকের গালে রেজার বুলোতে গিয়ে ঘুরল এবং তাকে দেখে ফেলল। কয়েক সেকেন্ড তার দিকে কেমন ঠান্ডা চোখে তাকাল সে। তারপর দৃষ্টি সরাল আয়নার দিকে।

মায়া পা বাড়াতে গিয়ে তাকে ফের দেখে নিল। ছোটমামার চেয়ে সাস্থ্যটা ভাল। হাতাকাটা গেঞ্জি আর ডোরাকাটা পাজামা পরনে। কপালে একটা ভুরুর ওপর কি কাটার দাগ দেখেছে মায়া? হুঁ, দেখেছে। ওঃ! ওর নাম বীরু। কী থেকে বীরু? বীরেন? ভ্যাট! বীরেন তো বড়মামার নাম। বীরেশ্বর হতেও পারে। মায়ার কলেজের এক সহপাঠিনী মধুমিতার দাদার নাম বীরেশ্বর।

এই যে! শোন--শুনুন।

মায়া চমকাল। বুকের ভেতর হঠাৎ চমক—যেন হৃৎপিন্ড ছুঁয়ে দিয়েছে কেউ। মায়া ঘুরে সেখান থেকে বলল, কী?

গলায় সাবানের ফেনা নিয়ে বীরু দরজার পর্দা তুলে একটু হেসে বলল, আপনি যোগব্রততার মেয়ে না?

মায়া মাথা দোলাল ছোট্ট করে।

হুঁ। আরেক কাপ চা ম্যানেজ করতে পারেন?

মায়া বলল, আচ্ছা। তারপর দৌড়ে সিঁড়িব ধাপে উঠল। কাঠের ধাপে বড় শব্দ হচ্ছে। কানে বাজে। কেন উরু দুটো এত ভারী লাগছে মায়ার? কোথাও কি কিছু ঘটেছে? মায়া জানে না। অথচ কী এক অজ্ঞাত ঘটনার ঠান্ডাহিম ছোঁয়া অবচেতনায় শিরশির করে ওঠে। সিঁড়ির ঘোরালো ওপরের ধাপগুলো ক্লান্তভাবে আস্তে আস্তে ডিঙিয়ে গেল মায়া। কাল রাতের কিছু স্মৃতি অস্পষ্ট ছবির মত, মনের আলো-আঁধারি দেয়ালের ওপর প্রতিচ্ছায়ার মত সাঁৎ সাঁৎ করে চলে গেল কাল রাতে ঝড়ের সময় হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়েছিল মায়ার। কী ভয়ংকর ঝড়! নদীর ধারে উঁচু পাড়ের ওপর বাড়ি বলে অবশ্য বরাবর এ রকম হয়। বাসি রক্তের মত রঙ এই বাড়িটার। বিদ্যুতের ঝলকে হঠাৎ হঠাৎ তার কোনো অংশ দেখে কেমন অস্বস্তি লাগে। মায়ের কাছে ঝড়ের রাতে শুয়ে থাকার কথা মনেই পড়ে না মায়াব। বাবার কাছেও কি শুয়েছে? বড্ড ভুলো মন মায়াব। যা কিছু আজীবন স্মৃতি এই আঠারো বছর বয়সের সবটাই নির্জনতা আর একলা থাকার। পিসীমা ফিরে আসার পর অবশ্য একই ঘরে থাকেন। কিন্তু ওর অভ্যেস বড় খাটে শোওয়ার। দাদু-ঠাকমার মস্ত সেকেলে খাট, অসম্ভব উঁচু, মায়ার ঘরে ঢোকানো হয়েছিল। তার ফলে মায়ার খাটটা যথেষ্ট নীচু এবং আভিজাত্যহীন হয়ে পড়েছিল। তবে ঘরগুলো বেশ প্রশস্ত। উঁচু সিলিং। জানলাগুলো লম্বাটে। ঝড়ের রাতে অদ্ভুত শব্দ করে। কাল রাতে যতক্ষণ ঝড় হল, মায়া বিছানার সঙ্গে নিজেকে এঁটে রেখেছিল। তারপর পিসীমার নড়াচড়া শোনা গিয়েছিল। মনোরমা টেবিল ল্যাম্পের সুইচ টিপে বলে উঠেছিলেন, ওই যাঃ! কারেন্ট গেছে। একটু পরে কেরোসিন বাতি জ্বেলেছিলেন। মায়া তখন আশ্বস্ত হয়ে ঘুমের ভান করেছিল। কিছুক্ষণ পরে বৃষ্টির শব্দ শোনা গিয়েছিল। তখন মনোরমা আলো হাতে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। এই অভ্যাস বরাবর। যতক্ষণ বৃষ্টি পড়ল, বাইরে ওপরে ও নীচে মনোরমার কথাবার্তা কানে আসছিল। তার কতক্ষণ পরে, মায়ার তখন সবে ঘুমের ঘোর এসেছে, পিসীমা এসে ডাকলেন, ও মায়া! ঘুমিয়ে পড়েছিস নাকি? তোর ছোটমামা এসেছে রে।

মায়া ভীষণ অবাক হয়েছিল। ছোটমামা এসেছে শুনে নয়, এই ঝড়জলে এত রাতে এসেছে শুনে। বড়মামা মেজমামা এ বাড়ি আসেন না। মাঝে মাঝে ছোটমামা আসে। বাবার সঙ্গে শুধু তারই কথা বলাবলি এবং আত্মীয়তা বজায় রয়েছে। অন্য মামারা বাবাকে দেখলে দূরে সরে যান, মায়া জানে। তবে মায়ার সঙ্গে ওদের ভাব ঘোচে নি। দৈবাৎ কলেজে গিয়ে শহরের রাস্তায় দেখা হয়ে গেলে ভাগ্নীকে স্নেহ ভালবাসা দিতে ভোলেন,না।

মনোরমা বলেছিলেন, থাক গে। আর উঠতে হবে না। ঘুমো। সকালেই তো দেখা হবে।

মায়া হঠাৎ বলেছিল, বাবা কী বলে গেছেন পিসীমা?

আমায় তো কিছু বলে নি। তোকে বলে নি বুঝি?

ফিরবেন বলেছিলেন।

ও। তাহলে তো.....মনোরমা ঠোঁট কামড়ে কিছু ভাবছিলেন

তারপরই বাইরে মোটর সাইকেলের শব্দ শোনা গিয়েছিল। মনোরমা চঞ্চল হয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। মায়াও বিছানা ছেড়ে উঠেছিল। বাবা নিশ্চয় কাকভেজা হয়ে ফিরেছেন। শাড়ি ঠিকঠাক করে বেরিয়ে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে সে বাবাকে ডাকবে ভেবেছিল কিন্তু নীচের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়েছিল মায়া।

নীচের ঘরে টেবিলের ওপর পিসীমার কেরোসিন বাতিটা রাখা আছে। পিসীমা একটু তফাতে দাঁড়িয়ে আছেন। বাবা ভিজে জবুথবু। মেঝের পুরনো বেরঙা কার্পেট ভিজে গেছে জলে। তাঁর সামনে ছোটমামা আর একটা অচেনা ছেলে। কী বলাবলি হচ্ছে চাপা গলায়। বাবার মুখে কেমন একটা নিঃশব্দ হাসি। হাসি আর ক্রূরতা।

ঠিক এই রকম চেহারার সঙ্গে আর একবার দেখা হয়েছিল। এমনি রাতের বেলায়। অবশ্য সে রাতে ঝড় ছিল না। বৃষ্টিও ছিল না। সেটা কতদিন আগের কথা, মনে নেই। শুধু মনে হয়, তখন সে ফ্রক পরে থাকত।

সেই স্মৃতি হঠাৎ মায়াকে জোর ধাক্কা মেরেছিল। আর মায়া তখনই ছিটকে সরে গিয়েছিল। ঘরে ঢুকে খাটে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছিল। বাবা তাকে একবার দেখতে আসবেন ভেবেছিল। সে জানে না, উঁকি মেরে দেখে গেছেন কিনা যোগব্রত। হয়তো ঘুমোচ্ছে ভেবে ডাকেন নি।

বিরাট রান্নাঘর নীচেই। তবে চায়ের জন্যে ওপরের একটা ঘরে আলাদা কিচেন রয়েছে। নব ঠাকুর এখন এখানেই চা-জলখাবার তৈরিতে ব্যস্ত থাকেন দশটা অব্দি। তারপর নীচের বড় কিচেনে গিয়ে ঢোকে। ততক্ষণ দু-তিনজন ঝি চাকরবাকর এসে যায় গ্রাম থেকে। তারা রাতটা নিজেদের বাড়িতেই কাটায়। বড়বাবু সত্যব্রতের আমলে এমনটা ছিল না। ছোটবাবু যোগব্রত এ ব্যবস্থা চালু করেছেন।

মায়া নবকে চায়ের কথা বলে ঘরে ঢুকলো। পিসীমা তখনও ওপাশে খোলা ছাদের আলিসায় ঝুঁকে জগাইকে আঙুল দিয়ে জঞ্জাল দেখাচ্ছেন আর বকাবকি করছেন। একটা নিঃঝুম অতীতের কোলে ঘাড় গুঁজে থাকা বাড়িকে পিসীমা এভাবেই বর্তমান কালের মাটিতে সোজা দাঁড় করাতে পেরেছেন। মায়ার এটা মন্দ লাগে না। সে তার খাটের পাশে সেই জানলার দুটো রডের ফাঁকে মুখ রেখে নদী দেখতে থাকল। নদীর সোনালী বালির চড়ায় এখন খানিকটা ময়লা রোদ ছড়িয়ে। ওপারের বাঁশবনে ঘন ছায়ায় পাখিমারা এক মুসহর ধূর্ত ভঙ্গীতে হেঁটে গেল।

তিন

বনশোভা বাইরের ঘরের দরজার কপাটে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এ ঘরটা পুরোনো বাড়ির সঙ্গে ক'বছর আগে জোড়া হয়েছে। সকাল সন্ধ্যা এ ঘরেই তাঁর শিক্ষক দাদা বীরেন্দ্র প্রাইভেট পড়ান। একপাশে চারটে চেয়ার রয়েছে টেবিলের চারদিকে। পাশে বইভরা আলমারি। পড়াশুনার বাতিক আছে বীরেন্দ্রের। একটু-আধটু গানবাজনারও। অন্যপাশে তক্তপোষের ওপর একটা তরফদার সেতার, হারমোনিয়াম আর ডুগিতবলা রাখা আছে। সব যন্ত্রই নীল মোড়কে ঢাকা। অল্প-স্বল্প সুন্দর সাদা এমব্রয়ডারি তাতে। বনশোভার হাতের কাজ। আর দেয়াল জুড়ে বিখ্যাত মানুষদের বড় বড় ছবি। লোকজন এলে এ ঘরেই বসে। আজ অনেক লোকজন ঘর জুড়ে বসে আছে। দুপুর বারোটা অব্দি ঘরটায় হাটের মতো আনাগোনা আর চাপা গোলমাল ছিল। এখন শব্দহীন। যারা বসে আছে, বসেই আছে। ওঠার নাম নেই। বনশোভা বলতে পারছিলেন না, আমি এবার যাই।

বনশোভা টের পাচ্ছিলেন, মাথাটা মাঝে মাঝে ঘুরে উঠছে। পা দুটো শক্ত হয়ে বসে যাচ্ছে। ভীষণ তেষ্টায় গলার ভিতরটা শুকনো। কিছুদিন থেকে তাঁর শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। না যাবারই কথা। বয়স চল্লিশ হয়ে এল। চুল না পাকলেও, কিংবা মুখে বয়সের ছাপ তত না পড়লেও অনেকগুলো ঝড়-ঝাপটায় ভেতরটা পলকা হয়ে গেছে। তারপর আচমকা ফের এই আঘাত।

কিন্তু মুখ দেখে কিছু বোঝবার উপায় নেই। শুধু শুকনো ও ঈষৎ পুরু ঠোঁটের কোণায়, চিবুকে ও চোয়ালের হাড়ে, কিংবা মাঝে মাজে কুঁচকে যাওয়া ভুরু ও স্থির চাহনিতে নিজেকে সামলানোর আভাস চোখে না পড়ে পারে না। তা ছাড়া কখনও ঠোঁট কামড়ে ধরে নীচে নিজের পা দুটো দেখছেন।

পায়ের বুড়ো আঙুল দুটো নড়ে উঠছে।

বনশোভার আজ শহরে যাবার কথা ছিল হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের কাছে। বীরেন্দ্র নিয়ে যেতেন। দাদা-বোন তৈরি হচ্ছিলেন। হঠাৎ একদল ছেলে এসে খবর দিল।

তবে বীরেন্দ্রকে যেতে হয়েছে শহরে। স্থানীয় এম.এল.এ বিজয়েন্দুর জীপে গেছেন। বাড়ির পাশেই শহরগামী সড়ক। ছাদে দাঁড়িয়ে বনশোভা অবাক হয়ে যা দেখছিলেন, চোখকে বিশ্বাস করতে পারেন নি। এমন বিরাট কিছু ঘটতে পারে, এত লোকজনের মিছিল, এত পতাকা ও কালো ব্যাজ বুকের ওপর, এত মোটরগাড়ির সার! সবার আগে সাদা অ্যাম্বুলেন্স গাড়িটা, পেছনে টুঁ মেরে এগিয়ে চলেছে কালো পুলিস ভ্যান, তার পেছনে বিজয়েন্দুর জীপ, তারপর কয়েকটা ট্রাক। স্লোগান আর স্লোগান। 'বনধ' 'বন্‌ধ' চিৎকার। রাস্তার দু'ধারে ভিড় উপচে পড়ছিল। দোকানপাট বাজারে দুমদাম দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। তাঁর ভাইকে এত মানুষ ভালবাসত এবং তাঁর ভাইয়ের নামে এত দাঁতে দাঁত ঘষা শপথ, ক্রোধ, নিন্দা, ধিক্কার এবং 'বন্‌ধ' কোনোদিন কল্পনাও করতে পারেনি বনশোভা। সেই একবার তিনি হু হু করে কেঁদে ফেলেছিলেন। নৃপেনকে তিনি নেপো বলে কী তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য না করতেন। বলতেন, দই মারতে না পারলে তুই কিসের নেপো বল্‌ তো রুনু? বনশোভা হাসতে জানেন। যখন হাসেন, মনে হয় তাঁর হালকা ছিপছিপে শরীর পট করে ভেঙে পড়বে। আর নৃপেন বলত, আমি দইমারা নেপো নই—সেটাই সবাইকে বুঝিয়ে দিতে চাই, দিদি। নৃপেন মাঝে মাঝে বড্ড সীরিয়াস হয়ে উঠত। বনশোভার তখন কেমন একটা অস্বস্তি হত। কী চায় ও? কেন এত পণ্ডশ্রম? চাকরি-বাকরির চেষ্টা নেই। খালি গাঁয়ে গাঁয়ে ঘোরা, মিটিং, না নাওয়া না খাওয়া শুকনো শরীরে শুধু জ্বলজ্বল তীক্ষ্ণ দুটো চোখ। এখনও বনশোভা সেই চোখ দুটো দেখতে পাচ্ছেন। একটা কালো পাথরের ওপর দুটো জ্যান্ত চোখ! ওই চোখ তাঁকে সারাক্ষণ পাহারা দিয়েছে। ঝড়-ঝাপটা থেকে বাঁচিয়েছে। এখন বনশোভা শূন্যে ভাসছেন।

মাথাটা আবার ঘুরে উঠল। বাঁ হাতে পর্দার কাপড় আঁকড়ে ধরে মুখ তুললেন। ঘরভর্তি লোকগুলো মুখ নামিয়ে বসে আছে। বনশোভা ঠোঁট কামড়ে ধরে বলার চেষ্টা করলেন, এবার আসি। কিন্তু শুকনো গলায় স্বর ফুটল না।

কাছেই একটি ছেলে বসে আছে তক্তপোষে। সে মুখ তুলে বনশোভাকে দেখে বলল, শরীর খারাপ করলে ভেতরে যান দিদি। আমরা থাকছি। কিচ্ছু ভাববেন না।

একজন কথা বলে স্তব্ধতা ভাঙার ফলে আরও অনেকে কথা বলে উঠল। কথাগুলো মিলেমিশে একটা মানে দাঁড়াচ্ছিল, ওরা আছে। ওরা থাকবে।

কারা ওরা, তাও ভাল বোঝেন না বনশোভা। কয়েকজনকে অল্পস্বল্প চেনেন। বকুলপুরেরই। এদের সবার বয়স কম। কেউ নৃপেনের বয়েসী, কেউ আরও ছোট। এরা কেন বসে আছে, বসে থাকতেই চায়, বনশোভা বুঝতে পারছেন না। শুধু মনের ভেতর আবছা ভেসে এসে দাঁড়াচ্ছে সার-সার এইসব প্রতিমূর্তির মতো যুবকরা—একসার সাহস। প্রহরীদের মতো। আর কোথাও বুঝি এখনও ওত পেতে আছে আবার একটা ভয়ঙ্কর হামলা। কাল রাতের ঝড়ের মতো একটা বিপজ্জনক উপদ্রব। খালি মনে হচ্ছে আরও কিছু ঘটবে।

রবিয়ুল, বরং তুই বাড়ি চলে যা। একজন বলল। ওবেলা বডিগুলো এসে গেলে শোকমিছিল বেরুবে। বাবলবুনিয়া থেকে যত পারিস, লোকজন আনবি।

বনশোভার কাছাকাছি বসে থাকা ছেলেটি বলল, তা আর বলতে।

তাহলে আর দেরি করিস নে। চলে যা। বাসে যা। বুঝলি?

রবিয়ুল উঠে দাঁড়াল। বাঁকা ঠোঁটে বলল, সাইকেলে এসেছি। বাসে যাব কেন? অত সোজা না রে। এ নেড়ের বাচ্চা।

অন্য সময় হলে কথাটা শুনে সবাই হাসত। কেউ হাসল না। অন্য একজন বলল, দেখিস, গাঁয়ে কোনো ঝামেলা বাধাস নে। বিজয়েন্দুদা পই পই করে বলে গেছেন, যা হবার হয়েছে। পাল্টা ব্যবস্থা অন্যভাবে হবে।

রবিয়ুল পা বাড়িয়ে বলল, এতক্ষণ বেধে থাকলে আমি কী করব?

থামাবি। এ সময় মাথা ঠান্ডা রাখা দরকার।

রবিয়ুল ঘুরে, আসি দিদি বলে বেরিয়ে গেল। ওপাশের চেয়ার থেকে মোটা সোটা একটি ছেলে বলল, আর দিদিকে আটকে রেখেছিস কেন তপু? খামোকা!

তপু নামে নৃপেনের বয়সী ছেলেটি বলল, আটকাবো কেন? যান দিদি, ভেতরে যান। আমরা আছি।

বনশোভা আস্তে মাথাটা দোলালেন। এই সময় ভেতর থেকে একটা হাত তার হাতে পড়ল। খসখসে বাকলের মতো হাত। হাতটা তাঁকে টানল। বনশোভা ভেতরে পা বাড়াতেই দেখলেন, পাশের বাড়ির কোবরেজ মাসীমা।

বৃদ্ধা তাঁকে টানতে টানতে ভেতরের বারান্দায় এগিয়ে চাপা গলায় বললেন, ওখানে দাঁড়িয়ে কী করছিলে মা, ওই হতচ্ছাড়াগুলোর কাছে? চলো, তোমার ঘরে চলো। কতক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আছি থামের গোড়ায়। ভাবছি, কী ঘোঁট পাকাচ্ছে সব। হুঃ, চাঁদপানা মুখ করে বসে আছে এখন। দেশটা উচ্ছন্নে দিচ্ছে, আর মুখে বড় বড় কথা।

বনশোভার চোখে জল নেই, তবু বৃদ্ধা তাঁর থানের আঁচল দিয়ে চোখের নীচেটা ঘষে দিলেন। ফের বললেন, এস। মাথা-কপালে হাত বুলিয়ে দেব'খন।

বনশোভা নীচের একটা ঘরে থাকেন। ঢুকে খাটে পা ঝুলিয়ে বসলেন। বাজুতে একটা হাত। মশারির ঝুলন্ত কোণটা তাঁর মাথায় ঠেকছিল। কোবরেজ বুড়ী জ্ঞানদা বেঁটে মানুষ। গোলগাল গড়ন। পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর করে লাফিয়ে লাফিয়ে কোণাটা ওপরে তুলে দিয়ে এক লাফে খাটে বসলেন বনশোভার পাশে। বললেন, শুয়ে থাকো চুপচাপ। মাথায় হাত বুলিয়ে দিই। একে তো রোগে ভোগা শরীর তার ওপর এই সর্বনাশ। কত সয় মানুষের! নাও শোও।

বনশোভা বললেন, শোব না। দেখুন তো মাসীমা, টগর কী করছে? একটু জল দিতে বলুন না?

কেন? আমিই দিচ্ছি। বলে জ্ঞানদা ফের ছোট্ট লাফ দিয়ে নামলেন। শরীর এই বাহাত্তরেও খুব শক্ত। এখনও বনে-বাদাড়ে ঘুরে স্বামীর মতোই গাছ-গাছড়া শেকড়-বাকড় সংগ্রহ করে আনেন। যেচে পড়ে এ পাড়া ও পাড়া রুগীর খোঁজে ঘুরে বেড়ান।

ঝি টগর দুই পা ছড়িয়ে বসে আছে রান্নাঘরের বারান্দায়। ঝিমুচ্ছে। খুব কান্নাকাটি করে ক্লান্ত সে। আজ তার কোন কাজ নেই। অরন্ধন। তবে তার খাওয়ার জন্যে চাল ডাল পাবে সে। সেই আশায় এখনও বসে আছে। বনশোভার খেয়াল থাকার কথা না। কিন্তু টগরের মুখ ফুটে বলতেও যে বাধে। পোড়া পেট না হয় কিছু ধৈর্য ধরুক। আহা, কী সাঙ্ঘাতিক দিনটা না যাচ্ছে আজ!

জ্ঞানদা বারান্দার টুলে রাখা কুঁজো থেকে সেকেলে কাঁসার গ্লাসে জল ঢেলে নিয়ে এলেন। টগর মুখ তুলেছিল। কিছু বলবে ভেবে ঠোঁট ফাঁক করল। বলার আগেই কোবরেজ বুড়ী ভেতরে।

বুকে খিল ধরবে মা। দু-এক ঢোকে গলটা ভিজিয়ে নাও আগে। জ্ঞানদা সাবধান করে দিলেন বনশোভাকে।

বনশোভা একবার চুমুক দিয়ে গলা ভিজিয়ে গেলাসটা রাখতে হাত বাড়ালেন। জ্ঞানদা সেটা খপ করে কেড়ে নিয়ে জানলার নীচে রেখে দিলেন। তারপর আগের মতো খাটে উঠে বসলেন।

সকাল থেকে এ নিয়ে তিনবার আসা হল জ্ঞানদার। পাড়ার মহিলারা অনেকদিন বাদে ঝাঁকে ঝাঁকে আজ এ বাড়ি ঢুকেছিলেন। যেবার বনশোভার খোরপোষ নিয়ে শহরের আদালতে মামলা উঠল, সেবারও দিনকয়েক এমন ঝাঁকে ঝাঁকে আসা যাওয়া হয়েছিল। তারপর সচরাচর এ বাড়ি ওঁরা কেউ ঢুকতেন না। কদাচিৎ যুবতীরা কেউ-কেউ এসেছে। আর বনশোভার স্বভাবেও একটা বেয়াড়াপানা আছে। বকুলপুরের মেয়ে। অথচ সত্যিকার বন্ধু বলতে কেউ নেই তাঁর। একটু ঘনিষ্ঠ যারা ছিল, তাদের সবাই বাইরে দূরে কোথায় কোথায় স্বামীর ঘর করতে গেছে। কখনও-সখনও এলে একবার আসে মাত্র। বকুলপুরের এই বনেদী রোগটা ক্ষয়াটে সমাজের হাড়ের ভেতর ঘুণ পোকার মতো এখনও বেঁচে আছে। স্বামী-পরিত্যক্তা এবং আদালতে ওঠা মেয়ে সম্পর্কে কী এক ধিক্কারমাখানো অশুচিতার ভাব। নেহাত দরকার ছাড়া মাখামাখি তো নেই-ই, যেন ছায়া মাড়াতেও অনিচ্ছা। অথচ বকুলপুরের বাইরের চেহারায় নগরের আদল দিনে-দিনে ফুটে উঠেছে। মনে পড়ে, বছর কুড়ি আগে ব্লক আপিসের

ওপাশে 'উন্নয়নী' নামে টাউনশিপ উদ্বোধনের দিন এক মিনিস্টার বলেছিলেন, এই গ্রামনগরী বকুলপুর নতুন যুগে প্রবেশ করল।

সেই থেকে গ্রামনগরী কথাটা অনেক বছর চালু ছিল। এখন আর মনে পড়ে না কারুর। পড়লে একালে চোখা ছেলেমেয়েরা হেসে কুটিকুটি হয়।

জ্ঞানদা চাপাগলায় বললেন, সবখানে খবর-টবর গেছে? বউমার কাছে?

বনশোভা বললেন, দাদা খবর দেবে। বউদিদের বাড়িতে ট্রাংকল করবে বলে গেল।

বউমার যাওয়া তো অনেকদিন হল গো! কী বাপু খালি বাপের বাড়ি বসে থাকা! জ্ঞানদা তেতোমুখে বললেন। কলকাতা বড় জায়গা। তো বকুলপুরই বা আজকাল কম কিসে বলো? সিনেমা হাউসটা বাকী ছিল। তাও হল।

বনশোভা আঙুল খুঁটতে খুঁটতে বললেন, বউদির বাচ্চা হবে।

অ। তাই বটে। বলে জ্ঞানদা হাত বাড়িয়ে বনশোভার আঙুল খোঁটায় বাধা দিলেন। আঙুল খোঁটে না মা! একে তো অলক্ষণ চারদিকে। তা হ্যাঁ গো মেয়ে, পান্না কোথা?

ও তো পরশু কলকাতা চলে গেছে। চাকরি হয়েছে।

পান্নার চাকরি হয়েছে? মুখে দুঃখের ওপর খুশির ভাব ফুটিয়ে তুললেন জ্ঞানদা। তা পান্নাকে খবর দিলে কীভাবে? টেলিগ্রাম করা হয়েছে?

বনশোভা জবাব দিলেন, দাদা জানে।

জ্ঞানদা শক্ত হয়ে বললেন, ওর নাম পান্না। খবর পেয়েই বাজপাখির মতো উড়ে আসবে। জানিস মা বনি? আজ সারা সকাল আমার মন বলছে, পান্নার মতো ভাই যার, তার কেন এ দুর্গতি হল? ও! তাই বলো! পান্না ছিল না! থাকলে এতক্ষণ চারদিকে আগুন জ্বলে যেত গো, আগুন জ্বলে যেত!

বনশোভা খাটের বাজুতে মুঠি চেপে জানলার বাইরে তাকালেন। ঝকঝকে নীল আকাশ। গাছপালা জোরালো হাওয়ায় দুলছে। কোবরেজ মাসীমার জানার কথা না, রুনু আব পান্নার ইদানীং কথা বলা বন্ধ ছিল। রুনু তাকে শাসিয়েছিল প্রচন্ড। বলেছিল, তুই আমার সর্বনাশ করতে এগিয়েছিস পান্না। সাবধান! তুই রুকুনপুরে বিজয়েন্দুদার মিটিং-এ বোম মারতে গিয়েছিলি। কিছু চাপা থাকে না আমার কাছে। তোর লজ্জা করে না শুয়োর? ওই বিজয়েন্দুদা আমাদের জন্যে কী না করেছেন? জমিদারির কম্পেনসেশনের টাকাগুলো বিশ-পঁচিশ বছর ধরে আটকে ছিল। উনিই তদ্বির করে বের করলেন। সেই টাকায় খাচ্ছিস, পরছিস, মাথার ওপর ছাদটা টিকে গেছে। হতভাগা! তুই এমন নেমকহারাম? ধিক তোকে।

কথাগুলো এত তীব্র, এত স্পষ্ট যে বনশোভার প্রত্যেকটি শব্দ মনে আছে। তিনি কিছু ভুলতে পারেন না।—ভোলাটা তাঁর ইচ্ছা অনিচ্ছার বাইরে। এই এক অভিশাপ তার জীবনে। প্রচন্ড আর সর্বনেশে এক স্মরণশক্তি নিয়ে জন্মেছিলেন বনশোভা। লেখাপড়ায় ফার্স্ট হতেন। বি.এ-তে স্ট্যান্ড করা মেয়ে। হঠাৎ বাবা বিয়ে দিয়ে ফেললেন কালিকাপুরে। এখন বনশোভা বুঝতে পারেন, এই স্মৃতিশক্তিই তাঁর ঘোর শত্রু। সব টুকরো, ক্ষীণ, তুচ্ছ বা তীব্র ঘটনা—প্রতিটি বাক্য, ভঙ্গী, শব্দও তাঁর মনে থেকে যায়। এগুলো যদি শুকনো পাতার স্তূপ হত, আগুন জ্বালিয়ে ছাই করা যেত। এ যেন একটা ক্রমপ্রসারমান গাছ! ডালে ডালে পোকামাকড়, সাপ ও পাখি আশ্রয় নিয়ে আছে। মাঝে মাঝে ঝড় আসে। গাছটা নড়ে। বনশোভাকে অস্থির করে। ঘুমের ট্যাবলেট ছাড়া আজকাল ঘুমই আসে না।

জ্ঞানদা বললেন, আমার এই এক জ্বালা মা সারাটি রাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারি নে। কাল রাত্তিরে তো একফোঁটা ঘুমোতে পারি নি। ঝড়টা যখন এল, উঠে রইলুম বিছানায়। কী ডাকন, কী গর্জন! পৃথিবী থরথর করে কাঁপছে শুধু। জানিস বনি? আমি—আমার কেমন সন্দেহ হয়েছিল!

বনশোভা তাকালেন তাঁর দিকে।

ইস্কুলের ওদিকেই মনে হচ্ছিল, জানিস? পরপর একসঙ্গে অনেকবার আওয়াজ হল। ভাবলুম বজ্রপাত। কিন্তু তখনই—জ্ঞানদার চোখের ঢেলা ঠেলে বেরুল। গলার স্বর আরও চাপা হয়ে গেল। তখনই সন্দেহ হল, বজ্রপাত, না অন্য কিছু? বজ্রপাত হলে কি একসঙ্গে অমন ঘন ঘন হবে? ঠিক তাই।

ভোরবেলা ভাবলুম, যাই একবার বাগানটা দেখে আসি। আম তো বিশেষ আসে টাসে নি এবারে। কলম গাছে গোটাকতক ছিল। আষাঢ়ে পাকবে। তো রাস্তায় বেরিয়েই শুনি লোকেরা ছোটাছুটি করছে। তারপর.....

জ্ঞানদা চুপ করলেন। গলা শুকিয়ে গেছে। কোমরে গোঁজা পানের কৌটো বের করে ঝটপট পান মুখে পুরলেন। কোবরেজ মহিলা আসলে পান খান না, ওষুধ খান।

বনশোভা যেতে চেয়েছিলেন যোগমায়া বিদ্যাপীঠের কাছে। বীরেন্দ্র প্রায় ধাক্কা মেরে তাঁকে বাড়িতে ঠেলে দিয়ে ছুটে যান। রাতে কেউ টের পায় নি অত বড় একটা ঘটনা। বসতি থেকে দূরে তো বটেই। আর স্কুলে এখন ছুটি। পাশে বোর্ডিংয়ের দরজায় তালা ঝুলছে। প্রথমে চোখে পড়েছিল রিকশাওয়ালাদের। তারা ভেবেছিল, বাজ পড়ছে অনেকটা জায়গা জুড়ে। কিন্তু পোড়া ঝোপের মধ্যে ওলটানো জীপের কঙ্কাল দেখেই তাদের টনক নড়ে।

একটা শরীর ছিটকে পড়েছিল। তার মাথার দিকটা পোড়ে নি। মুখের একপাশে কালো চাপ চাপ রক্ত। রক্ত নয়—জমাট ছাই। অন্য পাশটা দেখেই চেনা গিয়েছিল, এ তো মধুবাবুর ড্রাইভার পরাশর। নৃপেন ও মধুবাবুর মড়া একসঙ্গে দলা পাকিয়ে গিয়েছিল। মাংস ও হাড়ের জড়াজড়ি জমাট পিন্ড। লাল্টুর মাথা ও পিঠের অনেকটা পুড়ে গিয়েছিল। পা দুটো বিশেষ পোড়ে নি। তবে প্রথম প্রথম সবাই ধরে নিয়েছিল বজ্রপাত ছাড়া কিছু নয়। পরে পুলিস গ্রেনেডের টুকরো খোল খুঁজে পায়।

সব বর্ণনা বাইরের ঘরে আলোচনা থেকেই কানে শুনেছে বনশোভা। পুলিস বলছে গ্রেনেড ছুড়েছিল অনেকগুলো। এসব গ্রেনেড মিলিটারীতে ব্যবহার করা। তবে এগুলো আজকাল যোগাড় করা শক্ত নয়। ক'বছর আগে সীমান্ত-জেলার ওধারে প্রচন্ড যুদ্ধ হয়ে গেছে। তখন এদিক থেকে অনেক দুর্বৃত্ত সেচ্ছাসেবক সেজে সীমান্ত ডিঙিয়ে গিয়েছিল। প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র তারা কুড়িয়ে এনেছিল। পুলিস যেমন জানে, গ্রামাঞ্চলে এখনও অনেকের কাছে সেই সব সাংঘাতিক অস্ত্রশস্ত্র আছে, জনসাধারণও জানে। এ ক'বছরে এলাকায় ডাকাতি, খুনোখুনি, সংঘর্ষ তো খুবই বেড়ে গেছে। রামেশ্বরীতলায় নাকি রীতিমত সাবমেশিনগানের লড়াই হয়ে গেছে তিন-চার মাস আগে। ধানকাটা নিয়ে সংঘর্ষ।

একটা ব্যাপার বড় আশ্চর্য লেগেছে বনশোভার। মধুবাবু পরাশর বা লাল্টু গুন্ডার মৃত্যুতে যেন কোন শোক নেই জনসাধারণের। বরং অনেকে নাকি ভেতর ভেতর ভারি খুশি। শুধু নেপেন—রুনুটা না মারা পড়লেই ভাল হত। কত উপকারী সং স্বভাবচরিত্রের ছেলে ছিল সে। বিজয়েন্দু বলছিলেন, সামনেবার ইলেকশানের টিকিট নৃপেনই পেত। আমি তো বুড়ো হাবড়া হয়ে গেলুম। এবার একটু ধর্মাধর্ম করব-টরব ভাবছিলুম । ওরা ইয়ং লীডার চাইছে। তো ছেলেটার বরাত, আমারও বরাত!

জ্ঞানদা ঢোঁক গিলে বললেন, হ্যাঁগো মেয়ে, তা কালিকাপুরে একটা খবর-টবর দেওয়া উচিত ছিল না? দেয় নি খবর?

বনশোভা দ্রুত বললেন, কেন?

বারে! অন্তত মেয়েটা তো দৌড়ে আসত মা। আপন মামা। পর তো না।

বনশোভা সামলে নিয়েছেন। নির্বিকার মুখে বললেন, ওকে আসতে দেবে কেন?

জ্ঞানদা রাগ দেখিয়ে হাত নেড়ে বললেন, কথা হল একটা? আসতে দেবে কেন? এখন তো কচি খুকী নয় যে আটকে রাখবে। শুনেছি, সোমত্ত হয়েছে। একা-একা বাসে চেপে ওপাশ দিয়ে কলেজে যায়। একবারটি মায়ের কাছে আসতে পারে না? চোখের দেখা দেখলেও তো দুঃখিনী মায়ের মনটা.....

জ্ঞানদা থেমে গেলেন। বনশোভা খাট থেকে নেমেছেন। দরজার দিকে এগিয়ে ডাকলেন টগর, ও টগর!

টগর সাড়া দিল। এই যে, বাবুদিদি!

শোন। তুমি বাড়ি যাও। বনশোভা বারান্দায় গিয়ে বললেন। ওবেলা এস'খন। আর চাল ডাল যা নেবে, নাও। নিজের হাতেই নাও। আর শোন.....বলে বনশোভা ফের এ ঘরে এসে টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা টাকা বের করলেন।

জ্ঞানদা তখন খাট থেকে নেমেছেন। টের পাচ্ছেন, কথাটা বলা উচিত হয় নি এ সময়। বিব্রত মুখে বললেন, রাগ করলি মেয়ে?

যেতে যেতে বনশোভা বললেন, না, না মাসীমা। রাগ করব কেন? আপনি বসুন, আসছি।

জ্ঞানদা পা বাড়ালেন। না মা বনি, একবার বাড়ি ঘুরে আসি। দেওরপোরা বড্ড চোর। এতক্ষণ তালা উপড়ে কী কীর্তি করেছে।

টগর টাকা ও চাল ডাল নিয়ে চলে যাচ্ছে। জ্ঞানদা তার সঙ্গ ধরলেন। চল্ রে বাছা! তোর সঙ্গে গল্প করতে করতে যাই।

ওরা বেরিয়ে গেলে বাড়িটা হঠাৎ যেন হাঁ করল। বিরাট মনে হল বাড়িটাকে। বনশোভার বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল হঠাৎ। প্রকাণ্ড থামটা একহাতে আঁকড়ে ধরলেন। অনুরাধা এ সময় থাকলে কত ভাল হত। বয়সে দশ বছরের তফাত, তবু তাকে বউদি বলে ডেকে সম্মান দেন বনশোভা। বীরেন্দ্র বেশি বয়সে বিয়ে করেছেন। তাঁর বয়স এখন প্রায় পঞ্চাশ। তাই স্ত্রীর কিঞ্চিৎ অনুগত। তা হোক। অনুরাধা বেশ মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে। ননদকে ছাড়া একদণ্ড ওর চলে না। বউদি বললেই সে বনশোভাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বলে, মেরে ফেলব বলে দিচ্ছি। একেবারে মেরে ফেলব।

বাইরের ঘরে ছেলেগুলো এখনও বসে আছে। চাপা গলায় কথা বলছে। আবার বনশোভার মনে হল, জীর্ণ ক্ষয়াটে স্মৃতিসঙ্কুল এই বাড়িটার বিরাট হয়ে ওঠা এবং মুখব্যাদান আর ওই ছেলেগুলোর চাপা গলায় কথা বলার সঙ্গে পরবর্তী কোনো আসন্ন সর্বনাশের সম্পর্ক আছে।

দরজায় উঁকি মেরে ঠাণ্ডা গলায় বনশোভা বললেন, তোমরা কি চা খাবে এখন?

তপু নামে ছেলেটা বলল, না দিদি। এত বেলায় ওসব হাঙ্গামা করবেন না। আপনি বরং বিশ্রাম করুন গে। আমরা থাকছি।

বনশোভা মনের ভেতর বললেন, কেন থাকছ তোমরা? মুখে বললেন, তোমাদের খাওয়াদাওয়া তো হয় নি?

মোটাসোটা ছেলেটা বলল, ও সব ভাববেন না দিদি। খাব'খন।

আচ্ছা। বলে বনশোভা তাঁর ঘরে ফিরলেন। কিছুক্ষণ মেঝের দিকে শূন্য দৃষ্টে তাকিয়ে স্থির দাঁড়িয়ে রইলেন।

অন্ততঃ মেয়েটা তো দৌড়ে আসত মা! এখন তো কচি খুকীটি নয়। শুনেছি সোমত্ত হয়েছে। একা একা বাসে চেপে ওপাশ দিয়ে কলেজে যায়। একবারটি মায়ের কাছে...

বনশোভা ঠোঁট কামড়ে ধরলেন। মেয়ের মুখটা স্পষ্ট ভেসে উঠল। ছ' বছরের ফুটফুটে দুধে আলতা রঙের পুতুল গড়নের মেয়েটা। বাবা বলেছিলেন, এ কী রে! এ যে মেমসায়েব! একেবারে গোলাপ ফুলের রং। ঠিক আছে, এর নাম রাখলুম লালী। সত্যব্রত সন্ধ্যাবেলা মোটরগাড়ি হাঁকিয়ে কালিকাপুর থেকে ছুটে এসেছেন। রুপোর রেকাবে সোনার হার এনেছেন। পৌত্রীর মুখ দেখে হাসতে হাসতে বললেন, লালী-টালী চলবে না বেয়াইমশাই। এ মুখে বড় মায়া। চোখ দুটো দেখছ? মায়া উপচে পড়ছে। ওকে নাম দেব মায়াময়ী। দুই বৃদ্ধের হাসিতে বাড়ি কাঁপতে থাকল।

সেবার পান্না দাদাদের লুকিয়ে কালিকাপুরে গিয়েছিল। ফিরে এসে বলল, লালী বলে ডাকলুম, অমনি দুষ্টু মেয়েটা ফোঁস করে উঠল। বলল কী জানিস দিদি? গাল ফুলিয়ে বলল, আমার নাম মায়া। লালী আবার কে?

বনশোভারও তাই। মায়া আবার কে? মায়াকে চেনেন না। লালীকে চেনেন যার ছ'বছর বয়স। গায়ের রং গোলাপী। পুতুলের মত গোলগাল গড়ন। একটুতেই ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদে।

বনশোভা অনেকদিন পরে দু'হাত বাড়িয়ে লালীকে বুকে নিলেন এবং নিঃশব্দে কাঁদতে থাকলেন।

চার

কালিকাপুর থেকে প্রায় ছ' কিলোমিটার দূরে এই রেলস্টেশন ক'বছর আগে ছিল নেহাত একটা হল্ট। কালিকাপুর হল্ট। এক কন্ট্রাক্টার তখন টিনের ছোট্ট শেডে বসে টিকিট বেচত এবং টিকিট আদায় করত। তার নাম ছিল মকবুল হোসেন। পাশের গাঁয়ে বাড়ি। যোগব্রতের ঠাকুর্দার পেয়ারের লোক। এখন সে গোরে শুয়ে আছে। হল্ট হয়েছে পুরোপুরি স্টেশন। কিন্তু খাঁ-খাঁ নির্জন দশা ঘোচেনি। ধু-ধু মাঠের মধ্যে কয়েকটা বাড়ি দূর থেকে দেখতে দেখতে গেলে ক্লান্তি লাগে না। আর ওই উঁচু রেলপথেরও

কী এক দার্শনিক সৌন্দর্যভাব আছে। এই সেই কিংবদন্তীখ্যাত ধুলোউড়ির মাঠ। এবার টানা খরায় তার নামের মানে ভালরকম ঠাহর করা গেছে। যোগব্রত প্রায় একঘণ্টা কদমগাছের ছায়ায় স্টেশনের নীচের চত্বরে শিবুর চায়ের দোকানে কাটিয়ে দিলেন।

রাতের বৃষ্টিতে মাঠের ধুলোট চেহারায় চেকনাই ফুটেছে। প্রকৃতির এই এক মজা। কিছুক্ষণ বৃষ্টিতেই প্রাকৃতিক যা কিছু তার আমূল রূপান্তর ঘটে যায়। খোয়া ঢাকা কালিকাপুর রোডের দু'ধারে ক্ষয়া-খর্বুটে গুল্মগুলো রাতারাতি ভোল বদলেছে। যোগব্রত বললেন, শিবু, তোদের গাঁয়ের খবর কী?

শিবু বলল, ভাল। কেন ছোটবাবু? খবর-টবর হবার মতো কিছু আছে নাকি?

যোগব্রত হাসলেন। তুই ব্যাটা তেপান্তরে পড়ে থাকিস। তবে স্টেশন জায়গা। খবর রাখিস নে?

শিবু জোরে মাথা দোলাল।

কাল তোদের গাঁয়ে মিনিস্টার এল। কত বিরাট মিটিং হল। শুনিস নি?

ও। তা শুনব না কেন?

এটা একটা বড় খবর নয় বুঝি?

শিবু হাসল। আমরা সামান্য চুনোপুটি ছোটবাবু! রাজামন্ত্রীর খবরে আমাদের কী?

যোগব্রত শরীর নাড়া দিয়ে জোরে হাসলেন। হুঁ। তাও তো বটে। তোরা আবার বে-দলের লোক।

শিবু কিছু বলল না। সাড়ে ছটার ট্রেন আধ-ঘণ্টা লেট। ডাউনে বিশেষ যাত্রী নামে না। নামে আপে। আপ সেই বেলা এগারোটার পর। তবে আজ ডাউনে জনাকতক লোক নেমেছিল। তাদেরই একজন উদাস মুখে বসে আছে। পরপর দু'গেলাস চা খেয়েছে। ফের একটা কেক বলেছে। তার সঙ্গে চা। শিবু বলল, বাবু চা নিন।

যোগব্রত এতক্ষণে লোকটার দিকে তাকালেন। তারপর চমকে উঠলেন।—আরে রজব আলি যে!

লোকটা মধ্যবয়সী। মাকুন্দ মুখে এক চিলতে গোঁফ। কতকটা মঙ্গোল ধাঁচের গড়ন মুখের। চোখ দুটো ফোলা ফোলা, মাথায় পাতলা চুল। পরনে সিন্থেটিক কাপড়ের ধূসর সুন্দর প্যান্ট। জামাটা তত মানানসই নয়। কাঁধে আনকোরা ব্যাগ ঝুলছে। আলগোছে হেসে মাথাটা একটু ঝুঁকিয়ে বলল, সালাম ছোটবাবু। কখন থেকে ভাবছি, দেখি ছোটবাবু চিনতে পারেন কিনা! আমার বরাত!

যোগব্রত সস্নেহে তার কাঁধে হাত রেখে বললেন, লক্ষ্য করি নি ভাই। তারপর গলা চেপে ফের বললেন, কবে ছাড়া পেলে?

এই তো গতকাল। রজব আলি তার কালচে ঠোঁটে চা ভরতি গেলাস বুলোতে থাকল। সেঁক দিয়ে আরাম নেওয়ার ভঙ্গিতে।

যোগব্রত পকেট থেকে সিগারেট বের করে বললেন, আলিপুর না দমদমে ছিলে যেন?

দমদম। তারপর বহরমপুরে।

শিবু চাওলা এতক্ষণে চিনতে পেরে নড়ে উঠল।—উরে ব্বাস! রজবদা যে গো। দেখ দিকি, একটুও চিনতে পারি নি। ও রজবদা, খবর ভাল তো?

যোগব্রত সিগারেট বের করে বললেন, নাও। তাহলেই বোঝ রজব আলি, এক গাঁয়ের লোক হয়েও শিবু যদি এতক্ষণ না চিনতে পারে, আমার কী দোষ?

সিগারেটটা যেন প্রাপ্য ছিল, এভাবেই তুলে নিয়ে রজব বলল, না, না। দোষ কিসের? সাড়ে ছ'টা বছর তো কম কথা না।

যোগব্রত তার কাঁধ আদরে ডলতে ডলতে বললেন, চেহারা বদলে গেছে হে রজব আলি! গায়ে মাংসও লেগেছে। এজন্যেই লোকে বলে জেলখানা মানে শ্বশুরবাড়ি।

রজব মাথা নেড়ে হাসবার চেষ্টা করল। না ছোটবাবু, ফোঁপরা। শালারা ভেতরটা ফোঁপরা করে দিয়েছে। রঙচঙে বেলুন। যাক্ গে, আপনার খবর বলুন শুনি।

খবর আর নতুন কী! যোগব্রত ভুরু কুঁচকে দূরের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

রজব ঢকঢক করে গরম চা গিলে গেলাস রেখে বলল, হ্যা.গো ছোটবাবু! আপনার মেয়েটা কত বড় হয়েছে? এ্যাদ্দিনে বিয়ের যুগ্যি তো হয়েছেই। বিয়ে-টিয়ে দিলেন নাকি? খাওয়া পাওনা আছে ছোটবাবু।

যোগব্রত আনমনে বললেন, না বিয়ে দিই নি। এখনও পড়াশুনা করছে।

রজব গলা চেপে চোখ নাচিয়ে বলল, বউদিদির সঙ্গে মিটমাট হয়ে গেছে, নাকি এখনও মামলা লড়ছেন?

নাঃ! যোগব্রত বিরক্ত হয়ে বললেন। এসব লোকের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে খারাপ লাগে। কিন্তু বাবলবুনিয়ার রজব আলিকে চটানোর কথা ভাবা যায় না। এই বেঁটে চ্যাপটা এবং মাকুন্দমুখো লোকটা গাঁয়ের তো বটেই, এলাকার সন্ত্রাস ছিল এক সময়। খুনদাঙ্গার মামলায় মেয়াদ খেটে এবার দেশে ফিরছে। আবার সেই পথে হাঁটবে, না স্রেফ ধার্মিক ও ভাল মানুষ হয়ে যাবে, অনুমান করা কঠিন। যোগব্রত সিগারেটে ঘন ঘন টান মেরে জুতোর তলায় পিষে দিলেন। ওঠ রজব, যাবে তো?

ওপাশে রাখা মোটর সাইকেলের দিকে তাকিয়ে রজব বলল, আপনার ছোটবাবু?

হুঁ। চলো ব্যাকে চাপিয়ে নিয়ে যাই। ক্যানেলের স্লুইস গেটে নেমে যাবে।

রজব খুশি হয়ে উঠে দাঁড়াল। শিবু শক্ত ও ঠাণ্ডা হয়ে ভাবছিল, দামটা দিয়ে যাবে, না বলবে পরে নিও? রজব পকেটে হাত ভরে মানিব্যাগ বের করতেই সে খুশি হয়ে বলল, এক টাকা পাঁচ পয়সা রজবদা। যাক্ গে বাবা, ভালয় ভালয় ফিরে এলেন। আবার দেখা টেখা হল। বুকে বলও পেলুম! গাঁয়ের অবস্থা যা হয়েছে আজকাল। মগের মুল্লুক হয়ে গেছে গো।

যোগব্রত মোটর সাইকেলে চেপে বসেছেন। দুপায়ের ওপর ধুতি একটু গুটিয়ে নিয়ে হাসতে-হাসতে বললেন, তা তো শিবু বলবেই। ওদের কোণঠাসা করে ফেলেছে রবিয়ুলরা। তার ওপর কাল স্বয়ং মিনিস্টার গিয়েছিলেন। শিবু এবার দ্যাখ বাবা, সব ঘটিবাটি গুটিয়ে না এই স্টেশনে বাসা বাঁধতে হয়।

শিবু তেজ দেখিয়ে বলল, অত সহজ না ছোটবাবু। দেখবেন শেষে কী হয়।

রজব আলি ব্যাকে বসে বলল, গা বাজছে ছোটবাবু! ছিটকে পড়ে যাব না তো?

যোগব্রত হাসিমুখে বললেন, তোমার আবার মরার ভয় রজব? বল কী হে!

না ছোটবাবু! মানুষের হাতে মরতে আমার ভয়-ডর নেই। তবে কিনা যন্তরের হাতে মরলে বড় ব্যথা বাজবে। দুঃখও হবে।

সে কী! কেন, কেন?

রজব গলার ভেতর বলল, অপমান তো বটে। মানুষ হয়ে জন্মেছি কিনা।

হুঁ। আমার কোমর জড়িয়ে ধরতে পারো হে রজব।

তাই ধরি ছোটবাবু। আপনি আমাদের কত আপনজন। রজব দু'হাতে যোগব্রতের শরীরের প্রকাণ্ড বেড় ঘিরে ফেলল। মুখটা পিঠের দিকে স্বভাবত এগিয়ে গেল, সাদা ধপধপে পাঞ্জাবি হাওয়ায় ফুলে উঠছে। নাকে চেপে আসছে। কিন্তু কী এক মিঠে গন্ধ আবিষ্ট করে। ছোটবাবু ছোটলোকের সঙ্গে মাখামাখি করলেও বরাবর বড় শৌখিন মানুষ। রজবের মনে হল, ফিরে এসে অকূল পাথারে ভেসে যাওয়ার দুর্ভাবনাটা আল্লার দোয়ায় এক ফুঁয়ে উড়ে গেছে।

রাতের বৃষ্টিতে এবড়ো-খেবড়ো পাথরকুচিভরা রাস্তার সব ধুলো গেছে। চাকার চারদিকে ছিটকে যাচ্ছে পাথরকুচিগুলো। পুবের হাওয়া জোরালো হয়ে বইছে সকাল থেকে। আসার সময় এ হাওয়া বুকে ধাক্কা মারছিল। এখন পেছনে ঠেলতে ঠেলতে সঙ্গে ছুটে আসছে। সানগ্লাস পরে নিয়েছেন যোগব্রত। মাঠ জুড়ে তাই অসময়ে কনে দেখা আলো। ফুটি, তরমুজ ও পটলের ক্ষেতে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়ে বা পুরুষ কালিকাপুরের ছোটবাবুকে দেখছে। রজবকে কি চিনতে পারছে ওরা? কিছুক্ষণ একটু অস্বস্তি লাগছিল। কিছুদূর এগিয়ে বাঁয়ে নদীর সমান্তরালে পৌঁছে ভাবলেন, মরুক গে! সবাই তো জানে, যোগব্রত কেমন মানুষ। কত চাষাভুষোকে ক্ষেত থেকে ডেকে মোটর সাইকেলের ব্যাকে বসিয়ে নিয়ে যান। এ দৃশ্য নতুন কিছু না।

নদী ঘুরে গেল পশ্চিমে। রাস্তার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হল। দেড় কিলোমিটার এগিয়ে ক্যানেলের স্লুইসগেট। সানগ্লাস খুলে দেখে নিলেন, কেউ আছে নাকি।

একজন আছে। নীচে ঝুঁকে কিছু করছে। আরও খানিকটা এগিয়ে চিনতে পারলেন, যুগলই বটে।

জালের সুতো পাকাচ্ছে। মোটর সাইকেলের শব্দ অনেক আগে পেয়েছে সে। হাওয়া ওদিকেই যাচ্ছে। মুখ তুলে তাকিয়ে আছে এদিকে, সাদা দাঁতগুলো ঝকমক করছে রোদে।

স্লুইসগেটটা ব্রিজের মুখে। কংক্রিট চত্বর পরিচ্ছন্ন। রাতের বৃষ্টি অনেক কাজ করে গেছে। তার ওপর ব্রেক কষে থেমে যোগব্রত বললেন, কীরে যুগলো? জল দেখতে এসেছিস? নাকি জলের স্বপ্ন দেখতে? এ্যাঁ?

যুগল সুতোধরা হাত জোড় করে প্রণাম করল। টিশেন থেকে ছোটবাবু?

রজব নেমে বাঁচল। ঝটপট পা বাড়িয়ে বলল, তাহলে আসি। সে ক্যানেলের পাড় ধরে জোরে হাঁটতে থাকল। বাবলবুনিয়া কালচে সবুজ একটা প্রাকৃতিক দুর্গের মতো দেখাচ্ছে। সামান্য দূরত্ব। ওখানে নদী ফের বাঁক নিয়ে উত্তরে ঘুরে গেছে। বড় রাস্তার ব্রিজের তলা দিয়ে চলে গেছে মৌখালি বিলের দিকে।

যোগব্রত বললেন, তোদের কালীতলা ঘুরেই বাড়ি ফিরব। আয় যাবি নাকি?

যুগল ঘুরে রজব আলিকে দেখছিল। বলল, ওনাকে তো চিনলুম না।

ধূর ব্যাটা! তল্লাটের সবাইকে চিনবি নাকি? বলে চাপা গলায় ফের বললেন যোগব্রত, রজব আলি। বাবলবুনিয়ার।

যুগল নির্লিপ্ত মুখে বলল, ছাড়া পেলে এ্যাদ্দিনে! তা হ্যাগো ছোটবাবু, উদিকে বকুলপুরের খবর শোনেন নি—নাকি শুনেছেন?

কী রে? কিছু শুনি নি তো। যোগব্রত ঝুঁকে পেছনের চাকা দেখতে থাকলেন।

যুগল বড় অদ্ভুত মানুষ। সারাদিন মাঠে আর মাঠ থেকে নদীর ধারে ঘুরে বেড়ানো ওর স্বভাব। রোদ চড়লে একটা গাছ খুঁজে নেবে। একা চুপচাপ বসে জালের সুতো পাক দেবে। সুতো তৈরি হয়ে গেলে একটা কঞ্চি বগলে চেপে তাতে জালের 'জো' বুনবে। সেই নিয়ে ফের একা মাঠের গাছতলায়, নদীর ধারে, নয়তো ঢেলাই-চণ্ডীর থানে কাঁটামাদার গাছের নীচে গিয়ে দাঁড়াবে। তারপর যেদিন জালটা বোনা হয়েছে, বড় জোর একবেলার জন্য বকুলপুর বাজারে যাবে বেচতে। তখন একখিলি পান আর একটা সিগারেটও চাই। ওইটুকুই তার শৌখিনতা।

যোগব্রত জানেন, যুগল চারপাশে সমকালের জীবন ও ঘটনা নিয়ে বড় একটা মাথা ঘামায় না। তার অনেক সুপ্রাচীন গুহ্যতত্ত্ব আছে। শোনার লোক পেলেই আওড়ায়। যোগব্রত তাকে ইচ্ছে করেই একটু তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন। কিন্তু তাঁকেও তত্ত্ব না শুনিয়ে ছাড়ে না যুগল।

যুগল চুপ করে আছে দেখে যোগব্রত বললেন, কী রে যুগল, চুপ করে গেছিস যে?

যুগল হাসল। আপনার অজানা আর কী আছে ছোটবাবু? এ তল্লাটের খবর সব আপনার ওই বেগে। বলে সে যোগব্রতের কাঁধের ব্যাগটা দেখিয়ে দিল।

যোগব্রত অস্থির হয়ে বললেন, হেঁয়ালি করা তোর স্বভাব যুগল।

যুগলের মুখটা আবার নির্লিপ্ত দেখাল। বলল, ভোরবেলা বউ বকুলপুর বাজারে গিয়েছিল মাছ বেচতে। গিয়ে দেখে সব হত্তাল। দোকান পাট বন্ধ। বাড়ি-বাড়ি ঘুরে মাছ বেচে এল। তো এ সেই জেবন-মরণ খেলা ছোটবাবু। এই আপনি আছেন, এই আপনি নেই। ছায়া হয়ে ঘুরছে তো। ছুঁলেই শোবেন।

ভেতরে-ভেতরে উত্তেজনায় কাঁপছিলেন যোগব্রত। ধমক দিয়ে বললেন, ফের হেঁয়ালি করছিস? কিসের হত্তাল বকুলপুর বাজারে?

যুগল আঙুল দেখিয়ে বলল, এক সঙ্গে চারটে পড়েছে। জীপ-গাড়িসুদ্ধু ছাই। 'বউ বলল, বোম মেরেছিল কারা। তবে কথা কী, আপনার মেজশালাবাবুও গাড়িতে ছিলেন।

যোগব্রত ওর দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে বললেন, রুনু—মানে নেপেনবাবু?

আজ্ঞে। যুগল আঙুলের গিঁট গুনে বলল, নেপেনবাবু, মধুবাবু, আপনার মশাই সেই গুণ্ডাটা—নাণ্টুবাবু আর ডেরাইভর। কটা হল? চারটে।

কখন বোম মেরেছিল শুনেছে তোর বউ?

হাঁ। কাল রেতে ঝড়ির সময়ে। সবাই ভেবেছিল বজ্জাঘাত। কেউ বেরোয় নি। যুগল উরুতে টাকুর পাক খাইয়ে বলল। ভোরবেলা নজরে এসেছিল। পাঁচ কাঠা জায়গা জুড়ে কালো ছাই। বউ

দেখেছে।

যোগব্রত ক্যানেলের পাড়ে কালীতলার দিকে মোটর সাইকেলের মুখ ঘোরালে যুগল বলল, কী ছোটবাবু! মেজশালাবাবুর মড়া দেখতে যাবেন না?

ধুর ব্যাটা! যোগব্রত রাগ দেখিয়ে বললেন। এতক্ষণ কি আছে? চালান গেছে মর্গে।

হুঁ। যুগল আকাশ দেখতে দেখতে বলল, বেশ চুপচাপ ছিল সব। শান্তি ছিল। ফের আরম্ভ হল। 'কালের' স্বভাবই এই ছোটবাবু। বুঝলেন? খুঁচিয়ে দিলে আর রক্ষে নেই। সাতশো রাক্কসের ঘুম ভাঙলে কী হবে? তেড়ে আসবে।

যুগল আপনমনে এইসব কথা অনর্গল বলে যাবে। তার কাল মানে সময় নয়, মহাকাল। ধ্বংসের দেবতা। যোগব্রত ক্যানেলের পাড় ধরে পুবে এগিয়ে গেলেন। যুগল বলেছে ফের আরম্ভ হল। লোকটা একটা কিছু আঁচ করেছে। নকশালী আমলে এভাবে অনেক কিছু আঁচ করার ক্ষমতা ওরা দেখেছেন। যুগল যেন দূর থেকে মৃত্যুর গন্ধ শোঁকে। শুঁকে নির্বিকার মুখে বলে, খুঁচিয়ে দিয়েছে।

ইরিগেশান সেন্টারে পৌঁছে মোটর সাইকেল রেখে যোগব্রত শূন্যে হাত দুটো ছুঁড়ে এবং শরীব মোচড় দিয়ে আড় ভেঙে নিলেন। একতলা দু' ঘরের কোয়ার্টারে দুজন ছোকরা কর্মচারী থাকে। তারাই বৈদ্যুতিক পাম্প চালিয়ে মাটির তলা থেকে জল তোলে। ফোয়ারার মতো জল ছড়িয়ে চৌবাচ্চা হয়ে খালে পড়ে। ক্যানেলে যখন জল থাকে না, তখন অর্থাৎ খরার দু'তিন মাস এই ব্যবস্থা। একজন গেছে বকুলপুর বাজারে, অন্যজন পাহারা দিচ্ছে। যোগব্রত তাকে বললেন, শচীন, রইল বাবা। আছ তো?

আছি স্যার।

দেখো বাবা, তোমার জুড়িদার ইতিমধ্যে ফিরে এসে সেদিনকার মতো কেলেঙ্কারী বাধায় না।

শচীন খিকখিক করে হাসল। পাগল স্যার? একদিনেই শিক্ষা হয়ে গেছে। তাব ওপব মদন ডাক্তারেব টিটেনাস ইনজেকশান! ভাগ্যিস ক্যানেলে পড়েছিল। অল্পে গেছে। তাও তো স্টার্ট দেওয়াব ক্রো ছিল না। থাকলে বুঝত।

যোগব্রত কালীতলার দিকে পা বাড়িয়ে বললেন, মেশিন বন্ধ আজ?

হ্যাঁ স্যার। রাত্তিরে এদিকে বৃষ্টিটা জোর হয়েছে। দেখছেন না? এখন এতেই সপ্তাটাক চলে যাবে।

সরু পায়ে-চলা পথ ক্যানেলের পাড়ে এই উঁচু পাম্পিং স্টেশন থেকে নেমে গাঁয়ে ঢুকেছে। ছোট্ট গ্রাম। ঘন গাছপালায় ঢাকা। সামান্য দূরে রেল-লাইন পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। পথের দু'ধাবে তিলেব ক্ষেত। কচি আখের ক্ষেত। কোথাও কোথাও ধানক্ষেত জমাট সবুজ চৌকো-চৌকো। মাটিটা নরম আর ধূসর। শুকোলে পাউডার-দুধের মতো মোলায়েম দেখায়। জল পলকে শুষে নেয়। তাই রাতের বৃষ্টিতে পথের কাদা এখনই শুকিয়ে গেছে।

একবার দাঁড়িয়ে কান পাতলেন, কালীতলাতেও বউ-কথা কও পাখি এখনও টিকে আছে। আজ ভোরবেলা থেকে কান পাতলেই পাখ-পাখালির ডাক শোনা যাচ্ছে। একটা বৃষ্টিতেই এতখানি সাড়া। যোগব্রত বাঁদিকে ঘুরে দূরে কালিকাপুর রোডে ক্যানেলের ব্রিজের দিতে তাকালেন। যুগল আসছে না। নদীর দিকেই যাবে হয় তো।

গাঁয়ের মুখে বাঁশবনের ওপাশে একটা খাল। খালের ওপারে যুগলের বাড়িটা দেখা যাচ্ছে। বাড়ি মানে মাটির একটা ঘর, একটুকরো খোলামেলা উঠোন, আর একটা জবাফুলের ঝাড়। ওটার চারা যোগব্রতের বাগানের। বর্ষা পড়লেই যুগলের বউ ফুলের চারা চাইতে যায়। কিন্তু ওই জবা বাদে আর কিছু স্থায়ী গাছ বাঁচাতে পারে নি। কথা তুললে বলে, ভাল মনে দেন নি ছোটবাবু, তাই—

এই নির্জন জঙ্গুলে ছোট্ট গাঁয়ে ঢুকলে বরাবর যোগব্রতের মনে কী এক শিহরণ ঘটে যায়। হৃৎপিণ্ডে একটা ঝিলিক। বোধে আবছা ভাসে কী সব মতিচ্ছন্ন ভাব—টুকরো হয়ে যাওয়া দুর্জ্ঞেয় রঙীন মূর্তি। মিলিয়ে মূর্তিটা সম্পূর্ণ করে দেখলে চাইলেই সংবিৎ ফেরে। সে কি আগের-আগের জন্মের জীবনের স্মৃতি? ছত্রাক, শ্যাওলা, তিতিরের ডিমের খোলস, পোকামাকড় আর সাপের নীল চোখের আলো। গাঢ় ছায়ায় শুয়ে থাকা দুটি শরীর। বড় স্যাঁতসেঁতে আর সোঁদা গন্ধে আচ্ছন্ন জরায়ুর মতো।

বাঁশমনের ভেতর প্রায় সুড়ঙ্গের মতো একফালি ধু-ধু রাস্তা। একজনের হেঁটে যাওয়ার পক্ষে প্রশস্ত।

দু'ধারে শুকনো পাতা, কাঁটা-ঝোপ। উঁচু মানুষ। বারবার হেঁট হতে হয়। কঞ্চিগুলো যুগল মাঝে-মাঝে সাফ করে ফেলে দেখেছেন। ফের গজায়। একবার একটুর জন্য চোখ বেঁচে গিয়েছিল। অবশ্য সেটা রাত্রিবেলা।

উঠোনে দাঁড়িয়ে ক্ষমা চুল ঝাড়ছে। কী দীর্ঘ অন্ধকার প্রপাত দিনদুপুরে! বুকটা ভীষণ চিতানো, প্রায় আকাশমুখী। দুই বাহু রোদে বড় বেশি প্রগল্‌ভতাময় মনে হল। ওই শরীরে কীভাবে যে এখনও আদিম পৃথিবীর ঘ্রাণ রয়ে গেছে।

খালে একটা মাত্র বাঁশের সাঁকো। নীচে অবশ্য জল নেই! দূর্বা ঘাসে ভরা। ভারসাম্য রেখে সাঁকো পেরুনো সহজ নয়। কিন্তু যুগল বা ক্ষমা অভ্যাসে এটা পারে। যোগব্রতও পারেন কষ্টেসিষ্টে। বন্যার বছর নৌকোয় যুগলদের উদ্ধার করতে এসে খেয়ালবশে পা ডুবিয়ে বাঁশটা খুঁজেছিলেন। পা ছড়ে গিয়েছিল অনেকটা। সেই বাঁশটা নিশ্চয় নয় এটা।

ক্ষমা এদিকে না ঘুরেই বলল, আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলুম কে জানে? খালি—

খালি? যোগব্রত উঠোন পেরিয়ে মাটির দাওয়ায় মাটিতেই বসলেন পা ঝুলিয়ে। নিকানো তকতকে মাটি। দেয়ালে আতপ চাল গুলে আঁকা পাখি, পদ্মফুল, ধানের শীষ, লক্ষ্মী মায়ের চরণ। একটা প্রাচীন শুচিতা ঝকমক করছে। দারিদ্র্যটা টের পেতে দেয় না আপাতদৃষ্টে।

ক্ষমা না তাকিয়ে বলল, খালি খুনোখুনি দেখছি।

সর্বনাশ! যোগব্রত আঁতকে ওঠার ভঙ্গি করলেন। বলিস কী?

হুঁউ। বলে সে এতক্ষণে চোখে চোখ রাখল।

যোগব্রত হাসলেন। আমার দিকে তাকিয়ে খুনোখুনিটা ভাল করে দেখছিস বুঝি? কে খুন হল ক্ষমা? আমিও কি? নাকি খুন হয়ে যাব বলছিস? দ্যাখ ভাই, খুলে বল। মানে-মানে প্রাণ বাঁচিয়ে কেটে পড়ি।

ক্ষমা সে-কথায় কান না করে বলল, যাবেন না বকুলপুর? নাকি গিয়েছিলেন?

কেন?

হঠাৎ ক্ষমার আলুথালু চুল ঝুঁকে পড়ল হাসির চাপে। ও মা! কাকে কী বলছি?

যোগব্রত আস্তে বললেন, কী বললি ক্ষমা?

কিছু না। তা অবেলায় কী মনে করে ছোটবাবু? বলে তাঁর পাশ কাটিয়ে ক্ষমা দাওয়ায় উঠল এবং চালের বাতা থেকে লম্বা চিরুনি টেনে নিল। চুল আঁচড়াতে থাকল দরজার কপাটে হেলান দিয়ে।

যোগব্রত বললেন, জমি দেখতে এলুম।

ক্ষ্যামার উঠোনেই তাহলে ছোটবাবুর জমি?

আসব না বলছিস!

ছোটলোকের ঘরে জন্মো নিয়েছি। অত বড় কথা বলতে পারি?

যোগব্রত মুখে অভিমান ফুটিয়ে বললেন, জানি। তুই আমাকে বড্ড ঘেন্না করিস ক্ষমা।

আঃ! ও কথা না।

একবার তুই বলেছিলি, গায়ে মাছের গন্ধ, তবু কেন ছোটবাবু—

ক্ষমার মুখে গাঢ় ছায়া নামল। উঠোনের দিকে তাকিয়ে বলল, বউদিরাণী আপনার গায়ে মাছের গন্ধ পেয়েই তো চলে গিয়েছিলেন। আমার জন্যেই তো সাত কাণ্ড রামায়ণ।

চুপ কর তো! যোগব্রত সিগারেট বের করে ফের পকেটে ঢুকিয়ে দিলেন।

ক্ষমা আস্তে বলল, আজ বউদিরাণীকে দেখতে গিয়েছিলুম, জানেন? যোগব্রত ওর মুখটা দেখেই ঘুরে বসে রইলেন। ক্ষমা বলতে থাকল, ভিড়ের মধ্যে গিয়েছিলুম। আর তখন তো অন্যরকম অবস্থা। বউদিরাণী আমার দিকে একবার তাকালেন। না চেনবার কথা নয়। মেয়ে বলেই মেয়েমানুষের দিষ্টিটা বুঝি ছোটবাবু। মোনে হল, এতগুলো বছর গেল, তবু কিছু মুছে যায় নি মোন থাকে। ওই এক পলকের চাউনিতে সব ঠাওর হল। তক্ষুনি সরে এলুম।

যোগব্রত অকারণ দূরে থুথু ফেলে বললেন, ওর চলে যাওয়ার সঙ্গে তোর সম্পর্ক নেই। বরাবর বলেছি তোকে। নিজেকে অত...

হুঁ বলুন বলুন! শুনি।

নিজেকে অত...আবার থেমে গেলেন যোগব্রত। ঘুরে বললেন, এক গ্লাস জল খাওয়াবি?

ক্ষমা চুলে চিরুনি গুঁজে ঘরে ঢুকল। একটু পরে ঝকঝকে মাজা কাঁসার গ্লাসে জল এনে দিল। যোগব্রত গ্লাসটা নিয়ে বললেন, টিউবেলের?

পাম্পিং সেণ্টারের।

যোগব্রত জল খেয়ে গ্লাসটা রেখে বললেন, মোড়লের বাড়ি হয়ে ফিরব। উঠি।

ক্ষমা উঠোনে নেমে গিয়ে বলল, আপনাকে আটকে রাখতে পারি? তবে এসেছেন যখন দয়া করে, একটু বসুন না ছোটবাবু। ওর চোখে দুষ্টুমি খেলা করছিল। ফের বলল, নাকি বনজঙ্গল খালবিল ছাড়া ক্ষমার কাছে বসতে ভাল লাগে না? হিজলতলা না হলে? কী গো?

তুই সত্যি আমায় বড্ড ঘেন্না করিস, ক্ষমা। জেনেও তোকে একবার দেখতে আসি। এই এক জ্বালা আমার! বলে যোগব্রত উঠলেন। পা বাড়িয়ে যুগলের বউয়ের মুখোমুখি দাঁড়ালেন। এত কাছে যে ভিজে চুলের কিংবা শরীরের মেয়েলী গন্ধ নাকে লাগল। কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে বুকের ভেতরটা ধকধক করে কাঁপল। ঊরু ভারী বোধ হল। কিন্তু সামলে নিলেন। আসি রে! তুই তো কালিকাপুর যাওয়া ছেড়েই দিলি।

দ্রুত এগিয়ে গেলেন বাঁশের সাঁকোটার দিকে। মনে হল, নীচের খালে নেমেই পেরুনো ভাল। শরীরটা কাঁপছে। ক্লান্তি লাগছে। হয় তো ব্যালান্স রেখে পেরুতে পারবেন না।

ছোটবাবু!

যোগব্রত ঘুরলেন না। শুধু বললেন, উঁ?

রাগ করে গেলেন?

যোগব্রত জবাব দিলেন, না। খালে সবুজ দূর্বার ওপর একটা সাপ যাচ্ছে। সাপটা নির্বিষ নয় বলে মনে হচ্ছে। নির্বিষ সাপ দ্রুত যায়। এটা খুব আস্তে এঁকেবেঁকে এগুচ্ছে। গায়ের রং খরিসের মতো। নিশ্চয় খরিস।

ক্ষমা লক্ষ্য করে বলল, কী দেখছেন? তারপর সে দৌড়ে পাশে গিয়ে দাঁড়াল। বলল, খরিস যাচ্ছে, যাক। আমার কথার জবাব দিলেন না ছোটবাবু?

যোগব্রত সাপের দিকে চোখ রেখে বললেন, তোর ওপর রাগ করা আর নিজের ওপর রাগ করা একই কথা।

দুজনে সাপটার চলে যাওয়া দেখতে থাকলেন। দুজনেই প্রকৃতিচর মানুষ। টের পাচ্ছিলেন, সাপটা চলেছে সঙ্গী অথবা সঙ্গিনীর খোঁজে। সাপেদের প্রজনন ঋতু এখন।

পাঁচ

আপনার নাম লালী, না?

মায়া ভীষণ চমকে উঠল। বাগানের পুব-দক্ষিণ কোণায় পাঁচিলের কাছে কাঠমল্লিকা গাছের তলায় হাঁটু দুমড়ে বসে সে পিঁপড়ের বাসা দেখছিল। বাসাটা অন্য কোন গাছের পাতা মুড়ে তৈরী। রাতের ঝড়ে ভেঙে পড়েছে। অজস্র লাল পিঁপড়ে ছোটাছুটি করছে। কী করবে তারা ঠিক করতে পারছে না হয় তো। ওদের চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে কাঠমল্লিকা ফুল। সুগন্ধে ম' ম' করছে এখানটা। এই গন্ধের একটা অনুষঙ্গ আছে মায়ার জীবনে। স্মৃতিটা ফিকে। শুধু মনে হয়, কোথাও কার সঙ্গে দাঁড়িয়েছিল কবে—ছোটমামাই কী? মাও হতে পারে।...হুঁ, সেখানে বুঝি একটা মন্দিরও ছিল।

মায়া দ্রুত ঘুরে দেখল, শহরের ছেলেটা তার পিছনে কয়েক হাত তফাতে দাঁড়িয়ে আছে। মায়া হাতের কাঠিটা ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তাকাল।

পান্না আপনার কথা বলেছে আমাকে। আপনার ডাকনাম তো লালী?

মায়া ঘাড় নাড়ল। আস্তে বলল, না। মায়া।

আপনাকে অসুস্থ দেখাচ্ছে। বীরু দু' পা এগিয়ে কোমরে দু হাত রেখে বলল। হাসল। আমিও খানিকটা আউট হয়ে গেছি মনে হচ্ছে। কাল রাত্তিরে পুরো বৃষ্টিটা নিয়েছি। বেশ ব্যথা করছে শরীরটা।

সর্দিভাবও।

মায়া বলল, বাবা ফিরতে দেরি করছেন বড্ড।

হুঁ, বাবা এলেই তো আপদ বিদায়! বীরু আরও জোরে হাসল।

মায়া জগাইকে খুঁজছিল। পিঁপড়ের বাসাটা ফেলে দিতে বলবে। কিছুক্ষণ আগে মনোরমার সঙ্গে নীচে নেমেছে। ওপাশে আমবাগানের তলা চুঁড়ে উনি ম্যাজিক করার মতো কয়েকটা আম বের করেছেন। আশ্চর্য, ধারণা ছিল এবার কোনো গাছেই আম ফলে নি। আমগুলো কোঁচড়ে নিয়ে জগাইকে অকারণ বকাবকি করে চলে গেছেন মনোরমা। আচারের ইচ্ছে নিয়েই গেছেন। মায়া তখন অভ্যাস-মতো সারা চৌহদ্দী গাছপালা ফুলের ঝোপ চক্কর দিয়ে বেড়িয়েছে।

মায়া ডাকল, জগাইদা!

জগাই—মানে ওই মালী বুড়ো তো? বীরু বলল। ওকে আমি সিগারেট আনতে পাঠিয়েছি।

মায়া নীচু পাঁচিলের ওপর দিয়ে দূরের রাস্তায় দৃষ্টি পাঠিয়ে বলল, বাবা এক্ষুনি এসে যাবেন।

বীরু ক্ষুব্ধভাবে বলল, কী আশ্চর্য! আপনি এত বাবা-বাবা করছেন কেন? আমি চিরকালের জন্যে এখানে থাকতে আসি নি।

মায়া দ্রুত বলল, আমি তা বলি নি। ভাবছিলুম, আপনি বাবার জন্যে ওয়েট করছেন।

ওয়েট করার কী আছে? বলে বীরু মুখভাব বদলাল। আগের মতো স্মার্ট হাসি ফুটিয়ে ফের বলল, বুঝতে পারছি, আমার সঙ্গে আপনার বাবার সম্পর্কের কথা আপনি জানেন না। এক সময় টাউনে আপনাদের যে বাড়ি ছিল সেটাই আমরা কিনেছিলাম। যোগব্রতদা টাউনে গেলেই আমাদের বাড়ি ওঠেন। জানি না, কেন আপনি এসব জানেন না।

এবার মায়া একটু হাসল শুধু।

বীরু বলল, টাউনে আপনাদের বাড়িটা কোথায় ছিল নিশ্চয় জানেন?

মায়া ঘাড় নেড়ে বলল, দেখি নি। তবে জানি।

কোথায় বলুন তো?

লালদীঘির পাড়ে।

কোন পাড়ে? বীরু মিটিমিটি হাসতে হাসতে লাগল। মানে, লালদীঘি একটা চৌকোণা পুকুর। বিশাল পুকুর। তার চারটে পাড় আছে।

মায়া আরও একটু হাসল। পূর্ব পাড়ে।

একজ্যাক্টলি। বীরু উৎসাহের সঙ্গে বলল। কিন্তু কেন যোগব্রতদা আপনাকে একবারও নিয়ে যান নি, কিংবা আপনার নিজেরও যেতে ইচ্ছে করে নি, সেটাই ভাবতে অবাক লাগছে। অথচ আপনি প্রায় তার পাশ দিয়ে কলেজে যান। যান না?

যাই। মায়া জবাব দিল।...আমার অনেক কিছুতে কৌতূহল নেই হয় তো।

আমার আবার উল্টো। এই যেমন ধরুন, আপনার ব্যাপারটা।

মায়া ভুরু কুঁচকে বলল, কী আমার ব্যাপারটা বলুন তো?

বীরু একটুও ভড়কাল না। নির্বিকার মুখে বলল, আপনার ছোটমামা পান্নার সঙ্গে আমার চেনাজানা যোগব্রতদার মারফত। তারপর ক্রমশ পান্নার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছে। পান্না ওদের ফ্যামিলির কোনো কথা গোপন করে নি আমার কাছে। যেমন ধরুন, আপনার কথা। আপনার নাম লালী, পান্নাই বলেছিল। তা ছাড়া আপনার সম্পর্কে অনেক কথাও।

কী কথা?

আপনি দেখছি বড্ড রাগী মেয়ে! পান্না কিন্তু উলটোটাই বলেছিল। ভারি শান্ত, সরল, একটু খামখেয়ালীও।

মায়া পিঁপড়ের বাসাটার দিকে চোখ রেখে বলল, ছোটমামার আমায় নিয়ে এত মাথাব্যথা কেন বুঝলুম না।

বীরু কি বলতে যাচ্ছিল, জগাইয়ের সাড়া পাওয়া গেল গেটের ওদিকে। সে সিগারেটের প্যাকেট হাতে নিয়ে কাকে ভাগিয়ে দিচ্ছে। মায়া ঘুরে দেখছিল ব্যাপারটা। দেখতে দেখতে প্রথমে চাপা হাসল।

তারপর হাসিটা চেপে রাখতে পারল না। পিছন ফিরে হাসতে লাগল। বীরু বলল, হাসছেন যে?

মায়ার অন্য কথা মনে পড়েছিল।

কিছু ভাল লাগে না, কিছু না—এই রকম মনে হওয়া নিয়ে দিন কাটানো যার, তার কিছু না কিছু হঠকারিতা না থেকে পারে না। মায়ার মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, তার এই স্বাস্থ্যের বা চেহারার রঙচঙে ব্যাপারটা নিছক বাইরে থেকে যত্ন করে চাপানো, ভেতরটা পাতা চাপা ঘাসের মত ফ্যাকাসে। হয় তো গোপনে রয়েছে গেছে কোনো গুরুতর অসুখ। হঠাৎ কোনো এক সময় মাথা ঘুরে উঠলেই হল, সে দাদুর মতো মরে যাবে। দাদুর স্বাস্থ্য ও চেহারাও উজ্জ্বল ছিল কত! এই একটা মৃত্যু সে চোখের সামনে দেখেছে। তারপর থেকে মরা-মরা খেলার অভ্যেস তাকে পেয়ে বসেছে। বিছানায় নিস্পন্দ হয়ে চোখ বুজে চিৎ হয়ে শুয়ে সে নিজেকে মড়া ভেবেছে। তারপর হঠাৎ ভীষণ ভয় পেয়েছে। দৌড়ে গিয়ে সামনে যাকে পেয়েছে, বাবা পিসীমা কিংবা নবঠাকুর, দু-হাতে জড়িয়ে ধরে বুকে মুখ গুঁজেছে। সবাই ভেবেছে, এ একটা আদর কাড়ার ভঙ্গী মেয়ের।

তো একবার মরা-মরা খেলে ভীষণ ভয় পেয়ে জগাইয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। জগাই চেঁচিয়ে উঠেছিল, কী হল? কী হল গো দিদি? কে ভয় দেখাল? মায়া কেঁদে ফেলেছিল। সেই সময় গেটের কাছে এক বোষ্টম ভিখিরি এসে দাঁড়িয়েছে এবং সবে ছোট্ট খঞ্জনী তুলে ঠুং করে বাজিয়ে ঠোঁট ফাঁক করেছে, জগাই তবে রে শালা বলে দৌড়ল খুরপি তুলে। তারপর দেখা গেল, বোষ্টম ভিখিরি বেচারা গ্রামের দিকে প্রায় লেজ তুলে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাচ্ছে এবং পেছনে জগাই। সেই দেখে মায়া ভিজে চোখে হাসতে হাসতে ঘাসে লুটোপুটি খাচ্ছে।

অথচ জগাই এই লোকটার কাছে বসে কতদিন হরিনাম শুনে চোখ বুজে থেকেছে।

তারপর থেকে মায়া তার দৃষ্টির মধ্যে থাকলে যদি ভিখিরি-টিকিরি কেউ গেটে আসে, জগাই তাড়া করবেই। ও বুঝি ভাবে, মেয়েটা এখনও সেই নাবালিকা আছে।

বীরু বলল, আপনি সত্যি বড্ড খামখেয়ালী মেয়ে।

হাসতে পেরেই হয় তো মায়ার মন ভাল হয়ে গেছে। মাথা আস্তে নেড়ে বলল, না। এমনি হাসছি। ও জগাইদা, শোন। এই দেখ, একটা পিঁপড়ের বাসা পড়ে আছে। ফেলে দাও।

জগাই বীরুকে সিগারেট দিয়ে পিঁপড়ের বাসার সামনে কোমরে দু-হাত রেখে দাঁড়াল। তারপর বলল, সমিস্যে।

মায়া বলল, কোনো সমস্যা-টমস্যা না। না হয় একটু কামড় খাবে। পাঁচিলের ওপাশে ফেলে দাও।

জগাই জিভ চুকচুক করে মাথা জোরে নেড়ে বলল, দেখছ না ডিম্ব হয়েছে?

বীরু ও মায়া একসঙ্গে বলল, ডিম্ব!

হুঁ, ওই যে সাদা-সাদা ফুটকি। ওগুলান ডিম্ব। জগাই প্রাজ্ঞের ভঙ্গীতে আঙুল দিয়ে দেখাল। এ সময়ে ওনাদের বংশবিরিদ্ধি হয় কি না।

মায়া ধমকের সুরে বলল, নাও হল! বাওলজির দিগ্‌গজ তুমি! ফেলে দিয়ে এসো।

জগাই গ্রাহ্য করল না। ওপাশ থেকে দুটো ভাঙা ডাল কুড়িয়ে এনে পাতার বাসাটা তার ডগায় তুলে নিল। তারপর প্রায় দৌড়ল। একটু তফাতে পুব-উত্তর কোণায় একটা নীচু ও ঝাঁকড়া বুনো গাছের ঝুঁকে পড়া ডালপালার ভেতর গুঁজে দিল বাসাটা। তারপর ডাল দুটো পাঁচিল পার করে ফেলে হাত ঝাড়তে ঝাড়তে ফিরে এল।

বীরু বলল, কামড়েছে তো?

জগাইয়ের মুখটা গম্ভীর। মাথা নেড়ে নাঃ, বলে চলে গেল নিজের কাজে।

লোকটা রিলায়েবল, না?

মায়া বলল, হ্যাঁ। কেন?

ওকে বলে দিয়েছিলুম, সিগারেট কার জন্যে—এসব প্রশ্নের জবাব যেন এড়িয়ে যায়।

মায়ার ভেতরটা ধক করে উঠেছিল। ফের রাতের কথাটা মনে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু সামলে নিয়ে বলল, আপনি কি ফেরারী আসামী নাকি?

বীরু জোর দিয়ে বলল, না না। মানে, গ্রামের ব্যাপার তো জানি। লোকের বড্ড কৌতূহল! কে

এসেছে, কেন এসেছে, কখন এসেছে...

মায়া দ্রুত বলল, আপনি তো লুকিয়ে নেই!

বীরু গম্ভীর মুখে বলল, সে নয়। জাস্ট এ প্রিকশান।

কিসের?

গ্রামের মেয়ে হয়েও বোঝেন নি? বীরু অধীর হয়ে বলল। নকশাল পিরিয়ডের সময় থেকে শহরের কেউ গ্রামে গেলেই কেমন চাপা হিড়িক পড়ে যায়। তার ওপর আজকাল তো শুনেছি এই এরিয়ায় প্রায়ই হাঙ্গামা হচ্ছে। একবার জানেন, এক বন্ধুর সঙ্গে একটা গ্রামে গিয়ে কী বিপদে পড়েছিলুম? রাত দুপুরে পুলিস এসে দরজায় দমাদম লাথি। বাপ্‌স্‌!

মায়া কোন কথা বাড়াল না। পা বাড়াল।

বীরু ডাকল, শুনুন।

কী?

জাস্ট কথার কথা বলছি। দৈবাৎ কেউ আমার কথা জানতে চাইলে বলবেন, আত্মীয়। আজই সকালে এসেছি।

মায়া ঘুরে নিষ্ঠুর মুখে বলল, অত ভয় কেন আপনার?

আহা, বললুম তো আজকাল পাড়া-গাঁয়ে আসা কত রিস্কি।

রিস্ক্ ক্রিমিনালদের থাকতে পারে। ভাল ছেলেদের কী?

বীরু রাগ চেপে হাসল। বয়স মা-মাসীর মতো হোক, তখন ওই সুরে কথা বলবেন। শাসনও করবেন।

মায়া দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ফের পা বাড়াল। হনহন করে বাড়ির দিয়ে এগোল।

বীরু তার দিকে তাকিয়েছিল, মায়া ভেতরে ঢুকে গেলে সে এদিক ওদিক তাকিয়ে গোড়া বাঁধানো বকুল গাছটার তলায় গেল। গোল লাইম কংক্রিটের চত্বরটা দু'ফুট মতো উঁচু। পলেস্তারা খসে গেছে। যথেষ্ট ফেটেছে। শ্যাওলায় সবুজ হয়ে আছে। তার ওপর অজস্র বকুল ফুল পড়ে রয়েছে। নাক উঁচু করে গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে বীরু বসে পড়ল সেখানে। খেয়াল হল না, প্যান্টে শ্যাওলার ছোপ লাগবে। সে সিগারেট ধরাল।

রাতের বৃষ্টির পর এইসব গাছপালা ও ফুলের গন্ধে পাখ-পাখালির ডাকে গভীর স্বাচ্ছন্দ্যতা এসে যায়। হঠাৎ মনে হয়, কোথাও একটা বিরাট প্রশান্তি বয়ে গেছে। তবে এসব ভাল লাগা মাত্র কিছুক্ষণ। তারপর মনে হয়, বড় অসহ্য এই নৈঃশব্দ্য। সাউণ্ডপ্রুফ ঘরের ভেতর আটকে থাকা যেন।

শুধু হাওয়াটাই হয়তো নির্ভেজাল। ফুসফুসের ভেতর যতটা পারা যায়, ভরে নিতে ইচ্ছে করে। বীরু জোরে শ্বাস টানল এক-একবার। কিন্তু কানে তালা ধরা ভাবটা যায় নি এখনও। মাথার ভেতরে ভোঁ-ভোঁ করছে। মগজ খালি হয়ে গেছে যেন। আর জিভের ডগায় কটু স্বাদ, চিনচিনে ব্যথা। বারবার থুথু ফেলতে ইচ্ছে করে।

কালীতলা থেকে বেরিয়ে যোগব্রত সিদ্ধান্ত করেছিলেন, বাবলবুনিয়া যাবেন। স্টেশন-রোড ডিঙিয়ে সেই ক্যানেলের পাড়ে মোটর সাইকেল নড়বড় করে কষ্টেসৃষ্টে এগোল। জায়গায় জায়গায় নেমে ঠেলে নিয়ে যেতে হল। এই পাড় বরাবর একটা রাস্তার স্যাংশন পিছিয়ে গেছে। খোঁজ নিয়ে জেনেছেন, একেবারে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে-এর যোগসূত্র। অথচ রাস্তাটা হলে কত ভাল হত লোকের। অনেক বেকার, খেত-মজুর অবরে-সবরে রিকশো চালিয়ে দু'পয়সা কামাতে পারত। গাঁয়ে সরাসরি ট্রাক ঢুকলে তরিতরকারী ও ফসলের দাম চাষীরা কিছুটা বেশি পেত। এখন দালালরা নিয়ে যায়। গরু-মোষের গাড়ির ভাড়া মাল বওয়ার তুলনায় ট্রাকের দ্বিগুণ।

তবে আজ যোগব্রত এসব কথা ভাবছিলেন না।

কালকের অত বড় মিটিংয়ে বাবলবুনিয়া যান নি, তার একটা কৈফিয়ত দেওয়া উচিত। অবশ্য ওটা নৃপেন ও মধুবাবুদেরই ব্যাপার। সেটাও একটা বড় কৈফিয়ত। লোকে ভালই জানে ব্যাকগ্রাউণ্ড। তাহলেও বাবলবুনিয়ার লোকদের তো দাবি-আব্দারটা আছে যোগব্রতের ওপর। ওখানকার মাঠে তাঁর

বেশ কিছু জমি আছে। বর্গাদার দু' পুরুষের। কিন্তু খাতিরে নিজের নাম লেখায় নি। সত্যব্রত ডাক্তারের নামে যত বদনাম থাক, আধিব্যাধির দুঃসময়ে তাঁর প্রাণঢালা সেবার কথা কেউ ভোলে নি।

গাছপালার আড়ালে একটা করে বাড়ি। অন্য প্রান্তে বাড়িগুলো গায়ে গায়ে ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে আছে। এর কারণ একটাই। ওটা মুসলানপাড়া। পরিবারে হু-হু করে সংখ্যাবৃদ্ধি এবং শরীয়তী জটিল আইন ওই ঠাসবুনোনি বসতির আসল কারণ। ভিটেয় ঘর তুলতে তুলতে উঠোনে বা আনাচে-কানাচে সব ফাঁকা জায়গা ভরে গেছে।

ক্যানেল বাঁ দিকে ঘুরে নদীতে মিশল। বিশাল স্লুইস গেট ওখানে বাঁধের মাথায়। যোগব্রত ঘুরে দেখতে পেলেন, যুগল দহের ধারে জলের দিকে তাকিয়ে আছে। মাথার ওপর ঝুঁকে পড়া হিজল গাছ। একটা কালো উরু উঁচু করে টেকোয় পাক খাওয়াচ্ছে।

হঠাৎ নিজের ওপর ক্ষোভ জাগল যোগব্রতের। ওই কালো কুৎসিত উরুটা দেখেই। ক্ষমার শরীরের কথা ভেবেই। থুথু ফেললেন যোগব্রত। মুখটা কিছুক্ষণ বিকৃত হয়ে রইল। বনশোভা বলেছিলেন, ধিক তোমায়! ভেতরে একটা চাষাভুষো মুদ্দোফরাস, ওপরে ভদ্রলোক। রুচিতে বাধে না? একটা নোংরা দুর্গন্ধ গায়ে গা ঘষে বেড়াও! গায়ে পঞ্চাশখানা সাবান ঘষে ওই কুচ্ছিত গন্ধ ঘুচবে না। হাজার ঘড়া গঙ্গাজল ঢাললেও না। কয়েকটা জন্ম কেটে যাবে। তারপর এসো।

একটু পরে যোগব্রত আগের মতোই নিজের আচরণের যুক্তি খুঁজে পেলেন। না, না—শরীর-টরীর কিংবা কাম-টাম কোনো ব্যাপারই না। ক্ষমার মধ্যে কী একটা আছে, খুব জটিল এবং মানুষের পুরোনো ব্যাপার। খুব চেনা লাগে। কথা বললে মন হালকা হয়ে যায়। মনে হয় ও আমার অনেকটা যেমন জানে, আমিও ওরটা জানি। তাছাড়া ভালবাসা ব্যাপারটা তো শেক্সপীয়ার বা রবীন্দ্রনাথ আলোচনায় ফালতু। নয় কি? ক্ষমা যেমন আকাশ বাতাসের ভাবগতিকের কথা তোলে, তেমনি। ভালবাসা একটা দুর্জ্ঞেয় বোধ—যা থেকে কিছু আচরণ প্রকাশ পায় নারী ও পুরুষের। সে-আচরণের রূপ নানা রকম হতে পারে। যুগে যুগে অবশ্য মানুষের প্রজ্ঞা ওই দুর্জ্ঞেয় বোধকে রবীন্দ্রনাথ, কালিদাস কিংবা মিস্টিক ফিলসফি দিয়ে সাজিয়েছে। ওসব বাইরের অলংকরণ। বড় জোর আদিম ও মূল বোধটাকে প্রকাশের চেষ্টা। তাছাড়া আর কী? নিক্তি দিয়ে কি মাপা যায় মানুষের ভালবাসার সঙ্গে?

ছোটবাবু! ছোটবাবু!

বাঁধের নীচে ডান দিকে কেউ ডাকছিল। যোগব্রত ঘুরে দেখেই ব্রেক কষলেন। হাতখানেক চওড়া একফালি পথ বাঁধের সায়ে উঠে এসেছে কোনাকুনি। সেই পথে নেমে গেলেন। নীচে দুধে ধোওয়া রাস্তা। একটা বাড়ির দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে বসে আছে দীপেনমাস্টার। তার পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে বাচ্চা মেয়েটা পাকা চুল খুঁজছে। অবাক চোখে সে মোটর সাইকেল দেখল। তারপর দৌড়ে ভেতরে ঢুকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল এক দঙ্গল ছেলেমেয়ে। চেঁচিয়ে উঠল, ভটভটিয়া! ভটভটিয়া!

দীপেন ধমক দিয়ে ওদের চুপ করিয়ে বলল, এক্ষুনি ভাবছিলুম দাদা, কালিকাপুর যাব নাকি।

যোগব্রত বললেন, তাই বুঝি? কী ব্যাপার দীপু?

দীপেন কাছে এসে গম্ভীর মুখে বলল, বকুলপুরের কাণ্ডটা তো শুনেছেন?

শুনেছি।

ঘটনা ঘটল কোথায়, আর এখানে তার ডেঞ্জারাস রিঅ্যাকশান। পরিস্থিতি গুরুতর দাদা।

যোগব্রত ভুরু কুচকে বললেন, কী হয়েছে?

আমাদের শাসাচ্ছে শুনলাম। রবিয়ুল খুব তড়পাচ্ছে, ভিটে থেকে তুলে দেবে। ঘরে আগুন ধরিয়ে দেবে। আমরাই নাকি বোম মেরেছি গত রাতে। দীপেন করুণ মুখে তাকিয়ে রইল যোগব্রতের দিকে।

যোগব্রত বললেন, কাল আমি টাউনে গিয়ে একটা কাজে আটকে গেলুম। নইলে মিটিং-এ আসতুম। তো ঠিক আছে। অত ভাববার কিছু নেই। আমার মনে হয় না, অতটা সাহস পাবে ওরা—এ মুহূর্তে অন্ততঃ।

দীপেন খপ করে দু'হাতে যোগব্রতের একটা হাত ধরে ফেলল। দাদা! প্লীজ! সব পক্ষই আপনাকে খাতির-ভক্তি করে। আপনার কথা সবাই শুনবে। আপনি রবিয়ুল আর প্রমথকে বুঝিয়ে বলুন, এসব গুণ্ডামি আমরা কখনও করি নি। করার কথা কল্পনাও করি নে। তাছাড়া দেখুন, নৃপেনের কথা বলছি

নে—মধুবাবুর তো শত্রুর শেষ নেই। কত লোককে চটিয়ে রেখেছেন। এটা ওঁর ব্যক্তিগত শত্রুতার ফলাফল ছাড়া কিচ্ছু না। এ আমি বাজি রেখে বলছি। এতে কোনোরকম পলিটিকসের গন্ধ নেই।

যোগব্রত হাসলেন। গন্ধ যে নেই, তাই বা কেমন করে বলছ? মধুবাবুদের মধ্যেও তো দলাদলি আছে!

দীপেন লাফিয়ে উঠল। হ্যাঁ। তা তো আছেই। বিজয়েন্দুবাবুও তো ভেতর-ভেতর ওঁর ওপর ভীষণ অখুশি। লাস্ট ইলেকশানে মধুবাবু তলায়-তলায় কত ভোট ভাঙিয়েছিলেন। ওদিকে নারানবাবুর ফ্যাকশন আছে।

যোগব্রত স্টার্ট দিয়ে বললেন, ঠিক আছে। বলব'খন। চলি।

দাদা, বকুলপুরে যান নি?

কেন?

দীপেন গলার স্বরে একটু ভড়কে গিয়ে বলল, মানে নৃপেন...

তাকে থামতে দেখে যোগব্রত বললেন, না। তুমি ঠিকই বলেছ। যাব। যাওয়া নিশ্চয় উচিত। নৃপেন আমার ঢের শত্রুতা করেছে। কিন্তু আফটার অল তার দিদিকে আমি বিয়ে করেছিলুম। আমার মেয়ের সে মেজমামা।

দীপেন হাসতে লাগল কথার ভঙ্গীতে।

বডি তো শুনলুম এখন টাউনে মর্গে গেছে। ওবেলা ফিরবে। তখন যাব। শ্মশানে উপস্থিত থাকব। বলে যোগব্রত জোরে এগিয়ে গেলেন। রাতের বৃষ্টির জন্য রাস্তায় ধুলো নেই। সুমসাম নির্জন পাড়াগাঁয়ের রাস্তায় শব্দটা প্রচণ্ড লাগে। প্রকৃতিতে হুলস্থূল ঘটে যাচ্ছে। গাছপালার আড়ালে থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বাচ্চা-কাচ্চারা বেরিয়ে আসছে। হাততালি দিয়ে চেঁচাচ্ছে, ভটভটিয়া! ভটভটিয়া!

কালকের মিটিংয়ের জায়গাটা চেনা যাচ্ছিল। চোখ বুলিয়ে আঁচ করলেন যোগব্রত, বিবাট সমাবেশ ঘটেছিল। প্রাইমারি স্কুলের মাঠ জুড়ে যেন মেলার চিহ্ন ছড়িয়ে আছে। ডাইনে বাঁক নিয়ে চওড়া রাস্তায় এগিয়ে গেলেন। এখানটা মোড়ল পাড়া। তারপর নো ম্যান'স ল্যাণ্ডের মতো খানিকটা পোড়ো জমি। তার ওধারে মুসলমান পাড়া। রাস্তায় টাটকা মেরামতের চিহ্ন চোখে পড়ছিল। মোটর গাড়িগুলোর ছাপ অবশ্য ধুয়ে গেছে।

'নেতাজী ক্লাব ও পাঠাগার'-এর বারান্দায় একদল যুবক দাঁড়িয়ে আছে। যোগব্রতকে দেখছে। প্রত্যেকটি মুখ থমথমে ভাব, কিন্তু ঠোঁটে অভ্যর্থনার মৃদু হাসিও রয়েছে। যোগব্রত ব্রেক কষে বললেন, প্রমথ আছে নাকি এখানে? আর রবিয়ুল?

ক্লাবের ভেতরে থেকে সাড়া এল, দাদা, আসুন।

প্রমথ? রবিয়ুল নেই? যোগব্রত মোটর সাইকেল বারান্দার ধার ঘেঁষে রেখে উঠে গেলেন।

রবিয়ুল বকুলপুরে দাদা। এখনও ফেরে নি। আসুন, আসুন।

ছয়

পায়ের শব্দে চমকে উঠেছিল বীরু। ঘুরে দেখল, মনোরমা হাসি মুখে এগিয়ে আসছেন। বললেন, ঘরে উঁকি মেরে দেখলুম নেই। ভাবলুম, না বলে চলে গেলে নাকি?

নাঃ। বীরু জ্বলন্ত সিগারেট একটু আড়াল করল। সামান্য দ্বিধা। তবে তার এসব সমীহ করার অভ্যাস নেই।

আঁচ করে মনোরমা বললেন, সামনেই খাও না ভাই। আজকাল ওসব মানামানির অর্থ হয় না। আসানসোলে তো ভাসুরপো দেওরপোদের কথাই ছিল, এ তো একপ্রকার টাদ্য। বুঝলে কথাটার মানে?

বীরু বলল, টাদ্য মানে?

খাদ্য মানে যা খাওয়া হয় এবং টাদ্য মানে যা টানা হয়। এই আর কী! মনোরমা হেসে আকুল হলেন। তা স্নান করবে তো? বলব জগাইকে, জল এনে দেবে?· রোয়াকে বসে—

বীরু কথা কেড়ে বলল, স্নান করব না। বৃষ্টিতে ভিজে ঠাণ্ডা লেগে গেছে মনে হচ্ছে।

তাহলে খেয়ে নেবে চলো। বেলা হয়ে গেল।

কিন্তু যোগব্রতদা? বলে গেলেন, স্টেশন থেকে সোজা ফিরে আসবেন।

মুখে বিরক্তি ফুটিয়ে মনোরমা বললেন, যোগোর কথা ছাড়ো। ওর কথার কি ঠিক আছে কোনো? এক্ষুনি ফিরছি বলে পরের দিনটাও কাটিয়ে আসবে। বরাবর তো এই। তুমি ওর ভাবনা কোরো না ভাই। চলো, খেয়ে নেবে।

বীরু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কোথায় কোথায় অত ঘোরেন?

মনোরমা আগে পা বাড়িয়ে বললেন, সারা তল্লাটে। অবশ্য ওর দোষ নেই। বাবা সামান্য জমি-জিরেত করেছিলেন। তো পাঁচ গাঁয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে। কাজেই ওকে ঘুরতে হয় টো-টো করে। তবে এখন তো গ্রীষ্মকাল। গাড়িটা চলে। বর্ষার পর পর প্রায় চারটে মাস পায়ে হেঁটে ঘোরে। তখন যদি অবস্থা দেখ ওর!

কী অবস্থা?

পায়ে গামবুট অবশ্য থাকবে। কিন্তু সারা শরীর, জামা-কাপড় কাদায় নোংরা।

যোগব্রতদা ফার্ম হাউসের কথা বলেন। সেটা কোথায়?

মনোরমা হঠাৎ থেমে দু'ফিতের স্লীপার দুটো ঘাসে খুব ঘষতে শুরু করলেন। নাকের ডগা কুঁচকে গেল। তারপর চেঁচিয়ে বললেন, জগাই! ও জগাই! এখানে আয় তো একবার। দেখাচ্ছি মজা।

বীরু বলল, কী লাগল?

কে জানে? কুকুর না বেড়ালের কীর্তি! স্লিপার দুটো পা থেকে ঝেড়ে ফেললেন মনোরমা।

বীরু হাসতে হাসতে বলল, কুকীর্তি বলুন!

যা বলেছ ভাই। মনোরমা সতর্কভাবে খালি পায়ে কয়েক ফুট দূরে সরে গেলেন। এবার ঘাসের ওপর তীক্ষ্ণ নজর। জগাই, এলি? এবার ডাকটা চেরা গলায়, বেশ জোরেই।

বাড়ির পেছনের দিকে এক বুড়ি বালতি ভরা কিচেনের আবর্জনা ফেলতে যাচ্ছিল। বলল, জগাই পানু বারুইয়ের বাড়ি পান আনতে গেল না দিদিঠাকরুণ?

মনোরমার মনে পড়ল। বললেন, ও। তা কী বলছিলে, ফার্ম হাউস? না, ওর নিজস্ব ব্যাপার নয়। ফার্মিং কো-অপারেটিভ। জনা পনের মিলে ওই করেছে। একসঙ্গে চাষবাস করে আর কী। বোঝোই তো, আজকাল জমিজমা রাখার বড্ড হ্যাঙ্গামা। ল্যাণ্ড সিলিং আইন করেছে। তো সরকারের আর কী! আইন করলেই হল।

বীরু বলল, সেটা কোথায় দিদি?

একটু দূরে। নদীর ওপারে খামার-বাড়ির মতো করেছে। গোডাউন, আপিস ঘর এসব আছে। মেশিনপত্তর আছে। মনোরমা বাড়ির সামনের লনে দাঁড়িয়ে বললেন, যোগো সেক্রেটারি। আসলে কী জানো, আইন থাকলে আইনের ফাঁকও আছে। এই হল মোদ্দা কথা। আমাদের কালিকাপুরের মাঠের সব জমি কো-অপারেটিভে রয়েছে।

মনোরমার দুই চোয়ালের কিছু দাঁত নেই, তা বোঝা যায়। কথা জড়িয়ে যায়। ভাইয়ের মতোই লম্বা চওড়া গড়ন। নাক মুখের আদলও এক। ঠোঁট দুটোও ওই রকম পাতলা। আরও মিল পরিধেয়ের রঙে। উজ্জ্বল সাদা শাড়ি পরেন—যদিও তা বৈধব্যজনিত।

বীরু তার ঘরের দিকে পা বাড়িয়ে হঠাৎ বলল, লালী খেয়েছে?

লালী! এক সেকেণ্ডের জন্য চমকে উঠে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে ছিলেন মনোরমা। পরের সেকেণ্ডে ফিক করে হেসে বললেন, ও মায়ার কথা বলছ? ওর নাম লালী কে বলল? মায়া নাকি?

না। পান্নার কাছে শুনেছিলুম।

মনোরমা একটু কাছাকাছি এগিয়ে সিঁড়ির দিকটা একবার দেখে নিয়ে চাপা গলায় বললে, ওকে লালী বলে ডেকো না কিন্তু। মায়া বলবে।

বীরু স্থির চোখে তাকিয়ে বলল, কেন?

পরে বলব'খন। মনোরমা গলা আরও একটু চেপে বললেন। এমনিতে ও নর্মাল। ভারি শান্ত। ইনটেলিজেন্ট। পড়াশোনাতেও ভাল। কিন্তু মাঝে মাঝে কেমন বদলে যায়।

বীরু বলল, আমারও তাই মনে হচ্ছিল তখন। কোথাও যেন একটু অ্যাবনর্মালিটি আছে।

মনোরমা বীরুর পাশ কাটিয়ে ষড়যন্ত্রসংকুল ভঙ্গীতে বীরুর থাকার ঘরে ঢুকে গেলেন। ইশারায় বীরুকে ভেতরে ডাকলেন। ফিসফিস করে বললেন, দুবছর বয়সে মায়ের সঙ্গ ছাড়া। তারপর থেকে মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। এমন কি মা সম্পর্কে কোনো ধারণাও নেই ওর। তোমাকে বলতে অসুবিধে নেই বলেই বলছি।

বীরু বলল, জানি, যোগব্রতদা কিছু না বললেও পান্নার কাছে সব শুনেছি।

সাত-সাতটা বছর এই বাড়িতে এক রকম নিজের জোরেই কাটিয়েছে। মনোরমা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন। তারপর এলুম আমি। তারপর প্রায় ছ'বছর হয়ে গেল আমার আসা। এ ছ'বছরে যতটা পারি, মায়ের অভাব মেটাবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু মায়ের অভাব মেটানো তো সহজ নয় ভাই। আসলে যা ক্ষতি হবার হয়ে গেছে ওই সাতটা বছরে। যোগো বেশির ভাগ সময় বাইরে কাটায়। মেয়েকে দেখাশোনার লোক নেই। একবারও ভাবে নি, মেয়েটার কী সর্বনাশ করছে? যোগো আমার ভাই বটে ওকে আমি ক্ষমা করতে পারি নে।

বীরু যোগব্রতের হয়ে বলল, কিন্তু মেয়ের পড়াশোনায় ত্রুটি রাখেন নি।

মনোরমা আঙুল খুঁটতে খুঁটতে মুখ নীচু করে বললেন, পড়াশোনার বাইরেও অনেক দায়িত্ব থাকে মানুষের। এমন একটা নিরালা বাড়ি। একেবারে গ্রামের বাইরে। আর ভদ্রলোকের বাড়ির একটা মা হারানো এমন মেয়েকে সঙ্গ দিতে যোগো ছোটলোকের মেয়ে এনে ঢুকিয়েছিল। কিছুদিন যেতে না যেতে পাঁচকথা রটতে লাগল। তখন মেয়েটা চলে গেল। নাকি যোগোই যেতে বলেছিল।

কে সে?

জানি না। শুনেছি।

বীরু একটু চুপ করে থেকে বলল, বউদি, মানে পান্নার দিদি একবারও মেয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেন নি? চিঠিপত্র অন্তত?

না। সে-সব কিছু না।

ভারি আশ্চর্য তো! বিশ্বাস হয় না।

মনোরমা মুখ তুলে বললেন, এসে আমারও বিশ্বাস হয় নি। আশ্চর্য লেগেছিল। কিন্তু চোখের ওপর ছটা বছর কাটল। দেখলুম তো।

আপনার চোখের আড়ালে যোগাযোগ হয়ে থাকতেও পারে। ধরুন, মায়া কলেজ যাতায়াতের পথে বকুলপুরে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে পারে। কিংবা সেভাবেই চিঠিপত্র লেখালেখি হতে পারে।

মনোরমা জোরের সঙ্গে বললেন, না। তা মনে হয় না। তেমন কিছু হলে টের পেতুম।

বীরু ফের বলল, ভারি আশ্চর্য তো!

আসলে ওর মা ভীষণ নিষ্ঠুর মেয়ে। কোল্ড ব্লাডেড। ওদের বংশটাই ওরকম। তুমি তো পান্নার বন্ধু। বলো না পান্না কেমন?

বীরু হাসল অগত্যা। আপনার কথা অস্বীকার করছি না।

তবে? নৃপেনকে তুমি চিনতে কিনা জানি না—

চিনি না। তবে শুনেছি। পান্নাও খুব খাপ্পা ওঁর ওপর।

মনোরমা নিজের কথায় নিজেই চমকে উঠেছিলেন। ক্রিয়াপদে অতীতকাল আপনা আপনি কীভাবে বেরিয়ে এসেছে মুখ থেকে। তারপর শুধরে নিয়ে বললেন, নৃপেন মুখে বড় বড় কথা বলে। আইডিয়ালিজম আওড়ায়। অথচ ওর মতো নীচ, স্বার্থপর, কুচক্রী দেখা যায় না। সত্যি বলতে কী, যোগোর সঙ্গে বউয়ের আইনত শেষ অব্দি ছাড়াছাড়ি হয় নৃপেনের চাপে। প্রথমে দিদিকে সামনে রেখে খোরপোষের দাবিতে মামলা করল। হেরে গেল। ডিক্রি পেল উলটে যোগোই। তখন সেপারেশনের মামলা আনল নৃপেন। আমি তখন এখানে। বছরের পর বছর মামলা হয়েছে। কী কেলেঙ্কারি ভাবতে পারবে না। এটা তো গ্রামাঞ্চল। তবে যোগোর এতটুকু ইচ্ছে ছিল না, ডিভোর্স হোক। আমি জানি, মায়ার মা নিজে থেকে ফিরে এলে অনাদর করত না।

বীরুর কানের ওপর দিয়ে ভেসে গেছে কথাগুলো। সে অন্য কথা ভাবছিল। মনোরমাকে থামতে দেখে বলল, আচ্ছা দিদি, বিকেলের মধ্যে যোগব্রতদা যদি না ফেরেন, আমি কী করব বলুন তো?

এসে যাবে'খন। ভেবো না।

যদি না ফেরেন?

মনোরমা ভাবতে ভাবতে বললেন, কোনো এক সময় তো ফিরবেই। তোমার থাকার অসুবিধেটা কী? তোমাকে তো থাকতেই বলে গেছে। আচ্ছা, তোমার খাওয়ার ব্যবস্থা করি। অন্ততঃ হাত মুখে জল দেবে তো?

বীরু বলল, হ্যাঁ।

কিছুক্ষণ পরে রান্নাঘরের বারান্দায় সাবেকী প্রথায় আসনে বসে বীরু খাচ্ছিল। মনোরমা থামের কাছে দাঁড়িয়ে নব ঠাকুরকে নির্দেশ দিচ্ছিলেন। বীরু আড়চোখে দেখল, ওপাশে একটা ঘরের জানলায় কার মুখ। পুরো তাকাতে গিয়ে ঠকল। মুখটা সরে গেল এইমাত্র। জানলার রডের ফাঁকে শাড়ির আঁচলের একটা অংশ অদৃশ্য হয়ে গেল। আর কে হতে পারে? ঝি মেয়েদের কেউ বলে মনে হয় না। কিন্তু মায়া যদি হয়, তাহলে লুকিয়ে তাকে কিংবা তার খাওয়া দেখার কারণ কী থাকতে পারে? সামনাসামনি দাঁড়াতে বাধা কিসের? মেয়েটা সত্যি অ্যাবনর্মাল।

মনোরমা ঝি-চাকরদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলছিলেন, আমাদের টাউনের বাড়িটা এরাই কিনেছে, বুঝলে নব? সেই কতো সুবিধে হয়েছে। তোমাদের ছোটবাবুর তো প্রায়ই টাউনে ছুটতে হয়। দুটো একটা দিন থাকতেও হয়। আগের মতো নিজের বাড়িতেই থাকে, সেই রকম আদর-যত্ন পায়। আমিও একবার গিয়ে ছিলুম। মনে পড়ছে বীরু?

বীর আনমনে বলল, হ্যাঁ।

তোমার বাবা একেবারে মাটির মানুষ। তোমার মা তো বেঁচে নেই। কোথায় দেশ ছিল যেন তোমাদের?

ফরিদপুর।

তাই শুনেছিলেন যেন। নব হাঁ করে কী দেখছ? আরেকটা মাছ দাও। একমুঠো ভাত দাও।

বীরু ব্যস্ত হয়ে বলল, না। না। আমার খাওয়া হয়ে গেছে।

সে কি! কিছুই তো খেলে না। মনোরমা একটু হাসলেন। আমাদের ঘটিদের রান্না অবশ্য অন্য রকম। সারা বছর—বিশেষ করে এই গ্রীষ্মকালটা আমরা ভীষণ পোস্ত খাই। তার নমুনা তো পেলে।

বীরু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমার জন্ম কিন্তু এ দেশেই। তবে ক্যাম্পে। বাবার তখনও পাত্তা নেই নাকি। মা ভেবেছিল, খুন-টুন হয়ে গেছে। তা জানেন? আমার বয়স যখন নাকি তিন বছর, হঠাৎ বাবা এসে হাজির। অনেক খুঁজে বের করেছেন আমাদের। তবে ওই যে বললেন, বাবা মাটির মানুষ। কথাটা ঠিক না। বাবা অনেক টাকাকড়ি এনেছিলেন। সেই টাকায় তো আপনাদের বাড়িটা কেনা হল।

বীরু হাসছিল না। থামের পাশে সে বালতি থেকে ঘটিতে জল তুলে আঁচাতে থাকল। মনোরমাকে ঘটিটা নেওয়ার সুযোগই দিল না।

মনোরমা বললে, দিনগুলো আজকাল খুব লম্বা। আমার তো কাটে না। যাও। ঘুমোবার অভ্যেস থাকলে ঘুমিয়ে নাও। যোগো এসে যাবে'খন।

ভেতরের ঘরের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বীরুর মনে হল, তার পিঠে কাঁটা বেঁধার মতো এক জোড়া গোপন চোখের দৃষ্টি বিঁধে যাচ্ছে। যখন সে তার ঘরে ঢুকল, তখনও মনে হল, কোন আড়াল থেকে যোগব্রতের মেয়ে সারাক্ষণের জন্য তার ওপর নজর রেখেছে। মেয়েটা সত্যি অ্যাবনর্মাল, নাকি জেনে গেছে বীরু কে? নিছক ভয় মেশানো কৌতূহল? যে চোখে মানুষ হিংস্র জন্তু দেখে, কিংবা বিষধর সাপ, সেই চোখে ভয়ের সঙ্গে কি ঘৃণাও থাকে না সন্তর্পণে?

বীরুর কাছে এ অভিজ্ঞতা নতুন। এই প্রচ্ছন্ন দৃষ্টির অনুসরণ অন্ততঃ কোনো মেয়ের দিক থেকে সে ভাবতেও পারেনি। বরং পেয়েছে বিস্ময় মেশানো প্রশংসা—হয়তো চাপা ভয়ের খাদও থাকে। কিন্তু বীরুর মতো ছেলেরাই তো একালের হিরো। মানুষ যেভাবেই তুমি মারো যেখানেই মারো—ফাঁসিতে, যুদ্ধে, গলির মোড়ে, আসলে মারছ তো একটা মানুষকেই। মানুষ মারাটাই কি যুগে যুগে বীরত্ব বলে গণ্য হয়নি? এখনও হচ্ছে। মানুষ যতদিন বাঁচবে, এমন হবে। কারণ মানুষ হয়ে মানুষ মারাটা খুব সহজ কথা নয়। সব মানুষ তা পারে না। কেউ কেউ পারে। যুদ্ধের নামে একটা দেশের

সব মানুষকে তুমি মানুষ মারতে পাঠাতে পারো। তারা অনেকেই শুধু মরবে—নিছক মারা পড়বে। যারা মারতে পারে, তারা মারবে। মরতে মরতে মারবে।

বীরু টের পেল, যোগব্রতের অনেকদিন ধরে একটা করে বলা শব্দগুলো এখন অর্থপূর্ণ বাক্য হয়ে তার মাথার শূন্য গর্ভে ঝটপট করছে। এই রকম খালিলাগা ভাব আরও দু'একবার হয়েছে বীরুর। এই রকম কানে ঝাঁপধরা বধিরতাও। কিন্তু এবার যেন অবচেতনে একটা ফাঁদে এসে পড়েছে। ওপরে দু'জোড়া তীক্ষ্ণ চোখ ফাঁদের গর্তে একটা জন্তুকে লক্ষ্য করছে।

বীরু শব্দ করে দরজা এঁটে দিল। এ ঘরে একটা নতুন ফ্যান আছে। অতিথিরা এলে হয় তো এ ঘরেই থাকে। কাল রাতে এবং আজ সকালেও কারেন্ট ছিল না। এসেছে কিনা দেখার জন্য সে সুইচ টিপতে হাত বাড়াল। আবহাওয়া মোটামুটি ঠাণ্ডাই বলা যায়। তা ছাড়া পুবদক্ষিণ কোনার ঘর। জানলা আছে অনেকগুলো বড় বড় সেকেলে জানলা, খড়খড়ি দেওয়া। এমনিতেই প্রচুর বাতাস আসে।

ফ্যানটা ঘুরতে লাগল। কারেন্ট এসে গেছে। কিছুক্ষণ ফ্যানটার দিকে তাকিয়ে রইল বীরু। গ্রামে বিদ্যুৎ সে এই প্রথম দেখছে না। কিন্তু ওই লাল রঙের পুরনো, বিচ্ছিন্ন, স্তব্ধ বাড়িটাতে বিদ্যুৎ কেমন অদ্ভুত লাগছে। খাপছাড়া একটা ঘূর্ণিযন্ত্র মাত্র।

বীরু আয়নার দিকে একবার তাকাল হঠাৎ। সকালে দাড়ি কাটার সময় যে চেহারা ছিল, এখন আর তা নেই। শুকনো, রুক্ষ, পাংশুটে দেখাচ্ছে। চোখের তলায় গর্ত, লালচে ছোপ। কাল ছিল কি এমনটি? কে জানে? এক পা এগিয়ে ঝুঁকে সে জিভ বের করে দেখতে থাকল। খাওয়ার সময় টের পাচ্ছিল, কী ঘটেছে। জিভের ডগা সত্যি ছড়ে গেছে—কিংবা জ্বলে গেছে। লাল হয়ে আছে। সেজন্যই ভীষণ ঝাল লাগছিল।

জানলায় এগিয়ে সে থুথু ফেলল। বাগানে এখন মানুষ নেই। কিছুক্ষণ বাগানটা লক্ষ্য করার পর সে সিগারেট ধরাল এবং শুয়ে পড়ল।

কিন্তু একটু পরেই টের পেল, ফ্যানের হাওয়াটা ঠাণ্ডা লাগছে। উঠে গিয়ে ফ্যান বন্ধ করে সে হাতের উলটো পিঠ গলায় ও বুকে ঠেকিয়ে তাপ বুঝতে চেষ্টা করল। জ্বর টর আসছে না তো?

ঘণ্টাখানেক পরে বীরু উঠে বসল। ঠাণ্ডাটা বেড়ে যাচ্ছে। শরীর জুড়ে অস্পষ্ট ব্যথাটা চাগিয়ে উঠেছে ক্রমশঃ। মাথাও ধরেছে একটু। পুরু তাঁতের বেডকভারটা তুলে গায়ে চাপাল সে। কাল রাতে ঝড়ের পর বৃষ্টির মধ্যে পান্নার সঙ্গে অন্ধের মত কত কিলোমিটার মাঠ জঙ্গল ভেঙে এখানে পৌঁছেছে, জানে না। জ্বর আসতেই।

স্বপ্ন, নাকি স্বপ্ন নয়। বীরুর মনে হল, সে মোবারককে দেখতে পাচ্ছে। মোবারকের পেছনে আরও একজন দাঁড়িয়ে আছে। তাকে বীরু চেনে। মোবারক জানলায় উঁকি দিচ্ছে। তার একটা হাত জানলার রডে। কবজিতে বালাটা অসম্ভব ঝকঝক করছে। বীরু খুব ভয় পেয়ে গেল। মোবারক জানল কী ভাবে, সে এখানে আছে?

মোবারক বলল, দরজা খুলে দে বীরু। ভেতরে যাব।

বীরু বলল না, না। তোকে দরজা খুলব না। তুই আমাকে মারতে এসেছিস।

মোবারক বলল, দরজা খোল বীরু। ওরা তাড়া করছে।

বীরু বলল, না।

ভেঙে ফেলব বীরু। উড়িয়ে দেব বলে দিচ্ছি। দরজা খোল্।

বীরু চোখ বুজে চেঁচিয়ে উঠল, না না না। তারপর বাড়িটা শব্দ করে কাঁপতে থাকল। ঝড়ের মত কিছু জোরালো তোলপাড় শুরু হল।

বাবুদাদা! ও বাবুদাদা!

বীরুর মনে হল, গলার স্বরটা মোবারকের নয়। অচেনা। অলীক উপদ্রব আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। বাবুদাদা! ও বাবুদাদা! খুব ব্যাকুলতা আছে কণ্ঠস্বরে। কে তাকে এমন করে ডাকতে পারে? বীরু ভয়ে ভয়ে চোখ খুলল। জানলায় মেবারক নয়, জগাই। তার থ্যাবড়া খসখসে বাকলের মত

হাতের মোটা আঙুলগুলো জানলার রডে। তার তোবড়ানো মুখে আতঙ্ক মেশানো হাসি। হেই গো বাবুদাদা, স্বপন হচ্ছে নাকি?

বীরু উঠে বসল। প্রচণ্ড শীত। মাথার খালি খোলে এখন জমাট পাথর ঠাসা। গুরুভার মাথার চাপে ধড়টা চেপ্টে যাচ্ছে। গলা শুকনো। লাল চোখে সে জগাইকে দেখতে থাকল।

এ কী গো বাবুদাদা? জ্বরজ্বারি নাকি? গায়ে ঢাকনা কেন গো?

বীরু টলতে টলতে এগিয়ে দরজা খুলে দিল। জগাই বারান্দা ঘুরে বসার ঘরে এ ঘরে আসা পর্যন্ত সে কপাট ধরে অপেক্ষা করল। তারপর বলল, জল খাব।

জগাই কোণার টেবিল দেখিয়ে বলল, ওই তো জগে জল রেখে দিয়েছি বাবুদাদা।

বীরু দেখে বলল, ঢেলে দাও।

জলটা ঢকঢক করে খেয়ে সে ফের বেডকভার জড়িয়ে শুয়ে পড়ল। জগাই তার মুখের দিকে তাকিয়ে থ্যাবড়া খসখসে হাতটা কপালে রাখল একবাব। বলল, হুঁ। বেরত্ত জ্বর। শুয়ে থাকুন। মা ঠাকরুণদের বলি গে। টাউনের ছেলে, ঝড়জল কি কখনও গায়ে নিয়েছে?

বীরু আর চোখ বুজতে পারছে না। সত্যিকার একটা স্বপ্ন কিনা তাও বুঝতে পারছে না। কিন্তু মোবারক তাকে মারবে কেন? তা ছাড়া পান্না বা সে ওকে বলেও নি কোথায় যাচ্ছে। জগাই বেবিয়ে গেলে সে নিরাপত্তার জন্য দরজাটা ফের বন্ধ করবে ভাবল। কিন্তু ফের ওঠা কষ্টকর। অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে বীরু নিজের সত্যাসত্যময় অথবা অলীক হত্যাকাণ্ডের প্রতীক্ষা করতে থাকল।

তখন মোবারক বকুলপুর বাজারে 'হ্যানিম্যান ফার্মেসি'তে বসে আছে। রজনী ডাক্তার শহরে গেছেন। তাঁর ছেলে শচীন এখন ডাক্তার। চ্যাপটা গড়নের কালো কুচকুচে যুবক। এই বয়সেই বায়ুদোষে চুলে পাক ধরেছে। তার বোকাটে স্বভাবের জন্য কিছু বন্ধু জোটে। বই খুলে কিছুক্ষণ পড়াশোনার পব বলল, কার্বোভেজ থাউজেণ্ড এক্স। দেখবি, মিরাকল্‌ হয়ে গেছে। আমি ভাই অলওয়েজ হাই পাওযারেব পক্ষপাতী।

মোবারক বলল, দেখিস শোচে, অবেলায় কাফন কিনতে হয় না যেন। আজ বন্‌ধ।

স্বপন ওরফে টাইগার চোখ পাকিয়ে বলল, বন্‌ধে খুলে রেখেছে শোচে। তপুরা দেখে গেছে। সাবধান।

শচীন উঠে আলমারি খুলল। বলল, ওষুধের দোকান ছাড়।

মোবারক একটু ঝুঁকে রাস্তা দেখে নিয়ে বলল, এমন সাকসেসফুল বন্‌ধ কিন্তু আজ পর্যন্ত হয়নি বকুলপুরে। সব পার্টি মাইরি আজ এক রা। লক্ষ্য করেছ টাইগারদা?

স্বপন ঠোঁটে চোঙ বানিয়ে কয়েকটা মোটা শিস দিয়ে বলল, শোচে! বডি-ফডি এলে শোক মিছিল বেরুবে। দোকান বন্ধ করে জয়েন করবি। শালা, তোকে যদি না দেখি শোক মিছিলে, তোর বাপের ফার্মেসি উড়িয়ে দেব।

এবার শচীন কাঁচুমাচু মুখে বলল, খুলতুম নাকি? এই নেড়েটা এসে খোলাল। খাপি খাচ্ছে ব্যাটা!

ছোট্ট বারান্দায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে সিগারেট টানছিল অজয়েন্দু। গায়ে নকশাদার গুরু পাঞ্জাবি, পরনে চুস্ত পাজামা। গলায় সরু সোনার চেন আছে। বলল, টাইগারদা, শুনলুম শোক মিছিল বেরুবে না।

স্বপন গোঁফের ডগা পাক দিয়ে বলল, কয় কেডা?

মোবারক বলল, উরে শালা! ও হচ্ছে এম. এল. এ.-র ভাই। ওর সোর্স কারেক্ট।

তুই আমাকে শালা বললি?

মোবারক ঝটপট হেঁট হয়ে টেবিলের কানাচে ঝুঁকে স্বপনের পা ছোঁবার চেষ্টা করে বলল, আই গুরু! মেরে রাজা! মেরে লাল! মেরে লাল! মাফ করে দাও। ফসকে গেছে।

শচীন যত্ন করে ওষুধের গুলি মোড়কে পুরছিল। বলল, অজয়েন্দু! হ্যাঙ্গামা বাধবে না তো? তোর সোর্স পাকা। আগেভাগে জানিয়ে দিস ভাই।

স্বপন বুঝি শোক মিছিল নিয়ে কিছু ভাবছিল। বলল, তপু কিন্তু বলল—যে যাই বলুক, বের করব।

কী? অজয়েন্দু তাকাল।

শোক মিছিল। শ্মশান অব্দি বডির সঙ্গে মিছিল যাবে। ফিরে এসে চৌমাথায় একটু মিটিং-ফিটিংও হবে। তপু বলল, এ প্রোগ্রাম ক্যানসেল করবে না। যত রাতই হোক আর যত বাধাই দিক। অন্ততঃ আজ একটা দিন আমরা ঝগড়া ভুলে এককাট্টা হব।

মিনিস্টার নিষেধ করেছে দাদাকে। ডি. এম. এস. পি. সবাই বলেছে, এখন ওসব করবেন না। অজয়েন্দু বলল। ল অ্যাণ্ড অর্ডার প্রব্লেম বাধবে।

মোবারক ওযুধ নিয়ে নেমে গেল রাস্তায়। স্বপন বেরিয়ে আড়ামোড়া দিতে দিতে হাই তোলার সঙ্গে ডাকল, মোবা! দাঁড়া।

মোবারক দাঁড়ালে স্বপন এক লাফে নেমে গিয়ে তার কাঁধে হাত রেখে হাঁটতে থাকল। নারানদার সঙ্গে দেখা হয়েছে রে? আমি তো চারটে অবধি ঘুমোচ্ছিলুম। গিয়ে শুনলুম, বেরিয়েছে।

মোবারক বলল, আমিও ঘুমোচ্ছিলুম। শালা কানের ঝাঁপ কিছুতেই খুলছে না।

ওই গুলি দিয়ে ঝাঁপ ছাড়বি বাঞ্চোৎ? দেখি, দেখি। বলে স্বপন ওর শার্টের বুক-পকেট থেকে মোড়কটা বের করে নিল। মোবারক বাধা দেবার আগেই স্যাণ্ডেলের তলায় ঘষটে দিল।

মোবারক তার পায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, টাইগারদা!

কী বে?

তোমার চটি বদলে গেল কেন গো?

স্বপন গলার ভিতর হেসে বলল, বাগানের ভেতর না রাস্তায় কোথায় পড়ল মাইরি! খেয়াল নেই। রমাকে খুঁজতে পাঠিয়েছিলুম। এসে বলল, নেই।

সর্বনাশ হয়ে গেছে তাহলে।

স্বপন ওপর কাঁধ আঁকড়ে বলল, আমার...(অশ্লীল) হয়েছে। ছাড় বে। মঞ্জুকে বিয়ের আগেই বিধবা করতে পেরেছি—এজন্যে শালা যা হবার হোক। চল্, তপার কাছে যাই! শোক মিছিলের জন্যে তলায় হাওয়া দিই গে।

স্বপন হাসতে লাগল। মোবারক হাসতে পারছিল না।

সাত

এ রাতে বকুলপুরে বিদ্যুৎ আছে। সাব-স্টেশনের লোকেরা সকালেই তাড়াহুড়ো ছেঁড়া তার জুড়ে খুঁটি-খাম্বা খাড়া করে লাইন মেরামত করেছিল। ট্রান্সফর্মার জ্বলে যায় নি ভাগ্যিস!

বিজয়েন্দু সবে ফিরে ওপরের ঘরে ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে এদিনের কাগজ পড়ছিলেন। নিবারণ পর্দার ওপাশ থেকে বলল, স্যার!

আবার কী? বিজয়েন্দু খাপ্পা হয়ে বললেন। বলা আছে বড্ড ক্লান্ত। কারুর সঙ্গে দেখা হবে না। নেহাত পার্টির যুব নেতারা কেউ এলে ভিন্ন কথা। কিন্তু তারা কেউ এ রাতে আর আসবে না। কথা যা হবার হয়ে গেছে।

নিবারণ বলল, কাল্কেপুরের যোগোবাবু স্যার!

কে? বিজয়েন্দু ব্যস্তভাবে কাগজ মুড়তে থাকলেন।

আজ্ঞে যোগোবাবু।

অ। বসতে বল্। আলো জ্বেলে ফ্যান খুলে দে। যাচ্ছি।

বিজয়েন্দু বেঁটে নাদুসনুদুস গড়নের মানুষ। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। কিন্তু চুলগুলো এরই মধ্যে সাদা হয়ে গেছে। গায়ের রঙ চকচকে শ্যামবর্ণ। গোলগাল প্রকাণ্ড মুখমণ্ডল। গোঁফ দাড়ি পরিষ্কার কামানো। ইজিচেয়ার থেকে উঠতে একটু কষ্টই হল। উঠে টেবিলে রাখা চুরুটের বাক্স্ থেকে একটা চুরুট নিলেন। লাইটার জ্বেলে ধরিয়ে বুঝলেন, ভুল হয়েছে। জামা পরতে হবে। পরনে খালি পাজামা আর গেঞ্জি। তাই জ্বলন্ত চুরুটটা অ্যাশট্রেতে রেখে পাঞ্জাবি চড়ালেন। তারপর চুরুট কামড়ে পায়ে চটি গলিয়ে নিয়ে বেরুলেন।

সিঁড়িতে নামতে নামতে সাড়া দিলেন, বসো যোগো। আসছি।

যোগব্রত সোফায় গা মেলে বসেছেন। মাথা সোফার কিনারায়, মুখটা চিত। বললেন, মোহনপুর ঘাটে শ্মশানে গিয়েছিলুম। শুনলুম তুমি চলে গেছ! ভাবলুম একবার দেখা করে যাই।

বিজয়েন্দু মুখোমুখি বসে বললেন, হ্যাঁ। জাস্ট মিনিট পনের হল ফিরেছি। বডিগুলো আর বকুলপুরে আনতে দিই নি। মোহনপুরের ঘাটেই দাহের ব্যবস্থা করেছিলুম। ছেলেরা খুব ক্ষুব্ধ। কিন্তু কী করব? বড্ড রিস্কি হত। ল অ্যাণ্ড অর্ডারের প্রব্লেম দেখা দিত হয় তো।

যোগব্রত সোজা হয়ে বসে বললেন, তোমার গলা ভেঙে গেছে।

বিজয়েন্দু হাসলেন। ধকলে। সেই সক্কালে গেছি। অমলবাবুকে ধরতে পারলুম না।

কাকে?

মিনিস্টার। বিজয়েন্দু হাত বাড়িয়ে অ্যাশট্রে কাছে রেখে বললেন। ট্রাঙ্ককলে পরে কথা হয়েছে। বললেন, আই. জি.-কে বলে দিচ্ছেন। হোম সেক্রেটারিকে পারসু করতে বলবেন। যাক্ ওসব কথা। তোমার পাত্তা নেই কেন?

যোগব্রত বললেন, চাষাভুষা মানুষ। এ-গাঁ ও-গাঁ ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম। হঠাৎ শুনলাম ব্যাপারটা।

বিজয়েন্দু ঠোঁটের একপাশে বাঁকা রেখা ফুটিয়ে বললেন, সাংঘাতিক ঘটনা। আমার তো ভাই কাঁপুনি যাচ্ছে না। এ কী অবস্থা হচ্ছে দিনে দিনে! আমরা চলেছি কোথায়?

যোগব্রত সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন। বললেন, কী মনে হচ্ছে তোমার?

মনে কী হবে? বিজয়েন্দু ভাঙা কণ্ঠস্বর চাপতে গিয়ে অস্বাভাবিক করে ফেললেন। ওপারের মুসলমানরা মুক্তি যুদ্ধ করবে, না আমাদের কাঁধে এসব উটকো আপদ এসে জুটবে। তুমি তো তখন রিলিফের কাজকর্ম করেছ। নিশ্চয় দেখেছে, কী সব ঘটেছে। হিউজ আর্মস অ্যাণ্ড অ্যামুনিশনস পাচার হয়ে এসেছে ওই সময়। তখন তো আমরা বোরখা দেখেই মজে গিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছি, বোরখার আড়ালে মুখটা কেমন ভাবিই নি। এবার ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারছি।

যোগব্রত সিগারেট ধরিয়ে আনমনে বললেন, বাবলবুনিয়া গিয়েছিলুম। মনে হল, উত্তপ্ত অবস্থা।

বিজয়েন্দু পলা বসানো আংটিপরা হাতটা নেড়ে বললেন, খামোকা ওরা উত্তেজিত হচ্ছে কেন? এর রুট ওখানে নয়। অন্যত্র।

নিষ্পলক চোখে তাকালেন যোগব্রত। তাই বুঝি?

জাস্ট অ্যান আইডিয়া। পুলিসের অ্যাংগল আমি জানি না। বিজয়েন্দু মুখ নীচু করে চুরুটের ছাই ফেললেন। মনে হচ্ছে মধুদার কোন ওল্ড এনিমির কাজ। কোয়াইট নন-পলিটিক্যাল ব্যাপার। আসলে টার্গেট ছিল মধুদা।

যোগব্রত খুকখুক করে হাসলেন। এখন তোমরা তো এ থেকে পলিটিক্যাল মুনাফা তুলবে।

নো, নো। নেভার! বিজয়েন্দু জোরে মাথা দোলালেন। এ নিয়ে পলিটিকস করতে গেলেই কেলেঙ্কারি। পার্টি চোট খাবে। ঘরে-ঘরে বেধে যাবে। দরকার কী ভাই? তার চেয়ে পুলিস যা ভাল বোঝে করুক। আমরা ইন্টারফেয়ার করব না।

হুঁ। যোগব্রত ফের আধশোয়া হয়ে একটা পা সোফার অন্য প্রান্তে তুলে দিলেন।

বিজয়েন্দু তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। যাক্ ওসব কথা। বলে এবার মিটিমিটি হাসলেন।

যোগব্রত বললেন, হাসছ যে?

একটু অন্য কথাবার্তা বলি। জাস্ট ফর রিলিফ।

বলো।

তোমার খবর কী?

কী খবর? তেমনি—অ্যাজ ইট ইজ।

ধুস্! তোমার সেই—কী যেন নাম সেই যে...বিজয়েন্দু প্রকাণ্ড শরীর দুলিয়ে চাপা হাসতে থাকলেন। যোগো! তুমি মাইরি দেখালে!

কী দেখালুম বলো তো?

চণ্ডীদাসী কীর্তি। যদিও হলপ করে বলতে পারি তোমার ব্যাপারটা নিকষিত হেম নয়।

যোগব্রত নির্বিকার মুখে বললেন, ও। তুমি ক্ষমার কথা বলছ?

এই তো মনে পড়েছে। ক্ষমা! কী নাম! বলে বিজয়েন্দু চোখ নাচালেন। এই! এলে যখন একহাত বসা যাক্। মাথাটা ভোঁভোঁ করছে। আই ওয়ান্ট টু ফরগেট এভরিথিং। নিবারণ! ও নিবারণ!

নিবারণ বাইরের বারান্দার রোয়াকে বসেছিল। বলল, স্যার!

ও ঘরের টেবিলের ড্রয়ার থেকে দাবার ছকটা নিয়ে আয়। কৌটোটাও। আর শোন, গিন্নীমাকে গিয়ে খবর দে, কালিকাপুরের যোগোবাবু এসেছেন। আপাততঃ চা...থেমে বিজয়েন্দু যোগব্রতের দিকে ঘুরলেন। কিছু খাবে?

যোগব্রত নিঃশব্দে মাথা দোলালেন।

বিজয়েন্দু ফুলো-ফুলো চোখে বালচাপল্য ফুটিয়ে বললেন, একটা শর্ত। খেলা জমে গেলে উঠতে দেব না। অর্থাৎ তোমার এ রাতে ফেরা হবে না। দুমুঠো খেয়ে শুয়ে পডবে। তাছাড়া যে অবস্থা দেখলে, রাতে নাই বা ফিরলে?

যোগব্রত কোনো কথা বললেন না।

নিবারণ দাবার গুটি ও ছক এনে দিলে বিজয়েন্দু বললেন, বাইরের দিকে জানলাগুলো বন্ধ করে দে। দরজাটাও। তারপর ওপরে গিয়ে বলে আয় যোগোবাবু খাবেন। এবং থাকবেন। বলে এসে . শোন্ না হতভাগা। পা বাড়িয়েই আছে। ফিরে এসে ও ঘরে বিছানাটা রেডি রাখবি। মশারি না থাকলে ওপর থেকে এনে খাটাবি। আর ইয়ে—যোগো! তোমার বাহন এনেছ নাকি?

হুঁ।

নিবারণ, শোন। বাবুর গাড়িটা...

যোগব্রত বাধা দিয়ে বললেন, থাক্ না। গেটের ভেতরেই রেখেছি। পরে দেখা যাবে।

অলরাইট। নিবারণ! এব পব তোর কাজ কী হবে বাবা, বুঝতে পারছিস?

নিবারণ মাথা দোলাল।

বুঝিস নি। পাশেই সদর রাস্তা। আজকাল আস্ত মোটবগাড়ি উবে যাচ্ছে, তো মোটব সাইকেল। তুই রোয়াকে বসে নজর রাখবি।

নিবারণ বলল, আর চা?

হ্যাঁ। চাও আনতে হবে, বাবা। গুটি সাজাতে সাজাতে বিজয়েন্দু নেশার ঘোরে অমায়িক ভঙ্গীতে বললেন। ইতিমধ্যে কেউ দেখা করতে এলে বলবি স্যার শুয়ে পড়েছেন। কেমন? আণ্ডারস্ট্যাণ্ড নিবারণ?

নিবারণ ঘাড় নেড়ে চলে গেল।

এস যোগো! খুব মাইগুফুলি খেলবে। চটিও না।

যোগব্রত বুঝতে পারছিলেন নার্ভাস ক্লান্ত ভীত বিজয়েন্দু একটা বড় রকমের রিলিফ চাইছেন।

পরমেশ্বরী ভেতরের দরজার পর্দা তুলে নিঃশব্দে ঢুকেছিলেন। দীর্ঘ দু'মিনিট স্থির দাঁড়িয়ে যোগব্রতকে দেখার পর বললেন, আর কতক্ষণ চলবে তোমাদের? সাড়ে এগারোটা বাজে।

যোগব্রত তাকালেন। তারপর সোজা হয়ে বসে বললেন, আরে! বউদি যে! পেন্নাম হই।

রসিকতায় কান করলেন না পরমেশ্বরী। অবশ্য যোগব্রত জানেন বিজয়েন্দুর স্ত্রী বরাবর এরকম রাশভারি সিরিয়াস প্রকৃতির মহিলা। শরীরের বেড় স্বামীর মতো, কিন্তু মাথায় লম্বা কিছুটা। রংটাও ফর্সা। চুলে সামান্য পাক ধরেছে। চওড়া নকশাপাড় সাদা শাড়ি পরনে, ব্লাউসটাও সাদা। কানে মুক্তোর দুল, গলায় মিহি লকেট হার এবং দু'হাতে সোনার কাঁকন পরেন। চলাফেরায় আভিজাত্য বজায় রাখেন। ডাকলেন, নিবারণ! বাবুদের ছক তুলে রাখ।

বিজয়েন্দু বিব্রত মুখে বললেন, এই দানটা অন্ততঃ। জাস্ট পাঁচ মিনিট।

না। ওঠ তো!

যোগব্রত অভিমান দেখিয়ে বললেন, বউদি আমার সঙ্গে কথাই বললেন না। কোন মুখে বউদির হাতে খাব?

পরমেশ্বরী তবু হাসলেন না। বললেন, খিদে থাকলেই খাবেন। আসুন তো। আর ঝামেলা করবেন

না। ঘুম পাচ্ছে।

বিজয়েন্দু অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে বললেন, তুমি খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লেই পারতে! বরাবর দেখেছ, আমার বারোটার আগে খাওয়া হয় না। তবু খামোকা...

পরমেশ্বরী ঘরে পা বাড়িয়ে বললেন, কথা বাড়িও না। যোগোবাবু আসুন! ও ভাষণ দিক ততক্ষণ।

ওপরেব বারান্দায় মস্তো ডাইনিং টেবিল। ফ্রিজের ওপর দাম্পত্য ফোটোগ্রাফ। যোগব্রত বহুবার খেয়েছেন এবাড়ি। বিজয়েন্দু স্কুলে ও কলেজে তাঁর সহপাঠী ছিলেন। পরে বিজয়েন্দু কলকাতায় থেকে এম. এ. এবং ল পাস করেন। ক'বছর ওকালতিও করেছিলেন। সেই সময় রাজনীতিতে ঢোকেন। পর পর দুটো ইলেকশানে বকুলপুর কেন্দ্র থেকে প্রচুর ভোটে জিতেছেন।

ওরে বাবা! এত সব আয়োজন! যোগব্রত চোখ বড় করে বললেন। তাছাড়া আমি চাষাভুযো মানুষ। লুচি ভাল লাগে না। দু'বেলা ভাতই খাই।

দু'বেলা ভাত! বিজয়েন্দু আঁতকে উঠলেন। এ বয়সে দু'বেলা ভাত! তোমার মাথা খারাপ নাকি?

প্রিমিটিভ লাইফ ব্রাদাব। যোগব্রত গর্ব প্রকাশ করলেন। বিশুদ্ধ রোদ, বাতাস, নির্ভেজাল খাদ্য এবং প্রচুর শারীরিক পরিশ্রম। তাছাড়া কখন কোথায় কী খাচ্ছি, তারও ঠিক নেই। দুপুরে আজ বাবলবুনিয়ায় এক মুসলমানবাড়ি খেয়েছি।

পরমেশ্বরী বললেন, ভাত খাবেন তো ভাতও আছে। দিচ্ছি।

যোগব্রত বললেন, না না। আজ লুচিই খাব।

দু'জনে খাচ্ছেন। পরমেশ্বরী গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। একটু পরে বললেন, মধুবাবুর ড্রাইভারের ভাইপো এসেছিল দু'বার। ওদের একটা ব্যবস্থা করে দিও—যা হয় কিছু। ড্রাইভারের বউ নাকি ভীষণ অসুস্থ। পাড়ার ছেলেরা হাসপাতালে দিয়েছে।

বিজয়েন্দু হাত তুলে বললেন, শুনেছি। কথা হয়েছে।

মধুবাবুর বাড়ি গিয়েছিলুম।

তাই বুঝি? ভাল করেছ। সকালে একবার যাব।

মেয়েটা বারবার ফিট হচ্ছে। ওর মায়ের দিকে তাকানো যাচ্ছিল না। কিছুক্ষণ বসে থেকে চলে এলুম। বাড়িভর্তি আত্মীয়স্বজন—ভিড়ে থইথই করছে। পরমেশ্বরী রেলিং-এর দিকে এগিয়ে গেলেন। একটা ব্যাপার বড্ড আশ্চর্য লাগল, জানো?

কী বলো তো? বিজয়েন্দু লুচির টুকরো মুখে পুরতে গিয়ে থামলেন।

লোকগুলো যেন মজা দেখতেই এসেছে। মা-মেয়েকে সামলানোর দিকে মন নেই কারুর। মঞ্জুর ছোট ভাইটার বয়স তো মোটে বছর দশেক। সে বেচারা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। ওকে কেউ দেখছে না।

তাকে তো মুখাগ্নি করতে নিয়ে গেছে দেখলুম তখন।

হ্যাঁ, আমি যাওয়ার একটু পরে নিয়ে গেল।

বিজয়েন্দু মুখ তুলে খাদ্য চিবিয়ে গেলার পর বললেন, ইয়ে—বীরেনদের বাড়ি যাও নি?

যোগব্রত খাদ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে চুপচাপ খাচ্ছেন। তাঁর দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে নিয়ে পরমেশ্বরী বললেন, গিয়েছিলুম। বনি একা ছিল।

একা থাকবে কেন? ওদের বাড়িতে থাকার জন্য তপনদের বলা ছিল। ছিল না কেউ?

পরমেশ্বরী বিরক্ত হয়ে বললেন, ওরা কি বনিকে ঘিরে বসে থাকবে? ওরা বাইরের ঘরে ছিল।

তাই বলো। বনি নিশ্চয় খুব ভেঙে পড়েছে। আহা, বেচারা!

পরমেশ্বরী ফুঁসে ওঠা স্বরে বললেন, না। বনিকে জান না? ওর মতো শক্ত মেয়ে ক'টা আছে তোমাদের বকুলপুরে? তাছাড়া ভেঙে পড়ার কী আছে ওর? বাজে কথা বোলো না।

বিজয়েন্দু তক্ষণি সজাগ হয়ে যোগব্রতের দিকে দ্রুত তাকিয়ে নিলেন। যোগব্রত নির্বিকার মুখে খাচ্ছেন। বিজয়েন্দু বললেন, আচ্ছা, পান্নাটা গেল কোথায়? কেউ বলতে পারল না। বীরেনকে অবশ্যি জিজ্ঞেস করা হয়নি। মনে ছিল না।

পরমেশ্বরী আস্তে বললেন, বনি বলল, পান্নার চাকরি হয়েছে কোথায় যেন। পরশু চলে গেছে।

পান্নার চাকরি হল, আমি জানাতে পারলুম না? বিজয়েন্দু অবাক হয়ে বললেন।

এতক্ষণে পরমেশ্বরীর ঠোঁটের কোণায় হাসি দেখা গেল। হাসিটা বাঁকা। বললেন, সবার চাকরি তো এম. এল. এ.-কে ধরে হয় না। পান্নার অন্য সোর্স আছে। হয়েছে।

যোগব্রত মুখ তুলে পরমেশ্বরীর দিকে তাকালেন। বিজয়েন্দু হাসতে হাসতে বললেন, সোর্সটা কে?

অত জানি না। বনি বলল, চাকরি হয়েছে পান্নার। ওটুকুই জানি।

তাহলে তো ওকে খবর দেওয়ার দরকার ছিল!

বীরেনবাবু নিশ্চয় দিয়েছেন। তোমার অত বেশি ভাবতে হবে না! বলে পরমেশ্বরী এগিয়ে এলেন টেবিলের কাছে। যোগোবাবু, লুচি ঠাণ্ডা হয়ে যায় নিতো? আর দুটো নিন।

যোগব্রত বললেন, দিন। সারাদিন ঘুরেছি, বারবার খেতে ইচ্ছে করবে।

পরমেশ্বরী চুপচাপ চারটে লুচি তাঁর থালায় তুলে দিলেন। খানিকটা মাংসও বাটিতে ঢাললেন। আপত্তি করলেন না যোগব্রত। বিজয়েন্দুর খাওয়া শেষ। চেয়ারে একটু ঢিলে হয়ে বসে বারান্দার ওধারে রাতের আকাশ দেখার চেষ্টা করছিলেন। দেখতে পাওয়া কঠিন। বকুলপুরের এদিকটায় বসতি হয়েছে গত বিশ পঁচিশ বছর ধরে। আগে পোড়ো মাঠ আর আগাছার জঙ্গল ছিল। বেশির ভাগই বাইরের লোক এসে বাড়ি করেছে। অবাঙালীও কম নেই। বকুলপুর ধনেজনে ফুলছে ফাঁপছে দিনে দিনে। শুধু সাবেকী এলাকা কতকটা তেমনি আছে। বনশোভাদের পাড়াটায় ফাটা নোনাধরা দেয়ালের পুরনো বাড়ি, গোলকধাঁধার মতো গলি, রোয়াকে বুড়ো বুড়িরা ঝিমোয়। তরুণরা সকাল থেকে সন্ধ্যা এই 'গ্রামনগরী'তেই চরে বেড়ায়। আদ্যিকালের গুহায় সারারাত বড় শ্বাসকষ্ট। প্রান্তরে ঘুরে বাতাস নেয়।

বিজয়েন্দু আপন মনে বললেন, ছেলেরা খুব চটে গেছে শোক মিছিল হল না বলে। আরে বাবা, বন্ধ তো হল। আর কী? ভাবছি কিছুদিন যাক। কমিউনিটি সেন্টারে একটা শোকসভা করা যাবে। হলের ভেতর হবে। কমপ্লিটলি নন ভায়োলেন্ট। যোগো, তুমি আমাদের কমিউনিটি সেন্টারটা দেখনি। নাকি দেখেছ?

যোগব্রত বললেন, দূর থেকে দেখেছি।

মাই গুডনেস! সেন্টার ওপেনিংয়ের দিন কোথায় ছিলে? বিজয়েন্দু সোজা হয়ে বসলেন। সেন্ট্রাল মিনিস্টার দিয়ে ওপেন করালুম। তুমি আসনি? তুমি মাইরি নাম্বার ওয়ান কালপ্রিট। একেবারে দেশদ্রোহী।

যোগব্রত হাড় চুষতে চুষতে বললেন, তোমার একটা মহৎ গুণ বিজয়েন্দু। তুমি খুব সহজে মন থেকে জঞ্জাল কুড়িয়ে ফেলতে পারো। সেন্ট্রাল মিনিস্টার আমার ফার্মিং কো-অপারেটিভেও পায়ের ধুলো দিয়েছিলেন সেদিন। তুমি সঙ্গে ছিলে। আমি তোমারটা দেখতে আসব, না তোমার আমারটা দেখতে যাবার কথা ছিল?

বিজয়েন্দু ভাঙা গলায় খ্যাক খ্যাক করে হাসতে লাগলেন। হ্যাঁ, তাই বটে। বাই দা বাই, কমিউনিটি হলটা হয়ে ছেলে-মেয়েদের নেশা ধরে গেছে। হরদম ফাংশান আর এঁর জন্মদিবস, ওঁর মৃত্যুদিবস। এবার নাকি আষাঢ়স্য প্রথম দিবস করবে। ভাবা যায়? দেশে এই অবস্থা—আর আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে যক্ষের বিরহ বেদনা।

পরমেশ্বরী বাঁকা মুখে বললেন, ঠাট্টার কী আছে? স্কুলের ছেলে-মেয়েরা মিলে মেঘদূত নৃত্যনাট্য করবে। ওদের কচি মগজে তোমাদের ওই কদর্য জিনিসগুলো যাতে না ঢোকে সেই চেষ্টাই তো করছি।

বিজয়েন্দু নরম হয়ে বললেন, না না। ঠাট্টা করব কেন? এসব করবে বলেই তো অত ছোটাছুটি করে কমিউনিটি সেন্টারের টাকাকড়ি দিয়ে ফাংশান করিয়েছিলুম। যোগো, তুমি কি জানো সেন্টারের একটা কমিটি আছে, যার প্রেসিডেন্ট শ্রীমতী পরমেশ্বরী দেবী?

যোগব্রত পরমেশ্বরীর দিকে তাকিয়ে বললেন, তা হলে তো প্রতিটি ফাংশানে আসব। বউদি, কার্ড দেবেন?

পরমেশ্বরী বললেন, আমরা কার্ড-ফার্ড করি নে। হাটবারে ঢোল সহরত করে দিই আর কিছু হাতে লেখা পোস্টার টাঙিয়ে দিই।

আমাকে আপনি এত অপছন্দ করেন কেন বলুন তো? যোগব্রত হাসতে হাসতে উঠলেন। বারান্দার একধারে কিচেনের দরজা। তার পাশে বেসিন। ট্যাপ খুলে হাত ধুতে থাকলেন। বিজয়েন্দু পাশে এসে

দাঁড়িয়েছেন।

পরমেশ্বরী বললেন, বাড়ি বয়ে এসে অপমান করতে আপনার জুড়ি নেই।

সেকি!

ওই যে বললেন, অপছন্দ করি।

জিভ কেটে যোগব্রত বললেন, সরি। ভেবে কিছু বলি নি।

বিজয়েন্দু চোখ নাচিয়ে বললেন, লক্ষ্য করেছি—যতবার যোগো এসেছে, দুজনে এই রকম বাঁকা তীর ছোড়াছুড়ি। ব্যাপারটা কী বলো তো যোগো? অতীতকালে কি তোমাদের কোনো কানেকশান ছিল—যা আমি আদৌ অবগত নই?

পরমেশ্বরী নির্বাক। টেবিল থেকে বাড়তি মাংসের বড় বাটিটা তুলে ফ্রিজে ঢোকালেন। যোগব্রত বললেন, ওদের বাড়ি কলকাতার সেই পাইকপাড়ায়—কস্মিনকালে যেখানে যায় নি। এমন কী তোমার বিয়ের নেমন্তন্নও খাই নি। যদিও মনে পড়ছে, একটা কার্ড পাঠিয়েছিলে। পৌঁছেছিল লেটে।

হঠাৎ পরমেশ্বরী বললেন, আগেও বলেছিলুম, এবারও বলছি, আপনার মেয়েকে একদিন নিয়ে আসবেন। এবার একা এলে দরজা মুখের ওপর বন্ধ হয়ে যাবে! 'মেঘদূত' ফাংশানের দিন আসুন। সকাল থেকে আমার কাছে থাকবে।

বিজয়েন্দু বললেন, ওর মেয়েকে কি তুমি দেখেছ?

না।

আমি দেখেছি বারকতক। মানে কালিকাপুরে ওদের বাড়িতেই। অসাধারণ ফুটফুটে সুন্দরী। বিজয়েন্দু অম্লান বদনে বললেন পুত্রবধূ করাব মতো। আমার মনে...

যোগব্রত সিগারেট ধরাতে ধরাতে কথা কেড়ে বললেন, আমি তোমার বেয়াই হতে পারি? চাষাভুষো মানুষ।

ঝি মেয়েটি টেবিল সাফ করতে এল। পরমেশ্বরী আঙুল দিয়ে এঁটো নির্দেশ করতে করতে বললেন, তোমার ছেলে ফেরার সময় হয় তো মেমসাহেব সঙ্গে নিয়ে আসবে। কাজেই কোনো আশা কোরো না। আমিও করি না।

অরুণেন্দু তো ট্রিনিটি কলেজে আছে শুনেছিলাম? যোগব্রত দাঁত খুঁটতে খুঁটতে বললেন।

হ্যাঁ ভাই। আর বছরখানেক দেরি। চলো, তোমাকে শুইয়ে দিয়ে আসি।

বিজয়েন্দু সিঁড়িতে পা রেখে ডাকলেন—নিবারণ!

নীচে থেকে সাড়া এল, আছি স্যার।

পরমেশ্বরী বললেন, ভয় নেই। আপনার মেয়েকে কেউ কেড়ে নেবে না। অবশ্য করে নিয়ে আসবেন সঙ্গে। কবে আসবেন বলে যান?

যোগব্রত সিঁড়িতে থেমে এদিকে ঘুরে অমায়িক হেসে বললেন, আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে।

নীচের ঘরে পৌঁছে বিজয়েন্দু বললেন, তোমার বাহনটা বরং গ্যারেজে ঢোকাও। নিবারণ, ড্রাইভারকে ঘুম থেকে ওঠা বাবা!

নিবারণ যাচ্ছিল। যোগব্রত বললেন, থাক গে বিজয়েন্দু। আমি বরং বাড়ি যাই।

সেকি! রাত বারোটা কখন বেজে গেছে! বিজয়েন্দু আঁতকে উঠলেন। তাছাড়া তোমার মাথা খারাপ হল নাকি? কালকের মতো ঝড় বৃষ্টি আসতে পারে। তার ওপর, এত বড় একটা ঘটনা ঘটল। তোমার সাহস আছে জানি। কিন্তু এটা দুঃসাহস যোগো। অসুবিধেটা কিসের? ওই তো ও ঘরে বিছানা করে দিয়েছে। জাস্ট কয়েকটা ঘণ্টা মাত্র। ভোরে চলে যেও। নিবারণ চা খাইয়ে দেবে। আমার তো উঠতে আটটা।

যোগব্রত গোঁ ধরে বললেন, না। ওদের কিছু বলে আসি নি। ঘুমোতে পারবে না।

বিজয়েন্দু ক্ষুব্ধভাবে বললেন, তখন তো দিব্যি সায় দিলে। আশ্চর্য মানুষ মাইরি তুমি!

যোগব্রত বিজয়েন্দুর কাঁধে হাত রেখে বললেন, কিছু মনে কোরো না, প্লীজ! আসলে তোমার বউ, মায়ার কথা বলল তো! হঠাৎ মনে হল, মায়া ভাববে। যা সেন্টিমেন্টাল বাপ-সোয়াগী মেয়ে!

আই সি! বিজয়েন্দু বোঝবার চেষ্টা করে শান্ত হলেন। হুঁ, সেও একটা কথা। তা এভাবে একা

অতটা পথ ঝড়বৃষ্টি মাথায় নিয়ে যাওয়া। থিংক টোয়াইস, যোগো।

নাঃ। আমার এ অভ্যাস আছে। বলে যোগব্রত বেরিয়ে গেলেন।

একটু পরে মোটর সাইকেলের প্রচণ্ড শব্দ শোনা গেল। এত রাতে সব নিশ্চুপ। মাঝে মাঝে রাস্তায় একটা দুটো করে ট্রাক চলে যাচ্ছে আলোর হলকা ছড়িয়ে। যোগব্রতের মোটর সাইকেলের শব্দ দূরে মিলিয়ে গেলে বিজয়েন্দু বললেন, নিবারণ, গেটে তালা দিয়ে আয়। দরজা আটকে শুয়ে পড়।

ওপরে গেলে পরমেশ্বরী বললেন, যোগোবাবু চলে গেলেন মনে হল?

হ্যাঁঃ। চিরকালের খামখেয়ালী আর গোঁয়ারগোবিন্দ।

পরমেশ্বরী খাটের পাশে একটু চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে থাকার পর নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, বনি আজ নিজে থেকেই ওর মেয়ের কথা বলছিল।

তাই বুঝি?

বলছিল, মুখোমুখি দেখা হলেও কেউ কাকেও চিনতে পারবে না আর।

ও!

পরমেশ্বরী আর কোনো কথা বললেন না। মশারি টেনে নামাতে থাকলেন। বিজয়েন্দু চিত হয়ে চোখ বুজেছেন। ফ্যান ঘুরছে। নীল মশারি ফুলে উঠেছে। ঢোকার আগে পশ্চিমের জানলায় উঁকি মেরে পরমেশ্বরী আকাশের অবস্থা দেখে এলেন। বোঝা গেল না। ওদিকটায় ইলেকট্রিক সাবস্টেশন। বিশাল উঁচু মঞ্চের মাথায় জোরালো বাতি জ্বলছে।

আজ সকাল থেকে স্বামীর ভালমন্দ নিয়ে খুব ভাবছেন পরমেশ্বরী। ঠাকুরঘরে তিন ঘণ্টা কাটিয়েছেন। বিজয়েন্দুর জানার কথা না। বিজয়েন্দুর নাক ডাকতে শুরু করেছে। নইলে ওকে বলতেন, কলকাতায় কাটিয়ে এস না গো কিছুদিন।

এ রাতে ঝড় এল না। কিন্তু আকাশের কোণায় ষড়যন্ত্র ঠিকই ছিল। বিদ্যুতের ঝিলিকও ছিল। যোগব্রত বাড়ির গেটের সামনে মোটর সাইকেলের হেড-লাইট ফেলতেই লাল বাড়িটা ঝলসে গেল কয়েক মুহূর্ত। তারপর চলবিদ্যুতের আলো কমে গেল। কিন্তু বাড়ির চারধারে বাল্বগুলো জ্বলছে। বাগানের অনেকটা আলোকিত।

প্রিঁ প্রিঁ প্রিঁ!

জগাইয়ের ঘুম পাতলা। সাড়া দিয়ে বলল, যাই ছোটবাবু।

যোগব্রত ওপরে মায়ার ঘরের জানালার দিকে তাকিয়ে আছেন। মায়া এইমাত্র সরে গেল। গিয়ে দেখবেন, ঘুমের ভান করে শুয়ে আছে।

জগাই গেট খুলে বলল, টাউনের বাবুদাদার বেরৎ জ্বর। আগুন বেরুচ্ছে। দিদিঠাকরণ টেবলেট-বড়ি খাইয়েছেন। খালি বেভুল কথাবার্তা বলছে। শেষে মাথা ধুইয়ে দিলুম। কী ঝামেলা।

যোগব্রত আস্তে বললেন, ঝামেলা কিসের?

জগাই আর কোন কথা বলল না। যোগব্রত গাড়িটা খিড়কি দিয়ে ঢোকালেন বাড়িতে। অক্লেশে ও পাশের বারান্দায় তুলে বললেন, তেরপলটা ঢেকে দে। বৃষ্টি হলে ছাঁট লাগবে।

কাঠের সিঁড়িতে শব্দ না তুলে সতর্কভাবে উঠে গেলেন যোগব্রত। অভ্যাসমত একবার একটু গলা চড়িয়ে বললেন, মায়া! ঘুমোচ্ছিস?

তারপর নিজের ঘরে। তালা আঁটা থাকে দরজায়। একটা চাবি মনোরমার কাছে আছে। যোগব্রত আলো জ্বেলে জানালাগুলো খুলে দিলেন। ধুতি জামা গেঞ্জি ছেড়ে একটা লুঙি পরে খালি গায়ে বেরুলেন। ওপরের বারান্দা থেকে চাপা গলায় বললেন, জগাই!

ছোটবাবু?

তুই ওর ঘরে শুচ্ছিস তো?

হুঁ। তা না তো কী?

ঠিক আছে। দেখিস ওকে।

হুঁ, হুঁ।

মনোরমার ঘরের দরজা খুলে গেল। চোখ দেখে বোঝা গেল, ঘুমোন নি এখনও। কাছে এসে বললেন, মায়া একটা কেলেংকারি না করে ছাড়বে না। এভাবে সারা দিন এত রাত অবধি বাড়ি ছেড়ে থাকে মানুষ?

যোগব্রত বললেন, কী ব্যাপার?

মনোরমা ফিসফিস করে বললেন, কাজলদের কাছে শুনেছে, গত রাতে বকুলপুরে কী ঘটেছে।

সে তো শুনবেই। আজ না হোক, কাল শুনতে পেত। তাতে কী?

তারপর থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে কান্নাকাটি করছে। দেখবে, এস না।

কাঁদছে কেন?

সে কেমন করে জানব? মাথা ভাঙলেও কি বলবে?

চলো। যাচ্ছি...

মনোরমা যাওয়ার একটু পরে যোগব্রত গেলেন। মনোরমা নিজের খাটে পা ঝুলিয়ে বসেছেন। ঘরে টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। মায়া তার খাটে কাত হয়ে বালিশে মুখ গুঁজে আছে। মশারির একটা পাশ গোঁজা নেই। হাওয়ায় ঝুলে গেছে। যোগব্রত সেদিকটা তুলে ঢুকে পাশে বসলেন। মাথায় হাত রেখে ডাকলেন, মায়া! ঘুমোচ্ছ?

সাড়া না পেয়ে যোগব্রত হাসিমুখে দু-হাতে মুখটা এদিকে ঘুরিয়ে দিলেন। মায়া চোখ খুলল। কয়েক সেকেণ্ড আবছা আলোয় বাবার চোখে চোখ রাখার পর ধনুকের মত বেঁকে দু-হাতে তাঁর কোমর জড়িয়ে ধরল এবং পেটে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকল। যোগব্রত মেয়ের পিঠে হাত রেখে ঠাণ্ডা গলায় শুধু বললেন, ছিঃ।

যোগব্রত বুঝতে পাচ্ছিলেন, এ কান্না কিসেব। কিন্তু আর কিছু করার নেই।

আট

খুব ভোরে ওঠা অভ্যাস যোগব্রতর। উঠে হাঁটতে হাঁটতে গ্রামের একটা কোণা নাক বরাবর পেরিয়ে নদীর বাঁকে পৌঁছান। এখানে শীতের শেষে নদীর বুকে বাঁধ দিয়ে জল আটকানো হয়েছে। বর্ষার ঢল এলেই কেটে দেওয়া হবে। আটকানো জলে এখন দু'ধারে কয়েক হাজার একর জমি সেচ পায়। সবকারী পাম্পিং স্টেশন আছে কালীতলার মত। ট্রান্সফর্মার বসিয়ে বিদ্যুৎ নেওয়া হচ্ছে। সেই বিদ্যুৎ খামারবাড়িও পাচ্ছে। বাঁধের ওপর দিয়ে যোগব্রত যান সেই খামারবাড়িতে। গেটের মাথার সাইনবোর্ডে বিশাল হরফে লেখা আছে 'কালিকাপুর কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ।' অনেক দূর থেকে পড়া যায়।

নদী আটকানো নিয়ে প্রথম বছর দূরের ভাটিতে বাবলবুনিয়ার লোকের সঙ্গে বিরোধ বেধেছিল। মৌখালির বিলের সঙ্গে বাবলা অব্দি হাজামজা খালটা সংস্কার করে যোগব্রত বিরোধ মিটিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, কালীতলায় মাটির তলায় সঞ্চিত জল তোলার জন্য পাম্পিং সেণ্টারও স্যাংশন করিয়েছিলেন। বিজয়েন্দু এসব কাজে বড় সহায় হয়েছেন যোগব্রতর। নিজের গরজে তো বটেই। তার সুফলও দু-হাত ভরে কুড়িয়েছেন বিজয়েন্দু। ঝুড়ি ঝুড়ি ভোট পেয়ে বেদলের প্রার্থীকে প্রচণ্ড হারিয়েছিলেন।

কিন্তু ভোটের রাজনীতি যোগব্রতকে কোনো কালে ছুঁতে পারে না। হাওয়া উঠলেই ঘাড় নীচু করে উদ্ভিদের মধ্যে ঢুকে পড়েন। সরীসৃপের মত। বেরিয়ে আসেন সময় বুঝে। গ্রাম সমাজে ওপরতলার লোকের তাঁর ওপর খাপ্পা হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। নীচুতলার লোকই বা চটবে কেন? তারা গতর খাটাচ্ছে রোদে, ছোটবাবু বসে আছেন গাছের ছায়ায়। সুখদুঃখের কথা বলছেন। বুকে ভরসা দিচ্ছেন। মাঠকুড়োনি মেয়েরা মাঠে পাখির ঝাঁকের মত খাদ্যকণা সংগ্রহে চলেছে। ছোটবাবু তাদের সন্ধান দিচ্ছেন, কোথায় জামবনে জাম পেকে কালো টসটসে হয়ে আছে। কোথায় ধান ক্ষেতের মধ্যে একটুখানি জলে কোণঠাসা মাছের ছটফটানি শুনেছেন। তা ছাড়া খামারবাড়িতে সারা বছর টুকিটাকি কাজ তো আছেই। চৈতালি ঝাড়াইয়ের সময় খামারের চত্বরে হাতে একটা করে কুলো নিয়ে সার বেঁধে ওরা দাঁড়ায়। মাথার ওপর কুলো তুলে চৈতালি ঝাড়ে হু-হু হাওয়ায়। চিকন খন্দের সোনালী-রুপোলী খোসা মাছের আঁশের মত উড়ে উড়ে ছড়িয়ে পড়ে। আকাশে খর সূর্য। দরদর করে ঘাম ঝরে। একগলায় গান

গাইতে গাইতে ওরা নিজেদের দুঃখময় জীবনকে অর্থপূর্ণ করে। থামলেই যোগব্রত চেঁচিয়ে বলেন, সেই গানটা! 'ধুলোউড়ির মাঠে রে ভাই, রোদ ঝলমল করে।'...

যোগব্রত আজ আটটা অব্দি শুয়ে আছেন। মনোরমা বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একবার ডেকে গেছেন। যোগব্রত ভারী গলায় বলেছেন, একটু ঘুমোব।

যোগব্রত ঘুমোচ্ছিলেন না। পুবের দুটো জানালাই উঠে বন্ধ করে দিয়েছেন। শেষ রাতে ঠাণ্ডার জন্য ফ্যান বন্ধ করা আছে। কিন্তু দক্ষিণের দুটো জানলা দিয়ে নদীর ওপার থেকে হাওয়া এসে ঢুকছে। যোগব্রতর খালি গায়ে শোয়া অভ্যেস। পরনের লুঙিটা এলোমেলো হয়ে আছে। চোখ বুজে সিগারেট টানছেন।

ঝোঁকের বশে হয়তো একটা গুরুতর ভুল হয়ে গেছে। পান্নাকে ওদের সঙ্গে না জোটালেই পারতেন। অথচ কে জানে কেন একটা নিষ্ঠুর কৌতুকের লোভ কিছুতেই ছাড়তে পারেন নি। পান্নাকে বলেন নি, মধুবাবুর জীপে নৃপেন থাকবে। জানলে পান্না পিছিয়ে যেত হয়তো। এমন কি চমকেও উঠত। যোগব্রত ধরা পড়ে যেতেন ওর কাছে। ওর আসল টার্গেট কে, তক্ষুনি আঁচ করে ফেলত। এখন বলা যায় না, কী করে বসত ও।

অবশ্য পান্নার সঙ্গে তার দাদাদের বা দিদির সম্পর্ক বরাবর খারাপ। বিশেষ করে নৃপেনের সঙ্গে তো তার সাপে-নেউলে সম্পর্ক ছিল। প্রথম এদিকে নকশালী হাওয়া ওঠার সময় এলাকার পান্নার বয়সী বা তার মত সব ছেলেই ভেসে গিয়েছিল। সে এক হঠকারী প্রবাহ। নৃপেন ভাইয়ের পেছনে শুধু পুলিস নয়, দলের ছেলেদেরও লেলিয়ে দিয়েছিল। পান্না আণ্ডারগ্রাউণ্ডে চলে যায় তখন। প্রায় বছর দেড়েক পরে এক রাতে পান্না এসে যোগব্রতকে ঘুম থেকে জাগিয়েছিল। পোড় খাওয়া, রোগ কাঠি চেহারা, গর্তে বসা চোখ। যোগব্রত জানতেন, কেন এসেছে পান্না। পরদিন থেকে বিজয়েন্দুকে ধরাধরি, পুলিসের কাছে তদ্বির ও ছোটাছুটি করে নামটা কাটাতে পেরেছিলেন। তখন কিছুদিন পান্না কালীতলা এবং কালিকাপুরে গা ঢাকা দিয়ে রইল। তারপর বকুলপুরে ফিরল। নৃপেনের মেজাজ তত দিনে ভাইয়ের প্রতি অনেকটা শান্ত হয়েছে। ওদিকে বিজয়েন্দুও তাকে চাপ দিয়েছেন। তা ছাড়া পার্টি থেকেও এ উৎপাত ট্যাকল করার জন্য নতুন কৌশল নেওয়া হয়েছে। পার্টি ওদের খুঁজে খুঁজে আশ্রয় দিচ্ছে। যাক গে, যা হবার হয়েছে সোনার বাছারা! এবার এস দিকি, দেশ গড়ার কাজে হাত লাগাই। এই বুলি বিজয়েন্দুরই। নৃপেন এসব ছেলেদের ঘৃণা করত। কিন্তু কথাটা তার ভাল লেগেছিল।

তারপরই এসে গেল, সীমান্তপারে হুলস্থূল। একাত্তরের 'মুক্তি যুদ্ধ।' যোগব্রতর এই একটা স্বভাব আজীবন। বান-বন্যা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, খাদ্যাভাব, কিংবা এ ধরনের আপৎকালে সবার আগে দৌড়ে যান। সেবারও সীমান্তে ছুটে গিয়েছিলেন। বেছে বেছে নন-পলিটিকাল লোকদের নিয়ে রিলিফ কমিটি করেছিলেন। শরৎকাল থেকে শীতের শেষ দিন পর্যন্ত চাষবাস ঘরবাড়ি সব কিছু ছেড়ে ওই সব করে বেড়াতেন। পান্নাকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। বকুলপুরের আরও কিছু ছেলেকেও জুটিয়েছিলেন। এরা সবাই সেই বিপ্লবের উদ্বৃত্ত ফসল। নাকি উচ্ছিষ্টই। কিন্তু মজার ব্যাপার, তারা কেউ-কেউ ঝটপট মিলিটারি ট্রেনিং নিয়ে লড়তে গিয়েছিল। পান্নাও ছটফট করত। যোগব্রত তাকে সামলে রাখার চেষ্টা করতেন। কতটা পেরেছিলেন, যোগব্রত নিজেও বুঝতে পারেন নি। পান্না মাঝে মাঝে নিপাত্তা হয়ে যেত। গোঁসাইতলার ক্যাম্পে পান্না ছিল একাই একশো। সে উধাও হলে যোগব্রত একটু মুশকিলে পড়তেন। ত্রাণ-সামগ্রীর হরির লুঠ তখন।

স্বপন, মোবারক আর বীরু যোগব্রতের ওই সময়কার রিক্রুট। স্বপন থাকে বকুলপুর কালোনীপাড়ায়। বীরু শহরে। এ দুজনের নাড়িতে টান পড়া এ সময়ে স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু মোবারক ছেলেটা ভারি অদ্ভুত। নকশালী আমলে প্রচণ্ড মারধর খেয়েছিল। তারপর প্রাণ বাঁচাতে ওপারে পালিয়ে যায়। ওই সময় হঠাৎ একদিন তাকে নিয়ে এল স্বপন।...দাদা, চিনতে পারেন পোলাডারে? হাল্লায় কয়, আমি মকবুল দরজির পোলা। স্বপন হোহো করে হাসতে লাগল।

সীমান্তপারের কোনো এক মুক্তি-যোদ্ধার টাইগার নাম নিয়ে অদ্ভুত-অদ্ভুত গুজব চলছিল। কীভাবে স্বপনের নামও টাইগার হয়ে যায়, যোগব্রতও জানেন না। সবাই ওকে বলে, এ পারের টাইগার। সেই থেকে স্বপন টাইগারদা হয়ে গেছে।

যোগব্রত কাত হয়ে সিগারেরটা বিছানার পাশে রাখা অ্যাশট্রেতে ঘষটে নেভালেন। এই অবস্থায় কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টে অ্যাশট্রেটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। ঝোঁকের বশে একটা গুরুতর ভুল করে ফেলেছেন হয়তো। পান্না বলে গেছে তার চাকরি হওয়ার কথাটা শুধু দিদিকেই বলেছিল। এখন কথা হচ্ছে, পান্না আর কিছু খুঁটিয়ে বলেছে কি না। পান্না এ ক্ষেত্রে কতটা বিশ্বাসযোগ্য?

সে কি বনশোভাকে একথাও বলেছে যে, তার চাকরিটা অ্যাপ্রেন্টিসের--রাঁচি হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশনে? ব্যঙ্গের ছলে এ কথাটাও কি বলেছে, জামাইবাবু তার এ চাকরিটা করে দিয়েছেন? চিঠিটা অবশ্য যোগব্রতের কেয়ার অফে এসেছিল। যোগব্রত কাল সকালে যাবার পথে পান্নাকে চিঠিটা দিয়েছেন।

সে কি রাঁচি থেকে নিজের ঠিকানা দিয়ে অন্তত বনশোভাকে চিঠি লিখবে? যোগব্রতের পইপই নিষেধ সত্ত্বেও?

ঠিক এটাই বুঝতে পারছেন না যোগব্রত। ওকে বুঝিয়ে বলেছেন, 'ওখানে গিয়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকার মত থেকো। ঘটনাটা সিরিয়াস। এতটা সিরিয়াস হত না যদি না একজন মিনিস্টার আসতেন এ সময়। কাজেই বুঝতে পারছ, তদন্তটা জোরালোই হবে এবং দৈবাৎ একটা গেরো খুলে গেলে তুমিও বিপদে পড়বে।'

পান্না বলেছে, ভীষণ বুঝি। তবে সে জন্যেও না, এখানকার লাইফ আমার অসহ্য জামাইবাবু। দেখবেন আমি আর এ জীবনে এখানকার মাটিতে পা দেব না।

যোগব্রত মুখে বলেছেন, না না। তা কেন? আমার কাছে আসবে। চিঠিপত্তর লিখবে।

পান্না মাথা নীচু করে বলেছে, নাঃ।

হ্যাঁ, পান্না ভীষণ একগুঁয়ে। যা বলে, তা করতে ছাড়ে না। কিন্তু তা হলেও আনপ্রেডিক্টেবল।

যোগব্রত ফের চিত হলেন। স্থির ফ্যানটার দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে রইলেন। খবরটা কি কাগজে বেরুবে? মফঃস্বলের খবর আজকাল কাগজে বিশেষ বেরোয় না। বেরুলেও অনেক দেরিতে দু'চার লাইন। আর পান্নারও খবরের কাগজ পড়া অভ্যেস নেই। তাছাড়া রাঁচিতে গিয়ে বাংলা কাগজ যোগাড় করে পড়ার মতো গরজ তার হবে না। এটা একরকম নিশ্চিত। তবু--

যোগব্রতের মাথার ভেতরে হঠাৎ ঠাণ্ডা ঢিল পড়ল।

কতদিন পান্না চুপ করে থাকবে? একদিন না একদিন তার মেজাজ চরিত্র বদলে যাবে। চাকরির টাকা তাকে বদলে দেবে। সে সবাইকে ক্ষমা করা ও তুচ্ছ করার ভঙ্গীতে বকুলপুরে চিঠি লিখবেই, কোনো বন্ধুকেও লিখতে পারে। তারপর একটা ভয়ঙ্কর চিঠি যাবে তার কাছে। দুঃসংবাদ নিয়ে যাওয়া সেই চিঠি পান্নাকে ক্ষেপিয়ে দেবে।

তখন সে কী করবে? যোগব্রত শরীরের ভেতরকার ঠাণ্ডা ঢিলটা কুড়িয়ে ফেলে দিলেন। পান্না বরাবর আনপ্রেডিক্টেবল্। এটাই ওকে নিয়ে সমস্যা। হয়ত ততদিনে জীবনধারণের স্বাচ্ছন্দ্য তার ক্রুরতার ধার ভোঁতা করে ফেলে তাকে ভদ্রলোক বানিয়ে ছাড়বে। নয়তো সে ঠাণ্ডা চোখে যোগব্রতের কাছে কৈফিয়ৎ চাইতে ছুটে আসবে।

যোগব্রত বলতে পারেন, নৃপেন মধুবাবুর সঙ্গে ছিল, জানতুম না তার তো মিনিস্টারকে শহরে পৌঁছে দিয়ে আসার কথা ছিল। তুই নিজেই তো বলেছিলি এ কথা। তুই বলেছিলি না—মেজদা মিনিস্টারের পায়ে-পায়ে কুকুরের মতো ঘোরে?

তবু পান্নার বিশ্বাস হবে না। সে জানে, নৃপেন যোগব্রতের কত ক্ষতি করার চেষ্টা করেছে বারবার। বেনামী জমির ঠিক-ঠিকানা দাখিল করে দিয়েছে। বকুলপুরের মাঠের জমিগুলো দখল করিয়েছে। গ্রামে গ্রামে তাঁর বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়েছে। পান্নার এসব কিছুই অজানা নয়। মধুবাবু তো সাদাসিধে লোক। নৃপেন যা বলেছে, তাই করেছেন। মধুবাবুকে যোগব্রত ট্যাকল্ করতে পারতেন। নৃপেনের জন্যই পারেন নি। নৃপেন বক্তৃতায় বলত, কালিকাপুরের ওই ভণ্ড কুলোক, ওই কুচক্রী মীরজাফরের হাত গুঁড়িয়ে দাও! ওই লম্পট চরিত্রহীনের জন্যে সর্বহারা জনগণের মা-বোনের ইজ্জত বিপন্ন। ওর কালো হাত ভেঙে দাও।

পান্না একদিন না একদিন ছুটে আসবেই। যোগব্রত বিছানায় কাঠ হয়ে পড়ে রইলেন কিছুক্ষণ। মনে হল, বাগানে শুকনো পাতার ওপর পান্নার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন। শব্দটা এগিয়ে আসছে।

তারপর কাঠের সিঁড়িতে তার পায়ের চলা শব্দ।

যোগব্রত একঝটকায় উঠে বসলেন। তারপরই বুঝলেন, কেউ সিঁড়িতে শব্দ করে নেমে গেল। মায়াই হবে। সে খুব শব্দ করে নামে সিঁড়িতে।

হুঁ, মায়া কাল রাতে ভীষণ কেঁদেছিল। যোগব্রত পুবের জানালা দুটো খুলে দিলেন। রোদ এল ঝাঁজিয়ে। বাগান পরিচ্ছন্ন দেখলেন। উত্তর-পূর্ব কোণে বকুলগাছের দিকে মায়া হনহন করে এগিয়ে যাচ্ছে। যোগব্রত একটু সরে এলেন। মায়া গোল চত্বরে বসে পড়ল। হাতে বই থাকার কথা। নেই।

দরজা খুলেই যোগব্রতের এতক্ষণে মনে পড়ল বীরুর কথা। শেষরাত থেকে যে তোলপাড় আর আতঙ্কের আবছায়ার মধ্যে বিপন্ন যোগব্রত আটকে পড়েছিলেন, সঙ্গে-সঙ্গে সরে গেল। মনে হল, এতক্ষণ অকারণ একটা অলীক বিপদের বোঝা কাঁধে বয়ে মরেছেন। পান্না থাকলে বীরুও আছে।

নিজের দিকে প্রশংসা মেশানো বিস্ময়ে তাকালেন যোগব্রত। এই তাঁর ইনটুইশান বরাবর। বীরুকে এখনও ছাড়েন নি। তাছাড়া বীরু জ্বর বাধিয়েছে। কাজেই আপাতত তাকে থাকতেই হচ্ছে। তারপরও থাকার ব্যবস্থা করা যায়। শুধু ও রাজি হলেই হল। রাজি হবে কি?

না হবার কিছু নেই। ফার্মিং কো-অপারেটিভে একটা ব্যবস্থা করা যাবে। হয়তো খুশিই হবে বীরু।

হালকা মনে যোগব্রত পাঞ্জাবি চড়িয়ে নীচে গেলেন। বীরুর ঘরের পর্দা সরিয়ে জগাই ভেতরে উঁকি মেরে আছে। পায়ের শব্দে ঘুরে মনিবকে দেখে উদ্বেগসঙ্কুল মুখ করে তাকাল। চাপা গলায় বলল, ঘুমোচ্ছেন। জ্বরটাও মনে হচ্ছে ছেড়ে গেছে। খুব ঘাম দেখলুম।

যোগব্রত কিছু বললেন না। জগাই বেরিয়ে গেলে তিনি পর্দা তুলে উঁকি দিলেন। মশারির ভেতর ঘুমোচ্ছে বীরু। ভীষণ ঘেমেছে মনে হচ্ছে। দরজার পাশেই সুইচবোর্ড। এক পা বাড়িয়ে রেগুলেটার ঘুরিয়ে একে রেখে ফ্যানের সুইচ টিপে দিলেন। তারপর উঠোনে টিউবয়েলের দিকে এগিয়ে গেলেন।

বকুলতলায় বসলে সোজা পশ্চিমে খিড়কির দরজাটা দেখা যায়। দরজাটা খোলা। মোটা-সোটা ও উঁচু একটা শ্যাওড়াগাছ আছে ওপাশে ঘাটের মাথায়। সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন মনোরমা। মাছ ধরাচ্ছেন। তাঁর পায়ের কাছে জাল ঝাড়ছে অরু জেলে।

পুকুরটা মাঝারি আয়তনের। কিন্তু সুন্দর চৌকো করে কাটা। যোগব্রতের ঠাকুর্দার কীর্তি। চার পাড়েও অনেক ফলের গাছ লাগিয়েছিলেন। এখন জঙ্গল হয়ে গেছে। পুকুরের জলটাও স্বাভাবিক দেখায় না। নীলচে রঙ। পাতা পচে কেমন একটা গন্ধ ছড়ায়। মায়া শুনেছে, একসময় ওই শ্যাওড়াতলায় রোজ সন্ধ্যাবেলা একথালা ভাত-তরকারি রাখা হত। দুটো শেয়াল এসে খেয়ে যেত। মায়ার বিশ্বাস হয় না। কিন্তু জগাই কিরে খেয়ে মাথাকুটে বলেছে, একেবারে সত্যি কথা। তখনকার দিনে দেব-দেবীর সঙ্গে মানুষের একটা সম্পর্ক ছিল। আজকাল তেমন বনবাদাড়ও নেই, আর মানুষও বড্ড স্বার্থপর হয়ে গেছে। ওনারা রাগ করে পর্বতে ফিরে গেছেন। পর্বতটা কোথায় জিজ্ঞেস করলে জগাই বলে, কৈলেস। আবার কোথা?

তবে একথা ঠিক, আর শেয়ালের ডাক প্রায় শোনাই যায় না। মায়ার মনে পড়ে, তার ছোটবেলায় ওই পুকুরপাড়ে আর দক্ষিণে নদীপারের বাঁশবনে খুব শেয়াল ডাকত। ডাক্তারদাদুর আমলে নাকি একটা বাঘও মারা পড়েছিল। জগাই বলে, সেটাই কালিকাপুরের শেষ বাঘ। আসলে এই এক নিয়ম। যে জানোয়ার দৈবাৎ একবার মানুষমুখো হয়, তার, আর জঙ্গলে ফেরা হয় না। কালিকাপুরের শেষ বাঘটা নাকি রোগে ভুগছিল! তাই মানুষের কাছে আশ্রয় নিতে এসেছিল। ডাক্তারবাবু তাকে ভুল বুঝে গুলি করে মারলেন। মরার পরে বাঘটার চোখে জল দেখেছিল লোকেরা। জগাইও দেখেছিল তো? হুঁউ। সে দেখবে না কেন? মায়া হেসে খুন হত। জগাই দুঃখ করে বলত, হেসো না দিদি। এ হাসির কথা না। এ বড় দুঃখের কথা।

একটা বাঘের মৃত্যুতে দুখের কথাটা কী, মায়া বোঝে না। অথচ জগাই ওইরকম। এই বাগানে একবার একটা খরিস সাপ মেরেছিলেন যোগব্রত। জগাই কপাল চাপড়ায় আর ছটফট করে বেড়ায়— হায়, বাস্তু সাপকে হত্যে করলেন ছোটবাবু! করলেন কী গো!

উদ্ভিদ ও প্রানিজগতের সঙ্গে জগাইয়ের যেন নাড়ির যোগ। মায়া বুঝতে পারে। আসলে ওটা অভ্যাসে এসে যায় জীবনে। জগাই ওই নিয়েই আছে। ঝড়ে উঠোনে যে ভাঙা বাসা আর ডিমগুলো

পড়ে গিয়েছিল, জগাই তা যত্ন করে তুলে দিয়েছে ওপাশের শিরিস গাছে। গাছের একটা অংশ উঠোনের ওপর ঝুঁকে এসেছে। এ বয়সেও সে দিব্যি গাছে চড়তে পারে। নীচে দাঁড়িয়ে কাজল চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করছিল কাল। মরবে। বুড়ো ছাতু হবে নির্ঘাত! ও বুড়ো, এই দেখ আঁচল পেতে রইলুম। পড়লে ধরে নেব। জগাই রসিকতার ধার ধারে না। ওর মুখের তোবড়ানো কোঁচকানো চামড়ার মতো মনটাও হয়তো জড়িয়ে-মড়িয়ে গেছে। বলছিল, চিল শকুন উড়িও না। এটা ভদ্দরনোকের বাড়ি, খ্যাল রেখো।

অগত্যা কাজল বলেছিল, বুড়োর বুড়ি থাকলে তো কাঁদবে। কাঁদার লোক নেই বলেই মরণ বাঁচন এক করে বেড়ায়।

মায়ার হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল একটা কথা। জগাইদার বউ নেই কেন? আদতে ছিল কি কখনও? আশ্চর্য, এতকাল একবারও কথাটা জানার ইচ্ছে করে নি! অথচ এটা নিশ্চয় একটা জরুরী কথা। তার বাবার সঙ্গে জগাইয়ের যেন একটা অদ্ভুত মিল আছে। সেই মিলটা ভাবতে গেলে অনেক রহস্য এসে সামনে দাঁড়ায়। জগাইয়ের জীবনেও কি কিছু ঘটেছিল বাবার মতো? থাকতেও পারে নাকি তার মতো একটা মেয়ে?

গাছ থেকে জগাই নেমে এলে মায়া প্রশ্নটা সরাসরি তুলত। কিন্তু সেই সময় ভূষণ হন্তদন্ত হয়ে বাড়ি ঢুকেই বলেছিল, সব্বোনাশ, সব্বোনাশ! শুনলুম, রাতের বেলা ঝড়ের সময় বকুলপুরে 'মাডার হয়েছে। চার-চাট্টে 'বোডি' পড়েছে। একেবারে কাঁকড়াপোড়া। জীপ গাড়িতে বোমা মেরেছিল। ও দিদিঠাকুরণ শীগগির এদিকে আসুন।

মনোরমা ওপর থেকে বলেছিলেন, কীরে ভূষণো?

বেবং কাণ্ড। ছোটবাবুর মেজ শালা নেপেনবাবুও মাডার হয়েছেন। ইস্কুলের কাছে মধুবাবুর জীপ গাড়িতে বোম মেরেছিল।

মায়া স্থির হয়ে গিয়েছিল কয়েক সেকেণ্ড। মাথা ঘুরে উঠেছিল। তারপর সে এক দৌড়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকেছিল। বাড়ির ভেতর আবহাওয়া বদলে আবার স্বাভাবিক হলে সে পা টিপেটিপে নেমেছিল। রান্নাঘরের বারান্দায় ছোটমামার বন্ধু খেতে বসেছে। মায়া ওপাশের একটা ঘরে তেমনি পা টিপে টিপে ঢুকেছিল। বিস্ময়, আতঙ্ক, ঘৃণা মেশানো চোখে লুকিয়ে দেখছিল তাকে। খুব খুঁটিয়ে দেখতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু হঠাৎ সে এদিকে মুখ তুলতেই মায়া দ্রুত সরে যায়।

আজ আর আবহাওয়ায় কালকের মতো ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভাবটা নেই। এত সকালেই রোদ্দুর বেশ কড়া। গাছের তলায় শুকনো পাতা উলটে ধূসর রঙের সাতভেয়ে পাখির ঝাঁক পোকা খুঁজছে। বকুলগাছে তীক্ষ্ণ চেরা আওয়াজে ঝিঁঝি পোকা ডাকছে। জগাইয়ের মতে, ওই পোকার ডাকেই আম পাকে। তবু অভ্যেস। আম ফলুক না ফলুক তার কাজ তাকে করতেই হবে। যেমন জগাইকে করতে হয়।

মায়া দেখল, এতক্ষণে বাবা উঠেছেন। কোনো দিকে না তাকিয়ে সোজা বেরিয়ে গেলেন। পায়ে হেঁটেই যাচ্ছেন যোগব্রত। গায়ে আজ ধূসর রঙের পাঞ্জাবি, পরনে পাজামা। কাঁধে ব্যাগটা থাকবেই। যোগব্রত নিশ্চয়ই খামারবাড়িতে যাচ্ছেন।

মায়া মুখ নামিয়েছিল। একটু পরে মুখ তুলে দেখল, যোগব্রত দূরে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে রাস্তায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাতে-ধরাতে একবার এদিকে তাকালেন। তারপর হনহন করে চলে গেলেন। গাছপালার আড়ালে ঢাকা পড়ল তাঁর উঁচু শরীর।

পিসীমার ডাক ভেসে এল খিড়কির শ্যাওড়াতলা থেকে, ও মায়া! মাছ দেখবি আয়।

মায়া গ্রাহ্য করল না। চুপচাপ বসে রইল। কিছুক্ষণ পরে পিসীমা জেলেকে পেছনে নিয়ে বাড়ি ঢুকে গেলেন। তখন মায়া উঠল।

কামিনী ফুলের ঝোপের সামনে হাঁটু দুমড়ে জগাই প্রণামের ভঙ্গীতে চিবুক মাটিতে ঠেকিয়ে কি কিছু দেখছে? ঝোপের তলার অন্ধকার ছায়ায় কিছু কি ঘটছে? খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করছে জগাই।

অন্য সময় হলে মায়া আচমকা তার পাছায় থাপ্পড় মেরে চমকে দিত। ওই গো বলে জগাই লাফিয়ে উঠত। মায়া তাকে এড়িয়ে অনেকটা তফাত দিয়ে সামনের ঘরের বারান্দায় উঠল। তারপর

ভেতরে ঢুকে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াতে গিয়ে ডাইনে তাকাল।

বীরুর ঘরের দরজার পর্দাটা ফাঁক হয়ে দুলছে। সাদা মশারির ভেতর বীরু চিত হয়ে শুয়ে আছে। চোখ দুটো খোলা। মায়া চমকাল। ফ্যাকাসে, মড়ার মতো নিস্পন্দ শরীর। মারা যায় নি তো নিঃশব্দে? মায়া ঘরে ঢুকে পড়ল।

আজ সারারাত আরও এক প্রবল ঝড়ের মধ্যে কাটিয়েছে বীরু। অদ্ভুত মারাত্মক সব স্বপ্ন। শহরের ব্যারাকের মাঠে সারবদ্ধ ঘোড়া—যাদের গায়ের রঙ সবুজ চোখে কাজল টানা। আয়ত মায়াময় হলুদ রঙের চোখ সার সার। বীরু টাইগারদাকে খুঁজে হন্যে হচ্ছিল। এসব ঘোড়া পাকিস্তানের। কেউ তা বলেছিল কিংবা মনে হচ্ছিল বীরুর। আমবাগানের ভেতর একটা কামান পাতা। কামানটা হঠাৎ সাপ হয়ে ফণা তুলল। আর সেই সময় কোথায় দাঙ্গা বেধেছে বলে লোকেরা কোলাহল করে বেড়াচ্ছে। বীরু পালাচ্ছে। সামনে নদী। নদীর ধারে পান্নার ভাগ্নী দাঁড়িয়ে আছে। বীরু বলল, পালান! পালান! পান্নার ভাগ্নী হাসতে হাসতে বলল, আমার নাম লালী নয়। তখন যোগব্রত পকেট থেকে এক তাড়া নোট বের করে বললেন, নাও। আর এখানে থেকো না। পুলিস আসছে। বীরু পালাতে থাকল। কিন্তু মায়াও কেন পালাচ্ছে বুঝতে পারল না। মাঠটায় ফোমের গদি বিছানো। দৌড়োনো যায় না। খান সেনারা আসছে। পালাও! পালাও!

এই রকম অসংখ্য চলচ্ছবি ঘূর্ণিঝড়ের মতো তার মাথার শূন্য খোলের ভেতর সশব্দে ঘুরপাক খেয়েছে। বার বার জগাই তার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে। ভোরে ফের একটা স্বপ্ন দেখল বীরু। অচেনা একটা লোক ড্যাগার নিয়ে তাকে তাড়া করছে। বীরু লাফ দিয়ে উঠতে চেষ্টা করল। অনেক উঁচুতে উঠে গেল। নীচের লোকটা চেঁচিয়ে কি বলতে লাগল। বীরুর ঘুম ভেঙে গেল। জগাই বলল, খুব স্বপন হচ্ছে বাবুদাদা? আর ঘুমোবেন না। ঠাকুরমশাই চা করছে। এনে দেব খাবেন? মাথায় ময়লাটা কেটে যাবে। গরম গরম চা।

বীরু বলেছিল, থাক্।

ঘুম আসছিল। কিন্তু আর ঘুমোয়নি সে। বাইরের ধূসরতা সাদা হতে হতে হলুদ হয়ে গেল। অসংখ্য পাখি ডাকতে থাকল। হঠাৎ মনে হল, কোথাও সুন্দর ও আনন্দজনক কিছু ঘটছে। বীরু মশারির ছাদের দিকে তাকিয়ে সেই অলীক আনন্দের স্বাদ নিতে থাকল। সেই সময় স্বপ্নে দেখা পাকিস্তানী ঘোড়াগুলো—সবুজ রঙের শরীর, কাজল টানা আয়ত হলুদবর্ণ চোখের ঘোড়াগুলোর কথা মনে পড়ল। বিশ্বাস করতে পারল না। ঘোড়াগুলি কি সত্যি সবুজ দেখেছিল? চোখে কাজল কিংবা চোখের ভেতরটা হলুদ হয়ে থাকাও কি সত্যি? কিন্তু স্বপ্নের স্মৃতিটা এত স্পষ্ট আর তীব্র এখনও পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। স্বপ্ন মনে রাখাটা বীরুর হয়তো অভ্যাস। কিংবা স্বপ্ন মনে রাখার একটা ক্ষমতা তার আছে। খুব কম বয়সের অজস্র স্বপ্ন তার এখনও মনে হচ্ছে।

বীরুর মনে হল, স্বপ্নের পাকিস্তানী ঘোড়াগুলোর চোখে গাঢ় মমতাও দেখেছিল। এ বড় অদ্ভুত! কেন এমন দেখল? কুষ্টিয়ার ওদিকে সে লড়াই করতে গিয়েছিল। কিন্তু কোথাও ঘোড়া দেখেনি।

হঠাৎ বীরু চমকাল। খুব কাছেই একটা কিছু এসে দাঁড়িয়েছে। শরীরে এতটুকু শক্তি নেই যে ধুড়মুড় করে লাফিয়ে ওঠে। অসম্ভব হালকা হয়ে গেছে শরীরটা। সে আস্তে আস্তে চোখের তারা ঘোরাল ডান দিকে। নেটের মশারির পাশে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। বীরু বলল, দিদি?

আমি।

বীরু বলল, ও, আপনি? চলে যাচ্ছেন কেন? শুনুন।

বেঁচেবর্তে আছে দেখে মায়া পা বাড়িয়েছিল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, কী?

কটা বাজে বলুন তো? আমার ঘড়িটা পাশে নেই।

সাড়ে নটা।

কাইণ্ডলি, মশারিটা তুলে দিন না।

একটু ইতস্তত করে মায়া আলতো হাতে খাটের চার পাশ ঘুরে মশারিটা তুলে ওপরে গুঁজে দিল। জানালার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার জ্বর ছেড়েছে?

ছেড়েছে মনে হচ্ছে। বীরু হাসল। আপনার পিসিমা দারুণ ট্যাবলেট খাওয়াচ্ছেন কাল থেকে।

ব্যথাটা নেই। কিন্তু ভীষণ উইক করে ফেলেছে।

জগাইদাকে ডেকে দিচ্ছি।

থাক্। আমি উঠছি। বলে বীরু আস্তে আস্তে উঠে বসল। বালিশটা খাটের বাজুতে রেখে পিঠ দিল। সামনে পা দুটো ছড়াল। তারপর সিগারেট ধরাল। সরি! অ্যাশট্রেটা দিন।

মায়া টেবিল থেকে অ্যাশট্রে এনে বিছানার ওপর রাখল। তারপর পা বাড়াল ফের।

বীরু বলল, বাবা আছেন, না বেরিয়েছেন?

বেরিয়েছে। বলে মায়া তাকাল ওর দিকে।

বীরু বলল, কিছু বলবেন মনে হচ্ছে?

মায়া কয়েক সেকেণ্ড শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর আস্তে বলল, পরশু রাতে আপনি আর ছোটমামা বকুলপুরে একটা জীপের ওপর বোম মেরেছেন?

বীরু ধোঁয়া ছাড়তে ঠোঁট ফাঁক করেছিল। ফাঁক করে রইল। নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে বলল, কে বলল?

আমি জানি। মায়া অন্য দিকে ঘুরে বলল।

ধরুন, তাই। বীরু একটু হাসবার চেষ্টা করল। তাতে আপনার কী?

গাড়িতে আমার মেজমামা ছিলেন।

তাই বুঝি? বীরু শুকনো হাসল। আমার তা দেখার সুযোগ ছিল না। তা ছাড়া আপনার ছোটমামাও সঙ্গে ছিল আমার!

মায়া গলার ভেতর বলল, ছোটমামা জানত জীপে মেজমামা আছে?

জানি না।

কেন বোম মারলেন?

বীরুর মনে আঁচ লাগছিল এবার। আস্তে বলল, বাবাকে জিগ্যেস করবেন। তা ছাড়া আপনার এতে নাক গলাবার দরকার কী?

মায়া ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক সেকেণ্ড। ঠোঁট কামড়ালো। তারপর বলল, বাবা তো বোম মারেন নি। আপনি মেরেছেন। তাই আপনাকেই জিগ্যেস করছি।

বীরু মুখ নামিয়ে বলল, টাকার জন্য।

মায়ার গলার স্বর ভেঙে গেল। আমি যদি টাকা দিই, আপনি কাকেও বোম মারবেন?

হুঁউ। বলুন, কাকে মারতে হবে?

যদি বলি, বাবাকে?

বীরু এক পলক ওর মুখটা দেখে নিয়ে বলল, হুঁউ। কত টাকা দেবেন?

যত টাকা পেয়েছেন মেজমামাকে মার্ডার করে।

এখনও পাই নি। বীরু ধোঁয়া জোরে ছাড়তে ছাড়তে বলল। পাই নি বলেই ওয়েট করছি। পেলে কি থাকতুম এখানে?

মায়া কাঁপা কাঁপা স্বরে বলল, আপনাকে ধরিয়ে দেওয়া উচিত পুলিসের হাতে।

বীরু আর অবাক হচ্ছিল না। চমকটাও কেটে গেছে ততক্ষণে। ফের একটু হেসে বলল, আপনি সত্যি একটু—একটু কেন, অনেকখানি অ্যাবনর্মাল। পান্না বলেছিল. .

মায়া ফুঁসে উঠল। শ্বাসপ্রশ্বাস মিশিয়ে বলল, আমি অ্যাবনর্মাল, না যারা মার্ডার করে বেড়ায় তারা অ্যাবনর্মাল?

বীরু এবার রসিকতার সুর আনল গলায়। হালকা চালে বলল, আপনার বাবা কি বলেন জানেন? মার্ডার ব্যাপারটা ভেরি—ভেরি ন্যাচারাল। ভেরি নর্ম্যাল। এটা একটা ন্যাচারাল ল। ও কী? চলে যাচ্ছেন কেন? পুলিশের কাছে যাচ্ছেন তো? একটা কথা শুনে যান। আহা, শুনুন না! বাসিমুখে ঝগড়া করার মানে হয় না।

মায়া যেতে যেতে দাঁড়াল। মুখ ফিরিয়ে বলল, আপনাকে আমি ঘৃণা করি।

করুন। আর বাবাকে?

বাবাকেও। বলে মায়া দ্রুত বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। পর্দা ধাক্কা খেল। বেশ কিছুক্ষণ এপাশে ওপাশে দুলতে থাকল।

বীরু মুখ উঁচু করে অনেকটা হাঁ করে দম নিয়ে হাসতে গেল। পারল না। হঠাৎ সমস্ত ব্যাপারটা তেতো লাগল। মাথার ভেতর শূন্য খোলে উত্তাপ নিয়ে সে সিগারেটটা ঘষটে নেভাল। তারপর শরীরটাকে নাড়া দিয়ে খাট থেকে নামল। জিভের ডগা আবার জ্বালা করছে। সে জানালার দিকে কয়েক বার থুথু ফেলার চেষ্টা করল। মেয়েটা তাকে ভাড়াটে খুনী সাব্যস্ত করেছে। কিন্তু বীরু তা জানে, সে তা নয়। এটা একটা অপারেশন। নিছক মার্ডার নয়। ওই গ্রাম্য নির্বোধ মেয়েকে অপারেশন আর মার্ডারের তফাত বোঝানো যাবে না।

এখনই এখান থেকে চলে যেতে হবে। অসহ্য লাগছে এমনি চুপচাপ একা, সাউণ্ডপ্রুফ ঘরের মধ্যে আটকে থাকা, আর এই জ্বরে ভোগা—কোনো মানে হয় না। বীরুর ভেতরে ছটফটানি জেগে উঠেছে। কিন্তু শরীর দুর্বল। পা টলছে। হেঁটে যাওয়া খুব কঠিন হবে। বরং রাস্তা অব্দি গিয়ে যদি বাসটাস পেয়ে যায়।

কিন্তু এই জংলী এলাকায় সে রাস্তাঘাট কিছু চেনে না। পাড়াগাঁয়ের লোকের স্বভাবও তার জানা। সবাই হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে। অসংখ্য প্রশ্ন করবে। তা ছাড়া ইতিমধ্যে বাইরে কী ঘটেছে, কিংবা ওই ঘটনার কতটা প্রতিক্রিয়া—সে কিছুই জানে না। টাইগারদা বা মোবারক কি দৈবাৎ ধরা পড়েছে? টাইগারদা কঠিন পাথর। কিন্তু মোবারকটা বড্ড সেন্টিমেন্টাল। কিছু স্ক্রু ঢিলে আছে ওর। একটু ভীতু টাইপও বটে। নকশাল পিরিয়ডে ওপারে পালিয়ে গিয়েছিল।

একটা ব্যাপারে অবাক লাগল এতক্ষণে। যোগব্রত তাকে যেন এড়িয়ে ঘুরছেন। বাড়িতে রেখেছেন এবং যত্ন-আত্তির ব্যবস্থাও করেছেন। কিন্তু সামনে আসছেন না। কেন?

এই সময় বীরুর হঠাৎ মনে হল, পান্না কি জানত জীপে তার মেজদাও থাকবে? বীরুর হৃৎপিণ্ডে কেউ ড্যাগারের ডগা ঠেকাল। জানলার রড আঁকড়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। মৃত মানুষের মত।

নয়

বীরেন্দ্র নির্বিরোধী মানুষ। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। কিন্তু চুলে পাক ধরে নি। ঢ্যাঙা লম্বাটে গড়ন, সামনে ঝুঁকে মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটেন বলে তাঁকে কুঁজো মনে হয়। যোগমায়া বিদ্যাপীঠে শিক্ষকতা করতে করতে বুড়ো হয়ে এলেন প্রায়। কিন্তু তেমন কিছু জনপ্রিয় শিক্ষক নন। অঙ্কের মাস্টার বলে একটা মজার অভ্যাস হয়ে গেছে, হাতে সব সময় একটা চক থাকবেই। লম্বা, ঈষৎ লালচে আঙুলে সাদা চকের ছোপ দেখে হঠাৎ মনে হবে, ওঁর শরীরটা রক্তহীন। কিন্তু বীরেন্দ্রের কোনো অসুখ নেই। ভীষণ দেরিতে বিয়ে করে বকুলপুরে এবং স্কুলে কিছুদিন কৌতুকের পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। এখন হাওয়াটা চলে গেছে। তবে আগে বরাবর তাঁতের কাপড়ের পাঞ্জাবি পরতেন। বিয়ের পর থেকে আদ্দিই পরেন। একটু শৌখিনতাও চোখে পড়তে বাধ্য। কিন্তু সেই আস্তে পা ফেলে মাটি দেখে হাঁটা আর অকারণে বা কারণে হঠাৎ মুখ তুলে আকাশ দেখতে দেখতে দ্রুত কিছু ভেবে নেওয়ার বাতিকটা রয়ে গেছে। ছেলেমেয়েরা তাঁর এই ভঙ্গীটা নিয়ে ক্যারিকেচার করে।

বকুলপুরের জমিদার বংশের বড় তরফ বলে যে পুরনো সম্মান ছিল, তার ছিটেফোঁটা এখনও ভাগ্যে জোটে। তার সঙ্গে জুটেছিল যুবনেতা নৃপেন বাবদ উপরি কিছু মর্যাদা। পান্নার হালচাল সেটা ক্ষয়ে দিতে পারে নি। বরং বীরেন্দ্র অনুভব করেন, পান্নার জন্যই বা কিছু ভয়ে ভক্তিভাব জনসাধারণের কাছে গত ছ'সাতটা বছরে লক্ষ্য করা যাচ্ছিল।

বীরেন্দ্র আপসের পক্ষপাতী সব সময়। বোনের ব্যাপারটা নিয়ে যোগব্রতের সঙ্গে মিটমাট করে নিতে চেয়েছিলেন। নৃপেন সেটা হতে দেয় নি। কিন্তু এখানেই বীরেন্দ্রের দুর্বলতা। নৃপেন ছোট হলেও তাঁকে খুব মেনে চলতেন। আর বনশোভা তো বরাবর মেজাজী মেয়ে। তাঁকে কিছু নরম ও মৃদুস্বরে বলতে গেলেই তেড়ে বলেন, বড়দা! তুমি চুপ করো তো। বীরেন্দ্র বলেন, বেশ। চুপ করলুম। যা ইচ্ছে, কর তোরা।

বনশোভার ব্যাপারটায় বীরেন্দ্র আঘাত পেয়েছিলেন। তারপর সয়ে যায় সেটা। বরং বোনের জন্য

এখানে বা কাছাকাছি অন্তত সদর শহরে একটা চাকরির চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু বনশোভার চাকরি করার চেষ্টাটা নৃপেনের জেদে আর এগোয় নি। নৃপেন বলত, সবতাতে মডার্ন আউটলুক চলে না। এ বাড়ির মেয়ে চাকরি করবে কী? তুমি ভেবো না। ওর দায়িত্ব আমার। আশ্চর্য, বনশোভার কিন্তু নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ইচ্ছে ছিল খুব। তাছাড়া দিন কাটানোরও প্রশ্ন ছিল। কিন্তু বনশোভা মুখে নৃপেনকে যত ঠাট্টাতামাশাই করুন, ভেতরে ভেতরে কেমন যেন ভয় পেতেন এবং মেনে চলতেন। শেষে বলেছিলেন, আমি চাকরি করলে সংসার দেখবে কে?

বীরেন্দ্র চিরকুমারই থেকে যেতেন। তাঁকে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে বাধ্য করেছিল নৃপেনই। নিজে ঘটকালি করে কনে দেখে পছন্দ করেছিল। পরে বীরেন্দ্র আড়ালে বোনকে বলেছিলেন, জানিস বনি, রুনু কেন এসব করল-টরল?

বনশোভা বলেছিলেন, কেন আবার? তোমার পাগলামি দেখে।

কিসের পাগলামি? বীরেন্দ্র হেসে ফেলেছিলেন। ধুর! আমি তোকে বলছি শোন। এতদিনে জানলুম রহস্যটা। মধুবাবুর মেয়েকে রুনু বিয়ে করবে।

বনশোভা চমকে উঠেছিলেন। কাকে? মঞ্জুকে নাকি?

হ্যাঁ। তা তো শুনলুম। বীরেন্দ্র খুব হেসেছিলেন। রুনু লাইন ক্লিয়ার করে রেখেছে।

বনশোভার বিশ্বাস হয় নি। মঞ্জুকে বিয়ে করবে কী। মঞ্জু স্কুল ফাইনালটাও পাস করে নি। তা ছাড়া ওর কত বদনাম বকুলপুরে। ছেলেদের সঙ্গে রোয়াকে বসে আড্ডাবাজী করে। বাঁকা-চোখা কথা বলে। চাউনি, হাবভাব আর সাজগোজ দেখে মনেই হয় না ভদ্র-পরিবারের মেয়ে। রুনু মঞ্জুকে বিয়ে করবে—ওর কি মাথা খারাপ হয়েছে?

অনেক রাতে নৃপেন ফিরলে বনশোভা বলেছিলেন, রুনু শোন। তোকে একটা কথা বলব?

নৃপেন মিষ্টি হেসে বলেছিল, কী এমন কথা রে—অমন করে বলছিস?

তুই নাকি মঞ্জুকে বিয়ে করবি?

নৃপেনের মুখটা ঈষৎ গম্ভীর হয়ে উঠেছিল। কিছুক্ষণ চুপচাপ সিগারেট টানার পর আস্তে বলেছিল, তোকে আমার লুকোনোর কিছু নেই দিদি। তোকে কখনও কিছু গোপন করি নি। অবশ্য তুইও করিস নি। তো কথা হচ্ছে, আমি মঞ্জুর প্রেমে পড়ি নি। তুই তো জানিস, এ স্বভাব আমার নেই। সময়ও নেই। পৃথিবীতে অনেক করার মতো কাজ আছে। কতটুকুই বা করতে পারলুম? তো...

নৃপেনের এই এক অভ্যাস ছিল। স্পষ্ট উচ্চারণে অনেকটা সময় নিয়ে কথা বলত। হয়তো বক্তৃতা করে এমনটা হয়েছিল, বনশোভা ভাবতেন।

নৃপেন একটু চুপ করে থাকার পর বলেছিল, জাস্ট একটা জেদ! মধুদা অসম্ভব ভাল মানুষ। তাঁর স্ত্রীও গোবেচারা, নেহাত গেঁয়ো মেয়ে। মধুদার বাড়ি যেই যাক, তাকে বাড়ির একজন করে ফেলতে ওঁদের দেরি সয় না। কিন্তু এই সুযোগটা নিয়েছে কিছু হারামজাদা মাস্তানমার্কা ছেলে। কলোনী পাড়ার টাইগারের নাম শুনেছিস?

শুনেছি হয়তো! কেন?

টাইগার নারানদার গ্রুপের লোক। আগে নকশালী করে বেড়াত। নারানদা ওকে রিক্রুট করেন। যাই হোক, এই ব্যাটা টাইগার আমার চোখের সামনে মঞ্জুর আঁচল টেনে ধরেছিল।

নৃপেন ফের চুপ করেছিল। বনশোভাও তাকিয়েছিলেন চুপচাপ।

আমার চোখের সামনে। নৃপেনের চোয়াল শক্ত দেখাচ্ছিল। গলার ভেতর কথা। আমাকে দেখে বলল, রুনুবাবু, দেখলেন নাকি? মঞ্জু কিছু মাইণ্ড করে না। কাজেই আপনারও মাইণ্ড করা ভুল। কীরে মঞ্জু, তুই বল! মঞ্জু বলল, রুনুদা, তোমরা থাকতে। সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক হচ্ছে কেন গো?...আমার মাথার ভেতর আগুন ধরে গেল। কিন্তু তুই তো জানিস, আমি কখনও মেজাজ খারাপ করি নে। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে জানি। রাজনীতি করতে করতেই এটা শিখেছি। যাই হোক, পরে একদিন মধুবাবুকে কথায় কথায় বললুম, মঞ্জুকে কি চিরকাল ঘরে আইবুড়ো রাখার সংকল্প করেছেন মধুদা? অমনি, বললে তোর অবাক লাগবে, মধুদা সোজা বলল, তুমি ওকে বিয়ে করবে নেপেন? তোমাকে আমার বরাবর পছন্দ। মুখ ফুটে বলা হয় না। তোমরা বকুলপুরের বনেদী ঘরের ছেলে।

একটু হেসে বনশোভা বলেছিলেন, তুই অমনি হ্যাঁ বললি?

নৃপেন বাঁকা মুখে বলেছিল, হ্যাঁঃ!

কিন্তু ও তো শুনেছি ভাল মেয়ে নয়। ওকে তুই জেনে-শুনে বিয়ে করবি?

নৃপেন চোখে হাসি নিয়ে বলেছিল, ওকে আমার শায়েস্তা করতে হবে না? আমার সংস্পর্শে এসে কতজন অটোমেটিক্যালি শায়েস্তা হয়ে যাচ্ছে। কত ডেস্ট্রাকটিভ এলিমেন্টকে কনস্ট্রাকটিভ করে ফেললুম এ যাবৎ। তবে আসল কথাটা শোন। ইদানীং আমার ধারণা, মঞ্জু আসলে হয় তো আমার নজর কাড়তে চায়। ও যেন আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে ওসব করে।

বনশোভা হেসে ফেলেছিলেন। তা হলে বল তোকে ভালবাসে?

নৃপেন মোটা গলায় বলেছিল, অসম্ভব নয়।

বনশোভা দাদা বীরেন্দ্রকে কোনোদিনই নৃপেনের কোনো গোপন কথা বলে দেন নি। বীরেন্দ্র মনে করতেন, মধুবাবুর সঙ্গে রাজনীতি করতে গিয়ে নৃপেন মঞ্জুর প্রেমে পড়েছে। তা মন্দ কী! ভালই! মেয়েটা দেখতে মোটামুটি সুন্দরী বলা যায়। লেখাপড়াটা একটু কম। তা হোক। নৃপেনের মত গোঁয়ারকে জব্দ করতে ওই রকম একটা তেজী ধরনের মেয়ে দরকার।

পরশু রাতে খেতে বসেও বীরেন্দ্র বলছিলেন, রুনু বোধ করি লজ্জায় আমাকে বলতে পারছে না। ওকে জিজ্ঞেস কর না বনি, আমি আগ বাড়িয়ে মধুবাবুর কাছে যাব নাকি?

বনশোভা বলেছিলেন, যেতে হবে না। মধুবাবুই নিজে কথা তুলেছেন।

কথা তুলে চুপ করে আছেন কেন? আমার কাছে আসুন। আমি তো রুনুর মরাল গার্জেন। কিছুক্ষণ রুটি চিবুনোর পর বীরেন্দ্র ফের বলেছিলেন, আজ যেন কোথায় বড় মিটিং আছে রুনুর?

বাবলবুনিয়ায়। মিনিস্টার আসবেন বলছিল।

ও। তা হলে তো দেরি হবে ফিরতে। বীরেন্দ্র ঘড়ি দেখে বলেছিলেন। বরং আমি বাইরের ঘরে একটু গানবাজনা নিয়ে বসি। তুই বসবি নাকি? বীরেন্দ্র চোখ নাচিয়ে একটু ঝুঁকে বলেছিলেন ফের, আজ একবার বস্ না বনি। অনেককাল তোর গান শুনি নি। অন্ততঃ আমাকে মাঝে মাঝে রিলিফ দিবি।

বনশোভা বলেছিলেন, ভ্যাট! ভুলে গেছি গান-ফান। তুমি একা গাও। শ্রোতা হিসেবে আমাকে পাবে। তবে দেখবে, শেষ পর্যন্ত অসংখ্য শ্রোতা এসে দরজার কড়া নাড়বে। তখন ঠেকিও।

এখন বোঝা যায়, সে রাতে কী ঘটেছিল। বাবলবুনিয়া ছিল নৃপেনের দলের বিরোধীদের বড় একটা ঘাঁটি। সেখানে বড় মিটিং, মিনিস্টার আসা, এদিকে মধুবাবুর মেয়ের সঙ্গে নৃপেনের বিয়ের অনিবার্যতা—এইসব মিলিয়ে দাদা-বোনের মনে একটা সুখের জোয়ার এসে গিয়েছিল।

অনুরাধা এসে বাড়ির শূন্যতা অনেকটা ভরে গেছে। কিন্তু কিছুদিন সে নেই। বাচ্চা হতে বাপের বাড়ি কলকাতা গেছে! বাড়ি আবার বড্ড ফাঁকা লাগছিল। এমন একটা সময়ে নৃপেনের বউ আসার সম্ভাবনাটা খুব সুখবরের মত। বনশোভা কল্পনায় আরও দুটি মেয়েকে দেখতে পাচ্ছিলেন—যারা বাড়ির ভেতরটা উজ্জ্বলতা, চাঞ্চল্যে ভরে তুলেছে! মঞ্জু যাই হোক, এ বাড়ির একজন হয়ে উঠবে—সেটাই বড় কথা। অবশ্য মেয়েটা বনশোভাকে দেখলেই কত খাতির যত্ন করে। ভীষণ চঞ্চল। আগ বাড়িয়ে আলাপ ওর জুড়ি নেই বকুলপুরে। একটু বেশী কথা হয় তো বলে। তা বলুক। কথা বলা ভাল। বনশোভার আজকাল প্রচুর কথা শুনতে ইচ্ছে করে। তার ভেতরকার আবহমান গুরুভার স্তব্ধতা অসহ্য হয়ে উঠেছে ক্রমশঃ। স্মৃতি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—অন্ধকার কোণ থেকে ক্রমশঃ আলোর দিকে এগিয়ে আসছে। বনশোভা কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন।

ও ঘরে গিয়ে তক্তপোষে বসে তরফদার সেতারটা কোলে তুলে হঠাৎ বীরেন্দ্র বলেছিলেন, আচ্ছা বনি, কদিন থেকে পান্নাকে দেখছি না কেন রে?

ক'দিন থেকে কী? কাল দুপুরেই খেয়ে বেরিয়ে গেল। বনশোভা বলেছিলেন। বলল, চাকরি পেয়েছে কলকাতা না কোথায় যেন। জয়েন করতে যাচ্ছে।

অ্যাঁ? বীরেন্দ্র নড়ে বসেছিলেন। পান্না চাকরি পেয়েছে? সেকি? যা, বাজে কথা।

বলল তো। বনশোভা আনমনে বলেছিলেন। আমি বিশ্বাস করি নি। তাই তোমাকে বলি নি।

বীরেন্দ্র একটু চুপচাপ থাকার পর বলেছিলেন, ও বরাবর এ রকম। তবে চাকরির ব্যাপারটা সত্যি হতেও পারে। আমি ওকে যেন দরখাস্ত লিখতে দেখেছিলুম কবে। ইদানীং একটু খুশী-খুশী মনে হত না ওকে?

অত লক্ষ্য করি নি।

আমি করেছি। বীরেন্দ্র সেতারের খাপ খুলে বলেছিলেন, তুই ডিটেলস জিজ্ঞেস করলেই পারতিস বনি।

করেছিলুম। শুধু বলল, অ্যাপ্রেনটিসের চাকরি। কারখানায়।

তা হলে ঠিকই। ঠিকই চাকরি পেয়েছে। কিন্তু ওভাবে আমাদের—অন্ততঃ আমাকে না জানিয়ে চলে যাওয়াটা উচিত হয় নি। টাকা-পয়সার দরকার নিশ্চয় ছিল। তা ছাড়া বেডিংপত্র—

শুধু একটা কিটব্যাগে জামা প্যান্ট-ট্যান্ট গুছিয়ে নিচ্ছিল দেখেছি।

সেতারের তারে সুর বাঁধতে বাঁধতে বীরেন্দ্র শেষ পর্যন্ত আগের সখের সেতারে ফের খাপ দিয়ে বলেছিলেন, পৌঁছে-টৌছে চিঠি লিখে সব জানাবে'খন। এ তো আর সেই বিপ্লব করতে যাওয়া নয়, চাকরি।

বনশোভা খেতে বসেছেন বেলা গড়িয়ে। বীরেন্দ্র অনেক আগে খেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন। কোথায় যাচ্ছেন বলে যান নি। অথচ খাওয়ার পর ছুটির দিনে তাঁর লম্বা ঘুমের অভ্যাস আছে। বীরেন্দ্রকে কাল থেকে আর শোকার্ত বলে হচ্ছে না! চেহারা বদলে গেছে রাতারাতি। হাবভাব অন্য রকম। একটু চঞ্চল ব্যস্ত এবং হয়তো বা দিশাহীন। পা বাড়াতে কত বার এখানে ওখানে ঠোক্কর খাচ্ছেন। বনশোভা লক্ষ্য করেছেন এসব। তাঁর খালি ভয় হচ্ছে, সদর রাস্তায় আজকাল যা বাস ট্রাকের উদ্দাম ছোটাছুটি আবার না একটা কিছু ঘটে যায়।

টেবিল চেয়ারে খাওয়াটা চালু করে গেছে নৃপেনই। রান্নাঘরের বারান্দাটা চওড়া। বনশোভা দরজার কাছে চেয়ারটায় বসে ভাত খুঁটছেন। একটু তফাতে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দু-পা ছড়িয়ে মেঝেয় বসে আছে টগরবালা। কাল থেকে সে প্রচণ্ড দার্শনিক। তার কথা : জীবনটাই এ রকম। পুত্রশোক ভুলেও তো মাকে কোমরে আঁচল জড়িয়ে ঘরকন্নার কাজে নামতে হয়। ঝড় আসে, ঘর ভাঙে। বন্যা আসে, ভাসিয়ে দেয় সাজানো সংসার। বৃক্ষে বজ্রঘাত হয়। তবু কি মানুষ আবার ঘর বাঁধে না? সংসার সাজায় না? নাকি বৃক্ষের বাজপড়া কালো ডালটার পাশে কচি পাতা গজায় না? এই হল গে নিয়ম। যে যায়, সে যায়। যে থাকে, সে থাকে। তাকে বাঁচতে হয়। বাঁচতে হলে দু' মুঠো গিলতেও হয়। একে তো যৌবন বয়সে বুকের ওপর এক বজ্রাঘাত গেছে। তারপর এই বেবং ঘা। মুখ তুলে তাকানো যায় না, কী ছিলেন দিদিঠাকরুণ—কী হয়েছেন—তা'পরে কী হলেন?

টগরবালা চোখ মুছছে। বনশোভা জানেন, মেয়েটার চোখে সত্যি জল আসছে। কিন্তু ওটা অভ্যাস। খেতে বসে কেউ ঘ্যানর ঘ্যানর করলে ভাল লাগে না। বনশোভা আস্তে বললেন, দেরি করছ কেন টগর? তিনটে বেজে গেছে।

হুঁ যাই এবার। বলে টগর পলকে মুখে একটু হাসি ফোটাল। ন্যাকড়ায় বাঁধা এনামেলের গামলায় প্রচুর ভাত তরকারি—ওপরে শালপাতা চাপানো আছে তুলে কাখে নিয়ে বেরিয়ে গেল। এই ভাতের জন্য ছোটবড় কয়েকজন মানুষ হা-পিত্যেশ করছে তার বাড়িতে। খিড়কি দিয়ে বেরুলে সিংহবাহিনীর মন্দিরবাড়ি। ভাঙা পাঁচিল গলিয়ে টগরকে একটা ধ্বংসস্তূপ ভেদ করে যেতে হবে। ওদিকটায় যেন হরাপ্পা। মৃত এক নগরী। তার ভূলুণ্ঠিত ইজ্জত প্রকৃতি করুণা ও মমতায় বুক দিয়ে ঢেকেছেন। টগর সেই হরপ্পার শেষ দিনগুলো দেখেছে। বনশোভাও দেখেছেন। টগর সেখান দিয়ে জোরে বেরিয়ে যাবে। একবারও পিছু তাকিয়ে দেখবে না। ভাববে না। কিন্তু বনশোভা তাকিয়ে দেখেন। ভাবেন। তাঁর স্মৃতি তীব্র। তা ছাড়া মানুষের বয়স যত বাড়ে, ছোটবেলার স্মৃতি তত সামনে এগিয়ে এসে দাঁড়ায়। আনমনে ভাবলেন, তখনকার দিন হলে কী ঘটতে পারত। বাড়িভরা লোকজন ছিল তখন। খুব একটা সাড়া ফেলে দিত রুনুর মৃত্যু। এই চাপা শোকের পাথর তাঁকে একা বইতে হত না।

বাইরের ঘরে আর কেউ নেই। বীরেন্দ্র বলে দিয়েছেন, পাহারার কী দরকার? তা ছাড়া এসব

শো আমার ভাল লাগে না। তোমরা তো জান, ভিড়ভাট্টা আমার ভাল লাগে না।

যুবনেতা তবু বলে গেছে, ঠিক আছে দাদা। তবে বলা রইল, প্রয়োজন হলেই খবর দেবেন। আমরা আছি।

ওরা হয়তো মনে মনে রাগ করেই গেছে। পেশী প্রদর্শনের খেলাটা বরবাদ করে দিলেন বীরেন্দ্র।

বনশোভা এক মুঠো ভাত তুলতে গিয়ে থামলেন। ওপাশের ঘরের বারান্দায় বড় বড় থাম আছে কয়েকটা। সেখানে যেন পায়ের শব্দ শুনেছেন এইমাত্র। এখান থেকে থামের আড়ালে দৃষ্টি পৌঁছয় না। বললেন, কে?

কোনো সাড়া এল না। তখন ভাতের ছোট্ট গ্রাসটা মুখে তুললেন। গেলার পর ফের মনে হল পায়ের শব্দ শুনেছেন। বীরেন্দ্র বাইরের ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে গেছেন। বনশোভার এতক্ষণে মনে পড়ল দরজাটা বন্ধ করে আসেন নি। একটু গলা চড়িয়ে বললেন, মাসীমা নাকি?

আমি।

সাড়াটা এল খুব আস্তে। একটু কাঁপা কাঁপা স্বর। বনশোভার স্বভাব সহজে চটে যান। বললেন, আমি কে?

আমি...আমি লালী।

কে? প্রায় চেঁচিয়ে বললেন বনশোভা।

থামের আড়াল থেকে কে একটু এগিয়ে ফাঁকা জায়গাটায় দাঁড়াল। চাপা, ভাঙাচোরা ভয় পাওয়া গলায় ফের বলল, আমি লালী।

বনশোভা কয়েক সেকেণ্ডের জন্য শক্ত হয়ে বসে রইলেন। চোখ দুটো নিষ্পলক হয়ে গেল। তাকিয়ে রইলেন মুখে কথা সরল না। কাঁধে লাল রঙের বেশ বড়-সড় একটা পলিথিন ব্যাগ ঝুলছে। মেয়েটিও স্থির চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকার পর কেমন একটু হেসে করুণ স্বরে বলল, আমার মা কই?

বনশোভা চেয়ার থেকে শান্তভাবে উঠলেন। এক ঢোক জল খেলেন। তারপর হেঁট হয়ে ঘটিটা তুলে নিয়ে গিয়ে টের পেলেন মাথা ঘুরছে। ওই অবস্থায় আঁচিয়ে নিয়ে আঁচলে মুখ মুছে আস্তে বললেন, যাচ্ছি।

রান্নাঘরের বারান্দা থেকে নামলে উঠোন। উঠোনে পুরনো লাইম কংক্রিটের চামড়া জায়গায় জায়গায় উঠে গেছে। শ্যাওলা জমে আছে। টলতে টলতে পা ফেলছিলেন বনশোভা। উঠোনটা এখন অথৈ সাগর, নাকি বহুদূরগামী এক রাস্তা। হাঁটছেন। রাস্তা শেষ হচ্ছে না। কিংবা ভাসছেন তো ভাসছেন, তীরের দেখা নেই। বনশোভা খুব শক্ত থাকার চেষ্টা করছিলেন। উঠোনটুকু পেরুতেই কি চুল পেকে দাঁত ভেঙে বুড়ি হয়ে যাবেন? মেয়েটার চোখে এখন ভয় পাওয়া চাহনি। চোখ দুটো চঞ্চল। একটু ভিজে ভাব। চোখের পাতা কাঁপছে।

সে ফের বলল, আমার মা কই?

বনশোভা সিঁড়িতে পা রেখে থমকে দাঁড়ালেন। শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল। হয়তো রাগে, হয়তো দুঃখে। অভিমানেও বা। ভুরু কুঁচকে বললেন, কে তোমার মা?

মায়া ভয় পেয়ে গেছে ভদ্রমহিলার হাবভাব দেখে। বারোটা বছর ধরে মনের ভেতর তার মায়ের একটা আদল গড়া আছে। সে তৈরী। সে জানে, মাকে দেখামাত্র চিনতে পারবে। চেঁচিয়ে বলবে, মা, আমি চলে এসেছি। বলার সুযোগ এখনও পাচ্ছে না। ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে এতক্ষণের উত্তেজনা। একটা হিড়িক ফেলতে চেয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে, অবাস্তব। আর ভদ্রমহিলা অসম্ভব রোগা, ডিমালো মুখের গড়ন, কোটরগত চোখ, ময়লা রঙ, নিষ্প্রভ শাড়ি, মাথায় তত বেশী চুলও নেই—কেমন গেঁয়ো চোখে তাকিয়ে যেন ভীষণ অবাক হয়ে দেখছেন তাঁকে।

মায়ার একবার মনে হল, বাড়ি চিনতে ভুল হয় নি তো? না না, ভুল হয় নি। পেয়ারা গাছটা ছিল বাইরের দিকের পাঁচিলের পাশে। ওখানে অবশ্য একটা ভাঙাচোরা দেউড়ি থাকার কথা। নেই। কিন্তু গাছটা তো ঠিকই আছে। তা ছাড়া যে লোকটাকে ছোটমামার নাম করে বাড়ির কথা জিগ্যেস করেছে, সেও আঙুল তুলে দেখিয়েছে বাড়িটা। বাইরের ঘরের দরজা বাতাসে একটু ফাঁক হয়েছিল। ওই ঘরটা তার স্মৃতিতে নেই। কিন্তু উঁকি মেরে ভেতরে বাদ্যযন্ত্র দেখে মনে পড়ে গেছে, বড়মামা

গান গাইতেন। আরও অনেক টুকরো ফিকে, অস্পষ্ট স্মৃতি আছে। বেশীটাই মিল ছিল না। তবে ওই পেয়ারা গাছটা শক্ত হয়ে মনের ভেতর দাঁড়িয়ে আছে। ঝাঁকড়-মাকড় গাছটা ছিল টুকটুকে হলুদ পাকা পেয়ারায় সাজানো। কতবার স্বপ্নে দেখেছে, সে পেয়ারা পাড়ছে। তাজা, রসাল, উজ্জ্বল বড় বড় সব পেয়ারা। এখন দেখেছে, তত কিছু নয়। স্বপ্নের তুলনায় এ একটা অত্যন্ত অনুজ্জ্বল, রোগা, বুড়ো গাছ। গাছটা অন্ধ হয়ে গেছে যেন। মায়া তাকালেও সে তাকাতে পারল না। অত বড় গাছটা ছিল, এখন কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল।

কিন্তু এই থামগুলো দেখামাত্র সে চমকে উঠেছিল। কোন থামটার গায়ে নাম লেখার চেষ্টায় সে ছুরির ডগা দিয়ে 'ল' লিখতে পেরেছিল। ঠাকুর্দা ডেকে ডেকে সবাইকে দেখাচ্ছিলেন। ঘটা করে হাতে খড়ি হয়েছিল লালীর।

খোদাই হরফটার ওপর কতবার চুনকাম হয়েছে, মায়া জানে না। তবু ঢুকেই হঠাৎ মনে পড়েছিল কথাটা। থামে এই আদ্যাক্ষর লেখার কথাটা বাবা অনেকবার বলতেন। খুব শিগগির হরফ চিনেছিল মায়া।

কে তোমার মা—শুনে ঘাবড়ে গেল মায়া!

আসার পথে সে কতবার ভেবেছে, মা যদি তাকে ফিরিয়ে দেন, কী হবে? আর কোথায় যাবে সে? প্রাণ গেলেও আর বকুলপুরে ফিরবে না বলে বেরিয়ে এসেছে। পিসীমা ঘুমোচ্ছিলেন। বাবা খেতে বসে কিছুক্ষণ বীরুর সঙ্গে কথা বলার পর বেরিয়ে গিয়েছিলেন ফের। হয়তো ফার্মেই গেছেন। জগাই বীরুর ঘরে গল্প করছিল। মায়া সিঁড়িতে সাবধানে পা ফেলে নেমেছে। তারপর গেট খুলে হনহন করে হেঁটে ঘুরপথে কালিকাপুর স্টেশন রোডে পৌঁছেছে। পৌনে তিনটে নাগাদ একটা বাস ছাড়ে স্টেশন থেকে। বকুলপুরের পাশ দিয়ে শহরে চলে যায়। এ পথেই মায়া কলেজ যাতায়াত করে।

মায়া ঢোক গিলল। জলতেষ্টা পেয়েছে। শুকনো গলায় বলল, আমি কালিকাপুর থেকে আসছি। এ বাড়িতে আমার মা থাকে। আমার বড়মামার নাম বীরেন্দ্রনাথ...

সে থেমে গেল। বনশোভা সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলেন। তারপর হাত তুলে আচমকা চড় মারলেন মায়ার গালে।

তারপরই চেরা গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, মাকে চিনিস নে বাঁদরমুখী?

এবং দম টেনে বিকৃতমুখে কেঁদে দু-হাতে মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

মায়ার মুখটা তাঁর বুকে।

একটু পরে বনশোভা তেমনি হঠাৎ শান্ত হয়ে গেলেন। মায়ার মুখটা দু'হাতে তুলে চঞ্চল চোখে চুল থেকে চিবুক অব্দি খুঁটিয়ে দেখলেন। মায়ার ফর্সা গালটা লাল হয়ে গেছে। সেখানে ঝুঁকে ঠোঁট রাখলেন বনশোভা। তারপর তার কাঁধে হাত রেখে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন।

মায়া মুখ নামিয়ে লাজুক স্বরে বলল, চিনতে পারি নি।

বনশোভা শান্তভাবে বললেন, বসো। তারপর ওর কাঁধ থেকে ব্যাগটা নিয়ে টেবিলের ওপর রেখে দিলেন।

মায়া একটু হাসল। আমাকে চিনতে পেরেছিলে মা?

বনশোভাও হাসলেন। মাথাটা আস্তে দোলালেন। বললেন, খেয়ে এসেছিস?

হ্যাঁ। অনেক আগে। মায়া ঘরের ভেতরটা দেখতে দেখতে বলল। তুমি বুঝি এত দেরি করে খাও?

জবাব দিলেন না বনশোভা। মেয়েকে তন্ময় হয়ে দেখছেন। স্মৃতির সঙ্গে মেলাচ্ছেন।

মায়া ফের বলল, আমি কিন্তু একেবারে চলে এসেছি। তোমার কাছে থাকব।

দশ

ফার্মের মাঠে দাঁড়িয়ে ছিলেন যোগব্রত। বিস্তীর্ণ এই সমতল মাঠে দাঁড়িয়ে বিকেলটা উপভোগ করার অভ্যাস তাঁর। আগের দিনে মাঠটা ধু-ধু করত। এখন যেদিকে চোখ যায়, চাপ চাপ সবুজ রঙ। হঠাৎ মনে হবে শরৎকাল। পশ্চিমে ধনুকের মতো বেঁকে চলে গেছে পাকা সড়ক এক শহর থেকে অন্য শহর ছাড়িয়ে সীমান্তের দিকে। উঁচু উঁচু গাছগুলো পাঁচিলের মতো দেখায়। সূর্য সেই

পাঁচিল বেয়ে নামছে। মেঘ জমে আছে রঙবেরঙের। তার আড়ালে সূর্যটা টকটকে লাল চাকার মতো। সূর্য ডুবলেই মাঠ জুড়ে এক আশ্চর্য শান্ত আলো জেগে ওঠে। ওই সময়টা বড় ভাল লাগে।

প্রায় সত্তর একর মাটি জুড়ে কো-অপারেটিভ চাষবাস। অসংখ্য সেচের নালা রয়েছে। তার দু' পাড়ে গুঁড়ো দুধের মতো সাদা নরম মাটিতে অড়হরের বীজ বোনা হয়েছিল। সে-রাতের বৃষ্টিতেই চারা মুখ বাড়িয়েছে। কতক্ষণ ঘোরাঘুরি করে এবং হাঁটু দুমড়ে বসে যোগব্রত দেখেছেন। এ ব্যাপারটা বরাবর তাঁর ভারি আশ্চর্য ঘটনা মনে হয়। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না অঙ্কুরোদগমের সময়টাকে। কীভাবে কোথা থেকে প্রাণ আসে? স্থানকালে নিজেকে ছড়িয়ে দেয়। এর উদ্দেশ্যই বা কী? ভাবতে কিন্তু কালীতলার যুগলকে মনে পড়ে যায়। অমনি হেসে ফেলেন যোগব্রত।

একদিন ক্ষমাকে বলেছিলেন, তোর লোকটা দার্শনিক। জানিস ক্ষমা?

কী? ক্ষমা ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছিল। কী বললেন ছোটবাবু?

মুশকিল, শব্দটা ক্ষমাকে বোঝানো যাবে না। অনেক ভেবে বলেছিলেন, খুব জ্ঞানীলোক আর কী। সেই সে আগের দিনে যাদের বলত 'ডাকপুরুষ' না কি যেন?

হুঁ। ডাকের পুরুষ। ক্ষমা হেসে খুন। তবে ওই মুখটুকুন সার ছোটবাবু। এদিকে লবডঙ্কা।

কেন? আর কী চাস ওর কাছে?

কী চাইব আবার? কিচ্ছু না। ক্ষমা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল কিছুক্ষণ। তারপর ফের একটু হেসে বলেছিল, তা হঠাৎ ওকে ডাকের পুরুষ বলা কেন, শুনি?

আজ আমাকে খুব জ্ঞান দিয়েছে জানিস? যোগব্রত বলেছিলেন।

আপনাকে? ও মা! আমার কী হবে?

শোন্ না। তখন নদীর ধারে ভাঁড়ুলে গাছটার তলায় দেখি চুপচাপ বসে আছে। আমাকে দেখেই বলল, আচ্ছা ছোটবাবু, আপনি তো শিক্ষিত মানুষ। বলুন তো, মানুষ বেঁচে আছে কিসের জোরে? কোন্ ভরসায় বা ঘরদোর বানাচ্ছে, পোশাক পরছে। খাচ্ছে-দাচ্ছে ঘুমোচ্ছে। বলুন?

হুঁ। তা আপনি কী বললেন?

বললুম, অত ছাই কি জানি আমি? তুই বল্ না যুগল, শুনি। তখন যুগল বলল, কথাটা ভাবতে অবাক লাগে ছোটবাবু! মরণ তো মানুষের ছায়া হয়ে ঘুরছে। কারণ মরণকে সঙ্গী করেই মায়ের পেটে মানুষের জন্ম। যমজ ভাইয়ের মতো একসঙ্গে জীবন-মরণ জন্ম নিয়েছে পৃথিবীতে। দু' ভাইয়ে কত কানামাছি খেলা, কত ভাব ভালবাসা, আবার ঝগড়াঝাঁটিও। অথচ মরণকে এত ভয়। আবার মরণ আছে জেনেও তার ভয় তুচ্ছ করেও মানুষ ঘরদোর বানাচ্ছে। খাচ্ছে-দাচ্ছে শুচ্ছে। যত ভাবি, আমার অবাক লাগে।

যোগব্রত একটু চুপ করে থেকে ফের বলেছিলেন, বুঝলি ক্ষমা? বহুকাল আগে সায়েবদের দেশে একজন ডাকপুরুষ ছিলেন। তাঁর নাম সক্রেটিস। অবিকল এই কথাগুলো বলতেন। আর তাঁর বউ ছিল কেমন জানিস? তোর মতো দজ্জাল মেয়ে। স্বামীর মাথায় গরম জল ঢেলে দিত।

ক্ষমা নাকছাপি খুঁটছিল। চোখ পাকিয়ে বলেছিল, বেশ করত।

যুগলের গায়ে গরম জল ঢালিস নাকি?

না। জোড়া পায়ের লাথি মারি বুকে।

এ্যাঁ! বলিস কী?

ছাড়ুন তো ওসব কথা।

ছাড়ব কী? যুগল তো আজ আমার মাথায় ভীষণ ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে। শেষে বলল কি জানিস? বলল, এই যে ছোটবাবু, আপনি মাথা উঁচু করে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আপনার পেছনে কিন্তু ছায়া। বলে যোগব্রত অবিকল যুগলকে নকল করেছিলেন। হুঁ গো ছোটবাবু! ছেঁয়াতে আর আপনাতে রিপ্তিটাক ফারাক বই লয়। ছেঁয়ার ছোঁওয়াটি লাগল কী ধপাস করে পড়লেন। আর উঠলেন না। ব্যস। হল।

একটা বুড়ো আঙুল বাঁকা করে যুগলের মতো কাঁধের পেছনটা নির্দেশ করে যোগব্রত এত জোরে হেসেছিলেন যে চোখে জল এসে গিয়েছিল। বলেছিলেন, জল দে ক্ষমা। তেষ্টা পেয়েছে।

ক্ষেমার হাতের জল না হলে ছোটবাবুর তেষ্টা মেটে না তো!

মেটে না রে! কই, জল দে।

একটু আগে বাবলবুনিয়ার ফজল আলি এসেছিল। একটা চাকরি-বাকরি চাই তার। জেলে বেতের কাজ শিখে এসেছে বটে, ওতে পেট ভরবে না। আর তার বিশ্বাস, শরীরে পারার বিষ ঢুকিয়ে দেয় জেলে। ভেতরটা ফোঁপরা হয়ে যায়। মারদাঙ্গা করার তাকত খুইয়েছে সে। অতএব ছোটবাবু তার একটা হিল্লে করুন।

ফার্মে নাইট-গার্ড আছে দুজন। যোগব্রত রাতে হঠাৎ এসে দেখেছেন, তারা মাঠ ঘুরতে বেরোয় না। সারা ফার্ম এলাকা কাঁটাতারের বেড়ায় ঘেরার প্রস্তাব আছে। কিন্তু একসঙ্গে ওটা সম্ভব হয় নি। অনেক টাকা খরচ। পিলার করা হয়ে গেছে। একটু একটু করে এগোচ্ছে কাজ। গত শীতে প্রায় তিন একর জমির ধান কেটে নিয়েছিল চোরেরা। কিন্তু ফজল কি এ কাজ নেবে? যোগব্রত বলেছেন, পরশু-তরশু একবার এসো। ভেবে দেখি কী করা যায়।

কাল ম্যানেজিং কমিটির মিটিং আছে। কথাটা তুলে দেখবেন। অবশ্য তাঁর কথার অমত হবে না কারুর। কিন্তু ফজল লোকটাকে সামলানোর প্রশ্ন আছে। সূঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরুবে না তো? এ ফার্মে বেনামী মেম্বার অর্থাৎ ভুয়ো শেয়ারের ব্যাপার আছে। জগাই, মায়া, মনোরমা এমন কী ঝি-চাকরদেরও কেউ কেউ মেম্বার। তাদের নামে জমি আছে বেনামীতে। ফজল প্রমথদের লোক ছিল একসময়। বাবলবুনিয়ার প্রমথরা তখন বেদলে ছিল। এখন বিজয়েন্দুর দলে ঢুকেছে। তবে বিজয়েন্দু আছেন যখন, তখন প্রমথরা গণ্ডগোল করতে পারবে না।

এই সুন্দর বিকেলে এইসব চিন্তাভাবনা বড্ড তেতো লাগে। পৃথিবীতে অনেক মুহূর্ত আসে, অনেক দৃশ্য দেখা যায় এবং অনেক মুখের সামনে দাঁড়াতে হয়, যখন বাকি সব ব্যাপার নিষ্ফল হয়ে পড়ে থাকে পায়ের তলায়। মনে হয়, সামনেরটাই সত্য এবং অনেক বড়।

দার্শনিক যুগলের বউটার সামনে দাঁড়ালে ঠিক এরকম লাগে।

সন্ধ্যার দিকে একবার কালীতলা ঘুরে এলে মন্দ হত না। কিন্তু গত রাত থেকে একটা ভয় আবছায়ার মতো দূর থেকে তাঁকে অনুসরণ করছে। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ মনে হচ্ছে, কেউ পেছনে আসছে। সারাক্ষণ দূরে কোথায় কার চাপা পায়ের শব্দ। গাছের আড়ালে পাখিমারা মুসহরের মতো এক জোড়া তীক্ষ্ণ চোখ।

ছোটবাবু! ছোটবাবু!

সূর্য ডুবে গিয়ে সেই আশ্চর্য ধূসর আলোটা জেগে উঠছে কালিকাপুরের পশ্চিমমাঠে। মাথার ওপর কাকের ঝাঁক। মাঠচরা চড়ুইরা কিসের উত্তেজনায় ছটফট করে বেড়াচ্ছে এবং অজস্র কথা বলছে। এ সময়টা কিছু একটা ঘটতে থাকে প্রকৃতিতে। কিসের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। প্রাণীরা ব্যস্ত হয়ে ওঠে। আকাশ বদলে যেতে থাকে। কেউ আসবে বলে—কোনো বড় ঘটনা ঘটবে বলে একটা চাপা হুলস্থুল পড়ে যায় যেন।

ছোটবাবু! ছোটবাবু!

শুনেও শুনছিলেন না যোগব্রত। তাঁকে লোকেরা বড্ড বেশি ডাকে। ভেবে দেখলে এটা খুব বিরক্তিকর। কিন্তু এই তো জীবন তাঁর। যেদিন তাঁকে এমন করে কেউ ডাকবে না, সেদিন থেকে বাঁচাটা কঠিনই হবে। সে তো বিশাল শূন্যতা। একা হয়ে যাওয়া। পিছিয়ে পড়া যূথ ভ্রষ্ট হয়ে।

জগাইয়ের গলা বুঝতে পেরেই মুখটা ঘোরালেন। খামারবাড়ির ফসল মাড়াইয়ের সাদা উঠোন ডিঙিয়ে থপথপ করে পা ফেলে আসছে সে। আটচালায় রাখা ট্রাক্টারের পেছনে থেকে ডিস্কহ্যারো খুলে ট্যাংকের চৌবাচ্চায় ধুতে নিয়ে যাচ্ছে জব্বার আলি। গোডাউনের দরজার সামনে উঁচু চত্বরে বসে নামাজ পড়ছে তার বাবা। হরিসাধন আপিস ঘরের বারান্দায় বসে চা খাচ্ছে।

জগাইয়ের মুখেচোখে আতঙ্কের ছাপ। ঠোঁট ফাঁক করা। যোগব্রত চমকে উঠেই শক্ত হয়ে দাঁড়ালেন। একটা গিঁট খুলে গেছে কি প্ল্যানিংয়ের? কোন্‌টা খুলল? যেটাই খুলুক, বীরুর কথাই প্রথমে মনে হল। বীরুর জ্বরটা দিনে আর আসে নি। কিন্তু মনোরমাকে বোকা ভাবা যায় না!

যোগব্রত ঠাণ্ডা গলায় বললেন, কিছু বলার আগে চুপচাপ দাঁড়া কিছুক্ষণ। তারপর বলবি।

জগাই দাঁড়াল। হাঁফাতে থাকল।

বস্। বসে পড়্। একটু জিরিয়ে নে।

জগাই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বসেই পড়ল। তাকিয়ে রইল ঘোলাটে চোখে। ওর এরকম চোখ দেখলে কেমন চমক লাগে। লুপ্ত কোন প্রজাতির প্রাণীর চোখ যেন—একদা যারা পৃথিবীতে ছিল এবং আধিপত্যও ছিল। তাদের অসংখ্য ইন্দ্রিয় ছিল। হাজার হাজার বছর ধরে ক্ষয় হতে হতে পাঁচটায় এসে ঠেকেছে। এগুলোও একটা করে ক্ষয়ে যাচ্ছে। কারণ পৃথিবীতে আলো বাড়ছে। শব্দ বাড়ছে। ভিড় বাড়ছে। বাড়ছে গড়পড়তা আয়ু।

এবার বল্। যোগব্রত হাঁটু দুমড়ে সেচ নালার পাড়ে তার মুখোমুখি বসলেন। আস্তেসুস্থে বল্।

জগাই ঘড়ঘড় করে বলল, দিদিমণি চলে গেছে।

কে চলে গেছে?

দিদিমণি।

কোন দিদিমণি?

জগাই রাগ করে বলল, আবার কে? মায়া দিদিমণি।

হুঁ। কোথায় চলে গেছে?

বকুলপুরের মায়ের কাছে। একটা চিঠি...

বড়দি ঠাকরুণকে চিঠি লিকে গেছে—মায়ের কাছে চললুম। আর আসব না।

মায়া লিখে গেছে?

আজ্ঞে।

কখন গেল?

তা কি কেউ জানে? জগাই হতাশ ভঙ্গীতে বলল। কখন লুকিয়ে বেরিয়ে গেছে।

কেউ দেখে নি?

জগাই অপরাধীর মতো মাথাটা দোলাল। ওব আক্ষেপের সেই চেনা ধ্বনিটা বের করে দিল, আঃ-হাঃ। এবং সে নাকটাও ঝাড়তে ভুলল না।

যোগব্রত একটু চুপ করে থাকার পর নিশ্বাস ফেলে বললেন, ঠিক আছে। তুই যা। চুপচাপ চলে যাবি, বুঝলি? আমি যাচ্ছি 'খন। আর দিদিকে বলবি যেন চুপ করে থাকে।

জগাই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

যোগব্রত ধমক দিলেন। কী দেখছিস হাঁ করে? যা—আমি যাচ্ছি একটু পরে। যা বলেছি, দিদিকে বলবি।

জগাই উঠল। আস্তে আস্তে পা ফেলে চলে গেল। যোগব্রত তীক্ষ্ণ দৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। হরিসাধন তাকে কী জিজ্ঞেস করল। জগাই তাকাল না। খামারের লোকেরা কাজ ফেলে এদিকে তাকিয়েছিল। জগাইকে তারাও জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে? জগাই যে কাকেও জবাব দিল না, যোগব্রত বুঝতে পারছিলেন।

সিগারেট বের করে আস্তে-সুস্থে ধরালেন যোগব্রত। পা দুটো ভারি মনে হচ্ছে। মাথার ভেতরটা হঠাৎ ফাঁকা লাগছে! আঙুলগুলো কাঁপছে। তাহলে আবার বনশোভার কাছে শোচনীয়ভাবে হেরে গেলেন!

কিন্তু এখনও বিশ্বাস করতে বাধে। নিছক স্বপ্ন মনে হয়। মায়া এভাবে চলে গেল? যেতে পারল? নাকি কোথাও বুঝতে কিছু ভুল হয়েছে মনোরমার? নিশ্চয় ভুল হয়েছে। কিংবা মায়া রাগ করে নদীর ধারে গিয়ে কোথাও চুপ করে বসে আছে। সবটাই চালাকি মায়ার। আস্তে আস্তে পা বাড়ালেন যোগব্রত।

হরিসাধন বলল, কী হয়েছে স্যার?

কী হবে? যোগব্রত ফ্যাকাসে মুখে একটু হাসলেন। জগাইটা বরাবর এরকম। দিদির জ্বর হয়েছিল। একটু বেড়েছে। তাই ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

সিরিয়াস নয় তো স্যার?

না না। তেমন কিছু না।

হরিসাধন পা বাড়িয়ে বলল, সাইকেলে করে বকুলপুরে যাব স্যার?

কেন?

মাখন ডাক্তারকে ডাকতে।

আরে না, না। ব্যস্ত হয়ো না। বলে যোগব্রত এগিয়ে গেলেন। আপন মনে ফের বললেন, আমি গিয়ে দেখছি।...

এক রাতের জ্বরেই বীরুর মনে হচ্ছিল, শরীরটা থেঁতলে জড়িয়ে মড়িয়ে গেছে। হাঁটতে গিয়ে টের পেল, বোঝা টানছে। সর্দি ভাবটা যাচ্ছে না। বুকে শ্লেষ্মা জমে আছে। কাসি হচ্ছে। সবচেয়ে মুশকিল সিগারেট টেনে সুখ পাচ্ছে না।

নব ঠাকুর আদার রস মেশানো চা খাইয়েছে। তার সঙ্গে খুব তেতো আলাপ হল বীরুর। গ্রামীণ সন্দিগ্ধতা এখনও আছে লোকটার চোখে। মনোরমার সামনে সেটা নিষ্প্রভ ছিল। একলা মুখোমুখি হয়ে তাই জেরার চোটে রাগিয়ে দিচ্ছিল বীরুকে। দাদাবাবুকে তো এর আগে কখনও দেখি নি। শুনলুম ছোটবাবুর পিসতুত ভাই। তাই বুঝি? তা হ্যাঁগা, আপনারাই? তা হ্যাঁগা, আপনারাই তাহলে টাউনের বাড়িটা কিনেছিলেন? তবে যে শুনলুম কোন রেফুজিকে বেচেছিল? যাক গে, মরুক গে। কী করা হয় দাদাবাবুর? ক'দিন থাকা হচ্ছে? গেরামটা কেমন লাগছে? আপনারা হলেন গে শউরে মানুষ। এ আদাড় গাঁয়ে কি মন টানবে?

এসব কথার পালটা হিসেবে বীরু শুরু করল, তোমার নাম নবচন্দর বুঝি? ওই রকম? সে আবার কী বাবা? কোথায় থাকা হয় বাবার? গেরামের ভেতরে? বেশ, বেশ। গেরামের ভেতরে মানে তো ঘরে? কিসের ঘর—মাটির না ইটের? ও বাবা, ইটের? ভাল। বাবা নবচন্দরের বউ-টউ আছে তো? আছে? সত্যি বলছ? যাঃ। বিশ্বাস হয় না। ও বাবা, ছেলেমেয়েও আছে? চলো, দেখতে যাব। যাওয়া হবে না এখন? বেশ, রাত্তিরে যখন বাড়ি ফিরবে, তখনই যাব। যাব না? কেন বাবা?

নব বুঝতে পারছিল, শউরে দাদাবাবু খাপ্পা হয়েছে। অপ্রস্তুত হয়ে চোখ পিটপিট করতে করতে কাঁচুমাচু হেসে সে কেটে পড়ল। বীরু এর আগেও দেখেছে, পাড়াগাঁয়ে এ ধরনের গায়ে জ্বালা ধরানো লোক আছে। অচেনা লোক দেখলেই চারিদিক থেকে টেপাটেপি করে এবং খুঁচিয়ে দেখতে থাকে জিনিসটা কী।

মনোরমা কাছাকাছি কোথাও নেই হয়তো। থাকলে তেড়ে আসতেন। বাড়ির কাজের লোকেদের আড্ডা পছন্দ করেন না। বীরু লনে বেরুল। গাছপালার মাথায় শেষ বিকেলের দিকে রোদ্দুর ঘনঘন রঙ বদলাচ্ছে। আকাশের কোনায়-কোনায় মেঘ নড়াচড়ার দরুনই এমনটা হয়। গরমটা আবার পড়েছে। কাল এতক্ষণ জ্বর এসে গিয়েছিল। এখন যখন গরম লাগছে, তখন জ্বরটা আর আসবে না ধরে নেওয়া যায়।

হঠাৎ বীরুর এই পরিবেশটা কদর্য লাগল!

সে অস্থির হয়ে উঠল। ভিড়ে ও কোলাহলে তার জন্ম। আলো শব্দ উজ্জ্বলতায় তার বেড়ে ওঠা। এই গভীর স্তব্ধতা তার ধাতে আর সয় না। এক সময় কিছুকাল জেদ করে সইয়ে নিয়েছিল। তার মনে হয়েছিল, সমাজটা ভেঙে নতুন করে গড়ার সময় হয়েছে। কিন্তু ঠকল। শিখল সব অদলবদল যেন বাইরে-বাইরে। অদলবদলের কথা সবচেয়ে জোর গলায় যারা বলছে, তারাই ধাপ্পাবাজ। আড়ালে বসে আছে এক ধুরন্ধর জাদুকর। ওই জাদুকাঠি বুলিয়ে ভেল্কি লাগিয়ে দিচ্ছে। তাঁবুর পেছনের পর্দা তুলে একে একে কতজন পালিয়ে এল বীরুর মতো। পান্নার মতো। টাইগারদা ও মোবারকের মতো।

অনেকদিন বাদে চারজন একসঙ্গে জুটেছিল একটা ঘরে। ব্যাপারটা এক নাটকের পরের অংশ বলা যায়। বীরু এসেছিল পান্নার সঙ্গে। পান্নাও জানত না, এই 'অপারেশনে' আর কে কে থাকবে? প্রথমে ঢুকল মোবারক। মোবারকও জানত না আর কারা থাকবে? শেষে ঢুকেছিল স্বপন নন্দী—বকুলপুরের টাইগারদা। সে থমকে দাঁড়িয়ে আঙুল তুলে একেক জনকে দেখে ফিক করে হেসে উঠেছিল। অপারেশন সাকসেসফুল! কই নীরেনদা! আমার সেলামী ছাড়ো আগে।

এখন না। বেরুবার সময় খাস বাবা।

কখন বেরুব?

লোক এসে খবর দেবে'খন।

কোথাকার লোক?

বস্ তো বাবা! চা-টা খা।

না। আগে জিনিসটি দর্শন করাও।

ব্রাণ্ডিব বোতল দেখে টাইগারদা তো রেগে লাল। বাঙাল ভাষায় অকথ্য-কুকথ্য বলতে শুরু করেছিল। নারাণবাবু নামে প্রৌঢ় ভদ্রলোক হাসিমুখে সব হজম করলেন। এমন কী, হালায় আমাগো রুগী পাইছে বাক্যটাও। শেষ পর্যন্ত টাইগারদা ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে সাবধানে ওঁর কাঁধের ভারি কিটব্যাগটা কোনায় রেখেছিল।

একটা স্কুলবাড়ির পেছনে ছায়ায় বসে ব্রাণ্ডিটা চারজনে শেষ করেছিল। তারপরই ঝড়টা এসে পড়ে।

অনেকদিন বাদে রক্তেব নামে ঝিমধরা শরীরটাই বদলে চাঙ্গা হয়ে গিয়েছিল। চরম মুহূর্তের সেই উত্তেজনা এখনও মনে আছে। বাইরে ঝড়। রক্তের ভেতর ঝড়। এতটুকু আতঙ্ক নেই তখন। অতীত ভবিষ্যৎ মুছে গেছে। শুধু টগবগে তাজা বর্তমানকে পায়ে মাড়িয়ে নাচছে। দূরে উঁচুতে গাছপালাব ফাঁকে আলো দেখেই টাইগারদা বলেছিল, পজিশান নাও! অমনি পান্না বীরুকে টেনে বাস্তা পেরিয়ে আমবাগানে ঢুকেছিল। বীরু একবার বলেছিল, যদি বাস বা ট্রাক হয়?

পান্না বলেছিল, বোঝা যাবে। তবে বাস এত রাতে নেই। ট্রাক হতে পাবে। হলে পিছিয়ে আসব।

পুলিসের গাড়ি?

চলে গেছে সব।

জীপে কে থাকবে বে?

জানি না। চুপ বড্ড কথা বলছিস তুই।

পান্না জীপে পুলিস থাকলে কিন্তু..

দ্যাখ বীরু, ইট ইজ ফাইন্যাল। আমাদের টার্গেট একটা জীপ। দ্যাটস অল। পুলিস হয় হোক।

ঝড়ের মধ্যে তীব্র হলুদ দুটো আলো এগিয়ে আসছিল। আলো দুটো এপাশ ওপাশ কবে যেন টলতে টলতে আসছিল। হঠাৎ বীরু লক্ষ্য করেছিল, বকুলপুর অন্ধকার হয়ে গেছে কখন।

পান্না উঠে দাঁড়িয়েছিল। রেডি! কাম অন্।

বীরুর দু' হাতে দুটো গ্রেনেড। ক্যাপসুলের মাথা দাঁতে চেপে ধরে এগিয়ে গিযেছিল। কে জীপ থেকে চেঁচিয়ে উঠেছিল এ্যাই!...

জগাই পাশ দিয়ে থপথপ করে বেরিয়ে গেল। এত জোরে ও হাঁটে না। কোথায় যাচ্ছে অমন করে? বীরুকে দেখেও দেখল না।

বীরু পা বাড়াল। গেট খুলে বেরিয়ে উদ্দেশ্যহীন হাঁটতে থাকল। এই সরু রাস্তার ধুলোটা লাল। কোনকালে ইট বিছানো হয়েছিল। এবড়ো-খেবড়ো হয়ে আছে। বাঁ দিকে যোগব্রতের বাড়ির নীচু পাঁচিল, ডাইনে আন্দাজ এক-দেড় মিটার উঁচু বাঁধ। নীচে ঢালু হতে হতে মাটিটা নদীতে নেমে গেছে। ঝোপ-জঙ্গল গাছপালায় ঢাকা। একটা ফাঁকা জায়গা পেয়ে ঢালু বেয়ে বীরু নামতে থাকল। আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে/বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে। পদ্যটা মনে পড়ল বীরুর। হাঁটু জলও নেই। একপাশ দিয়ে যেন চুপি চুপি তিরতির করে ভীতু একটু জল গড়িয়ে যাচ্ছে। জুতোর সোলও ডোবে না। জগাই বলেছে, ওদিকে বাঁধ বেঁধে জল আটকানো হয়েছে। বাঁধেব গা বেয়ে ঝর্ণার মতো একটু-আধটু ঝরে যাচ্ছে। সেই দিয়ে এখানটায় উপোসী নদীর গলা ভেজানো একটুখানি।

জলটা পেরিয়ে সোনালী বালির চড়া। বীরু নাকে রুমাল ঢাকল তক্ষুণি। কী নোংরা স্বভাব এদের! সে জলের ধারে ধারে হাঁটতে থাকল। কিছুদূর এগিয়ে নদী ডাইনে দক্ষিণে ঘুরেছে। পশ্চিমে টানা বাঁশবন বলে সেখানে নদীর তলায় এখনই ঘন ছায়া। অন্ধকারের ছোপ। পাড়টা এবার এদিকটায় খাড়া হয়ে উঠেছে। ভাঙনের দাগ রয়েছে গায়ে। আরও কিছুটা এগিয়ে সে উঁচু দেয়ালের মতো পাড়ের একটা জায়গায় সরু রাস্তা দেখতে পেল। পাড়টা চিরে নেমে এসেছে রাস্তাটা।

ওপরে উঠে বীরু উলটো দিকে তাকাল। সামনে কয়েক টুকরো ক্ষেতের ওপারে একটা রাস্তা দেখা যাচ্ছে। খানিকটা উঁচু রাস্তা। দুধারে গাছপালা লাগানো হয়েছে ইটের জাফরির ভেতর। কচি গাছ মাথা তুলেছে। একটা জাফরির ওপর পা ঝুলিয়ে বসে একটা লোক সুতো পাকাচ্ছে। বীরু এগিয়ে গেল।

যেতে যেতে একবার পিছু ফিরে দেখে নিল, যোগব্রতের বাড়িটা কোথায়? তখনও দিনের আলো ফুরিয়ে যায় নি। গাছপালার ভেতর আবছা লাল বাড়িটা চেনা যায়।

লোকটা তাকে দেখে তাকিয়ে আছে। সুতো কাটা বন্ধ করেছে। সবচেয়ে চোখে পড়ার মতো ওর চওড়া বুকটা। তামাটে রঙ গায়ের। বড় বড় দুটো হাত দাগড়া দাগড়া শিরায় ভর্তি। মুখটা লম্বাটে এবং নাকটা বেশ মোটা, কিন্তু উঁচু এবং তীক্ষ্ণ। কান দুটো বেমানান বড়। এক কানের লতিতে ছোট্ট তামার বালি ঝুলছে। গলায় তুলসীকাঠের মালা। হাঁটু অব্দি ময়লা ধুতি জড়িয়ে-মড়িয়ে পরা। দুটো শান্ত নিষ্প্রভ চোখে চেয়ে আছে। তাকে দেখছে। তার শরীর একটুও নড়ে না আর।

বীরু রাস্তায় উঠে বলল, এই রাস্তাটা কোথায় গেছে দাদু?

কালকেপুর ইস্টিশেনে।

বীরু হাসল। লোকটা কথা বলতে পারে তাহলে। আর এদিকে কোথায় গেছে দাদু?

টাউনে।

বীরু একটু ভেবে বলল, বাস যায় না এ রাস্তায়?

যায়। একটু আগে গেল ইস্টিশেনে। একটু বাদে আসবে। টেরেনের সঙ্গে সময় বাধা।

বীরু ইটের জাফরিতে ওর একটু তফাতে বসে বলল, সুতো তৈরি হচ্ছে? কী হবে সুতো দিয়ে?

লোকটা জবাব না দিয়ে নীরস গলায় বলল, বাবুর কোথা আসা হয়েছে?

ওই যে, যোগব্রতবাবুর বাড়ি। বীরু আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল।

অ। আপনি ছোটবাবুর কেউ হন বুঝি?

বীরু জানে ইচ্ছে করেই গলা পেতে দিয়েছে। দ্রুত বলল, আমি যোগব্রতবাবুর পিসতুতো ভাই। বেড়াতে এসেছি। থাকি টাউনে। কিছুদিন থাকতেও পারি এখানে, নাও পারি। হয়তো একটু পরে যে বাসটা আসবে, সেটাতেই ফিরে যেতে পারি। কিছু ঠিক নেই।

আপনি হাঁফাচ্ছেন কেন গো? শরীল ঠিক আছে তো?

বীরু একটু অবাক হল। লোকটার অবজার্ভেশন আছে। বলল, হ্যাঁ। এসেই জ্বর বাধিয়েছি। তার ওপর নদীটা যা ডিপ--মানে গভীর। পাড়ে উঠতে হাঁফিয়ে গেছি। যাক্ গে। তুমি কি কালিকাপুরের লোক?

আজ্ঞে না। আমি ওই যে দেখছেন, ওই ধুয়োর মতো গাঁখানা—ওই কালীতলার লোক।

এতদূরে কী করছ?

ঘুরে বেড়াচ্ছি।

বলো কী! এতদূরে ঘোরাঘুরি করো নাকি?

অব্যেস। বলে সে একটু হাসল। আকাশের দিকে মুখ তুলে ফের বলল, এই দেখলেন এখানে বসে আছি, খানিক পরে দেখবেন ওই ক্যানেলের বিরিজে বসে আছি। কখনও নদীবাগেও যাই। গাছতলায় গিয়ে বসি। এই করেই চলে যাচ্ছে আজ্ঞে! সময় তো নদীর ধারা। কে বেঁধে রাখবে? এখানে একবার ওখানে একবার, মাছের মতো টুঁ মেরে ভেসে বেড়াই। কখনও উজোনে, কখনও ভাটিতে। কেটে যায় দিন।

মাই গুডনেস! বীরু নড়ে বসল। তুমি মাইরি ফিলসফার দাদু।

আজ্ঞে?

নাও। একটা সিগারেট খাও।

সে হাত নেড়ে বলল, চলে না বাবুমশাই। কোনো নেশার অব্যেস নেই।

বাঃ! তোমার নাম কী দাদু?

যুগলো বলে সবাই ডাকে। যুগল। বলে সে সুতোর খেই টাকুতে জড়িয়ে নিল। ফের বলল, আপনার যোগব্বতোবাবু—মানে আমাদের ছোটবাবু আমাকে ভালই চেনেন। বলবেন যুগলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

বুঝে ফেলবেন।

বীরু আনমনে বলল, বুঝে ফেলবেনটা কী?

যুগল জবাব দিল না। তোবড়ানো গা টাকুর ডগা দিয়ে চুলকে বলল, টর্চলাইট সঙ্গে নেই গো! সন্ধ্যাবেলার মুখে বেরিয়ে পড়েছেন। ঠিক হয়নি।

কেন?

এই মানে পোকামাকড়ের কথা বলছি। এ সময়টা ওনাদের জোড়বাঁধার কাল। মেজাজ টং হয়ে থাকে। যুগল ভয় দেখানো ভঙ্গীতে বলতে থাকল। আজকাল অবিশ্যি তত বেশি আর ডংশন হয় না। কত রকম পোকামারা বিষ বেরিয়েছে। ভুঁইক্ষেতে ছড়ানো হচ্ছে। তার ওপর লোকের চলাচলও বেড়েছে মাঠঘাটে। ইলেকটিরি আলো আর ওই পাম্পের ভটভটানি সারাক্ষণ রাতভর। তিষ্ঠুতে পারে না। তা হলেও সময়ের একটা দোষ-গুণ আছে বাবা, বুঝলেন? একটা সময় আপনি গায়ে হাত রাখুন, আদর কাড়ার মতো চুপ করে থাকবে। আবার একটা সময় ছায়া নড়লেই ডংশাবে। একটু চুপ করে থেকে গলার আতঙ্ক মেশানো বিষণ্ণতা ঝেড়ে ফেলে ফের যুগল বলল, তবে দু'পেয়েকে সবার বিষম ভয়। বিষম। শব্দ করে হাঁটুন। সরে যাবে। কারণ কি না, মানুষ হল সাংঘাতিক জীব। উরে ব্বাস! এর চেয়ে সব্বনেশে আর আছে কে চরাচরে?

বীরু সিগারেটের ধোঁয়ায় রিং বানাতে বানাতে বলল, তুমি ঠিকই বলেছ ফিলসফার।

যুগল সাগ্রহে বলল, কথাটার অর্থ বাবুমশাই?

জ্ঞানী মানুষ আর কি।

যুগল খুকখুক করে লাজুক হেসে বলল, আপনিও ছোটবাবুর মতো ঠাট্টা করছেন?

যোগব্রতদা তাই বলেন বুঝি?

আজ্ঞে।

তোমার বউ নেই?

আছে বই কি।

ছেলেপুলে?

সে বালাই নেই। কবে একটা হয়েছিল, আঁতুড়েই চলে গেছে। যুগল ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলল। ঘুরে বলল, বাবুর নামটা জানতে ইচ্ছে করে।

বীরু।

বীরু?

হ্যাঁ। বীরু দূরে বাসের আলো দেখতে পেল এতক্ষণে। ধূসর আলোটা গাঢ় হয়ে গেছে। দূরে আঁধার ছমছম করছে। মাঠের এখানে ওখানে সবে একটা করে আলো জ্বলে উঠল। হলদে রঙের একটা করে ছোট ঘর ক্ষেতের মাথায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছিল কখন থেকে। ঘরগুলো কিসের হতে পারে? যুগলের কাছে জেনে নেওয়া যাবে। সে বাসের আলো দেখতে থাকল। সাদা দুটো হেড-লাইট এপাশ-ওপাশ করে এগোচ্ছে। চাপা উত্তেজনায় শরীর অবচেতনে চনমন করে উঠল। চোয়াল শক্ত হয়ে গেল।

বীরুবাবু!

বীরু চমকে উঠল। কয়েক সেকেণ্ড লেগে গেল বর্তমানে ফিরতে।

তারপর বলল, কী?

কী হল গো?

কী হবে?

যুগল পা বাড়িয়ে দিল মাটিতে। নেমে বলল, যাবেন তো চলুন, ছোটবাবুর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি।

বীরু স্বপ্নে হাঁটার মত পা বাড়াল। তার পাশে শব্দ করে পা ফেলছে যুগল। এবড়ো-খেবড়ো পাথরকুচি বিছানো রাস্তাটা পায়ের তলায় যেন নড়াচড়া করছে।

যুগল বলল, কপালের লেখন বলে একটা কথা আছে বীরুবাবু। কথাটা ফালতু। দেখেশুনে পা ফেলাটাই বড় কথা। তবে কি জানেন, যে যার মরণ সঙ্গে করে নিয়ে পৃথিবীতে আসি? আপন-

আপন পছন্দমত। সেটা বুঝতে পারি নে, এই হল গে সমিস্যে। সবাই তো ভাবি, বিছানায় আরামে শুয়ে মরণ হোক। শেয়রে আত্মপরিজন বসে থাক। সুখেই মরি। কিন্তু তা কি হয়? কারুর হয়, কারুর হয় না।

লোকটা এত মৃত্যু-মৃত্যু করছে কেন? বীরুর খারাপ লাগছে। যেন ভয় দেখাচ্ছে তাকে। বীরু বলল, পেছনে বাস আসছে হে ফিলজফার! সরে এস। এক্ষুনি 'মরণ' হয়ে যাবে।

হুঁ, জানি। সময় হলে সরব।

বাসটা আলোয় প্রায় ঝলসে দিচ্ছে। বীরু সরে গেল এক পাশে। যুগল অন্য পাশে। বাসটা হর্ন দিতে দিতে বেরিয়ে গেল। এবার অন্ধকারটা চোখে জোর ধাক্কা দিল। বীরু বলল, কই? কোথায় তুমি?

আছি। রাস্তার মাঝ দিয়ে আসুন। যুগল তেমনি শব্দ করে হাঁটতে লাগল।

কিন্তু তারপর চুপচাপ একেবারে। বীরুও চুপ। ক্লান্ত।

কিছুক্ষণ পরে যোগব্রতের বাড়ির গেটে পৌঁছে বীরু বলল, বাপস্! তুমি না থাকলে আজ ফেরাই হত না। কী? ছোটবাবুর সঙ্গে দেখা করে যাবে না।

যুগল বলল, আজ থাক।

জগাই বারান্দায় বসেছিল। বলল, কে? যুগলো নাকি হে? অনেকদিন পরে! এস, এস।

বীরু বলল, যোগব্রতদা ফেরেন নি?

হুঁউ। এই তো এক্ষুনি ভটভটে নিয়ে বেরুলেন। পথে দেখা হয় নি? বলে জগাই এগিয়ে এল।

যুগল বলল, তা হলে কাপাসতলা হয়ে গেছেন। ছোটবাবুর ভটভটের কাছে সব পথই পথ। আসি হে জগাইদা।

একটু বসবে না?

না। বলে যুগল চলে গেল। বীরুর দিকে আর তাকালও না। একটু খারাপ লাগল বীরুর।

জগাই বলল, বড়দিঠাকরুণ খুঁজছিলেন বাবুদাদা। আর একটু দেরি দেখলে লণ্ঠন নিয়ে বেরুতুম।

বীরু বল, একটা চেয়ার নিয়ে এসো না জগাইদা। এখানেই বসি। আর দেখ তো, এক কাপ চা পাওয়া যায় নাকি?

জগাই চেয়ার আনতে গেল। বাড়িটা আরও বেশী স্তব্ধ মনে হচ্ছিল বীরুর। ওপরের ঘরগুলোতে আলো জ্বলছে। কিন্তু কেউ কথা বলছে না। মায়াকে সেই সকালে দেখেছে, তারপর মায়া যেন গর্তে লুকিয়ে গেছে। মেয়েটাকে ট্যাকল করা কঠিন। অথচ একটা জেদ ধরতে ইচ্ছে করছে বীরুর, একটা কিছু মীমাংসা করতে পারলে অস্বস্তিটা কাটত। সে তাকে ভাড়াটে খুনী বলেছে। বীরু সত্যি কি তাই? বীরু, তুই কি তাই? এমন করে মুখের ওপর কোনোদিন কেউ তোকে এমন কথা বলতে পারে নি। বীরু, লজ্জায় ঘৃণায় ধিক্কারে তোর মাথা কাটা যাচ্ছে না?

বীরু এখানে থাকতে পারবে না। যোগব্রতের ফার্মে কোথায় মাঠের মধ্যে জলকাদায় চাষাভুষোদের মত চাকরি-বাকরি! দূর দূর! বীরু এজন্য জন্মায় নি পৃথিবীতে। আসলে যোগব্রত তাকে যেন নিজের পাহারায় রাখতে চান। এটাই কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মত।

জগাইয়ের পেছন পেছন মনোরমা এলেন। বেড়াতে বেরিয়েছিলে বুঝি? আমি তো ভাবনায় পড়ে গিয়েছিলুম। অজানা জায়গা। তার ওপর সঙ্গে আলো-টালো নেই। দিনকাল খারাপ।

বীরু বলল, দিদি বসুন। জগাইদা, আর একটা চেয়ার আনো।

মনোরমা বললেন, থাক। জগাই, নব চায়ের জল চাপাল নাকি দেখে আয়। তুমি বসো ভাই। শরীর কেমন? জ্বরটর আসে নি তো আর?

না। বীরু একটু ইতস্ততঃ করে বলল, মায়া বুঝি পড়তে বসেছে?

মনোরমা দু' পা এগিয়ে এসে চাপা গলায় বললেন, তোমাকে কী লুকোব ভাই? তুমি আমাদের ঘরের ছেলে। হতভাগী মেয়েটা দুপুরবেলা কখন চলে গেছে।

বীরু চমকে উঠল। চলে গেছে মানে!

চিঠি লিখে গেছে, বকুলপুরে মায়ের কাছে যাচ্ছে। আর ও বাড়ি আসবে না।

কেন?

হাতের তালু চিত করে একটু নেড়ে বাঁকা ঠোঁটে মনোরমা বললেন, কে জানে? যোগো হয় তো বকুলপুরেই গেল। আমার তো বুক কাঁপছে। ওখানে গিয়ে গণ্ডগোল বাধাবে নাকি? তোমার শরীর ভাল থাকলে যেতে বলতুম। যতক্ষণ না ফেরে, ঘরবার করতে হবে।

বীরু কোনো কথা বলল না। কিন্তু তার শরীরের ভেতরটা হঠাৎ হিম হয়ে গেছে। এতকাল বাদে সামান্য একটা মেয়ে তাকে যেন ধাক্কা দিয়ে একটা গভীর গর্তে ফেলে পালিয়ে গেল।

এগার

বিজয়েন্দুর দরবার আজ সারাদিন। বকুলপুরে থাকলেই এ রকম। কলকাতা গিয়েও অবশ্য রেহাই পান না। কিন্তু সেখানে আশি লক্ষ লোকের ভিড়ে গা-ঢাকা দিয়ে থাকা সোজা। এখানে পিঁপড়ের গর্তে লুকিয়ে থাকলেও লোকেরা খুঁড়ে বের করবে। হাজার আরজি পেশ করবে। লোকের চাওয়াব শেষ নেই। খাঁই-খাঁই ভাবটা বেড়ে যাচ্ছে। অভিযোগের পাহাড় জমিয়ে ফেলছে।

রেজলাপাড়ায় সারা বছর বোমাবাজি, তীরধনুক আর পাইপগানের লড়াই চলছে। গাঁয়ের শান্তিপ্রিয় জনসাধারণের পক্ষ থেকে ডেপুটেশন এসেছে। বিজয়েন্দুর স্বরভঙ্গ সেরে গেছে। বললেন, পুলিস কিছু করছে না বলছেন। ধরে নিচ্ছি, তাই। কিন্তু ভেবে দেখুন, থানা পিছু বিশ-তিরিশখানা করে গ্রাম। ওরা কতক্ষণ কোথায় ল অ্যাণ্ড অর্ডার নিয়ে যুঝবে? সরে এলেই দুর্বৃত্তরা ফের মাথা তুলবে। আসল সমস্যাটা কী জানেন? তা হল গ্রামের কৃষিতে সারপ্লাস পপুলেশান। এরা নতুন জেনারেশন গ্রামে। এদের শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ নেই। কোনো কাজকর্ম পাচ্ছে না। অথচ অধিকাববোধ জন্মে গেছে। এদেব জন্য আমরা কিছু করি নি। এদের কথা ভাবছিও না। এদিকে গ্রামে গ্রামে এইসব অশিক্ষিত বেকাব 'সারপ্লাস পপুলেশন' রক্তবীজের মত বাড়ছে। এবা করবেটা কী তা হলে? চুরি করবে। ছিনতাই কববে। ডাকাতি করবে। রাহাজানি করবে। এরা সেকালের ভাড়াটে লাঠিয়ালদেব মতো ভাড়াটে খুনী হবে। এদের কোনো দোষ নেই। দোষ আমাদের। বলুন না, দেশের লক্ষ লক্ষ গ্রামে গ্রামপিছু কতজন করে পুলিস দরকার তা হলে? এবং সেই পুলিসের পক্ষে কি এদের দমন করা সম্ভব? কাজেই আমাদের অন্য কিছু ভাবা দরকার আজ। এই সারপ্লাসদের পুনর্বাসনের জন্য অ্যাগ্রেরিয়ান ইণ্ডাস্ট্রি কবা দরকার। অসংখ্য কুটিরশিল্প করা দরকার। কিন্তু আমরা স্বার্থপর। নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি করে মরছি।

বিজয়েন্দু ক্লান্ত হয়ে চুপ করলে কোনার দিক থেকে বীরেন্দ্র বললেন, একস্ট্রিমিস্টরা তো ওদেরই কাজে লাগতে চেয়েছিল। আমার ধারণা, ফের কাজে লাগাতে চাইবে। ফের একটা একস্ট্রিমিস্ট ওয়েভ আসবে।

বীরেন্দ্র কখন থেকে এসে বসে আছেন। কেন এসেছেন বলেন নি। বিজয়েন্দু আঁচ করেছেন, নৃপেনের ব্যাপারেই এসেছে। বীরেন্দ্রের এ কথায় একটু অবাকও হলেন। বীরেন্দ্র কদাচ দেশের ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে মুখ খুলেছেন বলে মনে পড়ে না। বিজয়েন্দু একটু হেসে বললেন, ঠিকই বলেছেন, বীরেনদা। আপনার সঙ্গে আমি একমত। যে নতুন ফোর্সটাকে কনস্ট্রাকটিভ করা যেত তা ডেস্ট্রাকটিভ হয়ে যাবে। আমরা ঠেকাতে পারব না।

তারপর ঘুরে রেজলাপাড়ার ডেপুটেশনকে বললেন, ঠিক আছে। আপনারা এখন আসুন। আমি দেখছি কী করা যায়। পুলিস সুপারকেই বলতে হবে। লোকাল পুলিসকে দিয়ে কিছু হবে না।

লোকগুলো ভীষণ আশা নিয়ে এসেছিল। আশা-নিরাশায় দুলতে দুলতে চুপচাপ চলে গেল। বিজয়েন্দু চুরুট ধরিয়ে ফিক করে হেসে বললেন, রেজলাপাড়া তো? ব্রিটিশ পিরিয়ডেও কি কম ছিল? স্বভাবদুর্বৃত্তের আখড়া ওটা। তবে তখন ওদের সংখ্যা কম ছিল। এখন বেড়েছে। লাঠি ও হেসোর বদলে মর্ডান উইপনস হাতে নিয়েছে।

বীরেন্দ্র বললেন, তার সঙ্গে রাজনীতিও জড়িয়ে গেছে। পলিটিক্যাল পার্টি ওদের আশ্রয় দিচ্ছে।

দিচ্ছে। আই এগ্রি। বলে দীর্ঘ এক মিনিট চুপচাপ চুরুট টানলেন বিজয়েন্দু। তারপর ভুরু একটু তুলে গলা কিছুটা চাপা করে বললেন, বলুন দাদা এবারে। অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি।

বীরেন্দ্র ক্ষুব্ধভাবে বললেন, তিনটে দিন পেরিয়ে গেল। পুলিস একটা অ্যারেস্ট পর্যন্ত করল না!

বিজয়েন্দু একটু ঝুঁকে তেমনি চাপা স্বরে বললেন, আপনি শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি বীরেনদা। আপনাকে বলেই বলেছি। ওবেলা ওসি ভদ্রলোক এসেছিলেন। যা শুনলুম, ভরসা পাচ্ছি না। এ কী অবস্থা হচ্ছে? আমরা কোথায় যাচ্ছি?

বীরেন্দ্র আগ্রহে বললেন, কী?

ডিটেলস বলা যাবে না বীরেনদা। বিজয়েন্দু উদাস চোখে তাকিয়ে বললেন। শুধু আভাসে বলছি, এটা ফ্যাকশন্যাল সংঘর্ষের ব্যাপার। আমরা নিজেদেব পায়ে নিজেরা কুড়ুল মারছি। এর পেছনে এমন সব হাত আছে, যা সেই সেণ্টার অব্দি কানেকটেড। বুঝলেন? পুলিসের পক্ষে নাক গলানো অসম্ভব।

বীরেন্দ্র মনে জ্বালা নিয়ে বললেন, তা হলে এর কোনো প্রতিকার হবে না?

বিজয়েন্দু কেমন হেসে বললেন, আচ্ছা বীরেনদা, একটা কথা বলি শুনুন। জাস্ট কথার কথা মাত্র। ধরুন, ভগবান না করেন, এমনি বলছি। মনে করুন, এর মধ্যে যদি আপনাবই ছোট ভাই পান্না জড়িত থাকে। কী করবেন?

প্রায় আর্তনাদ কবে বীরেন্দ্র বললেন, পান্না?

উত্তেজিত হবেন না দাদা। এটা একটা কথার কথা। পান্না হলে আপনি কী করবেন?

শিক্ষকোচিত কণ্ঠস্বরে বীরেন্দ্র বললেন, সে তার পাপের শাস্তি পাবে। তাতে আমার এতটুকু দুঃখ হবে না।

ব্যাপারটা একটু জটিল, বীরেনদা। পান্না-টান্না কোন কথা নয়। বলে বিজয়েন্দু চুরুটের বাক্সো আব লাইটার তুলে নিলেন। আমার পক্ষে যতটা করার কবব। তাতে ত্রুটি হবে না। তবে আপন গড বলছি, আমি ফ্রাস্ট্রেশনে ভুগছি। দেখবেন, কবে না এসব ছেড়ে ছুড়ে গাউন পরে হাইকোর্টে যাচ্ছি।

বিজয়েন্দু।

বিজয়েন্দু উঠে দাঁড়িযেছেন। ঘড়ি দেখে বললেন, কাল কলকাতা চলে যাচ্ছি। সামনে অ্যাসেম্বলিব বর্ষা সেসন আসছে। শেষ করে বকুলপুরে ফিরব, একেবারে পুজোয়। আমাব নিজেরই হৃৎকম্প শুরু হযেছে তো..

বীরেন্দ্র আস্তে আস্তে উঠলেন। বললেন, সত্যি কি পান্না এর সঙ্গে জড়িত?

বিজযেন্দু জোর করে হেসে মাথা নেড়ে বললেন, আরে না না! জাস্ট একটা কথার কথা। দাদা, আপনি আমি—সব্বাই, প্রত্যেকটি নিবীহ নখদন্তহীন মানুষ আজ অত্যন্ত অসহায। মার খাওযা ছাড়া কোনো উপায় নেই।

বীরেন্দ্র কোনো কথা না বলে বেরিয়ে গেলেন।

আবার রাস্তার দিকে মুখটা ঝুলিয়ে আগের মতো হাঁটছিলেন বীবেন্দ্র। কানের ভেতর দিয়ে বিজযেন্দুর কথাটা মাথায় ঢুকে গেছে। মাছির মত ভনভন করছে। পান্না যদি জড়িত থাকে...পান্না যদি জড়িত থাকে...পান্না যদি জড়িত থাকে...পান্না যদি...

রুনু ও পান্নার মধ্যে একটা তীব্র বিরোধ গত সাত-আট বছরে একটানা ছিল। বীরেন্দ্র আড়চোখে তাকিয়ে ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছেন। নাক গলাতে পারেন নি। ভাইয়েরা তাঁকে পাত্তা দেয় নি কোনোদিন। কিন্তু ঝামেলা এড়িয়ে থাকার অভ্যাস বীরেন্দ্রের। গতিক বুঝলে দূরে দূরে সরে থেকেছেন। তাই বলে রুনু বা পান্না অন্ততঃ সামনাসামনি কোনোদিন দাদাকে অশ্রদ্ধা দেখায় নি, এটাও সত্যি।

নৃপেনকে বাড়ি ঢুকতে দেখলে পান্না বেরিয়ে যেত তক্ষুনি। এ এক অদ্ভুত অবস্থা। বনশোভা একটু তেজী স্বভাবের মেয়ে বলে নাক গলাতে গেছেন। কিন্তু মাঝখান থেকে অপমানিত হয়ে আড়ালে সরে গেছেন। তবে বনশোভার টানটা নৃপেনের দিকেই বেশী ছিল বরাবর। যোগব্রতের ব্যাপারে তো ভীষণ ছিল। নৃপেন যা বলেছে, তাই করেছেন বনশোভা। বীরেন্দ্র পারিবারিক কেলেঙ্কারির ভয়ে বনশোভাকে বোঝাতে চেয়েছেন। মানিয়ে নিতে উপদেশ দিয়েছেন। তখনকার মত বনশোভা চুপ করে থেকেছেন। কিন্তু রাতে নৃপেন ফিরে এসে ফের কী ফুসমন্তর ঢেলেছে কানে, বনশোভা ফের হিংস্র হয়ে উঠেছেন।

পান্না এ ব্যাপারে বীরেন্দ্রের অনুগামী ছিল। শুনেছেন, পান্না নাকি প্রায়ই কালিকাপুরে যায়-টায়। যোগব্রতের ওখানে থাকে। তাঁর মোটর সাইকেলের ব্যাকে বসে থাকতেও দেখেছে কেউ কেউ। এ নিয়েও রুনুর সঙ্গে বিরোধ বেড়েছে পান্নার। পান্না যেন রুনুকে চটাতেই যোগব্রতের সঙ্গে মেলামেশা করেছে।

কিন্তু তাই বলে রুনুকে খতম করতে চাইবে, এ হয় না। এ অবিশ্বাস্য। বিজয়েন্দু কেন পান্নার নামটাই করে বসলেন? হঠাৎ বীরেন্দ্র খাপ্পা হয়ে উঠলেন। চালাকিটা পুলিসের। আসল কালপ্রিটদের পাত্তা করতে না পেরে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাতে চাইছে। তাই তো করে পুলিস। এই তার ট্রাডিশন।

বিকেল গড়িয়ে গেছে। বাজারে এ সময়টা ভিড় ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। রাত ন'টা অব্দি এই কোলাহল। তারপর ফাঁকা হতে থাকে রাস্তাঘাট। সিনেমা ঘর হবার পর ভিড়টা এ বেলা এমন বেড়ে যাচ্ছে। তার সঙ্গে বাস রিকশো টেম্পো মিলে বকুলপুর টগবগ করে সেদ্ধ হচ্ছে যেন। পাখিডাকা শান্ত ভদ্র সেই বকুলপুর স্মৃতিতে চলে গেল। জেলাবোর্ডের এই রাস্তায় বড় জোর দু'ঘণ্টায় একটা করে বাস যেত। মাঝে মধ্যে ঘোড়ার গাড়ি। বর্ষায় রাস্তার জায়গায় জায়গায় এক হাঁটু কাদা জমত। একবার স্বয়ং এস. ডি. ও.-কেও বাস ঠেলতে দেখেছিলেন বীরেন্দ্র।

হাঁটতে হাঁটতে একখানে দাঁড়িয়ে গেলেন বীরেন্দ্র। আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে রইলেন। তা হলে রুনুর মৃত্যুর কোনো প্রতিকার হবে না?

চশমা খুলে চোখ রুমালে মুছে আবার পা বাড়ালেন। মাটির দিকে দৃষ্টি। টের পাচ্ছিলেন, ওপাশে একটা চায়ের দোকানে কারা তাঁকে নিয়ে ক্যারিকেচার করছে। হাসির শব্দ কানে আসছে। কিন্তু ঘুরে তাকালেন না। অনন্তকাল ধরে হেঁটে যাওয়ার মত পা ফেলতে থাকলেন বীরেন্দ্র।

বনশোভা বুঝতে পারছিলেন, লালীর এ চাঞ্চল্যে কোথায় একটা বড় ফাঁকি আছে। তাঁকে জড়িয়ে ধরে সন্ধ্যা অব্দি বাড়ির ঘরে ঘরে ছুটে বেড়ানো, অকারণ কোন কিছু দেখে মিথ্যে করে চিনেছি, সেইটে তো' বলে চেঁচিয়ে ওঠা, অত বেশী হাসি এবং পেছন দিককার ধ্বংসস্তূপে গিয়ে মায়ের কাঁধে হাত রেখে দাঁড়ানো—যেন বনশোভার ছোটবেলাটা তার নিজেরই ছোটবেলা ছিল—এগুলোর মধ্যে অনেক গণ্ডগোল আছে। বনশোভার বয়সী অভিজ্ঞ চোখে ধরা পড়ে যাচ্ছিল। লালী আসলে জোর করে নিজেকে মানিয়ে নিতে চাইছে এখানে।

তা তো স্বাভাবিকই। বনশোভাও অগত্যা ওর খেলায় যোগ দিচ্ছিলেন। তাঁর পক্ষে এটা প্রয়োজনীয়। অথচ বারবার এ কানামাছি খেলায় পায়ের তলায় খানাখন্দ এসে পড়ছে। দুজনেই হোঁচট খাচ্ছেন। হঠাৎ—হঠাৎ বনশোভার মনে হচ্ছে, মেয়েটা কে? কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে রক্তগত সম্পর্ক অনুভব করতে চাইছেন। কিন্তু কিছুতেই জোড় মেলাতে পারছেন না। ভাবছিলেন, সবই অভ্যাস। আস্তে আস্তে সহজ হয়ে যাবে ব্যাপারটা।

লালী কথায় কথায় কালিকাপুরের বাড়ির একশো নিন্দে করছে। তার ওপর ওই পিসীমাটা—যেন শূর্পনখা রাক্ষসী। মনোরমা কেমন করে পুজোয় বসেন, তাও দেখাল। বাবার সব আলমারি আর বাক্সের চাবি ওঁর আঁচলে। সব সময় একটা করে গুনে দেখবেন রিং থেকে পড়ে গেছে নাকি। পুজোয় বসেও তাই। আর কি ভীষণ কিপটে, জানো মা? জেলেবউ পুকুরে মাছ ধরার সময় বুকের কাছে একটা ছোট্ট মাছ লুকিয়ে রেখেছিল। তাও দেখেছে পিসীমা। দেখে মেয়েটা যখন চলে যাচ্ছে, খপ করে তার বুকের কাপড়ে হাত ঢুকিয়ে দিল। পার তুমি? বলো, পারতে?

তবে সবচেয়ে খারাপ লাগে, কেমন চুপচাপ ঝিমধরা অবস্থা। দিন কাটতে চায় না। সেই গাছপালা আর গাছপালা। বর্ষার সময় এলেই আতঙ্ক, এই বুঝি নদী এসে বাড়ি ঢুকল। জানো মা, গত ফ্লাডে আমাদের নীচের তলায় জল ঢুকেছিল? নীচের সব জিনিসপত্র ওপরে আনা হল। সারারাত আমি পিসীমা জগাইদা জেগে বসে আছি। টিপটিপ করে বিষ্টি পড়ছে। নদীতে কী ভীষণ সাউণ্ড! আর বাবা বেরিয়েছে নৌকা নিয়ে রিলিফ করতে। আমি তখন তোমার কথা ভাবছিলুম মা।

তাই বুঝি? বনশোভা মনে মনে জানলেন, লালী মিথ্যে বলছে।

তোমার গা ছুঁয়ে বলছি।

আমার কথা ভাবলে কবে তুমি চলে আসতে।

লালী কাঁচুমাচু মুখে বলল, আসতুম। কিন্তু ভয় করত।

কিসের ভয়?

যদি তুমি ফিরিয়ে দাও? যদি বলো, কে তুমি, চিনি না? চলে যাও।

তা কি পারি?

কিছু বলা যায় না। লালী ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, এসব কথা ভাবতুম না, যদি আমাকে চিঠি লিখতে। কেন লিখতে না মা? আমি তো কবে বড়ো হয়েছি।

বনশোভা আস্তে বললেন, চিঠি লেখার কথা ভাবিনি, তা নয়। গত বছরেও পুজোর সময় ছাদে দাঁড়িয়ে আছি। দেখছি, মেয়েরা সেজেগুজে বেরিয়েছে। হঠাৎ তোমার কথা মনে হল। নীচের ঘরে এসে লিখতে বসলুম। লেখার পর মনে হল, লালীর তো আমার কথা কিছু মনে নেই। যদি জবাব না দেয়? কিংবা যদি ওর বাবার হাতে ধরা পড়ে চিঠিটা? তাহলে...

আমার কলেজের ঠিকানায় লিখতে পারতে।

বনশোভা ওর চোখে চোখ রেখে বললেন, তুমি তো রোজ বকুলপুরের পাশ দিয়ে বাসে কলেজে যেতে শুনেছি। কেন একদিনও বাস থেকে নেমে অন্ততঃ দেখা করেও যাওনি লালী?

লালী বিষণ্ণ স্বরে বলল, আমার ভয় করত বললুম না? ভাবতুম, তুমি যদি কথা না বলো?

কিন্তু তোমার মামাদের সঙ্গে তোমার বেশ ভাব ছিল।

লালী কান্নার ভঙ্গী করে বনশোভার কাপড় খামচে ধরে তাঁর কাঁধে মুখ গুঁজল এবং তাঁর পিঠে মৃদু থাপ্পড় দিয়ে বলল, মারব! মেরে ফেলব বলে দিচ্ছি। তোমার সঙ্গে রাস্তাঘাটে দেখা হলে বুঝি ভাব হত না?

বনশোভা দুহাতে মেয়েব মুখ তুলে ধরে কপালে ঠোঁট ছোঁয়ালেন। বললেন, চলো। খুব হয়েছে। কিছু খেয়ে নাও। সেই কখন খেয়ে বেরিয়েছ।

এখন আমার কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না, মা। চলো— আবার ছাদে গিয়ে বসে থাকি।

যাচ্ছি'খন। চলো, একটু দুধ খেয়ে নেবে।

মা, তোমাদের গরু নেই?

না। তোমাদের আছে বুঝি?

এখন নেই! আগে ছিল। একটা লোক এক বালতি করে দুধ দিয়ে যায় রোজ।

বনশোভা হাসলেন। আমরা তো তোমাদের মত বড়লোক নই। এক বালতি নয়, এক ঘটি দুধেই চালিয়ে নিই। এস।

লালী পা বাড়িয়ে আনমনে বলল, তোমাদের এখানে বড্ড শব্দ। শহরের মত। বড্ড কানে লাগে।

বড় রাস্তার ধারে বাড়ি তো! সব সময় ট্রাক বাস যাচ্ছে। বনশোভা মেয়ের হাত ধরে রান্নাঘরের বারান্দায় গেলেন। ফের বললেন, তোমার নিরিবিলি থাকা অভ্যাস। তাই কানে লাগছে।

লালী শান্তভাবে চেয়ারে বসে বলল, ভিড় হট্টগোল আমার একটুও ভাল লাগে না। কলেজ করতে গিয়ে খালি ভাবি, কখন বাড়ি ফিরব। ছুটি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সোজা বাসস্ট্যাণ্ডে চলে যাই। কারুর বাড়ি না, সোজা বাসস্ট্যাণ্ডে। মা, তোমার মনে আছে—ওই গাছটার কথা?

কোন্ গাছটার কথা?

স্টেশন রোড থেকে আমাদের বাড়ি আসতে বিরাট বটগাছটা—ভাঙা মন্দির?

মনে আছে। কেন?

একদিন ভীষণ বৃষ্টি পড়ছে। বাসটা একটু লেট করল আসতে। সাড়ে ছ'টা বেজে গেল। মেঘে মেঘে তখনই একেবারে রাত্তির হয়ে গেছে। জগাইদা রোজ রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকে। নেমে দেখি, জগাইদা নেই। তখন...

ছাতা ছিল না সঙ্গে?

ছিল। কিন্তু কী ভীষণ হাওয়া দিচ্ছিল। লালী চোখ বড় বড় করে বলল। যেই বটগাছটার কাছে গেছি, বিদ্যুৎ চমকেছে—তারপর দেখি কী, একটা কালো মতো কী বসে আছে। আর আমি... মায়া

খিলখিল করে হেসে উঠল। দৌড় দৌড়। আছাড়-ফাছাড় খেয়ে শাড়ি ছিঁড়ে কাদা মাখামাখি করে বাড়ি পৌঁছলুম। তখন দেখি, জগাইদা লণ্ঠন নিয়ে বেরুচ্ছে। তারপর পিসীমা জগাইকে প্রচণ্ড চড় মারল। জগাইদা বলল, আপনার জন্যেই তো দেরি! জগাইদাকে জান তো? বাবাকেও মাঝে মাঝে কেয়ার করে না।

নাও। দুধটা খেয়ে ফেলো।

লালী দুধের গেলাসটার দিকে তাকিয়ে রইল।

কী হল?

তোমরা বুঝি কাচের গ্লাসে খাও? আমাদের বাড়িতে কাচের গ্লাস শুধু বাইরের লোকের জন্যে।

বনশোভা আহত হয়ে বললেন, আমরা তো তোমাদের মত বড়লোক নই। দাঁড়াও, এক মিনিট। বলে তিনি গ্লাসটা নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকলেন। আলমারিতে অনুরাধার বাপের বাড়ি থেকে আনা স্টেনলেস স্টিলের থালা বাটি গেলাস আছে। একটু ইতস্ততঃ করে আঁচলের চাবিগোছা থেকে খুঁজে খুঁজে চাবিটা বের করলেন।

একটু পরে স্টেনলেস স্টিলের গ্লাসে দুধটা ঢেলে নিয়ে এলেন। লালী বলল, না, না। খাব না।

সেকি!

আমি কি বলেছি, কাচের গ্লাসে খাব না? যাও, কাচের গেলাসে নিয়ে এস।

বনশোভা হাসতে হাসতে এক হাতে ওর মাথাটা ধরে অন্য হাতে গ্লাসটা ঠোঁটে গুঁজে দিলেন। তখন লালী নিঃশব্দে চুমুক দিল। তারপর গম্ভীর হয়ে বলল, ছাড়ো। খাচ্ছি।

বনশোভা বললেন, তুমি নতুন মানুষ এ বাড়িতে। আমারই ভুল হয়েছিল।

লালী যেন জোর করে দুধটা খেল। বনশোভা ঘটির জল হাতে নিয়ে ওর মুখটা ধুইয়ে দিলেন। আঁচলে মুছেও দিলেন।

লালীর যেন খারাপ লাগছে, আঁচ করছিলেন বনশোভা। বললেন, কী? ছাদে যাবে না?

লালী উঠে দাঁড়াল। ফের আগের মত হাসি ফুটল তার মুখে। চলো। বলে সে লাফ দিয়ে উঠোনে নামল। দৌড়ে সিঁড়িতে উঠে বারান্দায় গেল। বলল, আমাদের কাঠের সিঁড়িটা কিন্তু জ্যান্ত, জানো মা? তোমার মনে পড়ছে তো কোন সিঁড়িটার কথা বলছি?

তোমাদের সিঁড়ি তো একটাই। বনশোভা হাসতে হাসতে বললেন। মনে থাকবে না কেন?

লালী মুহূর্তে একটু ধাক্কা খেল বুঝি। বলল, আর সিঁড়ির দরকার কী?

বনশোভা সকৌতুকে বললেন, আর আমাদের ওপরে ওঠার সিঁড়ি দুটো। ওই একটা—আর এপাশে দেখতে পাচ্ছ? কেমন ঘোরানো লোহার সিঁড়ি। সিঁড়িটার বয়স কত জানো?

বীরেন্দ্র বাইরে কড়া নেড়ে ডাকছিলেন, বনি, বনি!

লালী বলল, কে ডাকছে মা?

তোমার বড়মামা। যাও, দরজা খুলে দাও।

লালী দৌড়ে চলে গেল। দরজা খুলে বাচ্চা মেয়ের মত চেঁচিয়ে উঠল, আমি এসে—ছি।

বীরেন্দ্র থমকে দাঁড়িয়েছিলেন।

লালী বলল, স্বপ্ন নয়, বড়মামা। ছুঁয়ে দেখ, আমি এসেছি।

ও, লালী! বীরেন্দ্র ভাগ্নীর কাঁধে হাত রাখলেন। যতটা অবাক হবার কথা, হলেন না। ফের বললেন, বাবা আসতে দিল তোকে? হুঁ, না দেবার কী আছে? আইনতঃ তুই তো এখন সাবালিকা। তোকে আটকে রাখার অধিকার তো কারুর নেই। তোর স্বাধীন ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। কখন এলি?

লালী দরজা বন্ধ করে বলল, অনেক আগে।

বীরেন্দ্র হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে বাতি জ্বেলে দিলেন। আয় লালী, বলে ওকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন।

বনশোভা দাঁড়িয়ে আছেন থামের পাশে। বীরেন্দ্র বললেন, আলো-টালো জ্বেলে দাও, বনি। আবার কী? আর একটু চা-ফা করো।

দিই। বলে বনশোভা বারান্দা ও নীচের ঘরের বাতি জ্বেলে শাঁখটা নিয়ে এলেন। বারান্দায় উঠোনের মুখে দাঁড়িয়ে ফুঁ দিলেন কয়েকবার। নিছক অভ্যাস।

লালী বড়মামার সঙ্গ ধরল। দোতলার ঘরে ঢুকে জানালাগুলো খুলে দিল। লালী সুইচ খুঁজে টিপে

দিল। আলো জ্বলল। বাইরে তখনও দিনের ধূসর আলোটা ফুরিয়ে যায় নি।

বীরেন্দ্র চেয়ারে বসে বললেন, কাছে আয় লালী।

লালী তাঁর পাশে টেবিলে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। বলল, বড়মামা, তুমি অবাক হলে না আমাকে দেখে?

অবাক হব কেন? বীরেন্দ্র শান্ত গাম্ভীর্যে বললেন। বড় হয়েছ। লেখাপড়া শিখেছ। মাঝে মাঝে মাকে দেখতে আসবে। এতে অবাক হবার কিছু নেই। তা ছাড়া এত বড় একটা ঘটনা ঘটল। তোমার আসাটাই তো স্বাভাবিক। জাস্ট এ হিউম্যান রিঅ্যাকশান।

লালী বলল, আমি সেভাবে আসি নি।

কী ভাবে এসেছ?

আর যাব না কালিকাপুরে। মায়ের কাছে থাকব।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকার পর বীরেন্দ্র একটু হাসলেন। তোমার বাবা আপত্তি করেন নি?

আমি চিঠি লিখে রেখে চলে এসেছি।

বাড়ি থেকে পালিয়ে আসা? বীরেন্দ্র জোরে শুকনো হাসার চেষ্টা করলেন। বলছ কী?

হ্যাঁ। লালী ঠোঁট কামড়ে বলল, আর আমি ওখানে ফিরে যাব না।

বীরেন্দ্র ওর একটা হাত নিয়ে বললেন, থাকতে পারলে তো ভালই। তবে কথা হচ্ছে, পারবে তো? আমরা তোমার বাবার মত বড়লোক মানুষ নই। কষ্ট হবে। তা ছাড়া তোমার কলেজ তো এখনও শেষ হয় নি। কলেজ খুলছে কবে?

লালী মুখ নামিয়ে মেঝে দেখছিল। আস্তে বলল, ফোর্থ জুলাই।

বইপত্তর এনেছ সঙ্গে?

না।

বনশোভা চায়ের জল চড়িয়ে ওপবে চলে এসেছেন। বাইরে দাঁড়িয়ে কথা শুনছিলেন। এবার ঘরে ঢুকে বললেন, দাদা! তুমি ওভাবে কথা বলছ কেন বলো তো? এত খুশী হয়ে তোমাকে...

ওয়েট ওয়েট। বীরেন্দ্র হাত তুললেন। বনি, রিয়ালিটিকে ফেস করাই উচিত।

বনশোভা মেয়ের কাঁধে হাত রেখে তাকে টেনে বললেন, লালীর জন্য তোমায় ভাবতে হবে না। আমি কাল থেকেই একটা চাকরিব চেষ্টা কবব। আমাদেব মা-মেয়ের জন্যে কারুকে ভাবতে হবে না। আয় লালী।

বীরেন্দ্র তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু কিছু বললেন না।

লালীর চোখে সামান্য ঘোর এসেছিল। হঠাৎ মনে হল, নীচের ঘরে বড় ঘড়ির টকটক শব্দটা কেন শুনতে পাচ্ছে না? অমনি ঘোরটা কেটে গেল। মনে পড়ল বকুলপুরে শুয়ে আছে। বিছানাটা একটু শক্ত। নতুন কাপড়ের গন্ধ নাকে আসছে। বালিশটাও একটু উঁচু আর ঠাসা। তারপর টের পেল, মায়ের একটা হাত তার পেটের ওপর দিয়ে ছড়ানো। হাতটা অস্বস্তিকর। ছুঁয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে সরিয়ে দিল। বনশোভা ঘুমোচ্ছেন। তাঁর হাতটা বেখাপ্পা পড়ে রইল।

নতুন কাপড়ের গন্ধটা বাড়তে বাড়তে লালীকে ঘিরে ধরল। ওপরে নীচে ও দু'পাশে গন্ধটা স্থির হয়ে দাঁড়াল। লালী তাকিয়ে রইল। ঘরের ভেতর খাবলা খাবলা বিচ্ছিরি আলো পড়েছে দেয়াল ও মশারির গায়ে। আলোগুলো জানালা দিয়ে আসছে। এসে দুলছে। তিরতির করে কাঁপছে। ফ্যানে কেমন ঘরঘর ঘষটানো শব্দ। বড্ড গরম। বড় বেশি আলো।

আলো আর শব্দও। এটা নীচের ঘর। জানালার নীচে খানিকটা ঘাসে ঢাকা জমির ধারে ভাঙাচোরা পাঁচিল আছে। একটা উঁচু নোনা আতার ঝাড় আছে। তার ওধারে বড় রাস্তা। ট্রাকের শব্দ দূর থেকে এসে বাড়তে বাড়তে এবং ঘরের ভেতর মশারিটা সাদা আলোয় ঝলসে দিতে দিতে চলে যাচ্ছে। ঠিক যেন মাথার ভেতর দিয়ে চলে গেল। মা কেমন করে এ ঘরে ঘুমোতে পারে, বুঝতে পারছে না লালী। সে উপুড় হয়ে বালিশে চিবুক রেখে জানালাটার দিকে তাকিয়ে রইল। বড়মামার কথা ভাবতে লাগল। মায়ের কথা ভাবতে লাগল।

শহরের রাস্তায় দেখা হওয়া বড়মামা আর বকুলপুরের বাড়ির বড়মামা আলাদা লোক। আর

বনশোভাকেই বা সে কেন এখনও মা ভাবতে পারছে না? খালি মনে হচ্ছে, এক অচেনা মহিলাকে সে জোর করে মা ভাবছে। তার মায়ের মুখের সঙ্গে কেন তার এতটুকু মিল নেই? বিকেলে সে আসার একটু পরে ঝি মেয়েটি এসে ফিক করে হেসে বলেছিল, কে বলবে মা আর মেয়ে? শেষে বনশোভার ধমক খেয়ে বলল, হ্যাঁ—কপালের কাছটা আপনারই মত, দিদি। কান দুটোও। লালী আয়নায় নিজের কপাল আর কান দুটো দেখছিল। বনশোভার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছিল। বুঝতে পারে নি। তবে গায়ের রঙে তো এতটুকু মিল নেই। সে কত ফর্সা, আর বনশোভার রঙটা পাতা ঢাকা ঘাসের মত ফ্যাকাসে।

আবার দূরে চাপা গরগর শব্দ। শব্দটা যতটা এগিয়ে আসছে, মশারিটা তত সাদা হচ্ছে। তত স্পষ্ট হয়ে উঠছে মশারির ছটফটানি। আজ রাতে নতুন কাপড়ের গন্ধে ভরা সাদা অচেনা মশারির এই অস্থিরতা লালীকে বিব্রত করছে। গরগর শব্দটা ভারী হতে থাকল। তারপর ভট্ ভট্ ভট্ ভট্...ভট্ ভট্ ভট্...ভট্ ভট্ ভট্ ভট্ গররররর...

লালী মুখ তুলল। বুকটা ধড়াস্ করে উঠল। শব্দটা দারুণ চেনা! ভীষণভাবে চেনা। আবছা দেখল, একটা মোটর সাইকেল আস্তে আস্তে বাড়িটা পেরচ্ছে। বড় অনিচ্ছায় ঘষটানো শব্দটা সরে যাচ্ছে দূরে। তারপর লালী কাঠ হয়ে মুখ গুঁজল বালিশে। তার বুক কাঁপতে থাকল। ভেতরটা ভয়ে ঠাণ্ডা হিম হয়ে গেল। সে চোখ বুজে উপুড় হয়ে রইল এবং একটা হাত বনশোভার গায়ে রাখল।

মোটর সাইকেলটা দূর থেকে দূরে চলে যেতে যেতে চেতনার বাইরে উধাও হয়ে গেল। লালী তখন চোখ খুলল।

কিন্তু না। আবার দূরে কোথাও সেই শব্দ জেগে উঠেছে। শব্দটা বাড়ছে। মোটর সাইকেলটা ফিরে আসছে। তারপর তেমনি চাকা ঘষটানো অনিচ্ছা নিয়ে অথচ প্রচণ্ড গর্জন করতে করতে নোনা আতার গাছটাকে ঝলসে দিয়ে চলে গেল।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। লালী ঠোঁট কামড়ে ধরেছে। চোখে জল ভেসে যাচ্ছে। বালিশটা ভিজছে। তার শরীর হিম। মড়ার মত। তৃতীয় বার মোটর সাইকেলটা ফিরে এসে বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে ব্রেক কষার জোরালো শব্দ হতেই লালী ছিটকে গেল বনশোভার ওপর।

বনশোভার ঘুম ভেঙে গেল। বললেন, কী? কী রে? ভয় পেলি বুঝি?

লালী কানে কানে বলল, বাবা।

বনশোভা ওকে জড়িয়ে ধরে হাসতে হাসতে বললেন, স্বপ্ন দেখছিলি? ঘুমোও। পিঠে হাত বুলোতে থাকলেন মেয়ের। তারপর টের পেলেন, মেয়ে চুপি চুপি কাঁদছে।

মুহূর্তে বনশোভা শক্ত হয়ে বললেন, বাবার জন্য মন খারাপ করছে তোর? বেশ তো। সকাল হোক। যাবি মা। আমি তো তোকে বেঁধে রাখতে পারব না। নাও, এখন ঘুমোও।

মোটর সাইকেলটা স্টার্ট দিচ্ছে। অনেকক্ষণ ধরে একই জায়গায় প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছে। তারপর চলতে শুরু করেছে। শব্দটা দূরে মিলিয়ে যাবার পর লালী বনশোভার কানের কাছে মুখ রেখে বলল, বাবা এসেছিল।

বনশোভা হাসবার চেষ্টা করে বললেন, পাগলী কোথাকার! স্বপ্ন দেখছিস।

না। মোটর সাইকেলের শব্দ শুনলে না? ওটা বাবার। আমি চিনি।

বনশোভা চমকে উঠলেন। একটু চুপ করে থাকার পর বললেন, শব্দ শুনে কিভাবে চিনলি?

আমি চিনি। লালী ফিসফিস করে বলে উঠল। তিনবার ওখান দিয়ে গেল বাবা।

যাক্ না। কাঁদার কী আছে তাতে? বনশোভা মেয়েকে আদর করতে করতে বললেন। ভয় পাবারই বা কী আছে? ঘুমোও একটু পরে ফের বললেন, আর তো কচি মেয়ে নও যে জোর করে ধরে নিয়ে যাবে কেউ?

বললেন বটে, কিন্তু একটা গভীর অস্বস্তি অথবা আতঙ্ক তাকে চেপে ধরেছে ততক্ষণে। বুঝলেন, আর ঘুমটা আসবে না। উঠে বসলেন বনশোভা। লালী ভয় পাওয়া গলায় বলল, কোথায় যাচ্ছ?

ওই জানলাটা আটকে দিই।

তাই দাও।

বনশোভা জানলা বন্ধ করে মশারিতে ঢুকতে না ঢুকতে মোটর সাইকেলটা চতুর্থ বার বেরিয়ে গেল। অস্ফুষ্ট স্বরে আপনমনে বললেন, চক্কর মেরে বেড়াচ্ছে রাত দুপুরে। ভূতের মত।

শেষ রাতে লালী একটা স্বপ্ন দেখেছিল।

বাবলা নদীর ওপারে কপালীকতলার জঙ্গলে পিসীমার সঙ্গে পুজো দিতে গেছে কপালী মায়ের থানে। তারপর কীভাবে পথ হারিয়ে ফেলেছে। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ দেখে, একটা গাছের ছড়ালো লম্বা মাটিতে ছুঁয়ে থাকা ডালে যোগব্রত চিত হয়ে শুয়ে আছেন। কাঁধের সুন্দর ঝোলাটা মাটি ছুঁয়েছে। বুকের পাশে বন্দুক দাঁড় করানো আছে। যোগব্রতের শরীরের রঙ গিরগিটির মত ধূসর এবং হলদে। তাঁর গা বেয়ে লাল পিঁপড়ের ঝাঁক। লালী চেঁচিয়ে উঠল বাবা! ও বাবা! যোগব্রত চোখ খুললেন। ভয়ঙ্কর লাল চোখ। লালী ভয়ে পালাতে চেষ্টা করল।

এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে গেল। ধুড়মুড় করে উঠে বসল। বনশোভা কখন উঠে গেছেন। বন্ধ জানালার ফাঁক দিয়ে রোদের ফলা এসে মশারিকে বিঁধেছে। আর শুল না লালী। মশারি তুলে রেরিয়ে এল।

বারো

বকুলপুরের টাইগার স্বপন নন্দী টি কর্নারের সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছিল। সে কখনও ভেতরে ঢুকে চা খায় না। ডবল ওমলেট আর দুটো টোস্ট ওইভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেয়েছে।

ভেতর থেকে নিমাই বলল, অত সেজেগুজে কোথায় যাচ্ছ টাইগারদা?

'কেপ্টে'র বাড়ি। বলে নির্বিকার মুখে কাপটা শেষ করে স্বপন প্যান্টের পকেটে হাত রাখল। নতুন কেনা ঝকমকে একটা পার্স বের করল।

নিমাই বলল, ইস! কত টাকা টাইগারদার। কোথায় পেলে গো?

তোর বাপের গদি লুঠ করে আনলুম। স্বপন দাঁত বের করে বলল। তোর বাপের দিব্যি, দেখে আয়। বুক চাপড়াচ্ছে।

নিমাইয়ের বাবা বকুলপুর বাজারের বড় আড়তদার। 'টি কর্নারে'র ভিড়ে একটা হাসি উঠল। টাইগারের কথাবার্তাই এ রকম। আজ তার ভোল বদলে গেছে অনেকটা। সেজন্যেই চোখে পড়ছিল। নীল রঙের সাদা ডোরাকাটা স্পোর্টিং শার্ট আর উজ্জ্বল সাদা প্যান্ট পরনে। পায়ে গাব্দা চপ্পলটাও নতুন। গলায় রুপোর মিহি চেন ঝুলছে। কড়ে আঙুলে মোটা লাল পাথর বসানো চাঁদির আংটিটা অবশ্য পুরনো। ওটা নাকি তার নেহাত আপতকালীন যন্তর। দু' কাঁধ উঁচু করে সে সিগারেট টানতে টানতে বাঁ হাত বাড়িয়ে খুচরোটা নিল। বয় ভোম্বল হাত বাড়িয়ে বলল, একটা টাকা দাও না টাইগারদা। অত টাকা তোমার।

স্বপন ঘুরে ফিক করে হেসে বলল, টাকা নিবি?

হুঁউ।

সত্যি নিবি তো?

দিয়েই দেখ না। ভোম্বলের একটা হাত নিজের মাথায় বেড় দেওয়া, অন্য হাতটা বাড়ানো।

তবে...স্বপন একটা অশ্লীল বাক্য বললে ফের 'টি. কর্নারে' হাসির ঝড় বয়ে গেল।

ঢোলা হাফ·পেন্টুল পরা ছেলেটা লজ্জায় লাল হয়ে দৌড়ে ভেতরে ঢুকল। মালিক মনোমোহন আড়ালে দাঁতমুখ খিঁচোলেন তাকে। বোঝা গেল, স্বপন সরে গেলে ছোঁড়াটা থাপ্পড় খাবে।

স্বপন শিস দিতে দিতে কয়েক পা এগিয়ে হঠাৎ থামল। তারপর ডাকল, কোথা গেলি রে? আই ভোমলা! কাম অন, কাম অন।

ভোম্বল ভয়ে ভয়ে উঁকি মেরে বলল কী?

আও মেরা দোস্ত! স্বপন হাতের তালু চিত করে আঙুল নেড়ে ডাকল। শিস দিতে থাকল। যেন কুকুরকে ডাকছে।

ভোম্বল বলল, না। তুমি মারবে।

না এলে সত্যি মারব। শোন না বে!

ভয়ে ভয়ে ভোম্বল কয়েক পা এগিয়ে গেল। মনোমোহনের মুখটা গম্ভীর। দু' চোখে দেখতে পারেন না স্বপনকে। অথচ কিছু বলারও সাহস নেই। নিমাইরা ওকে সাহস দিচ্ছিল। চলে যা না। মারবে কেন? যা না।

স্বপন পীচের ওপর হাঁটু দুমড়ে বসে বলল, মনাদা কত দেয় রে মাসে?

দশ টাকা।

বলিস কী? এত বেশী?

আর দু'বেলা চা আর দু'পিস রুটি।

ব্যস?

হুঁ।

ক'টাকা নিবি? স্বপন মিটিমিটি হাসতে লাগল।

সব নেব।

খুব লোভ রে! সরে আয়। বলে স্বপনন তার ঢোলা খাঁকি হাফ পেন্টুলেব পকেটে কি একটা ঢুকিয়ে দিল। খবর্দার! কাকেও দেখাবি নে। বাড়ি যাবি কখন?

দুটো আড়াইটে হবে। ভোম্বল হাসল। কী দিলে গো?

বের করিস নে। হাত ভরে দ্যাখ্। যদি শুনি ওদের দেখিয়েছিস, বেদম প্যাঁদাব।

ভোম্বল পকেটে ভয়ে ভয়ে হাত ঢোকাল। পোকা-টোকা ঢুকিয়ে দেয় নি তো? যা খচ্চব লোক টাইগারদা। কিন্তু তার হাত টাকাকড়ি বুঝতে পারে। ছুঁয়েই হাতটা বের করে নিল। কযেক সেকেণ্ড চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার পর হাসতে হাসতে ফিরে গেল।

স্বপন দু'কাঁধ উঁচু করে শিস দিতে দিতে এগিয়ে গেল। পকেটে টাকাকড়ি থাকলে সে দিলদরিয়া মেজাজের মানুষ। ছোঁড়াটার পকেটে একটা পাঁচ টাকার নোট ভাঁজ করে ঢুকিয়ে দিয়েছে। মনটা ভারি খুশি। যত হাঁটছে, মাঝে মাঝে একটা করে খালি সাইকেল রিকশো সামনে বা পিছনে একটু গতি কমিয়ে বলে যাচ্ছে, যাবেন নাকি টাইগারদা? টাইগার রিকশো চাপবে না। চাপলে ওরা কৃতার্থ হয়ে যাবে, সে জানে।

এই যে! টাইগারবাবু যে?

স্বপন দাঁড়িয়ে গেল। বকুলপুর থানার সেকেণ্ড অফিসার মণীন্দ্রবাবু সাইকেলেব ব্রেক কষেছেন সামনে। সে চমকাবার পাত্র নয়। একটা হাত কপালে ঠেকিয়ে বলল, নমস্কার স্যার।

সেজেগুজে চললেন কোথায় মশাই? শহরে বুঝি?

স্বপন হাসল। না। একবার সোনাতলা থেকে ঘুরে আসি। দিদির বাড়ি।

হেঁটে যে?

স্বপন জোরে হেসে বলল, সবতাতেই জেরা মেজবাবু? না, হেঁটে যাব না। এই রোদে পাঁচ মাইল হাঁটব? বাপস্। সাইকেলে যাব। দেখি, কারুর কাছে একটা সাইকেল পাই নাকি।

হুঁ। বলে মণীন্দ্রবাবু চাকার দিকে তাকালেন।

স্বপন চাপা গলায় বলল, কিছু বলবেন স্যার? বলুন না।

আপনি ঘোঁতন নামে কাউকে চেনেন?

স্বপন ভুরু কুঁচকে বলল, ঘোঁতন? না তো। কেমন চেহারা বলুন তো?

রোগা, শ্যামবর্ণ। আপনার চেয়ে বয়সে সামান্য ছোট হতে পাবে।

স্বপন সিরিয়াস হয়ে বলল, অমন চেহারার একশোটা ছেলেকে আমি দেখেছি। রোজ দেখতে পাচ্ছি।

মণীন্দ্রবাবু বললেন সেভেনটি-ওয়ানে যখন বর্ডারে রিলিফ করে বেড়াতেন, ঘোঁতন নামে এই এলাকার কোনো ছেলে ছিল না আপনাদের সঙ্গে?

স্বপন ভাবতে ভাবতে মাথা দোলাল। নাঃ। তেমন কাকেও মনে পড়ছে না। কিন্তু কেসটা কী?

সে কথার জবাব না দিয়ে মণীন্দ্রবাবু বললেন, মোহনপুরে এক ঘোঁতন আছে। কিন্তু সে বয়স্ক লোক। ঠিক আছে। পরে যদি মনে পড়ে, জানাবেন।

কেসটা বললে .... বলেই স্বপন চমকে ওঠার ভান করল। নেপেনদার মার্ডার কেস! তাই বলুন।

মণীন্দ্রবাবু জিভ কেটে মাথা নেড়ে বললেন, না না। ওটা তো আরও বিগ ব্যাপার। টপ লেবেলে যা হবার হচ্ছে। এ একটা পেটি কেস। এ আমার মত চুনোপুটির ব্যাপার।

স্বপন মুখে রাগ ও দুঃখ ফুটিয়ে বলল, চারদিন হয়ে গেল। এখনও একটা অ্যারেস্ট হল না স্যার? তবে দেখবেন, আমরা একটা কিছু করব। না, না—পলিটিক্যালি অ্যাকশন নেব। বিজয়েন্দুবাবু নারান বাবু তপু হেরম্বদা সবাই বলছেন, বদলাটা অন্য ভাবে নেওয়া হবে। তা ছাড়া আমাদের শোকসভা বা শোক মিছিল কিচ্ছু করতে দেওয়া হল না। সেও হবে। ফের বন্‌ধ্‌ ডাকা হবে দেখবেন। আপনারা অ্যাকশান না নিলে অগত্যা তাই করতে হবে।

মণীন্দ্রবাবু হাসতে হাসতে অমায়িক ভদ্রলোকের মত সাইকেলের প্যাডেলে চাপ দিলেন।

স্বপন কয়েক পা হাঁটার পর নিঃশ্বাসের সঙ্গে বলল, শালা! মামদোবাজী।

শীগগির পুলিশী নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে মিছিল বের করতে হবে। তপু বলেছে। দরকার হলে থানার সামনে অবস্থান ধর্মঘট করতে হবে। স্বপন আবার একটা সিগারেট ধরাল। বিজয়েন্দুবাবু বলছিলেন, গ্রেনেডের খোলের টুকরো পেয়েছে। কড়া বারুদের গন্ধ আছে তাতে। অন্য কিছু পেলে বরং পুলিশ কুকুর-টুকুর এনে শোঁকাত। বারুদ শুকে খুনী ধরা যায় না। এতো রীতিমত মিলিটারী অ্যামবুশ।

এ ধরনের অ্যামবুশ স্বপন কয়েকটা করেছে। সীমান্তের দু'পারেই। কখনও চটি খুলে যায় নি পা থেকে। আসলে চটি পরে এসব অপারেশনে নামা উচিত নয়। খেয়াল ছিল না। ভাগ্যিস চটিজোড়া আমবাগানের পেছনে আখের খেতে পড়েছিল। অত দূর খুঁজতে যায় নি পুলিশ। স্বপনের খুড়তুত বোন রমা দ্বিতীয়বার গিয়ে কুড়িয়ে এনেছে। কলোনী পাড়ার সামনে কয়েক একব জমির পর আমবাগানটা। ও পাড়ার মেয়েরা আম কুড়োতে আসে সব সময়। কেউ সন্দেহ করতে পারে নি,

হ্যানিম্যান ফার্মেসির সামনে আসতেই মোবারক ডাকল, টাইগারদা!

কীরে? আবার তুই তালা খুলতে এসেছিস?

মোবারক নেমে এসে বলল, না। দিদি এসেছে বাপের বাড়ি। তার বাচ্চাটা দুধ তুলছে।

কিরে কর।

তোমার কিরে।

মোবারক পাশে হাঁটতে থাকল। স্বপন বলল, যাবি নাকি? পীরিতের মেয়ের কাছে যাচ্ছি। একটু সিমপ্যাথি ডিক্লেয়ার করে আসি। রোজ একবার করে যাচ্ছি, তো শালা বাড়িভরা লোক।

মঞ্জুর কাছে যাচ্ছ?

আবার কে বকুলপুরে আমার পীরিতের মেয়ে আছে বে? বেচারী খুব ঘা খেয়েছে কোমল প্রাণে। আহা!

মোবারক খিকখিক করে হেসে বলল, মঞ্জুর ওপর তোমার মাইরি এত রাগ!

স্বপন ওর একটা হাত ধরে ফেলল। বল, আর বলবি? বল্‌!

মোচড় খেয়ে মোবারক উঁহু করে উঠল। বলল, এই! মাইরি, ঘা-খাওয়া হাতে আবার ব্যথা ধরিয়ে দিলে। ফোস্কা পড়ে আছে দেখছ না?

স্বপন ওর হাতটা দেখে চোখ পাকিয়ে বলল, আবে শালা! এই হাত নিয়ে এখনও তুই ওপেনলি রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিস! খাইছে রে খাইছে! এ হালায় কমু কী!

মোবারক বলল, কুকার ধরাতে পুড়ে গেছে না?

হ। হেই পোড়া? স্বপন চোখ কটমট করে বলল। জিরা জিরা কালো দাগ? এ্যাই মোবা, স্বরূপপুরে না কোহানে য্যান তোর মামুর বাড়ি কইছিলি? শালা, এক্ষুণি বেড়াতে যা সেখানে। ও বেলা যদি তোরে আমি বকুলপুরে দেহি, মাথা মুড়াইয়া হেই পারে রাখিয়া আমু। কইয়া রাখলাম।

দিদির সঙ্গে ও বেলা সত্যি যাচ্ছি, মাইরি। দিদির এসকর্ট হয়ে।

তাই যা। স্বপন শিস দিতে দিতে হাঁটছিল। একটু পরে ফের বলল, কাল রাত তখন নটা-টটা—আমি ভজুদার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। কালিকাপুরের ওই ভদ্রলোক রে, কী যেন নাম....

যোগব্রতবাবু।

স্বপন বলল, হ্যাঁ। যোগব্রতবাবু আর নারানদা যাচ্ছে দেখলুম। যোগব্রতবাবু মোটর সাইকেল হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমাকে দেখে নারানদা হাত তুলে ডাকল। গেলুম। তারপর অনেক কথাবার্তা হল।

মোবারক বলল, এই টাইগারদা! শুনলুম যোগোবাবুর মেয়ে নাকি মায়ের কাছে চলে এসেছে! আর যেতে চাইছে না বাবার কাছে। মাইরি, পান্না থাকলে একবার গা ঘষে আসতুম।

স্বপন হাসল। নারানদা আবার মাইরি একটা অপারেশন চাপাচ্ছে ঘাড়ে। এখনই না। মক্কেল ফিল্ডে নেই, বাইরে আছে। যদি দৈবাৎ এসে পড়ে....স্বপন অনুক্ত শব্দটা আঙুলের সাহায্যে বুঝিয়ে দিল।

মোবারক ভুরু কুঁচকে বলল, না না। বাড়াবাড়ি ঠিক না। কয়েক মাস যাক্। রুণুর গ্যাং তপার পেছনে ঘুরছে কাল থেকে। এখন চেপে থাকো। হাওয়া খারাপ।

স্বপন বলল বললুম তো! এখনও ফিল্ডে নেই পার্টি। দৈবাৎ এসে পড়লে আলাদা কথা। তবে এত শীগগির না আসতেও পারে।

পার্টিটা কি টাইগাবদা?

শুনলে হাসবি। স্বপন দাঁত বের করল। মাইরি!

কে?

পান্না।

ইমপসিবল! লাফিয়ে উঠল মোবারক। চালাকি করো না।

স্বপন ওর কাঁধে হাত রেখে বলল, পান্না তো জানত না মধুবাবুর জীপে নৃপেন আছে! এখন জেনে যাবে। সব ফাঁস করে দেবে। আফটার অল সহোদর ভাই। ব্লাড কানেকশান আছে না বে?

কিন্তু....... মোবারক একটু ভেবে বলল, পান্না তো চাকরি পেয়েছিল। সেখানে গিয়ে ডুব মেরে থাকার কথা।

আবে বুদ্ধু, সে বাড়ি আসবে না কোনোদিন? চিঠি লিখবে না দাদা-দিদিকে?

মোবারক গুম হয়ে বলল, দেখ টাইগারদা। এর পর ঠিক একই ভয়ে অন্য একটা অজুহাত দেখিয়ে তোমাকে বলবে, মোবাকে ঝাড়। তারপর রইলে তুমি। তখন তোমাকেও ঝাড়ার জন্য বীরুকে ঠিক করবে। চলুক না এভাবে। একের পর এক। শালা! রোজ কেয়ামতের দিন (ডুমস ডে) আর মরার মানুষ থাকবো না দুনিয়ায়।

স্বপন শিস দিতে দিতে বলল, তোকে এ অপারেশনে থাকতে হবে না। আমি আর বীরু থাকব।

তুমি তাহলে কেস নিয়েছ? মোবারক হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল।

আকাশের দিকে ঠোঁট দুটো গোল করে শিসের মধ্যে স্বপন চন্দ্রবিন্দুহীন হুঁ উচ্চারণ করল।

বীরুকে আমি বারণ করে আসবো। আজই টাউনে গিয়ে ওকে বলব। মোবারক ঘুরল।

মোবা, এ টাইগারের ল্যাজ মাড়াইতে আইলে মরবা। বলে স্বপন ওর দিকে এক পা এগিয়ে ফিক করে হাসল। দু'হাতে ওর মুখটা টেনে গালে চটাস্ করে চুমু খেয়ে বলল, অত ভাবিস ক্যান বে? চুপচাপ থাক্। তুই থিংক কর। আমিও থিংক করি। কী বলিস? আমরা কি পোলাপান বে? ব্রেনখানা পাইক্যা তরমুজ হইছে না?

রাস্তায় ভিড় আছে। ট্রাক, বাস, টেম্পো, রিকশা যাতায়াত করছে। তার মধ্যে দিয়ে দুজনে কথা বলতে বলতে যাচ্ছে। উজ্জ্বল রোদে অসংখ্য মানুষের ভিড় ভেদ করে চলেছে দুটো মানুষ। কিন্তু আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না ওদের। ফরসা, কালো, ফ্যাকাসে, ধূসর কত রঙের মানুষের মধ্যে ওরা মিশে আছে। কেউ টের পাচ্ছে না। ওরা কারা—কী ওদের প্রকৃত পরিচয়।

চৌমাথায় পৌঁছে মোবারক বলল, আসি।

আয়। কিন্তু যা কইলাম।

মোবারক একটু অস্বাভাবিক গতিতেই চলে গেল। মুখটা নীচু করে হাঁটছিল সে। স্বপন কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ্য করার পর শিস দিতে দিতে ডাইনের রাস্তায় এগিয়ে গেল। বাড়িগুলো বেশিদিনের নয়। পয়সাওয়ালার লোকেরা পুরনো গ্রামের ভেতর দিক থেকে এখানে এসে বাড়ি করেছে। বড্ড ফাঁকা আর ন্যাড়া লাগে।

একটা দোতলা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে স্বপন ডাকল, পিণ্টু! ও পিণ্টু!

দোতলা থেকে জানালায় মুখ বাড়িয়ে মঞ্জু বলল, কে?

আমি।

মঞ্জু একটু ইতস্তত করে বলল, কী দরকার বলবে টাইগারদা? একটু ব্যস্ত আছি।

স্বপন গম্ভীর হয়ে গেল। দরকারটা তোমাদেরই।

একটু ইশারা দিন। মায়ের অসুখটা বেড়ে গেছে। এখন নামতে পারব না।

আচ্ছা। পরে বলব। বলে স্বপন হনহন করে চলে এল। বড় রাস্তায় পৌঁছে চৌমাথায় রেলিং ঘেরা জায়গাটায় একবার দাঁড়াল। বিজয়েন্দুর বাবার মার্বেল প্রতিমূর্তির দিকে তাকিয়ে সিগারেট ধরাল। নিজের ওপর রাগে ক্ষোভে ভেতরটা গরগর করছে। কিছু করতে না পেরে সে এক দলা থুথু ছুঁড়ল মূর্তিটার দিকে।

মোবারক পায়ের কাছের পীচ দেখতে দেখতে এবং চপ্পলের ডগায় টুকরো যা কিছু পাচ্ছে, কিক মেরে ছিটকে দিতে দিতে অনেকটা হাঁটল। তারপর বাজার পেরিয়ে গিয়ে রাধিকা ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের কাছে একটু দাঁড়াল। খোলামেলা চওড়া জায়গায় কয়েকটা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। পাশেই যশোদাবাবুর পেট্রোলপাম্প। দু'ভাইয়ের কীর্তিকলাপ দেখলে তাক লেগে যেত প্রথম প্রথম। এখন মোবারক এখানে দাঁড়ালে দেশের হাল-গতিক টের পায়। অতি দ্রুত তার মনে একটা লোভাটে ইচ্ছে সাদা বেড়ালের মতো খেলতে শুরু করে এদিক থেকে সেদিকে। ড্রাইভারিটা শিখে কাঁহা কাঁহা মুল্লুক গাঁক গাঁক করে মাটি কাঁপিয়ে ট্রাক চালিয়ে ঘুরতে পারত। আজ সাঁইথিয়া, কাল আসানসোল। পরশু সিউড়ি, পরের দিন বহরমপুর।

যশোদাবাবু তপুর বাবা না হলে কী যে ভাল হত। তপু এখন নৃপেনের ফেলে যাওয়া যুবনেতার গদি দখল করার তালে আছে। মুখে যতই ভাব থাক, তপু নারানবাবুদের ফ্যাকশানকে গুঁড়িয়ে দিতে সব সময় তৈরি। পারত না আপসপন্থী মধুবাবুর জন্য। খানিকটা নৃপেনের জন্যও বটে। নৃপেন মাথা ঠাণ্ডা রেখে হিসেব করে এগোতে চাইত। মোবারকদের আদর আপ্যায়ন করত সুযোগ পেলেই। মোকারকের ধারণা, পান্নার সঙ্গে তার দোস্তির জন্যই নৃপেনের মনের তলায় কিছু কুটো ছিল। নইলে কবে মোবারককে সে কোলে টেনে নিত। আপত্তি কিসের তাতে? মোবারক পা বাড়িয়েই ছিল। পান্না যে তাতে চটত না সে জানে। পান্না স্থানীয় কোনো ব্যাপারেই জড়াতে চায় নি কোনোদিন। আঞ্চলিক রাজনীতি কেন, রাজনীতি ব্যাপারটাতেই তার ঘেন্না জন্মে গেছে কবে থেকে।

কিন্তু মোবারকের পিছনে নারানবাবু বকুলপুরের টাইগারকে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। ইচ্ছেমতো পা বাড়ালেই মোবারক আউট হয়ে যেত এবং যাবে। সে জানে, নারনবাবু কেন নৃপেনদের ওপর খাপ্পা। সোনাতলায় খালের ব্রিজ ধসার পর তদন্তে দেখা গিয়েছিল সিমেন্ট বালির মেশাল ছিল একটায় কুড়িটা। সবাই তাজ্জব তাই শুনে। এ তো সর্বনেশে ব্যাপার। এতদিন কংক্রিট যেন মন্তর তন্তরের জোরে চিড় খায় নি। নারানবাবু তাঁর কর্মচারীদের ওপর সব দোষ চাপিয়ে, পাতি-ঠিকেদার জাফর আলিকে সর্বস্বান্ত করে এবং শোনা যায়, গোপনে মধুবাবুর হাতে-পায়ে ধরে মিটিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু কন্টাক্টরিতে বদনাম একবার রটলে সামলানো সহজ নয়। সরকারী খাতা থেকে নাম বাতিল হল। নারানবাবু আড়তদারী আর দাদনের কারবারে ফিরে গেলেন। কালিকাপুরের যোগব্রতের সাহায্যে গ্রামাঞ্চলে পাট আর চৈতালী ফসলের ওপর দাদনের কারবার করেন আজকাল।

মোবারক জানে, নারানবাবুর আসল টারগেট ছিল নৃপেন। মধুবাবুকে সঙ্গে পেলে তো ষোলকলা পূর্ণ হয়। অনেক সুযোগ খোঁজার পর তা পাওয়া গিয়েছিল। নৃপেনই সোনাতলার ব্রিজ ভাঙা নিয়ে অনেক তদ্বির করে কমিটি বসিয়েছিল। তার ওই এক কথা : নিজের বাবা হলেও ক্ষমা নেই। জনগণের কাছে বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি পেতেই হবে,নারানদাকে। রাশিয়া বা চীন হলে তো সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ্য রাস্তায় দাঁড় করিয়ে গুলি করে মারত। আমরা গণতন্ত্রবাদী। বিচার করে শাস্তি দেব। তবে তার চেয়ে বড় কথা, পার্টির নেতৃস্থানীয়রা যদি এই করে, পার্টি কি দাঁড়াতে পারবে মাথা তুলে? সবাই জানে, নারানবাবুর শাস্তিতে নৃপেনের পার্টির জোর বেড়ে গেল হুহু করে।

আর মোবারকের রাগটা মধুবাবুর ওপরে। নকশালী আমলে মধুবাবু তাকে পাকিস্তানী চর প্রমাণ

করতে উঠে পড়ে লেগেছিলেন। তার দর্জি বাবার কোমরে পুলিশ দড়ি বেঁধেছিল। মোবারক ভুলবে না কোনদিন একথা। মধুবাবুকে খতম করেও রাগটা মাঝে মাঝে চিড়বিড় করে উঠছে। আর গোটা দুই গ্রেনেড পেলে সে মধুবাবুর বাড়িটাও উড়িয়ে দিয়ে না হয় সীমান্ত ডিঙিয়ে ফের পালাবে। তারপর সোজা কুয়াইত বা বাহেরিনে পাড়ি জমাবে। চাচাতো ভাই গফুরের মতো। গফুর টয়টো গাড়ি চেপে ঘোরে সেখানে। ফোটো পাঠিয়েছিল।

গ্যারেজ আর পেট্রল পাম্পের সামনে রাস্তার ধারে ঝাঁকড়া মেহগনির ছায়ায় খাটিয়া পেতে বসে আছে কয়েকজন ড্রাইভার। দুজন সর্দারজীও আছে। মাঝে মাঝে খাটিয়ার তলা থেকে বোতল তুলে নিশ্চয় স্রেফ জল ঢালছে না গলায়। কাকে পরোয়া? মোবারকের ধারণা, প্রকাশ্যে রাস্তার ধারে আগের মতো তাড়ি আর থলেয় লুকনো চোলাইয়ের বোতল বিক্রি ফের শুরু হবে। নৃপেন নেই। নৃপেন এসব ব্যাপারে বড্ড গোঁড়া ছিল। ভীষণ মরালিস্ট যাকে বলে। ছেলেদের সঙ্গে মধুবাবুর মেয়ে মঞ্জুর মাখামাখি দেখে রাগ করত। মঞ্জুকে ইমমরালিটির ছোঁয়া থেকে বাঁচাতেই কি বিয়ে করতে রাজী হয়েছিল নৃপেন? হয় তো তাই।

মোবারক একটু দাঁড়িয়ে থাকার পর পা বাড়াল। একটা কিছু করা উচিত। পান্না তার জিগরি দোস্ত। পান্নার কাছে সে কিছু গোপন করেনি কোনোদিন। পান্নাও করে নি। এই প্রথম সে পান্নাকে একটা কথা গোপন করেছিল টাইগারদার হুকুমে। জীপে নৃপেন থাকবে, এ কথাটা বলেনি পান্নাকে। বললে হয় তো গোটা অপারেশনটাই বানচাল হয়ে যাবে, এই ভয়ে বলে নি। বরং সে অবাক হয়েছিল, নারানবাবুর ঘরে পান্নাকে দেখে। মনে মনে ভীষণ ভড়কে গিয়েছিল। পরে ভেবেছিল, বীরুকে পান্না ছাড়া কেউ আনতে পারত না এ কাজে। বীরুরও মিলিটারি ট্রেনিং আছে। গ্রেনেড ছুঁড়তে জানে। টাইগারদার ভাষায় এটা ছিল 'গ্রেনেড অপারেশান'।

এখন নারানবাবু, ভয়ে ভাবনায় পান্নাকে খতম করতে চাইছেন। স্বপন তো জন্মখুনে। ও ঠাণ্ডা মাথায় চোখে চোখে তাকিয়ে এবং মৃদু হেসে 'কেমন লাগছে কমরেড', বলে গলায় ড্যাগার চালাতে পারে। স্বপনের অতীত বা ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। ও হাঁটে চির-বর্তমানের পথে।

পান্নার পরই মোবারকের পালা। এতে কোন ভুল নেই। মোবারক শিউরে উঠল। ফের জোরে হাঁটতে থাকল। ডাইনের গলি রাস্তায় শর্টকাটে পান্নাদের বাড়ি যাওয়া যায়। সেকালের জমিদারবাড়ির ভেঙে পড়া ইটের স্তূপে জঙ্গল গজিয়ে আছে। তার ভেতর সরু একফালি পায়ে চলা রাস্তা। আঁকাবাঁকা খিড়কি দিয়ে ঢুকে মন্দিরের চত্বরে একবার দাঁড়াল। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। পায়রাগুলো কোথায় গেল? এখানে কতকাল আসে নি সে। হাঁড়িকাঠটা এখনও আছে, মাটি ফুঁড়ে ওঠা বুড়ো অজগরের মতো মুখটা হাঁ করা। মাথা জুড়ে কবেকার সিঁদুরের চাপচাপ ছোপ। রক্তও আছে। রঙ বদলে গেছে, এই যা। ধূসর কালচে বাদামী আর ছোপ-ছোপ লালে মাখামাখি। ঠাকুরদালানের বড় বড় থামে ফাটল। ইটের দাঁত বের করে দাঁড়িয়ে আছে মৃত সময়। কোনার দিকে বিশাল জবার ঝাড় লাল-লাল ফুল সামনে উগরে যাচ্ছে। রক্তবমির মতো। শুধু পায়রাগুলো নেই। কী খাঁ খাঁ লাগছে!

মোবারক এগিয়ে গিয়ে খিড়কির দরজার সামনে দাঁড়াল। দরজাটা আটকানো আছে। একটু ইতস্তত করে আস্তে কড়া নাড়ল। কড়া নাড়তে নাড়তে ডাকল, দিদি! বনিদি! দিদি আছেন? আমি মোবা।

দরজা বেশ শব্দ করে দ্রুত খুলে গেল। মোবারক তাকিয়ে রইল। মেয়েটিকে সে চেনে না। সেও দরজা খুলে দাঁড়িয়ে গেছে এবং তাকে দেখছে।

এই ভাঙাচোরা খাঁ-খাঁ বাড়িতে ক্ষয়াটে এবং শোকে দুঃখে বিষণ্ণ পরিবেশে একটা দারুণ উজ্জ্বল সৌন্দর্য আনন্দ আর তুমুল কোলাহল একসঙ্গে আচমকা মুখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে ভাবতে পারে নি মোবারক। এখানে মানায় না ওকে।

ওদিক থেকে বনশোভার গলা শোনা গেল, কী রে লালী? যখন তখন ঝটপট দরজা খুলিস নে বলছি, তবু শোনে না। প্রায় দুপুরবেলা সিঙ্গিদের ষাঁড়টা এসে কপাটে গুঁতো মারে। ষাঁড়টা তো? টগর! দ্যাখ তো গিয়ে।

ওই রকম থমকে দাঁড়ানো দেখে তাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। লালী দৌড়ে চলে গেল। মোবারক শুকনো হেসে বলল, আমাকে ষাঁড় বানিয়ে দিলেন বনিদি!

বনশোভা উঠোনে নেমে বললেন, কে?

আমি মোবা।

বনশোভা একটু হাসলেন। মোবা! আমি ভাবলুম....কিছু মনে করো না ভাই। এস, এস।

মোবারক সোজা বড় ঘরের বারান্দায় উঠে গিয়ে মিথ্যা করে বলল, অনেক আগে আসা উচিত ছিল। ছিলুম না। পান্না নেই?

বনশোভা একটা মোড়া বের করে বললেন, বসো। পান্না নেই।

কোথায় গেল?

পান্না তো আজ বেশ কয়েকদিন হল চলে গেছে। বনশোভা থামে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালেন। লালী উঠোনে পোড়ো কুয়োয় ঝুঁকে পচা জলে নিজের প্রতিমূর্তি দেখছে। বনশোভা তাকে ডাকলেন।

আবার অমন করে ঝুঁকেছ? চলে এস বলছি! কিন্তু লালী কানে নিল না।

মোবারক মুখে বিস্ময়ের ভাব এনে বলল, সে কি! পান্না চলে গেছে?

পান্না কলকাতা না কোথায় চাকরি পেয়েছে বলছিল।

খবর পেয়েছে সে?

বনশোভা বাঁকা মুখে বললেন, কে জানে? ঠিকানা দিয়ে যায় নি যে খবর দেব। তাছাড়া খবর পেয়েই বা কী করবে সে? তোমরা তো চেনো ওকে। তোমাদের বন্ধু।

মোবারক ভাবনার ভঙ্গী করে বলল, এমন একটা সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটল। অথচ....

কথা কেড়ে বনশোভা বললেন, ওর কাছে সাংঘাতিক ঘটনা বলে কিছু আছে নাকি? থাক ও কথা। বাইরে ছিলে বুঝি? অনেকদিন আসো-টাসো না। তবে একবার শুনেছিলুম, বাংলাদেশে আছ।

মোবারক বলল, না! স্যার নেই বনিদি?

দাদা ওপরে আছে।

খুব ভেঙে পড়েছেন বুঝি?

বনশোভা সে কথার জবাব দিলেন না। লালীর উদ্দেশে বললেন, তুইও একটা সর্বনাশ না বাধিয়ে ছাড়বি নে দেখছি, লালী। সাপ টাপ থাকবে। দিন কাল খারাপ এখন। খালি আদাড়ে ঘোরা স্বভাব তোর।

লালী কুয়োর ভেতর থেকে মুখ তুলে হাসল। জানোই তো। বলছ কেন?

মোবারক ফের মিথ্যা করে বলল, ওকে চিনতে পারলাম না তো বনিদি?

বনশোভা আস্তে বললেন, আমার মেয়ে। তারপর একটু হাসলেন। এতদিনে বড়লোক বাপের বাড়িতে মন মানে নি। ভিখারিনীর কুঁড়েঘরে এসে মা বলে ডেকেছে। এখন দেখ, ক'দিন ভাল লাগে?

লালী কথাটা শুনল। কিন্তু কিছু বলল না। মোবারক হেসে বলল, দুয়োরাণী বলুন।

তা যা বলেছ! বলে বনশোভা পা বাড়ালেন। বসো, চা করে আনি।

এত বেলায় আর চা খাবো না বনিদি। মোবারক তেতো মুখে বলল। সেই সকাল থেকে মনোদার টি কর্নারে কমসে কম সাত কাপ হয়ে গেছে। এবার বাড়ি ফিরে চান-টান করে ভাত খাব।

বীরেন্দ্র মোবারকের গলা পেয়ে নেমে আসছিলেন। সিঁড়ির ধাপ থেকে বললেন, কে ওটা? মোবা নাকি?

হ্যাঁ স্যার। মোবারক ঝটপট উঠে দাঁড়াল। যোগমায়া বিদ্যাপীঠে বীরেন্দ্র তার স্যার ছিলেন। সিঁড়ির শেষ ধাপে পা রাখতেই সে দু'পা ছুঁয়ে মাথায় ঠেকাল। বলল, ছিলুম না স্যার। গোঁসাইদীঘি গিয়েছিলুম পিসীর বাড়ি। কাল রাত্তিরে ফিরে সব শুনলুম। সকালে বাজারে পান্নার সঙ্গে দেখা হবে ভেবেছিলুম। হল না। তাই চলে এলুম।

বীরেন্দ্র বনশোভার ঘর থেকে একটা চেয়ার এনে বসলেন থামের পাশে। বললেন, বসো মোবা।

মোবারক বসল। খুব বিনীত ভঙ্গীতে স্যারের দিকে তাকিয়ে রইল।

বীরেন্দ্র বললেন, ঘটনার পর দুটো দিন তো খুব অস্থির হয়ে কাটালুম। ছোটাছুটি কম করিনি। থার্ড-ডেতে আমার মনে হল, হোয়াট ফর? আগুনের সঙ্গে যারা খেলবে বলে ঠিক করেছে তাদের খেলতে দাও। পুড়ুক, ঝলসাক্, ভস্মে পরিণত হোক। তুমি কে দুঃখ করার? তুমি আমাদের মহাভারতের

কাহিনী নিশ্চয় পড়েছ মোবা?

পড়েছি বই কি স্যার।

ব্যস ব্যস! তাহলে আর কী বোঝাব তোমাকে? বীরেন্দ্র কঠোর মুখে বললেন। আমি বিশ্বাস করি, ইতিহাস রিপিটস ইটসেলফ্। ফের কুরুক্ষেত্র আসন্ন। একটা কথা তুমি আমায় বলো মোবা, তুমি যদি বিকেববান হও, তুমি যদি সত্যকে আশ্রয় করতে চাও, কোন্ পথ তুমি বেছে নেবে? যারা হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষকে ভুলিয়ে ঠকিয়ে সর্বস্বান্ত করে ক্ষমতা আর অর্থের পাহাড়ে বসে লম্বা লম্বা বাত ঝাড়বে, তাদের দালালী করবে—নাকি তাদের মুখোশ খুলে দেবে? বলো, তোমরা ইয়ং জেনারেশন, তাজা ব্লাড বইছে শরীরে। কী করবে তুমি?

মোবারক তাকিয়ে রইল।

বীরেন্দ্র উরু চাপড়ে বললেন, পান্না ওয়াজ রাইট। আমি বলছি, পান্নার চিন্তার কোনো ভুল ছিল না। ভুল করছিল রুনু—নৃপেন। নৃপেন জেনেশুনে হোক কিংবা মূর্খের মতো হোক, দালালীর পথ বেছে নিয়েছিল। তবে হ্যাঁ, পান্না গিয়েছিল কমপ্লিট ডেসট্রাকশানের পথে। আত্মহননের রাস্তায়।

মোবারক বুঝতে পেরে বলল, আপনি ওই পিরিয়ডের কথা বলছেন স্যার? সে তো আমিও...

বীরেন্দ্র কথা কেড়ে বললেন, দেখ মোবা! তোমাদের ভুলটা কোথায় হয়েছিল জানো? সময়ের ঘড়ির কাঁটা তোমরা দেখতে পাওনি। তখনও দেরি ছিল। এখনও হয়তো দেরি আছে। ওই যে মহাভারতের কথা বললুম—তুমি দেখবে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আরম্ভের কাল নির্ণয় করেছিলেন আসলে শ্রীকৃষ্ণ। উনি স্বয়ং মহাকাল তো। তাই ঘড়িটি ছিল তাঁর হাতেই বাঁধা। তোমাদের দরকার একজন শ্রীকৃষ্ণ।

অগত্যা মোবারক বলল, আপনি ঠিক বলেছেন স্যার!

বীরেন্দ্র একটু শান্ত হয়ে বললেন, হ্যাঁ, শ্রীকৃষ্ণ। তিনি নিজে কিন্তু যুদ্ধ করেন নি। ভবিষ্যৎ ভারতের শ্রীকৃষ্ণও নিজের হাতে অস্ত্র ধরবেন না। ডিক্টেট করবেন। অর্জুনের মনে বৈরাগ্য আসবে। বলবে, এরা তো আমাদের দেশের মানুষ। আত্মার আত্মীয়। শ্রীকৃষ্ণ বলবেন, কর্মে তোমার অধিকার। কর্ম করো অর্জুন! আমি পাঞ্চজন্যে ফুঁ দিয়েছি। সময় হয়ে গেছে। এখন তুমি গাণ্ডীব তুলে নাও হাতে। বুঝতে পারছ মোবা, এ গাণ্ডীব কিসের?

মোবারক হাসল। বিপ্লবের স্যার?

বীরেন্দ্র হাত বাড়িয়ে তার কাঁধ ছুঁয়ে বললেন, তুমি তো ভাল ছাত্র ছিলে হে! কেন পড়াশুনো ছেড়ে দিলে? কাজটা বাপু ভাল করো নি!

লালী! লালী! বনশোভা চেঁচিয়ে উঠলেন। দেখছ জংলী মেয়ের কাণ্ড? ফের খিড়কি খুলে বেরিয়েছে। এত অস্থির মেয়ে!

বনশোভা খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। বীরেন্দ্র মোবারককে শুনিয়ে বললেন, অস্থির মানেটা কী? ওর কি এখানে মন বসছে? বারোটা বছর তো সামান্য নয়। টোটালি ডিসকমিউনিকেটেড হয়ে গেছে। তাছাড়া আমরা তো বলতে গেলে গরিব মানুষ। আর ও বেড়ে উঠেছে অ্যাফ্লুয়েন্সের মধ্যে। তাছাড়া ওদের কালিকাপুরের পরিবেশটা বনেদী গ্রাম্য গৃহস্থের। আমাদের এখানে খানিকটা আরবান।

উত্তেজনার পর ক্লান্ত দেখাচ্ছিল বীরেন্দ্রকে। মোবারক বলল, পান্নার ঠিকানাটা দিতে পারেন স্যার? খুব জরুরী দরকার ছিল ওর সঙ্গে।

বীরেন্দ্র মাথা দোলালেন গম্ভীর মুখে। ওর হোয়্যার অ্যাবাউটস জানি না। শুনেছি কোথায় চাকরি পেয়ে চলে গেছে। আমাদের খুলে কিছু বলেও যায় নি।

বনশোভা লালীকে প্রায় টানতে টানতে বাড়ি ঢোকালেন। লালী বিব্রত মুখে হাসছে। বনশোভা তাকে রান্নাঘরে বারান্দায় ডাইনিং টেবিলের একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বললেন, একটু বসো। এক্ষুণি প্ল্যান করব আমরা।

লালী বলল, ওই পুকুরে কিন্তু আমি সাঁতার কাটব। আমি ভীষণ সাঁতার কাটতে পারি জানো?

বনশোভা হাত তুলে মারার ভঙ্গী করে হাসতে হাসতে বললেন, চালাকি করো না! এখানে এসে জংলীপনা দেখিয়ে তাক লাগাতে চাইছ। কালিকাপুরে তোমাকে পুকুরে নামতে দেয় বিশ্বাস করব ভাবছ?

আমি কিছু দেখিনি বুঝি? রীতিমতো বাথরুম, টাব পর্যন্ত আছে। শহরের বাড়িকেও হার মানায়। আর তুমি ইচ্ছে করেই গেঁয়োপনা দেখাচ্ছ।

লালী কাঁচুমাচু মুখ করে বসে রইল।

মোবারক বলল, উঠি স্যার। বনিদি, গেলুম। যদি পান্না চিঠি ফিঠি লেখে, ওর ঠিকানাটা চাই আমার। মাঝে মাঝে খোঁজ নিয়ে যাব।

সে চলে গেলে লালী বলল, ছেলেটা কে মা?

বনশোভা বললেন, তোর ছোটমামার বন্ধু।

মা। ছোটমামা.......বলেই চুপ করে গেল লালী। না, ওসব কোনো কথা সে বলবে না। এ জীবনে কারুর কাছে বলবে না।

বনশোভা বললেন, কী? কিন্তু মেয়ের কাছে জবাব না পেয়ে রান্নায় মন দিলেন।

তেরো

কালীতলা পাম্পিং স্টেশনের একতলা ঘরটায় ছায়ায় নীল রঙের ভটভটিয়া দাঁড় করানো আছে দেখে ক্ষমা থমকে দাঁড়িয়েছিল। ছোটবাবু এসেছেন কখন। এদিক ওদিক খুঁজে দেখতে পাচ্ছিল না তাঁকে।

ক্ষমার কাঁখে পেতলের ঘড়া। একটু আগে বকুলপুর বাজার থেকে মাছ বেচে ফিরেছে। বলল, ও শচীন, মেশিনটা একবার চালিয়ে দাও না ভাই! নাইব।

উঁচু ফ্রেমের মধ্যে নল বসানো আছে। ফোয়ারার মতো তীব্রবেগে জল উপচে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সেই জলের মধ্যে দাঁড়ানো সোজা নয়। শচীন বলল, তা দিচ্ছি। কিন্তু দক্ষিণা কই দিদি?

অমনি ক্ষমা বাঁ হাতে কলাপাতায় জড়ানো কয়েকটা পাবদা মাছ ছুঁড়ে দিল বারান্দায়। দক্ষিণে ছাড়া তোমার দিদি জল নিতে আসে কখনও? দেখ, দেখ। চিলে ছোঁ দেবে। রেখে এস আগে।

শচীন খুশি হয়ে বলল, উরে ব্বাস। কোথায় ধরলে দিদি? এ তল্লাটে তো সব শুকনো'

সেই মৌখালির বিলে ইজারা নিয়েছিলুম না আমরা? বোরো ধানে পাম্প চালিয়ে সেচ দিচ্ছে আর জল একটু করে শুকোচ্চে। ক্ষমা সবিস্তারে বলল। জল তলায় ঠেকেছিল। মণ দেড়েক মাছ হল আর কী! ভাগাভাগি হতে রাত-দুপুর।

শচীন কলঘরে ঢুকে সুইচ অন করে এল। কিছুক্ষণের মধ্যে জল উঠতে শুরু করবে।

ক্ষমা ফোয়ারার তলায় গিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দুষ্টু হেসে বলল, ছোটবাবু কোথায় গেল? নাইতে লজ্জা করছে যে!

শচীন মনে মনে বলল, কত লীলা জানো শ্রীরাধিকে! মুখে বলল, না না। ছোটবাবু মোড়লপাড়ায় গেছে। তুমি নাও না যত খুশি। দেখো, সেদিনকার মত জলের ধাক্কায় আছাড় খেও না।

আমি জলের মাছ। বলে ক্ষমা ফোয়ারার তলায় চলে গেল। সে জানে, শচীন মুখে দিদি বললেও আড়াল থেকে তার শরীর দেখবে। দেখুক! কী আছে আর এ শরীরে? ভেতরটা ফোঁপরা। ওপরটা মাংসে চেকন—হয়তো লোভনীয় এখনও। ছেলেছোকরাও তাকে দেখে শিস দেয় বকুলপুরের বাজারে। আমার পোড়াকপাল! আমি যে তোদের মত কত তাগড়া ছেলেপুলের জন্ম দিতে পারতুম। দিয়েছিলুমও। ধরে রাখতে পারি নি।

জলের মাছ বলতে গিয়ে মনে পড়ে গেছে ক্ষমার, কবে ছোটবাবু তাকে মচ্ছকন্যে বলে ডাকতেন যেন। সে কতকালের কথা। বাবলা নদীর ধারে হিজলতলায়, নাকি মৌখালির বিলে ফাঁড়ি ঘাসের বনে—কিংবা কালিকাপুরে দালানবাড়িতে—কোথায় বলেছিলেন, মনে নেই। আগের জন্মের কথা বলে মনে হয়। ছোটবাবু, ক্ষমা যদি মচ্ছকন্যে হয়, তুমিও তা হলে মচ্ছপুরুষ ছিলে আগের জন্মে। এ জন্মে কালিকাপুরে ডাক্তারবাবুর ছেলে হয়ে আছ। নইলে ক্যানে এত টান ক্ষমার দিকে? নইলে কেন বকুলপুরের বড়বাড়ির মেয়েটার সঙ্গে বনিবনা হবে না বলো?

কিন্তু ক্ষমার কাছে কী পেলে শেষ অব্দি, আর ক্ষমাই বা কী পেল? বড় জ্বালা ক্ষমার ছোটবাবু। মরণ না হলে এ জ্বালার শেষ নেই।

আর তুমিও তো জ্বলছ। বুঝতে পারি ছোটবাবু। এক নদীর দুপারে বসে আছি। তাকিয়ে আছি। কেউ কারুর কথা বুঝতে পারি নে। হাত বাড়িয়েও হাতটা ছোঁয়া যায়না। ক্ষমার গায়ের মাছের গন্ধ। জলকাদার গন্ধ। সাতটা সাবুন ঘষেও তো যাবে না। আর তোমার দেখ কী সোনার জলে ধোয়া শরীলখানা! মিশ খায় না মেশালেও। তেল আর জল যেমন।

শচীন কিচেনের ঘুলঘুলি দিয়ে দেখতে পেল, দু'হাত ওপরে তুলে মেয়েটা যেন প্রার্থনার ভঙ্গীতে বিড়বিড় করে কী বলছে। জলের ধারার ভেতর তার ঠোঁট দুটো নড়ছে। চোখ বন্ধ। উঁচু উদ্ধত স্তন ও ডিমালো উরুর দিকে নিষ্পলক চোখে ধূর্ত শেয়ালের মত তাকিয়ে রইল শচীন। তার সঙ্গী আকবর এসে আচমকা ওর কাঁধ ধরে বলল, অ্যাই শালা খচ্চর!

শচীন হি-হি করে হাসতে লাগল। আকবর বলল, ও জিনিস তোমার ভোগের জন্য নয় বাপ! ওসব বড়লোকের ধন। চোখ দিও না। দেখ না, যুগলো ব্যাটা পেয়েও পেল? আরে দূর দূর! দুনিয়ার সেরা যা কিছু সব তো শালা বড়লোকের জন্যে। তার চেয়ে আয়, ডুগি-তবলায় তেরে-কেটে মেরে-কেটে করি। তুই গলা ছেড়ে মান্না ডে হাঁক। ভাই রে এ দুনিয়ায়.....

হারমোনিয়াম ডুগি-তবলা আছে কোয়ার্টারে। দুজনে স্ফূর্তিতে সময় কাটায়। একটু পরে ভরা কলসী, কাঁখে ভিজেশাড়ি জড়ানো গায়ে, ক্ষমা দরজার নীচে এসে বলল, হয়ে গেছে ভাই। মেশিন বন্ধ করো।

ক্যানেলের বাঁধ ঘুরে নেমে বাঁশবনের কাছে গিয়ে দেখল, ছোটবাবু চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে জামতলায়। ক্ষমাকে দেখে বলল, তোর বর কোথা রে?

কেন? ববকে হঠাৎ কী দরকার ছোটবাবু?

যোগব্রত হাসবার চেষ্টা করে বললেন, দুটো জ্ঞানের কথা শুনতে এলুম—কী যেন বলিস ওকে—হ্যাঁ, ডাক-পুরুষের কাছে।

ক্ষমা হাসল না। কেন? অত লেখাপড়া পাসের বিদ্যায় কুলোচ্ছে না বুঝি?

না। যোগব্রত শান্তভাবে বললেন। জানিস, মায়া ওর মায়ের কাছে পালিয়ে গেছে।

ক্ষমা একটু চমকাল। পরক্ষণেই খিলখিল করে হেসে উঠল।

হাসছিস ক্ষমা?

হাসব না কী কাঁদব? ক্ষমা সপ্রতিভ ভঙ্গীতে বলল। যে গাছের বাকল, সেই গাছে মিলতে গেছে। এ তো সুখের কথা ছোটবাবু। যা হওয়া উচিত, তাই হয়েছে। ছেলে হলে বলতুম, তাই তো! মেয়ে। ঠিকই করেছে। হতভাগিনী দুঃখিনী জননীটির পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে এতদিনে, আমি তো খুব সুখ পেলুম শুনে। বেশ করেছে।

যোগব্রত বললেন, তুইও দেখছি তোর বরের মত দার্শনিক—মানে ডাকপুরুষ—উঁহু, ডাককন্যে হয়ে গেছিস। ভাল।

কেন? অন্যায় বললুম কিছু?

না। যোগব্রত হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। গলার স্বর বদলে গেল। কিন্তু আমার এ কত বড় হার বুঝতে পারছিস ক্ষমা? আমি ঘুমোতে পারছি না। খেতে পারছি না। সারা এলাকায় অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কোনো কাজে মন বসছে না। কাল প্রায় সারা রাত বকুলপুরে ওদের বাড়ির পাশ দিয়ে চক্কর মেরে ঘুরেছি।

ক্ষমা বাঁকা হাসল। নিজের দোষে, ছোটবাবু।

কী দোষ আমার?

ক্ষমা বলল, কাঁখে ভরা কলসী। দাঁড়ানো যায় না এভাবে। ইচ্ছে হয় তো আসুন। দুঃখ বেজেছে বুঝি। তাই ছাই ফেলতে ভাঙাকুলো এ ক্ষমার কাছেই এসেছেন তো?

হ্যাঁ। এসেছি।

ক্ষমা মুখ ঘুরিয়ে আবেগ চেপে বলল, শুনে প্রাণটা ভরে গেল ছোটবাবু। আসুন।

তুই চল্, যাচ্ছি।

যোগব্রত দাঁড়িয়ে রইলেন। মাঠের দিকে তাকিয়ে সিগারেট ধরালেন। ক্ষমা বাঁশবনের ভেতর এগিয়ে গেল। ঘুরে একবার দেখলেন, সে কলসীটা কাঁখ বদল করতে গিয়ে এদিকে ঘুরল। তাঁকে দেখে নিল।

তারপর দ্রুত চলে গেল।

সিগারেটটা শেষ হলে জুতোর তলায় ঘষড়ে নিভিয়ে যোগব্রত পা বাড়ালেন।

ক্ষমা ঘরের পেছন দিকে কাপড় বদলাচ্ছিল। চুল ঝাড়তে ঝাড়তে এসে দাওয়ায় একটা তালপাতার চাটাই বিছিয়ে দিল। যোগব্রত বসলেন।·বললেন, জল দে খাই।

ক্ষমা ঘরে ঢুকে কাঁসার গ্লাসে জল আনল। মুখ টিপে হেসে বলল, সেণ্টারের টাটকা জল। এক্ষুণি আনলুম দেখলেন না ঘড়া করে। কেউ খায় নি এখনও।

গ্লাস থেকে মুখ তুলে যোগব্রত বললেন, জল জল করছিস কেন? কিছু বলেছি?

এঁটো জলে তো আপনার মোন কোনোদিন ভরে নি ছোটবাবু? ক্ষমা চোখে হাসল। দায়ে পড়ে খেয়েছেন, তেষ্টাও মিটেছে। কিন্তু মোন ভরে নি। কারই বা ভরে?

এত বাঁকা কথা বলিস কেন কে জানে? যোগব্রত গ্লাস রেখে বললেন। হয়তো শুনতে ভালবাসি বলেই বলিস। কিন্তু আজ আমি....

কী? চুপ করলেন যে?

আজ আমি মাথার ঘায়ে জ্বলছি। জ্বালাস নে ভাই। বরং সান্ত্বনা দে।

ছোটবাবু! ও কী! ক্ষমা অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইল।

যোগব্রত দ্রুত পাঞ্জাবির পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখটা আলতোভাবে মুছে বললেন, কিছু না। কাল থেকে ঘোরাঘুরি করে ঠাণ্ডামতো লেগেছে। নাকে চোখে জল ঝরছে। সর্দি-টর্দি হবে আর কী।

ক্ষমা কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর নিঃশ্বাস ফেলে চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, একটা সত্যি কথা বলবেন ক্ষমাকে?

কবে বলি নি রে?

এখন একবার বলবেন?

কী বলব?

আপনি বকুলপুরের দিদিকে এখনও ভালবাসেন, তাই না? মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারেন নি, তাই না?

যোগব্রত ওর চোখে চোখ রেখেই মুখ নামালেন। কী ভালবাসা? ভালবাসার তুই কী বুঝিস?

ক্ষমা ঠোঁটের কোণায় হাসল। ছোটলোকের মেয়ে। লেখাপড়া শিখি নি। কিন্তু আপনাদের মতো লোকের সঙ্গ তো পেয়েছি? ওই সোজা কথাটা কে বোঝে না ছোটবাবু? উড়ন্ত পাখিকেও শুধোন, বলে দেবে। আব দেখুন ছোটবাবু, এই জষ্ঠি মাসে চোখ খুললেই দেখতে পাবেন, পাখ পাখালি মুখে করে খড়কুটো বইছে। কেন বলুন তো? বাসা বাঁধবে। ডিম পাড়বে। ডিম ফুটে ছানা বেরুবে। সেই ছানাকে লালন-পালন করবে।

যোগব্রত অধীরভাবে বললেন, কী বলতে চাস তুই?

আপনার মনের কথা। আবার কী? আপনি তো বৈরাগী নন। সাধু-সন্নোসীও নন।

যোগব্রত চুপ করে থাকলেন।

ক্ষমা বলল, কিন্তু আপনার বরাবর দুই নৌকায় পা। আপনি মাথার ঘায়ে জ্বলবেন না তো কে জ্বলবে ছোটবাবু? বকুলপুরের দিদি মেয়েকে ফেলে রাতারাতি চলে গেলেন এক কাপড়ে। আপনি গিয়ে পায়ে মাথাকুটে বলে আসেন নি তখন, আর কালীতলামুখো হব না? নেপেনবাবুর রাগ ছিল কালীতলার ওপর। কিসের রাগ? না, কালীতলাওলা লাল ঝাণ্ডা করে। সেই কালীতলার ছোটলোকের মেয়ের সঙ্গে আপনার পীরিত। নেপেনবাবু আপনার ওপর খাপ্পা হয়েই ছিলেন—আরও হলেন। আর আসতেই দিলেন না দিদিকে।

যোগব্রত দ্রুত বললেন, পুরনো কথা তুলে লাভ কী?

ক্ষেতিই বা কী? ক্ষমা শক্ত হয়ে বলল। আর আপনি করলেন কী মনে পড়ছে? যেন নেপেনবাবুকে দেখিয়েই আমাকে আর আমার লোকটাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিজের বাড়িতে তুললেন। ওকে দিলেন জমি। আর আমাকে মিথ্যে পাটরাণী সাজাতে বসলেন।

ক্ষমা চোখ মুছে ধরা গলায় বলল, তখন ফাঁদে পড়ে ছটফট করছি। শেষ পর্যন্ত ওকে সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে এসে বাঁচলুম।

কাঁদবার কী আছে এতে? যোগব্রত সিগারেট বের করলেন।

আমারও যে একুল-ওকুল দুকুল গেল ছোটবাবু! ক্ষমা হু-হু করে কেঁদে উঠল এবার। না পেলুম সোয়ামীর মোন, না ঘর-সংসারের সুখ। একি আমার বেঁচে থাকা? নেহাত মরতে পারি নে বলে জন্তু-জানোয়ারের মতো জলকাদা মেখে আহার খুঁজি। পোড়া পেটে দুটো মুখে দিতে হয়।

যোগব্রত বললেন, কিন্তু আমি কী করব বল্ ক্ষমা? কী করব? কী করতে পারতুম?

ক্ষমা চোখ মুখে কান্না সামলে নিয়ে বলল, এখনও তো বয়স চলে যায় নি। বিয়ে করে বউ আনুন। চাষবাস করুন। আপনি বড়লোক জোতদার মানুষ। আপনার কী ভাবনা ছোটবাবু? একবার জমির আলে গিয়ে দাঁড়াবেন, মন ভরে উঠবে। আর আমি? আমি কোথায় দাঁড়িয়ে বলব, এই আমার মাটি? কিসে মোন ভরবে?

যোগব্রত উঠে দাঁড়ালেন। আজ বড় মুখ করে তোর কাছে এসেছিলুম। তুইও আঘাত দিলি। এই আমাব কপাল।

ক্ষমা চুপ করে রইল। যোগব্রত আস্তে আস্তে চলে গেলেন। খাল পেরিয়ে বাঁশবনেব ভেতর ঢুকলে ক্ষমা উঠল। দুপুরের রান্না চাপাতে বড্ড দেরি হয়ে গেছে। যুগল কখন ফিরবে তার ঠিক নেই। কোনোদিনই থাকে না। লোকটা সেই ভোরে কখন বেরিয়ে যায় সুতো আর টাকু নিয়ে। গামছায় খানিকটা মুড়ি আর গুড় বেঁধে নেয়। নদী আর মাঠ জুড়ে ঘুরে বেড়ায়। যখন যেখানে মন চায়, বসে পড়ে। আপনমনে সুতো কাটে। হয়তো কোন হিজল গাছের ছায়ায়, নয়তো সাঁকোর ওপর—কিংবা চেলাই চণ্ডীর খালে লাল ফুলে ভবা কাঁটা-মাদারের তলায় একলা যে লোকটা বসে টাকু ঘুরিয়ে সুতো পাকাচ্ছে, সেই যুগল। দূব থেকেই চেনা যায় তাকে।

আজ এক মুহূর্তের জন্য ক্ষমার মনে হল, লোকটা সারাজীবন মাঠে-মাঠে নিজের থাকার মতো একটা ঘর খুঁজে হন্যে হচ্ছে। ক্ষমা মনে মনে বলল, ক্ষ্যামা দিও।

কার উদ্দেশে বলল নিজেও বুঝতে পারল না।

বিকেলে আকাশ কালো করে মেঘ উঠেছিল। সেই মেঘ ছড়িয়ে গেল আকাশের চারিদিকে। বিশাল শূন্য ড্রাম গড়িয়ে নিয়ে যাবার মতো গমগম শব্দ হতে লাগল। ঝলকে ঝলকে বিদ্যুৎ শিসিয়ে উঠল। তারপর মৌখালির বিলের দিক থেকে শনশন করে একটা ঝোড়ো হাওযা এসে পড়ল।

জগাই আকাশ দেখতে দেখতে ঘোষণা করল, ঝড়িটা থামলেই ওনারা বর্ষাবেন। ওনারা কারা, তা জগাই জানে না। তার মনে হয়, তাঁরা আছেন মাথার ওপর। না থাকলে এসব হয়-টয় না।

কিন্তু জগাইয়ের পূর্বাভাস ঠিক-ঠিক ফলল না। ঝোড়োহাওয়া থামার আগেই বৃষ্টি এসে গেল। প্রথমে মোটা মোটা ফোঁটা। তারপর ঘন মিহি আর চিকণ ধারা। সেই সঙ্গে নদীর ওপারে সোনালী ঝলমলে রোদও ফুটে উঠল আকাশে। রোদের মধ্যে বৃষ্টি পড়া দেখলে জগাই নাচতে নাচতে খেঁকশিয়ালের বিয়ের কথা ঘোষণা করে। কিন্তু আজ সে অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইল।

বীরু বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। একটু পরেই বেরুবে। স্টেশন রোডে সন্ধ্যার মুখোমুখি সেই বাসটা ধরবে। ঝড়বৃষ্টি তার মুখটা বিকৃত করে ফেলেছে। কিন্তু নদীর ওপারে রোদের মধ্যে বৃষ্টি দেখে সে খুশি হল। এপারে আলোর রঙ কালচে ধূসর এবং ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। জোরালো বাতাসও বইছে। ওপারে রোদটা বিরাট প্রজাপতির মতো বসে আছে, ডানা কাঁপার মতো কাঁপনও আছে। ভারি অদ্ভুত লাগছিল দেখে।

জগাই বলল, রোদও হচ্ছে, বৃষ্টিও হচ্ছে—তখন আপনার কী মনে হয় বাবুদাদা?

বীরু বলল, ভীষণ আনন্দ হয়।

জগাই চিন্তিত মুখে বলল, আমার খালি ভাবনা হয়। কোথায় যেন একটা গোলমাল বেধেছে। তালে তাল আসছে না। সুরে সুর বসছে না। বরাবর বৃষ্টিমাসে এমন ধারা হয়। বুঝলেন?

বুঝলুম না। বলে বীরু কান পাতল। একটু চমকাল। গ্রামের ভেতর যেন যোগব্রতের মোটর

সাইকেলের শব্দ হচ্ছে। ফিরে আসছেন এরি মধ্যে? বলে গেছেন, বকুলপুরে যাবেন। তারপর আরও কোথায় যেন। ফিরতে রাত হয়ে যাবে। বীরু যেন অপেক্ষা করে তাঁর জন্য।

এদিকে বীরু ঠিক করেছে, এই সুযোগেই চলে যাবে। আর সে থাকতে পারছে না এখানে। এই পরিবেশটাই অসহ্য লাগছে। তা ছাড়া চাষবাসের খেত-খামারে চাকরি করা তার পোষাবে না। তার চেয়েও বড় কথা, সে বেশ বুঝতে পেরেছে, যোগব্রত তাকে যেন বডিগার্ড রাখতেই মতলব করছেন। হয়তো পান্নার ভয়ে। কিন্তু পান্না কিছু করতে চাইলে বীরু তাকে ঠেকাতে পারবে না। পান্না বরাবর বড্ড ডেসপারেট। বীরুর চেয়ে ঠাণ্ডা হিম, কঠিন। আগের দিন হলে কী হত বলা যায় না, কিন্তু এখন বীরু খুব দুর্বল। তার আত্মা একটা অপমানের বোঝা বয়ে নুয়ে আছে। সে ভাড়াটে খুনী তো নয়।

নদীর ওপারের রোদটা আস্তে আস্তে মুছে গেল। বাতাসের গতি কমল। এপার ওপার একাকার করে বৃষ্টি ঝরতে থাকল। তার মধ্যে ভিজতে ভিজতে যোগব্রত এসে পড়লেন।

বীরু বলল, ফিরে এলেন যে? যোগব্রত হয়তো শুনতে পেলেন না। জগাই বলে অভ্যাস মতো ডাকলেন না। গাড়িটা ঠেলে বাড়ির পেছনের দরজায় নিয়ে গেলেন। জগাই ভেতরে দৌড়ল। দরজা খুলে দেবে। বীরু একটু দাঁড়িয়ে থাকার পর ঘরে গিয়ে ঢুকল। কিডব্যাগটা কোণা থেকে এনে বিছানার ওপর প্রকাশ্যে রেখেছিল। এখন সে মনে মনে তৈরি। যোগব্রতকে সে সোজা বলে দেবে, চলে যাচ্ছি। বৃষ্টি হোক, ঝড় হোক, কেউ আমাকে আটকাতে পারবে না।

ততক্ষণে যোগব্রত ওপরে চলে গেছেন।

ইজিচেয়ারে বসে টেবিল ল্যাম্পের আলোয় একটা খাম খুলছিলেন যোগব্রত। হাত কাঁপছিল। আজ সকালে ফার্মে যান নি। সব চিঠি ফার্মেই দিয়ে আসে ডাকপিওন। কিছুক্ষণ আগে ফার্ম হয়ে যাবার সময় এই খামের চিঠিটা দেখে চমকে উঠেছিলেন। ভীষণ ভয় পেয়েছিলেন। খামের ভেতরে গোখরো সাপ আছে যেন। ওখানে বসে পড়তে পারেন নি। তাই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে বাড়ি এসে চুপিচুপি চিঠিটা পড়তে চান।

চিঠিটা পান্নার। লম্বা চিঠি।

টেবিল থেকে চশমার খাপটা টেনে নিলেন যোগব্রত। কাঁপা কাঁপা হাতে চশমা পরলেন। গোটা গোটা হরফে খুব মন দিয়ে লিখেছে পান্না। প্রথম লাইনটা পড়েই ধাক্কা খেলেন। '. জামাইবাবু, আপনার শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণাম।'

ঘোর লাগা চোখে লাইনটার দিকে তাকিয়ে রইলেন কয়েক সেকেণ্ড। মনে হল, বাইরে নয়—মাথার ভেতরেই মুহুর্মুহু মেঘ ডাকছে। রক্তবৃষ্টি হচ্ছে। মাঠ ঘাট লাল হয়ে যাচ্ছে।

'জামাইবাবু,

আপনার শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণাম। এই চিঠিটা লেখা আমার পক্ষে খুব কঠিন কাজ। আমি আপনার মতো গ্র্যাজুয়েট নই। নিতান্ত অশিক্ষিত যুবক। বড়দা আমাকে অশিক্ষিত বলেন। আমি জানি, ভুল বলেন না। কাজেই এই চিঠির ভুলত্রুটি নিজগুণে ক্ষমা করবেন।

আপনি মহৎ ভদ্রলোক। এলাকার শোষিত বঞ্চিত জনগণের জন্য আপনি আজীবন লড়ে যাচ্ছেন। আপনি বিশ্বাস করেন, রাজনীতির বিরাট জাল ফেলে তাদের ধরা হচ্ছে আর ভেজে খাওয়া হচ্ছে (স্মরণ করুন, কথাটা কবে কোথায় বলেছিলেন)। আপনি তাই গোপনে জালগুলোর গেরো কেটে বেড়াচ্ছেন। এজন্যেই আপনি মহৎ এবং একজন সত্যিকার বিপ্লবী। আপনার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বলছি, আমিও এটা বিশ্বাস করি।

জামাইবাবু, আপনি কথায় কথায় গান্ধীজী, পল্লী পুনর্গঠন আর অহিংসার পথে বিপ্লবের জয়গান করেন। আপানি কো-অপারেটিভ করে বেড়ান গ্রামে গ্রামে। আপনার মতো একজন আদর্শবাদী পুরুষের কথা ভাবলে সত্যি বড় আনন্দ হয়। তবে এসব কথা থাক। আসল কথাটা বলি, যেজন্য এই চিঠি লেখা।

সে-রাতের অপারেশনের আগে আপনি আমাকে বলেন নি, গাড়িতে মেজদা থাকবে। বলেছিলেন, রুনু মিনিস্টারের সঙ্গে থাকবে। মধুবাবু একা আসবেন। কিন্তু আমি তাতে সায় দিলেও জানতুম, মেজদা

মিনিস্টারের সঙ্গে যায় নি। কারণ বিজয়েন্দুবাবুর বাড়িতে মিনিস্টার ফেরার পথে একটুখানি বসে গেলেন। তখন রাত প্রায় ন'টা। আমি আর বীরু ওখান দিয়েই নারানবাবুর বাড়ি গিয়েছিলুম। কিন্তু তখন আর কিছু করার ছিল না। আমি অলরেডি তখন ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছি। পিছিয়ে এলে খতম হয়ে যেতুম। জামাইবাবু, অনেক ঘা খেয়ে এবং ঠকে শিখেছি, জীবনটা খুব ভ্যালুয়েবল প্রপার্টি। পিদিমের মতো আগলে রাখা উচিত।

সে রাতে যখন দুলেপাড়ার মাঠ ঘুরে বিদ্যাপীঠে যাচ্ছি, তখন আমি বুঝতে পেরেছি আপনার রিঅ্যাল টার্গেট কে? সে মেজদা। অথচ শুনলে অবাক্ হবেন, আমার একটুও রাগ হল না আপনার ওপর। আমিও আমার টার্গেট করে নিলুম মেজদাকে। আপনি তো জানেন বরাবর আমি খুব ঝটপট সিদ্ধান্ত নিতে পারি।

কেন টার্গেট করলুম? ফাঁদে আটকে পড়েছি বলে? না জামাইবাবু। মেজদা যেমন আপনার বর্ন এনিমি, আমারও তাই। অন্ধকার মাঠে ঝড়টা এসে পড়লেই আমার বিবেক জেগে গেল। হ্যাঁ, আমার একটা ছোট হোক, রোগা হোক, পটকা হোক—বিবেক আছে। হাসবেন না যেন। আমার বিবেক বলল, এই তো মোক্ষম সুযোগ। বি রেডি অ্যাণ্ড ক্র্যাশ দা এনিমি!

আপনি জানেন কিছু কিছু কারণ। অনেক ঘটনাও হয়তো জানার কথা। তবু সংক্ষেপে টাচ দিয়ে যাচ্ছি। মেজদা জানত, আমি বর্ন-কিলার। আব সে ছিল ভীষণ ভীতু। তার ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স বেড়ে যাচ্ছিল দিনে দিনে। কথায কথায় সে গায়ের জোরের নিন্দা করত। সেই কমপ্লেক্স থেকেই মেজদা আমাকে ঘৃণা করতে শিখেছিল। কিন্তু আমার ঘৃণার জন্ম প্রথমে নিছক রিঅ্যাকশন থেকে। পরে অন্য কিছু থেকে। সেই অন্য কিছুটা এসে পড়েছিল সাতষট্টি সালে। মেজদা রাজনীতি করত বলে বাড়িব ছেলে হিসেবে খুব কাছে থেকে তার ব্যাপার-স্যাপার আমার দেখা ছিল। তাব সঙ্গীদেব তো ভালই জানতুম। জানতুম, এরা একদল দালাল। ধূর্ত মুরুব্বিরা এই নির্বোধগুলোকে হাতের পুতুল বানিয়ে ক্ষমতা ও টাকাকড়ি লুটছে। এরা ছিঁটে ফোঁটা পাচ্ছে-টাচ্ছে অবশ্য। কিন্তু মেজদা? তার কেন এ মতিচ্ছন্ন হবে? সে তো শিক্ষিত, বুদ্ধিমান মানুষ। লোক ঠকানো এবং ভোট কুড়োনো বাজনীতি কি তাকে সাজে? করুণা মাঝে মাঝে আমার ঘৃণাকে আড়াল করে সামনে দাঁড়াত। নকশালী আমলে ক্রমশ সেই করুণা মরে গেল। বেঁচে রইল শুধু ঘৃণা। মেজদা আমার পেছনে পুলিস আর তার দলের গুণ্ডা লেলিয়ে দিল। জামাইবাবু, আপনি আমার উদ্ধারকর্তা। ভুলি নি। কৃতজ্ঞতাবোধ এখনও আমার আছে।

এর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যায় দিদি এবং আপনার ব্যাপারটায় মেজদার ভূমিকা দেখে সত্যি অবাক হয়ে যেতুম। নিছক ওই কুৎসিত রাজনীতির স্বার্থে সে নিজের দিদির জীবনটাকে প্ররোচনায় আর মিথ্যেমিথ্যি রটনার আঘাতে একেবারে নষ্ট করে ফেলল। দিদি বুঝতে পারে নি। সে মেজদাকেই বেশি ভালবাসত। ছেলেবেলা থেকেই দিদি তার ভক্ত হয়ে উঠেছিল। আর কারুর কথা সে মানত না বা কানে নিত না।

দিদির দিকে তাকিয়ে আমার কষ্ট হত। মেজদার ওপর ঘৃণাটা যেত বেড়ে। আপনি এ ক্ষেত্রে একেবারে নিবপবাধ সাধু-মহাত্মা, তা বলব না। কিন্তু আপনার সঙ্গে তো আমার রক্তের সম্পর্ক নেই। দিদিব সঙ্গে আছে। তার জন্যই মেজদাকে আমার খুন করার ইচ্ছে হত।

কিন্তু তখনও সত্যি সত্যি সে-পথে পা বাড়ানোর জন্য তৈরি ছিলুম না। জামাইবাবু, মেজদা তারপর আমার হার্টে আঙুলের খোঁচা দিলে। স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। এ কি দুঃস্বপ্ন দেখছি? এত নীচ, নির্বিকার এবং জঘন্য মানুষ থাকতে পারে, যে নিজের ছোট-ভাইয়ের প্রেমিকাকে জেনেশুনে বিয়ে করতে চায়?

আমি মধুবাবুর মেয়ে মঞ্জুর কথা বলছি। মঞ্জু আর আমার এ অ্যাফেয়ার অনেক দিনের। নকশালী আমলে সে আমাকে এত হেল্প করেছে, বলার নয়। মঞ্জু তেজী, সাহসী, একরোখা মেয়ে। বেপরোয়া তার চালচলন। তাকে আমার উপযুক্ত সঙ্গিনী মনে হয়েছিল। আমরা পরস্পরকে অন্ধের মতো ভালবেসেছিলাম। এবং এ সবই মেজদা জানত।

মধুবাবু একজন অপগণ্ড গ্রাম্য মানুষ। তার কোনো দোষ ছিল না। মেজদা জামাই হলে তার খুশি হবারই কথা। কিন্তু আমি আজও ভেবে কূল পাই নে, মেজদা কীভাবে জেনেশুনে বর সাজতে তৈরি হয়ে গেল! মঞ্জুও দারুণ অবাক হয়েছিল। বিদ্যাপীঠের পেছনে পুকুরের ঘাটে ক'দিন আগে এক রাতে,

তখন জ্যোৎস্না ছিল, মঞ্জু আমার পায়ে মাথা কুটতে লাগল, একটা কিছু করো। আমাকে বাঁচাও। আমি ওর ঠোঁটে ঠোঁট রেখে বললুম, প্রতিজ্ঞা করছি— একটা কিছু করব। জ্যোৎস্নায় মঞ্জুর চোখ দুটো চকচক করছিল।

জামাইবাবু, তাহলেই দেখুন, নিজের অজান্তে আমি মেজদাকে খতম করতে তৈরিই ছিলাম। এতে আপনি নিমিত্তমাত্র। আপনি শুধু আগুনটা ফুঁ দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন, অত কিছু না জেনেই।

তাই আপনার কাছে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এই চিঠিটা লিখছি। আমি জানি, আপনি আমার জন্য সব সময় উৎকণ্ঠায় ভুগছেন। হয় তো ভাবছেন, পান্না আসল খবর পেয়েই দৌড়ে আসবে ড্যাগার নিয়ে। না জামাইবাবু, আপনি হয় তো আমাকে সেবারকার মত আবার উদ্ধার করেছেন। মেজদা বেঁচে থাকলেও মঞ্জুকে পেতুম না, না থেকেও অবশ্য আর পাওয়ার আশা নেই। কারণ, আমি তার পিতৃঘাতীদের একজন। কিন্তু মঞ্জুর কথামত আমি একটা কিছু করতে তো পেরেছি। তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছি অবাঞ্ছিতের হাত থেকে। আমার সেই রোগাপটকা বিবেক বলছে, বরং ওকে বাতিল করে দাও মন থেকে। দিতে চেষ্টা করছি। কারণ প্রেমিক হিসেবে আমার প্রতিশ্রুতি পালন করেছি। আর কোনো খেদ নেই।

বকুলপুরে আর কোনো দিন ফিরব না। ফেরার মুখও হয় তো নেই। আর ফিরেই বা কী লাভ? বকুলপুর আমার অসহ্য লাগত। বেঁচে গেছি। আপনার বন্ধু ভদ্রলোক ভেরি বিগ অফিসার। আপনি বুঝি তাঁকে আমার সম্পর্কে কিছু বলে থাকবেন। উনি আমাকে খালি বলছেন, আপনাদের মতই সাহসী বেপরোয়া ইয়ং ব্লাড দরকার। এখানে ভীষণ দলাদলি আছে ট্রেড ইউনিয়নে। কীভাবে চলবেন-টলবেন, বলে দেব। আপনাকে আমার চাই। মাস তিনেক শিখুন-টিখুন, সেই যথেষ্ট। যাই হোক, এখানেও আমি মাথার ওপর আপনার মত একজন প্রেটেক্টর পেয়ে গেছি। কী লাক আমার!

জামাইবাবু, জীবনটাকে বদলানোর এই সুযোগ ছাড়তে চাইনে। শেষে একটা কথা বলতে চাই। দিদি এবং আপনার মাঝখানে তো আর মেজদা নেই। ডিভোর্স-টির্ভোস মিনিংলেস। আপনি তো কথায় কথায় বড়াই করে বলেন, আমি ন্যাচারাল মানুষ। কিছু মানিটানি নে। অন্তত লালীর মুখ চেয়ে সেটা প্রমাণ করুন না! বড়দা বিয়ে করেছেন। দিদির ভবিষ্যৎ অন্ধকার। বলবেন, তুমি তো আছ। হ্যাঁ আছি। তবে আগে অপনি কী করছেন, দেখতে চাই। এজন্য অপেক্ষা করব। ইতি, পান্না।'

যোগব্রত চিঠিটা মুড়ে খামে ঢুকিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন। বৃষ্টিটা ধরে এসেছে। খুব শীগগির সন্ধ্যা এসে গেছে আজ।

ডাকলেন, জগাই! গলা চড়িয়েই ডাকলেন। এমন করে কোনোদিন ডাকেন না। বাড়িটা কেঁপে উঠল যেন।

বাইরে থেকে যোগমায়া প্রতিধ্বনি করলেন, এই জগাই, তোর বাবু ডাকছেন।

একটু পরে জগাই এল। ভিজে জবুথবু অবস্থা। দরজার কাছ থেকে সেদিনকার মত হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, টাউনের দাদাবাবু হঠাৎ চলে গেল। টানাটানি করলুম গেট অব্দি। শুনল না। বললুম, ছোটবাবুকে ডেকে দিচ্ছি। তাও কানে করল না।

যোগব্রত শুধু বললেন, বীরু চলে গেল?

একটু পরে মুখ তুলে দেখলেন, তখনও জগাই দাঁড়িয়ে আছে। ধমক দিয়ে বললেন, কাপড় ছাড় গে না হতভাগা। নিমুনি হবে যে! আর শোন্, নবকে চা পাঠাতে বল।

জগাই চলে গেল। যোগব্রত উঠে জানালার কাছে গেলেন। বীরুকে এ জানালায় দেখা যাবে না। নদী দেখছিলেন যোগব্রত। নদীতে এখন অন্ধকার। মনে হচ্ছে, অন্ধকারে নদীতে জল এসে গছে। জলটা ফুলছে, কেঁপে উঠছে। কলকল শব্দ হচ্ছে। চমকে উঠছিলেন, বাঁধটা ভেঙে গেছে নাকি? কিন্তু তক্ষুনি বুঝলেন, হ্যালুসিনেশান।

বীরু সকালে দশটা টাকা নিয়েছিল। ভেবেছিল, সিগারেট-টিগারেট কিনবে। এখন বোঝা গেল, মুখে যা কিছু বলুক, সে চলে যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছিল। যাক্। এসব ছেলে বড্ড বিপজ্জনক। এরা পাকা কিলার। কাছাকাছি থাকাটা ঠিক নয়। তবে পাওনা টাকা কড়িটা নিয়ে গেল না। পরে দিয়ে আসবেন'খন।

তারপর চা খেতে খেতে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য যোগব্রত নড়ে উঠলেন। যাবেন নাকি আজ

রাতেই বকুলপুর? মা ও মেয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন—মুখ নীচু করে বলবেন, নিতে এলুম? নৃপেন নেই। ভয় কিসের তা হলে?

পরক্ষণে যোগব্রত শান্তভাবে হেলান দিলেন ইজিচেয়ারে। পান্না যাই লিখুক, ব্যাপারটা হয়তো অত সহজ হয়ে নেই।

চৌদ্দ

বকুলপুরে দিনটা যদি কেটে যায়, রাতটা বড় বিচ্ছিরি লাগে। লালীর একটুও ঘুম হয় না। সারারাত মোটাগাড়ির শব্দ। এ রাতে বৃষ্টি পড়ছিল ফোঁটা-ফোঁটা। ভেবেছিল, ঘুমটা ভাল হবে। হল না। কোথায় প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল। বেশ কয়েকবার। তারপর আবছা হট্টগোল শোনা যাচ্ছিল। বনশোভা কী বলতে গিয়ে থেমে কান পাতলেন। আবার বাজ পড়ল বুঝি। লালী বলল, বাজ পড়ছে মা! ভয় করছে না তোমার? সেই সময় ওপর থেকে বীরেন্দ্রের নেমে আসার শব্দ শোনা গেল। দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকলেন, বনি! বনি! ঘুমোলে?

বনশোভা উঠে গিয়ে আলো জ্বেলে ব্যস্তভাবে দরজা খুললেন। বললেন, কী হয়েছে দাদা?

বীরেন্দ্র উদ্বিগ্ন মুখে চাপা স্বরে বললেন, কোথায় বোমাবাজি বেধেছে। ওবেলা শুনে এসেছিলুম তপুর সঙ্গে নুরুর গ্যাং এসে জুটেছে। নারানের গ্যাংয়ের সঙ্গে বাধতে পারে। এক কাজ করো, বরং তোমরা ওপরের ঘরে গিয়ে শোও।

বনশোভা বললেন, কেন? আমাদের বাড়িতে হামলা হবে নাকি?

কিচ্ছু বলা যায় না। রুনু চলে গিয়েও কি আমরা রেহাই পাব ভাবছ? বীরেন্দ্র ভাল করে শুনছিলেন। ফের বোমা ফাটার শব্দ হতেই লাফিয়ে উঠলেন। কাছেই হচ্ছে। এস, এস। লালীকে ওঠাও।

লালী শুনছিল। ভয়ে থরথর করে কেঁপে উঠল। বনশোভা মশারি তুলে বললেন, আয় তো লালী। আমরা ওপরের ঘরে শুইগে আজ।

লালী ঝটপট নেমে এল। বীরেন্দ্র বললেন, দরজায় তালা দাও। বরান্দার আলোটা বরং জ্বালা থাক্। দেরি করো না।

দরজায় তালা এঁটে তিনজনে ওপরের ঘরে গেল। এটা বীরেন্দ্রর ঘর। বনশোভা বললেন, পুলিশ কিছু করছে না কেন? পুলিসের চোখের সামনে এসব হচ্ছে।

বীরেন্দ্র বাঁকা মুখে বললেন, তাই তো বরাবর হয়। কিছুকাল সব শান্ত ছিল। আবার শুরু হয়ে গেল। এখন দুবেলা এই চলবে দেখে নিও। যাক্‌গে, আমি মেঝেয় বিছানা করে নিচ্ছি। তোমরা খাটে শোও।

লালী কাঠ হয়ে শুয়ে ছিল। প্রতি মুহূর্তে ভাবছিল, কারা এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে বাড়িটার ওপর। এই অভিজ্ঞতা তার জীবনে এমন প্রত্যক্ষ হয়ে আসে নি। শুনেছে মাত্র। কালিকাপুরে তো এসব ভাবাই যায় না। যোগব্রত শক্ত দুহাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কার সাধ্য ওখানে হাঙ্গামা বাধায়? এমন একটা দুঃসময়ে খালি বাবার কথাটাই তার মনে ভেসে আসছিল। আবছা দেখতে পাচ্ছিল বাবা একা নয়—তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে আছে ছোটমামা আর বীরু।

লালীর মনে হচ্ছিল, এসব সময়ের জন্যে এমন কিছু ছেলের দরকার আছে। বাবা হয়তো ভুল করেন না।

তারপর সব শান্ত হয়ে গেছে। বীরেন্দ্র বলেছেন, আপাতত এই। কাল ফের শুরু হবে দেখবে। ফের একজন খুন না হওয়া অব্দি থামবে না ওরা। জানো বনি? আজ ওবেলা মোবারক পান্নার খোঁজে হঠাৎ এল, তখনই আমার কেমন সন্দেহ জেগেছিল। জাস্ট ইনটুইশন। এখন বুঝতে পারছি, কেন ডাকতে এসেছিল পান্নাকে।

বনশোভা বলেছেন, পান্না গিয়ে ভালই করেছে। চাকরিবাকরি যদি সত্যি পেয়ে থাকে...

কথা কেড়ে বীরেন্দ্র বলেছেন, পেয়েছে পেয়েছে। হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিওর।

একবারও ঘুম আসে নি লালীর। বড় মামার নাক ডেকেছে। মায়ের নাক ডাকে না, কিন্তু কেমন একটা শব্দ করে মুখে। লালীর একটা অস্থির রাত কেটে গেছে বকুলপুরে।

সকালে রান্নাঘরের বারান্দায় চা খেতে বসে তার মুখটা গম্ভীর, চোখ দুটো লাল, একটু ছলছল। বনশোভা বললেন, কী হয়েছে রে? অমন দেখাচ্ছে কেন?

লালী একটু হাসতে চেষ্টা করল। তারপর মুখ নামিয়ে আস্তে বলল, একটা কথা বলব। রাগ করবে না মা?

না না। রাগ করব কেন? বল্ না।

আরও আস্তে লালী বলল, আমি যদি মাঝে মাঝে বেড়াতে আসি তোমার কাছে...

বনশোভা স্থিরদৃষ্টে তাকিয়ে বললেন, আচ্ছা!

মা, তুমি রাগ কোরো না! হঠাৎ লালী দু' হাত বাড়িয়ে বনশোভাকে টানল এবং তাঁর পেটে মাথা গুঁজে ফুপিয়ে কেঁদে উঠল। আমি মাঝে মাঝে তোমার কাছে এসে থাকব। কলেজ খুলবে, তখন রোজ তোমাকে দেখা দিয়ে যাব। বলো, তুমি রাগ করবে না?

বনশোভার শরীর অবশ লাগছিল। একটু হেসে ওর পিঠে হাত রেখে বললেন, মন টিকছে না তো? সে তো জানতুম মা। সবই অভ্যাস মানুষের। বেশ তো! আর দুটো দিন কষ্ট করে থাকো। মেজমামার শ্রাদ্ধটা হোক তারপর যাবে।

লালী মুখ তুলল। মুখটা ভেজা। বলল, এখন যদি যাই? সাড়ে সাতটার একটা বাস আছে।

এখনই? বনশোভা সঙ্গে সঙ্গে শক্ত হয়ে গেলেন। তাহলে ওঠ। তোমার ব্যাগটা গুছিয়ে দিই।

লালী অবাক হল। কিন্তু কিছু বলল না। চুপচাপ বনশোভার পেছন পেছন উঠোন পেরিয়ে ঘরে ঢুকল। একটু পরে বীরেন্দ্র বাজার থেকে এসে বললেন, যা বলেছিলুম। নুরু ভার্সেস টাইগার জোর হয়ে গেছে রাত্রে। ওদের ধরতে পারে নি পুলিস। কয়েকজনকে ধরে নিয়ে গেছে। কী হবে? ছেড়ে দেবে ওবেলা।

বাজারের থলিটা কিচেনের বারান্দায় রেখে বললেন, টগরবালা কোথা রে? রইল, দেখিস।

টগর কলতলা থেকে বলল, রাখুন। যাচ্ছি।

বীরেন্দ্র বনশোভার ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়ালেন। হাসিমুখে বললেন, মেয়েকে নিয়ে শহরে যাবে নাকি বনি? দেখো বাবা, যার মেয়ে সে কেড়ে নিয়ে যায় না যেন!

বনশোভা শান্তভাবে বললেন, লালী চলে যাচ্ছে।

সে কী! চলে যাচ্ছে মানে? সামনে রুনুর শ্রাদ্ধ। তার আগেই এভাবে যাওয়া কি ঠিক হচ্ছে মা?

লালী কাঁচুমাচু মুখে বলল, বড়মামা! আমি বরং মাঝে মাঝে এসে মায়ের কাছে থাকব। আমার পড়াশোনা হচ্ছে না। বইপত্তর আনি নি।

সঙ্গে সঙ্গে বীরেন্দ্র সায় দিয়ে বললেন, এক্সজ্যাক্টলি। আমিও তাই ভাবছিলুম। ভেরি ইনটেলিজেন্ট ক্যালকুলেশান। তা খাওয়া-টাওয়া হয়ে গেছে তো? ও বনি, কখানা ফুলকো লুচি ভেজে দাও না ওকে।

লালী বলল, খেয়েছি বড়মামা। তারপর পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় রাখল। বীরেন্দ্র প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করলেন। শিক্ষা বিষয়ে একটা জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দিতেও ভুললেন না।

বনশোভা বললেন, চলো মায়া।

লালী চমকে তাকাল। তারপর মায়ের পায়ের ধুলো নিতে হেঁট হলে বনশোভা তার কাঁধ ধরে ওঠালেন। বাইরে গিয়ে বললেন, যখনই মন খারাপ করবে, চলে আসবে এমনি করে।

লালী আস্তে আস্তে হাঁটছিল। বলল, কিন্তু প্রমিজ করো গা ছুঁয়ে, সপ্তায় একটা করে চিঠি। লিখব।

আমার চিঠি মস্তো লম্বা হবে, দেখবে।

তাই বুঝি? বনশোভা ওর হাত ধরে টানলেন। সরে এস। বেপরোয়া ট্রাকগুলো ভীষণ জোরে যায়। এবেলা-ওবেলা অ্যাকসিডেন্ট লেগেই আছে। বলে একটু হাসলেন। তোমাদের কালিকাপুরে কিন্তু এসব ভয় একটুও নেই।

লালী বলল, তখন তুমি হঠাৎ মায়া বলে ডাকলে!

লালী টের পেল, তার কাঁধে বনশোভার হাতটা চেপে বসেছে। বনশোভা ওর কথা কানে না নিয়ে বললেন, তোমাদের বাগানের বকুলগাছটা আছে না কেটে ফেলেছে?

নেই। লালী মিথ্যে করে বলল।

আর কাঠমল্লিকার গাছটা?

কেটে ফেলেছে।

সে কী! বনশোভা দাঁড়িয়ে গেলেন। এখানে রাস্তার দুধারে মেহগানি গাছ। সকালের গোলাপী রোদ পাতার ফাঁক দিয়ে তাঁর মুখে খানিকটা ঝিলিমিলি এঁকেছে।...ফুলের গাছ কাটতে আছে? এই সময়টাতে কী যে ফুল দিত! গন্ধে বাগানটা ম-ম'করত। এখানে তো দেখতে পাচ্ছ, পাখি-টাখি কিছু নেই। এত শব্দ! থাকবে কেন? কালিকাপুরে—মানে তোমাদের বাগানে গিয়ে দাঁড়ালে অনেক পাখির ডাক শোনা যেত। তোমার দাদুর এক বন্ধু এলেন সেবার কলকাতা থেকে। বলেছিলেন, এ যে দেখছি চিড়িয়াখানা।

বনশোভা হাসছিলেন। লালী অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। এতক্ষণে বনশোভা কালিকাপুরের কথা বলছেন। লালী সারাক্ষণ এসব কথা বলেছে। বকুলগাছটার কত গল্প করছে। কাঠমল্লিকা গাছটার ফুলের কথা বলেছে। কিন্তু তিনি কানই করেন নি। লালীর খারাপ লেগেছে। এখন সে অবাক হয়ে গেল। বনশোভা তার কোনো কথাই মন দিয়ে শোনেন নি।

লালী ঠাণ্ডা গলায় বলল, বাগানে আমরা ধানক্ষেত করেছি।

বনশোভা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, এরপর যদি এসো তোমাকে তোমার ছোটবেলাব গল্প শোনাব। ওই বাগানে ঘাসের ওপর রোজ বিকেলে তুমি হামাগুড়ি দিতে। জগাইদা ঘোড়া হত। একদিন তুমি...

লালী বলল, ওই বাসটা নাকি দেখ তো?

না। ওটা যাচ্ছে জলঙ্গী। সেই বর্ডারে। বনশোভা লালীর হাতটা টেনে আবার রাস্তা থেকে ওকে সরিয়ে আনলেন। একটু পরে ফের বললেন, বর্ষা এলে তোমাদের নদীতে খুব মাছ হত। মৌখালির বিলে জল ঢুকলে উজানে ঝাঁকে ঝাঁকে খয়রা মাছ আসত। এত বড বড় খয়রা। কালীতলার সেই মেছুনী মেয়েটা আর আসে না তোমাদের বাড়ি?

লালী আনমনে মাথা দোলাল।

কোন মেয়েটার কথা বলছি বুঝতে পারছ? বনশোভা ফের হাসলেন। যাকে তুমি বলতে 'মচ্ছ-মা'।

লালী তাকাল। মচ্ছ মা কী?

বনশোভার মুখটা কঠিন দেখাল। তোমার বাবা তোমাকে শেখাতেন ডাকতে। তোমাকে কোলে নিয়ে আঙুল তুলে দেখাতেন, ওই তোমার 'মৎস্য-মা' আসছে। তোমার জন্যে কত ভাল-ভাল মাছ আনে। বনশোভা ক্যারিকেচার করছিলেন যোগব্রতের। তারপর বললেন, আসে না বুঝি আর?

লালী ফের জোরে মাথা দোলাল। চিনিই না তাকে।

মিথ্যে বলছ? চেনো না? বনশোভা যেন জ্বলছেন। দু' চোখে আগুন। অতদিন তোমাদের বাড়িতে ছিল। তোমাকে কোলে পিঠে মানুষ করার জন্য তাকে বাড়িতে রাখা হয়েছিল। তুমি বলছ, চিনি না?

লালী কাঁচুমাচু হয়ে বলল, আমার অত কিছু মনে নেই। বিশ্বাস করো।

তার গলার স্বরে অসহায়তা টের পেয়ে বনশোভা চুপ করে গেলেন। সামনে বাসস্ট্যাণ্ড। রাস্তার মোড়। এখান থেকে পাথরকুচি বসানো ছোট রাস্তাটা চলে গেছে কয়েকটা গ্রাম পেরিয়ে কালিকাপুর স্টেশনে। বিশাল আকাসিয়া গাছের তলায় গুঁড়ির খুব কাছে মা ও মেয়ে দাঁড়াল। লালী গাছটার গায়ে আঁটা ফলকে বিজ্ঞাপন পড়তে থাকল।

বনশোভা বললেন, এমন করে হঠাৎ চলে এসেছিলে, আমার খালি অবাক লাগছে কী জানো? কেউ তোমার খোঁজ নিতে এল না পর্যন্ত। জগাইদাকে পাঠাতে পারত।

আমি তো চিঠি লিখে এসেছিলাম। বলে লালী গাছটার গুঁড়িতে নাম লেখার জন্য একটা শুকনো কাঠি কুড়িয়ে নিল। তারপর 'লালী' লিখল। লিখে বলল, বাবা তো এসেছিল।

বনশোভা শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে আস্তে বিকৃত প্রতিধ্বনি করলেন, এসেছিল।

লালী কাঠিটা ঘষে হরফ স্পষ্ট করছিল। সে গুঁড়ির দিকে ঘুরে আছে। বলল, আবার কীভাবে আসবে? তুমি তো...একটু থেমে এক নিঃশ্বাসে বলে দিল, তুমিই তো পথে কাঁটা দিয়ে রেখেছ।

মায়া! বনশোভা প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন।

লালী তেমনিভাবে ঘুরে থেকে 'হরফে কাঠি ঘষতে ঘষতে বলল, কোর্টে গিয়েছিল কে? বাবা, না তুমি? সেপারেশন চেয়েছিল কে? আমি সব জানি।

বনশোভা কাঁপছিলেন। প্রচণ্ড মার খেয়ে ধরা গলায় বললেন, ও। বুঝতে পারি নি তুই আমার কাছে কৈফিয়ত চাইতে এসেছিলি এতদিন বাদে! ঝগড়া করতে এসেছিলি।

না। আমি চলে এসেছিলুম তোমার কাছে থাকব বলে।

লালীর কান্না টের পেয়ে বনশোভা শান্তভাবে বললেন, তাহলে চলে যাচ্ছিস কেন?

বলছি তো আবার আসব। যখন মন খারাপ করবে, চলে আসব।

বাসটা এত শীগগির এসে গেল—বড্ড অসময়ে। বনশোভা অতি কষ্টে বললেন, বাস এসে গেছে।

লালী ঘুরে বাসটা দেখল। বকুলপুরের যাত্রীরা ভিড় করে নামছে। অ্যাসিস্ট্যান্ট ছোকরা চেঁচাচ্ছে—কালকেপুর স্টেশান! কালকেপুর স্টেশান! ছেড়ে গেল! ছেড়ে গেল! তারপর লালীর দিকে চোখ পড়তেই সে চেঁচাল, এই যে মায়াদিদি! চলে আসুন। সিট রাখছি।

কয়েক মুহূর্তের জন্য মা ও মেয়ে মুখোমুখি দাঁড়ালো! পরস্পরের মুখের রেখা দেখতে থাকল। তারপর লালী বলল, আসি।

বনশোভা বললেন, এস।

লালী দৌড়ে বাসে গিয়ে উঠল। একটু পরেই জানালার পাশে বসে মুখ বাড়িয়ে ডাকল, শোন। কাছে এস না!

বনশোভা কাছে গেলে সে জানালা থেকে হাত বাড়াল। বনশোভাও হাত বাড়ালেন। লালী মায়ের আঙুলে আঙুলে জড়িয়ে খুব আস্তে বলল, তুমি রাগ করো না মা! তুমি ভাবছ, শুধু তোমাকে একা বকে দিলুম। বাবাকে বুঝি কিছু বলতে ছাড়ি? বাবা খালি হাসে। তুমিও হাসো, মা। না—না, একবার হাসো। আমার খাতিরে।

বনশোভা হাসবার চেষ্টা করলেন। পারলেন না। বাসটা স্টার্ট দিয়েছে। আঙুল থেকে আঙুল সেই টানে খুলে গেল। লালীর হাতটা নড়তে থাকল। বনশোভা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখতে থাকলেন। অবশ হাতটা কিছুতেই টেনে তুলে মেয়ের মতো নাড়ানো গেল না।

মাথাটা ঘুরে উঠেছে। টলতে টলতে গিয়ে বনশোভা প্রাচীন আকাসিয়ার গুঁড়িতে 'লালী' হরফগুলোর ওপর একটা হাত রাখলেন। মুখটা ঝুঁকে রইল। 'লালী'র ওপর হাতের তালু ঘষতে থাকলেন। কর্কশ কঠিন বাকলে হাতের তালু জ্বালা করতে থাকল। ততক্ষণে মোড়টা জনহীন হয়ে গেছে। বনশোভা একা।...

সকালে অনেকক্ষণ ধরে জগাই সাইকেলটা ধুয়েছে। ততক্ষণে যোগব্রত ফার্ম ঘুরে এসেছেন এক চক্কর পায়ে হেঁটেই। ফিরতে আটটা বেজে গেছে।

বাড়ির সামনেকার বারান্দার নিচে হাঁটু দুমড়ে বসে মোটর সাইকেলের কলকব্জা পরখ করছিলেন যোগব্রত। একটা কাঠি ঢুকিয়ে খোঁচাচ্ছিলেন। পেছনে ফুলের বনে জগাই হুমড়ি খেয়ে বসে ঘাস ওপড়াচ্ছিল। সে একটা অস্পষ্ট শব্দ করল। যোগব্রত কানে নিলেন না। জগাই আপনমনে উদ্ভিদ ও পোকামাকড়ের সঙ্গে কথা বলে। হয়তো দেখেছে কোনো শুঁয়োপোকা কিংবা হেলেসাপের বাচ্চা। এই সময়টিতে ডিম ভেঙে হেলেসাপের বাচ্চা বেরুতে শুরু করে। বর্ষায় বাচ্চাগুলো বেশ ডাগর হয়ে ছোটাছুটি করে বেড়ায় বাগানে। একবার বৃষ্টির মধ্যে গাছপালা থেকে এক ঝাঁক ক্ষুদে সাপ পড়েছিল জগাইয়ের মাথায়। কিলবিল করে উঠতেই জগাই থ। কিন্তু আশ্চর্য, সে একটুও নড়ে নি। পরে বলেছিল, নড়লেই ডংশাত। কিন্তু সাপগুলো নিছক নির্বিষ ঢ্যামনার বাচ্চা। ঢ্যামনা গাছে চড়তে ওস্তাদ। যোগব্রতের মাথায় পড়লে কিন্তু সহ্য করতে পারতেন না। ভাবতেই গা ঘুলিয়ে ওঠে। এতকাল উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতে ঘোরাঘুরি করেও জগাইয়ের মতো 'ন্যাচারাল' হতে পারলেন না। শুধু মুখেই যত বড়াই। ন্যাচারাল হওয়া সহজ নয়। পেঁয়াজের খোসার মতো সভ্যতার ভাঁজে ভাঁজে সাজানো অস্তিত্বের কেন্দ্রটা টের পাওয়া সোজা, কিন্তু খোসাগুলো ছাড়ালে যোগব্রতের কিছু বাকি থাকে না। মেঠো দার্শনিক যুগল

যেমন বলে, ডিমের ভেতর টলটলে কুসুমের মতো মরণ বসে বীজ বুনছে। ওই হলগে কালবীজ। খোসা চিড় খেয়ে আঁকুর গজাল কী, চিত হয়ে শুলেন আপনি। সব জারিজুরি ফক্কল।...

পেছনে ও তারপর পাশে একটু তফাতে কার পায়ের শব্দ হ'ল। যোগব্রত ঘুরলেন না তখনও। ওইসব মেঠো তত্ত্ব নিয়ে আছেন। যন্ত্রের অভ্যন্তরে অন্ধকার প্রচ্ছন্ন কোনো জটিল হিজিবিজিতে কাঠির ডগা ঠেকিয়ে ঝুঁকে আছেন।

ঘরের ভেতরকার কাঠের সিঁড়িতে জোরে শব্দ হতেই মুখ তুললেন। সাদা দুটো পা, নীলচে শাড়ির নিচেটা এবং একটা ঝুলন্ত লাল ব্যাগের তলাটা চোখে পড়ল। দ্রুত এবং জোরে বললেন, কে?

আমি। এবং একটু পরে—মায়া।

যোগব্রত উঠে দাঁড়ালেন। বকুলপুর যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। আর পাঁচ মিনিট পরেই বেরুতেন। যাওয়া হল না। সারা শরীরে একটা ক্লান্তির ঠাণ্ডা হিম স্রোত বয়ে গেল। দু'হাত লম্বা করে ঝুলিয়ে আকাশ দেখতে থাকলেন।

বাড়ির দোতলার ঘরটা থেকে মনোরমার গলা শোনা গেল, কী? ফিরে এলি যে বড়?

আসব না? মায়া চড়া গলায় বলল। নিজেদের বাড়িতে যখন খুশি আসব। তুমি বলার কে?

বাঃ! মুখ ফুটে গেছে দুদিনেই! বেহায়া মেয়ে কোথাকার।

থামো! বাজে, বোকো না। আমি কচি খুকি নই।

ও! আচ্ছা!

যোগব্রত দুহাত ঝুলিয়ে মুখ উঁচু করে আকাশ দেখছিলেন। শরীর শিথিল। হয়তো এই তাঁর শরীরের রীতি—কোথাও যাবার জন্য গতিবেগ যখন শরীরকে টানটান করে এবং ধনুকের তীরের মতো ঋজু করে রাখে, তখন বাধা পড়লে একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি শরীরকে শিথিল করে ফেলে মুহূর্তেই। কিন্তু এখন তাঁর মাথার ভেতরটাও শূন্য লাগছিল। পিসি-ভাইঝির কথাকাটাকাটি আর কানে ঢুকছিল না। নদীর ওপারের চাপ-চাপ সবুজ ঘিরে ঘন কুয়াশা দেখেছিলেন। তারপর সেই অলীক কুয়াশা ক্রমে ক্রমে তাঁর চারদিকে এসে দাঁড়াল। মনে হল, জীবনে অতীত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সব ধোঁয়াটে।

বকুলপুর যেতে চাইছিলেন—যাওয়া হল না। যাওয়া হল না এটাই তাঁর মাথার ভেতর বুকের ভেতর হিম হয়ে বসেছে। এ যেন একটা বিশাল ব্যর্থতা। সারা রাত এক অদ্ভুত বিহ্বলতায় বকুলপুর যাওয়ার কথা তাঁকে মাতাল করে রেখেছিল। পান্নার চিঠির কয়েকটা লাইন পাখির ঝাঁকের মতো তাঁর মাথার ভেতর ওড়াউড়ি করছিল। 'দিদি আর আপনার মাঝখানে আর তো মেজদা নেই। ডিভোর্স-টিভোর্স মিনিংলেস।'

...কিন্তু পান্না জানে না, আর হয়তো কিছু সহজ হয়ে নেই।

তবু মুখোমুখি একবার দাঁড়াতে ইচ্ছে করছিল বনশোভার। অন্তত দেখে আসতেন চোখেও। তারপর কি কিছু ঘটত?

কে জানে! অথচ বড় সাধ হয়েছিল মেয়ের ছলে মেয়ের মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর। মায়া ফিরে এসে সেই সাধ অপূর্ণ থেকে গেল। নির্বোধ মেয়েটা!

হঠাৎ নড়ে উঠলেন যোগব্রত। মাথার ভেতরটা জ্বালা করতে থাকল। তীব্র ব্যর্থতার বোধ নিয়ে দিনটা কীভাবে কাটাবেন বুঝতে পারলেন না। মোটর সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে হাত রাখলেন। একটু ঝুঁকে দাঁড়ালেন। জগাই কী একটা বলল, কানে ঢুকল না যোগব্রতের। হ্যাঁচকা টানে হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে গেটের দিকে মোটর-সাইকেলের মুখ এনে সিটে বসলেন। তারপর স্টার্ট দিয়ে জোরে বেরিয়ে গেলেন।

নীচের রাস্তায় পৌঁছে গতি কমালেন যোগব্রত। তাই তো! কোথায় যাবেন এখন? কোথায় কী কাজ আছে মনে পড়ছে না। শহরে যাবেন? কিন্তু মোটরসাইকেলের মুখ উল্টোদিকে—কালিকাপুর স্টেশনের দিকে। কোথায় চলেছেন যোগব্রত?

ঘুরে শহরমুখী হলেন। কিন্তু একটু যেতে না যেতে মনে পড়ল বকুলপুর হয়ে যেতে হবে তাহলে। অমনি ফের ঘুরলেন। স্টেশনের দিকেই চললেন আগের মতো...

ক্ষমা শেষরাতে গিয়েছিল মৌখালির বিলে। কালীতলা মৎস্যজীবী সমিতির ইজারা নেওয়া জলায় আজ

আরেক দফা মাছ ধরা হয়েছে। কাদামাখা গায়ে ভাগের মাছ বকুলপুর বাজারে বেচতে গিয়েছিল ক্ষমা। বিলেই মাছের নিকিরি এসে বসে থাকে শহর থেকে। বেশি মাছ হলে সমিতি তাদের বেচে। অল্পস্বল্প হলে ভাগাভাগি করে নিয়ে নিজেরা বেচতে বেরোয়। এ-গাঁ সে-গাঁয়ে চিরকাল লোকের সঙ্গে একটা সম্পর্ক হয়ে গেছে। এখনও সেটা বজায় রাখতে চায় কালীতলার মেছো-মেছুনীরা।

ফিরতে দুপুর গড়িয়ে গিয়েছিল। ক্ষমা দূর থেকে দেখতে পেয়েছিল যোগব্রতের মোটরসাইকেল পাম্পিং সেণ্টারের গাছতলায় দাঁড় করানো আছে। কিন্তু তাঁকে কোথাও দেখতে পায় নি।

ঘরের দরজা খুলে পরিষ্কার একটা শাড়ি—তারপর অনেকদিন পরে লালব্লাউজ আর কালো সায়াটা নিল সে। তাক থেকে মোড়কে জড়ানো কতকাল আগের সাবানটাও নিল।

তারপপর বেরুতেই দেখল যোগব্রত উঠোনে দাঁড়িয়ে আছেন।

ক্ষমার বুকটা ধড়াস করে উঠেছিল। কাদামাখা শাড়িটা টেনে মাথায় ঘোমটা দেবার ভঙ্গি করে বলল, এ কেমন আসা ছোটবাবু? এমন সময়!

যোগব্রতের চোখদুটো নিষ্পলক। কিছু বললেন না।

ক্ষমা বলল, অমন করে কী দেখছেন ছোটবাবু? বসুন। চান করে আসি। তা'পরে কথা।

যোগব্রত এগিয়ে গিয়ে দাওয়ায় উঠলেন। তারপর দুহাতে তাকে জড়িয়ে ধরে তুলে ফেললেন। দাওয়ার নিচু চালে ক্ষমার মাথা ঘষে গেল। তাকে ঘরে নিয়ে যেতেই ক্ষমার সংবিৎ এল। সে চেঁচিয়ে উঠল, এ কী এ কী ছোটবাবু! ছি ছি ছি! এ কী করছেন!

যোগব্রতের ভেতরকার আদিম মানুষটা অস্পষ্ট ভাবে গলার ভেতর কিছু বলল—ক্ষমা বুঝতে পারল না। সে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। আঁচড়ে কামড়ে অস্থির হচ্ছিল। শক্তিমান যোগব্রত তাকে মেঝেয় আছড়ে ফেলে দরজা এঁটে দিলেন। তারপর ঘুরে দাঁড়ালেন। ঘরে অন্ধকার। একটা ছোট্ট ঘুলঘুলি আছে মাত্র মাথার ওপর দাওয়ার দিকে। সেখান থেকে আলো এসে যখন ভেতরটা কিছু স্পষ্ট করল, তখন ক্ষমা মেঝেয় বসে আছে। মুখটা নিচু। পিট ফুলে ফুলে উঠেছে। নোংরা শড়িটা বেসমাল। যোগব্রত ধপধপে পরিষ্কার পাঞ্জাবি-পাজামা মেঝের ধুলোয় ঘষটে বসে পড়লেন। তারপর যেন বললেন, আমার বড় জ্বালা।

ক্ষমা মুখ তুলল। যোগব্রতের বুকে মুখটা ঠেলে দিল।

যোগব্রত এতক্ষণে মানুষের ভাষায় বললেন, শেষপর্যন্ত তোর কাছেই এলাম ক্ষমা!

ক্ষমা অস্ফুটস্বরে বলল, ক্যানে?

জবাব পেল যোগব্রতের শরীরের ভাষায়। আদিম মানুষী বোঝে এ আদিম ভাষা। দ্রুত সাড়া দিল।...

তখন কালীতলার মাঠে সন্ধ্যার ঘোর লেগেছে। ক্যানেলের পাড় ধরে শান্তভাবে মোটসাইকেলে ফিরেছেন যোগব্রত। বাকি জীবনের শেষ আশ্রয় হয়ে থাকে যুগলের বউ— যার শরীরে ও মনে প্রাগৈতিহাসিক সময়ের স্বাদগন্ধ। সে নিশ্চয় কোন জন্মের কথা, যখন পৃথিবীর সবটাই ছিল প্রকৃতির করতলগত। মাটির গন্ধ ছিল আরও তীব্র। উদ্ভিদের রঙ ছিল আরও সবুজ। প্রকৃতির জঠরের ভেতরকার গভীরতর অন্ধকারে নামহীন এক পুরুষ আর নামহীন এক নারী, যাদের জাতি গোত্র পরিচয় কিছু ছিল না, গায়ে গা ঘেঁষে জড়াজড়ি শুয়ে ছিল সরীসৃপের মতো। শ্যাওলা, ছত্রাক, তিতিরের ডিমের ভাঙা খোল চারপাশে ছড়ানো। আর সেই অন্ধকার ছিল ঘন নীলবর্ণ। নীল অন্ধকার কালীতলার এক কুঁড়েঘরে ফিরে এসেছিল এতকাল পরে।

পীচের রাস্তায় ক্যানেলের ব্রিজে পৌঁছুলে কেউ তাঁকে ডাকল, ছোটবাবু!

ব্রেক কষে মুখ ঘুরিয়ে আবছা অন্ধকারে দেখলেন যুগল বসে আছে। হেডলাইটের আলোয় তাকে দেখতে পেয়েছিলেন কি? মনে পড়ে না। মন্ন তন্ময় হয়ে অন্য কিছু ভাবছিল। হাসলেন যোগব্রত। দার্শনিকপ্রবর যে!

আজ্ঞে?

যোগব্রত আরও জোরে হাসলেন।...আজ্ঞে কী রে? ভূতের মতো এখনও মাঠে এসে বসে আছিস। জালবোনা শেষ হল নাকি? টাকু সুতো কিছু দেখছি না কেন রে?

যুগল বলল, সব ফেলে দিইছি ছোটবাবু।

কেন রে? কিসের দুঃখে? যোগব্রত সিগারেট বের করে বললেন, নে। খা।

যুগল উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে আসতে আসতে গলার ভেতর বলল, আজ সকালে হুই হেজলতলা থেকে দেখলাম, ছোটবাবু আসতে আসতে হঠাৎ ঘুরলেন। খানিক যেয়ে আবার হঠাৎ ঘুরলেন। মোনে কিসের ছটফটানি গো?

তুই বুঝবি নে।

বুঝি বৈকি ছোটবাবু! যুগল আস্তে বলল। তবে কথা কী, মানুষের জেবন-মরণ দুই ভাই—মায়ের পেটে এক সঙ্গেতে ওনাদের জম্মো। ভূমিষ্টি হলে ছাড়াছাড়ি। বুঝলেন ছোটবাবু? যখন দুভাইয়ের জোড় লাগে, তখনি শান্তি। আর ছটফটানি থাকে না। জ্বালারও শেষ। এই দেখুন না!

যোগব্রত চমকে উঠলেন হঠাৎ। ....যুগল! তোর হাতে ওটা কী!

আমারও কি কম জ্বালা ছোটবাবু?

যুগল!

গর্জন করেই থেমে গেলেন যোগব্রত। মোটরসাইকেলের সিট থেকে ছিটকে পড়লেন। মোটর সাইকেলটাও গড়িয়ে পড়ে তেমনি গরগর করতে থাকল। যুগল আবার হাত তুলল। কালো বাঁকানো জিনিসটা প্রচণ্ড জোরে নামাল। আবার তুলল। নামাল। বারবার নামল এবং তুলল। যোগব্রতের গলার ভেতর ঘড়ঘড় আওয়াজ হচ্ছিল। যুগল বলল, জ্বালা কি আমারও কম?

যোগব্রত অন্ধকার পীচের ওপর শুয়ে রইলেন। যুগল ডাকল, ছোটবাবু!

যোগব্রতের কাছে সাড়া পেতে চেয়েছিল। আরও কিছু বলত। বলা হল না যুগলের। মোটরসাইকেলটা সমানে গরগর করতে থাকল। হেডলাইটের আলোটা লাল হতে হতে নিভে গেছে কখন।...

তোমার বসন্তদিনে

মধুমালা রেলের ওপর ব্যালান্স রেখে হাঁটছিল। একমাথা ফুরফুরে চুল। চনমনে একটা হাওয়া মাঠের দিক থেকে এসে ছোট্ট শান্টিং ইয়ার্ড পেরিয়ে চলে যাচ্ছিল রেলবাবুদের লাল বাড়িগুলোর দিকে—সেখানে বিশাল অশ্বত্থতলায় ক'দিন থেকে এক জ্যোতিষী সাধু এসে বসেছে। ছোটখাট ভিড় হচ্ছে সবসময়। পাশ দিয়েই সরু রাস্তা স্টেশন থেকে এগিয়ে বড় রাস্তায় পড়েছে। তার ওধারে কপালীতলা। সাতশোটা বাড়ি আছে ছোট-বড়। মানানসই বাজার আছে। ডাকঘর স্বাস্থ্যকেন্দ্র পুলিশফাঁড়ি আর ইস্কুল আছে।

বড়রাস্তা ধরে মধুমালা আসেনি। একটু আনমনা, ছটফটে স্বভাবের মেয়ে। আজ সকালে তাকে স্টেশনে আসতে হবে, আগে জানা ছিল না। দাদা সুকুমারের আচমকা রাত থেকে জ্বর, গলাব্যথা, কাসি। তাই অনেক বলে-কয়ে বোনকে পাঠাল।

কেন, কোন চাকর-বাকর আসতে পারত! মধুমালাকে কেন? না—যে আসবে, সে দাদার অন্তরঙ্গ মানুষ। এমন অন্তরঙ্গ কহতব্য নয়। কলকাতায় থাকতে একপাতে কাড়াকাড়ি করে খেত। এক গেলাসে তেষ্টা মেটাত। চাকর-বাকর পাঠালে ভাববে, বড়লোকী দেখিয়েছে সুকুমার।

মধুমালা বলেছে—হুঁ সব বুঝি বাবা। আমার চুপচাপ বসে থাকা তো কেউ দেখতে পারে না। আজ মন খারাপ ছিল তো তাই চুপচাপ বসেছিলুম। বাস্, ওর চোখ গেল অমনি। নাও, এখন ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো।

কেন? মন কেন খারাপ ছিল মধুমালার? এমনি-এমনি। কেন তা কি সে জানে? কোন-কোনদিন সকালে উঠে মা অকারণ তেতো হয়ে ওঠেন না? বাবা বাড়িসুদ্ধ দোষ খুঁজে বেড়ান না? এ হল মনমেজাজের ব্যাপার। কখন কেমন থাকবে, কে বলতে পারে? বিশেষ করে, রাতের বেলা মানুষ শুলেই যেন নিজের ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। তারপর সারারাত কত কী সব হয়, কতকিছু ঘটতে থাকে—স্বপ্ন মেশানো ঘুম, নানারকম ভয় ও ভালবাসার ঘটনা। আজ ঘুম ভাঙার পরও মধুমালা যে এক মিনিট কেঁদেছে, তা সে প্রাণ গেলেও কাকেও বলতে পারে না। শেষদিকের স্বপ্নটা ছিল অদ্ভুত। মধুমালা যেন কনে-বউ, মাথায় মুকুট, মুখে চন্দনের ফোঁটার আল্পনা, বিরাট মাঠের মধ্যে মোটরগাড়ি চেপে যাচ্ছে। কী ধুলো, কী ধুলো! বাবা তাকে ডাকছেন। সে ডাকছে বাবাকে। কেউ কাকেও খুঁজে পাচ্ছে না। এদিকে মধুমালাকে দিয়ে ভুতুড়ে গাড়িটা চলেছে তো চলেছেই। সে কী কান্না তখন!

ঘুম থেকে জেগেও কান্না থামতে চায় না। তারপর দেখে মুখের উপর একফালি টাটকা রোদ পড়েছে। জানলার রডে বসে চড়ুই তাকে খুঁটিয়ে দেখছে। ওদিকে জেঠিমার খোকাটা কোথাও খিট খিট করে হাসছে আর হাসছে। হয়তো বাগানে বাবা তাকে হাঁটা শেখাচ্ছেন। তখন হাসি পেল মধুমালার। হেসে-টেসে বিছানা ছাড়ল। কিন্তু দাঁত ব্রাশ করতে গিয়েই হঠাৎ মনটা কেমন করে উঠল। তারপর জলের টবের সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই। ব্যস, মন খারাপ শুরু হয়ে গেল। হাত আর চলতে চায় না। মা ডেকে বললেন—কতক্ষণ লাগবে রে? চা জুড়িয়ে জল। সুকু ডাকছে, শোন গে।......

রাস্তায় বেরিয়ে সে স্বপ্নটার জন্যে দারুণ লজ্জা পেয়েছে। দুঃখ বা মনখারাপ আরও বেড়েছে। কেন অমন বিচ্ছিরি স্বপ্ন দেখল সে—ভুলেও যা কোনদিন মনে আসে না। এই তো সবে ইস্কুল ফাইনাল পাসের খবর এল! ছ'মাইল দূরের জংশনে ঘুঘুডাঙায় মেয়েদের কলেজ আছে। মা ও দাদা ওকে ভর্তি করাবার জন্যে ব্যস্ত। ট্রেনে ডেলি-প্যাসেঞ্জারী করবে আরও সব মেয়ের মত। আজকাল কত সুবিধে হয়েছে দেশে। ওদিকে বাবা সেকেলে মানুষ। উনিশশো তিরিশে ম্যাট্রিক পাশ করে মোক্তারী পড়েছিলেন। সম্প্রতি পেশা ছেড়ে জমি-জমা দেখছেন। তাঁর প্রবল ইচ্ছে, মেয়ের বিয়ে দেওয়া যাক। স্ত্রীলোকের অত বিদ্যে বুদ্ধি না থাকলেও চলবে। পৃথিবীটা মুখ্যত পুরুষই চালাচ্ছে। আরে বাবা, চল তো দেখি স্টেশনে—ট্রেন একবার স্টার্ট দিলে কোন মেয়ের বুকের পাটা আছে যে লাফ দিয়ে পাদানীতে উঠবে? ওসব ব্যাপার পুরুষের পোষায়। বিশ্বসংসার একটা ট্রেনের মত। ....

খানিকটা গোলমাল করে দিয়েছিল কাপালীতলার কয়েজন ভদ্রলোক। মধুমালার সহপাঠিনীরা তাঁদেরই মেয়ে। তিনজনের বিয়ে পরীক্ষার অনেক আগে হয়ে গেছে, দুজনের হব-হব অবস্থা। বাকি শুধু একজন—

শ্রীলতা। জগন্নাথ ডাক্তারের মেয়ে। বায়োলজি নিয়ে পড়বে এবং তারপর মেডিকেলে ঢুকবে। মধুমালার বাবার মতে, শ্রীলতা মেয়েই নয়—আস্ত ছেলে। ভলিবল ব্যাডমিন্টন সাঁতার এইসব খেলায় ভারি পাকা। খেলার সময় চেহারার হাবভাব লক্ষ্য করেছ কি কেউ? মেয়ে বলে ভাবা যায় না।

প্রমথ বড় অদ্ভুত মানুষ। বলার ভঙ্গীতে ঠাট্টা-তামাশা থাকলে কী হবে—যা বলেন, তা ওঁর নিজের কাছেই বেদবাক্য।

তবে ইদানীং বয়েস হয়েছে। ছেলে সুকুকে সমীহ করে চলছেন। এটাই মধুমালার যা ভরসা।

শেষরাতের স্বপ্ন নাকি সত্যি হয়। যেই কথাটা মনে পড়া, মধুমালা ছটফট করে উঠেছিল। তারপর রাগের ঘোরে সোজা রাস্তায় স্টেশনে না গিয়ে ঝোপজঙ্গল পেরিয়ে শান্টিং ইয়ার্ডে ঢুকেছে। যেন এভাবেই একটা শোধ নেওয়া হল ব্যাপারটার। মধুমালা ঘুরপথেই চলবে। তারই প্রতীক যেন।

কিন্তু হঠাৎ অশ্বত্থতলায় জ্যোতিষীর কথা ভেবে একটা লোভ জাগল। এত সকালে ভিড়টা থাকে না। একবার গিয়ে হাত দেখাবে নাকি?

সঙ্গে পয়সা নেই। তাই ইচ্ছেটা চেপে দিতে হল। আগের মত রেলে ব্যালান্স রেখে হাঁটতে থাকল। জ্যৈষ্ঠমাসের শেষ হপ্তায় সেই কবে বৃষ্টি হয়েছে, মনেই পড়ে না। যে সব ঘাস বা গাছপালা প্রথম বৃষ্টিতে জোরালো ধরনের সবুজ রঙ পেয়েছিল, ক্রমশ পাংশুটে মেরে যাচ্ছে। দুপুরের দিকে হাওয়াটা পুব থেকে আসতে আসতে খুবই তেতে যায়। সকালেই যা খানিক আরাম। সেই আরাম নিয়ে মধুমালার চুলগুলো উড়ছিল। ইয়ার্ডটা উঁচু—একধারে গভীর নয়ানজুলি, ওপরে ঝোপঝাড়।

সেখান থেকে আওয়াজ আসে—বাঃ! অপূর্ব! অপূর্ব! এ যে ট্রাপিজের খেল নাতনী।

মধুমালা চমকে ওঠে এবং লজ্জা পেয়ে রেল থেকে নামে। কোবরেজমশাই ঝোপে দাঁড়িয়ে আছেন। মাথাটা সাদা, দাড়িগোঁফও তাই, গা ও পা খালি—পরনে হাঁটু অব্দি পট্টবস্ত্র, হাতে কাটারি। গুলঞ্চলতা নিতে এসেছেন। মধুমালা একটু হাসে।

—থামলে কেন? রসভঙ্গ হল যে! তাল কাটল। কোবরেজমশাই ঝোপ থেকে বেরোন।—জান তো, তাল কাটলে কী হয়? দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় একবার নাচের তাল কেটেছিল উর্বশীর। তার ফলে মর্তে জন্ম নিতে হল। মর্তে বড় কষ্ট, নাতনী। ভীষণ কষ্ট।......

এই পাগলা বুড়োর পাল্লায় পড়লে আর রক্ষে নেই। একঘন্টা সমানে বকবক করে যাবেন। অতএব মধুমালা ঝটপট বলে ওঠে—স্টেশনে যাচ্ছি। দাদু, সাড়ে সাতটার আপ চলে যায়নি তো? কতক্ষণ আছেন আপনি?

কোবরেজমশাই সকৌতুকে নিজের কব্জি দেখিয়ে বলেন—কেন? তোমার কাছে কালযন্ত্র নেই?

—নাঃ। পরিনি। মধুমালা একটু হেসে জবাব দেয়।

—যে যুগ পড়েছে, সব সময় পরে থাকবে। তোমরা একালের মানুষ, নাতনী! আমাব কথা অবশ্য আলাদা। আছি, না আছি—অন্ধবৎ। কিবা দিন কিবা রাত।

মধুমালা পা বাড়িয়ে বলে—দাদুর কানদুটো নিশ্চয় আছে?

হো হো করে হেসে কোবরেজমশাই কাটারি ও লতাসুদ্ধ দু'কান ছুঁয়ে বলেন—আছে মনে হচ্ছে।

—ট্রেনের শব্দ শোনেননি?

হঠাৎ লাফিয়ে ওঠেন কোবরেজমশাই।—রাধেমাধব! রাধেমাধব! মনে পড়ছে, একটু আগে একটা গাড়ি পাস করল যেন। তখন একটা ঢ্যামনা সাপকে ঝোপ থেকে তাড়াতে ব্যস্ত ছিলাম বলে মুখ তুলে তাকাইনি। নাতনী! দেখ তো, উত্তরে আকাশে কালো ধোঁয়াটোয়া দেখতে পাচ্ছ নাকি? শাদা মেঘের তো দেখাই নেই—কালো কিছু দেখলেই জানবে সাড়ে সাতটার ডাউন!

শুনেই তাকিয়েছিল মধুমালা। ও, এতক্ষণ তার কানে আসা উচিত ছিল। আপের দিকে ডিসট্যান্ট সিগন্যালের পর বাঁকের গাছপালার আকাশে টাটকা ধোঁয়া আবহমন্ডলে মিশে যাচ্ছে, ছত্রখান হয়ে পড়ছে জোরালো বাতাসে। চাপা ধক ধক একটা আওয়াজ আস্তে আস্তে ক্ষীণতর হচ্ছে। স্টেশনের দিকে তাকায়। উঁচু ভিটের উপর স্টেশনের ঘর। নীচু প্ল্যাটফর্মে সম্ভবত কিছু সাঁওতাল পরিবার ঘরকন্নার আসবাব সামলাতে ব্যস্ত। তাদের কাছে একজন নীল জামাপরা খালাসী দাঁড়িয়ে বচসা করছে। স্টেশনের বারান্দা থেকে ওপাশের গেটের দিকে কিছু লোক সরে গেল। বাদ বাকি সব খাঁ খাঁ। শুধু একটা

বিষণ্ণ কুকুর চুপচাপ দাঁড়িয়ে কিছু শুঁকছে। পিপুল আর কৃষ্ণচূড়ার তলায় ঘন ছায়া।

তার মানে আপ ট্রেনটা এসে চলে গেল। মধুমালা বড়রাস্তা থেকে ঝোপ জঙ্গলে ঢোকার আগেই স্টেশন থেকে ছেড়ে গেছে। সে একটুও শোনেনি। কারণ, তার মন অন্য কিছু শুনছিল। শেষ রাতের বিয়ের বাজনার প্রতিধ্বনি—কিংবা......

মধুমালা কোন কথা না বলে হনহন করে লাইন ডিঙিয়ে চলে যায়। প্ল্যাটফর্ম এখনও নীচু। যাত্রীদের মই বেয়ে ওঠার মত গাড়িতে উঠতে হয়। এ নিয়ে খুব লেখালেখি চলেছিল। এবার নাকি শীগগির উঁচু করা হবে। বিজলীর লাইন এসে গেছে স্টেশনে। ওভারব্রীজ হবে। দিনে দিনে স্টেশনের গরুত্ব বাড়ছে কিনা।

পিপুলগাছটার গোড়া বাঁধানো। লাল সিমেন্টের গোল চত্বর কয়েক জায়গায় ফাটা। তাতে খড়ি দিয়ে নানান জায়গায় নাম লেখা আছে। কপালীতলার ছেলেরা—যারা খেলাধূলা ভালবাসে না, বিকেলে এখানে এসে বসে থাকে। যাত্রী দেখে। টিপ্পনী কাটে। তারাই লেখে নিশ্চয়। আধমোছা নাম সব। কোনটা যুক্তচিহ্ন দেওয়া—পাশে কোন মেয়ের নাম। 'তপন + অঞ্জলি'! অঞ্জলি তো বড় স্টেশনবাবুর মেয়ের নাম। বাবা রে বাবা, কী সাহস ওদের!

মনখারাপ ভাবটা চলে যায় মধুমালার। ফিক করে হেসে ওঠে। তপনটা কে? অঞ্জলি নিশ্চয় জানে না এ ব্যাপারটা। জানলে যা কান্ড হবে, ভাবা যায় না। তপন কে, রাখীর কাছে জেনে নেওয়া যাবে। ওর সঙ্গে সব ছেলের খাতির আছে। সুধীর + ধরণী। কী কান্ড! মধুমালা আপনমনে হাসে। দুজনেই তো ছেলে।

কপালীতলা স্কুলে কো-এডুকেশনের ব্যবস্থা আছে। ছেলেরা আজকাল যা পাজী হয়েছে, কহতব্য নয়। এমন কীর্তির সংখ্যা সেখানে আনাচে কানাচে প্রচুর। মাস্টারমশাই আর দিনিমর্ণিদেরও রেহাই থাকে না। কতবার সে নিয়ে হৈ-চৈ হয়েছে। কিন্তু মধুমালার নামে তেমন কোন মন্তব্য লেখা হত না। একবার তার কৈফিয়ৎ লেখা হয়েছিল—সাবধান, প্রথম মোক্তার আদালতে নিয়ে যাবে, হাতে হাতকড়া। এমনি সব কত ইঙ্গিত!

মধুমালা ঠোঁটে আঙুল কামড়ে এবং হাসি নিয়ে চত্বরটা দেখতে থাকে। হঠাৎ সে 'মধু' দেখেই চমকে ওঠে— গোল চত্বরের খাড়াইয়ের লেখাটা শুরু হয়েছে। পড়তে গেলে ডাইনে এগোতে হবে। সে দ্রুত সরে যায় সেদিকে। তারপর থমকে দাঁড়ায়।

'আমার স্বপ্নে দেখা মধুমালা থাকে, বড়রাস্তার বাঁকে। মোটরগাড়ি চাপিয়ে নিয়ে তাকে, চলে যাবে.....'

মেলাতে পারেনি, কিংবা কেন, এখানেই ছেড়ে দিয়েছে। তার পরের লাইন ঃ মধুমালা, তোমাকে স্বপ্নে দেখেছি। ইতি র।'

এসব দেখলে মনে কী যে হয়, রাগ না দুঃখ, ঘৃণা না শিউরে-ওঠা স্পষ্ট বোঝা যায় না। ঠোঁট নিঃসাড় লাগে। বুকের ভিতর হাওয়া বয়ে যায় হু হু করে। আর কোথাও একটু আলোয় রাঙা জগতেব ঝলমলানি, মেঘের ফাঁকে রোদের মত। সে কী সুখ, সে কী দুঃখ—এই বয়সে কেউ বোঝে না। বুঝতে পারে না। কানের লতি যায় রেঙে। গালে টোল পড়ে। চোখের দৃষ্টিতে কী সব কুয়াশা এসে জড়িয়ে যায়। সেইসব কুয়াশার ভেতর প্রজাপতিরা আসে ঝাঁকে ঝাঁকে। হঠাৎ চমকে যায় এক দারুণ গোপন বোধে—আমাকে নিয়ে কাদের ভাবনা!

আর লজ্জা, লজ্জা এবং লজ্জা। সেই ধরাপড়ার লজ্জা।

এদিক-ওদিক দ্রুত তাকিয়ে সে ঝটপট কথাগুলো মুছে ফেলতে থাকে। হাতের তালু সাদা হয়ে যায়।

তারপর গলার শির ফুলে ওঠে মধুমালার। ঠোঁট কামড়ে ধরে। খুব রেগে যায়। চত্বরটার সামনে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে চত্বরটাকেই ভীষণ অপমান করার উপায় খোঁজে।

কিন্তু কিছু খুঁজে পায় না। 'র' কে? কয়েকটা ছেলের নাম মনে পড়ে যায়। রবীন, রথীন, রঞ্জন, মুসলমানপাড়ার রফিক.....কিন্তু না, রফিকের সে সাহস হবে না। রবীনই কি? বড় ফাজিল ধরনের ছেলে। মেয়েদের পিছে লাগা অভ্যাস আছে। রবীনকে জব্দ করার উপায় খোঁজে সে—নিরাপদ উপায়। বাড়িতে কেউ যেন টের না পায়। সেটা বড্ড লজ্জার ব্যাপার হবে। মধুমালার সম্পর্কে আজ অব্দি

কোনোরকম কথা ওঠেনি। মা মন্দিরা গর্ব করে বলে বেড়ান—আসলে নিজেদের মেয়ে শাসন করতে পারে না, পরের ছেলের দোষ দেয়। কই, আমার মালুও তো আছে। কোন ছোঁড়ার সাধ্য চোখ তুলে তাকাক্ না দেখি।

এই সময় তার চোখ গেল প্ল্যাটফর্মের শেষ দিকে সাঁওতাল লোকগুলোর ওপর। নীল উর্দিপরা খালাসীটা দাঁড়িয়ে আছে তখনও। বড় বড় দাঁতগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কেন হাসছে ও?

এতক্ষণে দেখতে পায় মধুমালা। লোকগুলো সাঁওতাল নয়—বেদে। জ্যৈষ্ঠ-সংক্রান্তিতে কপালী নদীর ওপারে মনসাপূজার ধুম হয়। সেই উপলক্ষে প্রতিবছর বীরভূমের পাহাড়ী এলাকা থেকে ওরা আসে। সাপ গায়ে জড়িয়ে নাচে। পয়সা পায়।

মুহূর্তে চঞ্চল হয়ে ওঠে মধুমালা। যে-ছেলেমানুষী সে আজকাল ছাড়ব ছাড়ব করে এগোচ্ছে, ছাড়া যাচ্ছে না—সেটা প্রচন্ডভাবে পেয়ে বসে তাকে। এক নেশার টানে সে এগিয়ে যায় লোকগুলোর দিকে। ওরা একটা ঝাঁপি খুলে ফণাতোলা সাপের নাচ দেখাচ্ছে খালাসীটাকে। সম্ভবত এই দিয়েই ভাড়াটা অর্থাৎ রেলের টিকিট উসুল করছে। আর কীই বা করবে—এত গরীব সব।

মধুমালা ফণাতোলা ধূসর প্রকান্ড গোখরোটাকে দেখামাত্র শিউরে ওঠে। কাঠের মত হয়ে যায় সারা শরীর। সব ভুলে সে সাপটা দেখতে থাকে। খালাসী বলে—দেখছেন দিদি, ওই যে মাথাব নীল-লাল চক্কর, ওটাই হল গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের চরণ। দেখুন, লক্ষ্য করে দেখুন। ...

স্টেশনঘরের বারান্দার ধারে যে দিকটায় সাদা রঙের বেড়া, বুনো লতাপাতা উঁকি মারছে। যেন ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে আছে সভ্যতার দিকে। এই লাল ইটের দেয়াল, টিকিট কাউন্টাব ও টিকিটবাবুদেব মধ্যে সভ্যতার ব্যাপার-স্যাপার দেখে তাজ্জব হচ্ছে তারা। আব এই দুটি আগন্তুক, বয়সে নবীন, তাদেরও দেখছে যেন। যেমন করে এসব পাড়াগাঁয়ের বউ-ঝিবা নতুন লোক দেখে, চাউনিগুলো তেমনি।

কয়েক মিনিটেই স্টেশনঘরের বারান্দা ফাঁকা। গেট দিয়ে গল গল কবে বেবিয়ে গেছে যাত্রীস্রোত। ছোট্ট চায়েব স্টলের মালিক খবরের কাগজ পড়ছে, মুখটা নীচু। এইমাত্র এল কলকাতা থেকে। বয় ছোঁড়াটা কেটে পড়েছে অশ্বত্থতলার সাধুর কাছে। আবার গাড়ি ন'টা পাঁচের ডাউন।

দিব্য ভুরু কঁচকে বেনার জংলী ব্যাপারগুলো দেখছিল। বয়স ছাব্বিশ সাতাশের মধ্যে। মাথায় ঝাঁকড়া চুল কাঁধছোয়া, গোঁফ আছে। লম্বা নাকের নীচে সেই গোঁফের তীব্রতা আছে। পাতলা ঠোঁটদুটো। চোখ দুটো অন্যরকম—চেহারার তীক্ষ্ণতা চোখের বিশালতায় ভেসে গেছে। লম্বা সে। টকটকে ফর্সা রং, পরনে গাঢ় নীল সেমিবেলবটস, পুরোহাতা ফিকে গোলাপী শার্ট—পায়ে গাব্দা স্লিপার। কাঁধে গাঢ় লাল নক্সা কাটা ঝোলা। তাকে হঠাৎ অ্যাংলোইন্ডিয়ান বলে ভুল হতে পারে।

--ইস্! অস্ফুট শব্দ করে ওঠে সে।

শান্তনীল বিরক্ত মুখে চায়ের স্টলের দিকে তাকিয়েছিল। মুখ ফিরিয়ে বলে—উঁ?

—সাপ।

—সাপ তো থাকবেই। যা জঙ্গল! বলে শান্তনীল তার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়।

শান্তর মাথার চুল দিব্যর চেয়ে অবিন্যস্ত, টেরি আছে। গোঁফ ও দাড়ি আছে চিবুকে। ভরাট মুখ। নাকে হাড় মোটা, ডগা সূক্ষ্ম। চোখের দৃষ্টিতে চাপা রাগের ভাবটা স্থায়ী। অথচ কথা বলার সময় হাসিটা বাঁধা। তার গায়ে বাদামী মোটা কাপড়ের বুশশার্ট, দু'কাধে কলার—দুই বাহুতেও পকেট, বুকে দুটো পকেট—সব পকেটের ওপর আধখানা চাঁদের মতো ঢাকনা, একটা লাল সরু কলমের মাথা দেখা যাচ্ছে। একটু তামাটে রঙ তার চামড়ার। চোখের তলায় কালো ছাপ আছে। কপালে একটা কাটার দাগ আছে। দিব্যর চেয়ে মাথায় খাটো বলে বেঁটে দেখায় তাকে। চৌকো চোয়াল। দাঁত চেপে কথা বলে, তাই চওড়া সাইডবার্নের তলা থেকে চিবুকের দাড়ির প্রান্ত অব্দি চোয়ালের হাড় নড়ে ওঠে। মনে হয় চিবুচ্ছে সবসময়। তার পরনে ইয়াঙ্কি টেডিবয়দেব সাতটা পকেটওলা খসখসে ছাইরঙা প্যান্ট—নীচের দিকটা চোঙা। পায়ে পা-ঢাকা সোয়েডের জুতো—যাকে বলে বুশ-শু। তার কাঁধে একটা পলিথিনের কিটব্যাগ। একটা ক্যামেরাও ঝুলছে। ঝুলছে একটা ভিউ-ফাইন্ডার। শৌখিন রকমের পর্যটকের চেহারা।

দিব্যর দৃষ্টি বেড়ার পাশে একটা তরুণ তালগাছের গুঁড়িতে—গুঁড়িটা অগোছাল ও সীসেরঙের

ঘন চাপ চাপ বাগড়ায় ঢাকা। সে ভাল করে দেখে নিয়ে বলে—না, সাপ নয়। সাপের খোলস।
—রিয়েল সাপের খোলস তো? একটু তামাশা করে শান্তনীল।
তারপর দিব্য ঘোরে। —স্টলের ভদ্রলোককে জিগ্যেস করা যাক।
শান্ত আবার বিরক্ত হয়। — কিন্তু ব্যাপারটা কী? সুকু আসেনি!
—তাতে কী হয়েছে? তুই বড্ড ফর্মালিটির ভক্ত!
শান্ত পা বাড়িয়ে বলে—স্টেশনের কাছের লোকেরা হরদম ট্রেন ফেল করে, শুনেছি। যাক্‌গে, আয়—চা খাই।
—হুঁ। দিব্য এগিয়ে যায়। —এই যে দাদা, হবে নাকি?
স্টলের লোকটি কাগজের পাতায় চোখ রেখেই মাথা নাড়ে এবং ডাকে—নিতাই, বাবুদের চা দে।
পাশে কয়লার গোল চুলোয় গোল টিনের বড় পাত্রের ঢাকনা কাঁপছে। ভাপ বেরুচ্ছে। বেঞ্চে দুজনে আরাম করে বসে। শান্ত বলে—আপনার নিতাই মনে হচ্ছে নেই।
লোকটা একই ভঙ্গীতে একটু জোরে ডাকে—নিতাই! এ্যাই নিতাই!
দিব্য বলে—শান্ত, তুই জানিস সুকুদের বন্দুক-ফন্দুক আছে নাকি?
ঘাড় নাড়ে শান্ত। জানে না।
—পাখি-ফাকি মারা যেত! কত পাখি।
—সব পাখি খায় না।
—হুঁ। কই দাদা, আপনার নিতাই কোথায়?
লোকটা আচমকা কাগজ নামিয়ে চটপট ভাঁজ করে ফেলে টুল থেকে পা নামিয়ে স্যান্ডেল পরতে থাকে। রাগী মূর্তি। হেঁড়েগলায় চেঁচিয়ে ওঠে—এ্যাই নিতাই! হতভাগা, দেখাচ্ছি মজা শালাকে। গুষ্টির ষষ্ঠীপুজো দিচ্ছে ব্যাটা।
শান্ত একটু অস্বস্তিতে কাঠ হয়ে তাকিয়ে থাকে। নিশ্চয় একটা বাজেরকমের মারধর দেখতে হবে! বাচ্চাদের মার খেতে দেখলে তার খারাপ লাগে। দিব্য একটা সিগারেট ধরায়। মুখটা ভাবলেশহীন। কিন্তু লোকটা তেমন কিছুই করে না। আগন্তুকদের আড়চোখে দেখতে দেখতে কাপ-প্লেটে গরম জল ঢালে।
শান্ত বলে—দাদা, সুকুমার রায় বলে এখানকার কাকেও চেনেন নাকি?
—খুব চিনি। মোক্তারবাবুর ছেলে। আপনারা কলকাতা থেকে আসছেন?
—হ্যাঁ। ওদের বাড়িটা কোথায়?
—ওই যে গাছগুলো দেখছেন, ওখানে বড়রাস্তা। দক্ষিণে চলে যাবেন সোজা বাজার ছাড়িয়ে, তারপর জিগ্যেস করবেন। রাস্তার বাঁকে বাড়ি—শেষদিকে।
—বিকেলের দিকে কলকাতা ফেরার ট্রেন ক'টায় বলতে পারেন?
—খুব প্যারি। এ্যাই নিতাই। আয়, মজা দেখাচ্ছি। বলে চায়ে দুধ মেশায় সে। তারপর বলে—ট্রেন সেই তিনটে পাঁচ সিডুল টাইম, আসে প্রায় পৌনে চারটেয়! আজকালকার ব্যাপার। তারপরের ডাউন ছ'টা সতেরো। সিডুল। তারপর একেবারে রাত ন'টা পঁয়তাল্লিশ। আজই ফিরে যাবেন?
শান্ত হাত বাড়িয়ে কাপ নিয়ে বলে—হয়তো। কী রে দিব্য, আজই ফিরবি তো?
লোকটা বলে—আপনার চা স্যার।
শান্ত চোখ নাচায় দিব্যর দিকে। ওকে স্যার বলছে তাই। দিব্যর মধ্যে একটা কী আছে—তাকে লোকে বেশ খাতির-টাতির করে। দিব্য চা নিয়ে বলে জায়গাটা ভাল লেগেছে। রাতে থাকতে আপত্তি নেই। অবশ্য......
সুকু যদি বলে! আমরা তো গেস্ট!....শান্ত খুক খুক করে হাসে। হাসির সময় ওর একহাতের আঙুল বরাবর মুঠো পাকিয়ে যায়। ঊরুতে ঠোকে।
দিব্য বলে—আমি অবশ্য বলার ধার ধারিনে। নিজেই তো চলে এলুম। জানিস, ও অবাক হবে আমাকে দেখে! ভাববে, হঠাৎ এ ব্যাটা কোত্থেকে?..... একটু চুপ করে থেকে সে ফের বলে—সুকু

আমায় কোনোদিন আসতে বলেনি।

—বলেনি। মানে, হয়তো পাড়াগাঁ, এবং ওদের ফ্যামিলি লাইফ অন্যরকম। সংকোচ থাকা স্বাভাবিক। দেখ দিব্য—বলে শান্ত আবার খুক খুক করে হেসে ও মুঠো ঠোকে উরুতে।.....আমার মনে হচ্ছে, সত্যি সত্যি এসে পড়ব, ও ভাবেনি। তাই স্টেশনে আসেনি। কিংবা...

দিব্য তাকায়।

—কিংবা......গলার স্বর চাপা করে শান্ত বলে যায়।.....ওদের ফ্যামিলি সম্পর্কে এ্যাদ্দিন এন্তার গুল ঝেড়েছে। বলেছে, জমিদারি ছিল ঠাকুর্দার আমলে ইত্যাদি ইত্যাদি। বলেছে না? হাতি ছিল, ঘোড়া ছিল, একটা ফোর্ড গাড়ি ছিল, ফর্টিটুতে বেচে দেয়। কোথায় ওদের সুন্দর বাগান আছে—যেখানে পীচ গাছ আছে। রিয়েল চাইনিজ ফ্রুট! ভাবা যায়?.....আবার হাসতে থাকে শান্ত। হাসির চাপে চায়ের কাপ উল্টে যাবার দাখিল।

দিব্য ওকে চিমটি কাটে। চা-ওলা শুনছে—কানে তুলতে পারে, তারপর দিব্য ঠোঁট চোঙা করে শিস দিতে থাকে।

শান্ত বলে যায়—এই! যদি সব গুলতাপ্পি হয়, ও কিন্তু লজ্জায় পড়ে যাবে। চল নেক্সট ট্রেনে মানে মানে কেটে পড়ি। দাদা, নেক্সট ডাউন ক'টায়!

—নটা পাঁচ। আসে সাড়ে ন'টায়। আর বলবেন না। .... বলে আচমকা লোকটা 'এ্যাই নিতাই' হাঁক ছেড়ে স্টল থেকে বেবিয়ে যায়।

গেট পেরিয়ে গেলে শান্ত উদ্বিগ্ন করে তোলে মুখটা—এই বে! মার্ডার-ফার্ডার হবে। বুঝলি দিব্য? কী ব্যাপার দেখ, একটা আইন আছে—মাইনরদের দিয়ে কাজ করানো চলবে না। অথচ বেস্তোরাঁ থেকে শুরু করে সব জায়গায় বাচ্চা দিয়ে লোকে কাজ নেয়। ইভ্‌ন বাড়িতেও। আমাদের পাশের ফ্ল্যাটেব ভদ্রলোক.....

দিব্য হঠাৎ প্ল্যাটফর্মের দিকে দূরে দৃষ্টি রেখে অস্ফুট বলে ওঠে—ইস্!

—কী রে? আবার সাপ?

দিব্য চুপ। কিন্তু দৃষ্টিতে স্বতস্ফূর্ত বিস্ময় অথবা মুগ্ধতা আছে।

—এই! স্নেকবাইটিং খেয়ে নির্ঘাৎ যাব রে দিব্য! এত সাপ! ভয় করছে।

—সাপ না। মেয়েটা!

শান্ত সোজা হয়ে বসে—মেয়েটা? ও! বাঃ! লাভলি মাইরি! চার্মিং! এখানে এমন জিনিস আছে? ওঃ দিব্য! আমি দুদিন থাকব এখানে। টু ডেজ! ইস, ভাবা যায় না। কী জিনিস রে!

দিব্য চায়ে চুমুক দেয়। কিছু বলে না। কিন্তু চোখ সেদিকেই।

শান্ত প্রায় ছটফট করে। —ওকে আসতে বল-না-শালা। লেট হার কাম, নাকি আমরা যাব? দিব্য, চল্ মাইরি। তোর পায়ে পড়ি। এ্যাদ্দুর আসাটা নিস্ফলা হল না, বল। এই দিব্য, তুই ভ্যাবলা হয়ে গেছিস কেন রে? বল্ একটা কিছু? বেবি! উইল ইউ কাম হিয়ার।

চায়ের কাপটা কাউন্টারে রেখে সে দিব্যকে খোঁচা দিতে থাকে। দিব্য নির্বিকার মুখে কাপটা বেখে পকেট থেকে রুমাল বের করে পা ছড়িয়ে মুখটা মোছে। সিগ্রেট ধরায় আবার। তারপর ভুরু কুঁচকে শাসনের ভঙ্গীতে বলে —মেরে ঠ্যাঙ খোঁড়া করে দেবে। একি চৌরঙ্গী পেয়েছ?

শান্তর উত্তেজিত ভঙ্গীটা সমান ছিল। এবার সে হঠাৎ নড়াচড়া বন্ধ করে। ফিসফিস করে বলে — শী ইজ কামিং। দিব্য! আসছে এদিকে। ওঃ শালা! আই মাস্ট ডাই: জাস্ট এ ড্রিম।

দিব্য তাকিয়ে থাকে নিষ্পলক।......

মধুমালা হন হন করে এসে স্টেশনের উঁচু ও খোলামেলা বারান্দার নীচে একটুখানি দাঁড়ায়। সিঁড়ি বেয়ে উঠে পড়ে ওপরে। তারপর চৌকোনা চ্যাপ্টা থামের পাশ দিয়ে ঢাকা বারান্দায় যায়। তার বাঁদিকে চায়ের স্টল, ডাইনে ও সামনে স্টেশন ঘরের দরজা। সামনের দরজায় উঁকি মেরে দেখে বড়বাবু ইয়া বড় রেজিস্টারে কী সব টুকছেন। ছোটবাবু টিকিটের আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে টিকিট মেলাচ্ছেন। সিগন্যালম্যান মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে আছে। সব যেন মূর্তি।

সে দরজার পাশের ওজনযন্ত্রে উঠে দাঁড়ায়। আধুনিক যন্ত্র নয়—সেকালের হাতওয়ালা একটা অদ্ভুত ব্যবস্থা। এক বর্গগজ লোহার পাতে মাল ওজন হয়। হাতলটা ধরে সে নিজের ওজনটা বোঝবার চেষ্টা করে।

এই সময় স্টলে একটা বকাবকি শুরু হয়েছে। চা-ওলা তারকবাবু বয়টার কান ধরে টেনে এনেছে! আরও কারা কথা বলছে।

তারপর সব চুপ। মধুমালা ওজনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ওপরে মস্ত বড় টাইমটেবলটা পড়তে থাকে। অল-ইনডিয়া চার্ট। একটায় ভাড়ার অঙ্ক। অন্যটায় সময়। সব স্টেশনেই এমন চার্ট থাকে। ছোট হরফে ছাপা। তাহলে মধুমালা পড়তে পারছে। শুরু হয়েছে হাওড়া থেকে। শেষ দেরাদুন। কতদূরে দেরাদুন? জায়গাটা কেমন?

—আরে! মালাদি যে? কী খবর বোনটি? ভাল তো? হঠাৎ যে!

তারকের কথা শুনে মধুমালা গম্ভীর হয়ে মাথাটা দোলায় শুধু। তারপর ঘুরে রেললাইনের দিকে তাকাতে তাকাতে ঢাকা বারান্দার কোনার থামটা পেরিয়ে যায়। ওখানেই স্টলের সামনেটা। প্যাসেজ মতো। বারান্দার ওদিকটা দিয়ে হাঁটলে গেটে যাওয়া যায়। মধুমালা খোলামেলায় দাড়িয়ে গেল। তার দৃষ্টি এখনও রেলরাইনের দিকে। চোখের কোনায় কখন থেকে দেখে নিয়েছে দুই মূর্তি বসে আছে স্টলের বেঞ্চে। একজনের জায়গায় দুজন—তখন নিশ্চয় দাদার লোক নয়।

অবশ্য দাদার লোকটা সঙ্গে আরেকজন আনবে না তার মানে আছে কি? দাদার বয়সী এবং চেহারায় কলকাতার ছাপটা ধরা যায় সহজেই। গাঁয়ের মানুষের এটা সহজাত। কিন্তু ওরা যদি তাই হয়, একটু দেরী করে ফেলেছে মধুমালা—সংকোচ হচ্ছে। ওরা ডেকে জিগোস করুক না। কলকাতার ছেলেরা তো স্মার্ট হয় খুব।

- সুকুটা মাইরি কী? শান্তনীল উঠে দাঁড়ায় এবং চায়ের দাম মেটাতে থাকে।

অমনি তারক বলে ওঠে—ওই মলো যা! মালাদি! শুনছ গো? এনারা বোধহয় তোমাদের বাড়িই এসেছেন।

দিব্য দাড়িয়ে বলে—বোধহয় নয়। এসেছি! কে ও?

--আপনারা যান স্যার। ওনার সঙ্গে যান। ওই তো মোক্তারবাবুর মেয়ে। সুকুমারবাবুর বোন। মালাদি, এনাদের নিয়ে যাও।

মধুমালা একবার ঘুরেছিল মাত্র। নির্বিকার মুখ। শান্ত তার পাশে গিয়ে বলে - আপনি....মানে তুমি বুঝি সুকুমারের বোন? ও বলেনি যে আমি আসব?

মধুমালা একইভাবে থেকে মাথাটা দোলায়। মনে মনে বলে—বলেছে। কিন্তু একজন আসার কথা। দুজন যে!

—বলেছিল? বাঃ! তাহলে তুমি আমাদের রিসিভ করতে এসেছ? তা এত দূরে আনমাইন্ডফুলি ঘুরে বেড়াচ্ছ যে? শান্ত খুক খুক হেসে ওঠে। আমাদের নিয়ে চল।

মধুমালা হঠাৎ যেন ফোঁস করে ওঠে—কলকাতার ছেলেরা ভদ্রতা করে কথা বলতেও জানেন না? আসুন।

—মাই গুড্‌নেস! শান্ত ভড়কে যায়। কেন? অভদ্রটা কী করলুম!

দিব্য গম্ভীর মুখে বলে—ওকে তুমি বলাটা নিশ্চয়ই অভদ্রতা। দেখছি, শী ইজ্ কোয়াইট্ এ লেডি।

শান্ত কপট গাম্ভীর্যে বলে—রাইট, দ্যাটস্ রাইট! প্লীজ ফরগিভ মি, মিস মালা।

ওরা যেন তাকে ঠাট্টা করছে—মধুমালা আবার ফোঁস করে বলে—এটা বাংলাদেশ। আপনারাও বাঙালী। আসুন! আমার এত সময় নেই।

শান্ত এবার হা হা করে জোরালো হেসে বলে—এঃ! বড্ড সিরিয়াস মিস্ মালা!

—আমি মিস্ মালা টালা নই। শ্রীমতী মধুমালা রায়। আসুন।

বলে সে হন হন করে এগিয়ে যায় গেটের দিকে। দিব্যর পাঁজরে খোঁচা মেরে শান্ত চলতে থাকে। দিব্য ভাবলেশহীন মুখে এদিকে ওদিকে তাকাতে তাকাতে হেঁটে যায়। অশথতলায় গিয়েই হঠাৎ ঘুরে বলে—এই রাস্তা দিয়ে গিয়ে বড়রাস্তা। তারপর জিগোস করলে বলে দেবে। আমি একটু পরে যাচ্ছি।

তারপর সে জ্যোতিষী সাধুর সামনে বসে পড়ে। হাত বাড়িয়ে বলে—একবার দেখুন না সাধুবাবা। সাধু হেসে ওর হাতটা নেন। শান্ত বলে—দিব্য। এক মিনিট—হাতটা দেখিয়ে নিই।

তখন মধুমালা নিজের হাতটা সরিয়ে নিয়ে বলে—পরে আসব বরং। কই, আসুন।

শান্ত হাসতে হাসতে বলে—আহা দেখিয়েই নিন না!

মধুমালা চলতে থাকে। দিব্য তার পিছু নিয়ে সস্নেহে বলে—পরীক্ষা দিলেন নাকি? রেজাল্ট বেরোয়নি বুঝি?

মধুমালা এতক্ষণে হাসে।—কই, আসুন।

শান্তর এবার রাগ হয়েছে। পা বাড়িয়ে আপন মনে বলে—সুকুর বোনটার মাথায় ছিট আছে।

দুই

কলকাতা থেকে শান্তনীলের একা আসার কথা। দিব্যও এসেছে। এতে সুকুমার খুব খুশি। জ্বর গায়ে এসে বসেছিল সে। বাবার প্রকান্ড ইজিচেয়ারে। এত লম্বা যে পা ছড়িয়ে ঘুমানো যায়। ঘরটাও বেশ বড়। কোণের দিকে একটা সেকেলে সোফাসেট আছে। অন্যপাশে অনেকগুলো চেয়ারের মধ্যে একটা সেকেলে সেক্রেটারিয়েট টেবিল। পেছনে চারটে আলমারি। চামড়ায় বাঁধানো আইনের বই ঠাসা। বাবার শুধু ফৌজদারী মামলার প্র্যাকটিস, মোক্তার হিসেবে ঝানু, পয়সা করেছেন—কিন্তু কেতা ব্যারিস্টারের। আপিস করেছিলেন দু-জায়গাতেই। ছুটির দিনে আর সন্ধ্যার পর বসতেন এই ঘরে, সকালের দিকে ঘুঘুডাঙা কোর্টের পাশেই একটা ভাড়ার ঘরে। ডেলি-প্যাসেঞ্জারী করতেন ট্রেনে। যেতেন ভোব ছ'টায়, ফিরতেন সন্ধ্যা ছ'টায়। আজীবন।

—তোরা যদি ভেবে থাকিস, তোদের জন্যে খুব ঘটা করব, সুকুমার তামাসা কবে বলল—তাহলে পস্তাবি। স্রেফ নিরামিষ ব্যাপার।

শান্ত ব্যস্তভাবে বলে—ঠিক আছে বাবা। নিরিমিষই খাব।

—খাওয়ার কথা বলছিনে। সুকুমার বলে ওঠে। বলছি ধুমধামের কথা। নিজের বাড়িব মত থাকবি খাবি! ব্যস!

দিব্য একটু হাসে।—শুধু থাকতে খেতে আসিনি। তাই না শান্ত?

শান্ত সায় দেয়। সুকুমার বলে—কেন এসেছিস?

—দেখতে।

—কী?

—তুই কোথায় থাকিস, কেন থাকিস, তাই দেখতে।

—দেখছিস তো! কেমন কাম এ্যান্ড কোয়ায়েট লাইফ কাটাচ্ছি।

তিনজনে হাসাহাসি করে। তারপর সুকুমার করুণ হাসে।—আমার শালা হঠাৎ এসময়ে জ্বর হয়ে গেল। কত ঘুরতুম। দেখি, এ্যান্টিবায়োটিক কিছু খেয়ে এখনই জ্বরটা ছাড়াতে হবে।

শান্ত সিরিয়াস হয়ে পরামর্শ দেয়—ডাক্তারের সঙ্গে কনসাল্ট না করে খাস নে। ভাল ডাক্তার আছে তো এখানে?

—আছেন। হেলথ্ সেন্টারে একজন সেকালের এল.এম.এফ আছেন জগন্নাথ বকসী। এখানেই সেট্‌ল করেছেন। মোটামুটি ভাল ডাক্তার বলা যায়।

দিব্য জানলার বাইরে তাকিয়ে ছিল। ঘুরে বলে—তোদের বন্দুক নেই?

—আছে। কেন?

—এমনি।

শান্ত বলে—ও বাঘ মারবে বলে বেরিয়েছে। বাঘ নেই রে?

কখন দরজার কাছে এসে গিয়েছিলেন প্রমথ, শান্তর কথার জবাব দিতে দিতে ঘরে ঢোকেন। —ছিল একসময়। নদীর ওপারে জঙ্গল ছিল-টিল অনেক। এখন তো সব চষে ফেলেছে লোকেরা। পপুলেশান বেড়েছে, খাকতি বেড়েছে। মোটা ভাত-কাপড় আর চলে না, বাবা!

শান্ত ও দিব্য উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে। প্রমথ মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়েন।—বসো বসো।

সুকু ক'দিন থেকে বলছে, তোমরা আসবে। হঠাৎ জ্বর। ওয়েদারের গোলমাল আর কী। তার ওপর টো টো করে বেড়াল বনবাদাড়ে। রোদ লেগেছে। বসো তোমরা। সুকু, ওদের ঘরে নিয়ে যা। এখানে কেন? বাড়ির ছেলে সব।

সুকুমার বলে—মদন জল তুলছে। হাত-মুখ ধোবে।

—মদন, জল তোলা হল রে? বলতে বলতে প্রমথ বেরিয়ে যান।

বাইরে উঁচু খোলামেলা বারান্দা, ওপরে আকাশ। ঠিক বারান্দা নয়, একটা চওড়া চত্বর। দু'দিকে ও সামনে বসার জন্য সিমেন্টমোড়া চকচকে বেঞ্চ মত সামনে ধাপ বাঁধা সিঁড়ি। নীচে তিনদিকে বিশাল প্রাঙ্গণ। ঘাসে ঢাকা লন—গেট অবধি একফালি রাস্তায় খোয়া বিছানো আছে। ঘাসের ওপর থরে বিথরে ফুলের গাছে ফুল। পাঁচিলের ধার ঘেঁসে ছোট বড় গাছ, বর্মী বাঁশের ঝাড়, পাতাবাহার ইত্যাদি। সেই বারান্দার ধারে সিঁড়ির মুখে প্রকান্ড দুটো বালতিতে জল এনে রাখছে মদন নামে বুড়ো একটা চাকর। পেছনে একটা কুয়োতলা আছে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন প্রমথ। অদৃশ্য মদনকে কিছু বললেন। তারপর খোয়ার ওপর চটির আওয়াজ তুলে গেটে এগোলেন। পরনে ধুতি, গায়ে সাদা হাতকাটা ফতুয়া, পায়ে চটি। প্রাচীন সম্ভ্রমের প্রতীক। ওর যাওয়া দেখতে দেখতে শান্ত বলে—তোদের পুকুর নেই?

সুকুমার হাসে—শহর থেকে কেউ এলে এসব জানতে চায়। আছে বাবা, সে ট্রাডিশন যাবার নয়। পুকুরে মাছ আছে। ভাল জাতের গরু আছে। প্রচুর বিশুদ্ধ দুধ দেয়। বাগান আছে। খামার বাড়ি আছে। বাবা গৃহস্থ মানুষ। একালের ধার ধারেন না। ব্যাঙ্কে টাকা রাখার চাইতে মাটি কেনা সেফ মনে করেন। যা, জল দিয়েছে। এক্সট্রা কাপড়চোপড় এনেছিস? না আনলে অসুবিধে নেই।

দিব্য বলে—কিচ্ছু আনিনি। কী দরকার?

—ওই ঝোপ পরে এই গরমে কাটাবি? যাঃ

—এই তো ফ্যান আছে!

—থাকলেও কী। রিল্যাক্স করা যায় না ওভাবে। শান্ত, তুই?

—আমি একটা পাঞ্জাবি আর পাজামা এনেছি। দিব্যটা তো রাস্তা থেকে হুট করে চলে এল।

সুকুমার ওঠে। রুগ্নতার প্রকাশ আছে ওর চলায়। কিন্তু ওরা কিছু বলে না।

সুকুমার ভেতরের দরজার কাছে গিয়ে ডাকে—খুকু! খুকু!

কেউ তক্ষুনি সাড়া দেয়—কী?

—আমার ঘর থেকে পাজামা-পাঞ্জাবি এনে দে। ওয়াড্রোবের ওপরে আছে দেখবি। ধোপা যেগুলো দিয়ে গেল সকালে।

—আমি একটা কাজ করছি।

সুকুমার একটু রাগ নিয়ে ভেতরে চলে যায়। শান্ত চোখে ঝিলিক তুলে হাসে! চাপা গলায় বলে বুঝলি কিছু?

দিব্য মাথা নাড়ে।

—শালা হিপোক্রিট! সুকুর বোন। কী মেয়েরে!

দিব্য কিছু বলে না। ব্যাগটা সোফায় রেখে বাইরের চত্বরে গিয়ে দাঁড়ায়। দেখে সিঁড়ির মাথায় দুটো টুল, দুটো মগ, দুটো মস্ত জলভরা পিতলের বালতি, আর একটা টুলে কাচা ভাঁজ করা তোয়ালে ও সাবানের কৌটো রয়েছে। মদন নামে লোকটার চেহারা গরিলার মত। দু হাত ঝুলিয়ে হেঁটে যাচ্ছে বাড়ির পূবপাশে কুয়োতলার দিকে। লোকটা কথা বলতে জানে না—এমন ভঙ্গী। দিব্য ভেবেছিল, ওকে জিজ্ঞেস করবে ল্যাট্রিনটা কোথায়।

ভীষণ চাপ। তলপেটে ব্যথা নিয়ে হন হন করে নেমে যায়। বাড়ির পশ্চিমের প্রাঙ্গণে ফুলগাছের ঝোপ প্রচুর। পাঁচিলের ধারে আরও ঘন। তার বাইরে বড়রাস্তা। গাড়ির শব্দ সারাক্ষণ।

সে এদিক-ওদিক দেখে একটা ঝোপের সামনে দাঁড়ায়। তারপর প্যান্টের বোতাম খুলতে গিয়েই শোনে কে বলছে—ওই তো ল্যাট্রিন। দ্রুত ঘোরে দিব্য। জানালায় সুকুমারের বোনের মুখ। ঘুরতেই সরে যায় মুখটা। তখন দিব্য ডাইনে তাকায়। উত্তর-পশ্চিম কোনায় উঁচু ল্যাট্রিনটা দেখতে পায়—

সিঁড়ি আছে। একলা দাঁড়িয়ে থাকা ধবধবে সাদা এক বুড়ো সাধু যেন। এমনি মনে হয় দিব্যর। খুব পবিত্র হাবভাব। কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে সে। আবার পিছনে ঘুরে সেই জানালাটার দিকে তাকায়। সবুজ গরাদ শুধু। ভেতরে ঘন ছায়ার রহস্য। হঠাৎ রেগে যায় সে। বোতাম খোলে ঝটপট।....

একটু পরে চত্বরে উঠে আসে। শান্ত জামাইবাবু সেজে হাত পা মুখ ধুচ্ছে। বরাবর ওর মধ্যে সব ব্যাপারে ভোগী মানুষের নিষ্ঠা ও পারিপাট্য আছে। খেতে বসলেও তাই। এসব মানুষ সচারচর আইন মানার পক্ষপাতী এবং সীমা ডিঙোতে চায় না—তাই আইনের ফাঁক খুঁজে এগোয়। এই শান্ত তিনটে বিষয়ে এম.এ দিয়েছিল। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, ইসলামী সংস্কৃতি, এদুটোয় পাশ করেছিল। তৃতীয়বার দর্শন নিয়ে পরীক্ষায় বসে এবং টুকতে গিয়ে ধরা পড়ে সে কি কেলেঙ্কারী। অবশ্য তাতে কিছু যায় আসেনি। সে চাকরি করতে আগ্রহী না। বাবার হোসীয়ারি আছে। একমাত্র ছেলে। চালিয়ে যাচ্ছে।

দিব্যর মনে পড়ে গিয়েছিল শান্তর পরীক্ষার টোকার ব্যাপারটা। প্রায় কোন না কোন সময় মনে পড়ে। আপনমনে হাসতে হাসতে তার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় সে। সুকুমার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে—চৌকাঠে ভর দিয়ে। বেচারার মনের অবস্থা বোঝা যায়। সে দিব্যকে দেখে বলে—ল্যাট্রিনে গিয়েছিলি? সেকেলে কারবার বাবার। গেস্টদের জন্যে অদ্দূরে ল্যাট্রিন করেছেন। এ্যাটাচড প্রিভির কথা শুনলে বাবা ঘেন্নায় শিউরে ওঠেন। বলেন কি জানিস? প্রক্ষালন মোচন এসব ব্যাপার জৈব। কাজেই.....

শান্ত হেসে মুখ ঘোরায়। রাত দুপুরে হিসি পেলে কী করিস রে?

সুকুমার জিভ কেটে বলে— এই ! বাবা আসছেন....দিব্য তুই বদলে নে। ধোয়া পাজামা পাঞ্জাবি রেখেছি। চমৎকার মানাবে তোকে।

দিব্য খদ্দরের ধূসর পাঞ্জাবিটা তুলে পরখ করে। গায়ে হবে তো? আমি তোর চেয়ে ইঞ্চি তিনেক উঁচু।

প্রমথ মোক্তার কুয়োতলার দিকে চলে গেলেন। দিব্য ওখানে দাঁড়িয়েই প্যান্ট শার্ট ছাড়ল। পরনে শুধু টাইট জাঙ্গিয়া। সুকুমার ফের জিভ কেটে চাপা গলায় বলে—এই ঝটপট।

শান্ত বলে—ও সায়েব। ন্যাংটো হয়ে স্নান করবে কুয়োতলায় দেখবি!

সায়েবই, টকটকে ফর্সা রং। দূর থেকে দেখলে দিব্যকে বাঙালী মনে হয় না। সে পাজামায় একটা পা গলিয়ে একবার ডাইনে ঘোরে—অকারণ, তারপর ঠোঁটে চাপা হাসি নিয়ে অন্য পা-টাও গলায়। সুকুমারের বোন বড্ড অদ্ভুত মেয়ে তো। সেই ভেজা ঝোপটার কাছে গিয়ে কী করছে? একপলকেই বোঝা গেছে, মুখটা দারুণ গম্ভীর। তারপর দৌড়ে ওদিকে অদৃশ্য হয়। পাগলই সম্ভবত। সুকুমার নিশ্চয় গোপন করেছে তার বোন পাগলী। অথচ দেখতে কী সুন্দর। সব ভুলে একটু চাপা করুণা আসে দিব্যর মনে।

কিন্তু একটা মজার ব্যাপার ধরা পড়ে যাচ্ছে। সুকুমারের বোন সবসময় যেন আড়াল থেকে এই দুটি আগন্তুকের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে। কেন?

সুকুমার তাড়া দেয়। ঝটপট! আমার মাথা ঘুরছে। শুয়ে শুয়ে কথা বলব তোদের সঙ্গে। চলে আয়।.....

বাড়ির ভেতরটা কেমন যেন দুর্গের মত মনে হয় দিব্যর। এক টুকরো নীচু উঠোন—আয়তক্ষেত্রের গড়ন। তার চারদিকে ঘর। দক্ষিণে বসার ঘর থেকে ঢুকলেই টানা বারান্দা। থাম আছে। উত্তরে ঠাকুরঘর। পূবটাই যা দোতলা। কিন্তু মোটে একটা ঘর দোতলায়। সুকুমারের ঘর।

ঘরটা হালফ্যাশানী আসবাবে সাজানো। বেশ বড় আয়তনেও। পূবে ও দক্ষিণে দরজা। জানালা আছে অনেকগুলো। চমৎকার নকশা কাটা পর্দা ঝুলছে—কিন্তু বাতাসের দাপটও আছে। সুকুমার খাটে শুয়ে পড়েছে। গায়ে চাদর টেনে নিয়েছে। সোফায় হাত-পা ছড়িয়ে বসে সিগ্রেট টানছে দিব্য ও শান্ত। এমন সময় সুকুমারের মা মন্দিরা এলেন। তাকিয়ে দেখার মতো চেহারা। বয়স বোঝা যায় না। টকটকে লাল চওড়াপাড় সাদা তাঁতের শাড়ি, সিঁথিতে প্রচুর সিঁদুর একরাশ ঘনকালো চুলকে সৌন্দর্য দিয়েছে—স্বাস্থ্যবতী মহিলা। ছেলের বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করতে এলেন। সঙ্গে চাকরের হাতে ট্রে। প্লেটে খাবার—নানারকম সন্দেশ, আম। দিব্য ও শান্ত ঝুঁকে প্রণাম করল।—আহা, থাক বাবা, থাক। বেঁচে থাকো। সুখে থাকো সব। সুকু এ্যদ্দিন কতসব গল্প করেছে তোমাদের। হঠাৎ জ্বর ওর। তাতে কী? এসেছ—

নিজের বাড়ি ভেবে থাকবে, ঘুরবে। তা ইয়ে—তুমিই শান্ত বুঝি?

দিব্য বলে—না, আমি দিব্য। দিব্যেন্দু চক্রবর্তী।

শান্ত বলে—আমিই শান্ত, মা। সুকুরা আমাকে অবশ্যি অশান্ত বলে।

মন্দিরা হাসেন।—তেমন কিছু মনে হচ্ছে না বাবা! আমি মা, ছেলেদের চিনি। হ্যাঁ বাবা, পুরো নাম কী যেন তোমার.....

—শান্তনীল রায়চৌধুরী।

—তোমার বাবার কী যেন বিজনেস আছে—সুকুই গল্প করে সবসময়।

—আছে। হোশিয়ারী। অবশ্যি আমি কিছু দেখি না—বাবাই সব।

দিব্য মাথা ঘুরিয়ে সোফার পেছনে লুকানো আধপড়া সিগ্রেটটা খোঁজে। ঝটপট লুকিয়ে ফেলেছিল। ওই তো আছে। মোজাইক করা মেঝে। ফ্যানটা জোরে ঘুরছে, যদিও দরকার ছিল না। সিগ্রেটটা হু হু করে পুড়ে যাচ্ছে।

মন্দিরা ট্রে থেকে প্লেটগুলো টেবিলে রাখতে রাখতে বলেন—তোমার জামাইবাবু শুনেছি বিলেতে থাকেন। তাই না? দিদিও তো ওখানে? সুকু বলেছিল।

শান্ত মাথা দোলায়। —হ্যাঁ। দিদি জামাইবাবু এসেছিলেন মার্চে। আবার আসবেন সেই পুজোয়। জামাইবাবু ইঞ্জিনিয়ার তো!

মন্দিরা দিব্যকে প্রশ্ন করেন—তুমি কী করো বাবা? সব বলেছে—মনে নেই। ঝটপট দিব্য বলে দেয়—ব্যাংকে চাকরি করি। বাবা মারা গেছেন। বোনটোন নেই। তিন ভাই। দুজনের একজন বম্বে, অন্যজন দিল্লী। মা বড়দার কাছেই থাকেন, দিল্লীতে। কখনও আসেন আমার কাছে। বছরে বার দু-তিন। .....তারপর হেসে ওঠে। ফের বলে—আমি মায়ের সুপুত্র নই!

—বালাই! বলতে নেই। বলে মন্দিরা তিরস্কারের ভঙ্গিতে হেসে ওঠেন। তবে কী জান বাবা? দস্যি ছেলের দিকেই মায়ের টান বেশি।

দিব্য ভাবলেশহীন মুখে বলে—আমার মা উল্টো বলেন। আমি আঁতুড়ে মারা গেলেই খুশি হতেন।

সুকুমার মুখটা ঘুরিয়ে নেয়। দিব্য কোথাও মানিয়ে চলতে জানে না। ওর কী যে স্বভাব! আর শান্ত দিব্যকে চুপি চুপি খোঁচা দেয়। দিব্য গ্রাহ্য করে না।

মন্দিরার মুখের হাসিটা কেমন বদলে গিয়েছিল যেন। কিন্তু তক্ষুনি জোরে আবার হাসেন—বুদ্ধিমতী মহিলা তিনি। বলেন—ও কথা কি বলতে আছে, ছেলে? মায়ের মন তোমরা ছেলেরা কী বুঝবে বল? ....হ্যাঁ, এসব আমাদের বাগানের আম। গাছপাকা আম। সব খাবে কিন্তু। ভাল লাগলে.....

দিব্য বলে—আরো চাইব। ভাববেন না! সুকু জানে, আমি বড্ড পেটুক।

মন্দিরা বলেন, আচ্ছা, আচ্ছা। দেখা যাবে ছেলে কেমন পেটুক। তারপর দরজার দিকে ঘুরে বলেন—তুই হাঁ করে কী দেখছিস? জলের গেলাস নিয়ে আয়। আর মালুকে বল্, চা হল নাকি।

সুকুমার বলে—খুকুকে চায়ের চার্জ দিয়েছ? ব্যাস, তাহলেই হয়েছে! মন্দিরা কান করে না সে কথায়। বলেন—আমার বাবা হার্টের একটুখানি গন্ডগোল আছে। ওঠা-নামা করা বারণ। ওপরে দেখতে এমন — শুধু খোসা। সুকু, জগাকে সবসময় থাকতে বলেছি তোর এখানে। জগা, থাকবি। কই চল, দেখি মালু কী করছে।

—খুকুর মেজাজ, কেন এমন হল, বল তো? সুকুমার বলে।

—ঝগড়া করেছিস নাকি? বলে হাসতে হাসতে পা বাড়ান মন্দিরা।

দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে বলেন—তাহলে ছেলেরা, আমি যাই। নিজের বাড়ির মত থাকবে অসুবিধে হলে বলবে। লজ্জা কোর না সব। সুকু, জগা থাকবে। ছোঁড়া বড্ড ফাঁকিবাজ। দেখবি। এ্যাই ছোঁড়া। আবার হাসি হচ্ছে দাঁত বের করে? চল্, জল নিয়ে আসবি। আর ছোটবাবুর দরজা থেকে নড়বিনে বলে দিচ্ছি।......

মন্দিরা চলে গেলে শান্ত বলে—তোর মা, রিয়েলি সুকু, অসম্ভব—মানে রিয়্যালি দারুণ ভালো রে! এমন মা পেলে—ওঃ! কী না যে করতুম!

দিব্য বলে—পাঁচটা সাবজেক্টে এম.এ দিতিস! শালা এম-এ-টি ম্যাট!

প্রাণ খুলে হাসে শান্ত। তারপর সুকুমারকে বলে—এম-এ-র পর ওই টি টা কী বুঝতে পারছিস তো সুকু?

সুকুমার বলে—টুকলিফাই? টুকে পাস? তাই না?

তিনজনেই হাসে। তারপর দিব্য বলে—হ্যাঁরে সুকু, শান্তর বাবার গেঞ্জির কারবার আছে, এটা তোর মাকে বলেছিলি কেন রে? তোদের বুঝি গেঞ্জির দরকার হয় খুব?

সুকুমার অপ্রস্তুত হয়ে বলে—না, এমনি। ক্যাজুয়ালি। মা আবার সব খুঁটিয়ে জানতে ভালবাসেন কিনা।

—তাহলে তোর দাদামশাই নির্ঘাৎ বিগ বিজনেসম্যান ছিলেন?

—হ্যাঁ। পুঁজিপতি বলতে পারিস। অভ্রের খনিও ছিল একটা। নীচের ঘরে ছবি আছে—দেখবি।

দিব্য সন্দেশ গালে পুরে বলে—নাও শালা এখন আঙুল শোঁকাবে। মাইরি, তোরা সুকু পাড়াগাঁর ছেলেরা যেন কী। এলুম ঘুরতে.....

শান্ত বলে ওঠে—এবং চরতে।

দিব্য বলে যায়—হ্যাঁ। গায়ে জ্বর বাধাল। তারপর ঘোরো ঘর থেকে ঘরে—ফ্যামিলি হিস্ট্রি শোন। বাপস্।

সুকুমার অগত্যা বলে—তুই বড় এ্যাগ্রেসিভ সবসময়। যাঃ!

অন্তত একমিনিট চুপচাপ থাকে সবাই। বাইরের বাতাস পর্দা ফাঁক করে বারবার এবং গ্রামীণ আকাশ, গাছপালা, ঘরবাড়ি ওতপ্রোত একটা অখণ্ডতা বারবার ভেসে ওঠে। কাক ও চড়ুই শব্দ করে কার্নিশে। কেমন যেন নির্লিপ্ত প্রাণহীন আর উদাস সময় বয়ে যায় এখানে—একঘেয়ে। দিব্যর হঠাৎ সব তেতো লাগে। সুকুমাররা এখানেই জন্মেছে, বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং এখানেই মরতে ভালবাসবে। শান্তর মনে অন্য কথা। সিঁড়িতে হাল্কা পায়ের শব্দ কখন শুনবে, ওই শব্দটা সম্পূর্ণ অন্যরকম - পৃথিবীর কোন শব্দের সঙ্গে মিল নেই, সে স্পষ্টই চিনবে কে আসছে।

তারপর দিব্য জল খায়। খেয়ে বলে,—রাগ করলি সুকু? হোস্ট তুই।

তখন সুকুমার জোরে হাসে। —আমিই এ্যাগ্রেসিভ। যাক্ গে, শোন্। চা খেয়ে তোদের নিয়ে বেরবো।

শান্ত ব্যস্ত হয়ে বলে—জ্বর গায়ে? না—না। শুয়ে থাকবি।

—বলছি, শোন না! যাব রিকশো করে। আগে ডাক্তারের কাছে! তারপর.......

—উঁহু। ডাক্তারকে ডেকে পাঠা।

—হেলথ সেন্টার ছেড়ে এখন ওঠার সময় নেই ডাক্তারের। উঠবেন সেই একটায়। লাইন দিয়ে আছে বাহান্ন হাজার পেশেন্ট। ছেড়ে এলে দরখাস্ত চলে যাবে হেল্‌থ ডিপার্টে।

শান্ত চিন্তিত মুখে বলে—সত্যি! তোদের মানে, পাড়াগাঁয়ের ডাক্তার ইজ এ প্রব্লেম। এখন মনে হচ্ছে কেন যে শালা ডাক্তারিটা পড়িনি। মামার পরামর্শ ছিল—অথচ আমার মাথায় ভূত চাপল।

সুকুমার বলে—ডাক্তারি পড়ে তুই গাঁয়ে আসতিস? আহা—চাঁদ!

—আলবাৎ আসতুম!

দিব্য বলে—বিশেষ করে সুকুদের গাঁয়েই!

সুকুমার বলে—কেন?

শান্ত দিব্যর কথার মানে টের পেয়েছিল। একটু রেগে বলে—তুই একটা ননসেন্স!

দিব্য বলে—গাঁয়ের জামাই হয়ে আসত নির্ঘাৎ। ভাবা যায় না।

শান্ত বালকের মত লজ্জায় কাঁচুমাচু হয়ে পড়ে। সুকুমার কিছু না ভেবেই হাসে। শান্ত চাপা গলায় বলে ওঠে—স্থানকালের সেন্সও নেই তোর!

এইসময় সিঁড়ির দিকের দরজার পর্দা তুলে ধরেছে জগা নামে চারকটা। চায়ের ট্রে দু'হাতে নিয়ে মধুমালা ঢুকছে। ঘরে পা বাড়িয়েই ঘোরে সে। জগাকে কড়ামুখে বলে ওঠে—পর্দা সরাতেও জানিসনে? এক্ষুনি পুড়ে যেতুম না? বুদ্ধু কোথাকার! আবার দাঁত বের করে হাসছিস যে?

সুকুমার বলে—ঢুকতে ঢুকতে ঝগড়া! তোর হয়েছেটা কী, শুনি?

থমথমে গম্ভীর মুখে মধুমালা সোফার সামনের টেবিলে ট্রে রাখে এবং চলে যেতে পা বাড়ায়। সুকুমার বলে—এ কী! চা ঢেলে দে! চলে যাচ্ছিস কেন? দিব্য বলে—আপনি বেশভূষা বদলেছেন মনে হচ্ছে?

মধুমালা সপ্রতিভ জবাব দেয়—আপনারাও বদলেছেন। তারপর পা বাড়ায় ফের।

সুকুমার ব্যস্তভাবে উঠে বসে।—খুকু, পরিচয় করিয়ে দিই তোর দাদাদের সঙ্গে।

মধুমালা দাঁড়িয়ে পড়ে। শান্ত বলে—দাঁড়িয়ে কেন? বসুন না।

সুকুমার বলে—ওকে আপনি টাপনি করছিস কেন রে? ছোটবোনকে আপনি! তুই বলবি। খুকু বোস।

দিব্য গম্ভীর হয়ে বলে—উঁহু। শী ইজ কোয়াইট্ এ লেডি! তুই ব্যাটা জানিসনে—আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ চলছে। খবরের কাগজ পড়িস? আসে এখানে?

সুকুমার বলে—ক্যালকেশিয়ানগিরি ছাড়। আজকাল সারা বাংলাই কলকাতা। কলকাতা আর কলকাতায় নেই। খুকু, এ হচ্ছে দিব্যেন্দু চক্রবর্তী। আর এ শান্তনীল রায় চৌধুরী। বলেছিলুম, চিবুকে দাড়ি থাকবে।

শান্ত দাড়ি খামচে ধরে কৌতুকের ভঙ্গী করে।—দ্যাটস্ স্ট্যাটাস্ সিম্বল!

মধুমালা বলে—আপনারা অত ইংরাজি বলেন কেন? বাঙালী না?

ঘর ফেটে পড়ে তিনটি পুরুষালি হাসিতে। শান্ত হাততালি দিয়ে বলে—সুকু! এ মাইরি জয়বাংলা। মানে ওপারে জন্মালে নির্ঘাৎ রোশেনারা হত!

দিব্য বলে—বাঙালী-বাঙালী ভাবটা মাঝে মাঝে ভালই লাগে। জয়বাংলা।

মধুমালা ভুরু কুঁচকে একটা কড়া কথা বলতেই যেন তৈরী হয়—কিন্তু বেমক্কা এসে পড়েন কোবরেজ মশাই। পর্দা তুলেই জগা তখন একই ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে তাঁর মূর্তিটি ভেসে ওঠে। কই সুকু? মোক্তারমশাই বলছিলেন—জ্বর হয়েছে সুকুর। শুনেই চলে এলুম। কী জ্বর? কেমন জ্বর?

ঘরে ঢুকেই থমকে দাড়ান।.....ও। এনারা বুঝি কলকাতা থেকে এসেছেন? তাই নাতনী তখন স্টেশনে যাচ্ছিল। নমস্কার, নমস্কার।

দিব্য ও শান্ত নমস্কার করে। হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। মূর্তিমান রসভঙ্গ। সেই ফাঁকে মধুমালা কেটে পড়ে। কোবরেজমশাই খাটে গিয়ে বসেন। সুকুমারের হাত টেনে নিয়ে পরখ করতে থাকেন। ঘরে আবাব স্তব্ধতা। সুকুমার খুবই গম্ভীর। বাবার ওপর রাগ হয়েছে। শান্ত তার দিকে চোখ টেপে। দিব্য উঠে যায় দক্ষিণের দরজায়। বাইরে টানা ছাদ। এলাকাটা অনেকখানি দেখা যায়। গাছপালার জটলা—তার মধ্যে বিদ্যুতের তার। দূরে চকচক করছে পীচের সড়ক উঁচু হতে হতে দিগন্তে মিশেছে। ট্রাক, বাস, সাইকেল রিকশো চলছে। হঠাৎ পৃথিবীটা খুব বড় লাগে দিব্যর—হঠাৎই মনে হয়, এখনও কতকিছু জানার ও দেখার আছে যেন। সব বিরাট ব্যস্ততা, হইচই, ভয়ঙ্করতম শব্দ চাপা দিয়ে খাঁ খাঁ শূন্যতার গ্রাস এখনও কোথাও স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাবে—সেখানে মানুষের ইচ্ছে অনিচ্ছে কামনা বাসনা হিংসা বা পাপের মূল্যই ধরা হয় না। হয়তো সেখানেই প্রকৃতি।....

এবং দিব্যর মনে হয়, যে ব্যাপ্তি চোখের সামনে দেখছে—তা তার মত মানুষকে খুব সহজেই অচিহ্নিত করে দিতে পারে। নিজের বুকে লুকিয়ে ফেলতে পারে। পৃথিবীটা এত বড় এর আগে টের পায়নি তো।

সে আশ্বস্ত হয়ে নিশ্বাস ফেলে.....

মধুমালা নীচে গিয়েই বেরিয়ে পড়ে বাড়ি থেকে। চওড়া রোয়াক থেকে নেমে ডাইনে ঘুরে প্রাঙ্গণে ঢোকে। চাঞ্চল্যটা জোর বেড়ে চলেছে মনে। কী একটা অস্থীরতায় ফুলছে। শেষ রাতের সেই স্বপ্নের প্রতিক্রিয়া আর নেই। কিন্তু নতুন উপদ্রব ঘটেছে। বেশ তো ছিল সব—হঠাৎ বেমক্কা কারা এল, ব্যালান্স নষ্ট হল, একটা পুরনো দুর্গের ওপর হামলা চলার মতো।

সেই কামিনী ঝোপটার সামনে দাঁড়াল সে। নাকে আঁচল ঢাকা। অসভ্য সব। গাছের গোড়াটা এখনও ভিজে আছে। বিষ! মরে যাবে না তো গাছটা? এসব গাছের সঙ্গে মধুমালার মন জড়িয়ে আছে—

নিবিড় ও গভীর সেই জড়িয়ে থাকাটা। এগুলো সে নিজের হাতে পুঁতেছে। নিজে জল দেয় দুবেলা। নার্সারি থেকে সার নিয়ে আসে। নতুন নতুন চারাও আনে। কিছু মরে যায়, কিছু বাঁচে ও বেড়ে ওঠে। ফুল ফোটে। যে বোগনভেলিয়াটা জানালার ওপরে ঝাঁকিয়ে বসে, লাল সাদা দুরকম ফুল ফুটেছে—তারই লাগানো। কেমন করে দিনে দিনে গাছ বাড়ে, নতুন ডালের আঁকুর গজায়, পাতা আসে, কুঁড়ি ধরে ও ফুল ফোটে—সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে। দেখলে অবাক লাগে না ব্যাপারটা! কোত্থেকে আসে ফুল? গত বর্ষায় লাগানো যুঁই ও বেলি মস্তো ঝাড় হয়ে ফুলে ভেঙে পড়ছে। সন্ধ্যাবেলা ম ম করে গন্ধে। কত কী মনে পড়ে যায়। কত কী ইচ্ছে জাগে। মনে হয়, কী যেন ঘটবে জীবনে - খুব শীগগির, হয়তো কাল কিংবা পরশু কিছু ঘটবে--যা ভারি ভাল, দারুণ সুখের। সুখ কী তা বোঝে মধুমালা, তার এই সুখ যেন মায়ের সুখ।......

রাগে আবার জ্বলে ওঠে সে। রোদ বেড়ে গেছে। এখন জল ঢালা উচিত কিনা বুঝতে পারে না। অথচ ওই অপবিত্রটা থেকে কামিনী গাছটাকে মুক্ত করতেই হবে। দেখ না, গাছটা বিব্রত মুখে দাঁড়িয়ে আছে। যেন বলছে—আমাকে চান করিয়ে দাও শীগগির। রামোঃ

আজকাল কী সব বিচ্ছিরি নির্লজ্জ অভ্যাস লোকের—দাঁড়িযে ওই কম্মটি সেরে নেয়। স্কুল যাবার পথে ওই নিয়ে মেয়েরা কত হাসাহাসি করত। কেউ বলত প্যান্ট পরা লোকের পক্ষে বসাটা কষ্টকর। তাই। আহা বেচারা! আবার খিলখিল, হাসি।

কিন্তু বরাবর কলকাতার লোকের ওপর মধুমালার রাগ। ঠিক কবে থেকে এই রাগের শুরু মনে নেই। শুধু মনে হয় ওরা বড্ড চালিয়াৎ। কেমন চোখে তাকায় দেখেছ? যেন সবজান্তা মহাপুরুষ। এঁচোড়ে পাকা হাবভাব। দাদার বন্ধুরা বরাবর এসেছে কলকাতা থেকে। সুকুমাব এম.এ পড়ার সময় ওখানে হোস্টেলে থাকত। ছুটিছাটায় ওর সঙ্গে কেউ কেউ আসত। একেকটি একেকরকম সঙ যেন। সবতাতেই হাসি, ঝটপট মন্তব্য, হুল্লোড়। জগার কাছে শুনেছিল, দাদা ও বন্ধুবা নাকি রাতে লুকিয়ে বিলিতী মদ খায়। দাদা মাতাল হয়, এটা অবিশ্বাস্য। জগাকে ধমকেছিল মধুবালা –খবরদার, আমি শুনলুম শুনলুম। বাস্। খুব ভয় ছিল, ছোঁড়াটা যা ভাবলা! কথা চাপা রেখেছে জগা। আজ অব্দি কেউ টের পায়নি। কিন্তু মধুমালার খালি মনে হত, দাদা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। রামবাবুর ছেলের মত কবে রাস্তায় মাতলাম করবে! ইস্, ভাবা যায় না! মাতালদের খুব ভয় আর ঘেন্না করে যে মধুমালা! রাস্তাঘাটে মাতাল দেখলে খুব ছেলেবেলায় ভয়ে সিঁটিয়ে যেত। একবার স্কুল থেকে ফেরাব পথে হরেনবাবু মাতাল হয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন—দুহাত তুলে। অমনি দিশেহারা হয়ে ফ্রকপরা মধুবালা পালিয়েছিল, গাঁ ছেড়েই বলা যায়—মাঠ দিয়ে নদীর ধারে ধারে ঘুরে বাড়ি ঢুকতে সন্ধ্যা। সেদিনের আতঙ্ক এখনও মন থেকে যায়নি। তাই দাদার মদ খাওয়া নিয়ে তার আপত্তি হয়েছে। ভেবেছে চোখ বুজে ওকে বলে ফেলবে কথাটা—নিষেধ করবে। কিন্তু পারেনি। দাদাকে অন্যসব ব্যাপারে যত কড়া কথাই বলুক, দাদার সামনে দাঁড়ালে এখনও দাদাকে দেবতার মতো লাগে। দাদা তো টের পায় না, তার বোন তার জন্যে প্রাণ দিতে পারে হাসিমুখে। মায়ের কাছে শুনেছে, তিন তিনটে সুন্দর সুন্দর খোকার পর সুকুমার এল কোলে। কত মানত, কত পুজোআচ্চা, কত ধর্নার পর বেঁচে আছে সে। এম. এ. পড়তে দূরে যেতে হবে বলে মায়ের সে কি কান্নাকাটি! মধুমালাও তো কত কেঁদেছিল গোপনে। সব গুছিয়ে সুকুমার বেরুচ্ছে, খুকু কোথায়? খুকুর পাত্তা নেই। মদন বলে—দেখুন গে, ঝোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে—বাগানে। জবাফুলের ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে কাঁদছিল খুকু। চোখ দুটো ভেসে যাচ্ছে, এত কান্না!

তারপর তো সুকুমারের এম. এ. পড়া শেষ হল। বাড়ি ফিরে এল। তারপর প্রায় এই একটা বছর ওর কোন বন্ধুবান্ধব আর আসেনি। হঠাৎ এতদিনে এই দুজনের আবির্ভাব। চিবুকে দাড়ি যার—তাকে মানিয়ে নেওয়া যায়, গায়ে পড়া ভাব আছে এবং ভদ্র বলেই মনে হচ্ছে—কিন্তু এই ঢ্যাঙা ফর্সাটা যেন কেমন। গম্ভীর-গম্ভীর ভাব—মেপে কথা বলে। ভদ্রতার ছলে কূট কাটে। আর চাহনিটা কেমন যেন ভাসা ভাসা—একটা বিশাল ফাঁকা, তোমাকে দেখছে অথচ দেখছে না—গ্রাহ্য করেও করছে না। নির্বিকার মুখ। দেখ না, কেমন বেপরোয়া, এত চমৎকার ফুলগাছটার গোড়ায় প্যান্টের বোতাম খুলে....নির্লজ্জ কোথাকার! দাদার বন্ধু না হলে এবং এ বাড়ি না হলে বিচ্ছিরি অপমান করে

ফেলত মধুমালা।

মধুমালা ছটফট করে এগিয়ে যায় জানালার কাছে। চেঁচিয়ে ডাকে—মদনদা! মদনদা আছে? মা! মা!

জানালাটা খাবার ঘরের। ডাইনিং টেবিল আছে, আবার পিঁড়ির ব্যবস্থাও আছে। ওপাশেই কিচেন। কিচেন ও কিচেনের বারান্দায় জোরালো আয়োজন এবং ব্যস্ততা। কলকলানি শোনা যাচ্ছে। ঝি-ঠাকুর-চাকর কলকল করছে। এর কোনো মাথামুণ্ডু নেই। মাঝে মাঝে কর্ত্রীর গলাও শোনা যাচ্ছে। মধুমালা বিরক্ত হয়ে বলে—যেন ভোজ লেগেছে। শ্রাদ্ধ হবে। বাব্বাঃ! এত ডাকছি, সাড়া নেই। মা! মদনদা!

ভেতরে মন্দিরা শুনে বলেন—দেখ তো মালু কেন ডাকছে!

কেউ বলে—মদনকে ডাকছে। মদন, ডাক পড়েছে রাজকন্যের! যা মাথা কাটবে।

তরপর অনেকগুলো হাসি। কথাটা বলেছে চারুঠাকুর। রোস, দেখাচ্ছি মজা। তারপর মদন এসে উঁকি মারে।

—হাঁ করে কী দেখছ? এক বালতি জল আন। গাছ ধোব।

হুকুম দিয়েই মধুমালা আবার কামিনী ঝোপের কাছে চলে আসে। দুঃখ ও রাগ নিয়ে তাকায়। মনে-মনে কথা বলে গাছটার সঙ্গে।—লক্ষ্মীসোনা একটুখানি থামো। তারপর তোমাকে ছোঁব। গাছটা যেন খুশিতে নড়ে ওঠে। শনশনিয়ে বাতাস আসে। শাখায় পাতায় ব্যাকুলতা নিয়ে এই বাগানের মালিনীর দিকে তাকিয়ে থাকে। যেন বলে—তোমাকে আমারা ভালবাসি...

দিব্য ঘুরতে ঘুরতে তখন দক্ষিণের ছাদ হয়ে পশ্চিমের ছাদে। সাড়ে তিন ফুট উঁচু কার্নিশের দেয়ালে শরীর ঠেকিয়ে নীচের বাগান দেখছে। মধুমালার কাণ্ড দেখছে। মধুমালা জল ঢালছে একটা গাছের গোড়ায়। দিব্য বুঝতে পেরেছে, কেন। সে প্রথমে হাসে। তারপর গম্ভীর হয়। তাবপর নির্বিকার তাকিয়ে থাকে। উদ্দেশ্যহীন।

খালি বালতিটা হাতে নিয়ে ঘোরে মধুমালা। তারপর মুখ তুলে দেখতে পায় দিব্যকে। একটু চমক খায়। সেই অপ্রতিভ ভাবটুকু যেন ঢাকতেই ফিক করে হেসে ওঠে।

সূর্য দক্ষিণে ঘুরেছে একটু। পূব-দক্ষিণ কোণায়। মধুমালা দাঁড়িয়ে পড়েছে। সে উত্তর-পশ্চিমে। সরলরেখায় তীব্র আলো তার মুখে গিয়ে ভেসে যাচ্ছে, গড়িয়ে পড়ছে যেন। উজ্জ্বল মুখ এবং ছোট্ট একটু হাসি।

দিব্যর চোখ—বিশাল দৃষ্টি জ্বলে যায় মুহূর্তের জন্যে। কী সুন্দর মেয়েটা। আর অত উঁচুতে ছাদের ধারে আকাশের বুকে একটা ফর্সা ঢ্যাঙা মূর্তি, পাঞ্জাবি জোরালো বাতাসে কাঁপছে, মধুমালার মনে অবচেতন একটা বিহ্বলতা ছুটে আসে, একটা ঝিলিকের মতো—এবং হঠাৎ তার মনে হয়—কে ও? এবং তক্ষুনি সে লজ্জায় কাঠ হয়ে যায়।

মুখ নামিয়ে প্রায় দৌড়ে খিড়কির দরজার দিকে চলে যায় সে। খালি মনে হয়—কী যেন ঠিক হয়নি, উচিৎ ছিল না এমনটা।

আর দিব্যর চোখে মেয়েটা তখনও ধরা! উজ্জ্বল সৌন্দর্য একটা। যেন পৃথিবীর কেউ নয়। ভিড়ের নয়। রাস্তার নয়। নির্জনতার ও স্তব্ধতার। গাছপালাব শ্যামল শরীর থেকে বেরিয়ে আসা—যেন কতকাল আগে জন্মেছে, মৃত্যুহীন। তার জন্যে কি কোন প্রতিশ্রুতি ছিল?...

তরপব ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে। রাস্তাটা দেখা যায় না গাছের আড়ালে। গেটের দিকে ঘোরে। জিপের শব্দ কি? জিপটা...না, সামনে দিয়ে চলে গেল। ধোঁয়া উড়ছে কোথাও। পাখি চক্কর দিচ্ছে। জিপের আওয়াজ বুকের ভিতর গরগর করতে করতে মিলিয়ে যায়।

ও কিছু না, বলে দিব্য সরে আসে। বেরোতে হবে, ঘুরতে হবে টো-টো করে—এবং সেইসব নির্জনতায় ভাবতে হবে নিজের ভবিষ্যৎ। এমনভাবে চুপচাপ খেতে আর সুকুমারের নির্বোধ কথাবার্তা শুনতে সে আসেনি।

ঘরে তখনও সেই বুড়ো লোকটা বসে আছে। বকবক করছে শান্তর সঙ্গে। শান্ত বলছে—আপনি ঠিকই বলেছেন দাদু। আমি তো এ্যানসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান হিসট্রির ছাত্র। আয়ুর্বেদ যে কী, ভাবা যায় না। গভমেন্ট রিসেন্টলি এসব স্কিমটিম করছে। কত আগে করা উচিত ছিল। আপনাকে এ্যাপয়েন্টমেন্ট

দিতে বাধ্য। দরখাস্ত করে দিন। স্কিমটার কথা আমি জানি। প্রতি ব্লকে একজন হোমিওপ্যাথ, একজন এ্যালোপ্যাথ, একজন আয়ুর্বেদী...

দিব্য বলে—ইয়ে, সুকু! তোদের বন্দুকটা দিবি? বেরোব।

সুকুমার বলে—তুই...হ্যাঁ। তুই তো রাইফেল ক্লাবের মেম্বার ছিলি। ভুলে গেছলুম। দাঁড়া, ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। মদনকে দিচ্ছি সঙ্গে। নদীর ওপারে চলে যাবি। ড্যাট! আমার হঠাৎ জ্বর হয়ে গেল।

তিন

ঘন গাছপালা ঘেরা জায়গাটা। মধ্যে একটা ডালপালা ছড়ানো বট দাঁড়িয়ে আছে সবার ওপরে। একটা পুরানো মন্দিরের গা ফাটিয়ে সে উঠেছে। মন্দিরের ছোট ইট দেখেই বোঝা যায় বহুকালের। একটা পাথরের ফলক আছে দরজার ওপর। পড়া যায় না। ভিতরে কোন মূর্তি নেই। ইটের স্তূপে ঝোপ গজিয়েছে! সামনে খানিকটা তকতকে ঘাসবিহীন মাটি। উঁচু একটুকরো বারান্দায় ইটের টকরো, ধ্বসের সব লক্ষণ জড়ো। তার উপর ছোট ছোট মাটির ঘোড়া পিদিম, শুকনো ফুল, সিঁদুরের ছোপ।

প্রণাম সেরে মদন বলে—ইনিই আজ্ঞে কপালীতলা! এখন পিতিষ্ঠা হয়েছেন গাঁযের মধ্যিতে।

দিব্য দোনলা বন্দুকটা কাঁধ থেকে নামায়। মাটিতে কুঁদো রেখে নিজেব গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড করায়। এখন হঠাৎ গুলি ছুটলে চিবুকের তলা দিয়ে মগজ ফুঁড়ে বেরোবে। কিন্তু অটোমেটিক নয়। সে সিগ্রেট ধরায়। একটু হেসে বলে—তুমি ভূত দেখেছ মদন?

মদন হসে। দেখেছে, তা বলার জন্য তৈরী হচ্ছে বোঝা যায়। এই লোকটা বড অদ্ভুত। বাড়িতে কেমন নির্বাক যন্ত্র মনে হচ্ছিল। নদী পেরিয়ে আসা অব্দি তেমনি থেকেছে। তাবপর এই জঙ্গলে ঢুকেই মুখ খুলেছে তো খুলেছে—কিছুতেই থামছে না। একেবারে বাঘা গাইডদেব একটি গ্রাম্য নমুনা। মনে হচ্ছে, এই সব জনহীন জায়গায়, উদ্ভিদ ও মনুষ্যেতর প্রাণীদের সব খবব তাব জানা। সে যেন ওদেরই কেউ। সুকুমারদের লোক। সুকুমার জানে বলেই ওকে পাঠিয়েছে, তা বোঝা যায়। প্রতিবাব পা ফেলেছে, আর একটা করে নৈসর্গিক ঘটনা—যা নিসর্গে ঘটে এবং ঘটেছে, তার নিপুণ বর্ণনা দিচ্ছে। একটু আগে শিরিস গাছটার ডালে হনুমান মারার গল্প শুনিয়েছে। ওখানে একটা কেযা ঝোপেব বাসিন্দা একটা সাপের কথাও বলেছে। বলেছে কবে একটা শেয়াল দাঁত ছরকুটে মারা পড়েছিল প্রচন্ড ঝড়বৃষ্টিতে। অথচ এই লোকটা মানুষের পরিবারে ও ভিড়ে বোবা হয়ে যায় ! কেন?

মদন ভূতের গল্প শোনায়। ঠিক ভূত নয়, ডাকিনীর। এই বটগাছে একটা ডাকিনী দেখেছিল। জ্যোৎস্নারাতে উলঙ্গ শরীরে চুল খুলে বসে চেরা গলায় গান গাইছিল। দুঃখের গান। এই ডাকিনীটার যে কামিখ্যে ফেরা হয়নি—আটকে পড়েছিল এখানে। সে আলাদা গল্প। .

শান্ত এল না। ও এইরকমই। বলল—বাপ্‌স! জঙ্গলে মাঠে এই বোদ্দুবে ঘোরা আমাব পোযাবে না। তুমি যাও—তুমি তো এক্সপার্ট গানম্যান এবং সুকুমার ঠাট্টা করে বলল—এ্যান্ড গ্যাংস্টার।

—আলবাৎ! শালার কট্টুকু তুই জানিস সুকু? খাঁটি ম্যাকসিক্যান মাল, মাইরি। দুহাতে রিভলবাব চালাত সিক্সটি সেভেনে। তখন বাঞ্চোৎ ছিল একটা পলিটিকাল পার্টির এ্যাকশান স্কোয়াডে। কিন্তু কী ভাবে পরে যে সব ম্যানেজ করে বেরিয়ে এল, ভাবা যায় না! একেবারে উইদাউট এনি স্পট—মাইরি! সে সব তুই জানিস নে। বলব'খন।

—আত্মীয়টাত্মীয় নিশ্চয়ই পুলিশের বিগ স্পাই ছিল?

—আই থট্ দ্যাট্। শালা তো বলবে না খুলে! এ্যাই দিব্য, খালি হাতে ফিবলে কিন্তু বন্দুক কেড়ে শুট করব জেনে রাখ। যা—উইশ্ ইউ গুড্ লাক্।

দিব্য একটু হেসে চলে এসেছে। শান্ত কিসের যেন তালে আছে। আবছা মনে হয়েছে তাব। ওই তো এতটুকু মেয়ে, বন্ধুর ছোট বোন। সেন্স নেই শালার। হঠাৎ দিব্যর মনে পড়ে যায়, সুকুমারের মা যেন খুব ইন্টারেস্টেড শান্তর ওপর। জামাই করবেন নাকি! ওই বেঁটে দেড়েল ক্লাউন ফুলপরীটাকে বিয়ে করলে কুকুরের মত গুলি করব বাঞ্চোৎকে! এদিকে বয়সের গাছপালা নেই, প্যান্টে সাতটা পকেট নিয়ে ঘোরে—ওদিকে বাবা গেঞ্জীর কারবারী!

দিব্যর মাথার ভিতরে মৌমাছি ঢুকে পড়েছিল। নদীর ধারে এসে সেটা ফুড়ুৎ করে বেরিয়ে গেছে।

কী সুন্দর নদী! খাত ভরতি সোনালি বালি, তার মধ্যে রাস্তা খুঁজে খঁজে একফালি ভীতু কালো স্রোত এগিয়ে গেছে বাঁকের দিকে— ওখানে রেলব্রীজ আছে। আসার সময় ট্রেন থেকে দেখতে পেয়েছিল। ভাল লেগেছিল। কেন নদী দেখতে ভাল লাগে মানুষের? পাহাড় সমুদ্র আকাশ বন এবং জীবজন্তু? মানুষ তো এখন হাড়েমজ্জায় পুরো শহরের প্রাণী। ভিড়ে বেঁচে আছে। ভিড়ে খাচ্ছে ঘুমোচ্ছে বেড়াচ্ছে। বেশ আছে সব। অথচ হঠাৎ মাঝে মাঝে হার্টে খেঁচুনি অথবা মগজ কামড়ানো কী এক ব্যথা দপ দপ করার দরুণ ছুটিছাটায় ছোটো নদী সমুদ্র আকাশ পাহাড় বনে—দ্বীপপুঞ্জে, তুষারে, কাশ্মীরে, নৈনিতাল এলিফ্যান্টা গুহা। নস্টালজিয়ার কারবার। নেচার টানে।

—বাবু, বাবু। হরিয়াল।

হঠাৎ অরণ্যমানুষটা ওর বাহুর কাছটা উত্তেজনায় চেপে ধরে, দিব্য এত চমকেছিল যে বন্দুকটা পড়ে যেত এবং হয়তো সেফটি ক্যাচে চাপ লেগে গুলি বেরিয়ে একটা দুর্ঘটনা ঘটে যেত। একজন মরত, তাতে ভুল নেই। পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জে পাখি মারা ছররাও মরটাল ডোজ।

বিরক্ত দিব্য অভিজ্ঞ হাতে খপ করে নলটা ধরে সামলায়। এ ব্যাটা কেমন করে জানবে হরিয়াল মারা বেআইনী। বন্য পশুপাখি সংরক্ষণ আইনের আওতায়, ঘুঘুজাতীয় পাখি হরিয়ালও পড়ে। অবশ্য এই গ্রামাঞ্চলে আইন ব্যাপারটা কতটা উদ্ভট, দিব্যর কিছু অভিজ্ঞতা আছে। সাতষট্টিতে মেদিনীপুরের গ্রামে কয়েকটা মাস ঘুরেছিল। তখন অন্য দিব্য সে। দিনের পর দিন একইভাবে একঘেয়ে কথাবার্তা আর কাজে সে ক্লান্ত হয়েছিল। ঘেন্না ধরে গিয়েছিল। সবটা যেন নিছক এ্যাডভেঞ্চারের ভঙ্গী। তার রক্তে এ্যাডভেঞ্চারার হওয়ার ব্যাপারটা নেই। সে আবিষ্কারক হতেও চায় না। পাহাড়ের চূড়ায় উঠে এত কিসের অহঙ্কার কিছুতেই তার মাথায় ঢোকে না। দুর্গম জায়গায় অভিযান—মেরুবিজয় যেমন, এতে কি ক্রেডিট, কিসের আনন্দ সে বোঝে না। তার সেই পলিটিক্যাল জীবনটাও তেমনি উদ্দেশ্যহীন ও বিস্বাদ লেগেছিল। রাতারাতি পালিয়ে এসেছিল। তারপর ভিড়ে মিশে যাওয়ার মতো থেকে গেল। একেবারে নন এ্যাকটিভ হয়ে ওঠায় তার কোনদিক থেকে বিপদ আসেনি।

– যাঃ! উড়ে গেল, বাবু। নিরাশ হয়ে মদন বলে। উঁকি মেরে আছে তখনও—দু-হাঁটুতে হাত দিয়ে কুঁজো হয়ে আছে।

দিব্য বলে—চলো, অন্য কোথাও যাই।

মদন পা বাড়িয়ে বলে—বাঁওড়ের দিকে চলুন। ছুটকোছাটকা হাঁস থাকলেও থাকতে পারে।

—ছুটকোছাটকা মানে?

মদন কথা বলতে গেলেই দাঁড়ায়। এই ওর বিরক্তিকর অভ্যাস। সে বলে—কালীপুজোর পর থেকে হাঁস আসা শুরু হয়, বাবু। হর্দম শনশনানি মাথার ওপর। ধান পাকার পরও দু'একটা মাস থাকে। গাজন অব্দি দু'একটা ঝাঁক থেকে যায়। তারপর পালায়। শুনেছি পাহাড়ে পালায়।

আঃ। কী যেন বললে ছুটকোছাটকা।

—সেই তো বলছি। কীভাবে এটা হয় কে জানে, দলছাড়া হয়ে থেকে যায় দুটো একটা। কিছুতেই যায় না। এত বড় আশ্চয্যির কান্ড বাবু! আমার মনে হয় কী জানেন? ওরা যেতে পারে না আসলে। দলছাড়া হয়ে তখন দলকানা অবস্থা। কোনপথে যাবে, জানে তো সেই দলপতি। নাকি যা-ও যেতে পারত। ছাস্তির ভয়ে যেতে পারে না। তখন এদিকে জল শুকিয়ে কাদা হচ্ছে—মাটি জাগছে বিলের তলায়। জলচরা পাখি, অবস্থাটা বুঝুন বাবু। বেচারা এখান থেকে ওখানে ছটফটিয়ে বেড়াচ্ছে। কোথাও জল নেই। শেষে গাঁয়ের দীঘিতে গেল।

—তুমি দেখেছ এমন?

—কতবার দেখেছি। সবাই দেখেছে। তা শুনুন—সেবার দীঘিতে গিয়ে আশ্রয় নিলে বেচারা। যে দেখে, সেই মেরে খাবার মতলব আঁটে। কথাটা কানে গেল মোক্তারবাবুর। দীঘির পাড়ে গিয়ে হুকুম দিলেন, এ হাঁস যে মারবে তার মাথা নেব। ভয় করে সবাই ওনাকে। তারপর হাঁসটা থাকে। থেকে চরে-ফিরে খায় আঘাটায়। দামের মধ্যে ভেসে বেড়ায়। কী সুন্দর লাগে বাবু। বুনো জলহাঁস—কৈলাসে যার জন্মো, বাবা মহাদেবের দেশ। তখন গাঁয়ের অতিথি হয়েছে।.....

দিব্য অবাক হয়ে তাকায় ওর দিকে। বলে—ঠিকই বলেছ, মদন। কৈলাস! মার কৈলাস!

—মোক্তারবাবুর কাছে শুনেছি আজ্ঞে।

—তুমি সেই হাঁসটার কথা বলো, মদন। শেষে কী হল?

—সেটাই আশ্চয্যি, বাবু। দীঘির জল বারোমাস থাকে। কিন্তু একদিন সকালে আর তাকে দেখা গেল না। কেউ বলল পালিয়েছে কাছাকাছি কোন পুকুরে। যেসব পুকুরে জল ছিল, তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল। মোক্তারবাবুর তখন জোয়ান বয়েস। এ-গাঁ ও-গাঁ নিজেও খুঁজলেন—পঞ্চগ্রামী পর্যন্ত হল। সে কত লোক জমল বারোয়ারিতলায়।

—বল কী? একটা হাঁসের জন্যে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তখন গাঁয়ের মানুষ অন্যরকম ছিল, বাবু।

—হাঁসের কথা বলো, মদন।

দুঃখিত মুখে কয়েক মুহূর্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকার পর মদন বলে—আঃ!

— কী হল!

দীর্ঘশ্বাস ফেলে লোকটা বলে—বলি, বাবু। হাঁসটা যেন সারা গায়ের চোখের মণি হয়ে উঠেছিল। অন্যপাড়া থেকে ভাল পুকুর ফেলে সবাই দীঘিতে নাইতে আসত। কেন? না—হাঁসটা দেখবে। বিকেলবেলা ছেলেপুলেরা পাড়ে বসে বসে দেখত। ঢিল ছুঁড়লে মেয়েরা তাড়া দিত। বউ-ঝিবা কেউ কেউ মানত দিত লুকিয়ে—হাঁসটার জন্যে না জানি কোন দেবতা এসেছে। আর সে বছর বড় সুলক্ষণ কপালীতলায়। ভাল ফসল হয়েছে। সুফলা বছর। বিবাদ কমেছে। লোকেব মুখে হাসি। বলুন, মানত দেবে না? বউ-ঝিরা একগলা জলে দাঁড়িয়ে তাকে প্রণাম করত, বাবু।

—তারপর?

—হাঁসটা যেন অদেশ্য হয়ে গেল। আর পাত্তা মিলল না। পঞ্চগ্রামী করাই সার হল। কে মেবে খেল, জানা গেল না।

দিব্য চমকে উঠে বলে—মেরে খেল?

—হ্যাঃ। মাঠে—ওইখানে ডানাপাখনা পাওয়া গিয়েছিল। রেতের বেলা লুকিয়ে মেরেছিল, বাবু। আর তার অভিশাপও লাগল। হ্যাঁ—দারুণ অভিশাপ। পরের সনে খরা। আকাল। সে আকাল বড ভয়ঙ্কর হয়েছিল, বাবু। পঞ্চাশ সনের সেই আকালের কথা আর কী বলব।

—হ্যাঁ, তেরেশো পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের কথা জানে দিব্য। তখন তার জন্মই হয়নি। সে জন্মেছে তার আরও পাঁচ বছর পরে। পঞ্চাশ লাখ লোক না খেয়ে মরেছিল। তবু কেড়ে খায়নি।.....

তক্ষুনি নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলে—তোমার গল্পটা খুব ভাল লাগল মদন।

—এ গল্প বাবু, খুব দুঃখের।

— তা তো বটেই।

আবার হাঁটতে থাকে সে। একটু পরে বলে—কিন্তু আমি জানি বাবু, কে হাঁস মেরেছিল।

—জানো? বলনি কেন?

মদন কেমন হাসে। ঘাড় নাড়ে। তারপর কল্কিফুলের ডালপালা একহাতে টেনে রাস্তা করে দেয় দিব্যকে। দিব্য বাঁধে ওঠে। তারপর মদন বলে—বললে মেয়েটাকে গাঁছাড়া করত। চুল কেটে নিত। গরীব লোকের বউ, ছোটজাতের ঘরে জন্মো। কিন্তু রূপসী ছিল বলে। বাবুবাড়ির মেয়েরাও অমন হয় না। তিনটে স্বামীর ঘর পালিয়ে তখন বাবার ঘরে এসেছে। ওর বড় লোভ ছিল, বাবু—বিষম লোভ। মানে—ওই পদ্মর।

দিব্য হেসে বলে—পদ্ম নাম বুঝি?

মদন খিকখিক করে হাসে—কেমন রহস্যের আঁচ মুখে।

দিব্য বলে—তোমার সঙ্গে ভাব ছিল না?

মদন লজ্জা পায় একটু, তারপর জোরে মাথা দোলায়।

—ভ্যাট্। তুমি চেষ্টাই করনি বলো।

মদন জিভ কেটে বলে—কী যে বলেন! এখন বুড়ো হয়েছি—চুল পেকেছে। মোক্তারবাবুর ঘরে জেবনটা কাটিয়ে দিলুম। সে পুরনো কথা বলতে গেলে নিজেরই হাসি পায়। আমি পদ্মকে ওই বাঁওরে

একদিন একা পেয়ে বললুম—হাঁস খেয়েছ, জানি। পদ্ম হাতে-পায়ে ধরতে লাগল। তারপরে......

—থামলে কেন? আমি বাইরের লোক। কাকেও বলতে যাচ্ছিনে।

—যা হবার হল, আজ্ঞে। বলে লোকটা ফ্যাক ফ্যাক করে হাসতে থাকে।

এই গরিলাটা রূপসী পদ্মকে ব্ল্যাকমেল করত। একটা বুনো হাঁসের জন্যে। ভাবা যায় না এত অদ্ভুত ব্যাপার। এই লোকটা ব্ল্যাকমেলার। এই লোকটাই একটু আগে সেই হাঁসটার জন্যেই কি দীর্ঘশ্বাস ফেলছিল—দুঃখ করছিল? হয়তো না—সেই গ্রাম্য যৌবনটির জন্যে। সেই স্মৃতির নস্টালজিয়া, বিষণ্নতা। একটা দলভ্রষ্ট বুনো হাঁসের সঙ্গে একটি যুবতীর রক্তমাংস ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে ওর স্মৃতিতে।

মদন ফের বলে—তবে আকালে পদ্মর দশা হল চূড়ান্ত। অভিশাপ, বাবু। বাপের সঙ্গে শহরে পালিয়ে গিয়েছিল। শুনেছি, কোলকাতার হাড়কাটা না কি গলি আছে—সেখানে থাকত। এ্যাদ্দিনে আর বেঁচে থাকার কথা না। বিষ শরীলে নিয়ে মেয়েমানুষ বাঁচে না, বাবু।

—তুমি কি ওর জন্যই বিয়ে করোনি?

—আমি? হা হা করে হাসে উজ্জ্বল রোদে একটা আদিম মানুষ। মাথা দোলায়। তারপর হনহন করে হাঁটতে থাকে।

দিব্যর মাথায় উড়ে বেড়াচ্ছে একটা দলভ্রষ্ট বুনোহাঁস—তারপর ছলাৎ শব্দ কোন জনহীন দুর্গম জলায়, সেখানে নীল রঙের অদ্ভুত অন্ধকারে তার পাখনার শব্দ। হঠাৎ সে কেঁপে ওঠে। ভয় পেয়ে যায়। দলছাড়া হাঁসটা—প্রাণবন্ত, চঞ্চল গোঁয়ার, উদ্দেশ্যহীনতায় আক্রান্ত বুনো হাঁসের ভবিষ্যৎ কি সবারই সমান? কিছুতেই বাঁচানো যায় না তাকে?

হঠাৎ রূঢ় স্বরে সে বলে ওঠে—রোদে ঘোরাচ্ছ কেন? কোথায় তোমার হাঁস?

মদন ভ্যাবাচ্যাকা খায়। আস্তে বলে—আসুন তো দেখি। আপনার—ওরও বরাত।.....

বেলা যত বাড়ছে, মধুমালা টের পাচ্ছে, সেই চাঞ্চল্যটা বেড়ে যাচ্ছে। মনের এই ছটফটানি কেন সে একটুও বুঝতে পারে না। তখন বার বার সেই শেষ রাতের স্বপ্নটাকেই দায়ী করে। স্বপ্নটার ওপর রেগে যায়। তত লজ্জায় আড়ষ্টও হয়। অথচ সারাক্ষণ চঞ্চলতার মধ্যেও কী একটা চাপা সুর—অর্কেস্ট্রার জাঁকালো স্বরের মধ্যে একটা নরম সূক্ষ্ম চিনচিনে কাঁপাকাঁপা সুর—সুখের। সেই সুরটা সবার থেকে আলাদা—আড়ালের। একলা-একলি সুখের এই বুঝি স্বাদ।

সে রান্নার আয়োজনে ভিড় বাড়াতে গেছে। কিছুক্ষণ পরে ভাল লাগেনি। মা বললেন, দাদার ওখানে যা। মাথাটাথা ধরছে দেখগে। ট্যাবলেট লাগবে নাকি। আর জগাই ডাক্তারকে খবর দিয়ে এসেছিল—তুই বরং একবার যা রে। এক ফাঁকে দেখে যাক্। এমন দিনে জ্বর। দেখে আয়, মালু।

দিনটা কিসের, মধুমালা বোঝে না। ভারি তো দুটো সঙের মূর্তি এসেছে কলকাতা থেকে—ধন্য করে দিয়েছে মোক্তারবাবুর বাড়িকে। মধুমালা ইতিমধ্যে বলতে ছাড়েনি—দুই জোকার। ওরাই আবার দাদার বন্ধু—ফ্রেন্ডস। বুজুম ফ্রেন্ডস্। হাসতে হাসতে এও বলছে—লরেল-হার্ডি মা! একজন ঢাঙা অন্যজন বেঁটে। লরেল-হার্ডির ছবি তো দেখনি। হাসতে হাসতে মরে যাবে।

মন্দিরা বলেছেন—আঃ কী হচ্ছে। শুনবে যে।

—হুঁ, বয়ে গেল! একজন আবার বন্দুক নিয়ে বাঘ মারতে গেলেন। শেয়াল ডাকলেই ভিরমি খেয়ে না পড়েন। তখন দেখবে মদনচন্দ্র কাঁধে বয়ে নিয়ে আসছে। আমি তাই বলে ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছিনে বাবা!.....

এই সময় প্রমথ এসেছেন বাইরে থেকে। কী রে খুকু? এত লেকচার দিচ্ছিস কিসের?

বাবাকে একটু সমীহ করে মধুমালা। জিভ কেটে সরে পড়েছে। নিজের ঘরে কিছুক্ষণ রেকর্ডপ্লেয়ার বাজিয়েছে। আওয়াজ চড়িয়ে দিয়েছে। কমিয়েছে, আবার চড়িয়েছে। তারপর পাঁচ মিনিট খাটে চিত হয়ে পড়েছে। দু'হাত ওপরে তুলে চোখ বুজে পা দুটো নাচিয়েছে। ভাল লাগছে না—কিছু ভাল লাগছে না। কোথায় যাই, কী করি, এইরকম ছটফটানি শুধু।

উঠে একটা পত্রিকা পড়তে চেষ্টা করেছে। পড়তে ভাল লাগে না। ছবি দেখছে। সিনেমাস্টারদের ছবি। তাও ভাল লাগছে না। তখন আলমারি ভর্তি পুতুলের রাজ্যে দৃষ্টি ফেলল। ধুর! ওকি আর মানায়

তাকে? এখন তাকে দেখলেই পুতুলগুলো ভয়ে যেন পাংশুটে হয়ে প্যাটপ্যাট করে তাকায়। আলমারি খুলে স্প্রীঙের বড় পুতুলটা বের করে সে। দম দিলে হাততালি দিয়ে কেমন নাচে সেটা। একবার নাচিয়েই তার গালে চড় মেরে ভরে দিল। আলমারি বন্ধ করে দেয়ালে ঘুরে ছবি দেখে বেড়াল সে। তারপর বেরোল খিড়কি দিয়ে।

পূবের পাঁচিলের দরজা দিয়ে বেরোলে সানবাঁধানো পুকুরঘাট। পাড়ে কলাবন। কলাবন হয়ে জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ি। প্রমথবাবুর দাদা সাধনবাবু বহুকাল আগে পৃথগন্ন হয়েছেন। আগে দুই বাড়িতে যাতায়াত ভাবসাব ছিল না। ইদানীং খুব হয়েছে। সাধনবাবু বরাবর ব্যাচেলার ছিলেন। বছরখানেক আগে হঠাৎ বিয়ে করে বসেছেন এক স্কুল মিসট্রেসকে। একটা ফুটফুটে বাচ্চা হয়েছে। মধুমালার ঠাকমা অবিবাহিত বড়ছেলের কাছে গিয়ে থাকার সময় মারা যান—তার পরে বিয়ে। সবাই বলে, মায়ের শেষ ইচ্ছে মেটাতেই সাধনবাবু বুড়ো বয়সে বিয়ে করলেন।

বুড়ো মানে খটখটে বুড়ো। তেমনি বদরাগী। তাঁর অকালে বিয়ে এবং বাচ্চা দেখে কপালীতলা থ হয়ে গেছে। মধুমালার জেঠিমারও চুলে সব পাক ধরেছে। কেষ্টনগরের মেয়ে। স্কুল ছেড়ে স্বামীর ঘর করছেন এখন। ওঁর জন্যেই দুই ভায়ে দু'বাড়িতে আবার ভাব। মধুমালাকে তো এসেই ন্যাওটা করে ফেলেছেন। এমন মজার ব্যাপার, প্রমথ দাদার বাচ্চাটাকে নিয়ে সবসময় ঘোরেন। বাগানে নিয়ে এসে হাঁটা শেখান। এজন্য মন্দিরা যে আড়ালে একটু ফোঁস করেন, মধুমালা জানে এবং মুখ টিপে হাসে। একটু বোঝার বয়স তো তার হয়েছেই।

কিন্তু মন্দিরা আড়ালে যাই করুন, বড় জা'র সামনাসামনি অন্যরকম। তবে সুমিতা যতবার এবাড়ি আসেন, মন্দিরা ততবার ওবাড়ি যান না। জিনিসপত্র খাবারদাবার চালাচালি প্রায় সবদিনই। বড়জা ছোটকে, ছোট বড়কে টুকিটাকি সুস্বাদু রান্না একবাটি ঝি বা মেয়ের হাতে পাঠান।

মধুমালা আজ সকাল থেকে জেঠিমার কথা ভুলেই বসেছিল। হঠাৎ মনে পড়ে গিয়ে সে ছুটেছে। মা সত্যি বলেছিলেন—আজকের দিনটা। আজকের দিনটা যে কী, সব ভুলভাল হয়ে যাচ্ছে। ইস, লক্ষ্মীসোনা জেঠিমা, তাকেও ভুলে গিয়েছিলো মধুমালা।

খিড়কিতে ওখানেও একটা ছোট্ট সানবাঁধানো ঘাট আছে। ক্ষান্ত ঝি ঘাটে হাঁড়ি মাজছিল। মধুমালাকে দেখে সে হাসে।—আজ যে দেখিনি বড? শুনলুম কলকাতার কুটুম এসেছে। মাছ ধরছিল জাল ফেলে। যাও—জেঠিমা নাম করছিল। কারা এসেছে গো?

ঢঙ দেখে গা জ্বলে যায়। সবই জানে, সবই বলছে—অথচ ওর মুখ থেকে না শুনলে পেটের ভাত হজম হবে না। মধুমলাও জবাব না দিয়ে ঢুকে পড়ে বাড়িতে। জেঠিমা! জেঠিমা! এসে গেছি!

এবাড়িটা ছোট্ট। মোট দুটো ঘর, একটা টিনের রান্নাঘর—একতলা। কিন্তু ছিমছাম সাজানো। উঠোনেই ফুলবাগিচা। শিউলিতলায় টিউবেল। এক কোণায় স্নানঘর—ওপরে ছাদ নেই, তার পাশেই ল্যাট্রিন! এগুলো বিয়ের পর বানাতে হয়েছে সাধনবাবুকে। পৈতৃক বাড়ির কোন ভাগ নেননি ছোটভায়ের কাছে। বরাবর গোঁয়ার ধরনের মানুষ। নিষ্কর্মা ও অলসও বটে। জমিজমার আয়ে চলে গেছে।....

আবার ডাকতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় মধুমালা। বারান্দায় চেয়ারে বসে আছেন জ্যেঠামশাই। খালি গা, পরনে লুঙি। বাবার মতো পৈতে রাখেন না। দেবদেবতা মানেন না। একে গম্ভীর রাশভারি মানুষ—এখন আরও গোমড়ামুখে বসে আছেন। পায়ের কাছে দুটো রুইমাছ। একটু আগে পুকুর থেকে ধরা হয়েছে, তার ভাগ।

সাধনবাবু মধুমালাকে যেন দেখতেই পাচ্ছেন না, মাছের দিকে চোখ। ঝগড়ার সুর লেগে আছে, এমন স্বরে বলেন—এক কথা হাজারদিন বলতে আমার ভাল লাগে না। কেন বলতে হবে? যা আমার পছন্দ নয়—যা নিষেধ করেছি, তাই। এ কী!

মধুমালা দেখে, দরজার পর্দা সরানো, ভেতরে খাটে জেঠিমাকে দেখা যাচ্ছে। পা ঝুলিয়ে ঝুঁকে আছেন—বুকের তলায় টুম্পা। তার মাথায় মৃদু থাপ্পড় দিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছেন এবং জেঠিমার চোখে জল। কাঁদছেন। খোঁপাভাঙা চুলগুলো ফ্যানের হাওয়ায় উড়ছে।

এ অবস্থাটা কোনদিন মধুমালা ভাবেও নি। জেঠামশাই জেঠিমার মধ্যে একটু আধটু ঝগড়া অনেক সময় না হয়েছে, এমন নয়। কিন্তু মধুমালা এলেই ওঁরা তাকে ডেকেছেন—আয়! তারপর তক্ষুনি সব

ঝগড়ার আবহাওয়া উবে গেছে। আবার স্বাভাবিক সব।

মধুমালা সর্তক পা ফেলে বারান্দায় ওঠে। সাধনবাবু তবু যেন তাকে দেখতে পান না। বলেন—এমন জানলে......কক্ষোনো.......হুঃ! এই শালা সংসার! লাথি মারো!

মধুমালাকে দেখে সুমিতা মুখ তোলেন। তারপর সোজা হয়ে বঁসে মুখটা ফিরিয়ে চোখ মোছেন আচলে। বলেন—কী রে? আসিসনি যে আজ?

মধুমালা ওঁর মুখের দিকে একটুখানি তাকিয়ে থাকার পর আস্তে বলে--এই তো এলুম।

বাইরে সাধনবাবুর কথা শোনা যায় আবার—না। দিস ইজ লাস্ট টাইম। তুমি মহাবিদূষী হতে পারো। বি.এ.বি.টি—আমি ঠ্যালা ননম্যাট্রিক। কিন্তু আমার সিক্সথ সেন্স আছে। আমি মানুষ—হিউম্যান বিইং।

সুমিতা চাপাগলায় বলেন—আঃ! তুমি থামবে? ছিঃ!

আর কোন কথা শোনা যায় না সাধনবাবুর। একটা অস্বস্তিকর স্তব্ধতা থাকে কিছুক্ষণ। মধুমালা সুমিতার পাশে বসেছে। সুমিতা ওর চুলগুলো সরিয়ে দিতে দিতে সস্নেহে ও আস্তে বলেন—খুব রোদ্দুরে ঘুরেছিস নাকি রে?

মধুমালা মাথা দোলায়।

— কে এসেছে তোদের বাড়ি?

— কে দুজন। দাদার বন্ধুটন্ধু।

– কলকাতার?

মধুমালা মাথা দোলায় ফের। তারপর একই অস্বস্তিকর স্তব্ধতা। টুম্পা ঘুমোচ্ছে। টুকটুকে লাল ঠোঁট কাঁপছে ঘুমের ঘোরে—ফুঁপিয়ে কান্নার মতো। কেন অমন হয়? আহা সোনা, মাণিক, টুম্পা। ছপ্ন দেখছ? কী ছম্প গো? মধুমালা মনে মনে বলতে থাকে।...আমার মতো ছপ্ন? ও মা! তুমি তো ছেলে। তুমি বর হয়েছ? ছছুরবাড়ি যাচ্ছ? তবে কেন কান্না?

বাইরে আবার চাপা বিস্ফোরণ। মাছগুলো চিলে নিয়ে যাক্। আমি বেরোচ্ছি।

ঘাড় ঘুরিয়ে বাইরেটা দেখে নিয়ে উঠে যান সুমিতা। ঝিকে ডেকে বলেন—ক্ষান্তদি, মাছদুটো নিয়ে যাও! তারপর ঘুরে বলেন—খুকু, আয়। মাছ কোটা দেখবি।

মধুমালা বেরিয়ে আসে।

রান্নাঘরের বাবান্দায় সুমিতা বঁটি পেতে বসেন। ক্ষান্ত বলে—উঁ হুঁ হুঁ। সেদিনকার মতো হাত কেটে রক্তারক্তি করবেন দিদি। রাখুন, আমি কাটছি। যার যা কাজ! কোথায় ছাত্তর ঠ্যাঙাবেন, না বড়বাবুর বাড়ি....

এই অব্দি বলেই ঝি মেয়েটা পানখেকো দাঁতে হেসে ওঠে। সুমিতা ধমক দেন—থামো তো! সবসময় এক কথা ভাল লাগে না। নিজে হাতে রান্না করে খেতুম না তো, কটা দাসী-চাকরাণী ছিল আমার? এ বয়সে রাজরাণী হয়েছি—কি ভাগ্য। উনুনে আঁচ দাও। দশটা বাজতে চলল!

সুমিতার গোল মোটা হাতদুটো ঝাঁকুনি খায়, আর রক্তে লাল হতে থাকে। শাঁখা সরাতে গিয়ে রক্ত লাগে। মোটা কাঁকনজোড়া এঁটে বসে যায় মাংসে। গলার চেনটা বুকের মাংসে চিকচিক করে জ্বলে। ভরাট বুকদুটো গোলাপী ব্লাউজের মধ্যে দুলতে থাকে। হঠাৎ মনে পড়ে যায় মধুমালার। জেঠিমার পেটে যখন টুম্মা, মা হাসাহাসি করে বলেছিলেন—এ বয়সে পারবে ধকল সামলাতে? ভাসুর মশাই কাকাতায় নিয়ে যাক আগেভাগে। নার্সিংহোমে ভর্তি করে দিক।

. কলকাতায় নিয়ে যাননি—ঘুঘুডাঙা হাসপাতালে কেবিন ভাড়া করেছিলেন জেঠামশাই। ব্যথা ওঠার দিন সে কী ছটফটানি ওঁর! সেদিনই বিশ্বকর্মাপুজো। ট্যাকসি বাস সব বন্ধ। রিকশো করে নিয়ে যাওয়ার ভরসা পেলেন না। অ্যাম্বুলেন্স আনা হল বলে-কয়ে। যতক্ষণ না এল, জ্যাঠামশাই একবার রাস্তায় যাচ্ছেন—একবার বাড়ি ঢুকছেন। শেষ অব্দি প্রমথ বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন—দাদা একটা পাগল! ছেলেপুলে যেন কারও হয়নি—হচ্ছে না। বাপস্! গাঁ মাথায় করে ফেললেন একেবারে। যেন হাতি প্রসব হচ্ছে। যত্তসব! বাবার কথাটা এত কদর্য লেগেছিল সেদিন।.....

— জেঠিমা! মধুমালা ডাকে।

— উঁ?

— জেঠামশাই কেন বকছিলেন?

— ও এমনি। তোমার জেঠামশাইয়ের মাথায় একরকম পোকা আছে, কামড়ায়।

— যাঃ। সত্যি বলো না জেঠিমা!

একটু চুপ করে থেকে হাসিমুখে কপট ধমকের সুরে সুমিতা বলন—বড়দের ব্যাপারে ছোটদের নাক গলাতে নেই। একি অভ্যেস মেয়ের? আমরা না গুরুজন?

অমনি মধুমালা চলে আসে। উঠোনে হন হন করে হেঁটে যায়।

সুমিতা ব্যস্ত হয়ে ডাকেন—খুকু! শোন—শুনে যাও। কী অদ্ভুত মেয়ে তুমি। এই খুকু....

ততক্ষণে মধুমালা কলাবনে ঢুকেছে। আর তক্ষুনি ওর মাথায় একটা জ্বলন্ত সিগ্রেটের টুকরো পড়েছে। টের পেত না, কিন্তু ওপরের কার্নিশে ঝুঁকে শান্ত বলেছে—এই যাঃ! মুখ তুলে তাকিয়ে মাথাটা ঝাড়ে সে। সর্বনাশ! চুল পুড়ে যেত। পুড়েছে কি না দেখার জন্যে মাথায় হাত দেয়। তারপর সিগ্রেটের টুকরোটা লাথি মেরে নেভাতে চেষ্টা করে। ওপর থেকে শান্ত বলে—সরি, ভেরী সরি। দেখিনি।

মধুমালার মন তেতো-তেতো, একশো তেতো। একের পর এক এইসব ঘটে যাচ্ছে। রাগের চোটে সিগ্রেটটা সে গুঁড়ো করেও ক্ষান্ত হয় না, স্লিপারের ডগায় তুলে জলে ফেলে দেয় ধুলোমাটিসুদ্ধ। তারপর মুখ তুলে দেখে, তখনও শান্ত দাঁড়িয়ে আছে—দুহাত কার্নিশে রেখে নীচের দিকে ঝুঁকে আছে। মুখে কাঁচুমাচু ভাবের সঙ্গে একটা ধূর্ততা খেলা করছে। আর কৌতুকও।

সে সটান বাড়ি ঢুকে যায়। বারান্দায় পৌঁছে কানে আসে তাদের ঝি গেনুর মায়ের কথা : তা ভালই হবে। খুব ভাল হবে, গিন্নীদি। মোক্তারবাবু জ্ঞানী মানুষ। সব দেখে শুনেই তো এই বাক্যি বলেন—জ্ঞানের কথাই বলেন। মেয়েছেলে নেকাপড়া শিখে কি পাখনা গজাবে? ওই তো পাসকরা মেয়ে এনেছেন বড়বাবু (সম্মিলিত হাসি) ...... এবেলা গরম জলে পা পুড়ছে, ওবেলাতে হাত কেটে রক্তারক্তি হচ্ছে। মেয়েছেলে যখন, তখন স্বামীর ঘরসংসার করতেই হবে—করতেই হবে। একসময় করতেই হবে।...

মন্দিরা বলেন—আমার বাপু মত বদলেছে ইদানীং। উনি ঠিকই বলেন। শুধু আমার সুকুটা ...তবে এবার সুকুও মত দেবে মনে হচ্ছে। ছেলেটির কথা ক'দিন থেকে পইপই করে শুধোচ্ছি দেখে ও খানিকটা আঁচ করেছিল—বুঝলে গেনুর মা?

—এখন চোখেও সবাই দেখলেন। আমিও দেখলুম। খুব ভাল ছেলে। খুব ভাল।

—বাবার এক ছেলে তো। তিনটে—বুঝলে। তিনটে—মানে তিন তিনবার এম.এ. পাস। একটা এম.এ. পাস দিতেই তো সব অক্কা যায়। এ তল্লাটে কেন—সারা জেলাতে কজন আছে? উনি বলছিলেন—এ সুযোগ ছাড়লে চলবে না। উনি হয়তো কালই চিঠি লিখবেন—নাকি নিজে চলে যাবেন। চেনা-জানা লোক সঙ্গে নিয়ে গিয়ে ধরবেন। বলছেন—যা চাইবেন ওনারা, রাজী হব।

—(চাপাস্বরে) হ্যাঁ গো, ছেলের মেয়েকে নিশ্চয় মনে ধরেছে?

—হুঁউ। না ধরে পারে? সে আমি টের পেয়েছি কখন। আর তোমরাই বলো, মেয়ে আমার পাঁচটার একটা। একটু ছেলেমানুষী এখনও আছে। তবে বিয়ের জল গায়ে পড়লেই ঠিক হয়ে যাবে। কত দেখলুম। আমিও তো এবাড়ি এসেছিলুম সেই এট্টুকুন বয়সে! তোমরা তো দেখেছ, বাপু! তার চেয়ে খুকু আমার কত বুদ্ধিমতী—স্কুল ফাইনাল এই, এই! আবার ঢুকেছে! তাড়া—তাড়া! ঠাকুরঘরের বারান্দায় ওঠে না যেন, ঘরে আর এত গঙ্গাতল নেই আমার!

মারাত্মক ঘেঁউ আর্তনাদ শোনা যায়। তারপর কুকুরটা পালিয়েছে।

—হ্যাঁ গো গিন্নীদি, বললেন যে তিনটে বড় পাস। মেয়ে তো মোটে একটা—

একটু পরে মন্দিরা বলেন—হ্যাঁ। ঠিকই বলেছ গেনুর মা। কথা উঠবে। কিন্তু দেখ—আসলে টাকায় সংসার চলছে। আর —জামাই যদি চায়, কলেজে পড়াবে। ইউনিভার্সিটিতেও পড়াবে। অসুবিধে তো নেই।....তা পড়াবে বইকি। আর মেয়ের অমন চেহারা—সেটাও তো ধরতে হবে, তোমরা বলো। এমন মেয়ে ক'টা কার ঘরে আছে শুনি? একশোটা পাস দিয়েও কি এমন মেলে?

মধুমালা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনছিল। পাথরের মূর্তি। মুখ লাল। নাকের ফুটো কাঁপছে। উরু অবশ—পায়ের পাতা কাঁপছে। ঠোঁট কামড়ে ধরেছে।

গেনুর মা দেখতে পেল হঠাৎ। চাপা গলায় বলে—মালু শুনছে।

মন্দিরা হাসেন। তারপর ডাকেন—খুকু! গিয়েছিলি জগাইদার ওখানে? কী বলল?

মধুমালা সবার সামনে এদিকের বারান্দা দিয়ে বসার ঘরে ঢোকে। বাবা আর কে সব বসে কথা বলছেন। সে হন হন করে বেরিয়ে যায়। সিঁড়ি বেয়ে নামে। গেটের দিকে চলতে থাকে উদ্দেশ্যহীন।

নদীর ওধারে বাঁধের ওপর জামবনের খানিকটা ছায়া এসে পড়েছে। একটু পরেই বাঁধ থেকে কপালীর জঙ্গলে ঢুকবে ছায়াটা। সেখানে বসে পড়েছে মদনবুড়ো। বাবা গো বাবা! কলকাতার মানুষটা যে চাষাভুষোর চেয়েও দড়। এতটুকু ক্লান্ত নেই, গ্রাহ্য নেই—বুনো শুয়োরের মত গোঁ ধরে বনবাদাড় বিলখাল চষে বেড়াচ্ছে। আর কী বন্দুকবাজ, কী টিপ হাতের! যা টিপ করে, তাই পড়ে। মদন হাঁপাতে হাঁপাতে আপনমনে হাসে। তার হাতে একজোড়া ঘুঘু, একটা জলপিপি একটা তিতির। এবেলা জাল ফেলে পুকুরের মাছ ধরিয়েছেন মোক্তারবাবু। ওবেলা পাখির মাংস হবে। ছোটবাবু সুকুর সঙ্গে অনেকবার এসেছে মদন। সে এর কাছে নাবালক। সাক্ষাৎ অর্জুন। সব্যসাচী। দুহাতে সমান টিপ। ধন্যি যাই বাবা, গড় করি।.....

দিব্য সিগ্রেট ধরিয়ে টানছিল, দাঁড়িয়ে। সুকুমারের পাজামা পাঞ্জাবিতে কাদা লেগেছে। চোরকাঁটা ফুটেছে। দেখে নেবে ওরা। ওপারে উত্তর-পশ্চিমে কপালীতলা দেখা যাচ্ছে। সুকুমারদের দোতলা বাড়িটা খুঁজছিল সে। অন্যমনস্কভাবে বলে—এই নদীর কোন গল্প নেই মদন?

মদন মাথা নাড়ে। - - কপালীর? আছে। অনেক আছে।

—কিন্তু তুমি হাফাচ্ছ?

— তেষ্টা পেয়েছে, বাবু। আপনার পায়নি?

— না। বলে সে চুপ করে যায়। বেশ খানিকটা দূরে ঘাট। এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি ওখানটা। সুকুর বোন না? নদীর খাত থেকে সবে এপারে উঠছে। চুল উড়ছে, কাপড় জড়িয়ে যাচ্ছে গায়ে ও পায়ে। বার বার সামলে নিচ্ছে। অমনি বুকের মধ্যে গুর গুর করে ড্রাম বেজে ওঠে দিব্যর। চোখের সামনে বিশাল প্রকৃতি কয়েকমুহূর্ত তীব্র হয়ে জ্বলে ওঠে। তারপর মাথার খুলির ভিতর বাতাস ঢুকে যায় একঝলক। কান ভোঁ ভোঁ করতে থাকে। তবে কি .... ঠোঁট কামড়ে ধরে দিব্য।

আমার মনে হয়, তা যদি হয় তাহলে কেন ও আসবে? চাকর-বাকর কাকেও পাঠাবে সুকুমার।....

অবশ্য এমনও হতে পারে, সুকুমারের বোন নিজেই উদ্যোগী হয়ে খবর দিতে আসছে।

কিন্তু এত শিগগির!....

অবশ্য কলকাতা তিনঘন্টার পথ মাত্র। তাছাড়া রেডিও মেসেজ বলে একটা ব্যবস্থা আছে। রাষ্ট্রের প্রশাসন আজকাল মর্ডান টেকনিকে সাজানো। রাষ্ট্র কী ভয়ঙ্কর শক্তিমান হতে পারে, ঈশ্বরের চেয়ে মারাত্মক প্লেটোর কথাবার্তাও কল্পনা করেননি।.....

গুর গুর ড্রাম বাজতে থাকে। নাকি রেলব্রীজ পেরোচ্ছে কোন রেলগাড়ি—নাকি বুকের মধ্যে এই গুরুতর আওয়াজ! বন্দুকের নলটা শক্ত করে ধরে দিব্য বলে—মদন!

—বলুন বাবু!

— তুমি...তুমি বরং চলে যাও। আমি এখনও ঘুরব!

— সে কি বাবু! চানের সময় হয়ে এল। ক্ষিদে পায় নি?

— না। তুমি যাও।

মদন মুখের দিকে তাকিয়ে চমকায়। রোদে-বাতাসে কলকাতার বাবুর মুখ পোড়েনি, হঠাৎ এতক্ষণে গনগনে লাল। কখন ধরে ফেলেছে, এ এক ক্ষ্যাপাবাবু—এবার আরও ক্ষ্যাপা। অনেক বন্দুকবাজ বাবুর সঙ্গে মোক্তারমশাই তাকে পাঠিয়েছেন কপালীর জঙ্গলে, এমন দেখেনি সে। ইনি কে বটে গো?

সে নদীর ঢালু পাড় বেয়ে সাবধানে নামতে থাকে। খাতের বালিতে পা পুড়ে যায়। তখন দৌড় জলে নামে। একহাতে পাখি, অন্যহাতে জল খায় শরীর ঝুঁকিয়ে। আঃ বলে উঠে দাঁড়ায়। বাঁধের দিকে উঁচুতে তাকায়। কলকাতার বাবু দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ বড় মায়া হয়, কেন কে জানে। কী যেন চাপা দুঃখ আছে ছেলেটার বুকে, তাই সারাক্ষণ আনমনা—কেমন যেন উদাস-উদাস দৃষ্টি, কপালে তিনটে ভাঁজ! দূরের দিকে তাকিয়ে কী ভাবছে, আর ভাবছেই। এমন কাঁচা বয়সে কোথায় ঘুণ ধরেছে গো?

কিন্তু তাই বলে পাখিদের ছাড়ান নেই। দেখলেই বাঘের মত চোখে খুনের নেশা জ্বল জ্বল করে ওঠে। মদন সামনে ঝুঁকে গরম বালির চড়া লাফাতে লাফাতে পার হতে থাকে।

দিব্য কল্কিফুলের ঝোপ ঠেলে এগিয়ে দাঁড়ায়। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

সুকুমারের বোন কপালীর মন্দিরের সামনে পরিষ্কার মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে আছে, পিঠটা ফুলে ফুলে উঠছে। দীর্ঘ দু-তিনটে মিনিটই ওই ভাবে থাকার পর সে মুখ তোলে। গাল ভেসে যাচ্ছে জলে। কপালে ধুলো। ঠোঁট কাঁপছে। দৃষ্টি মন্দিরের ভেতরদিকে—যেখানে ধ্বংসের শূন্যতায় আগাছা।

কেন? সাবধানে নিঃশব্দে দু'পা এগোয় দিব্য। কেন সুকুর বোন অমন করছে?

আর হঠাৎ একটা মিরাক্‌ল ঘটে যাওয়ার মত কোত্থেকে একটা সাদা প্রজাপতি নাচতে নাচতে এসে সুকুমারের বোনের গালের পাশ দিয়ে যেতেই সে খপ্ করে ধরে ফেলে। মুহূর্তে মুখটা হিংস্রতায় ভরে যায়। তার ওপর কান্নার ছাপ। সুন্দর মুখে এ কি রাগ না ঘৃণা, ঘৃণা না হিংসা, হিংসা না দুঃখ—সব মিলেমিশে গেছে। প্রজাপতিটা পিষে মেরে হাতের মুঠো খোলে সে। হাতের তালু ও আঙুল সাদা হয়ে সবুজ গুঁড়োগুড়ো পাউডারের মত প্রজাপতির মাংসে ভরে গেছে। হাতটা ঝেড়ে ফেলতে গিয়ে মুখ ঘোরায় এবং দিব্যর সঙ্গে চোখাচোখি। এবং সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায়।

দিব্য এগিয়ে গিয়ে বলে—কী ব্যাপার?

ঘুরে দাঁড়িয়ে জোরে মাথা দোলায় মধুমালা।

দিব্য পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে ফেলে বলে—এসব কী হচ্ছে? কেন?

দীর্ঘ একমিনিট অপেক্ষা করে জবাব শোনার জন্য। ততক্ষণে সেই মারাত্মক ড্রামের বাজনা থেমে গেছে। ভেতরের স্তব্ধটা ক্রমশ ভরে তুলেছে কাপালীর জঙ্গলের নৈসর্গিক আওয়াজগুলো। পাখি ও পোকামাকড়ের ডাক। বাতাসের শব্দ গাছপালায়, শুকনো পাতার শব্দ, এই সব। তারপর হঠাৎ আবার আসে আরেকটা সাদা প্রজাপতি—হয়তো আগেরটার জোড়া, এবং ধরার জন্য হাত বাড়ায় মধুমালা, কিন্তু হাত ফসকে গিয়ে দিব্যর বুকে এসে লাগে। দিব্যর বুকের দিকে হাতটা আর এগোয় না। দিব্য নিজের বুকের দিকে তাকিয়ে একবার শিউরে উঠেছিল—রোমাঞ্চ যাকে বলে এবং পরক্ষণেই ব্যাপারটা কুসংস্কার বলে সে উড়িয়ে দিতে হো হো করে হাসে।—তুমি এসব বিশ্বাস করো? সব বাজে—গাঁজাখুরি। কোন মানে হয় না!

চার

প্রজাপতিটা নিয়ে কথা না বললেও পারত দিব্য। কতসব পোকামাকড় দিনরাত মানুষের গা ঘেঁষে ঘোরাফেরা করে বেড়ায়। এ সব আলোচনা বা উল্লেখের বিষয় নয়, যুক্তিসিদ্ধও নয়। কিন্তু মানুষ সব সময় তার পুরনো সংস্কার নিয়েই ব্যস্ত। এও একরকমের কুসংস্কার। এবং তা দিয়ে মধুমালাকে যেন অনেকটা নোংরা করে ফেলা হল।

পরে এসব কথা আলগোছে মনের একধারে ভেবে নিয়েছে দিব্য। বেচারী মধুমালা কুমারী মেয়ের লজ্জার আড়ালে চলে গিয়েছিল কিছুক্ষণ। এও অবশ্য তার পুরনো কুসংস্কার। তাই দিব্যর ওপরও যেন পাল্টা নোংরা ছড়ানো হল! কিছুক্ষণ দুপক্ষেই অস্বস্তি।

সাদা প্রজাপতিটা আঙুলে ঠেলে সরিয়ে দিলে সেটা উড়ে গেছে বন তোলপাড় করতে। দিব্য ফের বলে—ব্যাপার কী তোমার? বাড়িতে বকাবকি?

জবাব না পেয়ে আবার বলতে হয় তাকে—তোমরা এখানে বেশ আছ, দেখছি। দুঃখ-টুঃখ পেলে একলা লুকিয়ে মাথা ঠোকবার জায়গা আছে। আমি থাকি অন্যরকম জায়গায়। কান্নাকাটির কথা ভাবাই যায় না। হাসি পায়। পাঁচ সাতশো বছর আগে মানুষ চোখে কাঁদত, এখন কাঁদে ব্রেনে।

মধুমালা সোজা তাকায় একবার! অনেকটা সামলে নিয়েছে। তারপর আস্তে বলে—চলি।

—আমি কোথায় যাব?

—যেখানে এসেছেন। ..... বলেই সে ঘুরে পা বাড়ায়। ফের বলে—শ্রাদ্ধ খেতে।

দিব্য হাসতে চেষ্টা করে। —বাড়িতে কিছু একটা হয়েছে নিশ্চয়। তুমি রাগ নিয়ে এসেছ। কারো

ওপর পাল্টা শোধ চাইছ—মানে এতক্ষণ কান্নাকাটি করে তাই দাবি করছিলে? দেখছ না, মন্দিরটা খালি পড়ে আছে? কে শুনবে তোমার কথা?

—থাক। আপনাকে দিব্যি দিইনি।

—কিসের?

—অ্যাডভাইস দেবার।

—তুমি খুব বাঙালী-বাঙালী করছিলে। অ্যাডভাইস বলছ!

—স্লিপ অফ টাং।

দিব্য জোরে হাসতে থাকে।—আবার! আবার!

মধুমালা অমনি ফিক করে হেসে ওঠে— যদিও রাগে জ্বলে উঠেছিল এক সেকেন্ডের জন্যে। তারপর 'অভ্যেস' বলে ফের পা বাড়ায়। কিন্তু তখন হাসিটা ক্ষয়ে যেতে যেতে শেষ।

দিব্য দারুণ হঠকারিতায় খপ করে ডান হাতে ওর বাঁ হাতটা ধরে ফেলে এবং বাঁ হাতে বন্দুকের নল আছে। দিব্যর গলার স্বরও হঠাৎ বদলে যায়।—শোন, কথা আছে।

মুখ নামিয়ে মধুমালা পায়ের তলার মাটি দেখতে দেখতে প্রায় হাঁফানির মতো অস্পষ্ট স্বরে বলে—ছাড়ুন।

—না। কথা আছে।

মধুমালা মুখ নামিয়ে রেখেই মাথাটা জোরে দোলায়। খোলা চুলগুলো দু'কাধে ছুটোছুটি করে। তারপর হাতটা টানতে গিয়ে বুকঅব্দি তোলে এবং টের পায়, পারবে না। এই লোকটা তার কামিনী গাছটাকে অপবিত্র করেছিল! কার্নিশের ওপর উঁচুতে একে দাঁড়ানো দেখে সেই পাপ ক্ষমা করেছিল মধুমালা। কিন্তু সেটা ভুল—চোখের ভুল। মধুমালা ঘামতে থাকে। তার কুমারী শরীর থরথর করে কাঁপে। মুখের লালচে ছটা আস্তে আস্তে ফিকে হতে হতে ছাইপড়া দেখায়।

দিব্য কাঁপুনি ও পাংশুতা লক্ষ্য করে বলে—কী বলব ভাবছ তুমি? সে ধমক দিয়েই বলে একথা।—আমি ওই বেঁটে ভূতটা নই! আমার বাবার হোসিয়ারি ছিল না।

—হুঁ, আপনি সাধুসন্ন্যাসী! হাত ছাড়ুন!

—বলছি, কথা আছে। চলো, ওখানটায় গিয়ে বসব। জরুরী কথা।

—বন্ধুর বোনকে একলা পেয়ে....

—কী একলা পেয়ে? তুমি ভারি অভদ্র মেয়ে তো!

মধুমালা মুখ তোলে দ্রুত। সোজা তাকায়। কিছু কণ্ঠস্বর আছে, মেয়েরা টের পায়। দিব্যর সেই শূন্যতাময় বড় বড় চোখে আগুন জ্বলছে। কেমন বশ মেনে যায় সে। বলে—চলুন।

হাত ছেড়ে দিয়ে দিব্য পা বাড়ায়। ওপাশে একটা কুঁচফলের ছড়ানো ঝোপ ফুঁড়ে একটা ছাতিম উঠেছে। তার ছায়া উত্তরে নেমেছে খানিকটা শুকনো ঘাসে। জায়গাটা ভাল লাগছিল বসতে। সেখানে গিয়ে দিব্য বলে—বসো! তারপর নিজেও বসে।

মধুমালা একটু তফাতে বসে। দু'হাঁটু উঁচু করে তার ফাঁক দিয়ে হাত চালিয়ে পায়ের কাছে ঘাস ছেঁড়ে। আঙুল আড়ষ্ট। শক্তি-হারানো বা রুগ্ন মানুষের ছাপ পড়েছে তার মধ্যে। অথচ ভিতরে তোলপাড়। কপালী নদীর একবর্ষার জল কল কল করে বয়ে যাচ্ছে, পাড় ধ্বসার শব্দ ওঠে দু'একবার। একটা ভয় ঘুরে-ঘুরে ওড়া চিলের মতো ছায়া ফেলে বেড়ায় কোথাও। জঙ্গল জুড়ে পোকা-মাকড়ের নানা রকম শব্দ। সেইসব শব্দ আঁকড়ে ধরে সে। মিশে যেতে পারত যদি এই জঙ্গলের গোলমালে!

দিব্য একটা সিগ্রেট ধরায়। কিছুক্ষণ চুপচাপ টানে এবং ধোঁয়ার আংটি বানিয়ে দেখে। তারপর আস্তে বলে—আমি এখানে কেন এসেছি, জানো?.....মধুমালা মাথা একটু দোলাল দেখে সে ফের বলে—তুমি জানো না.....তিরিশ সেকেন্ড পরে আবার—শান্তও জানে না। পনেরো সেকেন্ড পরে—সুকুও না। এবং এই সময় একটা ঘূর্ণি হাওয়া জঙ্গল নাড়া দিতে দিতে ওদের পেরিয়ে যায়। খড়কুটো শুকনো পাতায় ডুবে যায় দু'জনে। চুল, কাপড়চোপড় ওড়ে।

তখন এগারোটা। রোদ ফেটে পড়ছে। আকাশ তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে চিল। জগাই ডাক্তার এসে যাবেন, খবর পাঠিয়েছেন। এখনও সত্তর জনের লাইন আছে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। কিছু ফুলকো লুচি খেতে

হয়েছে শান্তকে। আবার আমের ফালি প্লেটে। দুপুরে খেতে দেরী হবে। জল খেয়ে সে সিগ্রেটের প্যাকেট খোলে। হতাশ হয়ে বলে—ধুস্।

সুকুমার বলে—আনাচ্ছি। জগা!

জগা সিঁড়ির মুখ থেকে সাড়া দেয়— আছি ছোটবাবু।

শান্ত উঠে দাঁড়ায়।—থাম, দিব্যর ঝোলা হাতড়াই। শেয়ালদায় পাঁচ প্যাকেট কিনেছিল। নিশ্চয় শেষ হয়নি। শালা যা টানে—চেইন স্মোকার। এ্যাদ্দিন ক্যান্সার হওয়া উচিত ছিল। ডেফিনিটলি হবে!

বলতে বলতে সে ওয়াড্রোবের কোণায় ঝোলানো দিব্যর লাল ঝোলাটা নামায়।—ব্যাটা লালের ভক্ত বড্ড। সুপার এক্সপ্লোসিভ কারবার। ওকে মাইরি আজও বুঝতে পারিনে সুকু।

সুকুমার মিটিমিটি হেসে বলে—আমিও বুঝিনি! মিস্‌টিরিয়াস ক্যারেক্টার।

শান্ত সোফায় বসে কোলে ঝোলাটা রেখে বলে—এত কী মালপত্তর এনেছে রে! ভারি লাগল। মাই গুডনেস্।.....শান্ত খিক খিক করে হাসে। বইটা বের করে দেখে সে।.....জিনিয়াস্। আঁতের কারবার মাইরি সুকু।

—আঁতের? সুকুমার প্রশ্ন করে।

—তাও জানিসনে? গাঁয়ে এসে তুই গেছিস্! ইনটেলেকচুয়াল—ফরাসী কায়দায় আঁতেলেকচুয়াল।

—তাই বল্। সিগ্রেট পেলি?

—দেখছি। কিন্তু এসময় ব্যাটা এসে পড়লে কেলেঙ্কারী করবে। .....ইস। ডায়েরি লেখে। ভাবা যায় না।......তারপর একটা সিগ্রেটের প্যাকেট বের করে শান্ত বলে—পেয়ে গেছি। এসে খচে যাবে। যাক্, এখন খেয়ে তো নিই।

সিগ্রেটের প্যাকেটটা টেবিলে রেখেও সে ক্ষান্ত হয় না। ঝোলা হাতড়ায়। মুখে দুষ্টুমির হাসি।—নিশ্চয় আরও বিশেষ কিছু আছে। বুঝলি সুকু? গতকাল সন্ধ্যায় গিয়ে হঠাৎ বলল, তুই সুকুর ওখানে যাচ্ছিস কবে? যাবি বলছিলি যে? বললুম—টুমরো মর্নিং। ও বলল—আমিও যাব। এ্যাক্সেপ্টেড। তারপর ও বলল, সঙ্গে মাল ফাল নিস।

—নিয়েছিস?

—হুঁ। মনে হচ্ছে দিব্যও এনেছে। প্যাকেটে মোড়া এটা নির্ঘাৎ জিন। ব্যাটা জিনের ভক্ত। সুকু, তোর ঘরে রাত্তিরে অসুবিধে নেই তো?

সুকুমার চাপা গলায় বলল—না। আগেও হয়েছে কতবার। সুজনরা এসে খেয়ে গেছে। তবে ভাই, হুল্লোড় চলবে না। বুঝতেই পারছিস, বনেদী ফ্যামিলির কারবার।

—পাগল! শুধু ওটাকে সামলাস্। বলে প্যাকেটটা বের করে শান্ত। হা হা করে হাসে।—আগে এটা শেষ হবে! তুইও খাবি। জ্বর ছেড়ে যাবে।

সুকুমার বলে—খুলে দেখ না, কী জিনিস?

প্যাকেটটা সুতোয় আষ্টেপিষ্টে জড়ানো। দ্রুত সাবধানে খুলতে থাকে শান্ত। খবরের কাগজ, তার তলায় ইঞ্জেকসান এ্যমপিউলের কাগুজে বাক্স—আন্দাজ চার বাই সাত ইঞ্চি। রবারের আংটা পরানো। খুলতে খুলতে শান্ত সন্দেহের সুরে বলে—স্মাগলিং কারবার নয় তো? ওকে কিচ্ছু বিশ্বাস নেই কিন্তু। ভেরি ডেঞ্জারাস চ্যাপ।

তারপর বিকট ভঙ্গীতে শিউরে ওঠে সে। চোখ কপালে তুলে ফিস ফিস করে বলে—সুকু! সুকু! সর্বনাশ।

সুকুমার খাট থেকে আধখানা উঠে বসেছে তক্ষুনি। বলে—কী রে ওটা?

—রিভলবার। একগুচ্ছের কার্টিজ। সুকু। দিব্য এখনও ডেঞ্জারাস রে!

—রেখে দে শিগগির। এক্ষুনি কেউ এসে পড়বে।

শান্ত কাঁপতে কাঁপতে মোড়কটা গোছাতে থাকে। ওর মুখে নার্ভাস মানুষের ছাপ স্পষ্ট। জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলে। সুতো মোটামুটি জড়ানো হয়ে গেলে সে সিগ্রেটের প্যাকেকটাও ভীতু মুখে ঝোলায় ঢুকিয়ে দেয়। ঝোলাটা আগের মত রেখে আসে। ঘরে অস্বস্তি ঘুরছে। হঠাৎ একটা গুরুতর রকমের স্তব্ধতা ঢুকে পড়েছে, সেটা যেন সিংহের মত বসে আছে পিছনের হাঁটু দুমড়ে। জিব চাটছে। সুকুমার

চিত হয়ে শুয়ে চোখ বোজে। চাদরের মধ্যে পা দোলায়। তারপর বলে—ওকে বন্দুক দেওয়া ঠিক হয়নি। জানতুম না তো।

শান্ত ভারি গলায় বলে—তোদের চাকরটাকে ডাক, সুকু। সিগ্রেট আনাই।

—জগা।

—আছি গো, আছি। পালাইনি।

সুকুমার রেগে যায়।—ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছিস কেন? দেব এক চাঁটি মাথায়। এখানে আয়!

জগা এলে সে বালিশের তলায় হাত ঢোকায়। শান্ত দেখেও কিছু বলে না। এর কারণ, হয় সে এবাড়ির অতিথি, অতএব আতিথ্য পুরোমাত্রায় উশুল করতে চায়—নয় তো, দিব্যর রিভলভাবের অলীক গুলি খেয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

জগা চলে যাবার পরও কিছুক্ষণ দু'জন চুপচাপ থাকে। তারপর শান্ত আস্তে আস্তে বলে—আমাবই ভুল হয়েছিল। তোর এখানে আসব বলে তোকে চিঠি লিখেছি, কেন যে ওকে বলতে গেলুম! সুজনকে বললে ভাল করতুম। সুজন আসত। জানিস? বাইরে কোথাও একা বেড়াতে যেতে ভাল লাগে না, তাই।

—দিব্য সঙ্গে ওটা কেন আনল, তোর কী ধারণা?

—মনে হচ্ছে পার্সোনাল সেফটির জন্যে।

—তাহলে লোডেড রাখত। খোলা রাখত পকেটে। অমন মোড়কে কেন।

শান্ত মাথা দোলায়।—ঠিক ঠিক। ওঁর কিন্তু শত্রুটত্রু থাকা উচিত—স্বাভাবিক সুকু।

—হুঁ। কিন্তু....

—ছেড়ে দে। বরং এক কাজ করি সুকু। আমি আজ বিকেলেই ফিরে যাই। তাহলে কোনমুখে ও একা থাকতে চাইবে? তারপর আমি আবার আসব। আমার খুব ভাল লেগেছে এখানটা। তোদের ফ্যামিলি বা বাড়িটাও চমৎকার। কী ভাল যে লাগছিল এতক্ষণ! গ্যাংস্টার সব বরবাদ করে দিল। বরাবর—এভরিহোয়াব ওর কারবার এইরকম। কুকুরের মত অবলীলাক্রমে ঠ্যাং তুলে পেচ্ছাপ কবে দেয়। আর কক্ষনো ওব সঙ্গে নয়—নেভার।

সুকুমার চুপ করে থাকে। কয়েকবার কাশে শুধু।

—হ্যাঁ, আজ চলে যাই! বরং শিগগির ফের আসব। একা আসব।

--কিন্তু মা কি যেতে দেবেন? রাগ করবেন। বাবাও.....

—খুলে বলতে দোষ কী? এ্যাঁ? বলে দে সব।

সুকুমার একটু ভাবে। তারপর কেমন পাংশু হাসে।—সেকথা পরে। কিন্তু দিব্য যদি বলে—থাকব? যদি যেতে না চায়? ওর হাবভাবে মনে হল, কদিন থাকতে চায়। দেখলি না? বন্দুক নিয়ে কেমন নাচতে নাচতে বেরিয়ে গেল। ওর শিকারের নেশা আছে, একটু আধটু জানতুম। কিন্তু সত্যি বলে বিশ্বাস করিনি। তোর মুখেই আজ শুনলুম—ও রাইফেল ক্লাবের মেম্বার। হ্যাঁ রে, তাহলে তো ওর রাইফেল অবশ্যই আছে। দেখিসনি?

—না। ব্যাটা বরাবর গুলবাজ। নিজেই বলে রাইফেল ক্লাবের মেম্বার। আমার সঙ্গে ইউনিভার্সিটি ছাড়ার পর যোগাযোগ তো কদাচিৎ। সে-ও বারে বা কফিহাউসে। মুখটা দেখিস না—যেন সবসময় ভেতরে কী ঘোঁট পাকাচ্ছে।

সুকুমার হাসবার চেষ্টা করে বলে—তাহলে বোঝা যাচ্ছে, এমন একজনের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব—যার সম্পর্কে খুব কম কথাই আমরা জানি। স্ট্রেঞ্জ! কিন্তু বল্ শান্ত, ওর একটা এ্যাট্রাকটিভ পার্সোনালিটি আছে। ওটাই ওর জোর। তোর কী মনে হয়?

—হাতি না ঘোড়া! মাস্তান ইজ মাস্তান!

—ও কি সত্যিসত্যি ব্যাংকে চাকরি করে? গেছিস কখনও ওর ব্যাংকে?

শান্ত জোরে মাথা দোলায়।—স্রেফ গুল হয়তো। ওর কলেজ লাইফে যা স্পট্ আছে—তখন বললুম না তোকে? কীভাবে ম্যানেজ করল—সেটাই তো অবাক লাগে বরাবর। সুকু, এখন আমার বিশ্বাস—ইউনিভার্সিটি ছাড়ার পর থেকে এই ক'বছরের মধ্যে আবার কিছু ঘটেছে ওর লাইফে। আই অ্যাম

ডেড সিওর এখন। ওসব ব্যাংকের চাকরি-ফাকরি সব ধাপ্পা।

—কিন্তু ওর সোর্স অফ ইনকাম কী? কেমন চুকচুকে হয়ে রয়েছে। পয়সাকড়ি না থাকলে এটা সম্ভব নয়।

শান্ত উদ্বিগ্ন মুখে বলে—ভ্যাট্! সব আনন্দ মাঠে মেরে দিলে! আমার কিছু ভালো লাগছে না। সে উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি শুরু করে। কয়েক পা চলাফেরার পর থেমে বলে—আমি আজ যাই। আবার আসব। পরশু আসব। তুই বাড়িতে একটু ম্যানেজ কর সুকু।

সুকুমার আবার মিটিমিটি হাসে।—করলুম। কিন্তু দিব্য যদি থাকতে চায়?

—ওঃ। ওই প্রবলেম।....

নীচে তখন বান্নাঘর আর বারান্দা জুড়ে আয়োজন। যেন একশো লোক খাবে, এমন ছড়ানো-ছিটানো জিনিসপত্র, আনাজপাতি। মন্দিরা মোড়ায় বসে নির্দেশ দিচ্ছেন। হাতে তালপাখা। একদন্ড ঘরে ফ্যানের হাওয়া খেয়ে আসার ফুরসৎ নেই। এরা বড্ড চোর। মন্দিরা খুব ঘামছেন। ধমক দিচ্ছেন। কখনও হাসছেন। ভাবী কুটুম্বিতে নিয়ে বসিকতাও চলছে—তাব টুকটাক জবাব দিচ্ছেন। কখনও বলছেন—ওরে, তোরা গাছে কাঁটাল গোঁফে তেল করিস নে তো আর। থাম! খুব হয়েছে। ভাগ্যে থাকলে সব হবে। গেনু! হুলোটা এসেছে—ওই দ্যাখ! তাড়া!

এইসময় দুলেপাড়ার বউটা এল। ঝুড়িতে কলমীশাক আর ডুমুর এনেছে। গেনুর মা বলে—ওই! এসে গেছে। তোমার আর দিন ছিল না গো?

মন্দিরা আইটেম বাড়াতে বাড়াতে অনেকটা এগিয়েছেন। শাক দেখে খুশি হযে বলে—বিমলি, শাকটা নে। শিগগির বেছে ফেল্।

বিমলা আজ ঠিক ঝি। সে সন্দেহজনক দৃষ্টিতে দুলে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বলে—দিব্যি কবে বল তো বাছা, বাঁওরের শাক নাকি?

দ্রুত জিভ কেটে দেবদেবতা ও নিজের কাচ্চাবাচ্চার কিরে করতে থাকে শাকতোলানী মেয়েটি।—না, না। চোখের কিরে দিদি। দীঘিতে তুললুম। কত লোক দেখেছে।

বাঁওবে ছোটলোকের আ-পোড়া মড়া গিয়ে আটকে থাকে। অথচ সেখানেই কলমীদামের ঘন জঙ্গল। বড় বড পাতা, তেজী সবুজ রং, বেগুনি রেখা বসানো সাদা ফুলে ছয়লাপ। পানকৌড়ি ওড়ে। জলপিঁপড়া ডিম পাড়ে। একঠ্যাঙে বক ওৎ পেতে দাঁড়ায়।.....

মন্দিরা বলেন—বাছতে গেলে তো কিছুই মুখে তোলা যায না। ও কী? ডুমুর এনেছ? ঠাকুব! আজ চতুর্দশী না? ডুমুর খায় আজ?

চারু ঠাকুর খুন্তি হাতে রান্নাঘরের দবজা থেকে উঁকি মেরে বিরক্ত মুখে বলে—হুঁ! সব খায়।

বিমলা হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে—হ্যাঁ গা ভালমানুষের মেয়ে। শাক যদি দীঘির হয়, দীঘির পাড়ে তোমার কত্তাবাবা কি ডুমুরও লাগিয়ে রেখেছে?

মন্দিরা ধমক দেন—আঃ! লোক আছে বাড়িতে। গলা করিস নে তো বাপু।

দুলেবউ কাঁচুমাচু মুখে বলে—ওপারে গিয়েছিলুম। কপালীর জঙ্গলে। কাঠ কুটো আনতে গিয়ে দেখলুম। খারাপ জায়গার নয়।

এই সময় মন্দিরা ডাকেন—মালু কোথায় রে? কখন থেকে নেই।

গেনুর মার জবাব—জেঠিমার কাছে। আবার কোথায়?

দুলেবউ বলে—মালুদি কপালীর জঙ্গলে বসে আছে, দেখে এলুম।

মন্দিরা হাঁ করে তাকান। বিশ্বাসই করতে পারেন না।

—হ্যাঁ। বসে আছে। একটা ফর্সামত ছেলের সঙ্গে। ওনার হাতে বন্দুক আছে।

সবাই মুখ তুলে শুনছিল—চুপচাপ কয়েকটা মুহূর্ত। সব চোখেই বিস্ময়। তারপর মন্দিরা হেসে ওঠেন। সব দ্রুত চাপা দিতে থাকেন।—ও! সুকুর বন্ধু বন্দুক নিয়ে গেছে পাখি মারতে। মদনও গেছে সঙ্গে। দাদার বন্ধু—দাদার মত। যেতে দোষ কি? গেছে। আজকালকার ছেলেমেয়ে সব। দাদাদের সঙ্গে ....গেনু। কাকটা তাড়া। হেগে দেবে।

দুলেবউ বলে—মদনাকে তো দেখলুম একগুচ্ছের পাখি নিয়ে বকুলতলায় বসে আছে। বলে—বিলবাদাড় চষে কেলান্ত। জিরোচ্ছি।

বকুলতলা গাঁয়ের শেষে—নদীর ঘাটের কাছাকাছি। এপারে। মন্দিরা ধমক দেন—হয়েছে হয়েছে! হাত চালাও তো সব। কথা পেলেই হল!

কুঁচফলের ঝোপের পাশে ছাতিমের ছায়া ঘুরে দিব্যর পিঠভরা রোদ! সে বাঁ হাতের তালু শুকনো ঘাসে চেপে একটু হেলে পা দুটো বাঁকা করে ছড়িয়ে বসেছে—কোলে বন্দুক, ডানহাতে ঘাসের কুটো। মধুমালা তেমনি দু'হাঁটু বাঁকা করে বসে আছে—হাঁটুর ফাঁক দিয়ে দুটো হাতের আঙুল ঘাস ছিঁড়ছে। মুখ দু'হাঁটুর ফাঁকে ঝুলন্ত। বাঁদিকটা দেখা যাচ্ছে, কানের রিং চুলের ফাঁকে ঝিলমিল করছে মাঝে মাঝে। পিঠে চুলের নড়াচড়া। দিব্য বলে—তুমি শুনছ না কিছু।

মধুমালা ওইভাবে থেকেই জবাব দেয়—শুনছি।

—শুনছ, কিন্তু বুঝতে পারছ না।

মধুমালা মাথা দোলায়।

—কেন পারছ না? আমি বাংলায় বলছি—তোমার মাতৃভাষায়।

মধুমালা তবু মাথাটা নাড়ে।

আর অমনি দিব্য ডান হাত তার বাঁ কাঁধে থাবার মত ফেলে ঘাড় ঘুরিয়ে দিতেই মধুমালা মুখ তোলে। তাকায়। কিন্তু মুখে অন্য রকম চাপা হাসি—অর্থাৎ কোন ধ্বনির যেমন প্রতিধ্বনি। হাসিব প্রতিফলনই বা। এ কিসের হাসি, তা বোঝাবার চেষ্টা পন্ডশ্রম। হয়তো একটা স্বাভাবিকতা। সে বলে—কিন্তু আর কাকেও পেলেন না? আমাকে বাগে পেয়েই শোনাতে দৌড়লেন? বাঃ

দিব্য মুখ নামায়। সত্যি তো। কেন এই এঁচোড়ে পাকা মেয়েটাকে দেখামাত্র কনফেশনের নেশা চড়ে গেল তার মাথায়? একটা যুক্তি হাতড়ায় সে। মনে পড়ে যায়, স্টেশনে বসে চা খাবার সময় একটু দূর থেকে সকালের রোদে ঝলসানো একটা সৌন্দর্য দেখে আপনমনে ও মুগ্ধতায় ঠোঁট দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল—বাঃ। এবং সঙ্গে সঙ্গে কাল সন্ধ্যা থেকে সারারাত, ভোর ও সকাল অব্দি চাপা মাথাকোটা যন্ত্রণার ছটফটানি এক চুমুকেই যেন পান করে নিয়েছিল সেই সরল সৌন্দর্য। এখন সে এত কাছে চলে এসেছে, দিব্য সামলাতে পারেনি নিজেকে। কিন্তু এখন একদমে হুড়মুড় করে বলে ফেলার পর নিজেরই খারাপ লাগতে থাকে। নিজের ওপর রাগ হয়। মেয়েটা হয়তো বোকাহাবা, ভেতরে ভেতরে গো বেচারা, নিতান্ত খুকু—কী করতে কী করে বসবে, উদ্বেগ জাগছে।

মধুমালা আবার বলে, মুখটা গম্ভীর—বাবা আইন জানেন। আসামী খালাস করেন। বাবাকে বললেই পারতেন। কত বিচ্ছিরি-বিচ্ছিরি কেসের আসামী খালাস করেছেন বাবা।

দিব্য দ্রুত মুখ তোলে। রূঢ়স্বরে বলে—না তা নয়।

—তাছাড়া কী? মানুষ মেরেছেন। মেরে পালিয়ে এসেছেন। ফেরারী আসামী হয়েছেন। মোক্তারবাবুদের কাছে যান। ....বলতে বলতে এতক্ষণে মধুমালা খিল খিল করে হেসে ওঠে।

দিব্য অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। রাগ, বিরক্তি ও গ্লানি ঢেকে শান্তভাবে বলে—তুমি কী পরামর্শ দেবে, তা শোনার জন্য কিছু বলিনি তোমাকে।

—হুঁ, বলেছেন, আমার বাবা মোক্তারী করতেন কোর্টে—তাই। আইন জানেন—তাই। সরাসরি ওঁকে বলতে পারেননি, লজ্জার খাতিরে। হাজার হলেও শঙ্কুর বাবা, গুরুজন। কোনমুখে হুট করে বলা যায়? তাই আমার থ্রু দিয়ে। বেশ বুঝেছি বাবা!.....মধুমালার গল গল করে কথা বের হতে থাকে। আবার বলে—হুঁ, এসেই ধরে ফেলেছেন যে ছাই ফেলতে আমিই ভাঙা কুলো! আজ সকালে যেমন আপনাদের আনতে স্টেশনে চাকর পাঠানো হল না! খুকু, তুইই যা। ছাই ফেলতে এই ভাঙা কুলো সবতাতেই। একটু দম নিয়ে ফের বলে সে—ঠিক দাদাও এমন করেছে কতবার। আমার থ্রু দিয়ে বাবাকে ধরেছে। এই খুকু, বাবাকে বলিস্ না ভাই! সুকুমারের গলার স্বর ও ভঙ্গী নকল করে মধুমালা।

দিব্য সোজা হয়ে বসে চাপা গর্জায়—না।

মধুমালা একটু ভড়কে যায়। তাকায়, নিষ্পলক। ঠোঁটের হাসিটা গালের চামড়ায় সরে যেতে মিলিয়ে

যায় কানের দিকে। মনে হয়, হাসিটা সোনার রিঙের মধ্যে গিয়ে মিশল এবং ওত পেতে থাকল। সুযোগ পেলেই ঝাঁপিয়ে আসবে।

দিব্য শ্বাস-প্রশ্বাস মিশিয়ে বলে—ভেবেছিলুম তোমাদের এখানেই কয়েকটা দিন থাকব। তারপর চলে যাব কোথাও। কোথায় যাব কিংবা কী করব সেটা ঠিক করবার জন্য কয়েকটা দিন সময়ের দরকার ছিল। তাই অন্ততে একজন বিশ্বাসী কারও আমার ব্যাপারটা জেনে রাখা ভাল ছিল। সে আমাকে গার্ড দিত। হ্যাঁ—বাড়ির অন্তত এমন একজন, যে আমাকে ঘৃণা করবে না, ভয় পেয়ে হুলস্থূল বাধাবে না—স্বাভাবিক বলে মেনে নেবে। এমন একজন—যে সবসময় আমাকে বাইরের কোন মুভমেন্ট আঁচ করে তক্ষুনি জানাবে। এইসব ভেবেছিলুম আমি। সুকুমার? অসম্ভব। তার নার্ভের খবর আমার জানা আছে। সে ভীতু ছাপোষা কেরানী মানুষের একটা টাইপ। আর শান্ত? একটা ক্লাউন। ওর মনটা নিক্তি দিয়ে মাপলে দশগ্রামের বেশি হবে না। শোনামাত্র আমার কাছ থেকে দিশেহারা হয়ে দৌড়ে পালাবে। তুমি বলছ তোমার আইনজ্ঞ বাবার কথা। আই ডাউট—তিনি জেনে শুনে এমন একজনকে বাড়িতে আশ্রয় দেবেন কি না! তোমার মায়ের তো প্রশ্নই ওঠে না। উনি সম্ভবত হোসিয়ারিওলার ছেলেটাকে জামাই করার সুযোগ খুঁজছেন।

মধুমালা সঙ্গে সঙ্গে ঝটপট বলে ওঠে—খুঁজছেন তো! সেজন্যেই তো আমি বাড়ি থেকে চলে এলুম কপালীর মন্দিরে। সেজন্যেই তো দুঃখ হয়েছিল আমার। কান্না পেয়েছিল। মায়ের কথা শুনে, জানেন আমি আকাশ থেকে পড়েছি। মা এমন ট্রেচারী করবে, ভাবিনি।

দিব্য একটু হাসে। মধুমালা মুখ ঘুরিয়ে ফেলেছে। কান্না এসে গেছে হয়তো। সে আবার হাত রাখে ওর কাঁধে। —শান্ত তোমার যোগ্য নয়।

ক্ষুব্ধ মধুমালা বলে—থাক। ন্যাকামি করবেন না। আপনিই তো ওকে এনেছেন। এমন হয়েছিল তো একা এলেই পারতেন।

—না, আমি আনিনি। বরং আমিই এসেছি ওর সঙ্গে। সুকুর কথা আমার মাথায় ছিল না। হঠাৎ শান্তর সঙ্গে দেখা হল এক জায়গায়। বলল, সে সুকুর এখানে আসছে। আমি বললুম, যাব। কারণ, তখন আমি তো রাস্তায় নেমেছি। পালিয়ে বেড়াচ্ছি। তাই ওকে আঁকড়ে ধরলুম তক্ষুনি। রাতে ওদের বাড়িতে ওর সঙ্গে এক বিছানায় কাটিয়ে ভোর চারটের ট্রেন ধরলুম শেয়ালদায়। সারারাত ঘুমোইনি। আজ সকালে স্টেশনে নেমে জায়গাটা দেখতে দেখতে মনে হল, আমি এখানে নিরাপদ। তারপর, জানো। তারপর হঠাৎ প্লাটফর্মে দেখলুম তোমাকে—কী যে লাগল! সব আতঙ্ক, ছটফটানি, গ্লানি তক্ষুনি পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এখন কী লাগছে, জানো? আগে তোমার সঙ্গে চেনা থাকলে.....

দিব্য আবেগ সামলে নিয়ে চমকে ওঠে। সুকুর বোনের চোখে আবার জল টল টল করছে। দূরের দিকে দৃষ্টি। অস্পষ্টভাবে সে বলে ওঠে—কেন এসব বলছেন আমাকে?

—বলতে ভাল লাগছে।

—আমার সঙ্গে চেনা থাকলে কী করতেন?

—স্কাউন্ড্রেলটাকে মারতুম না। সহজেই ক্ষমা করতে পারতুম। শুধু তাকে কেন, পৃথিবীর সবাইকে ক্ষমা করা যেত। শুধু তোমার খাতিরে মধুমালা!

—আমি কী? কেন আমার খাতির?

দিব্য মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে মাথা দোলায় শুধু। কপালে তিনটে ভাঁজ আবার স্পষ্ট ফুটে ওঠে। বড় বড় দুই চোখের বিশাল মুগ্ধতা জ্বল জ্বল করে। তখন মধুমালা মুখ নামায়। তার বুক ধুক ধুক করতে থাকে অজানা ভয় অথবা উদ্বেগে! উরু ভারি লাগে। অবশ হয়ে যায় সারা শরীর। পৃথিবী যেমন নক্ষত্রের দিকে দৃষ্টি রেখে মহাশূন্যে ভেসে চলে—দুর্জ্ঞেয় এক নৈসর্গিক নিয়মে, অসহায়, ইচ্ছা-নিরপেক্ষ তেমনি করে তাকিয়ে মুখ নামায় মধুমালা।

প্রজাপতিটা এসেছিল! সাদা ফুটফুটে কুচুটে প্রজাপতিটা। ছটফটে। মেরে ফেলল। হাত ভরে গেল সাদা গুঁড়োয়—সবুজ রক্তে। কিন্তু আবার একটা এল। ওর বুকে বসে পড়ল। আবার উড়ে গেল।

মধুমালা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে সেই মিরাক্ল্। এখন দুটো প্রজাপতিই উড়ে বেড়াচ্ছে জঙ্গলে। সারা দৃষ্টি জুড়ে দুটো সাদা ছটফটানি। মন কেমন করে—শুধু কেমন করে।.....

হঠাৎ দিব্য বলে ওঠে—তুমি আমাকে ঘৃণা করছ?

—উঁ?

—আমি মার্ডারার, মধুমালা। খুনী। কিন্তু তোমাকে তো বলেছি, কেন অসীমকে আমি খুন করলাম। হয়তো করতুম না, এড়িয়ে যেতুম। কিন্তু দিনের পর দিন শুয়োরের বাচ্চা আমায় ব্ল্যাকমেইল করে যাচ্ছিল। কবে কোথায় খেয়ালের বশে কী করেছি, সে মোহ ভেঙেছে, এম.এ পরীক্ষা দিয়েছি, পাস করেছি, সাধারণ মানুষের মত লাইফটা কাটাতে চাইছি। ব্যাংকে একটা মোটামুটি ভাল চাকরিও পেয়েছি। হঠাৎ দেখি, একদিন অন্য ব্রাঞ্চ থেকে বদলী হয়ে এল অসীম মজুমদার। বাস্টার্ড! সিক্সটি সেভেনে পার্টির এ্যাকশন স্কোয়াডের লিডারের কিছু চিঠি—পার্সোনাল চিঠি সেগুলো, ওর কাছে রেখে দিয়েছিলুম। তখন আমার ছোটাছুটির সময়। তাই। চিঠিগুলোতে অন্য কিছু প্রমাণ হবে না—হবে যে কোথায় কাদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল। তারপর, পরে মোহ কাটিয়ে কলকাতা ফিরে শালাকে আর খুঁজেই পেলুম না। এ্যাদ্দিন বাদে হঠাৎ আবিষ্কার করলুম, ও একই ব্যাংকে আমার মত চাকরি করছে।.....

দিব্য দম নিয়ে ফের বলে—এই একবছরে কয়েকহাজার টাকা ক্যাশে এবং মদে বাস্টার্ডকে উপহার দিতে হয়েছে। মাসের পয়লা তারিখে মাইনে পেলেই ও সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রথমে ধার চেয়েছে, ফ্যামিলির দায়টায় নিয়ে কান্নাকাটি ভ্যাজর ভ্যাজর করেছে, তারপর আস্তে আস্তে নিজের মূর্তি ধরেছে। আশ্চর্য, আমি হঠাৎ এত বদলে গিয়েছিলুম এই ক'বছরে—ভীতুর ভীতু বোকার বোকা, ছাপোষা নিরীহ গেরস্থের মত! বাইরে বেলবটস, ভেতরটা শ্যাবি—দীনহীন, পোড় খাওয়া রোগা নেড়ি কুকুর। যত টের পেতুম ভেতরের এই অবস্থাটা, তত স্মার্ট হতে চেষ্টা করতুম। সেজেগুজে থাকতে চাইতুম। এখনও সেই টাইপটা দেখতে পাচ্ছ! নিজের ওপর ঘেন্না হত, মধুমালা। ঘেন্না হত, রাগ হত। ক্ষেপে যেতুম। কলেজ জীবনে রাইফেল ছোঁড়ায় নাম ছিল। টিপ অব্যর্থ ছিল। প্রথম পলিটিক্যাল স্পষ্ট পড়তে না পড়তে রাইফেলটা নিয়ে নিল পুলিস। তারপর....

একটু চুপ করে থেকে সে বলে—গুছিয়ে বলতে পারছিনে মনের অবস্থাটা কোথায় দাঁড়িয়েছিল। নিজের প্রতি সেই ঘৃণাকে চরমে তুলে দিল অসীম মজুমদার। এই শালা লাইফ! লাথি মারো! আমি ডিসিশন নিলুম। ঠান্ডা মাথায় এগোলুম টার্গেটের দিকে৷ কাল সন্ধ্যা ছ'টায় ওর বাসায় গেলুম। ওর স্ত্রী চেঁচিয়ে উঠল। ওর ছেলেমেয়েরা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল। পালিয়ে এলুম। ওঃ! এই শালা লাইফ! সব মনে পড়ে যাচ্ছে।

দুহাতে মুখ ঢাকল দিব্য। মধুমালা ওর কাঁধে হাত রেখে বলে—এক কথা হাজারবার বললে কষ্ট হবে না আমার? যেচে পড়ে এইসব ভ্যান ভ্যান ভ্যাট! চুপ করে থাকতে পারেন না?

দিব্য মুখ তোলে না দেখে সে ডাকে—দিব্যদা! এই! শুনছেন?

দিব্য শূন্যদৃষ্টে তাকায়।

—এসব তখন ভাবেননি কেন? এখন আর পস্তে কী হবে, শুনি?

কী নাবালিকা মেয়েটি! দিব্য কষ্টে একটু হাসে। মাথা নেড়ে বলে—না, পস্তাইনি।

—তবে এসব কথা কেন? জানতেন না, ছেলেমেয়ে বউয়ের সামনে কাকেও খুন করলে তাদের মনে কী হয়? একটা মানুষের বড় হতে কত সময় কত কষ্ট লাগে বোঝেন না? এম.এ.পাশ করেছেন?

দিব্য আস্তে বলে—আমার ফাঁসি যাওয়া উচিত তাই না মধুমালা?

মধুমালা জোরে মাথা দোলায়। —না, আমি তা বলিনি।

—আমার ধরা দেওয়া উচিত, কী বলো?

—না, না, না। আমি তা বলিইনি।

—তবে কী বলছ?

অন্তত দু' মিনিট চুপ করে থাকার পর মধুমালা খুব শান্ত ও স্বাভাবিক গলায় বলে—কপালীর মন্দিরে এসেছিলুম মন খারাপ নিয়ে। কতবার এসেছি। এলে লুকিয়ে কেঁদেছি, মানত মেনেছি—তখন মন ভাল হয়ে গেছে। হাসতে হাসতে ফিরে গেছি বাড়িতে।

—আজ?

—আজ? আমার আর বাড়ি ফিরতেই ইচ্ছে করছে না ...

মদনবুড়ো পাখি তিনটে নিয়ে বাড়ি ঢুকতেই মন্দিরা তেড়ে যান—এস, মহিষাসুর এস এতক্ষণে! ঢাকঢোল বাজুক! কী করছিলে বকুলতলায়? এ্যাঁ? যাকে নিয়ে গেলে, তাকেই বা কোন আক্কেলে বনজঙ্গলে একলা রেখে সঙের মত চলে এলে? এতটুকু বুদ্ধি হল না যাট বছরে নাবালকের? আবার দাঁত বের করে হাসা হচ্ছে?

মদন বলে—কলকাতার বাবুর হাতে অস্তর আছে। কপালী জঙ্গলে আর বাঘ নাই। ইদিকে মালুদি শুনলুম গিয়ে বসে-বসে কথা বলছেন।

দোষ খন্ডনের জন্য আর বেশি কথা খরচের দরকার হবে না, মদন এটাই যথেষ্ট মনে করছে। গেনুর মা বলে—আজ যে মহিষাসুর বড় মুখ করে হাঁক ছাড়ছে গো! কথা ফুটেছে।

মন্দিরা ধমক দিয়ে বলেন—কৃতার্থ করেছে। এখন ছোটবাবুকে দেখিয়ে নিয়ে এসো শিকারগুলো। কখন থেকে বলে পাঠাচ্ছে, মদনদা ফিরল নাকি। হাঁদারাম!

মদন থপ থপ করে এগোয়। ধুপধাপ পা ফেলে সিঁড়ি ভাঙে। হাঁটুর হাড়ে মট মট শব্দ ওঠে। সিঁড়ির উপর ধাপে জগা কলরব করে—পাখি! পাখি!

মদন নিঃশব্দে ঢোকে। পাখিসুদ্ধ ঝুঁকে প্রণাম করে। তারপর হাত তুলে দেখায় পাখিগুলো।

সুকুমার গম্ভীরমুখে বলে—দিব্যবাবু কোথায়? নীচে?

মদন দাঁত বের করে। —আজ্ঞে না। কপালীর জঙ্গলে মালুদির সঙ্গে বসে আছেন। শান্ত সুকুমারের দিকে তাকায়। সুকুমার বলে—খুকুর সঙ্গে?

মদন মাথা দোলায়।

ঘরে গুমোট ভাব কিছুক্ষণ! তারপর সুকুমার বলে ওঠে—আশ্চর্য! তা, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? আমরা কি পাখিগুলো গিলে খাব, বুদ্ধু কোথাকার?

পাঁচ

—বারে বারে রোদে যাসনে, সানস্ট্রোক হবে। সুকুমার বলেছে শান্তকে। ছাদে ঝাঁ ঝাঁ রোদ আর প্রায় লু বইছে। তার মধ্যে বার বার শান্ত দক্ষিণের দরজা দিয়ে ছাদে ঘুর ঘুর করে আসছিল। দু-একবার জিগ্যেস করেছিল, নদীটা কোনদিকে। তার মুখটা থমথমে। সুকুমার লক্ষ্য করেছে সেটা। ভেবেছে, দিব্যর রিভলবারই ওকে ক্ষুব্ধ করেছে।

কিন্তু শান্ত ক্রমশ রিভলবারের কথাটা ভুলে গেছে। দিব্য তার হামলার লক্ষ্য এখন। হ্যাঁ, দিব্যর এই ঈর্ষাজনক ক্ষমতাটা আছে, সে জানে। শালা মানুষ পটাতে ওস্তাদ। কথা কম বলে, বাঁকা চোখা মন্তব্য করে, স্পষ্টভাষী—অথচ লোকগুলো পটেও যায়। কিন্তু এখনে আসা মাত্র কখন কোন ফাঁকে সুকুমারে বোনকে পটাল, সে খুঁজেই পাচ্ছে না। গোয়েন্দার মত দিব্যর গতিবিধি ঘড়ির কাঁটার হিসেবে সে মিলিয়ে নিচ্ছে—কখন দিব্য বেরোল, বাইরে কতক্ষণ ছিল, কীভাবে মেয়েটার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হল—এ নিয়ে একটা প্রকল্প সে দাঁড় করাচ্ছে। সবচেয়ে অবাক লাগে মেয়েদের কান্ড দেখে। বরাবর সে দেখেছে, যতসব মস্তান মার্কা বাজে ছেলেদের সঙ্গেই সুন্দরী মেয়েরা ঘুরছে। এখানেও তাই হল। আসলে মেয়ে জাতটাই এমন। নিজে থেকে বদমাইসের পাল্লায় পড়ে! শেষটা গন্ডগোল হলে কোর্টে দাঁড়িয়ে সোজা বলে দেবে—ধর্মাবতার, আমি সরলা অবলা বালিকা। ওই লোকটা ভুলিয়ে-ভালিয়ে আমার সর্বনাশ করেছে। আশ্চর্য! জজসাহেবও তাই বিশ্বাস করেন! খবরের কাগজে লেখা হবে, ভুলিয়ে ভালিয়ে অর্থাৎ প্ররোচিত করে আসামী এই যুবতীর শ্লীলতাহানি ঘটায়। খুকী তুমি! গাল টিপলে দুধ বেরোচ্ছে? যখন আগুনে হাত বাড়াচ্ছিলে, জানতে না হাত পুড়ে যাবে? তুমি ঠিক থাকলে কে তোমার কড়ে আঙুল ছুঁতে পারে শুনি! হুঃ, আসলে ব্যাপারটা হয়েছে এই। নিছক গাঁয়ের মেয়ে। কলকাতার এক ব্রাইট মাস্তানকে দেখেই চোখ ধেঁধে গেছে। শান্ত অস্ফুট স্বগতোক্তি করেছে—এ্যান্ড শী হ্যাজ লস্ট হার সেন্স এ্যান্ড আইজ।

শেষবার ঘুরে এসে শান্ত বলে—ওরা আসছে।

সুকুমার অন্যমনস্কভাবে বলে—কারা?

শান্ত ইচ্ছে করেই ব্যাপারটা সুকুমারকে ধরিয়ে দিতে চায়। বলে—তোর বোন। মানে দিব্যকে নিয়ে আসছে। জঙ্গলে পথ-টথ হারিয়ে ফেলেছিল নিশ্চয়। ...শান্ত হো হো করে নিষ্প্রাণ হাসে।

সুকুমার বলে—হবে। তবে খুকু একটু খেয়ালী টাইপের, নিশ্চয় টের পেয়েছিস? ছেলেবেলা থেকেই ঘুরে বেড়ানো অভ্যাস। কতবার স্কুল পালিয়ে ওপারে জঙ্গলে কুল খেতে গেছে। বাবা খুঁজতে লোক পাঠিয়েছেন। ভীষণ জংলা টাইপ ছিল তখন। আজকাল আর ততটা নেই। স্বভাবও বদলে যাচ্ছে।

শান্ত গম্ভীর হয়ে বলে—পাড়াগাঁয়ে এভাবে যেখানে-সেখানে মেয়েদের পক্ষে ঘোরা বোধহয় রিস্কি। তাই না?

সুকুমার মাথা নাড়ে। —নাঃ। কিসের রিস্ক? তাছাড়া বাবাকে এলাকার সবাই একটু ভয়টয় করে। আমাদের বাড়ির মেয়েরা সারারাত মাঠে ঘুরে বেড়ালেও যমে ছোঁয় না। প্রথম এলি তো? এ বাড়ির ট্রাডিশন, ইনফ্লুয়েন্স, প্রেসটিজ খুব আনকমন। দাদু জমিদার ছিলেন কিনা। যাক গে—স্নান করবি কোথায়? বাথরুম অবশ্য আছে— সেখানে মেয়েরা স্নান করে। পুরুষদের জন্যে মুক্তাঙ্গন। নীচে বসার ঘরের বারান্দায়—যেখানে ওয়াশ করলি, আর কুয়োতলায় এবং একটু বেপরোয়া হলে পুকুরে। ওই তো পুকুর—আমাদেরই। বাঁধানো ঘাট আছে। জলটাও ভাল।

শান্ত বলে—আমি ভাই পুকুর-টুকুর নয়, খোলা বারান্দাতেও নয়—কুয়োতলায় যাব।

—তাই যাস। নিরিবিলি ওদিকটা। বাড়ির বাইরে—নেকেড হয়ে চান করলেও কেউ দেখার নেই। —সুকুমার হাসতে থাকে।

—সে দিব্যটা পারে। ও ঠিক তাই করবে দেখবি।

সিঁড়ির মুখে চটির শব্দ হল। তারপর দিব্য ঢুকল। ফর্সা সাহেবী রং তামটে, পুড়ে বিকৃত মুখ, বন্দুকটা আগে দেয়ালে সাবধানে ঠেস দিয়ে রাখে সে। তারপর পকেট থেকে দুটো তাজা কার্তুজ বের করে সুকুমারের দিকে এগিয়ে যায়।

সুকুমার তাকিয়ে আছে। হাত বাড়িয়ে কার্তুজ দুটো নিয়ে বলে—একটা বাজে খরচ মোটে। আমি হলে তো দুটোই যেত। তুই সাংঘাতিক শিকারী দেখছি!

দিব্য জামা খুলতে খুলতে বলে—একটা তোর বোন ফায়ার করেছে।

সুকুমার চমকে উঠে বলে—খুকু?

—খুকু আর খুকু নয়! শী ইজ এ রিয়্যাল লেডি। বলে দিব্য হাসে এবং সোফায় গিয়ে বসে। সিগ্রেটের প্যাকেট তার হাতে। জামাটা সুকুমারের খাটে পড়ে আছে। শান্তকে বলে—দেশলাই দে। আমারটা শেষ। ফেলে দিয়েছি।

শান্ত নিঃশব্দে দেশলাই দেয়। দিব্য সিগ্রেট ধরিয়ে রিং পাকাতে থাকে। সুকুমার বলে—খুকু কিসে ফায়ার করল?

—শূন্যে।

শূন্যে?

—আকাশে।

তারপর স্তব্ধতা। একমিনিট, দুমিনিট, তিনমিনিট গেল। তখন দিব্য বলে—কী হয়েছে তোদের?

সুকুমার শুকনো হেসে বলে—কী হবে? কিছু না।

হঠাৎ ঘোরে দিব্য। শান্তকে বলে—তুই আমার ব্যাগে হাত দিয়েছিলি?

শান্ত থতমত খেয়ে বলে—কে বলল যাঃ?

দিব্য উঠে দাঁড়ায়। ব্যাগটার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলে—নিশ্চয় হাত দিয়েছিলি। আমার ব্যাগটা এই পজিশনে ছিল না। আর এই বইটাও ছিল তলায় গোঁজা—এখন উল্টোদিকে বেরিয়ে আছে।

শান্ত জোরে হাসে। —সিগ্রেট চুরি করতে গিয়েছিলুম।

দিব্য ততক্ষণে ব্যাগের ভেতর হাত ভরে সব দেখাশোনা করছে। ভুরু কুঁচকে বলে—কিন্তু সিগ্রেট নিসনি।

—নাঃ!

—নিসনি, অথচ বলছিস সিগ্রেট চুরি করতে গিয়েছিলি।

—ভেবেছিলুম ...

কী ভেবেছিলি?

সুকুমার চাপা অস্বস্তিতে অস্থির হয়ে বলে—দিব্য! প্লীজ!

—শান্ত, তুই এই প্যাকেটটাও খুলেছিলি?

শান্ত নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে তার দিকে। সুকুমার ব্যস্তভাবে ফের বলে—দিব্য! প্লীজ—ছেড়ে দে। স্নানের সময় হয়েছে, রেডি হ। দেড়টা বাজে প্রায়।

—এই বাফুন! কথা বলছিস না কেন? হোয়াইট ডিড ইউ পুট ইওর ন্যাষ্টি হ্যান্ড ইন মাই ব্যাগ?

তখন শান্ত একটু হসে। বাঁকা ধরনের হাসি। —বেশ করেছি।

এক পা এগিয়ে যায় দিব্য, একহাতে ব্যাগ।

শান্ত দ্রুত বলে—যাঃ বাব্বা! মাল-টাল আছে নাকি খুঁজতে গেলুম—তাতে এমন কি হয়েছে? তুই কি মেয়েছেলে—না স্মাগলার যে এত টপ সিক্রেট কারবার?

দিব্য আর এক পা এগোতেই সুকুমার চাদর ফেলে ধুড়মুড় করে ওঠে। ছুটে এসে মাঝখানে দাঁড়িয়ে দিব্যর কাঁধে হাত রাখে।—দিব্য! দিব্য প্লীজ ভাই। সিন ক্রিয়েট কবিসনে। মুখ দেখাতে পারব না বাবা-মাকে! তোদের কত প্রশংসা করেছি—ছি—ছি!

দিব্য হিস হিস করে বলে—এটা অন্যের বাড়ি না হত, ওই দেড়েল বাফুনটার দাড়ি ছিঁড়ে ফেলতুম! সব ব্যাপারে ওর নাক গলানো চাই-ই।

সুকুমার ওকে টেনে খাটে নিয়ে যায়। জোর করে বসিয়ে দেয়। তারপর বলে—দিস ওয়াজ কোয়াইট আনএক্সপেকটেড। তোরা না এডুকেটেড ছেলে, দিব্য? ছিঃ। দিব্যি দুজুনে এলি হাসতে হাসতে একসঙ্গে। তারপর হঠাৎ কী যে হল বুঝতে পারছি না আমি! বন্ধুর জিনিসে হাত দিয়েছে - এতে ...

দিব্য বাধা দিয়ে বলে—ব্যাপারটা তা নয়, সুকু।

সুকুমার বলে—তোর এত একসাইটমেন্টের একটা কারণ অন্তত আমি বুঝতে পারছি। দ্য উয়েপন। এই তো? কিন্তু শান্ত তো বাইরের কারও সামনে ওটা খোলেনি। যা দেখার, দেখেছি মাত্র আমরা দুজন। বিলিভ মি, ঘরে তখন বাইরের কেউই ছিল না। আমরা তো বন্ধু আফটার অল। অথচ মনে হচ্ছে, তোকে যেন পুলিসের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হবে। ইফ ইট ইজ এ সিক্রেট, দেন ইট উইল রিমেন এ সিক্রেট।

শান্ত গজ গজ করে এবার। —ওসব কাকে কী বলছিস? আসলে আমারই ভুল হয়েছে ওর সঙ্গে আসা। আসতে চাইল—সকাল সকাল পৌঁছবে বলে নিজেই প্রোপোজাল দিল—বলল, দুপুরে রোদ বেড়ে যাবে। ভোরের ট্রেনে যাওয়াই ভাল। তক্ষুনি ফোন করে ফার্স্ট ট্রেনের সময় জেনে নিলুম—ভোর চারটেয়। তখন নিজে থেকেই বলল—আমার অত ভোরে ঘুম ভাঙবে না, বরং তোর কাছে থাকব। থাকল। তারপর ...

সুকুমার বাধা দিয়ে বলে—থাক। আর ওসব আলোচনা করে লাভ নেই। তোরা এসেছিস, আমি খুশি হয়েছি। ব্যস! কিন্তু এমন হলে সত্যি আমি বড্ড কষ্ট পাব।

দিব্য আস্তে বলে—তোকে কষ্ট দিতে আমি আসিনি, সুকু।

—কিন্তু এই তো দিচ্ছিস।

দিব্য মুখ নামিয়ে বলে—ক্ষমা চাইছি।

—ভ্যাট! ক্ষমা কিসের? ...বলে সুকুমার ওর পিঠে থাপ্পড় মারে। —লেট আস ফরগেট ইট। শান্ত, কোথায় স্নান করবি?

—বললুম তো, কুয়োতলায়।

—দিব্য, তুই?

—পুকুরে।

—জগা, নীচে খবর দে। এঁরা চান করতে যাচ্ছেন!

দিব্য তিন-তিনবার তার বাঁ কাঁধের যেখানটায় হাতের চাপ দিয়েছিল, সেখানটা এখনও কেমন হয়ে আছে। হাতটা এখনও যেন আঁকড়ে ধরে আছে তাকে। ওই প্রথম হাত! আরে, মুখ ঘোরাতে গিয়ে কী একটা গন্ধের ঝাপটানি লেগেছিল। ঠিক ঘামের গন্ধ নয়—এসেন্স জাতীয় কিছু নয়, যা দাদার পোশাক গোছাতে টের পায়—মাঝামাঝি রকমের কিছু। কিছুক্ষণ অন্তর-অন্তর ভেসে আসছে। মধুমালা যত ভাবছে, এসব কিছু না, কিছু না—তত তার লজ্জা। তত আড়ষ্টতা। একলা ঘরে আর মুখ তুলে সোজা দাঁড়াতে পারছে না। তার চারদিক থেকে একটা জোরালো পুরুষতা তার গায়ে ছায়া ফেলেছে। সে টের পায়, এই ছায়া থেকে সে বেরুতে পারছে না, হয়তো আর পারবেও না।

কয়েক মিনিট আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সন্দিগ্ধ চোখে নিজের শরীর দেখে নিয়েছে। নদীর ওপার থেকে ফিরে কিছু কি চোখে পড়ার মত বদল ঘটে গেছে? বাড়ি ঢোকার মুখে তো সে কী হয় কী হয় অস্বস্তি নিয়ে পা ফেলছিল। মায়ের যা চোখ। ধরে ফেলতে দেরী হবে না যে মধুমালার শরীরটাই কত বদলে গেছে। বলবেই। বলবে—ও খুকু, কী হয়েছে তোর?

বলেনি কেউ। সাঁৎ করে নিজের ঘরে ঢুকে পড়েছে থামের আড়াল দিয়ে। প্রথমেই বাঁ কাঁধ শুঁকেছে বার বার। আরাম লাগে, ঘেন্নাও, কিন্তু তারপর যত মিনিটগুলো এগোল, বয়স মিনিটে মিনিটে বাড়ল—সে চম্‌কে চম্‌কে উঠতে থাকল। নিজের কাছে ধরা পড়ার লজ্জায় তার মাথা কাটা যায় যেন।

মধুমালা বাইরে থেকে ঘরে ঢুকেই প্রথমে দুম করে খাটে গড়িয়ে একবার পড়বেই। পা দুটো মেঝেয় থাকবে। হাত দুটো ওপরে এবং চোখ বোজা। দু'এক মিনিট ওভাবে থাকার পর চোখ খুলবে। তারপর হুড়মুড় করে উঠে বসবে। এই তার অভ্যাস।

এখন তার উঠতে ইচ্ছে করছে না। চোখ খুলতে চাইছে না। চোখের পাতা ফেলে রেখে দৃষ্টিহীনতার লাল নীল হরেক রঙা এক আজব অন্ধকারে কাকে খুঁজছে কিছু খুঁজছে। এখন কত সব অলৌকিক দৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু অবশেষে লাল নীল হলুদ রঙের খেলার মধ্যে কে একজন চেহারা ধরে জেগে উঠতে চায়। তার টকটকে ফর্সা রং, লম্বা লম্বা শক্তিশালী আঙুল, কাঁধছোঁয়া অঢেল চুল, বড় বড় চোখ পৃথিবীকেও ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে উদ্দেশ্যহীনতায়।

তন্ময় হয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ সে টের পায়, চোখ খুলে দেখতে পাওয়া পৃথিবীটা কখন অসম্ভব ভরে গেছে এক বিশাল পুরুষের উপস্থিতিতে। অমনি চমকে উঠে চোখ খোলে।

তার মনে হয়, মাথার পিছন দিকে বা শিয়রে—যেখানে কেউ দাঁড়ালে মানুষ কিছুতেই তাকে দেখতে পায় না, সেখানে বন্দুক হাতে দিব্য দাঁড়িয়ে আছে। আবার মধুমালার লজ্জা। আবার বুক ধুক ধুক করে ওঠা। আবার গায়ের চামড়ায় কাঁটা ফুটে ওঠা। সে নিজেকে মনে মনে বলে—এই মেয়েটা! তুই নির্ঘাৎ মরেছিস!

তারপর হঠাৎ মনে পড়ে যায়, দিব্য কেন এসেছে এখানে। দিব্য ফেরারী খুনী আসামী। অমনি মধুমালার বুক তোলপাড় করে এক মহান দুঃখের আবেগ গলা ঠেলে আসে। তার ইচ্ছে করে আকাশ পাতাল কপালীতলা কাঁপিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে—তুমি চলে যাও সামনে থেকে। দূর হয়ে যাও। তোমার মুখ আমি দেখব না। না—না—না।...তুমি অত সুন্দর। তোমার হাতে খুনীর রক্ত। পৃথিবীর মানুষরা তোমার বিচার করবে আজ। অথচ অত ছোট নও তুমি। অনেক উঁচুতো তোমায় দেখেছিলুম—কতবড় আকাশের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলে! না—এসব তোমায় মানায় না! কামিনী গাছটাকে অপবিত্র করা, পাখি আর মানুষ খুন, বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি, হঠাৎ চটে ওঠা বদমেজাজ! তুমি যেদিকে হেসে মুখ ফেরাবে, সেদিকে সকাল হবে। মানুষদের দুঃখ ঘুচবে। যেখানে পা ফেলবে, জেগে উঠবে বাগান। সেই সাদা প্রজাপতিটা কেমন করে তোমার বুক আঁকড়ে বাঁচতে গেল, লক্ষ্য করোনি কি? দুষ্টুছেলে, দেখ তো কী করে বসলে হঠাৎ। কতকগুলো আজেবাজে চাকরবাকর লোক এসে তোমাকে বেঁধে নিয়ে যাবে লোহার গরাদ-ঘেরা খাঁচাকলে। তোমার হাতে-পায়ে শেকল, মাথা ঝুলে পড়বে। তোমার ওপর পৃথিবীর ঘৃণা! কেন? কেন এমন তুমি?...

—খুকু! ও খুকু! শুলি কেন অবেলায়? আচ্ছা মেয়ে বাবা!...মন্দিরা ঢুকেই মেয়ের কপালে আগে হাত রাখেন।—জ্বর বাধাসনি তো? রোদে বাতাসে ঘুরতে এত বারণ করব, শুনবি না তো।

তারপর মেয়ের চোখে জল দেখে মা অবাক হন।—একী রে! কাঁদছিস কেন? কী হল হঠাৎ?

কেউ কিছু বলেছে?

মধুমালা উঠে বসে। রাগ করে বলে—আঃ! পাড়া মাথায় কোর না তো। একটুতেই চেঁচামেচি। মেয়ে যেন আমি একাই আছি কপালীতলাতে।

মন্দিরা অবাক। কিন্তু হাসেন।—ওপারে কেন গিয়েছিলি হঠাৎ? দাদার মত জ্বর বাধিয়ে বসবি যে!

মধুমালা জবাব না দিয়ে আলনা থেকে একটা শাড়ি আর তোয়ালে টানতে থাকে।

—চান করবি? কপাল ছ্যাঁক ছ্যাঁক করছে মনে হল যে!

মধুমালা বেরিয়ে যায়। ঠাকুরঘরের বারান্দা হয়ে স্নানঘরে ঢোকে। ওপরটা খোলা। দরজা বন্ধ করে দেয়। তারপর শাড়ি খুলে ফেলে। জামার একটা ক্লিপ খুলেই একটু লজ্জা পায়। মনে হয়, কেউ তাকে দেখছে। একটু বিরক্তি আসে। ভাবে কয়েকটা মুহূর্ত। তারপর বাঁ কাঁধটা একবার শোঁকে। ফের গা শিউরে ওঠে। তারপর সে এক মগ জল তুলে আস্তে আস্তে মাথায় ঢালতে থাকে। আরামে শরীর জুড়িয়ে যায়। এবং আনমনা ভাবটা কেটে হঠাৎ মনে হয়, কে তাকে দেখছে। তখন দরজার ফাটলে একবার চোখ রাখে। একজায়গায় সাবানের কুচি আঁটা ছিল। খুলে বা গলে পড়েছে কবে।...

এ বাড়িতে আজ যেন উৎসব লেগেছে। কলকলানি কানে ভেসে আসে। সব আয়োজনই সার্থক হত, যদি না গতকাল সন্ধ্যায় কলকাতার একটা এঁদো গলির বাড়ীতে ছেলেবউয়ের চোখের সামনে এক হতভাগা গুলিবিদ্ধ না হত।

পৃথিবীর দূরপ্রান্তের একজন মানুষের ভাগ্যের সঙ্গে অন্যপ্রান্তের একজন বা কয়েকজন মানুষের ভাগ্য কীভাবে যে জড়িয়ে রয়েছে। একটা প্রকাণ্ড সেতারের মতো। কোথাও সূক্ষ্ম আঘাত লাগলে সব তারে ঝনঝন অনুরণন চলতে থাকে কতক্ষণ।

মধুমালার বুকে সেই অনুরণন। ঠোঁট কামড়ে ধরে সে। আবার কান্না পায়।...এভাবে কতক্ষণ ধরে মধুমালা আত্মগোপন করে থাকে। তারপর যখন শুকনো শাড়ি জড়াচ্ছে গায়ে, চুলে তোয়ালে জড়িয়ে রেখেছে—চারু ঠাকুরের হেঁড়ে গলা শুনতে পায় সে।

—হাঁ হাঁ দদ্যাৎ
হুঁ হুঁ দদ্যাৎ
দদ্যাৎ চ করকম্পনে
· শিরঃসঞ্চালনে দদ্যাৎ
ন দদ্যাৎ ব্যাঘ্রঝম্পনে।...

হাঁ হাঁ করলেও দেবে, হুঁ হুঁ করলেও দেবে। হাত নাড়লেও দেবে, মাথা নাড়লেও দেবে। যখন বাঘের মত লম্ফঝম্ফ করবে, তখন দেবে না। হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ!

কী ভাগ্যে নিমতেতো মুখে হাসি ফুটেছে চারুঠাকুরের! মন্দিরা করুণ স্বরে বলছেন—কিছুই তো খাচ্ছ না বাবা। ওইটুকুন খেয়ে মানুষ বাঁচে?

শান্ত বলে—খাচ্ছি তো। শরীরটা ঠিক নেই। আবার যখন আসব, তখন...

—না, না। সে হবে না বাবা। অন্তত তিনটে দিন তো থাকতেই হবে। সুকুর জ্বর ছাড়ুক!

—না না। আজই বিকেলে ফিরতে হবে। কথা দিচ্ছি, আবার...

—সে কী! পাখীর মাংস কে খাবে?

দিব্য বলে—আমি থাকছি। অরিজিন্যাল পাখীর মাংস—নির্ভেজাল! কী বলিস সুকু! তাছাড়া অত পরিশ্রম করে মেরে আনলুম।

সুকুমার হাসে, সে ওই অবস্থায় এসে একটা চেয়ারে বসে আছে। সে দুধ-রুটি খাচ্ছে। তার সুযোগে মাছভাজাও। বলেছে, আজকাল ডাক্তাররা সবই খেতে দেন রুগীকে।

থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে পারিবারিক বিগ্রহ সিংহবাহিনীর উদ্দেশ্যে প্রণাম করতে করতে মধুমালা এইসব শুনতে পাচ্ছিল। তার প্রণাম আর শেষ হচ্ছে না।

প্রমথ গিয়ে দাঁড়ান। মন্দিরা হাঁউমাউ করে বলেন—শান্ত চলে যাবে বলছে এবেলা। শোন ছেলের কথা! কত সব ইয়ে করেছি। এ যে স্বপ্ন দেখার ব্যাপার।

প্রমথ বলেন—সে কী হয় বাবা? এই তো এলে। ঘোরো—দেখ। অবশ্য তোমরা কলকাতার ছেলে। এখানে দেখার কীই বা আছে! তবে কী জানো? মাঝে মাঝে লাংসে ফ্রেস এয়ার ভরে নেওয়া ভাল। খাবার-দাবারও সব হোমমেড। টাটকা এবং নির্ভেজাল।

তারপরই চলে যান। ব্যস্ত এবং রহস্যময় মানুষ। কোথায় যান, কোথায় ঘোরেন, কী করে বেড়ান ভোর পাঁচটা থেকে রাত দশটা অব্দি, এ বাড়ির কেউ বিশদ জানে না! কখনও কুয়োতলায়, কখনও পুকুর পাড়ে—কখনও গাঁয়ের বারোয়ারি তলায়। আবার কখনও বাজারে ভোলাবাবুর হোমিওপ্যাথিব আড্ডায় বসে আছেন।

দিব্য যেন শান্তকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে—বলা যায় না, কালও পাখি মারতে যেতে পারি—পরশু তরশু—অনেকদিন এরকম চলতে পারে। কী রে সুকু? ঘাড় ধরে বের করে দিবি নাকি? প্রহারেণ ধনঞ্জয়?

এই চড়া গলার কথা ফুরোলে সুকুমার বলে—কী বলিস!

আর তার মা শুধু বলেন—বেশ তো! যদ্দিন মন চায়, থাকবে। বলছিই তো থাকতে, বাবা!

কণ্ঠস্বরটা কেমন শুকনো মনে হয় মধুমালার। কথাটা যদি শান্ত বলত, মা দুহাত তুলে ড্যাং ড্যাং করে নাচতেন। মধুমালা হন হন করে বারান্দা পেরিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢোকে।

তোয়ালে খুলে চিরুণী চালায় চুলে। তারপর চিরুণীর চুল এবং জল ঝাড়বার ছলে বারান্দায় আসে। কান করে খাবার ঘরের কথাবার্তা শুনতে থাকে ফের।

দিব্য বলে—সুকু, ইয়ে—মধুমালা খেল না যে? তোদের পারিবারিক রীতিতে পড়ে না সম্ভবত।...এবং সে জোর হাসে।

দিব্য খুব হেসে হেসে কথা বলছে। স্নানের পর অনেকটা বদলে গেছে মনে হয়।

সুকুমার বলে—না, না। মা, খুকু খেলেও পারত একসঙ্গে!

মন্দিরা বলেন—এই তো এতক্ষণে বকে-টকে চান করাতে পাঠালুম! এখনো হয়তো চান করছে।

গেনুর মা ঘোমটা দিয়ে ওখানে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। মধুমালাকে দেখতে পেয়ে চাপা হেসে বলে দেয়—ওই তো মালুদি! চান সারা। চুল আঁচড়াচ্ছে।

—মালু! দাদারা ডাকছে। আয়, একসঙ্গে খাবি! মন্দিরা ব্যস্ত হয়ে ডাকেন।

দিব্য বলে—এক দাদার খাওয়া প্রায় শেষ। রিয়েল দাদা তো রুগী। অবশ্য আমি ওর না খাওয়া অবধি সমানে খেয়ে যাবার কথা দিচ্ছি।

মন্দিরা ভেতরে-ভেতরে বিরক্ত হন। ছেলেটি কেমন বেহায়া এবং কেমন যেন। মুখে হাসি দিয়ে ডাকেন—ও মালু! আয় মা। দাদারা ডাকছে।

দিব্য সত্যি সত্যি ডাকে—মধুমালা! তোমার জন্যে খাওয়া হচ্ছে না। চলে এস।

তখন মধুমালা চুলে চিরুণী গুঁজে খুব স্মার্ট হয়ে চলে আসে। টেবিলের খালি চেয়ারটায় দিব্যর পাশেই হাসিমুখে বসে পড়ে। পাতগুলো দেখতে দেখতে শান্তর উদ্দেশ্যে বলে—আপনার আবার কি হল?

—এ্যাঁ? ঘুম থেকে জাগে শান্ত। তারপর অপ্রস্তুত হাসে।—নাঃ! কী হবে?

এদিকে মন্দিরা ও সুকুমার একটু অবাক হয়েছে। বড় বেশি বাচালতা প্রকাশ করছে যেন মধুমালা। পাগলামি আরও কত শুরু করবে, ঠিক নেই। ওকে ডাকার ইচ্ছে ছিল না এসব কারণে। মন্দিরা মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বলেন—ও কী রে? অমন করে কথা বলে নাকি?...ঠাকুর মশাই! মালুকে ভাত দাও।

মধুমালা দুষ্টু হেসে বলে—খিদে পেয়েছে। প্রচুর ভাত দাও।

দিব্য বলে ওঠে—আমাকেও সেকেণ্ড রাউণ্ড। সুকু, তোরা দেখে যা শুধু।

মন্দিরা বারান্দায় চলে যান।' এ-ছেলেটা কেমন যেন। বড্ড অসভ্য লাগে হাবভাব।...

শান্তকে কিছুতেই আটকানো গেল না। মন্দিরা—এমন কি প্রমথ পর্যন্ত সাধাসাধি করলেন। তবু সে যাবে। দিব্য তখন বাগানে গিয়ে সিগ্রেট টানছে। মধুমালা তাকে তার লাগানো গাছপালার সঙ্গে

পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। বাড়ির পশ্চিমে সেই কামিনীগাছের কাছে গিয়ে মধুমালা হঠাৎ লজ্জা পেয়ে মুখ নামায়। দিব্য মিটিমিটি হাসে।—ওটা তোমার গাছ জানতুম না!

—যারই হোক, গাছপালার ওতে অপমান হয়। ওদেরও তো প্রাণ আছে।

—আছে নাকি?

—তাও জানেন না? আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু আবিষ্কার করেছিলেন...

দিব্য হো হো করে হাসে।—খুকু, তুমি রিয়্যালি খুকু। আচার্য বোসের আবিষ্কার অন্য।

—অন্য মানে?

—সায়েন্স নিয়ে কলেজে ভর্তি হয়ো। কেমন? সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে।

—ভ্যাট্! বাবা-মায়ের কন্‌স্‌পিরাসি চলছে, বললুম না।

—বললে নাকি? কখন?

—যান! আপনার কিছু মনে থাকে না। ভেবেছিলুম...

—কী ভেবেছিলে, মধুমালা?

—তেমন কিছু হলে আপনার সাহায্য পাব।

—কী সাহায্য, কেমন সাহায্য, মধুমালা?

—জানি না। এমনি লেগেছিল।

—কিন্তু আমি তো এ্যাবস্কণ্ডার! ফেরারী খুনী আসামী!

মধুমালা মুখ তুলে ওকে একবার দেখে মুখটা নামায়। অন্তত এক মিনিট পরে মাথাটা একটু দুলিয়ে বলে—ভুলে যাই, মনে থাকে না!

দিব্য বলে—হ্যাঁ, আমারও।...

তখন প্রমথ নিজেই এগিয়ে দিতে যাচ্ছেন শান্ত বাবাজীকে। গেটে রিক্সা এসেছে। সুকুমার ছাদে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে। মন্দিরা নীচে বাইরের চত্বরে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছেন। গেট থেকে রিক্সাটা চলে গেলে তিনি ঘুরে দাঁড়ান। দেখতে পান, বোগেনভিলিয়ার ঝোপের সামনে মধুমালা আর দিব্য দাঁড়িয়ে আছে। পিছনে লাল ও সাদা লক্ষ লক্ষ ফুল। চোখ জ্বলে যায় মন্দিরার। বুকটা ছাঁৎ করে ওঠে। ভাবেন, ডাকবেন খুকুকে—পারেন না। ভদ্রতায় বাধে। আস্তে আস্তে বাড়ি ঢুকে পড়েন। টানা বারান্দা ঘুরে ওপরে ছেলের ঘরে যান। তারপর ছাদে ছেলের পাশে গিয়ে দাঁড়ান। বড়রাস্তায় দূরে রিক্সাটা সবে ঢুকছে। ট্রেনের আর দেরী নেই।

—সুকু! হাওয়া লাগবে, ঘরে আয়।

—যাই।

—সুকু!

—উঁ?

—ও কি সত্যি সত্যি থাকবে?

—কে? দিব্য? হ্যাঁ—বলছে তো থাকবে। থাক্ না।

—কিন্তু ছেলেটা ভাল নয় রে। তখন দেখেই কেমন লেগেছিল। তারপর জগা একটু আগে বলল, ওর কাছে পিস্তল আছে, তোরা ওর ঝোলা হাতড়ে বের করেছিলি—সত্যি নাকি রে?

সুকুমার চমকে উঠেছিল। আস্তে বলে—জগা দেখেছিল? হ্যাঁ—আছে। আজকাল এইসব ব্যাপার হচ্ছে, মা। ছেড়ে দাও। স্টেনগান নিয়ে ঘুরে বেড়ায় ছেলেরা। আমাদের কী?

—কিন্তু খুকুর সঙ্গে ও যেন বড্ড বেশি মাখামাখি করছে।

—করুক না।

—না।

মায়ের কঠোর স্বর শুনে সুকুমার তাকায়। কিছু বলে না।

—ছেলেটা অসভ্য। তখন শুনলাম পুকুরে ল্যাংটো হয়ে চান করতে নেমেছিল। এ-ঘাটে ও-ঘাটে বউ-ঝিরা থাকে। হয়তো কতজনে দেখেছে। কী বলবে তারা? গাঁ জুড়ে ঢি ঢি পড়বে না? তার ওপর ওই ছেলের সঙ্গে খুকু নাকি কপালীর জঙ্গলে ঘুরেছে। দুলে বউ দেখেছে। এতক্ষণ তো বাড়ি-বাড়ি

খবর পাচার হয়ে গেছে। ওকে পষ্টাপষ্টি বলে দে—চলে যাক্।

সুকুমার কাঁচুমাচু মুখে বলে—ছি ছি! সে কি বলা যায় নাকি?

—তাহলে আমিই বলব।

—মা! না, না। দোহাই মা, লক্ষ্মীটি! এতে আমাকে অপমান করা হবে। হাজার হলেও একসময় ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম। তাছাড়া—তুমি জানো না, তোমাদের জানাইনি—অনেকবার ইউনিভার্সিটিতে অনেকের সঙ্গে ছাত্র ইউনিয়নের ব্যাপারে গণ্ডগোলে পড়েছি। দিব্য আমার পিঠ বাঁচিয়েছে। ও না থাকলে আমার পড়াশোনাও হত না, হয়তো কবে মার খেতুম।

মন্দিরা একটু চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার পর আস্তে আস্তে চলে যান। সুকুমার মা-র চলে যাওয়া দেখে। তারপর তার মনে হয়, শীত-শীত ভাবটা বেড়ে যাচ্ছে একটু করে। জ্বরটা আবার আসছে। বিকেলের রোদ মিঠে লাগছে। সে ভাবে আরও কিছুক্ষণ রোদটা নেবে। পশ্চিমের কার্নিশে গিয়ে সে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়। তারপর মুখ ঘোরাতেই চোখে পড়ে, নীচে বাগানে দিব্য আর খুকু দাঁড়িয়ে গল্প করছে। একবার দেখেই মুখ ফিরিয়ে নেয় সে। মনটা হঠাৎ দুঃখে ভরে যায়। বোনেব নতুন ছোট্ট হৃদয়টার কথা ভেবে সে ছটফট করে ওঠে। এ কী করছে খুকু!

এবং সে আর দাঁড়াতে পারে না। ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। কাঁপতে কাঁপতে জড়ানো স্বরে ডাকে—জগা! জগা! লেপ চাপিয়ে দিয়ে যা।...

ছয়

সুকুমারের জ্বর রাতের দিকে বেশ খানিকটা বেড়েছিল। জগন্নাথ ডাক্তার এসেছিলেন। বুকে ঠাণ্ডা জমে গেছে খুব। সকালে মধুমালার কাছে খবর পেল দিব্য।

সুকুমাবকে কাল সন্ধ্যাবেলা মন্দিরা নীচের ঘবে নিযে গেছেন। নিজেই ছেলের দেখাশুনা করছেন। ওপরের ঘরে অবশ্য দিব্যর পরিচর্যার কোন ত্রুটি হয়নি। টানা একটা ঘুম দিয়েছে—স্বপ্নহীন ঘুম। খুব ভোরে উঠে খোলা ছাদে দাঁড়িয়ে জীবনে এই প্রথম সূর্যোদয় দেখেছে। কতক্ষণ পরে মধুমালা চা নিয়ে এসেছে। দাদার অসুখের কথা বলেছে। তার ছোট্ট কপালে যেন ভাঁজ পড়ে গেছে— যার নাম বিষাদরেখা।

চা খেয়ে দিব্য নীচে গেল সুকুমারকে দেখতে। মধুমালার সঙ্গেই গেল।

উঠোনে তখনও রোদ পড়েনি। ঘন ছায়ায় কী এক স্তব্ধতা আঁটো হয়ে আছে। টিউবেলের কাছে একরাশ বাসনকোসন ধোয়া হচ্ছে। দিব্যর মনে হল, ঝি মেয়েটা খুব সাবধানে ধোয়াপাথলার কাজটা করছে—যেন একটুও শব্দ ওঠে না। বেশ কয়েকজন লোক বাড়িতে এখন থাকা সত্ত্বেও এমন একটা প্রাতঃকালীন স্তব্ধতা কি সুকুর জ্বরের জন্যে, নাকি শান্ত চলে গেল বলে? কিংবা নাকি দিব্যর মতো অবাঞ্ছিত অতিথির দরুণ? দিব্য তখনই স্থির করল, সে চলেই যাবে।

মন্দিরা দিব্যকে দেখে ঘোমটা দিলেন প্রাচীন রীতি অনুসারে এবং একটু সরে দাঁড়ালেন। দিব্য যথাসম্ভব সমীহ করে বলল—কেমন আছে ও!

মন্দিরা অস্ফুটস্বরে কিছু বলে বেরিয়ে গেলেন। দিব্য দেখল, সুকুমার কাত হয়ে ঘুমোচ্ছে। মুখটা তেলতেলে দেখাচ্ছে। দিব্য একবার ভাবল, ওর কপালে হাত রেখে উত্তাপ পরীক্ষা করবে। কিন্তু পাছে সুকুর ঘুম ভেঙে যায়, তাই একটু দাঁড়িয়ে থেকেই চলে এল।

মধুমালা ঘরে দাঁড়িয়ে রইল।

দিব্য ফিরে গেল ওপরের ঘরে। একটা সিগারেট ধরাল। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল বিছানার দিকে—যে বিছানায় সে শুয়েছিল। বালিশটা বিধ্বস্ত, আর চাদরও যথেষ্ট কুঁচকে বিশৃঙ্খল হয়ে আছে। সে হঠাৎ অবাক হল। নিজেকে নিরুদ্বেগে গাঢ় ঘুমে স্থির কল্পনা করে তার অবাক লাগল। সে ঘুমোতে পেরেছিল এভাবে? এমন নির্বোধ ঘুমের কোন মানে হয়? নিজের ওপর তেতো হয়ে গেল সে। তারপর সিগারেটা যত পুড়ে ছাই হল, অনুশোচনায় অস্থির হল সে।

যদি আগের সন্ধ্যায় কলকাতার একটা ছোট্ট বাড়িতে তার আঙুল ট্রিগারে চেপে না বসত, যদি সে মৃদু হেসে ক্ষমা করে চলে আসতে পারত, তাহলে আজ জীবনের এই অন্য দিগন্তে নির্বিবাদে

চলে-ফিরে বেড়াতে পারত।

কতক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর সে ঝোলাটা টেনে নিল। কিন্তু উঠতে গিয়ে মনে হল, এ মুহূর্তে তার চলে যাবার জন্যেও যেটুকু সাহস ও সামর্থ্যের দরকার, তা যেন নেই। সে যেন চুপি চুপি অন্যের ঘরে ঢুকে বসে আছে, পালাতে গেলে চোখে পড়ার ভয় আছে। আর সত্যিই তো, কাকেও বিদায় সম্ভাষণ না করে যাওয়া ঠিক নয়। কেউ তাকে বিদায় দিতে এমুহূর্তে সামনে আসুক!

মধুমালা ছাড়া আর কে আসবে? সে এল একটা ট্রে নিয়ে। দিব্য দ্রুত দেখে নিল প্লেটে ফুলকো লুচি তরকারি দুটো সন্দেশ আর প্লেটচাপানো কাপে নিশ্চয় চা, এবং জলের গ্লাস। মধুমালা একমুহূর্তে তার কাঁধে ব্যাগ দেখে নিয়ে কেমন হেসেছে।—ও কি! কাটবার চেষ্টা? এক্ষুনি কেন?

দিব্য চেষ্টা করে হাসল।—তাহলে কখন?

মধুমালা নীচু টেবিলে ট্রে রেখে শুধু বলল—আসুন।

—এখন আমার খিদে নেই, খুকু!

—কী বললেন? মধুমালা উজ্জ্বল মুখে ভুরু কুঁচকে তাকাল ওর দিকে।

—খুকু! তোমার ডাকনাম তো খুকু! সবাই যা বলে, আমি বললে দোষ হবে না নিশ্চয়।

মধুমালা মাথাটা দোলাল একটু। বলল—খেয়ে নিন। অত সাধাসাধি করতে হবে কেন?

দিব্য হাসতে হাসতে বলল—নিশ্চয় নয়। জানলে তোমার মা রাগ করবেন।

—যাঃ! মা রাগ করবে কেন?...মধুমালা ভর্ৎসনার ভঙ্গীতে বলল কথাটা। কী ভেবেছেন মাকে? কাল থেকে দাদার জ্বর। একমাত্র ছেলের জ্বর হলে মায়েদের মনমেজাজ তো ভাল থাকে না। তাই আপনার সঙ্গে কথা বলল না। কই, খেয়ে নিন!

অগত্যা দিব্য সোফায় গিয়ে বসল। তারপর নির্বিকার মুখে একটা লুচি তুলে নিয়ে বলল—যাবার সময় তোমার খাতির! ট্রেনের টাইম জানা আছে তোমার?

—কেন?

—যাব।

—কোথায় যাবেন?

—কলকাতা। আবার কোথায়?

মধুমালা চমকে উঠল। চাপা তীব্র ঝাঁজ ঝরিয়ে বলল—কোনমুখে যাবেন? গেলেই তো পুলিশ হাতে হ্যাণ্ডকাপ লাগিয়ে ·দেবে। কী করেছেন, সব ভুলে গেছেন বুঝি?

হাসতে হাসতে কেশে ফেলল দিব্য। জল খেয়ে বলল—কলকাতা শহরটা খুব বড়। আশি লক্ষ লোক। সে তুমি ভেবো না, খুকু।

মধুমালা ঠোঁট উল্টে বলল—আমার ভাববার দায় পড়েছে! নেহাৎ সম্পর্কটা দাদার বন্ধু তাই।

দিব্য বুঝতে পারে, সুকুর বোন আবার বড্ড ছেলেমানুষী করছে। সেই ইঁচড়েপাকামিটা আবার চেগে উঠেছে। কিন্তু সে হাসতে গিয়ে গম্ভীর হয়। বলে—তোমার পরামর্শটা কী তাহলে?

—কিসের?

—বা রে! তুমি বলছ, কলকাতা ফিরে যাওয়া উচিত হবে না। তাহলে কোথায় যাব—কী করব?

মধুমালা এতক্ষণ সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার সুকুমারের খাটে গিয়ে পা ঝুলিয়ে বসে। তারপর মিটিমিটি হাসে।—কাল আপনি বলছিলেন, কপালীর জঙ্গলে ঘুরে দিব্যি জীবন কাটিয়ে দেয়া যায়।

—হুঁ, বলেছিলুম!

—বলেছিলেন শুধু চাই একটুকরো জমি।

—হুঁউ।

—চাষাভুষো হয়ে জলকাদা মেখে কাটাতে দারুণ লাগবে বলছিলেন!

দিব্যর খাওয়া শেষ। নিঃশব্দে জলের গ্লাস হাতে বাইরে ছাদে যায় এবং ড্রেনের মুখে হাত ধোয়। কুলকুচো করে। তারপর ফিরে এসে চায়ের কাপ তুলে নেয়।

মধুমালা বলে—জুড়িয়ে যায়নি তো?

মাথা দোলায় দিব্য। তারপর বলে—ওসব বাজে। মানে কপালীর জঙ্গলটঙ্গল। কিন্তু তুমি হয়তো

ঠিকই বলছ খুকু, যাবটা কোথায়? ধরা আমি দেব না। কারণ, আমি বস্তুত কোন অন্যায় করিনি। একজন ব্ল্যাকমেলার আমার জীবনকে হেল করে দিচ্ছিল, তাকে খতম করা পাপ নয়। তার চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। সে কয়েকমুহূর্ত চুপ করে থাকে। তারপর নিজের যুক্তির দৃঢ়তা জানাতে আবার বলে—না, আমি ঠিকই করেছি।

মধুমালা আস্তে বলে—কিন্তু লোকটার বউ ছেলেমেয়ের কী হবে?

—এক কথা কাল থেকে একশোবার বলছ খুকু।

—বলছিই তো। বলবও।

দিব্য তীব্র স্বরে কিন্তু চাপা গলায় বলে—লোকটা এমনি-এমনি মারা যেতে পারত। ট্রাম-বাসে চাপা পড়তে পারত। স্ট্রোকে মরতে পারত। ও একই কথা!

মধুমালার কপালে নাকের ডগায় ঘামের ফোঁটা জমে ওঠে। কী বলবে, কিছু খুঁজে পায় না। দিব্যর দিকে নিষ্পলক কয়েকমুহূর্ত তাকিয়ে থাকার পর সে খাট থেকে ওঠে। ট্রে গুছিয়ে নিতে থাকে।

দিব্য বললে—তুমি রাগ করলে খুকু?

মধুমালা ঘাড় নাড়ে। তারপর বেরিয়ে যায়। দিব্য সিগারেট ধরায়। আবার ভাবনায় পড়ে যায়। সুকুর বোন তাকে থাকতে বলছে, এটা ঠিকই। কিন্তু কতদিন এভাবে অতিথি সেজে থাকা সম্ভব? ওদিকে শান্ত মনে-মনে ভীষণ চটে ফিরে গেছে। সে আজকালের মধ্যেই ব্যাপারটা টের পেয়ে যাবেই। তখন শান্ত কী করবে, বলা কঠিন! শান্তকে তার বরাবর আন-প্রেডিক্টেবল মনে হয়েছে। হ্যাঁ, শান্ত ঠিক এ রকম ছেলে। সুকুমারের কাছে বেড়াতে এসে হঠাৎ চলে যাওয়ার মধ্যে তার এই স্বভাবটাই কাজ করছে।

সিঁড়ির মুখে দরজার পর্দার পিছন থেকে জগা ডাকে—বাবুদাদা!

—কী?

—দাদাবাবু খুঁজছেন আপনাকে।

—কে? সুকু?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

দিব্য ওঠে। ব্যাগটা নেবে ভাবে—তার আগে সুকুর পাজামা-পানজাবিটা খুলে নিজের পোশাক পরা দরকার, শেষঅব্দি ব্যাগটা রেখে নীচে যায় সে।...

সুকুমার একগুচ্ছের বালিশে হেলান দিয়ে আধশোয় অবস্থায় রয়েছে। দিব্যকে দেখে মৃদু হাসে সে।—আয়!

দিব্য খাটে ওর পাশেই বসে। তারপর মাথায় আর গলার নীচে হাত রেখে বলে -জ্বর তো ছাড়েনি দেখছি!

—ভোগাবে দেখছি।...সুকুমার তারপর চাপা গলায় ফের বলে—একটা সিগারেট দে। মায়ের ঘরে এসে কী বিপদে পড়েছি! ওপরে থাকলে তোর অসুবিধে হত অবশ্য!

দিব্য সিগারেট বের করে। ওর ঠোঁটে গুঁজে দেয়।

সুকুমার ডাকে—খুকু! পর্দাটা টেনে দে না ভাই! আর মাকে একুখানি ম্যানেজ কর।

দিব্য ঘুরে এবার দেখতে পায় মধুমালাকে। আলনার সামনে দাঁড়িয়ে খুব কেজো ভঙ্গীতে শাড়ি গোছাচ্ছে। দাদার কথা শুনে সে ঘুরে বলে—সিগারেট টানলে মাথা ঘুরবে যে?

—মাথা আর কত ঘুরবে? তুই যা না লক্ষ্মীটি। হুঁ, পর্দাটা...

মধুমালা রাগের ভঙ্গীতে চলে যায় এবং ইচ্ছে করেই পর্দাটা আরও ফাঁক করে দিয়ে যায়। সুকুমার বলে—সর্বনাশ! দিব্য!

দিব্য উঠে গিয়ে পর্দাটা টেনে দেয়। তারপর বলে—বরং দরজাটা বন্ধ করে দিই রে।

—তাই দে।

দরজা ভেজিয়ে সুকুমারের কাছে আসে দিব্য।

সুকুমার চোঁ চোঁ করে সিগারেট টানে বিকৃত মুখে। তারপর কাশতে থাকে। জ্বলন্ত সিগারেটটা তার হাতে কাঁপে। কাশির মধ্যে ঘড় ঘড় করে বলে—বাঁচব না শালা!

দিব্য সিগারেটটা কেড়ে নেয়। জানলায় ঘষে নেভায় এবং বাইরে ফেলে দেয়। একটু বিব্রত বোধ করে সে। উদ্বিগ্ন হয়ে বলে—কী হয়েছে তোর?

রুমালে মুখ মুছে সুকুমার একটু হাসে।—মৃত্যুরোগ! রিয়্যালি—আই স্মেল ইট।

—আমাকে ট্রান্সফার করতে পারিস নে সুকু? বিছানায় শুয়ে থাকি অ্যাণ্ড ওয়েট ফর...

—কেন রে? ব্যর্থ প্রেমট্রেম?

—কতকটা।

সুকুমারের মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। ক্রমশ সেই লাল আভা মিলিয়ে আবার ফিকে হলুদ রঙটা ফুটে ওঠে। সে দিব্যর একটা হাত খপ করে চেপে ধরে বলে—তুই বরাবর বড্ড মিসট্রিয়াস, দিব্য। তোর বিরাট অংশ আমি জানিনে, ওনলি এ লিট্‌ল! বল না, কার সঙ্গে প্রেমটা জমিয়েছিলি এবং তারপর তার নিশ্চয়ই কোন বিগ গাইয়ের সঙ্গে বিয়ে হল। সব রাস্তাই তো রোমে যায়!

দিব্য বলে—অত কথা বললে সাফোকেশন হবে। চুপ করে থাক্‌।

—বল্‌ না রে! শুনতে ইচ্ছে করছে।

—তোর হাতটা কী গরম! থার্মোমিটাব নেই? টেম্পারেচার দেখা হয়েছে?

—ছাড় ওসব। তুই বল, দিব্য।

—কী বলব?

—তোর ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী।

দিব্য একটু চুপ করে থাকার পর ওর দিকে তাকায়! মুখটা অস্বাভাবিক গম্ভীব। সুকুমার টের পেয়ে বলে—কী?

—আচ্ছা সুকু,...বলে দিব্য থেমে থাকে।

—কী রে?

—তুই হেমিংওয়ের কিলার গল্পটা পড়েছিস? একটা লোক তার ঘাতকরা আসছে জেনেও চুপচাপ নির্বিকার শুয়ে রইল—পালিয়ে গেল না! কারণ তার নিয়তি...

সুকুমার বাধা দিয়ে বলে—পড়েছি। কী বলতে চাস তুই?

—আচ্ছা সুকু...

—কী রে?

—এমন যদি হয়, আমি তোর কাছে লুকিয়ে থাকতে এসেছি—ধর, আমি তোকে বলছি, আই অ্যাম আসকিং ফর এ্যান আনডার-গ্রাউনড লাইফ...

—তার মানে? সুকুমার উত্তেজনা চাপে। তুই কি আবার সেই পলিটিকসে নেমেছিস?

ঘাড় নাড়ে দিব্য।—না। তার জের হিসেবে একটা মারাত্মক ঘটনা ঘটেছে। সুকু, তুই কীভাবে নিবি ব্যাপারটা, জানি না। খুকু অবশ্যি শুনেছে এবং হয়তো মেনে নিয়েছে।

সুকুমার চমকে উঠল।—খুকুকে বলেছিস? কেন বলতে গেলি ওকে? ভ্যাট্‌! ও পেট-আলগা মেয়ে—নেহাৎ বাচ্চা! ভুল করেছিস রে।...সুকুমার একটু চুপ করে থাকার পর ফের বলে—কিন্তু কী? ব্যাপারটা কী?

—পরশু সন্ধ্যায় আমি একটা মার্ডার করেছি। তাই শান্তর সঙ্গে তোর এখানে পালিয়ে এসেছি।

সুকুমার নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলতে ভুলে যায় যেন।

দিব্য বলে—অন্যায় করিনি। লোকটা ছিল ব্ল্যাকমেলার। আমার আগের লাইফের কিছু ইনফরমেশন আর ডকুমেণ্ট ছিল ওর হাতে। আমি চেয়েছিলুম অন্যরকম ভাবে বাঁচতে। বাস্টার্ড ব্ল্যাকমেলার আমাকে ফতুর করে দিচ্ছিল না শুধু—প্রতিমুহূর্তে অস্বস্তির সৃষ্টি করছিল। তাই ওকে পরশু সন্ধ্যায় ওর বাড়িতে গিয়ে ওর বউ-ছেলেমেয়েদের সামনে...দিব্য দুহাতে মুখ ঢেকে একটু ঝুঁকে পড়ে।

সুকুমার তার পিঠে হাত রেখে ডাকে—দিব্য, শোন।

—বল।

—শান্ত জানে?

—না।

—খুকু ছাড়া আর কেউ জানে?

—না।

—খুকুকে কেন বলতে গেলি?

মুখ তুলে মাথা দোলায় দিব্য।—জানিনে। কপালীর জঙ্গলে তোর বোন গেল। পোড়া মন্দিরটার ওখানে গিয়ে সম্ভবত কান্নাকাটি করছিল।...

—খুকু! কেন?

দিব্য হাসে একটু।—শান্তর সঙ্গে বিয়ের কথা শুনে বেচারা ঘাবড়ে গিয়েছিল। আমি...জানি না কেন, হঠাৎ ওর কাছে কনফেশানের ঝোঁকে গলে পড়লুম। তুই বিশ্বাস কর সুকু। আমি হঠাৎ খুব এলোমেলো হয়ে পড়েছিলুম।

সুকুমার বলে—দেখ তো, কোথায় জলের গ্লাস আছে।

পাশের টেবিল থেকে জলের গ্লাসটা তুলে দেয় দিব্য। সুকুমার কয়েক চুমুক জল খেয়ে বলে—রেখে দে। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে বার বার।

দিব্য গ্লাসটা রেখে বলে—যাক্‌গে ওসব। আমি চলে যাই, সুকু।

—কোথায় যাবি? কলকাতায় ফেরা মোটেও উচিত হবে না তোর।...সুকুমার একটু ভেবে নেয় দ্রুত। দূরে কোথাও আত্মীয়স্বজন থাকলে বেটার। কিন্তু...সত্যি দিবা, আমি ভাবতেও পারিনি তুই মার্ডার করে চলে এসেছিস। কাল শান্ত তোর রিভলবারটা বের করল। তখনও ভাবিনি।

—আমি যাই রে!

সুকুমার ওর হাত টেনে ধরে।—শোন্। দ্রুত এভাবে ডিশিসন নেওয়া ঠিক নয়। একটা কথা বলছি তোকে—মন দিয়ে শোন। কপালীতলায় আমাদের ফ্যামিলি, তোকে আগেও বলেছি, দুর্গের মতো নিরাপদ জায়গা। কেন জানিস? বাবার প্রভাব-প্রতিপত্তি। অন্তত এটুকু বলতে পারি, এখান থেকে তোর কোন ক্ষতি হবে না, যতক্ষণ বাবা আছেন। তাছাড়া কলকাতা থেকে জায়গাটা বেশ দূরে। আগের মতো এঁদো পাড়াগাঁ নয় যে সবাই তোর গতিবিধি মুখস্থ করে ফেলবে। বাইরের লোক সম্পর্কে আজকাল এখানে আর কেউ কৌতূহল দেখায় না। কাজেই এখানে আপাতত তুই সেইফ।

—তারপর?

—কয়েকটা দিন যাক্। তারপর ডিসিশন নিবি।

দিব্য চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলে—কিন্তু আমি তো জানি—তুইও জানিস, সারাজীবন এভাবে লুকিয়ে থাকার মানে হয় না। হয়তো লুকিয়ে থাকাও যায় না।

—হুঁ। যায় না। সেজন্যই বলছি, নিজেও ভেবে দেখ, আমাকেও ভাবতে দে।...বলে সুকুমার কণ্ঠস্বর চাপা করে।—বরং শোন্। বাবার সঙ্গে কনসাল্ট করি। না না—উনি এসব ব্যাপারে নির্বিকার, দেখবি। জীবনে রাজ্যের মার্ডারকেস ঘেঁটেছেন। ডাল-ভাতের ব্যাপার।

দিব্য তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। এই সময় বাইরে দরজায় চাপ পড়ে। মন্দিরার গলা শোনা যায়!—সুকু!—সুকু! দরজা দিলি কেন? ওষুধ খাবার সময় হল যে!

দিব্য উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেয়। মন্দিরা ঢুকে ওকে দেখে কেমন হাসেন। তারপর সোজা ছেলের দিকে পা বাড়ান।—ওষুধ খেতে হবে যে!

—মা! দিব্যকে যেতে দিও না। ও চলে যাবে, বলছে!

মন্দিরা ঘুরে আবার দিব্যকে দেখে নিয়ে বলেন—না। যাবে কেন? আমরা তো তাড়িয়ে দিচ্ছিনে বাবা! উনি মদনের কাছে তোমার বন্দুকের টিপের কথা শুনে খুব খুশি। মানে—সুকুর বাবা। একটু আগে বলছিলেন, ছেলের সঙ্গে তাহলে আলাপ করতে হয়। তুমি যাও না বাবা, বাইরের ঘরে একা আছেন।

সুকুমার হেসে ওঠে।—এক শিকারী আরেক শিকারীর খোঁজ পেয়ে গেছে। আবার কী!

দিব্য বেরিয়ে যায়।...

প্রমথ দাদার ওপর রেগে গুম হয়েছেন সকাল থেকে। রোজ টুম্পাকে নিয়ে এবাড়ির বাগানে

কিছুক্ষণ ঘোরেন। আজ সাধনবাবু মুখের ওপর বলে দিয়েছেন—টুম্পা ঘুমোচ্ছে। অথচ খিড়কির দরজায় দাঁড়িয়ে টুম্পার হাসি শুনেছেন। বাকিটা বলেছে, ও বাড়ির ঝি। ছোটকত্তার কানে ইনিয়ে-বিনিয়ে দাম্পত্য-কলহের বর্ণনা তুলেছে। প্রমথ স্তম্ভিত হয়েছেন। সহোদর ভাই! মানুষ কী, এ-বয়সেও চেনা গেল না তাহলে।

ফিরে এসে বন্দুক নিয়ে বসেছেন। তেল দিয়ে মুছেছেন—কার্তুজের হিসেব করেছেন। তারপর ভেবেছেন, প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ করা যাক্। সেই কবে ঝোঁকের মুখে বন্দুক ছোঁবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, এ্যাদ্দিনে তা পচে ভূত হয়ে গেছে।

প্রমথ এখনও বিড়ি টানেন। পর্দা তুলে দিব্য বাইরের ঘরে ঢুকে দেখল, সুকুর বাবা বিড়ি টানছেন। তাকে দেখে খুশি হয়ে বললেন—এই যে! এস—এস। বসো। একটু আগে তোমার কথাই হচ্ছিল। তোমার নামটা কী যেন বাবা?

দিব্য সোফায় বসে বলে—দিব্যেন্দু চক্রবর্তী। দিব্য বলে ডাকবেন।

—হুঁ। তোমার হাতে তো প্রচণ্ড টিপ! বন্দুক আছে নিজের?

—এখন নেই। ছিল। রাইফেল ছিল।

—বল কী! প্রমথ প্রশংসাসূচক কটাক্ষ করলেন। কী হল রাইফেল?

—গণ্ডগোলের সময় পুলিশ নিয়ে যায়। আর ফেরত দেয়নি।

—ক্লেম সাবমিট করোনি পরে? কিসের গণ্ডগোল?

দিব্য একটু হেসে বলে—পলিটিক্যাল। সিক্সটি সেভেনের ব্যাপার।

—তাই বলো! প্রমথ খুকখুক করে হাসলেন। এ্যারেস্ট হয়েছিলে?

—হ্যাঁ। পরে ছেড়ে দেয়।

—তুমি তো ওস্তাদ ছেলে তাহলে! হুঁ—দেখেই আঁচ করেছিলুম। বলে প্রমথ ঘাড় ঘুরিয়ে ডাকেন—মদন! এ্যাই মদ্না!

বাইরের উঁচু বারান্দা থেকে সাড়া আসে—আজ্ঞে-এ-এ!

—এদিকে আয়।

মদন সবিনয়ে ঢোকে। দিব্যকে দেখতে পেয়ে একগাল হেসে সে মাথা নুইয়ে করযোড়ে প্রণাম করে। তারপর বলে—আজ যাবেন তো আজ্ঞে?

প্রমথ কপট ধমক দেন—ইস্! লোভ বেড়ে গেছে যে রে! যা, দু'কাপ চা নিয়ে আয়।

মদন চলে গেলে দিব্য বলে—শিকারে মদন দারুণ কাজের লোক। ট্র্যাকার হিসেবে ভালই। তবে বাঘ-ভাল্লুক তো নেই আপনাদের দেশে!

—ছিল। প্রচুর ছিল। প্রমথ স্মৃতিভারাক্রান্ত কণ্ঠস্বরে বলেন।...একসময় আমার গোয়াল ঘর থেকে বাঘ বাছুর নিয়ে যেত। এখনও যে দু'একটা নেই, এমন নয়। তুমি তো নদীর সাউথে মানে বাঁওরের ওদিকে যাওনি! খুব জঙ্গল আছে এখনও। বাঁধ হয়নি কি না। হলে—সবটা উচ্ছেদ হবে। তাই আমি চেষ্টা করছি, বরং যাতে বাঁধটা না হয়। ওটা সরকারী রিজার্ভ ফরেস্ট হতে আপত্তি কী? কালেকটার সায়েব কনভিন্সড্। কিন্তু চাষা-ভূষোদের জমির খাকতি প্রচণ্ড। তাদের নিয়ে পলিটিকস চলছে। বড্ড ঝামেলা বাবা, বড্ড ট্রাবল!...

প্রমথ একটু চুপ করে থেকে ফের বলেন—এই তিনগুণ-চারগুণ ফসল বেড়েও তা লোকের পেট ভরছে না। ভরবে কী ভাবে? কুকুর-বেড়ালের মতো বাড়ছে লোকসংখ্যা। আমি বলি, লোকসংখ্যা কমাও। আর জঙ্গল উচ্ছেদ বন্ধ করো। মানুষও বাঁচুক, জীবজন্তুও বাঁচুক। পৃথিবীতে শুধু মানুষই থাকবে, তাহলে বৈচিত্র্য কোথায়! শুধু খাবে-দাবে, পরবে, আর স্ফূর্তি করবে? কোন মানে হয়? ঈশ্বর কত বৈচিত্র্য সাজিয়ে রেখেছিলেন থরে-বিথরে। নির্বোধের মতো সব চষে একাকার করে জমি আর কারখানা বানাচ্ছে। বোকার হদ্দ আর কাকে বলে!

দিব্য সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। এই মানুষটিকে সে কী ভেবেছিল? সে মুগ্ধ হয়ে বলে—আপনি ঠিকই বলেছেন জ্যাঠামশাই!

সায় পেয়ে প্রমথ বলেন—বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নিয়েছি। আর আমিষ ছুঁইনে। প্রতিজ্ঞা তো তারও

আগে করেছিলুম, বন্দুক ধরব না। তো...

—শুনেছি। মদন বলছিল।

প্রমথ কাঁচুমাচু হাসেন।—হঠাৎ তোমার গল্প শুনলুম মদনের কাছে। তারপর আনকনশাসলি বন্দুক সাফ করতে বসলুম। বৈষ্ণবের অহিংসাধর্ম মেইনটেইন করা আমার মতো ত্যাঁদোড় লোকের পক্ষে বড় কঠিন। বলবে ত্যাঁদোড় কেন বলছি? বাবা, সারাজীবন মোক্তারি করে ক্রিমিনাল ঘেঁটেছি। ফৌজদারি কেস মানেই রাজ্যের মারদাঙ্গা খুনখারাবি—তোমার গিয়ে রেপকেস, চুরিডাকাতি, বাটপাড়ি!...ওতেই ভেতরটা কেমন যেন হয়ে গেছে। এই বৈষ্ণবের বুকের ভেতরটা যদি দেখতে!

এ কি কনফেশান? দিব্য অবাক হয়ে যায়। আর প্রমথ তখনই নিজেকে সামলে নেন। বলেন—এটাই এক জ্বালা। গুরুতর সমস্যা। মাঝে মাঝে দুর্দান্ত বন্য এক পুরনো প্রমথ অহিংস ভালমানুষ এই প্রমথকে দাবিয়ে রেখে বেরিয়ে আসতে চায়।

মদন চা নিয়ে আসে। টেবিলে রেখে একটু তফাতে বসে। প্রমথ বলেন—স্নাহারাদি হয়েছে তো বাবা? নাও, চা খাও।

দিব্য চায়ে চুমুক দিয়ে বলে—আপনার বন্দুকটা খুবই ভাল। একটু হেভি অবশ্য। পাখিটাখি মারার পক্ষে অসুবিধে—কিন্তু বড় কিছু মারার পক্ষে খুব কাজের জিনিস।

প্রমথ বন্দুকটায় হাত বুলিয়ে বলেন—বিলিতি যে! সেকেণ্ডহ্যাণ্ড কিনেছিলুম। সদরে তখন সাবজজ ছিলেন ম্যাকফারসন সায়েব। যাবার সময় বেচে দিলেন। লাইসেন্স করা ছিল অলরেডি। নাইনটিন থার্টি নাইনে। তখন সেকেণ্ড গ্রেট-ওয়ার শুরু হয়েছে। ওয়ার-ফাণ্ডে মোটা চাঁদা দিয়ে লাইসেন্স হাতালুম।...যাক্‌গে। তোমার কথা বল এবারে। বাবা-মা বেঁচে আছেন তো?

দিব্য ঘাড় নাড়ে।—বাবা নেই। মা আছেন। দাদারা আছেন।

—কলকাতায় আছেন?

—কলকাতায় আমি একা। দাদারা বাইরে থাকেন। মা তাঁদের কাছে।

—তাই বুঝি!...প্রমথ সস্নেহে ওকে দেখার পর ফের বলেন—ইয়ে, নিজের বাড়ি আছে, না ভাড়া-বাড়ি?

—একটা সিঙ্গলরুম ফ্ল্যাট! ভাড়া দিয়ে থাকি। গড়চার দিকে।

—আচ্ছা! প্রমথ চা-টুকু গিলে কাপ মদনের দিকে এগিয়ে দেন। যা, রেখে আয়। দেখে ফেলবে কেউ। যা বাড়ি হয়েছে! ইয়ে, শোন —বল্‌গে আমি সুকুর বন্ধুকে নিয়ে বেরোচ্ছি।

মদন দাঁত বের করে বলে—আমি যাব আজ্ঞে!

প্রমথ ধমক দেন।—না।

মদন বিরস মুখে কাপদুটো রাখতে যায়। দিব্য বলে—একমিনিট। কাপড়টা বদলে আসি।

—কী দরকার? হ্যাঁ, শোন বাবা, বন্দুক আমি ছুঁড়ব না। প্রকাশ্যে হাতে নিতেও পারব না। লোকে দুষবে। আফটার অল বয়স তো হয়েছে। আমি তোমার টিপ দেখব।

দিব্য হাসিমুখে বলে—ঠিক আছে।...

মদনের কাছে শুনে মন্দিরা থ। বন্দুক নিজের হাতে সাফ করেন। প্রমথ, তাতে অবাক হবার কিছু নেই। কিন্তু তাই বলে বন্দুক নিয়ে বেরোবেন ফের, এটা অকল্পনীয়। ছি ছি! লোকে কী বলবে! সুকুমার বলল—না, না। দিব্য বন্দুক ছুঁড়বে। বাবা হয়তো ওয়াচ করবেন!...

মধুমালা শুনেই বাইরের ঘরে যখন গেল, তখন দিব্য আর প্রমথ গেট পেরিয়ে রাস্তায় নেমেছেন। সে ফিরে এসে সটান ছাদে চলে গেল।

ছাদ থেকে কপালী নদীর ওপার অব্দি দেখা যায়। সে দেখল, দুই মূর্তি হনহন করে চলেছে। বাবাকে আজ খুব চঞ্চল মনে হচ্ছে। তার এত ভাল লাগল দৃশ্যটা!

কিছুক্ষণ রোদে দাঁড়িয়ে সে ঘেমে উঠল। কখন দুজনে নদী পেরিয়ে ওপরে উঠেছে। মধুমালা চঞ্চল হয়ে উঠল।

সিঁড়ি দিয়ে প্রায় দৌড়ে নেমে যায় সে। মন্দিরা বলেন —কোথা যাচ্ছিস খুকু? দাদার কাছে থাক্

গে। মাথা ধরেছে বলছিল।...

মধুমালা কান পাতে না। বেরিয়ে যায়।...

ওপারে বাঁধে দাঁড়িয়ে প্রমথ মদনের মতো নিসর্গের নামতাপাঠ শুরু করেছেন তখন। ধুতি এমনভাবে কোমরে গুঁজেছেন, হাঁটু অব্দি নগ্ন হয়েছে এবং কোথাও লোম নেই দেখে দিব্যর অবাক লাগে। পায়ে চটিজুতোয় নদীর বালি ঢুকেছিল। পা ঝেড়ে নিতে দিব্য চমকে ওঠে। ডানপায়ের তিনটে আঙুল নেই। দিব্য তাকিয়ে আছে দেখে প্রমথ অন্যমনস্কভাবে বলেন—এক সময় কপালী নদীতে বড্ড কুমীরের উপদ্রব ছিল। বর্ষায় সাঁতরে এপারে আসতুম। একবার ধরে ফেলল! শেষঅব্দি পায়ের আঙুলের ওপর দিয়েই গেল। তখন সদরে কালেক্টর ছিলেন এক আইরিশ সায়েব। কুমীরটার অত্যাচার বাড়লে একদিন চলে এলেন।

থামতে দেখে দিব্য বলল—মারলেন কুমীরটা?

—হ্যাঁ।.. প্রমথ ফতুয়া থেকে বিড়ি বের করে ধরান। তারপর পা বাড়ান। ফেব বলেন—এখন মরুভূমির অবস্থা। কোন জন্তু-জানোয়ার দেখি না। কোন থ্রিল নেই!

একটু পরে খুক খুক করে হেসে বলেন—জন্তু-জানোয়ার নেই নয়, আছে। সেগুলো মানুষ হয়ে ভোল পাল্টেছে এখন। মানুষেব চেহাবা নিয়ে সমাজে ঢুকে পড়েছে। তাই না?

দিব্য ছোট্ট করে সায় দেয়।

—বাঘের হিংস্রতা, সাপের খলতা, শেয়ালের ধূর্ততা, শুয়োরের গোঁ, সবই তুমি দেখতে পাবে মানুষের মধ্যে। আগে এতটা ছিল না।

তিনটে আঙুল নেই, অথচ প্রমথ একটুও খুঁড়িয়ে হাঁটেন না। রোদ আর ছায়া ওঁর মুখের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, আর মুখটা দেখে মনে হচ্ছে, এই পৃথিবীর অনেক স্মৃতির ছোপ ধরা তামাটে পোড়-খাওয়া একটা অদ্ভুত পদার্থ, যা পাথরের মতো—অথচ প্রাণবন্ত, চঞ্চল, সারাক্ষণ ব্যস্ত। কপালীর জঙ্গলে ঢুকেই মানুষটা বদলে গেছেন। কিন্তু কোথায় যাচ্ছেন দিব্য কিছু বুঝতে পারে না। খালি মনে হয়, নিসর্গের কোন গোপন নির্জন আর রহস্যময় অভ্যন্তরে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অকারণে তার গা ছমছম করে!

একটা বিশাল গাবগাছের তলায় পৌঁছে প্রমথ হঠাৎ ঘোষণা করেন—একবার আমি এই বন্দুকে মানুষ মেরেছিলুম!

দিব্য কথাটা পরিহাস কিনা বুঝতে চেষ্টা করে। কিন্তু প্রমথের মুখের রেখায় দৃঢ়তা ফুটে উঠেছে। গলার নীচের খাঁজে ঘাম চকচক করছে। দুচোখের ঘোলাটে ফ্যাকাসে মাংসে দুটো তারা পিঙ্গল, আর তারার কেন্দ্রবিন্দুতে ঠিকরে পড়ছে কী আলোর ঝলকানি। দিব্য বলে—আজ্ঞে?

—মানুষকে গুলি করেছিলুম। ওই ঝোপগুলো দেখছ, ওর পিছনে একটা জলা আছে, সেখানে।

দিব্য আস্তে বলে—কেন?

—জাস্ট চোখের ভুল। ইচ্ছে করে—ডেলিবারেটলি গুলি করিনি। তখন এই এলাকায় বুনো শুয়োরের খুব উপদ্রব ছিল। ভয়ে লোকেরা চাযবাস বা কাশখড় কাটতে যেতে পারছিল না। তখন সবাই আমাকে ধরল—মোক্তার বাবু, এর একটা ব্যবস্থা না করলে আমরা না খেয়ে মরব। তাই বেরিয়ে পড়লুম। সারাদিন টো-টো করে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে এখানে দাঁড়িয়ে আছি। সূর্য নদীর ওপারে সবে ডুবেছে। হঠাৎ দেখি, ওই ঝোপগুলোর পিছনে কী নড়াচড়া করছে। আবছা অন্ধকারে কালো চারপায়ে হাঁটা জন্তু—শুয়োর ছাড়া কী হতে পারে? গুলি করলুম। গোঙানিও শুনলুম। অবিকল শুয়োরের চিৎকার। তারপর নড়াচড়া থামলে এগিয়ে গিয়ে সাবধানে টর্চের আলো ফেললুম। দেখলুম...

—মানুষ?

—মানুষ।

—কে?

—বাউরিদের একটি ছেলে। বছর ষোল-সতের বয়স। লুকিয়ে কাশখড় কাটছিল। ওই কাশবনগুলো ইজারাদারের সম্পত্তি। ছেলেটা লুকিয়ে খড় কাটতে এসে মারা পড়ল।

—কী করব? বডিটা তুলে নিয়ে বিলের জলে দামের তলার রেখে দিলুম। বাড়ি ফিরে মদনকে

ডেকে নিয়ে এলুম। একখানা গভীর গর্ত করে পুঁতে ফেলা হল। তার ওপর ঘাস কাশের ঝোপ চাবড়াসুদ্ধু তুলে বসিয়ে স্বাভাবিক করে দেওয়া হল। সেবারই বর্ষায় ফ্লাডে একাকার হল। এখন ওখানটায় ধানচাষ হচ্ছে। কোন চিহ্ন নেই।

—খোঁজ হল না ছেলেটির?

—হয়েছিল। এলাকার লোকেরা তখন বড্ড সরল আর বোকা-সোকা ছিল। বিলের জলে পরীদের পাতালপুরীর কথা বিশ্বাস করা হত। অনেকে এখনও ভাবে, ছেলেটাকে পরীরা সেখানে নিয়ে গেছে। বেঁচেবর্তে সুখেস্বচ্ছন্দে আছে। পরী বিয়ে করে ছেলেপুলের বাপও হয়ে থাকবে।

প্রমথ ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে অদ্ভুত হাসেন। দিব্য বলে—শুধু এই?

প্রমথ ঘাড় নাড়েন।—না একটা মাঠকুড়োনি মেয়ে বাড়ি ফেরার পথে আড়াল থেকে ব্যাপারটা দেখেছিল। সে আমার ভয়ে কিছু বলেনি। পরে আমার দিকে কেমন দৃষ্টে চেয়ে থাকত। এইতে আমার সন্দেহ হল। তখন ওকে জেরা শুরু করলুম। ভয়ে মেয়েটা কেঁদেকেটে অস্থির। শুধু বলে—কাকেও বলিনি মোক্তারবাবু কাকেও বলব না মোক্তারবাবু..এইরকম প্রলাপ। তখন গতিক বুঝে..

দিব্য শুকনো গলায় বলে—কী?

প্রমথ নিজের করতল ও আঙুল দেখতে দেখতে অস্ফুটে বলেন—আমার অনেক পাপ—অনেক! তারপর মাথা দোলান। কোন দুর্জ্ঞেয় ভাবের প্রকাশ যেন।

দিব্য অস্থির হয়ে বলে—মেয়েটির কী হল? কী হল তার?

প্রমথ মুখ তোলেন। গাছের উঁচুতে দৃষ্টি রেখে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। একটা ঝিঁঝি পোকা তীব্র স্বরে একটানা ডাকছে। একটু পরে বলেন—উঠোনের নিমগাছে সে একরাতে স্যুইসাইড করে ঝুলেছিল।

দিব্য শ্বাস-প্রশ্বাস মিশিয়ে বলে—খুন করে ঝুলিয়ে দিলেন বুঝি?

—সবাই তাই করে।...প্রমথ ওর দিকে ঘুরে কেমন হেসে বলেন।

—করে বুঝি?

—হুঁউ। যেমন তুমি করেছ। প্রমথ এবার পরিষ্কার হাসেন।

—কে বলল আপনাকে?

প্রমথ মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে জবাব দেন—খুকু। আর সেজন্যেই এভাবে তোমায় ডেকে নিয়ে এলুম।

আট

কিছুক্ষণ আগে কপালীর জঙ্গলে যে কুঁচফলের ঝোপ দিব্যর জামা একবার টেনে ধরেছিল এবং দিব্য ঘুরে দাঁড়িয়ে যার দিকে তাকাতেই জামা ছেড়ে দিয়েছিল—যেন ভয় খেয়েই, সেই ঝোপটা মধুমালার আঁচলের একটা টুকরো নিল।

মধুমালা ঘুরে দেখল একবার। এই গ্রীষ্মে লাল কুঁচফল ধরেছে থোকায়-থোকায়। ক্ষয়া-খর্বুটে গুল্মটির সারা গা ফেটে রক্তারক্তি যেন। নাড়াবুনে বোকাব মতো তাকিয়ে তার মাথার ওপর এক লম্বাটে বালক অর্জুন গাছ ভয়ে কাঁপছে। আর পতপত করে পতাকার মতো উড়ছে একটা সাপের খোলস পাশের শেয়াকুল ঝোপে। তার গা ঘেঁষে আবার এক শান্ত সন্ন্যাসীর মতো দাঁড়িয়ে আছে সাঁইবাবলার ঝাড়—জটার মতো ঝুলছে তার মাথা থেকে বুনো আলু আর শিমলতা, তার গোঁফদাড়ির মতো চিকন সোমলতার ঝালর—যার ওপর বনচড়ুইয়ের ঝাঁক এতক্ষণ খুব হইচই করছিল এবং মধুমালাকে দেখেই ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল। সন্ন্যাসী সাঁইবাবলা অমনি রুষ্ট দৃষ্টিপাতে মধুমালাকে ভস্ম করতে চাইল। মধুমালা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তার অবচেতনায় হাজার বছরের মেয়েদের সেই ব্যাকুলতা জেগে উঠেছে, যে-ব্যাকুলতায় বীজ থেকে গাছের অঙ্কুর গজায়, কলি থেকে ফুল ফোটে এবং ফুল থেকে ফল ধরে—আর মেঘ থেকে বৃষ্টি ঝরে, সূর্য ওঠে এবং অস্ত যায়, দিন রাতের কত খেলা চলে পৃথিবীতে!...

দিব্য আর প্রমথ আজ জামবনে ঢুকছেন। ঘন ছায়ার মধ্যে দুটি মানুষকে দেখে ভারি অবাক লাগে। আর দিব্যর উজ্জ্বল সাদা মুখ এদিকে ওদিকে ঘুরছে। প্রতিবারই মধুমালা ভাবছে, তাকে সে দেখতে

পাবে। কিন্তু দিব্যর দৃষ্টিতে একটা ব্যাপ্তি আছে, যা দূরের কিছু ছুঁয়ে বেড়াচ্ছে। গাছের পাতার ফাঁকে আকাশের নীল—নাকি ধূসর কাশবন? মধুমালার বড় অভিমান হয়। তাকে পিছনে ফেলে রেখে ওরা কতদূর চলে গেল! তারা তো একই দলের মানুষ। যেন কথা ছিল দলবেঁধে কোথাও বেরিয়ে পড়ার এবং হেঁটে যাওয়ার—কত নদী মাঠ বনভূমি পেরিয়ে আদিম থেকে আদিমতম জগতে—প্রকৃতির জঠরের দিকেই বা—যেখানে সারাক্ষণ স্যাঁতসেঁতে উর্বর মাটি থেকে জন্ম নেয় এ্যামিবা ও শামুক, পাখি ও সিংহের পাল—পড়ে আছে সেখানে নিষ্পিষ্ট শ্যাওলা ও ছত্রাক, আর ফার্ন, ভাঙা ডিমের খোল, স্তব্ধ রঙচঙে গিরগিটি আর চিত্রিত সুন্দর সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে! সে বড় রহস্যময় গভীরতম উৎসপ্রদেশ। বুকে হেঁটে সেখানে সরীসৃপের ভিড়ে মিশে মানুষকে ঢুকে যেতে হয়—পুরো ন্যাংটো হয়েই, সভ্যতার খোলস বাইরের দরজায় ফেলে ও পা দিয়ে মাড়িয়ে ঢুকতে হয় সেই গোপন নির্জন পাতালে।...

এইসব কথা আবছা মনে হয়েছে অনেকদিন থেকে মধুমালার। বড় অস্পষ্ট আর ভাসা-ভাসা স্বপ্নের মতো এই বোধ। তার মনে হয়েছে, ওইরকম কোন একটা জায়গা থেকেই উদ্ভিদ মানুষ আর প্রাণীদের আসা এবং মৃত্যু মানে সেখানেই ফিরে যাওয়া।

এখন কপালীর জঙ্গলে দাঁড়িয়ে মধুমালাকে সেই অদ্ভুত বোধ বিব্রত করে। আকাশের রঙ এখন ক্রমশ নীল থেকে ধূসর হয়ে পড়ছে। রোদ হচ্ছে আরও ঝাঁঝালো। হাল্কা বাতাস ছায়ায় এসে সেই ঝাঁঝ ছড়িয়ে দিচ্ছে। বুকের মধ্যিখানে ঘামের সিক্ততা টের পায় সে। তার চোখদুটো স্থির আর নিষ্পলক হয়ে ওঠে। প্রমথ দিব্যর কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে কিছু বলছেন দেখতে পায়। তারপর ওরা আবার পা বাড়ায়। তখন মধুমালাও ঝোপের আড়ালে অনুসরণ করে।..

জামবনের শেষে বাঁওরের বিস্তীর্ণ জলা। দুটি মানুষ এবার সেই জলার ধারে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। মধুমালা হঠাৎ ডাইনে পায়ের শব্দ পায়। শুকনো পাতার ওপর ভারি পায়ের শব্দ। সে সঙ্গে সঙ্গে গাছের আড়ালে বসে পড়ে। মদন হন্তদন্ত হয়ে এগোচ্ছে। প্রমথকে কোন খবর দিতে যাচ্ছে নিশ্চয়। কী খবর? দিব্যর ব্যাপারে নয় তো? এতক্ষণে কি পুলিশ দিব্যর খোঁজে-খোঁজে কপালীতলার মোক্তারবাড়ি চলে এসেছে? মধুমালার বুক ঢিপঢিপ করে।

কিন্তু সে সাড়া দেবার আগেই মদন বাঁধের রাস্তায় অনেকটা এগিয়ে গেছে!

মদন প্রমথের কাছাকাছি হতেই প্রমথ ঘোরেন। এতদূর থেকে বোঝা যায়, মদন ধমক খাচ্ছে। তারপর কিন্তু প্রমথ দিব্যকে কিছু বলেন। দিব্য বন্দুক কাঁধে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রমথ আর মদন বাঁধের রাস্তায় ফিরে আসছেন।

অমনি মধুমালা কাঠবেড়ালির ক্ষিপ্রতায় জামবনের পুবদিকে হামাগুড়ি দিয়ে সরে যায়। এই গাছগুলো বুনোজামের। মাটি থেকে সমানে ঝাঁকড়া হয়ে উঠে গেছে। সরু কাণ্ড ও ডালপালা। কিন্তু ঘন পাতায় ঢাকা। পুবদিক ঘুরে মধুমালা দিব্যর কাছাকাছি গিয়ে একটু হাসে। দিব্য বন্দুক তাক করেছে জলার ওপর একটা শঙ্খচিলের দিকে।

সেই সময় পা টিপে-টিপে পেছন থেকে এগিয়ে মধুমালা খপ করে দুহাতে দিব্যর দু'চোখ চেপে ধরে। দিব্য বলে—ছাড়ো মধুমালা!

মধুমালা একচোট হাসে প্রাণ খুলে। তারপর বলে—অন্য কেউ হতে পারত!

—আর কে হবে?

—অন্য কেউ হতে পারে না বুঝি?

—না। কপালীর জঙ্গলে আমার চোখ চেপে ধরবে যে, সে মধুমালা।

—যাঃ! পেত্নীটেত্নী হতেও পারত।

—উঁহু। দিনদুপুরে পেত্নীর অত সাহস হবে না।

মধুমালা আকাশে দ্রুত তাকিয়ে বলে—বড্ড রোদ এখানে। ছায়ায় এস না দিব্যদা।

দিব্য কথা মেনে একটা হিজলগাছের ছায়ায় যায়। গাছের তলায় ঘাসের ওপর শুকনো পাতা আর শীষালো হিজলফুল ছড়িয়ে রয়েছে। এক ঝাঁক ছাতারে পাখি পাতা উল্টে পোকা খুঁটে খাচ্ছিল। বড় একটা ভয় পায় না ওদের দেখে। কিছুটা তফাতে সরে যায় এবং আগের মতো নির্ভয়ে হল্লা করতে থাকে। দিব্য বন্দুকটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে রেখে সিগারেট বের করে। বলে—বাপ্‌স!

কতক্ষণ সিগারেট খাইনি!

মধুমালা বলে—এই! আমি ধরিয়ে দিচ্ছি।

—পারবে? খুব বাতাস এখানটায়!

—চেষ্টা করা যাক্, পারি কি না।...মধুমালা ওর হাত থেকে দেশলাই নেয়।

দিব্য দুষ্টুমি করে বলে—অভ্যেস থাকলে পারবে।

—উঁ?

—কাকেও কখনও ধরিয়ে দিয়েছ সিগারেট?

—তোমার কী মনে হয়?

—বয়সের তুলনায় তুমি অনেক প্রাজ্ঞ।

—প্রাজ্ঞ মানে?

—ওয়াইজ।

—তার মানে?

—ওয়াইজ মানে জানো না? স্কুল ফাইনাল পাশ মেয়ে!

মধুমালা মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে দেশলাইকাঠি ঠোকে—আনাড়ি তা বোঝাই যায়। জ্বলতেই দ্রুত ফেলে দেয় কাঠিটা। হাত ঝাড়তে থাকে। একেকটা কাঠি থাকে—যার বারুদ গোড়াঅব্দি মাখামাখি, এবং সঙ্গে সঙ্গে আঙুলে ছ্যাঁকা লাগে। অস্ফুট স্বরে সে বলে—উঃ! আর দিব্য তার হাতটা ধরে ফেলে। কতটা পুড়ল, দেখার জন্যেই। মধুমালা ছাড়াবার চেষ্টা করে। পায়ের কাছে শুকনো পাতা তখন হু-হু করে জ্বলে উঠেছে।

মধুমালা চেঁচিয়ে ওঠে—নেভাও! নেভাও! সবনাশ হয়ে যাবে।

দিব্য নির্বিকার বলে—কী সর্বনাশ হবে! জ্বলুক— দেখতে ভাল লাগছে!

মধুমালা এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নেয়। আতঙ্কে সরে গিয়ে বলে—সর্বনাশ হবে যে! জঙ্গলে আগুন ধরে যাবে! দিব্যদা! তুমি জানো না– ভীষণ ব্যাপার হবে।

– আগুন জ্বলা দেখতে ভাল লাগে না তোমার?

গাছের তলায় শুকনো পাতায় আগুন হু-হু করে এগিয়ে চলেছে! ধোঁয়া উঠছে। পোকামাকড়ও পালাচ্ছে হন্তদন্ত হয়ে। ছাতারে পাখিগুলো ভয় পেয়ে উড়ে গাছের ডালে গেছে এবং তুমুল চেঁচামেচি জুড়েছে। দিব্য এবার বুঝতে পারে, সত্যি এই আগুনটা এবার ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে। সবখানে প্রচুর শুষ্কতা। ঝোপঝাড় আর বিস্তীর্ণ কাশবন শুকিয়ে বারুদ হয়ে আছে। তবু সে ইচ্ছে করেই নেভায় না। মধুমালার ব্যাকুলতা উপভোগ করে।

মধুমালা প্রায় কেঁদে ফেলার ভঙ্গীতে বলে—তুমি শহরের ছেলে কি না? বুঝবে না—তুমি কিছু বুঝবে না। তারপর নিজেই পায়ের স্লিপার দুটো ব্যস্তভাবে খুলে দু'হাতে নেয়। এবং বসে পড়ে। আগুনে জুতোর বাড়ি মারে। ঘষতে থাকে।

দিব্য হাসতে-হাসতে বলে—তোমায় ওয়াইজ বলেছিলুম। উইথড্র করছি। তুমি বোকা।

মধুমালা রেগে যায়।—বেশ। আমি বোকা তো বোকা!

এবার দিব্য আগুনের বৃত্তরেখা বরাবর পায়ের জুতো দিয়ে একহাত দূরে সমান্তরাল রেখার মতো শুকনোপাতা সরিয়ে দেয়। বৃত্তাকার আগুন নিরাপদে জ্বলে ছাই হয় এবং আর এগোতে পারে না। তখন সে বলে—শহরের ছেলেরা কীভাবে আগুন নেভায় দেখলে তো?

মধুমালা উঠে দাঁড়ায়। জুতো দুটো পরে গম্ভীর মুখে এগিয়ে গাছের গুঁড়িতে হেলান দেয়।

দিব্য সিগারেটটা ধরিয়ে নিতে আগুনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু তখনই সরে এসে মধুমালার উদ্দেশ্যে বলে—হ্যাঁ, তুমি ধরিয়ে দেবে।

তারপর ওর কাছে চলে আসে। অবাক হয়ে ফের বলে—দেশলাই? দেশলাই কই? বাঃ! দেশলাইটা বুঝি ফেলে দিয়েছ সঙ্গে সঙ্গে!

মধুমালা জবাব দেয় না। তার আঙুলে ছ্যাঁকা লেগেছিল। সে আঙুলটার দিকে তাকিয়ে আছে। দিব্য ব্যস্তভাবে দেশলাইটা খুঁজে বেড়ায়। পা দিয়ে ছাই উল্টে দেখে। আগুন নিভে গেছে। বাতাসের

ঝাপটানিতে কোথাও ধোঁয়ার সঙ্গে অঙ্গারের ছটা—উজ্জ্বল রোদে তা খুব নিষ্প্রভ। তারপর দেশলাইটা দেখতে পায়। অক্ষত পড়ে রয়েছে একটু তফাতে। সেখানে কচি কিছু ঘাস শুকনো পাতার ফাঁকে মুখ বের করে আছে।

মধুমালাও খুঁজছিল আড়চোখে। সেও একই সঙ্গে দেখতে পায়। এবং দু'জনে একই সঙ্গে লাফ দিয়ে যায়। একই সঙ্গে হাত বাড়ায়।

দিব্যর হাত মধুমালার হাতে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে মধুমালার মুখ লাল হয়ে যায়। এক মুহূর্তের জন্যে দিব্যর মনে হুলস্থূল ঘটে। কিন্তু সে নিজেকে সামলে নেয়।

দু'জনে হিজলগাছের ছায়ায় এসে গুঁড়িতে পিঠ রেখে বসে। মধুমালা এবার সাবধানে দেশলাই জ্বালে। দিব্য দু'হাতে তার জ্বলন্ত কাঠিধরা হাত ঘেরে এবং সিগারেট ধরিয়ে নেয়। তারপর বলে—খুব ভয় পেয়েছিলে খুকু?

—কেন?

মাথা দোলায় দিব্য।—এমনি। মনে হল তুমি যেন হঠাৎ ভয় পেলে।

—কখন?

—দেশলাইটা কাড়াকাড়ির সময়।

মধুমালার মুখটা আবার লাল হয়ে যায়। সে মুখ ফিরিয়ে অস্ফুটে বলে—যাঃ!

দিব্য কিছুক্ষণ সিগারেট টানার পর বলে—হঠাৎ চলে এলে! বকুনি খাবে যে।

মধুমালা সে কথা পাশ কাটিয়ে বলে—বাবা কী বললেন?

—তুমি ওঁকে সব বলে দিয়েছ কেন?

—বেশ করেছি। আমার পেটে কথা থাকে না।

—আর কাকে বলেছ?

—আর কাকেও বলিনি।...মধুমালা স্বচ্ছন্দভাবে জানায়। বাবা আইন বোঝেন। তাই বলেছি। বলে ঠিক করিনি?

—হুঁ।

—বাবা কী বললেন, বলছ না কেন?

—বললেন...দিব্য একটু চুপ করে থাকে। তারপর বলে—বললেন, অন্যায় কিছু করিনি। ব্ল্যাকমেলারকে খুন করা পাপ নয়।

—বাবা তা তো বলবেনই।

—কেন বলো তো?

—খুনটুন নিয়ে মামলামোকর্দমা করা অভ্যেস বাবার। তাই।

দিব্য ভেবেছিল, প্রমথের সেই ভয়ঙ্কর ব্যাপারগুলো বুঝি তার মেয়ে জানে। জানে না দেখে আশ্বস্ত হয়। বলে—উনি ব্যাপারটা সহজভাবে নিলেন। কিন্তু...কিন্তু...

—কী?

—আমার বিবেক।...হঠাৎ আবেগে অস্থির হয়ে যায় দিব্য। সারাক্ষণ লোকটাব বউ আর অসহায় ছেলেমেয়েগুলোর চেহারা মনে ভেসে আসছে। ওরা তো কোন দোষ করেনি। ওদের যে আমি দুঃখের পথে ভাসিয়ে দিলুম। ওরা তো আমায় ক্ষমা করতে পারবে না, খুকু।

মধুমালা নির্বিকার মুখে বলে—পারবেই না। কেন পারবে? তুমি তো শাস্তিটা ওদেরই দিলে!

—হ্যাঁ। তখন এ কথাটা ভাবিনি।...দিব্যর চোয়াল আঁটো হয়ে যায়। সিগারেটটা ঘষে নেভায় জুতোর তলায়। ফের বলে—কিন্তু এখন আমি কী করব?

দিব্য অস্থির হয়ে বলে—এর শাস্তি আমাকে দেওয়া হলেও ওদের যে শাস্তি অকারণে চাপিয়ে দিয়েছি, তা তো তারা ভুগবেই। ছেলেমেয়েগুলো এডুকেশন পাবে না। খেতে পাবে না। মাতাল জঘন্য চরিত্রের বাবা। আমি তো জানি, একপয়সা জমিয়ে রাখেনি লোকটা। সব দু'হাতে উড়িয়েছে। কিন্তু সে বেঁচে থাকলে ওরা খেয়ে-পরে বাঁচত। লেখাপড়া শেখার সুযোগ পেত।

মধুমালা উদ্বিগ্ন মুখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। কিছু বলতে পারে না।

—আমি শালা বাস্টার্ড! দোষ তো আমারই। যখন সমাজ বদলাবো বলে সমাজ ধ্বংস করতে ছুটে গিয়েছিলুম, তখন নিজেই ধ্বংস হয়ে গেলুম না কেন? আমি শালা লোভী হ্যাংলা কুকুর! ওয়েস্টার্ন মড সেজে বিলিতি কুত্তার ভেক ধরে ফপিশ লাইফের লোভে নিজেকে চাকরি-বাকরির লাইনে ভিড়িয়ে দিলুম। পপকালচারে মুখ লুকিয়ে বাঁচতে চাইলুম। অথচ এই আমি—ভালভাবেই জানি, এর নাম সংকীর্ণ স্বার্থপরতা! এর নাম দালালী! এর নাম ভিড়ের ভেড়া হয়ে হেঁটে যাওয়া!

বলতে বলতে সে ঘোরে মধুমালার দিকে। জ্বলজ্বলে চোখের দৃষ্টিতে তাকিয়ে চাপা গলায় বলে—তোমার বাবা এই জঙ্গলে বুনো শুয়োর ভেবে গুলি করে মেরেছিল একটা মানুষকে! তুমি বন্দুক ছুঁড়তে পারো না মধুমালা? বলবে—দৈবাৎ অ্যাক্সিডেন্ট, দিব্যদার বুকে গুলি লেগেছিল! বলো, পারবে না বলতে?

মধুমালা ফোঁস করে ওঠে।—খুব হয়েছে! থামো! পরমুহূর্তে সে হাসিতে ভেঙে পড়ে। বলে—বাঃ! এবার আমার হাতে হাতকড়া পরাবার মতলব!

তারপর স্তব্ধতা কতক্ষণ।...

আর একসময়, সকাল ও দুপুরের সন্ধিকালে, বনভূমির সব চঞ্চলতা অসাধারণ রোদে জ্বলে যেতে-যেতে বিষণ্ণতা বেরিয়ে পড়েছে ছায়া থেকে—মাটি থেকে শোকসঙ্গীতের মতো সুর উঠেছে, কারণ ঘাসফড়িং আর পোকা-মাকড়গুলো দলে দলে ডাকতে শুরু করেছে। পিছনের জামবন থেকে সেই ঝিঁঝি-পোকার ডাক আরও তীব্র হয়েছে! মাঝে-মাঝে আসছে কোন অন্যমনস্ক বাতাস—কাঠকুড়ানী একলা মেয়ের মতো। দিব্যর হাত আলগা হয় এবং হাতটা তুলে নেয় সে। হাতে মধুমালার শ্বাস অনুভব করে। মধুমালা বলে—মদন এসেছিল কেন?

—কে সব এসেছে নাকি! সদরের সরকারী অফিসাররা।

—ও! আমি ভেবেছিলুম...

—পুলিশ?

—হুঁ।

দিব্য একটু হাসে।—তোমার কাছে আশ্বাস পেয়েছি ও ব্যাপারে।

মধুমালা খুশি হয়ে বলে—সেজন্যেই তো বাবাকে তোমার বিপদের কথা সব বলেছিলুম।

—এখন তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করছি।

—আগে বুঝি ভীষণ বোকা ভাবছিলে?

—না। তাহলে তোমায় কিছু বলতুম না।

—আচ্ছা, দিব্যদা!

—উঁ?

—কলকাতার কথা বলো না।

—কী কথা? কলকাতা কখনও দেখনি বুঝি?

—ভ্যাট! তা নয়।

—তবে কী?

—তোমার কলকাতার লাইফের কথা।

—বুঝেছি।...দিব্য মুখ টিপে হাসে।

—কী বুঝেছ?

—আমার ভালবাসার খবর জানতে চাও তো?

মধুমালা মুখ ফিরিয়ে কুমারীর লজ্জায় বনভূমি শিহরিত করে বলে—তুমি অসভ্য!

—তুমিও খুব সভ্য কি, খুকু?

—হুঁ, আমি জংলী। মা বলে, দাদা বলে—কপালীতলার সবাই বলে মোক্তারবাবুর মেয়ে জংলী! কারণ আমি জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসি। সবাই বলে কী জানো? যদি মোক্তারবাবুর বাড়ি না জন্মে বাউরি দুলেদের বাড়ি জন্মাতুম, সেটাই নাকি আমার যোগ্য হত। ভুল করে ও-বাড়িতে জন্মেছি! একদমে কথাগুলো বলে মধুমালা হেসে ওঠে।—তুমি জানো, আমার সত্যিকার কোন বন্ধু নেই? আমি

ভীষণ একা-একা ঘুরি?

—টের পাচ্ছি।

—কেন, তা বিশ্বাস করবে দিব্যদা?

—নিশ্চয় করব।

—কপালীর মন্দিরে মানত করে আমার জন্ম, তাই।

—বুঝলুম না।

—কপালীর মন্দিরটা কোথায় দেখলে না? জঙ্গলের মধ্যে। কপালীমা আমাকে বেঁধে রেখেছেন, বুঝতে পারছ না? সব সময় আমার মন পড়ে থাকে এখানে—নদীর এপারে। একবেলা না এলে কিছু ভালো লাগে না যে।

দিব্য অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। মধুমালার নিষ্পাপ সরলতাব উৎসটা সে এবার যেন পবিষ্কার দেখতে পায়। যেভাবেই হোক, ওর মাথায় এসব ঢুকে গেছে। এই বোধ থেকে মেয়েটির হয়তো আর পরিত্রাণ নেই। কুসংস্কার হোক, আর ন্যাকামি হোক, এর মধ্যে হয়তো কোন গভীব ব্যাপার আছে—যা সত্য। যেন আছে কোন আদিম প্রতিশ্রুতি—যা পালন করে যেতে হবে বেচাবীকে একদিন আরও বড় হবে। স্বামী ছেলেপুলের সিন্দুকে ওর অস্তিত্ব বন্ধক রাখা হবে। কিন্তু ও যেন মূলত প্রকৃতির। দিব্য আনমনে বলে—তুমি...ডটার অফ নেচার তাহলে? প্রকৃতিকন্যা!

মধুমালা নির্দ্বিধায় হঠাৎ ওর হাত নিয়ে বলে—বলো না দিব্যদা কলকতার কথা!

দিব্য মাথা দোলায়।—আমার কোন ভালবাসার মেয়ে ছিল না।

—বিশ্বাস করি না। একশো দিব্যি দিলেও, না।

—কেন, খুকু?

—কলকাতার ছেলেমেয়েরা...বাব্বা! সব জানি আমি।

—খুকু, তোমার বয়স কতো?

—হঠাৎ একথা কেন শুনি?

—সম্ভবত আমার বয়স তোমার ডবল।

—দাদার বুলি। দাদা সবসময় বলে কী জানো? মধুমালা সুকুমারের কণ্ঠস্বর ভেংচি কেটে বলে—জানিস খুকু, আমি তোর ডবল বয়েসী?

—ঠিকই বলে। ডবল বয়সী মানুষের সঙ্গে ফাজলামি করতে নেই। বিপদ হতে পারে।

—কিসের বিপদ?

—ভালবাসার কথা শোনার বিপদ।

মধুমালা চমকে ওঠে একটু। ওর দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেয়। তার উজ্জ্বল ঘাড় গলা কানের লতি থেকে গলাঅব্দি শিহরণ ওঠে। দিব্য তা খুঁটিয়ে দেখতে পায়। তারপর মধুমালার হাতটা আলগা হয়ে যায়। অস্ফুটস্বরে বলে—আমায় কেউ ভালবাসতে পারে না। আমি তো কারু মনের মতো নই। কারু মন জুগিয়ে কথা বলতে পারিনে। সবাই বলে মেয়েটা সৃষ্টিছাড়া।

তারপর হঠাৎ সে উঠে দাঁড়ায়। দিব্য বলে—রাগ করে চলে যাচ্ছ?

মাথা দোলায় মধুমালা। তারপর বেণী বুকের দিকে নিয়ে নতুন করে বাঁধতে থাকে। এতক্ষণ যা-কিছু হয়েছে, সব পায়ের তলে মাড়িয়ে বলে—বাবা তোমাকে শিকার করতে বলে যাননি? কই—ওঠ। পাখি-টাখি মারো!

—নাঃ! কিছু ভাল লাগে না। তুমি ইচ্ছে করলে বাড়ী যেতে পারো।

—আর তুমি!

—এখানেই বসে থাকব।

—কতকাল?

—যদ্দিন না মরি।

অমনি মধুমালা তার দিকে ঝুঁকে কাতুকুতু দিতে থাকে।—ফের কুলক্ষুণে কথা? ওঠ—ওঠ বলছি। ওঠ। না উঠলে...

দিব্য বাধ্য ছেলের মতো উঠে দাঁড়ায়।

—ওই যে নদীর ধারে, বাঁকের কাছে বাঁশবন দেখছ! ওর পিছনে ভীষণ জঙ্গল আছে। এর চেয়েও বেশি জঙ্গল। ওখানেই নাকি সরকারী রিজার্ভ ফরেষ্ট হবে। বাবা তদ্বির করছেন। যাবে ওখানে?

—তুমি যাবে তো?

মধুমালা একটু ভাবে। ঘুরে উত্তর-পশ্চিমে কপালীতলা দেখে নেয়। তারপর বলে—ফিরে গিয়ে কিন্তু প্রচণ্ড বকুনি খেতে হবে। মায়ের শুধু নয়—বাবারও।

—খাবে বকুনি।

মধুমালা আবার একটু ভাবে। তারপর আস্তে আস্তে বলে—আমি তো অন্যায় করিনি!

দিব্য ওর একটা হাত নেয়। মধুমালা আবার লজ্জায় রাঙা হয়ে মুখ নামিয়ে বলে—ওখানে একটা লোক মোষ চরাচ্ছে। দেখছে। হাতটা ছেড়ে দাও।

দুজনে বাঁধে ওঠে। ফাঁকা খোলামেলা কিছুদূর। সূর্যের তাপ ততক্ষণে কড়া হয়েছে। কাছাকাছি ছায়া নেই। স্লুইস গেটের নীচে জাল পেতে জেলে ও জেলেনী একবুক জলে দাঁড়িয়ে ছিল। মুখ তুলে ওদের দেখতে থাকে। মধুমালা ওপর থেকে ঝুঁকে বলে—নেত্যদা! মাছ পাচ্ছ তো?

—তেমন পাচ্ছি না দিদিমণি।

—যা পাচ্ছ, তাই খুব। ফেরার সময় নিয়ে যাব। দেখছ না? কলকাতার লোক এসেছে। মাছ লাগবে না?

লোকটা হাসে। মেয়েটি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দিবাকে দেখে। দিবার চেহারা সায়েবদের মতো—হয়তো তাই। উঁচুতে ফুটফুটে ফর্সা একটা শরীর। সেও তো কম চমকপ্রদ নয়। এই জল-জঙ্গলের নিসর্গে বড় উদ্ভট লাগার কথা। দিব্য নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে যুবতী মেয়েটির দিকে। খালি গা। ভিজে কাপড়ে স্তনদুটি পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। কিন্তু ওর তো এতটুকু সংকোচ নেই। শরীর নিয়ে এতটুকু বাতিক নেই যেন। শরীর ওর কাছে স্বাভাবিক ব্যাপার।

আরও কিছুটা এগিয়ে প্রথম যে গাছটা সামনে এল, তার তলায় দাঁড়ায় দিব্য। মধুমালা বলে—দাঁড়াচ্ছ কেন? এরি মধ্যে টায়ার্ড?

দিব্য মাথা দোলায়। তারপর ফের পা বাড়ায়। ক্লান্তি এসেছে, সত্য! সেটা শারীরিক কারণে নয়, উদ্দেশ্যহীনতার জন্যে।

একটু পরে খোলামেলাটা শেষ হয়ে যায়। কাশব্যানাকুশে ঢাকা কয়েক একর জমির ওপর পায়ে-চলা রাস্তা পেরিয়ে ওরা বাঁশবনের কাছে পৌঁছয়। বাঁশবনটা দূর থেকে যত ঘন দেখাচ্ছিল, ততটা ঘন নয়। ভেতরে শুকনো বাঁশপাতার স্তূপ। প্রচুর ফাঁকা। এখানে আরণ্য ভাবটা আরও বেশি---দিব্য অনুভব করতে পাবে। কিন্তু বিহারের জঙ্গলের সেই উগ্র রুক্ষতা নেই, কিংবা নেই তরাই বা আসামের জঙ্গলের মতো দুর্ভেদ্যতা আর স্যাঁতসেঁতে ভাব। ভাগীরথীর সমতল অববাহিকায় এইসব বনভূমি খুব সাজানো গোছানো। এর মধ্যে অহিংস প্রশান্তি আছে। দিব্য স্মৃতির মধ্যে ডুবে যেতে থাকে।

বাঁশবনের পর সত্যিকার জঙ্গল বলা যায়। উঁচু-উঁচু ঘন গাছপালা আর লতাপাতা জড়াজড়ি করে সেখানে একটু দুর্গমতা সৃষ্টি করেছে। দিব্য এখন মুগ্ধ হয়ে বলে ওঠে—বাঃ।

মধুমালা কেমন হাসে।—এদিকে বারদুত্তিন এসেছি। সেও বাবা বা দাদার সঙ্গে। তখন নাকি বাঘ থাকত।

—এখন থাকে না?

—সবাই বলে আর বাঘ নেই। সবগুলো মোক্তারবাবু মেরে শেষ করে দিয়েছেন।

—ঠিকই করেছেন। তাঁর মেয়ের নির্ভয়ে চলাফেরার জন্যে।

বাবার গর্বে গর্বিতা মধুমালা বলে—হুঁউ। তাছাড়া এই এলাকা পুরোটা আমার দাদুর, জানো তো?

—কেমন করে জানব?

—বাবা ইচ্ছে করেই ফেলে রেখেছেন। সবাই বলে, গাছগুলো কেটে রাতারাতি বেচে দেওয়া উচিত। অনেক টাকা হবে। কারণ, গভমেণ্ট তো দখল করে নেবে সব। বাবা কী বলেন জানো? বাবা বলেন, নিক না দখল। তবে ট্রাকটার বা ডোজার চালিয়ে উচ্ছেদ করে চাষবাস করা চলবে

না। রিজার্ভ ফরেষ্ট করতে হবে। আজ বোধহয় ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টেব অফিসাররা এসেছে। গিয়ে শুনব, এইসব নিয়ে কথা হয়েছে। বাবা বলেন জন্তু-জানোয়াররা...

দিব্য ওর কাঁধে হাত রাখতেই মধুমালা থামে। একটু আড়ষ্ট হয়ে পা ফেলে। দিব্য বলে—আরণ্য স্বাধীনতা কাকে বলে জানো, খুকু?

—উঁ?

—আরণ্য স্বাধীনতা। তার মানে, বনজঙ্গলে একরকম স্বাধীনতা আছে। মানুষ সেখানে গেলে সেই স্বাধীনতা পায়।

—তুমি পেলে বুঝি?

—তুমি পাচ্ছ না?...

দিব্য থামে। তাবপর ওর দু'কাঁধে হাত রাখে। ফের বলে—কেন এখানে আমায় নিয়ে এলে, মধুমালা?

মধুমালা প্রথমে অবাক, পরে বিব্রত—তার চঞ্চলতা ফুটে ওঠে চোখে, শরীর ব্যাপী। সে সেই বিস্মিত অস্থিরতা নিয়ে বলে—তুমি বন্দুক ছুঁড়বে, দেখব। খরগোস মারবে। এখানে খরগোস আছে অনেক। হরিয়াল মারতে চাও, তাও আছে। অনেকরকম পাখি আছে।

—কিন্তু আমি আর কিছু মারব না, খুকু।

—তাহলে ফিরে চলো।

—না।

—তবে?

মধুমালা নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করে। কাঁটাঝোপে আটকে গেলে যেভাবে শাড়ি ছাড়িয়ে নেয়, সেভাবেই। কিন্তু পারে না। দিব্যর দুই নিষ্পলক তীব্র দৃষ্টি তাকে ভয় পাইযে দেয়। দিব্য চাপা স্বরে বলে—তুমি কি ভয় পাচ্ছ?

—হ্যাঁ।

—কেন?

—তুমি অমন করছ কেন?

—কী করছি, খুকু?

মধুমালা অসহায় হয়ে নিজের পায়ের দিকে দৃষ্টি ফেলে—মুখটা নামায়।

একটু পরে দিব্য বলে—একি! ভয়ে তুমি কেঁদে ফেললে যে!

তাবপর মধুমালা যা বলে ওঠে, দিব্য ভীষণ চমকায় এবং তক্ষুনি তার কাঁধ ছেড়ে দেয। মধুমালা মুখ নামিয়ে কান্নাজড়ানো গলায় বলে—আমি ওসব কখনও করিনি।...

দিব্য প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল—কী সব, কিন্তু সে প্রশ্ন করার মেজাজ নেই। রাগে জ্বলে ওঠে সে। পকেটে হাত ভরে দ্রুত সিগারেট বের করে। জ্বেলে নেয়। তারপর হনহন করে এগিয়ে যায় সামনের দিকে। একটা বিশাল বটের তলায় অজস্র ঝুরি—সেখানে গিয়ে একবার ঘোরে। দেখে, মধুমালা সেভাবেই দাঁড়িয়ে আছে।

কতক্ষণ একইভাবে দাঁড়িয়ে থাকে সুকুমারের বোন।

তারপর দিব্যর একটু অনুতাপ হয়। সে ডাকে—খুকু! এখানে এস।

বেশ কয়েকবার ডাকার পর মধুমালা যায়। গিয়ে সে একটা লম্বা মোটা শেকড়ে বসে পড়ে। তারপর নিঃশব্দে শাড়ির নীচের দিক থেকে চোরকাঁটা ছাড়াতে থাকে।

দিব্য একটু হেসে তার সামনে নগ্ন মাটিতেই বসে পড়ে। বন্দুকটা শুইয়ে রেখে সেও মধুমালার শাড়ি থেকে চোরকাঁটা ছাড়াতে থাকে।

মধুমালা কিছু বলে না। বাধাও দেয় না। দিব্য সস্নেহে বলে—তুমি জংলী সত্যি। লেখাপড়া শিখলে কী হবে, তুমি ভীষণ গেঁয়ো আর বোকা মেয়ে। নয় তো সবসময় ওই এক ভয় নিয়ে ঘুরতে না—ওই একই কথা বলতে না। দেখ খুকু, আমি আগেও দেখেছি—যখন আণ্ডারগ্রাউণ্ডে বিপ্লবের খেলা করতে গিয়েছিলুম, গ্রামের মেয়েরা ভীষণ শরীরসচেতন। সেক্সকনসাস। একজন পুরুষের সঙ্গে অন্যরকম সম্পর্কের কথা তারা ভাবতেও পারে না। আমেরিকানদের মতো। লাভ-মেকিং মানেই নির্ভেজাল সেক্স।

আমি সেক্সের কথা ভাবিনি, খুকু। বিশ্বাস করো। তুমি এতটুকু মেয়ে! আমি তো জানোয়ার নই!

মধুমালা ফোঁস করে ওঠে এতক্ষণে।—থাক। আর লেকচার নয়। তেষ্টা পেয়েছে। জল খাব।

—এখানে জল কোথায় পাবে?

—পাব। ওপাশে কপালী। তোমার তেষ্টা পেলে চলে এস।

—পেয়েছে।

দুজনে ওঠে। উত্তরে গাছপালা ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে অনেকটা গিয়ে দিব্য দেখে, রেলব্রিজের কাছে চলে এসেছে। এখানে নদী ঘুরে পশ্চিমে গেছে। নদীতে দহ আছে। ঘন কালো জল। দুজনে ঢালু পাড় বেয়ে দৌড়ে নামে। হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আঁজলাভরে জল খায়।...

তারপর নদীর ধারের নীচু বাঁধে বসে দিব্য সিগারেট ধরায়। রেলব্রীজ কাঁপিয়ে একটা মালগাড়ি যেতে থাকে। ততক্ষণ কেউ কোন কথা বলে না। মালগাড়িটা চলে যাওয়ার পর মধুমালা বলে—কটা বাজল?

—মোটে সাড়ে দশটা। কেন?

—এমনি...বলে সে হঠাৎ অস্থির হয়ে ওঠে। উঠে দাঁড়ায়। দিব্যর কাঁধের কাছে জামা খামচে ধরে বলে—ওঠ। কিছু মেরে না নিয়ে গেলে কথা উঠবে।

—কী কথা?

—বোঝ না? সবাই ভাববে, জঙ্গলে ওরা এতক্ষণ কী করছিল!

দিব্য হাসতে-হাসতে ওঠে।—চলো, দেখি! অগত্যা হরিয়ল মারব। আইন ভাঙতে একসময় খুব আনন্দ পেতুম। আবার ভেঙে ফেলি! হরিয়াল মারা আজকাল বেআইনী।

গাছপালার মধ্যে ঢুকে মধুমালা ঘনিষ্ঠ হয় দিব্যর। গা ঘেঁষে হাঁটে! তারপর অদ্ভুত চাপা গলায় বলে—কিন্তু সাবধান, অমন করে আর আমার দিকে তাকিও না। আর যা খুশি করো আপত্তি নেই।

—যা খুশি? দিব্য ওর কাঁধে হাত রাখে। বেশ। চুমু খাই যদি?

মধুমালা মুখ নামিয়ে ফিসফিস করে বলে—আচ্ছা, চুমু খেলে মেয়েদের পেটে বাচ্চা আসে না তো?

দিব্য জোরে হেসে ওঠে। তারপর দ্রুত ওর মুখটা দু'হাতে ধরে ঠোঁটে ঠোঁট রাখে। মধুমালা চুপ করে থাকে। বনভূমিতে একটা ঘূর্ণিহাওয়া ঢুকে পড়ে। দুজনকে পেরিয়ে যায়।...

নয়

তখন সূর্য মাথার ওপর। ঘাসে শুকনো পাতার মচ মচ শব্দ শুনে মধুমালা ঘুরে তাকায়। দিব্যর পাঁজরে দ্রুত খোঁচা দিয়ে সে তখনই একটু সরে বসে। ফিস ফিস করে বলে—মহিষাসুর! হুঁউ-যা ভেবেছিলুম।...

দিব্যও ঘুরে তাকায়। মদন আসছে। কিন্তু তার হাতে দিব্যর ব্যাগ! পিছনের ঘাসজমি পেরিয়ে সে এদিক-ওদিক খোঁজে। এরা ঝোপের পাশে ঘন পাতাভরা বাঘনখা গাছের ছায়ায় বসে আছে! আর ঘাসজমিটা ফাঁকা—সেখানে তীব্র রোদের ঝলকানি, তাই হয়তো গরিলাটার চোখ ধাঁধিয়ে গেছে। তারপর হাঁ করে। তারপর কোনরকমে বলতে পারে—পালিয়ে যান!

মধুমালা উঠে দাঁড়ায় সঙ্গে সঙ্গে। তার ঠোঁট কাঁপে। দাঁতে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরে সে বলে—তার মানে?

—পুলিশ পুলিশ! মদন অতিকষ্টে বলেই দিবার ব্যাগটা দিব্যর কোলে ফেলে দেয়। সে পিছনদিকটা ঘুরে দেখে ফের বলে—ওনারা পুলিশ! বাবুদাকে ধরবে বলছে।

দিব্য গম্ভীর হতে চেয়েছিল। পারে না। সে একটু হেসে ব্যাগটা খুলে দেখে নেয় তার প্যান্টশার্টও গুঁজে দেওয়া হয়েছে। এটার মধ্যে।

তারপর দিব্য উঠে দাঁড়ায়। ওদের সামনে নিঃসঙ্কোচে সুকুমারের পাঞ্জাবি, তারপর পাজামাটাও খুলে ফেলে। নিজের প্যান্ট-শার্ট পরতে থাকে। আর মধুমালা সেই সময় আচমকা হাত তুলে মদনকে মারতে যায়। মদন একটু পিছিয়ে গিয়ে হাসবার চেষ্টা করে।

হাঁপাতে হাঁপাতে মধুমালা বলে—বুদ্ধু গাড়োল হতচ্ছাড়া মহিষাসুর!

মদন হাঁফ সামলে নিয়েছে ততক্ষণে। মুখ হাঁড়ির মতো। ঘড়ঘড় করে বলে—আমাকে বকলে কী হবে? গিন্নিমা বললেন যে! নুকিয়ে ওনার ব্যাগ আমাকে দিয়ে খিড়কির দোরে ঠেলে দিলেন। বললেন, দিয়ে আয় গে এক্ষুনি। পালিয়ে যেতে বল্‌গে।

মধুমালা আরও ক্ষেপে গিয়ে বলে—আর তোমারও কপালে বাঘ পড়ে গেল?

দিব্য সুকুমারের কাপড়-চোপড় মদনের হাতে গুঁজে দিয়ে বলে—সুকুমার কেমন আছে, মদন? ওকে বোলো—যেখানেই থাকি, চিঠি দেব।

মধুমালা ফুঁসে ওঠে—এসব মিথ্যে! মা ওকে চালাকি করে পাঠিয়েছে। মাকে আমি চিনিনে?

মদন বাধা দিয়ে বলে—আজ্ঞে না দিদি, না। সত্যি সত্যি পুলিশ এয়েছেন গো।

দিব্য দেখতে পায়, মধুমালার চোখে জল ছলছল করছে। দিব্য বলে—ও নিশ্চয় মিছে বলছে না, খুকু। যখন তোমার বাবাকে ডেকে নিয়ে গেল—তখনই আমার সন্দেহ হয়েছিল। আর তোমার বাবাও আমাকে সাবধানে থাকতে বলে গেলেন।

মধুমালা বলে—না। এ মায়ের চক্রান্ত। মাকে তুমি চেনো না!

মদন বলে—আজ্ঞে না দিদি। মা কালীর দিব্যি। তখন জিপগাড়িতে সাদা পোষাকে ওনারাই এসেছেন। মোক্তারবাবু বললেন—সুকুর দুই বন্ধু কলকাতা থেকে এয়েছিল বটে। তারা তো কালই চলে গেছে। ওনারা বিশ্বাস করলেন না। তক্কাতক্কি হচ্ছিল কর্তাবাবুর সঙ্গে। ইদিকে গিন্নীমা তক্ষুনি সব শুনে আমাকে...

মধুমালা চোখে জল নিয়ে ধমক দেয়—থামো! ওসব বানানো! মা তোমাকে শিখিয়ে পাঠিয়েছে।

মদন দিব্যি কাটতে যাচ্ছিল, দিব্য তাকে থামিয়ে ব্যস্তভাবে বলে—খুকু, এখানে এভাবে আর চ্যাঁচামেচি করা ঠিক নয়। আমি যাই। তোমাদের বন্দুকটা তুমি নিয়ে যাও—যদি দৈবাৎ দেখ, ওরা নদীর এপারে এসে পড়েছে, জিগ্যেস করলে বলবে—বন্দুক ছোঁড়া প্র্যাকটিশ করছিলে। ব্যস! লক্ষ্মীটি!

সে বন্দুকটা তুলে মধুমালার হাতে গুঁজে দেয়। মধুমালা বন্দুকটার কুঁদো মাটিতে ঠেকিয়ে রাখে। চোখে জল ছলছল করছে। নাসারন্ধ্র কাঁপছে। কপালের ওপর ফুরফুরে কিছু চুল ওড়াউড়ি করছে—কোথাও একটা প্রচণ্ড ঝড় চলেছে বুঝি। দুপুরের বনভূমি হঠাৎ ঘোর স্তব্ধ হয়ে গেছে। কোন পাখিও আর ডাকছে না। মদন ডাকে—এস দিদি!

মধুমালা দ্রুত ঘুরে দিব্যকে বলে—তুমি কোথায় যাবে?

দিব্য একটু হাসে। মাথাটা নাড়ে। বলে—বুঝতে পারছিনে। পরের স্টেশন এখান থেকে কতদূরে?

মদন বলে—গিন্নিমা তাই বলেছেন বাবুদা! পরের টিশান সোনাইতলা—মোটে ক্রোশ আড়াই। রেলের ধারে-ধারে চলে যান। দুটোর গাড়ি পেয়ে যাবেন।

মধুমালা ছটফট করে বলে—কিন্তু ওর যে খাওয়া হয়নি, সে কথা খেয়াল নেই মায়ের? এত যে ভাল করার চেষ্টা, টিফিন-কেরিয়ারে খাবার দিয়ে পাঠাল না কেন? আমি সব বুঝি।

—খেয়ে নেব'খন। দিব্য সরল মনে হেসে বলে। সোনাইতলায় কিছু খেয়ে নেব। ও তুমি ভেবো না।

মধুমালা বলে—রেললাইনের ধারে কোন গাছ নেই। সারাপথ রোদ্দুর।

—সে ম্যানেজ করে নেব। ভেবো না।

—আমি কিছু ভাবছি না! ভাববার দায় পড়েছে!...বলে মধুমালা দুহাতে মুখ ঢেকে ঘুরে দাঁড়ায়। বন্দুকটা পড়ে যায় এবং চাপা ফোঁপানির আওয়াজ শোনা যায়।

মদন অপ্রস্তুত হয়ে বলে ওঠে—অই! অই! পাগলামি কোরো না তো দিদি।

দিব্য মধুমালার কাঁধে হাত রেখে ডাকে—খুকু! শোন।

মধুমালা নড়ে না। মদন এগিয়ে এসে বন্দুকটা তুলে নিয়ে বলে—আর দেরী কোরো না গো। কে জানে, ওনারা ইদিকবাগে এসে পড়লেন নাকি!

দিব্য মদনকে বলে—তুমি বরং এগোও মদন। আমি ওকে দেখছি।

একটু দাঁড়িয়ে থেকে মদন বলে—বন্দুকটা?

—তুমিই নিয়ে যাও। ও পরে যাচ্ছে। আর দেখো, সুকুর জামার পকেটে কয়েকটা কার্তুজ আছে

কিন্তু।

মদন সাবধানে সুকুমারের পানজাবি-পায়জামাটা বুকের কাছে ধরে রাখে এবং অন্যহাতে বন্দুকটা কাঁধে নিয়ে পা বাড়ায়। সে খোলা ঘাসজমিটা পেরিয়ে একবার ঘুরে এদের দেখে নেয়। তারপর গাছপালার মধ্যে ঢোকে। দেখতে দেখতে চোখের আড়ালে চলে যায়।

দিব্য মধুমালার দুই কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দেয়।—খুকু! কথা শোন।

মধুমালা নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে। তারপর বলে—না! আমি আর কারও কথা শুনব না। পৃথিবীসুদ্ধ আমার পর—শত্তুর!

— আঃ খুকু! কথা শোন।

মধুমালা কান্নাজড়ানো গলায় বলে—কেন? বাবা এত কীর্তি করেছেন, আর তোমার ব্যাপারটা ম্যানেজ করতে পারতেন না? খুব পারতেন।

—আমার ব্যাপারটা ম্যানেজ করা সম্ভব নয়, খুকু।

—কেন নয়?

—ও কথা থাক, অন্য কথা শোন তুমি। লক্ষ্মীটি, অবুঝ হয়ো না।

মধুমালা মাথা দোলায়।—না। বাবা হয়তো ওদের ম্যানেজ করেছেন এতক্ষণে। শুধু মা গোলমাল পাকিয়ে দিলেন! তুমি যেও না।

দিব্য হাসতে গিয়ে দুঃখিত হয়। মধুমালার এই ছেলেমানুষীতে সরল সৌন্দর্য আছে—ভালবাসা আছে, অপরিণত মনের জোরালো ভালবাসা—সে বুঝতে পারে। আর এই নির্মল বনভূমিতে প্রকৃতিই এমন একটা স্বচ্ছন্দ খেলার আয়োজন করেছিল, খেলা শিগগির ভেঙে দিতে হল—কারণ মানুষের মধ্যে অনেক পাপ আছে, অনেক গ্লানি আছে। দিব্য নিজের আবেগ দমন করে। সুকুর বোন এমন নির্লজ্জভাবে কেঁদে ফেলতে পারে, সে ভাবেও নি।

দিব্য আস্তে বলে—যাব না তো কী করব?

—আমি আগে দেখে আসি, ব্যাপারটা সত্যি না মিথ্যে।

—কিন্তু খুকু, একদিন না একদিন আমাকে ধরা পড়তেই হবে। আমার বিচার হবে কোর্টে। এটা একটা রিয়্যালিটি।

বলেই দিব্যর মনে হয়, মধুমালা রিয়্যালিটি বুঝতে পারবে কি? সে উপযুক্ত কথা হাতড়ায়। আর মধুমালা ফের বলে—আমি এক্ষুনি আসব। দৌড়ে যাব—দৌড়ে আসব। তুমি এখানে থাকো।

—যদি ব্যাপারটা সত্যি হয়?

—ফিরে তো আসি। বাবা কী বলেন শুনে আসি! মা কপালীর দিব্যি, ফিরে এসে যেন তোমায় এখানে দেখতে পাই।

মধুমালা পা বাড়াতেই দিব্য বলে—এক সেকেণ্ড!

তারপর সে তখনকার মতো ওকে চুমু খেতে মুখ বাড়ায়, কিন্তু মধুমালা ওর মুখটা ঠেলে সরিয়ে দেয়। বলে—ফিরে এলে, তখন।

সে দৌড়ে চলে যায়। ঘাসজমির ওপর শুকনো পাতা কাঁপিয়ে অলৌকিক হরিণের মতো ছুটে যায় সুকুমারের বোন। দিব্য মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। কতক্ষণ পরে তার চমক ভাঙে। একটা সুন্দর স্বপ্ন সদ্য ভেঙে জেগে ওঠার পর কয়েক মুহূর্ত যেমন আবছা বিষণ্ণতা আসে, সেইরকম। দিব্য চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে আরও কিছুক্ষণ।...

তারপর আচমকা শিউরে ওঠে সে। নির্জন বনভূমির স্তব্ধতা, গাছের পাতাও আর কাঁপছে না—সারা অতীতকাল এখানে আটকে গেছে এবং ভবিষ্যৎ বলতে কিছু নেই, এমন এক অদ্ভুত অবস্থা। এই যেন তার মৃত্যু। পিছনে ও চারপাশে অথৈ স্তব্ধতা, সামনে শূন্যতা।

আর মৃত্যুর মুহূর্তে নাকি সমস্ত জীবন মানুষের চোখের সামনে ছবির মতো স্পষ্ট ভেসে ওঠে। দিব্যর পিছনের জীবন স্তব্ধতার একাকার জটিলতা থেকে, বৃত্তরেখা যেভাবে সরলরেখা হয়ে ওঠে, ছিলেছাড়া ধনুকের মত দ্রুত সোজা হচ্ছিল—প্রলম্বিত সময়ের ওপর বিন্দু বিন্দু রক্তের রঙ ফুটে উঠছিল। সে অসহায় হয়ে তাকিয়ে থাকে। এ কোথায় এসে তার চলার শেষ হল! এমন করে ফুরিয়ে

যাবার শূন্যতায় পৌঁছতেই কি সে আজীবন হেঁটে এসেছে?

বাঘনখা গাছটার গুঁড়িতে হেলান দিয়ে সিগারেট ধরায় সে। তারপর কাঁধের ব্যাগে হাত ভরে। রিভলভারের প্যাকেটটা অনুভব করে। অমনি সে সাহস ফিরে পায়।

প্যাকেটটা শান্ত এলোমেলো সুতো দিয়ে জড়িয়ে রেখেছে। বাফুন! চোয়াল আঁটো হয়ে যায় দিব্যর। দ্রুত সুতো খুলে প্যাকেট থেকে রিভলবার বের করে এবং চারটে কার্তুজই ভরে নেয়। প্যাকেট আর সুতো মুচড়ে দলা পাকিয়ে ঝোপের মধ্যে ফেলে দেয়।

রিভলবারটা অটোমেটিক। সাবধানে এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে একবার ট্রিগার টেপে। একটা গুলি বেরিয়ে যায়। আচমকা নির্জন জঙ্গল ভুতুড়ে শব্দে ছত্রখান হয়। বারুদের কটু গন্ধ এসে ঝাপটা মারে। হ্যাঁ—ঠিকই আছে। ছ'টা কার্তুজের দু'টি নিয়েছে অসীম মজুমদার। একটা নিল কপালীর জঙ্গল। বাকি রইল তিন। হিসেব করে দিতে হবে বাকিগুলো। কে নেবে? সে জানে না। চেনে না তাদের।

কিন্তু কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে সে? সুকুমারের বোন তাকে কি আমৃত্যু দাঁড়িয়ে থাকতে বলে চলে গেল?

রিভলবারটা হঠাৎ যতটা প্রয়োজনীয় মনে হচ্ছিল, আর মনে হচ্ছে না ততটা। তার হাত কাঁপছে। ওজন বেড়ে যাচ্ছে অস্ত্রটার। সে ক্লান্তভাবে বাঁ-হাতের অবশিষ্ট সিগারেট জুতোর তলায় ঘষে নেভাতে গিয়ে দেখে, সুকুর স্লিপারটা পরে আছে! তার জুতো সুকুর মা টের পাননি। জুতোজোড়া খাটের তলায় রয়ে গেছে। তার পরনে মডের পোষাক এখন অথচ পায়ে দীনহীন মানুষের মতো বাজে একটা স্লিপার—নোংরা, ছেঁড়া। একটু বিব্রত বোধ করে। তারপর রিভলবারটা সাবধানে ব্যাগে ভরে রাখে।

সুকুর বোন তাকে দিব্যি দিয়ে গেছে। মা-কপালীর নামে দিব্যি—আসলে ভালবাসার দিব্যি। সুকুর বোনের সরল হৃদয়টার কথা ভেবে দিব্যর কষ্ট হয়। কোথায় পড়েছিল যেন—কোন বিলিতী বইতেঃ হোয়েন ইনস্যানিটি কিলস দা ইনোসেন্স...

সে আবার কিটব্যাগ খোলে। নোটবই বের করে। ডটপেন বের করে। একটা পাতা ছিঁড়ে বড় বড় হরফে লেখে ঃ 'খুকু!'

একটু ভাবে। চিঠি লিখতে ইচ্ছে করে না। বরং কবিতার কিছু লাইন। এইরকম অবুঝ ভালবাসার ব্যাপারে, সেটাই শোভন নয় কি? সে ঠোঁটের কোণায় হাসে। স্মরণ করতে থাকে যোগ্য কোন কবিতার পঙ্‌ক্তি। কিছু মনে আসে না এ মুহূর্তে।

স্মৃতি আবার অন্ধকার হয়ে গেছে। ঠোঁট কামড়ে দিব্য ছটফট করে। তারপর আচমকা মনে ছিটকে আসে কয়েকটা লাইন। কিন্তু এ তো ইংরেজি! হো-চি-মিন—নাকি মাও-সে-তুং—কোন বিপ্লবী কবিতা, স্মৃতি আবার গোলমাল করছে। 'ইন দা স্প্রিং টাইম উই কেম ইওর গ্রিন ভ্যালি...উই প্রমিজ্‌ড সো...ইন ইওর স্প্রিং টাইম হোয়েন দা রেড ফ্লাওয়ার্স ব্লসম্...'

সুকুর বোন স্কুল ফাইনাল পাশ। বুঝবে কি? অগত্যা সে বাংলা করে লেখে ঃ 'তোমার বসন্তদিনে...'

পরের শব্দটা ভাবার মুহূর্তে পিছনে কোথাও ঝোপের আড়াল থেকে কে তাকে ভারি গলায় ডাকে—দিব্যেন্দুবাবু!

ডটপেন দাগটানা ছোট্ট কাগজ থেকে মুখ তোলে। দিব্য দ্রুত ঘোরে এবং দীর্ঘ সময়ের অভ্যাসজাতবোধে, সংস্কারে, মুহূর্তে চঞ্চল ও ক্ষিপ্র সে—কলম ও কাগজটা ফেলে দিয়ে রিভলবার বের করে।

অন্যদিক থেকে আবার জোরালো আওয়াজ আসে—দিব্যেন্দুবাবু! ওটা ফেলে দিন।

দিব্যেন্দু ঘুরতেই আরেকদিক থেকে কে দৌড়ে আসে এবং চিৎকার করে—হ্যাণ্ডস্ আপ্!

দিব্য তিনদিকে তিনটে কার্তুজ পাঠিয়ে দেয়। স্তব্ধতা খান খান হয়ে যায়। পাখিরা কোথাও চুপচাপ ঝিমুচ্ছিল। তুমুল চেঁচামেচি জুড়ে দেয়। তারপরই তার ডান হাতে গুলি লাগে। আবার গুলির শব্দ এবং বারুদের ঝাঁঝালো গন্ধে কপালী জঙ্গল কটু হয়ে যায়। রিভলবারটা পড়ে যায়। দিব্য বাঁ-হাতে ডান হাত চেপে ধরে পাগলের মতো গর্জন করে ওঠে—বাস্টার্ড!

না, গুলিতে জখম হবার যন্ত্রণায় নয়—সুকুর বোনকে পুরো বাক্যটা লিখতে পারেনি বলে। তার চারদিকে শুকনো পাতায় প্রচণ্ড আওয়াজ হতে থাকে। কারা আসে, সে মুখ তুলে দেখে না।...

মধুমালা উবুড় হয়ে শুয়েছিল। চোখমুখ ফুলো দেখাচ্ছিল। খিড়কি দিয়ে ঢুকতেই মন্দিরা তাকে প্রচণ্ড মেরেছেন। ঘরে বন্ধ করে রেখেছেন। খেতে দেননি। জীবনে এই প্রথম শাস্তি মধুমালার।

বিকেলে দরজা খুলে সুকুমার বোনের কাছে এল। তার গায়ে তখনও জ্বর। হাঁফাচ্ছে। আসতে কষ্ট হয়েছে তার। গলার কাছে হাত রেখে ডাকে—খুকু!

গরম হাতের ছোঁয়ায় চামড়া পুড়ে যায় মধুমালার কিন্তু ঘোরে না।

কয়েকবার ডাকার পর সে সাড়া দেয়—কী?

সুকুমার চাপা স্বরে বলে—মদন কপালীর জঙ্গলে গিয়েছিল। এই কাগজটা কুড়িয়ে এনেছে। দেখ তো, হয়তো তোরই।

মধুমালা ঘুরে দোমড়ানো কাগজটা দেখে বলে—না। আমার না।

—হ্যাঁ। ওটা তোর। মানে—দিব্য লিখেছে তোকে।

মধুমালা চুপ করে থাকে। সুকুমার কাগজটা ওর হাতে গুঁজে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। কিছু বলবে ভাবে—বোনকে কিছু সান্ত্বনা দিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু পারে না। আস্তে আস্তে চলে যায় সে। এবং পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেলে উবুড় হয়ে শুয়ে থেকেই মধুমালা লাল চোখে কাগজটা দেখে। 'খুকু, তোমার বসন্তদিনে...'

কী? আমার বসন্তদিনে কি? মধুমালা মনে মনে মাথা কোটে। তারপর দেখে, তারই চোখের জলে হরফগুলো ভিজে আবছা হয়ে যাচ্ছে। যে সাদা প্রজাপতিটা কাল কপালীর জঙ্গলে সে পিষে মেরেছিল, ঠিক সেই রকম।...

চুমকি

সাত কেজি তিরিশ গ্রাম রেলের লোহা চুরি করে হাতেনাতে ধরা পড়েছিল গিরিপদ। আদালতের হাকিম তার বয়স এবং অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করে তিনমাস সশ্রম জেলের হুকুম দেন। রেল জাতীয় সম্পত্তি। সে কারণে কড়াকড়ির একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করার দরকার ছিল।

গিরিপদ রোগা গড়নের খাটো মানুষ। মুখে দাড়ি এবং মাথায় চুড়ো করে বাঁধা চুল নিয়ে তার চেহারায় সাধুর আদল আছে। বয়স ষাটের কাছাকাছি। সে পাতলা ঠোঁটে বিনীতভাবে কথাবার্তা বলে। জেলকর্তা তাকে বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁরা একরকম চোরডাকাতের সঙ্গেই ঘর করেন। চোর চেনেন। গিরিপদ চোর নয়। হয় দৈবাৎ পেটের দায়ে অনন্যোপায় হয়ে কনকপুর রেলইয়ার্ড থেকে লোহার টুকরোগুলো হাতাতে গিয়েছিল, নয় তো পাকেচক্রে তার মতো নিরীহ বোকা লোককে ফাঁদে ফেলা হয়েছিল। তাছাড়া গিরিপদ মুখ ফুটে বলেও ছিল, সে ভদ্রবংশের মানুষ। গরিব বলে এই হীনাবস্থা।

গিরিপদ মেয়াদের শেষদিকে জেলকর্তার সবজিক্ষেত ও ফুলবাগানে মালীগিরি করেছে। জল তুলেছে। ছোটখাট ফায়ফরমাস খেটেছে। তারপর তাঁরই সুপারিশে মেয়াদের একসপ্তা আগে ছাড়া পেল। তিনমাসের জেলভাতা পেল কিছু টাকা। এ তার পক্ষে আশাতীত ব্যাপার। বাড়ি আসার সময় সদর শহরে মেয়ের জন্য আর নিজের জন্য ধুতি-গেঞ্জি কিনল সে। একটা সস্তা কাঁধেঝোলানো ব্যাগ কিনে যত্ন করে ভরে ট্রেনে চাপল।

চুরির দায়ে জেলখাটার লজ্জায় গিরিপদ বেলা গড়িয়ে বাড়ি ফিরতে চেয়েছিল। কনকপুর জংশনে যখন সে ট্রেন থেকে নামল, তখন ঝুঁঝকি আঁধার হয়েছে।

রেলের বিশাল জলার ধারে বিশ বছরের জবরদখল এক বসতিতে তার মাটির বাড়ি। টালির চাল। খিড়কির ঘাটে হাত পা ধুয়ে বেড়ার ধারে যেতেই কুকুর ডাকল। গিরিপদকে দেখে কুকুরটা ডাক থামিয়ে লেজ নাড়তে নাড়তে এসে তার হাঁটু শুঁকতে থাকল। গিরিপদ চোখে জল নিয়ে তার পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, ভাল তো বাবা?

তারপর বাড়ি ঢুকেই স্তম্ভিত হয়ে গেল সে।

দাওয়া থেকে উঠোন অব্দি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে আছে সাত আটজন যুবক। দাওয়ায় একটা লণ্ঠন জ্বলছে। যুবকদের চেহারায় মাতলামির লক্ষণ ফুটে বেরুচ্ছে। গিরিপদর মেয়ে চুমকি একটা মাটির হাঁড়ির থেকে এনামেলের গেলাসে তাড়ি ছেঁকে সবাইকে বিলোচ্ছে। একটা থালায় একগুচ্ছের চাট।

দৃশ্যটা এত অবিশ্বাস্য লাগল গিরিপদর যে সে ভাবল, তার মেয়াদখাটা শেষ হয় নি এবং জেল ঘরে শুয়ে সে আসলে লম্বা একটা স্বপ্ন দেখছে। কুকুরটা তার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে তখনও লেজ নাড়ছিল। সে পা তুলে তার পেটে একটা লাথি মারলে কুকুরটা কেঁউ করে উঠে সরে গেল। তখন তাড়ির আসরের যুবকদের চোখ পড়ল তার দিকে। তারাও অবাক চোখে তাকিয়ে রইল। লেবুগাছের কাছে দাঁড়িয়ে সাধুর চেহারার মানুষটি যে গিরিপদই, তারা ঠাহর করতে পারছিল না যেন।

চুমকি স্থির হয়ে গিয়েছিল। তারপর আস্তে বলল, তোমরা এখন যাও তো সব।

যুবকরা যথেষ্ট মাতাল হয়েছে ইতিমধ্যে। তারা হইচই করে উঠল। একজন বলল, উরে ব্বাস। গিরিকাকা যে গো। হঠাৎ ছেড়ে দিলে শালারা?

আরেকজন বলল, ভালই হয়েছে। এস গিরিকাকা, এস। বসে পড়ো।

অন্য একজন জিভ কেটে বলল, অ্যাই বানচোত। কাকে কী বলছিস? গিরিকাকা সাধুসন্নেসী লোক। এসব জিনিস খায় নাকি?

ওরা জড়ানো গলায় এইসব বলে হ্যা হ্যা করে হাসতে লাগল। তখন চুমকি ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠল, কী বললাম কানে গেল?

অ্যাই চোপ! চুমকিরানী কী বলছে শোন।

কী বলছ চুমকিরানী?

চুমকি উঠে দাঁড়াল। চালের বাতা থেকে একটা কাটারি টেনে নিয়ে বলল, কুপিয়ে কাটব বলে দিচ্ছি। বেরোও সব বাড়ি থেকে—বেরোও বলছি।

ওরা গ্রাহ্য করল না। হ্যা হ্যা করে হাসতে লাগল। গিরিপদ লেবুগাছের কাছে দাঁড়িয়ে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে। ওদের অনেকেই তার চেনা। ভদ্রলোকের বাড়ির ছেলে সব। লেখাপড়াও জানে। চকচকে পোশাক-আশাকে ঘুরে বেড়ায়। ওদের দল বেঁধে কতদিন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে অথবা ওভারব্রিজে আড্ডা দিতে দেখেছে। গিরিপদকে গিরিকাকা বলে ডাকে ওরা। গিরিপদও তো ভদ্রবংশের মানুষ। তার এক ভাই বড় চাকুরে কলকাতায় থাকে। এক বোনের স্বামী জামসেদপুরে ইঞ্জিনিয়ার। গিরিপদ জীবনে কারুর অনুগ্রহপ্রত্যাশী নয় এবং বিশেষ লেখাপড়া শিখতে পারেনি বলে এই অবস্থায় পড়ে আছে। কিন্তু তার জীবনে আর যা কিছু ঘটুক, এমন কিছু ঘটবে সে কল্পনাও করতে পারেনি। চুরি করে জেল খাটার চেয়ে এ যে সাংঘাতিক ব্যাপার। তার বাড়ির উঠোনে তারই মেয়ে তাড়ির আসর বসাবে, সে এ দৃশ্য চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছিল না। মাত্র তিনটে মাসেই চুমকির এই পরিণতি কেমন করে সম্ভব হল?

গিরিপদর আর এক মুহূর্ত এ মাটিতে পা রাখতে ইচ্ছে করল না। সে হঠাৎ ঘুরে হন হন করে বেরিয়ে গেল সদর দরজা দিয়ে।

পেছনে চুমকি চেঁচিয়ে উঠল, বাবা! তুমি কোথায় যাচ্ছ? বাবা!

গিরিপদ কানে নিল না। অন্ধকারে এবড়োথেবড়ো রাস্তা ধরে হাঁটতে থাকল। ঘন গাছপালার ভেতর এই জবরদখল মাটিতে নানা অবস্থার মানুষের বাস। বন্যা ও বিবিধ কারণে দূর থেকে উৎখাত মানুষেরা এসে দিনে দিনে এখানে ভিড় বাড়িয়েছে। তাদের ঝোপড়ি বা তেরপলের ঘর কালক্রমে প্রকৃত বসতবাটি হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক কারণে তাদের উচ্ছেদ করা যায় নি। তার ফলে কেউ কেউ দখল করা জায়গা পয়সাওলা লোকেদের বেচে দিয়েছে এবং পয়সাওলা লোকেরাও সুন্দর পাকাবাড়ি আর ফুলবাগান নিয়ে বসবাস করছে। বিদ্যুৎও এসে গেছে এখানে। বেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়ে গিরিপদ বাজারের কাছাকাছি আলোর দেশে পড়ল।

তখন আবার সেই চুরি করে জেল কাটার লজ্জাটা তাকে টেনে ধরল। সে আবার অন্ধকারের ভেতর ঢুকে গেল। ঝোঁকের বশে সে আগাছা-ঝোপঝাড় আর জলকাদা ভেঙে হাঁটতে হাঁটতে বেলস্টেশনে ফিরল। তারপর প্ল্যাটফর্মের শেষদিকটায় নিরিবিলি বেঞ্চে বসে রইল।

গিরিপদ এই যে আবার এতখানি দূরত্ব পেরিয়ে স্টেশনে এল, প্রতি মুহূর্তে সে আশা করেছিল চুমকির কণ্ঠস্বর শুনতে পাবে পেছন থেকে—কিংবা পায়ের ধুপধুপ শব্দও শুনতে পাবে। কিন্তু তেমন কিছু ঘটল না দেখে মুষড়ে পড়ল। তার আদরের মা-হারা মেয়ে এমন নিষ্ঠুর হয়ে গেছে।

জীবনে এত বেশি অবাক হয়নি গিরিপদ। এত বেশি কষ্টও পায় নি। মাত্র তিনটে মাসে তার বড় সাধের সংসার এমন বদলে গেল কেন, সে বুঝতে পারছিল না। সে অনবরত ফোঁস ফোঁস করে নাক ঝাড়তে থাকল। তার দাড়ি ভিজে যাচ্ছিল চোখের জলে।

কিছুক্ষণ পরে একটা ট্রেন এলে গিরিপদ ট্রেনটার দিকে তাকিয়ে রইল ভিজে চোখে। তারপর গার্ড সায়েব হুইশল বাজালে সে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। তারপর দৌড়ে গিয়ে সামনের কামরায় উঠে পড়ল।

এই ট্রেনে চেপে কোথায় যাচ্ছে, জানা ছিল না গিরিপদর।...

রেলের জলায় মৎস্যশিকার

বোধনের মাসতুতো ভাই জিজো কলকাতার ছেলে। স্প্যানিশগিটার বাজিয়ে নানা দেশের গান গাইতে পারে। সম্প্রতি কনকপুরে বোধনদের ক্লাবের একটা ফাংশনে তাকে গাইতে এনেছিল বোধন। তারপর তাকে আটকে রেখেছে দু-তিনটে দিন। জিজোর চেহারা ফিল্মের হিরোর মতো। তাছাড়া এমন মনমাতানো গান গাইতে পারে বলে কনকপুরে তার খুব খাতির। বোধন গর্ব করে তাকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। ছোট্ট এক চলমান ভিড় পেছনে এঁটে থাকে।

কলকাতা ফেরার দিন শনিবার জিজোকে আটকে দিলেন বোধনের জামাইবাবু শ্রীহর্ষ। তিনি কলকাতা ফিরবেন সোমবার। জিজোর এখানে মন টেঁকে না। কিন্তু জামাইবাবু নাছোড়বান্দা মানুষ। খুব আমুদে বলে জিজোকে তাঁর সাহচর্য ভাল লাগে।

শনিবার সকালে বোধন ও জিজোকে নিয়ে শ্রীহর্ষ রেলের জলায় গেলেন ছিপ ফেলতে। জলার ইজারা বোধনের বাবা কুঞ্জনাথের। জামাইয়ের ছিপ ফেলার নেশা আছে। এলেই ছিপ নিয়ে সারাদিন জলের ধারে কাটান।

ডানদিকে খিড়কির ঘাটে চুমকিকে দেখে শ্রীহর্ষ বললেন, ওটা সেই গিরিপদবাবুর মেয়ে না বুধো?

বোধন হাসল। ... বাবুই বটে! চুরি করে জেলখাটাবাবু!

শ্রীহর্ষের মন ফাতনার দিকে। বললেন, চুরি মানে?

বোধন আগাগোড়া রসিয়ে রসিয়ে ঘটনাটা বর্ণনা করে বলল, ট্রাজেডি একেই বলে জামাইবাবু। বাড়ি ফিরেই মেয়ের কীর্তি দেখে গিরিপদ কেটে পড়েছে শুনলুম। আচ্ছা, আপনি বলুন—এর কোনো মানে হয়?

কিসের?

ভ্যাট! আপনি শুনছেন না কিচ্ছু!

শুনছি। বলো না।

নিজে চোর—এদিকে মেয়ে লুজক্যারেক্টার। ডিফারেন্সটা কী বলুন?

শ্রীহর্ষের খ্যাঁচ ফস্কে গেল। ফের মনোযোগ দিয়ে টোপ গাঁথতে থাকলেন। পেছনে ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বোধন ও জিজো বসে আছে। জিজো চুমকিকে দেখছিল। বলল, লুজক্যারেক্টার?

বোধন বলল, হ্যাঁ।

লুজক্যারেক্টার বলতে কী বোঝাতে চাইছিস? কারুর সঙ্গে প্রেম-ট্রেন—

বোধন জামাইবাবুর দিকে ইশারা করে জিভ কাটলে জিজো থেমে গেল। শ্রীহর্ষ মুচকি হেসে বললেন, বলে যাও। আমি শুনতে পাচ্ছি না। আমার কানে এখন মাছটার চলাফেরার ডিপ সাউণ্ড। দেখছ, কেমন বুজকুড়ি কাটাচ্ছে? সেয়ানা মাল!

বোধন হাসতে লাগল। তারপর গলা একটু চেপে জিজোকে বলল, কার সঙ্গে প্রেম আছে বোঝা যায় না। কিন্তু ইদানীং দেখি, একদঙ্গল মাস্তান ওদের বাড়িতে আড্ডা দেয়।

জিজো বলল, নাম কী রে?

চুমকি। দারুণ নাম না?

আসল নাম নিশ্চয় আছে একটা?

হয়তো আছে। জানি না। বলে বোধন জিজোর দৃষ্টি লক্ষ্য করে চোখ নাচাল। ....এই! এমন করে তাকাস না! পয়েজনাস মেয়ে। এক্ষুনি কী বলে ফেলবে।

জিজো দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বলল, ওর ফিগার দেখছিলুম, ডায়েট কন্ট্রোল করে নাকি রে?

বোধন আবার হো হো করে হেসে ফেলল। ..... তোর মাইরি কোনো আইডিয়া নেই। খেতেই পায় না ঠিক মতো, তো ডায়েট কন্ট্রোল। ছোটবেলায় দেখলে মনে হত রিকেটে ভুগছে। এখন বরং একটু সাহস লেগেছে গায়ে।

চুমকি তাদের বাড়ির নিচে ঘাটের মাথায় একটুকরো কাঠে বসে সামান্য কিছু তৈজসপত্র ধোয়াপশলা করছিল। মাঝে মাঝে এদিকে মুখ তুলে তাকাচ্ছিল। তাকে নিয়েই এরা কিছু বলাবলি করছে টের পাচ্ছিল সম্ভবত। কাজ শেষ হলেও সে জলে হাত নেড়ে খেলতে থাকল।

জিজো বলল, দারুণ ফিগার। এসব মেয়ের টেলেন্ট থাকলে উন্নতি করত। বুধো, তুই রুবিনাকে তো দেখেছিস।

রুবিনা?

সেই যে অ্যাংলো মেয়েটা রে। মুনলাইটের।

বোধন ওর কাঁধে থাপ্পড় মেরে বলল, তুই মাইরি যে কী। কিসের সঙ্গে কিসের কম্পেয়ার করিস।

জিজো সিরিয়াস হয়ে বলল, নারে। রুবিনারাও ভীষণ গরিব ছিল। ওর বাবা ছিল রেলের লোক। রিটায়ার করার পর শোচনীয় অবস্থা হয়েছিল। এত ড্রিংক করলে তা হবেই। তারপর দেখেছি, রুবিনার মা ভিক্ষে করত। তারপর রুবিনা বড় হল। আর ব্যাস। ওদের কপাল ফিরে গেল।

আহা, সে তো টেলেন্ট আছে বলে। বোধন তর্কের সুরে বলল। গিরিপদর মেয়ের কী আছে?

শুধু ফিগার আর বদমাইসি।

জিজো শান্তভাবে বলল, বদমাইসি ডিপেণ্ড করে অবস্থার ওপর। রুবিনা কী ছিল? টাকাকড়ি স্ট্যাটাস এসব পেলে তখন পার্সোনালিটি ডেভালাপ করে। রুবিনাকে এখন কেউ ডাকলেই শুতে....

বোধনের চিমটি খেয়ে সে থামল। জামাইবাবু শ্রীহর্ষ কপট রাগ দেখিয়ে বললেন, তোমরা আদিরস ঢেলে দিলে, আমার চারটাকে ঘুলিয়ে! এত হল্লা করলে মাছ আসে? তারও তো প্রাণের ভয় আছে রে বাবা! ...তারপর ঘুরে ওদের দিকে চোখ নামিয়ে ফের বললেন, নেপথ্যে এ্যাক্টিং না করে স্টেজে মেরে দিয়ে এস। তবে না বুঝি!

শ্রীহর্ষ খিকখিক করে হাসতে হাসতে ফাতনায় নজর দিলেন। বোধন চোখ টিপে জিজোর কানে কানে বলল, আয়। সিগারেট খেয়ে আসি।

জিজো উঠল।.....জামাইবাবু। আসছি আমরা।

শ্রীহর্ষ বললেন, দেখো হে। যেন মাথা ফাটিয়ে দেয় না। সাবধান।

যাঃ। কী যে বলেন। বলে বোধন জিজোর হাত ধরে টেনে আগাছার জঙ্গলে ঢুকল। ওখানে রেলের সীমানা সিমেণ্টের থামে কাঁটাতার আটকে বেড়ার মতো লম্বালম্বি চলে গেছে স্টেশনের পেছন অব্দি। ঝোপঝাড় আর উঁচু ঘাসের ভেতর মরচেধরা লোহালক্কড়ের স্তূপ দেখা যায়। গিরিপদর বাড়ির কাছে প্রকাণ্ড এক ডুমুরগাছের তলায় দাঁড়িয়ে দুজনে সিগারেট টানতে থাকল।

জিজো বলল, রুবিনার ভীষণ ডাঁট হয়েছে, বুঝলি বুধো? আমার সঙ্গে কথাবার্তা বিশেষ হয় না। বোম্বের একটা লোকের সঙ্গে এখন চুটিয়ে প্রেম করছে। লোকটা মাইরি ওর বাপের বয়সী—আপন গড বলছি। তুই দেখলে ভাববি এ কী ব্যাপার!

বোধন বলল, ওর সঙ্গে গান করিস না আর?

করি। সে তো ডায়াসের ব্যাপার। টাকা পাই, করি। ডায়াস থেকে নেমে গেলেই তখন হু কেয়ারস ফর হুম। তবে আমি ভাবছি, শির্গাগির মুনলাইট ছেড়ে দেব। পোষাচ্ছে না।

ফিল্মে প্লেব্যাকের চেষ্টা করছিস না কেন রে?

জিজো আনমনা হয়ে বলল, কলকাতায় বসে থেকে কিছু হবে না। বোম্বে যেতে হবে। তবে বোম্বেতে বড্ড টাফ কম্পিটিশান।

বোধন সপ্রশংস দৃষ্টে চেয়ে বলল, হ্যাঁ রে। তুই যে বারে গান করিস, মেসোমশাই-মাসিমা আপত্তি করেন না?

জিজো হাসল। .....করলেও শুনছে কে? একদিন জানিস কী কেলেঙ্কারি? জিজো গলা নামিয়ে বলল, ডায়াসে তেড়ে কিশোরকুমার চালিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ দেখি কোণার টেবিলে বড়দা আর এক অচেনা ভদ্রমহিলা।

বোধন হতভম্ব হয়ে গেল। ....বলিস কী! রুণুদা?

জিজো সকৌতুকে মাথা দোলাল।

রুণুদা জানত না তুই মুনলাইটে গান করিস?

জানলে কি যেত?

তারপর তারপর?

জিজো কথা বলতে ঠোঁট ফাঁক করেছিল, হঠাৎ থেমে গেল। হাত দশেক তফাতে একটা ঝোপের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে চুমকি। স্থির শরীর, নিষ্পলক চোখ। বোধন দেখতে পেয়ে একটু নার্ভাস হল। সে ভাবল, চুমকিকে নিয়ে কথাবার্তা বলেছে, তাই কানে গিয়ে সে ঝগড়া করতে এসেছে। বোধন মুখে যতই ফটফট করুক, সে নিরীহ প্রকৃতির যুবক। ঘাবড়ে গিয়ে বলল, চুমকি যে! গিরিকার খবর-টবর পেলে?

চুমকি মাথাটা একটু দুলিয়ে বলল, না। তারপর কয়েক পা এগিয়ে এল।

বোধন আরও ভড়কে গিয়ে বলল, কিছু বলবে চুমকি?

চুমকি জিজোর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। ....পরশু রাতে পোড়ামাতলায় আপনার গান শুনলাম। খুব ভাল লেগেছিল। হঠাৎ এখানে আপনাকে দেখব ভাবিই নি। হ্যাঁ গো বুধোদা, আর ফাংশনে বসবে

না?

বোধনের ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়েছে। চুমকি যে জিজোকে এই জঙ্গলে জায়গায় দেখে অবাক হয়েছে এবং কমপ্লিমেন্ট দিতে এসেছে টের পেয়ে সে খুব খুশি হল। বলল, আর ফাং-‍‍‍ হবে না এখন। জিজো, আলাপ করিয়ে দিই! এ হল চুমকি।

চুমকি দ্রুত বলল, আমার ভাল নামটা বলো বুধোদা।

বোধন হ্যা হ্যা করে হেসে বলল, তোমার দিব্যি—আমি তোমার আসল নাম জানিই না।

কুমারী লক্ষ্মীরাণী রায়।

কুমারী লক্ষ্মীরাণী রায়। বোধন বলল। বলো কী! তবে চুমকি নামটা তার চেয়ে ভালো।

জিজো মনে মনে হাসছিল মেয়েটির গ্রাম্য সরলতা দেখে! নির্বিকার ভাব ফুটিয়ে একটু নমস্কারের ঢঙ করে বলল, আমার নাম সুতপন চ্যাটার্জী। আপনাকে সবাই যেমন চুমকি নামে চেনে, আমাকে তেমনি চেনে জিজো নামে।

চুমকি খুব হাসল। জিজো কথাটা তার খুব অদ্ভুত লেগেছে। বলল, জিজো। যেন নামটাকে সে বাজিয়ে নিতে চাইল।

বোধন বলল, জিজো আমার মাসতুতো ভাই। কলকাতায় থাকে।

চুমকি বলল, তোমার কলকাতার মাসিকে আমি বুঝি চিনি না? তোমার ভারতী মাসি তো?

বোধন ও জিজো অবাক হয়ে মুখ তাকাতাকি করল। জিজো মুখ টিপে হেসে বলল, বলুন তো কেমন চেহারা?

চুমকি বলল, বেঁটে মতন। ফর্সা রঙ। মাথার চুল দেখে হিংসে হয়। এত চুল।

জিজো চোখে ঝিলিক তুলে বলল, চিনেছে রে।

চুমকি বলল, আরও বলব? গত পুজোয় এসেছিলেন। বাবা সন্ধ্যেবেলা আমাকে বলল, কলকাতার দিদি এসেছে—সকাল বেলা একগোছা ফুল দিয়ে আসবি। আমি ভোরবেলা গিয়ে দিয়ে এলুম। মাসিমা আমাকে দুটো টাকা দিয়ে বললেন, রোজ ফুল চাই।

জিজো বলল, তোমাদের ফুলের বাগান আছে নাকি?

ছিলো তো। চুমকি উদাস চাহনিতে বলল। উঠোন ভর্তি কত ফুলগাছ ছিল। বাবা বাড়ি বাড়ি বেচে বেড়াত। এখন পাট নেই মোটে। আমি ওসব পারি নে।

বোধন সহানুভূতি দেখিয়ে বলল, ওর বড় প্রব্লেম, বুঝলি জিজো? পিবিকা নিরুদ্দেশ। একা মেয়েছেলে—খুব করুণ অবস্থা।

চুমকি শাড়ির আঁচলের কোণা আঙুলে জড়াচ্ছিল। একটু লজ্জার ভাব মুখে ফুটিয়ে জিজোকে বলল, সেই গানখানা করুন না, শুনি। সেই যে....ধুস। পেটে আসছে মুখে আসছে না। সে স্মরণ করার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়ে ফের বলল, করুন না একখানা গান।

বোধন আবার হ্যা হ্যা করে হেসে বলল, এই জঙ্গলের মধ্যে গান! কেলেংকারি হয়ে যাবে মাইরি! এক্কেবারে হিন্দি ফিল্মের কাণ্ড হবে। ধ্যাৎ! ভাবা যায় না।

চুমকি চোখ পাকিয়ে বলল, তুমি থামো তো বুধোদা।

জিজো বলল, এখন মুড নেই।

কী নেই?

মানে— মেজাজ নেই। ভাল লাগছে না। জিজো একটু হাসল। ....বরং সন্ধ্যায় এদের বাড়িতে যান যদি, শুনতে পাবেন হয়তো। জামাইবাবু ছাড়বেন না মনে হচ্ছে।

বোধন একটু বিব্রত বোধ করল। চুমকি তাদের বাড়ি যাবে—সেটার চেয়ে বড় কথা হল, গানের আসর বসলে বসবে ভেতর ঘরে। হয়তো দোতলায় ওঁর থাকার ঘরেই বসতে পারে। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ পারিবারিক এবং প্রকাণ্ড প্রাইভেট, সেখানে বাইরের কারুর যাওয়া মানা—বিশেষ অন্তরঙ্গ না হলে। বোধন এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে বলল, জিজো! গেয়ে শুনিয়ে দে না বলছে যখন। আশে পাশে লোকজন নেই। ভিড় হবার চান্স দেখছি না। গলা চেপে গা বরং।

জিজো ভুরু কুঁচকে বলল, ধুস! আমার মুড নেই।

আহা, চুমকি শুনতে চাইছে। এতেই তোর মুড আসা উচিত।

জিজো চুমকির দিকে তাকাল। ...আপনি গান গাইতে পারেন না?

চুমকি ফিক করে হেসে গ্রাম্য মেয়েদের স্বভাবমতো আঁচলে হাসিটা ঢাকল। তারপর লজ্জা পাওয়া গলায় বলল, ইচ্ছে তো খুবই ছিল। ছোটবেলায় ধ্বজবাবুর গানের ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল বাবা। মাইনে দিতে পারিনি বলে ধ্বজবাবু রাগ করে একদিন বললে, তোর গলা শাঁকচুন্নীর মতো। তোর দ্বারা কিস্যু হবে না।

দুজনে কান খাড়া করে শুনছিল। জিজো বলল, তারপর?

চুমকি ঘুমভাঙা চোখে তাকিয়ে বলল, বাবা বলত গান জানলে পৃথিবীসুদ্ধ বশ। আমার হল না।

এই সময় হুইলে সুতো ছাড়ার কড়কড় শব্দ আর শ্রীহর্ষের চিৎকার ভেসে এল। ..বুধো। জিজো। কুইক। কুইক। কাম। কাম। বেঁধেছে-এ এ-এ

দুজনে দৌড়ল, পেছন পেছন চুমকিও।

চুমকির তালভঙ্গ

জামাইবাবু পাঁচকিলো ওজনের রুইমাছ ধরেছেন, বাড়িতে এদিন খুব আনন্দ। ছিপে ধরা মাছের স্বাদই নাকি আলাদা। নৈলে রেলের জলার বিশাল বিশাল মাছ খাওয়া হয়েছে এ যাবৎ। তারপর শ্বশুরের বন্দুক নিয়ে জামাই গেছেন বিলে হাঁসশিকারে। শ্রীহর্ষ যখনই আসেন এইসব অ্যাডভেঞ্চার হয়। তবে কুঞ্জনাথ এবার একটু সাবধান করে দিয়েছেন জামাইকে বন্দুকের ব্যাপারে। দিনকাল খারাপ। বন্দুক ছিনতাই হওয়ার খবর আছে এলাকায়। শ্রীহর্ষের সঙ্গে বোধন আর জিজো ছাড়া পুটন নামে পাড়ার একটা ডানপিটে ছেলেও গেছে।

এখন চৈত্রের শেষে শঙ্খদহের বিলে আর তত হাঁস নেই। শীতের শেষে সবই চলে গেছে প্রায়। ছুটকো দু-একটা ঝাঁক থাকলেও থাকতে পারে আলস্যের দরুন।

সন্ধ্যা গড়িয়ে নিরাপদে ফিরে এলেন শ্রীহর্ষ। পূর্ণিমা তিথি। চা ফা খেয়ে সঙ্গীদের নিয়ে হাইওয়েতে বেড়াতে বেরুলেন। হাঁস না মারতে পেরে মনটা ভাল নেই। একমাইল এগিয়ে নদীর ব্রিজে বসে বললেন, জিজো। গান গা-শুনি। জিজো গাইতে লাগল।

বোধনের মা আরতি নিচের বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে নাতি অর্থাৎ শ্রীহর্ষ ও তার বড় মেয়ে ক্ষণিকার ছমাস বয়সের শিশুটিকে আদর করছিলেন। উঠোনে কে এসে দাড়ালে বললেন, কে রে?

আমি চুমকি, মাসিমা।

আরতি ভুরু কুঁচকে বললেন, কী?

চুমকি একটু সেজেছে—সেটা বৈদ্যুতিক আলোয় স্পষ্ট। লাজুক হেসে আঁচলের ভেতর থেকে একগোছা করাটে রজনীগন্ধা বের করে বলল, যে কটা ছিল, নিয়ে এলুম মাসিমা। শুনলুম কলকাতার মাসিমা এসেছেন, তাই।

আরতি বিরক্ত হয়েছিলেন তাকে দেখে। বললেন, আসে নি। এখন সন্ধ্যাবেলা ফুল কী হবে? নিয়ে যা।

দোতলার বারান্দায় ঝুঁকে বোধনের দিদি রমিতা বলল, চুমকি না?

চুমকি মুখ তুলে হাসল। .....হ্যাঁ রুমুদি। তুমি কেমন আছ? কবে এলে?

রমিতা বলল, ও কী রে তোর হাতে? রজনীগন্ধা?

চুমকি মাথা দোলাল।

দাঁড়া যাচ্ছি। বলে রমিতা চটির শব্দ তুলে নামতে থাকল সিঁড়ি বেয়ে।

আরতি গুম হয়ে নাতির দিকে মন দিলেন। চুমকি বাড়ির ভেতর চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিল। জিজো বা বোধনের কোন সাড়া না পেয়ে একটু হতাশ হল সে। ওপাশের একটা ঘরে বোধনের ছোটভাই শোভন আর ছোটবোন জয়িতা পড়তে বসেছে প্রাইভেট টিউটরের সামনে। রান্না ঘরে ঠাকুরমশাই খুন্তি নাড়ছে। বসন নামে ঝি পা ছড়িয়ে বসে কী একটা করছিল। নিষ্পলক চাউনিতে সে চুমকিকে দেখতে থাকল। চাকর নণ্টে তার দিকে কেমন চোখে চাইতে চাইতে বেরিয়ে গেল কোনো

ফরমাস খাটতে। রমিতা নেমে এসে ফুলগুলো নিয়ে বলল, ধুস। এ কী ফুল এনেছিস রে? সেবার কত বিরাট ডাঁটি এনেছিলি। বলেই সে নিজের ভুল বুঝতে পারল। অবশ্য এখন সিজন চলে গেছে। কত নিবি রে? চুমকি জিভ কেটে বলল, পয়সা নেব বলে এনেছি নাকি রুমুদি? এমনি।

এমনি? রমিতা অবাক হয়ে তাকাল।

চুমকি চাপা গলায় বলল, ওবেলা বুধোদা বলল, গানের আসর হবে। ভারতী মাসিমার ছেলে গাইবে। তাই গান শুনতে এলুম রুমুদি। কখন আসর হবে গো?

ও মা। রমিতা কপালে চোখ তুলল। তুই জিজোর গান শুনতে এসেছিস? তারপর সে খিলখিল করে হেসে উঠল।

আরতির কানে গিয়েছিল কথাটা। বললেন কিসের গান? গান-ফান হবে না।

বুধোদা বলছিল তাই এলুম মাসিমা।

বুধোর সঙ্গে তোর কোথায় দেখা হল?

কেন? আমাদের বাড়ির কাছে রেলপুকুরে জামাইবাবু মাছ ধরছিলেন না? তখন বুধোদা....

আরতি এক কথায় বলে দিলেন, ওরা কেউ নেই এখন। ফিরতে রাত্তির হবে। তাই যা।

রমিতা বলল, তুই দাঁড়া একটু। পয়সা এনে দিচ্ছি।

চুমকি মনে মনে চটে গেল। কিন্তু মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, পয়সা লাগবে না। রুমুদি আমি গান শুনব বলে ওগুলো নিয়ে এলুম যে।

রমিতা এতক্ষণে ব্যাপারটা টের পেয়ে আবার হেসে উঠল। .....ও মা। তুই জিজোকে বুঝি এগুলো প্রেজেন্ট করতে এসেছিস। মা শুনছ? তোর পেটে পেটে এত বুদ্ধি রে চুমকি!

আরতি ধমক দিয়ে বললেন, কী ওর সঙ্গে ঝামেলা করো বাপু সন্ধ্যেবেলা। আমাদের বাগানে এত ফুল। আর ওর সঙ্গে.....অ্যাই চুমকি। তুই যা তো এখন।

চুমকির চোখ জ্বলে উঠল। কিন্তু সে কিছু বলল না। ঠোঁট কামড়ে ধরে হঠাৎ হন হন করে বেরিয়ে গেল। সদর দরজায় বেরিয়ে গিয়ে সে শুনতে পেল, আরতি চাপা গলায় বলছেন, গান শোনার ছল করে এসেছিল চালাকি আমি বুঝি না? রাজ্যের চোরডাকাতের আড্ডা ওদের বাড়িতে।

চুমকি রাগে অস্থির হল। তার ইচ্ছে করছিল, গিয়ে কিছু কথা শুনিয়ে আসে—কিন্তু রাগ দমন করল। হন হন করে সে হাঁটতে থাকল রাস্তায়। আলোর অংশ পেরিয়ে মোড় নিল সে। তাদের বসতিটার নাম হয়েছে নতুনপাড়া। সংকীর্ণ এবড়োখেবড়ো রাস্তায় একটু এগিয়ে জলনিকাশী নালার ওপর কাঠের ব্রিজ। ব্রিজে উঠলে কেউ তাকে নাম ধরে ডাকল। পূর্ণিমার আলো ঝলমল করছে। চুমকি চিনতে পেরে বলল, কী রে টেম্পো?

টেম্পো একা নেই। অ্যাটম, মনো, সাট্টা আর টিকিনও আছে। সামনে ওরা দাঁড়াতেই চুমকি শক্ত হয়ে গেল। টেম্পো বলল, তোর সঙ্গে আর্জেন্ট কথা আছে চুমকি।

চুমকি শক্ত গলায় বলল, কী?

তুই নোটনাশালাকে কী বলেছিস?

কী বলব আবার?

তুই বলিস নি ডাংয়ের বাড়িতে একবস্তা মাল রেখেছিলুম?

টিফিন হিসহিস করে বলল, আর নোটনশালা খোঁচড় লেলিয়ে দিলে। ডাংকে ধরে নিয়ে বেদম ঝাড়লে। এখন ডাংকে তুই পুষবি না তোর কত্তাবাবা পুষবে, বল?

অ্যাটম বলল, পোষাপুষির কথা ছাড় রে। রিয়্যাল কথাটা বল। এখন যে হেভি লাগা লেগেছে পেছনে, তার কী হবে?

সাট্টা বলল, অত বাতচিতের কী আছে রে?

টেম্পো হাত তুলে ওদের থামিয়ে দিয়ে বলল, আমাকে বলতে দে। আমি তখনই বুঝেছিলুম বেলাইন করছে। কী ট্রেচারাস মেয়ে মাইরি। অ্যাদ্দিন ধরে তোকে গার্ড করে যাচ্ছি, আর শেষে নোটনশালা তোকে গাঁথল?

চুমকি স্থির দাঁড়িয়ে শুনছিল। এটা যদি তার বাড়ি হত, মুখের ওপর জবাব দিতে ভয় পেত

না। তাছাড়া সে নোটনকে ডাকত। এরা যে নোটনের নামে এত গালমন্দ করছে। নোটন সামনে এলে লেজ গুটিয়ে পালাত। চুমকি ভারি একটা শ্বাস ছেড়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাবার জন্য পা বাড়াল। অমনি সাট্টা তার কাঁধে হাত রেখে একটু ঠেলে দিল।

টেম্পো বলল, মুখে কুলুপ আঁটলি যে রে? খুব এনথু হয়েছে। ইচ্ছে করলে ভেঙে দিতে পারি জানিস?

অ্যাটম বলল, শুধু মাইরি গিরিকাকার খাতির। নৈলে এতক্ষণ তোর বিষদাঁত ভেঙে দিতুম।

এতক্ষণে চুমকি আস্তে বলল, যেতে দাও।

টেম্পো ফ্যাঁচ শব্দ করে অদ্ভুত হাসল। আমাদের সঙ্গ আর ভাল লাগছে না। তা লাগবে কেন? এখন যে তুমি লোটনা চিনেছ।

চুমকি আবার পা বাড়াল। সাট্টা তার সামনে দাঁড়াল। বলল, তোকে যদি আমরা এখন তুলে নিয়ে যাই, কী করতে পারিস?

চুমকি শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, আমি চেঁচাব বলে দিচ্ছি সাট্টাদা। যেতে দাও।

সাট্টা প্যান্টের পকেট থেকে একটা ছুরি বের করল। স্প্রিংয়ের ছুরির ফলাটা জ্যোৎস্নায় ঝকমক করে উঠল। চুমকির গলায় ছুরির ডগা ঠেকিয়ে বলল, নে। এবার চ্যাঁচা।

চুমকি ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। এতদিন ধরে এদের দেখছে, খানিকটা মেলামেশাও করছে—কিন্তু এমন হতে পারে সে কল্পনাও করেনি। নোটনের দিদি বাণী বলেছিল, ওদের পাত্তা দিস নে। ছোবল মারবে দেখবি। ঠিক তাই হল এতদিনে। কিন্তু ডাংয়ের ঘরে চোরাই মাল থাকার কথা তো সে বলেনি কাউকে। রাগে দুঃখে আর আতঙ্কে বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল চুমকি। তার চোখ ফেটে জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ল।

সেই সময় টেম্পো তার একটা হাত ধরে ফেলল। চাপা গলায় বলল, আয় আমাদের সঙ্গে।

চুমকি কাঁপা কাঁপা স্বরে বলল, কোথায়?

আয় তো।

পাঁচজন সামনে পিছনে ঘিরে চুমকিকে নিয়ে গেল রাস্তার বাঁকে। ডাইনে নতুন পাড়া শুরু হয়েছে। বাঁ দিকে রেলের জমিতে আগাছার জঙ্গলের ভেতর মরচেধরা লোহালক্কড়ের স্তূপ। কাঁটাতারের বেড়ার সামনে চুমকি থমকে দাঁড়াল। টেম্পো বলল, ভেতরে ঢোক।

প্রথমে টিফিন আর মনো ঢুকে গেল বেড়ার ফোঁকর গলিয়ে। টেম্পো চুমকির হাত রেখে ফের বলল, ঢুকে পড়।

চুমকি গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে কান্নাজড়ানো গলায় বলল, না।

সাট্টা ছুরির ফলা আবার গলায় ঠেকাল। তখন চুমকি বেড়ার ফোঁকর গলিয়ে ভেতরে ঢুকল। টেম্পো তার পিঠে হাত রেখে বলল, চোওপ শালী। আবার ন্যাকামি করে কাঁদছে। লোটনশালার কাছে শোওনি অ্যাদ্দিন? ভয় কিসের তোমার? .... এর সঙ্গে একটা চূড়ান্ত রকমের অশ্লীল বাক্যও সে উচ্চারণ করল।

চুমকি এতক্ষণ এধরনের কিছু আঁচ করতে পারে নি, যদিও তার অবচেতনায় একটা হুলস্থুল সৃষ্টি হয়েছিল। এবার সে আরও ভয় পেয়ে গেল। এখানে চেঁচিয়ে আকাশ ফাটালেও কেউ শুনতে পাবে না। একটু তফাতে রেলইয়ার্ডে একটা ইঞ্জিন ওয়াগন শান্টিং করছে। থেকে থেকে চেরা গলায় শিস দিচ্ছে। দুদিক থেকে দুটো মালগাড়ি এসে দীর্ঘ সময় ধরে পরস্পরকে অতিক্রম করছে। ঝোপঝাড়ের ভেতর কালো লোহালক্কড়ের স্তূপে জ্যোৎস্না পড়ে মনে হচ্ছে অসংখ্য গলাকাটা দানো এসে ওত পেতেছে। চুমকির মনে হচ্ছিল তার শরীর হাঁটছে, সে নয়। টেম্পোদের অশ্লীল খিস্তি ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। একটা ফাঁকা ঘাসে ঢাকা জায়গায় পৌঁছে ওরা দাঁড়াল।

টেম্পো বলল, তাড়াহুড়োর দরকার নেই। ওয়ান বাই ওয়ান। আমার পর সাট্টা। তারপরে অ্যাটম, তারপরে টিফিন, মনো, তুই লাস্টম্যান। চুমকি, তোকে আজ ছোট্ট করে একটা পানিশমেন্ট দেব। সামান্য নমুনা।

সে খ্যাক খ্যাক করে হাসলে বাকি চারজনেও হাসল। তারপর টেম্পো বলল, এই! তোরা মাইরি

একটু আড়ালে যা। লোকের সামনে আমার ওসব হয় না।

চারজনে একটু তফাতে সরে গেল। টেম্পো বলল, আরে। আর একটু ডিসস্ট্যান্সে যা।

সাট্টা বলল, দেখিস পালায় না?

টেম্পো বলল, যমের হাতে পড়েছে। পালাবে কোথায়? নলী কেটে দেব না শালীর? বলে সে চুমকির কাঁধে হাত রেখে দাঁড়াল। চাপা গলায়, আই শালী! কাপড়চোপড় খুলে ফ্যাল!

চুমকি শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছিল। টেম্পোর তর সইল না। সে জোর করে শাড়িটা টানাটানি করে ছাড়িয়ে ফেল দিল। চুমকি তখন স্থির। টেম্পো শায়ার ফাঁস ধরে টানল। খুলতে না পেরে হাঁচকা টানে দড়ি ছিঁড়ে ফেলল। শায়া নেমে গেল পায়ের কাছে। এবার টেম্পো নিজের প্যান্টের বোতাম খুলতে যেই মাথা ঝুঁকিয়েছে, চুমকি আচমকা তার বুকে ধাক্কা মারল। তারপর দৌড়তে থাকল।

টেম্পো পড়ে গিয়েছিল। ওর সঙ্গীরা অভাবিত এই পরিস্থিতিতে হকচকিয়ে গিয়েছিল কয়েক মুহূর্ত। টেম্পোর চিৎকারে তাদের হুঁশ ফিরল। তারা চুমকিকে ধরার জন্য দৌড়ল।

কাঁটাতারের ভেতর দিয়ে যেতে চুমকির শরীর ফালাফালা। সে নতুন পাড়ায় ঢুকে প্রথম বাড়িটার ভেতর চলে গেল। এ বাড়িটা নোটনের দিদি বাণীর। বাণী উঠোনে দাঁড়িয়ে কোলের বাচ্চাটাকে চাঁদমামা দেখাচ্ছিল। বারান্দায় হেরিকেন জ্বলছিল। তাছাড়া উঠোনভরা জ্যোৎস্না। চুমকি বাণীর পাশ কাটিয়ে যাবার সময় আর্তনাদ করল, 'বউদি গো' বলে। তারপর বারান্দা পেরিয়ে সোজা ঘরে ঢুকে গেল। বাণী চেঁচিয়ে উঠল, কে কে?

ততক্ষণে চেনা, ঘরের আলনা থেকে বাণীর একটা শাড়ি নিয়ে শরীর ঢাকতে শুরু করেছে চুমকি। হেরিকেন হাতে হন্তদন্ত ঘরে ঢুকে বাণী থমকে দাঁড়াল। তার কোলে বাচ্চাটা ঝুলছে বেকায়দায়। বাচ্চাটা ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠলে বাণী হেরিকেন রেখে তাকে আলতো থাপ্পড় মারল। তারপর চুমকির দিকে তাকাল। ঠোঁট কামড়ে ধরে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকার পর শ্বাস ছেড়ে আস্তে বলল, হতচ্ছাড়ী সর্বনাশী।

চুমকি দুহাতে মুখ ঢেকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে হু হু করে কেঁদে উঠল।

রান্নাঘর থেকে বাণীর শাশুড়ি সুবালা আর বাণীর বড় মেয়ে স্নিগ্ধা দৌড়ে এসেছে। দরজায় উঁকি দিল তারা। বাণীর ছোট ননদ বাসন্তীও এল হাঁফাতে হাঁফাতে। বাণী তেড়ে গেল। .....ভিড় করে ঠাকুর দেখছ নাকি সব? যাও তো সব।

বাণীর দাপট আছে। ওরা দরজা থেকে চুপচাপ সরে গেল। বাণী বলল, মরবার জায়গা ছিল না—আমার কাছে এলি যে এখন? লাইনে মাথা দিলি না কেন হারামজাদী?

বাসন্তী বারান্দা থেকে বলল, আহা, কী হয়েছে ওকে জিজ্ঞেস করো না বাপু?

সুবালা চাপা গলায় বললেন, বুঝতে পারছ না? ল্যাংটো হয়ে বাড়ি ঢুকল কি এমনি-এমনি।

বাণী বলল, কাঁদতে লজ্জা করে না পোড়ারমুখী? নিজের বাবাটার পর্যন্ত জলজ্যান্ত মাথা চিবিয়ে খেলি। কোথায় নিপাত্তা হয়ে গেল, সেদিকে খবর নেই। এদিকে রাজ্যের নচ্ছার চোরডাকাতগুলোর সঙ্গে সমানে ঢলাঢলি করে বেড়াচ্ছে। তোমার এ কী হয়েছে? এই তো সবে শুরু।

চুমকি ঘুরে দাঁড়িয়ে চোখ মুছে মুখ নামিয়ে বলল, তোমার শাড়িটা কেচে কাল ফেরত দেব। তারপর সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

সে উঠোনে নামলে বাণী বাচ্চাটাকে ধপাস করে বারান্দায় বসিয়ে বলল, কোথায় যাচ্ছিস? শোন।

চুমকি চুপচাপ চলে গেল। বাণী সদরদরজা পর্যন্ত এগিয়ে চেঁচিয়ে বলল, তুই মর—আমরা দেখি।

রাস্তায় নেমে চুমকির ভয় করছিল। তাদের বাড়ির সামনে সে থমকে দাঁড়াল। বেড়াঘেরা টালির চালের ঘরটাকে তার এখন শত্রু মনে হচ্ছিল। টেম্পোরা ওখানে কি তার জন্যে ওত পেতে আছে? আগড়ের সামনে দাঁড়ালে তার প্রিয় কুকুর মণ্টু দৌড়ে এসে লেজ নাড়তে থাকল। মণ্টু বাড়ি পাহারা দেয়। কিন্তু টেম্পোদের সে চেনে। তাই বিরক্ত হয়ে ঘেউ ঘেউ করবে না। তবে এ পাড়ার ভেতর টেম্পোদের গোলমাল করার সাহস হয়তো হবে না। মনো ছাড়া সবাই বেপাড়ার ছেলে। ইদানীং তারা নোটনের ভয়ে নতুন পাড়ায় আসে না। চুমকিদের বাড়িতে আড্ডা দেওয়া তো কবে ছেড়েই

দিয়েছে।

চুমকি নোটনের কথা ভাবল। নোটন হয়তো এখন বাজারে কোথাও আড্ডা দিচ্ছে। আরও একটু ইতস্তত করে সে আগড় সরিয়ে ভেতরে ঢুকল। সেই সময় রাস্তা থেকে জগনের সাড়া এল। জগন বলল, চুমকি নাকি?

জগনকে দেখে সাহস ফিরে পেল চুমকি। বলল, হ্যাঁ কাকা।

জগন গাঁওয়ালে পান বেচে বেড়ায়। পূর্ববঙ্গের লোক। দরজার কাছে এসে বলল, বাবার খুঁজখবর পাইলা নাকি চুমকি?

না জাগনকাকা। ....চুমকি ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চমকে উঠল। চাবিটা শাড়ির আঁচলে গিঁট দিয়ে বাঁধা ছিল। এখন তালা খুলবে কেমন করে?

মণ্টু জগনের সাড়া পেয়ে চ্যাঁচামেচি করছিল। জগন তাকে ধমক দিচ্ছিল। ধমক খেয়ে মণ্টু আরও খাপ্পা হয়ে চ্যাঁচামেচি বাড়িয়ে দিল। জগন বলল, হালার কুত্তাডা বড় জ্বালায় দেহি। অ মনি। অ্যামন করে ক্যান আমারে দেখিয়্যা? হইল কিডা? সে হাসতে লাগল।

চুমকি মণ্টুকে তাড়া করে বলল, চাবিটা কোথায় হারিয়ে ফেলেছি—কী বিপদ হল দেখ তো জগনকাকা।

জগন ভেতরে ঢুকে বলল, স্মরণ করিয়্যা দ্যাহো—রাখছ কোহানে।

কিছুতেই মনে পড়ছে না। তালাটা ভাঙতে হবে দেখছি।

ভাঙবা ক্যান। ঠারাও, আমি দেহি কেমুন তালা।

এই সময় বাণী এল। জগন দেশলাই জ্বেলে তালাটা পরখ করে দেখে হতাশ ভাবে মাথা নাড়ল। তারপর বলল, খাড়াও। একহালা পুরান চাবি আছে আমার লগে। লইয়া আসি।

সে চলে গেলে বাণী বলল, অমন থম থম করে চলে এলি যে বড়। কী হয়েছে বললি না তো?

চুমকি চুপ করে থাকল।

কে ধরেছিল? টেম্পো, না সাট্টা?

চুমকি আস্তে বলল, সবাই। টিকিন, অ্যাটম, মনুও ছিল।

কোথায়?

খালের কাছে। .....চুমকি গলার ভেতর বলল। ....ছুরি গলায় ঠেকিয়ে রেল ধারে নিয়ে গিয়েছিল।

তারপর, তারপর?

পালিয়ে এলুম।

বাণী ঝাঝাল গলায় বলল, এমনি পালিয়ে এলি? তাহলে উলঙ্গ হয়ে কেন?

জোর করে কেড়ে নিল যে।

শায়া পরিস নি?

চুমকি মাথা দোলাল।

শায়াও কেড়ে নিল? বাণী থাপ্পড় তুলে বলল ; এখনও বল সর্বনাশী। নোটনকে ডাকতে পাঠিয়েছি। আর কিছু হয়েছে নাকি বল। বাণী ফিসফিস করে উঠল। আইবুড়ি মেয়ে। পেটে বাচ্চাটাচ্চা এসে গেলে কী হবে বুঝতে পারছিস না হারামজাদী?

চুমকি খাপ্পা হয়ে বলল, না। ওসব কিছু হয় নি। টেম্পোরে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে পালিয়ে এসেছি।

বাণী সন্দিগ্ধ ভাবে বলল, লুকোস নে চুমকি।

চুমকি হাত বাড়িয়ে বলল, তোমার গা ছুঁয়ে বলছি বাণীদি।

বাণী দুপা সরে দাঁড়াল। ...থাম্। চান-টান-না করে ছুঁবি নে আমাকে।

জগনের সাড়া পাওয়া গেল রাস্তায়। ....না মা। খুঁজিয়া পাইলাম না হালাখান। বাণীরে জিগাও না, মাপমতন চাবি থাকে তো আনিয়্যা দিউক।

বাণী গলা তুলে বলল, আছে। খুলে দিচ্ছি'খন।

জগন চলে গেল রাস্তা দিয়ে। খাওয়াদাওয়ার পর এখন তার নিরিবিলিতে মাঠ সারার সময়।

খালে শৌচকর্ম সেরে কাঠের সাঁকোয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ চাঁদ দেখতে দেখতে বিড়ি টানবে। তারপর কালীকীর্তন গাইতে গাইতে বাড়ি ফিরবে।

বাণী তালাটা পরখ করে বলল, ভাঙবার দরকার নেই। নোটন আসুক। তোর কাপড়চোপড় খুঁজে নিয়ে আনবে'খন।

চুমকি আবার কেঁদে উঠল। ....তোমার পায়ে পড়ি, বাণীদি। ওকে তুমি এসব কথা বলো না।

বাণী রুষ্টভাবে বলল, না বললে আবার যে ওরা তোর ওপর হামলা করবে বুঝতে পারছিস না হতচ্ছাড়ী মেয়ে? তাছাড়া আর এ নিরিবিলি বাড়িতে একলা থাকতে পারবি রাতবিরেতে? বল্, পারবি?

চুমকি চুপ করে থাকল। গিরিপদ জেলে যাওয়ার পর পাড়ার কিছু বয়স্ক লম্পট রাতবিরেতে তার সঙ্গে গল্প করতে আসত। কখনও গভীর রাতে কেউ তার দরজায় টোকা দিত। ভয়ে কাঠ হয়ে থাকত চুমকি। এই অত্যাচার থেকে বাঁচতে সে টেম্পোদের শরণাপন্ন হয়েছিল। শেষে টেম্পোরা লাই পেতে পেতে এমন মাথায় উঠেছিল যে এখানে এসে তাড়ি-মদের আসর বসাতে শুরু করেছিল। পাড়ার লোকে প্রথম প্রথম ভয়ে কিছু বলত না। নোটনেরও তখন টেম্পোদের সঙ্গে সদ্ভাব ছিল। কিন্তু নোটন মনে মনে খাপ্পা হত চুমকির ওপর। গিরিপদ জেল থেকে ফিরে ব্যাপারটা দেখে উধাও হয়ে গেলে চুমকি আঘাত পেয়েছিল মনে। নোটনের সাহায্যে আড্ডাটা বন্ধ করে দিয়েছিল সে। চুমকি ক্রমশ টের পেয়েছিল, আপাতদৃষ্টে সে ছেলেগুলোকে নিষ্কর্মা ভেবেছিল, তারা মোটেও তা নয়। সব্বাই ওয়াগান ব্রেকার। পুলিশ মাঝে মাঝে এসে চুমকিকে শাসিয়ে যেত। চুমকি জানে, নোটনের সঙ্গে পুলিশের গোপন সম্পর্ক আছে যেন। তাই পুলিশ চুমকির ওপর জুলুম করে নি।

চুমকির কুকুরটা ঘেউ করে উঠল হঠাৎ। জ্যোৎস্নায় সাদা লেজ নাড়তে নাড়তে দৌড়ে গেল বেড়ার আগড়ের দিকে। তারপর নোটনের সাড়া পাওয়া গেল। সে বাজার থেকে হন্তদন্ত হয়ে এসেছে। বাড়ি ঢুকে হাসতে হাসতে বলল, কী হয়েছে চুমকি?...

কলকাতার খবর

নোটনের দাদা যতীনের বাজারে একটা স্টেশনারি দোকান আছে। বাইরে যেতে হলে সেদিন নোটনকে দোকানে বসতে হয়। যতীন বুঝতে পারে, নোটন টাকাকড়ি হাতায়। কিন্তু উপায় নেই। নগদ টাকাকড়ি সামলে রেখেই বাইরে যায়।

যতীন কলকাতা গিয়েছিল দোকানের জিনিসপত্র কিনতে। কনকপুরে ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি আছে। তাদের ট্রাকে মাল বুক করে যতীন বেলেঘাটায় বোনের বাড়ি রাত কাটাবে। সেই রাতে চুমকির ওপর বিপদ গেল।

দুপুরে ফিরে সে দোকান হয়ে বাড়ি এল। নোটন দোকানে ভালমানুষ সেজে চমৎকার দোকানদারি করছে। ভাইকে বলে এল, ট্রাকে মাল আসবে। লক্ষ্য রাখিস।

চুমকিদের বাড়ির ঘাটেই বরাবর স্নান করে যতীন। আগড় ঠেলে ঢুকে সে দেখল, চুমকি দাওয়ায় হেলান দিয়ে বসে আছে। উস্কোখুস্কো চেহারা। যতীন বলল, কী রে? অসুখ করেছে নাকি?

রাশভারি প্রকৃতির মানুষ যতীন। ব্যবসাবাণিজ্য ছাড়া পৃথিবীর কোনো ব্যাপারে তার মাথাব্যথা নেই। চুমকি একটু মাথা নাড়ল দেখে সে ঘাটের দিকে এগিয়ে গেল। চুমকির কুকুরটা একটু তফাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটু বিরক্ত প্রকাশ করে থেমে গেল। সজনেগাছের ছায়ায় ঠ্যাং সোজা রেখে বসে রইল।

গিরিপদর মেয়েকে মনে মনে আদপে পছন্দ করে না যতীন। বউ বাণী যে মেয়েটাকে এত আস্কারা দেয়, তাতে সে বউয়ের ওপর চটা। নোটনের সঙ্গে একবার বিয়ের কথা বলেছিল বাণী, বছর দুই আগে। যতীন কড়া হয়ে বলেছিল, ওই নষ্ট মেয়ের সঙ্গে নোটনের বিয়ে? তোমার মাথা খারাপ হয়েছে? পরে বাণীও কেমন মিইয়ে গিয়েছিল। সেও যেন বুঝতে পেরেছিল, এটা ঠিক হবে না। তারপর গিরিপদ জেলে গেলে চুমকির কীর্তিকলাপ টের পেয়ে যতীন থ। বাণীও যেন খুব ভড়কে গিয়েছিল। আর বিশেষ পাত্তা দিত না চুমকিকে। ইদানীং যতীন লক্ষ্য করেছে, চুমকি আবার তাদের বাড়ি যাতায়াত

করে। বাণী আগের মতোই তাকে আস্কারা দিচ্ছে।

ঘাটে নেমে যতীনের একটা কথা মনে পড়ে গেল। তার মাথায় বাণিজ্যের রাশিকৃত ভাবনা। ফালতু জিনিস মাথায় ঠাঁই পায় না। কথাটা মনে পড়েই সে গলা চড়িয়ে ডাকল, চুমকি! ও চুমকি!

চুমকি দাওয়া থেকে নেমে সজনে তলায় গিয়ে বলল, ডাকছ বুড়োদা?

যতীনের ডাকনাম বুড়ো। যতীন মুখে দুর্লভ হাসি ফুটিয়ে বলল, বেলেঘাটায় ছিলুম রাত্তিরে। অনু বলল, সেদিন তোর বাবা এসেছিল হঠাৎ। দেখা করে চলে গেছে। বেনে পুকুর না কোথায় যেন কার বাড়ি কাজ পেয়েছে। অনু জেলের খবর জানত না। নিজেই বলেছে গিরিকাকা। অনু তোর কথা জিজ্ঞেস করেছে। ভাল আছে বলেছে।

যতীন হাসতে লাগল। চুমকি চমকে উঠেছিল। ধরা গলায় বলল, ঠিকানা দেয়নি বাবা?

কী জানি! বেনেপুকুরে আছে বলেছে। খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করিনি। বলে যতীন জলে নেমে গেল।

চুমকি ঘাটের মাথায় বেড়ার ধারে এসে দাঁড়াল।... বেনেপুকুর কোথায় গো বুড়োদা?

যতীন আস্তে সুস্থে একটা ডুব দিল। তারপর সূর্যের দিকে ঘুরে করযোড়ে প্রণাম করে বিড়বিড় করে কী মন্ত্র আওড়াল। কানে আঙুল দিয়ে জল পরিষ্কার করে বলল, কী বলছিলি?

বেনেপুকুর কোথায় গো?

যতীন গোঁফের জল আঙুল টেনে ঝরিয়ে বলল, বললে কি বুঝবি? গেছিস কখনও কলকাতা?

চুমকি জোরে মাথা দোলাল।

তাহলে চিনবিনে।

যতীন গা রগড়াতে থাকল। ফের ডুবল। একটু সাঁতার কাটার ভংগি করল দুহাত ছড়িয়ে। জলে নামলে ভারিক্কি প্রকৃতির মানুষও কেমন যেন ছেলেমানুষ হয়ে যায়। চুমকি উত্তেজনায় অস্থির—কিন্তু তার কোনো কথা কানে নিল না যতীন। স্নান শেষ হলে সে ঘাটে দাঁড়িয়ে গা মুছতে মুছতে শেষে নিজে থেকেই বলল, সামনে শনিবার ফের যাব, বুঝলি? ডজন দু-তিন পলিথিনের বালতি আনতে হবে। ভুল হয়ে গেছে। আরও কটা আইটেম খেয়াল ছিল না। ভাবিস নে, এবার হাতে সময় করে গিরিকার সঙ্গে দেখা করে আসব।

চুমকি চঞ্চল হয়ে বলল, আমি তোমার সঙ্গে যাব বুড়োদা।

যাবি? যাস। .... বলে যতীন ব্যস্তভাবে ঘাট থেকে উঠে এল। তারপর হনহন করে উঠোন পেরিয়ে চলে গেল।...

চুমকি নিঃশব্দে কাঁদতে থাকল। ....

রাতে বাসন্তী আর স্নিগ্ধার কাছে শুয়েছিল চুমকি। নোটন শাড়ি আর শায়াটা রাতে খুঁজে পায় নি। ভোরবেলা চুমকি নিজেই আনতে গিয়েছিল। কিন্তু কোথাও নেই দেখে অবাক হয়ে ফিরে এসেছিল। অবেলা স্নিগ্ধা তাকে খাবার জন্য ডেকে গেছে। যায় নি চুমকি। হরেন মুদির দোকান থেকে একটা পাউরুটি এনে অর্ধেকটা খেয়ে অর্ধেকটা মণ্টুকে খাইয়েছে। তার খিদে পাচ্ছে না। পৃথিবীটা একেবারে অন্যরকম লাগছে। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে, আশেপাশে কোথাও পাঁচটা কামজর্জর পুরুষ তার দিকে লক্ষ্য রেখে ওত পেতে বসে আছে।

বছর ন-দশ আগে যখন তার ফ্রক পরার বয়স, রেলইয়ার্ডের কাছে ছাগল আনতে গিয়ে একটা লোকের পাল্লায় পড়েছিল। সন্ধ্যার আগে সেদিন আকাশে প্রচণ্ড মেঘ করেছিল। তারপর ঝড় এসে গেল। দিশেহারা ছাগলটা উল্টোদিকে দৌড়ে সারবেঁধে দাঁড়ানো ওয়াগনের আড়ালে চলে যায়। সেখানেই লোকটার পাল্লায় পড়ে চুমকি। বাঘের মতো লোকটা তাকে তুলে ওয়াগনের ভেতর নিয়ে গিয়েছিল।

তখন চুমকির মা আভারাণী বেঁচে। সেদিনও বাণীর মতো তার মা তাকে বলেছিল, রেললাইনে মাথা দিয়ে এলি নে কেন বাঁদরমুখী?

চুমকি ক্লাস ফোরে উঠেছে সে-বছর। বাবা-মায়ে মিলে পরামর্শ করে স্কুল ছাড়িয়ে দিয়েছিল। বাড়ি ছেড়ে বেরুতে দিত না একা। কিন্তু কতদিন এমন করে থাকা যায়? গরিব মানুষদের সব ভুলে যেতে হয়। সব চেপেচুপে রেখে বুকের ভেতর ক্ষত নিয়ে বাঁচতে হয়।

কিন্তু ঝড়বৃষ্টির মধ্যে একটা অপেক্ষমান নিষ্ঠুর ওয়াগন চুমকিকে আমূল বদলে দিয়েছিল। পুরুষদের

সম্পর্কে কুমারী মেয়েদের স্বাভাবিক আতংক আর তার ছিল না। দশ বছর পরে চুমকি পুরুষদের প্রতি তাচ্ছিল্য করে তাকাতে পারে। আগের রাতে টেম্পোদের সঙ্গে রেল এলাকার জঙ্গলে ঢোকার সময় ছুরি খাওয়ার ভয়ের সঙ্গে ওই তাচ্ছিল্যবোধটাও ছিল।....

যতীন খেতে খেতে বলল, জানো? বলতে ভুলেছি—অনুদের বাড়ি গিয়েছিল গিরিকাকা।

বাণী অবাক হয়ে বলল, সে কলকাতায় আছে নাকি?

যতীন ব্যাপারটা দু-এক কথায় সেরে ফেলে বলল, যেমন বাবা, তেমনি মেয়ে বটে। চিরকাল তো এমনি। ছেড়ে দাও।

বাণী বলল, হ্যাঁ গো, বলেনি মেয়েকে নিয়ে টিয়ে যাবে?

কে জানে! বলে যতীন ঢকঢক করে জল খেল। .... নোটন খেয়ে যায় নি। বেলা হয়ে গেল। শোনো, নোটনকে আমি বলতে পারব না—তুমি বলো। ও যেন গিরিকাকার বাড়ি আড্ডা দেওয়াটা ছাড়ে। কনকপুর সুদ্ধু রটেছে, নোটনা মেয়েটাকে বিয়ে করবে।

বাণী গুমোট মুখে বলল, সে লায়েক হয়েছে। মন চাইলে করবে। আমি কী বলব?

যতীন রাগ করতে গিয়ে হেসে ফেলল। ... তোমাকে বোঝা দায়।

বাণী এঁটো থালা তুলে বলল, হুঁ—বলো! বলো না আমিই সব নটঘটি বাধিয়েছি।

যতীন বলল, ছেড়ে দাও। জাতকুলনাশা নষ্ট মেয়ের কথা বললে মুখটা পচে যায়। কালে কালে হচ্ছেটা কী? আগের দিন হলে.....

বাণী ধমক দিল। থামো তো! খুব হয়েছে।

যতীন চুপ করে গেল।....

বিকেলে চুল আঁচড়ে পান চিবুতে চিবুতে বাণী তার ছেলেকে কোলে নিয়ে চুমকিদের বাড়ি গেল। চুমকি দাওয়ার নগ্ন মাটিতে চুল এলিয়ে শুয়ে আছে কাত হয়ে। তার মাথার কাছে কুকুরটা বসে আছে।

বাণীর ডাকে উঠে বসল চুমকি। বাণী বলল, কী রে? জ্বর বাধালি নাকি?

চুমকি একটু হেসে মাথা দোলাল। তারপর ঘর থেকে একটা মাদুর এনে বিছিয়ে দিল। বাচ্চাটাকে নামিয়ে দেখতে দিল বাণী। কুকুরটার সঙ্গে সে খেলতে লাগল। বাণী মাদুরে বসে বলল, না খেয়ে ক'দিন থাকবি ভেবেছিস?

চুমকি বলল, ভাত খেতে ইচ্ছে করছে না। পাঁউরুটি আনিয়ে খেয়েছি।

চালাকি?

তোমার দিব্যি বউদি।

বাণী ওর মুখের দিকে শান্ত চোখে তাকিয়ে বলল, তোর বাবার খবর পাওয়া গেছে, জানিস?

হুঁ। বুড়োদা চান করতে এসে বলল। চুমকি মাটিতে আঁক কাটতে কাটতে বলল, বুড়োদাকে বলেছি, ফের যেদিন কলকাতা যাবে, সঙ্গে আমি যাব।

যাস্। অনুর কাছে বরং তোকে রেখে আসবে। তুই থাকিস ওখানে। তোর বাবার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবে।

একটু চুপ করে থাকার পর চুমকি আস্তে বলল, বাবা যদি আসে আমার সঙ্গে কনকপুরে?

বাণী ভাবতে ভাবতে বলল, এখানে এসেই বা কী করবে? কাজ পেয়েছে শুনলুম। বাবার কাছেই থাকবি। তোদের বাড়িটা দেখাশুনো করব আমরা। নোটনঠাকুরপো থাকবে। অসুবিধে কিসের?

বাণীর ছেলে টুকুন কুকুরটার কান টানাটানি করছিল। চুমকি গিয়ে ছাড়িয়ে দিল। হাসতে হাসতে ওর পিঠে আলতো থাপ্পড় মেরে বলল, কামড়ে দেবে জানো না? তারপর সে একটা ফুলন্ত ডাল ভেঙে এনে টুকুনের হাতে দিল।

টুকুন জন্মের পর থেকে চুমকির কোলে চেপেছে। এখন তার বয়স মাস ছয়েক হল। মধ্যে কিছুদিন চুমকি একটু বদলে গিয়েছিল। টুকুনকে না দেখলে অত ব্যস্ত হয়ে উঠত না। ইদানীং আবার টুকুনের সঙ্গ পেতে চায়। কিন্তু শিশুদের অভিমান তীব্র। সহজে পাত্তা দিতে চাইছে না চুমকিকে। কোলে তুললেই হাত পা ছুড়ে কান্নাকাটি করে।

বাণী দেখল, চুমকি টুকুনের সঙ্গে ভাব জমাতে ব্যস্ত হয়েছে। তার ভালই লাগল। বড্ড জ্বালায়

টুকুন। চুমকির জিম্মায় ওকে রাখতে পারলে সে বেঁচে যায়।

বাণী বলল, হ্যাঁ রে রাত্তিরে কী খাবি? ঘরে চাল আটা আছে তো কিছু?

চুমকি আনমনে বলল, হ্যাঁ। তারপর টুকুনকে কোলে তুলে নিয়ে সজনে গাছটার দিকে গেল। পাখি দেখাতে থাকল। পাখিটা উড়ে গেলে ঘাটের মাথায় গিয়ে দাঁড়াল।

বিকেলে বাড়ির ওপর গাছগাছালির ছায়া পড়েছে। বিশাল রেলপুকুরের দামে বক বসে আছে। পাটকিলে রঙের রোদে ওপারে রেলইয়ার্ডে একটা ইঞ্জিন দাঁড়িয়ে ঝিমোচ্ছে। খানিকটা দূরে কারশেডের ভেতর থেকে আরেকটা ইঞ্জিন বেরিয়ে এল। তারপর ট্রেন এল ডাউন থেকে। ট্রেনটা স্টেশনের দিকে চলে গেলে বাণী চোখ টিপে হেসে বলল। টেম্পোরা তোকে টাকাকড়ি দিত। তাই না?

চুমকি বলল, জান যদি, জিজ্ঞেস করছ কেন?

আচ্ছা, বল না আমাকে। আমি কি কাউকে বলতে যাচ্ছি?

তোমার দেওরকে জিজ্ঞেস করো!

চুমকি বেড়ার কোণার দিকে ভাঁটফুলের ঝোপে চলে গেল। বাণী একটু রাগ করে বলল, তোর ওই দোষ চুমকি। সব কথা পেটে রেখে দিবি। এই যে কলকাতা যাবি তুই, টাকাকড়ি লাগবে না? সেজন্যে জিজ্ঞেস করছি।

চুমকি ঝাঁঝালো গলায় বলল, হ্যাঁ টেম্পো আমাকে টাকা দেবে। নিজেদেরই জোটে না। রেলের ওয়াগন ভেঙে তাও ভাত জোটে না সংসারে। উল্টে আমার কাছে টাকা ধার চাইত।

তাড়ি মদ আর জুয়োয় টাকা ওড়ালে তাই। বাণী হাসতে লাগল। তারপর গলা চেপে বলল, নোটন?

কী?

নোটন কিছু দেয় না?

ইশ! নোটনদা দেবে। কেন দেবে? কবে বাবাকে দশটা টাকা ধার দিয়েছিল, তাই শতবার চেয়েছে।

সে কী রে। নোটনের সঙ্গে তোর অত ভাব!

চুমকি খাপ্পা হয়ে বলল, আমার ভাব সবার সঙ্গে। লোকের মতো তুমিও বলো না, আমি প্রস।

বাণী ধমক দিয়ে বলল, মুখে থাপ্পড় মারব চুমকি। তোর ভালর জন্যে জিজ্ঞেস করছি।

চুমকি আর কথা বলল না। টুকুনকে নিয়ে সে উঠোনে চলে গেল। মাটিতে বসিয়ে দিয়ে নিজেও পা ছড়িয়ে বসল। খেলতে লাগল ওর সঙ্গে। কিছুক্ষণ পরে হাসি মুখে ঘুরল বাণীর দিকে। বাণী গম্ভীর মুখে নাক খুঁটছিল। চুমকি বলল, আমি কলকাতায় গিয়ে থাকতে পারব না বউদি। টুকুনের জন্য মন খারাপ করবে।

বাণী সে কথায় কান না করে বলল, আয়। চায়ের জল চাপাতে বলি গে।

বাণী চলে যাওয়ার পর চুমকি ঘরের দরজায় নতুন তালাটা এঁটে দিল। তারপর টুকুনকে কোলে নিয়ে বেরুল রাস্তায়। দুপা হেঁটে সে থমকে দাঁড়াল। বোধন আর জিজো আসছে।

বোধন বলল, এই যে চুমকি। তোমাদের পাড়ায় লেবার খুঁজতে এলুম। রেলপুকুরের দাম পরিষ্কার করতে হবে, পিতাজীর অর্ডার। কোন বাড়ি কার কাছে যাব বলো তো?

কথাটা মিথ্যা। নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি মানুষের অবচেতন আকর্ষণ থাকে। জিজোর তাগিদেই সে এসেছে। জিজো লম্পট ছেলে নয়। কিন্তু এ যৌবনে অনেক হঠকারিতা থাকে। জিজো মৃদু হেসে বলল, আপনি কাল ফুল দিয়ে এসেছেন আমার জন্য!

বোধন চুমকির ভংগীতে সাহস পেয়ে বলল, ধুস। তুই ওকে আপনি-টাপনি করছিস কেন রে? ও তো আমাদের চেনাজানা মেয়ে।

চুমকি মুগ্ধ দৃষ্টে জিজোর দিকে তাকিয়ে বলল, আমি শিগগির কলকাতা যাব। বাবা কলকাতায় আছে। আপনি কবে যাবেন জিজোদা?

চুমকি সহজে ছেলেদের সঙ্গে পরিচিত হতে জানে। কাল মাছ ধরার সময় জিজোর সঙ্গে অনেক কথাবার্তা বলেছিল। জিজো বলল, আমি কাল মর্নিংয়ে যাচ্ছি।

বোধন চোখ টিপল জিজোকে। চুমকি বলল, আমাকে নিয়ে যাবেন সঙ্গে? নোটনদার দিদি থাকে।

ওদের বাড়ি যাব প্রথমে। আমি কখনও কলকাতা যাই নি জিজোদা।

জিজো একটু বিব্রত হয়ে বলল, কিন্তু....

বোধন বলল, কিন্তু কিসের রে? ও যাবে ট্রেনে—তুই যাবি ট্রেনে। ন্যাশনাল প্রপার্টি। বোধন হাসতে লাগল।

বাণী কথাবার্তা শুনতে পেয়ে দরজায় উঁকি মেরে অবাক। সে গলা চড়িয়ে ডাকল, চুমকি। টুকুনকে নিয়ে আয়। ওর খিদে পেয়েছে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও চুমকি ওদের বাড়ি ঢুকল। বোধন আর জিজো মনে মনে খাপ্পা হয়ে উদ্দেশ্যহীন হেঁটে নতুনপাড়া পেরুতে থাকল। বোধন বলল, ছুঁড়ির পেছনে এত ফ্যাচাং আছে জানতুম না মাইরি।

বাণী তখন চুমকিকে চাপা গলায় ধমকাচ্ছে। এখনও তোর শিক্ষা হল না হতচ্ছাড়ী? আবার রাস্তাঘাটে ছেলেছোকরাদের সঙ্গে ফক্কুরি?

চুমকি আস্তে বলল, ফক্কুরি করব কেন? একটা কথা জিজ্ঞেস করছিলুম। বুধোদাব মাসতুতো ভাই ওই ছেলেটা কলকাতায় থাকে।

চোখ কটমট করে অথচ ঠোঁটের কোণায় হেসে বাণী বলল, কলকাতা কি কনকপুর পেয়েছিস? কল্‌কাতা একটা মহাসাগর জায়গা।

চুমকি সাগরই দেখে নি তো মহাসাগর। সে চুপ করে গেছে।

চুমকির কলকাতা যাত্রা

চুমকি পরদিন ভোরবেলায় স্টেশনে হাজির। বাণীদের বাড়ি রাতে শুয়েছিল। কাককোকিল ডাকতে না ডাকতে উঠে গেছে নিজেদের বাড়িতে। কিটব্যাগে কিছু কাপড়চোপড় ভরেছে—বেশি কাপড় তার নেইও। তোলার শাড়িটা পরেছে। যেমন তেমন করে চুল বেঁধেছে। পায়ে সচরাচব জুতো পবে না সে। কবেকার একজোড়া সরু ফিতের স্যাণ্ডেল ছিল তাকে তোলা। পরে হাঁটতে বাধোবাধো ঠেকে। তবু সাণ্ডেল দুটো পায়ে দিয়ে কাঁধে কালো কিটব্যাগ ঝুলিয়ে চুমকির মন আনন্দে চনমন করছিল।

সাড়ে সাতটায় ট্রেন। সোমবার সকালের এই ট্রেনটাতে বড্ড বেশি ভিড় হয়। কনকপুর থেকেও অসংখ্য লোক ওঠে। সময় কাটতে চাইছিল না। চুমকি পাঁউরুটি দিয়ে চা খেয়েছে একবার। আবার খেল। গোটা বারো টাকা আর কিছু খুচরো পয়সা তার সম্বল। এ দিয়ে কলকাতা যাওয়া হবে কি না তার ধারণা নেই।

সূর্য ওঠার পর ভিড় বাড়ছিল প্ল্যাটফর্মে। চুমকি এমন কেউ নয় যে লোকে তাকে জিজ্ঞেস করবে, কোথায় যাচ্ছ? শুধু তার মনে একটা ভয়, টেম্পোরা কেউ এখানে দেখলে কী করবে। তাকে কি তারা এতলোকের সামনে আটকে দেবে? দুজন কনস্টেবলকে ঘুরে বেড়াতে দেখে তার একটু সাহস হল। স্টেশন ঘরের গেটের একটু তফাতে দাঁড়িয়ে সে নজর রাখছিল কখন জিজো আসবে। কিন্তু এইরকম হয় সংসারে। যার প্রতীক্ষায় থাকতে হয় সবাই একে একে এসে গেলেও সে আসে নি। টিকিট কাটার ঘণ্টা বাজল তবু জিজোর পাত্তা নেই।

টিকিটের লম্বা লাইন পড়েছে। চুমকির আর ধৈর্য ধরছে না। নোটনের দিদি অনুপমা আর জামাইবাবু যামিনীকে সে চেনে। বেলেঘাটায় থাকে তারা। বেলেঘাটার কথা জিজ্ঞেস করলে কি কেউ দেখিয়ে দেবে না?

টিকিটের লাইন কমে গেলেও জিজোর পাত্তা নেই। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে চুমকি লাইনে গিয়ে দাঁড়াল। কলকাতা যেতে হলে শেয়ালদার টিকিট কাটতে হয় সে জানে। কিন্তু টিকিটের দাম শুনে সে ভড়কে গেল। সাড়ে দশ টাকা?

টিকিটবাবুর ধমক খেয়ে সে ক্ষুদে অর্ধবৃত্তাকার পয়সার ব্যাগ থেকে দলাপাকানো নোটগুলো গুণে দিল। টিকিটটা ব্যাগে ঢুকিয়ে চঞ্চল ভিতু চোখে চাইতে চাইতে প্ল্যাটফর্মে ঢুকল। ট্রেনের ঘণ্টা পড়ল। বাঁকের মুখে ধোঁয়া দেখা যাচ্ছিল। প্ল্যাট ফর্মের যাত্রীরা ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ট্রেন আসা দেখছিল। চুমকি কোথায় দাঁড়াবে ঠিক করতে পারছিল না। এ কটু এগিয়ে যেতেই হঠাৎ কার চোখে পড়ল, ওই তো দাঁড়িয়ে আছে। হাতে স্প্যানিশ গিটার। কাঁধে ব্যাগ। জামাইবাবু শ্রীহর্ষকে দেখতে পেল চুমকি। চুমকি অবাক

হয়ে গেল। কখন এল ওরা? টিকিটই বা কাটল কখন?

ভিড় ঠেলে এগোনো কঠিন। তার ওপর তরকারিওলাদের আনাজপাতির বস্তা। ছানাওলাদের অসংখ্য ছানার পাত্র। ট্রেন এসে যাচ্ছে। চুমকি গুঁতো মেরে ঠেলাঠেলি করে জিজোদের কাছে এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু পৌঁছতে না পৌঁছুতে ট্রেনটা এসে গেল। চিৎকার চ্যাঁচামেচি বেড়ে গেল প্ল্যাটফর্মে। চুমকিকে পেছনে ফেলে দলে দলে লোকেরা এগিয়ে গেল সামনের দিকে। এখানটায় ভেণ্ডারদের কামরা। তাছাড়া সবাই ভাবছে পেছনের দিকেই খালি কামরা পেয়ে যাবে।

চুমকি জিজোদের খুঁজে বের করতেই পারল না। সব কামরার মুখে ভিড়ের ঠেলাঠেলি। শেষ দিক পর্যন্ত ঘুরে আসতে আসতে ট্রেন ছাড়ার বাঁশি বাজল। গার্ডবাবু নীল পতাকা নাড়তে থাকলেন। তখন চুমকি মরিয়া হয়ে সামনের একটা কামরায় উঠে পড়ল। মেঝেয় চালের বস্তা একগাদা লোক। তার ভেতর দিয়ে এগিয়ে সে কোনরকমে দাঁড়ানোর একটু জায়গা করে নিল।

কোনো বড় স্টেশনে ট্রেন থামলে চুমকি জিজো আর জামাইবাবুকে খুঁজে দেখবে ভেবেছিল। কিন্তু ভিড়ের চাপ ঠেলে বেরুনো সহজ নয়। আর যে স্টেশনে ট্রেন থামছে, নামছে কোথায় লোকেরা? বরং আরও উঠছে ঠেলাঠেলি করে। সোমবারের এই ট্রেনটা সব স্টেশন ধরে না। শেয়ালদা পৌঁছয় খুব শিগগির। তাই এত ভিড়।

রাণাঘাটে একবার নামবার সুযোগ পেয়েছিল চুমকি। কিন্তু ডাইনে বাঁয়ে বেশিদূর এগোতে সাহস পেল না। একবার দূরে যেন জিজোকে একপলক দেখলেও। পাছে এক্ষুনি ট্রেন ছেড়ে দেয়, চুমকি কামরার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টে তাকিয়ে রইল। আর দেখতে পেল না জিজোকে।

কাঁচড়াপাড়া ছাড়িয়ে বসার জায়গা পেল একটু। কিছুক্ষণ পরে টের পেল লোকগুলো তাকে চোখ দিয়ে চেটে খাচ্ছে। আঁচলটা ভাল করে জড়িয়ে দিল পায়ে। পাশের লোকটি ইচ্ছে করেই তাকে চেপে রেখেছে বুঝল সে। কিন্তু গ্রাহ্য করল না।

দমদম পৌঁছুনোর পর কামরায় ভিড় কমে গেল। জানালার কাছে বসে অবাক চোখে তাকিয়ে রইল চুমকি। এত বেশি পাকাবাড়ি সে জীবনে দেখেনি। বহরমপুরে কতবার গেছে বটে, কিন্তু এই একটানা দীর্ঘ রঙ-বেরঙের বাড়ি, কালো চিমনি, কত সব কারখানা, সব মিলিয়ে তার অভিজ্ঞতায় নতুন। সমান্তরাল অশেষ এক সৌন্দর্যভরা গম্ভীর ছবি চলেছে তো চলেছে। নিজেদের ছোট্ট বাড়িটা রেলপুকুর জরাজীর্ণ নতুনপাড়ার পরিবেশ তার কাছে অকিঞ্চিৎকর মনে হচ্ছিল।

শিয়ালদার প্ল্যাটফর্মে ট্রেন থেমেছে। তখনও বসে আছে চুমকি। ভাবছে, আবার ট্রেন ছাড়বে। এক দঙ্গল লাল জামা পরা রেলকুলি কামরায় ঢুকে মোটঘাট টানাটানি করছে। পাশের একটা লোক তাদের সঙ্গে ঝগড়া করে নেমে যাবার মুখে চুমকির দিকে তাকাল। তখন চুমকি জিজ্ঞেস করল, শেয়ালদা আর কয় স্টেশান বাবুমশাই?

লোকটা অবাক হয়ে বলল, এই তো শিয়ালদা।

চুমকি হুড়মুড় করে উঠল। প্ল্যাটফর্মের ভিড় দেখে সে ভড়কে গেল। এ ভিড়ের গতি যেদিকেই সেদিকেই সে নিজেকে ছেড়ে দিল। জিজোকে আর কি খুঁজে বের করতে পারবে সে?—

জিজো ও রুবিনা

মুনলাইটে গিয়ে জিজো দেখল রুবিনা বারের পেছনে করিডোরে ম্যানেজারের ঘরে দাঁড়িয়ে আছে। তার কাঁধে হাত রেখে চাপা গলায় কথা বলছে জুবি। রুবিনার একেকদিন একেকরকম পোশাক। আজ জিনসের প্যান্ট, নীল শার্টের ওপর কালো ভেলভেটের হাতকাটা জ্যাকেট —রুপোলী কারুকার্য খচিত। গলায় এক গুচ্ছের রঙ-বেরঙের পুঁথির মালা। জিজোকে দেখে একটু হেসে 'হাই' করল। জুবিন বলল, কাঁহা থে ইয়ার? শোচা, হামলোগকো ছোড় দিয়া। হোয়ার হ্যাড ইউ বিন?

জিজো বলল, বাইরে ফাংশান করে এলুম।

জুবিনের আসল নাম সেলিম আখতার। বোম্বেতে থাকার সময় প্রখ্যাত অর্কেস্ট্রা নগস্টার জুবিন মেটার ফাংশান দেখার পর নিজের নামটা জুবিন করে নিয়েছিল। সেই বা কম কিসে? তারও ছোটখাট একটা অর্কেস্ট্রা দল আছে। কিছু চাহিদাও হয়েছে ইদানিং। মুনলাইটে সে কিছুদিন হল কন্ট্রাক্টে ঢুকেছে।

গায়ক-গায়িকাদের সঙ্গে বাজায়। আবার নিজেরাও শুধু অর্কেস্ট্রা জমিয়ে রাখে। নানা দেশের টুকরো-টুকরো সুর কুড়িয়ে নিয়ে বিচিত্র একটা ব্যাপার সে কম্পোজ করতে পটু। চমক সৃষ্টিতে তার প্রতিভা আছে।

চৌরঙ্গী এলাকার এই পাঁচতলা বাড়িটার নিচের তলায় দোকানপাট। দোতলায় বেশ বড় বার-কাম রেস্তোঁরা। বাকি ওপর তলাটা আবাসিক হোটেল। মালিক এক পার্শী ভদ্রলোক। তিনি থাকেন বোম্বেতে। পাঞ্জাবী ম্যানেজার সজ্জন কিং দাপটের সঙ্গে কারবার চালান।

ম্যানেজারের ঘরের পাশের চওড়া ঘরটাতে আগে মালিক এসে থাকতেন। এখন মিউজিক্যাল পার্টির রেস্টরুম হয়েছে। একটু-আধটু রিয়ার্সালও চলে। মেঝে জুড়ে কার্পেট। সোফা, ডিভান, কিছু চেয়ারও আছে। দেয়াল জুড়ে অয়েল-পেন্টিংয়ে ল্যাণ্ডস্কেপ।

জিজোদের জন্য চা-কফির ব্যবস্থা মাগনা। তবে পেগ টানতে হলে পকেট থেকে পয়সা দিতে হবে। নয়তো ফি থেকে কেটে নেবে। বন্দোবস্ত ডেলি পেমেন্টের।

জিজো ঘরে ঢুকে তার স্প্যানিশ গিটারের তার বাঁধতে থাকল। ঠোঁটে সিগারেট। একটু পরে একপট চা রেখে গেল আব্দুল। জিজো ডাকল, জুবিন! টি!

জুবিন বাইরে থেকে বলল, তুম পিলো মিস্টার। আমি চায় পিবে না।

জিজো পট থেকে চা ঢালতে জুবিনের বাহিনী এসে পড়ল। সাড়ে পাঁচটা বাজে। ছটা থেকে বারেব ডায়াসে গান শুরু হবে। চলবে রাত দশটা অব্দি। জুবিনের দলে জনাপাঁচেক লোক। প্রত্যেকে যে যার বাদ্যযন্ত্র বয়ে এনেছে। এখন কিছুক্ষণ ঘরে চাপা সুরে বাজনার বিশৃংখলা। জিজোকে দেখে ওবা হইচই করে উঠেছিল। তিনদিন ছিলো না জিজো।

জিজো ভাবছিল, রুবিনার সঙ্গে জুবিনের কী এত কথাবার্তা এতক্ষণ ধরে? কনকপুব যাবাব আগে অব্দি দেখেছিল, রুবিনার খুব ডাঁট হয়েছে। জুবিনকেও পাত্তা দিচ্ছে না। অথচ জুবিনেবও ওব এখানে চান্স পাওয়ার ব্যাপারে কিছুটা সাহায্য ছিল।

একটু পরে জুবিন ঢুকে জিজোর পাশে বসে তাব কাঁধে আলতো থাপ্পড় মেরে বিচিত্র বাংলায় বলল, ডুবে ডুবে জল খাচ্ছ কোথায় বোলো ইয়ার? আমি ভাবল কী, তুমি নোকবি পেয়ে মুনলাইট ছেড়ে দিলে।

জিজো বলল, নোকরি আমি করব না।

করবে না বলছ, তো এ কী করছ? জুবিন হাসতে লাগল। সজ্জন ভেইয়ার নোকবি কবছ।

জিজো একটু হেসে ওর কানের কাছে মুখ রেখে বলল, রুবিনার কী ট্রাবল হল?

জুবিন বলল, হাউসিং ট্রাবল। ওর মা দাদার কাছে বেহালায় চলে গেছে। রুবিনাদের বাড়িওযালা বলছে, তুমি হটো। কেন—কী তুমি কো টেনেণ্ট নও। টেনেণ্ট ছিল তোমার বাবা। রুবিনা পড়েছে মুশকিলে। তো আমি বললুম, ওয়েলেসলিতে একটা খ্রিস্টিয়ান উইমেনস অ্যাসোসিয়েশন আছে। ওদের মেস আছে। সেখানে বলে দেব। রুবিনার পছন্দ নয়।

কেন?

জুবিন ফিক করে হাসল। ওর তো অনেক বয়ফ্রেণ্ড। তাদের এণ্টারটেন কবতে পারবে না।

হোয়াট অ্যাবাউট দ্যাট ওল্ড ফেলা?

তুমি বাজোরিয়ার কথা বলছ তো? সে কাট করেছে।

জিজো হাসল। তিনদিন ছিলুম না—তার মধ্যে শো মাচ হ্যাপনড।

জুবিন দার্শনিকতা করে বলল, আরে ভাই। এক সেকেণ্ডে দুনিয়ার কতটা চেঞ্জ হয়ে যায়। ছোড়ো। আজ এক নয়া চমক লাগাও তো ইয়ার। হারামী সজ্জন সিং বলছে কী, ঔর নয়া-নয়া টেলেন্ট লে আও। শালা।

জুবিন থেমে গেল। আব্দুল পট নিতে এসেছে। রুবিনা এতক্ষণে এসে বলল, হাই জিজো। তোমার খোঁজে তোমাদের বাড়ি গিয়েছিলুম। বলে নি বাড়ির লোকে?

জিজো অবাক হয়ে গেল। —না তো? কবে?

সানডে মর্নিংয়ে—মানে গতকাল। তোমাদের বাড়ির একটা লোক বলল, তুমি বাইরে গেছ। বলে

রুবিনা জুবিনকে ঠেলে সরিয়ে জিজোর গা ঘেঁসে বসল।

জিজো বলল, জুবিন বলছে তোমার বাড়িওয়ালা ঝামেলা করছে।

ও হ্যাঁ। ডোণ্ট ওরি।.....রুবিনা বাঁকা হাসল। তারপর একটু নড়ে বসল। ...মাই গুডনেস। জুবিন, তোমাকে বলতে ভুলেছি। আসানাসোলের সেই পার্টির সঙ্গে নিউমার্কেটে দেখা হল আজ। আমি তোমার সঙ্গে মিট করতে বললুম। ওরা এখানে আসবে।

জুবিন বিরক্ত হয়ে বলল, এখানে কথা হবে না। সজ্জনের চোখের সামনে কী কথা হবে? আর একটা কথা হল, আমার পক্ষে মুশকিল আছে। সজ্জনটা বহুত হারামী আছে না? ওর সঙ্গে আমার অন্যরকম কন্ট্র্যাক্ট। অ্যাবসেণ্ট থাকতে পারব না।

জিজো জিজ্ঞেস করল, আসানসোলে কী ব্যাপার রুবিনা?

রুবিনা চাপা গলায় বলল, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া। একটা ফাংশনে গেলে পর পর কয়েকটা নাইট চান্স আসবেই। ফ্যাক্টরি এরিয়ার ভেতর ফাংশন ফার্স্ট মে। ওদিন মে ডে।

জুবিন ঘড়ি দেখে উঠে দাঁড়াল। দলের লোকেদের ইশারা করে বেরিয়ে গেল। ছটা বেজে গেছে। এখনই ডায়াসে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। অর্কেস্ট্রা দিয়ে শুরু।

ঘর নির্জন হলে রুবিনা জিজোর দু'কাঁধে দু'হাত রেখে বলল, তুমি কি রাগ করেছ জিজো?

জিজো হাসল। ...নাঃ। রাগ করব কেন?

রুবিনা দ্রুত আলতোভাবে ওর ঠোঁটে ঠোঁট ছুঁইয়ে একটু সরে এল।....আই লাইক ইউ জিজো।

সো হোয়াট?

ও জিজো! এখনও তোমার ভীষণ রাগ। আমি ক্ষমা চাইছি। আমি অনুতপ্ত জিজো, আমি তোমাকে এড়িয়ে থাকছিলুম। ....রুবিনা উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে আবেগ জড়ানো গলায় কথা বলছিল।....কাল তোমাদের বাড়ি ক্ষমা চাইতেই গিয়েছিলুম জানো? .... সে জিজোর মুখটা খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে ফের বলল, তোমাকে একটু ডার্ক দেখাচ্ছে কেন বলো তো?

জিজো শান্ত গলায় বলল, গ্রামে গিয়েছিলুম। রোদে খুব ঘুরেছি।

তুমি আমাকে বললে আমিও যেতুম।

যেতে না।

কিন্তু তুমি বলো নি। রুবিনা ওর হাত নিয়ে খেলতে থাকল। .... কোথায় গ্রাম? কত দূরে?

হাণ্ড্রেড এ্যাণ্ড টেন কিলোমিটার ফ্রম ক্যালকাটা!

দ্যাটস ওয়াণ্ডারফুল! সেখানে কি করলে?

ফিশিং, হাণ্টি এ্যাণ্ড.....জিজো চোখ নাচাল। এ্যাণ্ড লাভমেকিং।

কে ছিল তোমার সঙ্গে?

কেউ না।

তবে কার সঙ্গে?

দেয়ার ওয়াজ এ ভিলেজগার্ল। ভেরি ভেরি বিউটিফুল—চার্মিং।

ও জিজো! আই ফিল জেলাস! রুবিনা ওর হাতটা ঝাঁকুনি দিয়ে ছেড়ে দিল। তাহলে তোমার একটা থ্রিলিং এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে বলো!

নিশ্চয়।

রুবিনা মুখে মিথ্যে গাম্ভীর্য এনে মাথা দোলাল। ....তুমি কি ভাবছ তোমার এসব কথা বিশ্বাস করলুম। কক্ষনো না। আমি তোমাকে খুব চিনি, জিজো। ইউ আর সেক্সডাল!

হোয়াট!

রুবিনা হাসতে হাসতে সোফার শেষদিকটায় সরে গেল। তারপর ভুরু কুঁচকে বলল, আমি জানি।

জিজো রাগের ভঙ্গী করে বলল, উইল ইউ স্লিপ উইথ মি টুনাইট?

শাট আপ!

জিজো একটু হেসে সিগারেট ধরাল। তারপর তার বদ্যযন্ত্রটা টেনে নিয়ে স্ট্রোক দিতে থাকল। মাঝে মাঝে আড়চোখে রুবিনার দিকে তাকাচ্ছিলো সে।

রুবিনা আস্তে আস্তে বলল, ওপিনিংয়ে কী গাইবে আজ?

সিঙ্গল্। এ্যানি ভ্যাম সং। জিজো নড়ে বসল হঠাৎ। এই! ওপনিংয়ে পর্টুগিস সং গাইব? সুরটা কিন্তু একেবারে বাংলা লোকসঙ্গীতের মতো।

ওঃ! দারুণ হবে। একটু শোনাও না।

জিজো চাপা গলায় গাইল :

'নাও হা নাদা দা নোভো নো কুস কেসো
নাও হা নানা দা নোভো নো কুই দিগো...

রুবিনা প্রশংসা করার পর বলল, অনেকসময় আমার মনে হয় কলকাতা একটা ক্রেজি ওল্ড ফুল। তাই না? ক্রেজি আফটার এভরিথিং!

এই তো! তুমি নিন্দে করছ আমার গানের।

মোটেও না। তুমি গানটা শিখিয়ে দেবে আমায়?

দেব—যদি তুমি...

কী?

কিছু না। বলে উঠে দাঁড়ালো জিজো। তারপর রুবিনার দিকে একটু বাও করে এগিয়ে গেল। জুবিনের অর্কেস্ট্রা শেষ হয়ে এসেছে। সে পেছনের দরজা দিয়ে ডায়াসে ঢুকল। বিস্তৃত বারের ভেতর নীল আলোয় ভ্রমর গুঞ্জন চলেছে যেন। এখনও যথেষ্ট মাতাল হয়নি কেউ। একটা ছোট্ট চেয়ারে বসে অপেক্ষা করতে করতে জিজোর মনে হল, রুবিনা একা এখনও হয়তো ওঘরে চুপচাপ বসে আছে। আজ আবার রুবিনার জন্য একটু আবাছা দুঃখ ছুঁয়ে যাচ্ছিলো জিজোকে।...

রাত সাড়ে দশটায় বার থেকে বেরিয়ে জিজো দেখল জুবিন ট্যাক্সি চেপে চলে যাচ্ছে দলবল নিয়ে। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল সে। রুবিনা একটু দেরি করে বেরিয়ে এল। জিজোকে দেখে বলল, ভাবছিলুম তুমি চলে গেছ। আমি তোমাকে খুঁজছিলুম। ডেকে আনবে তো?

তুমি কিছু বলো নি! তাছাড়া তুমি তো এটুকু পথ রিকশো করেই চলে যাও দেখছি।

আজ ভয় করছে। এসকর্ট দরকার। এস।

আমি তোমাকে পৌঁছুতে গেলে আর বাস-ট্যাক্সি কিছু পাব না।

না পেলে কী আছে?

জিজো পা বাড়িয়ে বলল, তুমি এমন করে কথা বলো না—শুনলে রাগ হয়। তুমি থাকতে দেবে রাতে?

চেনা রিকশোওয়ালা এসে রুবিনার কাছে সেলাম দিয়ে দাঁড়াল। রুবিনা বলল, চলে এস।

নাঃ!

রুবিনা ওর হাত ধরে টানল।... আমি একা যেতে পারব না। আজ বড্ড ভয় করছে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও জিজো রিকশোয় উঠে বসল। রুবিনা তাকে বেড় দিয়ে ধরে রইল। ফ্রিস্কুল স্ট্রিটে পৌঁছে রুবিনা রিকশোর হুড তুলে দিল। তারপর ফিসফিস করে বলল, মোড়ে দুদিন থেকে দেখছি কয়েকটা ছেলে দাঁড়িয়ে থাকে। আমাকে দেখলেই স্ল্যাং কথাবার্তা বলে।

বলবেই তো। তুমি সজ্জনদাকে বলো না কেন পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতে?

ওঃ! সজ্জন আমাকে পৌঁছে দেবে? তুমি লোক চেনা না!

বাজোরিয়াকে রিং করলেই পারতে!

রুবিনা জোরে চিমটি কেটে বলল, শাট আপ! ওর নাম কোরো না।

সেই মোড়টা নিরাপদে পেরিয়ে যাবার পর রুবিনা ডাকল, জিজো!

উঁ?

তুমি আর আমি মিলে চলো না আসানসোলের ফাংশানটা করে আসি। প্রচুর টাকা দেবে। জুবিন না যাক্। আমি সুভাষ নামে একটা ছেলেকে চিনি। মৌলালি সি আই টি রোডে 'মিডনাইট সিম্ফনি' নামে ওর একটা অর্কেস্ট্রা পার্টি আছে।

সুভাষকে আমি চিনি।

চেনো? খুশি হয়ে দুহাতে জিজোকে জড়িয়ে ধরল রুবিনা। তবে তো প্রব্লেম নেই।

জিজো চুপ করে থাকল। রুবিনা ওর সায় পাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। শরীর দিয়ে আধার করছে চাইছিল। কিন্তু জিজো বরাবর ওরকম নিঃসাড়। রুবিনাদের গলি রাস্তায় রিকশো ঢোকার পর সে বলল, এখনও দেরি আছে তো। দেখা যাক। পার্টি তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করলে আমাকে খবর দিও।

ওরা মুনলাইটে এল না। হয়তো কাল সকালে আমার কাছে ওদের নিয়ে আসবে মিণ্টো।

মিণ্টো কে?

সে আছে একজন। মিণ্টোই তো মিডলম্যান।

বাড়ির গেটের পাশে পানের দোকানে কয়েকটা লোক আড্ডা দিচ্ছিল। রুবিনা ও জিজোকে দেখে তারা গম্ভীর হয়ে রইল। রুবিনা বলল, এস।

না, দেখি, ট্যাক্সি পাই নাকি।

রিকশোর ভাড়া মিটিয়ে রুবিনা তার দিকে তাকিয়ে বলল, ঠিক আছে থ্যাংক ইউ। গুডনাইট! তারপর সে হনহন করে ভেতরের উঠোন পেরিয়ে চলে গেল।

জিজো গলি রাস্তাটায় হাঁটতে হাঁটতে এতক্ষণে একটা প্রচণ্ড উত্তেজনা টের পেল। মানসিক উত্তেজনা। রুবিনার কাছ ছাড়া হলেই সে এমনটা টের পায়। অথচ রুবিনার কাছে গেলেই সে নিঃসাড় হয়ে পড়ে। কেন, তা বুঝতে পারে না।

বড় রাস্তায় পৌঁছেই সে বালিগঞ্জের শেষ ট্রাম পেয়ে গেল।

নরকে কিছুক্ষণ

শেয়ালদা স্টেশন থেকে বেরিয়ে চুমকি জীবনের প্রথম কলকাতার মুখোমুখি। দারুণ উত্তেজনা জেগেছিল প্রথম দর্শনেই। তার ভাল লেগেছিল বললে কম বলা হয়। সে চঞ্চল চাউনি দিয়ে কলকাতার রঙ শুষে নিচ্ছিল। আবর্জনার গাদা, গর্ত, নোংরা কোনোকিছু তার চোখে পড়ছিল না। ট্রাম গাড়ির কথা সে শুনেছিল। স্বচক্ষে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছিল না— যেন স্বপ্নে দেখছে।

আর যেন কলকাতারও এই স্বভাব—নতুন লোককে তক্ষুনি বদলে দেয়। স্মার্ট করে ফেলে কিছুক্ষণের মধ্যে। চুমকি এক নিরীহ চেহারার ভদ্রলোককে বেলেঘাটার কথা জিগ্যেস করলে তিনি আঙুল তুলে বলেছিলেন, ওই যে ওখানে বেলেঘাটার বাস পেয়ে যাবে।

কিন্তু বাসের অবস্থা দেখে চাপতে সাহস করেনি চুমকি। একে ওকে জিগোস করতে করতে ব্রিজ পেরিয়েছে। তারপর হেঁটেছে তো হেঁটেছে। কিছুদূর যাবার পর মনে হয়েছে, এবার জিগোস করা উচিত। হ্যাঁ, এটাই বেলেঘাটা বটে। একটা পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দোনামনায় পড়ে গেছে সে। বিকেল হয়ে গেছে হাঁটতে হাঁটতে। শিগগির অনুদের বাড়িটা খুঁজে পাওয়া দরকার। পানের দোকানে একটু ভীড় কমলে সে কাঁচুমাচু হেসে দোকানীকে জিগ্যেস করেছে, আচ্ছা দাদা, এটাই তো বেলেঘাটা?

হিন্দুস্থানী মধ্যবয়সী দোকানী তাকে দেখতে দেখতে মাথা নেড়েছে। মেয়েটিকে দেখে তার মনে হয়েছে, এই প্রথম কলকাতায় এসেছে। বলেছে, হাঁ, হাঁ। তুম যায়েগা কাঁহা?

সাহস পেয়ে চুমকি বলেছে, দাদা! বেলেঘাটায় যামনীবাবু বলে একজন থাকে। তার বাড়িটা কোথায় জানেন?

দোকানী হা হা করে হেসেছে। ...কত্তো যামিনী আছে। রাস্তার নাম বলো, তব্ না!

বেলেঘাটা।

হাঁ হাঁ। বেলেঘাটা তো বহুত বড়া জায়গা।

হতাশ হয়ে চুমকি আবার হাঁটতে শুরু করেছে। কোথাও তার মুখের দিকে তাকিয়ে করুণা করে কেউ কেউ ভাবনার ভঙ্গীও করেছে। কিন্তু কে চেনে যামিনী বা তার বৌ অনুকে। কারও কণ্ঠস্বরে উৎসাহ টের পেলে চুমকিও দ্বিগুণ উৎসাহে বলেছে কনকপুরের অনুপমা। আমার দিদি হয় সম্পর্কে। আর জামাইবাবুর নাম যামিনীরঞ্জন দাশ। বেঁটে করে মোটা করে দেখতে। মাথায় টাক।

লোকেরা এ অবস্থায় যা করে। সামনে দেখিয়ে বলেছে, ওখানে গিয়ে খোঁজ নাও। দিনশেষে আলো

জ্বলে উঠেছিল রাস্তায়। রাস্তার মোড়ে একটা বটতলার বেদীর ওপর কজন যুবক তাস খেলছিল। তাসের জুয়া। গিরিপদর মতো একটা দড়ি আর চুড়োবাঁধা চুলওয়ালা লোক দেখে চুমকি চমকে উঠেছিল। কিন্তু কাছে এসে দেখল অন্য লোক। তাকে যামনীর কথা জিগ্যেস করলে মাথা নাড়ল। চুমকি কাঁদো কাঁদো মুখে তাকিয়ে রইল। এতক্ষণে তার বুকের ভেতর হারিয়ে যাওয়ার আতঙ্ক আর প্রচণ্ড দুঃখের কান্না ঠেলে উঠছিল। কেন যে সে বোঝে নি কলকাতা একটা বিশাল শহর এবং বেলেঘাটা বললেই চলে না— ঠিকানাটা জেনে আসা উচিত ছিল এমনি করে ঠেকতে ঠেকতে সে সারাজীবন শিখে আসছে। এখনও তার শিক্ষা হল না। বাণীবউদি ঠিকই বলে।

তাসের জুয়ো ছেড়ে টেম্পোর বয়সী এক যুবক তাকে দেখছিল। তার সঙ্গীরা বলল, কী দেখছিস বে? মেয়েছেলে কখনও দেখিসনি? তিন ঝাঁক পাত্তি খসিয়েছিস। কাম অন!

যুবকটি মুখ বাঁকা করে বলল, থাম বে। বেশি কেলাস নে! তারপর চুমকির দিকে তাকিয়ে বলল, কী হয়েছে বললে?

দাড়িওলা বুড়ো বললে, হ্যাঁ রে বোম্বু, এ পাড়ায় যামনী বলে কাউকে চিনিস নাকি? মেয়েটা যামিনীর বাড়ি খুঁজছে।

বোম্বু নামে যুবকটি একটু ভাবনার ভঙ্গী করে হাসল। ....যামিনীদা? হ্যাঁ—হ্যাঁ। রোগা করে পাতলা করে...

চুমকি দ্রুত বলল, না। বেঁটে করে মোটা করে। মাথায় টাক।

উরে ব্যাস। তুমি ওই যামিনীর কথা বলছ? তাস রেখে বোম্বু উঠে এল। এ পাড়ায় দুই যামনী আছে।

চুমকি আনন্দে নেচে উঠেছিল। বলল, কনকপুরের জামাই। অনুদির বর। আমার দূরসম্পর্কের দিদি।

বোম্বু সঙ্গীদের বলল, আসছি বে। একে বাড়িটা দেখিয়ে দিয়ে আসি।

ওর সঙ্গীরা হাসতে লাগল। চুমকি টের পেল, তাকে লক্ষ্য করেই এই হাসাহাসি। কিন্তু গ্রাহ্য করল না সে। একে তো একটানা পাঁচঘণ্টার ট্রেনে আসার ক্লান্তি, অচেনা জায়গায় হন্যে হওয়া, তার ওপর সেই দুপুর থেকে কেবলই হাঁটতে—তার মাথা টলমল করছিল। বোম্বুর পেছন পেছন সে হাঁটতে থাকল।

এলাকাটা একটা বস্তি। টালি আর খোলার ঘর ঠাসবন্দী। খাটাল। মাঝেমাঝে দু-একটা একতাল্লা বা দোতলা ইটের বাড়ি। তাদের চেহারাও ক্ষয়াটে। এমন জায়গায় অনুদিরা থাকে ভেবে অবাক হচ্ছিল চুমকি। কনকপুরে যখন যায়, তখন কিন্তু বোঝা যায় না। মনে হয় বোধনদের চেয়েও ভাল বাড়িতে তারা থাকে।

বস্তির ভেতরে এ-গলি সে-গলি গোলকধাঁধায় ঘুরতে ঘুরতে একটা ঘুপচি একতলা বাড়ির সমানে পৌঁছে বোম্বু হাসল। এই তোমার জামাইবাবুর বাড়ি।

তাও ভাল। চুমকি ভাবল। ইটের বাড়ি তো বটে। সামনের দিকে একটা ঘরে বড় চাকা ঘুরছে আর একটা লোক খড় কাটছে সেই চাকায়। অবাক হয়ে দেখল চুমকি। দরজা নেই বাড়িটার। ভেতরে একটুকরো উঠোন দেখা যাচ্ছে। উঠোনে দুটো খাটিয়া পড়ে আছে। বারান্দায় ওঠে বোম্বু বলল, চলে এস। যামিনীদাকে ডেকে আনি।

বরান্দায় এক বুড়ি বসে আপন মনে পান চিবুচ্ছিল। ঘোলাটে এবং নির্বিকার চোখে তাকিয়ে বলল, কে র‍্যা?

বোম্বু বলল, যামনীদার শালী। গ্রাম থেকে এসেছে।

বুড়ি বলল কে?

বোম্বু ধমক দিল।....খালি কে আর কে? কাজ নেই কম্ম নেই। পান খাওয়া। তারপর চুমকির দিকে তাকিয়ে হাসল।... ভেতরে গিয়ে বসো। এ তো তোমার কুটুম্বের খবর। যাও, যাও আমি ডেকে নিয়ে আসি।

চুমকি আর দাঁড়াতে পারছিল না। ঘরে কম পাওয়ারের একটা আলো জ্বলছে। ভেতরে ঢুকেই সে তক্তপোসের বিছানায় বসে পড়ল। কিটব্যাগটা নামিয়ে নিচে রাখল ঘরের ভেতর একটা কাঠের

আলনায় লুঙি, প্যান্ট, জামা এসব ঝুলছে। তাকে একগাদা শিশিবোতল। কোণার দিকে একটা কেরোসিন কুকার আর এনামেলের কড়াই। একটা কেটলি, কয়েকটা হাতলভাঙ্গা কাপ অনুদের সংসার দেখে হতাশ হল চুমকি।

বাইরে বুড়িটা এতক্ষণে নড়বড় করে বেরিয়ে গেল। অনুদির শাশুড়ি হতেও পারে কিন্তু অনুদি কোথায় গেল?

একটু পরে বোম্বু ফিরে এল... আসছে এক্ষুনি বোসো তো।

চুমকি আস্তে বলল, দিদি নেই?

বোম্বু বিছানায় একটু তফাতে বসে বলল, ইভিনিং শো সিনেমা দেখতে গেছে বলে সে একটা সিগারেটের প্যাকেট বের করল। সিগারেট ধরিয়ে অদ্ভুত হেসে জিগ্যেস করল, তোমার নাম কী?

এবার একটু অস্বস্তি জাগছিল চুমকির। বোম্বুর হাবভাব চাউনি তার ভাল ঠেকছে না ক্রমশঃ। সে মুখ নামিয়ে বলল, কুমারী লক্ষ্মীরাণী রায়।

কোত্থেকে আসছ বললে যেন?

কনকপুর।

সে আবার কোথায়?

বহরমপুরের ওদিকে।

তোমার ফিগারখানা মাইরি দারুণ। ফেসকাটিং দেখে মনে হয় শাবানা আজমি। মা কালীর দিব্যি বোম্বু ঠোঁট গোল করে মৃদু শিস দিল। তারপর সিগারেটটা মেঝেয় ঘষটে নেভাল।

চুমকির বুকটা কেমন করে উঠল। বলল, জামাইবাবু আসছে না কেন?

আসছে, আসছে। ব্যস্ত হচ্ছ কেন? তুমি মাইরি বড্ড এনথু করছ!

মুহূর্তে চুমকির মনে হল, কনকপুরের টেম্পো বা সাত্তার সঙ্গে এর কোথায় একটা প্রচণ্ড রকমের মিল আছে সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কৈ, কোথায় আছে জামাইবাবু? আমাকে নিয়ে চলুন সেখানে।

বোম্বু তার কাঁধ ধরে জোর করে বিছানায় বসিয়ে দিলে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। এবার সে পুরোপুরি টের পেয়েছে এটা অনুদির বাড়ি নয়। সে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল। বোম্বু চাপা গলায় বলল, কী মাইরি ঝামেলা করো? বোস না চুপচাপ কচি মেয়ের মতো, কান্নাকাটি কেন আবার!

চুমকি চেঁচিয়ে উঠল, জামাইবাবু অনুদি!

বোম্বু তার মুখ চেপে ধরে বিছানায় ফেলে দিল...চেল্লাচেল্লি করলে জানে মেরে দেব। চুপ। বলে সে সাত্তার মতোই তক্তপোষের তলা থেকে একটা চকচকে ভোজালি বের করল।

এটা কনকপুর নয়। রেলইয়ার্ডে খোলামেলা জমি নয়। বদ্ধ ঘর। অচেনা রহস্যময় এক বিশাল শহরের একটা মারাত্মক ফাঁদে পা দিয়ে বসে আছে সরলবিশ্বাসে। চুমকি আতঙ্কে বোবা হয়ে ভোজালিটার দিকে তাকিয়ে রইল।

বোম্বু দরজাটা আটকে দিল ভেতর থেকে। ভোজালিটা আবার তক্তপোষের তলায় রেখে সে হাসল। অমন করো কেন মাইরি? চেহারা দেখেই তো চিনেছি তুমি কী লাইনের জিনিস।

চুমকি হু হু করে কেঁদে বলল, আপনার পায়ে পড়ি দাদা। আমাকে ছেড়ে দিন। ভগবান আপনার ভাল করবে। সে হাঁফাতে হাঁফাতে বোম্বুর পা ছুঁতে এল।

বোম্বু তাকে ধাক্কা মেরে বলল, বড্ড ত্যাঁদড়ামি করছ লক্ষ্মীরাণী। তারপর সে পরবর্তী মতলবে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু সেই সময় দরজায় ধাক্কা মেরে কেউ তাকে ডাকল, এই শালা বোম্বাই। খোল বানচোত।

প্রচণ্ড ধাক্কায় কপাট ভেঙে যাবার উপক্রম হলে বোম্বু দরজা খুলে বলল, তোদের মাইরি সময় অসময় নেই।

ওর তিন তাগুর সঙ্গী হুড়মুড় করে ঢুকল। চুমকিকে দেখে বলল, এ মা। এ যে কেঁদে ভাসিয়ে দিলে রে। কান্নার কী আছে বাবা? অনেক ঘাটের জল পেটে পড়েছে বলে তো মনে হচ্ছিল তখন।

বোম্বু দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, তোরা কী রে? একটু বাইরে যা দিকিনি পরে আসিস।

ওরা হ্যা হ্যা করে হাসতে লাগল। একজন বলল, লজ্জা কী বে বোম্বু। তুই যা ইচ্ছে কর না। আমরা চোখ বুজছি।

কান্না থেমে গিয়েছিল চুমকির। সে বোধশূন্য হয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছিল এদের। কোথাও একটা ভয়ংকর জায়গা আছে নরকের মতো, সেখানে পৃথিবীর সবচেয়ে ভীষণ মানুষের বসবাস এবং এরা তারাই। টেম্পো-সাট্টার দল এদের কাছে কিছুই নয়। এরাই আসল, টেম্পোরা নকল। কলকাতার বাইরেটা দেখে মুগ্ধ হয়েছিল চুমকি। এখন ভেতরে ঢুকে সে আতঙ্কে বোবা হয়ে গেছে।

বোম্বু ফের তার গায়ে হাত দিলে সে নড়ে উঠল। তারপর পাগলের মতো হাত পা ছোঁড়াছুড়ি করতে থাকল। মুখে চাপা গোঙানির মতো শব্দ বেরুচ্ছিল তার। বেগতিক দেখে বোম্বু বলল, হাঁ করে কী দেখছিস রে তোরা? ধর না একটু।

এবার চুমকির আর নড়ার উপায় রইল না।...

কতক্ষণ পরে বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিল কেউ। চার কামতৃপ্ত তখন মদের বোতল বের করছে। মেঝেয় বসে গেলাসে মদ ঢেলে খাচ্ছে। হাতে হাতে সিগারেট। চাপা গলায় তারা কথা বলছে। চুমকি বিছনায় নির্জীব হয়ে পড়ে আছে। দরজায় শব্দ শুনে বোম্বু বলল, কে বে?

সেই বুড়ি বাইরে থেকে বলল, হল্লা হল্লা।

অমনি ঝটপট সব সামলে চারজনে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। বুড়ি দরজায় শেকল তুলে এঁটে দিল। তারপর উঠানে নড়বড় করে হেঁটে বাইরের খোলা দরজায় গিয়ে নির্বিকার মুখে দাঁড়াল।

কয়েকটা বাড়ির ওধারে রাস্তার মোড়ে হল্লা হচ্ছে। হল্লা মানে বুড়ির ভাষায় পুলিশের গাড়ি নয়—বেদলের মাস্তানদের হামলা। বোমার শব্দে পাড়া কাঁপতে লাগল। আশেপাশে সব বাড়ির দরজা জানালা বন্ধ হয়ে গেছে। বস্তির ভেতর নিঃশব্দে ছোটাছুটি চলেছে। যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র যোগান দিচ্ছে মদতদাররা। বোমার শব্দ এক সময় কমে এল। হল্লা থেমে গেল। তারপর এতক্ষণে লোডশেডিং শুরু।

আবার হাঙ্গামা চাগিয়ে উঠত। কিন্তু পুলিশের গাড়ি এসেছে। থানা বেশি দূরে নয় যদিও—এসব ক্ষেত্রে দেরি করে আসার নিয়ম। বুড়ি টের পেয়ে আবার নড়বড় করতে করতে এসে দরজা খুলল। তারপর অন্ধকারে ঠাহর করে দেশলাই খুঁজে হেরিকেন জ্বালাল। চুমকির গায়ে ধাক্কা মেরে চাপা গলায় বলল, আই। ওঠ ওঠ। চলে যা চলে যা বলছি।

চুমকি চোখ মেলে তাকিয়ে ওঠে বসার চেষ্টা করছিল।

বুড়ি অশ্লীল গাল দিয়ে বলল, ওঠ খানকি। বেরো, বেরো ঘর থেকে। এক্ষুনি তোর কত্তবাবারা আসবে।

চুমকি টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। মাথা ঘুরছে। সে দেয়াল আঁকড়ে ধরে সামলে নিল। নিচের অঙ্গ অসম্ভব ভারি আর যন্ত্রণাদায়ক। বুড়ি থাপ্পড় তুললে সে ভয়ে ভয়ে কিটব্যাগটা তুলে নিল।

বুড়ি তাকে ঠেলতে ঠেলতে উঠোন পার করে বাইরে পৌঁছে দিয়ে নিশ্চিন্ত হল।

চুমকি নিশির ঘোরে আচ্ছন্ন মানুষের মতো হাঁটছিল। মাঝে মাঝে বসে পড়ছিল পথে। আবার উঠে দাঁড়াচ্ছিল। বড় রাস্তায় কিছুটা এগিয়ে গেলে মোড় থেকে দুজন কনস্টেবল এসে সন্দিগ্ধভাবে সামনে দাঁড়াতেই চুমকি ডুকরে কেঁদে উঠল। ওরা অবাক হয়ে মুখ তাকাতাকি করছিল। পথচারীরা থমকে দাঁড়াচ্ছিল। রাস্তায় আলো নেই। দোকানপাটে মোম বা লণ্ঠন জ্বলছিল। দেখতে দেখতে একটা ভিড় জমে গেল সেখানে।...

চুমকির আশ্রয়লাভ

জিজো অনেক বেলা অব্দি ঘুমোয়। আজ ঘুম থেকে ওঠার পর রুবিনার কথা মনে পড়ে একটা অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করেছিল সে। কাল রাতে রুবিনার সঙ্গে রিকশোতে আসার সময় যে আড়ষ্টতা টের পাচ্ছিল, রাতারাতি ঘুচে গেছে যেন। এমন কী মুনলাইটে রুবিনাকে ফাজলেমি করে সেক্স সংক্রান্ত যে বাক্যটা বলেছিল, দিনের আলোয় তার জন্য লজ্জিত বোধ করছিল জিজো। রুবিনাকে যতটা শস্তা ভেবেছে। সে হয়তো তত শস্তা নয়। কোথাও যেন একটা শক্ত ব্যাপার আছে—রুবিনার জীবন-যাপন প্রণালীর ভেতর। বাইরে থেকে সেটা ধরা যায় না।

কিন্তু হুট করে রুবিনার কাছে হাজির হতে তার বাধল। জুবিনের আড্ডায় যাবার জন্য বাসে উঠল জিজো।

জুবিন থাকে বস্তি এলাকার একটা বাড়িতে। বাড়িটা একতলা। এক অবসরপ্রাপ্ত এবং ক্যান্সার রোগগ্রস্ত আইনজীবীর বাড়ি। তাঁর চেম্বার একসময় বাইরের এই ঘরটাতে। মহল্লার যুবকরা জুবিনের ভীষণ অনুরাগী। তাই জুবিনের ঘরে গানবাজনার সারাক্ষণ জগঝম্পে আশেপাশের লোকেরা বা বাড়ির মালিক তিতিবিরক্ত হলেও কিছু করার নেই।

জিজো দেখল রুবিনা জুবিনের ঘরে জমিয়ে বসে আছে। ঠোঁটে সিগারেট। হাতের গ্লাসে সোনালী রঙের তরল পদার্থটি কী তাও বোঝা যাচ্ছিল। জুবিন খুশি হয়ে বলল,আও মেরা দোস্ত। তারপর সে একটা ব্রাণ্ডির বোতল থেকে গ্লাসে খানিকটা ব্রাণ্ডি ঢেলে জল মিশিয়ে বলল, পিও মেরি নানীকী খাতেরসে।

জিজো বলল, কী ব্যাপার? সেলিব্রেট করছ মনে হচ্ছে?

ইয়া। জুবিন হাসল। ....আজ আমার নানীর বার্থডে আছে।

রুবিনা জিজোর উপস্থিতি সম্পর্কে যেন নির্বিকার। দেয়ালের দিকে ধোঁয়া ছুঁড়ছে। দেয়াল জুড়ে ইউরোপীয় সঙ্গীতকারদের ছবি। মাঝে মাঝে নগ্ন মেমসায়েব। মেঝেয় কেরালার কুটিরশিল্প নারকেলছোবড়ার রঙীন কার্পেট। কয়েকটা শস্তা লোহার চেয়ার। একটা স্বরলিপি আঁটা বোর্ড। কয়েকটা বিদেশী বাদ্যযন্ত্র। কিছু পত্রিকা। জুবিন একধরনের আভিজাত্যের অনুরাগী এবং তার ঘরে নকল হলেও সেই কিম্ভূত আভিজাত্যের ধাঁচ বজায় রাখতে চায়।

জিজোর মনটা ভাল ছিল। ব্র্যাণ্ডিতে চুমুক দিয়ে বলল, হ্যাপি বার্থডে টু উওর নানী। তারপর রুবিনার দিকে তাকাল। রুবিনা এক পপ গাইয়ের ছবির দিকে বিকারহীন মুখে তাকিয়ে ধোঁয়া ছুঁড়ছে।

জুবিন বলল, রুবিনা আমাদের মহল্লায় আসছে, বুঝলে জিজো? এক্ষুনি আমরা ওকে ঘর দেখাতে নিয়ে যাব। দুটো ছেলেকে পাঠিয়েছি আগাম।

জিজো বলল, হঠাৎ পেয়ে গেল বুঝি?

হঠাৎ নয়। জুবিন চোখ টিপে হাসল। ভেতর ভেতর চেষ্টা করছিলুম। তবে সেপারেট কিছু নয়—একটা ফ্যামিলির ভেতর থাকবে। গোমেশ নামে একজন আছে। তার পেয়িংগেস্ট হয়ে থাকবে। টেম্পোরারির অ্যারেজমেন্ট। কোনো অসুবিধে হলে আমি তো আছি কাছাকাছি।

জিজো বলল, রুবিনা আমার সঙ্গে কথা বলছে না কেন বলো তো জুবিন?

জুবিন চোখ নাচিয়ে বলল, ও তোমার ওপর রাগ করেছে।

কেন? খারাপ কিছু করেছি কি?

হুঁউ। জুবিন গলা চেপে বলল।...রাত্তিরে তুমি ওকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে আসনি। গেট থেকে চলে গেছ। ওর ঘরে বাড়িওয়ালা তালা দিয়ে রেখেছিল। চ্যাঁচামেচি হুলস্থূল কাণ্ড।

বলো কী? তারপর?

রুবিনা অত রাতে থানায় গিয়েছিল। পুলিশের কথা তো বুঝতেই পারছ। গড়িমসি করে রাত বারোটায় গিয়ে বাড়িওলাকে ডেকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তালা খুলে দেয়। মুশকিল হয়েছে, রুবিনার নামে তো ভাড়ার রসিদ নেই। এদিকে পাড়ার ছেলেদেরও চটিয়ে রেখেছে রুবিনা।

রুবিনা ফোঁস করে উঠল এতক্ষণে। ....শাট আপ। এভরিবডি ওয়ান্টস টু মেক লাভ উইথ মি। অ্যাণ্ড দ্যাট ব্লাডি ল্যাণ্ডলর্ড। সন অফ এ বিচ। দ্যাট ওল্ড ফাকিং ফুল। বাস্টার্ড।

জুবিন ওর মুখ চেপে ধরে বলল, খামোশ হো যাও পিয়ারি। আমার ঘরটাকে আর নোংরা কোরো না।

জিজো গম্ভীর হয়ে বলল, কিন্তু আমি তো বুঝতে পারিনি কিছু। তাছাড়া রুবিনার উচিত ছিল আমাকে ডাকা। যখন দেখল ঘরে তালা আটকানো....

রুবিনা শান্তভাবে ওর কথায় বাধা দিয়ে বলল, গিয়েছিলুম দৌড়ে। তোমাকে ডাকছিলুম। তুমি ট্রামে উঠে পড়লে।

জিজো বলল, অত রাতে সামনে ট্রাম দেখে এমন ব্যস্ত হয়েছিলুম যে কিছু লক্ষ্য করার মতো

মনের অবস্থা ছিল না। কারুরই থাকে না।

এই সময় বাইরে মাইকে কেউ কিছু ঘোষণা করতে থাকল। জানালার পর্দা সরিয়ে রুবিনা উঁকি দিল। জুবিন দরজায় গিয়ে শুনে আসার পর বলল, আজকাল এই এক ব্যাপার হয়েছে। লোকে আর পুলিশের মিসিং স্কোয়াডের ওপর নির্ভর করতে পারছে না। নিজেরাই রিকশো আর মাইক ভাড়া করে বেরিয়ে পড়ছে মহল্লায়-মহল্লায়।

জিজো বলল, কী ব্যাপার?

বিহার থেকে কলকাতায় এসেছিল মুন্নী নামে একটা মেয়ে। কীভাবে নিখোঁজ হয়েছে। বছর দশেক বয়স। ফর্সা রঙ। রোগা গড়ন। পরনে সালোয়ার কামিজ। ....জুবিন হাসতে লাগল। প্রায়ই এরকম হচ্ছে। মাইক আর রিকশো নিয়ে লোকেরা বেরিয়ে পড়ে। কখনও দেখি গাড়ি নিয়ে ঘুরছে। সঙ্গে মস্তো ফোটো।

জিজো বলল, কলকাতায় হারিয়ে যাবার পক্ষে চমৎকার জায়গা।

জুবিন একটা বাদ্যযন্ত্র টেনে নিয়ে পিড়িং পিড়িং করতে করতে বলল, দেহাতে আর কেউ থাকতে চাইছে না। এই মহল্লায় আসার পরও লোকজনের ভিড় দেখেছি কম। এখন! সকালে এলে দেখবে হাঁটা যায় না। আনস্কিলড লেবারে থইথই করছে। এরা যেখানে সেখানে শুয়ে ঘুমোয়। রাস্তা নোংরা করে। লেবার কন্ট্রাক্টাররাই হয়তো এদের নিয়ে আসছে।

রুবিনা বলল, কিন্তু শুধু মেয়েরাই কেন হারিয়ে যায় বলো তো?

জিজো বলল, মোটেও না। অসংখ্য ছেলেও হারিয়ে যাচ্ছে আজকাল।

কোথায় যায় ওরা?

জিজো গেলাসে চুমুক দিয়ে বলল, ছেলেরা মার্ডার হয়ে যায়। কেউ কেউ জুবিনের মতো বোম্বে যায় হিরো হতে।

জুবিন শুধু হাসল। তার মন সঙ্গীতে। রুবিনা বলল, সে তো মেয়েরাও নাকি যায়।

তুমি গিয়েছিলে নাকি জুবিনের মতো?

আমার কোনো উচ্চাকাঙ্খা নেই।....রুবিনা জিজোর জ্বলন্ত সিগারেটটা নিয়ে টানতে থাকল। তারপব ফের বলল, বি সিরিয়াস। মেয়েরা নিখোঁজ হচ্ছে—তারা সবাই বোম্বে যায় না। কোথায় যায় তারা?

জিজো সিরিয়াস হয়ে বলল, উত্তর-পশ্চিম ভারতে দেহাতী পয়সাওয়ালাদের বউ হতে যায় শুনেছি। তার মানে, কেউ মেয়েগুলোকে বেচে দিয়ে আসে। আবার নাকি অনেক মেয়েকে পতিতাবৃত্তি করায়।

ওঃ। দ্যাটস হরিবল।

জুবিন বলল, মিসেস অ্যারাথুনের কথা ভুলে যাচ্ছ রুবিনা। ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের বাড়িটা কী ছিল?

রুবিনা চুপ করে রইল।

হ্যাভ এনি পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স?

রুবিনা শূন্য গেলাস ছুঁড়ে ফেলল মেঝেতে। গেলাসটা দৈবক্রমে ভাঙল না। জুবিন হো হো করে হেসে উঠল। জিজো বলল, জুবিন। রুবিনাকে নিয়ে যা তা বলো না।

জুবিন বলল, কারণ আছে। মিসেস অ্যারাথুনের পাল্লায় পড়েছিল রুবিনা। জিগ্যেস করো না ওকে। প্রথমে বুড়ির মতলব টের পায় নি ও। পরে আর ছায়া মাড়াত না। খ্রিস্টমাস গিফট দিয়েছিল মিসেস অ্যারাথুন। রুবিনা ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছিল। অবশ্য তখন ওর বয়স কম। জাস্ট সুইট ফিফটিন অর সিক্সটিন।

কথা বলতে বলতে জুবিনের পাঠানো ছেলেদুটো এসে গেল। জুবিন বলল, তাহলে যাক। জিজো, আয় না আমাদের সঙ্গে। কাছাকাছি—কয়েকটা বাড়ির পরেই।

জিজো বলল, আমি গিয়ে কী করব? তোরা ঘুরে আয়। আমি বসছি।

ওরা চলে গেলে সে জুবিনের ফোটো অ্যালবাম নিয়ে দেখতে থাকল। জুবিনের পার্টির নানান জায়গায় অনুষ্ঠানের ছবি। রুবিনারও কয়েকটা ছবি দেখে একটু অবাক হল সে। রুবিনার সঙ্গে জুবিনের সম্ভবত বহুদিনের একটা সম্পর্ক আছে। দুজনের অন্তরঙ্গ অবস্থারও ছবি আছে। ঘুম থেকে ওঠার পর রুবিনার প্রতি যে আকর্ষণ জেগেছিল, এই ছবিগুলো দেখতে দেখতে কেটে গেল!

কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টে তাকিয়ে থাকার পর সে একটা গিটার নিয়ে বাজাতে শুরু করল। ভাল লাগল না। রুবিনার কাল রাতের কথাগুলো মাথার ভেতর ভনভন করে উড়ে আসছে ক্রমাগত। রুবিনা এমন ভাব দেখাচ্ছিল যেন সুভাষের 'মডনাইট সিম্ফনি'তে জিজোকে নিয়ে ভিড়ে যাবে এবং জুবিনকে ছেড়ে দেবে। অথচ আসল ব্যাপারটা হল, সে জুবিনের কাছাকাছি এসে যাচ্ছে এবার। বাড়ির ঝামেলা হয়তো নিছক উপলক্ষ্য।

জুবিনের ফিরতে দেরি হচ্ছিল। ওর দলের একটা ছেলে এসে গেলে জিজো উঠল। বলল, জুবিনকে বলো, আমার জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। গেলুম।

কিছুক্ষণ বাজে সময় নষ্ট হয়েছে—এরকম তেতো মন নিয়ে জিজো হাঁটছিল। ট্রাম রাস্তায় পৌঁছে সে ঠিক করল, আর কোথাও যাবে না। নিউমার্কেট থেকে একটা ক্যাসেট কিনবে ভেবেছিল। ইচ্ছে করল না। বাড়ি ফিরে চুপচাপ শুয়ে কাটাবে ভাবল। রাত থেকে শরীর কেমন ম্যাজম্যাজ করছিল। ব্রাণ্ডিটা খেয়ে সেটা যেন বেড়ে গেছে।

কিন্তু বাড়ি ফিরেই জিজো ভীষণ অবাক হল।

কিচেনের অন্য দরজার মুখে ব্যালকনিতে মেঝেয় বসে কনকপুরের সেই চুমকি ভাত খাচ্ছে। আব তার পাশে একটা মোড়ায় বসে আছেন তার মা ভারতী।

বাথরুম খালি আছে কিনা দেখতে গিয়ে এই দৃশ্যটা চোখে পড়ে জিজো কিচেনের এপাশের দরজায় থমকে দাঁড়িয়ে গেল। বলল, আরে এ কী!

চুমকি তার দিকে তাকিয়েই মুখ নামাল। আঙুলে ভাত খুঁটতে থাকল। তার চেহাবার মধ্যে প্রচণ্ড রুগ্নতা জিজোর চোখে পড়ছিল। ভারতী একটু হেসে বললেন, নাটকীয় ঘটনা, বুঝলি জিজো? ভাগ্যিস বেচারী বুদ্ধি করে থানায় ঢুকেছিল। নইলে কোন বদমাসের পাল্লায় পড়ে বিপদ হত। যা হয়েছে। সব আজকাল।

জিজো শান্তভাবে বললেন, বেলেঘাটায় ওর দিদি-জামাইবাবু থাকে। কিন্তু ঠিকানা না জেনেই বোকার মতো চলে এসেছে। শেষে বুদ্ধি করে থানায় গিয়েছিল। ঘুরে ঘুরে করুণ অবস্থা। পুলিশের পাল্লায় পড়াও আবার সাংঘাতিক ব্যাপার। একশো জেরার চোটে কাহিল। চেহারা কী হয়েছে দেখছ না?

জিজো অধীর হয়ে বলল, আহা! এখানে এল কী ভাবে?

বেলেঘাটা থানা থেকে পুলিশ এসে পৌঁছে দিয়ে গেল।

পুলিশ আমাদের ঠিকানা জানল কেমন করে?

ভারতী চটে গেলেন। ...জানল কেমন করে! চুমকি বলেছে আমাদের কথা। পুলিশ ওর দিদি-জামাইবাবুর খোঁজ করেছে। পায়নি। শেষে জিজ্ঞেস করেছে, কলকাতায় আর কেউ চেনা-জানা আছে নাকি। তখন আমাদের কথা বলেছে।

চুমকি আস্তে আস্তে বলল, জিজোদার নাম করে বললুম, হোটেলে গান করে। তখন...

জিজো বলল, বুঝেছি। মুনলাইটের সজ্জনদা আমার ঠিকানা দিয়েছে।

ভারতী শান্ত হেসে বললেন, আমি তো আকাশ থেকে পড়েছিলুম। শেষে যখন বলল, কনকপুরে রোজ আমাকে ফুল দিয়ে আসত, তখন মনে পড়ল। আরে, এ তো সেই গিরিপদব মেয়ে।

বলে চুমকির দিকে একটু ঝুঁকলেন।....খাচ্ছ না কেন? পেট ভরে খেয়ে নাও। মুখ দেখেই বুঝেছিলুম খাওয়া-দাওয়া জোটে নি।

চুমকি মুখ নামিয়ে বলল, থানায় খেতে দিয়েছিল। রাত্তিরে রুটি তরকারি, সকালে চা পাঁউরুটি।

সে তো কয়েকদীদের খাবার।

চুমকি হাসবার চেষ্টা করে বলল, না। দারোগাবাবুর বাসা থেকে এনেছিল।

দারোগাবাবুরা তোমার কর্তাবাবা হয়, পাগলী কোথাকার। খাও, পেট ভরে খাও।....

জিজো স্নান করতে ঢুকল। যখন সে খেতে বসেছে, তখন লক্ষ্য করল, ব্যালকনির মেঝেয় পা ছড়িয়ে বসে আছে চুমকি। দেয়ালে ঠেস দিয়ে। কনকপুরে কী উজ্জ্বল মনে হয়েছিল মেয়েটাকে। খুব ধকল গেছে বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু এমন করে হঠাৎ চলে এল কেন? জিজোর মনে পড়ল, তাকে বলেছিল কলকাতা যাবে বাবার খোঁজে। আশ্চর্য জেদী তো মেয়েটা। কিন্তু তার চেয়ে আশ্চর্য, জুবিনের ঘরে

তখন হারিয়ে যাওয়া মেয়েদের কথা হচ্ছিল।

ভারতী ডাইনিং টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললেন, এসেছে ভালই করেছে। আমার কাছে থাক। তত বেশি কাজকর্ম করতে হবে না। খাবে পরবে, হাত খরচাও দেব মাসে মাসে। ওরা গ্রামের মেয়ে তো। খুব সিনসিয়ার, বুঝলে জিজো? দিদি বলত, শিগগির তোমাকে একটা ভাল কাজের লোক পাঠিয়ে দেব। আজও দিল।

জিজো বলল, ও এসেছে ওর বাবার খোঁজে।

বাবার খোঁজে মানে?

জিজ্ঞেস করো না ওকে।

ভারতী চুমকীর কাছে চলে গেলেন। জিজো খেয়ে দেয়ে সোজা নিজের ঘরে চলে গেল। দরজা এঁটে দিয়ে শুয়ে পড়ল। দিনের বেলা খেয়ে ঘুমোলে গলা ধরে যায় বলে সে পারত পক্ষে ঘুমোয় না। আজ তার ঘুমোতে ইচ্ছে করছিল। বরং আজ মুনলাইটে যাবে না।

জিজো সিগারেট টানতে টানতে রুবিনার কথা ভাবতে থাকল। সত্যি বড় অদ্ভুত মেয়ে।..

গিরিপদর স্বদেশযাত্রা

চারদিকে উঁচু পাঁচিল ঘেরা। একপাশে ছোট্ট একটা পুকুর। তার পাড়ে বাঁশঝাড় পর্যন্ত আছে। অন্যপাশে পুরনো আমলের দোতলা বিশাল এই বাড়ি। পুরোটাই লাল রঙের। বাইরে থেকে বোঝা যায় না কিছু। বাইরে একদিকে বস্তি এলাকা। অন্যদিকে মধ্যবিত্তদের বাস—তত ঝকমকে চেহারা না হলেও সভ্যভব্য দেখায়। রাস্তায় ছেলেরা ক্রিকেট খেলে। রঙবেরঙের মোটর গাড়ি যাতায়াত করে। ঠাসবন্দী ওই সব ইটের বাড়ি থেকে সুন্দর সুন্দর মানুষজন বেরোয়। গিরিপদ সারাদুপুর দোতলার বারান্দা থেকে চারপাশের জীবনযাত্রা ও হালচাল দেখে ক্লান্ত হয়। সে আজীবন গ্রামীণ মানুষ। নিরিবিলি চুপচাপ জায়গা তার ভাল লাগে। তার মন কেমন করে ওঠে কনকপুরে তার বাড়িটার জন্য। কিন্তু ও বাড়িতে আর তার পা দিতেও সাহস হয় না। বোকা মেয়েটা বাড়িটাকে নরক করে ফেলেছে এতদিনে।

বিকেলে সে কর্তাবাবুর জন্য গোটা তিরিশেক পান সেজে দেয়। হলঘরে রুপোর রেকাবিতে ভিজে রুমাল দিয়ে ঢাকা পানগুলো পৌঁছে দিয়ে আসে। পাঁচটায় কর্তাবাবু তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসবেন। গিরিপদ নিচে থেকে একরাশ বেলফুল এনে ছড়িয়ে দেবে রুমালের ওপর। একটু পরেই নাচ-গানের মহড়া শুরু হবে। কোনদিন দরজায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ উপভোগ করে গিরিপদ। কোনদিন তার এসব আদপে ভাল লাগে না। নিচে গিয়ে হরিণের খাঁচার কাছে বসে থাকে। চাপা গলায় হরিণটার সঙ্গে বাক্যালাপ করে। মণ্টু নামে একটা গ্রাম্য কুকুরের গল্প শোনায় ওকে।

এ বাড়িটা যেন চিড়িয়াখানা। বড়লোকের খোয়াল একেই বলে। একটা হরিণ আছে। একদঙ্গল গিনিপিগ আছে। ওদিকে কার্নিশে আর ঘুলঘুলি জুড়ে অসংখ্য পায়রার বাসা। গিরিপদর ওপর এদের দেখাশোনা খাওয়ানোর দায়িত্ব।

আর ওই ফুলবাগান। খুরপি আর জলের ঝারি নিয়ে গিরিপদ বিজ্ঞ মালীর ভান করে ঘোরে। জেলখানার কথা মনে পড়ে যায়। আনমনা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে পুকুরটার পাড়ে। পুকুর জুড়ে লালশালুক আর পদ্ম লাগানো রয়েছে। জল কমলে ডিপ টিউবওয়েলে পাম্প চালিয়ে পুকুর ভরার ব্যবস্থা আছে। গিরিপদর প্রথম প্রথম ভয় করত। এখন সুইচ টিপে পাম্প চালু করতে পারে।

কর্তাবাবুর নাম প্রমোদরঞ্জন। এতবড় বাড়িতে একা থাকেন। মাঝে মাঝে গাড়ি করে আত্মীয়-স্বজন আসেন। তাঁরা কেউ কেউ থেকেও যান একটা বেলা। কেউ কেউ দুটো-তিনটে দিনও থাকেন। গিরিপদ ফাইফরমাস খেটে বখশিস পায়। দুজন চাকর, একজন ঝি, একজন রান্নার ঠাকুর আছে। প্রথম প্রথম গিরিপদকে দিয়েই তারা নিজেদের কাজ করিয়ে নিত। ক্রমে ক্রমে গিরিপদ একটু কড়া হয়েছে। তাছাড়া নিজেকে ভদ্রলোক বলে গণ্য করে—কেউ মানুক বা না মানুক।

পশুপাখির দায়িত্ব ছিল নিরঞ্জন নামে চাকরের ওপর। নিরঞ্জন সে দায়িত্ব কর্তাবাবুর অজ্ঞাতে গিরিপদর কাঁধে চাপালেও গিরিপদ তাতে খুশি হয়েছে বরং। হরিণ আর গিনিপিগের জন্য পুকুর

পাড় থেকে ঘাস নিয়ে আসে। ছোলা ভিজোতে দেয়। বাজারে গিয়ে কাংনিদানা কিনে আনে। যত্ন করে খাওয়ায়। খাঁচা পরিষ্কার করে দেয়। জল ছিটিয়ে স্নান করায়।

খেয়ে দেয়ে তিরিশ টাকা মাইনে হয়েছে গিরিপদর। চেহারায় চেকনাইও ফুটেছে বাইরে বাইরে। কিন্তু মনে লেশমাত্র সুখ নেই। মাঝে মাঝে ঝোঁকের মাথায় কনকপুরে যাবে বলে তৈরি হয়। তারপর সেই সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে মনটা তেতো হয়ে যায়। সে মুখ গম্ভীর করে পুকুরের ধারে ঘাটের মাথায় বসে থাকে চুপচাপ।

কিছুদিন আগে কর্তাবাবুর সঙ্গে গাড়ি চেপে শেয়ালদার দিকে গিয়েছিল গিরিপদ। কর্তাবাবুর খেয়াল হয়েছিল, কখন ওখানে নাকি ভাল কয়েকটা মালতী চারা দেখে এসেছেন। হঠাৎ দেখা হয় যামিনীর সঙ্গে। গাঁয়ের জামাই যামিনী—যতীনের বোনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। যামিনী তাকে দেখে অবাক হয়েছিল। কলকাতায় এসে কাজ পেয়েছে শুনে সে খুশি হয়ে বলেছিল, যাবেন কাকা একবার বাসায়। ঠিকানা লিখে দিচ্ছি।

পরে যামিনীর বাসায় গিয়েও ছিল গিরিপদ। অনু তাকে খাতিরের চূড়ান্ত করল। শেষে চুমকির কথা জিজ্ঞেস করলে গিরিপদ বলেছিল, ভালই আছে।

আসলে সে নিজেই আঁচ করতে গিয়েছিল কনকপুরের হালচাল। অনু অনেকদিন কনকপুরে যায় নি। সামনে জামাইষষ্ঠীতে যাবার আশা করছে। তবে যতীন—তার দাদা প্রতি সপ্তাহে মাল কিনতে আসে এবং একবার দেখা করে যায়। চুমকি সম্পর্কে আলাদা কোন খবর দেয় নি সে। আর গিরিপদও ভেঙে কিছু বলে নি। কোন মুখে বলবে।

তবে গিরিপদের পক্ষে স্বস্তির কথা, তার জেলখাটার খবরও যতীন দেয়নি। দিলে নিশ্চয় অনু খুঁটিয়ে জানতে চাইত ব্যাপারটা। সব মেয়েই বাপের দেশের খবর খুঁটিয়ে জানতে চায়। কিন্তু যতীন এমন মানুষ, নিজে থেকে কিছু বলার স্বভাব নেই। ব্যবসা ছাড়া ওর অন্য কিছুতে মন নেই। অনু হাসতে হাসতে বলেছিল, দাদা ওই এক মানুষ। বাড়ি ঢুকেই বলবে, চললুম। ট্রেন ফেল হয়ে যাবে।...

গত রাতে চুমকিকে স্বপ্ন দেখে সকাল থেকেই মন খারাপ করে ঘুরছে গিরিপদ। প্রাঙ্গণে বুগানভিলিয়ার ঝাঁপির কাছে দাঁড়িয়ে কনকপুরের জন্য অস্থির হচ্ছিল সে। তার মেয়ে বরাবর কেমন বেপরোয়া, তেমনি বোকার হদ্দ। মাকে হারিয়ে তারপর থেকে নিজের জোরে বেড়ে উঠেছে। পুরুষ মানুষের পক্ষে মেয়েদের সবদিকটা বোঝাও কঠিন, দেখাও কঠিন। চুমকি ছেলেদের সঙ্গে নির্দ্বিধায় মিশেছে দেখেও গিরিপদ কোন মুখে বলবে, ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা উচিত নয়? বড় জোর বলত কী যে করিস খালি? তবে ছেলেগুলোর কাছে উপকারও পাওয়া যেত। টাকাকড়ির অভাব হলে গিরিপদ ধার চাইত নিঃসংকোচে। আর ওই নোটন। ডানপিটে মারকুটে ছেলে বটে, কিন্তু গিরিপদের সামনে শান্ত আর বেজায় ভদ্র। দাদার দোকান থেকে এটা ওটা লুকিয়ে এনে দিত নোটন। টাকাকড়ি ধার চাইলে তো দিতই। একবার পাঁচকিলো আটা দিয়েছিল, মনে পড়ে গিরিপদর। জেলে গিয়ে তাই মেয়ের খাওয়ার জন্য তত বেশি চিন্তা ভাবনা ছিল না তার। ওদিকে নোটনের বউদি বাণীর মতোও দয়ালু মেয়ে হয় না। কী ভাল না বাসত চুমকিকে—যেন নিজের মায়ের পেটের বোন। চুমকির চুলের জট ছাড়িয়ে দিত চিরুনী টেনে। কলকাতা থেকে যতীন শাড়ি কিনে নিয়ে গেলে বাণী সেই নতুন শাড়ি একবার পরাবেই চুমকিকে।...

প্রমোদরঞ্জন নিচে নেমে গিরিপদকে দেখে মুচকি হেসে বললেন, কী হে সাধুবাবা। অমন তুম্বো মুখ করে দাঁড়িয়ে আছ যে?

প্রমোদরঞ্জন তাকে ঠাট্টা করে সাধুবাবা বলেন। রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আনার মতো এনেছিলেন গিরিপদকে। আমহার্স্ট স্ট্রীটে তাঁর শ্যালক অমিয়র বাড়ির রোয়াকে বসে শুকনো রুটি চিবুচ্ছিল লোকটা—সাধুর মতো চেহারা। খেয়ালী মানুষ প্রমোদরঞ্জনের এসব বাতিক আছে। একবার রাস্তায় শুয়ে থাকা একটা ন্যাড়ামাথা বালককে তুলে এনেছিলেন। দিনকতক পরে সে পাঁচটাকার নোট নিয়ে সিগারেট কিনতে গিয়ে আর ফেরেনি। তারপরও অনেকবার এরকম করেছেন। তাঁর পরীক্ষা সফল হয় নি। গিরিপদর বেলায় মনে হচ্ছে, এবার একটা খাঁটি সারির লোক পেয়ে গেছেন— যে সত্যিকার কাজের লোক এবং বিশ্বাসী। কাজেও প্রচুর নিষ্ঠা।

গিরিপদ কাঁচুমাচু মুখে বলল, একটা কথা বলছিলুম বাবুমশাই।

হুঁ, বলে ফেলো।

দেশের জন্য মনটা বড় ছটফট করছে বাবুমশাই। দু'দিনের জন্য যাব ভাবছিলুম।

প্রমোদরঞ্জন হাসলেন। টাকাকড়ি চাই?

আজ্ঞে, তা পেলে তো ভালই হয়।

কিন্তু এখনও তো একমাসও হয় নি হে। এরই মধ্যে বাড়ি যাওয়া কি ঠিক হচ্ছে? প্রমোদরঞ্জন পাঞ্জাবির পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে বললেন, হুঁ—তোমার দেশ কোথায় যেন?

কনকপুর বাবুমশাই।

কে আছে হে বাড়িতে? কার জন্য মন চঞ্চল হল? বউ?

দুঃখিতভবে হাসল গিরিপদ। আজ্ঞে না, মেয়ে। ওই একটি মোটে মা-হারা মেয়ে। বাড়িতে তাকে একা রেখে এসেছিলুম কাজ খুঁজতে।

বলো কী! মেয়ের বয়স কত?

আজ্ঞে, সোমত্ত মেয়ে। বয়স আঠারো-উনিশ হল বোধ করি। বিয়ের যোগ্য হয়ে গেছে—তো.....

অ্যাঁ! প্রমোদরঞ্জন অবাক হয়ে তাকালেন।....তাকে একা রেখে এসেছ। আজকাল তো কাগজে পড়ি, গ্রামের অবস্থা ভীষণ খারাপ।

গিরিপদ মুখ নামিয়ে বলল, পাড়াপড়শি আছে বাবুমশাই। মেয়েও খুব পাকা।

পাকা মানে কী সাধুবাবা?

গিরিপদ বিব্রত হল। ঢোক গিলে বলল, আজ্ঞে। চালাকচতুর। প্রাইমারি অব্দি লেখাপড়া শিখেছিল।

বুঝলুম। প্রমোদরঞ্জন দুটো দশ টাকার নোট ওর হাতে দিয়ে বললেন, তেমন বুঝলে মেয়েকে নিয়ে এসো সঙ্গে করে। থাকার ঘর দেব। বাবা-মেয়ে থাকবে। কাজকর্ম দুজনেই করবে। কাতানের মায়ের বয়স হয়েছে—প্রায়ই চলে যাবে বলে শাসায় শোনো না?

আজ্ঞে, আজ্ঞে। গিরিপদ খুশি হয়ে মাথা দোলাল।

পাকাপোক্ত কাজের মেয়ে পেলে ভাল হয়। তবে কাজই বা কী? প্রমোদরঞ্জন গলা ছেড়ে ডাকলেন, অ্যাই চণ্ডীবালা! কোথায় তুই?

বুড়ি দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল—হাতে ঝাঁটা। কর্পোরেশনের একটি সুইপার মেয়ে এতদিন প্রাঙ্গণ ও বাড়ির আনাচ-কানাচ ঝেঁটিয়ে বাথরুমগুলো সাফ করে যেত। সে হঠাৎ আর আসে না। তাই চণ্ডীবালা ওরফে কাতানের মায়ের ওপর দায়িত্ব বর্তেছে। কর্তামশাই খামখেয়ালী বলেই অনেক ব্যাপারে ভীষণ কড়া।

চণ্ডীবালা কান খাড়া করে শুনছিল। গলার ভেতর বলল, করবে। করুক না এত কোন আবাগীর মেয়ে— দেখব'খন। তার ওপর আমাকে দিয়ে মেথরের কাজ করিয়ে নিচ্ছে। কে করবে, দেখি না।

প্রমোদরঞ্জন খাপ্পা হয়ে বললেন, এ জন্যেই তো তোদের এই দশা। ইশ। মেথরের কাজ করিয়ে নিচ্ছে। আমি নিজে করিনে এসব? আমার বাথরুম আমি নিজে পরিষ্কার করি নি আজ? খুব যে শোনাচ্ছিস বড়।

চণ্ডীবালা শুকনো পাতার দিকে ঝুঁকে পড়ল ঝাঁটা নিয়ে। প্রমোদরঞ্জন তার দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে থাকার পর চলে গেলেন। সিঁড়ির শব্দ করে ওপরে উঠতে থাকলেন।

গিরিপদ নিচের তলার একটা ঘরে গিয়ে ঢুকল। এ ঘরে বৃন্দাবন কালুচরণ নামে ভৃত্যদ্বয়ও থাকে। মাঝে মাঝে কর্তাবাবুর ড্রাইভারও বেশি রাত হয়ে গেলে খাটিয়া নিয়ে ঢুকে পড়ে। ঘরটা বেশ বড়ো। ছড়িয়ে ছিটিয়ে অনেকগুলো মানুষের জায়গা হয় শোবার। তার চেয়ে সুখের কথা একটা পুরনো আমলের ফ্যানও আছে—যদিও তা বিচ্ছিরি শব্দ করে ঘোরে। কিন্তু লোডশেডিংয়ের দৌরাত্ম্যে কতক্ষণই বা ভৃত্যরা এই সুখটুকু পায়।

গিরিপদ জেলের ভাতার টাকায় কেনা সেই শাড়িটা যত্ন করে রেখেছিল। সঙ্গে নিয়ে বেরুল। বারোটা পাঁচে একটা ট্রেন আছে। শেয়ালদার কাছে কোন হোটেলে দুমুঠো খেয়ে নেবে।....

পুনর্মিলন

ভারতী চুমকিকে পেয়ে কাজের লোককে ছাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু কয়েকদিনেই টের পেলেন ভুল হয়েছে। গ্রামের মেয়েরা খুব আন্তরিক এবং কাজের লোক হয়, এ ধারণা ভেঙে গেল। হয় চুমকির কাজে মন নেই, নয় সে একেবারে নিষ্কর্মা আর আনাড়ি। কাপ ভেঙে গেলাস ভেঙে ঘাড় গোঁজ করে বসে থাকে সে। একটু বকাঝকা করলেই চোখে জল। ধোয়া পাখলার কাজটাও যদি ভাল করে পারত। তার চেয়ে বড় কথা, মুখের হাসিটি পর্যন্ত নেই। ভারতী বলেছিলেন, শিখিয়ে নেব'খন। কিন্তু শিখতে চাইলে তো। মুখ ভার করে থাকার একটা কারণ থাকতে পারে—বাবার খোঁজ খবর মেলে নি। জিজো বেনেপুকুর এলাকায় খোঁজ করে এসেছে। সাধুসন্ন্যাসীর চেহারার মত লোক আছে। তারা কেউ কনকপুরের গিরিপদ নয়। এমন কী, বোধনকে চিঠি লিখে নোটনদের কাছ থেকে বেলেঘাটার যামিনীর ঠিকানা পাওয়া গেছে। জিজো যামিনীর কাছে গিয়ে একই কথা শুনেছে—গিরিপদ বেনেপুকুরে থাকে। তবে যামিনী বলেছে, গিরিকাকা ফের যদি আসেন, তাঁকে বলব। জিজো ঠিকানা দিয়ে এসেছে।

আরও একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে ভারতী ক্রমশ চুমকির ওপর চটে উঠেছিলেন। ওই যে এত মুখভার, কাজে গড়িমসি, কিন্তু জিজো বাড়ি ঢুকলেই কেন মেয়েটা এমন চঞ্চল হয়ে ওঠে? হাঁ করে তাকিয়ে থাকে জিজোর মুখের দিকে। বাথরুমে একগাদা কাপড় নিয়ে বসেছে। জিজোর গলা শুনলে অমনি উঁকি মারবে। কেমন চোখে চেয়ে থাকবে ওর দিকে। তারপর ভারতীর চোখে পড়ছিল, জিজো তার ঘরে থাকলে চুমকি আনাচে-কানাচে যেন ছোঁকছোঁক করে ঘোরে। একদিন কথায় কথায় জিজোর বউদি মহুয়া মুখ টিপে হেসে শাশুড়িকে বললেন, জিজোঠাকুরপো বলছিল, চুমকির দারুণ নাচের ফিগার। গলাটাও মিষ্টি। যদি শেখার চান্স পেত, শাইন করতে পারত।

ভারতী রাগে অস্থির হয়ে বললেন, নাচাচ্ছি। কালই ওকে দূর করে দেব।

তারপর রাগটা কিছুটা ছেলের ওপরও পড়ল। জিজো টেনেটুনে বি এটা পাস করে ইতরজনের বৃত্তি ধরেছে। গান-বাজনাই ওর জীবনটা শেষ করে দিল। কাকেও বলতে পারেন না তাঁর ছেলে হোটেলে শুঁড়িখানায় গান করে। কিন্তু সেটা গোপন নেই অবশ্য। জিজোর বাবা পুলকেন্দু দুবছর আগে স্ট্রোকে মারা গেছেন। ভাগ্যিস মৃত্যুর আগে এই দোতলা বাড়িটা বানিয়ে যেতে পেরেছেন এবং কোন কন্যাসন্তান নেই। নিচের তলায় ভাড়াটে আছে। বড় ছেলে শুভেন্দু বা রুনু ভাল একটা চাকরি করে। তাই সংসারে সচ্ছলতা আছে। কিন্তু জিজো কি এমনি করে দায়িত্বহীন জীবন কাটাবে?

সকালে জিজো ব্রেকফাস্ট খায় নিজের ঘরে। চুমকিকে দিয়ে প্রথম কয়েকটা দিন পাঠাচ্ছিলেন ভারতী। এদিন নিজে নিয়ে গেলেন। তারপর কথায় কথায় জিজোর ভবিষ্যৎ এনে ফেললেন। জিজো রেগে গেল।...তোমাদের অসুবিধেটা কী হচ্ছে? এও তো চাকরি। মাসে মাসে টাকা চাও বুঝি? বলো দেব।

ভারতীও খাপ্পা হয়ে বললেন, শোনো কথা। এমনি করে জীবন কাটাবি তুই? বিয়ে করতে হবে না? সংসার করতে হবে না? ছন্নছাড়া হয়ে থাকবি চিরদিন?

কিসের ছন্নছাড়া? জিজো গলার ভেতর বলল। আমি কি ড্রিংক করে রাতবিরেতে এসে মাতলামি করি?

ভারতী বেগতিক বুঝে বেরিয়ে গেলেন। জিজোর লক্ষ্য রুনু। রুনু রাতে মাতাল হয়ে ফেরে। মহুয়ার সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করে অকারণ। এ নিয়ে অনেকদিন ধরে চাপা অশান্তি আছে সংসারে।

চুমকি বারান্দায় থামের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল! ভারতী তেড়ে গেলেন।...তুমি এখানে কী করছ? তোমাকে না বলে এলুম কাপডিসগুলো ধুয়ে ফেলো!

চুমকি বলল, ধুয়েছি মাসিমা।

কৈ, কেমন ধুয়েছ—এস, দেখাও। ভারতী তাকে নিয়ে কিচেনে গেলেন। তারপর কাপডিস প্লেট খুঁটিয়ে দেখতে থাকলেন। তারপর চোখ মুখ লাল করে বললেন, এ কি ধোয়া হয়েছে? থাক, তোমাকে আর কিছু করতে হবে না। ভোমলাকে বলছি, আবার রাধার মাকে খবর দিক। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব নেই!

চুমকি সেগুলো আবার ধুতে যাচ্ছিল। ভারতী কেড়ে নিলেন। চুমকি একটু দাঁড়িয়ে থেকে সরে এল বারান্দায়। আজ জিজোর ঘরে বাজনা বাজছে। সে থামে হেলান দিয়ে শুনতে থাকল। গ্রিলের

ভেতর দিয়ে ওপাশের রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে। একটু পরে সে চমকে উঠল। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না চুমকি।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে এ বাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে গিরিপদ আর নোটন।

চুমকি চঞ্চল হয়ে উঠল।...মাসিমা ও মাসিমা। আমার বাবা এসেছে মাসিমা।

ভারতী কিচেন থেকে উঁকি মেরে ভুরু কুঁচকে বললেন, কী এসেছে?

বাবা, মাসিমা।

বলে চুমকি সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকল। ভারতী বারান্দায় এসে বললেন, বউমা! দুধটা চাপানো আছে। দেখ তো। তারপর গ্রিলের ভেতর দিয়ে দেখলেন, হ্যাঁ—সেই গিরিপদই বটে।

চুমকিকে দরজা খুলে বেরুতে দেখে নোটন বলল, আমি বললুম না কাকা, এই বাড়িটাই বটে। ভদ্রলোক মিছিমিছি ঘোরালেন।

চুমকি চোখে জল নিয়ে বাবাকে দেখছিল। গিরিপদ হাসছিল। চুমকি চোখ মুছে বলল, একটু দাঁড়াও আমি আসছি। তারপর সে দৌড়ে ভেতরে চলে গেল।

গিরিপদ বলল, কুঞ্জবাবুর ভাইরার বাড়ি আছে শুনেই বুঝেছিলুম—ভালই থাকবে। তবে বুঝলি নোটন, আমার কর্তাবাবুর বাড়ি দেখলে তুই চমকে যাবি। তার ওপর চিড়িয়াখানা একেবারে।

নোটন গলা নামিয়ে বলল, কেমন লোক গো বুধোর মাসিমারা? ভেতরে যেতে বলল না।

গিরিপদ হাসল।...কলকাতার লোক, বাবা নোটন। এনাদের রীতিনীতি অন্যরকম। এ কি তোমার কনকপুর পেয়েছ?

ওদিকে চুমকি কিচেনের পাশের ঘুপচি ঘর থেকে তার কিটব্যাগ গুছিয়ে নিচ্ছিল। ভারতী চুপচাপ ওকে দেখছিলেন! মহুয়া বলল, কী ব্যাপার চুমকি? হঠাৎ কোথায় যাচ্ছ এমন করে?

চুমকি বলল, বললুম না, আমার বাবা এসেছে। ওই দেখুন না, গেটের সামনে।

তুমি একেবারে চলে যাচ্ছ? আর আসবে না?

চুমকি হাসিমুখে বলল, দেখা যাক। মাসিমা, আমি যাচ্ছি। সে ভারতীর পা ছুঁতে হাত বাড়াল। ভারতী পা সরিয়ে নিয়ে বললেন, থাক, থাক।

চুমকি জিজোর ঘরে ঢুকে গেল।...জিজোদা। আমি যাচ্ছি।

জিজো বাদ্যযন্ত্র রেখে হাসিমুখে বলল, যাচ্ছ মানে?

বেরিয়ে দেখুন না, কে এসেছে।

কে।

বাবা।

জিজো কৌতূহলী হয়ে বেরিয়ে গেল ওর বাবাকে দেখতে। সিঁড়িতে নামার সময় বলল, তুমি হঠাৎ এভাবে চলে যাচ্ছ কেন চুমকি?

বাবা এসে গেছে যে। চুমকি শ্বাস-প্রশ্বাস মিশিয়ে বলল। বাবা আমাকে যেখানে নিয়ে যাবে, যাব। বাবার জন্যই তো কলকাতা এসেছিলুম।

গিরিপদ ও নোটন জিজোকে দেখছিল। চুমকি পরিচয় করিয়ে দিল। নোটন বলল, থামো, থামো। জিজোবাবুকে চেনাতে হবে না তোমাকে। আমাকে চিনতে পারছেন না জিজোবাবু?

জিজোর কিছু মনে নেই। একটু হেসে মাথা নাড়ল। তারপর গিরিপদকে বলল, আপনার মেয়ে এখানে আছে জানলেন কী ভাবে? আমি তো আপনার খোঁজে খুব হন্যে হয়েছি কয়েকদিন।

গিরিপদ বলল, বেনেপুকুরে লালবাড়ি বললেই হত। কর্তাবাবুর নাম প্রমোদরঞ্জন মিত্তির। খুব নামকরা লোক। নাচ গানের ওস্তাদ। বাড়িতে চিড়িয়াখানা পর্যন্ত।

জিজো বলল, প্রমোদ মিত্তির? বলেন কী? সে তো ইন্টারন্যাশনালি ফেমাস লোক।

আপনারা চিনবেন বৈকি। গিরিপদ বলল। শুনেছি খবরের কাগজে ওনার নাম ছাপা হয়। খুব দয়ালু লোক। উনিই তো বললেন, মেয়েকে নিয়ে এস গে। গাঁগেরামে রাখা উচিত নয়।

জিজো চুমকির দিকে তাকিয়ে চোখ নাচাল।...চুমকি, তোমার লাক ভাল।

চুমকি কিছু বলল না। বলল, আমি যদি কলকাতায় থাকি, মাঝে মাঝে মাসিমার সঙ্গে দেখা করে

যাব। বলবেন যেন মাসিমাকে।

গিরিপদ বলল, আপনিও যাবেন, বাবা। বুধোকে আপনি চিঠি লিখেছিলেন। তার কাছে খবর পেয়ে এই ঠিকানা নিয়ে এলুম। সময় হলে একবার যাবেন যেন এ বুড়োকে দেখতে।

জিজো মাথা দোলাল। ওরা তিনজনে রাস্তা ধরে হেঁটে চলেছে, জিজো তখনও দাঁড়িয়ে আছে। এতদিন চুমকি তাদের বাড়িতে ছিল। তার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয় নি। এখন তার মনে হল, বাড়িটা যেন ফাঁকা হয়ে গেল হঠাৎ। কী আছে ওই গ্রাম্য মেয়েটার মধ্যে? খুব চেনা কিছু আবিষ্কার করেছিল যেন তার মুখে।

প্রমোদ মিত্তিরের বাড়িতে থাকবে চুমকি। যদি বুদ্ধিমতী হয়, চান্সটা নেবে। জিজো আনমনে ভাবছিল। প্রমোদরঞ্জন এক সময় উদয়শংকরের দলে ছিলেন। পরে নিজের ব্যালেট্রুপ নিয়ে ঘুরেছেন। এখন কী করছেন, জানে না জিজো।...

চুমকির নবজীবন

মাস খানেক পরে একদিন হঠাৎ খেয়াল বশে জিজো প্রমোদরঞ্জনের বাড়ি গেল। পাড়ারও নামকরা লোক--বহুকালের বাসিন্দা মিত্র পরিবার। সবাই চেনে। তাই জিজোর অসুবিধা হয় নি খুঁজে বের করতে। প্রকাণ্ড গেটের মাথায় বুগানভিলিয়ার ঝাঁপি। মার্বেল ফলকে লেখা আছে 'ধ্রুপদী', তার তলায় 'সঙ্গীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্র।' গেটের ফাঁকে একটা সাদা ছোট্ট লোমশ কুকুরের মুখ উঁকি দিচ্ছিল। তাবপর কেউ কুকুরটাকে কোলে তুলে নিয়ে গেট খুলতেই জিজো দেখল চুমকি।

এক মাসেই চুমকির চেহারার সেই গ্রাম্য আদল ক্ষয়ে গেছে। ফুটে বেরিয়েছে নতুন জেল্লা। জিজোকে দেখে সে চঞ্চল হয়ে উঠল।...আপনি কী বলুন তো জিজোদা। তিন-তিনবার আপনাদের বাড়ি গেছি। আপনার দেখা পাইনি। বলেন নি মাসিমা?

জিজোব ভেতরে ঢুকে মনে হচ্ছিল জনহীন এক প্রেতপুরী। মাথা দুলিয়ে বলল, হ্যাঁ—শুনেছি। কিন্তু তোমাকে তো চেনা যাচ্ছে না। দারুণ স্মার্ট হয়ে উঠেছ।

জিজো হাসতে লাগল। চুমকি বলল, প্রথমবার বাবার সঙ্গে গিয়েছিলুম। পরের দুবার একা।

চিনতে পেরেছিলে?

কেন পারব না? চুমকি চোখে হাসল। কলকাতা আমার হাতের তলার মতো স্পষ্ট এখন।

বলো কী? জিজো ওব কুকুরটার দিকে তাকাল। ওটা কোথায় পেলে?

দোতলার দিকে চোখের ইশারা করে চুমকি বলল, বাবু কিনে দিয়েছেন। আমার খুব কুকুর পোযার সখ। কনকপুরে আমার একটা কুকুর ছিল। তার নাম রেখেছিলুম মণ্টু।

এর কী নাম রেখেছ?

মণ্টু। চুমকি খিলখিল করে হাসতে লাগল।

পুকুরের দিক থেক গিরিপদ এসে জিজোকে দেখে খুশি হল। মেয়েকে ধমক দিয়ে বলল, এই বোদে দাঁড় করিয়ে রেখেছিস ওনাকে? আসুন বাবা, ঘরে আসুন।

জিজোকে নিয়ে নিচেব তলায় একটা ঘরে ঢোকাল গিরিপদ। ওপর থেকে সেই সময় কেউ ভারি গলায় ডেকে বলল, চুমকি। অ্যাই চুমকি।

চুমকি জিভ কেটে বলল, এই রে। ভুলেই গেছি। তারপর সে কুকুরটাকে নামিয়ে রেখে হন্তদন্ত বেরিয়ে গেল। কুকুরটা নিজের পা শুঁকে সম্ভবত তার পেছন-পেছন দৌড়ুল। ও পাশের কাঠের সিঁড়িটা চুমকির পায়ের শব্দে মচমচ করছে শুনতে পেল জিজো।

তক্তাপোষে বিছানা পাতা আছে। ওপরে রঙীন সাধারণ ধরনের বেডকভার। জিজোকে সেখানে বসিয়ে গিরিপদ দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। খুশি খুশি মুখ করে বলল, কর্তাবাবুর বেজায় পছন্দ চুমকিকে। সব সময় খালি চুমকি আর চুমকি। একদণ্ড না হলে চলে না।

জিজো বলল, নাচ-টাচ কিছু শেখাচ্ছেন না?

গিরিপদ অবাক হয়ে তাকাল।...নাচ? বলে সে মাথাটা জোরে দোলাল। মেয়েছেলে নাচ শিখবে কী বাবা জিজো?

কেন? তোমার কর্তাবাবুর দলে তো মেয়েরা নাচে। দেখ নি? নাচ শিখতে আসে না?

আসে বৈকি। গিরিপদ একটু হাসল।...ওনারা সব বড়লোকের মেয়ে। ওনাদের সাজে।

তাহলে তোমারই আপত্তি আছে বলো।

গিরিপদ দুঃখিত মুখে বলল, বিয়ের যুগ্যি হয়েছে। ছেলে খুঁজছি। যামিনীকেও বলেছি। ওর কি নাচ শিখলে চলে, বলুন?

জিজো সিগারেট ধরিয়ে গিরিপদকে দিতে গেল। গিরিপদ সিগারেট খায় না। প্রত্যাখ্যান করে চাপা গলায় বলল, ভাল পাত্র আছে হাতের কাছে। সেই যে ছেলেটাকে আমার সঙ্গে দেখেছিলেন, মনে পড়ছে? কনকপুরের নোটন। তারও খুব পছন্দ। ফি সপ্তায় কলকাতা আসে একবার করে। দেখা করে যায়। কিন্তু ওদের বাড়ির—মানে ওর দাদার এতে মত নেই।

গিরিপদ কনকপুরের কথা বলতে থাকল। জিজোর কান নেই। চুমকির চেহারাটা মনের ভেতর ভেসে আছে। একটু পরে গিরিপদ তক্তপোষের তলা থেকে কেরোসিন কুকার বের করল।...চা করে দিই বাবাকে। খান।

জিজো বলল, না। থাক। আমি উঠি।

সেই সময় চুমকি এসে গেল।...জিজোদা, বাবু আপনাকে ডাকছেন।

জিজোর আগ্রহ ছিল প্রমোদরঞ্জনের সঙ্গে আলাপ করার। কিন্তু মুখে দ্বিধা ফুটিয়ে বলল, কেন?

আহা, আসুন না! আমি বাবুকে বললুম, হোটেলে গান করে। আমাদের কনকপুরে গান করেছিল। তখন বাবু বললেন, ডেকে নিয়ে আয়।

চুমকির তাগিদে শেষ পর্যন্ত ওপরে চলে গেল জিজো। বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসেছিলেন প্রমোদরঞ্জন। ফর্সা, লম্বাটে গড়নের মানুষ। শাদা ফুরফুরে একরাশ বাবরি চুল মাথায়। পরিষ্কার করে গোঁফদাড়ি কামানো। জিজোর মনে হল, চেহারায় কেমন যেন মেয়েলি আদল আছে। পুরুষ নাচিয়েদের যেন তাই থাকে। জিজো নমস্কার করলে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, হুঁ। বসো।

জিজো বসল একটু তফাতে একটা গদি আঁটা সেকেলে চেয়ারে। বলল, আপনি বিখ্যাত মানুষ। আমার নিজে থেকেই এসে আলাপ করা উচিত ছিল।

তুমি নাকি হোটেলে গান করো...প্রমোদরঞ্জন মুচকি হাসলেন। তারপর সোজা হয়ে বসে ভুরু কুঁচকে ফের বললেন, তুমি বলছি বলে খাপ্পা হচ্ছ না তো?

জিজো ব্যস্ত হয়ে বলল, না না।

পপসিঙ্গার? নাকি পাঁচমিশেলি গাও!

জিজো হাসল। আজ্ঞে না। জাস্ট পপ। নানা দেশের।

সেদিনকে গ্র্যাণ্ডে গিয়ে দেখলুম, ওরা আজকাল পপ উঠিয়ে দিয়েছে। গজল—কিঞ্চিৎ রাগপ্রধানও চলছে। তুমি কোন হোটেলে গাও?

মুনলাইট।

চিনি। প্রমোদরঞ্জন পান মুখে পুরে বললেন, তোমার নামটা কী যেন...

চুমকি থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে কথা শুনছিল। বলল, জিজো!

জিজো দ্রুত বলল, অনীশ মুখার্জি। তবে জিজো নামেই আমি পরিচিত।

একটা শোনাবে? আপত্তি না থাকলে।

আমার মুড নেই এখন। মুড না থাকলে এসব গান হয় না।

চা চা চা! প্রমোদরঞ্জন হো হো করে হাসতে লাগলেন। আমিও পারি মানে গাইতে নয়, নাচতে। চা চা চা ক্যানক্যান। হাওয়াইয়ান হুলা।...তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন, যত সব রাবিশ। দেশটার এতবড় কালচার ট্রাডিশান ছিল। অথচ যত রাজ্যের উচ্ছিষ্ট নিয়ে মেতে উঠেছে। তোমার রুচির প্রশংসা করতে পারলুম না বাপু। অগত্যা গজল শিখলেও তো পারতে।

জিজো মনে মনে বিরক্ত হয়ে বলল, পাবলিক যা চায়।

ড্যাম ইওর পাবলিক। তুমি যদি রিয়্যাল আর্টিস্ট হও, তুমি যা দেবে, তাই নেবে লোকে! আসলে আমাদের সময়ের মতো সেলফ কনফিডেন্স নেই তোমাদের।

জিজো উঠল।...আচ্ছা, নমস্কার। চলি!

হুঁ—রাগ হল তো? প্রমোদরঞ্জন আবার হো হো করে হেসে ফেললেন।...বসো হে বসো! তুমি জানো না, রিয়্যাল আর্টিস্টের এটাও মহৎ গুণ যে সে সবকিছু অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারে। মুখে বলছি বলেই কি ভাবলে যে আমি তোমাদের ভক্ত নই? মাঝে মাঝে আড়ালে দাঁড়িয়ে এনজয় করে আসি। তাই বলে নিজে ও লাইনে হাঁটতে রাজি নই—নেভার। বসো, চা খাও। চুমকি! দাঁড়িয়ে আছিস এখনও?

চুমকি দৌড়ে গেল ওপাশে। জিজোকে বসতে হল ভদ্রতার খাতিরে। কিন্তু লোকটাকে তার ইন্টারেস্টিং লাগছিল। ভেতরে ভেতরে এবার কৌতুক অনুভব করছিল সে।

প্রমোদরঞ্জন চাপা গলায় বললেন, সেদিন একটা থিয়েটার দেখতে ইনভাইট করেছিল। দেখি, বেলিড্যান্সেরও আইটেম জুড়ে দিয়েছে। ধুমসো একটা মেয়ে পেট বের করে নাচাচ্ছে। ক্যাড! পেটের মাসল দেখে মনে হল ভেতরে ইয়া মোটা মোটা কৃমিকীট আছে। রাগ করছ তো শুনে?

জিজো হাসল। না, বলুন।

শরীরের গড়নে সিমেট্রি থাকলে এভরিথিং ইজ অলরাইট। আমার কাছে যে সব মেয়ে নাচ শিখতে আসে আমি তাদের গড়নটা আগে দেখে নিই। গড়নে হেরফের থাকলে বলি, হবে না।

আপনার নিজস্ব দল নেই এখন?

মাথা নাড়লেন প্রমোদরঞ্জন। দল রাখতে হলে একরকম পলিটিকসে জড়িয়ে পড়তে হয়। যাক গে, একখানা শোনাও না! মুড আসেনি এখনও? নাকি যন্তর লাগবে? দেন—কাম উইথ মি।

প্রমোদবঞ্জন উঠলেন। তারপর জিজোর হাত ধরে টানতে টানতে হলঘরে নিয়ে গেলেন। বললেন, এই দেখ কতরকম যন্তর! কী মনে হচ্ছে?

জিজো বাদ্যযন্ত্রগুলো দেখছিল। সবই সাবেকী জিনিস। পিয়ানো, অর্গান, বেহালা, হারমোনিয়াম, সেতার, তবলা, খোল, ঢোলক—এইসব। পিয়ানোটা তার ভাল লাগল। একটু বাজাতেই প্রমোদরঞ্জন বললেন, অসাধারণ। চালিয়ে যাও!

জিজো ইচ্ছে করেই পপ বাজাচ্ছিল। বাজাতে বাজাতে ঘুরে প্রমোদরঞ্জনের দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে গান শুরু করল। দারুণ চটুল ইংরিজি গান। হল গমগম করে উঠল। প্রমোদরঞ্জন চোখ বুজে আঙুলে তুড়ি দিয়ে তাল দিচ্ছিলেন। হঠাৎ একেবারে উদ্দাম নৃত্য শুরু করলেন। জিজো অবাক। প্রমোদরঞ্জন, 'ক্যানক্যান'-এর ঢঙে নাচছেন। তারপর মুখে 'হুপ হুপ' আওয়াজ দিয়ে হঠাৎ হুলা নাচতে শুরু করলে সে থেমে গেল।

প্রমোদরঞ্জনও থামলেন।...কী হে? পারি না?

ওয়াণ্ডারফুল!

তোমাদের এসব জিনিস একবার দেখেই শেখা যায়। এর জন্যে তালিমের দরকার নেই।

জিজো আপত্তির সুরে বলল, না। বডি তৈরি করতে হয়।

সে তো অ্যাক্রোবেটিকসের ট্রেনিং! প্রমোদরঞ্জন একটা টুলে বসে ঘাম মুছে বললেন, কিন্তু আমি একটা ক্ল্যাসিকাল নাচছি...পারবে নকল করতে? ধরো—কত্থক।

চুমকি চা আনল। চায়ে চুমুক দিয়ে জিজো বলল, ওস্তাদজী। একটা কথা বলব?

তুমি আমাকে ওস্তাদজী বলে ফেললে হে!

আপনি তো ওস্তাদজী!

বেশ তাই। বলো, শুনি কী বলবে? হোটেলে তোমার গানের সঙ্গে ডাকবে কি?

চুমকি মুখে আঁচল চাপা দিল হাসি লুকোতে। জিজো হাসতে হাসতে বলল না, না আমি চুমকি সম্পর্কে বলছিলুম।

চুমকি সম্পর্কে? কী কথা হে?

ওর তো দারুণ ফিগার। ওকে নাচ শেখাচ্ছেন না কেন?

প্রমোদরঞ্জন চুমকির দিকে চেয়ে বাঁকা মুখে বললেন, ওর দ্বারা কিস্যু হবে না। ওর মাথায় কিছু নেই।

চুমকি দ্রুত বলল, বাবা রাগ করে যে। এখানে আসর বসে সন্ধ্যাবেলা। আমি যদি দরজায় উঁকি

মারতে আসি, বাবা ধরে নিয়ে যায়। বাবা তক্কে তক্কে থাকে। বলে কী, বাবু রাগ করবে। এখন যাস নে।

প্রমোদরঞ্জন চোখ পাকিয়ে বললেন, থাক। তোমার আর নেচে দরকার নেই। অকম্মার ধাড়ী কোথাকার!

চুমকি ক্ষুব্ধ হয়ে বেরিয়ে গেল। জিজো বলল, এবার আসি ওস্তাদজী!

প্রমোদরঞ্জন ওর কাঁধে হাত রেখে বললেন, খুব খুশি হলুম জিজো। তুমি মাঝে মাঝে চলে এসো সন্ধ্যার দিকে। ক্ল্যাসিক্যাল জিনিসের সঙ্গে পরিচয় হবে, দেখবে কী অসাধারণ ট্রাডিশান আমাদের ভাণ্ডারে আছে। আমরা নেগলেক্ট করছি। কারণ আমরা মেরুদণ্ডহীন ভৃত্যের জাত!

জিজো নিচে এসে দেখল চুমকি একটা লোকের সঙ্গে কথা বলছে। গিরিপদ প্রাঙ্গণের শেষদিকে ঘাস ওপড়াচ্ছে ফুলগাছের গোড়ায়। লোকটাকে চুমকি বলল, যাও তো কালুদা এখন। বাবুকে তুমি নিজে থেকে বলো। আমি ওসব পারব না। কামাই করেছ, মাইনে কাটা যাবে না?

লোকটা ব্যাজার হয়ে চলে গেল। চুমকি বলল, এবার আমাদের ঘরে কিছুক্ষণ না বসলে চলবে না জিজোদা। আসুন।

জিজো ওর কথা এড়াতে পারল না। ভেতরে গিয়ে বিছানায় বসল। বলল, ওস্তাদজী তোমাকে খুব লাইক করেন বোঝা গেল।

কী করে?

পছন্দ।

চুমকি একটু তফাতে বসল। কুকুরটা ওর দুপায়ের ফাঁকে দুঠ্যাং তুলে রইল। চুমকি তার মুখে হাত বুলোতে বুলোতে চাপা গলায় বলল, বাবুকে কেমন মনে হল?

দারুণ লোক। আর্টিস্টরা যেমন হয় আর কী?

চুমকি মুখ নামিয়ে আস্তে বলল, আমার এখানে থাকতে ইচ্ছে করে না।

সে কী! কেন?

এমনি।

জিজো সিগারেট ধরাল। তারপর ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি একটা দারুণ চান্স মিস করছ, চুমকি। বাবাকে রাজি করিয়ে এই সুযোগে যদি নাচ-টাচ শিখে নিতে, তোমার বরাত খুলে যেত। তোমার এমন সুন্দর চেহারা—এত ভাল ফিগার।

চুমকি হাসল।...ওসব বলবেন না। লজ্জা করে শুনতে।

জিজো সিরিয়াস হয়ে বলল, তোমাকে প্রথম দেখার সময় থেকেই ব্যাপারটা মাথায় ঢুকে গেছে। কিন্তু আমার পক্ষে কিছু করার নেই। এটাই ট্রাবল, চুমকি। যদি খানিকটা নাচতে টাচতে শিখতে, তাহলে...

কী?

ধরো, তুমি হোটেলে বা রেস্তোঁরায় নাচার চান্স পেতে। ভাল টাকা দেয় ওরা। রুবিনা বলে একটা মেয়ে আছে—তোমার চেয়ে একটু বয়স বেশি। তত সুন্দর নয়। কিন্তু আজকাল সে প্রচুর টাকা কামাচ্ছে।

নাচ করে?

হ্যাঁ—সেরফ নাচ। গাইতে পারলে তো আরও ভাল।

চুমকি সলজ্জ হেসে বলল, বাবার আপত্তি। কিন্তু আমি রোজ লুকিয়ে লুকিয়ে নাচ দেখতে যাই। বাবা যখন থাকে না, তখন ঘরের দরজা বন্ধ করে...

সে রাঙামুখে থেমে গেলে জিজো বলল, নাচো বুঝি? দারুণ কিন্তু ওস্তাদজীর কাছে বাবাকে লুকিয়ে শেখো না কেন?

চুমকি রাগী মুখ করে বলল, শেখাবে আমাকে? খালি যত খারাপ মতলব বাবুর। আমি বুঝি না।

জিজো চমকে উঠল।...খারাপ মতলব?

মাথাটা ওপরে নিচে দোলাল চুমকি। ফিসফিস করে বলল, বাবাকে যেন বলবেন না জিজোদা।

বাবুর ঘরে গেলে খালি আমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে আসবে। কী করব? সহ্য করে থাকি। বাবুর আসর ভাঙে রাত দশটায়। তখনও আমাকে চাই বাবুর। প্রথম প্রথম ওপরে থাকতুম। উনি শুলে তবে ছুটি আমার। পরে যখন বুঝলুম, তখন দশটা না বাজতেই শুয়ে পড়ি। ডাকাডাকি করলে বাবাকে বলি, বলো গে! ঘুমিয়ে পড়েছে।

জিজো অবাক হয়ে শুনছিল। অবশ্য বিখ্যাত ব্যক্তিদের রক্তমাংসের ক্ষিদে থাকা স্বাভাবিক। তাছাড়া আর্টিস্ট লোকেদের এমন একটু-আধটু ব্যাপার থাকতে পারে। কিন্তু চুমকির জন্য তার দুঃখ হচ্ছিল। ধোঁয়া ছেড়ে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে দিতে জিজো বলল, মুশকিল হচ্ছে যে তুমি বেশি লেখাপড়া শেখো নি। রুবিনার কথা বলছিলুম। তার লাইফেও এ ধরনের ব্যাপার ঘটেছে অনেক। আমাকে বলত একসময়। কিন্তু সে একে তো অ্যাংলোইণ্ডিয়ান মেয়ে—লেখাপড়া মোটামুটি জানে। হাই সোসাইটির লোকেদের ট্যাকল করতে পারে। তুমি তো গ্রামের মেয়ে। আই ফিল ফর ইউ—আমি...

চুমকি কথাগুলো আঁচ করতে পারছিল। কিন্তু গ্রাহ্য করল না। হঠাৎ ওকে থামিয়ে বলল, আমাকে হোটেলের নাচ দেখাবেন, জিজোদা?

দেখবে? বেশ তো। যেও।

আমি কি চিনি? আপনি নিয়ে যাবেন? চুমকি ষড়যন্ত্র সংকুল ভঙ্গিতে বলল, আপনি বাবাকে শুনিয়ে বলে যান, আপনার মা ডেকেছে—খুব দরকার! আমি ওবেলা একা যাব! বাবা এতে আপত্তি করবে না। ট্রামে চেপে চলে যাব আপনাদের বাড়ি।

জিজো একটু ভেবে বলল, ঠিক আছে। তুমি বরং এক কাজ করবে। ট্রাম স্টপে নেমেই সেখানে দাঁড়াবে। ঠিক পাঁচটা নাগাদ। আমি থাকব। না থাকলে অপেক্ষা করবে।

চুমকি মাথা দোলাল। তারপর বলল চলুন, বাবার কাছে যাই।

গিবিপদ প্রাঙ্গণে শিউলিগাছের ছায়ায় বসে জিরোচ্ছিল। জিজোকে দেখে একগাল হেসে বলল, আলাপ হল কর্তাবাবুর সঙ্গে? খুব মহাশয় লোক, বাবা। খুব দয়ালু লোক।...

রাতের দরজা

মুনলাইটের সেই ড্রেসিংরুমে জিজোর সঙ্গে চুমকিকে দেখে রুবিনা অবাক হয়ে গেল। জিজো পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, ফ্রেশ ফ্রম কাণ্ট্রি।

রুবিন মুখ টিপে হেসে বলল, কটেজ ইণ্ডাস্ট্রি। চমকতে রহে—ইস লিয়ে চুমকি। না গ্লিটারিং ওয়ান, রুবিনা।

রুবিনার হাতে গেলাসে রঙীন পানীয়। চুমকির ঘাড় বেড় দিয়ে বলল, চুমকি! ডু ইউ স্পিক ইংলিশ?

চুমকি এই পরিবেশে বিব্রত বোধ করছিল। জিজো বলল, ও ইংলিশ জানে না। কাণ্ট্রি গার্ল!

ওকে। রুবিনা বলল। দেন—তুমি হিন্দি সমঝেগি জরুর?

চুমকি এতদিন হিন্দিটা বুঝতে শিখেছে। তাকে প্রমোদরঞ্জনের পান জর্দা আনতে হয়েছে। লণ্ড্রি যাতায়াত করতে হয়েছে। আরও কত টুকিটাকি কাজে বেরিয়ে লোকের সঙ্গে কথা বলতে হয়েছে। সে ক্রমশ স্মার্ট হয়ে ওঠার চেষ্টা করছিল। বরাবর সে পরিবেশের সঙ্গে দ্রুত খাপ খাইয়ে নিতে পারে। বলল, কুছ কুছ!

ওরা হাসতে লাগল। রুবিনা বলল, থোড়াসা তো পিও ডার্লিং! জিজো, আবদুলকে বলো।

চুমকি জানে পানীয়টা মদ। কিন্তু টেম্পো বা নোটনদের পাল্লায় পড়ে দু-এক চুমুক না খেয়েছে এমন নয়। জিজো বলল, না, না। ওকে ভড়কে দিও না একদিনেই।

ইউ শাট আপ। আমি ওকে ট্রেনিং দেব। রুবিনা বলল। চুমকি! জেরাসে পি লো! কাম অন, কাম অন ডিয়ারি! ইউ আর সো বিউটিফুল অ্যাণ্ড চার্মিং! তুম ইতনি সুন্দর! সে ওর গালে চটাস করে চুমু খেল। চুমকি গাল মুছল সঙ্গে সঙ্গে।

আব্দুল রেড ওয়াইন দিয়ে গেল জিজোর কথায়। রুবিনা চুমকিকে গলা বেড় দিয়ে ওকে খাওয়াতে থাকল। চুমকি অবাক হয়ে টের পেল, এত সুন্দর স্বাদ হয় মদের। কনকপুরের মদ অত তেতো আর দুর্গন্ধ কেন?

কিছুক্ষণ পরেই তার আড়ষ্টতাটা পুরো কেটে গেল। বলল, আপনাকে রুবিনাদি বলব।

বোলো—বোলো! জুবিনা ওকে টেনে দাঁড় করাল।...লেকিন, তুমকো এক আচ্ছা ড্রেস পিনা চাহিয়ে। জুবিন, ম্যানেজারকে বোলো।

জিজো বলল আহা! ও কি নাচতে এসেছে?

শাট আপ! লেট মি সি হোয়াট হ্যাপনস! রুবিনা মেতে উঠল চুমকিকে নিয়ে। ঘরে ড্রেসিং টেবিল এবং প্রসাধন আছে। নানা ধরনের পোশাকও আছে। চুমকিকে হাতকাটা একটা জংলা ছাপের ঝলমলে নাইটি পরিয়ে কোমরে লাল নকশা কাটা ভেলভেটের চওড়া বেল্ট এঁটে দিয়ে বলল, দেখ, কি ম্যাজিক হয়ে গেল!

সত্যি ম্যাজিক। চুমকির চুলের ধাঁচও বদলে দিয়েছে। ঠোঁট লিপস্টিকের রঙে উজ্জ্বল। রুবিনাকে তার পাশে নিষ্প্রভ দেখাচ্ছিল যেন। জিজো মুগ্ধ হয়ে গেল। তারপর হাসতে হাসতে বলল, চুমকি। তুমি সত্যি নাচবে কি?

চুমকির মাথায় ওয়াইনের উত্তাপ। সে খালি হেসে অস্থির হচ্ছে। রুবিনা বলল, জুবিন! আস্তে করে একটু স্ট্রোক দাও তো! চুমকি, আমার সঙ্গে পা ফেলো। আঃ। ইধার দেখো—অ্যায়সা জার্কিং অ্যাণ্ড স্টেপিং! হাঁ—সে নাচতে শুরু করল।

চুমকি চেষ্টা করে বলল, ধুস! আমি অন্য নাচ জানি!

দেখাও!

চুমকি কত্থক দেখেছে প্রমোদরঞ্জনের আসরে। মণিপুরী দেখেছে। পর্যায়ক্রমে নেচে দেখাল এবং হাততালি পড়ল। সজ্জন সিং ঘরে ঢুকে দেখছিল। বলল, তো ফা! কুছ ওরিয়েন্টাল ভি হোনা চাহিয়ে। বহুত মজেদার হোগা। ভ্যারাইটি ইয়ার, ভ্যারাইটি!

চুমকির এই প্রগলভতা দেখে অবাক হচ্ছিল জিজো। ক্রমশ তার মাথায় একটা অদ্ভুত চিন্তা কাজ করছিল। ইনোসেন্স ভাঙার মধ্যে হয়তো যেমন নিষিদ্ধ সুখ থাকে, তেমনি হয়তো কিছু বিবেকদংশনও। জিজো ভাবছিল, এটা কি ঠিক হচ্ছে? রাতে শহর গ্রামের এই সরল বোকাসোকা মেয়েকে হাত বাড়িয়ে নিতে চাইছে। জিজো দেখল, চুমকি বার বার আয়নাতে নিজেকে দেখছে। নিজেকে যেন চিনে নিচ্ছে সম্ভাবনাসমেত।

জিজোকে আনমনা লক্ষ্য করে রুবিনা বলল, জুবিন! দেখছ? জিজোর মুখ গম্ভীর। ও ভাবছে ওর গার্লফ্রেণ্ডকে আমরা কেড়ে নিলুম। নিলেই বা! ওর অণ্টির দেশে কত মেয়ে। আবার একটা নিয়ে আসবে। এটিকে আমরা ছাড়ব না কিন্তু।

জুবিন আর তার দলের লোকেরা হেসে উঠল। চুমকি ব্যাপারটা টের পেয়ে একটু লজ্জিত হল। ওয়াইনের নেশা তাকে চঞ্চল করে। এক মুহূর্তের জন্য তার একটু অস্বস্তি লাগল। সে ধুপ করে বসে পড়ল। চাপা স্বরে জিজোকে বলল, এই! এবার আমি যাই। দিদিকে বলুন না, এগুলো খুলে নেবে।

জিজো হাসল। কেন? নাচবে না?

না। আমার ভয় করছে।

ঠিক আছে। দেখবে বরং চুপচাপ বসে।

ওরা ফিসফিস করে কথা বলছে দেখে রুবিনা তেড়ে এল।...তোমরা কি আমার নামে কিছু বলছ?

জিজো বলল, না। শি ইজ ফিলিং আনইজি। বাড়ি ফিরতে চাইছে।

রুবিনা চুমকির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দুহাতে জড়িয়ে শূন্যে তুলে কয়েকপাক ঘুরিয়ে নামিয়ে দিল চুমকিকে। চুমকি খিলখিল করে হাসছিল। রুবিনা বলল, দেখলে তো? আমি ওর স্প্রিং কোথায় জানি। চুমকি, এবার ইংলিশ শিখনা হোগি তুমকো। হাম শিখায়েগি। ইংলিশ নেহি শিখনেসে কেরিয়ার ক্যায়সে বানাওগি তুম? জিজো, ওকে রোজ আমার কাছে নিয়ে আসবে—এভরিডে ইন দা মর্নিং।

ডায়াসে নামার সময় হয়ে এল। কিন্তু চুমকি শেষ পর্যন্ত বেঁকে বসল। কিছুতেই যাবে না ডায়াসে। রুবিনারা চলে গেলে সে পোশাক বদলাতে পাশের ড্রেসিং কেবিনে ঢুকল। এখন তার মুখ একটু গম্ভীর। নিজের শাড়ি পরে বেরিয়ে এলে জিজো বলল ঠোঁটে লিপস্টিকের রঙ থেকে গেল যে? ওখানে বেসিনে ধুয়ে এস। সাবান আছে।

চুমকি আয়নায় দেখে নিয়ে বেসিনে মুখ ধুতে গেল। ফিরে এসে বলল, আর আছে?

জিজো মাথা দোলাল। তারপর বলল, হঠাৎ কী হল তোমার বলো তো চুমকি?

চুমকি সলজ্জ ভঙ্গীতে মুখ নামিয়ে বলল, কখনও টেজে নেচেছি নাকি? হুট করে...

এই! টেজ বোলো না ওদের সামনে। স্টেজ।

ইস্টেজ?

উঁহু, স্টেজ। জিজো হাসতে লাগল। এটা থিয়েটারের স্টেজ নয়। বার-কাম-রেস্তোঁরা আছে—তার সামনে একটা উঁচু জায়গা আছে। তাকে বলে ডায়াস। সেখানে নাচ গান হয় লোকেরা খাওয়া দাওয়া করে। ড্রিংক করে।

চুমকি কী ভাবতে ভাবতে বলল, আপনি কখন গাইবেন?

একটু পরে। ভেবো না। এর ফাঁকে তোমাকে বাসে তুলে দিয়ে আসব। আমাকে এখানে রাত দশটা অব্দি থাকতে হবে।

চুমকি আস্তে বলল, আমি ততক্ষণ থাকব। একা যেতে ভয় করবে।

এস, রুবিনার নাচ দেখবে। ব্যাপারটা আগে তোমার বোঝা দরকার।

চুমকি উঠল। তার মনে উত্তেজনা থমথম করছিল। ডায়াসের পেছনের দরজায় পা দিয়ে তার মনে হল সত্য মিথ্যায় একাকার একটা পৃথিবীতে হুট করে এসে পড়েছে। উঁকি মেরে দেখতে গেল সে।

চমকিত আবিষ্কার

রবীন্দ্র ভবনে অনুষ্ঠান ছিল। রাত নটায় শেষ হলে প্রমোদরঞ্জন চৌরঙ্গী হয়ে ফিরছিলেন। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। মুনলাইটের কাছে এসে ড্রাইভারকে বললেন, এখানে একটু রাখো তো পরাশর। আসছি।

অনেকদিন পরে মদ্যপানের ইচ্ছে হয়েছিল প্রমোদরঞ্জনের। তাই গাড়িতে ছাত্র-ছাত্রীদের কাউকে নেন নি। মুনলাইটেই যে ঢুকতেন, তা নয়। কিন্তু মুনলাইটের নিয়ন সাইন দেখে জিজোর কথা মনে পড়েছিল।

ভেতরে ঢুকে কোণার দিকে একটা খালি টেবিলে বসলেন। নীলাভ আলো সিগারেটের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। ছোট্ট ডায়াসে ম্যাক্সিপরা একটা মেয়ে কোমর দুলিয়ে প্রচণ্ড নাচছে। আরেকটি মেয়ে ইংরিজি গান গাইছে। বেজায় রকমের জগঝম্প গোছের বাজনা বাজছে। কানে তালা লেগে যাবার অবস্থা। বিরক্ত হলেন প্রমোদরঞ্জন। কিন্তু হুইস্কির অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে।

ওয়েটার এক পেগ হুইস্কি এনে দিলে চুমুক দিয়ে প্রমোদরঞ্জন ডায়াসের দিকে তাকালেন ফের। তারপর ভীষণ চমকে উঠলেন। অসম্ভব! নিশ্চয় ভুল হচ্ছে কোথাও। ইশারায় ওয়েটারকে ডেকে নিচু গলায় জিগ্যেস করলেন প্রমোদরঞ্জন, ক্যা নাম হ্যায় তুমহারা, ভাই?

ওয়েটার সেলাম দিয়ে বলল, জী আবদুল হক!

আচ্ছা আবদুল, উও যো লড়কি নাচ রহি, উও কোন হ্যায়?

সাব! আবদুল ওয়েটার নর্তকীদের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, উও যো গানা গাতি, উসকি নাম মিস রুবিনা! ঔর উও যো নাচ রহি, উসকি নাম মিস তুহিনা!

ঠিক হ্যায়, ভাই! প্রমোদরঞ্জন আশ্বস্ত হয়ে গেলাসে চুমুক দিলেন। ওয়েটার চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ ফের শিষ দিয়ে তাকে ডাকলেন। আবদুল। শুনো, শুনো ভাই!

কহিয়ে সাব!

হিঁয়াপর মিস্টার জিজোভি গানা গাতা হ্যায়?

জী, জী।

ঠিক হ্যায়! বলে প্রমোদরঞ্জন নর্তকীর দিকে তাকালেন ফের। ডায়াসে আলো উজ্জ্বল। কিন্তু কখনও লাল, কখনও সাদা, কখনও সবুজ ঝলকানিতে নর্তকী ও গায়িকা পরী হয়ে উঠছে। নাক মুখের আদল খুঁটিয়ে দেখা কঠিন। কিন্তু আশ্চর্য, চেহারায় এমন মিল! চুমকির কথা ভাবতে থাকলেন প্রমোদরঞ্জন।

মেয়েটা যেন চুমকির যমজ। অথচ চুমকির চেয়ে যেন অনেক বেশি সুন্দরী। এই প্রথম মনে হল প্রমোদরঞ্জনের। গিরিপদর মেয়েটাকে জোর করে নাচ শেখালে মন্দ হয় না। কী বলবে গিরিপদ?

এবার বাজনার সুর বদলে গেল। তালও বদলাল। তারপর কেউ বেমক্কা চেঁচিয়ে উঠল, চা চা চা। তখন দুটি মেয়েই উদ্দাম নাচ জুড়ে দিল। এ কি নাচ? কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী করে কামনা-টামনাকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা যেন। একটু পরে পরে প্রমোদরঞ্জন দেখতে পেলেন জিজোকে। হাতে স্পিকার নিয়ে সে সামনে এগিয়ে এল। নর্তকীদ্বয় নাচ শেষ করে চলে গেল ভেতরে। প্রমোদরঞ্জন মৃদু হেসে ওয়েটারকে ডাকলেন। ওয়েটার অর্ডার নিয়ে যাবার সময় বলে গেল, সাব! ইয়ে আপকা মিস্টার জিজো!

হ্যাঁ—জিজো। খুকখুক করে হাসতে লাগলেন প্রমোদরঞ্জন। তিনটে খালি চেয়ার এতক্ষণে ভর্তি হল। হিপি চেহারার সাহেব মেম, আর দাড়িওলা এক দিশী ছোকরা। একটু বিরক্ত হলেন প্রমোদরঞ্জন। কিন্তু উপায় নেই। ডায়াসের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কিছুক্ষণ পরে জিজোর গান শেষ হলে তার বয়সী এবং ফর্সা স্বাস্থ্যবান এক যুবক, চিবুকে দাড়ি, টুপি খুলে বাও করে ইংরেজিতে বলল, লেডিজ অ্যাণ্ড জেণ্টলমেন! এবার এক নতুন চমক আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। এই আশ্চর্য উজ্জ্বল সৃষ্টি আপনাদের উপহার দিতে পেরে আমরা খুশি। এই অনুষ্ঠানের নাচ তৈরি করেছেন আপনাদের প্রিয় শিল্পী মিস রুবিনা এবং বাজনায় অংশ আপনাদের বিনীত ভৃত্য এই জুবিনের।

হাততালি পড়ল। আবার উদ্দাম বাজনা শুরু হল। ডায়াসের আলো কমে গেল। তারপর প্রমোদরঞ্জন দেখলেন, চুমকির মতো দেখতে সেই মেয়েটি—মিস রুবিনার মূর্তি ফুটে উঠছে। বুকে একটা কাঁচুলি এবং নিম্নাঙ্গে ঝালরের মতো এক টুকরো আবরণ—বাকি শরীর নগ্ন। দুটো হাত দুদিকে ছড়িয়ে সে নাচতে শুরু করল। বিচিত্র ভঙ্গীতে তার কোমর দুলতে থাকল এবং পেট কুঞ্চিত হতে থাকল। প্রমোদরঞ্জন শরীরে উষ্ণতা টের পেলেন।

মুনলাইটে অনেকদিন আগে একবার এক বন্ধুর সঙ্গে এসেছিলেন। তখন গান-টান ছিল। কিন্তু ক্যাবারে ছিল না। ক্রমশ দেশের অবস্থা কত বদলাচ্ছে, তার নমুনা।

দ্বিতীয় পেগ শেষ করে আব্দুলকে বখশিস দিয়ে বেরিয়ে গেলেন প্রমোদরঞ্জন। বড় হোটেলে ক্যাবারে বা স্ট্রিপটিজও দেখেছেন বহুবার দেশে ও বিদেশে। কিন্তু মুনলাইটের মতো মাঝারি ধরনের হোটেলের এ ব্যাপারটা ভাবা যায় না।

বাড়ি ফিরে প্রমোদরঞ্জন অভ্যাস মতো ডাকলেন, চুমকি। ও চুমকি!

গিরিপদ তার ঘর থেকে বেরিয়ে বলল, ওর মাসিমাকে দেখতে গেছে, কর্তাবাবু, বলে গেছে, রাত্তিরে না ফিরতেও পারে। মাসিমার অসুখ।

প্রমোদরঞ্জন রেগে গেলেন।...রোজই মাসির বাড়ি। সকাল-দুপুর-রাত্রি সব সময়। একি ধর্মশালা?

গিরিপদ গুম হয়ে রইল।

প্রমোদরঞ্জন সিঁড়িতে পা রেখে বললেন, কালু! গেটে তালা বন্ধ কবে দে। চালাকি পেয়েছে সব? রাত দুপুরে যখন খুশি বাড়ি ফিরবে। রোসো, দেখাচ্ছি মজা!...

ঘুম থেকে উঠেই ভোরে আধ ঘণ্টা হেঁটে আসার অভ্যাস প্রমোদরঞ্জনের।

ফিরে এসে ছাদের ওপর কিছুক্ষণ যোগব্যায়ামও করেন। তারপর স্নান করে বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসেন। চুমকি চা নিয়ে আসে।

এদিন সে চা দিতে এলে প্রমোদরঞ্জন তার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন।

চুমকি একটু হেসে বলল, কী হল! অমন করে তাকালে আমার ভয় করে কিন্তু।

কাল তুই কোথায় ছিলি রাত দুপুর অব্দি?

বাবা বলে নি?

তুই নিজের মুখে বল।

বালিগঞ্জে মাসিমার খুব অসুখ যে!

হুঁ, কাছে আয় তো দেখি।

চুমকি পিছিয়ে গেল হাসতে হাসতে।...খালি ওই! যান্!

প্রমোদরঞ্জন গর্জে বললেন, কাছে আয়!

হুঁ—কাছে যাই, আর আপনি...

শাট আপ! কাছে আয়।

চুমকি বিব্রত মুখে দাঁড়াল। প্রমোদরঞ্জন হঠাৎ উঠে এসে খপ করে ওর একটা কান ধরে ফেললেন। চুমকি চেঁচিয়ে উঠল, আঃ! ব্যথা করছে। ছাড়ুন!

সন্দিগ্ধ ও অভিজ্ঞ প্রমোদরঞ্জন ওর কানের পেছনে মেক-আপের রঙ খুঁজতে চাইছিলেন। রাতে ঘুম ভাল হয় নি তাঁর। মিস তুহিনার চেহারাটা ভেসে উঠছিল বারবার। বুঝতে পারছিলেন না, এমন মিল কীভাবে সম্ভব হয়? অভিজ্ঞতায় তিনি জানেন, ফাংশানে কড়া মেক-আপ নিলে পুরোটা ধোয়া যায় না—স্নান করলে আলাদা কথা। তবু স্নানের পরও কানের পেছনে অনেক সময় চিহ্ন থেকে যায়।

চুমকির কান ছেড়ে দিয়ে ইজিচেয়ারে বসে পড়লেন প্রমোদরঞ্জন। চুমকি মুখ লাল করে দাঁড়িয়ে আছে। কানের রিঙটা খুলে গেছে। আটকে দিয়ে কপট কান্নার ভঙ্গী করে বলল, শুধু এরকম। আর আমি আপনার বাড়িতে থাকব না বলে দিলুম!

প্রমোদরঞ্জন গলার ভেতর ক্লান্তভাবে বললেন, থাকবি না তো বটেই। তবে তোর দোষ নেই। আমি তোকে আটকাতে পারব না। বড্ড দেরি হয়ে গেছে।

চুমকি মিথ্যা করে চোখ মুছে ভুরু কুঁচকে বলল, দিলেন তো রিঙটা বেঁকিয়ে।

নতুন কিনে নিবি।

হঠাৎ এই স্বরবদল লক্ষ্য করে চুমকি একটু চমকাল। কিন্তু চমক চেপে শান্তভাবে বলল, তাহলে টাকা দিন না!

কত লোক দেবে তোকে। প্রমোদরঞ্জন শুকনো হাসলেন। হীরের দুল বানিয়ে দেবে। জড়োয়া নেকলেস পরবি। মিস তুহিনা হয়েছিস। তোর আবার অভাব?

চুমকি নিষ্পন্দ হয়ে গেল। ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছিল সে।

প্রমোদরঞ্জন বললেন, কাল মুনলাইটে তোর নাচ দেখেছি। ন্যাংটো হয়ে নাচছিলি।

অমনি চুমকি ঘুরে দ্রুত সিঁড়ির দিকে হাঁটতে থাকল। প্রমোদরঞ্জন বোবা হয়ে গেলেন কিছুক্ষণের জন্য।

পুকুর পাড়ে খরগোস আর গিনিপিগের জন্য ঘাস কাটছিল গিরিপদ। মেঘ ভেঙে হালকা রোদ বেরিয়েছে। গায়ে ছায়া পড়লে ঘুরে দেখল, কর্তাবাবু গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে। সে কাঁচুমাচু হাসল।...চুমকিকে বকেছেন, ভাল করেছেন কর্তাবাবু। চিরটা কাল ওইরকম বেপরোয়া। কনকপুরে থাকতে তো আরও দুরন্ত ছিল।

প্রমোদরঞ্জন বললেন, সাধুবাবা! আর ঘাস-ফাস ছিঁড়ো না।

আজ্ঞে?

আজ্ঞে কী হে? তুমি তো শিগগির বড়লোক হয়ে যাচ্ছ। আর আজ্ঞেটাজ্ঞে কোরো না।

গিরিপদ বুঝতে না পেরে হতাশ ভাবে তাকাল। কোন দোষ করেছে নিশ্চয়। বলল, বোকা মেয়ে কর্তাবাবু। দোষঘাট করলে দুঘা মারবেন। তাতে আমার আপত্তি নেই।

মারব? বলো কী সাধুবাবা? প্রমোদরঞ্জন হা হা করে বিকট হাসলেন।...কদিন বাদে তোমার মেয়ের ছবি ছাপা হবে কাগজে। সাংবাদিকরা ইন্টারভিউ নেবে। তাকে আমি মারব?

গিরিপদ বেজার মুখে ঘাস কাটতে থাকল। চুমকির বড্ড বাড় বেড়েছে। অমন হুট করে যখন তখন 'মাসিমা'র নাম করে বেরিয়ে যায়। বলে, মাসিমা আমাকে এক সায়েবের বাড়ি আয়ার কাজ পাইয়ে দেবে। মাসে খাওয়া থাকা পরা এবং একশো টাকা মাইনে। গিরিপদর এতে অবশ্য সায় আছে। এখানে কর্তাবাবুর দুজনকে মাসে ষাট টাকা ঠেকিয়ে খালাস। ঠাকুরের হাতে রান্না খাওয়া যায় না। কোন বেলায় নিজেরাই রাঁধে। চুমকি যদি কাজটা পায়, গিরিপদ আর চাকরগিরি করবে না। বরং কনকপুরে ফিরে যাবে। চুমকি তাকে মাসে মাসে টাকা পাঠাবে। ভদ্রলোকের মেয়েরা কি চাকরি করছে না?

গিরিপদ মুখ তুলে দেখল, কর্তাবাবু তার দিকে কেমন চোখে তাকিয়ে আছেন। সে বলল, কিছু

বুঝতে পারছি না কর্তাবাবু। এমন কথা কেন বলছেন, কিছু মাথায় ঢুকছে না।

ন্যাকা? বুড়ো ভাম কোথাকার! প্রমোদরঞ্জন ছড়ি তুলে গর্জন করলেন। তোমার পেটে পেটে এত কাণ্ড, এদিকে সাধুর ভেক ধরে আছ!

গিরিপদর আঁতে ঘা লাগল। গম্ভীর মুখে বলল, দেখুন কর্তাবাবা! আমিও ভদ্রবংশের লোক। না হয় কপাল দোষে...

প্রমোদরঞ্জন তাকে থামিয়ে দিলেন।...লজ্জা করে না মেয়েকে হোটেলে ন্যাংটা নাচ নাচতে দিয়েছ?

হোটেলে? গিরিপদর হাত থেকে ঘাসগুলো পড়ে গেল। ফের বলল, নাচ?

প্রমোদরঞ্জন চাপা স্বরে শ্বাস-প্রশ্বাস জড়ানো গলায় বললেন, ছ্যা ছ্যা ছ্যা! আমার বাড়িতে একটা ক্যাবারে গার্ল থাকে জানতে পারলে দেশ জুড়ে টি টি পড়ে যাবে না? আমার কাছে কেউ নাচ শিখতে আসবে? সবাই ভাবছে, আমি আজকাল ন্যাংটো নাচ শেখাচ্ছি মেয়েদের। এ যে বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা হয়ে গেল।

গিরিপদ কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। ব্যাপারটা এতক্ষণে তার খানিকটা মাথায় এসেছে। কিন্তু চুমকি হোটেলে মাঝে মাঝে নাচতে যায়, এটা তার কাছে অবিশ্বাস্য লাগছিল। একে তো তার অভিজ্ঞতার মধ্যে রাতের কলকাতার ছিটে-ফোঁটা নেই, তার ওপর চুমকি নাচতে জানে—এও এক অসম্ভব কথা। তারপরই তার মনে পড়ল, ঘরের দরজা বন্ধ করে চুমকি যেন কী করত টরত। ধুপ ধুপ শব্দও সে শুনেছে। এই নাচের বাড়িতে থেকে রোজ নাচ দেখে চুমকির মেয়ে-স্বভাবের দরুন নাচবার ইচ্ছে তো হতেই পারে।

গিরিপদর আরও মনে পড়ল, জিজো বলেছিল, চুমকিকে নাচ-টাচ শেখাচ্ছেন না কেন। জিজো নাকি হোটেলে গান করে।

তাহলে ভেতর ভেতর একটা কিছু ঘটে থাকবে। ইদানীং মাসিমার কাছে যাচ্ছি বলে চুমকি প্রায়ই যখন তখন বেরিয়ে যেত। কর্তাবাবু তাকে খুঁজলে গিরিপদ মেয়ের হয়ে নানা ছলছুতো তুলে কৈফিয়ত দিত। কোনদিন বিকেলে বেরিয়ে ফিরত অনেক রাতে। গিরিপদ অস্বস্তিতে ছটফট করত। গেটে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত মেয়ের অপেক্ষায়। জিজো ট্যাক্সি করে তাকে নামিয়ে দিয়ে যেত। ভালমানুষ গিরিপদর মাথায় খারাপ কিছু ঢোকে নি। জিজোর মা কনকপুরে গেলে চুমকি তাঁকে ফুল দিয়ে আসত। ফুল বড় ভালবাসেন উনি। কাজেই ওনার চুমকির ওপর টান থাকতেই পারে।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে, ব্যাপারটা তাহলে অন্যরকম। ছোটবেলা থেকেই গিরিপদ তার মেয়েকে শাসন করতে পারে নি। এখন তো আর পারবেই না, তা সে জানে। সে ফোঁস ফোঁস করে নাক ঝেড়ে বলল, কর্তাবাবু কি আপন চোখে দেখেছেন, নাকি লোকের মুখে শুনেছেন?

চ্যাঁচামেচি এবং ক্রোধ প্রকাশের পর প্রমোদরঞ্জন ক্লান্ত। গলার ভেতর বললেন, কাল স্বচক্ষে দেখেছি, তোমার মেয়ে হোটেলে নাচছে। সেই জিজো না বিজো হারামজাদাই ওর এ সর্বনাশ করেছে। শোন গিরি, যা হবার হয়েছে। তোমার মেয়ে। তুমি হুকুম দাও, ওকে আটকে রাখব।

গিরিপদ এক নিঃশ্বাসে বলল, দিলুম।

ওকে আমি নাচ শেখাব। সত্যিকারের নাচ। ওর মধ্যে টেলেন্ট আছে।

আজ্ঞে। গিরিপদ হাল ছেড়ে দিয়ে বলল। আপনার আশ্রয়ে যখন আছে, তখন আপনি ওর মা-বাবা। ওর ভার আপনার ওপর ছেড়ে দিলুম।

প্রমোদরঞ্জন হাঁকলেন, অ্যাই চুমকি।...

জিজোর নৈরাশ্য

তারপর অনেকদিন আর চুমকির পাত্তা নেই। জিজো অস্থির। সে রাতে ট্যাক্সি করে বৃষ্টির মধ্যে চুমকিকে পৌঁছে দিতে যাবার সময় সে ঝোঁকের বশে তাকে চুমু খেয়ে ফেলেছিল। তাই কি রাগ করে চুমকি আর আসছে না? গ্রামের মেয়েদের সেন্টিমেন্ট অন্যরকম।

কিন্তু চুমকি তো বাধা দেয় নি। শুধু মনে হয়েছিল জিজোর, যেন চুমকি আশ্চর্য শীতল মেয়ে। ওর শরীরে যেন কোন অনুভূতি নেই। ড্রেসিংরুমে একদিন পোশাক বদলানোর সময় জিজো হুট

করে ঢুকে গিয়েছিল। চুমকি তখন প্রায় বিবস্ত্র। জিজো চলে আসছিল অপ্রস্তুত হয়ে। চুমকির কিন্তু গ্রাহ্য ছিল না। বলেছিল, জিজোদা! পিঠে সেফটিপিন আটকে গেছে। ছাড়িয়ে দাও তো। তারপর তার চোখের সামনে চুমকি রঙীন কাঁচুলি খুলে নিজের যেমন-তেমন ব্রেসিয়ারটা পরতে থাকল। জিজোর ইচ্ছে করছিল, ওকে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু লোভ সম্বরণ করেছিল। নিজের শরীর সম্পর্কে কেন এত অসচেতন চুমকি, জিজোর কাছে দুর্বোধ্য লাগে।

কয়েকদিন তাকে না দেখে জিজো বড্ড বেশি উতলা হয়ে উঠেছিল। সজ্জন সিং বলে, কোথায় গেল তোমার মিস তুহিনা? ওড়ার ট্রেনিং খতম হতে না হতে চিড়িয়া অন্য ডালে গিয়ে বসল নাকি, মিস্টার জিজো? এসব চিড়িয়ার স্বভাব আমার জানা আছে।

জিজো বুঝতে পেরেছে এবং আবদুলও আভাসে বলেছে, মুনলাইট বারে ভিড় বাড়ছে তুহিনার জন্য। কিন্তু যেদিন মিস তুহিনা থাকে না, সেদিন ক্রমশ ভিড় কমে যায়। যেদিন সে নাচে, সেদিন রাত দশটা বেজে গেলেও ওঠার নাম করে না মাতাল প্রেমকুড়ুনি লোকেরা। ওয়েটাররা গুঁতো মেরে বের করে দেয়। দারোয়ানও ডাকতে হয়।

এখন চুমকির দরকষাকষির সুযোগ। পাকাপাকি কণ্ট্রাক্ট করে নিতে পারত সজ্জনের সঙ্গে। কিন্তু সে আসছে না। আগের দিন রুবিনা চুপিচুপি বলছিল, একটা নাইট ক্লাবের অফার পেয়েছে। প্রচুর টাকার অফার। জুবিন তাকে নিষেধ করছে। নাইট ক্লাবে নাচার অনেক ঝামেলা আছে। কোটিপতি লোকের পাল্লায় পড়ে হাফিজ হয়ে যাবার চান্স আছে নাকি। তবে রুবিনার ইচ্ছে, কোন ফাইভস্টার হোটেলে সুযোগ পেলে চলে যাবে। যোগাযোগ করছে ভেতরে ভেতরে। কিন্তু জুবিনের মতো আজেবাজে অর্কেস্ট্রা তো ওরা নেবে না।

অস্থির হয়ে জিজো একদিন প্রমোদরঞ্জনের বাড়ি গেল।

ভেবেছিল গেটে চুমকির কুকুরটাকে প্রথমে দেখবে। তারপর চুমকিকে। কিন্তু তার বদলে একটা অচেনা লোক গেটের ফাঁকে মুখ বের করে বলল, কাকে চাই?

জিজো বলল, গিরিপদকে।

লোকটা হ্যা হ্যা করে হেসে বলল, গিরিবাবু? মানে আমাদের সাধুবাবা? সে বেরিয়েছে।

ওঁর মেয়েকে একটু ডাকো তাহলে। বলো, জিজোবাবু এসেছেন।

তার সঙ্গে দেখা হবে না।

সে কী! কেন?

কর্তাবাবুর বারণ আছে।

জিজো একটু হাসল। ঠিক আছে, তোমার কর্তাবাবুকে গিয়ে বলো আমার কথা।

উনি ব্যস্ত।

জিজো খাপ্পা হয়ে বলল, কী ব্যস্ত? গিয়ে আমার নাম করো।

এখন উনি নাচ শেখাচ্ছেন। কাছে গেলে রাগ করবেন।

জিজো ক্ষুব্ধ হয়ে রাস্তায় এল। আশ্চর্য তো! তারপর সে আঁচ করল, একটা কিছু ঘটেছে। সিগারেট ধরিয়ে সে আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকল। মোড়ে এসে তার চোখ পড়ল, গিরিপদ একটা লণ্ড্রির দোকান থেকে কাপড়ের প্যাকেট নিয়ে বেরুচ্ছে। জিজো ডাকল, গিরিকাকা!

গিরিপদ তাকে দেখে গম্ভীর হয়ে গেল। শুধু বলল, ভাল তো?

জিজো হাসিমুখে বলল, আপনার কাছে গিয়েছিলুম। মা বলল, অনেকদিন ওদের খবর নেই।...

গিরিপদ বলল, হুঁ। জানি। কাজটা আপনি ভাল করেন নি বাবা!

কী কাজ? জিজো চমকে উঠল।

গিরিপদ আস্তে বলল, আমার মেয়েটাকে সর্বনাশের পথে ঠেলে দিচ্ছিলেন, এটা উচিত হয় নি।

কী বলছেন গিরিকাকা!

যা বলছি, নিজেই ভাল বুঝতে পারছেন বাবা! গিরিপদ বাঁকা হাসল। গরিবের মেয়ে। লেখাপড়া জানে না। যেমন বোকা, তেমনি বেহায়ার হদ্দ। তাকে নষ্ট করতে তো বেশি সময় লাগে না।

গিরিপদ হাঁটতে থাকল বাড়ির দিকে। জিজো তার সঙ্গ নিয়ে বলল, নষ্ট করার কথা কী বলছেন?

ওকে হোটেলে নাচাতেন। এটা বুঝি ভাল? গেরস্থর মেয়েকে নাচানো খুব পুণ্যের কাজ বাবা জিজো! ধরুন, যদি তাই হয়—তাতে দোষটা কী? টাকাকড়ি রোজগার যদি হয়, খারাপ ভাবছেন কেন? এমন টাকাকড়িতে আমি পেচ্ছাপ করি!

জিজো থমকে দাঁড়াল। গিরিপদ হন হন করে চলে গেল। জিজো কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকার পর ঘুরে ট্রাম রাস্তার দিকে চলতে থাকল। এইসব গ্রাম্য লোকের নীতিবোধ ভারি অদ্ভুত। জিজো ভাবছিল। হয়তো চুমকির অবচেতনায়ও একই নীতিবোধ থেকে গেছে। তাই ঝোঁকের বশে অনেকটা এগিয়ে নিজেও পিছিয়ে গেছে এমনি করে। নৈলে তাকে যেমন বেপরোয়া মনে হয়েছিল, এভাবে প্রমোদরঞ্জনের বাড়িতে তাকে আটকে রাখা যেত না।

অথচ ট্যালেন্ট ছিল মেয়েটার মধ্যে। ওর নির্বিকার ও শীতল আচরণে পেশাদার নর্তকীর উপযুক্ত লক্ষণ আবিষ্কার করেছিল জিজো। রুবিনাকে ওই পেশাদারী শীতলতা এখনও মূল্য দিয়ে অর্জন করতে হচ্ছে। অথচ চুমকির মধ্যে তা সহজাত ছিল। সে খুব সহজে কামাতুর বা প্রেমিক পুরুষদের প্রতি শীতল চোখে তাকাতে জানে।

একটা প্রচণ্ড ভাইটালিটি যে চুমকির মধ্যে আছে, তাতে কোনও ভুল নেই। সে উন্নতি করতে পারত। জিজো তাকে ঠিকই চিনেছিল। হয়তো তার এ পরিণতির জন্য তার গ্রাম্য নীতিবাগীশ বাবা একা দায়ী নয়, খানিকটা সে নিজে এবং বেশিটার জন্য সম্ভবত ওই বুড়ো নাচিয়ে ভদ্রলোক।

প্রমোদরঞ্জনের ওপর খাপ্পা জিজো। ভদ্রলোক ভীষণ পার্ভার্টেড। চুমকি নিজেই বলেছিল এই ব্যাপারটা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালার মতো ওই বুড়ো যখেরই কি পাল্লায় পড়ল চুমকি?

জিজো একটা ট্যাক্সি করে সোজা ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে গেল।

গোমেশের পেয়িংগেস্ট থেকে রুবিনা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। জুবিনও বস্তি এলাকায় থাকতে চাইছিল না। মধ্যে কয়েকটা ফাংশনের চান্স পেয়ে মোটা টাকা কামিয়েছিল। ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে একটা টু রুম ফ্ল্যাট পেয়ে গেছে। চারতলা বাড়ির ছাদের অ্যাজবেস্টসের দুটো ঘর। রুবিনা আর জুবিন এখন একসঙ্গে আছে। কোনও এক সময় বিয়ে করে ফেলবে ওরা।

রুবিনা একা ছিল। জিজোকে দেখে বলল, কাম অন ম্যান! হেল্প মি।

কী ব্যাপার?

দেখছ না আমি এখন হাউস ওয়াইফ বনে গেছি?

দেখছি। বলে জিজো বসল।

রুবিনা কাপড় মেলে দিয়ে এসে বলল, তোমাকে অমন দেখাচ্ছে কেন জিজো?

জিজো হাসল।...তোমার মিস তুহিনার খোঁজে গিয়েছিলুম।

আমার না তোমার? রুবিনা তোয়ালেতে হাত মুছে উঁকি মেরে আকাশ দেখল। আকাশে বর্ষার মেঘ করে আছে। মাঝে মাঝে ঝলমলিয়ে উঠছে। বাতাস বইছে জোরে। ছাদের খোলামেলায় মেলে দেওয়া কাপড়গুলো খুব দুলছে। রুবিনা পাশে ভাড়া করা সোফায় শরীর মেলে বসে পড়ল। তারপর জিজোর কাঁধে হাত রেখে বলল, কী বলল ও? এনি মিস হ্যাপ?

ইয়া।

শুট, ম্যান!

জিজো ঘটনাটা বললে রুবিনা গম্ভীর মুখে উঠে গেল। টেবিলের ড্রয়ার থেকে সিগারেটের প্যাকেট এনে দুটো সিগারেট একসঙ্গে ধরাল। তারপর মুখে একটা জ্বলন্ত সিগারেট গুজে দিয়ে বসল।...জানতুম। কিন্তু দেখ জিজো, ওর জন্য আমিও ভেবেছি এবং অনেকটা এগিয়েছিও। সেকেণ্ড ফ্লোরে এক ভদ্রমহিলা থাকেন। স্কুল টিচার। ওঁর একজন আয়া দরকার। চুমকিকে আভাসও দিয়েছিলুম। ফাইনাল করার জন্য এবার ওর দরকার ছিল। মিসেস লিণ্ডার কাছে থাকলে ওর একটা চমৎকার লাভ হত। ইংলিশটা শিখে ফেলত। বলো তুমি?

এক্স্যাক্টলি।

ও শিগগির শিখে ফেলত কিন্তু। আমার বিশ্বাস।

আমারও। জিজো হেলান দিয়ে পা ছড়াল। আলস্যের ভংগী করে বলল, শেখবার ক্ষমতা ওর

অসাধারণ। কী দ্রুত বদলে যাচ্ছিল ভেবে দেখ।

ইয়া। রিয়ালি এ মেটামরফসিস। রুবিনা হাসতে লাগল।

জিজো একটু চুপ করে থেকে বলল, ছেড়ে দাও।

রুবিনা আনমনে বলল, ওর জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে। তারপর সে নড়ে বসল।...জিজো, সজ্জনকে বলে দেখ না, যদি সে কিছু টাকা খরচ করতে রাজি থাকে। সজ্জন কিন্তু চুমকির জন্য পাগল—তুমিও লক্ষ্য করেছ নিশ্চয়।

জিজো তাকাল তার দিকে।

রুবিনা ষড়যন্ত্রসংকুল স্বরে বলল, চুমকির বাবাকে টাকার লোভ দেখানো যায়। সজ্জনকে বলো।

আমার ধারণা এতে কাজ হবে না।

আহা, চেষ্টা করো না।

জিজো একটু হাসল।...কিন্তু প্রমোদ মিত্তিরকে সামলাবে কেমন করে? সে তো আটকে রেখেছে।

পুলিশকে বলবে চুমকির বাবা। সজ্জনের সঙ্গে পুলিশের বড়কর্তাদের যোগাযোগ আছে।

জিজো বলল, ঝামেলা। হিতে বিপরীত হয়ে যেতে পারে।

জিজোর পিঠে থাপ্পড় মেরে রুবিনা বলল, কাওয়ার্ড! তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না। আমি সজ্জনকে বলছি। আজই।

রুবিনা রেকর্ড প্লেয়ার চালিয়ে দিল। তারপর চোখে ঝিলিক তুলে বলল, কাম অন ম্যান। লেট আস ড্যান্স।

জিজোকে টানাটানি করে সে নড়াতে পারল না। তখন নিজে নাচতে শুরু করল। জিজো চোখ বুজে কল্পনা করছিল, চুমকি নাচছে। এই ফ্ল্যাটে রুবিনা আসার পর মাঝে মাঝে চুমকি এসেছে। রুবিনা তাকে নাচিয়েছে। এখন চুমকি থাকলে জিজো তার সঙ্গে নাচত।...

পুনরায় তালভঙ্গ

চুমকি তখন সত্যিই নাচছিল প্রমোদরঞ্জনের হলঘরে। অন্য নাচ। তার দুপায়ে একরাশ ঘুঙুর। প্রমোদরঞ্জন একবার ঢোলক, একবার পাখোরাজ, কখনও খোল, আবার কখনও তবলা বাজাচ্ছিলেন। মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে নেচে দেখাচ্ছিলেন। দুটো দরজাই বন্ধ ভেতর থেকে। আকাশে মেঘ জমেছিল। তারপর ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল। ঘরের ভেতর আবছা আঁধার জমল। প্রমোদরঞ্জন খুশি হয়ে অস্ফুট স্বরে বললেন, তোফা!

কার্পেটে ধপাস করে বসে পড়ল চুমকি। তারপর চিত হয়ে শরীর মেলে শুয়ে চোখ বুজল। বলল, ফ্যান ফুল করে দিন।

প্রমোদরঞ্জন ফ্যান ফুল স্পিডে দিয়ে তার পাশে বসলেন।...এ কী রে! ভিরমি খেয়ে পড়লি যে! হাসতে হাসতে বললেন।...এ তো তোমার হোটেল-কুর্দন নয়।

চুমকি চোখ বুজে থেকে আস্তে বলল, টায়ার্ড লাগছে!

উঁ? টায়ার্ড? বলিস কী রে? এ যে আধা খ্যাঁচড়া হল। ওঠ।

ঘুঙুর খুলে দিন। পা ব্যথা করছে।

ইশ! বাপের চাকর পেয়েছিস আমাকে? আমি তোর গুরু। আমাকে বলছিস ঘুঙুর খুলে দিতে?

আঃ, খুলে দিন না বাবা! আমার কষ্ট হচ্ছে।

প্রমোদরঞ্জন তার সুঠাম সুন্দর শরীরের দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর তাঁর মধ্যে আশ্চর্য একটা আবেগ জাগল। এক অসাধারণ নটীর রূপরেখা চোখের সামনে ভেসে আছে। বিহ্বলতা নিয়ে তিনি চুমকির পায়ে হাত রাখলেন। শিউরে উঠল তাঁর শরীর। যত্ন করে ঘুঙুর খুলে ফেললেন। তারপর আস্তে বললেন, তোর পাপ হল, চুমকি। তোকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, জানিস তো?

বাইরে ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। মেঘ ডাকছে। প্রমোদরঞ্জন গুনগুন করে মিঁয়াকী মল্লার ভাঁজতে ভাঁজতে চুমকির বুকের পাশে সরে এলেন। তারপর ওর বন্ধ চোখ দুটির ওপর আঙুল বুলিয়ে ডাকলেন,

চুমকি!

উঁ?

প্রমোদরঞ্জনের আঙুল ওর ঠোঁটে নামল। চুমকি আলতো হাতে সরিয়ে দিল। তারপর প্রমোদরঞ্জন তীব্র হঠকারিতায় ঝুঁকে ওর ঠোঁটে ঠোঁট রাখলেন। এবার চুমকি কিন্তু বাধা দিল না।

প্রমোদরঞ্জন আবেগে অস্থির হয়ে বললেন, চুমকি! জানিস? তোর মধ্যে আমার চিরকালের ভালবাসার নটীকে খুঁজে পেয়েছি। তুই আমাকে ছেড়ে চলে যাস নে চুমকি। আমি তোর মধ্যে বাঁচতে চাই।

চুমকির বুক স্পর্শ করলে সে চোখ মেলে তাকাল। বলল, এ কী হচ্ছে?

চুমকি, তোকে ভালবাসি।

চুমকি উঠে বসতেই প্রমোদরঞ্জন ওকে জড়িয়ে ধরলেন। চুমকি নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল।

কিন্তু প্রমোদরঞ্জন তখন উন্মত্ত। কিছুটা বিস্মিতও। একসময় কত যুবতী নর্তকী তাঁর প্রেম পেয়ে ধন্য হয়েছে, ঈষৎ আভাসেই আত্মসমর্পণ করেছে। অথচ এই আশ্রিত গ্রাম্য মেয়েটিকে তিনি আয়ত্ব করতে পারছেন না। তাঁর প্রেম যে কত দুর্লভ, তা এই নির্বোধ নর্তকীর বোধগম্য হচ্ছে না। তাঁর মাথায় জেদ চড়ে গেল। তিনি বলপ্রয়োগে উদ্যত হলেন। চুমকির হিংস্র চেহারা ফুটে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। সে প্রমোদরঞ্জনকে ধাক্কা মেরে চেঁচিয়ে উঠল, ন্না! ছাড়ুন! নৈলে আমি চ্যাঁচাব! ছেড়ে দিন আমাকে।

বেগতিক দেখে প্রমোদরঞ্জন নিবৃত্ত হলেন। হ্যা হ্যা করে হেসে বললেন, তুই একটা পাগলী! ইয়ার্কিও বুঝিস না?

চুমকি উঠে দাঁড়িয়ে কাপড় সামলাতে সামলাতে বলল, ইয়ার্কি? আপনার মতলব বুঝি না?

সে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। প্রমোদরঞ্জন বিভ্রান্ত হয়ে বসে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর আলো জ্বেলে দিলেন। ঘর অন্ধকার হয়ে উঠেছে। বাইরে প্রচণ্ড মেঘ ডাকছে। বৃষ্টি পড়ছে একটানা। ক্লান্ত প্রমোদরঞ্জন টলতে টলতে নিজের ঘরে গেলেন। হুইস্কির বোতল বের করলেন।

গিরিপদ নিচের ঘরের চৌকাঠের কাছে বসে বৃষ্টি দেখছিল। চুমকি ঘরে ঢুকলে সে বলল, আজ এরই মধ্যে হয়ে গেল? লেখাপড়াটা শিখতে পারিস নি। নাচগানের বিদ্যেটা যদি শিখতে পারিস, তাতেই কাজে হবে। মন দিয়ে শিখে নে। বড়লোকের মেয়েরা এত এত টাকা দিয়ে শিখতে আসে। আর তুই...

ঘুরে মেয়ের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল সে। চুমকি তক্তপোষে বসে ঝরঝর করে কাঁদছে।

গিরিপদ অবাক হয়ে বলল, কী হল? কর্তাবাবু বকেছে?

চুমকি জবাব দিল না।

গিরিপদ একটু হাসল।...একটু বকাঝকা না খেলে বিদ্যা হয় না রে। বাপের বয়সী লোক। শিখতে ভুল করলে যদি একটা থাপ্পড়ও মারে, খুব ভাল কথা। গুরুর হাতে প্রহার খেতে হয়।

চুমকি চোখ মুছে ভাঙা গলায় বলল, আমি আর এখানে থাকব না। থাকতে হয়, তুমি থাকো!

সে কী? কোথায় যাবি?

আয়ার কাজ বলা আছে এক জায়গায়। মাসে একশো টাকা মাইনে দেবে। সেখানে যাব।...চুমকি উঠে তার কিটব্যাগটা টেনে বের করল তক্তপোষের তলা থেকে। তারপর দড়ির আলনা থেকে তার কাপড়চোপড় টেনে কিটব্যাগে ভরল।

গিরিপদ হাঁ করে তাকিয়ে আছে। নড়ে উঠল এবার।...এখন কোথায় যাবি? তোর মাথা খারাপ হয়েছে? অ্যাই চুমকি! করছিস কী?

চুমকি তাকে আরও হকচকিয়ে দিয়ে একটা মানি ব্যাগ বের করল। কয়েকটা দশটাকার নোট গিরিপদের হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, বাবু যদি তোমাকে তাড়িয়ে দেয়, সোজা কনকপুরে চলে যেও। আমি মাসে মাসে টাকা পাঠাব। আমার জন্যে ভেবো না।

গিরিপদ নোটগুলো মুঠোয় ধরে তাকিয়ে রইল ওর মুখের দিকে। তারপর চুমকি বৃষ্টির মধ্যে প্রাঙ্গণে নামলে সে ভাঙা গলায় ডাকল, চুমকি!

চুমকি ঘুরে বলল, ওই যাঃ। কুকুরটাকে চেনে বেঁধে রেখে এসেছি ওপরে। এনে দেবে?

গিরিপদ সে কথায় কান করল না। চেরা গলায় নিষ্ফল গর্জন করল, চুমকি! ভাল হবে না বলছি।

চুমকি দৌড়ে গেটের দিকে চলে গেল। তারপর সে গেট খুলে বেরিয়ে গেলে গিরিপদ হন্তদন্ত হয়ে ওপরে গিয়ে হাঁফাতে হাফাতে বলল, কর্তাবাবু। কর্তাবাবু। চুমকি চলে গেল। দেখুন দিকি কাণ্ড— এই বিষ্টির মধ্যে!

প্রমোদরঞ্জন মদ্যপান করছিলেন। ভেতর থেকে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বললেন, তা আমি কী করব? বুড়ো ভাম কোথাকার। তুমিও যাচ্ছ না কেন? গেট আউট!

গিরিপদ একটু দাঁড়িয়ে থাকার পর নেমে গেল।...

পাঁচ বছর পরে একটি সাক্ষাৎকার

'আপনি কী ভাবে এ লাইনে এলেন, বলুন মিস মালা?'

'লাইন? হোয়াট ডু ইউ মিন বাই লাইন?'

'মানে এই নাচ টাচের কথা বলছি।'

'দ্যাটস এ সিলি ওয়ার্ড। আই ডোন্ট লাইক দ্যাট। এ কি আর্ট নয়?'

'হ্যাঁ—আর্ট তো বটেই। কিন্তু...'

'কিন্তু কী? দেখুন মিস্টার, এই এক অদ্ভুত বিচারবোধ আপনাদের। একজন রাইটার যখন নভেলে সেক্স নিয়ে পাতার পর পাতা লেখেন, তাকে সোসাইটি অচ্ছ্যুত করে না। কিন্তু একজন নর্তকী তার সুন্দর বডির লালিত্য ছন্দে ফুটিয়ে তুললে ইউ হেট হার। ন্যুড স্কাল্পচারকে বলবেন দারুণ আর্ট, অথচ একটি জলজ্যান্ত মেয়ের শরীরের ভংগীকে বলবেন অশ্লীল!'

'ক্যাবারে গার্লদের ব্যাপারটা...'

'ওয়েট। কেন আপনি ধরে নিচ্ছেন ক্যাবারে গার্ল বেশ্যাবৃত্তি করে? যদি কেউ করেও তবু বেশ্যাবৃত্তি আর্ট নয়। তবে যে নেচে টাকা পায়—প্রচুর টাকা, সে শরীর বেচবে কেন? আমি আর্ট বেচে খাই। আর্ট বেচে আরও অসংখ্য লোক খায়। তাদের পুরস্কৃত করা হয়। তাদের স্ট্যাচু তৈরি কের রাখা হয়। সোসাইটিতে তারা গণ্যমান্য মহাপুরুষ। আর আমি ক্যাবারে গার্ল বলে ঘৃণ্য জীব!'

'প্লীজ!'

'মেয়েদের ডিটেলস শারীরিক বর্ণনা দিয়ে পোয়েট্রি লিখলে তিনি সম্মানিত কবি। কিন্তু সেই বর্ণনাকে আমি লিভিং করে তুললে আমি অপরাধী। অথচ বলুন, পোয়েট্রিকে শরীর দিয়ে প্রকাশ করলে তাতে কি অন্য ডাইমেনশান আসে না?'

'এসব নিয়ে আপনি ভাবেন জেনে ভাল লাগছে।'

'সাধে কী ভাবি? অপমানে, দুঃখে, রাগের জ্বালায়।'

'আসলে মানুষ এখনও শরীরকে সহজভাবে নিতে শেখে নি। যাক এসব কথা। আপনি নাচের লাইনে এলেন কী ভাবে?'

'আগে থেকে কিছু ঠিক ছিল না। স্বপ্নেও ভাবিনি আমি নাচব। পাকে চক্রে আম নর্তকী হয়ে উঠেছিলুম।'

'একটু ডিটেলসএ বলুন, প্লিজ।'

'অনীশ মুখার্জি নামে একটি ছেলের সঙ্গে ঘটনাচক্রে আমার আলাপ হয়। সে হোটেলের পপসিঙ্গার ছিল। দারুণ গাইত। সে আমার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল, আমার ফিগার নাকি ড্যান্সারের।'

'সে এখন কোথায়?'

'জানি না। তার সঙ্গে তিন বছর আমার আর দেখা নেই।'

'আপনার জন্মস্থান কোথায়?'

'গ্রামে। মুর্শিদাবাদ জেলায় কনকপুরে।'

'আপনার বাবা-মা কি বেঁচে আছেন?'

'মা ছোটবেলায় মারা যান। বাবা বেঁচে আছেন। গ্রামেই থাকেন। বাবার একটু সাধুসন্ন্যাসীর বাতিক

ছিল বরাবর। কনকপুরের বাড়িতে মন্দির করে দিয়েছি। আশ্রমের মতো পরিবেশ। বাবা ধর্ম নিয়ে কাটান।'

'আপনার প্রফেশনের জন্য গ্রামের সমাজে তাঁর কোন প্রব্লেম হয় না?'

'সঠিক জানি না। গ্রামে আমি অনেক বছর যাই নি। বাবা যাতায়াত করেন। টাকাকড়ি দিই নিয়মিত। তবে বাবার কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারি, গ্রামেরও অবস্থা বদলেছে। আজকাল কেউ আমাকে নিয়ে মাথা ঘামায় না। প্রত্যেকেরই প্রব্লেম বেড়ে গেছে তো!'

'কিছু মনে না করলে আপনার শিক্ষাদীক্ষার কথা বলুন প্লিজ?'

'দেখুন, বরাবর আমি সব ব্যাপারে ফ্র্যাংক। তত কিছু লেখাপড়া শেখার সুযোগ পাই নি। অনিবার্য কারণে ক্লাস ফোরেই পড়াশুনা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।'

'আশ্চর্য আপনি তো মেমসাহেবদের মতো ইংরিজি বলেন।'

'তাই বুঝি? ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে এক অ্যাংলোইন্ডিয়ান ফ্যামিলিতে প্রায় একবছর আয়ার কাজ করেছিলুম। বাড়ির কর্ত্রী ছিলেন স্কুল টিচার। মেয়ের মতো স্নেহ করতেন। ওঁর বাচ্চাকাচ্চা ছিল একদঙ্গল। যতক্ষণ উনি স্কুলে থাকতেন, আমি ওদের দেখাশুনা করতুম। বিকেলে আমাকে উনি স্পোকেন ইংলিশ শেখাতেন। ভদ্রমহিলা ছিলেন খুব উদার মনের মানুষ। তখন আমি রেগুলার একটা বার-কাম-রেস্তোরাঁয় প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যা ছটা থেকে রাত দশটা-অব্দি নাচি। কিন্তু উনি আপত্তি করতেন না। অবশ্য রুবিন.. মিস রুবিনার নাম শুনেছেন কি?'

'না তো। কে তিনি?'

'সেও একজন ক্যাবারে গার্ল। জুবিন নামে এক মুসলিম অর্কেস্ট্রা কন্ডাক্টারকে বিয়ে করেছিল। রুবিনা আমাকে যত্ন করে পপ ড্যান্স শেখাত। চা চা চা, হাওয়াইয়্যান হুলা, ক্যানক্যান এসব। পরে রুবিনা আর জুবিনের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। রুবিনা থাকত ওপরকার ফ্ল্যাটে। জুবিন চলে গেলে আমি রুবিনার সঙ্গে থাকতুম। আয়ার কাজ ছেড়ে দিয়েছিলুম। তারপর একটা মিসহ্যাপ হল। একটা ফিল্মপার্টির অফার পেয়েছিল রুবিনা। উঁচু স্টেজের ওপর নাচের সিন। ডাইরেক্টার ছিল ফুলিশ হামবাগ। রুবিনা বিশফুট উঁচু পাটাতনের ওপর থেকে পড়ে যায়। পা স্লিপ করেছিল। মাথার পেছনে ক্র্যাক হয়ে যায়। হসপিটালে মারা যায় রুবিনা। ওঃ। আই কান্ট ফরগেট দ্যাট হরিবল ডেথ! এ নাইটমেয়ার!'

'হ্যাঁ, তারপর?'

'ফ্ল্যাট ছিল রুবিনার নামে। তাই আমি বিপদে পড়লুম। জিজো ল্যান্ডলর্ডকে ধরলেও ফল হল না।...

'জিজো কে?'

'ও! অনীশ মুখার্জী।'

'বলুন।'

'ল্যান্ডলর্ড যদি আমার নামে ফ্ল্যাটটা দিত, আমার জীবন হয়তো অন্যরকম হয়ে যেত। জিজোর সঙ্গে আমার বিয়ে হতে পারত। জিজো আমাকে ভালবাসত। এবং...

'আপনি?'

'আমিও তাকে ভীষণ ভালবাসতে শুরু করেছিলুম।'

'বিয়েতে বাধা কিসের ছিল?'

'বলছি। সেই সময় এক ফাইভস্টার হোটেলের মালিকের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। ভদ্রলোক একজন অ্যাংলোইন্ডিয়ান। উনি আমাকে অনেকদিন ধরে সাধছিলেন ওঁর হোটেলে নাইট ক্লাবে নাচার জন্য। জিজোর আপত্তি থাকায় আমি রাজি হইনি। থাকার প্রব্লেম এলে তখন বাধ্য হয়ে ওঁর শরণাপন্ন হলুম। জিজোই নিয়ে গেল। উনি প্ল্যাডলি ওঁর ক্যামাক স্ট্রিটের বিরাট বাংলো অফার করলেন। সেখানে গিয়ে আমার জীবন একেবারে বদলে গেল।'

'কীভাবে বদলে গেল?'

'প্রচন্ড আর্থিক সচ্ছলতা তো বটেই, মর্ডান লিভিং আমাকে গিলে খেল। এয়ারকন্ডিশনড ঘর, কার্পেট, গাড়ি। আমি গরিব ঘরের মেয়ে। গ্রামের মেয়ে। আমি ভেসে গেলুম। তাছাড়া তখন বুদ্ধিও

খুব কাঁচা। আমি রোনাল্ডের হাতের পুতুল হয়ে গেলুম। রোনাল্ড কথা দিয়েছিল, জিজোকেও সে হোটেলে সিঙ্গার হিসেবে ভাল টাকা দিয়ে নেবে। নিল না। বলল, হি ইজ এ ফোর্থ গ্রেড সিঙ্গার। মুনলাইটে চলতে পারে। তারপর সে বাংলোর দারোয়ানদের দিয়ে জিজোকে অপমান করল। আমার কাছে আসা বন্ধ করে দিল জিজো।'

'আপনি প্রতিবাদ করেন নি?'

'জানতুম না। তাছাড়া ক্রমশ—ওই যে বললুম, আমি জিজোর কাছ থেকে মনের দিক দিয়ে দূরে সরে যাচ্ছিলুম। নিশ্চয় এ আমার অকৃতজ্ঞতা। পাপ। আই হেট মিসেলফ! আই রিপেন্ট!'

'তারপর?'

'রোনাল্ডকে কি ভালবেসে ফেলেছিলুম? জানি না। সে প্রায় আমার দ্বিগুণ বয়সের লোক। কিন্তু তার মধ্যে নির্ভরতা দেখতুম। নিরাপত্তা অনুভব করতুম। সে আমাকে যথেচ্ছ স্বাধীনতা আর টাকাকড়ি দিত—কন্ট্রাক্টের বাইরেও প্রচুর টাকা দিত। তার বন্ধুরা ছিল কলকাতার বড় বড় নামকরা লোক। তারা নাইট ক্লাবের মেম্বার। আমি তাদের সামনে নগ্ন হয়ে নাচতুম। তারপর ক্রমশ সব খারাপ লাগল। নাচকে আর্ট হিসেবে নিয়েছিলুম। কিন্তু যখন ক্রুড রিয়্যালিটি ফেস করতে হল, তখন বেরবার পথ খুঁজলুম। আপনি তো জানেন, থিয়েটার বা ফিল্মে ক্যাবারে ড্যান্সের দরকার হয়। ঠিক করলুম, স্বাধীনভাবে এই প্রফেশান বেছে নেব এবং হোটেল বার নাইট ক্লাবের পরিবেশ ছেড়ে বেরিয়ে যাব।'

'গেলেন শেষ পর্যন্ত?'

'হ্যাঁ। রোনাল্ড আমার পেছনে গুন্ডা লাগিয়েছিল, জানেন?'

'বলেন কী!'

আমি মানিকতলায় একটা ফ্ল্যাট যোগাড় করেছিলুম। এই এলাকার থিয়েটারে একটা ড্রামা চলছিল। রেগুলার নাচি একটা সিকোয়েন্সে। এক রাতে বেরিয়ে গাড়িতে উঠেছি, চার-পাঁচজন মস্তান সামনে দাঁড়াল। হয়তো আমাকে মার্ডার করাই উদ্দেশ্য ছিল। ড্রাইভার ছিল খুব সাহসী। তাদের ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দিল স্পিডে। ওরা ছিটকে গেল দুধারে। বোমা মারল। গাড়ির পেছনে লাগল। তাতে কোন ক্ষতি হয় নি। পরে পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা হয়েছিল।'

'এ ফ্ল্যাটে কতদিন এসেছেন?'

'মাস ছয়েক হল প্রায়। এই ফ্ল্যাটটা আমি কিনেছি।'

'আপনার কুকুরটা বেশ সুন্দর তো!'

'ও! এ আমার ছোটবেলা থেকে হবি। এর নাম কি জানেন? মন্টু। ব্যাপারটা ভারি মজার। গ্রামে থাকতে আমার একটা দেশী কুকুর ছিল। তার নাম ছিল মন্টু। যখন কলকাতা চলে এলুম, তখন বেচারা কীভাবে ট্রেনে কাটা পড়ে। খবর অনেক পরে পেয়ে খুব কান্নাকাটি করেছিলুম। যাঁর বাড়িতে থাকতুম, তিনি খুব নাম করা লোক। তিনি আমাকে স্নেহ করতেন। একটা কুকুর কিনে দিয়েছিলেন। তাকেই মন্টু বলতুম। তারপর তো ওঁর বাড়ি থেকে চলে আসতে হল। কুকুরটা ওখানে রয়ে গেল। জানি না সে বেঁচে আছে কি না। এই কুকুরটা কিনে দিয়েছিল রোনাল্ড। একে কিন্তু ছেড়ে আসি নি।'

'মিস মালা, মূল প্রশ্নটা ছেড়ে এসেছি। নাচের ফিগার থাকলেই তো হয় না। নাচ শিখতে হয়। আপনি কি রুবিনার কাছেই নাচ শিখেছিলেন?'

'আপনি একটু মুশকিলে ফেললেন।'

'বলতে আপত্তি আছে?'

'না। বলতে তো ইচ্ছেই করছে। কিন্তু আমি চাই না কারুর নামে স্ক্যান্ডাল রটুক। কারণ আপনিতো এসব কথা পত্রিকায় ছাপবেন। রেকর্ড করে নিচ্ছেন টেপে।'

'ঠিক আছে। নাম গোপন করেই বলুন।'

'না। আপনি টেপ বন্ধ করুন। অফ দা রেকর্ড বলব। যদি ছাপেনও, অস্বীকার করব।'

'অলরাইট। বন্ধ করছি টেপ। হুঁ, এবার বলুন।'

'প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী প্রমোদরঞ্জন মিত্র আমার প্রকৃত গুরু।'

'বলেন কী! এই তো কিছুদিন আগে মারা গেলেন উনি।'

'হ্যাঁ। অসুস্থ অবস্থায় থাকার সময় একদিন ওঁকে দেখতে গিয়েছিলুম নার্সিংহোমে। প্রথমে তো চিনতেই পারলেন না। পাঁচ বছর পরে গেছি। তারপর যখন চিনলেন, তখন ওঁব চোখ দিয়ে নিঃশব্দে জল পড়তে লাগল। ঘরে তখন কেউ ছিল না। আমাকে কাছে বসতে বললেন। আমার একটা হাত নিয়ে বুকে রাখলেন। বললেন, জানিস চুমকি? তোর নাচ দেখতে যেতুম রেগুলার! মুনলাইট বাবে, তারপর হোটেলে রোনাল্ডের নাইট ক্লাবে। কতবার তুই আমার পাশ দিযে নেচে গেছিস, আমি তোকে ছুঁয়েছি। তুই আমায় চিনতে পারিস নি। চুমকি, আমার ইচ্ছে করছে, মৃত্যুর সময় তোর নাচ দেখি—নগ্ন হযে তুই নাচবি..'

'বলুন!'

'এক্সকিউজ মি। এমোশনাল হয়ে পড়েছি।'

'চুমকি কি আপনাব ডাকনাম?'

'হ্যাঁ।'

'তারপর আপনি কী বললেন ওঁকে?'

'আমি কী বলব? আমার কষ্ট হচ্ছিল। শেষে বললুম, মৃত্যুর কথা ভাবছেন কেন? বেঁচে থেকে আমাব নাচ দেখবেন। আপনার সেই নাচ-ঘরে আমি নেচে আসব। উনি বললেন, আর কি ফিবে যেতে পাবব?'

'প্রমোদবঞ্জনেব সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ হল আপনার?'

'বাবা গ্রাম থেকে চলে এসে ওঁব বাড়িতে কাজ কবতেন। সেই সূত্রে আমাকেও সেখানে নিযে যান। প্রমোদরঞ্জনের বাড়ির হলঘরে নাচের ক্লাস হত। আমি সব দেখতুম। দিনেব পব দিন দেখে দেখে আমার ইচ্ছে করত নাচতে। তখন ঘরের দরজা বন্ধ করে নাচতুম। সে ছিল ক্ল্যাসিকাল ডান্স। পরে প্রমোদবঞ্জন সব টের পান। তখন আমাকে তালিম দিতে শুরু কবেন। সন্ধ্যায বড়লোকের মেয়েবা আসত তামিল নিতে। তাই আমাকে শেখাতেন সকাল থেকে দুপুর অব্দি। হলঘবেব দবজা বন্ধ কবে শেখাতেন। প্রথমে বাজাতেন। আমি তালে তালে পা ফেলতুম। তাবপব উঠে এসে নিজে নাচতেন। মুখে বোল বলতেন। আবাব ছুটে গিয়ে খোল বা পাখোয়াজ নিয়ে বসতেন। আমি ক্লান্ত হযে পড়তুম। কখনও শুয়ে পড়তুম মেঝেতে। উনি আমাকে এত ভালবাসতেন ভাবতে পাববেন না। আমাব পা থেকে ঘুঙুব খুলে দিতেন পর্যন্ত।'

'শিল্পীরা খেযালী মানুষ।'

'এক্স্যাক্টলি। প্রমোদরঞ্জন ছিলেন অসম্ভব খেয়ালী। কিন্তু তখন আমি গ্রামেব মেয়ে, বিদ্যাবুদ্ধি নেই। ওঁকে বুঝতে পারি নি। উনি আমার মধ্যে কাউকে হয়তো জাগিয়ে তোলাব চেষ্টা করছিলেন। প্রাচীন যুগের দেবদাসীদের কথা বলতেন—যারা মন্দিরে দেবতাব সামনে নাচত। আর জানেন? কতদিন উনি বাদ্যযন্ত্র ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেন আর বলতেন, মনে কর আমি দেবতা। তুই আমার সামনে নিজেকে সারেণ্ডার করছিস।..আসলে উনি চাইতেন আমি সারেণ্ডার করি।'

'করেন নি?'

'না। ভয় পেতুম। আমি সামান্য মেয়ে।'

'কিন্তু আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, উনিই সারেণ্ডার করেছিলেন আপনার কাছে।'

'কে জানে!'

'আপনি জিজোর কথা বলুন।'

'ও! জিজো! হি ওয়াজ এ ফাইন চ্যাপ। সো সিম্পল। সো চার্মিং অ্যাণ্ড সিনসিয়ার। ওকে আমি ভুলতে পারব না।'

'তার খোঁজ নিতে ইচ্ছে করে না?'

'ভীষণ কবে। কিন্তু আমি তার মুখোমুখি হতে পারব না।'

'যদি সে হঠাৎ এসে পড়ে?'

'আসবে না। দ্যাট আই নো ভেবি ওয়েল।'

'ধরুন, যদি আসে?'

'আমি জানি না। সত্যি জানি না কী করব। আই...আই উইল...আই মাস্ট কিল মিসেলফ! প্লিজ, অন্যকথা বলুন।'

'টেপ চালিয়ে দিচ্ছি।'

'দিন।'

'আপনার এ মুহূর্তে ভবিষ্যৎ কর্মসূচী কী?'

'লটস অফ প্রোগ্রাম। অসংখ্য ফিল্মে নাচের রোলে কন্ট্রাক্ট আছে। বাংলা, হিন্দি, তামিল। রিসেন্টলি বি বি সি মন্দিরের ওপর টি ভি ফিল্ম করছে—তাতে দেবদাসীর রোল করব। তাই রেগুলার ওড়িশী ড্যান্সের তামিল নিচ্ছি।'

'থিয়েটার?'

'না। থিয়েটারে নাচতে আমার ভীষণ অস্বস্তি হয় আজকাল।'

'কেন?'

'লোকের মুখোমুখি নিজের রক্ত মাংসের শরীরটা ডিরেক্ট ফেস করাতে গিয়ে খালি মনে হয় আমি সারেণ্ডার করছি। যতদিন নিজেকে বুঝিনি, সারেণ্ডার করেছি। সেজন্য কোনও কষ্ট হয়নি। আসলে এই শরীরের মূল্য বুঝতুম না তখন।'

'কিন্তু ফিল্মেও তো লোকে আপনার শরীরকেই...'

'ও, নো নো। দ্যাটস মাই পিকচার। স্রেফ ছবি।'

'বুঝতে পেরেছি।'

'ডুই ইউ নো আই ওয়াজ ব্রুট্যালি রেপড টোয়াইস ইন মাই লাইফ? কিন্তু আমি গ্রাহ্য করি নি।'

'টেপ চালু আছে কিন্তু।'

'আই ডোণ্ট কেয়ার ফর দ্যাট।'

'আপনি উত্তেজিত মিস মালা।'

'সরি।...জানেন? উনিশ বছর বয়স পর্যন্ত আমি নিজের শরীরের ব্যাপারে অত্যন্ত অসচেতন ছিলুম। তারপর সচেতন হয়েছিলুম ক্রমশ। এর জন্য আমি প্রমোদরঞ্জনের প্রতি কৃতজ্ঞ।'

'টেপ চালু আছে।'

'ডোণ্ট টক অ্যাবাউট ইওর ব্লাডি হেল মেসিন।'

'সরি। গো অন প্লিজ।'

'প্রমোদরঞ্জনের মতো মানুষ আমাকে আমার শরীরের মূল্য বুঝতে সাহায্য করেছিলেন। আমার শরীরই যে আমার আত্মা, তাঁর কাছেই শিখেছিলুম। এখন আমি জানি, মাই বডি ইজ মাই সোল। যখন আমি নাচি, তখন আমার আত্মা কথা বলে। ড্যান্সিং ইজ দা ল্যাংগুয়েজ অফ মাই সোল। তাই আমি শরীরকে যত্ন করি—তাকে ছুঁতে দিতে চাইনে কাউকে।'

'তাহলে বিয়ে না করার কারণ কী এই?'

'ইয়া।'

'কিন্তু হোয়াট অ্যাবাউট জিজো? যদি সে আসে কোনদিন?'

'হোয়াট ডু ইউ ইনসিস্ট, ম্যান? আর ইউ কামিং ফ্রম হিম?'

'কক্ষণো না, মিস মালা! আসলে এটা এ মুহূর্তে একটা ভাইটাল প্রশ্ন।'

'প্রশ্নটা যে আমারই নিজস্ব ব্যক্তিগত প্রশ্নও, বোঝেন না?'

'সরি! আপনি কেঁদে ফেললেন!

'মিস্টার! উইল ইউ প্লিজ...

'ও, সিওর। উঠছি, মিস মালা। আই অ্যাম এক্সট্রিমলি সরি।'

'থ্যাংকস।...'

বসন্ত রাতের ঝড়

মাঝরাতে দিঘানিয়ার মাঠের দিক থেকে একটা হাওয়া আসে। তালগাছের শুকনো বাগড়া খড়খড় করে নড়তে থাকে। হাটতলার বটগাছে ভুতুড়ে শব্দ কতক্ষণ। হলুদ পাতা ঝরে পরে সর-সর খর-খর ধারাবাহিক।

তারপর হঠাৎ সব চুপ। কিছু পরে কোথাও কুকুর ডেকে ওঠে। রোঁদের চৌকিদারের চেরা গলায় হাঁক শোনা যায়, হেই জাগো—ও-ও!

সুরযদাসের ঘুম ভেঙে গেছে। মালসার আগুন থেকে টুকরো অঙ্গার চিমটেয় তুলে তামাক ধরায়। হুঁকো টানতে টানতে খক-খক করে কাসে।

তার মেয়ে লখিয়া তেরপলের ঝোপড়ির পেছন ঘেঁষে কুঁকড়ে শুয়ে আছে। হাত বাড়িয়ে সুরযদাস একবার দেখে নেয় তুলোর কম্বলটা ঠিকঠাক চাপানো আছে নাকি।

রোঁদের চৌকিদার হাটতলায় এসে হুঁকোর জুগজুগে আগুন দেখে হাঁক ছাড়ে।

হেই গাহানিয়া!

হাঁ জি! সাড়া দেয় সুরযদাস গাহানিয়া। আও, আও।

তামাক সেবা করো জেরাসে!

ধনপতি চৌকিদার তামাক খেতে আসে গাহানিয়া বুড়োর কাছে। কলকেয় টান মেরে কাসির সঙ্গে বলে, বহুত জাড়া, গাহানিয়া!

হাঁ! বহত জাড়া ধনপতিয়া!

মাঘের শেষে হাওয়া ঘুরেছে। দক্ষিণের মাঠে দিনমান ধুলো ওড়ে গরু-বাছুরের খুরে খুরে। শিমূলের ফুল ঝরে পাক্‌ড়ার গুটি ধরেছে। রেললাইনের ধারে শ্মশানের শিয়রে পিপুলগাছটা ন্যাড়া হয়ে গেছে। মাঝরাতে সেখানে এখন শেয়ালের চিৎকার।

শীতটা এবার যাচ্ছে না। ক'দিন আগে বৃষ্টি হয়েছে। তাই শীত চলে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়েছিল। ফিরে আসছে আবার। হাওয়া ঘুরে গেছে, সূর্য সরেছে উত্তরায়ণের পথে, তবু মরিয়া হয়ে আঁকড়ে ধরেছে শীত এ দিঘানিয়াকে।

মাঝরাতের হাওয়াটা চলে গেলে কুয়াশা ঘনিয়ে আসে। অনেক বেলা অব্দি যে কুয়াশার গাঢ়তা। মাঠের ওপর, গাছগাছালির কাঁধে, ঘরবাড়ির পথে, পিচরাস্তা আর রেললাইনের দৈর্ঘ্যববাবর গাঢ় নীল-ধূসর কুয়াশার আলোয়ান।

পিচরাস্তার ধারেই হাটতলা। সপ্তায় দু-দিন হাট বসে। গলায় হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে সুরযদাস গান গেয়ে হাটের ভিড়ে ভিক্ষে করে। লখিয়ার হাতে খঞ্জনি বসানো ডুবকি। রিনরিনে গলায় বাপের সুরে সুর মেলায়। শ্যামলা ছিপছিপে গড়ন। পাথর কুঁদে তৈরি ভাস্কর্যের মতো।

মেয়েটা অন্ধ।

এই হাটতলা থেকে ছোট্ট বাজার, পেট্রলপাম্প আর গ্যারেজ, সেখান থেকে বাস-স্ট্যাণ্ডে, সবখানে নির্ভুল পা ফেলে সে ঘোরে। প্রতি ইঞ্চি মাটি তার চেনা। সকালে এনামেলের মগ নিয়ে হারাইয়ের চায়ের দোকানে যাবে। পয়সার তুলনায় অনেক বেশি চা আদায় করে আনবে। গাহানিয়া বুড়ো তখন রাতের মালসার আগুনে আবার কাঠের টুকরো গুঁজে জমকালো করেছে। এ রুখাশুকা বৃক্ষবিরল দেশে কাঠ পাওয়া মুশকিল। হাটতলায় হাটবারের দিন হাটুরে গাড়োয়ানরা দূর-দূর থেকে আনাজপতি বেচতে আসে। রাঁধাবাড়া করে খায়। তারাই লকড়ি-কাঠ সঙ্গে করে আনে। দু-একটা ফেলে যায় চলে যাবার সময় অমনোযোগে। সুরযদাস তাক করেই থাকে।

ধনপতি চৌকিদার তামাক খেয়ে গল্পসপ্প করে চলে যাবার পরে সুরযদাসের তামাক পুড়ে ছাই। তত জুত হয়নি তামাক খাওয়া। সুরযদাস লম্প জেলে তামাক টুঁড়বে ভাবছিল।

থেমে গেল পায়ের শব্দ শুনে। ঝোপড়ির পেছনে বিশাল বটের গাছ। তলা জুড়ে শুকনো পাতা ঝরছে শীতের রাতে। বেলা হলে লখিয়া ঝেঁটিয়ে জড়ো করে আনবে। সেইসব পাতায় হাঁটাচলার শব্দ।

সূরযদাস বলে, কৌন গে?

রাতের আঁধার এ বয়সেও আঁধার নয় তার কাছে। দৃষ্টি চলে। তিনটে কালো-কালো মূর্তি এগিয়ে আসছে তার ঝোপড়ির দিকে। কৌন গে? আবার বলে সূরযদাস।

চুপ বে শালে বড়ুঢে! তেরা বাপ!

গলাটা চেনা লাগে। মাথার ভেতর ভেতর ঠাণ্ডা ঢিল গড়িয়ে যায় গাহানিয়া বুড়োর। ঝোপড়ির দরজার মুখে পাথর হয়ে বসে থাকে। তিনটে মূর্তি এসে পাশে দাঁড়ায় সামনা-সামনি। তারপর একজন এসে কাছেই বসে পড়ে। চাপা স্বরে বলে, হারামি গেঁদুয়ার বাত শুনে রাগ করিস না বুড়ো। ওকে তো জানিস, গন্ধা মুখ।

চিনতে পেরে গাহানিয়া বলে, ছোটকু?

হাঁ। আমি আছি, গেঁদুয়া আছে, আর আছে টোটন।

টোটন? কিছু বুঝতে পারে না সূরযদাস গাহানিয়া। ভীষণ অবাক হয়ে যায়।

ছোটকু ফিসফিস করে বলে, তোকে আমরা বিশ্বাস করি গাহানিয়া বুড়ো। এই মালটা তোর ঝোপড়িতে রেখে যাচ্ছি। সময় হলে নিয়ে যাব। আর শোন্, যদি কেউ জানতে পারে. কী হবে জানিস?

গেঁদুয়া হিস্ করে একটা শব্দ করে গোখরোর মত।

সূরযদাস স্পষ্ট ঠাহর করে, গলায় ছুরি চালানোর ভঙ্গী করল হারামি ছোকরা। ওব বাবা হাটতলায় চানাচুর বিক্রি করে বেঁচে ছিল। গেঁদুয়া এখন সাইকেলে ট্রানজিস্টার ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

একটা কাপড়ের ছোট্ট পুঁটুলি সূরযদাসের হাতে গুঁজে দেয় ছোটকু।·বলে, গিনতি-করা মাল আছে। একটা সরালেই জানে মেরে দেব বুড়োকে। নে, সামলে রাখ জলদি করে!

টোটন বলে, ওকে বলে দে, লখিয়াও যেন জানতে না পারে।

গেঁদুয়া বলে, জানলে জানবে। বুডঢা, হুঁশিয়ার। ওই ছোকরিকে ভি সমঝে দিবি

ঘড়ঘড়ে গলায় গাহানিয়া বুড়ো বলে, হাঁ।

ছোটকু তাড়া দেয়, হাঁ কী রে বুড়ো। যা বললাম, মনে রাখিস। নৈলে তুই তো যাবি, তোর কানা বেটিটাও যাবে। দিঘানিয়ার মাঠে শুইয়ে রেখে শকুন দিয়ে খাওয়াব। জলদি কর। লুকিয়ে রাখ।

সূরযদাস পুঁটুলিটা নিয়ে ভেতরে ঢোকে। কোণার দিকে একটা ভাঙা কাঠের বাক্সো আছে। তার ভেতর কতকালের পুরনো ছেঁড়া কাপড়চোপড় ভর্তি তার তলায় রেখে ঝোপড়িব মুখে এসে দেখে, কেউ নেই।

স্বপ্ন দেখছিল কি না বুঝতে পাবে না। কাঁপা কাঁপা হাতে মাটির ডাব্বা থেকে তামাক খামচে তোলে। শীতটা হঠাৎ জোরালো হয়ে চেপে বসেছে। মালসাব আগুন জুগজুগ করছে। এতক্ষণে ট্রেনের শব্দ দিঘানিয়ার মাঠের দিকে! ঝমরঝম করে কালুডিহির কাঁদরের সাঁকো পেরোচ্ছে রাতের ট্রেন।

কাসির শব্দে ঘুম ভেঙে লখিয়া বিরক্ত হয়ে বলে, ফির তুম তামাক পিতা, বাবা?

চুপ রি! সূরযদাস ধমক দেয়। চুপসে নিদ যা!

লখিয়া চুপ করে থাকে। দূরে দিঘানিয়া স্টেশনে রাতের ট্রেন আসছে। আওয়াজ শুনে বুঝতে পারে গাড়িটা থেমে যাবে। থেমে যাওয়ার পর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ কিছুক্ষণ। মানুষের মতো রেলগাড়িরও কষ্ট হয়।...

২

সাঁওতাল পরগণার মৈলাহাট থেকে পিচের সড়ক এসে রাজ্যসীমান্ত পেরিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার দিঘানিয়ার বুকে ঘেঁষে চলে গেছে ধুলিয়ানের দিকে। দিঘানিয়ায় দুই রাজ্যরই লোকের জীবিকার ঘাঁটি। সাহেবগঞ্জ লুপ লাইনের এক ঝিমধরা স্টেশন প্রসারিত অসমতল মাঠের মধ্যিখানে ন্যালাভোলার মত দাঁড়িয়ে আছে।

স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে সকালের ট্রেনের প্রতীক্ষা করছিল টুকাই। পিচের সড়ক যেখানে রেললাইন পেরিয়ে গেছে, সেখানে ফটক। ফটকের পাল্লা দুটো পড়ে গেছে রাস্তা আটকে। দুধারে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে একাগাড়ি, টাঙ্গা, টেম্পো, ট্রাক, একটা বাস, গরু-মোষের গাড়িও কয়েকটা।

স্টেশনবাবু পরিমল অগস্তি ঘর থেকে বেরিয়ে সিগারেট ধরালেন। শ্মশানের শিমুলতলার কাছে আপ ডিসট্যান্ট সিগন্যালের মাথায় একটা শকুন বসে আছে। টেশনজেঠু! টেশনজেঠু! দেখছেন? টুকাই চেঁচিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অগস্তিবাবু শকুনটাকে দেখতে থাকেন।

একটু পরে তামাশা করে বলেন, ও টুকাই, বাড়ি ফিরে খবর নাও, ঠানদিদির কী অবস্থা! বিশ্বাস নেই, টোটন যা শাসায় শুনেছি। ঠ্যাং ধরে টানতে টানতে ফেলে দিয়ে এল নাকি—জ্যান্ত অবস্থায়।

টুকাই শড়ির আঁচল কামড়াচ্ছিল। হেসে ফেলে। ঠানদিদিকে বলছি গিয়ে, থামুন!

সাতসকালে ট্রেন দেখতে এসে, অগস্তিবাবু বলেন, শেষে শকুন দেখে ফেললে টুকাই! শকুন বড় অমঙ্গুলে।

ট্রেন দেখতে এসেছি নাকি? টকুই বলে। জামাইবাবু আসবে লিখেছে।

উরেব্বাস! তাহলে তো কেলেঙ্কারি!

কেন টেশনজেঠু? কেলেঙ্কারি কিসের?

শকুন দেখেছ। কাজেই তোমার জামাইবাবু আজ আর আসছে না।

টুকাই হাসে। ভারি তো আমার! না এলেই বা আমার কী! বাবা তাড়া লাগিয়ে পাঠাল, তাই এলাম।

দূরে বাঁকের মাথায় ট্রেনের ধোঁয়া দেখা যাচ্ছিল। যাত্রী একদঙ্গল আদিবাসী খাটিয়ে মেয়ে-মরদ, আর জনাকতক ব্যাপারী লোক, নতুন বিয়ে করা বউ নিয়ে এক বর। ধোঁয়া দেখেই তারা তাক করে দাঁড়িয়ে গেছে। গাড়ি আধ-মিনিটও দাঁড়ায় না এ ছোট্ট স্টেশনে।

টুকাইয়ের বিশ্বাস নেই জামাইবাবু সত্যি আসবেন বলে। এর আগেও একদিন এসে ফিরে গেছে। জামাইবাবুটি এক অদ্ভুত মানুষ। দ্বারভাঙা এলাকার লোক। পাকুড়ের বাংলা স্কুলে হিন্দির শিক্ষক। নিজেকে বলেন আদ্ধেক খোট্টা আদ্ধেক বাঙালী। কিন্তু শুদ্ধ করে বাংলা বলতে পারেন না মুখে। লিখতে অবশ্য ভালই পারেন। তবে চেহারা দেখলেও হিন্দুস্তানী। মাথায় ছোট করে ছাঁটা চুল। টিকি না থাকলেও ভুল হয় টিকি আছে বলে। ধুতি পাঞ্জাবি পরে সবসময় ফিটফাট থাকেন। দিঘানিয়ার হাটতলার মালিক রসিকলাল ওঝার কোন দূর সম্পর্কের ভাগ্নে। ওঝামশাই-ই সম্পর্ক করে দিয়েছিলেন। শুধু একটু খুঁত, টুকাইয়ের মতে, দোজবর। আগের বউ অসুখ হয়ে মারা পড়েছিল।

টুকাইয়ের দিদি রুচির বিয়ের বয়সও, স্থানীয় মতে, পেরিয়ে গিয়েছিল। দোজবরে এবং আদ্ধেক খোট্টা লোকের সঙ্গে বিয়ে কম দুঃখ হয়নি—টুকাইয়ের তাই মনে হয়। তার ওপর একি অদ্ভুত বিয়ে, বিয়ের পর একবারমাত্র রুচিদিকে নিয়ে গিয়েছিল, দ্বারভাঙা জেলার গ্রামের বাড়িতে। সে গ্রামও নাকি একেবারে সৃষ্টিছাড়া। না রাস্তাঘাট, না কিছু। পড়ো-পড়ো একটা মাটির ঘর। দীপনারায়ণের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই সেখানে। বাবা-মা কবে মারা গেছেন। দু'রাত থেকে জোর করে রুচিদি বরকে নিয়ে চলে এসেছিল। ওদিকে পাকুড় স্কুলে দীপনারায়ণ থাকে নেহাত একটা বোর্ডিংয়ে। ভাড়া বাড়ির চেষ্টায় ছমাস কেটে গেল প্রায়। আসলে জামাইবাবুর ইচ্ছে নয় সংসারী হয়ে থাকা। টুকাইয়ের এমন মনে হয়। বাড়িতেও আড়ালে এইসব কথাবার্তা ওঠে মাঝে-মাঝে। পাকুড়ের মত বড় জায়গায় বাড়ি মেলে না এটা অবিশ্বাস্য।

টুকাইয়ের চোখের ওপর লম্বালম্বি ট্রেনটা শেঁটে যেতেই সে চমকায়। কখন এসে গেল যে বুঝতে পারে না। তার অবিশ্বাসী চোখের ওপর দিয়ে ঢ্যাঙা, রোগা, কাদো ধুতি-পাঞ্জাবী পরা দীপনারায়ণ ভেসে এলেও সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

দীপনারায়ণ থমকে দাঁড়ায়। টুকাইকে চিনতে কয়েক সেকেন্ড দেরি এই যা। সে শান্ত হেসে বলে, অনুরাধা! তুম হেঁয়া, তুমি এখানে কি করছ?

টুকাই শ্বাস ফেলে বলে, তাহলে সত্যি এলেন?

হ্যাঁ, এলাম। শ্যালিকার পাশে হাঁটতে হাঁটতে দীপনারায়ণ বলে, কেন? তুমি কি সোচ করছিলে আমি আসব না? তো থাক ওসব বাত। বোলো, পিতাজী কেমন আছেন? মাতাজী? ঔর ঠানদিদি? টোটনের খবর কী? কুছু করছে, না খালি চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছে?

দীপনারায়ণ শ্যালিকার দিকে চোখ রেখে ফের বলে, তোমাকে থোড়া দুবলা দেখাচ্ছে। ওসুখ

হয়েছিল? কী ওসুখ?

মুখ খুললে জামাইবাবু এইরম। একসঙ্গে অনেক কথা বলে। চুপ করে থাকলে ভীষণ চুপ। জিগ্যেস করলে শুধু উদাসীন চোখে তাকিয়ে—উঁ? কুছু বোলছ?

টুকাই আগে কথায়-কথায় ভেংচি কেটেছে। এবার আর ভেংচি কেটে ঠাট্টা-তামাশা করার চেষ্টা নেই তার মধ্যে। টেশনজেঠু পরিমল অগস্তির কথাটা মাথায় ঘুণপোকার মত কুট কুট করে মগজ কুরে খাচ্ছে। ডিস্ট্যান্ট সিগন্যালের কাছে শ্মশান আছে। গরীব লোকরাই সেখানে মড়া ফেলে আসে। কাঠের অভাবে আধপোড়া করে পুঁতে দেয় মাটির তলায়। শেয়াল-কুকুর বা শকুন সেখানে ওঁত পেতে থাকবে সারাক্ষণ, এটাই স্বাভাবিক।

তবে সিগন্যাল পোস্টের মাথায় জীবনে এই প্রথম শকুন বসে থাকা দেখল টুকাই। একবার তাদের রান্নাঘরের খোড়ো চালে একটা শকুন বসেছিল বলে পুরো চালটা ফেলে দিতে হয়েছিল। তখন টুকাই একেবারে বাচ্চা মেয়ে। তবু সব মনে আছে। তখন ঠানদিদি, আকাশের তারা যত, তত তার নাকি বয়স এবং যে খটখটে শুকনো চেহারার বৃদ্ধা নাকি টুকাইয়ের ঠাকুর্দার বিধবা সৎমা, হাঁটা-চলা করে বেড়াতে পারতেন। তাঁর বুক ফাটা চিৎকার আর আতঙ্ক এখনও স্পষ্ট মনে আছে টুকাইয়ের। কৈ তারপর কি কিছু ঘটেছিল বাড়িতে,, ভয়াবহ কোনও ঘটনা?

আঁতিপাতি খুঁজেও মনে পড়ে না। অথচ টেশনজেঠু শকুন দেখার সঙ্গে অমঙ্গলকে জড়িয়ে দিয়ে মনকে গণ্ডগোলে জড়িয়ে ফেলেছিলেন। একটা ক্ষীণ আর চাপা উৎকণ্ঠা টুকাইকে পেয়ে বসেছে।

পায়ে চলা একফালি পথ বিধবার শূন্য সিঁথির মত স্টেশনের পেছনের মাঠে। এদিকে-ওদিকে কয়েকটা লাক্ষাগাছ, শেয়াকুলকাঁটার ঝোপ। লাল মাটির ঢিবির মাথায় একটা প্রকাণ্ড আকন্দ, তার মোটা আঁকাবাঁকা শেকড় উদোম হয়ে আছে হাঁ করা লাল মাটির গর্তে। ঘর রাঙা করার জন্য আদিবাসী আর স্থানীয় গরীব-গুরব মেয়েরা ওই মাটি নিয়ে যায়।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল, জামাইবাবু একটা গুপ্তধনের গল্প বলেছিল এই আকন্দ গাছের তলার গর্তটা দেখিয়েই।

বেড়াতে বেরিয়েছে শ্যালিকাকে সঙ্গে নিয়ে দীপনারায়ণ। আকন্দগাছের বয়স বেশি হলে তার শেকড়ের খাঁজে যক্ষরা গুপ্তধন লুকিয়ে রাখে। ....অনুরাধা, তোমার গুপ্তধন চাই? ঘুমের ঘোরে হঠাৎ দীপনারায়ণের এই কথাটা ভেসে আসে এখনও।

টুকাই হাসছিল এতক্ষণে। দীপনারায়ণ আনমনে জিজ্ঞেস করে, হাসতি কিঁউ অনুরাধা। কী হল, হাসছ কেন?

কিছু না। টুকাই জোরে পা ফেলে। এমনি।

তুমি কি আমাকে দেখে হাসছ?

দীপনারায়ণ মধ্যবয়সী মানুষ। তবু মাঝে মাঝে হঠাৎ কেমন ছেলেমানুষ হয়ে ওঠে যেন। টুকাই গম্ভীর হয়ে বলে, ওমাসে আসব বলে আমাকে কষ্ট দিলেন। এলেন না যে?

সেজন্য তুমি হাসছ? দীপনারায়ণ যাই হোক কিছু একটা ব্যাখ্যা পেয়েই খুশি। সিরিয়াস ভঙ্গী করে বলে, একজামিনেশানের অনেক খাতা দেখতে হল। দেখতে দেখতে তারপর এসে গেল স্কুলের অ্যানুয়াল ফাংশান। আমার ইচ্ছা পূরণ হল না।

বাঁশডাঙার ওপর তালগাছের সার। বাতাসে শব্দ কুরছে শুকনো তালবাগড়া। হাটতলার পেছনে মন্দিরতলার দিকে বটগাছটা থেকে হঠাৎ কোকিল চিৎকার করল। দীপনারায়ণ আঙুল তুলে বলে, ওখানে একটা আন্ধা মেয়ে গাহানি ছিল। তারা আছে কি অনুরাধা?

লখিয়ার কথা বলছেন তো?

হবে। ওর বাবা লোকটাও গাহানিয়া। হাটের ভেতর হারমোনিয়াম বাজিয়ে ভিখ মাঙত দেখেছিলাম। এখনও তাই করে।

আর সেই লেংড়া মুসলমান ফকির, সে আছে, না চলে গেছে?

টুকাই অবাক হয়ে বলে. আছে। কেন?

দীপনারায়ণ শান্ত মুখে আস্তে বলল, তোমাদের দিঘানিয়া জায়গাটা বেশ। নানারকম মানুষ আছে।

তো জানো অনুরাধা? আমার এই একরকম হবি বলতে পার। যেখানে যাই, ঘুরে ঘুরে নানারকম মানুষ দেখি। অনুরাধা, হাটতলার সেই পাগলী দিদি আছে কি?

সুদাংখেপির কথা বলছেন তো?

হবে। সেই যে কপালে থাপ্পড় মারে আর বলে, এ বাবারা! ওগো বাবারা! দীপনারায়ণ খি-খি করে হাসে।

জামাইবাবু সত্যি অদ্ভুত মানুষ, টুকাই ভাবছিল। এইসব মানুষজন, আকন্দগাছের শেকড়ের খোঁজে যক্ষের গুপ্তধন, দিঘানিয়া এসে টো টো করে যেখানে-সেখানে ঘোরা, এসবের মধ্যে কেমন একটা পাগলামির লক্ষণ। মাঠের মধ্যে চুপচাপ পিপুলগাছের তলায়, অথবা পুকুরের পাড়ে, চষা ক্ষেতের আলের ধারে, কখন গিয়ে বসে থাকে একলাটি হয়ে। দূর থেকে দেখে বুকটা ধড়াস করে ওঠে। ওই একাকিত্ব চোখে মেখে গিয়ে টুকাইয়ের মনে হয়, লোকটার যেন কী একটা কষ্ট আছে।

কচিদিব এসবে মন নেই। লক্ষ্যও করে না কিছু। সারাদিন পাড়া বেড়ানো স্বভাব তার। অনুকূলবাবুর বউ, নয়তো স্কুলের দিদিমণি স্বপ্নার কাছে আড্ডা সকাল বিকেল। দুপুরে তাকে ঠিকই পাওয়া যাবে হরি সিং ছত্রীর বাড়িতে। বড়লোকের বউঝির কাছে গিয়ে কেন বসে থাকে হ্যাংলার মত? মা বরণ করেন। টোটনদা শাসায় তবু গ্রাহ্য করে না কচিদি।

গাড়ু হাতে মাঠ সারতে বেরিয়েছিলেন নন্দলাল। খিড়কির কাছে এসে হঠাৎ চোখে পড়েছিল জামাই আসছে। পেছনে ছোট মেয়ে টুকাই। হাসি মুখে জামাইকে সম্ভাষণের জন্য দাঁড়িয়ে গেছেন।

দীপনারায়ণ পা ছুঁয়ে মাথায় ধুলো নিলে মেয়েকে তিরস্কার করে বলেন, তোর আর বুদ্ধিসুদ্ধি হবে না টুকাই। এদিক দিয়ে মানুষ আসে? সদররাস্তা ছেড়ে—

দীপনারায়ণ বলে, অনুরাধার দোষ নেই পিতাজি! আমি ওকে নিয়ে আসল শর্টকাটে।

তবু নন্দলাল বলেন, আমার টাঙ্গা বলা ছিল মকবুলের, সেই যে গতবার যার টাঙ্গায় এলে! অগত্যা একটা রিক্সো-টিক্সো। তা নয় পায়ে হাঁটিয়ে এতটা পথ!

বাড়ির ভেতর ঢুকে হাঁকডাক শুরু করেন নন্দলাল। শোভা ঘোমটা টেনে একতলার বারান্দা থেকে নেমে আসছেন। ঠোঁটের কোণায় আশীর্বাদী হাসিটুকু।

টুকাই বলে, নাও। এনে দিলাম তোমাদের জামাইকে। বাব্বা! জামাই-জামাই করে অস্থির সব।

জামাই শাশুড়ির পায়ের ধুলো এবং আশীর্বাদ নিয়ে বারান্দায় যায়। টুকাই কচিদিকে খুঁজছিল। শোভা চোখের ইশারায় তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে আড়ালে ফিসফিসিয়ে বলেন, টুকু! দেখতো একবার শিগগির, হতচ্ছাড়ি কার বাড়ি গিয়ে বসে আছে। আমার প্রাণের শত্তুর হয়ে উঠেছে যেন সব। ও মা টুকু! গিয়ে দেখ মা।

টুকাই না বলতে গিয়ে মায়ের মুখের রেখা দেখে থেমে যায়। ছোট্ট শ্বাস ছেড়ে হাত দুটো নেড়ে একটা ভঙ্গী করে বেরিয়ে যায়।

পেছন থেকে দীপনারায়ণ বলে, অনুরাধা, তুমি কোথায় যাচ্ছ?

আসছি। বলে টুকাই দিদিকে খুঁজতে যায়। ....

৩

হরি সিং ছত্রীর ইদানীং কারবার ট্রান্সপোর্টের। পেট্রলপাম্প ও গ্যারেজ দিয়ে শুরু হয়েছিল। এখন তিনটে ট্রাকের মালিক। বিহারের মৈলাহাটে অফিস খুলেছেন, আবার এদিকে মুর্শিদাবাদের আরেক ঘাঁটি। মাঝখানে দিঘানিয়ায় তাঁর বসতবাড়ি। বাড়িটা দোতলা। গেটে দারোয়ান।

স্বাধীনতার বছর সিংজী দিঘানিয়ার হাটে তাঁতের গামছা আর মশারী বেচতেন। হোমিওপ্যাথির ডাক্তার বৃন্দাবন চাটুয্যের ডিসপেন্সারির পাশের খালি কুঠুরিতে ভাড়ায় থাকতেন।

ডাক্তার চাটুয্যে বেঁচে থাকলে ভীষণ অবাক হয়ে যেতেন সিংজীর ভাগ্য দেখে। তিরিশটি বছর দেখতে দেখতে কোথায় চলে গেছে। ডাক্তারের একতলা ইটের বাড়ির পড়ো-পড়ো অবস্থা। একখানা ঘর কোনক্রমে টিকে আছে। সেই ঘরের ভেতর মচমচে তক্তপোষে শুয়ে রুগ্না ডাক্তার-গিন্নি মৃত্যুর প্রতীক্ষা করেন।

দয়া করে মাঝে মাঝে সিংজী লোক মারফত কিছু সাহায্য পাঠান। আগের দিনের প্রতি কৃতজ্ঞতায়। কখনও কিছু চাল বা ময়দা, আনাজপাতি। কখনও কিছু পয়সাকড়ি।

কিন্তু ছোটকু জানতে পারলেই গন্ডগোল বেঁধে যায়। তার সম্মানজ্ঞান টনটনে। প্রথমে একচোট যায় তিতলিদির ওপর। তিতলি ডাক্তারের দূরসম্পর্কের এক বোনের মেয়ে। ভাগলপুরে বিয়ে হয়েছিল। বিধবা এবং নিঃসহায় অবস্থায় এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। আজ সে না থাকলে ছোটকুর মায়ের অবস্থা যা হত ভাবা যায় না। দেখাশোনা, সেবাশুশ্রূষা, রান্নাবান্না সবকিছু প্রাণ দিয়ে করে মেয়েটা। তবু ছোটকুর যখন তখন খোঁটা আর ধমক খেতে হয় তাকে। হাটবারে সিংজীর লোক কিছু আনাজপাতি দিয়ে যায়। ছোটকুর চোখ বাঁচিয়ে তিতলি সেগুলো তক্তপোষের তলায় লুকিয়ে রাখে। দেখতে পেলেই ছোটকু ফেলে দিতে যাবে আস্তাকুঁড়ে।

করুণা ছেলেকে মাথা কুটে অভিশাপ দেন। তখন তিতলি গিয়ে তাঁর মুখে হাত চাপা দেয়। মামীমা! ছিঃ! কী বলছেন? পেটের ছেলেকে এসব বলতে আছে?

করুণা হু হু করে কেঁদে ফেলেন। কেন আমার মরণ হয় না রে তিতলি?

ছোটকু শুনতে পেয়ে বলে, তোমার মরার আগে দিঘনিয়া পচে ভুট হবে। থামো, দেরি আছে।

করুণা ফের শাপ দেন, মর। তুই এখনই মর—আমি দেখে তবে শান্তিতে মরি।

ছোটকু যতক্ষণ বাড়িতে, ততক্ষণ এই অশান্তি। তিতলি ছোটকুকে ঠেলতে ঠেলতে বের করে দেয়। ....অ্যাই বাঁদর! তুই যা দিকি কোথায় যাবি।

ছোটকু তিতলির ওপর যত তম্বি করুক, তাকে সে একটু সমীহ করে চলে অবশ্য। তিতলি না রাঁধলে তার খাওয়া হবে না। খিদের সময় খেতে না পেলেই সে ভীষণ ছেলেমানুষ আর অসহায় হয়ে পড়ে।

তিতলি আজ দশ বছর এ বাড়িতে আছে। যখন এসেছিল তখন ছিপছিপে গড়নের যুবতী। মুখে সবসময় শান্ত হাসি। এখন তিরিশ-বত্রিশ হয়েছে বয়স। এত দুঃখকষ্ট, টানাটানির সংসারেও তার শরীরে মেদ জমেছে খানিক। হাবভাব গম্ভীর হয়েছে। সধবা জীবনে জামাকাপড় সেলাইয়ের কাজ শিখেছিল পেটের দায়ে। টেলারিং সার্টিফিকেটটা বাঁধিয়ে দেয়ালে টাঙিয়ে রেখেছে। বছরে পুজোপার্বণের মুখে খোঁড়া মিয়া খলিফা (দর্জি) হাতে-সেলাইয়ের কাজগুলো পাঠিয়ে দেয়। বোতামঘর টেঁকা, আলিগড়ি পাঞ্জাবির কাজ এইসব। তখন বেশ কিছু পয়সাকড়ি কামিয়ে নেয়।

তাই হাত পাতলে ছোটকু নিরাশ হয় না তিতিলিদির কাছে। এখন যে গুরু-পাঞ্জাবি গায়ে চড়িয়ে সে ঘোরে, সেটা তিতলি তাকে গত পুজোয় নিজের হাতে বানিয়ে দিয়েছে। বোঝাই যায় না, পুরোটা হাতে সেলাই করা।

এ পর্যন্ত সব ঠিক আছে, ছোটকুর মতে খেটে নাও আমার মত। বুক ফুলিয়ে মাথা উঁচু করে ঘোরো। ব্যস! কিন্তু ওই ব্যাটা ছত্রী রাজপুতের দয়ার দান ছুঁয়ো না। তাহলেই ছোটকুর মাথায় মাইরি আগুন ধরে যাবে।

সিংজী ছোটকুকে পেট্রলপাম্পে চাকরি দিয়েছিলেন গত বছর। মাসতিনেক পরে চুরির বদনাম দিয়ে ভাগিয়ে দেন। লুকিয়ে নাকি পেট্রল বেচত এবং ক্যাশ হাতাত নিয়মিত।

ছোটকু কিছুদিন সিংজীকে চাকু মারবে বলে খুব শাসাত তিতলিদিকে শুনিয়ে। হয়তো সেটা না পেরেই ব্যর্থতার ক্ষোভে চুপ করে গেছে।

তিতলি ইদানীং লক্ষ্য করছিল, ছোটকু রামভকতের ছেলে গেঁদুয়ার সঙ্গে আড্ডা দেয়। গেঁদুয়া ছোটবেলা থেকে ছিঁচকে চোর। বার দু-তিন হাটতলায় ছিনতাই করে ও প্রচন্ড মার খেয়েছিল। তারপর যত বয়স বেড়েছে, সে একটার পর একটা চুরি-ডাকাতি এমন কী খুনখারাপির সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। দু-দফা অল্পমেয়াদ জেলও খেটে এসেছে। রোঁদের সেপাই বা চৌকিদার প্রতি রাতে তাকে ঘুম থেকে ওঠায়। দিঘানিয়া বা আশেপাশের কোনও গাঁয়ে-গঞ্জে চুরি-ডাকাতি হলে তাকে থানায় ধরে নিয়ে যায় পুলিস। মারধোর দিয়ে শেষে ছেড়েও দেয়। আজকাল আর চালান দেয় না আগের মত। গেঁদুয়ার হয়তো মুরুব্বির জোর আছে এখন।

সেই গেঁদুয়ার সঙ্গে আড্ডা, তাসপেটা এবং টো-টো করে ঘুরে বেড়ানোতে ছোটকু সম্পর্কে ভেতর-

ভেতর উৎকণ্ঠা জেগেছে তিতলির।

তিতলি বিকেলে সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তারবাবুর কাছে মামীমার জন্য ওষুধ আনতে গিয়েছিল। আজ করুণার একটু জ্বর! ডাক্তারবাবু বললেন, ভাববেন না। এই ক্যাপসুলগুলো খাইয়ে দেবেন। গরম জলে একবার গা মুছিয়ে দেবেন বরং।

রাস্তার চৌমাথায় বাস-স্ট্যান্ডের কাছে খাটিয়া পেতে ড্রইভার ক্লিনার মেকানিকের দল তাস পিটছে। পাশে সিংজীর পেট্রলপাম্প আর গ্যারেজ। সেখানে কয়েকটা ট্রাক টেম্পো দাঁড়িয়ে আছে। তিতলি দেখল, একটু তফাতে কালভার্টের কাছে দাঁড়িয়ে আছে নন্দবাবুর ছোট মেয়ে টুকাই আর তার জামাইবাবু।

দীপনারায়ণ মাঠের দিকে আঙুল তুলে কী দেখাচ্ছিল। টুকাই দেখতে দেখতে এদিকে ঘুরে তিতলিকে দেখে চেঁচিয়ে ডাকল, তিতলিদি।

তিতলি একটু হেসে এগিয়ে যায়। টুকাইয়ের জামাইবাবুটি যে পাগলা মানুষ, তাতে তার সন্দেহ নেই। বিয়ের পর আলাপ হয়েছিল, তখনই টের পেয়েছিল তিতলি।

দীপনারায়ণ অবশ্য চিনতে পারে না। টুকাই বলে দিলে ঝটপট নমস্কার করে।

তিতলি বলে, ঘুরতে বেরিয়েছ জামাইবাবুকে নিয়ে!

টুকাই বলে, না। ঘুরছেন জামাইবাবু নিজে। আমি বডিগার্ড।

সে কী। তিতলি অবাক হবার ভঙ্গী করে একটু হাসে।

দীপনারায়ণ বলে, কে কার বডিগার্ড আছে দেখুন না কেনো। অনুরাধা আমার আছে, কী আমি অনুরাধার বডিগার্ড আছি। তো ও কী আনলেন? দাওয়া? কার ওসুখ?

কথা বলতে বলতে তিনজনে বাজারের রাস্তায় ঢোকে। বাজারে বিকেলের দিকটায় রোজ কিছু ভিড়। আশেপাশের গাঁ-গঞ্জ থেকে শৌখিন লোকেরা আসে। অস্থায়ী একটা সিনেমাঘরও হয়েছে তাঁবু খাটিয়ে। পরে নাকি স্থায়ী হবার আশা আছে। তখন ইঁটের বিশাল ঘর হবে।

টুকাই হঠাৎ গা ঘেঁসে এল তিতলির।...তিতলিদি, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

তিতলি তাকায়।

দীপকনারায়ণকে কেউ চিনতে পেরে কুশল বিনিময় করছে। সেই ফাঁকে টুকাই চাপা স্বরে বলে, আজ দুপুরে ছোটকুদা আর দাদা মন্দিরতলায় লুকিয়ে তাড়ি খাচ্ছিল, জানো?

তিতলি অবাক হয় না। শুধু বলে, তাই বুঝি?

আমাকে দেখেই ওরা হকচকিয়ে গেল। টুকাই দুঃখিত স্বরে বলে।...কিন্তু ওদের তো লজ্জা-টজ্জা নেই। লজ্জা আমারই। তিতলিদি, ছোটকুদাকে তোমরা শাসন করো না কেন গো?

তিতলি হাসে।... কে কাকে শাসন করে ভাই? ছোটকু কারুর ধার ধারে না।

টুকাই মুখের রেখায় দুঃখ রেখে বলে, আমার সব চেয়ে খারাপ লাগল কী জানো তিতলিদি গেঁদুয়া ডাকুও ওদের সঙ্গে বসে তাড়ি খাচ্ছিল!

গেঁদুয়া! তিতলি আস্তে বলে।

টুকাই বলে, হাটতলার গাহানিবুড়োকে চেনো তো? সেই যে হারমোনিয়াম বাজিয়ে ভিক্ষে করে, লখিয়ার বাবা?

হুঁ, চিনি।

বুড়ো সুদ্ধু, ওদের সঙ্গে তাড়ি খাচ্ছিল। টুকাই ঢোক গিলে বলে, ভাবছি, বাবার কানে তুলব। দাদা এত খারাপ ছেলে হয়ে গেছে, ভাবতেও পারিনি।

দীপনারায়ণ সঙ্গ নিয়ে বলে, কী গোপন বাতচিত হচ্ছে তোমাদের, আমাকেও থোড়া শেয়ার কর, অনুরাধা! আমি ভি শুনে খুশি হই!

তিতলি মুখ টিপে হাসে।... মেয়েদের বাতচিত শুনতে নেই জামাইবাবু।

হুঁ, বুঝেছে। দীপনারায়ণ খি-খি করে হাসে।...আমি আপনাদের টার্গেট আছি। আমি ফিগার অফ জোক।

তিতলি বলে, না না। আপনাকে নিয়ে কথা বলিনি আমরা।

টুকাই বলে, তিতলিদি, একটা প্রব্লেমে পড়েছি।

কিসের টুকাই?

জামাইবাবুর কীর্তি! টুকাই একবার ঘুরে দীপনারায়ণকে দেখে নেয়।...কী মুখ করে আমার জন্য এবার শাড়ি আর রেডিমেড ব্লাউজ এনেছেন। সে কী ব্লাউজ! তিনটে আমি জোড়া দিলে তবে গায়ে হবে।

দীপনারায়ণ কুণ্ঠিত মুখে বলে, ভুলটা করেছে' দোকানদার। আমি বলল এক, শুনল আরেক। আমি বলল, টোয়েন্টির মধ্যে এজ। তো দিল তার ডাবল!

টুকাই বলে, তাও আবার হাত কাটা। পরি, আর সবাই পেছনে প্যাক দিক।

তিতলি সস্নেহে বলে, না। এখানে কত মেয়ে পরছে। তুমি নিয়ে এসো। টেঁকে সাইজ করে দেব।

তুমি একটা সেলাই মেসিন কেন না কেন তিতলিদি?

টাকা কোথায় পাব ভাই? তিতলি মুখ নামিয়ে বলে। খোঁড়া মিয়া খলিফা বলেছিল কিস্তিতে নাকি পাওয়া যায় শহরে। সেখান থেকে এনে দেবে। কোথায় কী? ওর নিজের একটা মেসিন দু-দিনের জন্য চেয়েছিলাম। দিল না

টুকাই উৎসাহ দেখিয়ে বলে, কেন? ব্লক অফিসে লোন দেবে না? কত লোক তো পায়! থামো, দিদিকে বলছি। ওর সঙ্গে বি.ডি.ও. সায়েবের বউয়ের খুব ভাব।

দীপনারায়ণ হাসে।....অনুরাধার দিদির ভাব কার সঙ্গে নয়? আমি ভি বলব নিরুপমাকে। ওর কথায় কাজ হলে কেন করবে না? করা উচিত। কী বোলেন?

বাড়ির সামনে এসে টুকাই বলে, তিতলিদি, আমি এক দৌড়ে জামাটা নিয়ে আসছি। জামাইবাবু, একটু দাঁড়ান এখানে।

টুকাই হন্তদন্ত হয়ে চলে গেল। দীপনারায়ণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে দেখে তিতলি বলল, দাঁড়িয়ে কেন জামাইবাবু? ভেতরে এসে বসবেন, আসুন।

একটু ইতস্তত করে দীপনারায়ণ ভেতরে যায়।

একটা পাশে ধ্বংসস্তূপ। ভেতর দিয়ে একফালি পরিষ্কার পথ। উঠোনে পুরোনো ইঁদারা। তার পাশে একটা জবাফুলের ঝাড়, একটা বিস্তীর্ণ সজনেগাছ। উঠোনে এক সময় লাইমকংক্রিট ছিল মোড়া। টুটে ফেটে এবং উপড়ে গেছে। জায়গায়-জায়গায় গর্ত। তবু পরিচ্ছন্নতা ঝকমক করছে।·বারান্দার সিমেন্ট কবে উঠে গিয়েছিল। তার ওপর মাটি লেপে দেওয়া হয়েছে।

ঘরের ভেতর থেকে করুণার সাড়া আসে। তিতলি দীপনারায়ণকে একটুকুরো আসন দেয় বসতে বারান্দায় থামের কাছে। ভেতরে গিয়ে চাপা গলায় মামীমাকে বলে, রুচির বর। টুকাইয়ের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছিল। নিন, ক্যাপসুলটা খেয়ে ফেলুন।

করুণা বলেন, জামাইকে একটু চা-ফা—

দিচ্ছি। আপনি ওষুধটা খেয়ে নিন তো!

ওষুধ খাইয়ে তিতলি বেরিয়ে আসে। বারান্দার কোণায় উনুন এবং রান্নার সরঞ্জাম। কেরোসিন কুকার জ্বালাতে ব্যস্ত হয় তিতলি। দীপনারায়ণ বাড়িটা দেখছিল। তারপর দেখে, তিতলি তার দিকে তাকিয়ে ছিল। মুখটা ঘুরিয়ে নিল। দীপনারায়ণ তবু তাকিয়ে থাকে।

তিতলি বলে, গরিব মানুষের বাড়ি, জামাইবাবু।

আমি ভি গরিব। খিক খিক করে হাসে দীপনারায়ণ। বোলবেন কেন, আপনার তো মাস্টারি আছে। মাসে মাসে বেতন পান। তবু গরিব বোলছি কেন, জিজ্ঞাসা কোরবেন তো? শুনে লিন—

হঠাৎ চুপ করে যায় সে। তিতলি বলে, কী হল জামাইবাবু?

দুনিয়ায় নানারোকম গরিব আছে, এই আর কী।

তিতলি কেটলি চাপিয়ে উঠে আসে। উঠোনে গিয়ে দাঁড়ায়। সজনের ওপর ডালে দিনের শেষ আলোটুকু চুইয়ে পড়ছে। শিরশিরে বাতাস উঠোনে ঘুরপাক খেয়ে চলে যায়। শীত করে একটু-একটু।

তিতলি জানে নিরুপমার সঙ্গে বিয়েটা সুখের হওয়া সম্ভব নয়। নিরুপমা তার বোনের চেয়ে অনেক বেশি চঞ্চল প্রকৃতির, একেবারে অন্যরকমও স্বভাব চরিত্রে। নিরুপমার বদনাম কতবার শোনা গেছে দিঘানিয়ায়। একবার এক ড্রাইভারের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল। কোত্থেকে ধরে নিয়ে এসেছিলেন

নন্দলালবাবু। নিরুপমার কারণেই তার ভাই টোটোন গতবছর ব্লকের এক প্রেমিক গ্রামসেবক ভদ্রলোককে চাকরির মায়া ত্যাগ করে পালাতে বাধ্য করেছিল এলাকা থেকে। দীপনারায়ণ এসব নিশ্চয়ই এতদিনে টের পেয়েছে। তিতলি ভাবে। ভেবে সে ভীষণ অবাক হয়ে লোকটাকে দেখতে থাকে।

টুকাই বহুত দেরি করছে। দীপনারায়ণ বলে অন্যমনস্কভাবে। টুকাই ওব দিদির মত খানিকটা।

তিতলি একটু হাসে। ....টুকাইয়ের দিদিকে নিয়ে যান এবার সঙ্গে করে। আর তাহলে নিজেকে গরিব মনে হবে না, জামাইবাবু।

যাব, যাব। বাসা-বাড়ি পাচ্ছি না বলেই তো প্রব্লেম!

জামাইবাবু একটা কথা বলব?

বোলেন। বোলেন। দীপনারায়ণ আগ্রহ দেখায়।

বিয়ে করে বউকে কি এমন করে কেউ ফেলে রাখে বাপের বাড়িতে? তিতলি কৌতুকের ছলে বলে। ...বাসা-টাসা বাজে কথা। আসলে বলুন, বউ পছন্দ হয়নি।

ছি ছি, ওকী কথা। জিভ চুক চুক করে দীপনারায়ণ। নিরুপমাকে খুব পছন্দ হয়েছে।

টুকাই এসে পড়ে হাঁফাতে হাঁফাতে। প্যাকেটে শাড়িটাও এনেছে। তিতলিদিকে দেখাবে।

শাড়ি আর জামার খুব প্রশংশা করে তিতলি। চা তৈরি করার পর দীপনারায়ণকে চা দেয়। টুকাই অনিচ্ছা করে চা খায়। তিতলির চায়ে নেশা খুব। করুণাকেও চা দিয়ে আসে। হঠাৎ এই ক্ষয়াটে নির্জীব বাড়িটা আজ সন্ধ্যার মুখে প্রাণ ফিরে পেয়েছে মনে হয় তিতলির । ওদের সহজে যেতে দিতে চায় না সে।

তাকে হেরিকেন জ্বালতে দেখে দীপনারায়ণ বলে, এ কী! ইলেকট্রিক নেই আপনাদের।

ছিল তো। লাইন কেটে দিয়ে গেছে। বলে তিতলি হেরিকেনটা বারান্দায় রাখে। তারপর করুণাব ঘরে একটা লম্প জ্বেলে দিয়ে আসে। টুকাইকে বলে, একটু বোস তুমি। জামাটা এখনই ঠিক করে দিচ্ছি।...

বাজার এবং বস্তির দিকটায় দিঘানিয়ার কৃষ্ণপক্ষের রাতগুলো বিদ্যুতের আলোয় একটু ঝলমল করে। জনসংখ্যা মিউনিসিপ্যালিটি হওয়ার উপযুক্ত করেনি এখনও দিঘানিয়াকে। পঞ্চায়েত সভা কৃষ্ণপক্ষে সারারাত বাঁধের খুঁটিতে বাল্ব জ্বালিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছে। বাল্বগুলোর মধ্যে প্রচুর দূরত্ব। চুরি ডাকাতির প্রকোপ বাড়ছে দিনে দিনে, তাই এটুকু বাড়তি খরচ। শুক্লপক্ষে আকাশের চাঁদই যথেষ্ট। ঈশ্বরের এই বাতির আলোয় চোর ডাকাতেরা বিব্রত বোধ করবে বলে ধারণা পঞ্চায়েত-বাবুদেব।

হাটতলার দিকটা এ কৃষ্ণপক্ষে অন্ধকার। বিদ্যুতের তার নিয়ে খুঁটি এতদূর আসেনি। আসার কারণও ছিল না।

রাতের খাওয়াটা বড্ড বেশি হয়ে গেছে অনিচ্ছা সত্ত্বে। দীপনারায়ণ শ্বশুর বাড়ির খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে ঘুরতে ঘুরতে হাটতলায় এসেছিল। হাতে টর্চ। কিন্তু জ্বালতে ইচ্ছে করছিল না তার। অন্ধকারই ভাল লাগে। সে বিহারের অজ পাঁড়াগায়ের মানুষ। কলেজে পড়ার জন্য মফঃস্বল শহরে কাটিয়েছিল। শহর তার ধাতস্থ হয় না। এই ছত্রিশ বছর বয়সে পৌঁছে ক্রমশ তার মুখ ঘুরে যাচ্ছে ভিড়ের উল্টোদিকে—নির্জনতায়, নৈঃশব্দে। দৃষ্টি মানুষজন ছাড়িয়ে দূরে—আকাশ, প্রান্তর কিংবা কোথাও অজ্ঞাত জায়গায় পৌঁছুনোর চেষ্টা করছে সারাক্ষণ।

এবার এসে নিরুপমার ব্যবহার তাকে ধাক্কা দিয়েছে। একলা ঘরে দুপুরবেলায় নিরিবিলিতে কথা বলতে ইচ্ছে করেছিল। একটু বসেই চলে গিয়েছিল নিরুপমা। আসছি বলে আর এল না। ঘুমিয়ে পড়েছিল দীপনারায়ণ। ঘুম ভাঙার পর আর নিরুপমাকে দেখতে পায়নি। আবার নাকি কোথায় বেরিয়েছে।

সন্ধ্যায় তিতলিদের বাড়ি থেকে ফিরে দেখেছে নিরুপমা ঠানদিদির ঘরে বসে আছে। হেসে হেসে কথা বলছে বৃদ্ধার সঙ্গে। কিন্তু দীপনারায়ণের মুখোমুখি আর হল না খাওয়ার সময় পর্যন্ত।

খেয়ে দীপনারায়ণ বেরিয়েছে। রাতের ভ্রমণে শ্যালিকাকে সঙ্গে আনা যায় না, সেটা কেমন যেন দেখায়। তবে টুকাই জোর করে এলেও সঙ্গে নিত না। সে একা ঘুরতে চাইছিল অন্ধকারে।

বটতলার দিকে আগুন জুগজুগ করছে এবং কাশির শব্দ। দীপনারায়ণ ভাবছিল যাবে নাকি গাহানিয়া

সূরযদাসের কাছে? লোকটা বেশ। আর ওর অন্ধ মেয়েটাও। সেবার তাকে বাবা-মেয়ে হারমোনিয়াম ডুবকি বাজিয়ে গান শুনিয়েছিল।

পায়ের শব্দ শুনে চমকে টর্চ জ্বালে দীপনারায়ণ। টৌটনকে দেখে নিভিয়ে ফেলে। টৌটন চমক খাওয়া ভাঙা গলায় বলে, কে?

আমি। দীপনারায়ণ সাড়া দেয়। ফের বলে, ঘুম করছ টৌটন?

ও! জামাইবাবু! টৌটন একটু হেসে এগিয়ে আসে। তার সঙ্গে আরও দুজন আছে। কাছে এসে টৌটন বলে, বেড়াতে বেরিয়েছেন? আপনার ঠান্ডা লাগছে না? ফাঁকা মাঠের হাওয়ায় যা শীত এখানে।

দীপনারায়ণ হাসে। নাঃ! তো বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াচ্ছ তুমি?

এই একটু—

তো আলাপ করিয়ে দাও তোমার বন্ধুদের সঙ্গে!

অগত্যা টৌটন বলে, এ ছোটকু। আপনি চিনতেও পারেন। তিতলিদির ভাই। আর এ হল গেঁদুয়া। একে চিনবেন না। বাসস্ট্যান্ডের কাছে থাকে।

দীপনারায়ণ অন্ধকারে ছোটকুকে লক্ষ্য করে বলে, ছোটকুবাবুদের বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল টুকাই। জামা সেলাই করল তিতলি দিদির কাছে। বহুত গপসপ ভি হল। তিতলিদিদি আপনার কথা বলল অনেক।

ছোটকু জানতে চাইল না কী কথা বলছে তিতলিদি। টৌটনকে সে চিমটি কাটল। টৌটন বলল, ঘুরুন জামাইবাবু! আমরা চলি।

তিনটি ছায়ামূর্তি অন্ধকারে দূরে মিলিয়ে গেল। কিছুক্ষণ আকাশে নক্ষত্র দেখে দীপনারায়ণ। তারপর গোহানিয়ার ঝোপড়িব দিকে হাঁটতে থাকে।

আলোর ঝলক পড়তেই সূরষদাস বলে, কৌন গে?

রাম রাম গাহানিয়াজি!

রাম রাম। কৌন বা?

দীপনারায়ণ মাটিতেই ধুপ করে বসে পড়ে। দেহাতি বুলিতে নিজের পরিচয় দেয়। গাহানিয়া বুড়ো ব্যস্ত হয়ে হাত বাড়িয়ে এক টুকরো চট বের করে। বসতে দেয় নন্দলালবাবুর জামাইকে।

ভেতরে ল্যাম্পের আলোয় অন্ধ মেয়েটা পা ছড়িয়ে বসে ভাত খাচ্ছে। মাঝে মাঝে নিঃশব্দ হাসছে। এদের কথাবার্তায় সাড়া দেওয়ার একটা নিজস্ব ভঙ্গী ওর।

খাওয়া হলে সে এঁটো এনামেলের থালা নিয়ে সাবধানে গুঁড়ি মেরে বেরিয়ে আসে। দীপনারায়ণ অবাক হয়ে দেখে, অন্ধ মেয়েটা নির্ভুল পা ফেলে বটতলার পেছনে চলে যাচ্ছে। সে বলে, কোথায় গেল তোমার মেয়ে, গাহানিয়াজি?

পুকুরঘাটে গেল বাবুজি! সূরষদাস তারিফ করে মেয়ের। ভগবান ওকে ভেতরে দুটো চোখ দিয়েছেন বাবুজি! তবে কথা হল, বাইরের চোখে আমরা আর কতটুকু কী দেখি। লখিয়াবেটি ভেতরের চোখ দিয়ে যা দেখে, আমাদের দেখার সাধ্য নেই। বাবুজি, একটা সিগারেট থাকলে দিন।

আমি সিগারেট খাইনে গাহানিয়াজি!

দুজনে দেহাতি বুলিতে কথাবার্তা বলতে থাকে। সূরষদাস আবহাওয়ার আলোচনা করে। শীতটা বেশ চলে গিয়েছিল। আবার জাঁকিয়ে ফিরে এসেছে। ভোরের দিকে তো মনে হয়, তার ঝোপড়িটা বরফের চাঙড় হয়ে নেমে আসছে বুকে। এদিকে মানুষের মন থেকে মায়ামমতাও ঘুচে যাচ্ছে দিনে দিনে। হরিসিং ছত্রী ফিবছর কম্বল-কাপড় দান করেন শীতের সময়। এবার দিয়েছেন মোটে একটা কম্বল। তাই দিয়ে দুজন মানুষের শীত কাটানো কঠিন। আগের বছর ভুল হয়েছিল। কম্বলের বদলে কাপড় চেয়ে এনেছিল সূরষদাস। বুদ্ধি করে কম্বল চাইলে দুখানা কম্বল হয়ে যেত। সিংজীর কাছে হয় কম্বল নাও, নয়তো কাপড় নাও। দু' জিনিস তো দেবেন না একজনকে। বলবেন, মেয়েকে কেন সঙ্গে নিয়ে যাইনি? গিয়েছিলাম তো! সিংজীর লোক বলল, ঘরপিছু একখানা কম্বল, নয় কাপড়। তার চেয়ে দানের ভড়ং না করলেই হয়।

কথায়-কথায় রসিকলালজির কথা ওঠে। সম্পর্কে দীপনারায়ণের মামা হন। কিন্তু বিয়ের পর থেকে

কেমন যেন পরের মত আচরণ। তাই দীপনারায়ণ নেহাত দেখা করেই চলে এসেছে।

গাহানিয়া বুড়ো বলে, ওহি তো বাত।

লখিয়া পুকুরঘাট থেকে এসে ঝোপড়িতে ঢুকে গেল। বসে রইল হাঁটু মুড়ে। মুখে তৃপ্তির হাসি। একটু পরে সে ডাকে, বাবুজি!

দীপনারায়ণ বলেন, বল লখিয়া!

এবার একখানা কাপড় চেয়ে নেব আপনার কাছে। সেবার কথা দিয়ে গেলেন। মনে আছে তো?

জরুর! দীপকনারায়ণ হাসে। তো গাহনা শুনাও লখিয়া!

এখন যে ভাত খেলাম, বাবুজি! ভাত খেলে গাহনা ভাল হয় না।

কিন্তু সূরযদাস উৎসাহে হারমোনিয়ামটা বের করে। ঝোপড়ির মুখে বসে সিঙ্গলরিড বেসুরো যন্ত্রটা বাজাতে শুরু করে। বলে, শুনা, শুনা বেটিয়া! বাবুজি কাপড়া বখশিস দেগা। শুনা!

ঠান্ডা হিম অন্ধকার রাতে প্রথমে একটু উপদ্রবের মত লাগছিল দীপনারায়ণের—সত্যি সে গান শুনতে চায়নি। কিন্তু ক্রমশ সূবযদাসের লোকসঙ্গীত এই শীতলতার ভেতর নিজের স্থান করে নেয। একটা ওমের মত আবরণ গড়ে ওঠে।

'...খাড়ু না দিয়া না দিয়া গোধনিয়া

একহি ভৈঁসা হো রামা

সিভাসে ফাড়ক যায় হো রামা'

অভাগিনী মেয়ে পায়ের খাড়ু পায়নি, কন্যাপণ হিসেবে গোধনও পায়নি। পেল একটা মোষ। তার শিঙের গুঁতোয় অস্থিব। মোষ বলতে স্বয়ংবরই।

সূরযদাসের মুখে হাসি। তার অন্ধ মেয়েটাও হেসে কুটিকুটি 'একহি ভৈঁসা গাইতে। তাবপবই মুখটা গম্ভীর করে ককিয়ে ওঠা সুরে 'সিভাসে ফাড়ক যায় হো রামা' গেয়ে বুকে হাত।...

নন্দলাল জামাইকে খুঁজতে বেরিয়েছিল। গাহানিযার ঝোপড়িব সামনে সে বসে গান শুনছে দেখে অবাক হয়ে যান। বদ্ধ পাগল। এই ঠান্ডার রাতে আকাশের নিচে বসে গান শুনছে! আর এই গান। ঘরে রেকর্ড-প্লেয়ার আর কত রেকর্ড আছে, তাই ফেলে!

টৌটন নিজের জিনিস বলে হাত দিতে দেয় না দিদি বা বোনকে। জামাইবাবুর বেলায় তার মানা থাকতে পারে না। তাছাড়া জামাই ঘরে বসে গান শুনছে রেকর্ডপ্লেয়ারে, এটাই নন্দলালের কাছে সুন্দর গার্হস্থ্য দৃশ্য বলে মনে হয়। একটু বিরক্ত হয়ে টর্চ জ্বেলে ডাক দেন নন্দলাল, দীপু!

জামাইও টর্চ জ্বেলে শ্বশুরকে দেখতে পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে ওঠে। চাপা গলায বলে, গাহানিয়াজী, কাল একসময় তোমার মেয়ের জন্য কাপড় দিয়ে যাব। রামরাম!

রামরাম বাবুজি!

অন্ধ মেয়েটাও মিঠে গলায় বলে, রামরাম বাবুজি!...

৪

তিতলি ছোটকুর কলার খামচে ধরে বলে, অ্যাই বাঁদর! তুই কাল তাড়ি খাচ্ছিলি ছোটলোকদের সঙ্গে?

ছোটকু তিতলির পাঁজরে কাতুকুতু দিলে সে কলার ছেড়ে দেয়। ছোটকু বলে, নিজের প্রেসটিজ আর রাখতে শিখলে না মাইরি তিতলিদি! সে হাসতে থাকে। বলে তাড়ি খাচ্ছিলাম! বয়স হয়েছে, তাড়ি খাব না? বেশ, যদি বল তাড়ি ছোটলোকে খায়, তো মেনে নিচ্ছি—হ্যাঁ, তাড়ি ছোটলোকে খায। ভদ্রলোক কী খায়? হুইস্কি, কিংস, দিশি। এবার বরং তাই খাব।

তিতলি তার কাঁধে থাপ্পড় মারে। তুই ছোটলোকেরও অধম ছোটকু!

সেজন্যেই তো তাড়ি খাই। ছোটকু পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরায়। তিতলির মুখের ওপর ধোঁয়া ছুঁড়ে বলে, এসব কথা তোমার কানে কে তোলে তিতলিদি?

যে দেখেছে, সেই।

উঁহু, নামটা কী তার?

নাম বললে তাকে মারবি তো?

ছোটকু গলায় ছুরি চালানোর ভঙ্গীতে আঙুল টেনে শিষ্ করে একটা শব্দ করল। এটা গেঁদুয়ার নকল করা। তবে গেঁদুয়ার মত সাংঘাতিক হয় না মোটে।

তিতলি ভুরু কুঁচকে বলে, পারবি—যদি নামটা বলি?

বলেই দেখ না।

তিতলি মুখ টিপে হেসে আস্তে বলে, টুকাই।

জিভ বের করে ছোটকু বলে, মাইরি? যাঃ!

তিতলি হাসে। গেল তো প্রেষ্টিজ পাংচার হয়ে? আর তোকে পাত্তা দিচ্ছে না টুকাই!

ভারি আমার! ছোটকু সিগারেটের ধোঁয়া দিয়ে রিঙ পাকায় একটার পর একটা। তারপর ঘুরে বলে, সত্যি টুকাই দেখেছে?

তিতলি এবার গম্ভীর হয়।...তুই কখন কী করে বসবি, আমার আজকাল খুব ভয় হয় ছোটকু! তুই ওই গেঁদাই ছোকরার সঙ্গে ঘুরিস। টোটনের সঙ্গে মিশলেও তত সন্দেহ করতাম না। কিন্তু ওই ডাকাত ছোকরার সঙ্গে তাস খেলিস। তারপর তাড়ি-ফাড়ি গাঁজা ভাং খাচ্ছিস ওর সঙ্গে। মতলব কী খুলে বলতো?

সেধে মিশলে কী করব?

থাপ্পড় তুলে তিতলি তেড়ে যায়। মারব? সেধে মেশে? নোংরা ছোটলোক একটা—যখন-তখন পুলিস ধরে নিয়ে মারে। এবার যে তোকে নিয়ে গিয়ে অমনি করে মারবে, তখন বাবার মুখটা উজ্জ্বল হবে তো?

ছোটকু মিটিমিটি হেসে বলে, এমন করে বলছ মাইরি, যেন বাবাকে দেখতে পাচ্ছ। ছেড়ে দাও সক্কালবেলা ওসব ভাল-ভাল কথাবার্তা। আজ হাটবার না? থলে দাও, বাজার করে আনি। অনেকদিন আলু কুমড়োর ঘ্যাট খেয়ে মুখটা পচে গেছে।

আমার কাছে পয়সাকড়ি নেই। গম্ভীর মুখে বারান্দার উনুনে চাপানো গরম জলের পাত্র নামায় তিতলি। করুণা আজ স্নান করবেন বলে ভোর থেকে জেদ ধরেছেন। জ্বরটা অবশ্য কাল থেকে আর নেই। কিন্তু সারারাত ঘুম হয় না। অন্তত গরম জলে গা মুছিয়ে মাথাটা ঠান্ডা জলে ধুয়ে দেবে তিতলি।

ছোটকু খাপ্পা হয়ে বলে, চেয়েছি তোমাকে যেন। আমি পয়সা রোজগার করতে পারিনে বুঝি? কৈ, থলে কোথায়?

থামের হুকে থলে ঝুলছিল। ইশারায় দেখিয়ে সন্দেহাকুল দৃষ্টে তাকায় ওর দিকে তিতলি।...রোজগার করেছিস? তাহলে আমার ধারগুলো শোধ দে আগে।

ছোটকু ডাট দেখিয়ে বলে, কত?

সে অনেক। অন্তত দশটা টাকা দে, দেখি।

পকেট থেকে একগোছা নোট বের করেছে দেখে তিতলির বুকটা ধড়াস করে ওঠে। সে বড় বড় চোখে তাকিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বলে, ছোটকু! অত টাকা তুই পেলি কোথায়?

ছোটকু একটা দশ টাকার নোট ছুঁড়ে ফেলে তার সামনে।

তিতলি নোটটার দিকে তাকিয়ে ফের বলে, ছোটকু!

কোনও জবাব না দিয়ে ছোটকু শিস্ দিতে দিতে বেরিয়ে যায়। টাকাটা হাত বাড়িয়ে তুলে নিতেও ভয় করে তিতলির। অতগুলো টাকা প্যান্টের পকেটে নিয়ে ঘুরছে—কোথায় পেল অত টাকা?

করুণা কষ্ট করে বিছানা থেকে উঠেছেন। দেয়াল ধরে সাবধানে পা ফেলে আসছিলেন। চৌকাঠের কাছে ওঁর শীর্ণ হলুদ আঙুল দেখতে পেয়েই টাকাটা তুলে জামার ভেতর চালান করে দেয় তিতলি। তার কাছে টাকা থাকবে এবং তার সেলাইয়ের রোজগার করা টাকাতেই অন্নবস্ত্রের সংস্থান। কাজেই সেটা করুণার কাছে প্রশ্ন নয়। যদি ওভাবে টাকা পড়ে থাকে বারান্দায়, তবেই করুণা প্রশ্ন করতেন। অথচ একটা চাপা কষ্টকর অস্বস্তি তিতলিকে এ মুহূর্তে সত্যিকার জবাবটা দিতে বাধ্য করবে।

তাই সে মামীমার প্রশ্নের মুখোমুখি হতে চায়নি।

মামীকে ধরে ইঁদারাতলায় রোদে বসিয়ে দেয় তিতলি। গরমজলটা নিয়ে যায়। গায়ে মাংস বলতে

আর নেই করুণার। হাড় ক'খানা মাত্র অবশিষ্ট। শুধু চুলগুলো যৌবন থেকে এই বার্ধক্য পর্যন্ত তাঁকে ছেড়ে যায়নি। সাদা-কালো একরাশ চুল নিজের হাতে নাড়াচাড়া করেন করুণা। মাথায় নারকেল তেল ঘষে দেয় তিতলি। করুণা যখন আক্ষেপে বলেন, চুলগুলো উঠে গেল রে তিতলি, আমিই শুধু রয়ে গেলাম, তখন তিতলি হাসতে থাকে। বাজে কথা বলবেন না তো! বলে সে চুলগুলো টেনে দেখায়, গোড়া কত শক্ত। ফের বলে, মামাবাবুর হোমিওপ্যাথি ওষুধ খেয়েছিলেন তো? তারই গুণ মামীমা!

করুণা হাসেন একটু। ...মোটেও না। আমাকে সাধত। আমি বলতাম, তোমার ওই চিনির গুলিতে কিছু হবে না। আমার বেঁচে থাক ভোম্বলবাবু!

সে কে মামীমা?

তুমি দেখনি মা! সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার ছিল ভোম্বলবাবু। নামেও ভোম্বল, চেহারাও তাই। আসত, যেন গদাহস্তে ভীমের প্রবেশ! তোমার মামার বন্ধু ছিল। আবার যখন এলোপ্যাথি হোমিওপ্যাথি নিয়ে তর্ক বাধত, তখন এক হুলস্থুল অবস্থা।

খোঁড়া মিয়া খলিফার মেয়ে এসে একগাদা জামা দিয়ে গেল। বোতামঘর টেঁকে বোতাম লাগাতে হবে। এক প্যাকেট বোতামও রেখে গেল বারান্দায়।

আজ একটু দেরি হবে ওগুলো নিয়ে বসতে। ছোটকু বাজারে গেছে। অনেক কিছু আনবে হয়তো। তিতলি বুঝতে পারে না, এটা সুখের দিন, না দুঃখের। রান্নাটা সে ভালই জানে। কতকাল ভাল কিছু রান্নার সুযোগ পায় না। আজ কি ছোটকুকে বলবে সে, টাকাগুলো আজেবাজে খরচ না করে বারান্দার বেড়াটা সারিয়ে দাও এবং আরও বেশি টাকা থাকে যদি, ছাদের ফাটলগুলোও?

আবার বুকটা ধড়াস করে ওঠে তিতলির। অত টাকা কোথায় পেল ছোটকু? ...

ছোটকু হটতলায় গিয়ে দেখতে পেয়েছিল টুকাইকে। টুকাই একা হাটতলার পেছনে মন্দিরের ওদিকে কোথায় যাচ্ছিল। কল্কেফুলের জঙ্গলের ভেতর সে ঢুকে গেলে ছোটকু অবাক হয়েছিল। কার সঙ্গে টুকাইয়ের ভাবটাব হয়েছে নাকি, কিছু বলা যায় না!

তবে এও ঠিক, সত্যি যদি হয়, ছোটকু দুজনকেই জানে মেরে দেবে।

তাড়াতাড়ি একগাদা বাজার করে সে তিতলিদির সামনে ফেলে দিয়ে চলে আসে হন্তদন্ত হয়ে। মন্দিরতলায় হাটবারে ভক্ত মানুষজন পয়সা ছুঁড়ে প্রণাম করতে যায়। পেছনে কল্কেফুলের জঙ্গলের পর বিশাল ঢেউখেলানো মাটির মাঠ। কোথাও চাষের ক্ষেত, কোথাও বাজা ডাঙা। ধু-ধু ছড়িয়ে আছে দিগন্তরেখা পর্যন্ত। ঘন কুয়াশার পোঁচ শেষ প্রান্তে। কল্কেফুলের জঙ্গলের ওদিকে একটা ক্ষয়াখবুর্টে গেরোচনা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে টুকাই। দৃষ্টি মাঠের দিকে। ছোটকুর পায়ের শব্দে ঘুরে দাঁড়ায় সে। নিষ্পলক চোখে তাকায়।

ছোটকু কাছে গিয়ে বলে, তোমার সঙ্গে কথা আছে টুকাই!

টুকাই ঠোঁট কামড়ে ধরেছিল। আস্তে বলে, কী?

বলছি। গেরোচনা গাছের একটু তফাতে একটা ইঁটের চাবড়ায় বসে পড়ে ছোটকু। সিগারেট জ্বেলে ধোঁয়ার সঙ্গে বলে, তুমি তিতলিদিকে কী বলেছ আমার নামে?

টুকাই তেমনি নিষ্পলক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকার শ্বাস ছেড়ে বলে, কী?

বলনি তাড়ি খাওয়ার কথা?

টুকাই ফোঁস করে ওঠে। আর বলেছি তাতে হয়েছেটা কী? খেতে পার, বলতে পারব না?

ছোটকু বলে, টৌটনও খাচ্ছিল কিন্তু । তার কথা নিশ্চয়ই বলনি তোমার গার্জেনকে?

বলেছি।

বলেই টুকাই সামলে নেয়। মিথ্যা বলা হচ্চে টের পেয়ে। তাই তক্ষুনি ঢোক গিলে বলে ফের, না বলে থাকলেও যখন-তখন বলে দেব।

ছোটকু হাসতে থাকে। তারপর বলে, তুমি মাইরি যেন কী টুকাই! তিতলিদিকে বলে দিয়ে ভেবেছিলে আমার মাথা কেটে নেবে। ভারি আমি কেয়ার করি তিতলিদির। কিন্তু যদি বাবার কানে তুলতে যাও, টৌটন তোমাকে তুলে আছড়ে মারবে। সাবধান!

টুকাই বাঁকা মুখ করে বলে, ঈশ্! দাদাকে আমি যেন ভয় পাই। দেখ না, এখনই গিয়ে বাবাকে

বলে দিচ্ছি, ছোটলোকের মত তোমরা সব তাড়ি খাও!

তাড়ি খাই, তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে নাকি? ছোটকু আরও হাসে। কী যে বল মাইরি! যাকগে ওসব কথা। ওখানে একা কী করতে এসেছ তুমি?

টুকাই দূরে চোখ রেখে বলে, জামাইবাবুকে ডাকতে।

ছোটকু উঠে দাঁড়ায়। অবাক হয়ে বলে, জামাইবাবু! কোথায় সে?

ওইখানে বসে আছে।

ছোটকু এতক্ষণে দেখতে পায় দীপনারায়ণকে। অনেকটা দূরে মাঠ চিরে আঁকাবাঁকা চলে গেছে একটা কাঁদর, মাঠের স্বাভাবিক জল নিকাশী খাল। চলে গেছে শ্মশানের পাশে রেললাইনের তলা দিয়ে দূরের নদীর দিকে। কাঁদরের পাড়ে একটা বাজপড়া অশ্বত্থগাছ এবং তার তলায় শেয়ালকুলের একটুখানি জঙ্গল। সেখানে বসে আছে দীপনারায়ণ।

ছোটকু বলে, মাইরি! লোকটা যেন কী। ওখানে কী করছে?

টুকাই সেদিকে চোখ রেখে আস্তে বলে, আচ্ছা ছোটকুদা!

উঁ? ছোটকু অন্যমনস্কভাবে সাড়া দেয়।

তোমরা গেঁদাইয়ের সঙ্গে মিশছ। পুলিস যদি তোমাদের ধরে, কী হবে ভেবেছ?

ছোটকু চমকে ওঠে। ভেতরে-ভেতরে একটু চটেও যায় সে। টুকাইটার মধ্যে যেন বড্ড জ্যাঠামি। বয়সের তুলনায় যেন বড্ড বোঝে সবকিছু। এই ব্যাপারটাই যা খারাপ লাগে, নয়তো টুকাই এক আশ্চর্য মেয়ে। আশ্চর্য এবং সুন্দর। টোটনের বোন না হলে ছোটকু কবে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার হঠকারিতা সামলাতে পারত না।

আর তার ওপর এখন হাতা কাটা ব্রাউজ পরে আছে। দুটো ঝকঝকে উজ্জ্বল বাহু দেখে ছোটকুর চোখ জ্বলে যাচ্ছে। কী সুন্দর দেখাচ্ছে আজ টুকাইকে!

রাগটা তক্ষুনি পড়ে গিয়ে একটু হাসে সে। বলে, পুলিসের কথা কেন ভাবছ? গেঁদাই চোর-ডাকাত হতে পারে। আমরাও কি তাই ভাবছ?

টুকাই শক্ত মুখে বলে, তাহলে গেঁদাইয়ের সঙ্গে অত ভাব কিসের তোমাদের?

কারণ দেখাতে ব্যর্থ হয়ে ছোটকু বলে, তোমার এসব নিয়ে মাথা ঘামানো ঠিক নয়, টুকাই! ঘরের শত্রু বিভীষণের মত কথা বলছ।

টুকাই হঠাৎ পা বাড়ায়। হনহন করে নেমে যায় ঢাল বেয়ে। ছোটকু চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। এ মুহূর্তে একটা উটকো ব্যর্থতার বোধ তাকে অস্থির করে। টুকাইয়ের সঙ্গে ওই শূন্য বিশাল মাঠে সে হেঁটে যেতে পারলে খুব খুশি হত, কিন্তু টুকাই যাচ্ছে তার জামাইবাবুর কাছে। ...

শেষ শীতে কাঁদরের তলায় বালি আর নুড়ির ভেতর ঝিরঝির করে একফালি জলের ধারা বয়ে যাচ্ছে। দীপনারায়ণের মনে হয়, বেঁচে-বর্তে থেকে আপন পথে যাওয়ার জন্য এই স্বচ্ছ কালো জলটা যেমন মাথা কুটছে, তেমনি করে অনেক মানুষও বেঁচে-বর্তে আছে পৃথিবীতে। নিছক বেঁচে থাকা বলে কিছু নেই, চলতে পারাটাই আসল কথা।

তার নিজের জীবনটা যেমন। কিন্তু চলেছে কোথায় সে! নিজেকে আজকাল বড় উদ্দেশ্যহীন লাগে। স্কুল মাস্টারি, স্বপাক খাওয়া, মাঠেঘাটে একলা ঘুরে বেড়ানো। বুঝতে পারে না কী করবে। প্রথম যৌবনে মাস্টারিটা পেয়ে খুব সাচ্চা শিক্ষক হবার চেষ্টা করেছিল। আদর্শবাদী হতে চেয়েছিল। হওয়া যায় না। কেউ কারুর কথা শোনে না। পরীক্ষায় পাশ করাটাই ছেলেদের এবং তাদের অভিভাবকদের কাছে মূল লক্ষ্য। কী হবে জ্ঞান-ট্যান নিয়ে? ওটা বাড়তি বোঝা।

প্রথম বউয়ের কথা মনে পড়ে যায় হঠাৎ কোনও মুহূর্তে। বুকটা হু-হু করে ওঠে। সুশীলা তাকে বুঝেছিল। খুব সাচ্চা মেয়ে ছিল সে। তত লেখাপড়া শেখার সুযোগ পায়নি। একেবারে দেহাতি মেয়ে বলতে গেলে। তার বাবা ছিলেন স্থানীয় মন্দিরের পূজারি। ন্যালাভোলা চরিত্রের মানুষ। কিন্তু মেয়ে ছিল বুদ্ধিমতি। শক্ত মনের এবং অসাধারণ সাহসী চরিত্রের মেয়ে। পচনধরা সময় তাকে টিকতে দিল না।

দীপনারায়ণ এতকাল পরে আবার বিয়ে করে বসেছে হঠকারিতায়—ভেবেছিল, নতুন করে শুরু

করবে। সুশীলা যেখানে তাকে রেখে গিয়েছিল, সেখান থেকে।

কিন্তু কোথায় সুশীলা, কোথায় নিরুপমা! মাঝেমাঝে মনে হয়েছে বাঙালী মেয়ে হওয়াতেই গন্ডগোল যেন। অথচ কত বাঙালী মেয়ে তো বিহারী স্বামীর ঘর করছে। কোনও গন্ডগোল ঘটছে না। পূর্ণিয়া, দ্বারভাঙা, দুমকা, মুঙ্গের, ভাগলপুর—কত জায়গায় সে এমন দেখেছে। সবখানেই দিব্যি খাপ খেয়ে গেছে। পৃথিবীর আদত কথা একজন পুরুষ একজন মেয়ের মিশে যাওয়া। দুই নদী এক হয়ে যাওয়া। নদী সঙ্গমে দুরকম জলের একটা সূক্ষ্ম বিভাজন রেখা বাইরে থেকে দেখা যায় বটে, কিন্তু ভেতরে দুই জল এক জল হয়ে বইছে। খানিক দূরে গিয়ে নদীটা এক এবং আরও বড়।

কিংবা নিরুপমা তাকে পছন্দ করছে না। সে বাঙালী মেয়ে না হলেও হয়তো এমন ঘটত। বিয়ের পর এসে রসিকলালজীর বাড়িতে কানাঘুষো কিছু বদনাম শুনেছিল নিরুপমা সম্পর্কে। এখন তাই সত্যি বলে ধারণা হয়।

ধারণার বীজ মাথার ভেতর ছিল বলেই পাকুরে বাসাঘর খুঁজে বউকে নিয়ে গিয়ে থাকার জন্য ততখানি চেষ্টা তার ছিল না। চেষ্টা যতটুকু বা ছিল, তা বাইরে-বাইরে।

তবু কেন সে শ্বশুরবাড়ি এসেছে? নানা অজুহাতে আসতে দেবি করেও অবশেষে এসে পড়েছে কেনই বা? না এলেই ভাল হত।

নিজেকে প্রশ্ন করে দীপনারায়ণ। তখন মনে হয়, আরও খুঁটিয়ে পরীক্ষার দরকার আছে।

জামাইবাবু!

চমকে ওঠে দীপনারায়ণ! ঘরে টুকাইকে দেখে মুহূর্তে তার মনের কষ্টটা সরে যায় কোথাও। হয়তো এই উজ্জ্বল আর অনাবিল সরলতার প্রতীকের মোহেই তার ফিরে আসা—নিরুপমার কাছে অপমানিত হবে জেনেও। সে খুশি হয়ে হাসে। এত দূর চলে আসলে অনুরাধা? তোমার কারেজ আছে।

টুকাই কাঁদরের বুক দেখতে দেখতে বলে, কারেজ কিসের?

না, মানে ...দীপনারায়ণ কথা খুঁড়ে পায় না। শেষে বলে, খুব সুন্দর ওই জলটা, টুকাই। দেখছ?

টুকাই পাড় থেকে নিচে নেমে যায়। একগোছা নুড়ি কুড়িয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে। তারপর মুখ তুলে পাড়ের মাথায় দীপনারায়ণকে দাঁড়ান দেখে বলে, ডেকে আসেননি যে বড়?

ডাকলে তুমি আসতে?

থামুন! চালাকি শুধু। নুড়িগুলো ফেলে দিয়ে আবার নুড়ি কুড়োয় টুকাই। যেন পছন্দ হয় না কোন-গুলো নেবে।

দীপনারায়ণ শুকনো ঘাসের ওপর বসে তার খেলা দেখতে থাকে। একটু পরে বলে, তিতলিদি তোমাকে বহুত সুন্দর করে দিয়েছে, টুকাই! আর দেখ, শাড়িটাও কেমন নতুন করে দিয়েছে তোমাকে। আমার প্রশংসা করছ না কেন তুমি?

টুকাই হেঁট হয়ে নুড়ি দিয়ে বালিতে মুখ আঁকছিল ঘাড় ঘুরিয়ে বলে, প্রশংসা কি কেউ যেচে চায়?

চাইছি টুকাই! তোমাকে কেমন দেখাচ্ছে, তুমি জান না!

টুকাইয়ের গাল লাল হয়ে ওঠে। মুখ ঘুরিয়ে বলে, যাঃ! খালি অসভ্যতা।

দীপনারায়ণ জীভ কেটে বলে, ছি, ছি। এটা কি অসভ্য কথা হল টুকাই? সুন্দর জিনিসকে সুন্দর বলব না? তো কী বলব?

নীল ধূসর আকাশের নিচে খোলামেলা বিস্তৃত মাঠের বুকে এই শীর্ণ জলধাবার পাশে সদ্য যুবতী হয়ে ওঠা এক নারীকে দেখতে দেখতে দীপনারায়ণের হঠাৎ মনে হয়, পৃথিবীতে জীবনের একটা উদ্দেশ্য খুঁজে পাচ্ছে অস্পষ্টভাবে। চড়ুইয়ের ঝাঁক কিচমিচ করছে ওপারের চষাক্ষেতে। সাদা চাঙড়ের ফাঁকে সেখানে ঝাঁক বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে গমের চারা। কোথাও মানুষজন নেই। উঁচু-নিচু কাঁকুরে মাটির বুকে হঠাৎ ওই সবুজ দাগড়া ছোপটুকুর মধ্যে যেমন স্নিগ্ধতা, তেমনি এই টুকাই।

পাড়ের বাজপড়া অশ্বত্থ গাছের মাথায় একটা দাঁড়কাক ডাকতে লাগল। টুকাই তার দিকে নুড়ি ছুঁড়ে তাড়ানোর ব্যর্থ চেষ্টা করে। তারপর জলে হাত দুটো ধুয়ে বলে, আচ্ছা জামাইবাবু?

বল টুকাই।

আপনি ভূত দেখেছেন কখনও?

দীপনারায়ণ হাসে। বহুত দেখেছি। কেন? তুমি কি দেখতে চাও?

টুকাই অশ্বত্থ গাছটা দেখিয়ে বলে এই গাছটাতে নাকি ভূত থাকে।

দাঁড়কাকটাকে দেখিয়ে দীপনারায়ণ বলে, হাঁ - ওই তো ভূত আছে।

আপনার মাথা? ওটা তো দাঁড়কাক। টুকাই পাড় ধরে ওপরে উঠে আসে। ফের বলে, এই গাছে নাকি ভূত থাকে। রাত্তিরে যদি কেউ এখানে আসে, ঠিক শুনতে পাবে ভূতটা কান্নাকাটি করছে। আমার ইচ্ছে করে শুনতে—সত্যি না মিথ্যে। ও জামাইবাবু আসবেন আমার সঙ্গে— আজই রাতে?

টুকাইয়ের এইসব কথা যখনই শোনে দীপনারায়ণ, বুঝতে পারে, যুবতী হয়ে উঠেছে বটে, কিন্তু এখনও এক বালিকার ছায়া তার পেছন হাঁটছে। সেই ছায়া কথা বলে নিজের ভাষায়। দীপনারায়ণ একটা রোমাঞ্চকর ভুতুড়ে গল্প বলবে ভাবে।

কিন্তু টুকাইয়ের শোনার মন নেই দেখে সে চুপ করে থাকে। টুকাই আবার দাঁড়কাকটার পেছনে লেগেছে। পাখিটা এবার হার মেনে বিরক্ত হয়ে চ্যাচাতে-চ্যাচাতে উড়ে পালায়।

বহু দূরে রেল-লাইনে একটা মালগাড়ি আসছে ডাউন থেকে আপে। সেটা চোখে পড়লে টুকাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। দীপনারায়ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ায়। ইচ্ছে ছিল কাঁদর পেরিয়ে দূরের লাল মাটির ঢিপিটা অব্দি যাবে। থাক আজ।

সে পা বাড়িয়ে বলে, চলো টুকাই! ফেরা যাক।

টুকাই বলে, ইচ্ছে করছে না। একটু বসুন না জামাইবাবু।

রোদ লাগছে বহুত। দীপনারায়ণ সূর্য দেখে নিয়ে বলে। আর এখানে নয়, টুকাই! চলো।

চলুন না জামাইবাবু! আমরা এই কাঁদরের ধারে-ধারে রেল-লাইন অব্দি যাই?

আচ্ছা! তারপর?

রেল-লাইনের ধারে-ধারে হেঁটে স্টেশন।

বহুত খুব! তারপর?

তারপর বাড়ি।

প্রস্তাবটা ভালই লাগে দীপনারায়ণের। বাতাসটা একটু তাপ পেয়েছে। ঠোঁট শুকিয়ে যাচ্ছে। তবু মন্দ লাগে না হাঁটতে। এই বিস্তীর্ণ মাঠটাই যেন চাইছে এমন কিছু, বুক পেতে দিয়েছে। যত খুশি হাঁটো। হেঁটে যাও চিরকাল চিরজীবন।

গুনগুন করে গান গাইছে টুকাই, শুনতে পায় দীপনারায়ণ। হাঁটতে হাঁটতে ভাবে, নির্জন প্রান্তরে এলেই মানুষের গান গাইতে ইচ্ছে করে। তারও এমন হয় বরাবর। একলা হয়ে ওঠে বলেই কি নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে চায়, নাকি সাড়া দিতে চায় কাউকে গানের ছলে? কে সে? খুব আবছা ভাবে মনে হয়, প্রকৃতির খুব ভেতর দিকে কেউ যেন আছে মুখ তাকিয়ে, তাকে এমনি করে ডাক দেয় মানুষ।

একটা ঘূর্ণী হাওয়া আসে মাঠের কোণাকুনি। কাঁদর পেরিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে টুকাইয়ের ওপর। বিব্রত টুকাই ঘুরে উল্টোমুখে দাঁড়িয়ে শাড়ি সামলাতে চেষ্টা করে।

গা শিরশির করে ওঠে দীপনারায়ণের। যার জন্য একলা এসে গুনগুনিয়ে ওঠা, সেই যেন এসে ছুঁয়ে গেল টুকাইকে। মাথায় তার খড়কুটোর মুকুট পরা। সাপের খোলস ওড়ে তারই জয়পতাকার মত। নিসর্গের দরজা খুলে বেরিয়ে আসার সময় ওই শনশন শোঁ-শোঁ শব্দ পুরনো জংধরা কপাটের। তাকে মাঝে মাঝে এমনি করে দেখতে পাওয়া যায় একলা কোথাও জনহীন মাঠে।

দীপনারায়ণ কাছে গিয়ে বলে, ভয় পেয়েছিলে?

টুকাই মাথা দোলায়। আবার পা ফেলে। তার চুলে একরাশ খড়কুটো আটকে গেছে। ...

গাহানিয়া সূরযদাসের আজ হাটবারে গান গেয়ে ভিক্ষে করা বন্ধ। গেঁদাই ভোরবেলা এসে হুকুমজারি করে গেছে। ঝোপড়িতে মালটা রাখা আছে। কেউ মেরে দিলেই সর্বনাশ হয়ে যাবে। গেঁদুয়া বলেছিল, বুখার বলে শুয়ে থাকবি বুড়্ঢা! ঝোপড়ি ছেড়ে নড়বিনে একটা পা। তার বদলে এই পাঁচটা টাকা দিচ্ছি। যতক্ষণ না মালটা নিয়ে গিয়ে হাফিজ করছি, ততক্ষণ পাহারা দিবি যেন।

এ তো ভালই। চুপচাপ বসে পাঁচটা টাকা রোজগার। তবু বহুকালের অভ্যাস। সে ঝোপড়ির সামনে বসেই হারমোনিয়াম খুলেছিল। ভিড় জমতে শুরু করেছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার গেঁদাই এসে

ধমকে গেল। ...ক্যা শালা বুড়্‌ঢেলোক ঝামেলা পাকাতা খালি! হারমোনিয়া পুখারমে ফেক দেগা?

এক দেহাতি শ্রোতা আপত্তি করে গেঁদাইয়ের চোখ দেখেই সরে গেছে। গেঁদাইকে এ হাটের সব লোকই চেনে। ইদানীং সে হাটের মালিক রসিকলাল ওঝার লোকেদের নিয়ে আনাজপাতির তোলা তুলেবেড়ায়! দাঁড়িয়ে খবরদারি করে। হাটুরেদের টুঁ করার সাধ্য নেই। গায়ে কালো গেঞ্জি, গলায় লাল রুমাল বাঁধা, কব্জিতে ষ্টিলের বালা, পরনে আঁটো প্যান্ট গেঁদাইয়ের। চেহারায় খুনীর আদল।

অন্ধ মেয়েটা আজ ছুটি পেয়ে খুশি। শালপাতার ঠোঙা ভর্তি তেলেভাজা কিনে এনেছে নির্ভুল পা ফেলে। বাপকে দিয়েছে কিছু। বাকিটা তারিয়ে তারিয়ে খেয়েছে।

হাটবারটা তাদের রান্নার ঝামেলা হয় না। বটতলা জুড়ে গরুমোষের গাড়ির বাথান হয়ে ওঠে। হাটুরে গাড়োয়ানেরা বেলাবেলি রাঁধাবাড়া করে খেয়ে দেয়ে বাকি ভাত-তরকারি গাহানিয়াবুড়োকে দিয়ে যায় মাটির হাঁড়িশুদ্ধ। সেই খাদ্যে পরের দিনটাও চলে যায় বাবা-মেয়ের।

বিকেলে তামাক আনতে গিয়েছিল সুরযদাস। ছেদিলাল দাকাটা তামাক আর খৈনি বেচে হাটতলায় ঢোকার মুখে বাজারের সীমান্তে। কুমোরবুড়ির বারান্দার একটা অংশ সে ভাড়া নিয়েছে। অন্যদিকটা মাটির হাঁড়িকুঁড়ি সাজানো। আজকাল মাটির হাঁড়ির খদ্দের কম বলেই ভাড়া দিয়েছে বাবান্দাব একটা অংশ। আগের দিনে গোটা বাবান্দা জুড়ে হাঁড়ি সরা গামলা থরেবিথরে সাজানো থাকত।

খৈনির লোভেই আড্ডা জমে ছেদিলালের কাছে। পৃথিবীর হালচাল নিয়ে দার্শনিক কথাবার্তা ছেদিলাল ভালই বলে, সেও একটা কারণ। খৈনি তো আছেই।

সুরযদাসকে পেলে দাকাটা তামাকের স্তূপ চিটেগুড়ে মাখার ফরমাস করে ছেদিলাল। আজ তামাক মাখতে দেরি হয়ে গেল গাহানিয়াবুড়োর। বিনিপয়সায় খানিক তামাক পাবে।

হাটতলা খালি হয়ে গেছে বিকেলে। চারদিকে আবর্জনার ডাই। মেথরানি হরমোতিয়া রসিকলালজীব কাছে মাসকাবারি টাকা পায়। সন্ধ্যার মুখে এসে হাটতলা সাফ করে পুকুরের পেছনে খাল-জমিটায় ফেলে দিয়ে আসে। হরমোতিয়ার এক দঙ্গল ছেলেমেয়ে। ছোট-ছোট ঝুড়িতে আবর্জনা বয়ে নিয়ে যায় তারা। তার ভেতব পেয়ে যায় বহু খাদ্যদ্রব্য। পেঁয়াজ, আলু, কানাবেগুন এইসব।

অন্ধ লখিয়া অস্থির হচ্ছিল চায়ের জন্য। ঝোপড়ি ফেলে কোথাও যেতে বারণ করে গেছে বাপ। ফিরে এলে চা এনে খাবে। কিন্তু ফিরতে বড় দেরী করছে গাহানিয়া। সে টের পায়, দিনটা ফুরিয়ে যাচ্ছে বলে পাখী-পাখালির তুমুল ডাক। ওই বুঝি হরমোতিয়াও দলবল নিয়ে হাজির হয়েছে। সাড়া পেয়ে লখিয়া বলে, আ গেইলি মৌসি?

হরমোতিয়া ঝাঁটা পায়ে ঠেকা দিয়ে রেখে খৈনি ডলতে থাকে। কাজে নামার আগে গাহানিয়ার ঝোপড়ির কাছে এসে খৈনি খাওয়া অভ্যাস। গাহানিয়ার কল্কেটাও পুড়ুক পুড়ুক করে কয়েকবার টানতে ছাড়ে না মেথরানি। ততক্ষণে ওর ছেলেমেয়েরা হাটতলার তল্লাসি অভিযান চালায়। বাজখাঁই হেঁকে তাদের পরিচালনা করে সে। কাজে নামার আগে এটা তার তৈরী হওয়া। খৈনি বা তামাক তার দেহে তাকত আনে।

পুরুষালি গড়ন হরমোতিয়ার। চালচলনও তেমনি। স্বামী ছক্কু ছোটখাট মানুষ। বউয়ের দাবড়ানি খেয়ে সবসময় মনমরা। সে এখন বাজারের আড়তে ঝাড়ুদারি করছে। বাজারে দেখা হবে বউ ও ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে। দলবেঁধে বাড়ি ফিরবে সন্ধ্যার পর।

মৌসি! লখিয়া মিনতি করে বলে। চায় পিবি গে?

হরমোতিয়া নাক কুঁচকে বলে, নেহি রী! আভি চা নেহি পিয়েগি।

পি না গে মৌসি! হাম লাতি দুকানমে। লখিয়া এনামেলের পাত্র হাতে উঠে দাঁড়ায়। জেরা ঠাহর যা মৌসি, হাম তুরন্ত লাবেগি।

তো যা! বলে খৈনির দলাটায় জিভের তলায় গুঁজে দেয় হরমোতিয়া।

একটু কুণ্ঠার সঙ্গে লখিয়া বলে, ঝোপড়িমে কুত্তা না ঘুসে। কৈ না ঘুসে। জেরা তু দেখ মৌসি! কথা কেড়ে হরমোতিয়া বাঁকা হেসে বলে, আ রি! কৌন ঘুসে গা তেরি সোনেচাঁদিকা মহলমে? নেহি মৌসি! লখিয়া ফিস ফিস করে বলে। বাবা মানা কিয়া হামরে। ছোড়কে নেহি যানে বোলা। যা, যা। হাম খাড়ি রহি। চা লেকে আ। হাম ভি পিবে থোড়াসা।

চায়ে বড় নেশা লখিয়ার। হারাইয়ের দোকানে গেলে অনেক বেশি চা পায়। তাই সেখানে ছাড়া আর কোথাও চা আনতে যায় না। চঞ্চল এবং নির্ভুল পা ফেলে সে এগিয়ে যায় হাটতলা ছাড়িয়ে।

হরমোতিয়া এদিক-এদিক তাকাচ্ছিল। ঝোপড়ি ছেড়ে যেতে মানা করে গেছে গাহানি বুড়ো। কী আছে ঝোপড়ির ভেতর? টুটাফাটা হারমোনিয়াম একটা। ফেলে দিলেও কেউ নিতে চাইবে না।

দরজার সামনে বসে ভেতরে উঁকি মারে মেথরানি। হঠাৎ লোভে ওর মাথার ভেতরটা গরগর করে ওঠে। গাহানি বুড়োর পয়সাকড়ি থাকতে পারে। কতকাল ধরে গান গেয়ে ভিক্ষে করছে। তার কি অনেক টাকা জমে ওঠেনি এতদিনে? বাস-স্ট্যান্ডে অন্ধা ভিখিরিটি সেবার মরে পড়েছিল। তাপ্পিমারা জামার ভেতর চোরা জেবে কেত্তা শ রুপেয়া নোট! হরমোতিয়া মরিয়া হয়ে ওঠে। ইশারায় সবচেয়ে চালাক ওর মেজ মেয়েটাকে ডেকে নেয়। ফিস ফিস করে বলে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে। লখিয়া বা গাহানি বুড়োকে দেখতে পেলেই যেন তাকে হুঁশিয়ার করে দেয়।

পরের জিনিস নেওয়ার মধ্যে একটা নেশাও যেন আছে। হরমোতিয়াকে সেই নেশায় পেয়েছিল। অবশ্য এরকম অভ্যাস তার বরাবর আছে। কয়েকবার লাঞ্ছনা পেতে হয়েছে। আবার ভুলে গেছে। বেঁচে থাকার জন্য কত কী করে মানুষ। এতো সামান্য ব্যাপার।.....

৫

বাস-স্ট্যান্ডের কাছে থমকে দাঁড়িয়েছিল তিতলি। হরি সিং ছত্রীর পেট্রলপাম্প আর গ্যারেজের পেছনে রাস্তার নয়ানঝুলির মাথায় একটা টালি ছাওয়া ঘর। সেখান থেকে এদিক-এদিক তাকাতে তাকাতে দ্রুত আসছিল সে। তাকে দেখে ভীষণ চমকে উঠেছিল তিতলি। উরু ভার, বুকের ভেতর গুম গুম শব্দ।

ওই ঘরে থাকে সিংজীর ট্রান্সপোর্টের ট্রাক ড্রাইভার মোহন।

মোহন দিঘানিয়ায় এসেছে বছর দুয়েক হল প্রায়। এর মধ্যে সে এখানকার হিরো হয়ে উঠেছে। যাত্রাদলে তাকে ছাড়া পালা নামে না। রাজপুত্র হোক, কিংবা চাষার ছেলে, যে চরিত্রে এসে আসরে দাড়াক, চুপ করিয়ে দেয় অশান্ত দর্শকদের। নিজেই মোশান-মাস্টার, নিজেই সব গানের সুরকার। নিজেই কলকাতার চিৎপুর থেকে পালাব বই নিয়ে আসে।

আবার সেই মোহান শক্ত চোয়াড়ে চেহারায় বিশাল স্টিয়ারিং ধরে বসে থাকে। গ্যারেজের সামনে খাটিয়ায় বসে মদ খায়। হল্লা করে। কথায়-কথায় অশ্লীল খিস্তির চূড়ান্ত করে ছাড়ে।

কিন্তু নেশায় না থাকলে সে সদাশয় ভাল মানুষ। ভদ্রলোকের ছেলে। হিরো। ছোটকু গতবার যাত্রাদলে একটা ছোট্ট পার্ট করেছিল। সেই সূত্রে কিছুকাল মোহনদা ছিল তার গুরু। একদিন বাড়িতে ডেকে এনেছিল তাকে ছোটকু। বাড়ির অবস্থা দেখে এবং ছোটকুর মাকে দেখে মোহন খুব বকাবকি করেছিল ছোটকুকে। এমন জোয়ান ছেলে থাকতে এ অবস্থা হয় কেন? তুমি আমার সঙ্গে লেগে যাও। সিংজীমশাইকে আজই বলছি।

করুণা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে ছিলেন। তিতলি প্রথমে একটু আড়ষ্ট বোধ করেছিল। পরে সঙ্কোচ কাটিয়ে বলেছিল, সিংজীর ওখানেই তো কাজ পেয়েছিল ছোটকু। জিজ্ঞেস করুন না, কেন ছেড়ে এল? সিংজী ওকে সেধে নিয়ে পাম্পে বসিয়ে দিয়েছিলেন। মাসে দুশো করে টাকা দেবেন বলেছিলেন।

মোহন ভুরু কুঁচকে বলেছিল, কী ব্যাপার হে ছোটকু?

ছোটকু বাঁকা মুখে বলেছিল, সিংজী শালাকে এখনও চেনেন না, মোহন দা! সাবধান!

তিতলি বলেছিল, চুপ করতো বাঁদর। নিজের দোষ ঢাকতে খামোকা অন্যের বদনাম। ভাগ্যিস তোকে জেলে ঢোকাননি। অন্য কেউ হলে—

প্রেস্টিজ যাচ্ছে দেখে ছোটকু মোহনের হাত ধেরে টেনে বলেছিল, চলে আসুন মোহনদা! এ শালা কি ভদ্রলোকের বাড়ি? এ জন্যেই তো বাড়িতে থাকি নে।.....

মোহনকে মানুষ হিসেবে সেই থেকে ভালই লেগেছে তিতলির। কতবার হঠাৎ মোহনের কথা মনে পড়ে একটু বিব্রত বোধ করেছে। ছি ছি, তার এমন করে কোন পুরুষমানুয সম্পর্কে কিছু গোপনে ভাবতে নেই। পাপ হবে।

একদিন গ্যারেজের কাছে এই মোহনকে মাতলামি আর কুৎসিত খিস্তি করতে দেখে মোহটুকু চটে গিয়েছিল তিতলির । অথচ গত পুজোয় বাজারের মোড়ে যাত্রার আসরে তাকে অন্য রূপে দেখে আবার বুকের ভেতর ধড়াস করে এক চাপা শব্দ। আবার ক্ষয়ে যাওয়া মোহের ছোপ একটু করে স্পষ্ট হওয়া। আবার পাপবোধ। নিজেকে শাসন।

কিন্তু আজ সকালে তিতলি মোহনের ঘরের ওদিক থেকে নিরুপমাকে ওভাবে বেরিয়ে আসতে দেখে পাথর হয়ে গেছে কয়েক সেকেন্ডের জন্য। নিজের চোখকে সে বিশ্বাস করতে পারে না। মধু ড্রাইভারের সঙ্গে একবার নাকি পালিয়ে গিয়েছিল নিরুপমা। খুব কম লোকে জানে সে কথা। টুকাই না বললে জানতেও পারত না তিতলি। তাহলে আবার আরেক ড্রাইভারের সঙ্গে প্রেম করতে নেমেছে নিরুপমা? এত প্রেম কোথায় থাকে মেয়েদের? তিতলির তো নেই।

নিরুপমার কি রাক্ষুসীর ক্ষিদে? বেচারা দীপনারায়ণের কথা ভেবে তিতলির খারাপ লাগে। ভদ্রলোক শিক্ষিত, স্কুলের মাস্টার বটে, কিন্তু বোকার শিরোমণি। বিয়ে করাই বা কেন, যদি না কলঙ্কিনী বউকে শাসন করে মুঠোয় আটকে রাখতে পারবে?

রাগে ভেতরটা গরগর করে তিতলির। ফোঁস করে শ্বাস ফেলে বড় রাস্তার দিকে একটু এগিয়ে যায়। আকাশিয়া গাছের কাছে দাঁড়ালে মোহনের ঘরটা সামনাসামনি দেখা যাবে। ঘরের বারান্দায় মোড়ায় বসে দাড়ি কামাচ্ছে মোহন। বাঁশের খুটিতে আয়নাটা আটকানো। অন্য কোনদিকে তার দৃষ্টি নেই।

নিরুপমা তিনটে ট্রাকের ভেতর দিয়ে হনহন করেএসে রাস্তায় পৌঁছেই তিতলিকে দেখতে পেয়েছে। হাসছে। তিতলি যেন কিছুই দেখেনি, এভাবে রাস্তার দৈর্ঘ্য বরাবর তাকিয়ে আস্তে পা বাড়ায়। নিরুপমা এগিয়ে আসছিল তার দিকে। কাছে এসে বলে, কী তিতলি? এখানে কী করছ?

তিতলি হাসবার চেষ্টা করে বলে, ছোটকুকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

ছোটকু আর টোটনকে স্টেশনের দিকে যেতে দেখেছি খানিক আগে। নিরুপমা চাপা গলায় বলে, ওদের কী যেন একটা হয়েছে। কদিন থেকে লক্ষ্য করছি, দুজনে চুপি চুপি কী সব কথাবার্তা বলে। বেরিয়ে যায়। জানো কিছু?

তিতলি আস্তে মাথাটা দোলায়।

এস। বাড়ি যাবে না?

চল। বলে তিতলি পা বাড়ায়। একটু পরে ঠোঁটের কোণায় হেসে ডাকে কচি?

উঁ?

তোমাকে মোহনবাবুর ওখানে দেখলাম যেন! তিতলি চেপে রাখতে পারে না। দুম করে বলে দিয়ে ওর মুখের দিকে তাকায়।

নিরুপমা নির্বিকার মুখে আস্তে বলে, তোমার চোখ সবখানে।

চোখের কোনও দোষ নেই। তিতলি হাসে। এই যে যেতে যেতে কথা বলছি, অথচ চোখ কত কিছু দেখছে। যা দেখছে, তা সত্যি না হতেও পারে।

চালাকি কর না। যাওনি তুমি মোহনবাবুর ঘরে?

নিরুপমা ওর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নেয়। বলে, হুঁ গিয়েছিলাম। জানই তো আমার স্বভাব। প্রেমের জ্বালায় অস্থির।

তিতলি কী বলবে ভেবে পায় না। এভাবে জবাব দেবে নিরুপমা, এতটুকু অপ্রস্তুত হবে না, চমকাবে না, সে কল্পনাও করতে পারেনি। অবশ্য নিরুপমার বেহায়াপনা আছে সে লক্ষ্য করেছে। অনায়াসে অশ্লীল আলোচনা সে করে যায়। একটুও বাধে না।

বাজারের মুখে এসে তিতলি হঠাৎ বলে, টুকাই জামাইবাবুকে নিয়ে এসেছিল আমাদের বাড়ি।

নিরুপমা একটু হাসে। আমার বরকে পছন্দ হয়নি তোমার?

ভীষণ হয়েছে। কিন্তু জানই তো ভাই, আমার পথে কাঁটা পড়ে আছে।

কাঁটা-ফাঁটা বাজে কথা। সব নিজের কাছে।

বলতে পার তুমি! তোমার কত সাহস, কচি!

সাহস তোমারও আছে। সাহসকে খুঁচিয়ে জাগাতে হয়। খুব আস্তে কথা বলছিল দুজনে। বাজারের লোকজনের কান বাঁচিয়ে। আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটে ওরা। বাড়ির কাছে এসে তিতলি বলে, এস। একটু গল্প করি কচি! অনেকদিন তোমার সঙ্গে গল্প হয় না।

নিরুপমা চোখে ঝিলিক তুলে বলে, আমার ভয় হয় তিতলি, তোমাকেও খারাপ করে ফেলব দেখবে। সেদিন বলেছিলাম তোমাকে, আমার সঙ্গে মিশতে দেখলে লোকে তোমার কেলেঙ্কারি করে ছাড়বে।

ভ্যাট! এস না। তিতলি ওর হাত টানে।

ইঁদারাতলার রোদে বসে দুজনে। করুণা ঘরে শুয়ে আছে। সাড়া পেয়ে বলেন, তিতলি এলি?

তিতলি সাড়া দেয়, হ্যাঁ মামীমা!

কার সঙ্গে কথা বলছিস?

কচি।

ও। বলে চুপ করে থাকেন করুণা।

তিতলি নিরুপমার দিকে তাকিয়ে তাকে দেখতে দেখতে একটু হেসে বলে, হঠাৎ মোহনবাবুর ওখানে কী?

নিরুপমা চোখ পাকিয়ে বলে, তুমি কি আমার গার্জেন যে কৈফিয়ত দিতে হবে? ওই তো বললাম, প্রেমের জ্বালায় অস্থির।

পার বটে, কচি! সত্যি, আমার অবাক লাগে।

অবাক হবার কিছু নেই। এ তুমিও পার!

রক্ষে কর বাবা।

নিরুপমা ব্যঙ্গ করে বলে, মাছ খাচ্ছ, মাংস খাচ্ছ, সিনেমাও দেখছ, এমন কী থান পরতেও দেখি না। শুধু প্রেম করতেই দোষ? থাক, থাক। আর ন্যাকামি কর না তিতলি! এ দিঘানিয়ায় সবাই ডুবে-ডুবে জল খায়, আমি জানি!

তিতলির বলতে ইচ্ছে করে, ভাগলপুরে যে পরিবারে তার জন্ম হয়েছিল, সে একটা শিক্ষিত পরিবার। চাল-চলন ছিল অন্যরকম। ভাগলপুর শহর—সেও তো এ সৃষ্টিছাড়া দেহাতি দিঘানিয়া নয়। তাছাড়া তিতলি কলেজ অব্দি পড়েছিল। ভাগ্যের দোষে তাকে সব হারিয়ে দূরসম্পর্কের মামার আশ্রয়ে চলে আসতে হয়েছিল। তারপর এ দশবছরে সে গ্রামের মেয়ে হয়ে গেছে পুরোপুরি। দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়তে লড়তে চলেছে। আর কচি তো স্কুলেই পড়া ছেড়েছিল। তার বোন টুকাই অবশ্য টেনেটুনে স্কুল ফাইনালটা পাশ করেছে। মামার কাছে দিঘানিয়ার পুরোনো দিনের কথা সবই শুনেছে তিতলি। কেমন করে সামান্য এক হাট, আর চটি ধীরে ধীরে বাজার হয়ে উঠেছে এবং স্কুল, হাসপাতাল, ব্লক অফিস, থানা এসব গড়ে উঠেছে সেও শুনেছে। তারপর চোখের সামনে এত বছর ধরে তার আরও রূপান্তর দেখে আসছে।

না, তিতলি অন্য ধাতুতে গড়া। পোড় খেয়ে-খেয়ে সে আরও শক্ত হয়েছে। তাছাড়া কচির চেয়ে তার অন্তত পাঁচ বছর বয়স বেশি। কচিকে সে প্রায় ফ্রক পরা চেহারায় দেখেছে বলা যায়। তবু বন্ধুর মত এই যে মেশামেশি, সেও তিতলির খোলামেলা স্বভাবের দরুণ। সবাইকে শিগগির আপন করে নিতে জানে তিতলি।

তিতলি চুপ করে আছে দেখে নিরুপমা বলে, রাগ হল তো?

নাঃ! মাথা দোলায় তিতলি। শ্বাসের সঙ্গে ফের বলে, আমি সব কিছুর বাইরে ভাই।

বাইরে। সেজন্যে কচি মোহনবাবুর সঙ্গে প্রেম করতে গিয়েছিল কিনা তাই নিয়ে মাথাব্যাথা!

তিতলি হাসে। না। নিছক কৌতূহল।

কিংবা হিংসে।

তিতলি তাকায়। ঈর্ষা বোঝাতেই নিরুপমা হিংসে ব্যবহার করছে। বলে, ঈর্ষা কেন কচি? মোহনবাবুর চেয়ে আমি বয়সে কত বড় জান? আমাকে ভদ্রলোক দিদি বলে ডাকেন।

ইস্।

সত্যি। এ জবুথবু বুড়ি হয়ে যাওয়া মেয়েকে দিদি বলে তোমাদের দিঘানিয়ার লোকেরা।

আর তাতে তোমার খুউব কষ্ট হয়।

তোমাকে কথায় এঁটে ওঠা কঠিন, কচি। ছাড় ওসব কথা।

উঁহু। ছাড়ব না। মুখ টিপে হেসে নিরুপমা ফিসফিস করে এবং চোখে কৌতুকের নির্লজ্জ ঝিলিক। করবে মোহনবাবুর সঙ্গে প্রেম?

তিতলি ওর চুল টেনে দেয়। হাসতে হাসতে চোখে জল এসে যায় তার। অকারণ ঠোঁট আঁচলে মুছে বলে, তুমি কী কচি! ওদিকে বেচারা জামাইবাবু এসে তোমার মন পাচ্ছেন না। তুমি—

নিরুপমা দ্রুত বলে, তোমাকে বলেছে তো?

অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে তিতলি। তারপর সামলে নিয়ে বলে, মুখ দেখেই বোঝা যায়। তাছাড়া বউ ফেলে মাঠে মাঠে কোথায় কোথায় বেড়ান। শ্বশুরবাড়ি এসে জামাইদের সবসময় ঘরবন্দি থাকার কথা। সামনে বউ রেখে পুজো, ধ্যান।

জানো তুমি?

কেন জানব না? বিয়ে তো আমারও হয়েছিল। বয়স অবশ্যি তখন টুকাইয়ের মত। তিতলি স্মৃতির ভেতর সরে গিয়ে কথা বলে। কলেজে ঢুকেছি, বাবাও মারা গেলেন। ব্যস, পড়া ছাড়িয়ে কাকা বিয়ে দিয়ে দিলেন। মানিয়ে নিতে পেরেছিলাম খুব শিগগিরই। নইলে খুব কষ্ট হত। কিন্তু—

নিরুপমা তাকিয়েছিল ওর মুখের দিকে। বলে, থামলে কেন তিতলি? বল, শুনি। আমার শুনতে ইচ্ছে করে। তুমি কেমন করে এত সব সহ্য করে থাকো, ভেবে ভীষণ অবাক লাগে। আমি হলে পৃথিবীকে একদিকে রেখে অন্যদিকে গিয়ে দাঁড়াতাম। আমার ওসব ন্যাকামি নেই। কাউকে ধার-ধারার ব্যাপার নেই। কী হবে? বড়জোর মরে যাব, এই তো?

তিতলি বুঝতে পারে না ও কী বলতে চাইছে। ছোট্ট শ্বাস ফেলে বলে, জামাইবাবুকে তোমার হয়তো পছন্দ হয়নি। দেখ কচি, এতকাল পরে বলতে হয়তো দোষ নেই, আমারও কি পছন্দ হয়েছিল আমার বরকে? তবু ওই যে বললাম, মেয়েদের মানিয়ে নিতে হয়। উপায় তো থাকে না। আমাব তো কেউই ছিলই না। তোমার তবু তো বাবা-মা আছে। ভাইবোন আছে। আমার কেউ ছিল না।

নিরুপমা আস্তে বলে , চেষ্টা তো করেছিলাম। পারি না।

পারবে। মনকে বোঝাও, কচি। মেয়েদের হাত-পা ভগবান বেঁধে রেখেই পৃথিবীতে পাঠিযেছেন।

থাক। তোমাকে ঠানদিদির মত উপদেশ দিতে হবে না। ..নিরুপমা হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়।

চলে যাচ্ছ কেন? বসো। গল্প করি।

আমার কত কাজ! নিরুপমা পা বাড়িয়ে বলে।... তোমার সঙ্গে দেখা না হলে এখন সিংজীর বউয়ের সঙ্গে আড্ডা দিতাম।

এত চঞ্চল কেন তুমি, কচি? বরাবর একই রকম। বয়স বুঝি বাড়ছে না? তিতলি ভৎর্সনার সুরে বলে। ...তাছাড়া ঘরে বর রেখে পাড়ায়-পাড়ায় টো-টো করে বেড়ানো ভাল দেখায় না।

ইশ! কী দরদ অন্যের বরের জন্যে!....ইঁটের স্তূপের কাছে হঠাৎ ঘুরে নিরুপমা চোখ নাচিয়ে বলে, পারো তো আমার বরটাকে একটু শাস্তি-টাস্তি দাও। আমি বাঁচি তাহলে।

নিরুপমা স্তূপের আড়ালে হারিয়ে গেলে তিতলির মনটা তেতো হয়ে যায় কিছুক্ষণের জন্য। বড় নির্লজ্জ আর অসভ্য মেয়ে কচি। মনেই হয় না ভদ্রলোকের বাড়ির মেয়ে।..

দুপুরে ছোটকু খেতে এল না। নিরুপমা বলেছিল স্টেশনের দিকে যেতে দেখেছে টোটনের সঙ্গে। তাহলে বাইরে কোথাও গিয়ে থাকবে। করুণা ছেলেকে অভিশাপ দেন। অথচ খাবার সময় বাড়ি না ফিরলে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। ওঁকে পাতে বসাতে তিতলির অনেক কথা খরচ হয়ে যায়।

করুণার তাড়ায় বিকেলে কচিদের বাড়ি গেল তিতলি টোটন ফিরেছে নাকি দেখতে।

উঁচু মাটির ওপর নন্দলালবাবুর পৈতৃক বাড়িটা একলা হয়ে একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। উঠোনে দাঁড়ালে নিচু পাঁচিলের ওপর দিয়ে বহুদূর দেখা যায় চারদিকে।

টোটন ফেরেনি। বাড়িতে বলেও যায়নি কিছু। শোভা গজ-গজ করেন ছেলের জন্য। নন্দলাল গাড়ু হাতে মাঠের দিক থেকে সবে ফিরলেন। বললেন, কে গো ওটা?

আমি তিতলি মামাবাবু!

অ। দাঁড়িয়ে কেন গো মেয়ে? বসো, এখানে বসো। অনেকদিন দেখি না তোমাকে।

ডাক্তার-গিন্নি করুণাময়ীর অস্বাস্থ্য নিয়ে কথাবার্তা চলতে থাকে। শোভা পরামর্শ দেন, হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিলে নিশ্চিন্তে থাকতে পারত তিতলি। কিন্তু করুণা বিষ খেয়ে মরবেন বলে শাসান। তারপর ছোটকুর কথা, টোটনের কথাও প্রসঙ্গক্রমে। শেষে জামাইবাবুর কথা এসে গেল।

দীপনারায়ণের যা ব্যাপার। শ্যালিকাকে নিয়ে এবেলা স্টেশনে বেড়াতে গেছে। স্টেশনমাস্টার অগস্তিবাবু চায়ের নেমন্তন্ন করে গেছেন সকালে এসে।

নিরুপমা তার ঘরে শুয়েছিল। তিতলিকে দেখে উঠে বসে সে। তিতলি বলে, কী হয়েছে কচি? শুয়ে আছ যে? জ্বর নাকি হঠাৎ?

নিরুপমা চুল বাঁধতে বাঁধতে বলে, হুঁ। প্রেম জ্বর।

বাস। তিতলি হেসে ফেলে।...আসামাত্র শুরু হল তোতাপাখির বুলি?

তোতাপাখি হব কোন্ দুঃখে তিতলি? এ আমার নিজের বুলি।

তিতলি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে ওকে।

বসো। দাঁড়িয়ে কী দেখছ? নিরুপমা মিটিমিটি হাসে। চাপা স্বরে খাটের দিকে ইশারা করে বলে, এই দেখ, এখানে আমার আমি আমার বরের সঙ্গে শুয়ে থাকি। অল্পসল্প প্রেমের চেষ্টাও চলে অবিশ্যি। গন্ধে ভুর-ভুর করছে এখনও। যদিও বাসি গন্ধ।

তিতলি ওর চুল খামচে দিয়ে বলে, কী অসভ্য মেয়ে রে' বাবা! সত্যি তোমার কোনও তুলনা হয় না, কচি।

নিরুপমা আয়নার সামনে গিয়ে চুলে চিরুনী টানতে থাকে। আয়নার ভেতর দিয়ে তিতলিকে দেখতে দেখতে সে চোখে ঝিকিমিকি হাসে।....তোমার বরাত তিতলি! আমার বরের সঙ্গে তোমার দেখা হল না এবেলা।

সঙ্গে সঙ্গে তিতলি গম্ভীর হয়ে যায়। নিরুপমার সঙ্গে মেলামেশার চেষ্টা বরাবর সে করেছে। কিন্তু কোনও না কোনও একটা জায়গায় গিয়ে সে আঘাত পেয়ে সরে গেছে। তবু সে কেন আবার কাছ ঘেঁষতে চায় নিরুপমার? আসলে তাকে যেন তলিয়ে বোঝবার একটা গোপন এবং নিষিদ্ধ আগ্রহ তিতলিকে তাতায়। নিরুপমার বেপরোয়ামি, নির্লজ্জতা, উন্মত্ত প্রেম এইসব জিনিস তিতলিকে অবাক করে।

তার মুখ দেখে নিরুপমা আরও মজা পায় যেন। চুল-বেঁধে সে তার কাছে এসে কাঁধে হাত রেখে বলে, ইশ্! মুখখানা দেখে মায়া হচ্ছে আমার। বেচারি কত আশা করে এল! কিন্তু এসেই নিরাশ।

তিতলি ঠোঁটের ফাঁকে এবং শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে বলে, আমি তোমার কাছে এসেছি।

চালাকি! এতদিন তো আসনি?

সময় পাইনি! খেটে খাই, জানো তো! তোমার মত ভাগ্য করে তো আসিনি কচি! বলে তিতলি দরজার দিকে পা বাড়ায়।

নিরুপমা ওকে টেনে এনে বসিয়ে দেয় খাটে। চাপা স্বরে বলে, ঝগড়া যদি হয়, ভাল করেই হোক।

তিতলি গম্ভীর মুখেই বলে, কিসের ঝগড়া? আমি যাই।

ভেংচি কাটে নিরুপমা, যাই! তখন সকালে আমাকে মোহনদার ঘর থেকে বেরুতে দেখেছিলে বললে। শুনে আমার প্রাণটা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল একেবারে। তুমি না হয়ে অন্য কেউ বললে কেলেঙ্কারি করে ছাড়তাম। আর এখন আমি একটু ঠাট্টা করেছি, তাতেই তোমার মুখ ভার। তাহলেই বোঝ, মিথ্যে বললে মনটা কেমন হয়।

তিতলি ওর কথার ভঙ্গীতে একটু নরম হয়। আস্তে বলে, আমি না হয়ে আর কেউ দেখলেও একই কথা ভাবত ।

চোখ জ্বলে ওঠে নিরুপমার। আমি যেখানেই যাই, যা খুশি করি, লোকের কী? বলে সে গলার স্বর নামায়।.... তোমাকে সকালে বলেছিলাম, চোখ সবসময় সত্যি দেখে না। আমি গিয়েছিলাম গেঁদুয়ার খোঁজে। মোহনদার ঘরের পেছন দিয়ে শর্টকাটে। তাছাড়া সামনের রাস্তায় গেলে লোকে দেখে গেঁদুয়াকেও আমার প্রেমিক বানিয়ে ছাড়ত।

তিতলি তাকায় বড় চোখে।... গেঁদুয়ার কাছে কেন?

সব কথাই তোমাকে বলতে হবে?

একটু চুপ করে থেকে তিতলি বলে, কিছুদিন থেকে দেখছি ছোটকু আর তোমার ভাই টোটন ওই ডাকাতটার সঙ্গে খুব মেলামেশা করছে। আমার ধারণা ছোটকু-টোটন ওর পাল্লায় পড়ে সাংঘাতিক কিছু করে ফেলবে।

নিরুপমা গলার ভেতর বলে, ফেলবে কী, ফেলেছে! তুমি একটু বসো। আমি মুখটা ধুয়ে আসি।

ব্রাশে পেস্ট নিয়ে নিরুপমা সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিয়ে বেরিয়ে গেল। বাইরে দিনের আলো মুছে গাঢ় ধূসরতা ঘনিয়েছে। তিতলির এখনই বাড়ি ফেরা উচিত। করুণা আলো জ্বালতে পারবেন না। অন্ধকারে থাকবেন ভেবে সে অস্থির। কিন্তু নিরুপমার খাতিরে নয়, ছোটকু-টোটন-গেঁদাই ব্যাপ্যারটা তাকে আবার অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে। ছোটকু কাল অতগুলো টাকা দেখাচ্ছিল।

নিরুপমা উঠোনে ইঁদারার কাছে বসে দাঁত ব্রাশ করছে অবেলায়। দুবেলা দাঁত পবিষ্কার করে নাকি? বর এসেছে এবং বরের সঙ্গে শুতে হচ্ছে বলেই কি? তিতলির মনে নিষিদ্ধ একটা চিন্তাব রেখা কাঁপতে কাঁপতে সরে যাচ্ছিল এবং কাছে ভেসে আসছিল। সে বিছানার দিকে আড় চোখে তাকিয়েই দৃষ্টি সরিয়ে নিচ্ছিল। সম্ভবত নিরুপমা তার বরকে মেনে নিয়েছে। হাজার হোক, সে মেয়ে তো!

এইসব এতোল-বেতোল চিন্তার মধ্যে নিরুপমা ফিরে এল। সে তোয়ালেতে মুখ মুছে সেটা কাঁধে ঝুলিয়ে ক্রিমের কৌটো খুলল। মুখ টিপে হেসে বলল, একটু সেজে নেই ভাই। বর এসে দেখবে। আমার বরের যা বাতিক!

তিতলি অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটু কৌতুক করে। ... সে তো দেখতেই পাচ্ছি। দুবেলা দাঁত মাজিয়ে ছাড়ে।

নিরুপমা ঠোঁটেব ফাঁকে আস্তে বলে, চুমু-টুমু খেতে হবে না?

তুমি সত্যি বড় অসভ্য, রুচি!

অসভ্যতার কী দেখলে? নিরুপমা নির্বিকার মুখে বলে। দেখতে হলে বাত্তিরে এসে জানালাব ধারে আড়ি পেতো। কেমন?

নন্দবাবুর ডাক শোনা যায়। ....অ রুচি! চা জুড়িয়ে যাচ্ছে যে!

নিরুপমা ক্রিম ঘষতে ঘষতে দৌড়ে বেরিয়ে যায়। একটু পরে দু'হাতে দুটো ভর্তি চাযেব কাপ নিয়ে ফিরে আসে। ... নাও, ধর। বলে সে তিতলিকে একটা কাপ দিয়ে নিজের কাপটা ড্রেসিংটেবিলে রাখে। চুমুক দেওয়ার ফাঁকে ফাঁকে সে প্রসাধন সেরে নেয়। কপালে টিপ আঁকে বড় করে।

তিতলি তাকে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতে থাকে। বলে লিপস্টিক?

থামো। চা খাওযা হোক। আজ একখানা দারুণ মাঞ্জা দেব না? মুণ্ডু ঘুরে যাবে।

বরের?

বরের। এবং আরও কত প্রেমিকের। ...বলে নিরুপমা দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে আসে। তাবপর তিতলির সামনেই শাড়িটা ছাড়ে। শায়া, ব্রেশিয়ার ও ব্লাউজ বদলায়। আলমারি খুলে শাড়ি বের করে।

তিতলি আলমারির ভেতর সাজানো শাড়ির পাহাড় দেখে অবাক হয়ে যায়। অত শাড়ি নিরুপমার?

শাড়ি পরার পর ঠোঁটে লিপস্টিক ঘষতে ঠোঁট দুটো পর্যায়ক্রমে ফাঁক করে এবং বুজিয়ে নিরুপমা ঠোঁটের রঙে সমতা আনে। তারপর হাসি মুখে তিতলির সামনে দাঁড়ায়। ...কেমন দেখাচ্ছে আমাকে গো?

ডানাকাটা পরী।

নিরুপমা দু'হাতে তিতলির গলা জড়িয়ে ধরে বলে, তুমি যদি আমাব প্রেমিক হতে তিতলি!

তিতলি সুগন্ধের উগ্র ঝাঁঝ সহ্য করতে না পেরে ছটফট করে বলে, আঃ! চা পড়ে যাবে ছাড়ো!

নিজেকে জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে তিতলি খাট থেকে নেমে দাঁড়ায়! ব্যস্তভাবে বলে, বড্ড দেরি করে ফেললাম, রুচি। যাই! মামীমা অন্ধকারে আছেন!

সে পালিয়ে যাওয়ার মত হাঁটতে থাকে। তার মনের ভেতর ধিকি ধিকি আগুনের জ্বালা। কেন সে হুট করে চলে গিয়েছিল নিরুপমার কাছে, জেনে-শুনেও? ঐশ্বর্য, যৌবন আর দুঃসাহসের প্রতি তীব্র এমন ঈর্ষায় আর কখনও ছটফটিয়ে ওঠেনি সে। নিরুপমা কি তাকে আঘাত দিল এমনি করে,

সে বিধবা বলেই? নিরুপমা কি তার সকালের স্পষ্টভাষিতার প্রতিশোধ নিল?

গালে থাপ্পড় খেয়ে মুখ লাল করে ফিরে আসা মানুষের মত তিতলি বাড়ি ফিরছিল। দরজার কাছে পৌঁছে হঠাৎ মনে পড়ল, ওই যাঃ! জিজ্ঞেস করে আসা তো হল না কেন কচি গেঁদাইয়ের কাছে গিয়েছিল?

করুণা ইনিয়ে-বিনিয়ে অন্ধকার ঘরে কাঁদছিলেন আর শাপ দিচ্ছিলেন। তিতলি আজ নিষ্ঠুর মুখে গর্জন করল। কী? হয়েছে কী আপনার? আলোটা জ্বেলে নিতে কী এমন কষ্ট হয় শুনি? বাইরে কাজে গেলে একটু-আধটু দেরি হতেই পারে। তার জন্য—

করুণা চুপ করে যান সঙ্গে সঙ্গে। ...

এ রাতে খাওয়ার পর বাইরে আর ঘুরতে বেরোয়নি দীপনারায়ণ। স্টেশনে অগস্তিবাবুর কাছে সন্ধ্যা পর্যন্ত আড্ডা দিয়ে ফিরে একটু চমকে গিয়েছিল নিরুপমাকে দেখে।

চোখ জ্বলে গিয়েছিল আসলে। এত সুন্দর তো কোনদিন মনে হয়নি নিরুপমাকে! দীপনারায়ণের ইচ্ছে করছিল নির্লজ্জর মত আজ ওকে সাধবে। ভালোবাসার খেলা খেলবে।

কিন্তু ঘরে ঢুকেই সে ভড়কে গেল। আগের নিরুপমা কখন এসে ঢেকে ফেলেছে সেই লাবণ্য আর যৌবনকে। সাদাসিধে শাড়ি, কপালে ঘষা টিপ। ফ্যাকাসে ঠোঁট। কানে ঝুমকোর বদলে রিং। হাতের কাঁকনজোড়াও খুলে রেখেছে। দীপনারায়ণ বলে, জানি, আমাকে তোমার পসন্দ হয় না নুিরপমা! তো ঠিক আছে। আও, বৈঠো। বাত করি।

নিরুপমা আলনা গোছানোর ভান করছিল। ঘুরে বলে, নাও! তোমার আবার কী হল হঠাৎ?

কুছু হয়নি। আও, বৈঠো।

খোট্টাই বুলি ছাড়! নিরুপমা চুল খুলে আবার বাঁধে। এটা-ওটা নাড়াচাড়া করে। তারপর ফের বলে, যাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ, তার সঙ্গে বাত কর গে!

ছিঃ নিরুপমা! অনুরাধা তোমার বোন। আমার ভি বোন আছে। ছোট লড়কি!

নিরুপমা তার পাশ দিয়ে খাটে উঠে বিছানায় শুয়ে পড়ে। অন্য পাশে ঘুরে বলে, বড় লড়কিও আছে চেষ্টা করে দেখতে পার। তোমার খোঁজে এসেও ছিল সে।

দীপনারায়ণ ফুঁসে ওঠে। ....তুমি এমন কেন কর নিরুপমা? আমি কী দোষ করেছি?

নিরুপমা কোনও কথা বলে না দেখে সে তার পিঠে হাত রেখে ডাকে। একটু ঠেলে। তারপর তার দিকে ঘোরানোর চেষ্টা করে। নিরুপমা বিরক্ত হয়ে বলে, আঃ! কী কর! আমার ঘুম পাচ্ছে।

দীপনারায়ণ অসহায়ভাবে বলে, কেন আমার কাছে তোমার ঘুম পায়? কেন তুমি এমন হয়ে গেলে নুিরপমা? আগে তো এমন ছিলে না! কত্তো ভাল মেয়ে ছিলে তুমি। কেন এমন করছ, বলবে না?

আঃ! আমার ভাল লাগে না এখন কথা বলতে। ঘুম পাচ্ছে।

না, না। আজ আমি শুনতে চাই। বোল তুমি। দীপনারায়ণ অধীর হয়ে বলে। ওকে টানাটানি করতে থাকে। কিন্তু নিরুপমা পাথর হয়ে গেছে। তাকে নড়াতে এবং কথা বলাতে না পেরে দীপনারায়ণ আস্তে আস্তে উঠে আসে। দরজা খুলে কপাট ভেজিয়ে রেখে বেরিয়ে যায়। ...

৬

ঝোপড়ির দরজার মুখে বসে সূরযদাস পুড়ুক পুড়ুক করে তামাক টানছিল আর খকখক করে কাসছিল। লখিয়া ঘুমকাতুরে মেয়ে। কখন থেকে ঘুমে কাঠ। হাটতলার দিকটা সুনসান আঁধার। একটা নেড়ি কুকুর এসে গাহানিয়ার সামনে তফাতে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ লেজ নাড়ে। তারপর পেছনের দুই ঠ্যাং দুমড়ে নিজস্ব ভঙ্গীতে বসে গাহানিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে। বুড়ো কাসির মধ্যে একবার বলে, ভাগ ভাগ!

তার চোখে ঘুম সহজে আসে না। তামাক খেয়ে-খেয়ে এবং অনেক কাসির পর ক্লান্ত হয়ে শুতে গেলে গয়া-প্যাসেঞ্জার ট্রেনের চাপা শব্দ শোনা যাবে দূরের ব্রিজে। তখন রাত আড়াইটে বাজে।

ধনপতি চৌকিদ্দারের রোঁদের হাঁকটা কোথায় যেন একবার শুনতে পেল। কানের ভুল হতেও

পারে। অনেকটা সময় চলে গেল, তবু যখন এল না চৌকিদার, ভুলই সাব্যস্ত হয়।

সে এলে খুব খুশি হয় সূরযদাস। নিঝুম নিশুতি রাতে কথা বলতে ইচ্ছে করে তার। ধনপতির মত সমঝদার মানুষ কোথায় এ দিঘানিয়ায় যে এক ঝোপড়িবাসী সামান্য মানুষকেও পাত্তা দেবে?

কুকুরটা একবার ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। সূরযদাস বলে, ভাগ ভাগ! সে দেখতে পায় কুকুরটার লেজ খুব জোরে নড়ছে। চেনা মানুষজন দেখে থাকবে। আরও কয়েকবার ঘেউ ঘেউ করে ডাকে কুকুরটা। তারপর চারপায়ে উঠে দাঁড়ায়। এবার পায়ের শব্দ শুনতে পায় সূরযদাস। অভ্যাসে বলে, কৌন গে?

তেরা বাপ বে শালে বুডঢে!

গেঁদুয়া হারামির গলা। রাগে সূরযদাসের ভেতরটা গরগর করে। নেমকহারাম! মনে মনে বলে সে। তোর বাপের ভাগ্যি যে ধনপতিয়ার কানে তোলেনি, তার কাছে চোরাই মাল রেখে গেছে। কানে তুললে এখন হাজতে ঢুকে গিরিধারী সেপাইয়ের ডান্ডা খেতে খেতে এই হিমের রাতে কী দুর্গতি হত তোর।

তিনটিতেই এসেছে ঝোপড়ির সামনে। আঁধারে আবছা তিনটে বদমাস ছোকরার কালো মূর্তি দেখে কুকুরটা গরগর করছে কয়েকপা পিছিয়ে গিয়ে। গেঁদুয়া তেড়ে যায় কুকুরটার দিকে। গাড়োয়ানদের তৈরি ইঁটের উনুন ভেঙে একটা ইঁট তুলে দমাস করে মারে। কুকুরটা জোর বেঁচে চ্যাচাতে চ্যাচাতে অনেকটা দূরে সরে যায়। সেখানে নিরাপদে দাঁড়িয়ে ঘেউ-ঘেউ করে। গেঁদাই আঁধারেই তার দিকে বারবারই ইঁট তাক করে।

ছোটকু বলে, বুড়ো! শিগগির মালটা বের কর।

সূরযদাস নিঃশব্দে ঝোপড়ির ভেতর ঢুকে যায়। সে খুশিই হয়েছে। বুকের ভেতব পাথরের ভার জমেছিল তিনটে দিন। সে ব্যস্তভাবে তার বাকসোর ভেতর হাত ভরে। একরাশ ছেঁড়া কাপড়চোপডেব তলায় ছোট্ট পুঁটুলিটা রাখা আছে। লখিয়াকেও বলেনি কথাটা। তার মেয়েব যা পেট-আলগা স্বভাব। কথায় কথায় দৈবাৎ মুখ ফসকে বলে দিতেও পারত কাউকে।

আঁধারে পুঁটুলিটা খুঁজে হন্যে হয় গাহানিয়াবুড়ো। কাপড়চোপড় বের করতে থাকে। কতকালেব সব কাপড়। কামিজ, লখিয়ার মায়ের একটা শাড়ি, ন্যাকড়াকানি।

ছোটকু বাইরে থেকে তাড়া দেয়। ....কী হল বুড়ো? রাত ভোর করে দিচ্ছিস যে?

কাঁপাকাঁপা হাতে লম্পটা খোঁজে সূরযদাস। দরজার কাছে আগুনের গামলা জুগজুগ করছে। একটা ন্যাকড়া ছিঁড়ে গুঁজে দেয়। ফুঁ দিয়ে আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করে। গেঁদুয়া ধমক দেয়, ক্যা করতা বে শালে বুডঢে।

ছোটকু সাবধানে টর্চ জেলে দরজার মুখে বসে পড়ে। ....লম্প জ্বালছে বুদ্ধু কাঁহেকা। বলবি তো আগে? এই নে আলো দেখাচ্ছি।

টর্চের আলোয় দেখা যায়, লখিয়া এদিকে পিঠ দিয়ে কুঁকড়ে শুয়ে আছে। গায়ে তুলোর কম্বল। সূরযদাস ভীষণ কাঁপছে। কাঁপতে কাঁপতে সে বাকসোটার দিকে ঘোরে। আবার কাপড়-চোপড় ঘাঁটতে থাকে! তারপর খালি বাকসোটা আঁকড়ে ধরে কয়েক সেকেন্ড। ছোটকু বলে, কোথায় রেখেছিস? বের কর না বে!

সুরযদাশ আবার কাপড় হাতড়াতে থাকে। ঝোপড়ির ভেতর তার সামান্য সংসার। সেই সংসার ওলটপালট করে ফেলে সে। বাইরে গেঁদুয়া চাপা গলায় ক্রমাগত শাসায়।

সূরযদাস হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে লখিয়ার ওপর। তাকে ধাক্কা মেরে এবং তার চুল খামচে গর্জায়, অ্যাই লখিয়া! উঠ্। উঠ্ যা।

ছোটকু টৌটন গেঁদুয়া ওর কান্ড দেখে চুপ করে গেছে। ছোটকুর টর্চ নিভে যায়। অন্ধ মেয়েটা কাঁইমাই করে ওঠে। চাপা হুলস্থূলের মধ্যে সূরযদাসের গলা শোনা যায়। কিন্তু ওর ভাষা বোঝা যায় না। ঘড়ঘড়ে গলায় জড়িয়ে জড়িয়ে কীসব বলতে থাকে সে। অন্ধ মেয়েটা বারবার জিজ্ঞেস করে, ক্যা হুয়া গে? ক্যা কিয়া হাম? মারতা কাহে গে? সূরযদাস তার চুল খামচে ধরলে সে এবার চিক্কুর ছেড়ে কেঁদে ওঠে।

রাতদুপুরে হাটতলার দিকে এমন হুলস্থূল ঘটলে লোকেরা জেগে যাবে। ছোটকু আর টৌটন কিছু

খুঁজতে না পেরে হকচকিয়ে গেছে। মুখে কথা সরে না। কিন্তু গেঁদুয়া ব্যাপারটা সঙ্গে সঙ্গে টের পেয়ে গেছে। সে চাপা গর্জন করে ঝোপড়িতে ঢুকে সূরযদাসের কাঁধে থাবা মারে। চোওপ্ শালে বুডঢে বলে লখিয়ার উদ্দেশ্যে আরেক থাবা হাঁকড়ায়। চোওপ শালী! একদম জান নিকাল দেগা! বাবা-মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে চুপ।

গেঁদুয়া বলে, মাল্ কাঁহা? নিকাল জলদি!

সুরযদাস বেদম কাসতে থাকে। গেঁদুয়া ঝোপড়ির দরজায় হাঁটু দুমড়ে বসে আছে। বুড়োর গলায় তার শক্ত হাত। ফের বলে, কাঁহা বে শালে?

সূরযদাস হাঁউমাউ করে কেঁদে ওঠে। ....ঢুঁড়কে নেহি পাতা! ওহি বাকসোমে রাখ দিয়া হাম! তেরা কিরিয়া বাপ—

গেঁদুয়া সঙ্গীদের বলে, বাত্তি দেখাও। জলদি করনা! কাজকর্মে গিয়ে সঙ্গীদের নাম উচ্চারণ মানা। ছোটকু টর্চ জ্বালে ঝোপড়ির ভেতর। লখিয়া কাঠ হয়ে তেরপলের দেয়াল ঘেঁষে বসে আছে। আলুথালু চুল। অন্ধ চোখের ডেলা বেরিয়ে পড়েছে। গেঁদুয়া বুড়োকে ছেড়ে জিনিসপত্র ওলটপালট করে। তারপর শ্বাস ছেড়ে বলে, বাত্তি বুতাও!

ছোটকু আলো নিভিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কী একটা ঘটে যায় অন্ধকারে। সুরযদাস গাহানিয়া আচমকা জন্তুর মত ককিয়ে ওঠে এবং একটা ধ্বস্তাধ্বস্তির শব্দ শোনা যায়। তারপর ক্রমাগত গোঙানি। ঘড়গড়। শ্বাসপ্রশ্বাসের হাঁসফাস।

একলাফে গেঁদুয়া বেরিয়ে এসে লাথি মেরে আগুনের গামলাটা উল্টে ফেলে। তাতেও তার রাগ পড়ে না। সে ঝোপড়ির দরজার কাছে দেশলাই জ্বেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। তারপর হাঁফাতে হাঁফাতে বলে, চলা আও।

অন্ধকারে তিনটে ছায়ামূর্তি বটতলার দিকে দৌড়ে চলে যায়। কুকুরটা দূরে দাঁড়িয়ে অনবরত চিৎকার করছিল। এবার ঝোপড়ির কাছাকাছি চলে আসে। ঝোপড়িতে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠেছে।

তারপর লখিয়ার তীব্র আর্তনাদ শোনা যায়। আগুনের তাপ তাকে টের পাইয়ে দিয়েছে এতক্ষণে, কী ঘটেছে। সে বোবাধরা গলায় চ্যাচাতে চ্যাচাতে পেছনের তেরপল ছিঁড়ে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। নখের আঁচড় কাটে। আঁ আঁ করে চ্যাচায়। ....

দীপনারায়ণ বসে ছিল হাটতলার দক্ষিণে সামান্য দূরে কল্কেফুলের জঙ্গলে ঘেরা পুরনো শিবমন্দিরের বারান্দায়। হঠাৎ কানে এল কোথায় কেউ চেঁচামেচি করছে। প্রথম এত মনোযোগ দেয়নি, তারপর চমকে উঠেছিল। হাটতলার দিক থেকেই শব্দটা আসছে। তারপর জঙ্গলের ফাঁকে ঝিকিমিকি আগুনের ছটা দেখতে পেয়েছিল সে।

হাটতলায় এসেই তার চোখে পড়ে, সূরযদাসের ঝোপড়ি দাউদাউ জ্বলছে। সে দৌড়ে যায়। তার চিৎকার চেচামেচিতে লোকেদের ঘুম ভেঙে যায়। বাজারের দিক থেকে ছুটে আসে অনেক মানুষ।

দীপনারায়ণ জ্বলন্ত ঝোপড়ির কাছে গিয়েই বুঝতে পেরেছিল অন্ধ মেয়েটা ভেতরে আছে। সে পেছনের তেরপলের দেয়ালটা একটানে উপড়ে সরিয়ে লখিয়াকে টেনে বের করে। লখিয়া বলে, বাবা! বাবা! মেরি বাবা মর গেয়া! তাকে দূরে দাঁড় করিয়ে রেখে দীপনারায়ণ দেখে, ছোট্ট জ্বলন্ত ঝোপড়িটা সে উল্টে ফেলে দেওয়ায় আগুনের তেজ কমে গেছে। প্রচন্ড ধোঁয়া উঠছে। একদঙ্গল, লোক এসে দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু কেউ হাত লাগাচ্ছে না। দীপনারায়ণ তেড়ে যায় তাদের দিকে। ক্যা দেখ রাহা আপলোগ? জলদি জলের বালতি আনুন! আগ নেভান!

সামান্য একটা বাসস্থান নগণ্য এক মানুষের। নিতান্ত তেরপল আর কিছু লকড়ির ঠেকা। যা পোড়ার তা পুড়ে গেছে। লোকেরা তত উৎসাহ পায় না।

দীপনারায়ণ ব্যস্ত হয়ে বলে, গাহানিয়া কোথায় গেল? সে সূরযদাসকে খোঁজে। ঝোপড়ির ভেতর থাকলে সে আগেই বেরিয়ে আসত। গেল কোথায় সে?

লখিয়া হিঁপিয়ে-হিঁপিয়ে কাঁদে। বাবা! বাবা গে! বলে আঙুল তুলে ঝোপড়ি দেখায় শুধু।

কাঁহা হ্যায় উও?

ঝোপড়িমে থা। কৈ উসকো মারা! লখিয়া আবার হু হু করে কেঁদে ওঠে।

দীপনারায়ণ চমকে ওঠে। ঝোপড়িটা এখন ধিকিধিকি আগুন আর প্রচন্ড ধোঁয়ার মধ্যে একটা স্তূপ

হয়ে রয়েছে। সে বুঝতে পারে না কী করবে। দিঘানিয়ার লোকেরা যেন মজা দেখতেই এসেছে। দীপনারায়ণ অসহায়ভাবে বলে, একটা বাঁশ তো আনুন।

লোকেরা বুঝতে পারে না বাঁশ দিয়ে কী হবে। এক ভিখিরির ঝোপড়ি পুড়ে গেছে। এ নিয়ে ঘুম পন্ড করার মানে হয় না। একজন দুজন করে কেটে পড়ে ক্রমশ।

দীপনারায়ণ অগত্যা মরিয়া হয়ে আধপোড়া তেরপলের একটা দিক টানতে থাকে এবং তখনই মাংসপোড়া কটু ঝাঁঝালো গন্ধ তার নাকে ঝাপটা মারে। ....

দিঘানিয়া হাটতলার গাহানিয়া সূরযদাসকে ছুরি মেরে তার ঝোপড়িতে আগুন লাগিয়ে পালিয়ে গেছে কারা। আধপোড়া মড়াটা অনিচ্ছা-অনিচ্ছা করে সদরে চালান দিতে হয়েছে পুলিসকে। সারা দিঘানিয়ার লোকের দেখা পাপ চাপা দেওয়া কঠিন। নাম রটেছে গেঁদুয়ার। সে ফেরারি হয়ে গেছে গতিক দেখে। অন্ধ মেয়েটা নাকি তার গলার স্বর চেনে। সে পুলিসকে বলেছে, তার বাবার কাছে গেঁদুয়া কী মাল দাবি করছিল। পুলিস এটুকুতেই সব বুঝে গেছে। মাত্র কয়েকটা দিন আগে কেশবপুর বাজারে এক স্যাকবার দোকানে ডাকাতি হয়েছে। অনেক সোনার গয়না হাতিয়ে কেটে পড়েছিল ডাকাতরা। রাত্রে ঠিক দোকান বন্ধ করার মুখে তারা হামলা করেছিল।

কিন্তু তাহলে সেই ডাকাতির মালটা কী করল সূরযদাস? অন্ধ লখিয়া তার একটুও হদিশ জানে না। সে জানে না কখন গেঁদুয়া তার বাবাকে মালটা রাখতে দিয়েছিল। তার বাবা কোথায় তা রেখেছিল, তাও তার জানা নেই। অনেক জেরা করে এবং ভয় দেখিয়েও লখিয়ার কাছে এব বেশি কোনও কথা আদায় করতে পারেনি পুলিস। এর ফলে বেচারি লখিয়ার এখন হাজতবাস। পুলিসের ধারণা, সূরযদাসের বেটি অনেককিছু জানে। বোঝা যাচ্ছে, গেঁদুয়ার সঙ্গে বরাবর ওদের সম্পর্ক। অবশ্য লখিয়ার পক্ষে শাপে বর হয়েছে। অন্তত একটা আশ্রয় জুটেছে তার। খেতে পাচ্ছে দু মুঠো। ইঁটের দেয়াল ঘেরা ঘরে শুতে পাচ্ছে। কম্বল পাচ্ছে শীতের রাতে।

সূরযদাসের ঝোপড়ির আধপোড়া এবং না পোড়া কিছু জিনিস ধনপতি চৌকিদার বয়ে এনে থানার মালখানায় জিম্মা দিয়েছে। সিঙ্গল রিড হারমোনিয়ামটাও।

ডাকাতির গয়নাগাঁটি কি সূরযদাস কোথাও পুঁতে রেখে গেছে? ধনপতি চৌকিদার, গিবিধারী আর ভজনলাল এই দুই সেপাই, কখনও প্রহ্লাদবাবু ছোট দারোগা হাটতলার এদিকে-ওদিকে কদিন খুব তন্নতন্ন ঢুঁড়েছেন। কোনও সূত্র পাননি। অন্ধ মেয়েটা দফায় দফায় ধমক খেয়েছে। রুলের গুঁতোও খেতে হয়েছে তাকে। ককিয়ে উঠে শুধু বলে, হামরে না মালুম হুলোর! তারপর হিঁপিয়ে-হিঁপিয়ে কাঁদে।

দিন পাঁচেক পরে পুলিস গেঁদুয়াকে ধরে নিয়ে এল মৈলাহাটে তার মাসির বাড়ি থেকে।

পরদিন ভোরে পুলিস এল টৌটনের খোঁজে। টৌটন নেই। নন্দলাল হকচকিয়ে গিয়ে বললেন, কলকাতা যাচ্ছি ইন্টারভিউ দিতে, বলে বেরিয়েছে। ওর কথা আমাকে জিগ্যেস করবেন না। আপনারা ওকে খুঁজে বের করে ফাঁসি দিন, তাতে আমার মাথাব্যথা নেই। আমি মনে কবি, আমার কোনও পুত্র-সন্তান নেই। ছিল মরে গেছে।

বাড়ি অস্বাভাবিক চুপচাপ। দীপনারায়ণ অভ্যাসমত বাইরে কিছুদূর ঘোরাঘুরি করে এসে চা খেতে খেতে শ্বশুরের উদ্দেশ্যে বলে, আমি এই ভয়টাই করেছিলাম। সেজন্য টৌটনকে বললাম কী, তুমি কিছুদিন কোথাও চলে যাও। না গেলে দেখুন তো কী হত এখন?

নন্দলাল অবাক হয়ে জামাইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকেন। একটু পরে বলেন, আমি কিছু বুঝতে পারছি না এর মাথামুন্ডু। টৌটন যে ভেতরে-ভেতরে এমন খারাপ হয়ে গেছে—

কথা কেড়ে টুকাই বলে, যত শাসন আমার বেলা। আমি বলিনি দাদা গেঁদুয়ার সঙ্গে তাস খেলছে, তাড়ি-মদ খেয়ে বেড়াচ্ছে?

নন্দলাল স্বীকার করেন, বলেছিলি। কিন্তু ও তো কবে আমার হাতের বাইরে চলে গেছে।

শোভা ঘরে বসে গোপনে কান্নাকাটি করছিলেন। বেরিয়ে এসে ভিজে চোখে জামাইকে বলেন, তুমি গিয়ে পুলিসকে একটু বুঝিয়ে বল না বাবা। টৌটন আর যাই করুক, ভদ্রলোকের ছেলে। হয়তো একটু মেলামেশা করেছে খারাপ ছেলেদের সঙ্গে। তাই বলে ও কি চুরি ডাকাতি করতে গেছে?

টুকাই চাপা স্বরে বলে, ন্যাকামি কর না তো মা। ওমাসে রেকর্ড-প্লেয়ার কিনল দাদা—আমি জিগ্যেস

করলাম, কোথায় টাকা পেলি রে দাদা, তখন তুমিই দাদার হয়ে আমাকে মারতে বাকি রাখলে!

নন্দলাল আপসের সুরে বললেন, আহা! অত তলিয়ে কি আমরা দেখেছি কেউ? আজকাল ছেলেরা কত স্কোপ পায়-টায়, কত সোর্সে রোজগার করে। সেই ভেবে—অ দীপু! জামাইকে বলেন নন্দলাল, রসিকলালজীর কাছে যাই চল। দুজনেই যাই। উনি ইচ্ছে করলে ব্যাপারটা হাশ-আপ করে ফেলতে পারবেন। সামান্য একটা নাম তো! পুলিসের রেকর্ড থেকে কেটে দিলেই আর প্রব্লেম নেই।

শোভা বলেন, কত বড়-বড় কান্ড করে লোক পার পেয়ে যাচ্ছে আর খামোকা সন্দেহ করে একটা ছেলের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দেবে পুলিস?

নন্দলাল স্ত্রীকে সায় দেন।...এ দিঘানিয়ায় বুকে হাত দিয়ে বলুক তো কোন পয়সাওয়ালা সৎপথে থেকে এত কাঁড়ি-কাঁড়ি পয়সা করেছে? হাতি গলে যাচ্ছে আইনের ফুটো দিয়ে, আর সামান্য একটা মশা!

নিরুপমা বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। কারুর দিকে না তাকিয়ে উঠোনে নামে এবং দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

শোভা ডাকেন, অ কচি! কোথায় যাচ্ছিস।

আসছি।

যাসনে এখন। বাড়িতে এই বিপদ। শোভা চাপা স্বরে বলেন।... চারদিকে ঢি ঢি পড়ে গেছে। তুই যাসনে কচি। লোকে হাসাহাসি করবে।

ততক্ষণে নিরুপমা দরজা খুলে রাস্তায় গিয়ে পৌঁছেছে। নন্দলাল আরও গুম হয়ে হাত বাড়িয়ে গাড়ুটা নেন। বেরিয়ে যান উল্টোদিকের খিড়কির দরজা খুলে।

দীপনারায়ণ আস্তে আস্তে ঘরে ঢোকে। একটু পরে টুকাই তার কাছে যায়। ডাকে, জামাইবাবু!

দীপনারায়ণ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাড়ি কাটার কথা ভাবছিল। ঘুরে বলে, বোল অনুরাধা?

টুকাই নিজের আঙুলের নোখ দেখতে দেখতে বলে, বাড়িতে অসহ্য লাগছে। চলুন না কোথাও ঘুরতে যাই।

দীপনারায়ণ একটু হাসে।..আমারও কুছু ভাল লাগছে না অনুরাধা। ইচ্ছে করছে চুপচাপ শুয়ে থাকি। আমার নিদ পাচ্ছে, জানো?

টুকাই শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলে, ঘুমোন তাহলে। আমি বেরুচ্ছি।

তুমি কোথায় যাচ্ছ? তোমার দিদির মত তোমারও দেখছি পায়ে চাক্কা হয়ে গেছে।

টুকাই আস্তে বলে, চাক্কা কেটে দিতে পারেন না?

দীপনারায়ণ খুব জোরে হেসে উঠবে ভেবেছিল। কিন্তু নিজেকে তখনই দমন করে বলে, পারি না। সেটাই আমার প্রব্লেম। তো অনুরাধা, বুঝতে পেরেছি তোমার খারাপ লাগছে, একটু ওয়েট কর। আমি শেভ করে নিই। কাল থেকে দাড়ি কামানো হয়নি!......

সেই ভোরবেলা থেকে ছেলেকে অভিশাপ দিয়ে ক্লান্ত হয়ে গেছেন করুণাময়ী। ঘুমোচ্ছেন কিনা বোঝা যায় না, চোখ বন্ধ করে গুটিসুটি শুয়ে আছেন লেপের ভেতরে। তিতলি ইঁদারাতলায় মাদুর বিছিয়ে একগাদা জামার বোতামঘর সেলাই করছিল। রোদটা আজ হঠাৎ তেজী হয়ে উঠেছে। বেশিক্ষণ এখানে কাজ করা যাবে না।

ছোটকুর খোঁজে পুলিশ এসেছিল। ছোটকু এ রাতে বাড়ি ফেরেনি। কিন্তু তিতলি জানত ছোটকু খুব শিগগির পুলিসের খাতায় দাগি হয়ে যাবে। জানত বলেই সে নির্বিকার হয়ে আছে।

তিতলিরাণী!

তিতলি মুখ তুলে একটু অবাক হয়ে নিরুপমাকে দেখে। নিরুপমা জোরে পা ফেলে এসে তার পাশে বসে পড়ে। তিতলি বলে, আসামাত্র খোঁচা? আমি কি রাণী? দেখছ না দাসীগিরি করছি।

নিরুপমা ওর কাঁধে হাত রেখে বলে, তুমি কেন আমার ওপর রাগ করেছ বলতো তিতলি?

রাগ? আমার আবার রাগের দাম?

নিজেকে এত ছোট করে দেখাটা ঠিক নয়। নিরুপমা ওকে একটু দুলিয়ে দেয়। আঃ! রাখ তো কাজ। এলাম একটু কথা বলতে, আর উনি ভারি কাজ দেখাচ্ছেন!

অগত্যা তিতলি একটু হাসে।—এই! এক্ষুনি খলিফা এগুলো নিতে পাঠাবে। কাল থেকে ফেলে রেখেছি আলসেমি করে!

কৈ, আমাকে একটা সূচ দাও!

পারবে না। নষ্ট করে ফেলবে।

কী বলছ? বোতামঘর টেঁকা আবার একটা কাজ! দাও সূচ!

কৌটো থেকে সূচ বের করে দেয় তিতলি অনিচ্ছাসত্ত্বেও। সুতোও পরিয়ে দেয়। নিরুপমা সত্যি সত্যি সেলাই করতে থাকে। পরীক্ষা করে দেখে বলে, বাঃ!

পারছি না?

খুব পারছ।

নিরুপমা সেলাই করতে করতে বলে, এই তিতলিরাণী! আমরা দুজনে টেলারিং খুললে কেমন হয় বলতো?

তিতলি আনমনে বলে, ভাল তো হয়। কিন্তু মেসিন চাই যে! বলে সে মুখ টিপে একটু হাসে। বল না তোমার বরকে একটা মেশিন কিনে দেবে।

তুমি বললে দেবে।

আবার ফাজলামি শুরু করলে?

নিরুপমা গাম্ভীর্যের ভান করে বলে, ফাজলামি না। আমার বরকে আমি তো পাত্তা দিই না। তাই আমার কথা শুনবে না। তাছাড়া বউ খলিফার কাজ করবে কী? ভদ্রলোকের মেয়ে, মাস্টারের বউ! মানসম্মান থাকবে না যে! কিন্তু তুমি বললে—

কথা কেড়ে তিতলি বলে, আবার?

সত্যি বলছি, আমার বর তোমাকে খুব পছন্দ করে! সব সময় তোমার কথা টুকাইয়ের সঙ্গে। কচি!

ঠিক আছে বাবা! আর বলব না। কৈ, বোতাম দাও। চুপচাপ দুজনে সেলাই নিয়ে ব্যস্ত থাকে কিছুক্ষণ তারপর তিতলি আস্তে বলে, পুলিস এসেছিল ছোটকুর খোঁজে। ভাগ্যিস ছোটকু বাড়ি আসেনি কাল থেকে। নিরুপমা দাঁতে সুতো কেটে বলে, টোটনের খোঁজেও এসেছিল। টোটন কোথায় গেছে, বলে যায় নি।

আবার একটু চুপ করে থেকে তিতলি বলে, কচি, সেদিন গেঁদুয়ার কাছে কেন গিয়েছিলে?

নিরুপমা বলে, ওকে শাসাতে গিয়েছিলাম। টোটন আমাকে বলেছিল, কোথাও ওরা ডাকাতি করে গয়নাগাটি এনেছে। সেগুলো বোকার মত হাটতলায় গাহানিয়া বুড়োর কাছে লুকিয়ে রেখেছে। কিন্তু ওখানে রেখে ভরসা পাচ্ছে না। তাই আমাকে বলছিল যদি আমি ঠানদিদির ঘরে লুকিয়ে রাখি!

তিতলি শিউরে ওঠে। বলে, সর্বনাশ! তারপর?

নিরুপমা সূচে সুতো পরাতে পরাতে বলল, ওর গালে চড় মারলাম। জানো তো টোটোন বাড়িতে একমাত্র আমাকেই একটু ভয়-টয় করে। ওকে বললাম, তোকে এ পরামর্শ কে দিয়েছে হতভাগা? আমাদের বাড়িতে ডাকাতি করা গয়না লুকিয়ে রাখবি, ধরা পড়লে আমাদের সবার কোমরে দড়ি পড়বে জানিস? টোটন বলল, গেঁদুয়া খুব করে ধরেছে ওকে।

সেজন্য তুমি গেঁদুয়াকে শাসাতে গিয়েছিলে?

হুঁ। গিয়ে ওকে বললাম, তোর সাহস কী রে গেঁদুয়া! তুই কেমন করে ভাবলি আমি তোর ডাকাতির মাল লুকিয়ে রাখব? যাচ্ছি দাঁড়া পুলিসের কাছে। গেঁদুয়া আমার হাতে পায়ে ধরতে এল। বললাম, যদি তোকে টোটোনের সঙ্গে এবার থেকে কোথাও দেখি, তাহলে বুঝতে পারবি তোর কী অবস্থা। তারপর ভাবলাম, যাবার পথে ছোটকুকে শাসিয়ে যাব। তোমার সঙ্গে দেখা হল রাস্তায়। ভাবলাম তোমাকে বলি কথাটা। কিন্তু কীভাবে নেবে ভেবে আর বললাম না।

একটু পরে নিরুপমা চাপা নিঃশ্বাস ফেলে ফের বলে, আমার খুব রাগ হয়েছিল। আর কারুর কাছে লুকিয়ে রাখার কথা ভাবতে পারেনি, আমার কথাই মাথায় এসেছে গেঁদুয়ার। তোমার কাছে রাখার কথাও তো ভাবতে পারত। ভাবেনি। অথচ আমাকে ভেবেছে।

কেন বুঝতে পারছ?

তিতলি অবাক হয়ে বলে, না তো!

খারাপ বলে আমার বদনাম আছে তো! তাই ভেবেছে, একমাত্র আমিই সবরকম পাপের ঘাঁটি হতে পারব, আটকাবে না আমার পক্ষে। নিরুপমা ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে বলে, কী সাহস ছোটলোকের!

এবার তিতলি বুঝতে পারে নিরুপমার কোথায় লেগেছে আসলে। সে বলে, ছোটকু আমাকে বলেছিল, গাহানিয়া বুড়ো গয়নাগুলো কোথায় লুকিয়ে রেখেছে, লখিয়া জানে নাকি।

জানতেও পারে। নিরুপমা বলে। পুলিস ঠিকই বের করে ফেলবে ওর কাছে।

কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না, কচি!

কেন? বিশ্বাস না হওয়ার কী আছে?

গাহানিয়ার কি প্রাণের ভয় ছিল না? কোন সাহসে সে ওদের চোরাই জিনিস লুকোতে যাবে? তেমন মতলব থাকলে কি রাতারাতি মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে যেত না?

নিরুপমা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, হুঁ, সেও সত্যি।

আমার মনে হয় ওদের ঝোপড়ি থেকে দলেরই কেউ পরে চুরি করে নিয়েছে জিনিসগুলো।

তুমি ঠিকই বলছ, তিতলি। নিরুপমা একটু পরে ফের বলে, টোটোন নয়তো? টৌটন হঠাৎ কলকাতা চলে গেল চাকরির ইন্টারভিউ পেয়েছে বলে।

ছোটকুও হতে পারে।

আবার গেঁদুয়াও হতে পারে।

তিতলি শ্বাস ফেলে বলে, লখিয়ার জন্য কষ্ট হয়। বেচারা অন্ধ মেয়ে। উল্টে তাকেই রেখেছে পুলিস। হয়তো দেখবে, মাঝখান থেকে আসল পাপী ছাড়া পাবে। তাকে জেল খাটতে হবে।

নিরুপমা হঠাৎ ঝাঁঝাল স্বরে বলে, ছাড়তো এসব। আমি এলাম তোমার সঙ্গে আড্ডা দিতে। তুমি দিলে মনটাকে বিষিয়ে। অন্য কথা বল!

তিতলি একটু হাসে।.... বেশ তো! অন্য কথাই হোক। বল, তোমার বরের খবর কী?

ইশ্! আমার বরের খবরে খুব যে আগ্রহ তিতলিরাণী।

তিতলি রাগ করতে গিয়ে আবার হেসে ফেলে!....না, মানে, ভদ্রলোকের মুখ দেখে আমার মায়া হয়। এমন ভাল মানুষটাকে তুমি চোখের জলে করে ছাড়ছ!

আঁচল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিও। পাঠিয়ে দেব।

তিতলি ওর চুল খামচে ধরে!—অসভ্য মেয়ে কোথাকার!

আঃ ছাড়ো। লাগে। নিরুপমা আলতো হাতে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে চোখে হেসে বলে, আমি যদি তোমার মত বিধবা হতাম, কবে আবার কাউকে বিয়ে করে ফেলতাম। কিসের পাপ? ওসব আমি মানি না বাবা! তাও তো আজকাল আর আগের মত কেউ মাথা ন্যাড়া করে না! থান পরে না, একাদশী-টশীর বালাই নেই তোমার, মাছ মাংস গেলো, তাও দেখেছি। তবু ন্যাকামি করে আছ কেন ভেবে পাই না! আমি হলে দেখতে কবে কোমরে আঁচল বেঁধে—নাও! এটাও হয়ে গেল। আর আছে?

তিতলি জামাগুলো গোছাচ্ছিল। বলল, না। তুমি হাত না লাগালে কত দেরি হত!

ও তিতলি, টেলারিং করবে?

হুঁ-উ। কিন্তু বললাম তো। মেসিনের দাম কত জানো?

তোমার টেলারিং সার্টিফিকেট আছে না?

আছে।

দাঁড়াও! আজই ক্লার্কবাবুকে গিয়ে জিজ্ঞেস করছি।

কে সে?

আছে। নিরুপমা চোখে ঝিলিক তোলে।...কত লোকের সঙ্গে আমার প্রেম। যাকে যা বলব, ঘাড় কাত করে শুনবে। প্রেম কি সাধে করে বেড়াই আমি?

তিতলির এ মুহূর্তে নিরুপমাকে খুব ভাল লেগে যায়। আশায় আবেগে বুকের ভেতরটা দুলে ওঠে। মনে হয়,বুঝতে ভুল করেছে সে। জামাগুলো গুছিয়ে বেঁধে বলে, বসো। মামীমাকে ওষুধ খাইয়ে আসি।...

৭

রাতে খেতে বসে একটু দ্বিধার সঙ্গে দীপনারায়ণ বলে, ভাবছি কাল মর্ণিংয়ের ট্রেনে চলে যাব।

নন্দলাল বলেন, সে কী কথা?

শোভা ধরা গলায় এবং আঁচলে নাক মুছে বলেন, আমরা এই বিপদের মধ্যে আছি। আর তুমি আমাদের ফেলে চলে যাবে, বাবা?

স্ত্রীর কথায় সায় দিয়ে নন্দলাল বলেন, বিপদ বলে বিপদ! বড়বাবুর কাছে গিয়েছিলাম আজ। চোখ রাঙিয়ে বলল, খুন আর ডাকাতির জোড়া কেস। ছেলেকে হাজির না করালে প্রপার্টি আটক করব। তাহলেই বোঝ। আমার তো চোখের ঘুম চলে গেছে একেবারে! মুখে খাদ্য রোচে না পর্যন্ত।

দীপনারায়ণ আস্তে বলে, মামাজীকে আমি বলেছি। বললেন, দেখছি।

রসিকলালজী তো আমাকেও বলেছেন, দেখছি। নন্দলাল চাপা স্বরে বলেন। কিন্তু যাই বল দীপু, তোমার মামাজীকে তো আমি বরং তোমার চেয়ে ঢের বেশি চিনি। বড্ড গেঁদো মানুষ!

বুঝতে না পেরে দীপনারায়ণ জিগ্যেস করে, আজ্ঞে?

আইড্‌ল। নন্দলাল ব্যাখ্যা করেন। সে জন্যই ভাবছিলাম, তোমাকে সঙ্গে করে কাল সকালে একবার যাব। উনি যদি বড়বাবুকে বলে দেন, টোটন বেঁচে যাবে এ দফা।

টুকাই শুনছিল চুপচাপ। হঠাৎ বলে, যাবেন না জামাইবাবু! দাদার শিক্ষা হোক!

নন্দলাল তাকান তার দিকে। শোভা ধমক দেন, তুই থামতো। ছোট মুখে বড় কথা খালি।

টুকাই দমে না। ঝাঁঝল স্বরে বলে, একটা বুড়োমানুষ ভিক্ষে করে খায়, তাকে খুন করে আগুন জ্বালিয়ে—অন্ধ মেয়েটাকে পর্যন্ত—

উত্তেজনা আর ক্ষোভে তার কথা থেমে যায়। দীপনারায়ণ অবাক হয়ে তাকে লক্ষ্য করে। নন্দলাল একটু কেসে বলেন, আহা! টোটন তো কিছু করেনি। করেছে গেঁদুয়া!

শোভা রাগে গজগজ করতে করতে রান্নাঘরে ঢুকে যান। টুকাই ভাঙা গলায় বলে, এ বাড়িতে কারুর থাকতে ইচ্ছে করে? যদি মেয়ে না হয়ে ছেলে হতাম, এতক্ষণ আমাকে দেখতে পেতে না কেউ।

দীপনারায়ণ হেসে ফেলে। ....অনুরাধা! তুমি কী বলছ? আও, আও মেরা পাশ। বইঠো। সে হাত নেড়ে ডাকতে থাকে।

নন্দলাল বলেন, বড্ড মুখ হয়েছে তোর টুকাই!

টুকাই হঠাৎ ফুঁপিয়ে ওঠে। ...আমি যদি লখিয়া হতাম!

কান্না জড়ানো গলায় এই কথাটা বলে সে ছুটে গিয়ে তার ঘরে ঢোকে।

শ্বশুর-জামাই পরস্পর মুখ তাকাতাকি করেন। তারপর দীপনারায়ণ বলে, আসলে ওর মনটা খুব নরম। সেদিন অতক্ষণ দাঁড়িয়ে ডেডবডি দেখেছিল, এতে ওর মনে খুব শক্ লেগেছে। তারপর থেকে আমাকে সব সময় শুধু ওইসব কথা বলেছে। এত বোঝাচ্ছি, বোঝে না।

আমার দুটি মেয়েই একই ধাতুতে গড়া! বলে নন্দলাল আঁচাতে যান ইঁদারাতলায়।

পরে মনে মনে খুব হেসেছিল দীপনারায়ণ। একই ধাতুতে নয়, দুরকম ধাতুতে গড়া দুই বোন। নিরুপমা তো নির্বিকার। এতটুকু ভয় দুঃখ অনুশোচনার লক্ষণ তার মধ্যে নেই। খাচ্ছে, ঘুরচে, ঘুমোচ্ছে মড়ার মত। আর অনুরাধার ভেতরে যেন অদ্ভুত এক আগুন জ্বলছে, তার শরীর থেকে ঠিকরে পড়ছে একটা আভা। অস্থির, দুঃখিত, ক্ষুব্ধ। 'আমি যদি লখিয়া হতাম!' খুব অবাক হয়ে গেছে দীপনারায়ণ। কেন অনুরাধা এমন করে ভাবতে পারছে? অনুভূতিপ্রবণ মেয়ে বলেই কি?

হাটতলায় গিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে দীপনারায়ণ। অন্ধকার হিম নির্জন হাটতলায় সেই জুগজুগে আগুনটা আর নেই। কাসির শব্দ নেই। সিঙ্গল-রিড হারমোনিয়ামের সুরে লোকসঙ্গীত গায় না কেউ। রাতের হাটতলার চরিত্রটাই বদলে গেছে। হু-হু শূন্যতা শ্বাস ফেলছে শুধু।

ফিরে এসে দেখে, নরুপমা শুয়ে পড়েছে অন্যদিনের মত। দরজা আটকানোর শব্দে চোখ খুলে আবার বন্ধ করে সে। দীপনারায়ণ মৃদুস্বরে বলে, কাল মর্নিংয়ে চলে যাব ভাবছিলাম।

নিরুপমা সেকথায় কান না করে বলে, তিতলি তোমার কথা বলছিল।

কে? দীপারায়ণ একটু চমকে ওঠে।

তিতলি। চেনো না বলে ন্যাকামি করো না।

দীপনারায়ণ হাসবার চেষ্টা করে। ....বুঝেছে। তো কী বলছিল আমার কথা?

বলছিল তুমি ওর হাতে-সেলাই পাঞ্জাবির প্রশংসা করেছো। বলেছ ঠিক ওইরকম একটা চাই। কাপড় কিনে দেবে।

হ্যাঁ হ্যাঁ। দীপনারায়ণ মাথা নাড়ে। ঠিক, ঠিক। আজ সামকো—সন্ধ্যার সময়েতে বাস-স্ট্যান্ডের ওখানে দেখা হয়েছিল। তো তুমি কেমন করে জানলে? তোমার সাথ ভি দেখা হয়েছিল?

নিরুপমা ওপাশে ঘুরে বলে, হুঁ।

দীপনারায়ণ ওকে টেনে ঘুরিয়ে দেয় এপাশে। ...তো বোলো কী বাত হল তোমার সঙ্গে?

নিরুপমা বাঁকা হেসে বলে, ইশ্! সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ চঞ্চল উঠেছে।

ছিঃ নিরুপমা! চঞ্চল হব কেন? তুমি বলছ, তাই আমিও ভি বলছি। দীপনারায়ণ খি-খি করে হাসে। তারপর হঠাৎ হাসি থামিয়ে বলে, হাঁ-হাঁ। তিতলি বলছিল, তুমি ওর সঙ্গে টেলারিং শপ করবে বাজারে।

তুমি বলেছে মেশিন কিনে দেবে।

তিতলি বলল তোমাকে?

বলল।

একটু চুপ করে থেকে দীপনারায়ণ গম্ভীর হয়ে বলে, তুমি যদি ভাব, তিতলিব জন্য আমি মেসিন কিনে দেব বলেছি, তো সেকথা ভুল। তোমার জন্য দেব।

নিরুপমা শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বলে, আমাকে তুমি নিয়ে যাবে না পাকুড়ে?

দীপনারায়ণ অবাক হয়। ....তুমিই তো বলেছ যাবে না। কভি তুমি আমার সাথ কোথাও যাবে না। দেহাতে গিয়ে তোমার বহুত কষ্ট হয়েছে। তাই তুমি প্রমিস করেছ, কোথাও যাবে না। লেকিন এখন যদি বল, যাবে, তাহলে নিয়ে যাব না কেন? বোলো নিরুপমা, যাবে তুমি?

নিরুপমা চুপ করে থাকে।

কি হল? বাত তো বোলো নিরুপমা?

দিঘানিয়া ছেড়ে কোথাও আমি যাব না।

তো ঠিক আছে। ....

দুজনেই চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর নিরুপমা একটু হাসে। ....সেলাই মেসিন তুমি আমার জন্য কিনে দেবে না। দেবে তিতলিকে।

ক্ষুব্ধ দীপনারায়ণ বলে, যদি তাই দিই, তোমার তাতে জেলাস হবার কিছু নেই। কারণ তুমি আমাকে পছন্দ করো না, ভালবাস না। ভালবাসা থাকলে তো জেলাসি হবে।

না থাকলেও হয়। মেয়েদের এমন হয়।

তোমাকে আমি চিনতে পারি না, নিরুপমা। তোমার বোনকে চিনতে পারি। তোমাকে পারি না। বলে দীপনারায়ণ জামা-কাপড় বদলাতে ওঠে।

সে টেবিলল্যাম্পটা নিভিয়ে দিয়ে কাপড় বদলায়। নিরুপমা অন্ধকারে বলে, কাল তাহলে পাকুড় যাচ্ছ না। সেলাইমেসিন আনতে যাচ্ছ। তোমার সঙ্গে তিতলি আর আমি যাচ্ছি।

কাল কেমন করে হবে? অত টাকা তো আমার নেই!

মিথ্যে বল না। আছে—আমি দেখেছি।

দীপনারায়ণ শুকনো হাসে। ওই টাকায় হবে?

তিতলি বলেছে হবে।

দীপনারায়ণ টেবিলল্যাম্পটা আবার জ্বেলে খাটে এসে চিত হয়ে শুয়ে বলে, লেকিন বাড়িতে এখন টোটনের জন্য ঝামেলা। এখন—

ওকে থামিয়ে নিরুপমা দুহাতে জড়িয়ে ধরে। দীপনারায়ণ তবু সাড়া দেয় না। সে জানে, স্বার্থপর নিরুপমা সামান্য একটা সেলাইমেসিনের জন্য এখন হুজুগে মেতে উঠেছে। এই আদর তারই খাতিরে। ....

গিরিধারী সেপাইয়ের মনে দয়া হয়েছিল। একটা ছোট্ট লাঠি দিয়েছে থানার মালঘর থেকে ঢুঁড়ে। লখিয়া সেই লাঠি হাতে পা ফেলে আর লোকের উদ্দেশ্যে বলে হামরে ছোড় দেইলা বাবুজি! হামরে ছোড় দেইলা। তার মুখে হাসি ঝলমল করে। পায়ের শব্দ পেলেই সে বলে ওঠে, হামরে ছোড় দেইলা!

তার নামটা আসামীর তালিকা থেকে বাদ দিয়েছেন দারোগাবাবু। এ কেসে লখিয়াকে করবেন প্রসিকিউশন উইটনেস—রাজসাক্ষী। গেঁদুয়াকে সদরকোর্টে চালান দিতে হয়েছে। এখন সে জেল-হাজতে বিচারাধীন কয়েদি। ছোটকু আর টৌটনের নামে হুলিয়া জারি করেছে পুলিস। কেশববাবুর, বাজারে যে স্যাকরার দোকানে ডাকাতি হয়েছিল, তাঁর মুরুব্বির জোর গেঁদুয়ার মরুব্বির চেয়ে বেশি। দিঘানিয়া থানা ঝেড়ে ফেলতে পারল না কেসটা নিছক দুর্ঘটনা বলে।

ধনপতি চৌকিদারের বাড়ির দিকে যাচ্ছিল লখিয়া। লোকজনকে জিগ্যেস করতে করতে সে পা ফেলছিল। ধনপতিয়ার বাড়িতে সে কখনও যায়নি। গেলে ঠিক পৌঁছুতে পারত। কিন্তু খুব অবাক হয়ে গেছে সূরযদাসের মেয়ে। ধনপতিযা তার বাপের কাছে তামাক খেত। আড্ডা দিত রাতবিরেতে। কত সুখ-দঃখের গপ্প করত। সেই ধনপতিয়া আজ তার খোঁজ পর্যন্ত নেযনি। থানায় তাব সাড়া পেয়েছে লখিয়া। ডাকাডাকি করেছে। ও গে ধনপতিয়া কাকা! কাকা, আমি লখিয়া। হামরে পাকাড লিযা গে কাকা! তু হামরে ছোড়া দে ধনপতিয়াজী! সেপাইবা ধমক দিয়ে থামিয়ে দিয়েছে তাকে। ধনপতি কথা বলেনি তাব সঙ্গে।

ধনপতিয়া আসলে ভয় পেয়েছিল। সূবযদাসেব কাছে তামাক খেত সে। আড্ডা দিত বার্তবিবেতে বোঁদে গিযে। তাই কেসে জড়িয়ে যাবার ভয়টা ভীষণ তার।

এখন সকালবেলায় সূবযদাসের মেয়েকে সামনে দেখে ধনপতি গুম হয়ে যায। লখিয়া একমুখ খুশি নিয়ে বলে. হামরে ছোড় দেইলা, কাকা!

ধনপতির বউ কপিলাব মনে একটু দয়া হয় অন্ধ মেয়েটাকে দেখে। বলে, ব্যাঠ বি। হঁযা ব্যাঠ ধুপমে।

লখিয়া উঠোনে বসে পড়ে। হাসিমুখে বলে, গিরিধারীজী হামরে বোটি, চায়ভি দেইলা। বোলা, তু চৌকিদার কাকাকা ঘর যা। তাই আমি এলাম।

কপিলা বলে. এসেছিস তো ভাল করেছিস। তোদের ঝোপড়ি তো হারামি গেঁদুযা জ্বালিয়ে দিয়েছে। যাবিই বা কোথায়?

ধনপতি বউয়ের দিকে ট্যারা চোখে তাকিয়ে ছিল। ঘোঁত ঘোঁত করে বলে. আমি বেরুচ্ছি।

লখিয়া বলে, আমার সঙ্গে কেন কথা বলছ না ধনপতিকাকা?

ক্যা বোলু রি? ধনপতি কাকাকা রুখে বলে। তোর বাবা যে গেঁদুয়াদেব ডাকাতি করা মাল লুকিয়ে বাখত, একটু যদি জানতাম! তাহলে কি তোর বাবার কাছে তামাক খেতে যেতাম কখনও?

লখিয়া প্রতিবাদ করে। নেহি, নেহি গে কাকা। মেরি বাত তো শুনো!

আমার সময় নেই। পঞ্চায়েত অফিসে এখন মিটিং বসবে। আমাকে সেখানে হাজির থাকতে হবে। বলে ধনপতি চৌকিদার বউয়ের দিকে কড়া নজর ফেলে বেরিয়ে যায়। নীল পাগড়ীটা রাস্তায় গিয়ে মাথায় জড়াবে।

একটু চুপ করে থাকার পর লখিয়া চাপা স্বরে বলে, কাকি! আমি চৌকিদারকাকাকে যে কথাটা বলতে এসেচি, শুনল না। চলে গেল।

হামরে বল না রি! কপিলা ওর কাছে গিয়ে ন্যাড়া মাটিতে ধেবড়ে বসে পা দুটো ছড়িয়ে।

লখিয়া ফিসফিস করে বলে, গেঁদুয়া যে মালটা না পেয়ে বাবাকে মারল, ঝোপড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দিল, সেই মালটা আছে হরমোতিয়া মেথরানির কাছে।

চমকে ওঠে কপিলা। ....সে কী রে লখিয়া? তাই যদি জানিস তুই, কেন বড়বাবুকে বলিসনি? নাকি বলেছিস?

বলিনি কাকি। লখিয়া ধরা গলায় বলতে থাকে। বাবা বলেছিল ঝোপড়ি ছেড়ে যেন কোথাও না যাই। তো-আমার খুব চা খেতে ইচ্ছে করছিল। এমন সময় হরমোতিয়া এল হাটতলায় ঝাড়ু দিতে। তাকে বললাম, একটু দাঁড়াও না মাসি এখানে। আমি চা নিয়ে আসি।

কপিলা শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বলে, তুই জানিস না হরমোতিয়া এক নম্বর চুন্নি? চুট্টিন মেয়ে!

দম নিয়ে ঢোক গিলে লখিয়া বলে, ওকে রেখে চা নিয়ে এলাম। ওকে ভি দিলাম। চা খেয়ে ও হাটতলায় ঝাড়ু দিতে গেল। কাল রাতে আমার আচানক মনে হল, আমি যখন চা আনতে গিয়েছিলাম, তখন হরমোতিয়া আমাদের ঝোপড়িতে ঢুকেছিল।

কপিলা ফোঁস করে শ্বাস ছাড়ে। মাথা নেড়ে বলে, ঠিক, ঠিক। তাই হরমোতিয়ারা দিঘানিয়া ছেড়ে কাউকে কিছু না বলে রাতারাতি পালিয়ে গেছে।

লখিয়া নড়ে ওঠে। ....ভাগা হরমোতিয়া?

হাঁ রি। উসকি মরদ, লড়কা-লড়কি সবকোই ভাগা! কপিলা তেতো মুখে বলে। ওরা থাকত রসিকলালজীর আড়তের পেছনের ঝোপড়িতে। ঝোপড়ি রাগ করে ভেঙে দিয়েছেন রসিকলালজী।

লখিয়া ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। কপালে থাপ্পড় মেরে বলে, আমার দোষেই বাবা মারা পড়ল ডাকুদের হাতে। আমি এখন কী করব, কোথায় যাব রি কাকি? হাম অন্ধা!

চুপ চুপ। কাঁদিস না! কপিলা ওকে সান্ত্বনা দেয়। এসেছিস যখন, তখন থাক। ওবেলা তোকে নিয়ে বাবুজীদের কাছে যাব। রসিকলালজী, সিংজী সকলের কাছে যাব। বলব, একটা ঝোপড়ি অন্তত বানিয়ে দেন আপনারা। বাপের মত গাহানিয়া করবে। ভিখ মেঙেই খাবে না হয় বাপের মত। ভগবান চোখ দেননি, অথচ, গতরখানা দিয়েছেন। কী আর করবি বেটি তুই! চুপ, মাত রো। ....

৮

দিঘানিয়ার মাঠ থেকে যে দক্ষিণের হাওয়া বইতে শুরু করেছিল, শীতের হিমকে তা হিমালয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে ক্রমশ। সূর্য চলে এসেছে উত্তরায়ণে। পিচ রাস্তার ধারে ন্যাড়া গাছগুলোতে ফিকে সবুজ কচিপাতার ঝালর। ব্লক-অফিসে কৃষ্ণচূড়ায় ফুল ফোটার উত্তেজনা চোখে পড়ে। পঞ্জিকার হিসেবে বসন্তঋতু এসে গেছে। শেষ রাতে ঈষৎ হিম। চাদর টেনে গায়ে জড়াতে হয়।

দীপনারায়ণের ছুটির মেয়াদ এখনও ফুরোয়নি। রোজই যাবার কথা বলে, বাধা পায়। শ্বশুর-শাশুড়ি শ্যালিকা তো বটেই, নিরুপমাও বলে, আর দুটো দিন থেকেই যাও না কেন। তারপর চোখে ঝিলিক তুলে বলে, তুমি চলে গেলে তিতলির কষ্ট হবে যে! তখন আমাকে আর কাজ শেখাবে না। মেসিন নিয়ে তখন কী করব বলতো?

দীপনারায়ণ আর রাগ করে না এ কথায়। কিন্তু তার মনে এতদিনে একটু ধাক্কা লেগেছে। সত্যিই কি তিতলি তার সম্পর্কে এমন কিছু বলে, যাতে নিরুপমার মনে এই ধারণাটা গড়ে উঠেছে? সেলাই মেসিনটা তিতলি নিজের বাড়িতে রাখতে চায়নি। নিরুপমার ঘরে সেটা আছে। তিতলি রোজ দু'বেলা খোঁড়া মিয়া খলিফার দেওয়া কাজগুলো নিয়ে হাজির হয় নিরুপমার কাছে। দুজনেই হাত লাগায়। কয়েকটা দিনেই নিরুপমা মেসিন চালাতে শিখে নিয়েছে খানিকটা। একদিন ছুঁচ ফুটিয়ে রক্তারক্তিও করেছিল।

তিতলি যতক্ষণে ঘরে থাকে, দীপনারায়ণ ঢোকে না। অথচ তিতলি এলে সে খুশি হয়। একটা চাপা উত্তেজনা অনুভব করে। ওরা কাজ করতে করতে চাপা গলায় কথাবার্তা বলে এবং হাসাহাসি করে। দীপনারায়ণের শুনতে ইচ্ছে করে আড়ি পেতে। হঠাৎ তিতলির হাসি শুনে তার বুকটা ধড়াস করে ওঠে।

নিরুপমার পাড়া বেড়ানো বন্ধ হয়েছে মেসিনটা পেয়ে। টুকাইয়ের টানে দীপনারায়ণকে বেরুতে হয়। গল্প শোনাতে হয় আগের মত। কিন্তু টুকাই টের পেয়েছে, জামাইবাবু আজকাল কেমন যেন অন্যমনস্ক।

বিকেলে আজ বেরুনোর ইচ্ছে ছিল না দীপনারায়ণের। টুকাইয়ের টানাটানিতে হাটতলা অব্দি গেল। গিয়ে দেখে, অন্ধ লখিয়া চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, হাতে একটা ছোট্ট লাঠি। টুকাই বলে, কী রে লখিয়া? এখানে একা কী করছিস তুই?

লখিয়া বলে, কৌন গে?

আমি টুকাই!

লখিয়া চঞ্চল হয়ে ওঠে। টুকাইদিদি বাবুলোক হামরে এক ঝোপড়ি বানা দেইলা বাস-ইস্টান্ড মে।

তাতো দিয়েছে। এখানে একা কী করতে এসেছিস?

লখিয়া সে কথার জবাব না দিয়ে বলে, তোমার জামাইবাবু চলে গেছে টুকাইদিদি?

টুকাই দীপনারায়ণের দিকে একবার হাসিমুখে তাকিয়ে নিয়ে বলে, না। এইতো আমার সঙ্গে।

লখিয়া ঠাহর করে একটু এগিয়ে আসে। ....বাবুজী, আপনি চুপ করে আছেন কেন? কথা বলছেন না আমার সঙ্গে। আপনি আমার জান বাঁচিয়েছিলেন। তারপর আমি কত খুঁজেছি আপনাকে! বাবুজী!

দীপনারায়ণ একটু কেসে সাড়া দিয়ে বলে, বল লখিয়া!

লখিয়া নাক ঝেড়ে ধরা গলায় বলে, আপনি আমাকে সে রাতে টেনে বের না করলে, আমি ভি পুড়ে মরে যেতাম!

দীপনারায়ণ বুঝতে পারে, বেঁচে যাওয়ার কৃতজ্ঞতা আর আনন্দে অন্ধ মেয়েটা কাঁদছে। ওকে থানায় আটকে রেখেছে শুনে তার খারাপ লেগেছিল। কিন্তু ওই কেসে তার শ্যালক টৌটনও ফেঁসে গেছে। তাই শ্বশুরবাড়ির মুখ চেয়ে তাকে চুপ করে থাকতে হয়েছিল। রসিকলালজীর কাছে শুধু টৌটনকে বাঁচানোর অনুরোধ করতে গিয়েছিল সে। বলতে পারেনি লখিয়ার কথা। এখন লখিয়াকে সামনে দেখে তাই তার খারাপ লাগে। বলে, চলি লখিয়া! ঘুমতে বেরিয়েছি আমরা।

লখিয়া চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। যেতে যেতে হঠাৎ টুকাই পিছিয়ে এসে লখিয়ার সামনে দাঁড়ায়। দীপনাবায়ণ বলে, কী হল অনুরাধা?

টুকাই চাপা স্বরে বলে, হ্যাঁরে লখিয়া, সত্যি বলতো! গেঁদুয়াদের সঙ্গে দাদা ছিল কিনা? ছোটকুদা ছিল কিনা? সত্যি বলবি কিন্তু!

লখিয়া কিছুক্ষণ গুম হয়ে থাকে। তার সরু নাকের দুটো পাশ ফুলে একটু-একটু কাঁপে। ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে সে বলে, আমি তো চোখে দেখতে পাই না, টুকাইদিদি! হাম অন্ধা!

তাহলে গেঁদুয়াকে কেমন করে দেখলি?

ওর গলা চিনি আমি। লখিয়া হাঁসফাঁস করে জলে ডোবা মানুষের মত ছটফটিয়ে বলে, গেঁদুযা বাবাকে গাল দিচ্ছিল আর মারছিল।

তাহলে দাদা আর ছোটকুদার নাম করলি কেন পুলিসের কাছে?

লখিয়া হাত নেড়ে বলে, হামরে বোলা নেহি! হামরে নেহি টুকাইদিদি! গেঁদুয়া বোলা। গেদুঁয়াই মার খেতে খেতে বলে দিয়েছে।

দীপনারায়ণ ডাকে, এস অনুরাধা!

টুকাই বলে, যাচ্ছি। একটু দাঁড়ান না বাবা!

লখিয়া ফিস ফিস করে ওঠে। ....জানো টুকাইদিদি? আমাদের ঝোপড়িতে গেঁদুয়ারা যে মাল রেখে গিয়েছিল, তা চুরি করেছিল হরমোতিয়া। চুরি করে হরমোতিয়ারা দিঘানিয়া থেকে ভেগে গেছে।—

সত্যি? চমকে ওঠে টুকাই। ইশারায় জামাইবাবুকে ডাকে। কিন্তু জামাইবাবু ন্যালাখ্যাপার মত শুধু হাসে। এ ব্যাপারে তার একটুও কৌতূহল নেই যেন। টুকাই বলে, তুই সে কথা বলিসনি পুলিসের কাছে?

লখিয়া একটু হাসে। ....ধনপতিয়া কাকা, কপিলা কাকি, গিরিধারীজী সব্বাইকে বলেছি। ওরা দারোগাবাবুকে বলবে। ব্যস! হরমোতিয়া পাকাড় যাবে।

টুকাইয়ের ঠোঁটের ওপর ঘাম জমেছিল। ঘাম শাড়িতে মুছে বলে, আর থাকিস না এখানে তুই। আঁধার নামলে ফিরবি কেমন করে?

বলে টুকাই দৌড়ে যায় দীপনারায়ণের কাছে। লখিয়ার কাছে শোনা কথাগুলো চাপা গলায় বলতে বলতে হাঁটে। দীপনারায়ণ শুধু বলে, তাই বঝি?

মন্দিরের পেছনে উঁচু জায়গায় বসে দীপনারায়ণ মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকে। টুকাই কল্কেফুলের জঙ্গলে ঢোকে! কল্কেফুলের গোড়ায় মিষ্টি মধু থাকে। ফুল তুলে সে চুষে আপন মনে হাসে। বলে, ও জামাইবাবু, মধু চুষবেন মধু?

দীপনারায়ণ দেখছিল, ধু ধু মাঠে শেষবেলার নরম রোদে যেন তিতলি একা হেঁটে যাচ্ছে। তাকে দূর থেকে দূরে হাঁটায় দীপনারায়ণ। টুকাই কল্কেফুলের খেলা ছেড়ে চাল-বেয়ে নিচের পোড়ো জমিটায় ছুটে যায়। বুনো পায়রার ঝাঁকের দিকে ঢিল ছোড়ে। পায়রাগুলো উড়ে দূরে চলে যায় এবং ঘুরে

দিঘানিয়ার দিকে ফেরে দূরত্ব রেখে। টুকাই চেঁচিয়ে বলে, ও জামাইবাবু! আসুন না কাঁদরের ধারে যাই!

দীপনারায়ণ হাত নেড়ে তাকে চলে আসতে বলে। হাঁটা হাঁটি করতে আর ভাল লাগে না তার।

টুকাই কাছে এসে বলে, আপনার কী হয়েছে জামাইবাবু?

কী হোবে? কুচ্ছু হয়নি। দীপনারায়ণ একটু হাসে। বোস, এখানে চুপ করে বোস।

টুকাই তার মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থাকার পর বলে, চলুন, বাড়ি ফিরি।

দীপনারায়ণ রেললাইনের দিকে নির্দেশ করে বলে, ঠারো! ওই দেখ চাঁদ উঠেছে। ওই চাঁদে মানুষ গিয়েছিল। আমরা ভি যাব। অনুরাধা বোলতো, চাঁদে প্রথম পা রেখে নীল আর্মষ্ট্রং কী বলেছিল? ....ও অনুরাধা, যেও না। বাত তো শুনো!

টুকাই পা বাড়িয়েছে। দীপনারায়ণ হাসতে হাসতে বলে, একটা মজার বাত শুনে যাও!

টুকাই দাঁড়িয়ে যায়। বলে, ভ্যাট! খালি চুপচাপ বসে থাকা। ভাল্লাগে না!

তো গল্প শুনো।

তাও তো বলছেন না! টুকাই ঝাঁঝাল স্বরে বলে। তুম্বো মুখ করে বসে আছেন।

দীপনারায়ণ মিটি মিটি তাকায়। তার চোখে আবছা ঝিকিমিকি, যেন ওই ক্ষীণ চাঁদের একফালিতে জ্যোৎস্নাই। সে চাপাস্বরে বলে, একদিন তোমাকে বলেছিলাম অনুরাধা, চাঁদে তোমার ঠানদিদি চরকায় সুতো কাটছেন। এখন দেখ, তোমার দিদি একা নেই। তিতলিদিও আছে।

টুকাই মিটিমিটি হেসে বলে, দিদি একা নেই। তিতলিদিও আছে।

আছে। বলে জোরে হেসে ওঠে দীপনারায়ণ। সে আসলে তিতলিকেই দেখছিল চাঁদে বসে সেলাই কল চালাতে। টুকাইকে তো সে কথা বলা যায় না।

টুকাই বলে, কিন্তু জামাইবাবু, আপনি যে একগাদা টাকা দিয়ে দিদিকে সেলাইকল কিনে দিলেন, ভাবছেন দিদি সত্যি টেলারিং শপ খুলবে?

বলছে তো খুলবে।

টুকাই বলে, শালুক চিনেছে গোপালঠাকুর! এখনও চেনেননি ওকে। দুদিনের খেয়াল। দিদিব মাথাব অনেকগুলো স্ক্রু ঢিলে, বুঝলেন তো?

দীপনারায়ণ তামাসার সুরে বলে, টাইট দিয়ে দেব।

ইশ্। খুব হয়েছে! ও আপনার দ্বারা হবে না মশাই।

হবে না?

নাঃ। টুকাই দূরের ধূসরতার দিকে চোখ রেখে বলে। দিদিকে চেনা শক্ত। এই যে তিতলিদির সঙ্গে হঠাৎ এত ভাব করেছে, আগে তো ভাল করে কথাই বলত না। দেখবেন, শিগগিব ভাব চটল বলে। কারুর সঙ্গে দিদির বেশিদিন বনে না।

দীপনারায়ণ হাসতে হাসতে বলে, থাম—বলে দিচ্ছি তোমার দিদিকে!

বুড়ো আঙুল দেখায় টুকাই। ....

কিছুক্ষণ পরে বাড়ি ফিরে টুকাইয়ের কথাই সত্যি হল অবশ্য। নিরুপমার মুখ ভার। সেলাই মেসিনটা ঘরের মেঝেয় রয়েছে বটে, কিন্তু এক চিলতে কাপড় নেই আশেপাশে। দীপনারায়ণ 'কী হয়েছে' বলল বার দুই। জবাব নেই। বাইরে শোভাকে গজগজ করতে শোনা গেল। যে ঠাট্টা ইয়ার্কি বোঝে না, তাকে কেন ওসব কথা বাবা? তাছাড়া বাড়িতে এই বিপদ চলেছে, ছেলেটা কোথায় প্রাণের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, সেজন্য বোনেদের চিন্তা ভাবনা নেই এতটুকু! সারাক্ষণ হাসাহাসি। ছোটলোকের মত জামা সেলাই! কোন ভদ্রলোকের বাড়ির মেয়েরা এসব করে? এতে তো চারদিকে কেলেঙ্কারিতে ঢি ঢি পড়ে গেছে, তার ওপর এই আদিখ্যেতা।

টুকাই হাততালি দিয়ে দীপনারায়ণকে বলে, মিলে গেল তো? আপনাকে বলছিলাম, তিতলিদির সঙ্গে লাগল বলে!

নিরুপমা মুখ খোলে। লাগবে না? আহা, ছেড়ে দেব। আমাকে যা খুশি বলবে, আর—

দীপনারায়ণ নিরীহ ভঙ্গীতে বলে, হলটা কী?

নিজেই গিয়ে জিগ্যেস করে এস না। নিরুপমা বাঁকা মুখে বলে। ওপর ওপর ভালমানুষ সেজে

বেড়াচ্ছ, ভেতরে দিব্যি যা করার করছ!

দীপনারায়ণ একটু ক্ষুব্ধ হয়ে বলে, কী করছি বল তো?

নিরুপমা গলার ভেতর বলে, খুব হয়েছে। ন্যাকামি করোনা।

টুকাই দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল। হাসি চেপে সরে যায়। দীপনারায়ণ জামাকাপড় বদলাতে থাকে ধীরে সুস্থে। তারপর বাইরে গিয়ে বারান্দায় বসে। টুকাই রান্নাঘরে তার জন্য চা করছে দেখতে পায়। নন্দলাল বাড়িতে নেই। হয়তো ছেলের জন্য তদ্বিরেই বেরিয়েছেন কোথাও....

তিতলির চোখে ঘুম নেই। মন তেতো। করুণাময়ী তক্তপোষে শুয়ে আছেন, তিতলির বিছানা মেঝেয়। ছোটকু থাকলে বাইরের ঘরটায় শুত। ও ঘরেই ছিল ওর বাবার ডিসপেন্সারি। এখন ও ঘরে একটা খাটিয়া ছাড়া আর কিছু নেই। ওষুধের দুটো ছোট্ট আলমারি ছিল। ছোটকু কবে বেচে দিয়েছে। তিতলি কদিন থেকে একটা স্বপ্নে বিভোর ছিল। ওই ঘরেই রুচির সঙ্গে টেলারিং খুলবে। অবিকল একটা টেলারিং খুলবে। অবিকল একটা টেলারিং শপের খুঁটি-নাটিসহ পুরো ছবিটি ঘরের ফ্রেমের মধ্যে আটকে দিয়েছিল তিতলি।

ছবিটা আছড়ে ভেঙে দিয়েছে রুচি নিষ্ঠুর হাতে। ওকে খেয়ালি বলে জানত তিতলি। কিন্তু এ কি অদ্ভুত খেয়াল যে খালি কথায়-কথায় নিজের বরকে তিতলির প্রেমিক বানিয়ে দেওয়া। আজ আর সহ্য করতে পারেনি তিতলি। কথায়-কথায় শেষ পর্যন্ত ঝগড়া বাঁধিয়ে চলে এসেছে।

রাগে দুঃখে তিতলির ইচ্ছে করছে, রুচির বরের সঙ্গে অন্তত মিথ্যে প্রেমের খেলায় নেমে রুচির ওপর শোধ তোলে।

কিন্তু পরমুহূর্তেই বিব্রত বোধ করছে। ছিঃ, তা কি হয়? সে বিধবা মেয়ে। তাছাড়া দীপনারায়ণকে সে খুব শ্রদ্ধা করে। ভদ্র-সজ্জন এক স্কুল টিচার, একটু বোকা মানুষও বটে। তার ওপর তিতলির সমবেদনা থাকার কারণ, রুচির মত চরিত্রহীন মেয়েকে না জেনে বিয়ে করে ফেলেছে। রুচি তাকে মানুষ বলেও গণ্য করে না, তিতলি টের পেয়েছে।

তক্তপোষের তলায় হেরিকেনের দম কমিয়ে একটুকরো কাগজ এঁটে রাখে রাতে। চোখে আলো লাগলে ঘুম হয় না তিতলির। বাইরের ঘরের দরজায় হঠাৎ মৃদু কড়া নাড়ার শব্দ শুনেই চমকে উঠল সে। ছোটকু নাকি? হাত বাড়িয়ে হেরিকেনের দম তুলে নেয়। করুণা সারারাত ঘুমোন না। বলেন, এ কিছু না। কুকুরটুকুর দরজা ঠেলছে।

আবার কড়া নাড়ার চাপা শব্দ। তখন করুণাই সাড়া দেন, কে?

তিতলি উঠে বসেছে। ফিসফিস করে বলে, ছোটকু হয়তো।

করুণা সাবধান করে দেন, কথা না বললে দরজা খুলিসনে যেন।

তিতলি বাইরের ঘরে হেরিকেন হাতে গিয়ে দাঁড়ায়। আবার কড়া নড়ে। তারপর কেউ ডাকে, সুভদ্রা। সুভদ্রা।

বুক ধড়াস করে ওঠে তিতলির। তাকে এ নামে কে ডাকছে? গলাটা চেনা চেনা মনে হয়। সে কাঁপা কাঁপা গলায় বলে, কে?

সুভদ্রা, আমি দীপনারায়ণ আছি।

দরজা খুলে কাঁচুমাচু চেহারায় দীপনারায়ণকে দেখে খুব অবাক হয়ে যায় তিতলি। সে বলে, কী ব্যাপার জামাইবাবু?

দীপনারায়ণ হাসবার চেষ্টা করে বলে, তোমার সঙ্গে কুছু কথা আছে সুভদ্রা, তাই চলে আসল।

ঠোঁট কামড়ে ধরেছিল তিতলি। আস্তে বলে, ভেতরে আসুন।

না, সুভদ্রা। কথা আমি বাইরে বলতে চাই।

বেশ তো, বলুন।

এখানে নয়। দীপনারায়ণ মুখে কাতরতা ফুটিয়ে বলে। তুমি মনে কোনও ডর রেখো না সুভদ্রা। আমি জানোয়ার নই, মানুষ আছি। তুমি আমার সঙ্গে এস।

তিতলি আরও অবাক হয়ে বলে, কোথায় জামাইবাবু?

করুণা ভেতরের ঘর থেকে বলেন, কে রে তিতলি? কার সঙ্গে কথা বলছিস?

তিতলি ঘুরে গলা চড়িয়ে বলে, জামাইবাবু।

কে?

টুকাইয়ের জামাইবাবু।

করুণা চুপ করে যান। দীপনারায়ণ মৃদু স্বরে বলে, এমন জায়গায় গিয়ে বলতে চাই, যেখানে কারুর শোনার চান্স নেই।

তিতলি মুখ নামিয়ে বলে কী এমন গোপন কথা আপনার?

তুমি ডর করছ, সুভদ্রা!

বিব্রতভাবে তিতলি বলে, আমি তো মেয়ে, জামাইবাবু!

দীপনারায়ণ আক্ষেপ প্রকাশ করে বলে, আমি কাল ভোরের ট্রেনে ফিরে যাচ্ছি পাকুড়ে। কেউ আর আমাকে আটকাতে পারবে না। কারণ আমি কাউকে না জানিয়ে চলে যাব। তাই ভাবলাম, যাবার আগে তোমাকে কিছু কথা বলে যাব। তো তুমি ডর পেলে। ঠিক আছে। চলি!

জামাইবাবু! তিতলি ডাকে। আপনি ভেতরে আসুন। এ ঘরে বসে বলুন।

তোমার মামিমা শুনতে পাবেন।

পাবেন না। আপনি আস্তে বলুন।

দীপনারায়ণ তার দিকে একবার তাকিয়ে ভেতরে ঢোকে। খাটিয়ায় গিয়ে বসে পড়ে। করুণা ওঘর থেকে বলেন, কী রে তিতলি? আমাকে বলবি তো কী হয়েছে?

তিতলি ভেতরের দরজার কাছে গিয়ে বলে, ছোটকুদের মামলার ব্যাপার। আপনি চুপচাপ শুয়ে থাকুন তো। পরে শুনবেন।

তিতলি এসে দীপনারায়ণের সামনে দাঁড়ায়। বলে, বলুন!

দীপনারায়ণের মুখ দেখে সে বুঝতে পারে, বাইরে কোথাও নিরিবিলিতে যে কথা মন খুলে বলতে পারত, এখানে তা যেন বলতে খুব দ্বিধা। কিন্তু কথাটা কী হতে পারে, সে কিছুতেই আঁচ করতে পারছে না। দীপনারায়ণ পাঞ্জাবির বোতাম খুঁটছে মুখ নিচু করে। তিতলি আবার বলে, বলুন জামাইবাবু!

এই সময় বাইরে শনশন শব্দ হল। খোলা দরজা দিয়ে হাওয়া ঢুকল। তারপর হাওয়াটা বাড়তে লাগল। তিতলি উঁকি মেরে দেখে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বলে, ঝড় উঠবে মনে হচ্ছে।

তুমি বসো, সুভদ্রা!

তিতলি আড়ষ্টভাবে একটু তফাতে বসে। বাইরে হাওয়ার তুলকালাম শুরু হয়ে গেছে হঠাৎ। তারপর মেঘ ডাকল। করুণা কী যেন বললেন, বোঝা গেল না। মাঝরাতে মেঘের গর্জন, ঝড়ের শনশন, জরাজীর্ণ বাড়িটা ঘিরে হঠকারী প্রকৃতি হুলস্থূল বাধিয়ে দিয়েছে। তিতলি বলে, কী হল? বলুন?

দীপনারায়ণ মুখ তুলে বলে, বাইরে গেলে মুসকিলে পড়তাম দেখছি। যাই হোক কথাটা হল, আমি ডিসাইড করেছি, নিরুপমাকে ডিভোর্স করব।

তিতলি চমক সামলে বলে, আপনি পাগল জামাইবাবু!

দীপনারায়ণ ফুঁসে ওঠে।...হাঁ, আমি পাগল আছি। হব না পাগল? তুমি বোল সুভদ্রা, আমি আর কী করতে পারি?

আপনি রুচিকে নিয়ে যান।

সে যাবে না। দীপনারায়ণ শ্বাস ছেড়ে বলে। লেকিন সে কথা বলার জন্য আমি তোমার কাছে আসিনি। এসেছি অন্য একটা কথা বলতে।

বেশতো! বলুন।

তোমার জন্য আমার বহুত কষ্ট হয়, সুভদ্রা! দীপনারায়ণ দম আটকানো গলায় বলতে থাকে। তুমি এভাবে লাইফটা নষ্ট করবে কেন? আমি তোমার কাছে জানতে এসেছি, আমি যদি তোমাকে--

ভয়ঙ্কর শব্দে বাজ পড়লে কথা থেমে যায় দীপনারায়ণের। তিতলি এবার তার দিকে তাকিয়েই মুখ নামায়। ঠোঁট কামড়ে ধরে।

দীপনারায়ণ বলে, আজ আমার মধ্যে একটা ওলটপালট হয়ে গেছে। তাই এ কথা বলতে শরম হচ্ছে না, তুমি যাই ভাব আমাকে। আমি মরিয়া হয়ে তোমার কাছে ছুটে আসব সুভদ্রা। তুমি যত

কষ্টের মধ্যে আছ, আমি তত কষ্টের মধ্যে আছি। আমরা যদি দুজনে একসাথে মিলে যাই, আমরা বেঁচে যাব। শান্তিতে বেঁচে থাকব।

তিতলি আস্তে বলে, আপনার কথা শুনে অবাক লাগছে, জামাইবাবু!

দীপনারায়ণ বিকৃত স্বরে বলে, জামাইবাবু বললে আমার খারাপ লাগে! আমাকে তুমি ওই বলে ডেক না সুভদ্রা! আর তুমি বলছ, আমার কথা শুনে অবাক লাগছে। কেন অবাক লাগবে? আমি খারাপ কুছু কি বলেছি? তুমি এডুকেটেড মেয়ে আছ। তুমি বোল, এতে কী খারাপ আছে?

তিতলি বলে, ঝড় না থাকলে আপনাকে এখনই চলে যেতে বলতাম।

দীপনারায়ণ উঠে দাঁড়ায়।...ঝড় আছে তো কী হয়েছে! যদি চলে যেতে বল, যাচ্ছি।

তিতলি ধরা গলায় বলে, তাই যান।

পা বাড়িয়ে হঠাৎ ঘুরে দীপনারায়ণ একটু হেসে বলে, আমার ভাগ্য দেখ, সুভদ্রা! নিরুপমা আমাকে সব সময় খোঁচা মারে কী, তিতলি তোমার প্রেমে পড়েছে! তো তিতলি আমার প্রেমে পড়েনি, আমি জানতাম। তবু কেন আমি তার কাছে এসেছিলাম?

দীপনারায়ণ কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর ফের বলে, যে মানুষ নদীতে ভেসে যাচ্ছে, সে হাতের কাছে একটা কাঠ দেখলে আঁকড়ে ধরবে না? ধরবে। আর দেখ সুভদ্রা, কাঠ ভি ভেসে যাচ্ছে। খেযাল রেখ একথা।

সে ঝটপট দরজা খুলেই বেরিয়ে যায়। বেরিয়েই ঝড়ের মধ্যে পড়ে। বিদ্যুতের ঝলকানিতে তাকে আঁকাবাঁকা রেখার মত দেখায়।

তিতলি এতক্ষণে উঠে দাঁড়ায়। শরীর পাথরের মত ভারি। সমস্ত ব্যাপারটা তার মনে হয় এক অদ্ভুত স্বপ্ন।

ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টির ছাঁট এসে পড়ছে এবড়োখেবড়ো বারান্দায়। দরজা বন্ধ করে স্থির দাঁড়িয়ে থাকে তিতলি। ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে মানুষটাকে অমন করে ঠেলে না দিলেও পারত। হঠাৎ কেন এত বেশি নিষ্ঠুর হয়ে উঠল সে?

করুণা ডাকছিলেন।

তিতলি ওঘরে গিয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়ে। আলোটা বড্ড বেশি কমিয়ে দেয়। করুণা বলেন, নন্দলালের জামাই চলে গেল নাকি?

তিতলি অস্পষ্টভাবে হুঁ বলে।

করুণা বলেন, কী বলছিল বলবি তো? চুপ করে রইলি যে? কী হয়েছে ছোটকুদের মামলার?

তিতলি মিথ্যা করে বলে, মিটমাটের চেষ্টা চলছে।

করুণা খুঁটিয়ে জানার জন্য বারবার প্রশ্ন করেও জবাব না পেয়ে অভিমানে থেমে যান অবশেষে।

বাইরে ঝড়-বৃষ্টিটা সমানে চলেছে। তিতলির খালি মনে হয়, ওই ঝড় বৃষ্টিটা সত্যিকার নয়। নিছক স্বপ্নের একটা পরিপ্রেক্ষিত, যার ওপর আঁকাবাঁকা রেখায় একটা সরলচিত্ত মানুষের ছবি। আরও একটু পরে সে টের পায়, ঝড-বৃষ্টিটা তার মাথার ভেতর ঢুকে গেছে। ঠোঁট কামড়ে ধরে শুয়ে থাকে তিতলি। চোখের কোণা দিয়ে জলের ফোঁটা গড়িয়ে আসে।....

খিড়কির দরজা ভেজিয়ে রেখে বেরিয়েছিল দীপনারায়ণ। ভিজে কুঁকড়ে বাড়ি ঢোকে। বারান্দায় মিটমিটে একটা বাল্ব সারারাত জ্বলে। বাল্বটা নিভে আছে দেখে সে একটু অবাক হয়। তারপর ভাবে, হয়তো লোডসেডিং কিংবা ঝড়ে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে গেছে কোথাও। কিন্তু ঘরের দরজা ঠেলতে গিয়ে সে চমকে ওঠে! দরজা ভেজিয়ে রেখে গিয়েছিল। এখন বন্ধ।

সে কবাটে আস্তে শব্দ করে ডাকে, নিরুপমা! দরজা খোলো! বিদ্যুতের ঝিলিকে বৃষ্টির রেখা উঠোন জুড়ে ঝিকমিকিয়ে উঠছে। মুহুর্মুহু মেঘ ডাকছে। ঝড়টা শনশন করে ঘুরপাক খেতে খেতে দিযানিয়াকে যেন উপড়ে ফেলার চেষ্টা করছে। দীপনারায়ণ ডাকে চাপা স্বরে, দরজা খোলো, নিরুপমা।

একটু পরে দরজা খুলে যায়। ঘরে টেবিলল্যাম্পটা জ্বলছে। তার মানে ইচ্ছে করেই বাইরের আলোটা নিভিয়ে রেখেছে নিরুপমা।

দীপনারায়ণ ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে। নিরুপমা তখনও দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে। ভিজে জামা-কাপড় বদলাতে দীপনারায়ণ আলনার কাছে যায়। তখন নিরুপমা হিসহিস করে বলে, তিতলির কাছে গিয়েছিলে?

দীপনারায়ণ গলার ভেতর বলে, আমি যেখানেই যাই, তাতে তোমার কী?

লজ্জা করে না তোমার?

দীপনারায়ণ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, লজ্জা কি তোমারও করেনা, নিরুপমা? বেশি বাত কোরো না। তোমার লাইফ-হিস্ট্রি আমি সবই জানি। আমাকে ভালমানুষ পেয়ে আমার ঘাড়ে তোমাকে ঝুলিয়ে দিয়েছে, তাও জানি!

নিরুপমা হকচকিয়ে যায়। ন্যালাভোলা ধরনের লোকটার এমন চেহারা সে কখনও দেখেনি। একটু পরে সে ভাঙা গলায় বলে, তিতলি বলেছে বুঝি?

দীপনারায়ণ কাপড় বদলাতে বদলাতে বলে, সুভদ্রা ওসব কথা বলার মত মেয়ে নয়। দিঘানিয়ায় আরও কত বলার লোক আছে। বলেছে আমাকে।

সুভদ্রা! বিকৃত স্বরে নিরুপমা বলে। এত প্রেম যদি সুভদ্রার সঙ্গে, ঝড়ের রাতে লুকিয়ে তার কাছে না গিয়ে তাকে বিয়েই করে ফেল। দিঘানিয়ার লোকে বিধবা বিয়ে দেখে চমকে উঠুক।

দীপপনারায়ণ ভিজে জামাকাপড় একটা ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে বলে, তাহলে তো তোমাকে ডিভোর্স করতে হয়!

নিরুপমা চেঁচিয়ে বলে তাই করো!

বাইরে ঝড়-বৃষ্টির তুমুল শব্দ না থাকলে এই চিৎকার বাড়িটাকে জাগিয়ে দিত।

দীপনারায়ণ নিরুপমার দিকে তাকিয়ে গলাব ভেতর বলে, চাও তুমি?

হ্যাঁ, চাই। নিরুপমা তীক্ষ্ম স্বরে বলে।

বেশ। পাবে। বলে দীপনারায়ণ তার সুটকেশটা গোছাতে ব্যস্ত হয়।

নিরুপমা খাটের বাজু আঁকড়ে ধরে থাকে হিংস্র হাতে। মেঘের গর্জন, ঝড়-বৃষ্টির তান্ডব একই রকম চলেছে। হঠাৎ টেবিল-ল্যাম্পটা নিভে যায় কোথায় ভয়ঙ্কর শব্দে বাজ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে। আবার বিদুৎ চমকায় এবং দরজা খোলা দেখতে পায় নিরুপমা। বিদ্যুতের আলোয় দীপনাবায়ণের বেরিযে যাওয়াও তার চোখে পড়ে। সে তবু নড়ে না।

একটু পরে সে উঠে গিয়ে দরজাটা এঁটে দেয। ঠোঁট কামড়ে ধরে দাঁড়িয়ে থাকে কয়েক মিনিট! তারপর বিছানায় উঠে শুয়ে পড়ে। একটা কঠিন নিষ্ঠুরতা তাকে ঘিরে রাখে কফিনের মত। তার ভেতর শক্ত হয়ে সে শুয়ে থাকে। কারণ সে ধরেই নেয়, দীপনারায়ণ আবার ঝড়-বৃষ্টির ভেতর দিয়ে তিতলির কাছে ফিরে যাচ্ছে....

৯

সকালে আকাশ ঝকমকে। উজ্জ্বল রোদ। রাতের প্রলয়ের কোনও চিহ্ন নেই আকাশে। কিন্তু দিঘানিয়ার বুকে অনেক ধ্বংসের ছাপ। বাজ পড়ে ট্রান্সমিটার জ্বলে গেছে। রাস্তাঘাট জুড়ে ছেঁড়া সবুজ পাতা, খড়কুটো, ভাঙা ডালপালা। ঝোপড়ি উড়ে গেছে অন্ধ লখিয়ার। সে রসিকলাল ওঝার বাড়ির বারান্দায় জড়োসড়ো হয়ে সারা রাত বসে থেকেছে। শেষ রাতে খুব হিম পড়েছিল আবার। সকালে তাকে কুঁকড়ে শুয়ে থাকতে দেখে রসিকলালজীর দয়া হয়। তুই এখানে শুয়ে আছিস কেন রি লখিয়া?

আমার ঝোপড়ি ঝড়ে উড়ে গেছে হুজুর!

তোর বড় কষ্ট রি ছোকরি!

হুজুর, আমাকে একটা কম্বল-উম্বল দিন কিরপাসে। লখিয়া হাত জোড় করে বলে।

দেব, দেব। রসিকলালজীর এক হাতে গাড়ু। অন্য হাত তুলে আশ্বাস দেন।.... তোকে কম্বল দেব। ঝোপড়ি বানিয়ে দেব আবার। কিচ্ছু ভাবিস না তুই।

লখিয়া বারবার কপালে দু-হাত ঠেকায়। কৃতজ্ঞতায় ব্যাকুল হয়ে বলে, আপ দেওতামহারাজ!

রসিকলাল চাকরকে ডেকে বলে যান লখিয়াকে রাতের বাসি রুটিতরকারি এনে দিতে। পিচরাস্তার ধারে ইটভাটার ওদিকে যেতে যেতে ভাবেন, গেঁদুয়াটা থাকলে বড় ভাল হত। হাটের তোলা ওঠানোর কাজে তাকেই পাকাপাকি বহাল করতেন। গলায় রুমাল বেঁধে কালো গেঞ্জি আর নীল প্যান্ট পরে গেঁদুয়া তাঁর লোকের সঙ্গে হাটবারে হাটে গিয়ে দাঁড়ালেই হাটুরেদের বেগড়বাজি ঘুচে যেত। বড় তেজী ছোকরা ওই গেঁদুয়া। ভেতরে-ভেতরে তাকে ছাড়ানোর চেষ্টা করেও পারেননি রসিকলালজী। লখিয়া তার নাম করে দিয়েছে পুলিসের কাছে আর গেঁদুয়াও মারের চোটে সব কবুল করে বসে আছে।

হাতমাটি করার সময় হঠাৎ কথাটা মাথায় এসে গেল। কোর্টে যদি লখিয়া বলে, গলার শুনে গেঁদুয়ার নাম করেছিল বটে, কিন্তু তার ভুল হতেও পারে। সে অন্ধ ছোকরি। চোখে তো দেখেনি গেঁদুয়াকে।

আর গেঁদুয়া যদি বলে, হুজুর! পুলিস আমাকে মেরে গায়ের জোরে কবুলতি লিখে নিয়েছে। আমি নাদান ছেলে হুজুর, লিখাপড়াহ্ আদমি না ছে!

খুনের মামলা তাহলে কেঁচে যাচ্ছে! বাকি রইল স্যাকরার বাড়ি ডাকাতির মামলা। হরমোতিয়া মেথরানিকে যদি খুঁজে পায়ও পুলিস, কিছু যায়-আসে না। হরমোতিয়া যে গাহানিয়া বুড়োর ঝোপড়ি থেকে ডাকাতির মাল হাতিয়েছে, তার প্রমাণ কী? যে দিকেই যাক, মেথরানিই বিপদে পড়বে। যার কাছে মাল, সেই দোষী।

গেঁদুয়া খুব কাজের ছেলে। হাটতলায় এমন একজনকেই বহুদিন থেকে খুঁজছেন রসিকলালজী। এই গণ্ডগোলে জড়িয়ে না পড়লে তাকে কবে বহাল করতেন। বহুবার ছোটখাট কাজে গেঁদুয়া তাকে মদত দিয়েছে। হরি সিং ছত্রীর সঙ্গে বাস স্ট্যাণ্ডের কাছে একটুকরো জমি নিয়ে হাঙ্গামার দিন গেঁদুয়া বোম মেরে ভাগিয়ে দিয়েছিল ছত্রীর লোকজনকে। তারপর থেকে রসিকলালজীকে ভয় করে চলেন হরি সিং ছত্রী।

উত্তেজনায় চঞ্চল রসিকলাল ওঝা বাড়ি ফেরেন। বারান্দায় অন্ধ মেয়েটার তখনও খাওয়া শেষ হয়নি। কালরাতের ঝড়-বৃষ্টিটা তাকে তাঁর বারান্দায় উড়িয়ে এনেছে ভেবে রসিকলালজী ভগবানকেই ধন্যবাদ দেন।...

•

তিতলি কোমরে আঁচল জড়িয়ে উঠোনে ঝাড়ু দিচ্ছিল। রাতের ঝড়ে উঠোন জুড়ে খড়কুটো, ছেঁড়া পাতা, পাখির বাসা, আবর্জনার ছড়াছড়ি।

টুকাই এসে ডাকে, তিতলিদি!

তিতলি সোজা হয়ে দাঁড়ায়। একটু অবাক হয় টুকাইয়ের হাবভাব দেখে। ঝিমধরা চেহারা। তিতলি বলে, কী রে?

টুকাই আস্তে বলে, মা পাঠাল। তাই এলাম। জামাইবাবু রাতে ঝড়জলের সময় বেরিয়ে গেছেন। মা বলল, রসিকলালজীর ওখানেই গেছেন হয়তো। ওখানে না পেলে যেন তিতলিদির কাছে জিগ্যেস করি।

তিতলি গুম হয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত। তারপর নিঃশ্বাসের সঙ্গে বলে, আমার কাছে কেন?

টুকাই করুণ চোখে তাকায়। জানি না। হয়তো দিদি মাকে কিছু বলে থাকবে।

আমার কাছে আসবেন কেন তোমার জামাইবাবু? বলে তিতলি আবার হেঁট হয়ে ঝাড়ু বোলাতে থাকে। তার হাত একটু-একটু কাঁপে। দীপনারায়ণ ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে চলে গেছে তাহলে?

টুকাই ইঁদারাতলার সামান্য উঁচু শান বাঁধান বেড়ে বসে পড়ে। কিছুক্ষণ পরে ডাকে, তিতলিদি!

কী টুকাই?

তুমি রাগ কোর না আমার ওপর তিতলিদি।

কারুর ওপর আমার রাগ নেই, টুকাই। আবর্জনা একখানে জড়ো করে ফিরে আসে তিতলি। ইঁদারায় বালতি নামাতে থাকে। হাসবার চেষ্টা করে ফের বলে, তোমার জামাইবাবুটি এক পাগল।

টুকাই বলে, সত্যি পাগল। দেখ না, দিদির সঙ্গে ঝগড়া করে ঝড়জলের মধ্যে কখন চলে গেছেন। বাবা দিদিকে মারতে বাকি রাখলেন। স্টেশনে অগস্তিজেঠুর কাছে খোঁজ নিতে গেলেন শেষে।

তিতলি অনেকক্ষণ ধরে হাত-পা ধোয়। তারপর বলে, তোমার দিদি কেন ভাবল তার বর আমার কাছে আসবে? ভারি অদ্ভুত কথা তো! কচি আমাকে কী ভেবেছে?

টুকাই বলে, তিতলিদি, প্লিজ! ঝগড়া নয়। অন্তত আমার সঙ্গে নয়, তিতলিদি!

ঝগড়া করিনি, টুকাই। কিন্তু তুমিই বল, এটা অপমানের কথা কিনা? লোকে জানতে পারলে কী ভাববে আমার সম্পর্কে—তুমিই বল না?

টুকাই সায় দেয়।...তা ঠিক। কিন্তু তুমি তো জানো, দিদি কেমন!

করুণাময়ী দরজা ধরে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসেন। ঠাহর করে দেখে বলে, কে রে ওটা?

আমি টুকাই, জেঠিমা!

করুণা রুষ্ট মুখে বলেন, কী ব্যাপার তোরা আমাকে খুলে বলতো টুকাই? তোদের জামাই কাল রাত্তিরে ঝড়জলের সময় এল। এসে ওঘরে তিতলির সঙ্গে একঘন্টা ধরে কী সব বকবক করল। তারপর—

তিতলি কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। টুকাই তার দিকে একবার তাকিয়েই করুণাময়ীর দিকে ঘোরে।

করুণা বলেন, তারপর ঝড়জলের মধ্যেই চলে গেল। তিতলি বলল, ছোটকুদের মামলার ব্যাপারে কী বলতে এসেছিল। আমি ভাবলাম, তা হতেও পারে। আর এখন টুকাই বলছে, ঝগড়া করে জামাইবাবু ঝড়জলের সময় চলে গেছে। আমার তো কান আছে। স্পষ্ট শুনেছি সব। কী, হয়েছে কী?

টুকাই ঠোঁট ফাঁক করে কিছু বলবে বলে। কিন্তু থেমে যায়। তিতলি বলে, কিচ্ছু হয়নি। আপনি চুপ করুন তো মামিমা!

করুণা প্রায় চিৎকার করে বলেন, তুই চুপ কর। টুকাই কী বলছে শুনি!

টুকাই বলে, কিছু না জেঠিমা! জামাইবাবু দিদির সঙ্গে ঝগড়া করে চলে গেছেন।

তাতো গেছে। কিন্তু রাতে তোদের জামাই কেন এসেছিল তিতলির কাছে, তুই জানিস কিছু?

টুকাই ঢোক গিলে বলে, আমি কেমন করে জানব?

করুণা তিতলির দিকে চোখ কটমট করে বলেন, আই হতচ্ছাড়ি বাঁদর মেয়ে! কী বলতে এসেছিল নন্দবাবুর জামাই? ছোটকুদের মামলার জন্য ওর ভারি মাথাব্যথা! তাই বলতে আর সময় পেল না, এল ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করে রাতদুপুরে! বল, কী বলতে এসেছিল তোকে?

তিতলি ভাঙা গলায় বলে, আঃ! মামিমা, আপনি বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি করছেন!

করুণা উত্তেজনায় কাঁপছিলেন। দুর্বল শরীর। মাথা ঘুরে ওঠায় বারান্দার থাম আঁকড়ে ধরেন। তিতলি ছুটে গিয়ে তাঁকে ধরে ফেলে।

টুকাই হঠাৎ উঠে চলে যায়।

তিতলি করুণাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেয়। করুণা শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বলেন, যদি মনে কিছু থাকে, আমার মরার পর করিস, তিতলি! আমি তো জানি, ছোটকুর মত তুইও আমার মরার পথ তাকিয়ে আছিস। আমি মলে তোদের ছুটি!

তিতলি ওঁর বুকে মাথা গুঁজে বলে, আমি ছুটি চাইনে মামিমা!

করুণা তিতলির মাথায় হাত রেখে বলেন, কাঁদিসনে। আমি জানি তোর কী কষ্ট।

আমার কোনও কষ্ট নেই। বলে তিতলি মুখ তুলে সোজা হয়ে বসে। তারপর চোখ মুছে উঠে দাঁড়ায়।

করুণা ডাকেন, তিতলি কোথায় যাচ্ছিস?

তিতলি বলে, মরতে।

কিন্তু মরতে সে যায় না। বেরিয়েই চোখে পড়ে রাতের ঝড়ে সজনেগাছের ডাল থেকে ভেঙে পড়া পাখির বাসাটা। একপাশে সরিয়ে রেখেছিল সেটা। দু'হাতে তুলে নিয়ে গাছটার দিকে এগিয়ে যায়। কীভাবে বাসাটা গাছের ডালে যথাস্থানে বসিয়ে দেবে সেই নিয়ে ভাবনা এখন।....

নির্বাসনের শেষদিন

রঞ্জুর খবরটা যখন বারীনবাবু পান, তখন সবে সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। উঁচু রেলব্রীজের ওপর হেঁটে যেতে যেতে মাঝামাঝি জায়গায় এসে হঠাৎ সূর্যাস্ত দেখার সাধ হয়েছিল তাঁর। পিছু ফিরে আকাশের দিকে সবে তাকিয়েছেন, এমন সময় মৃগাঙ্ক দৌড়ে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে বলেছিল, জেঠু, শিগগির চলুন—রঞ্জু শেষ! রঞ্জু খুন হয়েছে!

কয়েক সেকেন্ড বারীনবাবু চোখের ফাঁকে সন্ধ্যার লাল-ধূসরে মেশা পশ্চিমী আকাশটা আটকে গিয়েছিল। তার মধ্যে কোন চাকার মত গোল সূর্য ছিল কিনা আজ মনে পড়ে না। সে তো একবছর আগের কথা। এমনি মার্চের শেষ দিনগুলো। কিন্তু তারা আজকের মত এমন নীরস আর শূন্য ছিল না। রঞ্জুব মত ছেলের টগবগিয়ে ছোটা-হাঁটা দেখে কী সব আশা আনন্দে বুকটা দুলে-দুলে উঠতই। আজ আর এ-কথা লুকিয়ে হয়তো লাভ নেই।

মৃগাঙ্কের মুখে কথাটা শুনে পরের কয়েকটা সেকেন্ড তিনি ঠিক কী বলেছিলেন বা করেছিলেন, একটু-একটু মনে পড়ে। তিনি খুব আস্তে বলেছিলেন, কে? রঞ্জু? যাঃ!

মৃগাঙ্ক বড্ড সেন্টিমেন্টাল ছেলে। সে হাউমাউ করে কেঁদে উঠেছিল।..... না জেঠু, না। আমি এক্ষুনি দেখে এলুম হাসপাতালে। জেঠিমারা অলরেডি চলে গেছেন। সন্টুদা গেছে। ঝিমিদি গেছে। ওরা বললে, বাড়ির কাছে আপনার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকতে। তাই যাচ্ছিলুম—হঠাৎ.....

বারীনবাবুর হাত তুলে কেমন হেসে বলেছিলেন, দেখছি।

এ ঠিক দাবাড়ের গল্পের সেই 'কাদের সাপ', বলার মত ব্যাপার। বড়ছেলে রঞ্জু খুন হয়েছে—এ-খবর পাড়ার নেওটা ছেলে মৃগাঙ্কর, এবং তিনি বলেছিলেন, দেখছি! আসলে এ-সব ক্ষেত্রে মাথাটা গুলিয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। কিংবা ভিতরে-ভিতরে কী যে নির্বোধ আত্মবিশ্বাস মুখিয়ে থাকে। খুব ছেলেবেলায় বারীনবাবুর বাবা মারা যান। তখন তিনি স্কুল থেকে ফিরছেন। বাবা মারা যাওয়াব খবরটাও এমনিভাবে পথে পেয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, যাঃ!

তার মানে, বারীনবাবুর বিশ্বাস ছিল, তাঁর বাবা কদাচ মরতে পারেন না। কিংবা এও হতে পারে যে, মৃত্যু ব্যাপারটা সম্পর্কে তাঁর কোন ধারণাই ছিল না।

গত বছর রঞ্জুর মৃত্যুর সন্ধ্যায় তাঁর বয়স সরকারী কাগজে চুয়ান্ন, কুষ্ঠিতে সাতান্ন। মৃত্যু—শুধু স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, চারপাশে বিস্তর খুনখারাপিতে মৃত্যু দেখে তাঁর চোখ ভোতা হয়ে গেছে। তাঁর আদরের বড়ছেলে অর্থাৎ যে-ছেলের প্রতি সব বাবার স্বভাবত একটা মোহ থাকে—নিজের জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার খাঁকতি-ঘাটতি উসুল করার দারুণ হাতিয়ার বলে যাকে সব বাবাই মনে করেন, তার খুনের খবর কিন্তু প্রথম চোটে বিশ্বাসই করতে পারেননি। রঞ্জু রাজনীতি করত, দেয়ালে পোস্টার মারত, মিছিলের লোক জোগাড় করে শ্লোগান হাঁকত—সে চলতি রাজনীতি অনুসারে একদিন খুন হতে পারে—এটা তিনি তো বেশ জানতেন। বকাবকিও করতেন। তার চাকরির জন্য তদ্বির-তদারকও কম করেননি। কিন্তু রঞ্জু পাল্টা তর্ক করলে বারীনবাবু হার মেনে চুপ করে যেতেন। হয়তো রঞ্জু নতুন কালের এক 'আঁভা গার্দে''—নতুন জীবনের নতুন পথের দিশারী। তাই হয়তো তার কথা তাঁর কাছে আবোল-তাবোল মনে হচ্ছে। একদিন কথায় কথায় পাড়ার লক্ষ্মীবাবুর সঙ্গে ছেলের হয়ে তর্কই করে বসেছিলেন।.....এ জেনারেশন গ্যাপের ব্যাপার। আমরা বুড়োরা ওদের ভাষা না বুঝতে পারলে ওদের দোষ দিয়ে লাভ নেই হে!

চলতি সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতির ওপর বীতশ্রদ্ধ একালের সব মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত বাঙালী বাবা যেমন ভাবেন, একটা রদ-বদল ভারি দরকার এবং সেটা ছেলেপুলেরাই ঘটাক—তবে আমার সন্তানটি ওর সাতে-পাঁচে না যাওয়াই ভাল, এবং তার জন্যে গোপনে বা প্রকাশ্যে চাকরি-বাকরির চেষ্টা চালিয়ে যান—যেতে হয়, বারীনবাবুর ব্যাপারটাও ছিল কতকটা তেমনি। যা করছে করুক, চাকরিটা হয়ে গেলেই ঠিক হয়ে যাবে। তারপর একটা বউ এনে ঝুলিয়ে দিলেই ব্যস, ওঁ শান্তি!

সেই রক্তরঙা সন্ধ্যার পর আরো কয়েকশো সন্ধ্যা কেটে গেছে। ওই রেলব্রীজ পেরিয়ে যেতে যেতে আরও কতবার হঠাৎ পিছু ফিরে সূর্যাস্ত দেখার চেষ্টা করেছেন বারীনবাবু। রেলইয়ার্ডের উঁচু

ল্যাম্প-পোস্টগুলোয় আসল নক্ষত্র ফোটার আগে নকল নক্ষত্র ঝিক-মিক করে উঠেছে। ধোঁয়াশায় কুয়াশায় তলিয়ে গেছে চামড়ার কারখানার পিছনের ঢ্যাঙা শিমুলগাছটা। এই চৈত্রে তার ডালপালায়—আপিস যাবার সময় বাসের জানালা দিয়ে দেখেছিলেন, লাল-লাল ফুলের সঙ্গে একদল শকুনও দিব্যি ফুটে উঠেছে।

ফেরার সময় ব্রীজের ওপারে বাস থেকে নেমে পায়ে হেঁটে একটু পথ আসা তাঁর অনেক দিনের অভ্যাস। আর ব্রীজের সবচেয়ে উঁচু অংশে এসে পশ্চিম আকাশ দেখতে দেখতে হঠাৎ চমকে ওঠাও তাঁর স্বভাবে দাঁড়িয়েছে। কেউ আবার একটা সাংঘাতিক খবর নিয়ে আসছে না তো!

নাঃ, গৌতম তেমন ছেলে নয়। ভারি শান্ত আর সরল সে। দাদার মত অত চেঁচিয়ে কথা বলে না। রাজনীতির ধারে-কাছে ঘেঁষে না। বড় একটা মেশেও না কারো সাথে। মাঝে মাঝে মেজছেলেকে দেখে এত নিঃসঙ্গ মনে হয় বারীনবাবুর! এ বয়সে বন্ধুবান্ধব থাকা বা একটু আধটু হই-হল্লা করা ভালই। তবে যা দিনকাল পড়েছে, মেশামিশি করতে গেলেই বিপদে পড়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। বন্ধুদের মধ্যে একজনের কাজকর্মের দায়ে সবাই জড়িয়ে পড়তে পারে। গৌতমের মা বলছিল, ওর পাইকপাড়ার মাসতুতো বা পিসতুতো বোনেব দেওর নিছক কাদের সঙ্গে রকে বসে আড্ডা দিত বলে পুলিস ওকে ধরে নিয়ে গেছে। একদিন একরাত্রি ছিল থানায়। মারধোরও খেয়েছে। বাড়ি যখন ফিরল, চেহারা আধখানা হয়ে গেছে—চেনাই যায় না। সন্টুর জন্যে যা ভাবনা হচ্ছে!

বারীনবাবু বলেছিলেন, সন্টু তো মেশেই না কারো সঙ্গে। নাকি মেশে?

তোমার কী মনে হয়?

প্রভাবতী বলেছিলেন, দেখি না তো তেমন কিছু! কিন্তু সারাক্ষণ চোখের সামনে থাকে না যে নজর রাখব! বাইরে কী করে না-করে কেমন করে জানব? আমরা তো ঘর-পোড়া গরু—সিঁদুরে মেঘ দেখলেই বুক কাঁপে।

বারীনবাবু ডেকেছিলেন, ঝিমি! শুনে যা।

সতপা পাশের ঘরে স্কুল ফাইনালের পড়া মুখস্থ করছিল। এসে বলেছিল,কী হল?

হ্যাঁরে, সন্টু কী করছে?...চাপা গলায় প্রশ্ন করেছিলেন বারীনবাবু।

ওর যা কাজ। চিত হয়ে শুয়ে চোখ বুজে পা নাচাচ্ছে আর আঙুল মটকাচ্ছে।

ঝিমি, তোর কী মনে হয়?...একটু হেসে ফিসফিস করে বলেছিলেন বারীনবাবু।

সুতপা অবাক।...কী মনে হবে? কিসে? যা বাবা!

মানে সন্টুর কথা বলছি। ও নিশ্চই ওসবের মধ্যে নেই?

ওসবেব মধ্যে মানে? কী সব?

প্রভাবতী চাপা খেঁকিয়ে উঠেছিলেন, তোর সবতাতেই ন্যাকামি! অমন ঘা খেয়েও তো শিক্ষা হয়নি।

ঝিমি—সুতপার চোখ ফেটে পড়ার উপক্রম।...ঘা খেয়ে? আমি আবার কোথায় ঘা খেলুম! ভ্যাট! শুধু আজে-বাজে ডিস্টার্ব!

বলে সে হনহন করে চলে গিয়েছিল। তবু মনের খুঁতখুঁতোনি কয়েকটা দিন কাটেনি স্বামী-স্ত্রীর। হাজার হলেও দাদার ভাই—রক্তস্রোতটা তো একই। কে জোনে সন্টুর ওই নিঃসঙ্গ শান্ত হাবভাব চেহারা একটা ঘুমন্ত আগুনের পাহাড় কি না—হঠাৎ যে-কোন মুহূর্তে চুড়ো ফাটিয়ে বেরিয়ে পড়তে থাকবে ভয়ঙ্কর গরম টগবগে লাভা-স্রোত। এ-কালের ছেলেদের বিশ্বাস করা শক্ত। আপিসের ননীবাবু নাকি তাঁর ঘরের জানালা থেকে স্বচক্ষে দেখেছেন, ঠাণ্ডা মাথায় একটা সতেরো আঠারো বছরের ছেলে চোখে-চোখে নিষ্পলক তাকিয়ে গলা কাটছে—বাপ্‌স! ভাবা যায়? বুঝলেন বারীনদা? চেহারা স্বভাব-চরিত্তির দেখে আপনি টের পাবেন না যে-ছেলেটি মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে দিব্যি সিগ্রেট ফুঁকছে আর গুন-গুন করছে, পাঁচ-মিনিট আগে সে এক সাংঘাতিক খুনখারাপি করে এল। আজকাল খুনী চেহারায় নেই—ভিতরে বসে আছে। হ্যাঁ—বিলিভ মি। বাস-স্টপে যে ছিমছাম ভদ্র চেহারার ছেলেটিকে আপনি বাস দেরী করছে কেন বললেন, সে মিষ্টি হাসল, বলল—এসে যাবে'খন— সে কিন্তু তখন কাকে খুন করার জন্যে অপেক্ষা করছে। ভাবতে পারেন? আমি তো শালা বাস-স্টপ থেকে বাড়ি অবধি একমিনিট পথ হাঁটতে সতেরোবার পিছনে তাকাই মাইরি! আপন গড, খালি মনে হয়—আমাকে ঝেড়ে

দেবে কেউ। অথচ আমি তো কোন সাতে-পাঁচে নেই—আপনিও নিশ্চই নেই। আপনার মনে হয় না এরকম? ....

সে জন্যেই ভয় করে সন্টুকে। অর্থাৎ এতদিনে ভয় করতে লেগেছে। ওর অত শান্ত নিঃঝুম স্তব্ধ হাবভাব, ওর সুন্দর ভুরুর ওপর কপালের ভাঁজেভাঁজে বিষণ্ণতার রেখাগুলো, ওর খুব আস্তে কথা বলা সবই ক্রমশঃ রহস্যময় লাগছে। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে বারীনবাবুর—সন্টু একটু চঞ্চল হোক, জোরে কথাবার্তা বলুক, হাসাহাসি করুক। তাই ওর সঙ্গে তামাসা করার চেষ্টা করেন বারীনবাবু। হাসির গল্প বলেন। তাঁর আপিসের লোকেদের নানা ব্যাপার নিয়ে হাসি-মস্করা করেন। সন্টু একটু হাসে। শুধু বলে, ওরা তো ওইরকমই। ব্যস!

অবশ্য সন্টুর এ স্বভাব আজ নতুন নয়—বরাবরকার, এটুকুই সব সংশয়ের মাঝে একটুখানি স্বস্তি, আর তাবৎ বাঙালী সন্তানই যে খুনী হয়ে গেছে বা যাচ্ছে — এটাও মস্ত ভুল। তা কি হয়?

গৌতম ওরফে সন্টু ক'বছর ধরে বি-এ পাস করে বসে আছে। বারীনবাবুর চাকরির মেয়াদ প্রায় শেষ হয়ে এল। এম-এ পড়ানোর ঝুঁকি নিতে সাহস পাননি। ঝিমির বিয়ে আছে—নিজের ভবিষ্যৎ আছে। সন্টুরও নিজের কোন তাগিদ দেখা যায় নি অবশ্য। টিউশনী যোগাড় করে চালিয়ে গেলেও পারত— সে চেষ্টা ওর ছিল না। অগত্যা রঞ্জুর বেলা যেমন করেছিলেন, অবিশ্রান্ত একটা চাকরির চেষ্টাও করে এসেছেন বারীনবাবু। হয়নি। সন্টু নিজেও নাকি চেষ্টা-চরিত্র করেছে শুনেছেন। ওর আবার চেষ্টা! ভালো করে কথাই হয়তো বলতে পারে না কোথাও। তা না হলে অমন সুন্দর চেহারার ছেলের এ্যাদ্দিন চাকরি না হয়ে পারে? বারীনবাবুর মনে এইসব অশান্তি।...

এরই মধ্যে হঠাৎ একটা কান্ড ঘটে গেল পাড়ায়।

বারীনবাবু তখন আপিসে। বাড়িতে ফোন নেই—তাছাড়া সে সময় কেউ যে বেরিয়ে গিয়ে ফোনে তাঁকে খবর দেবে সে-সুযোগও ছিল না। সারা দুপুর তুলকালাম ঘটে গেল পাড়ায়। দু-দলের সংঘর্ষ রীতিমত যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হল। একদল অন্যদলকে রেললাইন পার করে দেবার পর যথারীতি পুলিস এল। তিনটে একেবারে লাস, ডজনখানেক জখম—সে একটা বীভৎস ব্যাপার। পাশের বস্তীটা জ্বলে পুড়ে গেছে। বারীনবাবু ফেরার পথে খবরটা পেয়েছিলেন। সন্ধ্যা ছ'টা থেকে কার্ফু জারী করা হয়েছে। সে সন্ধ্যায় আর ব্রীজে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখা হল না। হাঁফাতে হাঁফাতে বাড়ির দিকে এগোচ্ছিলেন। তাঁর কেবল সন্টুর কথা মনে হচ্ছিল। সন্টুর কিছু হয়নি তো? সন্টু এর মধ্যে জড়িয়ে পড়েনি তো?

পাড়া একেবারে সুমসাম নিরিবিলি। জায়গায়-জায়গায় পুলিস বন্দুক হাতে পাহারা দিচ্ছে। পথচারী দেখলে তাক করছে। হতভাগ্য পথচারী দুহাত তুলে নীরব সংকীর্তন করতে করতে হেঁটে চলেছে। বারীনবাবুও তাই করলেন। এবং বিড়বিড় করে পুলিশের মুণ্ডুপাত করতে করতে গলিতে ঢুকলেন। সারাপথ গলির মোড় অবধি ইঁটের টুকরো আর কাঁচগুড়োয় ভর্তি। পিছনের বস্তীতে তখনও ধোঁয়া উঠছে। দমকল দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাড়ির জানালাটা দেখে থমকে দাঁড়ালেন বারীনবাবু। কান্ড দেখছ? সন্টু জানালার পাশে চুপচাপ বসে আছে। তিনি চাপা গলায় বলে উঠলেন, কী করছিস? বন্ধ কর এক্ষুনি। দেখছিস না, সব্বাই দরজা-জানালা বন্ধ করে রেখেছে।

অবশ্য সন্টুকে দেখে আশ্বস্ত হওয়া গেল। ঝিমি আর প্রভাবতীর মুখে সবটা শুনলেন খুঁটিয়ে। একটু পরে চা নিয়ে এলেন প্রভাবতী। সন্টু আর ঝিমি পাশের ঘরে চা খাচ্ছে। প্রভাবতী সামনে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বললেন, পাড়া থেকে একগুচ্ছের সব ধরে নিয়ে গেল খানিক আগে। শুনছি রাত্রে আবার ধরপাকড় করবে নাকি। অমরবাবুর তিন ছেলেকেই ধরেছে, ঝিমি স্বচক্ষে দেখেছে বলল। রানীদির দেওরটাকে মারতে মারতে নিয়ে গেল। সতীশ ডাক্তারের ছোটছেলেকেও নাকি ধরেছে। অথচ দ্যাখো, ছেলেটা এত ভাল। মাসীমা বলতে অজ্ঞান—কী ভক্তি-শ্রদ্ধা করে আমাদের! আমরা তো ভালই জানি—ও কোন সাতে-পাঁচে ছিল না।

বারীনবাবু উদ্বিগ্ন মুখে তাকালেন প্রভাবতীর মুখের দিকে।.....রমেনকে? বলছ কী? যাঃ, কোন মানে হয়?

তোমার তো সবতাতেই যাঃ। চোখের সামনে আমাকে ধড়ফড় করে মরতে দেখলেও বলবে—যাঃ, কোন মানে হয়? .....প্রভাবতী না রেগে পারলেন না।

না—মানে, রমেন তো তেমন ছেলে নয়, তাই বলছি।

ঝিমি জালালা দিয়ে সব দেখেছে যে! বলল, মারামারির সময়—না তারপরে কখন, রমেন মোড়ে দেখতে গিয়েছিল। তখন নাকি পুলিস ওকে ধরেছে। প্রভাবতী নাকের ডগা কুঁচকে বললেন, কে জানে বাবা! দেখতে গিয়েছিল না কী—বাইরে বাইরে তো সবাই ভাল।

বারীনবাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন, সন্টু বেরোয়নি তো?

পাগল! আমি তক্কে তক্কে ছিলুম না!

কিন্তু জানালা তো দিব্যি খোলা রেখে বসে রয়েছে দেখলুম। যদি বাইচান্স একটা গুলি-টুলি ছিটকে আসে!

ওসব অলুক্ষুণে কথা রাখো তো!

আরে তুমি জানই না—কী হয়। শোভাবাজারে হাঙ্গামা হচ্ছিল—তেতালার ছাদে দাঁড়িয়ে দেখছিল একটা ছেলে। ব্যস! মাথায় এসে....

প্রভাবতী আরো রেগে বললেন, কথা শোন। শিগগির পাড়া বদলাও। হেমেনকে খবর দাও। কোন মুসলমান এলাকায় ভাল ফ্লাট আছে বলছিল না? ওখানেই চলে যাই আমরা।

বারীনবাবু চিন্তিত মুখে বললেন, সে না হয় দিচ্ছি। কিন্তু সেও তো হুট করে এক্ষুনি হচ্ছে না। মাসের শেষ টাইম। আগের মাসের ভাড়াটাও বাকি। অনেক সমস্যা আছে।

প্রভাবতী দমে গেলেন। সেও একটা কথা।

একটু ভেবে নিয়ে বারীনবাবু বললেন, আমরা অবশ্য বুড়োবুড়ি—ঝিমিকে নিয়েও ভাবনা নেই। আমরা ধরো—কথাব কথা বলছি, থেকে গেলুম এখানে। আমাদের আর কে কী করবে? কিন্তু সন্টু—সন্টুটার জন্য মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। ধরপাকড় শুরু করলে তো আর বাছাবাছি হবার জো নেই। বিরাট ভবিষ্যৎ ওর সামনে পড়ে আছে। খামোকা একটা কালির দাগ পড়ে গেলে চাকরি-বাকবির গতিক কী হবে কে জানে।

প্রভাবতী দেযালের তাকে ঠাকুরের ছবির দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তাঁর চোখদুটি ভিজে হয়ে উঠেছে। একবার একটুখানি কেঁদে উঠলেন।......ডান চোখটাতো খুইয়েছি, ওইটে এখন সম্বল। আমার আর মন মানছে না গো!

বারীনবাবু স্ত্রীর কান্নায় ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। রঞ্জুর মৃত্যুর পর থেকে প্রভাবতীর পুরোনো ফিটের অসুখটা চাগিয়ে উঠেছিল। মাঝে মাঝে হঠাৎ এখনও এটা হয়। প্রভাবতী কান্নাটা সামলে নিলেন অবশ্য। আঁচলে নাকচোখ মুছে বললেন, বরং সন্টুকে তাহলে কোথাও কিছুদিনের জন্য পাঠিয়ে দাও।

সেও মন্দ হয় না ...বারীনবাবু অন্ধকারে যেন আলো দেখে লাফিয়ে উঠলেন।

আচ্ছা, আমাদের রবীন তো এখন প্রতাপগড়ে রয়েছে, না?

হ্যাঁ। এই তো গতমাসে চিঠি লিখেছিল।

প্রতাপগড় তা মন্দ হবে না। জায়গা ভালই। আলোহাওয়া আছে। স্বাস্থ্যকর।

সেখানে আবার গন্ডগোল-টোল নেই তো?

বারীনবাবু সজোরে মাথা দোলালেন। ...না, না। আমি জানি—ভারি চমৎকার জায়গা। সবাই তো বেড়াতে-টেড়াতে যায় ওদিকে। হিলসাইড জায়গা, নদী আছে—তোমার গিয়ে স্যাংচুয়ারি আছে। তোমাকে তো শোভা এত করে লেখে, তুমি এ বাড়ি ছেড়ে নড়তেই চাও না। কেন? গত এপ্রিলে রঞ্জুর খবর পেয়ে রবীন এসে তোমাকে নিয়ে যাবার জেদ করল না?

প্রভাবতীর ঠোঁটে একটুখানি হাসি ফুটল এবার। ...হ্যাঁ রবীন বড় ভাল মানুষ। শোভার ভাগ্য দেখে হিংসে হয়।

বারীনবাবু গতিক বুঝে সকৌতুকে বললেন, আর আমি বুঝি মন্দ মানুষ? শোভার দিদির ভাগ্যটাই কম কিসের?

প্রভাবতী প্রথম যৌবনের হারানো রংটা একপোঁচ এনে ফেললেন মুখে। ...তোমার সব সময় ইয়ে। হ্যাঁ—আমার ভাগ্য কম কিসের? আর বোল না। বিপদের মুখেও ছ্যাঁচড়ামি করা তোমার চিরকালের অভ্যেস।

ত্বরিতে গম্ভীর হয়ে বারীনবাবু বললেন, যাক গে—তাহলে সন্টু প্রতাপগড়েই যাক। কী বলো? নিজের লোক—অসুবিধে হবে না। ভালই যত্ন-আত্তি হবে। কথায় বলে মায়ের চেয়ে মাসির দরদ বেশিই। তা হ্যাঁ গো, আজ রাত্তিরে ধরপাকড় হবে কে বলল?

ঝিমি বলছিল। ও একটু আগে ওপরের ফ্ল্যাটে গিয়েছিল। শুনে এসেছে। নগেনের বউয়ের কে লালবাজারে থাকে নাকি! নগেনের ভাই দুটো যে পাড়ার সেরা মস্তান। তাই সাবধান করে দিয়েছে।

তাহলে সন্টু সন্ধ্যার ট্রেনেই যাক।

কারফিউ যে! বেরোবে কী করে?

এখনও ছ'টা বাজেনি। না, বেজেছে? ঘড়িটা দেখ তো? ভাগ্যিস, আজ একঘন্টা আগে বেরিয়েছিলুম অফিস থেকে! পথে তারকের কাছ হয়ে আসব ভেবেছিলুম। গেলুম না। আসলে ইনটুইসানের কান্ড। দেখলে?

প্রভাবতী ঘড়ি তুলে রেখে দিলেন টেবিলে। ...পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ।

পনের মিনিট বাকী। রঘুবাবুর বাজার অবধি কারফিউ। হেঁটে যেতে ছ'সাত মিনিট লাগুক। তোমার কাছে গোটা দশেক টাকা হবে না? আমার কাছে পাঁচ-ছ'টা হতে পারে। দেখছি। তুমি ওকে ডাকো।

প্রভাবতী বললেন, এক্ষুনি এই সন্ধ্যের মুখে? না—না!

উঁহু—আমার ইনটুইসান বলছে। ও সন্টু, সন্টু!

প্রভাবতী কী বলবেন, ভেবে পেলেন না। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন মাত্র। তাঁর মনে একটা ঝড় বয়ে এসেছে। সেটা সামলাতে দাঁতে ঠোঁট কামড়ে ধরলেন শুধু। তারপর বললেন, কিন্তু ও যাবে কোন পথে? যদি পথে কোথাও কিছু...

বারীনবাবুর স্বভাবই এই। যা মাথায় এসেছে, তক্ষুনি না করা হলে তাঁর চলে না। বাধা দিয়ে বললেন, কিচ্ছু হবে না—আমি বলছি। ও এই গলি দিয়ে ধোবীঘাট পুকুরটার পাড়ে চলে যাক। তারপর মাঠটা পেয়ে যাচ্ছে। মাঠ পেরোলেই রেলইয়ার্ড। ব্যস। রেললাইন ধরে সামান্য উজিয়ে গেলেই বাঁদিকে রেলফটক। সেখানে কারফু নেই। সন্টু, ও সন্টু! ...

গৌতম ভারি অবাক হয়েছিল। কিন্তু বাবার স্বভাব জানে বলেই কোন প্রতিবাদ করেনি। তাছাড়া খুব সহজে কিছুতে প্রতিবাদ করাও তার ধাতে নেই। ঝিমি চেঁচামেচি করছিল বটে, কিন্তু মায়ের কান্নাকাটিতে সে-ও চুপ করে গেছে শেষ অবধি। সত্যি তো—রঞ্জুকে হারানোর পর গৌতমকে মা কতকটা বুকে আগলে রাখতেই চেয়েছেন। ও যতক্ষণ বাইরে থেকেছে, মা অনবরত ঘর-বার করেছেন। সেই মায়ের যখন পাঠানোর মত রয়েছে, তখন ঝিমি বাধা দেবার কে? তাছাড়া গৌতম বেচারা নিষ্কর্মা থেকে-থেকে কেমন আলসে আর ঝিম মেরে যাচ্ছে। ওর বাইরে ঘুরে হাত-পায়ের খিল ছাড়ানো দরকার ছিল বইকি। ঝিমি জনান্তিকে ওকে বলেছে, তুই যা—তারপর আমিও তোর সুবাদে একবার ডানা মেলতে পাব মনে হচ্ছে। দেখা যাক। ...

হাওড়া স্টেশনে এসে রাতের গাড়িতে চেপে বসা অবধি তবু গৌতম কতকটা স্বপ্নের ঘোরেই থেকেছে। ঘটনাটা এত আকস্মিক এবং বিনা নোটিসের যে, কতক্ষণ ধরে তার ভ্যাবচ্যাকা ভাবটা ঘোচেনি। হঠাৎ কোন আত্মীয়ের অসুখ বা মৃত্যুঘটিত টেলিগ্রাম পেয়ে অবশ্য এমনি হুট করে বাড়ির সোমত্ত ছেলেকে যে অবস্থায় ছিল সে অবস্থাতেই বেরিয়ে পড়তে হয় স্টেশনের দিকে। কিন্তু এটা স্রেফ অন্য রকম—সোজা কথায় ঃ যঃ পলায়তি সঃ জীবতি! সে পালাচ্ছে। কেন? না—পুলিসের ভয়ে। পুলিস তাকে কেন ধরবে? সে তো দাদার মত রাজনীতি করে না, কিংবা চোর-ডাকাত গুন্ডা নয়—দিব্যি ভালোমানুষ, আইন মেনে চলে, সবুজ আলো না ফোটা অবধি বড়রাস্তা পার হয় না এবং পার হয় জেব্রারেখার ওপর দিয়ে হেঁটে, সে কদাচ ফুটপাত ছাড়া রাস্তায় নামে না, ভিড়ের গাড়িতে উঠে ভিড় বাড়ায় না, গগলস পরলেও মেয়েদের শরীর খুঁটিয়ে দেখে না, এবং ...এবং ...

গৌতম খুঁজে খুঁজে হয়রান। তাহলে কেন পুলিস তাকে ধরবে? সে তো রমেনের মত মারামারি দেখতেও রাস্তায় নামেনি। সতুদের মত বোমাও ছোঁড়েনি। পটকার শব্দে কানে আঙুল দেওয়া তার অভ্যাস। তবু নাকি পুলিস তাকে ধরবেই।

হঠাৎ তার মাথায় এল—তাহলে কি তার বয়স, সার্টিফিকেটের হিসেবে বাইশ বছর দুমাস এবং পারিবারিক হিসেবে তেইশ বছর দুমাস, এই বয়সটাই কি তার বেআইনী ব্যাপার? হ্যাঁ—ওইরকম কথাবার্তা ইদানীং শোনা যাচ্ছে বটে। বাবাও কথাটা বলেছিলেন। ঠিক—তাই বটে। এই রকম বয়স হওটাই সম্ভবত যত গোলমালের মূলে রয়েছে। কিন্তু কী মুশকিল! আমার বয়স এরকম—তা আমি কী করতে পারি তার জন্যে? সূর্য উঠছে, ডুবছে—দিন যাচ্ছে রাত্রি যাচ্ছে একটা করে, আর এ ব্যাপারটা ঘটে যাচ্ছে। গোঁফ ছিল না, গোঁফ হল। পরতুম হাফপ্যান্ট, ফুলপ্যান্টে ঢুকতে হল। আরও সব কতরকম ওলটপালট ঘটে গেল দেখতে দেখতে। এ সবের জন্যে আমি কি দায়ী?

লজিক শাস্ত্র অনুযায়ী এ সত্যি অদ্ভুত একটা ফ্যালাসি। 'একজন গুঁফো লোক চুরি করিতে ধরা পড়িল, সে চোর। অতএব সকল গুঁফো লোকই চোর। একজন লোকের ভুঁড়ি দেখিলাম। সে বড়োবাজারের মারোয়াড়ি। অতএব সকল বড়বাজারের মারোয়াড়ির ভুঁড়ি আছে, কিংবা সকল ভুঁড়িওলা লোকই বড়বাজারের মারোয়াড়ি।' লে হালুয়া!

গাড়ি খুব শান্ত মেজাজে গোদাপায়ের নাচের ঢংয়ে এগোচ্ছে। গাদাগাদি ভিড়। রাতের গাড়িরও রেহাই নেই। রাজ্যের লোকের এত যাওয়া-আসার বাতিক থাকতে পারে, ভাবা যায় না। বাতিক বইকি! প্রত্যেকের এমন কিছু জীবন নিয়ে টনাটানি শুরু হয়নি বা সম্পত্তি রসাতলেও যাচ্ছে না তবু একজায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়া চাই। অভ্যেসটা ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছে মানুষের। এদের প্রত্যেককে ডেকে জিজ্ঞেস করলেই বোঝা যাবে, এমন কষ্ট করে এ গাড়িতে এই কামরাটায় না গেলেও চলত—তাতে এমন কিছু মারাত্মক ক্ষতি নিশ্চয় হত না! সবার বয়স গৌতমের মত নয় বা সবাই আজ রাতে পুলিস পাড়ায় ধরপাকড়ে আসবে বলে লেজ তুলে পালাচ্ছে না কোথাও।

গৌতমের মেজাজ সহজে তাতে না—কিন্তু ক্রমশ কেমন খিঁচিয়ে যাচ্ছিল! তাব একপাশে একটা হোঁদলকুতকুতে ভুঁড়িয়াল গুঁফো লোক বসেছে, অন্যপাশে রাজযোটকের ব্যাপার—এক বিপুলাঙ্গী মহিলা বসেছে। মাঝখানে ইঞ্চি ছ'সাত ফাঁক এখন— ফাঁকটা প্রথমদিকে অবশ্য ডবল ছিল মনে পড়ছে। কখন ল অফ ডিমিনিশিং রিটার্নের তত্ত্ব অনুযায়ী এমনটি দাঁড়াল, ভাবুকতার ঘোরে লক্ষ্য করা হয়নি। দুর্যোধন কেন যে সূচাগ্র পরিমাণ মাটি পান্ডবদের ছেড়ে দিতে চায়নি, দিব্যি বোঝা যাচ্ছে। মানুষের এই হচ্ছে মুল স্বভাবদোষ। একটুকুন জায়গা পেলেই যথেষ্ট—তিলকে তালে পরিণত করতে দেরী হবে না। একেই বলে ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরনো। দুর্যোধন ভারি চালাক ছিল সন্দেহ নেই। গৌতম পা দুটো যে টান-টান করবে, সে উপায়ও নেই। পায়ের নিচে একদঙ্গল দেহাতী মেয়ে কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে বসেছে। সম্ভবত কলকাতা দেখতে গিয়েছিল। ওই খুনোখুনির বোমাবুমির দিনেও লোকে কলকাতা দেখতে আসে! ওরা অস্ফুটস্বরে কলকাতা দেখার বিস্ময়টা অনর্গল প্রকাশ করে যাচ্ছে পরস্পর। 'বিপুল'বাবুর নস্যি নেওয়া অভ্যাস সম্ভবত আগে ছিল না। সর্দির জন্যেই বার বার নস্যি নিচ্ছেন আর হাঁচির চোটে গৌতমের পাঁজরে পেযাই দিচ্ছেন। বাঁদিকের 'বিপুলা' (বাবুর স্ত্রিলিঙ্গ তো বিবি! মেয়েরা শুনলে ক্ষেপে যাবে না? ...পাওয়া গেছে ..., দেবী)...হ্যাঁ 'বিপুলা'দেবীর অভ্যাস পান খাওয়া। দুটো ঠোঁটে দানা দানা লালচে সুপুরির গুঁড়ো লেগে রয়েছে। শুধু তাই নয়—কষ গড়িয়ে যে রস পড়ছে, কাপড়ে ঘষে নিচ্ছেন। যার ফলে বুকের ওপর কাপড়টা দেখলে গা ঘিন ঘিন করে। অথচ কাপড়টা ধবধবে সাদা, সদ্য কাচা। উনি যখন বটুয়া থেকে খিলি বের করছেন, তখন লাউয়ের মত মোটা মোটা হাতের গুঁতো এবং মৃদু নড়াচড়াতেই বাঁদিকের হিপজয়েন্ট রীতিমত টাটাচ্ছে। নস্যি পান দুটোর গন্ধই গৌতম সইতে পারে না। সে সিগ্রেটের ভক্ত কিন্তু সেদিকেও বিপদ হয়ে গেছে। গাড়ি ছাড়ার পর যেই সিগ্রেটটি জেলে আরামে ধুয়ো ছেড়েছে, অমনি দুদিক থেকে যুগপৎ বাজখাঁই মাইকে ঘোষিত হয়েছে—উঃ হু, হু, হু, একি অত্যাচার! অপ্রস্তুত গৌতম সিগ্রেটটা 'সরি' বলে দেশলাই-বক্সের ভিতর সুকৌশলে নিভিয়ে ফেলেছে। তারপর আর সাহস হয়নি। উঠে গিয়ে যে কোথাও খাবে, তার সাহসও নেই—ফিরে এসে আর ও ছ'ইঞ্চিও দেখতে পাবে না। আশ্চর্য, আজকাল ট্রেনের বেঞ্চে কি ছারপোকা থাকে না? কোথায় যে পড়েছিল, ছারপোকার মাংসে নাকি প্রোটিন আছে। দি আইডিয়া! সরকার তাহলে ফরেন মানি কামানোর চমৎকার সুযোগ পেয়ে গেছে। সেজন্যেই বেঞ্চগুলো এমন অহিংস এবং কৈলাস পর্বতের মত খাঁটি বৈষ্ণব!

সারা রাতের জার্নি। ট্রেন পৌঁছবে সেই ভোরবেলা। তারপর আরও দু-তিন মাইল বাস অথবা রিকশো, তারপর প্রতাপগড়। গৌতমের বরাবর কড়া ইনসোমনিয়া। কিন্তু চলন্ত গাড়ির কী যাদু আছে, দিব্যি চোখের পাতা বুজে আসে, ঘুমের খাদের দিকে কেবলই টলে পড়তে হয়—অথচ ঝাঁপ দেওয়া যায় না শেষ অবধি! আঃ, এই ঘুম কোথায় থাকে, যখন সে হরকালী লেনের ঘরে রাত কাটায়? রাগে মেজাজ চনমন করছিল। ঘুম যদি সত্যি সত্যি মানুষ হত, এত শান্ত গৌতম বাঁই করে একটা ঘুষি মারতে পিছপা হত না। এসময়, এখন, এই চলন্ত গাড়িতে যদি কেউ তাকে একটুখানি শোবার জায়গা দিত, সে তার চাকর হয়ে যেত। আচ্ছন্ন চোখে সে দেখছিল এবং ঈর্ষান্বিত হচ্ছিল যে, পায়ের নিচে দেহাতী মেয়েমদ্দগুলো দিব্যি গা এলিয়ে এ-ওর ওপর গড়িয়ে নাক ডাকাচ্ছে। সে চারপাশে তাকাল। বেঞ্চের সবাই বসে-বসে নাক ডাকাচ্ছে। ভারি অবাক তো! দাঁড়িয়ে বা হাঁটতে হাঁটতে ঘুমনোর গল্প শুনেছিল—সেটা হয়তো মিথ্যে না হতেও পারে। ডানদিকের বিপুলবাবুর মুন্ডু প্রায় ভুঁড়ির কাছে ঝুলে গেছে! বাঁদিকের বিপুলাদেবী মাথা কাত করে প্রায় গৌতমের কাঁধের কাছে নাক ডাকাচ্ছেন। দুটো হাত বটুয়াটা কিন্তু শক্ত করে ধরে রয়েছে। গৌতম কাঁধ নাড়া দিলে তিনি সোজা হলেন। পরক্ষণে ঢুলতে ঢুলতে মাথাটা অন্যপাশে গড়িয়ে দিলেন। সেই সময় শোনা গেল, আঃ সোজা হয়ে শোও না! ভদ্রমহিলা ফের সোজা হয়ে ঘুমের ঘোরেই যেন বললেন, শোবার জায়গা কোথা যে শোব? তারপর যথারীতি মাথা চলে এল গৌতমের কাঁধে! গৌতম এবার সাহস পেয়ে বলে উঠল, আঃ, সোজা হয়ে শোন না! উনি ফের সোজা হয়ে যেন ঘুমের ঘোরেই বললেন, আমি কি শুয়ে যে সবাই আমার শোওয়া দেখছে? এবং যথারীতি অন্যপাশে ঝুঁকলে একই আওয়াজ শোনা গেল, আঃ সোজা হয়ে.....

এবার গৌতম ভদ্রমহিলার ওপাশে তাকাল। আরে! এ কখন এল ওখানটায়?

কোন কোন মেয়ের চেহারাতেই ধরা যায়, ভারি বিচ্ছু। যেমন ঝিমি। এ মেয়েটিও আকারে-প্রকারে সেই দলেরই একজন মনে হচ্ছে। হালকা গড়ন, ডিমালো মুখ—গাল দুটো ভরাট, ডান হাতের কব্জিতে চওড়া বেল্টে আটকানো বেঢপ ঘড়ি—ওই হাতটা চিবুকের নিচে থাম বানিয়ে মুখের ভার রেখেছে, এবং চোখদুটো খোলা। এতক্ষণে হিসেবের ভুল ধরা পড়ল। একটা নাকই ডাকেনি। অবশ্য ঝিমিদের নাক ডাকে না সম্ভবত—ঝিমির তো ডাকতে শোনেনি!

সে চোখ উঁচিয়ে তাকাতে গিয়েই চোখাচোখি হল এবং মনে হল মেয়েটি এক সেকেন্ডের কম হাসল— সেটা ভদ্রমহিলাটির এই ঢলানি (আক্ষরিক অর্থে) ভঙ্গীটার দরুনই সম্ভবত। গৌতমও। গৌতমও পাল্টা হাসল—হাসিটা প্রায় তিন সেকেন্ড সময় বাড়ানো।

কিন্তু কোন কথা নয়। ব্যস, চুপচাপ বসে সময় কাটানো গৌতমের অভ্যাস। কিন্তু চলন্ত গাড়িতে উঠে সব অভ্যাস মার খেয়ে যায় প্রচন্ড! সব ওলট-পালট করে দ্যায় চলন্ত রাতের গাড়িগুলো। এমন কিছু মাথায় আসে না যে ভেবে-ভেবে তলিয়ে যাবে! এ সময় এমন কাকেও দরকার হয়ে পড়েছে, যার সঙ্গে অনর্গল কথা বলে যাবে—দরকার হলে তর্ক করবে—কিংবা পাল্টাপাল্টি পরস্পর গান গাইবে। ঘড়ি দেখল সে—রাত ন'টা পনেরো। বাপ্স, এখনও প্রায় ন-দশ ঘন্টার ব্যাপার!

গৌতম আবার আড়চোখে মেয়েটির দিকে তাকাল। এবং আবিষ্কার করল মেয়েটি আড়চোখে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এটা স্রেফ দুষ্টুমি না হয়ে যায় না—কারণ বিপুলাদেবীর প্রকান্ড মুন্ডু এখন গৌতমেরে কাঁধে নেমে এসেছে, এমনকি গালে কাঁচাপাকা খসখসে চুলের সুড়সুড়ি লাগছে। পরক্ষণে মেয়েটি পুরো চোখ খুলে গৌতমকে কী ইশারা করল আঙুল তুলে। বুদ্ধিমান বলে গৌতমের সুনাম আছে। কিন্তু আজ রাতের মত মাথার ভিতর সে জিনিসটে খুঁজে বের করার আশা নেই মনে হল। সে পাল্টা চোখ নাচিয়ে ঠোঁট কাঁপাল মাত্র—অর্থাৎ কী?

মেয়েটি এবার নিজের বাঁ-কাঁধের নিচেটায় আঙুল দিয়ে কিছু ঝেড়ে ফেলার ভঙ্গী করল। তারপর ফের সেই বোবার ভাষায় কী বুঝিয়ে দিল। ঠোঁটে ক্ষণস্থায়ী অনেক হাসি একটার পর একটা বিদ্যুতের ঝিলিক মেরে উঠছে।

গৌতম এতক্ষণে বুঝল। নিজের বাঁ-কাঁধের নিচে শার্টটার অবস্থা কী গড়িয়েছে টের পেতে দেরি হল না তার। ছ্যা ছ্যা! ভদ্রমহিলার কষ গড়িয়ে পড়া লালচে লালায় জামাটার এ কী ছিরি হয়ে গেছে!

ওপাশে মেয়েটির হাসি এবার পুরো বেরিয়ে পড়েছে। চাপা হাসছে। ট্রেনের দুলুনির তালে তালে দুলছে আর ফিক-ফিক করে হাসছে। রাগে ভিতরটা গরগর করে উঠল গৌতমের। আমার জামাটা গেল, আর তুমি দিব্যি মজা পেয়ে হাসছ! গৌতম কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে কড়া স্বরে বলল, আঃ হচ্ছেটা কী!

ভদ্রমহিলা তক্ষুনি সোজা হয়ে বসে কাপড়ে ঠোঁট মুছে চোখ খুললেন। তারপর হাই তুলে পাশের মেয়েটিকে বললেন, কটা বাজল?

মেয়েটি বলল, দশটা হয়ে এল। ঘুমোচ্ছিলে, ঘুমোও না।

আর ঘুমোনো! এমনি করে যেতে পারে কেউ? উঃ মা গো। এমন জানলে দিনের বেলা যেতুম রে রিমি! —ভদ্রমহিলা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গৌতমের দিকে ঘুরে তাকালেন।.....কোথায় যাওয়া হবে বাবা?

ওঁর কণ্ঠস্বরটা যে এমন মধুর, কল্পনাও করতে পারেনি গৌতম। সিগ্রেট খেতে তখন ধমকেছিলেন, সেই রাগ এবং তার জামা নষ্ট করে দেওয়ার চাপা বিক্ষোভ এক সঙ্গে হুড়োমুড়ি করে বেরোতে গিয়ে হঠাৎ মেজাজ স্রেফ জল করে দিল। গৌতম গলে গিয়ে বলল, প্রতাপগড। আপনারা?

প্রতাপগড়! ও রিমি, ইনিও যাচ্ছেন রে! যাক্ বাবা, বাঁচালে....ভদ্রমহিলা হন্তদন্ত হয়ে উঠে দাঁড়াতে ব্যস্ত হলেন। ওপরের বাঙ্কটা ধরে অনেক যত্নে ওঠার পর বললেন, দেখো বাবা, জায়গাটা যেন কেউ মেরে দ্যায় না। রিমি, জলের বোতল দে। মুখে জল দিয়ে আসি।

রিমি নামে সেই মেয়েটি গৌতমের দিকে একবার কটাক্ষ করে বেঞ্চের নিচে থেকে খুঁজে একটা বোতল বের করল। ভদ্রমহিলা সেটা নিয়ে ঘুমন্ত যাত্রীদের ডিঙোতে ডিঙোতে বাথরুমের দিকে চলে গেলেন। মনে হচ্ছিল না যে, পৃথিবীতে মাধ্যাকর্ষণ নামে কোন প্রাকৃতিক নিয়ম আছে।

গৌতম একটু সরে আরাম করে বসল। রিমিও একটু সরল। তারপর রিমি তার অনবদ্য হাসিটা ঠোঁটে নিয়েই বলল, আপনি প্রতাপগড়ে নতুন যাচ্ছেন?

হ্যাঁ।

আমরাও নতুন।...কয়েক সেকেন্ড বিরতির পর সে গৌতমের জামাটার দিকে তাকিয়ে ফের বলল, কেউ জানতে চাইলে দোলের রং বলে চালিয়ে দেবেন।

গৌতম একটু হাসল।....কয়েক সেকেন্ড বিরতির পর সে গৌতমের জামাটাব দিকে তাকিয়ে ফের বলল, কেউ জানতে চাইলে দোলের রং বলে চালিয়ে দেবেন।

গৌতম একটু হাসল।...আপনার নাম রিমি?

এ্যা। হ্যাঁ।

আমার ছোটবোনের নাম ঝিমি।

তাই বুঝি।

উনি আপনার কে হন?

পিসিমা।....বলে রিমি গৌতমের ওপাশে বিপুলবাবুকে দেখিয়ে ফের বলল, আর উনিও নিশ্চয় আপনার কেউ হন?

গৌতম সবেগে মাথা দোলাল।...ভ্যাট! কে হবেন আবার? কেউ না।

রিমি জোরে হেসে উঠল। চাপা গলায় বলল, নিশ্চয় হন। বলতে লজ্জা পাচ্ছেন!

কী অবাক! লজ্জা পাবার কী আছে? চিনিই নে ওঁকে।

ওই সব হোঁদলকুতকুতে লোকের সঙ্গে সবাই যেতে লজ্জা পাবে। আমার তো পায়! হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। দেখছিলেন না, কতক্ষণ আমি পিসিমার সঙ্গে কথা বলিনি!...একটু থেমে হাসি চেপে রিমি ফিসফিসিয়ে উঠল, নির্ঘাৎ আপনার পিসেমশাই!

গৌতম প্রবল আপত্তি জানাল। ...না, না। ভ্যাট! আমার সত্যিকারের পিসেমশায়ের চেহারা টিংটিঙে রোগা—পাঁচফুট দশ ইঞ্চি উঁচু।

আপনার বোনের নাম ঝিমি না কী বললেন? আপনার নামটা কী শুনি?

গৌতম।

আমার এক মাসতুতো দাদার নাম অনুত্তম।

উত্তম হলেই কি ভাল হত না?

রিমি গম্ভীর হয়ে বলল, আমি অচেনা লোকের সঙ্গে জোক করিনে।

গৌতম উঠে দাঁড়াল হঠাৎ। সিগ্রেট বের করে ক্ষিপ্তহাতে জ্বালল। চোঁ চোঁ করে টানতে থাকল। তারপর বলল, কথা বলে সময় কাটানোর লোক খুঁজছিলুম—কিন্তু আপনি ভীষণ সিরিয়াস দেখছি। বাই দা বাই, আপনার পিসিমার নিশ্চয় ফিরতে দেরি হবে?

রিমি মুখ তুলে ভুরু কুঁচকে তাকাল। ... কেন?

ভড়কে গিয়ে, গৌতম জবাব দিল, তাহলে বেশ তারিয়ে-তারিয়ে খেতুম সিগ্রেটটা।

রিমি চোখ নামাল।...না খেলেই পারেন ওসব ছাঁইপাশ। আমার দাদা তো খায় না। দিব্যি আছে।...বলে সে বুকের কাছ থেকে রুমাল বের করে নাক ঢেকে ফেলল হঠাৎ।

গৌতম আরও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সিগ্রেটটা আগের মত দেশলাই বাক্সে নিবিয়ে ফেলল। তারপর মার্চ করার ভঙ্গীতে পা দুটো ঠুকে খিল ছাড়িয়ে নিল। বলল, আঃ, কী আরাম! আপনিও এ সুযোগে কাজটা সেরে নিতে পারেন কিন্তু। শুনছেন? এমন সুযোগ হেলায় হারাবেন না। মাইন্ড দ্যাট, এখনও ন' ঘন্টার জার্নি!

রিমি কড়ামুখে কী বলতে গিয়ে হেসে ফেলল। পরক্ষণে উঠে দাঁড়াল। ওপরের বাঙ্কটা একহাতে ধরে ক্রমান্বয়ে পা টান করে নিল। বলল, কী যেন বলছিলেন! আঃ কী আরাম?

হ্যাঁ। বর্ণপরিচয় পড়েছেন? নিশ্চয় পড়েননি। আমার বাবা একটু সেকেলে, ব্যাপারটা খুব পছন্দ করেন। মর্ডান অক্ষর-পরিচয়ের বই ওঁর চক্ষুশূল।

রিমি হঠাৎ ধুড়মুড় করে বসে পড়ল।... ওই রে, এসে গেল! আরাম হারাম হ্যায় এখন। এই! বসে পড়ুন শিগ্গির। নইলে আর স্কোপ পাবেন না।

গৌতম শান্তভাবে বসতে বসতে বলল, স্কোপ যথেষ্ট পেয়েছি।

রিমি ফের রেগে কিছু বলতে যাচ্ছিল, ওর পিসিমা এসে গেলেন—প্রকাণ্ড বেলুন নাচতে নাচতে এল বায়ুতরঙ্গের দোলায়।...বিমি, সরে বোস। বাবা,একটুখানি....ব্যস ব্যস! ওই যথেষ্ট!

ভদ্রমহিলা বসাব সঙ্গে সঙ্গে গৌতম টের পেল আগের ছ'ইঞ্চি কী করুণায় কিংবা দৈবযোগে দু'ইঞ্চি বেড়ে আট হয়েছে এবং এবার সত্যিকার অর্থে বসা যাচ্ছে। সে কি রিমির পিসিমার আকস্মিক অতিথিবাৎসল্য?

রিমির পিসিমা কৌটো থেকে পান বের করতে করতে বললেন, এবার বাবার সঙ্গে গল্প করে সময় কাটানো যাক। ঘুম যা হবার হয়ে গেছে—আর হচ্ছে না। তোমার নাম কী বাবা? তুমি বললুম, কিছু মনে করো না কিন্তু। কোথায় থাকো তোমরা? বাবা-মা বেঁচে আছেন? ক'ভাই-বোন? কী করো তুমি?...

দুই

প্রতাপগড় স্টেশনে যখন ট্রেনটা গিয়ে দাঁড়াল, তখন সকাল সাতটা সাঁইত্রিশ। বেশ খানিকক্ষণ লেট করেছে। স্টেশনটা মাঝারি ধরনের। ওভারব্রীজ আছে। ছোট্ট শান্টিং ইয়ার্ড আছে। আশেপাশে অনেক ছোটখাটো পাহাড় দেখা যাচ্ছে। কাছের পাহাড়টায় জায়গায় জায়গায় লাল ছোপ—নিশ্চয় মরশুমী ফুল ফুটেছে গাছপালায়। বিপুলবাবু কখন কোন স্টেশনে নেমে যাওয়ার ফলে শেষরাতটুকু বেশ আরামেই কেটেছিল গৌতমের। ঘুম আসছিল, কিন্তু জেগে থাকতে হয়েছে। রিমির পিসিমার বিশাল পারিবারিক ইতিহাস শুনতে হয়েছে তাকে। এবং সেই সুবাদে রিমির পিসি সিগ্রেট খেতেও পারমিট দিয়েছিলো—এইটুকু যা সুখ। তবে অন্তরঙ্গ চেনাজানা হবার পর বর্ষিয়সী মহিলার সামনে সিগ্রেট খেতেও বাধো-বাধো ঠেকছে। কিন্তু ওঁর মতে—লজ্জা করতে নেই বাবা, পথে সবই চলে। পথের মানুষ লৌকিকতা মানে না—মানা যায় না। অতএব খাও, আজকাল সবাই খায়।

রিমি কিন্তু সমানে ঘুমিয়েছে। পায়ের নিচে দেহাতী জোয়ানটার বুকের ওপর টান-টান পা তুলে দিব্যি ঘুমিয়ে নিয়েছে। মেয়েরা কী করে বসে সময়-সময়, তা তারা নিজেরা জানে না।

ট্রেনের স্টপেজ মাত্র তিন মিনিট। রিমির পিসি হৈ-চৈ শুরু করে দিলেন।...এ্যাই রিমি, ওঠ্ ওঠ্! এসে পড়েছি। কুলি, কুলি! এই ছেলে! বাবার নামটাও ভুলে যাচ্ছি....

গৌতম কিটব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে বলল, গৌতম।

বাবা গৌতম, একটা কুলি ডেকে দাও না বাবা। সামান্য দু-একটা মালপত্তর রয়েছে সঙ্গে!

গৌতম বেরিয়ে গেল। দরজার বাইরে এদিক-ওদিক তাকাল। স্টেশনঘরের সামনে একদঙ্গল রেলকুলি বসে রয়েছে। হাত দিয়ে অনবরত ইশারা করলেও তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। ব্যাপার কী। প্রত্যেক কামরা থেকে সবাই নিজের মোটঘাট নামাচ্ছে। সে একটু অবাক হল। ভিতরে রিমির পিসির করুণ চেঁচামেচি সমানে চলেছে। রিমি কোমরে আঁচল জড়িয়ে একটা বড় সাইজের সুটকেস, একটা প্লাস্টিক বাস্কেট ইত্যাদি টেনে দরজার কাছে জড় করছে।

একজন রেলের লোক আসছিল। লোকটা প্রতি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কী বলেছিল। কাছাকাছি এলে গৌতম ব্যাপারটা বুঝে ফেলল তক্ষুনি।... হেঁয়াপর আজ সুবেসে রেল কুলিলোগ হরতাল কিয়া হ্যায়। গাড়ি দশ মিনিটকে লিয়ে ঠার যায়ে গা। পেসেঞ্জার লোঁগোকো আপ্‌না-আপ্‌না সামান আপানা হাতসে উঠানে পড়ে গা।

লোকটা টেনে টেনে ঘোষণাটা উচ্চারণ করছিল। গৌতম অবাক হল। অনেক খবর তার জানার আগে কীভাবে সবাই জেনে ফেলে এটা সে বরাবর দেখেছে। এ গাড়ীর প্রায় সব যাত্রীই খবরটা কোন অজ্ঞাতসূত্রে জেনে ইতিমধ্যে মালপত্তর নামিয়ে ফেলেছে। কেবল গৌতমই টের পায়নি। খবর নাকি বাতাসের আগে আগে চলে। কিন্তু খবর ঠেলে নিয়ে যাওয়া বাতাসটা যেন কী সুকৌশলে গৌতমকে পাশ কাটিয়ে যায় বরাবর।

রিমি দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, কুলি নেই?

গৌতম জবাব দিল, হরতাল। ওই শুনুন না। এ্যানাউনসমেন্ট দিচ্ছে।

রিমি হাসিতে ভেঙে পড়ল। পিছনে ঘুরে বলল, পিসিমা, হরতাল!

পিসির মুন্ডুটা বেরিয়ে এল ওকে ঠেলে।...হরতাল? কিসের হরতাল? কার হরতাল?

গৌতম বলল, কুলিরা হরতাল করেছে। মোট বইবে না।

এ্যাঁ! ...লাফিয়ে উঠলেন পিসি।...ও রিমি, ঠ্যাল, ঠেলে দে!...পরক্ষণে ঘুরে করুণকণ্ঠে বললেন, কেন ওরা হরতাল করলে বাবা?

গৌতম আন্দাজে বলল, কোন প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে মারামারি হয়েছিল ভাড়া নিয়ে।

বাবা, সোনা আমার, মানিক! একটু হাত লাগাও বাবা! পিসি সিঁড়ি থেকে বেলুনের মতন উড়ে এলেন। গৌতমের হাত ধরে টান দিলেন—ও রিমি, ঠেলে-ঠেলে দে দাদাকে।

মালের সংখ্যা কম, কিন্তু ওজন কম নয়। এত ভারি কী সব থাকে মানুষের! গৌতমের প্রায় ঘাম বেরিয়ে গেল। রিমির কাঁধে একটা ক্ষুদে চামড়ার ঝুলি (ঝোলার স্ত্রীলিঙ্গ?), একটা ক্যামেরা, একটা ভিউ-ফাউন্ডার ঝুলছে। চারিদিকে তাকিয়ে এবার সে ঝুলি থেকে গগলস বের করে পরল। গৌতম একটু ক্ষুণ্ণ হল। এত সুন্দর চোখদুটো ঢেকে ফেলল রিমি! তাছাড়া এমনিতেই মেয়েদের রহস্যময়ী লাগে গৌতমের। এখন রিমি পুরো কালো পর্দার আড়ালে চলে গেল।

পিসি কৌটা থেকে পান গালে পুরে বিগলিত হাসলেন।—তাহলে রিমি?

রিমি সম্ভবত দূরের কোন পাহাড় দেখছিল। সাড়া দিল, উঁ?

বাস কোথায় আছে খোঁজ-টোজ করবি তো এবার?

রিমি একইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, এমন তাড়াহুড়ো তো, এলে কেন? বললুম, বিকেলে একটা এক্সপ্রেস টেলি করে দাও তোমার জামাইকে। স্টেশনে গাড়ি রাখবেন। তোমার তো ওই অভ্যেস! কেত্তন শুনেই বৃন্দাবন ছোটো। একটু ভাবাভাবি নেই!

গৌতম দাঁড়িয়ে ছিল— যেতে পারছিল না। একটু হেসে বলল, ইয়ে—আমিও তো যাচ্ছি। ওখানে বাস দাঁড়িয়ে আছে মনে হচ্ছে।

রিমি একবার ঘুরে হাসল।—মনে হচ্ছে কী! আমি তো দিব্যি দেখতেই পাচ্ছি।

পিসি বললেন, রিমি, শিগগির গিয়ে বাসে জায়গা রাখতে বল!

রিমি বলল, বাস ছেড়ে দিল।

গৌতম বলল, নেক্সট বাস আছে। তাছাড়া রিকশোও তো রয়েছে।

পিসি বললেন, রিমি, এগুলো তাহলে রিকশোওয়ালাকে গিয়ে বল, নিয়ে যাক।

রিমি জবাব দিল, রেলকুলিদের হরতাল। ওরা বাইরের কাকেও এখানে এসে মোটে হাত লাগাতে দেবে ভাবছ?

তাহলে কী হবে রে রিমি? কী বিপদে পড়লুম।...পিসি কাঁদো কাঁদো মুখে মোটঘাটের দিকে তাকালেন।

রিমি নির্বিকার বলল, বা রে। ভাবছ কেন? তোমার বাবাটি তো এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আজকালকার ছেলেরা ভীষণ পরোপকারী হয়—বিশেষ করে মেয়েরা যখন সমস্যায় পড়ে।

পিসি গৌতমের দিকে ঘুরতেই গৌতম দু-হাতে সুটকেস আর বাস্কেটটা তুলে নিয়ে গম্ভীর মুখে পা বাড়াল। ওরা দুজন পিছনে আর সব জিনিস নিয়ে আসছে টের পাচ্ছিল সে। এবং নির্ঘাত রিমি চাপা হাসছিল। হাত বদল করতে থেমে যাচ্ছিল বার বার। তাও আড়চোখে গৌতম দেখল।

পরের লোকাল বাস একঘন্টা পরে। দূরে যাওয়ার কয়েকটা বাস রয়েছে কিন্তু সেগুলোয় তিল ধারণের জায়গা নেই—তাছাড়া প্রতাপগড়ের যে রাস্তায় ওরা যাবে, সেটা রুট নয়। লোকাল বাস মাত্র একটাই। ততক্ষণে রিকশোই ভালো। এক রিকশোয় কুলালো না। অগত্যা গৌতমের রিকশোয় কিছু মালপত্র তুলে দিলেন রিমির পিসি।

দুই রিকশোওয়ালাই রিমির পিসির জামাইকে চেনে। তাঁর কোঠি চেনে। নদীর ধারেই সেটা রয়েছে। কিন্তু গৌতমের মেসোমশাই রবীনবাবুকে কেউ চেনে না। না চিনুক, রাস্তাটা তো চেনে। নম্বর রয়েছে কাছে। অসুবিধে হবে না।

চড়াই-উৎরাই পথ। সামনে হু হু বাতাস। খুব কষ্টে এগোচ্ছিল রিকশো দুটো। দুধারে অজস্র পোড়ো জায়গা—ঘাস আর গাছপালায় ভর্তি। বড় বড় পাথর ছড়ানো রয়েছে সবখানে। পথের পাশে মাঝে মাঝে উঁচু আর ছোটোখাটো টিলাও পড়ছে। পাহাড়ী গাছপালার চেহারায় বসন্ত-কালের রং ধরেছে। আগে রিমিরা যাচ্ছে, পিছনে গৌতম। মাঝে মাঝে রিমি পিছন ঘুরে যেন হাসছে। অন্তত ঠোঁট আর একটুখানি দাঁতের ঝিলিকেই তার আভাষ। কেন হাসছে রিমি, গৌতম বুঝতে পারল না। স্বয়ং রবিঠাকুরেব মত পন্ডিত বলে গেছেন, মেয়েরা অমন করে কেন হাসে—তা বিধাতাও কি জানেন? তবে স্বীকার করতে হবে, রিমি খানিকটা গায়ে-পড়া এবং সরলও বটে।

রিকশো বাঁ-দিকে—পুবের রাস্তায় ঘুরল। বসতি এলাকা শুরু হয়েছে এখান থেকে। দুধারে বাংলোপ্যাটার্ন বাড়ি, ফুলবাগিচা। ছবির মত সুন্দর সব। একটু গিয়ে রিকশোটা থামল।

•

অনেক কষ্টে মেসোমশায়ের কোয়ার্টার খুঁজে বের করা গেছে! প্রায় একঘন্টা ঘোরাঘুরি করার পর। কোয়ার্টারের নম্বরগুলো এমন এলোমেলো যে নতুন লোকের পক্ষে ভারি অসুবিধেয় পড়তে হয়। বারো বাই ই বাই সাতচল্লিশের পাশে বারো বাই কে বাই ঊনষাট। বোঝ ঠ্যালা!

এ কোয়ার্টারগুলো একটু নিচু পর্যায়ের মনে হল। রিমির পিসির জামাই খুব বড় অফিসার না হয়ে যান না। টানাটানি করলেও ভিতরে যায়নি গৌতম। পরে আসবে বলে কেটে পড়েছিল।

কিন্তু একটু হতাশ হল মেসোমশায়ের কোয়ার্টার দেখে। বাবা-মা'র-বর্ণনা শুনে যে রকমটি উঁচু ধারণা নিয়ে বসেছিল, তত কিছু নয়। রবীনবাবু সম্ভবত কেরানী-টেরানী কিছু হবেন। গৌতমের বাবার মতই।

বাবার চিঠিটা পড়ে শোভামাসি তো হেসে-কেঁদে খুন।। কলকাতার খবরাখবর কাগজে পড়ে সবসময় এদের জন্যে দুর্ভাবনায় ভোগেন! তার ওপর রঞ্জুর ব্যাপারটা রয়েছে! বললেন,...এসে ভালো করেছ সন্টু। এখানেই থেকে যাও। আর কলকাতা ফিরে কাজ নেই। উনি চেষ্টা-চরিত্র করবেন'খন! মিলে যাবে একটা কিছু।...পরক্ষণে ফের বললেন।....আমার অবশ্য সংসারটা খুব ছোট নয়, সে তো দেখতেই পাচ্ছ। তা হোক, অসুবিধে হবে না। ভাইবোনগুলোকে সকাল-সন্ধ্যে একবার করে নিয়ে পড়তে বসাবে—ব্যস!

একটু দমে গেল গৌতম। মার মুখে শুনে মাসি-সম্পর্কে কিছু ধারণা ছিল তার—সেটা প্রায় মিলেই যাচ্ছে। শোভাবতী খুব নাকি হিসেবী মেয়ে, ঘোর সংসারী, এবং স্বার্থপর টাইপের। অবশ্য এটা খুব প্র্যাকটিক্যাল বুদ্ধির নমুনা। গৌতমের মা একেবারে উলটো টাইপ। সেজন্যেই নাকি, বাবার মতে, তাদের

সংসারের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেনি। আসলে তিন-সাড়ে-তিনশো টাকা মাইনের চাকুরে সংসারের এ বাজারে কী শ্রীবৃদ্ধি ঘটা সম্ভব, পরিকল্পনা দপ্তরের লোকেরাই হিসেব কষে বলে দিতে পারে।

তিনরুমওলা এই কোয়ার্টারে বাস করে ছোট-বড় মিলিয়ে আটজন লোক। রবীনবাবু, তাঁর অথর্ব বাবা, শোভামাসি আর পাঁচটি ছেলেমেয়ে অর্থাৎ প্রথম চারটি মেয়ে, কনিষ্ঠটি ছেলে—তার সবে হাঁটি হাঁটি পা-পা দশা। এযুগে এতগুলো ছেলেপুলে হওয়ার একমাত্র কারণ যে পুন্নাম নামক নরক সম্পর্কে মেসোমশায়ের উৎকট ভীতি, তা সসংকোচে অনুমান করেছে গৌতম।

তার আরও খারাপ লাগল, যখন বাইরের ঘর থেকে রবীনবাবুর স্থবির বাবাকে ধরাধরি করে অন্য ঘরে ঢোকানো হল। এ ঘরটা রান্না ঘরের সামনা-সামনি। একটা দিকে দুটো জানালা—কিন্তু সেদিকটা পশ্চিম এবং জঙ্গলে সজ্জীবাগানে ঠাসা, একটা মস্ত ঝুপসি কী গাছও ডালপালা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বাইরের ঘরটা অবশ্য বাইরের ঘর হিসেবে কোনকালে ব্যবহার করা হয়েছে, মনে হল না। কী দুর্গন্ধ! পায়খানা পেচ্ছাব ওখানেই করতেন বৃদ্ধ। বড়মেয়ে মঞ্জু, মেজ রেণু, সেজ বুবু, যথাক্রমে ষোল, চৌদ্দ এবং বারো—বালতি বালতি জল ঢেলে ঘর পরিস্কার করে ফেলল। তক্তপোষ ঢোকাল দুটো! তাতে মেঝের তিনের-চার ভাগ ফুরিয়ে গেল। বাকিটুকুতে টেবিল আর দুটো চেয়ার পড়ল। খালি তাকগুলো দেখতে দেখতে পাঠ্যপুস্তকে ভর্তি হয়ে গেল। এবং তাকের ওপর-মধ্য-নীচ নিয়ে বেশ চেঁচামেচি ঝগড়াঝাঁটিও হল বোনেদের মধ্যে। গৌতম মধ্যস্থ হয়ে থামাল সব। একটি বছর আটেকের মেয়ে উঁকি দিচ্ছিল দরজায়। সে আচমকা ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। গৌতম তাকে দু-হাতে ধরে কোলে তুলে বলল, আরে! কাঁদছ কেন? কী নাম তোমার?

সে ক্রমাগত হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করে গাছ থেকে নামার মত সর সর করে নেমে গেল। তারপর মঞ্জু আর রেণুকে এলোপাথাড়ি খামচাতে শুরু করল। ওরা দুজনে অবশ্য হাসছিল। ...আঃ, বলবি তো কী হয়েছে? এই মিনু! আঃ, কী হচ্ছে? কলকাতার দাদা নিন্দে করবে ছিঃ, করো না। কতক্ষণ পরে বোঝা গেল মিনু সবচেয়ে উঁচু তাকটায় বই রাখতে চায়। মঞ্জু ফের বলল, কী মুশকিল! অত উঁচু থেকে বই পাড়বি কী করে তুই?

মিনু খ্যাঁচ করে ওর চুল ধরে এক টান মারল।

এবং ফের হৈ-চৈ লেগে গেল। বুবু আর নীচে নামতে রাজী নয়। দেখা গেল এবার মঞ্জুও রেগেছে! তারপর আচম্বিতে পরস্পর খামচাখামচি ফোঁপানি চ্যাঁ ভ্যাঁ শুরু হয়ে গেল। শোভামাসি রান্নাঘর থেকে খুন্তি হাতে দৌড়ে এলেন। খুন্তি তলোয়ারের মত ঘুরিয়ে বললেন, মেরেই ফেলব—আজ শেষ করে দেব একেবারে। পিছনে রবীনবাবু প্রচন্ড চেঁচিয়ে বললেন, চো-ওপ, চোওপ্! বের করে দাও ঘর থেকে!

এই সব ধকল সামলে চান-খাওয়া শেষ হতে দুপুর গড়াল। রবীনবাবু সাইকেলে যথাসময়ে অফিস চলে গেছেন। মাইলখানেক দূরে একটা টিলার ওপর ওঁর অফিসটা। গৌতমকে বলে গেছেন, কাল পরশু একবার গিয়ে দেখে এসো। ভালো লাগবে। সরকার এখানে এলাহী কান্ড করছে—না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না।

খাওয়ার পর বাইরের ঘরে আধশোয়া ভঙ্গীতে সিগ্রেট টানতে টানতে চোখে ঘুম এসে পড়ল। সিগ্রেট জানালার বাইরে ফেলে দিয়ে শুলো সে। আপাতত বাড়িতে কেউ নেই। রবীনবাবু যাবার পরেই চার বোন স্কুলে চলে গেছে। বাড়ি এখন শান্ত। ভিতরের দরজায় শোভামাসিকে দেখা মাত্র গৌতম চোখ বুজে ফেলল। সত্যি, না ঘুমালে আর চলবে না। শোভামাসি অস্ফুট বললেন, ঘুমোচ্ছ? ঘুমোও। পরে কথা বলব'খন।

তারপর কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমটা বেশ গভীর। অনেক-কালের অনিদ্রা এখানে এসে দিন-দুপুরে সুদে-আসলে কতকটা উসুল হয়ে গেল যেন। ঘুম যখন ভাঙল, তখন ঘরের ভিতর বাইরের রোদের আভা কমে গেছে। চোখ খুলে জানালার বাইরেই দৃষ্টি রেখেছিল গৌতম। কানে অস্পষ্ট খস খস আওয়াজ আসছিল। সে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। দেখল, টেবিলের ওপর আয়না রেখে মঞ্জু আর রেণু মুখ মেরামতে ব্যস্ত। মঞ্জুর হাত থেকে পাউডার পাফটা কেড়ে নিতে চেষ্টা করছে রেণু এবং না পেরে ফ্রকের নিচেটা তুলে কাজ চালিয়ে নিচ্ছে। মঞ্জু ওর ফ্রকের দিকে তাকিয়ে চোখ কটমট করছে। বুবু লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কোন ফাঁকে ঠোঁট দুটো লাল টুকটুকে করে ফেলেছে—আয়নার

ভরসা করার ধৈর্য ছিল না। এক কথায় ওরা সাজগোজ করছে। গৌতম বুঝল, স্কুল থেকে ফিরেই এসব কান্ড হচ্ছে এবং কলকাতার দাদার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হলে কতখানি স্তব্ধতা আর ভদ্রতা থাকা দরকার ইতিমধ্যে মায়ের কাছে তা শেখা হয়ে গেছে। মঞ্জু মুখ ঘুরিয়ে তাকে দেখার চেষ্টা করতেই গৌতম চোখ বুজল। মনে মনে হাসতে লাগল। ষড়যন্ত্র-সঙ্কুল চাপা ফিসফিস খুটখাট নানারকম আওয়াজ তাকে যেন সুড়সুড়ি দিচ্ছিল ক্রমাগত।

তারপর শোভামাসির সাড়া পাওয়া গেল। ....দাদা উঠেছে রে? গৌতম চোখ ফেলল ফের। দরজায় মাসিকে দেখে উঠে বসল। ওঁর সঙ্গে মিনু এসে ঢুকল। মিনুর সাজগোজ শেষ। চোখে কাজল, ঠোঁটে রং—দিব্যি টুকটুকে হয়ে উঠেছে ওবেলার মেয়েটা। শোভামাসি বললেন, চা আনি। মুখ ধুয়ে নাও ততক্ষণ। মঞ্জু, তোদের হল? সন্টু,..... হেসে ফেললেন শোভামাসি..স্কুল থেকে ফিরেই ওরা তোমার জন্য অপেক্ষা করছে, তা জানো?

গৌতম বিছানা থেকে নেমে ওদের সবার দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে হাসল। ..আচ্ছা!

শোভা বললেন, আর বলো না বাবা। যা হতচ্ছাড়া পাজি জায়গা। সকাল-সন্ধ্যে ওরা যে একটু বেড়াবে-টেড়াবে, তার যো নেই। উনি তো ফেরেন সেই সন্ধ্যেবেলা। আমি এই যখের ধন আগলাবো, না বাইরে বেরোব। তার ওপর ওই শ্বশুরমশায়কে নিয়ে হয়েছে যত জ্বালা। সবসময় কাছে তৈরী থাকা চাই। মেয়েরা একলা বেরোবে, তাও সাহস করে ছাড়তে পারিনে।

গৌতম বলল, কেন?

শোভা বড় বড় চোখে তাকিয়ে চাপা গলায় বললেন, ছত্রিশ-জাতের ছত্রিশরকম বদমাস এসে জুটলে যা হয়, তাই হয়েছে। চুরি-চামারি খুন-জখম ছিনতাই এসব লেগেই রয়েছে! মেয়েরা সে সন্ধ্যেব পর একা-দোকা বেরোবে, তার উপায় নেই। তার ওপর প্রায়ই শুনছি, ছেলেধরার উৎপাত হচ্ছে। তোমার মেসোমশাই বলেছিলেন, এই তো ক'দিন আগে, নারে মঞ্জু, এগার নম্বর জোনেব কাব ছেলে না মেয়ে...

মঞ্জু বলল, হ্যাঁ—বুবুর মত বয়স মেয়েটার। রেণু, ওই যে কোয়ার্টাবে যাদের কদমগাছ রয়েছে, কী যেন নাম ..ধুর, মনে পড়ছে না। ওই যে...

রেণু হ্যাঁ করে থাকল। শোভা বললেন, সাধ্য থাকলে এখান থেকে পালিয়ে বাঁচতুম বাবা। একসঙ্গে চার বোনে স্কুলে যায়, কাছেই স্কুল অবশ্য—যতক্ষণ না ফেরে দুগ্‌গা-দুগ্‌গা করে কাটাই। হ্যাঁ, চা এনে দিই। যাও, বোনেদের নিয়ে ঘুরে ফিরে সব দেখে এসো। কিন্তু জঙ্গল-টঙ্গলের দিকে যেও না আবার—সন্ধ্যের আগেই ফিরে এস...

একটু পরে চা আর চিঁড়েভাজা খেয়ে গৌতম বেরোল। কোয়ার্টারের সামনে অযত্নলালিত ফুলবাগিচা অথবা তার ধ্বংসাবশেষ—ভাঙাচোরা বেড়া—একটু গেটমত রয়েছে। তার মাথায় কী প্রচন্ড প্রাণশক্তিতে একটা বুগানভিলিয়া ঝাঁপি বানিয়ে বাস করছে। শোভামাসি বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছোট্ট টুকুনকে কোলে নিয়ে টা-টা শেখাচ্ছিলেন। টুকুন হাত তুলে খিল খিল করে হাসল। হঠাৎ গৌতমের কী মনে হল, দৌড়ে গিয়ে বলল, ওকেও দাও মাসিমা। সবাই যাচ্ছে—আর ও দোষ করল কী?

টুকুন নতুন লোক দেখে মুখটা হাঁড়ি করে ফেলল নিমেষে। কিন্তু গৌতমের আগ্রহ দেখে—কিংবা তাঁর মেয়েদের একজন এমন সুন্দর ছিমছাম কলকাতাবাসী দাদার সঙ্গে বেড়াতে বেরোনোর আবেগে, জোর করে টুকুনকে ওর কোলে গুঁজে দিলেন। গৌতম বাঁ-হাতের ওপর কোমরের কাছে অদ্ভুত ভঙ্গীতে ওকে বসিয়ে ডান হাতে তুড়ি বাজাতে বাজাতে এগোল। টুকুন চেঁচামেচি করছিল। কিন্তু রাস্তায় পৌঁছে দিদিদের হাসি আর নাচন-কোঁদন দেখে তখন কান্নাটা আচমকা হাসিতে বদলে দিল।

কিছুদুর গিয়ে বড়রাস্তা ধরল ওরা। একটা উঁচু টিলার ধার ঘেঁষে রাস্তাটা নেমে গেছে উৎরাইয়ের দিকে। মার্চের বিকেলে হালকা রোদ, পরিচ্ছন্ন বিশাল আকাশ, ঝকমকে কালো পথ, ছবির মত সুন্দর কোয়ার্টারগুলো ঢেউখেলানো জমির ওপর ছড়িয়ে আছে—সব মিলিয়ে বাঙালী কলকাতাওয়ালাদের চোখে ভারি ভাল লাগে। গৌতমের আগে চলছে শাড়িপরা মঞ্জু, ডাইনে রেণু, বাঁয়ে মিনু আর বুবু হাত-ধরাধরি করে। নিচের দিক থেকে রিকশোগুলো পায়ে হেঁটে ঠেলে নিয়ে আসতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে দু-একটা ট্রাক বা প্রাইভেট গাড়ি যাচ্ছে। পথচারীর সংখ্যা একটু কম এদিকে। স্থানীয় লোকেরা

সাইকেল ছাড়া পথ চলে না। অনেকটা যাওয়ার পর বাঁদিকে নদীর ধার অবধি প্রসারিত অসমতল একটা পার্ক পাওয়া গেল। পার্কের একখানে প্রকান্ড উঁচু ফোয়ারা রয়েছে। ঘনচিকন সবুজ ঘাস ঝাউ আর অচেনা বিলিতি গাছপালা আর লতাবিতানের মনোরম দৃশ্য চোখে পড়েছিল। আঁকাবাঁকা খালের পোলে দাঁড়িয়ে ছেলেমেয়েরা জল দেখছে। কৃত্রিম প্রপাত দেখছে। এখানে ওখানে দল বেঁধে বা জোড়ায় জোড়ায় যুবক-যুবতীরা বসে রয়েছে। মঞ্জু অনর্গল পার্কটার বিষয়ে কথা বলে যাচ্ছে।

গেট পেরিয়ে ওরা ঢুকল। ঢালু ঘাসের জমিতে বসল। টুকুনকে নিয়ে মঞ্জুরা খেলায় মাতল। গৌতম নদীর ওপারটা লক্ষ্য করছিল সিগ্রেট খেতে-খেতে। ওপারেই স্যাংচুয়ারি—সংরক্ষিত বনাঞ্চল। সবুজ বিস্তৃত জঙ্গলটা থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে ছোট-বড় অনেক টিলা। সে ভাবছিল, ওই একটা টিলার চুড়োয় একলা গিয়ে বসে থাকলে কী চমৎকার না হয়!

ততক্ষণ মঞ্জুরা গৌতমকে বুড়ি করে লুকোচুরি খেলা শুরু করেছিল। হঠাৎ যে কখন পরস্পর মারামারি শুরু করেছে গৌতম টের পায়নি। টুকুন তার সামনে বসে একটা পাতাভরা ডাল আস্ত গিলে খাবার চেষ্টায় ব্যস্ত। ভ্যাঁও করে আচমকা সাইরেন গোছের আওয়াজে সে দেখল মঞ্জুর চুল খামচে ধরে মা দুর্গার মত তাকিয়ে রয়েছে রেণু। মঞ্জু তার ফ্রকটা দুহাতে টানছে এবং অসুরবৎ চাউনি তার ঊর্ধ্বমুখে। বুবু রেণুর পিঠে বেদম কিলোচ্ছে। আর মিনু পাশে দাঁড়িয়ে পিঠ গর্ত করে 'কলকাতার সকাল নটার' আওয়াজ দিয়েছে।

এ অবস্থায় কী করা উচিত বুঝতে পারল না গৌতম। প্রথমে তার মনে হল, মেসোমশাইয়ের মত বার দুই বিকট 'চোপ' বলা দরকার। কিন্তু খোলামেলা আকাশের নিচে, তাছাড়া কোনদিন ইহজীবনে জোর করেও একটা ধ্বনিও তার স্বরযন্ত্র থেকে বেরোয়নি, সেটা কতখানি কাজের হবে বুঝতে পারল না। সে বিব্রতভাবে উঠে দাঁড়াল। তারপর রেণুর হাত থেকে অনেক কষ্টে মঞ্জুর চুলটা ছাড়াল প্রথমে। মঞ্জু অস্ফুটে কেঁদে উঠল। রেণুর হাতে কয়েকটা চুল থেকে গেল। এই সুযোগে বুবু রেণুর চুল ধরে ফেলেছে। রেণু ঘুরে তাকে খামচাচ্ছে, কাতুকুতু দেবার চেষ্টা করছে। এবার কান্না থামিয়ে মিনু এসে বুবুকে ধরে ফেলল এবং মোটামুটি সে একটা কুরুক্ষেত্র কান্ড। গৌতম দেখল, সে এখানে সত্যি বড় অসহায়। আর সবচেয়ে বিশ্রী ব্যাপার, সে হেসে ফেলেছে। ভীষণ হাসি পাচ্ছে তার। ওদিকে ইতিমধ্যে দর্শকও জুটে গেছে। দূরে-অদূরে দাঁড়িয়ে সবাই দৃশ্যটা উপভোগ করছে। সেই সময় আচমকা মিনু এক কান্ড করে বসল। ঝোপের ধার থেকে একটুকরো পাথর কুড়িয়ে রেণুর কানের পাশে মেরে বসল। কানের পেছন মুহূর্তে লাল হয়ে গেল। কান থেকে হাত চোখের সামনে এনে রক্ত দেখামাত্র রেণু বিকট চেঁচিয়ে ঝাঁপ দিল মিনুর দিকে। মিনু সঙ্গে সঙ্গে—সম্ভবত রক্ত দেখে দিশেহারা হয়ে দৌড় লাগাল। তাকে অনুসরণ করল রেণু। তারপর বুবু। অবশেষে মঞ্জু।

পার্কটা বিশাল। দিনের আলো কমে আসছে দ্রুত। দূরে নদীর জলে লালচে ছটা ঝিকমিক করছে। ঘাস গাছপালা বনঝোপ ধূসর হয়ে উঠেছে। কয়েক মুহূর্ত হতচকিত দাঁড়িয়ে থেকে গৌতম দৌড়ল। তার মনে হল মিনুর আজ নির্ঘাত রক্ষা নেই। এ সেই কলকাতার খুনের বদলে খুনের আইন। ঘোরালো পথ দিয়ে অনেকটা নিচে ওদের দৌড়তে দেখল সে। সোজাসুজি এগিয়ে দেখল সামনে খাল। তাই ঘুরে রাস্তা দিয়ে দৌড়ল। ইউক্যালিপটাস গাছের জঙ্গলের ভিতর চার বোনে ঢুকে পড়েছে। গৌতম ভিতরে ঢুকে ডাকল, মঞ্জু, মঞ্জু! সাড়া পেল না। জঙ্গলটা পেরিয়ে ঝাউবন। তারপর নদীর ধারে সুন্দর একটা পাথর-বাঁধানো পথ। সেখান থেকে চারিদিকে তাকাল সে। দেখল ডানদিকে উঁচু জায়গাটায় ঘাসের উপর মিনুকে ধরে ফেলেছে ওরা। ভয়ে শিউরে উঠে দৌড়ল গৌতম। এই রাক্ষুসে মেয়েগুলো হয়তো ওকে মেরেই ফেলবে। মিনু উবুড় হয়ে পড়েছে। আর মঞ্জু ওকে আড়াল দিয়েছে দেখে আশ্বস্ত হয়েছে গৌতম। কিল খামচানিগুলো মঞ্জুর ওপর দিয়েই যাচ্ছে। রেণুর কান ছাড়িয়ে দু'চার ছোপ রক্ত ফ্রক অবধি পৌঁছেছে। গৌতমকে দেখামাত্র এবার কোন দুর্জ্ঞেয় কারণে সবাই ক্ষান্ত দিল । গৌতম মিনুকে তুলে দাঁড় করাল। তারপর শুরু হল অভিযোগ আর পাল্টা অভিযোগ। হঠাৎ মঞ্জু লাফিয়ে উঠে বলল, সন্টুদা, সন্টুদা। টকুন কোথায়?

অ্যাঁ! পলকে গৌতম ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল।....তাই তো! সে লাফ দিয়ে দৌড়ল। জীবনে এসব অভ্যাস কোনদিনই নেই। কলকাতার রাস্তায় বোমা-গুলি চলার মধ্যে অনেকবার গিয়ে পড়লেও সে

শান্তভাবে হেঁটে জায়গাটা পেরিয়েছে। কিন্তু প্রতাপগড়ে পা দিয়ে এই সব প্রতাপ না দেখালেই নয়— ভাগ্যটা কী উল্টোদিকে এনে ফেলেছে রাতারাতি।

গলা শুকিয়ে গেল গৌতমের। চোখের সামনে সব ঝাপসা হয়ে গেল। টুকুন সেখানে নেই— সেই পাতাভরা ছোট্ট ডালটাও নেই। তার পিছনে একে একে চার বোন এসে দাঁড়িয়ে কাঠ হয়ে গেছে। ব্যাপারটা তক্ষুনি টের পেয়েছে। কয়েক মুহূর্ত পরস্পর তাকাতাকি করে প্রথমে কাঁদল রেণু। তারপর বুবু ও মিনু। মঞ্জু ফোঁস করে বলে উঠল, হল? এবার হল তো?

গৌতম ওদেরকে দাঁড়াতে বলে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করল কিছুক্ষণ। সামনে যাকে পেল, জিজ্ঞেস করল। কেউ বলতে পারল না। সবাই এখন পার্ক থেকে ফেরার তাড়ায় ব্যস্ত। সন্ধ্যে নেমে আসছে। উঁচু ফোয়ারাটার চারপাশে নানা রঙের আলো জ্বলে উঠেছে। সে অপূর্ব দৃশ্য দেখার চোখ নেই এখন। গৌতমের মনে হল, এটুকু সময়ের মধ্যে টুকুনের সাধ্যমত পা ফেলে কিংবা হামাগুড়ি দিয়ে খুব বেশিদূর যাওয়া সম্ভব নয়। গেলেও তার কান্নাকাটি নিশ্চয় শোনা যেত। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় যে কেউ তাকে তুলে নিয়েছে।

হৃৎপিন্ড ধক ধক করে উঠল। কে তুলে নিল তাকে? মাসীমা ছেলেধরার উৎপাতের কথা বলেছিলেন। সর্বনাশ! যদি তাই ঘটে থাকে?

তাছাড়া এখন বাড়ি ফিবে যাব কোন মুখে? চার বোনেব পর মা ষষ্ঠীর কৃপায় এই একটি মাত্র ছেলে মেসোমশায়-মাসিমার—বংশের একটিমাত্র সলতে। গৌতম চেষ্টা করলেও কাঁদতে পারে না কোনদিন। বরং এক্ষেত্রে নানান আজগুবি ব্যাপার তার মাথায় এসে গেল। হঠাৎ এই মুহূর্তে বিনানোটিশে তার মরে যাওয়া ছাড়া রাস্তা নেই। উঃ পৃথিবীটা কী গোলমেলে বিপত্তিকর জায়গা, বডদাটা স্রেফ বেঁচে গেছে। গৌতমের কপালে অশেষ কষ্ট আছে বোঝা যাচ্ছে। সে মঞ্জুকে ডেকে শুকনো স্বরে বলল, ম-মঞ্জু, এখানে থানাটা কোথায়? জানো?

মঞ্জু অনবরত ফোঁস-ফোঁস করছিল। নাক-চোখ মুছে বলল, সে তো অনেক দূর।

বুদ্ধিমতী রেণু আচমকা কান্না থামিয়ে বলল, এই দিদি! পার্কের দারোযান বলতে পাববে না? ওই একটা গেটই তো আজকাল খোলা রাখে। নিশ্চয় ও দেখে থাকবে। টুকুন অচেনা লোকেব সঙ্গে গেলে কান্নাকাটি না করে ছাড়বে না।

গৌতম লাফিয়ে উঠল। বলল, ঠিক বলেছ। চল, গেটে গিয়ে খোঁজ কবি।

গেটের দারোয়ান নিবিষ্টমনে শুনে ডাকল, রামধনিয়া, হৈ রামধনিয়া! কোন সাড়া এল না। সে গৌতমকে বলল, হাম তো আভি ডিউটিমে আসলো। বাবুজী হঁয়াপর—উও যে টাট্টিখানা হ্যায়— দেখিয়ে, উও যো বার্ত্তি জ্বল রাহা হ্যাঁ, আভি রামধনিয়া ঘুষা হ্যায়। যাইয়ে। চলিয়ে যান। উও যব নিকলেগা, পুছ করকে দেখিয়ে। রামধনিয়া থা গেটমে আভিতক। ও বলতে পারবে।

মঞ্জুদের দাঁড়াতে বলে গৌতম এগিয়ে গেল। কোন ব্যাটা গুঁফো খৈনী খাওয়া রামধনিয়া পায়াখানায় ঢুকে রয়েছে—কতক্ষণ লাগবে কে জানে। গৌতমের তো এক-দেড়ঘন্টা লাগে। সে করুণমুখে একপাশে দাঁড়িয়ে রইল। নাকে রুমাল চাপা দিতেও ভুলল না অবশ্য।

উঃ মিনিট গেল, না—ঘন্টা, নাকি দিন আর মাস আর বছর, আলোগুলো ভূতের মত দেখাচ্ছে, ছায়া কাঁপছে মাটির ওপর, বাইরে, রাস্তায় গাড়ির শব্দ শোনা যাচ্ছে, মাঝে মাঝে, দূরে নদীর ওপারের উঁচু টিলাটা মুছে গেল আকাশের মধ্যে, রামধনিয়া তারপর বেরোল। কানে পৈতে গোঁজা। মাটিতে হাত ঘষে লোটার জল ঢালল। কাঁধের গামছায় হাত মুছল। পেটে হাত বুলালো। তারপর পৈতেটো কান থেকে নামিয়ে গদাইলস্করী চালে এগিয়ে এল। হো লছমনিয়া! তেরা খাটিয়া নিকাল বে! দিন ভর ধুপোমে পৈড়ল বা।

গৌতম সবিনয়ে নমস্কার করে বলল, আচ্ছা, রামধনিয়াবাবু, আপ তো সামতক গেটমে থে। কোই আদমি এক ছোটি লড়কা লে গয়া, দেখা হ্যায়? কোই রোনেবালা লড়কা?

রামধনিয়া হাত চিতিয়ে একটা ভঙ্গী করে জবাব দিল, দেখা না। কেতনা রোনেবালা লড়কা ঔর কিতনি রোনেবালি লড়কি লেকে আদমী আতা ঔর যাতা। কৌন লড়কাকা খবর পুছতা হাম ক্যায়সে.... হোই লছমনিয়াঃ!.....এবার ডাকটা খুব গরম।

গৌতম তার হিন্দুস্থানীতে সাধ্যমত ব্যাপারটা বোঝানোর চেষ্টা করল। রামধনিয়া নির্বিকার। সে তার খাটিয়ার দিকে মনোযোগী। সারা রাত খটমলের কামড়ে তার নিদ হয় না। সে লছমনিয়ার সঙ্গে ঝগড়ায় ব্যস্ত হয়েছে। কারণ, তার ধারণা ছায়া নামবার আগেই খাটিয়াটা না ওঠানোর ফলে যে-খটমলগুলো ঘাসের নিচে লুকিয়েছিল, যথারীতি তারা ফের এসে ঢুকে পড়েছে। লছমনিয়া হনুমানজী এবং স্বয়ং রামজী ও সীতামাইজীর নামে কিরিয়া করেও রেহাই পাচ্ছে না।

গৌতম একটু দাঁড়িয়ে থেকে মঞ্জুদের কাছে চলে আসছে, সেই সময় হঠাৎ রামধনিয়া হাত তুলে ডাকল—এ বাবুজী! শুনিয়ে, শুনিয়ে!

গৌতম ফিরে এল। রামধনিয়া কোমরের কাছ থেকে একটা চিরকুট বের করে একগাল হেসে বলল, হা রামজী! মাফ কিজিয়ে বাবুজী। হাম একদম ভুল গেয়া থা। বাপ রে বাপ, খাটিয়ামে এত্তা খটমল— শালা গিদ্ধড়কা বাচ্চে রাতভোর সুঁই দেতা বাবুজী। ওহি লিয়েসব গড়বড় হো যাতা। দেমাগ ভি খারাব হো যাতা। তো দেখিয়ে, আধাঘন্টা আগেসে এক মাইজী ঔর বাবুজী ইয়ে কাগাজ হামকো দেকে বোলা কী, কোই আদমির লড়কা হারিয়েসে তো উনকো দে দেবে।

চমকে উঠে গৌতম বলল, সে কী ? দেখি, দেখি! ....চিরকুটটা নিয়ে সে দেখল, একটা ঠিকানা লেখা আছে, সুদীপ্ত সেন, জোন নাম্বার সি, ফোর্থ স্ট্রীট, কোয়ার্টারি নাম্বার সাত বাই ই। আর কিছু নেই। সে ব্যস্ত হয়ে বলল, ওঁদের কাছে কোন বাচ্চা ছেলে ছিল দেখে ছিলেন রামধনিয়াবাবু? কোই রোনেবালা লড়কা আপ দেখা থা?

রামধনিয়া জবাব দিল, নেহী বাবুজী। মাইজি তো গাড়ীমে বৈঠকে থী—বাবুজী আকে খালি কাগাজ দিয়া।

গৌতম দাঁতে ঠোঁট কামড়ে বলল, ওঁরা যেই হোন, আর একটু অপেক্ষা করতে পারলেন না? আশ্চর্য লোকতো! পার্কের ভিতর খুঁজে দেখলেই হত!

বোঝা গেল অল্প-সল্প বাংলা বোঝে রামধনিয়া। সে বলল, হাঁ হাঁ। উও বাত তো হাম পুছা থা। তো বাবু বোলা কী, আভি গাড়ি লেকে টিশন পঁহুচনে পড়ে—মালুম কোই টিরেনমে যায়েগা। এক মিনিট ঠারনেকো টাইম নেহী থা। ব্যস!... সে খাটিয়ায় বসে খৈনী ডলতে শুরু করল।

গৌতম ডাকল, মঞ্জু! তোমরা এস খোঁজ পাওয়া গেছে!....ওরা সবাই হাঁউমাউ করে দৌড়ে এল। গৌতম ততক্ষণে তার জীবনের অবিশ্বাস্য কুইক মার্চ শুরু করেছে। পিছনে দৌড়চ্ছে চার বোন। মিনু সামনে গুন গুন করে কাঁদছে। গৌতমের রাগ হচ্ছিল—অদ্ভুত লোক তো ওঁরা! টুকুনকে দারোয়ানের কাছে রেখে গেলেই পারতেন। নাকি রেখে যেতে চেয়েছিলেন, ব্যাটা খৈনীখোরদুটো রোনেবালা লড়কার হ্যাঙ্গামা সামলাতে পারবেন না বলে রাজী হয়নি? কিংবা দুজনেরই জলদি টাট্টিখানা যাবার দরকার হয়েছিল? এই বসতিহীন প্রান্তর এলাকায় থেকে-থেকে রামধনিয়া আর লছমনিয়া সম্ভবত বুদ্ধু হয়ে পড়েছে।

'সি' জোনটা কাছাকাছি দেখেছিল মনে পড়েছে। সামনের মোড়ে একটা ফলকে লেখা ছিল না? সেখানে পৌঁছতে মিনিট পাঁচেক লাগল। হ্যাঁ—এখান থেকে বসতি শুরু। আলো জ্বলছে চারিদিকে। সব একতলা কোয়ার্টার—কিন্তু বেশ পরিচ্ছন্ন ছিমছাম এলাকা। একজনকে জিজ্ঞেস করলে সে ফোর্থ স্ট্রীটটা দেখিয়ে দিল। সোজা পুবে এগিয়ে বাঁদিকে যাবার পর নদীর কাছাকাছি পড়বে। গতি কমাতে হল। মঞ্জুরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে—বুবু আর মিনু প্রায় হাঁপাচ্ছে। টুকুনকে কতখানি ভালবাসে বেচারারা—বোঝা যাচ্ছে বেশ। গৌতম একটু পরে দেখল, তারা ফোর্থ স্ট্রীটে ঢুকছে। মাঝে মাঝে অনেকটা ফাঁকা জায়গা, তারপর বাংলো ধাঁচের কোয়ার্টার। বাঁ-দিকে সাত নম্বর চোখে পড়ল একটা গেটে। পরক্ষণে রাস্তাটা চিনে ফেলল। সকালে এই রাস্তা দিয়েই তো রিমি ও আর তার পিসিকে পৌঁছে দিয়ে গেছে। ওই তো টেনিসকোর্টটা! ওই সেই ত্রিকোণ পার্ক। ওখানেই ওরা নেমেছিল রিকশো থেকে। গৌতম দেখল, এখানের গোলমেলে নম্বর খুঁজে বের করতে সময় লাগবে। তার চেয়ে সোজা রিমিদের কোয়ার্টারে গিয়ে হাজির হওয়া ভাল। রিমির পিসিমার জামাই নিশ্চয় সুদীপ্ত সেনকে চিনবেন।

আর একদমে সেই কোয়ার্টারের গেটে গিয়ে হাজির হল সে। তারপর পিছু ফিরে বলল, মঞ্জু, তোমরা একটু অপেক্ষা কর—আমি এক্ষুনি আসছি।

ঘুরে পা বাড়াতে গিয়ে গেটের পাশে সবুজ কাঠের ফলকটার দিকে চোখ পড়ে গেল তার। ল্যাম্প-পোষ্টের আলোয় সেটা স্পষ্ট পড়া যাচ্ছে। সুদীপ্ত সেন। জোন নাম্বার সি, ফোর্থ স্ট্রীট, কোয়ার্টার নাম্বার ....!

ভুল দেখছে না তো? ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল সে ফলকটার দিকে। ফের পড়ল। হ্যাঁ, এই তো সেই ঠিকানা। কাগজের সঙ্গে একটা একটা করে মিলিয়ে নিল। কোন ভুল নেই। অর্থাৎ টুকুন নির্ঘাত রিমির পিসির জামাই এবং মেয়ের হাতে পড়েছে— সুতরাং নিরাপদে আছে। কিন্তু রিমি কি বেড়াতে যায়নি তাহলে?

আরও দু-একটা প্রশ্ন তার মাথায় ঝিলিক দিয়ে গেল। এক ঃ— এদের গাড়ি আছে। কিন্তু শাশুড়িকে স্টেশন থেকে আনতে গাড়ি গেল না কেন?

ও, মনে পড়েছে। হঠাৎ শাশুড়ি ভাইঝিকে নিয়ে এসে পড়েছেন যে। বিনা নোটিসে এলে গাড়ি পাঠাবার প্রশ্নই ওঠে না।

দুই ঃ— এমন গাড়িওলা জামাইয়ের শাশুড়ি এমন কষ্ট করে থার্ডক্লাসে এলেন কেন?

এর জবাব হতে পারে ঃ সম্ভবত শাশুড়ির ফার্স্টক্লাসে চাপবার মত পয়সা নেই। জামাই বড়লোক শাশুড়ি গরীব— এই তো হতেই পারে! অনেক গরীব শাশুড়ির মেয়েটি ভারী সুন্দর হয়। সেই সুন্দরী মেয়ের প্রেমে পড়েও বড়লোকের ছেলে তাকে বিয়ে করে বসে।

কী সময়ে কী ভাবনা! গৌতম নিজের ওপর রেগে গেট খুলল। সটান ভিতরে গিয়ে বারান্দার নিচে দাঁড়াল। কিন্তু কী ভাবে, ঠিক কী আওয়াজ দিয়ে ডাকবে খুঁজেই পেল না কয়েক মুহূর্ত। মাঝে মাঝে মানুষের সামনে কী উৎকট সমস্যা এসে পড়ে ভাবা যায় না। এরা গাড়িওলা লোক। কী বলে ডাকা যায়, সে খুঁজে পাচ্ছে না।.... কে আছেন? বললে তেড়েমেড়ে কেউ পাল্টা যদি বলে বসে— কাকে চাই? কিংবা যদি ভিখিরি ভেবে ফেলে? কেউ যে বেরোচ্ছে না ছাই! বারান্দার ছাদ থেকে লতাপাতার ঝালর ঝুলছে। টবে সার সার ফুলগাছ, ঝাউ, ক্যাকটাস সাজানো। বারান্দায় মোটামুটি পরিষ্কার আলো আছে। হাল্কা বেতের সোফাসেট পাতা রয়েছে। দরজায় ভারি পর্দা ঝুলছে। ফাঁক দিয়ে ঘরের ভেতরের আলো দেখা যাচ্ছে। একটু কাশলে কেমন হয়? পরক্ষণে ভাবল যদি চোর ভেবে চেঁচিয়ে ওঠে! সবচেয়ে ভয়ের কথা, কুকুর আছে—না নেই? থাকলে নিশ্চয় বাইরে নোটিশ থাকত, কিংবা এতক্ষণে গর-গর করে তেড়ে আসত। রিমির নাম ধরে ডাকবে? কিন্তু তত বেশি পরিচয় হয়নি বলে সাহস পেল না গৌতম। একবার পিছু ফিরে মঞ্জুদের দিকে তাকাল সে। মঞ্জুরা সবাই মিলে হাত তুলে তাকে সাহস দিচ্ছে এবং ডাকতে বলছে সম্ভবত।

গৌতম মরীয়া হয়ে উঠল। বারান্দায় উঠে সটান তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, পিসিমা, পিসিমা আছেন?

তক্ষুনি ভিতর থেকে আওয়াজ এল—কে ? অচেনা গলা। তারপর পর্দা তুলে এক ভদ্রমহিলা বেরোলেন। গৌতমের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললেন, কাকে চান?

টুকুনের কথা বলতে গিয়ে গৌতম বলে ফেলল, আজ সকালে যে ভদ্রমহিলা কলকাতা থেকে এসেছেন—মানে পিসিমা...

মহিলা ঘুরে ডাকল, মা! তোমার সঙ্গে কে একজন দেখা করতে এসেছেন।

এবার পিসিমা বেরোলেন। গৌতমকে দেখে হন্তদন্ত হয়ে বলে উঠলেন, এস বাবা—এস। সোনা এস। ও অপু, বলেছিলুম না এর কথা? এ ছেলে না থাকলে আজ আমার হয়েছিল! এস বাবা, ভেতরে এস। ও রিমি!

বোঝা গেল মহিলাটি অর্থাৎ অপুই পিসিমার মেয়ে। হ্যাঁ—যা অনুমান করেছিল তাই। সে বলল, ভেতরে আসুন। বাইরে কেন? আপনার গল্প আজ পিসি-ভাইঝি সারাদিন করছে। আপনার নামটা কিন্তু ওরা কিছুতেই মনে করতে পারল না।

গৌতম নমস্কার করে বলল, আমার নাম গৌতম চ্যাটার্জি। দেখুন আমি কিন্তু......

ভিতর থেকে সেই মুহূর্তেই রিমির আওয়াজ এল—কে এল পিসিমা? জামাইবাবু ফিরলেন নাকি?

গৌতম ভিতরে ঢুকে বড় বড় চোখে তাকাল।

টুকুন কার্পেটের ওপর প্রকান্ড একটা বল বুকে ধরেছে আর অন্য হাতে কী কামড়াচ্ছে, নাকে সিকনি ঝরছে, চোখদুটো ভিজে এবং কোটরগত—সামনে হাঁটু ভাঁজ করে বসে রিমি ওর সঙ্গে খেলা করছে অর্থাৎ ওকে ভোলাচ্ছে। রিমি গৌতমকে দেখেই হেসে বলে উঠল, এই, জানেন? আজ দিদি একটা ছেলে কুড়িয়ে পেয়েছে। কী লাক্! ভারি সুন্দর বাচ্চাটা, না? .. বলে হাসি মুখে বেমানান বাৎসল্যের দৃষ্টিতে টুকুনের দিকে তাকাল।

গৌতম কাঁচুমাচু মুখে বলল, ওর জন্যেই এসে পড়েছি কিন্তু! পার্কে ওকেই আমরা হারিয়ে ফেলেছিলুম। এ আমার মাসির একমাত্র খোকা।

রিমি হাততালি দিয়ে উঠল। পিসিমা বললেন, হা ভগবান! এ কী কান্ড! ও অর্পণা এ যে, ইয়ে। ...বলে উনি হাসতে হাসতে সোফায় গড়িয়ে পড়লেন। একরাশ পানসুপুরির কুচি ছিটকে পড়ল চারিদিকে। সবাই হাসছে দেখে টুকুন ভ্যাঁ করে দিল।

সেই সময় দরজার পর্দা সরিয়ে আচমকা মঞ্জুদের আর্বিভাব ঘটল। প্রায় শকুন পড়ার মত ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ল টকুনের দিকে।

হাসি-কান্না আদর চেঁচামেচি—সে এক ভীষণ হৈ হৈ ব্যাপার রৈ রৈ কান্ড একেবারে। ওরা কাকেও কিছু বলার অবসর না দিয়ে যেমন এসেছিল তেমনি সদলবলে বেরিয়ে গেল টুকুনকে নিয়ে। গৌতম তখন মুখ খুলল। অপ্রস্তুত ভঙ্গীতে বলল, ইয়ে—কিছু মনে করবেন না। চার বোন এক ভাই তো—তাই একটু ইয়ে। আচ্ছা, পিসিমা, চলি।

রিমি এগিয়ে বলল, ভ্যাট্! ওরা যাক না। আপনি বসুন। পিসিমা, তোমার বাবা যে মহাপ্রস্থান করছেন তুমি কিছু বলছ না?

পিসিমা বললেন, যাক না—কী ভাবে যাবে ছেলে! বুড়ো মাকে পৌঁছে দিয়েছে। ফেলে চলে যাবে নাকি?

অপর্ণা বলল, বসুন বসুন, গৌতমবাবু! কর্তা আসুক—আলাপ করতে চেয়েছে আপনার সঙ্গে। শাশুড়ির মুখে শুনে-টুনে জামাইও আমার প্রেমে...বলেই রিমির দিকে তাকিয়ে সে জিভ কাটল।

রিমি বলল, তাহলেই বুঝুন—আপনি আমাদের কাছে কী হয়ে উঠেছেন!

গৌতম একটু গাঁইগুঁই করল।...ওরা আবার ভাববে-টাববে...

রিমি কড়া স্বরে বলল, ভ্যাট! আজকাল কেউ কারও জন্যে ভাবে না। বসুন না বাবা, ট্রেনে তো দিব্যি পাশাপাশি অতক্ষণ বসে কাটালেন। তখন তো কোন ওজর দেখিনি!...দিদি, আমার খারাপ লাগছে। তোমার এখানে একটা কিছু নিয়ে থাকার মত কিস্যু নেই। কার খোকাটা পেলে যদি...ভ্যাট!

অপর্ণা হাসল।...এখন থেকে খোকা রোগে ধরে গেছে? বাঃ, বেশ উন্নতি হয়েছে তো তোর রিমি!

রিমি একটা পত্রিকা টেনে মুখের আকস্মিক রংবদলটা ঢাকবার চেষ্টা করল। গৌতম বসল।

বাইরে গাড়ির আওয়াজ শোনা গেল। অর্পণা ব্যস্তভাবে দরজার দিকে এগোতে এগোতে বলল, ভাসুরমশাই ট্রেন পেলেন কি না কে জানে! বেশ দেরী হয়ে গিয়েছিল।

গাড়িটা বাইরে কোথাও থামল। একটু পরে অপর্ণার পিছনে এক সুদর্শন টেকো ভদ্রলোক ঢুকলেন। গৌতমের দিকে তাকাতেই রিমি বলল, জামাইবাবু, ইনিই ভদ্রলোক—মানে আপনার শাশুড়ি মহোদয়া যাঁর কথা বলছিলেন!

পরস্পর নমস্কার-বিনিময় করল ওরা। অপর্ণা বলল, ট্রেন পেলেন তাহলে? যাক্‌গে—শোন। সেই বাচ্চাটা পেয়েছিলুম না? এঁরই মাসির ছেলে। পার্কে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে হারিয়ে ফেলেছিলেন! এক্ষুনি ওর বোনেরা নিয়ে গেল ওকে।

সুদীপ্ত গৌতমের পাশে বসে বলল, কী নাটকীয় কান্ড!

তিন

রবীনবাবু সুদীপ্ত সেনের কথা শুনে লাফিয়ে উঠেছিলেন। ওরে বাবা! মিঃ সেনই তো তাঁদের বস—স্বয়ং বড়সাহেব! বয়স তরুণ হলেও কাজকর্মের ব্যাপারে ভারি পাকা। ছ'মাস আগে এসেছেন দিল্লী থেকে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে সবাইকে হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দিয়েছেন, চাকরি কী জিনিস—

ডিউটি বলতেই বা কী বোঝায়! প্রথম-প্রথম কিছুদিন আপিসের সবাই তো মনে মনে চটে লাল হয়ে থাকত ওঁর প্রতি। ইউনিয়নও ব্যাপারটা লক্ষ্য রাখছিল। কিন্তু ক্রমশ দেখা গেল, সেনসাহেব কাজের ব্যাপারে যত কড়াই হোন—আচরণে ভারি ভদ্র। মনের রাগ মুহূর্তে জল হয়ে যায় ওর একটি মিষ্টি হাসিতে। সকলের ব্যক্তিগত ব্যাপারেও খোঁজখবর নেন। ওঁর চেষ্টাতেই এখানকার হাসপাতালের সংলগ্ন একটা পৃথক ওয়ার্ড হয়েছে, যাতে এই 'আকরিক ধাতু নিষ্কাশন সংস্থার' কর্মীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। আসার পর থেকে উনি প্রতিটি জোনে সাবরডিনেট এবং মিনিয়াল স্টাফের কোয়ার্টারগুলো পরিচ্ছন্ন আর সুদৃশ্য করার চেষ্টায় লেগেছিলেন। সবাইকে নিজের শ্রমে ওইসব সাফ সুতরো কাজ করতে হয়েছে। নিজে উনি দাঁড়িয়ে থেকে সকাল-সন্ধ্যা এসব কাজে উৎসাহ যুগিয়েছেন। সামনের মাসে সবচেয়ে সুদৃশ্য কোয়ার্টারের মালিককে পুরস্কৃত করার কথাও হয়েছে। গৌতম এসে যে অবস্থা দেখেছে, তার সঙ্গে আগের অবস্থার কোন তুলনা হয় না। সে ছিল যেমন জঙ্গলে পরিবেশ, তেমনি নোংরা। গৌতম একটা দৃশ্য কল্পনা করে খুব হাসছিল— মেসোমশাই আন্ডারপ্যান্ট পরে খালি গায়ে কোয়ার্টারের সামনে জঙ্গল সাফ করছেন, সুদীপ্ত সেন দাঁড়িয়ে আছেন পাশে।.....

মঞ্জুদের পড়াশোনার উৎসাহ অমিতবিক্রমে বেড়ে গেছে হঠাৎ। এরপর প্রতি সকাল আর সন্ধ্যেটা কীরকম কাটবে তার নমুনা প্রথম দিনই পাওয়া গেল। সে কী রণতাণ্ডব! চার বোন চার রকম ভঙ্গী ও সুরে ঘরের ভিতর পড়া মুখস্থ করছে। সবচেয়ে বেশি শোনা যাচ্ছে মিনুর গলা। অতটুকু মেয়ের গলায় যে একশোটা রেল-এঞ্জিনের বাঁশি একসঙ্গে বাজতে পারে —না শুনলে ভাবা যায় না। আর শোভামাসি একটা ছড়ি দিয়ে গেছেন গৌতমের হাতে। বেদম ঠ্যাঙানোর পারমিট মঞ্জুর করেছেন। কিন্তু ওটা গৌতম কতদূর ব্যবহার করতে পারবে, নিজেই জানে না। এবং করলেও পরিণতি কী ঘটতে পারে—সে বিষয়ে শঙ্কাও তার প্রবল। ওরা চারজনে ঝাঁপিয়ে পড়লে গৌতমকে লেজ তুলে স্যাংচুয়ারির দিকেই পালাতে হবে হয়তো।

সারাটা সকাল কান ভোঁ ভোঁ করার পর ওরা স্কুলে বেরিয়ে গেলে সে চুপিচুপি ঘর ছাড়ল। মাথা কেমন ভার বোধ হচ্ছে। এত সুন্দর জায়গা, এত সব দৃশ্য—যা বঙ্গসন্তান সিনেমার পর্দায় দেখে চনমন করে ওঠে এবং মনে মনে একটা বাজেট পাস করে নেয়। কত জনের ভাগ্যেই বা যাওয়া হয়! গৌতমের যদি বা হল, তার সদ্ব্যবহার করা অবশ্যই দরকার। তার ইচ্ছে করল, দূরের ওই পাহাড়টার চুড়োয় গিয়ে বসে থাকবে। ইচ্ছে করল, স্যাংচুয়ারির ঘন জঙ্গলে কোথাও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে গাছের ছায়ায়, কিংবা নদীর ধারে চলে যাবে অনেকদূর—বালির চড়ায় হাঁটবে নির্জনে, একা কত কী ভাবতে ভালো লাগবে! মানুষের ভিড় তার কোন দিনই তো ভালো লাগে না; হাঁফ ধরে যায়। মানুষ কথাটার ওপর তার যে কোন মোহই অবশিষ্ট নেই—অন্তত দাদা রঞ্জুর সেই রক্তাক্ত মৃতদেহটা দেখার পরে। এ দশকের কলকাতা তাকে একটা চূড়ান্ত পরিণতিতে পৌঁছে দিয়েছে, যার নাম—পোশাকী কথায় 'নির্বেদ'। এখানে পৌঁছেছে বলেই তার চারপাশে কোন শূন্যতা নেই। আছে শুধু কালের নিপুণ হাতের খেলোয়াড়ি—যার নাম ইতিহাস এবং গৌতম জেনেছে,'তার পরও রয়ে যাবে কাল'। তবু কোথাও একটা বিষণ্ণতার সুর সারাবেলা তার মনে বাজে। কারণ এই চলমান বিপুল কল্লোলে মুখর জীবনধারার সঙ্গে নিজের কোন যোগসূত্র সে খুঁজে পায় না। ইংরাজিতে যাকে বলে, ডিসকমিউনিকেটেড হয়ে যাওয়া—সে কতকটা তাই হয়ে পড়েছে বলে তার ধারণা। মেসোমশাইয়ের আপিসের ব্যাপারে উৎসাহ, মাসীমার সাংসারিক গল্প-সল্প, মঞ্জুদের চিৎকৃত পড়া মুখস্থ আর সাজগোজ— সবকিছু উদ্দেশ্যহীন আর উদ্ভট লাগে। মানুষ এমন করে কেন বেঁচে থাকে— সে ভেবেই পায় না।

পথে অন্যমনস্ক হাঁটতে হাঁটতে মুখ তুলে চারপাশটা দেখে নিল সে। দূরের দিকেও তাকাল— ওই ঢেউখেলানো প্রান্তর, সবুজ ধূসর আর নীল পাহাড়গুলো, ওই কারখানাটা, এইসব ঘরবাড়ি, সবকিছু খুব হঠাৎ অচেনা লাগল। চমকে উঠল। সে এখন কোথায় আছে? কেন আছে? এ তার নির্বাসনে থাকা—এই সত্যটা স্পষ্ট হল সঙ্গে সঙ্গে। তার নির্বাসনদণ্ড দিয়েছে কেউ—যে তার চেয়ে শক্তিমান। পরাক্রমশালী এবং হৃদয়হীন এক রাজা। মনে পড়ল হরকালী লেনের সেই ছোট ঘরটার কথা— চুপচাপ শুয়ে বা বসে যেখানে সে নিজের অস্তিত্বকে চিন্তাভাবনার জটিল বিস্তারে অনুভব করত। সেই স্যাঁতসেঁতে দেয়ালঘেরা চিরচেনা ঘরটার জন্য তার মন কেমন করে উঠল। ইচ্ছে হল, এখুনি

স্টেশনের দিকে ছুটে যায়—ট্রেনে উঠে পড়ে।

কিন্তু তার এখন ফেরা বারণ। সে কলকাতায় আপাতত এক নিষিদ্ধ মানুষ এবং সেখানে ভীষণ বিপজ্জনক একটা অস্তিত্ব সে। পুলিশ তাকে পেলেই যেন পায়ে ডান্ডা মারবে। নিয়ে গিয়ে হয়তো ঝুলিয়ে রাখবে সেলের কড়িকাঠে। সে যদি প্রশ্ন করে, আমার কী অপরাধ বলবেন স্যার? গুরুগম্ভীর একটা জবাব তো শুনতে পাবেই ঃ তোমার অপরাধ তোমার বয়স।

দি আইডিয়া! দুঃখিতভাবে একটু হাসল সে। সত্যি তো, এক-একটা বয়স এক-এক সময় অন্যের পক্ষে তো বটেই, নিজের পক্ষেও ভারি বিপজ্জনক হয়ে উঠে। তার নিজের বয়স অর্থাৎ তারুণ্য এখন রাষ্ট্র ও সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক। তাঁরা অন্তত তাই ভাবছেন—একেকটি সুদৃশ্য সবুজ আগ্নেয় পাহাড়।

.....কিন্তু মাননীয় স্যার, আমার ভিতর একটুও আগুন নেই। অস্বাভাবিক ঠান্ডা একটা হিমঘরের মত আমার অভ্যন্তরভাগ। আমার কারো প্রতি কোন বিদ্বেষ নেই। কাকেও আমি শত্রু মনে করি না কিংবা বন্ধুও মনে করি না। কারো বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্রে আমি লিপ্ত নই। আপনারা আমাকে ভুল বুঝেছেন। দিনে দিনে আমার ভিতরে একটা ফ্রিজ তৈরী হয়ে গেছে। তার থাকে-থাকে সাজানো বাইরের জগতের নানা স্বাদ ও বর্ণের জিনিস আপনারা অবশ্য দেখতে পাবেন, কটু-অম্ল-তিক্ত-মিষ্ট-নোনা আর লাল নীল হলুদ ধূসর ইত্যাদি অজস্র ফল ও সবজি—যা আপনাদের সামাজিক বাগানে উৎপন্ন হয়েছিল এবং তারা কোনদিনই হিমের দরুন পচে যাবে না, আমরণ সাজানো থাকবে। যেমন ধরুন, আমার প্রিয় দাদার লাল রংয়ের শরীরটা, দুভাগ হওয়া তার হৃদ্‌পিন্ড, ফুসফুসের ওপর চেরা দাগটা সমেত, অবিকল দেখতে পাবেন। অথচ আমি তো শুধু এইসব স্মৃতির একটা জাদুঘরের নিতান্ত কেয়ার-টেকার ছাড়া কিছু নই। আমি চোখ বুজলেও বলে দিতে পারি, আমার ফ্রিজের কোন থাকে কী আছে। যেমন ধরুন, মৌলালীর বাসস্টপে দাঁড়িয়ে দেখেছিলুম একদিন—ট্রাফিক সিগনালের অপেক্ষায় থেমে থাকা একটা বাসের জানালা থেকে একটা অচেনা মেয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হেসেছিল, জানিনে কেন হেসেছিল—হয়তো চেনা ছেলে বলে ভুল করেছিল, সেই হাসিটাও স্যার অবিকল রেখে দিয়েছি। কিংবা ধরুন, কলেজ স্ট্রীটের ফুটপাতে বই কিনতে কিনতে পিছন থেকে একটি মেয়ে বলে উঠেছিল 'সানন্দ! কেমন আছ? চল, আড্ডা দেওয়া যাক— তোমাকে খুঁজেই সারা কদ্দিন থেকে! কী ব্যাপার বল তো?' এবং আমি ঘুরে মুখোমুখি তাকাতেই সে লজ্জা পেয়ে 'সরি' বলে কেটে পড়েছিল। আসলে কী জানেন স্যার? আমি একজন ভুল মানুষ—এ রং ম্যান! সবাই আমার মধ্যে চেনা মানুষ লক্ষ করে ফেলে - পরক্ষণে টের পায়, ভুল হয়েছে—'মাই গুডনেস'! হি ইজ নট দা রাইট ম্যান, হুম আই লাইক টু সে সামথিং, বাট হি এ্যাপিয়ারস্ টু বি দি সেইম।' অর্থাৎ হা পোড়াকপাল! যাকে কিছু বলতে চাই, এ তো সে লোক নয়—কিন্তু তার মত দেখতে! কথাটা আমার নয় কিন্তু। স্রেফ কোত্থেকে টুকেছি—এ মুহূর্তে মনে পড়ছে না।.....

..এসব আমার দোষ অর্থাৎ ওই ফ্রিজ রাখাটা। কিন্তু এই দুঃখটা আমার সঙ্গী ঃ আমি কেন কারো 'রাইট ম্যান' হতে পারলুম না স্যার? বাবা মা ছোটবোন—সবার মতে আমি কোন কাজের নই। পাস করে বছরের পর বছর বসে আছি, অন্নধ্বংস করছি—একটা রোজগারের ধান্দা খুঁজে পেলুম না! দাদা বলত, তুই নিজের জীবনটাকে 'ডগ ইন দা ম্যানজার' করে রাখিসনে সন্টু। হয় স্রেফ ছাপোষা হয়ে যা, নয়তো আমার মত ঝাঁপিয়ে পড়। মনে রাখিস, জীবন একবারের জন্যে দেওয়া হয় মানুষকে।...দাদা নাস্তিক মানুষ ছিল। তার পক্ষে একথা বলা সহজ। সে প্রাণকে জড়ধর্ম জানত। সে জানত, মৃত্যু মানে বিলুপ্তি। এবং যা সে বিশ্বাস করত, তার প্রতি সে ছিল দারুণ অন্ধ। মুশকিল হয়েছে যে আমার মনে ওই জোরটা নেই। বিশ্বাস-অবিশ্বাস দুটোতেই দরকার হয় মনের জোর। এর দোলায় যে দুলে মরছে, তার দশা ভারি করুণ। আমি দুলছি, এদিক থেকে ওদিকে সারাজীবন ধরে দুলছি। কখনো মনে হয়, মরে গেলেই তো সব শেষ—সুতরাং জীবনে আর জগতে যা কিছু ভাল যা কিছু কাম্য ও প্রেয়, লুটে নিয়ে বাঁচা যাক। কখনও মনে হয়, ও বাঁচাতে সুখ কোথায়, স্বস্তি কই? এত সহজ স্থূল, আর সাদামাটা লাগে সব! একটা সুন্দর বাড়ি, গাড়ি, টাকাপয়সা, সুন্দরী স্ত্রী এবং সন্তানাদি...ভ্যাট, ভ্যাট। কখনও ভাবি, নেই তাই—থাকলে নিশ্চয় ওতেই মেতে যেতুম। এই যেমন সুদীপ্ত সেন রয়েছেন। কিন্তু বিপদটা অন্যখানে—ওসব সম্পদ অর্জন করা এবং বরাবর টিকিয়ে রাখার

জন্যে মানুষকে যা সব করতে হয়, যে দৌড়ঝাঁপ হন্তদন্ত ছোটাছুটি, ঘাম, অভিসন্ধি, বুদ্ধি খরচ করতে হয়—বাপস, ও কি পোযায় আমার? এই 'আকরিক ধাতু নিষ্কাশন সংস্থা,' তার লোকজন, ঘরবাড়ি—কী জটিল ব্যাপার সামলাতে হয় দুবেলা ওই সেনসায়েবকে। তার বিনিময়ে একটা গাড়ি, সুন্দর বাড়ি ইত্যাদি ইত্যাদি লাভ করা যায়। বোগাস! অত সাতকাণ্ডের পর শেষ অবধি তো প্রায়ই সীতা রামের মাসি হয়ে পড়ে।

...তবে কি আমি ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রী মৈত্রেয়ীর মতো 'যেনাহম্ অমৃতং স্যাং' আউড়ে বুকুনি ঝাড়ছি? নাঃ, তাই বা কেন? এই তো হেঁটে যেতে বেশ ভাল লাগছে পৃথিবীর ধুলোয় ঘাসে গাছের ছায়ায়। ভাল লাগছে আমি শ্রীমতী রিমির কাছে যাচ্ছি বলে। জীবনকে এত ভালবাসি আমি। এত মায়ামমতা বেঁচে থাকাকে কেন্দ্র করে আমার মধ্যে জমে রয়েছে। আসলে, আমার বোন ঝিমি যা বলে, তাই সত্যি। আমি খুব স্বার্থপর মূলত। পৃথিবী জুড়ে নিজের জিনিসটি খুঁজে বের করার ধান্দায় আমি ব্যস্ত হয়তো। ওই যে মাঠের দিকে দেহাতী মেয়েটা একটা গরুর পিছনে ছোটাছুটি করছে—অনেকক্ষণ থেকে দেখছি, গরুটার সম্ভবত কোথাও ঘাস পছন্দ হচ্ছে না—নাকতোলানির মত এখান থেকে ওখানে দৌড়াদৌড়ি করছে এবং তাকে সামলাতে দেহাতী যুবকতীটির প্রাণান্ত—ঠিক ওই গরুটার মত স্বভাব আমার। কোথায় আছে কোন প্রান্তরে সেই খাঁটি গার্গীমার্কা অমৃতঘাস, কে জানে।......

রিমিদের গেটের কাছে গিয়ে একটু লজ্জা পেল গৌতম। কী ভাববেন ওঁরা? বলতে না বলতেই হুট করে যখন তখন হাজির হওয়া সম্ভবত ভদ্রতার পর্যায়ে পড়ে না। বিশেষ করে রিমির মত একজন যুবতী যখন ওখানে রয়েছে। সে ইতস্তত করে পা বাড়াল সোজা পথের দিকে।

কিন্তু বারান্দা থেকে পিসিমা দেখতে পেয়েছিলেন। চেঁচিয়ে উঠলেন—এস, বাবা এস। সোনা এস!

গৌতম কাঁচুমাচু মুখে বলল, বেড়াতে বেরিয়েছি। নদীটা দেখা হয়নি তো—তাই.....

পিসিমা এগিয়ে এলেন গেটে।......এক মিনিট আগে এলে রিমির সঙ্গে যাওয়া হত। ওই যে কী বলে, সরকারী জঙ্গলে গেছে হরিণ দেখতে। আমি যাইনি বাবা। হরিণ দেখতে গিয়ে হয়তো বাঘ-ভাল্লুক বেরিয়ে হালুম করতে আসবে!.....হাসতে লাগলেন পিসিমা।

গৌতম একটু দ্বিধার সাথে বলল, হেঁটে গেছেন, নাকি গাড়িতে?

গাড়িতে। জামাই তো আপিসে এখন। ড্রাইভার নিয়ে গেল। মা-বাপ-মরা জেদী মেয়ের কাণ্ড, বুঝতেই পারছ বাবা—কী জ্বালায় জ্বলে মরি দিনরাত্তির।

একা গেল নাকি?

হ্যাঁ, আর কে যাবে? অপুকে বলেছিল—ওর যাবার যো আছে? মেয়েদের সমিতি না কী করেছে এখানে—সারাদিন ওই নিয়েই থাকে।... পিসিমা মুখের বিধ্বস্ত পানটা ফেলে দিয়ে বললেন, যেমন আমার মেয়ে, তেমনি জামাই—দুইই সমান কাজপাগলা।

গৌতম পা বাড়িয়ে বলল, তাহলে চলি পিসিমা। পরে আসব'খন।

পিসিমা বললেন, বরং তুমি একটা রিকশো করে চলে যাও না বাবা। মাইলটাক দূরে নাকি। দেখা হয়ে যেতে পারে। যাও, বনের হরিণ দেখে এস! একা গেল—যতক্ষণ না ফিরবে, ভাবনায় থাকব। গৌতম তুমি ওইখানেই যাও। দেখবে, আবার একা একা যেন জঙ্গলে বেশিদূর ঢুকে পড়ে না রিমি। তুমি সঙ্গে থাকলে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে।

গৌতম বড় রাস্তার দিকে লক্ষ্মীছেলের মত ঘুরল—যেন পিসিমার আদেশ পালনে ব্যস্ত হয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা সঙ্গত মনে হচ্ছিল না তার। কেন সে কুকুরের মত রিমির পিছন পিছন গিয়ে হাজির হবে? রিমি তো তাকে ডাকলেই পারত। একা চলে গেছে দিব্যি—তার মানে, গৌতম যেমন তাকে সব সময় মনে রেখেছে, সে তাকে মনে রাখে না। রাখবার কোন কারণও অবশ্য নেই। ...পরক্ষণে মনে হল, কেন নেই? দুজনেই কলকাতা থেকে এসেছে, দুজনেরই এখানে সঙ্গী নেই—দুজনেই নতুন। সুতরাং রিমির তাকে সঙ্গে নেওয়ার বেশ সঙ্গত কারণ ছিল।

বড়রাস্তায় এসে সে মাথাটা ঠিক করে নিল। জীবনে এই প্রথম একটি মেয়ের সঙ্গ কামনা করছে সে—অভিমানবোধ খচ খচ করে বিঁধছে তার অবহেলার জন্যে। ভারি আশ্চর্য তো! সে সিগ্রেট জ্বেলে ব্যাপারটা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করল। হঠাৎ আজ বেলা দশটায় তার মধ্যে এ অভূতপূর্ব পরিবর্তন

ঘটল কেন? সামান্য কিছুদূর উদ্দেশ্যহীন হেঁটে তারপর সে অনুভব করল, যেন নিজেকে কেমন একা লাগছে।

নাকি, এই বিশাল আকাশ ও প্রান্তর, পাহাড় আর দূরের অরণ্য নিয়ে গড়া অচেনা জগতের বিস্তারে তার অস্তিত্ব স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হয়ে পড়েছে, তাই? কলকাতায় আকাশ নেই, ওটা ধূসর একটা প্লাস্টিক আচ্ছাদন মাত্র—তার ঘরটাও বেশ ছোট। অনেক অস্তিত্ব সারাক্ষণ চারপাশ থেকে অনুভব করা যায়। সেই সব হুড়মুড় করে আসা অবরোধের ফলে নিজের নিঃসঙ্গতার দিকে তাকানোর অবকাশই তো মেলেনি কখনো। বাইরের চাপ সামলে নিজেকে আলাদা এবং পরিষ্কার রাখতেই ব্যস্ত থেকেছে সে। আজ এখন এই অবরোধহীন খোলামেলায় তাই নিজেকে একা লাগা হয়তো স্বাভাবিক।

সত্যি, এত তুচ্ছ আর অসহায় নিজেকে কখনও লাগেনি তো। একটা বিপুলতার কেন্দ্রে সে যেন হারিয়ে যেতে বসেছে। সে আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকল। ডাইনে উঁচু গ্রানাইট শিলার থাক-থাক পাঁচিল মত পাহাড়। বাঁদিকে খাদ—তরপর নদী অবধি ছড়ানো পাহাড়তলি। ঘর-বাড়ি দেখা যাচ্ছে সেখানে। বাঁকের মুখে এসে সে একপাশে সরে দাঁড়াল। ঠিক পিছনেই একটা গাড়ি প্রিঁ প্রিঁ করছে। ধুলো বাঁচাতে নাকে রুমাল চাপা দিল সে। কিন্তু গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেছে। পরক্ষণে সে দেখল, চোখে গগলস ঢাকা রিমির মুখটা বেরিয়ে আছে একটা হাত অর্থাৎ সুডৌল বাহুসমেত—এবং সেটা আন্দোলিত হচ্ছে। হু হু বাতাস বইছে বলে রিমির কথা শোনা যাচ্ছে না।

পলকে গৌতমের ভিতর সেই অসঙ্গত অভিমানবোধটা জ্বলে উঠল। সে নির্বিকার মুখে শুধু বলল, কী ব্যাপার? ঘুরতে বেরিয়েছেন?

রিমি সঙ্গে সঙ্গে নেমে এল গাড়ি থেকে। ...আরে, আপনাদের কোয়ার্টার খুঁজে খুঁজে কী হয়রান না হয়েছি! জামাইবাবু শুধু জোন আর স্ট্রীট নাম্বারটা বলতে পেরেছিলেন। ও এলাকায় কী গোলমেলে নাম্বার! উঃ, আসুন বনে যাব।

গৌতম এবার হেসে ফেলল। —এ বয়সে বনে যাবেন কী?

আরে আসুন! ...রিমি চাপাস্বরে বলল, পরের ধনে পোদ্দারি করে নিই না—যতক্ষণ পারি। পিসিমার জামাইয়ের যে গাড়ি আছে, জানতুমই না। চলে আসুন, গরীবগুরবো মানুষ আমবা—ভাগ্যের জোরে এমন একটা গাড়ি পেয়ে গেছি বিনি পয়সায়। নিঙড়ে সব রসটুকু বের করে না নিলে চলে?

গৌতম গাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে বলল, নিঙড়ে অবশ্য শুধু খনিজ তৈল ছাড়া কিছু পাবেন মনে হয় না।

রিমির ঠোঁটটা কেমন হাসল। —আমার হাঁসের স্বভাব। সারটুকু দিব্যি বের করে নিতে পারি। ...ড্রাইভার, এবার তোমার বিদ্যেবুদ্ধি যাচাই হবে কিন্তু! স্পীড বাড়াও—ওয়েট, গৌতমবাবু কত হলে জমে বলুন তো? আশী, না একশো?

ড্রাইভার গোমড়া মুখে বলল, জী মেমসাব, রাস্তা বহুত খারাপ হ্যায়। ওত্ না স্পীড মাগার এ্যালাও নেহী। উও দেখিয়ে না—লিখা হ্যায়। ...সে স্টার্ট দিল গাড়িতে।

রিমি চটে-মটে বলল, ও রাষ্ট্রভাষা হাম নেহি পড়তা জানতা। হাম ... হাম স্পীড মাংতা। ...সে হেসে উঠল। তরপর চাপা গলায় গৌতমের দিকে ঝুঁকে বলল, সেই রূপকথার গল্পটা শোনেননি? রাজার ছেলে পক্ষীরাজের পিঠে চেপে বলল, ঘোড়া তুমি কার? যে আমার পিঠে চেপেছে এখন, তারই। অতএব এখন যে মর্ডান ঘোড়ায় বসে রয়েছি, তা ...

গৌতম বলল, আপনার।

রিমি বল, এবং আপনারও।

দুজনে হেসে উঠল একসঙ্গে। ড্রাইভার কিন্তু সত্যি স্পীড বাড়িয়েছে। মেমসায়েবের বোন স্বয়ং। সেনসায়েবের কানে তুললে হয়তো ধমক খেতে হবে—সে ভয় তার আছে।

গাড়ি বাইরে পার্কিং স্পটে থামল। ড্রাইভার রয়ে গেল। বড় বড় গাছ আর ছায়ায় নানা আকারের পাথর পড়ে রয়েছে। একটা উঁচু তারকাঁটার বেড়া নদীর সমান্তরালে চলে গেছে। গেটে পারমিট নিয়ে ওরা দুজনে ঢুকল। বেশ-সাজানো-গোছানো এদিকটা। এখানটা অবশ্য জঙ্গল নয়। জঙ্গল খোদাই করে

যেন একটা মনোরম উপবন বা পার্ক তৈরি করা হয়েছে। অজস্র নরনারী ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিশ্রাম করছে। উঁচু-নীচু জায়গা। পাথর আছে। ভাঙা টিলা রয়েছে। বেশ কিছু দূর গেলে অবজারভেশন টাওয়ার। সেখানেই প্রকৃত অরণ্য। বিশাল উঁচু টাওয়ারে রয়েছে অনেকে — চোখে ভিউ-ফাইন্ডার বা বাইনাকুলার।

রিমি সেদিকে যেতে যেতে হঠাৎ বলল, থাক। এই রোদে ওখানে উঠে কাজ নেই।

গৌতম বলল, কেন? হরিণ-টরিণ দেখবেন না?

হরিণ অনেক দেখেছি। চলুন অন্য কোথাও যাই।

সে তো পোষা হরিণ। বনের হরিণ নিশ্চয় দেখেননি?

রিমি এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে জবাব দিল, বনের হরিণ মনে-মনেই থাকা ভাল। বরং বাঘ-ভাল্লুক দেখতে পেলে খুশি হতুম।

বেশ তো। তাহলে টাওয়ারে ওঠা যাক।

ভ্যাট! দূর থেকে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে দেখার কোন মানে হয়? সে তো চিড়িয়াখানায় অনেকবার দেখেছি।

গৌতম হাসল। ... সর্বনাশ। তাহলে সামনা-সামনি দেখতে চান নাকি?

পেলে খুশি হই নিশ্চয়ই। ... রিমি পা বাড়াল। ...কিন্তু ওদের সে দয়া হবে?

কিছুদূর ওকে অনুসরণ করে গৌতম বলল, আরে! ওখান থেকে তো যেতে দেবে না ভিতরে। দেখছেন না—নিষিদ্ধ এলাকা লেখা আছে। ফাইন করবে।

রিমি জবাব দিল না। বাঁদিকে ঘুরল। এখানে বাঁধানো পথ বলতে তেমন কিছু নেই। ঝোপঝাড়ের মাঝে সবুজ ঘাসে ঢাকা জমি আর অজস্র শালগাছ। লোকজন একেবারে নেই। শালবনে ঢোকামাত্র, পিছন থেকে একজন খাঁকি উর্দিপরা লাঠি হাতে লোক দৌড়ে এল। ...উধার মাৎ যাইয়ে! যানা মানা হ্যায়।

রিমি বলল, আরে নেহী, নেহী! উধার যাচ্ছিনে বাবা, ইধার যাচ্ছি। গৌতমবাবু, চলুন, একটু ঘুরে যাওয়া যাক।

লোকটা দাঁড়িয়ে রইল। গৌতম টের পেল, রিমি গার্ডটাকে এড়িয়ে ঠিকই নিষিদ্ধ জঙ্গলে ঢুকতে চায়। তার গা কাঁপল একটু। ভীষণ ডানপিটে মেয়ে তো! ঝিমির সঙ্গে একটুও তফাৎ নেই।

অনেক ঘুরে একটু পিপুল গাছের নিচে দাঁড়িয়ে রিমি চারদিকে তাকাল। তারপর ফিস-ফিস করে বলল, গৌতমবাবু, কুইক!

সে সাঁৎ করে সামনের গাছপালা ঝোপঝাড়ের ভিতর ঢুকে পড়ল। শ'খানেক ফুট উঁচু টিলার সামনে এল ওরা। গৌতম নিষেধ করবে ভাবল। কিন্তু পারল না। অনেক পাথর পড়ে রয়েছে। দেখে-শুনে চলতে হচ্ছে। কিছু দূর গিয়ে একটা ন্যাড়া তার গা ঘেঁষে একটা ঝাঁকড়া গাছ। গাছটার গোড়ায় অল্প কিছু লোক রয়েছে। সেখানে একটা কালো পাথরের ওপর ...

রিমি ঘুরে দাঁড়িয়ে ঠোঁটে আঙুল দিল। তরপর পা টিপে টিপে আরও বাঁদিকে সরে গেল। দৃশ্যটা গৌতম দেখেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। জঙ্গলে এসেই মানুষ কেন যেন জন্তু হয়ে পড়তে চায়! লোকদুটো—অর্থাৎ একজন পুরুষ, অন্যজন স্ত্রীলোক—একপলকের দেখায় অবাঙালীই মনে হল। দিব্যি ভদ্রলোকের পোশাক পরে রয়েছে, অথচ ...

রিমি যখন থামল, তখন সে মুখ ফিরিয়ে থর থর করে কাঁপছে! তার মানে, প্রচণ্ড নিঃশব্দ হাসির ঝড়ে ভেঙে পড়ছে। কী বেহায়া মেয়ে রে বাবা! লজ্জা পেয়ে মূর্ছা গেল না কেন—সেটাই অবাক লাগে। গৌতম গম্ভীর এবং স্তব্ধ।

রিমি ঘুরে বলল, আপনি হসলেন না যে?

তখন গৌতমকে হাসতে হল। ...সিভিলাইজড অ্যাডাম এ্যান্ড ইভ।

আপনার মাথা! ...রিমি ফের হাঁটতে লাগল। ...মডার্ন বিদেশী ফিল্ম দেখেন না আপনি?

না তো!

আপনি অদ্ভুত! একটা সিনে ক্লাবের মেম্বার হলেই পারেন।

আর্পনি হয়েছেন নাকি?

হুঁউ।

তাতে বুঝি ওইসব দৃশ্য থাকে?

রিমি সে-কথার জবাব না দিয়ে হাসতে হাসতে বলল, আচ্ছা, কান্ড দেখুন ওদের! একটুও ভয় করল না!

কিসের ভয়, রিমি?

বাঘ-ভাল্লুকের।

আপনার যদি ভয় না করে, ওদের করবে কেন শুনি?

রিমি যেন তেড়ে এল। ...এই, যা-তা বললে ভাল হবে না কিন্তু। ভেবেছেন ...

কি ভেবেছি?

গৌতমবাবু, চলুন—ওই যে পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে, ওখানে যাই। ...বলে সে হঠাৎ প্রায় দৌড়তে শুরু করল।

জায়গায়-জায়গায় একটুখানি ফাঁকা, তারপর বিশাল গাছ, কাঁটা বাঁশের দুর্ভেদ্য জঙ্গল, অজস্র ছোট-বড় পাথর, আর একটানা পাখির ডাক। কিন্তু কোথাও কোন জানোয়ার দেখা গেল না। গৌতম সবসময় অস্বস্তিতে উদ্বেগে চনমন করছিল। রিমির মাথায় নির্ঘাত ছিট আছে! তা না হলে এমন করে ঘোরে? ভ্যাট্! বিরক্তি ধরে গেল।

রিমি থেমে বলল, এই! পাহাড়টা তো একটুও কাছে এল না! অথচ আধঘন্টার ওপর হাঁটছি। ছেড়ে দিন। চলুন, সামনে পাথরটার ওপর গিয়ে বসি। ছায়া রয়েছে দেখছি।

খানিকটা ফাঁকা জায়গা। একপ্রান্তে একটা অচেনা ঝাঁকড়-মাকড় গাছ। গাছটার গোড়ায় একটা পাথরের ধাপ শুরু হয়েছে— আন্দাজ পনেরো ফুট অবধি খাঁজে-খাঁজে উঠে গিয়ে সমতল হয়েছে। সেখানে ঘন ছায়া পড়েছে। মাথার ওপর হাত বাড়ালে গাছটার ডাল ধরা যায়।

ওরা দুজনে উঠে গিয়ে বসল সেখানে। এতক্ষণে গৌতম লক্ষ্য করল, রিমির কাঁধে ক্যামেরা আর ফ্লাস্ক রয়েছে। সেই ভিউ-ফাইন্ডারটাও হাতে ধরে আছে সে। চোখের গগলস খুলে রিমি বলল, অনেক কষ্ট করেছেন আমার জন্যে। এবার তার মজুরি দেওয়া যাক। কিন্তু .. কী মুশকিল! চা খাবার জায়গা তো একটাই।

গৌতম বলল, বেশ তো। চা দিয়েই ধুয়ে নেওয়া যাবে।. বলে সে ওর হাত থেকে ভিউ-ফাইন্ডারটা নিয়ে চোখে রাখল। পাহাড়টা দেখতে থাকল।

রিমি ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে হেসে বলল, আসলে কিন্তু চা নিয়েছিলুম আপনার জন্যে। আমার চা-টা না হলেও চলে।

অতএব, আমি একা খাই সবটা। আশা করি, আপত্তি নেই?

কক্ষনো না। এই নিন।

চায়ে চুমুক দিয়ে গৌতম বলল, ফ্লাস্কটা বেশ সন্দেহজনক!

কেন, কেন?

চা জল হয়ে গেছে।

সত্যি? কই দেখি, দেখি! ...বলে রিমি করল কী, গৌতমের হাত থেকে কাপটা নিয়ে চুমুক মেরে বসল। ...ঠিকই তো। আসলে তৈরী করার সময় ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল। বুঝলেন?

গৌতম গম্ভীর মুখে বলল, আমার এঁটো খেলেন কিন্তু!

অপ্রস্তুত হাসল রিমি ...তাতে কী? অতসব ভেবে কিছু করা অভ্যেস নেই।

কিন্তু এটা কি ঠিক? ধরুন, আমার ক্যানসার থাকতে পারে, টি-বি থাকতে পারে ...

রিমি ওর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে আচমকা চা-টুকু একনিশ্বাসে খেয়ে ফেলল। গৌতম হাঁ-হাঁ করে উঠেছিল। কিন্তু পরমুহূর্তে বোবার মত ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া কিছু করতে পারল না সে। রিমি ভিজে ঠোঁটটা মুছল না। নিঃশব্দে ফ্লাস্কের বাকি চা ঢেলে এগিয়ে দিল। আর কোন কথাই বলল না।

গৌতম ডাকল, রিমি!

উঁ?

যদি হঠাৎ এখানে এখন একটা বাঘ এসে পড়ে, কী করবেন বলুন তো?

আপনি নিশ্চয় আমাকে ফেলে চম্পট দেবেন!

অত ভীতু ভাবছেন কেন? আমার সাহসের কী দেখেছেন?

অনেক জিনিস দেখার আগে জানা হয়ে যায়।

কী অবাক!

সেই জন্যেই তো সবকিছুতে সবসময় অবাক হয়ে যান আপনি।

মোটেও না। আমি অবাকই হতে জানি নে। ওটা এমনি বললুম। সব আমার জানা হয়ে গেছে—নতুন করে ...

রিমি অস্ফুট হাসল। ...একটা কবিতা মনে পড়ল। সেই যে—'দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা, দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু' —কিন্তু ঘরের সামনে ঘাসের উপর শিশিরবিন্দুটি মানুষের দেখা এত কঠিন! চলুন, ওঠা যাক।

এক্ষুনি?

হঁ্যা—আর ভাল্লাগে না।

কিসে যে ওর ভাল লাগবে, কোথায় গেলে ভাল লাগবে—বুঝতে পারছিল না গৌতম। রিমি বলছিল, ওরা স্যাংচুয়ারি বলছে—স্রেফ ধাপ্পা। এটা পুরো অহিংস অরণ্য। এত ঘুরে একটা বেজিও দেখা গেল না! গৌতম বলেছিল, এমনও হতে পারে—জন্তু-জানোয়ারের এলাকা থেকে আমরা বেশ দূরে একই জায়গায় ঘুরছি।

সে ব্যাপারটা অবশেষে একসময় আমল দিতে হল। রিমি একখানে থেকে হঠাৎ বলল, দেখুন, দেখুন, একটু আগে এই গাছটার পাশ দিয়েই গেলুম আমরা!

গৌতম দেখে নিয়ে বলল, তাই তো!

আপনার নিশ্চয় দিকভুল হয়েছে। ছাড়ুন, এবার আমি লিড নেই।

কী কান্ড? লিড তো বরাবর আপনিই নিয়েছেন ।

যা বাব্বা! ...রিমি হতাশমুখে বলল। আমি ভাবছি, আপনি চিনে-টিনে যাচ্ছেন, তাই আমাকে বাধা দিচ্ছেন না।

গৌতম হসল। ...তার মানে পিছন থেকে লিড নিচ্ছি? কিন্তু রিমি, আপনি কি সত্যি বাধা কিছু মানবার পাত্রী?

রিমি ভেংচি কেটে বলল, না—পাত্রী সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী এবং গৃহকর্মনিপুণা।

গৌতম একটা পাথরে ধুপ কবে বসে সিগ্রেট ধরাল।

বিমি সানুনয়ে বলল, এই! আবার বসছেন? এত কুঁড়ে কেন ছেলে হয়ে?

পা ব্যথা করছে।

প্লীজ, উঠুন না। জাস্ট একটায় গাড়ি জামাইবাবুর আপিসে পৌছে দিতে হবে। বারোটা দশ হয়ে গেল। উঠুন—গৌতমবাবু!

বাবুরা বেশি পরিশ্রম সইতে পারে না যে! বাবুরা আয়েসপ্রিয় হন। অন্যের সেবাযত্ন পাওয়া নিয়ম মনে করেন। তাঁহারা ... রিমি! টেকচাঁদ ঠাকুর পড়েননি?

আমি একজন টাকুরকেই চিনতুম—তিনি রবি ঠাকুর। সম্প্রতি এখানে এসে আরেকজন চিনেছি, সে পাতু ঠাকুর—জামাইবাবুদের কিচেনে থাকে! ... রিমি এবার হাত ধরে টানল গৌতমের। ...ভ্যাট্! বাজে কথায় সময় কেটে যাচ্ছে! উঠুন।

গৌতম হাসল। ...আই অ্যাম এ টোটালি ডিসকমিউনিকেটেড ম্যান। দেখুন না, পায়ের সাম্নু অবধি আমার মগজের ওয়েভগুলো পৌছচ্ছে না। বুকে আটকে যাচ্ছে।

রিমি ওর বুকে হাত ঘষে বলল, বুকটা ডলে দিচ্ছি!

সেই মুহূর্তে আচমকা কী হুলুস্থুল ঘটে গেল গৌতমের মধ্যে। সে ওর হাতের কব্জিটা ঘড়িসমেত ধরে, অন্য হাতে ওর কাঁধটা টেনে চুমু খেয়ে বসল রিমির ঠোঁটে। রিমি ঘুরে দাঁড়াল সাঁৎ করে। গৌতম ওর পিঠের দিকে দাঁড়িয়ে দু-কাঁধে হাত রেখে ডাকল, রিমি, রাগ করলে?

তন্মুহূর্তে রিমি ঘুরল। ভিজে ঠোঁটে হাসি রয়েছে। ...না। চলো।

ওয়েট, ওয়েট। ...

গৌতম পা বাড়াতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। ...আগে ঠিক করে নিই। তা না হলে অনন্তকাল পথ হারিয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াতে হবে।

রিমি না ঘুরেই বলল, আত্মবিশ্বাস ফিরে এসেছে মনে হচ্ছে?

অসম্ভব নয়। ম্যাজিক টাচ!

অসভ্য কোথাকার।

যদ্দূর জানি, সভ্যতার বাসা লোকালয়ে—জঙ্গলে নয়।

কিছুদূর চুপচাপ হাঁটার পর রিমি মুখ খুলল। ...তোমাকে আমি সন্ন্যাসী ভেবেছিলুম।

রামায়ণ তো পড়েছ। রাবণের মত পরাক্রমশালী রাক্ষসরাজাকেও কিছুক্ষণের জন্যে সন্ন্যাসী সাজতে হয়েছিল।

সে বলতে হবে না। তুমি রিয়েল সন্ন্যাসী নও, সেটা কি জানতুম না ভাবছ?

আচ্ছা রিমি, রিয়েল সন্ন্যাসী রিয়েল মেয়েদের ...আরে। রিমি, রিমি! দ্যাখো দ্যাখো। দেয়ার ইজ এ রিয়েল হরিণ! ওঃ, গ্রান্ড!

রিমি দূরে ফাঁকা জায়গায় একটা হরিণকে ঝোপে পাতা চিবুতে দেখে বলল, দ্যাখো তো, ওটা সোনার হরিণ কি না?

হলে কি খুশি হতে রিমি?

সেই সময় গাছপালার ভিতর দিয়ে কোত্থেকে একটা হালকা হাওয়া এল। শুকনো পাতা ঝরতে থাকল গায়ের ওপর সর সর খর খর। ঝোপগুলো দুলে উঠল। রিমির কয়েকটা চুল উড়ে-উড়ে চোখের ওপর নাচতে থাকল। সে চুলগুলো সযত্নে সরিয়ে শুধু বলল, কে জানে!

গৌতম ওর হাতটা নিল। হাঁটতে হাঁটতে বলল, কদ্দিন থাকছ এখানে বললে না তো?

রিমিকে অন্যমনস্ক আর ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। আস্তে জবাব দিল, এখানে থাকতেই তো এসেছি।

সত্যি?

হ্যাঁ। দিদির সমিতিতে কী কাজে লাগব শুনলুম। তুমি কবে ফিরছ?

জানি না।

জান না মানে?

আমার কিছু ব্যাপার আছে—তুমি শুনলে হাসবে। আমি তো সারাক্ষণ ভিতরে-ভিতরে হেসে খুন হচ্ছি। ধরো, আমি এমন একজন মানুষ—যার গায়ে মার্কা দেওয়া হয়েছে : নিষিদ্ধ মানুষ। সাবধান, কামড়ায়। কারণ, এই ব্যক্তি একজন বঙ্গদেশীয় যুবক।

রিমি গগলস খুলে তাকিয়ে রইল ওর দিকে। তারপর বলল, তার মানে?

চল—গাড়িতে বসে বলব। ...

কিন্তু গাড়ির কাছে পৌঁছতে হলে গেটে যাওয়া চাই এবং গেটে যাবার জন্যে সেই পার্কটাতে পৌঁছনো দরকার আগে। সেটার পাত্তা নেই। দুজনে পরস্পর তাকিয়ে হতাশভাবে হাসল। গৌতম বলল, বনটার শেষ তো একটা থাকবেই। পাচ্ছিনে কেন? ...ইউরেকা! রিমি, অবজারভেশন টাওয়ারটা কেন এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি? তাহলেই সব জল হয়ে যেত।

রিমি চারদিকে তাকিয়ে বলল, কিন্তু কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না তো গাছের আড়ালে। চল, ওই ফাঁকায় গিয়ে দেখি।

ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে তাকাতাকি করে এবং ভিউ-ফাইন্ডার দিয়েও কোন ফল হল না। মনে হচ্ছে জায়গাটা পাহাড়তলির মত—বিশাল একটা আপাতসমতল ঢালু হয়ে যাওয়া জায়গায় জঙ্গল গজিয়েছে। গৌতম বলল, সর্বনাশ! তাহলে সত্যি সত্যি হারিয়ে গেলুম আমরা?

রিমি বলল, চোখ বুজে দৌড়নো যাক। একটা বেজে গেল যে! এই চলে এস! ভ্যাট, খালি কান্না পাচ্ছে আমার।

অরণ্যে রোদন যাকে বল। ..... গৌতম চেষ্টা করে একটু হাসল।....এক কাজ করা যাক। এই টিলাটা লক্ষ্য করে হাঁটি। ওখানে চড়ে দেখে নেব অবজারভেশান টাওয়ার কিংবা গেটটা কোন দিকে।

এবার আমার তেষ্টা পেয়েছে কিন্তু।...রিমি বলল।

আমারও।

এতক্ষণে দুজনে একটু ভয় পেয়ে গেছে। কোন কথা বলতে ইচ্ছে করছে না আর। হারিয়ে যাওয়ার কথা মুখে বলা এক, আর বাস্তবে ভিন্ন— সেটা দুজনেই টের পাচ্ছিল। তবে গৌতমের তত কিছু ক্ষতি হবার নয়, বেচারা রিমিকে নিয়ে ওর ভাবনা। একটায় গাড়ি পৌঁছে দেবার কথা—একটা বেজে গেছে কখন। তাছাড়া এটা একটা স্যাংচুয়ারি—হিংস্র জন্তু তো রয়েছেই। কখন কোন মুহূর্তে কী ঘটে যায়, কিচ্ছু বলা যায় না। গত সন্ধ্যায় এক কান্ড করে ফেলেছিল টুকুনকে হারিয়ে। আজ নিজে হারাতে বসেছে। অবশ্য সেটা তেমনি কিছু হারানো নয়—কিন্তু অন্যের বাড়ির যুবতী মেয়েকে সুদ্ধ হারিয়ে গেলে সে এক কেলেঙ্কারী আর ধুন্ধুমার কান্ড হবে। বড় লজ্জায় পড়ে যেতে হবে!

অবশ্য সেটা উদ্ধার পেলে এবং জানাজানি হলে—তবেই। আপাতত উদ্ধারের আশা কই? টিলাটায় পৌঁছতে অনেকটা সময় লেগে গেল। পথে একদঙ্গল হরিণ দেখাও হল একটুকরো ঘাসের জমিতে। পাহাড়টা ন্যাড়া। নিচে রিমি দাঁড়িয়ে রইল। গৌতম ঢালু গা বেয়ে একটুখানি উঠে একটা পাথরের চাঙড়ে দাঁড়াল। ভিউ-ফাইন্ডারে তক্ষুনি অবজারভেশান টাওয়ারটা আবিষ্কার করে ফেলল। তারা যেদিকে যাচ্ছিল, তার বাঁদিকে সেটা। অতএব এখান থেকে নেমে নাক-বরাবর হেঁটে গেলেই আর হারনোর ভয় নেই।...

বেশ দেরী হয়েছিল বাড়ি ফিরতে। একরাশ ক্লান্তি নিয়ে গৌতম স্নান করেছে। খেয়েছে। মাসিমার ছোটখাট প্রশ্নের জবাব দিয়েছে। কিন্তু রিমির সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার মুহূর্ত থেকে একটা তীব্র ছটফটানি তাকে পেয়ে বসেছে। হঠাৎ নিজের ওপর খাপ্পা হয়ে গেছে সে। পুরো একটা দুপুর আজ এত বাজে খরচ হয়ে গেছে যে, এখন নিজেকে গাল দিতে ইচ্ছে করে। কোন মানে হয়? একটা ছিটগ্রস্ত মেয়ের বোকা-বোকা কথার জবাব দেওয়া, হুট করে পাগল হয়ে তাকে চুমু খেয়ে বসা, ইত্যাদি ব্যাপারগুলোই কি চলতি কথায় 'প্রেম'! সে তাহলে প্রেমে পড়ে গেছে এই খামখেয়ালি মেয়েটার?

আসলে এ একটা বিস্ময় তার। নিজের প্রতি নিজের বিস্ময়। নিজের ভিতরে একজন অতি সাধারণ বোকাটাইপের ন্যাকা-ন্যাকা কথা-বলা গেরস্থ মানুষ বাস করছিল, এটা জানতেও পারেনি কোনদিন। এইসব গেরস্থ সাধারণ মানুষেরাই তো প্রেম করে, বিয়ে করে, ছেলেপুলের বাপ হয় এবং সকাল-সন্ধ্যা বাস-ট্রামের হ্যান্ডেল ধরে ঝুলতে ঝুলতে অপিসে যায়। আপিসে এরা কী করে সে তো সবাই জানে। এবং কখনও কখনও দু-চার টাকার মাইনের দাবীতে মিছিল এবং শ্লোগান—রোববার দুপুরে ঠেসে ঘুম, সন্ধ্যায় সিনেমা, এবং বউয়ের পাশে শোওয়া—শুতে শুতে বুড়ো হয়ে যাওয়া, দি ন্যাশনাল হাইওয়ে!

অবশ্য মানুষের পক্ষে আহার নিদ্রা মৈথুন স্বাস্থ্যের কারণে জরুরী। এগুলো জৈবিক চাহিদার ব্যাপার। একটা চাকরি, একটা ঘর, আর একটা বউ—ব্যস। অন্তত বঙ্গসন্তানের পক্ষে এ একটা মোক্ষম পাওয়া। গৌতম চাকরি ভালবাসে না। ঘর আছে বলে শুচ্ছে। বউ কী এখনও জানা হয়নি বলে ভাবে না—কোন চাহিদা অনুভব করে না। তার ধারণা, দেহ বা জৈবিক অস্তিত্বটা একটা বাড়তি বোঝা মানুষের। একে ঢাকো, খাওয়াও, ধোওয়ামোছা কর, পোশাক পরাও, শুইয়ে দাও, ঘুম পাড়াও এবং সেই সঙ্গে একটা বিপরীত সেক্সের দেহও জোগাড় করে দাও, সকালে বিছানা থেকে তুলে বাথরুমে নিয়ে যাও, কিছু অপকর্ম করাও....বাপ্‌স! এ যেন একটা আদুরে খোকাপালন! দেহখোকাটি নিয়ে মানুষের জ্বালার অন্ত নেই। তাবৎ মনুষ্যসৃষ্ট কান্ডকারখানার মূলে এই দেহখোকার বায়না! এমন হলে কী ক্ষতি হত, দেহ নেই—মন আছে?

এ বিপুল বিশ্বব্রহ্মান্ডের কতটুকুই বা আমরা জানি। এটা ভাবতে কত আরাম লাগে যে আমাদের চেনা জানা গ্যালাক্সির বাইরে এমন ব্রহ্মান্ড আছে, যেখানে দেহ নেই—শুধু মনের অস্তিত্ব। মন মনকে ছোঁয়, ভাব-তরঙ্গের দোলা লাগে সারাক্ষণ, ইচ্ছামাত্রেই তৃপ্তি, ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে বিচরণ নিখিল বিশ্বলোকে—ওইসব সূক্ষ্ম অদৃশ্য আলোকতরঙ্গের মত।.....

অবশ্য এই পার্থিব দেহধারী মনের পক্ষে, সীমিত ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির পরিমাপে সেই মনোময় বিশ্বের কোনকিছু বোঝা যাবে না। কিন্তু তেমন একটা মনলোকে পৌঁছতে পারলে ভাল হত। কোথাও

লেখা থাকত না—এই একজন নিষিদ্ধ মানুষ। কোন বড়সাহেবের সাধ্য থাকত না ফাইলে অর্ডাব পাস করেন ঃ এই লোকটি বঙ্গদেশীয় এবং এ তারুণ্য নামক নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করায় অতঃপর অনিশ্চিত কালের জন্য নির্বাসিত হইল!....

শুয়ে আর ঘুম এল না গৌতমের। সে সকৌতুকে প্রচ্ছন্ন ভর্ৎসনায় নিজেকে বলল, এটা কি তোমার ঠিক হচ্ছে না ? নিষিদ্ধ মানুষের পক্ষে প্রেম করা কি বেআইনী হবে না? ইডিয়ট! বুদ্ধুর মত তুমি একটা মেয়ের প্রেমে পড়ে গেছ—অস্বীকার করো না! তুমি একজন বঙ্গদেশীয় তরুণ। তোমাব মধ্যে ভয়ঙ্কর সংক্রামক একটা ব্যাধি দেশের কর্তাব্যাক্তিরা আবিষ্কার করেছেন তাঁদের প্রভুভক্ত ও অনুগত ডাক্তারদের সাহায্যে। তুমি যাকে ছোঁবে, সে-ই এই বিপজ্জনক অসুখে আক্রান্ত হবে। এই অসুখটার সব লক্ষণ প্রায় হিস্টিরিয়ার মত। প্রথমে মস্তিষ্কে সংক্রামিত হয়ে, ঠোঁটে প্রাথমিক লক্ষণ দেখা যাবে। ঠোঁট দিয়ে অদ্ভুত সব চিৎকার বেরোতে থাকবে। হাত দুটোয় খেঁচুনি ধরবে। তারপর সে ঢিল ছুঁড়বে। সে আবও মারাত্মক কিছু ছুঁড়তে থাকবে। আগুন জ্বলবে। এবং তোমার দাদা রঞ্জুর তো ঐ একই অসুখ হয়েছিল। তার ভাই তুমি সন্টু। তোমার মধ্যে নিশ্চিন্ত হিষ্টিরিয়ার তাবৎ লক্ষণ বহিঃপ্রকাশের সময় গুণছে। সাবধান!...

নাকি আমার রিমির দিকে এই টান, তাকে বাগে পেয়ে চুমু খেয়ে বসা, তাকে ভালো লেগে যাওয়া—সেই একই হিষ্টিরিয়ার অন্যরকম প্রাথমিক লক্ষণ? একই অসুখের তো দেহভেদে স্বাস্থ্যভেদে বিচিত্র ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ ফুটে উঠতে পারে—ডাক্তারী শাস্ত্রে নাকি একথা রয়েছে। বেচারা রিমি! ওর জন্যে কষ্ট হচ্ছে। ও টের পাচ্ছে না, ইতিমধ্যে ও সংক্রামিত এবং আক্রান্ত। তাই অত করে বলে দিল, বিকেল ঠিক পাঁচটায় সেই পাবলিক পার্কটার গেটে অপেক্ষা করবে। একা যাবে ও।

আমি যাব না। আমার ভয় হচ্ছে, ও আমার জন্যে মিছেমিছি কষ্ট পাবে।... গৌতম চোখ বুজল। ঘুম আসবে না। কিন্তু ঘুমোতে পেলে ভালো হত। অত বেশি হাঁটা অভ্যেস নেই। পা দুটো ব্যথা করছে। মিনুদের পায়েব ওপর চাপিয়ে মার্চ করতে বলবে।.

শোভামাসিমা সন্তর্পণে ঢুকলেন। গৌতম চোখ খুলতেই বললেন, অবেলায় আব ঘুমিয়ে কাজ নেই। শরীর খারাপ করবে। আর, হঠাৎ এক দিনেই এত হাঁটাহাঁটি করো না। অসুখ-বিসুখ হতে পারে।

গৌতম উঠে বসল। মাসিমা বিছানাতেই বসলেন। গৌতম বলল, না —হাঁটলুম কই? বললুম না সেনসায়েবেব গাড়িতে ঘুরছিলুম।

হুঁ। মাসিমা কী ভেবে নিলেন যেন। আচ্ছা গৌতম, তোমার সঙ্গে তো সেনসায়েবের বেশ চেনাজানা হয়ে গেছে।

একটু-একটু হয়েছে। কেন বলুন তো?

শোভামাসিমা একটু ইতস্তত করে বললেন, তোমাকে উনি আজ সকালেই কথাটা বলবেন ভাবছিলেন। বলতে পারেননি। নতুন এসেছ। তাছাড়া....

গৌতম কৌতূহলী হয়ে বলল, সব খুলে বলতে পারেন মাসিমা। সঙ্কোচ করার কিছু নেই।

নেই বলেই বলছি, বাবা। তোমার মেসোমশাই কিছুদিন থেকে বড্ড বিপদের মধ্যে রয়েছেন। উনি স্টোর সেকসানে কাজ করেন। ছ'মাস আগে যখন সেনসায়েব এসে চার্জ নিলেন, তখন স্টোরেব হিসেবে অনেক গরমিল ধরা পড়ল। হিসেবে মানে খাতাপত্তরে নয়—স্টোরের মালে। তোমার মেসোমশাই একেবারে সাদাসিদে সরল বুদ্ধির মানুষ—তা তো জানোই। ছেলেমেয়েদের মাথায় হাত দিয়ে বলতে পারি সন্টু, উনি একটি পয়সা অধর্ম করে কখনো ঘরে আনেননি। কীভাবে একজনের আয়ে এতবড় সংসারটা চলছে, সে তো দেখছ। কিন্তু স্টোরের ব্যাপার যখন, ওঁকে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। এখনও কেসটা পুলিসের হাতে দেননি সেনসাহেব, ডিপার্টমেন্টাল তদন্ত চলছে। উনি তো ভীতু গোবেচারা মানুষ, সব সময় উদ্বেগে ভাবনায় অস্থির হয়ে আছেন। এ বাজারে যদি চাকরিটা চলে যায়, ছেলেমেয়ে নিয়ে কী বিপদে পড়ব, বুঝতেই পারছ।

গৌতম শুধু বলল, তাই বুঝি?

হ্যাঁ। দেখছ না লোকটার চেহারা কী হয়ে গেছে দিনে দিনে। আগেও তো দেখেছ! সম্পূর্ণ নির্দোষ লোক—কারো সাতে-পাঁচে থাকেন না। তাঁর ঘাড়ে কী বিপদ পড়ে গেছে দ্যাখো! তাই বলছিলুম, সেনসায়েবকে একবার বলতে পারবে না বুঝিয়ে?

গৌতম ওঁর মুখের দিকে তাকাল। কিছু বলতে পারল না।

মাসিমা চাপা গলায় বললেন, এ বদমায়িসির আসল পান্ডা যে, তাকে ওঁদের আপিসের সবাই ভয় করে। এ এলাকাতেই বাড়ি যে লোকটার। গুন্ডা ধরনের লোক—বাড়ির অবস্থা ভাল। ওর নাম সেনসায়েবের কানে কেউ তুলতে সাহস পাচ্ছে না! আবার, এমন চালাক লোক সে— কোথাও নাকি কাগজে-কলমে তাকে ধরার কোন ফাঁক নেই।

গৌতম বলল, কে সে? নাম কী?

ওঁদের সেকসান-ইন-চার্জ। নামটা কী যেন বেশ...দাঁড়াও....নগেন হ্যাঁ নগেন মিত্তির। প্রতাপগড়ে ওর ঠাকুর্দা নাকি কাঠের ব্যবসা করতে এসেছিল কোন আমলে। বাবার আমলে আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছিল রাতারাতি। বাবা নেই। এখন তিন ভাই—দুই মা। নগেন দ্বিতীয় পক্ষের এক ছেলে। ভাইদের সঙ্গে বনিবনা নেই। এক ভাই রাজনীতির পান্ডা, অন্য ভাই সেই কাঠের ব্যবসা নিয়ে আছে। নগেন নিজের ভাগ বদমাইসিতে উড়িয়ে কাকে ধরে-টরে ওই চাকরিতে ঢুকেছিল। এখানে কত কেচ্ছাকেলেঙ্কারী শুনতে পাবে ওর নামে। মাকে ভাত দ্যায় না দু-মুঠো। বউটা নাকি মাঝে মাঝে পালিয়ে কলকাতায় বাপের বাড়ি গিয়ে থাকে। মা বেচারা শুনেছি, মেয়েদের সমিতিতে কী কাজ-টাজ করে—একা থাকে! ...

শোভামাসিমা একটু চুপ করে ফের বললেন, লোকটা ভারি ঘড়েল—বুঝেছ? আগের কর্তার সঙ্গে ভারি ভাব ছিল। সেন সাহেবের সঙ্গেও সেইরকম গলায় গলায় মিশে গেছে। সেই তো হয়েছে মুশকিল। সেনসাহেবকে বললে কোন লাভ হবে না—সবাই জেনে গেছে। তুমি বললে ...মানে, তোমাকে যখন এত ভালবাসেন, গাড়ি ছেড়ে দিয়েছেন বেড়াতে, তখন ...

রিমির কথাটা এখনও বলা হয়নি, বলতে কেমন অস্বস্তি লাগছে—সেজন্য নিজের ওপর ক্ষুব্ধ হল গৌতম। তবু সে আড়ষ্টভাবে বলতে বাধ্য হল, ঠিক আছে। দেখছি। ...

চার

রিমি কড়ামুখে বলল, পনেরো মিনিট লেট। ইস্, কারো জন্যে কোনদিন দাঁড়িয়ে থাকা অভ্যেস ছিল না। খুব টের পাইয়ে দিলে এতদিনে।

গৌতম স্বগতোক্তির মত বলল, ওয়েটিং ফর গোডো!

কী বললে?

একটা বিখ্যাত নাটকের নাম।

জানি। একেবারে আকাট মুখ্যু ভাবছ কেন? কিন্তু আমার ভাগ্যে গোডো মশাই সত্যি এলেন।

দুজনে পার্কে ঢুকল। গৌতম বলল, কিসে এলে?

রিকশোয়।

একা ছেড়ে দিলেন ওঁরা?

রিমি ফিসফিসিয়ে হাসল। ...বলেই আসিনি। কেটে পড়েছি।

কী সর্বনাশ! খুঁজতে বেরোবে না তো কেউ?

রিমি কান করল না কথাটায়। বলল, এই! আজ একটা কান্ড করে ফেলো তো! আমাকে হারিয়ে ফেলো।

সে তো যে-কোন মুহূর্তেই হারিয়ে ফেলা যায়।

কেমন করে শুনি?

আমি চলে গেলেই হল।

আমি যদি পিছু না ছাড়ি?

গৌতম একটু হেসে বলল, তাহলে লুকোচুরি খেলা যাক।

পাগল! ...রিমি নিঃসঙ্কোচে ঝাউবীথির নির্জনে ওর একটা হাত হাতে নিল। ...কী একা লাগছে এখানে! তোমার সঙ্গে আলাপ না হলে কীভাবে যে কাটাতুম কে জানে! আচ্ছা গৌতম, এর আগে কারো সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছ এমনি ভাবে? কারো জন্যে কোথাও ওয়েট করোনি?

আমার বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করছ?

মোটেও না। এমনি জানতে ইচ্ছে করে।

বিশ্বাস কর তো বলব, আমি খাঁটি আগমার্কা এ ব্যাপারে।

কেন শুনি?

তেমন যোগাযোগ হলকেই? বলেছিলুম না—আমি একজন ডিসকমিউনিকেটেড মানুষ?

না বাবা—দিব্যি কমিউনিকেট করতে পারো। থাক, অত লেবেল এঁটো না। হাটে হাঁড়ি ভেঙে ফেলব।

আহা, কী, হাঁড়ি ভাঙবে! একবার চুমু খেয়েছি—এই তো? মনে রেখো, আমি বলেছি যে আমি একজন ডিসকমিউনিকেটেড ম্যান। তার মানে আমি কাকেও কমিউনিকেট করলেও করতে পারি—স্রেফ আমার অজান্তে। কিন্তু আমাকে কমিউনিকেট করতে পারে না। তার মানে, আমার মধ্যে বাইরের কোন ব্যাপারই সাড়া জাগায় না।

জাগায় না বলছ? — রিমি ওকে কাতুকুতু দিতে থাকল।

গৌতম সরে যাবার চেষ্টা করে বলল, ভ্যাট! তুমি এত ডাল কেন? সব কথার আক্ষরিক অর্থ ধরে বসে থাকো।

ওসব বইপড়া বুলি না ছাড়লে ফের কাতুকুতু দেব কিন্তু।

ছাড়লুম। সত্যি, বিশ্বাস করো, আমার বোন ঝিমি—যার কথা বলেছি, আমাকে কী বলে জানো? মৌনীবাবা। আমার যে এত কথা বলার ইচ্ছে পেয়ে বসেছে দেখে নিজেরই অবাক লাগছে।

রিমি হাতটা তুলে ওর একটা বাহু ধরে ঘনিষ্ঠ ভাবে হাঁটতে লাগল। বলল, নির্ঝরের স্বপ্ন-ভঙ্গ! বাঃ! কিন্তু দেখো, আমাকে শুদ্ধ ভাসিয়ে নিয়ে যেও না!

তুমি কি ভয় পাচ্ছ রিমি?

একেবারে পাচ্ছিনে বললে মিথ্যে বলা হবে।

চল, ওই বেঞ্চটায় বসি—খালি রয়েছে দেখছি। নদীর ধারে বসতে বেশ লাগে কিন্তু।

হুঁ, কমিউনিকেশান ব্যবস্থা দ্রুত চালু হয়েছে কিনা। এর এঞ্জিনিয়ার নিশ্চয় আমি?

রিমি, ওই কারা আসছে—দখল করে নেবে বেঞ্চটা। কুইক মার্চ।

রিমি কোমরে আঁচল জড়িয়ে বলল, রান! ...তারপর দৌড়ল। দুজনে দখল করে ফেলল বেঞ্চটা। দুইপ্রান্তে বসল দুজনে—পাছে কেউ এসে ভাগ বসায়, রিমি একটা পা জানু অবধি তুলে লম্বা করে রাখল, এবং দেখাদেখি গৌতমও।

সেই মুহূর্তে বেরসিকের মত একটা সিড়িঙ্গে লম্বা মাথায় পাগড়ী, কানে মাকড়ি পরা প্রৌঢ় এসে মাঝখানটা দেখিয়ে বলল, বইঠনে শকতা?

রিমি বলল, কাঁহা বইঠেগা হুজুর? মেরী পাঁও রাখনেকো জায়গা দেগা নেহি? আপ বহুৎ ... এই, বেরসিকের হিন্দী কী? উঁহু—হল না। নিষ্ঠুরের হিন্দী কি?

লোকটা দুহাত চিতিয়ে বিশেষ ভঙ্গী করে সরে গেল। এরা দুজনে হেসে উঠল।

গৌতম ডাকল, রিমি?

রিমি বেঞ্চের ওপর দিকটায় একটা বাহু বেড় দিয়ে ঘুরে নীচে শুকনো নদীর ঝিরঝির স্রোত দেখছিল। সাড়া দিল—উঁ?

আমি হয়তো আজ রাতের গাড়িতেই চলে যাচ্ছি।

সে কী! ...রিমি চমকে উঠে সোজা হয়ে বসল। ...কেন?

আমি খুব কাজের মানুষ নই। কারো কাজে লাগতে পারব না যখন, তখন আর কী করব? পালানো—মানে চলে যাওয়া ছাড়া?

রিমি সরে এল কাছে। ...ব্যাপারটা খুলে বলবে?

তেমন কিছু না। থাক।

বা রে! তখন তো বললে, এখানে থেকে যেতেই হবে। চাকরি-বাকরিও খুঁজবে। হঠাৎ কী হল?

বললুম তো, আমার দ্বারা কিস্যু হবে না।

কী না হচ্ছে, তাও বুঝছি নে বাবা! ...রিমি হতাশ ও বিরক্ত মুখে বলল। ...দিব্যি তো সব চালিয়ে যাচ্ছ। যাঃ, ভীষণ—ভীষণ.... কী বলব ..... গোলমেলে ছেলে তুমি!

গৌতম সিগ্রেট জ্বেলে বলল, কী চালিয়ে যাচ্ছি বলতে চাও?

তোমার সঙ্গে তর্ক করতে আমি পারব না।

কোর না।

রিমি মুখ ফিরিয়ে নদীর দিকে রাখল। কিছুক্ষণ দুজনে স্তব্ধ থাকল। তারপর গৌতম নড়ে বসে বলল, বুঝলে রিমি? ওখানে পুলিস আমাকে থাকতে দিল না নিশ্চিন্তে—আমার গুরুজনের ভার্সান অনুযায়ী বলছি। এখানে থাকতে দিল না জনৈক নগেন মিত্তির।

নগেন মিত্তির! ...নামটা যেন শুনেছি। ...রিমি হাতড়াল কয়েক মুহূর্ত। ...হ্যাঁ, জামাইবাবুর মুখে। ওঁদের একজন অফিসার। তোমার সঙ্গে চেনা আছে নাকি?

মাথা নাড়ল গৌতম। ...নাঃ। আসলে মডার্ন যুগটাই এরকম। বাহান্ন হাজার মাইল দূর থেকে সম্পূর্ণ অজানা-অচেনা কোন ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির ক্ষতি করতে পারে। শুধু ক্ষতি নয়—অন্যের জীবনটা পুরো বদলে দিতেও পারে। আজকের পৃথিবী ঠিক এইসব মজার ম্যাজিকে ভরা।

তোমার কী ক্ষতি করল নগেন মিত্তির?

গৌতম মৃদু মৃদু হাসছিল। চোখদুটো অকারণ পিট-পিট করে সে বলল, দুঃখ এই যে লোকটাকে আমি এখনও চোখে পর্যন্ত দেখিনি। আজ বেলা সাড়ে তিনটে অবধি তার নামও জানতুম না।

রিমি রেগে-মেগে বলল, হেঁয়ালি কোর না তো! ঘোরালো-প্যাঁচালো লোক আমি সহ্য করতে পারিনে। আমি নিজে যেমন স্ট্রেট-কাট—তেমনি স্ট্রেট-কাট লোককে পছন্দ করি।

হয়তো আমি স্ট্রেট-কাট নই রিমি। হয়তো আমার মধ্যে সাংঘাতিক একটা অসুখ লুকনো আছে। ভীষণ সংক্রামক আর বিপজ্জনক সে অুসখ। আমার ভয় হয়....

রিমি সরে এসে ওর কাঁধে হাত রেখে চাপা গলায় বলল, কেন তুমি আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছ অমন করে?

গৌতম নিষ্পলক তাকিয়ে বলল, ভয়? না তো!

রিমির গলা কাঁপল। আবেগ দমন করার চেষ্টা তার কণ্ঠস্বরে।...মনে হল, তুমি হঠাৎ এত দূরে চলে গেছ—এত দূর থেকে তোমার কথাগুলো ভেসে আসছে! তোমাকে চেনা যাচ্ছে না। কেন তুমি এমন?

তুমি কেঁদে ফেললে রিমি? কেন?

রিমি মুখ ঘুরিয়ে নিল আগের মত। বাহুর উপর চিবুক রেখে ফের তাকাল নদীর ঝিরঝিরে স্রোতটার দিকে।...ভ্যাট্। আমার কিচ্ছু হয়নি।

না জেনে আঘাত করে থাকলে ক্ষমা কোর। আমি কাকেও আঘাত দিতে চাইনে। রিমি?

রিমি সাড়া দিল না। নিষ্পলক ভিজে দুটো বড় বড় চোখে শুধু নদী দেখতে থাকল সে।

গৌতম বলল, রিমি, পৃথিবী জায়গাটা বড় গোলমেলে। এর অনেক ব্যাপার আছে, যা তোমার বা আমার মত ছেলেমেয়েদের ট্যাক্‌ল করার বাইরে। আমরা সেখানে ভীষণ অসহায়। যে-সব ব্যাপারের জন্যে আমরা কেউ দায়ী নই, তবু তার সব খারাপ ফলাফল আমাদেরই ভুগতে হয় আমাদেরই প্রবীণ পিতৃপুরুষের বোকামি লোভ স্বার্থপরতা হঠকারিতা ঈর্ষাদ্বন্দ্বের চরম বলি শেষ অবধি আমরা এই তরুণ প্রজন্ম।...গৌতম পুড়ে যাওয়া সিগ্রেটের আগুনে আর একটা সিগারেট জ্বেলে নিল। ধোঁয়ার রিং পাকিয়ে দেখতে দেখতে ফের বলল, অবশ্য এই নগেন মিত্তিরের ব্যাপারটা খুব সামান্য। তেমন সাংঘাতিক হয়তো নয়। কিন্তু আমার যা ধাতে নেই, যা আমার পক্ষে করা একেবারে অসম্ভব—তা যদি আমাকে কেউ করতে বলেন, আমাকে স্বার্থপর ভাবো আর হীনচেতা কাপুরুষ ভাবো, আমার উপায় নেই। কারণ, এই মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকাটাই আমার অস্তিত্ব। এটাই এর পূর্ণতা। একে খণ্ডিত করা আর আত্মহত্যা করা আমার কাছে একই ব্যাপার। সুতরাং তোমার জামাইবাবুকে গিয়ে আমি কখনও বলতে পারব না যে আমার মেসোমশাইকে বাঁচান—কারণ তিনি নির্দোষ। সব দোষের দোষী নগেন মিত্তির।

রিমি ঘুরে তাকাল মাত্র। কিন্তু কিছু বলল না।

গৌতম আগের সুরেই বলল, দ্যাটস্ দা ফ্যাক্টর। আরও বলব না এই কারণে যে, এরপর ব্যাপারটা আরো বেশি গোলমেলে হয়ে দাঁড়াবে। ধরা যাক, আমার কথা শুনে সেনসায়েব নগেন মিত্তিরকে চার্জ করে বসলেন। সেটা খুবই সম্ভব। নগেন মিত্তির স্থানীয় লোক। অনেক গুন্ডা, বদমাস নাকি তার

হাতে রয়েছে! সুতরাং শুধু সেনসায়েব নন—সমস্ত কনসার্নের অজস্র লোক—পরবর্তী গোলমালে জড়িয়ে পড়বে—এতে কোন ভুল নেই। আবার অন্যদিকে ভেবে দেখলেও আমার খারাপ লাগে। মিছেমিছি নির্দোষ কতকগুলো লোক হয়তো অকারণ শাস্তি পাবে। কেউ সাস্‌পেন্ড হবে, কারো চাকরি যাবে। আমার মেসোমশাইয়ের কথাই ধর। এক-দঙ্গল ছেলেমেয়ে, অথর্ব বাবা—কী ভয়ানক দুর্দশায় পড়ে যাবেন! এবং ঠিক এদিকটা চিন্তা করতে গেলে, আমার অপরাধ গুরুতর দাঁড়ায়। সামান্য একটা মুখের কথা—সেনসাহেবকে বললেই বা এমন কী আমার মানহানি ঘটে যায়! কিন্তু রিমি—প্রব্লেমটা কোথায় আশাকরি বুঝতে পারছ এতক্ষণে? আমি বললুম সেনসাহেবকে—ধর উনি আমার কথা রাখলেন, অর্থাৎ বিশ্বাস করলেন। তাহলে গোলমাল আসছে। আবার আমি ওঁকে না বললেও অন্যপক্ষে গোলমাল সৃষ্টি হচ্ছে। শুধু তাই নয়—আমিও অকৃতজ্ঞ হৃদয়হীন প্রতিপন্ন হচ্ছি। সবদিক বিবেচনা করে আমি ঠিক করলুম, পালাব। কারণ, যদি আমি না আসতুম এখানে—তোমার মাধ্যমে আলাপ না হত সেনসায়েবের সঙ্গে—তাহলে? তাহলে যা অবস্থা ছিল, তাই থাকত। অতএব ব্যাপারটা থেকে 'আমি' কে মাইনাস করে দেওয়াই আমার দিক থেকে নিরাপদ নয় কি?

রিমি মুখ খুলল।...সব স্পষ্ট না বুঝলেও বলছি, তুমি যা যা ভাবছ—তা ঘটবেই তার মানে আছে নাকি? তুমি কি ঈশ্বর যে সব সাজানো ভবিষ্যৎ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ? সব অন্যরকম হতে পারে—যা তুমি ভাবনি।

আমি যুক্তিবাদী, রিমি। 'হয়তো'তে আমার আস্থা নেই।

আমি তোমার মত অত ভাবি নে। কিন্তু আমার ধারণা, মানুষ—শুধু মানুষ কেন, প্রাণীমাত্রেই আনপ্রেডিক্টেবল। ভেবে করে তাদের আচরণ সম্পর্কে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। ওই গাছটা আজ যেখানে দেখছি—কালও সেখানে ওটাকে একই রকম দেখব। কিন্তু ওই মানুষটার বেলা?

গৌতম একটু চুপ করে থেকে বলল, মানুষ আনপ্রেডিক্টেবল বলেই তো মানুষকে আমার এত ভয়, রিমি। তা না হলে তো সমস্যাই থাকত না।

অর্থাৎ তুমি রিস্ক নিতে ভয় পাও। আমি কিন্তু রিস্ক নিয়ে ঠকিনি—ভই নিই!

হয়তো ঠিকই বলেছ। আমি কখন কোন ব্যাপারে রিস্ক নিইনি। নিয়ে দেখিনি।

এবার দ্যাখ।

দেখতুম—কিন্তু এতে আমার নিজস্ব ঠকা-জেতা কিছু নেই। জড়িয়ে আছে অন্য অনেক মানুষের জীবন।

যাঃ, তুমি সবকিছু বড্ড বাড়িয়ে ভাবো।

আমার ইন্দ্রিয়গুলোর ধরনই এমনি, রিমি। হয়তো এত বেশী সচেতন—এত বেশী সেনসিটিভ যে...

ছাই!...রিমি উঠে দাড়াল।...শুধু কনট্রাডিকসানে ভর্তি তুমি। পরস্পরবিরোধী ভাবনাচিন্তায় ভোগো। তখন বলছিলে, কেউ বা কিছু তোমাকে কমিউনিকেট করতে পারে না! এখন বলছ, তোমার চেতনা ভীষণ প্রখর। বাহাদুর!

গৌতম হতাশভাবে দাঁড়িয়ে বলল, তোমাকে আমি ঠিক বোঝাতে পারিছ না। ভাষা দিয়ে অনেক জিনিস বোঝানো যায় না।

কতকগুলো ইমপরট্যান্ট জিনিস তো যায়!...রিমি হাঁটতে থাকল।...যা না হলে মানুষের চলে না, যা শ্বাস-প্রশ্বাসের মত জরুরী।

উদাহরণ দাও।... গৌতম থামল।

রিমি কানের কাছে মুখ এনে বলল, যেমন আ-মি তো-মা-কে ভাল—বা-সি।...পরক্ষণে সরে খিল খিল করে হেসে বলল, ইজ দ্যাট কমিউনিকেটেড টু ইউ, জেন্টলম্যান?

কী ভালবাসা?

ন্যাকামি কোর না। গা জ্বলে যায় চাউনি দেখলে। যেন খোকনছোনা—ডুডুবাটু খাচ্ছেন। বনেবাদাড়ে একলা অসহায় মেয়ে পেলে...ভ্যাট্‌ ভ্যাট্‌!

রিমি চুমু খাওয়াই কি ভালবাসা?

ভালবাসার ভাষা। জাস্ট্‌ দা ল্যাংগোয়েজ! —রিমি একটু দ্রুত হাঁটল।

সন্ধ্যা কখন নেমে গেছে। ফোয়ারাটায় নানা রংয়ের আলোর বিচ্ছুরণ দেখা যাচ্ছে। পার্ক নির্জন

প্রায়। কোথাও-কোথাও জোড়-বাঁধা নর-নারী খুঁজলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আর একটু পরে গেট বন্ধ হয়ে যাবে। ঘাসের ওপর গৌতম বসে রয়েছে। তার উরুতে মাথা রেখে শুয়ে রিমি আকাশের নক্ষত্র দখছিল। মৃদু হিমের স্পর্শ জাগছে এতক্ষণে।

রিমি বলল, আচ্ছা, গেটটা ওরা তো বন্ধ করে দেবে—অন্য কোথাও বেরনোর রাস্তা নেই?

দেখিনি। তিন দিকেই তো উঁচু কাঁটাতারের পাঁচিল। নদীর দিকটাও এত গভীর আব খাড়া যে সোজা নামা যায় না। কেন?

রিমি হাসল। নক্ষত্রের আলোয় ওর দাঁত ঝিকমিক করে উঠল। বলল, আমরা অনায়াসে এখানে কোথাও রাত কাটাতে পারি—আনডিসটার্বড! তাই না?

পাগল! ওঁরা তোলপাড় করে ফেলবেন না? এতক্ষণ করছেন কিনা, কে জানে।

অনেক ব্যাপার বাস্তবে সম্ভব নয়—কিন্তু কল্পনা করতে আমার ভারি ভালো লাগে কিন্তু।

কল্পনা করো তো—রাতে হিম এখনও পড়ে, এই হিমের মধ্যে এখানে কোথাও বাত কাটাচ্ছ! একা।

একা কেন? তুমি তো রয়েছ।

বেশ, তাই। তারপর?

তাবপর আবার কী?

তুমি দিব্যি নাক ডাকাবে, বুঝতে পারছি। কিন্তু আমি?

পাহারা দেবে মাথার কাছে। তোমার তো ইনসোমনিয়া আছে বলছিলে।

গৌতম মুখ নামিয়ে বলল, তুমি কি আমাকে লোভ দ্যাখাচ্ছ বিমি?

বারে! সাধু-সন্নেসী মানুষকে লোভ দেখাব কী?

আমি সাধু-সন্নোসী নই—হয়তো একটু বেশি সাধারণ মানুয।

দুটি ঠোঁট পরস্পরকে ছুঁলো। ছুঁয়ে থাকল এক মিনিট। তারপর মুখ তুলল। রিমি বলল, কে কাকে লোভ দেখাচ্ছে মশাই?

গৌতম বলল, ওটা বিদায়-চুম্বন।

সেই মুহূর্তে গেটের দিকে ঢং ঢং করে ঘন্টা বেজে উঠল। অলক্ষ্য মাইক থেকে গম্ভীব আওযাজ শোনা গেল ঃ আপলোগ পার্ককা অন্দর ঔর মাৎ রহিয়ে। আভি নিকাল যাইযে। কোই বহনেকা কোশিশ করেনে সে ফাইন হো যায়গা। হোঁ-শি-য়া-র!

গৌতম উঠে দাঁড়াল। রিমি শুয়ে হাত বাড়িয়ে বলল, বারে! ওঠাও আমাকে। কী স্বার্থপব তুমি।

হাত ধরে টেনে তুলল গৌতম। দুজনে হাঁটতে থাকল। গেট পেবিয়ে যেতে অন্ধকাব থেকে বেবিযে সেই ড্রাইভার সেলাম দিয়ে বলল, সাহাব গাড়ি ভেজা হ্যায়। আইযে মেমসাব।

রিমি চমকে উঠে বলল, গাড়ি পাঠিয়েছে? কেমন করে জানল যে আমি এখানে আছি?

ড্রাইভার ডবল সেলাম দিয়ে জবাব দিল, হামকো মালুম নেহী মেমসাব। সাহাবকা শাসমাইজী বোলা কী, পার্কমে জরুর বহনে পড়ী।

গৌতম বল্ল, আমি বরং হেঁটেই যাই।

বিমি হিড় হিড় করে ওকে টেনে গাড়ির দিকে নিয়ে গেল।..অত ইনর্ফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স কেন তোমার বল তো? যতক্ষণ না হাতের নাগালে পাচ্ছি, লুটেপুটে ভোগ করে নেওয়াই ভালো। নয়তো ঠকতে হয়। তা জানো না?

কিছুদুব যাবার পর গৌতম বলল, কিন্তু আমি মোড়ে নেমে যাব—বলে দিচ্ছি।

কেন? তোমাকে কোয়ার্টারে পৌছে দিয়েই আসব।

না, না। ওই সর্বনাশটি কোর না রিমি। তাহলে মাসিমারা আরও বেশি আশা করে বসবেন, এবং...

যারা আশা করতে ভালবাসে, তারা তোমার-আমার ধার ধারে না। আশার মুরগী ঘন্টায় হাজাব হাজার ডিম পাড়ে যে!...রিমি হেসে উঠল।

না রিমি, তুমি বুঝতে পারছ না।

খুব বুঝেছি। চুপ কর। ড্রাইভার কী ভেবে বসবে।

ভাবতে বাকি নিশ্চয় রাখেনি।

চুপ।...রিমির হাত এসে গৌতমের হাতের চেটোটা শক্ত করে ধরে ফেলল। রবীনবাবুর কোয়ার্টারের

সামনে গাড়িটার হেডলাইট গিয়ে পড়তেই দেখা গেল চার বোনের দলটা চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে আসছে। কাছে আসার আগেই গৌতম প্রায় লাফ দিয়ে নেমে বলল, রিমি, চলি।

তারপর গেট গলিয়ে ঢুকে পড়ল—পিছনে তাকাল না পর্যন্ত। গাড়িটা চলে যাচ্ছে শোনা গেল। বারান্দা থেকে শোভা বললেন, বলেছিলুম না, গাড়ি করেই পৌঁছে দেবে।

রবীনবাবুর গলা শোনা গেল।..... সেনসাহেব লোকটা আসলে তো বড্ড ভাল। পাঁচজনে ওঁর কান ভারি করে বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছে যে। নইলে নগেন মিত্তির-টিত্তির কোনদিকে উড়ে যেত।

শোভা বললেন, গাড়িতে মেয়েটা দেখলুম, কে গৌতম?

গৌতম জবাব দিল, ও সেনসাহেবের শাশুড়ির ভাইঝি। কলকাতায় থাকে— বেড়াতে এসেছে।

তোমার সঙ্গে আগে থেকে আলাপ ছিল, নাকি এখানে এসে আলাপ হল?

নাঃ, এখানে এসে।

ঘরে চল। মঞ্জু, তোরা আজ নিজেরা পড় গিয়ে। দাদাকে জ্বালাতন করিস নে।

রবীনবাবু বারান্দায় মোড়া পেতে বসেছিলেন। বললেন, ওকে একটা কিছু দাও—এখানেই বসুক আপাতত। আর চা পাঠিয়ে দাও।

শোভা চলে গেলেন। মঞ্জুরা অবাক চোখে গৌতমকে দেখছিল। রবীনবাবু ধমকে উঠলেন, হাঁ করে কি ঠাকুর দেখছিস সব? যা—পড়াশোনায় মন দে!

ওরা সুড়-সুড় করে ঢুকে পড়ল ভিতরে। ভাব-সাব দেখে মনে হল, আর কদাচ গৌতমের সামনে কেউ মারামারি করবে না—ভীষণ ভদ্রভাবে থাকার চেষ্টা করবে। গৌতম বলল, অফিস থেকে কখন ফিরলেন?

যখন ফিরি। মানে—প্রায় সাড়ে ছ'টা হয়ে যায়। স্টোরের ব্যাপার। বুঝতেই পারছ...তা হ্যাঁ বাবা সন্টু, কাল থেকে তো তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলার অবকাশই পাচ্ছি নে। ইয়ে— তোমাদের কলকাতার অবস্থা কী বল? কাগজে তো অনেক কিছু পড়ি। কাগজের কথা কত পারসেন্ট সত্য, কত পারসেন্ট বানানো- সে তো সবাই জানে।....

দীর্ঘ একঘন্টারও বেশি রবীনবাবু কলকাতা প্রসঙ্গ চালিয়ে গেলেন। তারপর এলেন এখানের প্রসঙ্গে। প্রতাপগড়ের আদি ইতিহাস থেকে শুরু হল। চলে এলেন তাঁর আপিসে। তাঁর আগের-আগের কর্তার চরিত্র, নানা ঘটনা, তারপর সেনসায়েব এসে থামলেন। একমিনিট বিরতির পর আনলেন নগেন মিত্রের কার্যকলাপ।

গৌতম কিছু শুনছিল, কিছু শুনছিল না। তার পিঠের কাছে মাঝে মাঝে শোভা এসে দাঁড়িয়ে থাকছেন, টের পাচ্ছিল সে। হঠাৎ তার মনে হল, রিমিকে নিষেধ করেছে কথাটা সেনসায়েবের কানে তুলতে— রিমি যা মেয়ে, যদি বলে দ্যায়!

পরক্ষণে মনে হল, বলে বলুক। হাতের ঢিল ছুঁড়ে দিয়ে পরে পস্তে লাভ নেই। তাছাড়া এঁরা সেনসাহেবকে যত বোকা ভাবছেন, সেনসাহেব তত বোকা নিশ্চয় নন। নগেন মিত্তিরের চরিত্র বা কার্যকলাপ তিনি জানেন না, এটা ভাবাই বোকামি। আসলে হয়তো কাগজ-কলমে লোকটার কিছু ধরা যাবে না জেনেই চুপ করে আছেন। আর, জানেন বলেই কেসটা চাপা দিয়েও দিতে পারেন। অকারণ নির্দোষ লোকগুলোকে শাস্তি দেবার মত অমানুষ নিশ্চয় নন ভদ্রলোক। মেসোমশাই অকারণ উদ্বিগ্ন হচ্ছেন।....

হঠাৎ রবীনবাবু গলা নামিয়ে বললেন, সেইটেই আমার মেইন ডিফেক্ট। তোমাকে লুকোবো না— কারণ সেনসায়েব নিজেই তোমাকে বলে উঠবেন ব্যাপারটা। ওখানেই আমার মস্ত ভুল হয়ে গেছে।

গৌতম বলল কিসে?

বললুম না?...রবীনবাবু ফিস ফিস করলেন।...এক ওয়াগন মাল—গত বছর থারটি ফার্স্ট মার্চ সন্ধ্যেবেলা পিট থেকে ডেলিভারি দিতে আসছিল। পথে ক্রেনটা ব্রেকডাউন হল। নগেন মিত্তির লোক দিয়ে সব নামাল। মাথায় বয়ে রাস্তার ধারে এনে জড়ো করল। তারপর ট্রাকে সেগুলো উধাও করে দিলে। এদিকে গোডাউন তখন বন্ধ। পিটে টালিক্লার্ক ওদিকে কাগজে ক্রেন-ড্রাইভারের সই নিয়ে ফেলেছে। উঃ, শালা নগেন করল কী, বেচারাকে গুম করে ফেলল রাতারাতি। সে এক হরিবল কান্ড! আমি সব টের পেলুম রাত্রিবেলা। তখনও বসে আছি আপিসে। নগেন এসে আড়াই হাজার টাকা গুঁজে দিলে হাতে। ব্যস্, মাত্র আড়াই হাজার!

গৌতম বুঝল, শোভামাসির বর্ণনা তাহলে অর্ধসত্য। এবং মেসোমশাইয়ের বর্ণনা যে অর্ধসত্য নয়, তার মানে নেই। হয়তো সেনসায়েবের বর্ণনা আবার অন্যরকম হবে। মোট কথা, একটা গুরুতর গোলমাল রয়ে গেছে—যা চাপা দেওয়া যায়নি এবং এখনও যাচ্ছে না। এমনও হতে পারে যে নগেন মিত্তির একা সবটার জন্য দায়ী নয়, রবীনবাবুও দায়ী।....

সে দুপুরের মতই বলল, ঠিক আছে। দেখছি।

তারপর উঠে গিয়ে ঘরে ঢুকল। কিছুক্ষণ ফের ভেবে দেখতে হবে সবকিছু। আপাতত হাতে-মুখে জল দেওয়া জরুরী। মাথা ঘুরতে লেগেছে। বড্ড খারাপ লাগে—মানুষ এই সব বিরক্তিকর ব্যাপার নিয়ে কেমন করে দিব্যি বেঁচে থাকে। কেমন করে? মেসোমশায়ের কথাই ধরা যাক। সকালে উঠে মুখ ধুয়ে আয়নার সামনে চমৎকারভাবে চুল আঁচড়ান, তারিয়ে তারিয়ে চা খান, কাগজ পড়েন, স্নান করেন এবং ফের চুল আঁচড়ান, ভাত-তরকারির স্বাদে আপ্লুত হন, সাইকেলের প্যাডেল ঠেলে ঠেলে অফিস যান। কোনখানে একচুল এদিক-ওদিক নেই। খুঁত থাকবার উপায় নেই। এবং মেসোমশায়ের মত ওইরকম বা তার চেয়েও বিতিকিচ্ছিরি সাংঘাতিক ঘা পুযে আরো কতজন দিব্যি ছেলেপুলের জন্ম দিয়ে যাচ্ছে কিংবা পান খাচ্ছে।....

হাত মুখ পা ধুয়ে-টুয়ে গৌতম বেরিয়ে এল। মাসিমা বললেন, কোথায় যাচ্ছ আবার?

গৌতম বলল, আসছি।

রাস্তায় এসে সে পায়চারি শুরু করল। ঠান্ডা কিন্তু মিষ্টি মার্চ-রাতের একটা হাওযা পাহাড়গুলির দিক থেকে এসে তার আশেপাশে কিছুক্ষণ ঘুর ঘুর করে তারপর পাহাড়ের দিকে চলে গেল। তাহলে শেষ অবধি যা স্পষ্ট হল, তা এই ঃ রবীনবাবু নিশ্চিত অপরাধী এবং সেনসায়েবকে ধরে ওঁকে বাঁচাতে হবে। অন্যেরা মরুক-বাঁচুক, সেটা গৌতমের দেখার কথা নয়—শুধু ব্ল্যাক লিস্ট থেকে একটা নাম তুলে দেবার জন্যে সুদীপ্ত সেনকে বলতে হবে। মেসোমশায়ের শেষ কথাটা হল এই।

সতরাং কে এক নগেন মিত্তিরের হাত থেকে বাঁচা গেল। এবার অন্য কেউ নয়, স্বয়ং নিজেরই নীতিজ্ঞান বিবেক নামক যাত্রাদলের গেরুয়াধারী গায়ক সেজে সামনে দাঁড়াল। সোজা কথায় 'চোরে'র (তাই-ই তো!) জন্যে ক্ষমাভিক্ষে করতে হবে। দৃশ্যটা চোখ বুজে কল্পনা করে নিল সে। সুদীপ্ত সেন সামনে পাথুরে মুখে বসে আছেন, গৌতম হেঁ হেঁ করে হাত কচলাচ্ছে। সুদীপ্ত সেন আকাশ থেকে পড়েই পাথর হয়েছেন, কারণ গৌতমের মত ছেলের পেটে-পেটে এই প্রবীণ চালাক-চতুর সংসারী বুদ্ধি তিনি কল্পনাও করেননি। রিমি নির্ঘাত পর্দার আড়ালে থেকে বোকার মত তাকাচ্ছে!

পাগল, পাগল! এরা আমাকে কী ভেবেছে?...গৌতম ক্ষুব্ধভাবে খুব হাঁটাহাঁটি করে বেড়াল অনেকক্ষণ। আজ ইনসোমনিয়ার তেড়ে আসা বাঘটা দেখে ঘুমের হরিণ চোঁ-চোঁ পালিয়ে যাচ্ছে।

সকালে মঞ্জুরা যখন যথারীতি তারসানাইয়ের রবরবায় পাঠে মন দিয়েছে, গৌতমের কানে কোয়ার্টারের বারান্দা থেকে কার হেঁড়ে গলার কথাবার্তা ভেসে এল। জানালায় সস্তা ছিটের পর্দা ঝুলছে। কৌতূহলী হয়ে পর্দাটা একটু সরিয়ে সে উঁকি দিল। অন্য কারণে নয়, এরকম গমগমে আওয়াজ সচরাচর শোনা যায় না বলেই তার কৌতূহল। যার আওয়াজ এমন, তার শরীর নিশ্চয় প্রকান্ড হবে। এবং কে জানে কেন, প্রকান্ড অর্থাৎ হোঁদল-কুতকুতে লোক দেখলেই ছেলেবেলা থেকে তার হাসি পায়। এক সময় সীতু নুদীকে বার বার দেখার জন্যে সে বার বার পড়ার বই ফেলে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াত। এবার ট্রেনে আসতে তার বিশেষ কষ্টই হয়নি—তার একমাত্র কারণ, রিমির পিসিমা এবং সেই অচেনা বিপুলবাবু। গৌতম হাসতে গিয়ে সামলে নিল। কারণ লোকটাকে যা ভেবেছিল, তা নয়।

মোড়ায় বসে আছে লোকটা। কিছুটা ঢ্যাঙা, খাড়া নাক, উদ্ধত মুখভঙ্গী, কাঁচা-পাকা চুলগুলোয় টেড়ির ছাপ আছে, চোখ দুটো মুখের সাইজের অনুপাতে ছোট, সরু সুঁচলো গোঁফ রয়েছে, বেশ ফরসাই বলতে হয়—গায়ে জংলা ছিটের শার্ট, নীলচে প্যান্ট—এক কথায় এ্যাংলো-এ্যাংলো টাইপ। সে একটা পা বাড়িয়ে সরু থামটায় গুঁতো দিচ্ছে জুতোর ডগা দিয়ে—এবং কাছেই থামে হেলান দিয়ে কৃতার্থ মুখে বিগলিত চোখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন রবীনবাবু।

গৌতম হতাশ হয়ে সরে আসতেই শোভা ঢুকলেন। তাঁর মুখে-চোখে একটা অদ্ভুত ব্যস্ততার ছাপ। ফিস ফিস করে হাত নেড়ে বলে উঠলেন, নগেনবাবু—নগেন মিত্তির এসেছে! ঠিক ঘা মুখে ওষুধ পড়ে গেছে, সন্টু। এবার? এবার কী করবি তোরা? ভেবেছিলি, মঞ্জুর বাপের কেউ নেই? কে আছে

না আছে, এবার দ্যাখ্ তোরা! ...শোভামাসির আহ্লাদ ফেটে বেরিয়ে এল হুড়-মুড় করে।

গৌতম অবাক হয়ে বলল, ওই নগেন মিত্তির? কী বলছেন ভদ্রলোক?

মাসিমা আবার হাত নেড়ে বললেন, আড়াল থেকে শুনলেই বুঝবে। শোন না ওখানটায়! ...বলে উনি দুপদাপ করে পাশের ঘরে চলে গেলেন।

গৌতম জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল ফের। কিন্তু তখন নগেন মিত্তির উঠে দাঁড়িয়েছে। ...তাহলে রবীনবাবু, ওই কথা রইল। বিকেলের মধ্যেই রমণীদা, প্রসাদজী আর সিংসায়েবকে নিয়ে বসছি। আপনি কিন্তু জাস্ট সাতটার মধ্যে দ্বিবেদীর কোয়ার্টারে পৌঁছচ্ছেন। তার আগে অবশ্যই রঘুবীরের সঙ্গে কথা বলে নেবেন—এ দায়িত্ব আপনার কিন্তু! ব্যাটা বড্ড টেঁটিয়া! আপনার সঙ্গে তো যথেষ্ট লাগ আছে। নেই?

রবীনবাবুর ঠোঁটে হাসি, চোখদুটো চকচকে, কিন্তু কপালে ভাঁজ। বললেন, আছে। ভাববেন না স্যার। ...তা ইয়ে, একটা কথা বলছিলুম স্যার!

নগেন মিত্তির দাঁড়াল। ...বলুন।

আমার ভায়রামশায়ের ছেলে, গ্রাজুয়েট স্যার, ভেরি-ভেরি ইনটেলিজেন্ট ছেলে স্যার, দেখলেই আপনার মনে ধরে যাবে- তো ইয়ে, ওর একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে স্যার। বুঝতেই তো পারছেন, এ বাজারে ... হেঁ হেঁ তার ওপর কলকাতার যা অবস্থা ...

কলকাতার ছেলে? ...নগেন মিত্তিরের ঠোঁটে হাসি, ভুরু কুঞ্চিত। ... সর্বনাশ মশায়! এখন একে বাঙালী—তাতে কলকাতার ইয়ংম্যান দেখলেই তো সবাই কেঁপে ওঠে। ...সে খ্যাঁক খ্যাঁক করে অদ্ভুত হাসল।

রবীনবাবু সিরিয়াস হয়ে হাত তুলে আশ্বস্ত করলেন। ..নো, না স্যার। সে লাইনের ছেলে মোটেও নয়। রাজনীতি টিতির ধারে কাছে মাড়ায় না। খুব শান্ত ভদ্র—নিরীহ টাইপের ছেলে। গ্যারান্টার তো আমি রইলুম। ডাকব —দেখবেন নাকি?

পরে দেখব। বলে নগেন মিত্তির চলে গেল। গেটের কাছে তার মোটর সাইকেলটা ঠেস দেওয়া ছিল। টেনে নিয়ে রাস্তায় উঠল। নীল ধুঁয়ো উড়িয়ে গুর-গুর করে চলে গেল। রবীনবাবু সেই যাওয়া দেখতে লাগলেন নিবিষ্ট মনে—ঠোঁটে মৃদু হাসি। তারপর ডাকলেন, ওগো, শুনছ? শোভার সাড়া না পেয়ে ঘরে চলে এলেন তিনি।

গৌতমের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একগাল হেসে বললেন, নগেনশালা এসেছিল! সব উল্টোপাল্টা হয়ে গেল বাবা সন্টু। রাখে হরি মারে কে।

পরক্ষণে গৌতমকে টানতে টানতে তিনি শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন। বিছানায় থাপ্পড় মেরে বললেন, বোস।

গৌতম বসল। ঠান্ডা পাথুরে চোখে তাকিয়ে থাকল।

রবীনবাবু খ্যাঁক করে হেসে বললেন, কথায় বলে বাত সারাতে কুষ্ঠ হল—কিন্তু এ যা দেখছি, বাত সারাতে গিয়ে কুষ্ঠটাই সেরে গেল। কাল রাত্রে সেনসায়েব নগেনের কোয়ার্টারে গিয়ে হাজির। ওই রকম মাথাপাগল যে লোকটা! যেই তুমি সব বলে দিয়েছ, অমনি ক্ষেপে গিয়ে রেকর্ডপত্তর খোঁজাখুঁজি করেছে—সব আগাগোড়া রিচেকিং করেছে রাত দশটা অবধি। তারপর গেছে নগেনের কাছে।

গৌতমের বুকের ভিতরদিকে কোথাও একটা খিঁচ ধরল। রিমি—তাহলে রিমিই কি ...

...বুঝলে বাবা সন্টু! নগেন তো কম নয়। সেনসায়েব চলে যাবার পর সব অফিসার আর ক্ল্যারিকাল স্টাফের কাছে দৌড়দৌড়ি করেছে। সকালে এল আমার কাছে। ফরেন এক্সপোর্ট সেকসানে নাকি কী গোলমাল রয়েছে, তাতে সেনসায়েবকে ঝট্ করে ফাঁদে ফেলা যায়। সেন্টার—মানে দিল্লীর যে অফিসারের অর্ডারে এসব বিদেশচালানী কনসাইনমেন্ট অর্ডার ইসু হয়, তিনি আবার সেনসায়েবের দারুণ শত্রু। নগেন মিত্তির দিনকে রাত করতে পারে। বাপস্! এতসব খবরও ও রাখে!

গৌতম আস্তে বলল, তারপর?

তারপর আর কী? নগেন গেলে দিল্লীতে ফোন করতে। এক্সপোর্ট সেকসানের কেস—প্রমাণ-অপ্রমাণ যাই হোক, করতে গেলেই আমাদের স্টোর সেকসানের লোকেরাই ভরসা। নাও, এখন ঠ্যালা সামলাও। পাল্টা ঘা খেয়ে সুদীপ্ত সেনের দীপ্তি ফুস করে নিভে যাবে!

চমৎকার বাক্য ব্যবহার করার খুশিতে পা নাচাতে থাকলেন রবীনবাবু। হাক দিলেন, কই গো, শুনছ? শিগগির আর দুকাপ চা দাও আমাদের। আপিস আজ একটু দেরী করে যাব। ...হ্যাঁ, সন্টু!

তোমার চাকরির জন্য নগেন মিত্তিরকে বললুম। ও কথা দিয়েছে। এখন ব্যাটা আমার সব কথা শুনবে—শুনতে বাধ্য।

এতদিন পরে দাদা রঞ্জুর মত হাত দুটো শক্ত হয়ে আসছিল গৌতমের—অবিকল দাদার মতই তার চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল—ভেঙে ফেল সব, ভেঙে গুঁড়ো করে দাও এই পচ-ধরা পুরনো পৃথিবীটাকে!

কিন্তু কিছু করতে না পেরে সে রবীনবাবুর দিকে তাকাল। মনে হল, মেসোমশায়ের শরীরটা বিপুল হতে-হতে, ছাদ ফুঁড়ে দেয়াল পেরিয়ে পরিব্যাপ্ত হয়েছে সবখানে। আর ওই অসম্ভব শরীরের প্রতি কোষে থরে-থরে সাজানো ক্রোমোসোম এবং তার মধ্যেকার জীনগুলো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে। লোভ, স্বার্থপরতা, নীচতা, হীনমন্যতা, দাসত্বপ্রিয়তা, ক্ষুদ্রতা আর সঙ্কীর্ণতা—দারিদ্র্যের পচা নর্দমা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে এসে রবীনবাবুর দেহকোষে সোজা জীনগুলোয় গিয়ে থিক-থিক করছে। এবং প্রতিটি কোষ হয়ে উঠছে একেকটি ক্যান্সারকোষ। ক্যান্সারকোষটা বাড়ছে—বেড়েই চলেছে—

হঠাৎ রবীনবাবু ঝুঁকে এসে ফিস ফিস করলেন, তুমি দিনকতক আর সেনেসায়েবের বাংলোর দিকে যেও না। একটু এড়িয়ে থাকো। দিস ইজ ফর ইওর অনার এ্যান্ড সেফটি এ্যান্ড অলসো অফ আওয়ার-সেলভস্—মাইন্ড দ্যাট!

বাইরে রিমির কণ্ঠস্বর না? পাশের ঘরে? গৌতম উঠে দাঁড়াল। সেই মুহূর্তে মঞ্জু দৌড়ে এসে চাপা গলায় এবং চোখ নাচিয়ে বলল, সেই মেয়েটা এসেছে, দাদা!

গৌতম ওঘরে গিয়ে দেখল, রিমি টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে রেণুকে পড়া বোঝাচ্ছে। গৌতমকে দেখে সে হাসল। ... চলে এলুম। দেখি, ভদ্রলোক আছেন, না কেটেছেন।

গৌতম গম্ভীর মুখে বলল, চল—বেরোই।

এসে সঙ্গে সঙ্গে তাড়িয়ে দিচ্ছ? ...রিমি সকৌতুকে বলল।

মঞ্জু হন্তদন্ত হয়ে বলল, আরে, বসুন বসুন। মাকে ডেকে আনি। মা কাল রাত্তিরে কত বকাবকি করল, আপনাকে আমরা আসতে বলিনি বলে।

মঞ্জু দৌড়ে বেরিয়ে গেল। দুমিনিট বিরতির পর রবীনবাবু এসে বললেন, গৌতম, তোমার চা টা রয়েছে এ-ঘরে। এ-মেয়েটি কে, চিনতে পারলুম না তো?

জবাবটা দিল রেণু। ...তোমাদের সেনসায়েবের শালী, বাবা।

ও, তাই বুঝি! রবীনবাবু শুকনো হাসলেন। আমি গৌতমের মেসোমশাই হই। তা ইয়ে, গৌতম তোমার চা ..

রিমি তক্ষুনি এসে পায়ের ধুলো নিতেই তিনি 'বেঁচে থাক মা' ইত্যাদি বলে পাশের ঘরে চলে গেলেন। রিমি গৌতমের দিকে তাকিয়ে বলল, কী? কথা বলছ না যে!

গৌতম গম্ভীর। শুধু বলল, চল— বেরোই।

রিমি বলল, দাঁড়াও না বাবা। তোমার মাসিমার সঙ্গে আলাপ করে যাই।

মঞ্জু এল। তার মুখটা কেমন নীরস। বলল, মা বাথরুমে ঢুকেছে। দেরী হবে বলল।

গৌতম নিঃসঙ্কোচে রিমির হাতটা টেনে এতগুলো বড় বড় চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

আশ্চর্য ম্যাজিক ঘটিয়ে গেছে সকালবেলা সেই নগেন মিত্তির নামে লোকটা। নইলে এতক্ষণ রিমি—সেনসায়েবের শালীর শুভ-পদার্পণে কী ধুন্ধুমার অভ্যর্থনার ঘটাই না পড়ে যেত! হয়তো এই মেয়েটি আর বোনপোর মাথায় টোপর পরিয়ে—অবশ্যই মনে মনে—সহস্রোত্তর শতবার শোভামাসিমা পুলকিত হতেন। রোমাঞ্চিত হতেন। অস্ফুট কণ্ঠে বলতেন, সন্টুর সঙ্গে ভারি মানায় মেয়েটিকে। মঞ্জু-রেণুরা সন্দেশ আনতে দেরী করছে ধরে নিয়ে ঘর-বার করতেন মাসিমা। রবীনবাবু হুলস্থূল বাধিয়ে দিতেন।

কিন্তু কিছু হবার নয়। নগেন মিত্তির এসে এক হ্যাঁচকা টানে বুকে টেনে নিয়েছে এঁদের। পাল্টা দলের ভিন্ন রংয়ের খেলোয়াড় অদৃশ্য জার্সি পরিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেছে সেনসাহেবের দলের উল্টোদিকে।

অবশ্য নগেন মিত্তিরের এ খেলার মাঠ গত রাতে প্রবল প্রযত্নে সাফ করে ফেলেছেন সেনসাহেব নিজেই—হঠকারিতায়। আইনত প্রায় নাবালিকা এঁচোড়েপাকা এক নির্বোধ শালীর কথায় অমন বুদ্ধিমান লোকটাও পটে গেল!

রিমি বলল, আরে! অমন গোঁয়ারের মত যাচ্ছ কোথায়?

গৌতম গতি কমিয়ে বলল, কোথাও নিরিবিলি একটু বসতে চাই। আমার মাথাটা—কেমন যেন লাগছে।

ট্যাবলেট আছে, খেয়ে ফেলো। ...রিমি ব্যাগ খুলতে ব্যস্ত হল।

নাঃ, মাথা ধরেনি। চল, ওই টিলাটার ওপর গিয়ে বসি।

ওঠা যাবে? ...রিমি বড়রাস্তার বাঁকের ধারে পাহাড়টার দিকে তাকাল, চল না দেখি।

পাথরের চাঙড়ে সাবধানে পা রেখে এবং ডিঙিয়ে হাত-ধরাধরি করে উঠল দুজনে। পাহাড়টা পুরোটাই ন্যাড়া—শুধু নিচেকার রাস্তার উল্টোদিকে একটা নিমগাছ রয়েছে। তার ঘন সবুজ চিকন পাতার ঝাঁপি দেখলে বোঝা যায়, কিছুদিনের মধ্যে ফুল ফুটবে। সেই সঙ্গে অবাক লাগে যে এই নীরস শুকনো পাহাড়ের ভিতর থেকে রস শুষে নিয়ে কেমন করে যেন বেঁচে আছে গাছটা।

এই ধরনের গাছের নিচে কে বা কারা বড় একটা পাথর রেখে দেয় কে জানে। বেদীর মত পড়ে থাকে পাথরটা। কেউ বা কারা এসে বসে তার ওপর। গৌতম আর রিমি বসল। যেন পূর্ব-নির্ধারিত একটা দৃশ্যপট বিশাল আকাশ আর প্রান্তরের পটভূমিতে টাঙানো রয়েছে, ওদের ভূমিকা সেখানে ছিল অনিবার্য।

অন্তত গৌতমের তাই মনে হল। বসার সঙ্গে সঙ্গে যেন সাড়া দিল পাথরটা—তার স্নিগ্ধ শৈত্য দিয়ে। একটু চুপ করে থেকে সে রিমির দিকে তাকাল। রিমি সামান্য ঝুঁকে কনুই উরুতে রেখে হাতের চেটোয় চিবুকের ভার নিয়েছে। কিছু আঙুল ঠোঁটের ওপর চলে গেছে। বাঁ হাঁটুটা এদিক-এদিক দুলছে। চোখের গগলসটা বাঁ হাতে কোলের কাছে ধরা আছে।

রিমি!... গৌতম তাকাল।

উঁ?

তোমার জামাইবাবুকে তুমি সব বলেছ তাহলে?

হুঁ-উ।

আমি বারণ করেছিলুম তোমাকে।

ভ্যাট্। ওসব কেন তুমি ভেবে মাথা খারাপ করো?...রিমি সোজা হয়ে বসল।...যা মাথায় ঢুকবে, একেবারে গাছ হয়ে শিকড়-বাকড় ডালপালা ছড়াবে অনন্ত কাল। কেন তুমি সহজ হতে জান না? এখন ওসব ভাল লাগে না।...বলে সে ওর হাতটা নিল। — দেখছ? এই পাহাড়ের ওইদিকটা ধ্বসিয়েই রাস্তাটা বানানো হয়েছে। নিশ্চই ডিনামাইট ফাটিয়েছিল। কেন থাকিনি সেদিন! ইস, কী ভাল না লাগত!

ধ্বংস দেখলে তোমার আনন্দ হয়। তাই না রিমি?

ভীষণ---ভী-ষ-ণ।

কেন?

ধ্বংস না হলে তো সৃষ্টি হয় না!

তুমি কি দর্শনের ছাত্রী ছিলে?

নাঃ। ইকনমিকস। তুমি বুঝি ছিলে?

হুঁ।

এই যাঃ! যেজন্যে এলুম, ভুলে গেছি বলতে! জামাইবাবু আজ বারোটার মধ্যে তোমাকে আপিসে দেখা করতে বলেছেন। কোয়ার্টারে থেকো—গাড়ি আসবে। খবরদার, আমাকে অপ্রস্তুত করো না কিন্তু।

গৌতমের ভিতর একটা শিহরণ ঘটে গেল।...আমাকে কী দরকার তোমার জামাইবাবুর?

সে আমি কেমন করে জানব?

যদি না যাই?

যাবে না। আমার মুখ থাকবে না। তোমার সঙ্গে আমার চটাচটি হবে। বাস্!

গৌতম বিরক্ত মুখে বলল, তুমি ভীষণ ঝামেলা পছন্দ কর, জানতুম না কেন ওসব বলতে গেলে ওঁকে? তোমাকে এত করে বারণ করলুম—ভ্যাট্!

ভ্যাট্ ভ্যাট্ কোর না। কী বিচ্ছিরি শব্দ।...এই, আজ ওবেলা ফের স্যাংচুয়াররিতে গেলে মন্দ হয় না। কাল কী একটা ভীষণ ভী-ষ-ণ ...একটা অদ্ভুত...সুন্দর দিন না কাটিয়েছি। থ্রিল...শিহরণ... রোমাঞ্চ...বলতে বলতে সে 'এ্যান্ড রোমান্স' বলে হাসিতে ভেঙে পড়ল।

গৌতম খুব আস্তে নিস্তেজ স্বরে বলল, হ্যাঁ—জীবনে প্রথম কোন মেয়েকে চুমু খেয়েছি কাল।

ফের অশ্লীল কথাবার্তা? রিমি চোখ পাকিয়ে তাকাল।... ছেলেদের স্বভাবই এরকম। একটুখানি

লাই দিয়েছে কী, ব্যস।

গৌতম গম্ভীর হল।... চুম্বন শ্লীল না অশ্লীল তা নিয়ে কাগজে ক'দিন খুব তর্কাতর্কি হচ্ছিল মনে পড়েছে। শেষ অবধি কী হল, কে জানে।

যাঃ, সে তো ছবিতে। ছবির ব্যাপার।

কিন্তু ফটোগ্রাফ। স্রেফ ছবি নয়। বাস্তবে যা হুবহু ঘটছে, তাই। এ্যান্ড সার্টেনলি প্রভোকেটিভ। ওসব নীতিবাগীশদের কথা ছাড় তো। অন্যদের বেলা তখন অশ্লীল লাগে, নিজেরা? নিজেদের বেলা?

আহা, ব্যাপারটা তো প্রাইভেট।

প্রাইভেট অ্যান্ড কনফিডেনসিয়াল।..রিমি আবার হাসল জোরে।...জামাইবাবুর একটা ফাইল দেখলুম কাল রাত্রে—আলমারি খুলে বের করলেন, —প্রাইভেট আন্ড কনফিডেনসিয়াল লেখা আছে লাল কালিতে।...বলেই সে জিভ কাটল। সর্বনাশ! ফের তোমাকে নিয়ে নগেন মিত্তিরের কাছে পৌঁছতে চলেছি। যত চেষ্টা করছি অন্যদিকে যাব—তত.... এই, গৌতম, তোমার ডাক-নাম কী বলছিলেন যেন?

সন্টু।

গৌতম তো বুদ্ধদেবের ছেলেবেলার নাম?

হুঁ।

তোমার ডাক-নাম বুদ্ধু হলে ভাল হত।...রিমি গম্ভীর মুখেই বলল। গৌতম এতক্ষণে হো হো করে হেসে ফেলল। সে বলল, জানো রিমি, সারা ছেলেবেলা পাড়ার আর স্কুলের ছেলেরা আমাকে গৌতম বুদ্ধু বলে ক্ষেপাত। সম্ভবত ওইসব অত্যাচারেই কোণঠাসা হয়ে আমি অর্ন্তমুখী স্বভাব পেয়েছিলুম। যাকে বলে ইনট্রোভার্ট।

আর আমি এক্সট্রোভার্ট, তাই না?

কেন?

সব সময় ভীষণ বকাবকি করি। হৈ-চৈ করে বেড়াই।

গৌতম ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি আমাকে বদলে দিয়েছ রিমি। পুরো উল্টে ফেলেছ। আমার ভয় হচ্ছে, তুমিও আমাকে বদলেছ। আমাকেও ভাবনার অসুখে ধরে গেছে কিন্তু। কাল সারারাত তো ভেবে ঘুমই হল না। সকাল থেকে কথা বলতেই ইচ্ছে করছিল না। জামাইবাবু কথাটা না বললে চুপচাপ শুয়ে থাকতুম।

কী ভাবনায় পেল তোমাকে?

উঁহু, গুপ্ত কথা ফাঁস করতে নেই।

গৌতম ওর দু-কাঁধ ধরে টানল হঠাৎ। রিমির মাথাটা ওর কাধের কাছে চলে এল। রিমির শরীরটা কাঁপছিল—দুলছিল—হয়তো অব্যক্ত খুশির জোয়ারে।

নিচে চারপাশে আদিগন্ত ব্যাপ্তিটার দিকে চোখ বুলিয়ে নিল গৌতম। কত উঁচুতে ওরা বসে রয়েছে। নিচের পৃথিবী কী অদ্ভুত দেখাচ্ছে! ঘর-বাড়িগুলো পুতুলের ঘরের মত, গাছপালা মাটিতে মিশে রয়েছে, নদীটা একটা সরু রুপোলি ফিতের মত পড়ে রয়েছে দূরে—স্যাংচুয়ারির দিকে টিলাগুলো মড়ার মুণ্ডুর মত দেখাচ্ছে। গৌতম ওকে ছেড়ে দিয়ে বলল, দ্যাখো দ্যাখো রিমি, রাস্তায় ওই লোকটা যাচ্ছে—কতটুকুন! আঙুলের মত ছোট্ট।

রিমি দেখে নিয়ে বলল, আমরা অনেক উঁচুতে আছি।

গৌতম লম্বা নিশ্বাস ফেলে বলল, চল নামি।

আর একটু বসি না বাবা।...রিমি দুষ্টু-দুষ্টু মুখে চোখে ঝিলিক তুলে বলল।...সময় এলে তো নিচে নামতেই হবে।

পাঁচ

গাড়ি আসবার আগেই গৌতম সুদীপ্ত সেনের অফিসে গেল। বিশাল কম্পাউন্ডে ঘেরা যাদুপরীর মতন বাড়িটা। চারদিকে চমৎকার সবুজ ঘাসের লন,. ফুলের গাছপালা আর সামনে বৃত্তাকার পথের কেন্দ্রে একটা ফোয়ারা। তেতোমুখে একটু ইতস্তত করে সে এগোল। নিজের খারাপ লাগা ভাবটাকে

লক্ষ্য করে মনে মনে সে একটু হেসে বলল, রিমি বলছে তাই এলুম। রিমিকে ভীষণ—ভীষণ ভালবেসে ফেলেছি যে দাদু!...রিয়েলি।

বড় সায়েবদের কাছে পৌঁছতে যে-সব নিয়মকানুন আছে, তা পালন করতে হবে ভেবে সে একটু খাপ্পাও হল রিমির প্রতি। রিমি যেন তাকে চুরি করে নিষিদ্ধ বাগান থেকে ফুল আনতে পাঠিয়েছে। হ্যাঁ—রিমি ছাড়া আর কে? এমন বোকাবোকা মুখ করে বলেছে মেয়েটা, 'জামাইবাবু তোমাকে দেখা করতে বলেছেন'...কথাটা না মানলেও খুব খারাপ লাগে। সিঁড়িতে পা ফেলেও সে ফের নিজের বিদ্রোহী ভাবটুকুর উদ্দেশ্যে আরেকদফা বলে নিল, দেখা করব আর চলে আসব, ব্যস!

এসব ক্ষেত্রে দারোয়ান বলে, 'সিলিপ দিজিয়ে' এবং একটুকরো কাগজ আর পেনসিল এগিয়ে দ্যায়—গৌতম দেখেছে। কিন্তু এ লোকটি তাকে দেখে তেমন কিছুই করল না। বলল, 'চল্‌যিয়ে যান। সাব আপকা ইনতেজার কর রাহা হ্যায়। হাঁ, যাইয়ে!'

সুদীপ্ত সেনের ঘর এয়ারকনডিশানড্‌। তা তো হবারই কথা। দরজা ঠেলতেই, এক ঝলক সুগন্ধ ঠাণ্ডা বাতাস তার বুকে এসে লাগল। মেজাজ খিঁচড়ে গেল তক্ষুণি। সুদীপ্ত সেন মিষ্টি হেসে 'আসুন' বলতেই কিন্তু গৌতম নিজের হীনমন্যতাটুকু আবিস্কার করে ফেলল। পোকার মত মুহূর্তে তাকে টিপে মেরে সপ্রতিভ ভঙ্গিতে সে বলল। ... 'ডেকেছিলেন—রিমি বল্...' হঠাৎ চুপ করে গেল সে। কারণ সেনসাহেবের শালী সম্পর্কে সম্ভ্রান্ত ধরনের 'ন' অন্তক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা উচিত ছিল। এটা অভদ্রতা বলে নিলেন কিনা সেনসায়েব, কে জানে!

সুদীপ্ত সেনের ঠোঁট থেকে হাসি মেলায়নি।...'বসুন। হট্ না কোল্ড ড্রিঙ্ক, বলুন?'

'মানে—এখন কিছু না। দুপুরে আমার ভাত ছাড়া কিছু খেতে ইচ্ছে করে না!' সরলতায় মুগ্ধ হয়েই হাসতে লাগল।

'রাইট। আমারও তাই।' ...ঘড়ি দেখলেন সুদীপ্ত সেন।...'একটায় গিয়ে খেয়ে আসি। তার একঘন্টা আগে অব্দি কিছু না। ক্ষিদে নষ্ট করার পক্ষপাতী আমি নই। সিগ্রেট খান তো?'

গৌতম দ্রুত বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। ভীষণ খাই।'

সিগ্রেট কেসটা খুলে এগিয়ে দিলেন সুদীপ্ত। গৌতম সসম্ভ্রমে একটা সিগ্রেট নিয়ে দেশলাই বের করতে যাচ্ছিল, সুদীপ্ত লাইটার জ্বেলে বললেন, 'আসুন'।

প্রকান্ড সেক্রেটারিয়েট টেবিল, বিশাল কাচে ঢাকা। ফুলবাগিচার মতন সাজানো বলা উচিত। গৌতমকে অনেকটা ঝুঁকে যেতে হল। এবং সিগ্রেটটা জ্বেলে নিতে গিয়ে একপলক সুদীপ্তের দিকে তার চোখ পড়ল। সুদীপ্তের ঠোঁটে কী যেন অভিসন্ধির রেখা ফুটে আছে ভেবে শিউরে উঠল। তার মাথার ভিতর নগেন মিত্তিরের উচ্চারিত শব্দগুলো হু-হু করে ঝড় তুলে চলে গেল। কতগুলো নাম—'রমণীদা' 'প্রসাদজী' 'সিংসায়েব' আর 'রঘুবীর'শকুনের মত ক্রুর লোভী চোখে একটা অজ্ঞাত লাসের দিকে নেমে আসছে মনে হল তার। হ্যাঁ, এগুলো সুদীপ্তকে খুলে বলা তার খুবই উচিত। কী জঘন্য একটা ষড়যন্ত্র আড়ালে ঘোঁট পাকাচ্ছে এই ভদ্রলোক জানেন না। কিন্তু মেসোমশাই ওর পরিবারের কথা মনে আসতেই সে মুষড়ে পড়ল। রিমির ওপর এবার রাগ হতে থাকল। সুদীপ্ত কি তাকে একটা চাকরি দিতে ডেকেছেন? সম্ভাবিত এবং হয়তো আসন্ন সেই মারাত্মক খেলায় তাঁর পক্ষে একজন যোগ্য খেলোয়াড় ভেবে বসেছেন গৌতমকে? দুঃখের বিষয়, সুদীপ্তের এই অ্যাসেসমেন্ট পুরো ভুল। কী আছে গৌতমের? না মারামারির মতন সামর্থ্য, না তেমন চতুর বুদ্ধিসুদ্ধি! হয়তো সুদীপ্ত সেন লোকটাই বোকা এবং আবেগপ্রবণ, এবং হয়তো খামখেয়ালিও। অযোগ্য লোকেরা উঁচু আসন পেলে খামখেয়ালি হয়ে ওঠে। কারণ নিজের অসামর্থ্য ঢাকবার ওটা একটা কৌশল ছাড়া কিছু নয়। এই সুদীপ্ত সেন পুরো ওয়ার্থলেস।

সুদীপ্ত সেন মুখ ফিরিয়ে আধমিনিট দেয়ালে কিছু নিঃশব্দে দেখার পর বললেন, 'আপনাকে ডেকেছিলুম।...'

গৌতম অমনি হুড়মুড় করে বলে উঠল, 'নগেন মিত্তির....'

সুদীপ্ত বাধা দিলে, মৃদু হেসে।...'না। নগেন মিত্তির নয়। ইউ আর টু ইয়ং ফর দ্যাট হার্ড নাট।'

'তবে কী?'... গৌতম সোজা হয়ে বসল।

সুদীপ্ত মিটিমিটি হেসে বললেন, 'ইউ আর টু ক্র্যাক দা আদার থিং। যাক্ গে। কিছু মনে করবেন না ভাই। পড়াশুনা কদ্দুর করেছেন?'

'কেন?' ... গৌতম হাসল। 'চাকরি দেবেন?'

সুদীপ্ত গম্ভীর হয়ে গেলেন হঠাৎ। ... দেওয়া-টেওয়া কোন ব্যাপার নয়। শুনলুম আপনার একটা চাকরি দরকার। আমার এখানে একটা স্কীম রয়েছে। আপনার ভালো লাগলে আই ক্যান সেট্‌ল দ্যাট।'

'কী চাকরি?'

'এখানে একটা মহিলা কল্যাণ কেন্দ্র করা হয়েছে। আমার স্ত্রী তার অভিভাবিকা বলতে পারেন—প্রেসিডেন্ট। আমার শালীকে—মানে রিমিকে দিয়েও কিছু কাজ করাতে চাই। অবশ্য....' সুদীপ্ত সেন আবার জোরে হেসে উঠলেন।...'অবশ্য একে আপনি স্বজন-তোষণ বা পোষণ বলতেই পারেন। কিন্তু উপায় ছিল না। যাক্ গে—এখন কথা হচ্ছে...'

গৌতম বোকা বনে বলল, আমি তো পুরুষ!

'নিশ্চয় আপনি পুরুষ। আপনাকে তো আমি স্ত্রীলোক বলছিনে ভাই।' সুদীপ্ত এবার হো হো করে সব কাঁপিয়ে হেসে দিলেন।... আসলে হয়েছে কি জানেন? সমিতির হিসেব-টিসেব রাখার কাজের জন্য একজন লোকের দরকার ছিল। আমার স্ত্রীর বিশ্বাস, এসব ব্যাপারে মহিলাদের চেয়ে পুরুষেরা নাকি বেশি নির্ভর যোগ্য। অথচ দেখুন সংসার চালানোতে ইকনমিস্ট বুদ্ধির দরকার তা পুরুষদের নেই বলেই আমি মনে করি। রিমির দিদি কেন যে হঠাৎ পুরুষদের পক্ষপাতী হলেন, ঈশ্বর জানেন। যাক্ গে, ওঁর ভীষণ ইচ্ছে যে আপনি ওঁদের সঙ্গে কাজ করুন।'...

গৌতম হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল ইতিমধ্যে। নগেন মিত্তির ঘটিত ব্যাপার থেকে আশ্চর্যভাবে সরে যাওয়া গেছে। বাপস্! এই গোলমেলে কারখানায় চাকরির অফার দিলে সে কি করে বসত ঠিক ছিল না।

সম্ভবত রিমির তাগিদেই এই চাকরিটা তার জোগাড় হয়ে যাচ্ছে। রিমি তার বস হবে না তো? আর চাকরিটাও বিচ্ছিরি হবে বোঝা যায়। স্রেফ এ্যাকাউন্ট্যান্ট! টাকাপয়সার যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ কষতে হবে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস—হয়তো বছরের পর বছর। অবশ্য কতদিন এইসব প্রাইভেট উদ্যোগ বেঁচে থাকবে তার ঠিক নেই।

তাহলেও এটা এই দুঃসময়ে একটা চাকরি! মেসোমশাইয়ের ফ্যামিলি থেকে উদ্ধার পাবার আশ্বাস এতে আছে। বাবা-মা ঝিমি চরম আনন্দে হাবুডুবু খাবেন। গৌতমের একটা হিল্লে হয়েছে! চুপচাপ না থেকে একটা কিছু করছে তো তাদের সন্টু বাবাজীবন। ' আলস্য ও কর্মবিমুখতা বাঙালী জীবনের এই দুই পাপ'—তার বাবার এই বাণী। গৌতম নড়তে পারছে, এতেই তাঁর পিতৃজন্ম সার্থক হবে। কারণ তাঁর সন্তান এখন থেকে 'পুণ্যবাণ' হয়ে যাচ্ছে।

গৌতম শেষ অব্দি খুসি হল! 'মন্দ হবে না। করব।' সে বলল। রিমির সঙ্গে তাকে একই জায়গায় দিন কাটাতে হবে। এই ব্যাপারটাও খুব ভালো মনে হল তার। সুদীপ্ত সেন বললেন, 'ফাইন!' তারপর একটা প্যাড এগিয়ে দিলেন। 'এতে আপনার পারটিকুলাস লিখে দিন। দরখাস্ত টাইপ করিয়ে দিচ্ছি। সই করেই চলে যাবেন। রিমি আপনাকে যথাসময়ে খবর দেবে।'...

মেসোমশায়ের কোয়ার্টারের সামনে গৌতমকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়ে সুদীপ্ত সেন চলে গেলেন লাঞ্চ খেতে।

শোভামাসিমা বরান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। গৌতমকে দেখে হেসে বললেন, 'সেনসাহেব ছিল মনে হ'ল গাড়িতে?'

গৌতম বলল, 'হ্যাঁ'

'এখন দ্যাখো না, আরো কত করবে। ওবেলা দেখবে ওঁকে গাড়ি করে পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছে। তা কী বলছিল মেমসাহেব?'

'কী বলবে?'

'বললে না যে তোমার মেসোমশাইকে একটু বুঝিয়ে বলো?'

'না তো!'

'না!' আকাশ থেকে পড়লেন শোভামাসি।... 'তবে কেন ডেকেছিল?'

'ডেকেছিল কে বলল, আপনাকে?'

'বা রে! তুমি সকালে ওঁর শালীর সঙ্গে বেরোলে—তারপর একটা লোক এসেছিল সেনসায়েবের কাছ থেকে।'

গৌতম একটু হেসে বলল, 'মাসিমা, একটা চাকরি পাচ্ছি।'

'চাকরি! পাচ্ছ? সেনসায়েব দিচ্ছে?'

'হ্যাঁ'

শোভামাসি আহ্লাদে আটখানা হয়ে ঘরে ঢুকলেন। 'এখন তো বলতে না বলতে সেনসায়েব পায়খানা সাফও করে দেবে। বুঝলে বাবা সন্টু? সাধে তো বেড়াল গাছে ওঠে না!' শোভা দু-হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বললেন—'করো চাকরি—করো। দলে লোক একজন বাড়ুক। তারপর দেখছি, কে কী করে।'

স্নান-খাওয়ার পর অভ্যাসমতো ঘুম আসছিল আজ—কিন্তু শুল না গৌতম। চিঠি লিখতে বসল বাবাকে খবরটা জানানো দরকার। 'বাঙালী' বাবার মুখটা সামনে রেখে সে তরতর করে বাঁধা গতের সরল জলে হাঁসের মতো সাঁতার কাটতে থাকল।

চিঠি লেখার পর সে বেরোল। চিঠিটার জন্যে পোস্টাপিসে যাওয়া দরকার। সেটা বেশ খানিকটা দূরে। ওখানে বাজার আর ঘনবসতি। লোকজন থিকথিক করছে।

চিঠি ডাকবাক্স ফেলে ভাবল, এবার রিমিদের ওখানে একবার যাওয়া যায়। রিমি কি তাকে ভীষণ হ্যাংলা ভাববে? একটু ইতস্তত করেও শেষ অব্দি সে পা বাড়াল। দেখল, রিমি তার অস্তিত্বের সঙ্গে আশ্চর্যভাবে জড়িয়ে গেছে কখন। কেউ যদি বলে যে রিমি এখানে আর থাকছে না—কিংবা এইমাত্র কলকাতা ফিরে গেল পিসিমার সঙ্গে, তাহলে তক্ষুণি আকাশ পাতাল ফাঁকা হয়ে যাবে এবং গৌতম একমুহূর্ত থাকতে পারবে না এখানে। হ্যাঁ, এমন কিছু ঘটলে তার একটুও ভালো লাগবে না এখানে থাকতে। আসলে গোড়াতেই ভুল হয়েছে। রিমিকে এড়িয়ে এই জায়গার নিসর্গকে, মাটি আর আকাশকে তার আপন করে নেওয়া উচিত ছিল। অথচ কয়েক ঘণ্টা সময়ে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেছে। প্রতাপগড়ের সব কিছু বড্ড বেশি রিমিময় হয়ে উঠেছে। একটা মেয়ে কোন জায়গার পক্ষে যে এমন জরুরী ব্যাপার হয়ে উঠতে পারে, সে কোনদিন ভাবতেও পারেনি।

এই কি তবে ভালোবাসা? নাকি নিছক ভাললাগা? যাই হোক না কেন, এ মুহূর্তে ভালোবাসা ভালোলাগার সঙ্গে এত ওতপ্রোত হয়ে আছে যে টেনে আলাদা করা যায় না।

পিসিমা লনে একটা বেতের চেয়ার পেতে চুপচাপ বসে ছিলেন। গৌতমকে দেখতে পেয়ে ছটফট্ করে উঠলেন। 'এস, বাবা এস। সোনা এস, মাণিক এস।'

পিসিমার মধ্যে অদ্ভুত কিছু গ্রাম্যতা আছে, গৌতম বিব্রত বোধ করে। এত বেশি চেঁচামেচি করা বাৎসল্যের মধ্যে খাঁটি জিনিস কতটুকু আছে সে বুঝতে পারে না। মৃদু হেসে সে বলল, 'একা বসে আছেন! রিমি বেরিয়েছেন বুঝি?'

রিমি সম্পর্কে এখন সম্ভ্রান্ত ক্রিয়াপদটাই সে ব্যবহার করল। এরা তো জানেন না যে রিমিকে সে ইতিমধ্যে চুমু খেয়েছে কতবার এবং বস্তুত রিমি নামক কোমল প্রাণীটি পুরো এখন তার করতলগত। অভিভাবকরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে কিছুই টের পান না।

পিসিমা বললেন, 'রিমি? রিমি ঘুমোচ্ছে। তুমি বসো বাবা। তোমার সঙ্গে কথা বলতে কত ভালো যে লাগে, আহা! মন খুলে কথা বলব, এমন কেউ আছে কোথায়? বসো।'

কিন্তু বসার আসন নেই এখানে। গৌতম ঘাসের ওপর বসে পড়তেই উনি লাফিয়ে উঠলেন।...উ হু হু! ছেলে আমার পাগল না মাথা খারাপ! ওরে ও ভব, বাবা ভব!' ডাকতে ডাকতে বাংলো বাড়ির পিছন থেকে একটা লোক দৌড়ে এল। পিসিমা বললেন, 'একটা চেয়ার দিয়ে যাও তো সোনা।'

পিসিমার তাহলে নির্বিচারে সবাইকে সোনা-মাণিক ইত্যাদিবলা অভ্যাস! গৌতম মনে মনে হাসল। এইসব সেকেলে মানুষদের জন্যে ঈর্ষা হয়। বসুধাজুড়ে কুটুম্ব সম্পর্ক স্থাপন করতে গেলে নিশ্চয় একটা দুর্ধর্ষ ধরনের প্রাণশক্তি দরকার। তবে রিকশাওয়ালা চাকরবাকর এবং স্বয়ং জামাই এবং এই গৌতমকে যিনি 'সোনামাণিক' সমানে মুক্তহাতে বিলোতে পারেন, তাঁর 'সোনামাণিকে'র বিশুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চয় সংশয় সৃষ্টি না হয়ে পারে না!

গৌতম চেয়ার দিয়ে গেলে বসল। তারপর বলল, রিমি ঘুমোচ্ছেন এখনও? সে কী!'

'সারা দুপুর টো-টো করে ঘুরেছে কোথায় কোথায়।' ...পিসিমা স্নেহ আর বিরক্তি একত্র করে বললেন।...নতুন জায়গা। এত করে বলছি, শোনে কে? দ্যাখো না, জ্বরটর ধরাল বলে। তা হ্যাঁ বাবা গৌতম, শুনলুম—তুমিও নাকি আমার মেয়ের সমিতিতে ঢুকছ?'

'শুনেছেন? কে বলল? রিমি বুঝি?

'রিমি? তুমি পাগল, না মাথা খারাপ?' পিসিমা হাসতে লাগলেন।—রিমির পেট থেকে কিছু বেরোবে ভাবছ? ও যদি তোমাকে বলে উত্তরে যাচ্ছি, তো খোঁজ নিয়ে দেখবে—ঠিক পশ্চিমে গেছে। ভীষণ গোলমেলে মেয়ে।' পিসিমা কোন অদৃশ্য জায়গা থেকে একটা পান বের করে আচমকা মুখে গুজে দিলেন। তারপর ফের বললেন, 'অপু বলছিল ওবেলা। বলছিল— ছেলেটি বেশ। খুব বিশ্বাসী মনে হয়। চাকরি খুঁজতে বেরিয়েছে, তো সমিতিতেই ওকে নিই না কেন? তবে সবটাই অবিশ্যি রিমির কান্ড। রিমি না বললে কেউ তো কিছু জানতো না। তা বেশ বাবা, খুব ভাল হবে। করো, ওখানেই করো। নিজের লোকের চাকরি। যেমন রিমি করবে, তেমনি তুমিও করো। দুজনে এত ইয়ে যখন—মানে এতখানি ভাব, তখন এক জায়গাতে কাজ করলে...'হঠাৎ পিসিমা চুপ করে গেলেন। পানের রস উপচে ধবধবে কাপড়টা বিশ্রি করে ফেলেছে। সম্ভবত কারো ভয়ে দ্রুত সে জায়গাটা ঘষে সাফ করতে ব্যস্ত হলেন।

সেই সময় অদূরে একটা জানালার পর্দা সরে রিমির ফুলোফুলো মুখটা দেখা গেল। ঘুম থেকে জেগে ওঠা ভিজে মুখ—হাসি ঝলমল করছে। গৌতমের চোখ পড়তেই ঠোঁট ফাঁক করেছে। কিন্তু রিমি ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ইশারায় ওকে ডাকল।

পিসিমা বললেন, ' তোমার মাসিমার সঙ্গে আলাপ করে আসব। বলে রেখো। রিমিকে সঙ্গে নিয়ে যাবো।'

গৌতম বলল, 'নিশ্চয়—নিশ্চয়। খুব আনন্দের কথা।' ওখানে রিমি ভুরু কুঁচকে বারবার তাকে আসতে ইশারা করছে এবং এ আহ্বান কী শক্তিমান, গৌতম টের পাচ্ছে। কিন্তু ডাকলেই তো এক্ষুনি এই মহিলাকে ছেড়ে সুদীপ্ত সেনের বাংলোয় হুট করে গিয়ে ঢোকা যায় না। অপর্ণা নিশ্চয় ঘরে নেই। কিন্তু ঝি-চাকর আছে। রিমিটার অবশ্যই মাথার ছিট আছে—তা না হলে এত বাড়াবাড়ি করে?

শেষে গৌতম পারছিল না, ওঠার উপক্রম করতেই পিসিমা টেনে ওকে বসিয়ে দিলেন।.. বসো বসো। এক্ষুনি যাবে কী? রিমি উঠুক। চা-টা খাও। অপুও এসে পড়বে এক্ষুনি। আজ সবাই মিলে গল্প করব। তাই তো ওবেলা জামাইকে বলছিলুম বাবা, আজকালকার ছেলে-ছোকরা হাড়-বদমাস, কী দুষ্টু বাবারে বাবা! সে এক মহাভারত— বলতে গেলে। কলকাতার যে পাড়ায় আমরা থাকি, সময় অসময় নেই, ধুম-ধাম ফট্ ফটাস লেগেই রয়েছে। খুনোখুনি মারামারি..ছ্যা ছ্যা ছ্যা' আসল কথা কী জানো, সেই ভয়েই তো রিমিকে নিয়ে পালিয়ে এলুম—ওই মেয়েকে আর বিশ্বাস করতে পারছিলুম না। সেদিন (চাপা স্বরে) রিমিরই এক বন্ধু— মেয়েটাকে দেখলে তুমি ভাবতেই পারবে না যে ও বুকের মধ্যে পিস্তল রেখে ঘুরে বেড়ায়—তা তাঁকে পুলিশ ধরে ফেলল। তখন—সত্যি বলছি গৌতম, আমার ভীষণ ভয় হল। পুলিশকে তো কিচ্ছু বিশ্বাস নেই। রিমির দিকে চোখ পড়লেই হল। তাই ভাবলুম, ওকে জামাইয়ের কাছে রেখে এলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।'....

গৌতম অবাক হয়েছিল শুনতে-শুনতে। কী বিপদ! রিমি তো তাকে এসব কিছু বলেনি!

অবশ্য সেও তো রিমিকে বলেনি তার নিজের আসল ব্যাপারটা।

কিন্তু রিমি হয়তো টেরই পায়নি কেন তাকে তার পিসিমা হঠাৎ রাতারাতি দুম করে প্রতাপগড় এনে ফেলল! একটু অবাক করল রিমি। জানতে ইচ্ছে করছে, রিমি কি তার সেই বন্ধুটির মতো রাজনীতি করত, কিংবা কী তার রাজনৈতিক মতামত!

পরক্ষণে ভাবল, রিমিকে যতটুকু চিনেছে—এ মেয়ে ওসবের বাইরের না হয়ে যায় না। কারণ রিমির মধ্যে একটা স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিকতা আছে। প্রাকৃতিক নিয়মের অনুগত, কোন বৃক্ষের মতোই রিমি সরল এবং আকাশলিপ্সু। প্রচুর তার রোদের ক্ষুধা এবং ঝড়-বজ্রের ভীতি। কোন মনুষ্য আরোপিত জটিলতা তার মধ্যে নেই। যেন নেই সভ্যতা সংস্কৃতির প্যাঁচালো কোন রঙের ছোপ। গৌতম ধরে নিল, রিমি ঠিক তার মতোই রাজনীতি ইত্যাদি থেকে নির্লিপ্ত। বিচ্ছিন্ন সে সভ্যতার আনুষঙ্গিক ব্যাপারগুলো থেকে। সেজন্যেই রিমির মধ্যে কোন জটিলতা নেই।

'তাই বলছিলুম জামাইকে— ছেলেটি বড্ড ভালো। আজকাল এমন ছেলে দেখাই যায় না।'...পিসিমা সমানে বলে যাচ্ছেন, গৌতমের কান ছিল না। তার মন রিমির পিছনটা হাতড়াচ্ছে। এবং তার একান্ত বশংবদ চোখ দুটো জানালায় রিমির চমৎকার চাপা লোভজনক ডাকটা অসহায় ভাবে লক্ষ্য করছে। শেষে রিমি রেগে-মেগে জানলার পর্দা টেনে দিল। গৌতম কাঁচুমাচু হয়ে বসে রইল।

সেই সময় অপর্ণা এসে পড়ায় রিমির কাছে যাবার কোন সুযোগই আর গৌতমের জন্যে অবশিষ্ট রইল না। রিমির সেন্টিমেন্টে হয়তো লাগল—গৌতম একটু বিব্রত বোধ করল। কিন্তু অপর্ণা ফিরে

ঘরের মধ্যে রিমি (নিশ্চয় সে শুয়ে থাকত বিছানায়) আর গৌতমকে দেখে কিছু ভাবতেন— যেটা বেশ বিসদৃশ হঠকারিতা হত। বাঁচা গেছে সেদিক থেকে। রিমির সাহসটা এত প্রচন্ড যে যে-কোন দিক থেকে বিপদ আসন্ন হয়ে উঠতে পারে। গৌতম মনে মনে একটু সতর্কও হল।

অথচ রিমিকে তার এড়িয়ে থাকাও ভারি কঠিন। নিজের ভিতর তার ষড়যন্ত্রকারী শত্রুর মতো প্রেম ভালোবাসাটার দিকে অসহায় চোখে সে তাকাল। কোথায় ছিল এতদিন এই ভালোলাগা ভালোবাসার গুরুতর আপদটা? সহজাত বৃত্তিগুলোর সঙ্গে ধীরে গোপনে বেড়ে উঠেছিল যেন এই ধুরন্ধর আততায়ী। এতদিনে ফাঁসে আটকে ফেলেছে তাকে।

অপর্ণা ব্যস্ত হয়ে বলল, 'কতক্ষণ এসেছেন? ভাবছিলুম—আপিস থেকে আপনাকে খবর পাঠাবো বিকেলে একবার আসতে। মিঃ সেনের সঙ্গে দেখা হয়েছে আপনার—উনি ফোন করেছিলেন। যাক্‌গে ভাই, খুব ভালো হল। বসুন, আসছি।'

অপর্ণা চলে গেল। পিসিমা বললেন, 'গৌতম, বাবা— সোনা আমার! কাল সকালে একবার আসবে?'

'কী ব্যাপার?' গৌতম শুধোল।

'ওদের এতবার বলছি, শুনেও শুনছে না কেউ। এখানে কোথায় নাকি পাহাড়ের সুড়ঙ্গের মধ্যে রুদ্রদেবের মন্দির আছে। তোমাকে নিয়ে বেরোব, বাবা। গাড়িফাড়ি আমরা নেব না। একটা রিকশোয় চেপে যাব। রিমিকে বললে বলে, পথে ডাকাত আছে। মেয়েকে বললে বলে, ওখানটায় কেউ যায় না—ঢুকতে দেয় না। এদিকে ভব বললে, ওসব মিথ্যে। সবাই যায়—ঢুকতেও দেয়। তা ভবকে যদি বললুম, ভব বললে—মেমসাহেব বারণ করেছে। বোঝ কান্ড।'

গৌতম বলল, 'যাব।'....

অপর্ণা একটু পরেই কাপড় বদলে চলে এল। একটা চেয়ার দিয়ে গেল ভব। অপর্ণা বসে বলল, 'শুনুন—আগামীকাল থেকেই জয়েন করুন। কেমন?'

গৌতম বলল, 'করব।'....

সান্ধ্য মজলিশটা বেশ জাঁকিয়ে বসবে মনে হল। কারণ টেবিল এবং আরও কিছু চেয়ার এসে গেল। ক্রমশ তিনজন মহিলা এলেন—যাঁদের একজন রিমির বয়সী প্রায়। তারপর এলেন সুদীপ্ত সেন। কথাবার্তা জমে উঠল। কিন্তু রিমির পাত্তা নেই।

রিমির কথা কেউ ভাবছে না—পিসিমাও না। তার সবল এবং স্পষ্ট ধ্বনের কথাবার্তায় সবাই হেসে উঠছে। গৌতম লক্ষ্য করল, তার প্রতি কারো মনোযোগ নেই—এবং সেটাই স্বাভাবিক। এই মহিলারা সেই সমিতির পরিচালিকা মনে হচ্ছে। গৌতম সামান্য একটা হবু কেরানী। কাজেই তার পক্ষে এভাবে বসে থাকাটা সঙ্গত হবে না ভেবে সে উঠল। সুদীপ্ত বললেন, 'চললেন? ঠিক আছে ভাই। আবার দেখা হবে।'

পিসিমা গল্পের স্রোতে ভাসছেন বলে গৌতমের চলে আসাটা লক্ষ্য করলেন না। সে পা বাড়াতেই এক মহিলা হঠাৎ ডাকলেন—'শুনুন, এই যে ইয়ে বাবু! কাল তো আপিসে আসছেন—আসার পথে আমার বাংলো হয়ে আসবেন। অপু, ফাইলটা ওঁর হাতেই দিয়ে দেব— কেমন?'

গৌতম বলল, 'আপনার ঠিকানাটা...'

মহিলা বললেন, হ্যাঁ—আপনি তো এখানে নতুন লোক। ঠিক আছে আপনাকে যেতে হবে না। আমি লোক পাঠিয়ে দেব'খন।'

গৌতম আশ্বস্ত হয়ে চলে এল। রাস্তায় এসে এতক্ষণে সে সিগ্রেট ধরাল। তারপর সুদীপ্ত সেনের বাংলোর দিকে তাকাল। অন্ধকার নেমে গেছে। বাংলোর সামনেটা যথেষ্ট আলোকিত। এবং সে দেখল, গেট খুলে রিমি হু হু করে বেরিয়ে আসছে।

কাছে এসে রিমি কড়ামুখে বলল, 'যদি না আসতুম!'

কী জবাব দেওয়া উচিত একথার—গৌতম ভেবে পেল না। রিমির মধ্যে যে একটা প্রচন্ড ছেলেমানুষী আছে, এ তারই পরিচয়। ছেলেমানুষী বলা ভুল—এ হল খুকিপনা। কারো কারো বয়স আর বুদ্ধিশুদ্ধি সমান্তরালে বাড়ে না। রিমির শরীরে যুবতী, মনের অনেকটা জুড়ে যেন এক প্রগলভা বালিকার বাস। গৌতম একটু হাসল। ....'তুমি আসবে, আমি জানতুম। কারণ, না এলে আমার ভীষণ খারাপ লাগত। এত খারাপ যে হয়তো রাতের ট্রেনেই কলকাতা চলে যেতে ইচ্ছে করত।'

রিমি এবার হেসে ফেলল। 'শাসাচ্ছ! বেশ তো—যেতে যেতেই। আমার কী এমন ক্ষতিটা হত, বুঝতে পারছিনে। আমি তো তোমার বিবাহিতা পত্নী নই।'

'তা হলে কি?'

'ট্রেসপাস করতে করতে অনেকদূর এগিয়েছ কিন্তু।'

'ফিরে যাব?'

রিমি ওর একটা বাহু ধরে বলল, 'এই গৌতম! তখন তুমি যদি সত্যি ঘরে ঢুকে থাকতে, দিদির কাছে কী অপ্রস্তুত না হতুম! জোর বেঁচে গেছি।'

গৌতম ওর হাত নিয়ে বলল, 'সেজন্যেই তো যাইনি। আচ্ছা রিমি, চাকরিটা করব?'

'তুমি আমাকে জিগ্যেস করছ না কিন্তু আমি করব কী না!'

'বেশ—করছি। তুমি করবে?'

'হুঁ-উ।'

'আমার একটু কেমন কেমন লাগছে।'

'কেন? মাসে তো বেশ ভালো টাকা দেবে ওরা।'

'চারশো।'

'তাহলে?'

'মুশকিল হয়েছে যে বস হবেন তোমারই দিদি।'

'দিদি তো আমারও বস হবেন!'

ওরা কথা বলতে বলতে হাঁটছিল। মোড়ে এসে দুজনে দাঁড়াল। নির্জন রাস্তা। কদাচিৎ দু'একটা রিকশো-গাড়ি সাইকেল যাচ্ছে, অনেকক্ষণ পর পর দু-একজন মানুষ। দূরে-অদূরে কালো পাহাড় জুড়ে ব্লাস্টফার্নেসের কিংবা বিজলী-বালবের আলো দেখা যাচ্ছে। এইসবের মধ্যে একটা গাম্ভীর্য আছে। আদিমতা আর সভ্যতা হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। গৌতম বলল, 'কে জানে! এসব চাকরি-বাকরি আমার বড্ড হ্যাংলামি লাগে। ভ্যাট্! একেবারে কুকুর-কুকুর লাগে সব। বিচ্ছিরি।'

রিমি হাসল না।.. 'আমার কিন্তু ভাল লাগবে—অন্তত এখানে। মেয়েদের নিয়ে কাজকর্ম। মন্দ কী!'

গৌতম হঠাৎ বলল,'রিমি, তুমি কি রাজনীতি করতে কলকাতায়?'

'রিমি দ্রুত জবাব দিল, 'মোটেও না।'

'ঠিক আমারই মতন তাহলে।'

'তোমার মতন মানে?'

'ভীষণ বোকাসোকা—ভীতু, গোবেচারা।'

রিমি কি ভেবে নিয়ে বলল, 'আমাকে বন্ধুরা তাই বলে কিন্তু। এই! জানো—আমাকে একবার ওরা তিনটে রিভলবার রাখতে দিয়েছিল! সারারাত ঘুমোতে পারিনি। না—পুলিশের ভয়ে নয়। মনে হচ্ছিল, ফিল্মে যেমন দ্যাখায় সব—অস্ত্রগুলো নিয়ে একটা কিছু করতে বেরিয়ে পড়ি। হয়তো ভোর হবার আগেই একটা ডিসিসান নিয়ে ফেলতুম—হল না। ওরা এসে ফেরত নিয়ে গেল। ভাবসাব দেখে মনে হল, আমার নার্ভের ওপর চাপ দিয়ে আমার কাছ থেকে কাজ বাগানোর ষড়যন্ত্র করেছিল ওরা। পরে ভাবলুম, ভীষণ বেঁচে গেছি—আবার ভাবলুম, কী যেন চান্স এসেছিল মিস করলুম।'

'তাহলে বোঝা যাচ্ছে, তুমি—যা ভাবছি, তা নও।' ..গৌতম অন্যমনস্ক-ভাবে বলল। 'তোমার মধ্যে শক্তি সাহস প্রচুরই আছে—শুধু হয়তো একটা দ্বিধা আপাতত সামনে এসে দাঁড়ায়, না কী! ওটাই তোমাকে ডিসিসান নিতে দ্যায় না। কিন্তু আমি—আমার কিচ্ছু নেই—কিচ্ছু না।।স্রেফ একটা ফাঁপা নলের মতন, খোসার মতন আমি আছি।'

রিমি হাসতে হাসতে বলল, 'ভীষণ দুঃখিত মানুষের মতন কথা বলছ কিন্তু। গৌতম, তোমার মধ্যে একটা বানানো দুঃখ আছে। সখ করে পুষেছ ওটা। বুঝলে? তুমি—তুমি...' রিমি কথা হাতড়াতে থাকল।

গৌতম বলল, 'ছেড়ে দাও। আমি একটা পুরোপুরি ভুল মানুষ।'

'ভুল মানুষ মানে?'

'যাকে বলা যায়, দা রং ম্যান।'

রিমি সকৌতুকে বলল, 'বরং নষ্ট মানুষ বলো।'

'হয়তো তাই।'

'কেন এরকম ভাবো নিজেকে?'

'আসলে হয়েছে কী জানো? পৃথিবীর সব ব্যাপার আমার চোখের সামনে ঘটছে, অথচ একটা কাচের ঘেরাটোপের মধ্যে থেকে সব দেখছি। তাই সবকিছুই অর্থহীন উদ্দেশ্যহীন বাজে ব্যাপার থাকে।...'

রিমি ওর হাত ধরে টানল। ...'চলো, ওই ব্রীজের ধারে বসি।'

গৌতম কথা বলতে বলতে এগোল। ...'আমার দাদা ছিল একজন বিপ্লবী যাদের বলা হয় নকশাল।'

রিমি কথা কেড়ে বলল, 'তোমার দাদা?'

'হ্যাঁ। আমরা দুভাই, এক বোন। ঝিমির কথা তোমাকে বলেছি—তোমার মতনই ভীষণ চঞ্চল...' গৌতম থেমে ওর দিকে তাকাল।

'শুনছি। নো কমেন্ট। বলে যাও।'

'জানি না, দাদা ঝিমিকে—তোমার যেমন হয়েছিল—কখনও রিভলবার রাখতে দিয়েছিল কি না। কিন্তু আমাকে একবার দিতে এসেছিল। আমি রাখিনি। কারণ আমার ভয় হচ্ছিল, অস্ত্রটা হয়তো আমি—বিশ্বাস করো—সত্যিসত্যি কিলার কিনা দেখতে, কিংবা হোয়েদার ইট ওয়াজ এ রাইট এ্যান্ড দা জেনুয়িন কিলার উইপন্—নিজের ওপর প্রয়োগ করে দেখতে চাইব। তুমি বুঝতে পারছ না রিমি, যার কাছে বাইরের জগতটাই খেলনা ঘরের মতন অবাস্তব, তার পক্ষে এটাই অনিবার্য হয়ে পড়তে পারত। তাই আমি দাদার কথা রাখিনি। দাদা আমাকে প্রচন্ড ঘৃণা করল, টের পাচ্ছিলুম। দাদা—এমন কি কথা বলতে বলতে হঠাৎ চড় মেরে বসেছিল আমার গালে। বলেছিল, তুই যদি আমার ছোট ভাই না হতিস, তাহলে তোকে চুপ করিয়ে দিতুম চিরকালের মতন। কারণ, তুই জানিস আমার কাছে কী আছে এবং আমি কী করতে চাই। ...তারপর অবশ্য দাদা অনেকবার আমাকে প্ররোচনা দিয়েছে। বলেছে, আয় সন্টু, জীবন মাত্র একবারের জন্য দেওয়া হয় প্রতিটি মানুষকে। এটা সমাজ বদলানোর কাজে লাগাই। দাদা দিনের পর দিন বলেছে, এই পচধরা স্বার্থপর নোংরা সমাজটা মানুষের জীবনের উপযোগী নয়। আয়, আমরা একে খতম করে ফেলি ..আমি হেসেছি চুপিচুপি। সমাজ, মানুষ,পৃথিবী—এসব খুব বড়ো আর ধারণাতীত ব্যাপার আমার কাছে। আমি কতটুকু? তাছাড়া বদলে যাওয়া সমাজকে আবার একদিন বদলানোর দরকার হবে না—আবার তথাকথিত 'শ্রেণীশত্রু'বা আবিষ্কৃত হবে না—এর কোন গ্যারান্টি আছে?' ...

রিমি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল, 'তোমার দাদা কোথায় এখন?'

গৌতম কেমন হাসল। ..'কেন?'

'এমনি জিজ্ঞেস করছি।'

'নেই।'

'নেই মানে?'

'গত বছর ঠিক এমনি সময় তাকে খুন করা হয়েছে।'

'সে কী।' বলে রিমি ওর কাঁধ আঁকড়ে ধরল।

গৌতম কোন কথা বলল না। সে আবার একটা সিগ্রেট ধরাল। চুপচাপ টানতে থাকল।

রিমি বলল, 'একটা কথা জানতে ইচ্ছা করে। বলবে?

'উঁ?' গৌতম নিছক সাড়া দিল।

'তোমার দাদাকে তুমি ভালবাসতে না?'

গৌতম চমকে উঠে বলল, 'কেন? দাদাকে ছোট ভাইরা তো ভালই বাসে। সহজাত প্রবৃত্তির মতন।'

'তোমার প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছে করে না? করেনি এতদিন?'

'কথাটা ভেবে আমি দেখিনি, রিমি।'

'কিন্তু প্রতিশোধের ইচ্ছেটাও তো সহজাত প্রবৃত্তির মতন হওয়া উচিত।'

'ইচ্ছে হওয়াটা সহজ। কিন্তু কাজটা কঠিন।' ...গৌতম হাসবার চেষ্টা করল।

'আমি হলে কঠিন কাজটাই বেছে নিতুম। তারপর...' রিমি চাপা স্বরে বলল কথাটা—এবং তাতে একটা খর হিংসার ঝাঁজ রয়েছে। ...'তারপর ভাবতুম প্রতাপগড় কিংবা চাকরি-বাকরির কথা।'

'যদি ঠাট্টা না হয়, তাহলে বলব তোমার কথাটা খুব চাইল্ডিশ!' গৌতম হেসে ফেলল।

'মোটেও না।' ...রিমি কঠিন স্বরে বলল। ...'তুমি জানতে না কারা তোমার দাদাকে খুন করেছে?'

'হয়তো জানতুম—হয়তো না।'

'হেঁয়ালি করো না, গৌতম। আমার গা জ্বালা করছে।'

'ওরা দাদাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে স্ট্যাব করেছিল। কারণ, ওদের মতে দাদা নাকি বিশ্বাসঘাতক।

করেছিল। একজন ট্রেটরকে ওরা চরম শাস্তি দিয়েছিল'... গৌতম অনামনস্কভাবে বইল। ...জানো? আমি কিন্তু টের পাচ্ছিলুম—দাদা কেমন যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে শেষের দিকে। গত জানুয়ারীতে প্রথম দাদার মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করি। কিন্তু কিছু বলিনি। তারপর দুটো মাস ও কেমন বিমর্ষ হয়ে থাকত। পুলিশের ভয়ে তো আগে সবসময় লুকিয়ে বেড়াত। কিন্তু তখন থেকে বেশির ভাগ সময় ওকে বাড়িতে দেখতে পেতুম। অবাক হতুম, পুলিশ কিছু করছে না দেখে। তারপর এক মার্চের বিকেলে তিনটি ছেলে—সবাই ওর এবং আমার পরিচিত—ওকে ডেকে নিয়ে গেল। তারপর...'

'সেই ছেলেগুলো এখন কোথায়, জানো?'

'দুজন পুলিশের গুলিতে মারা গেছে। অন্যজনের খবর জানিনে।'

হঠাৎ রিমি ওর কাঁধে একটু নাড়া দিয়ে হেসে বলল, 'থাক্। অনেকক্ষণ দুঃখ রাগহিংসেয় তোলপাড় হওয়া গেল। এবার এসো, আমরা অন্যকিছু বলি।'

গৌতম জ্বলন্ত সিগ্রেটটা খালের নিচে ফেলে দিয়ে বলল, 'রিমি, তুমি জানো—কেন তোমাকে আনা হয়েছে?'

'আনা হয়েছে মানে? পিসিমার হঠাৎ জামাইবাড়ি আসবার ইচ্ছে হল, তাই।'

'উঁহু! আমাকে ঠিক যেজন্যে এখানে পাঠানো হয়েছে, সেজন্যে তোমাকেও আনা হয়েছে। জঙ্গলে তোমাকে বলেছিলুম, আমি একজন নিষিদ্ধ মানুষ, মনে পড়ছে?'

'হ্যাঁ—বলেছিলে। তখন অবাক লেগেছিল।'

'পাড়ায় গন্ডগোল—পুলিশ ছেলেধরা হয়ে উঠেছে। তাই নিরাপত্তার জন্যে আমার সাবধানী পিতৃদেব আমাকে প্রতাপগড়ে নির্বাসনে দিয়েছেন।'

'অজ্ঞাতবাস করছ, বলো!' ...রিমি জোরে হেসে উঠল। ..'কিন্তু আমারটা তো '

'তোমারটাও প্রায় তাই। পাছে তুমি বিপ্লবী হয়ে যাও, তাই তোমারও নির্বাসন, রিমি।'

'ভ্যাট! কে বলল?'

'যেই বলুক, শুনলুম।'

'নিশ্চয় পিসিমা!' ...রিমি আবার রেগে গেল। 'ইস্! পেটে-পেটে কী সব ষড়যন্ত্র! তাই বুঝি কিছুদিন আগে জামাই-শাশুড়ি-মেয়ে মিলে অতসব কনফিডেনশিয়াল চিঠি চালাচালি হচ্ছিল! উরেব্বাস! আমি তো ভারী বোকা!'

'বোকা নও—তোমার মধ্যে আগুন আছে, রিমি। আগুন সংক্রামক, তাই আগুন সম্পর্কে সতর্কতা ভালো। তুমিও আমার মতন একজন নিষিদ্ধ মানুষ।'

রিমি কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারল না। ঠোঁট কামড়ে ধরল। খালের দিকে নিচের অন্ধকারে তাকিয়ে রইল। ওর মধ্যে চাপা উত্তেজনা ছটফট করছিল। তারপর হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল অভ্যাস মতো ...'কিন্তু নির্বাসনই বলো—কিংবা অজ্ঞাতবাস, আমরা খুব ভালোই কাটাচ্ছি এবং কাটাতে পারব মনে হচ্ছে। দুজনে চাকরি-বাকরি করব এক জায়গায়, ছুটির সময় একসঙ্গে বেড়াতে বেরোব। পুরো দিনটা ছুটি পেলে চলে যাব ওই জঙ্গলটায়—কিংবা কোন পাহাড়ে। উঃ, ভাবতে সুখে গলে পড়ছি গৌতম—সত্যি, ভাবা যায় না!'

'হু! গান-টান আনন্দ-টানন্দ প্রেম-ট্রেমে ভরিয়ে তোলা যেতে পারে!'

'এই! ঠাট্টা নয়—সিরিয়াসলি নাও!'

'নিলুম।'

রিমি ওর হাত ধরে বলল, 'বেশ। বলো—আমাদের কোন দুঃখ নেই।'

'বলছি। আমাদের কোন দুঃখ নেই।'

'আমরা ভীষণ সুখী।'

'আমরা ভীষণ সুখী।'

মাসিমা-মেসোমশাই দুজনেই গোড়ায় যতটা খুশি হয়েছিলেন, গৌতম ওঁদের কাছ থেকে চলে আসায় ঠিক ততটা অখুশি হবেন—এটাই স্বাভাবিক। গৌতম টের পেল, এর অন্যতম কারণ বিনি পয়সার একজন চমৎকার প্রাইভেট টিউটর হাতছাড়া হল।

সমিতির আপিসের লাগোয়া ঘরটা ভারি সুন্দর। সুন্দর সব দিকেই। প্রথমত নির্জনতা আছে পরিবেশে, দ্বিতীয়ত বর্ণাঢ্য ফুলের আয়োজন সামনে ও পিছনে। অদূরে কিছু বড় গাছের জটলা—যার নীচে শান্তিনিকেতনী ধাঁচে বেদী আছে, ফাংশন করার জায়গা। একটা প্লেটে লেখা রয়েছে 'পঞ্চবটি'। সবখানেই

সযত্ন রক্ষণাবেক্ষণের পরিচয় স্পষ্ট। আরও পিছনে পূর্ব সীমান্তে নদীতীর ঘিরে উঁচু বাঁধ আছে। তারও দুধারে অজস্র উঁচু ঝাঁকড়মাকড় গাছ। উজ্জ্বল সবুজ পাতায়-পাতায় বসন্তের রোদ আর হাওয়া ধ্রুপদী সঙ্গীতের স্বরলিপির মতন রহস্যময়তা এনেছে।

কাজ বলতে তেমন কী আর! অল্পস্বল্প হিসেব নিকেশ, দুচারটে চিঠিপত্তর লেখা, বাকি সময় রিমির সঙ্গে গুলতানি। অবশ্য অপর্ণার পিছন-পিছন মাঝেসাঝে ঘোরাঘুরি করতে হয়। মেয়েদের কুটির-শিল্প দেখে প্রশংসা করতে হয়। তাঁত ঘরে খটাখট মাকু চলে। গম্ভীর মুখে ওরা বাটিক শিল্প চর্চা করে। কোথাও নারকোল ছোবড়া থেকে কার্পেট বানানোর আয়োজন হয়। প্রত্যেক সেকসানে আলাদা আলাদা হিসেবপত্তরের ব্যবস্থা আছে। গৌতমের হাতে পৌঁছয় মোটামুটি সব ফিগারগুলো—বাস, এতেই তার দায়িত্বের সীমাবদ্ধতা। সর্বসাকুল্যে জনা চল্লিশ মেয়ের উৎপাদনক্ষমতা আর কতটুকু? অবশ্য টাকা পয়সা মেটানোর দিনটা যা খানিক ব্যস্ততা—সপ্তায় প্রতি শনিবার বিকেলে।

তবে রিমি বলেছিল, মুড্ড ঘুরে না যায়—সেটা ঠিকই। এলাকার তাবৎ যুবতী এখানে এসে জুটেছে। বেশির ভাগই অবিবাহিতা। খুব বেশি লেখাপড়া অনেকেই জানে না। রিমি বলেছিল, বিধবার সংখ্যা এক - সেও সত্যি। এবং এই যুবতীটি নাকি নগেন মিত্তিরের কী সম্পর্কের বোন।

চমকে উঠেছিল গৌতম। এখানেও নগেন মিত্তিরের গন্ধ! কী জানি কেন, সেই সকালে লোকটাকে দেখা অব্দি অদ্ভুত একটা অস্বস্তিতে তার মন ছমছম করে। এই ধরনের লোক সে কলকাতায় অনেক দেখেছে। কেউ রাজনীতির পান্ডা, কেউ পাড়ার মস্তানদের মুরুব্বি আবার কেউ স্রেফ ডাকু অর্থাৎ সমাজবিরোধী।।

গৌতম মন থেকে কিছুতেই নগেন মিত্তিরকে তাড়াতে পারে না। সুদীপ্ত সেনের সঙ্গে ভিতর ভিতর ইতিমধ্যে কতখানি লড়াই আরম্ভ হয়ে গেছে, তার জানতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সেন ফ্যামিলিকে দেখে সে সব বোঝবার কিছু উপায় নেই। তেমনি স্মার্ট হয়ে সুদীপ্ত সেন অাপিস যাচ্ছেন। তাঁর স্ত্রী যথোচিত বিশাল খোঁপা পরে প্রতিদিন সমিতিতে আসছেন—কাজকর্ম দেখছেন, ছোটাছুটি করছেন, এবং মুখে নিখুঁত পরিপাটি হাসির বিরাম নেই। আর রিমিও এ ব্যাপারে কোন হিন্ট দিতে পারে না। সে বলে, 'কই না তো! জামাইবাবু ওসব ব্যাপারে কোন কথা বলেন না। কিন্তু তোমার ওসবে মাথাব্যথা কেন? বেশ তো আছ!'

হ্যাঁ, বেশ আছে গৌতম। বাবার চিঠি এসে গেছে। খুব—খুব খুশি। ঝিমি লিখেছে—অবিশ্বাস্য! তুই গুল দিয়েছিস দাদা। আর শ্রীমতী রিমির কথা লিখেছিস—তিনি কি রিয়েল, না তোর স্রেফ ইম্যাজিনেশান? প্রেমে পড়েছিস, খুব ভালো করেছিস—কিন্তু খবর্দার, বিয়ে করে বসিস না। প্রেমজ বিবাহে অভিশাপ আছে।

ঝিমিটা বড্ড পাকা—এঁচড়ে তুলতুলে একেবারে। গৌতম হাসে। হাসবার সময় একটা নতুন অপরিচিত গর্ব নিজের মধ্যে টের পায় সে। রিমি তার অস্তিত্বে একটা রোদের মতন ঝলমল করে ওঠে। ক্রমশ তার মনে হয়, রিমি ছাড়া এই অতিকায় পৃথিবীতে তার বেঁচে থাকার কোন অর্থই থাকত না। এবং তার ফলে রিমির ভাবনা একপ্রকার জ্বরের মতন সারাক্ষণ তার মধ্যে লেগে থাকে। এই অবিশ্রান্ত মৃদু উষ্ণতার মধ্যে আরাম যতটা, ক্লান্তিও তত। সুখের সঙ্গে কী একটা গভীর দুঃখ হাত ধরাধরি করে মনের ওপর হেঁটে যেতে থাকে, নিরবচ্ছিন্নভাবে। ...

এক রোববার রিমির পিসিমা আর ছাড়লেন না। গৌতমকে সেই ভূগর্ভমন্দিরে নিয়ে যেতেই হবে। গাড়ির অসুবিধে নেই। জামাইয়ের গাড়িতে শাশুড়ী পুণ্য করতে যাবেন, খুব সামান্য ব্যাপার। রিমিও সঙ্গে চলল।

তিন মাইল রাস্তা ভারি চমৎকার। তারপর কাঁচা। ধুলো উঠতে থাকল প্রচুর। রিমি একটু গম্ভীর। মাঝখানে পিসিমা—দুপাশে ওরা বসেছে। তাই মন খুলে কথা বলা যাচ্ছে না। পিসিমা স্বভাবমতো বকবক করে চলেছেন সমানে। রিমি ভুরু কুঁচকে বাইরে তাকিয়ে আছে। একটা বাঁকের মুখে হঠাৎ সে চেঁচিয়ে উঠল— 'রোখকে, রোখকে!'

ড্রাইভার গাড়ি দাঁড় করাল। পিসিমা বললেন, 'কী হল হঠাৎ?'

রিমি দরজা খুলে নেমে গেল। এরা হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে। ব্যাপারটা আর কিছু নয়। গাড়ির পিছন ঘুরে অর্থাৎ গৌতম যেদিকে বসেছে, তার ওপাশে রাস্তার ধারে একটা ঝোপে অজস্র লালচে ফুল ফুটে আছে। নিতান্ত বুনো ফুল। রিমি পটাপট কিছু তুলে কিছু খোঁপায় গুঁজল। বাকিগুলো হাতে নিল। সোজা গৌতমের কাছে এসে বলল, 'সরে বসো—জায়গা দাও।'

পিসিমা সরল মনে বললেন, 'দেখ কান্ড! যেখানে ছিলি সেখানে আর না। এটুকুন জায়গায় নড়াচড়া করব কেমন করে?'

'পারবে।' রিমি নিঃসঙ্কোচে বলল। ...'দেখছ না, ওদিকে রিকশোর সার চলেছে—আর যা ধুলো!'

পিসিমা অনেক কষ্টে সরলেন। রিমি গৌতমের পাশে জায়গা নিয়ে বলল, 'বাপ্‌স! ওদিকে বসে ধুলোয় চাপা পড়ছিলুম!'

ড্রাইভার গম্ভীর মুখে বলল, 'খিড়কি বন্ধ করুন দিদি—তোবে ধুল লাগবে না।'

'হ্যাঁ—দম বন্ধ হয়ে মারা যাই আর কী। বেশ বলেছ।' ...রিমি বলল।

এতক্ষণে পিসিমার ঠোঁটে একটু হাসি ফুটল। দুহাত কপালে ঠেকিয়ে বিড়বিড় করে কী সব বলে জানালায় ঝুঁকে রইলেন।

গৌতম একটু হেসে একটা ফুল নিল রিমির হাত থেকে। ...'কী ফুল?'

'আমি বোটানি পড়িনি।'

বিমিও মিটিমিটি হাসছিল। গৌতম ফিসফিস করে বলল, 'বুঝেছি।'

'কী বুঝেছ?'

গৌতম ইশারায় বোঝাতে চাইল পিসিমার পানরসের ভয়ে রিমি এ ব্যাপারটা কবেছে। রিমি চাপা গলায় মন্তব্য করল, 'বুদ্ধু গৌতম আর কী ভাবতে পারে। যাক্ গে, শোন। আমি কিন্তু পাতালে প্রবেশ করছিনে। তুমি পিসিমাকে দর্শন করিয়ে আনবে। আমি গাড়িতে চুপচাপ বসে থাকব।'

ঠিক তাই করল রিমি। যা বোঝা যাচ্ছিল, একটা বড়ো পাহাড়ের ভিতর সুড়ঙ্গ করে মন্দির বানানো হয়েছে। এখানে কোন ইলেকট্রিক আলোর কথা ভাবা যায় না। বসতিহীন এলাকা। জঙ্গল আর পাহাড় চারদিকে। তবে পাতাল মন্দির দর্শনে প্রচুর মানুষ এসেছে নানা জায়গা থেকে। তাই বেশ ভিড় আছে। সামনেটা ধাপবন্দী পাথরে বাঁধানো বড়ো চত্বর। তারপর গুহামুখ। ভাস্কর্য হিসেবে অতুলনীয়। কিন্তু সুড়ঙ্গ পথ সংকীর্ণ। পাশাপাশি দুটো লোক যেতে-আসতে পারে। মাথার কাছে একটা কবে তাক—সেখানে মোম জ্বলে অল্প আলো ছড়াচ্ছে।

পিসিমা পিছনে, গৌতম আগে—পিসিমা ওর কাঁধ শক্ত করে ধবে আছেন। ধাপে ধাপে পাথুবে সিঁড়ি কখনও নিচে নেমেছে, কখনও বাঁক নিয়েছে—ভীষণ গা ছমছম করে। দম আটকে আসছে মনে হয়। খুব সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছে। লম্বা লাইন চলেছে দর্শনার্থীর—একটা নামছে, আবেকটা উঠছে অর্থাৎ বেরিয়ে আসছে। অস্বস্তিতে অস্থির হচ্ছিল গৌতম। পিসিমা যে ফেবার পাত্রী নন, তা জানা। দেবতাদর্শন করতে গিয়ে মাঝপথ থেকে ফিরে আসার কথা তাঁর পক্ষে ভাবাই যায় না। কিন্তু গৌতম তা পারে। ধর্ম-বিশ্বাস তাব নেই। অবশ্য এমন পাতালে মন্দির আর দেবতার অস্তিত্ব—তাব প্রতি একটা স্বাভাবিক কৌতূহল তার থাকা উচিৎ। কিন্তু কেন কে জানে, প্রচন্ড সন্ত্রাস তার হাত পা ঠান্ডা আর ভারি কবে ফেলছে। দর্শনার্থীর কেউ অস্ফুট, কেউ জোরে দেবতার নাম কবছে—জয়ধ্বনি দিচ্ছে। কেউ স্তোত্র পড়ছে। গুহার সুড়ঙ্গে সেইসব শব্দ গমগম করে বেজে উঠছে। বাতির অনুজ্জ্বল আলোয় মাঝে মাঝে বিহ্বল মুখগুলো ঝলসে উঠছে অন্ধকার থেকে। কী পাচ্ছে ওবা? কী পেয়ে ফিরে এল? কী পেতে চলেছে এই বিপদ-সঙ্কুল যাত্রায়? হয়তো আছে একটুকরো শিলামূর্তি, নয় আস্ত শিলাখন্ড। স্বর্ণমূর্তিও থাকতে পারে। কিন্তু এমন করে গিয়ে তা দেখায় কী মেলে, কী সে সুখ বা প্রশান্তি? গৌতম মাঝে মাঝে লোভী হয়ে পড়ছিল। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হচ্ছিল, বাইরের মুক্ত পৃথিবীতে এখন কতো আলো কতো হাওয়া! সেখানে রিমি তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। রিমি, রিমি, একান্তভাবে তারই রিমি! অথচ এখন এমনি করে দুর্গম পথে সিঁড়ি ভেঙে অন্ধকারে ঈশ্বর দেখতে যাওয়া! যদি হঠাৎ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে এই পুরনো পাহাড়টা!

ডাইনে বাঁক আবার। কুলঙ্গীতে লম্বা সোনালি মোম জ্বলছে। আবার ঝলসে উঠছে কিছু উত্তেজিত মুখ।

ফিরে আসা মুখগুলোর মধ্যে কয়েক সেকেন্ডের জন্যে একটা মুখ ভেসে উঠে পিছনের অন্ধকারে মিশে গেল। গৌতম থমকে দাঁড়াল।

পিসিমা ঠেলে দিলেন,'কী হল বাবা? থামলে কেন? চলো, চলো!'

পিছন থেকে লোকেরা তাড়া লাগাল, 'থামবেন না। এগিয়ে চলুন!'

ভুল দেখলো না তো গৌতম? পরের কয়েকটি মুহূর্ত সে নিঃসাড় হাঁটছিল। যেন স্বপ্নের মধ্যে, যেন ঘুমের ঘোরে—উদ্দেশ্যহীন যাত্রায়। তার সারা গা বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। এদিকে অন্ধকার

সুড়ঙ্গের মিছিল ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে পড়ছে। আওয়াজ বাড়ছে জয়ধ্বনির। আবার বাঁক এবং অদৃশ্য থেকে গমগমে গলায় কে বলে উঠল, 'সাবধান—নিচে নামতে হবে। সাবধান, হুঁসিয়ার!' সামনের লোকগুলোর মাথা আড়াল করছে দৃষ্টি—কিন্তু অস্পষ্ট দেখা গেল এক গোল গুহাতল রয়েছে—যার কেন্দ্রে দেবতার মূর্তি। দর্শনার্থীরা তাকে প্রদক্ষিণ করে বেরিয়ে যাচ্ছে। একটু পরেই দেখা গেল সেটা। সিঁদুরের ঘন উজ্জ্বলতায় ঢাকা একটা প্রতিমা—শুধু ওটুকুই দেখল গৌতম।

তারপর সে কীভাবে ফিরেছে, তার মনে নেই। সারাক্ষণ বারবার ভেসে উঠেছে সেই মুখটা—সরু গোঁফ, লম্বা জুলপি, কোঁচকানো ভুরুর নিচে জ্বলজ্বলে দুটো চোখ। এ স্বপ্ন ছাড়া কিছু হতে পারে না। বাইরের পৃথিবীতে এসে গৌতম জনসমাগমে খুঁজতে চেষ্টা করল সেই মুখটা। দেখতে পেল না আর। কিন্তু তখন তার শরীর শক্ত আর স্থির, হাতদুটো অজানতে মুঠো পাকিয়ে গেছে। গলার শিরাগুলো দড়ির মতন টানটান ফুলে উঠেছে। ...

পিসিমা রিমিকে নিয়ে পড়েছেন এতক্ষণে। হতচ্ছাড়ী মেয়েটা একেবারে ম্লেচ্ছ হয়ে গেছে—কী যে হারাল, জানল না! প্রসাদী একটুখানি ছেঁড়া ফুল আর সিঁদুরাঙা পাতা আস্ত দশটাকা প্রণামীতে পিসিমা কিনেছেন, রিমি তাই নিয়ে ওঁকে উত্যক্ত করল কিছুক্ষণ। তবে শেষ অব্দি গৌতম এবং রিমিকে প্রসাদের স্পর্শ নিতে হল মাথায়। তারপর পিসিমা গাড়িতে না উঠে প্রকাণ্ড নিমগাছের নিচে ধুলোতেই বসে পড়লেন। বললেন, 'কিছুক্ষণ বসি, বাবা। এখনও পা-দুটোর কাঁপুনি থামে না। ততক্ষণ তোমরা চা-ফা যা হয় কিছু খাবে তো খেয়ে নাও।'

রিমি চোখ টিপল গৌতমকে। তারপর হাঁটতে থাকল। গৌতম নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করল। এখানে ওখানে কিছু দোকানপাট রয়েছে আটচালায়। সম্ভবত তারা সন্ধ্যার দিকে যে-যার ডেরায় চলে যায়। তখন জায়গা শ্মশানের মতো নিঃঝুম হয়ে ওঠে। পুজোরী ঠাকুরের বাড়িটাই একমাত্র বসতি—পাহাড়ের গায়ে। তার ওপাশে একটা সরকারী ডাকবাংলো। নিচের দিকে একটা মস্তো ইঁদারা রয়েছে। ওখানটায় স্বভাবত ভিড় বেশি। রিমি বলল, 'পাহাড়ে চড়ব এসো।'

গৌতম কোন জবাব দিল না। পিছন-পিছন এগোল। মাঝে মাঝে সে চারপাশে তাকিয়ে সেই মুখটা খুঁজছিল। কিন্তু কোথাও কোন পাত্তা নেই।

পাহাড়টা অন্তত হাজার ফুটের বেশি উঁচু। মাত্র শ-দুই ফুট উঠেই রিমি হাঁপিয়ে পড়ল। একটা অংশ এখানে বিশাল ব্যালকনির মতো বেরিয়েছে পাহাড়ের গা থেকে। সেখানে দাঁড়িয়ে সে দেখল, গৌতম কিছু নিচে ভিড়ের দিকে তাকিয়ে আছে। রিমি ডাকল,'কী হল? এসো!'

গৌতম তখনও স্থির।

রিমির মনে হল যেন সে নেমে যাবার জন্যে গতি সঞ্চয় করছে—গৌতমের শরীরের ঝোঁকটা ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে যেন। রিমি একটু বিরক্ত হয়ে ফের ডাকল—'এসো! ওখানে দাঁড়িয়ে কী দেখছ?'

গৌতম এল না। তখন রিমি দৌড়ে নেমে গেল তার কাছে। কাঁধে খামচে মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'বাস! একেবারে তন্ময়! কী দেখছ, শুনি?'

গৌতম যখন মুখ ফেরাল তার দিকে, রিমি চমকে উঠল। গৌতমের মুখে--চেহারায় একজন অপরিচিত মানুষের আদল। তার দুচোখে উদ্‌ভ্রান্ত ভাব— চোখের সাদা অংশ লালচে দেখাচ্ছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। মুখের চামড়ায় রক্ত ফেটে পড়ছে যেন। দুটো হাত মুঠো পাকানো।

রিমি একটু কাঁপল অস্বস্তিতে। কী হয়েছে ওর? সে নিঃসঙ্কোচে দুকাঁধে হাত রেখে সামনে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে বলল, 'শরীর অসুখ করছে না তো? বললুম, সুড়ঙ্গে ঢুকো না। পিসিমার দায় পড়েছিল—সে একা যেত!'

গৌতম হাত সরিয়ে দিল নিঃশব্দে।

রিমি উদ্বিগ্নমুখে বলল, 'চলো—কুয়োর কাছে চলো শিগগির। মাথাটা ধুয়ে ফেলবে! অনেকের নাকি সুড়ঙ্গ-টুড়ঙ্গে ঢুকলে নার্ভের গণ্ডগোল হয়ে যায়। আমার এক বন্ধুর বাবা বোম্বে থেকে পুনা যাচ্ছিল—তারপর গাড়ি যেই না একটা সুড়ঙ্গে ঢোকে ...

গৌতম এবার আস্তে বলল, 'আমার কিছু হয়নি।'

'আলবাৎ হয়েছে।' ...রিমি হাসবার চেষ্টা করল। ...'খুব বীরত্ব বোঝা গেছে। চলো, বরং গাড়িতে যাওয়া যাক। ফ্লাস্কে চা এনেছি, খেলেই ঠিক হয়ে যাবে সব।'

গৌতম পাশের পাথরটার ওপর ধুপ করে বসে পড়ল। তারপর বলল, 'ভ্যাট্, কিছু না। এখানেই বসো।'

'উঁহু!' রিমি তাকে টানটানি করে ওঠাল ফের। ...'বলছি না, অত বীরত্ব অন্তত আমার সামনে না দেখালেও চলবে বাবা! বাঙালীর ছেলে একটা সুড়ঙ্গগুহায় ঢুকেই নার্ভগুলো খতম একেবারে!' সে প্রায় টানতে টানতে গৌতমকে নিয়ে চলল।

সমতলে এসে আবার থমকে দাঁড়াল গৌতম। তার ঠোঁট কাঁপছিল। চোখ দুটো তীব্র হয়ে সামনে আর দু'পাশে আলো ফেলছিল। অস্ফুটকণ্ঠে বিড়বিড় করছিল সে—'না, না—ঠিক। ভুল হতেই পারে না।'

রিমি এবার ক্ষেপে গিয়ে বলল, 'কী পাগলামি শুরু করলে বল তো! চারপাশে লোকেরা হাঁ করে তাকাচ্ছে। ভ্যাট্, কোন মানে হয় না।'

গৌতম একটু ঘুরে অদূরে খাবারের দোকানটা লক্ষ্য করল। একদল বাঙালী যুবক খাচ্ছিল, আর প্রচন্ড হাসাহাসি করছিল।

রিমি মৃদু ধাক্কা দিয়ে এগোল একা। ..'যা খুশি করো—আমি গাড়িতে গিয়ে বসছি।'

একটু পরে গৌতম হাঁটল। গাড়ির দরজা খুলে রিমির পাশে বসে পড়ল। কিন্তু কোন কথা বলল না। রিমিও বেশ গম্ভীর হয়ে গেছে। ড্রাইভার ঘুমোচ্ছিল এতক্ষণ। এবার পিছন ফিরে দেখে বলল, 'বড়ী মাইজী কাঁহা মেমসাব?'

রিমি আঙুল দিয়ে পিসিমাকে দেখাল। তারপর বলল, 'বড়ী মাইজীকো জলদি বোলাও না বাবা! আমার আর এখানে ভাল্লাগে না।'

ড্রাইভার হেলতে দুলতে এগোল নিমগাছটার দিকে। পিসিমা ততক্ষণে একদল বিশ্রামরত লোকের সঙ্গে চুটিয়ে গপ্পসপ্প করতে ব্যস্ত।

সারাপথ গৌতম আর রিমি গম্ভীর। পিসিমাই এ পুণ্যযাত্রার বর্ণনা দিলেন। বিবিধ মাহাত্ম্য প্রচার করলেন। সুদীপ্ত সেনের বাংলায় পৌঁছতে বেলা তখন প্রায় একটা বেজে গেছে। গৌতম রিমি ও পিসিমার উদ্দেশ্যে শুধু 'আসি' বলে হনহন্ করে নিজের ডেরায় চলে গেল।

সমিতিতে কাজ করে এমন একজন প্রৌঢ়া গৌতমের রান্না করে দিয়ে যায়। মাসে-মাসে তাকে কিছু টাকা দিতে হয়। কিচেনের ডুপ্লিকেট চাবি মেয়েটির কাছে থাকে। গৌতম স্নান করবে ভেবেছিল, কিন্তু ভালো লাগল না। কিছু খেতেও ইচ্ছে করল না। ভাতের গ্রাস দু-চারবার মুখে তুলে সে সব রেখে উঠে পড়ল।

চুপচাপ শুয়ে রইল সে। পাতাল মন্দিরের সুড়ঙ্গপথে স্বপন বোসকেই সে দেখেছে, এতে কোন ভুল নেই। বয়সে তার চেয়ে কিছু বড়ো, কিন্তু তার চেয়ে রোগা হালকা গড়ন স্বপন বোসের। সেই সূঁচলো গোঁফ আর লম্বা জুলপি, সামনে কপালে নামানো ছোট চুল, সরু খাড়া নাক আর জ্বলজ্বলে পিঙ্গল চোখ—একটুও ভুল হবার নয়।

স্বপন বোস তাকে লক্ষ্য করেনি। করলে সেও কি গৌতমের মতো চমকে উঠত, অস্থির হত? সম্ভবত নয়। কিছুই ঘটত না ওর। বরং—হয়তো হেলাফেলায় হাসত, কথা না বললেও ঠোঁটে স্পষ্ট ফুটে উঠত ব্যঙ্গের ভাব। সে হয়তো, এই গৌতম নামক নিরীহ নির্লিপ্ত ছেলেটিকে করুণা করত।

হ্যাঁ, করুণা। ...

গৌতম উঠে বসল ধুড়মুড় করে। জানালার বাইরে তাকাল বিভ্রান্তভাবে। বিকেল নামছে। বাগানের ছায়া লম্বাটে হয়ে তার ঘর ছুঁয়েছে। পাখিগুলো ছোটাছুটি করছে। ফুলগুলো বসন্তকালের হাওয়া মেখে দুলে-দুলে উঠছে—যেন প্রকৃতির অনন্ত সুখ গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়তে চায় নির্জন ঘাসের মাঠে। এই শান্ত সহজ প্রাকৃতিক প্রশান্তির ওপর ওই ধাবমান ছায়াগুলোর মতো একটা অশুভ শক্তি ঘুরঘুর করছে। ছত্রখান করে ফেলবে সে সব সামঞ্জস্য। শেষ হয়ে যাবে সব সাজানো বাগান।

কী করবে সে—কী করতে পারে গৌতম? অথচ বুকের ভেতর গুরগুর করে কী মেঘ ডাকছে। বিদ্যুৎ ঝিলিক দিচ্ছে। মস্তিষ্কের কোষে কোষে অজস্র লাল বাল্ব জ্বলে উঠছে—কম্পিউটার যন্ত্রের বিপদজ্ঞাপক আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

আবার ক্লান্ত হয়ে ভেঙে পড়ল সে। ধুপ করে গড়িয়ে গেল বিছানায়। সে এত দুর্বল, এত অশক্ত—তার কিছু করার ক্ষমতা নেই। আর বরাবর তো সে দেখেছে এবং চিনেছে এই পৃথিবীর আর মানুষেরা কত বিশাল—যার কাছে সে দারুণভাবে অসহায়!

চোখ বুজে রইল গৌতম। কতক্ষণ পরে সে টের পেল একটানা আবেগের তোলপাড় এবার তার চোখদুটোকে জলে ভাসিয়ে দিচ্ছে। আজ সেই ভিজে অন্ধকারময় পর্দায় ভেসে উঠল একটি মানুষ।

হাঁফাতে-হাঁফাতে ছুটে এল মানুষটা—সারা গায়ে রক্ত। চেঁচিয়ে ডাকতে থাকল সে—' গৌতম, গৌতম গৌতম!

'দাদা, তুমি?'

'হ্যাঁ আমি।'

'কী চাও?'

'তুই বেঁচে আছিস গৌতম, আমি মৃতদের একজন।'

'হয়তো বেঁচে আছি। কিন্তু কী চাও তুমি মৃত-মানুষ?'

'প্রতিশোধ!'

'দাদা।'

'গৌতম, আমি তোর মধ্যে আছি। তোর ওই বেঁচে থাকা হাত দিয়ে আমি প্রতিশোধ চাই।'

'কিন্তু তুমি যে ট্রেটব—বিশ্বাসঘাতক মানুষ, দাদা। ওরা এই নোংরাপচা পৃথিবী আর ক্ষয়রোগী মানুষগুলো বদলাতে চেয়েছিল। তুমি....'

'মিথ্যে, মিথ্যে! ওদের ভুল থেকে বাঁচাতে চেয়েছিলুম! এমন করে কিছু বদলায় না—আমি টের পেয়েছিলুম। তাছাড়া উদ্দেশ্যহীন মনে হচ্ছিল অতো রক্ত—ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম।'

'এ তোমার ভীরুতা, ক্লীবত্ব।'

'গৌতম! আমি তোর দাদা—একই রক্ত তোর গায়ে আছে।'

'আমি কী করব?'

'লুকোস না গৌতম! আমার মৃত্যুর পর দিনের পর দিন তোর মনের জ্বালা—তোর প্রতিশোধের তীব্র ইচ্ছে—সব আমি টের পেতুম। কতদিন তুই স্বপন বোসের বাড়ির আশেপাশে ঘুরে বেড়াতিস ভুলে গেলি?'

'না- না। সেজন্যে নয়। আমার শুধু কৌতূহল হত। খুনীগুলোকে দেখতে ইচ্ছে করত। মনে হত, স্বপন বোসকে মুখোমুখি বলি, কী লাভ হ'ল তোমার বিপ্লবের—নাকি তোমার মধ্যেকার সেই চিরকালীন আদিম হিংস্রতার ফসল এই নিষ্ঠুর হত্যাকান্ড? কিন্তু তুমি তো লেখাপড়াজানা বিবেকবান সুসভ্য মানুষ, স্বপনবাবু!'

'গৌতম, বুকনি রাখ। ওরা উদ্ভট। প্রকৃতির আইন না মেনে কারো রেহাই নেই। এমন সুযোগ আর পাবিনে -এখানে তুই এখন যথেষ্ট অপরিচিত। যে উদ্দেশ্যেই হোক স্বপন বোস এখানে এসেছে। তাকে...'

দাদাকে ঠেলে সামনে এল বাবার মূর্তি।....'খর্বদার গৌতম, খর্বদার। যে গেছে সে আর ফিরে আসে না। সামনে তোর তাজা জীবন। মনে রাখিস বাবা, এ জীবনের সদ্ব্যবহার করাই তোর ব্রত।'

পাশে এসে দাঁড়ালেন মা।....হ্যাঁ গৌতম, সোনা আমার। ক্ষমা করতে শেখো মানুষকে। করুণা করো পাপীতাপীদের। তোমার নাম রেখেছিলুম গৌতম—অনেক আশায় সাধে বিশ্বাসে। আমার চোখে যে জল পড়ছে, আমার বুকে যে দুঃখের জ্বালা—তা আরেক হতভাগিনীকে দিয়ে কী লাভ হবে বাবা?'

হঠাৎ দুজনকে দুপাশে সরিয়ে এগিয়ে এল ঝিমি। এলোমেলো চুল, জ্বলন্ত দৃষ্টি, নাসারন্ধ্র কাঁপছে। চেঁচিয়ে উঠল, 'গৌতম, গৌতম! কারো কথা শুনিস নে। তুই একদিন অনেক রাতে চুপি চুপি বলিছিলি—যদি এখন এ মুহূর্তে একজনকে সামনাসামনি পেতুম, তাহলে....'

গৌতম হাসল। কিন্তু পরক্ষণে কী বলেছিলুম ঝিমি? বলেছিলুম, ভ্যাট আমি ওসব কিছুই পারিনে—পারবও না।'

ঝিমি গর্জাল।...'ভীতু! কাপুরুষ! তুই ছেলে হয়ে যা পারিস নি—যা পারছিস নে—আমি মেয়ে হয়েও তা পারি। দেখবি—কোন না কোনদিন...'

গৌতম বলল, 'চুপ। রিমি কী বলে শুনি।'

ঝিমি ঠোঁট উল্টে বলল, 'ওসব ন্যাকান্যাকা প্রেমবিলাসিনী ঠুনকো মেয়েগুলো কী বলে আমার জানা আছে।'

'শোন না বাবা, কী বলে সে। রিমি, তুমি কী বলো?'

রিমিকে দেখতে পেল না গৌতম। তার সামনে চারটি মূর্তি এবার স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে। কয়েক মুহূর্ত পরে রিমি ভেসে এল। বলল, 'আমি? আমি তো সেদিন বলেই দিয়েছি, মনে পড়ছে না? আমি নিজে হলে যত কঠিন হোক, প্রতিশোধ নিতে ছাড়তুম না।'

গৌতম দুঃখিত ভাবে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর প্রচন্ড চেষ্টায় আচমকা হো হো করে হেসে উঠল। বিছানা থেকে হাসির চোখে উঠে বসল সে।

সেই সময় তার বদ্ধ দরজায় টোকা পড়ল।

মুহূর্তে সব গোলমেলে ভাবটা ঘুচে গেল গৌতমের। গম্ভীর মুখে যে দরজা খুলে দেখল, সত্যিকারের রিমি এসে দাঁড়িয়ে আছে। রিমিও গম্ভীর। নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে পড়ল সে।

একটু পরে রিমি বলল, 'বেশিক্ষণ ঘরে বসতে ভাল্লাগে না। বেরোব।'.... সে গৌতমের মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাকিয়ে ফের বলল, 'তুমি কি হঠাৎ পাগলটাগল হয়ে যাচ্ছ নাকি? একা অত হাসছিলে কেন? কী হয়েছে তোমার?'

গৌতম আস্তে বলল, 'কী জানি। আমি ভেবে পাচ্ছিনে কী করব। রিমি আজ সেই পাতাল মন্দিরের সুড়ঙ্গে স্বপন বোসকে দেখলুম মনে হল।'

রিমি ভুরু কুঁচকে বললে, 'কে স্বপন বোস?'

'আমার দাদাকে যারা খুন করেছিল, তাদের মধ্যে এই লোকটাই বেচে আছে।

'সে কী!' রিমি চমকে উঠল।

'হ্যাঁ---আমার ভুল হতে পারে না। তাকেই দেখেছি সুড়ঙ্গের মধ্যে।'

'যাঃ, সে মন্দিরে ঢুকতে যাবে কেন?'

'সেটাই বুঝতে পারছিনে। ও তো ধর্মটর্ম মানে না—রাজনৈতিক আদর্শ হয়তো আছে—ধরে নিচ্ছি, অবশ্যই আছে। ওর সে আদর্শে ধর্ম-ঈশ্বর বিশ্বাসের কোন জায়গা নেই।'

'তুমিও তো ধর্ম মানো না। তুমি কেন মন্দিরে গিয়েছিলে?'....রিমি একটু হালকা ভাবে বলল, কথাটা।

'ঠিক বলেছ। স্বপন বোস তাহলে কোন আত্মীয়-টাত্মীয়কে. '

'ভ্যাট্। তুমি তো বলেছিলে সে ফেরারী আসামী। পুলিশ তাকে পেলেই ধরবে।'

'তাহলে ও মন্দিরে ঢুকেছিল কেন?'

'আমারও সেই প্রশ্ন।'

'কিন্তু আমি তো ঠিক দেখেছি তাকে।'

'ভুল দেখেছ। একই ধাঁচের চেহারা অনেকের থাকতে পারে।'

'অসম্ভব রিমি, অসম্ভব। এ ভুল আমার হয় না।'

'কেন হয় না? সবার হতে পারে।'

'না।' গৌতম শক্তভাবে বলল।...'আমার একটা অদ্ভুত অভ্যাস আছে। মানুষের মুখ কখনো ভুলি নে। খুব ছোটবেলায় যে লোকটির কাছে এসপ্লানেডে বাদামভাজা কিনে খেয়েছিলুম এক বর্ষার বিকেলে, তার মুখটাও স্পষ্ট মনে আছে। তুমি শুনলে হাসবে, বারবার আমার অভ্যাস—সব চেনা মুখ একের পর এক দাঁড় করিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলি আমি--অবশ্য রাতের বিছানায়।'

'সে তো হাজার হাজার, লক্ষও হতে পারে। এ অব্দি কত মানুষ দেখেছি আমরা।'

গৌতম বলল, ' না রিমি—অত মানুষ আমরা দেখিনে। লক্ষ মানুষ আমাদের সামনে দিনরাত আসে যায়, তাদের সবাইকে আমরা মোটেও দেখিনে। মাত্র কিছু দেখি— অর্থাৎ অবজার্ভ করি। বাকি সবাই আমাদের দৃষ্টি পিছলে জড়পিন্ডের মতো বেরিয়ে যায়—আটকায় না। আরো স্পষ্ট বলা যায়—যে সব মানুষের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক গড়ে ওঠে, কয়েকমুহূর্ত অথবা তারও বেশি সময়ের জন্যে, তাদের আমরা জীবন্ত মানুষ হিসাবেই দেখি। তাঁদের মধ্যে আবার যাদের সম্পর্কে একটু বেশি মানসিক আবেগ জড়িত, তাদের মনে রাখি। বাকি অনেককে ভুলেও যাই।'

রিমি দুলে উঠল। 'সত্যি বলেছ তো! ভেবে দেখিনি ব্যাপারটা।'

'হ্যাঁ—তাই স্বপন বোসকে আমার ভুল হয়নি।'

'কিন্তু ওখানে ঢুকেছিল কেন?'

'আবার গোড়ার প্রশ্নে ফিরে আসছি তাহলে। রিমি, আমার কী করা উচিত?'

রিমি একটু চুপ করে থেকে বলল, 'যদি সত্যি সে এখানে এসে থাকে, ফের চোখে পড়া অসম্ভব নয়। আরেকবার দেখা হোক, তারপর ভেবে দেখবে—কী করা যেতে পারে।'

'যদি সত্যি তাকে ফের আবিষ্কার করি এখানে, কী করব রিমি?'

'আমার মনে হয়—বরং পুলিশে ধরিয়ে দিলেই ব্যস, সব চুকে গেল।'

'কিন্তু সেদিন তুমি বলেছিলে প্রতিশোধ নিতে।'

রিমি একটু হাসল। ... 'ওটা ঝোঁকের বশে বলেছিলুম। সত্যি বল তো, প্রতিশোধ কথাটার কোন মানে হয়? সভ্য মানুষের কাছে এর কোন অ্যাপিল থাকা উচিত নয়।'

গৌতম নিজের দুটো হাত বিছিয়ে লক্ষ্য করতে করতে বলল, 'আমি কি সত্যি সভ্য মানুষ, রিমি?'

রিমি চোখ পিটপিট করে মিটমিট হেসে বলল, 'অন্তত যতটা অসভ্যতা মাঝে মাঝে আমার পছন্দ, ততটা নও।' ....বলে সে ওর কাঁধে হাত রাখলো... 'এবার ওঠ। বরং বাইরে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে এসো—নার্ভ ঠান্ডা হবে। আশ্চর্য! তুমিই এ্যাদ্দিন পুরো ডিসকমিউনিকেটেড ম্যান বলে জাহির করছিলে!'

'হ্যাঁ, একটা নিঃসাড়তা ছিল আমার মধ্যে। লম্বা ঘুমের মতো।'.... গৌতম মৃদু হাসল।...'তুমিই প্রথম জাগিয়ে দিলে আমাকে। তারপর কে এক স্বপন বোস—উঃ, হরিবল্!'

'ওঠ। বেরোই।'

'কিছু ভাল্লাগে না, রিমি।'

'ভ্যাট্। ওঠ বলছি।'....রিমি উঠে দাঁড়িয়ে তাকে টানাটানি শুরু করল। অগত্যা গৌতমকে উঠতেই হল।...

আরও কয়েকটা দিন যেতে যেতে স্বপন বোস মিথ্যে হয়ে গেল গৌতমের কাছে। না, প্রতাপগড়ে সে আসে নি। পাতালমন্দিরের সুড়ঙ্গে একটা ভুল হয়েছিল কিভাবে। সকাল বিকেল ফাঁক পেলেই গৌতম ঘোরাঘুরি করেছে এখানে ওখানে। রিমির আড়ালে অনেক জায়গায় সে গেছে। স্বপন বোসের মুখটা আর দেখতে পায়নি। একদিন স্টেশন অব্দি একটা লোককে অনুসরণ করেছিল—পিছন থেকে লোকটাকে স্বপন বোসের মত দেখাচ্ছিল, তাই। সামনাসামনি গিয়ে মুখ দেখা অব্দি গৌতম হেঁটেছিল। কিন্তু না—সে অন্য লোক। এবং এমন ঘটনা একাধিকবার ঘটেছে। পার্কে রিমির সঙ্গে বসে থাকতে থাকতে চমকে উঠে কোন লোকের দিকে তাকিয়েছে—কখনও কাছেও গিয়ে দেখেছে, সব ভিন্ন মানুষ। রিমি টের পেয়ে হেসেছে, কিংবা রাগ দেখিয়েছে। অবশেষে নিজে থেকে গৌতম নিশ্চিন্ত হয়েছিল, স্বপন বোস যদিও কোন কারণে সেই সুড়ঙ্গে ঢুকেছিল—তারপরই চলে গেছে প্রতাপগড় এলাকা ছেড়ে। কিংবা অন্যদিকে—তাকে দেখতে পাওয়াটাই ভুল একটা।

ইতিমধ্যে রিমির পিসিমা কলকাতা ফিরে গেলেন। যাবার সময় গৌতমকে প্রচুর স্নেহ এবং উপদেশ দিয়ে গেলেন। তার মধ্যে রিমি সংক্রান্ত ব্যাপারও ছিল—সচরাচর যা থাকা উচিত। রিমি আর গৌতম চমৎকার জুটি নিশ্চয়। অন্তত মনে মনে সেনপরিবার কী দাঁড় করিয়েছে এতদিনে, পিসিমার আভাষে তা ফুটে উঠেছিলে। তবে বাধা আছে কিছু—অসবর্ণ হয়ে যায় যে! সামাজিক রীতি বলে একটা কথা আছে। গৌতমের বাবাকে বলার সাহস পিসিমার নেই। তবে মা বাপ হারা মেয়ে...এবং কিছু কান্না দিয়ে অনেক কথা বোঝাতে চেয়েছিলেন পিসিমা।

যাই হোক, সেন দম্পতি পুরো প্রশ্রয় দিচ্ছেন—সেটা স্পষ্ট। সমিতিতে গৌতম যে নিছক কর্মচারী নয়, অপর্ণা তা সতত টের পাইয়ে দিয়েছে সবাইকে। এবং ক্রমশ এইসবের ফলে সবাই জেনেছে রিমি অর্থাৎ সুদীপ্ত সেনের শালীর সঙ্গে গৌতমবাবুর বিয়ে হবে। সমিতির মেয়েরা আড়ালে গৌতমকে জামাইবাবু বলেও ডাকতে শুরু করেছে।

এ খবর গৌতমের মেসোমশাইর ফ্যামিলিতেও পৌঁছেছিল। প্রায়ই মঞ্জু এসে গৌতমকে ডেকে যায়—মা কিংবা বাবা ডেকেছে। আলস্যমিশ্রিত সংকোচে গৌতমের যাওয়া হয় না। রিমি বলে, 'তুমি ভারি অদ্ভুত তো। ওঁরা এত করে ডেকে পাঠাচ্ছেন, তুমি যাচ্ছ না কেন? ভাববেন, জামাইবাবুই যেতে দিচ্ছেন না।'

গৌতম বলে, 'সেও সত্যি। কিন্তু ভ্যাট! গেলেই হয়তো তোমার জামাইবাবু ভার্সেস নগেন মিত্তির শুনতে হবে—সে আমি জানি। তাই ভাল্লাগে না যেতে।'

রিমি বলে, 'তুমি ভীষণ অকৃতজ্ঞ।' .

'কেন, কেন?'

'নয়? ওঁদের ওখানেই তো এসেছিলে। এখন চাকরি পেয়ে...'

গৌতম তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, 'তুমি আমার বিবেকের কাঁটা হয়ে উঠেছ রিমি। বড্ড মুশকিলে ফেলে দিচ্ছ অনেকসময়।'

বিমি বলে, 'বেশ – তোমাব খুসি।'

এবং এসবেব ফলেই একদিন—অনেকদিন পরে মেসোমশাযেব কোযার্টাবে যেতে হল তাকে। বিমিকে নিতে চেয়েছিল সঙ্গে—বিমি গেল না।

যা আশা কবেছিল, প্রথম চোটে শোভামাসিমাব সুতীব্র ঝাঁঝালো অভিযোগ চুপচাপ গিলতে হল বেশ কিছুক্ষণ। এক সময তিনি যেন ক্লান্ত হযেই ভিন্ন কথা পাডলেন। সে কথাও কম তীব্র নয। 'ওই বাঁদ্যাব মেযেটাকে বিযে কবছ বামুন হযে? বাবা-মা আছেন, না নেই মাথাব ওপব? কী ভেবেছ কী তুমি? ওই ধিঙ্গি নাটুকে মেযে, কত সব বদনাম শুনছি মাস যেতে না যেতে।'

গৌতম একটু হেসে বলল,'বদনাম?'

'হু —বদনাম বই কি। ও মেযেব চবিত্র মোটেও ভালো না। কলকাতায একশো কেলেঙ্কাবি কবেছে বলেই না ওকে প্রতাপগডে এনে বাঁচাতে হযেছে—জানো সে খবব?'

গৌতম নিবীহভাবে বলল 'না তো।'

'তবে শোন আমাব কাছে—শুনে যাও। জেনে শুনে তো নিজেব বোনেব পেটেব ছেলেকে বিষ খেতে দিতে পাবিনে।' চাপা গলায শোভা বললেন। ' মেযেটিকে পুলিশ এ্যাবেস্ট কবেছিল। তিন বাত্রিব হাজতে বেখেছিল। বন্দুক না পিস্তল পেযেছিল ওব কাছে। অনেক ধবাধবি কবে ছেডে দায। নাকি দলেব নামধাম সব ফাঁস কবে দিযেছিল পুলিশেব কাছে তাই। তাবপব ওব পিসেমশাই তাড়াতাড়ি ওকে প্রতাপগডে জামাইযেব কাছে এনে বেখেছে। এখন--যাদেব বুকে হন্তা দিযে নামধাম বলে দিযেছে তাবা কি ওকে ছাডবে ভেবেছ? পৃথিবীব যে প্রান্তে থাক গর্তেই লুকোক— দেখবে একদিন না একদিন গন্ধ শুকে শুঁকে ঠিকই হাজিব হবে। ওব সঙ্গে একেবাবে মিশো না। শত হাত দূবে দূবে থাকো।

মেসোমশাই এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিলেন। ফিসফিস কবে বলে উঠলেন 'আমবা তোমাব নিজেব লোক। তাই সাবধান কবে দিচ্ছি বাবা। আমবা—মানে তোমাদেব ফ্যামিলি আবাব ঘবপোডা গব কিনা—সিঁদুবে মেঘ দেখলেই ভয কবে। বঞ্জুব ব্যাপাবটা কি ভুলে যাওযা ঠিক হবে?'

গৌতম শিউবে উঠেছিল। এবাব একটা চিৎকাব বুকেব ভিতব ঘবপাক খেতে খেতে কণ্ঠনালীতে পৌছে উত্তেজনাব চাপে তলিযে গেল। 'আপনাবা কোত্থেকে এসব শুনলেন?' কোনবকমে এটকুই উচ্চাবণ কবতে পাবল সে।

শোভামাসিমা বললেন, 'কথা কি চাপা থাকে সন্টু? থাকে না। শুধু সমযেব হেবফেব। কলকাতাব কথা প্রতাপগডে আসতে দেবী লাগে না আজকাল।'

কে বলল? গৌতম একটু রূঢভাবে প্রশ্নটা কবল ফেব।

মেসোমশাই একটু হেসে বললেন, 'ইযে — তা বলো না কাকেও। নগেন মিস্ত্রিব সব খবব কীভাবে যোগাড কবেছে। ও শালা নানান লাইনে ঘোবে— বাজনীতিব পাণ্ডাও বটে। সেনকে চিট কবতে এ খবব যোগাড কবেছে—

শোভা বললেন 'অত লুকোছাপা না কবে সোজা বলে দাও না বাবা। সন্টু পেটেব ছেলে আমাদেব। ওব ভালোব জন্যেই লুকোব না। বলো, বলে দাও।'

ববীনবাবু আবও চাপা গলায বললেন, 'নগেন শালা সেদিন বাত্তিবে একটা লোককে সঙ্গে এনেছিল – বললে, বাত্তিবটাব মতো ওকে জাযগা দিতে হবে। গা ঢাকা দিযে বেডাচ্ছে পুলিশেব ভযে। শালাব আত্মীয টাত্মীয হবে। তা বাবা, আমাব তো কেঁচোব দশা এখন—ওব কথা না বেখে উপায নেই। দিলুম জাযগা। পবে নগেন কথায কথায আমাকে বললে সেনসাহেবেব শালীব খবব। বুঝলুম ওই লোকটাব কাছেই শুনেছে সব। নগেনেব কথাতেই টেব পেলুম, ফেবাবী লোকটা নকশাল না হযে যায না—এদিকে সেনসাযেবেব শালীও তো এই দলেব সঙ্গে জডিত ছিল। সুতবাং অঙ্ক ঠিক মিলে যাচ্ছে।'

গৌতম ঠান্ডা মুখে বলল, সেই লোকটাব চেহাবা কীবকম?

শোভা উত্তেজিত হযে বললেন, 'থাক , জাঁক কবে লাভ নেই। কেন? পুলিশে ধবিযে দেবে নাকি? খবর্দাব --তুমিও মববে, আমবাও গুষ্টিসুদ্ধু বিনাশ হবো।'

গৌতম হাসবাব চেষ্টা কবল। 'না এমনি বলছি '

ববীনবাবু বললেন, 'তুমি চিনবে ভাবছ? সে গুডে বালি। ওবা ভোল বদলাতে ওস্তাদ। আমাব বাডি এল তখন তো দিব্যি ইযং চেহাবা, গোঁফ জুলফি ছোট ছোট চুল কপালঢাকা—এখন হযতো

দেখবে দাড়ি জটাজুট...'

গৌতম স্প্রিঙের মতো সোজা হয়ে উঠল।...'আমি চলি।'

'যাবে? হ্যাঁ — দেখো, খুব সাবধানে থাকবে। আর খবর্দার—যা বলেছি।' শোভা বলতে বলতে গৌতম বারান্দা পেরিয়ে গেল।

রাস্তায় উঠে সে একটু দাঁড়াল। প্রথমে নগেন মিস্ত্রিরের কাছে—না রিমির, সে ঠিক করতে পারল না। শান্ত হবার চেষ্টা করল সে। কিন্তু ক্রমাগত সামনে পিছনে, ডাইনে ও বাঁয়ে সব দৃশ্য আর স্পন্দন তার কাছ থেকে অর্থহীন সুদূরতায় পর্যবসিত হল। পৃথিবীটা অবাস্তব মনে হল। সে চারপাশে হৃত বাস্তবতা ঢুড়ে হন্যে হল—কিন্তু সবই নিষ্ঠুরভাবে আনরিয়েলিটি দিয়ে গড়া! আজকের মতো অসহায় নিজেকে কখনো মনে হয়নি তার।

গোঁফ জুলফি সামনে কপালঢাকা ছোট চুল। হুঁ, স্বপন বোস। সব এ মুহূর্তে অবাস্তব হয়ে উঠলেও স্বপন বোস নিখুঁত বাস্তব—মৃতদের মধ্যে একটা জীবিত সত্তা।

সে কি এবার রিমিকে হত্যা করতে প্রতাপগড় পাড়ি দিয়েছে? তাই কি রিমিকে অনুসরণ করে পাতাল মন্দিরে হাজির হয়েছিল? কিন্তু সুড়ঙ্গে তো রিমি ঢোকে নি—তাহলে সে ঢুকল কেন? নাকি গৌতমের চোখে পড়ার সম্ভাবনা এড়াতে ওখানে ঢুকে পড়েছিল? রিমি তখন বাইরে একা ছিল। ইস, কী সাংঘাতিক বিপদের মুখে দাঁড়িয়েছিল রিমি।

হয়তো প্রকাশ্যে এতসব লোকজনের মধ্যে রিমিকে খুন করার ঝুঁকি নিতে চায়নি স্বপন বোস।

হঠাৎ চমকে উঠল গৌতম। রিমি এখন কোথায় আছে? একা কোথাও সে বেরোবে না সম্ভবত—অন্তত গৌতমকে সঙ্গে না নিয়ে।

গৌতম হনহন করে প্রায় দৌড়ে চলল।

রিমি স্বপন বোসকে চেনে না বলছে। হয়তো সত্যি চেনে না। কিংবা সব জেনেও তাকে মিথ্যে বলেছে। আচ্ছা, ইদানীং রিমির মধ্যে কি কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করা যাচ্ছে?

মনে হয়—আবার হয়ও না। রিমি কিছুদিন বাইরে ঘোরাঘুরি করতে আর সাহস দেখাচ্ছে না যেন।

উঁহু — এই তো গতকাল পার্কে গিয়েছিল। আগামীকাল রোববার স্যাংচুয়ারীতে মেয়েদের পিকনিক করার কথা—রিমিই উদ্যোক্তা।

কিছু বোঝা যায় না।..

রিমি আস্তে আস্তে বলল, 'আসলে আমি পিছনটা পুরো ভুলতে চেয়েছিলুম—তুমি আমাকে ভুল বুঝো না গৌতম। জেনেছিলুম, আমি খুবই সাধারণ মেয়ে। কাকেও ভালবাসা ছাড়া আর কোন কিছুর ক্ষমতা আমার মধ্যে নেই। হ্যাঁ—তোমার দাদার মতোই আমি ওদের কাছে একজন ট্রেটর—বিশ্বাসঘাতক। কিন্তু এ ছাড়া আমার উপায় ছিল না। রক্তের পথ কিংবা আদর্শের জন্যে লড়াই যাই বলো—ও আমার আকস্মিক আবেগ ছাড়া কিছু নয়। হয়তো সেটা বুঝতে খুব বেশি দেরী হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কী করব? ভেবে দেখলুম, মানুষের জীবনটা বিশেষ বড়ো নয়—ছোট্ট। যতটুকু পারি ভোগ করে নিই। অবশ্য স্বীকার করতে দ্বিধা নেই।—তোমার সঙ্গে পরিচয়ের পর থেকে আমার এই ক্ষিদে বেড়ে গেল। আমি ফলেফুলে সুখে বাঁচতে চাই, গৌতম।'

'কিন্তু যতক্ষণ না স্বপন বোসটাকে খুঁজে বের করা যায়।' গৌতম ভুরু কুঁচকে কয়েকমুহূর্ত তাকিয়ে রইল রিমির দিকে— ফের বলল, 'এটাই এখন সমস্যা।'

'তারপর?'

'তারপর—একটা কিছু করা যাবে।'

'ও তো আবসকণ্ডার। ওকে পুলিশে ধরিয়ে দিলেই হয়তো...'

গৌতম কথা কেড়ে বলল, 'তারপর আবার ওরা আরেকজনকে পাঠাবে।'

রিমি অন্যমনস্কভাবে একটু হেসে বলল, 'হুঁ। দা সেকেণ্ড কিলার মে কাম।'

'তোমার কি খুব ভয় হচ্ছে রিমি?'

'মোটেও না।' রিমি ঠাণ্ডা চোখে তাকাল। 'তাহলে তো হইচই করে ফেলতুম জামাইবাবুকে ব'লে। পুলিশ গার্ডেরও নিশ্চয় ব্যবস্থা হত। আমি —আমার কাছে ব্যাপারটা এখনও আনরিয়েল, গৌতম।'

গৌতম একটু চুপ করে থেকে কেমন হাসল।..' কিন্তু তোমার বিশ্বাসঘাতকতার ফলে নিশ্চয়

অনেকগুলো জীবনের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, রিমি।'

রিমি একটু চমকাল।...'হ্যাঁ। তা হয়তো হয়েছে।'

'সেজন্যে কোন অনুশোচনা হয়না তোমার?'

'একথা জেনে কী লাভ?'

'ইচ্ছে করে জানতে।'

রিমি মুখ নামিয়ে বলল, হয়েছে। আমি সব ভুলে থাকতে চাই বলেই এত ছোটাছুটি হইচই করি।'

অনেকটা সময় চুপচাপ বসে থাকল ওরা। তারপর গৌতম বলল, 'কোনদিন কোথাও জড়িয়ে পড়তে চাইনি। সত্যি জড়িয়ে যাইনি। কিন্তু আমার এ কি হল, বুঝতে পারছিনে। তুমি জানো না রিমি, সারাক্ষণ কী প্রচন্ড চেঁচামেচি চলছে আমার মাথায়। ইচ্ছা করছে মাইক্রোফোনের মতো ভীষণ চেঁচিয়ে প্রতাপগড় কাঁপিয়ে বলে উঠি— তোমরা সাবধান হও, এ কিলার হ্যাজ কাম হিয়ার!'... সে শুকনো হাসতে থাকল।

রিমি একটু ঝুঁকে ওর কাঁধে চিবুক রাখল। ..'চুপ। যেতে দাও। আমি কিছু ভাবি না—আর কিছু ভাবব না। যা হবার হবে।'..আস্তে আস্তে তার ঠোঁট দুটো গৌতমের গাল ছুঁলো।

বাইরে অপর্ণার সাড়া পাওয়া গেল এতক্ষণে। '...রিমি, গৌতম চলে গেছে নাকি রে?'

রিমি আস্তে সরে বলল, 'না'

অপর্ণা এল 'শোন গৌতম, আজ বিকালের মধ্যে কিন্তু ফাইলটা শেষ করে ফেলতে হবে, ভাই। কাল তো সব পিকনিকে যাচ্ছো—পরশু মিনিস্টার আসছেন। স্ট্যাটিস্টিক্সটা তৈরী রাখতে চাই,বুঝেছ! গ্র্যান্টটা মিলে যেতে পারে। রিমি লক্ষ্মীটি —তুই একটু বসবি ওর সঙ্গে। বরং...' অপর্ণা ঠোঁট কামড়ে কী ভাবল।..'উহুঁ —মিনুদির ওখানে একটা স্টকবই রয়েছে যে। এ এক জ্বালায় পড়া গেল। ভদ্রমহিলা অকারণ আটকে রাখলেন—কোন পাত্তাই নেই।'

রিমি বলল, 'মিনুদি? ওঁর মাথায় হিসেব ঢুকলেই হয়েছে।'

'তাই দ্যাখ্ না।..অপর্ণা সখেদে জানাল। ...বললুম, থাক—আপনাকে কষ্ট করতে হবে না। তো...ভাই গৌতম, প্লীজ একবার যাও না ওঁর বাড়ি।'

রিমি উঠে বলল, 'আমিই যাচ্ছি । ওকে পাত্তাই দেবে না ভদ্রমহিলা।'

গৌতম হন্তদন্ত হয়ে বলল, 'না না—আমি যাই। দিদি, একটা কথা, রিমিকে অমন করে একা কোথাও যেতে দেবেন না কিন্তু। কারো সঙ্গ ছাড়া কক্ষনো না।'

অপর্ণা চমকে উঠেছে মনে হল। সে অস্ফুষ্টকণ্ঠে বলল, 'কেন —কী ব্যাপার?'

রিমির মুখে চোখে নিঃশব্দ তিরস্কার থমথম করছিল। সে কিছু বলল না। গুম হয়ে অন্যদিকে মুখ ফেরাল। গৌতম বলল, 'কেন একথা বলছি—আপনি তো ভালই জানেন অপর্ণাদি।'

অপর্ণার মুখে গাম্ভীর্য। সে ভুরু কুঁচকে বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'জানি না তুমি কতটুকু জেনেছ—নিশ্চয় রিমি কিছু বলে থাকবে তোমাকে। তবে ও মেয়েকে শাসন করার সাধ্য আমার নেই ভাই, উনি তো সবসময় বলেন...'

রিমি কথা কেড়ে ঝাঁঝালো স্বরে বলল, 'না বডিগার্ড নিয়ে বেড়ানো আমার সইবে না। কোন মানে হয়? সবাই দিনদুপুরে সব সময় স্বপ্ন দেখছে যেন। ভ্যাট্, ভ্যাট্, কোন মানে হয় না!'

অপর্ণা ধমক দিল, 'থামো! খুব হয়েছে। গৌতম, তুমি তাহলে যাও ভাই। মিনুদি যদি না থাকেন, বলে আসবে—আমি ফাইলটা আনতে লোক পাঠিয়েছিলুম। শিগগির আজই যেন পাঠিয়ে দেন।'

গৌতম এগোল। রিমি বলল, 'মিনুদির কোয়ার্টার ও খুঁজে বের করতে পারবে তাহলেই হয়েছে। শোন, আমি সুদ্ধ যাচ্ছি তোমার সঙ্গে।'

গৌতম দেখল সত্যি রিমি তাকে অনুসরণ করছে। অপর্ণা ভুরু কুঁচকে ব্যাপারটা একটুখানি লক্ষ্য করার পর অফিসের দিকে চলে গেল।

রাস্তায় পৌঁছে রিমি গৌতমের হাতটা নিল। খুব মিষ্টি গলায় বলল, 'আমি যে কারুও পক্ষে একটা লায়েবেলিটি, ভাবতে সুখে মন ভরে ওঠে। পৃথিবীতে কেউ না কেউ যদি আমাকে গুরুত্ব না দিল, তাহলে জন্মালাম কেন গৌতম?'

গৌতম ওর মুখটা দেখে নিল একবার। কিন্তু কিছু বলল না। নিঃশব্দে হাঁটতে থাকল পাশাপাশি। অথচ লক্ষ্য করল, নিজের মধ্যে একটা দুর্দান্ত রকমের এবং অসহনীয় উত্তেজনা বিস্ফোরণের জন্যে মুহূর্ত গুনছে। তার ভিতরের কম্পিউটার যন্ত্রে সবগুলো সতর্কীকরণের সংকেত লাল আলোয় শব্দময়

হয়ে উঠেছে। এই রিমি—প্রগলভ, উজ্জ্বল, পুষ্পিত রক্তমাংসের একটা বর্ণাঢ্য রেকাবি নিয়ে গৌতম চলেছে, আর মাথার ওপর কিংবা অন্য কোথায় ওঁৎ পেতে আছে অন্তরালে গুপ্ত এক বাজপাখি। গৌতমের সারা শরীরের প্রতিটি রোমকূপে একটি করে চোখ গজিয়ে চারদিকে লক্ষ্য রেখেছে।

রিমি কিছু বলছিল। তার কথা এখন সঙ্গীতময়। সেই আবহসঙ্গীতের মধ্যে গৌতম হাঁটতে থাকল। তারপর ক্রমশ তার সামনে স্বপ্নাদর্শের মতো একটা চতুর আবছা হ্যালুসিনেশন বিম্বিত হল মস্তিষ্কের কম্পিত প্রজেক্টর থেকে। সে দেখল, কেউ কিংবা কারা তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বলছে, 'রিমিকে দাও।'

গৌতমের চোয়াল আঁটা হয়ে গেল।..'না'।

'রিমি বিশ্বাসহন্ত্রী। ও বিপ্লবী জনগণের শত্রু।'

'না।'

'ওর বিচার হয়ে গেছে। একে বিপ্লবী জনগণ দিয়েছে মৃত্যুদন্ড।'

'না।'

'শেষবার বলছি, ওকে আমাদের হাতে তুলে দাও।'

'না—না—না!'

এক হাতের মুঠো শূন্যে উঠে গেল গৌতমের। অন্যহাতে রিমিকে আঁকড়ে ধরল। বিড়বিড় করে উঠল, 'না—না- না!'

রিমি মৃদু ধাক্কায় একটু সরে বলল, 'এই! কী হচ্ছে!'

মুহূর্তে গৌতম সচেতন হল। ঘুম থেকে জেগে ওঠার মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকাল রিমিব দিকে। একটু হাসল।

বিমি বলল, 'কী বিড়বিড় করছ?'

গৌতম বলল,'কিছু না। চলো।'

মিনুদিব বাড়ি থেকে বেরোতে সন্ধ্যার আবছায়া থমথম করছিল চারিদিকে। রাস্তায় নেমেই গৌতম একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেল। এতক্ষণ ওখানে আড্ডা দেওয়া ঠিক হয়নি। পুরো একটা জোন পেরিয়ে সুদীপ্ত সেনের বাড়ি পৌঁছতে হবে। একজায়গায় খানিকটা পোড়ো জমি আর জঙ্গল আছে। আলো আছে ল্যাম্পপোস্টে; কিন্তু ওখানটা বেশ নির্জন। জঙ্গলের নিচেই পুবদিকে নদী।

গৌতম একবার দাঁড়িয়ে বলল, 'তোমাদের বাংলোয় যাবার কোন সোজা পথ আছে, জানো?'

রিমি বলল, 'তুমি যা আমিও তাই। কেমন করে জানব?'

গৌতম হাটতে থাকল। একটু পরে ফের রিমি হেসে বলল, 'কেন? ভয় করছে?'

গৌতম অন্যমনস্কভাবে জবাব দিল, 'নাঃ!'

'আমার জন্যে তুমি কি বিব্রত বোধ করছ, গৌতম?'

গৌতম চমকে উঠে ওর দিকে তাকাল।...'কেন রিমি?'

'স্বপন বোসের জন্যে।'

'উঁহু।'

'উহু নয়। তোমার চেহারা বলছে, তুমি খুব এক্সাইটেড।'

'আমি এক্সাইটেড? না তো!'

রিমি হাসতে লাগল।..,'আচ্ছা গৌতম, যদি এখন তোমার সেই স্বপন বোস সামনে—'

চকিতে গৌতমের একটা হাত ডানদিকে রিমির পেটের ওপর দিয়ে ছড়িয়ে গেল এবং সে দাঁড়িয়ে গেল। রিমি অস্ফুটস্বরে বলল, 'কী হল?'

রিমিকে সে হাতটা দিয়ে পিছনে ঠেলে গৌতম বলল, 'কে বসে আছে ওই ব্রিজটার কাছে।'

রিমি হেসে উঠল।...' কে বসে আছে বলে অমনি ভয় পেয়ে গেলে! বাঃ!'

গৌতম আবার হাঁটতে লাগল। প্রায় ত্রিশগজ দূরে খালের ওপর কাঠের ব্রিজে লোকটা এবার উঠে দাঁড়িয়েছে। রেলিঙে ঝুঁকে নিচে তাকিয়ে আছে। ব্রিজের এদিকে উঁচু কাঠের ল্যাম্পপোস্ট থেকে আলো পৌঁছেছে খুব অল্পই। পরিষ্কার চেনা যাচ্ছে না! প্যান্ট আর সার্টপরা লোকটার সঙ্গে সেই পাতাল মন্দিরে দেখা পোশাক মিলিয়ে নিচ্ছিল গৌতম।

ব্রিজ অব্দি একতালে হেঁটে আসবার পর গৌতম দৃষ্টি আরও তীক্ষ্ণ করল। লোকটার পিছন দেখা

যাচ্ছে। রিমি সকৌতুকে গৌতমের মুখের দিকে তাকাল।

ওরা কাছে এলে লোকটা মুখ ফেরাল। না, স্বপন বোস নয়।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ার মতো একটা গভীর ক্লান্তি আর নিরাপত্তার অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল গৌতম। নিজের হাতদুটোর দিকে তাকিয়ে সে মনে মনে প্রশ্ন করল, 'তোমরা শত্রুকে ঠেকাবার মতো কি যথেষ্ট শক্তিশালী? এই পৃথিবীর প্রত্যাঘাত সহ্য করার মতো শক্তি কি তোমাদের আছে বন্ধুরা?'

পরক্ষণে তার ঠোঁটের কোণে সংশয়ের চিহ্ন ফুটে উঠল।

আরও একটু চলার পর সে বলল, 'রিমি, কিছুক্ষণ নদীর দিকে ঘুরে আসবে?'

রিমি ফাইল আর রেজিস্টারটা একবার দেখে নিল এবং ঘড়ি দেখল। তারপর ছোট্ট করে বলল, হুঁ উ।'

ওরা সন্ধ্যারাতের ধূসর নদীটির দিকে ঘুরল।...

পরদিন রোববার। পিকনিক। খুব সকাল সকাল উঠে সুদীপ্ত সেনের বাংলোয় যাবার কথা ছিল গৌতমের। ওখানেই সবাই জড়ো হবে। বাজার করার দায়িত্ব রিমি আর গৌতমেরই।

মুখ ধুয়ে তাড়াতাড়ি চা খেয়ে নিয়েছিল সে। সেইসময় দরজার বাইরে থেকে কে বলে উঠল,'সন্টু আছো নাকি?'

গলার স্বর চেনা লাগল। গৌতম উঠে গিয়ে পর্দা তুলেই স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। স্বপন বোস। একেবারে তার দরজার সামনে—মুখোমুখি। একটা প্রচণ্ড বোবা চিৎকার তার ভিতর ঘুরপাক খেতে খেতে দূরের দিকে কণ্ঠস্বরে কোথায় মিলিয়ে গেল।

'কি সণ্টু, কেমন আছো?' স্বপনের কণ্ঠস্বরে প্রগাঢ় অন্তরঙ্গতার সুর। ঠোঁটে পাতলা হাসি।..'হঠাৎ এসে পড়লুম এখানে—একটা কাজে। তারপর শুনলুম, তুমি এখানে আছ—চাকরি করছ। যাকগে, ভালই হল।'

তাকে ঠেলে স্বপন ঘরে ঢুকে পড়ল সরাসরি। ... 'সেদিন পাতাল-মন্দিরে বেড়াতে গিয়েছিলুম। হঠাৎ দেখি তুমি! দৌড়ে এসে তোমাকে ধরব ভাবলুম। কিন্তু তখন তুমি ভিতরে ঢুকে পড়েছ। ভিড়ে আর তোমার পাত্তাই পেলুম না। বেরিয়ে এসে কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করলুম। পেলুম না।'

গৌতম দরজার দিকে পিঠ দিয়ে তাকে দেখছিল—এক হাতে চায়ের কাপ।

'হঠাৎ আমাকে নগেনদা—মানে শালা প্রখ্যাত নগেন মিত্তির...' হেসে উঠলো সে—'কথায় কথায় বলল, প্রতাপগড়টা এখন যত রাজ্যের ফেরারী বাঞ্চোতের আড্ডা হয়ে পড়েছে। তারপর তোমার প্রসঙ্গ এল—'

গৌতম গম্ভীর কণ্ঠস্বরে বলল, 'আমি ফেরারী আসামী নই!'

'সেই তো! আমি বললুম, অসম্ভব—সণ্টুকে আমি কত চিনি! ওর দাদা ছিল বুজুম ফ্রেণ্ড! সণ্টুর মতো নিরীহ ভালো ছেলে হয়ই না। শালা বিশ্বাসই করবে না। বলে, নির্ঘাত কিছু খুনখারাপি করে কেটে পড়েছে কলকাতা থেকে। বললুম, নগেনদা, তুমি ওকে চেনো না। তো—ভালই আছ দেখছি।' ...ঘরের ভিতর চারপাশটা দেখতে থাকল স্বপন।

গৌতম কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। তার দাদার ঘাতক এবং তার প্রেমিকা রিমিরও সাম্ভব্য ঘাতক এই স্বপন বসু এখন তার ঘরে ঢুকে পড়েছে! ব্যাপারটা বাস্তব বলে মনে হয় না। একটা পরিকল্পিত ফ্যাণ্টাসি!

'তুমি কি আমার ওপর রাগ করেছ সণ্টু? কথা বলছ না যে?'

'কী বলব?'

স্বপন হো হো করে হেসে উঠল। ...'তুমি এখনও সেই নির্বিকার জড়পদার্থ হয়ে রয়েছ ভাই! নাঃ, একটুও বদলাওনি। যাক গে, শোন—আমার ব্যাপার তো বুঝতেই পারছ। পালিয়ে বেড়াচ্ছি। আমাদের পার্টি-সেল ফাঁসড় হয়ে গেছে। সবাই ধরা পড়েছে পুলিশের হাতে—কেউ কেউ মারাও পড়েছে। আমি তো কোনক্রমে বেরিয়ে এসেছি। এখন একটা কথা—যা তোমাকে বলতে এলুম। প্লীজ ভাই সণ্টু, তুমি ছাড়া এখানে আমার নাম জানে বা চেনে মাত্র আরেকজন—শালা নগেন মিত্তির। ও অনেক ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করে আসছে বরাবর—কারণ ওর একটা পলিটিক্যাল এ্যামবিসান আছে। যাই হোক, ও আমার কোন ক্ষতি করবে না। আমি এখানে শ্যামল বোস, বুঝেছ? বর্ধমানের একটা গ্রাম থেকে এসেছি—নগেনদা আমার আত্মীয়। কেমন? এখন বাকিটা তোমার দয়ার ওপর নির্ভর

করছে।'

দয়া! ঘাতকটা আমার কাছে দয়া প্রার্থনা করছে করজোড়ে। তার মুখে এখন অনুনয় এবং হাসি। গৌতম ঘামছিল।

'তোমার দাদার দুর্ঘটনার সঙ্গে আমার নামটা জড়িয়ে গেছে—তা সত্য। কিন্তু সন্টু আমি পারটির উদ্দেশ্য কী একটুও জানতুম না ভাই—মোটেও আঁচ করিনি। আমাকে বলে পাঠিয়েছিল রঞ্জুকে ডেকে আনতে। আমি যেতে বাধ্য হয়েছিলুম। কিন্তু বিশ্বাস করো—হঠাৎ মাঠে নিয়ে যে ওকে...'

গৌতম বলল, 'থাক।'

'না— তোমার জানা দরকার। তোমার মুখ দেখেই বুঝেছি—কী মনে রয়েছে তোমার। রঞ্জু ছিল আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু।--ছেলেবেলা থেকে। আমি খুব অসহায় হয়ে পড়েছিলুম ভাই। তোমার বাবা মায়ের কাছে যাবার সুযোগ পাইনি। যদি কখনও পাই, বলে আসব। ক্ষমা চেয়ে নেব।'

'প্রতাপগড়ে কেন এসেছেন আমি জানি স্বপনদা!'

'জানো ! কেন? বললুম তো—অজ্ঞাতবাসে।'

'না। রিমিকে খতম করতে।'

'রিমি! সে আবার কে?'

'সুদীপ্ত সেনের শালী। তাকে আপনার পার্টি ট্রেটর প্রতিপন্ন করেছে। আপনাদের তথাকথিত বিপ্লবী জনগণের কোর্টে তার ডেথসেন্টেস দিয়েছে! আর আপনি এসেছেন সেই খতমের হুকুম তামিল করতে।'

'যাঃ! কী সব বলছ সন্টু!'

'শাট আপ স্কাউন্ড্রেল!'

'ছিঃ সন্টু, আমি তোমার দাদার মতো!'

মুহূর্তে চায়ের কাপটা তার মুখে মেরে বসল গৌতম। স্বপন মুখ ঘুরিয়ে নিল। কিন্তু নাকের কাছে গল্‌গল্‌ করে রক্ত বেরিয়ে এল। সে ওকে বাধা দেবার জন্যে উঠে দাঁড়াতেই গৌতম ফের ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। প্রচণ্ড একটা ঘুঁসিতে স্বপনের ঠোঁট কেটে গেল। তার কলার ধরে দাড় করিয়ে পাগলের মতো মারতে শুরু করল গৌতম।

স্বপন পড়ে গিয়ে গোঙাতে লাগল। 'তুমি আমাকে মারলে সন্টু! তুমি আমাকে মারলে!'

গৌতম তার মুখে জোরে লাথি মারল।

এত সকালে আশেপাশে কোন লোক ছিল না। গৌতমের রান্না করার লোকটিও আসেনি।

আহত স্বপন আস্তে আস্তে উঠে বসল। তারপর রুমাল বের করে রক্ত মুছল। উঠে দাঁড়াল অনেক কষ্টে। বীভৎস আর রক্তাক্ত দেখাচ্ছিল তার মুখ। কিন্তু কোন কথা আর বলল না সে। টলতে টলতে বেরিয়ে গেল।

একটু পরে গৌতম পর্দা তুলে বাইরে তাকাল। দিনের প্রথম আলোয় উজ্জ্বল এবং রক্তাক্ত ঘাতকটি টলতে টলতে হেঁটে যাচ্ছে।

আস্তে আস্তে এতক্ষণে একটা গভীর এবং প্রবল কষ্ট বুক থেকে ঠেলে উঠল গৌতমের। তীব্র অনুশোচনায় ছটফট করে উঠল, সে এ কী করে বসল! লজ্জায় দুঃখে পরিতাপে ভেঙে পড়ল সে। ইচ্ছা হল দৌড়ে গিয়ে লোকটার সামনে নতজানু করজোড়ে বলে ওঠে, 'আমাকে ক্ষমা করো!'

আর, এই কি সেই মারাত্মক খুনী—যাকে বিনা প্রতিরোধে নির্বিবাদে সে আঘাতে জর্জরিত করতে পেরেছে? কোথায় তার হিংস্র ঠাণ্ডা শানানো ইস্পাতের লুকানো ছুরি কিংবা রিভলবার? এ তো একটা ক্লান্ত অস্থিসার রুগ্ন শরীর—তার দু-চোখে অজ্ঞাতবাসের থমথমে ভীরুতা, কণ্ঠস্বরে বিশ্রামের গভীর কাকুতি। প্রাণভয়ে পালিয়ে বেড়ানো একটা মানুষকে মারার মধ্যে কোন শৌর্য আছে কী?..

রিমি যখন এল, দেখল গৌতম চুপচাপ বসে রয়েছে। ঘরটা বিশৃঙ্খল। মেঝেয় ভাঙা কাপ আর কিছু রক্তের ছোপ। রিমি দেখামাত্র চমকে উঠল। সে রুদ্ধশ্বাসে গৌতমের কাঁধে হাত রেখে বলল, 'কী ব্যাপার? এসব—'

'স্বপন বোস এসেছিল।'

'স্বপন বোস! সেই লোকটা! সে কী!'

'হ্যাঁ।' ... গৌতম ম্লান হাসল। .....'ওকে আমি মেরেছি।'

রিমি মেঝে দেখতে দেখতে বলল, 'আশ্চর্য!'

'আশ্চর্য। আমার কাছে এসেছিল বলতে—ওর পরিচয় যেন গোপন করি। ও এখানে শ্যামল বোস—

বর্ধমানের গ্রাম থেকে এসেছে। নগেন মিত্তির ওর আত্মীয়। ও লুকিয়ে বেড়াচ্ছে। পুলিশের হাত থেকে তো বটেই—আমার মনে হল, দলের ভয়েও হতে পারে। ট্রেটর তো সবাই।'

'আর তুমি ওকে মারলে!'

'হ্যাঁ, আমার দাদাকে—' হঠাৎ থামল গৌতম। ....'চলো। দেরী করে ফেলেছি।'

রিমি গম্ভীর হয়ে বলল, 'কিন্তু এর পরিণাম কী হতে পারে, ভেবেছ?

'কী হবে রিমি?'

'নগেন মিত্তির যখন শুনবে, ওর লোককে মেরেছ—'

'তখন দলবল নিয়ে আমাকে মারতে আসবে।'

'তুমি এমন তো ছিলে না গৌতম! ভ্যাট্!'

গৌতম সোজা ওর চোখের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে বলল, 'আমি একটা কিছু করতে চাই রিমি—ভীষণ কিছু, মারাত্মক কিছু। জন্মাবধি চুপচাপ থেকে, সব মুখবুজে দেখতে দেখতে আমার হাত-পা সারা শরীর জ্যাম ধরে গেছে। আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না। এবার আমার সুসময় এসে গেছে রিমি!'

'তুমি নির্ঘাৎ পাগল হয়ে যাবে! ওঠ বেবোও।'

'আজ আমি এক অদ্ভুত আনন্দ পেয়েছি—অভূতপূর্ব! মানুষকে দৈহিক ভাবে আঘাত করার এত আনন্দ আছে, জানতুম না রিমি! আমার নবজন্ম হয়ে গেছে!'

রিমি ওর হাত ধরে টানল। ....'বীরপুরুষ! সব শিক্ষাসভ্যতার পর এই তোমার সিদ্ধান্ত! ভালো—চমৎকার! খুসি আমিও হয়েছি—নিশ্চয়ই হয়েছি। আমার প্রেমিক কাকেও মেরে রক্তারক্তি কবে দিতে পারে— সে নিরীহ ভীতু গোবেচারা নয়, এ পরিচয় পেয়ে খুসি হব না? মেয়েবা তো চিরকালই বীরপুরুষদের গলায় মালা দিতে চায়।'

'ব্যঙ্গ করো না, রিমি আমি একটা কিছু করতে চাই।'

'করবে তো এসো। আপাতত পিক্‌নিকের মুরগীগুলো কেটে কিলিংটা রপ্ত করে নাও।'

তার সঙ্গে স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো গৌতম বেরিয়ে গেল।

স্যাংচুয়ারীর ওদিকে একটা পিকনিক স্পট আছে। সেখানে সারা শীত আব বসন্তকাল বেশ ভিড হয়। ভিড় এড়াতে ওরা নদীর পাড় ধরে কিছুটা দূরে চলে গিয়েছিল। সমিতিব ত্রিশটি মেয়ে আর আর কর্ত্রীস্থানীয়া মহিলাদের এই গোলমেলে দলে একটুও নিজেকে মানাতে পারছিল না গৌতম। কিন্তু রিমির পক্ষে সে-ভিড় চমৎকারই মনে হচ্ছিল। বাতাস দিচ্ছিল জোরে! নদীর বাঁকের মাথায ঘন গাছপালা আর ঝোপঝাড়ে ভরা পোড়ো জায়গা। মেয়েবা গান গাইছিল। বয়স্কাদের দলটা গাছের ছায়ায় তাস খেলছিল। সেই গাছের গুঁড়িতে লাল শালুর ফেস্টুন টাঙানো—লেখা আছে মহিলা সমিতির নামধাম। কর্ত্রীরা—অপর্ণা, মিনুদিরা, সবার থেকে আলাদা আড্ডা দিচ্ছিল! সেটাই স্বাভাবিক। ঘাসের ওপর সতরঞ্চি পেতে বসে সবসময় তারা ফাইফরমাস করে যাচ্ছিল মেয়েদের। পাশেই পাথর কুড়িয়ে এনে উনুন বানানো হয়েছে। বয়স্কা তিনটি মেয়ে রাঁধা-বাড়ায় ব্যস্ত।

গৌতম এদের মধ্যে একমাত্র পুরুষ। সে এইসব এড়িয়ে নদীর চড়ায় গিয়ে বসেছে। উজ্জ্বল স্নিগ্ধ রোদে হাল্‌কা একফালি স্রোত তার পায়ের কাছে বয়ে যাচ্ছে। রিমি নাচগানের ভিড় থেকে বেরিয়ে প্রথমে উনুনের কাছে গেছে। তারপর অপর্ণাদের পাশে দাঁড়িয়ে কিছু রসিকতা করেছে। অবশেষে একফাঁকে কেটে পড়েছে নদীর দিকে। দেখছে, একা গৌতম চুপচাপ বসে রয়েছে।

রিমি চুপচাপ তার পাশে এসে বসেছে। এবং অমনি তার মনে হয়েছে গৌতম এতক্ষণ লুকিয়ে লুকিয়ে নিঃশব্দে কাঁদছিল যেন। গৌতমের চোখদুটো ভিজে দেখাচ্ছিল কি? সে অবশ্য কোন প্রশ্ন করেনি। চুপচাপ পাশে বসে থেকেছে।

গৌতম স্বপন বোসের কথা ভাবছিল। যে শত্রুকে ভেবেছিল দুর্দান্ত নিষ্ঠুর এবং শক্তিমান, যাকে ভেবেছিল মারাত্মক ঘাতক, সে তার হাতে পড়ে পড়ে মার খেল, কোন প্রতিরোধ পর্যন্ত করল না, তারপর আস্তে আস্তে চলে গেল—তার সেই মাথা ঝুলিয়ে টলতে টলতে চলে যাওয়ার দৃশ্য এখনও অবিকল দেখতে পাচ্ছে গৌতম—এবং আশ্চর্য, ক্রমশ দূর থেকে দূরে, গভীর থেকে গভীরে সেই পরাজিত প্রস্থানের কোন শেষ নেই। যত যায়, তত যেন স্পষ্টতর হতে থাকে সেই রক্তাক্ত মুখ।

এ কাকে সে মারল? কার ওপর প্রতিশোধ নিল? সেই বিপ্লবীকে গৌতমের বড় দরকার ছিল—

পৃথিবী বদলানোর জন্যে খুনের পর খুন করে যেতে হয়, ইতিহাসের চাকা ঘুরিয়ে দিতে গিয়ে যার শক্তিমান বাহু দুটোতে চাকার ঘষড়ে যাওয়ার দাগ পড়ে গেছে।

দাদার মৃত্যুর জন্যে গৌতমের সত্যিকার দুঃখ কোনদিন যে ছিলই না, সে একটু করে টের পাচ্ছিল, এবার আহত স্বপন বোস তাকে যেন টের পাইয়ে দিয়ে গেল। আসলে সে আঘাত করেছে এক হতবীর্য ভীতু চতুর পলাতককে— যে তার বিশ্বাসঘাতক দাদারই একটি প্রতিবিম্ব! গৌতম মনে মনে বলছিল, হ্যাঁ—জীবন—সত্যিকার জীবন, যা প্রাণবন্ত, যা খাঁটি—তা একরোখা, তা বেপরোয়া। তা যেদিকে হোক—স্বর্গ অথবা নরকে, পাপ কিংবা পুণ্যে, আদর্শ কিংবা আদর্শহীনতায়—ছুটে যেতে জানে। তা নিক্ষিপ্ত তীব্রগতি শাণিত তীরের মতো। তা কোথাও না কোথাও গিয়ে আঘাত করে। তা মাঝপথে ফিরতে জানে না অন্যমুখে।

তার দাদার জীবনের মধ্যে সেই ফাঁকি ছিল। দাদা সত্যিকার জীবন নিয়ে জন্মায়নি। তার ফুসফুস মস্তিষ্ক হৃদপিণ্ড সে-জীবনের উপযোগী ছিল না। তাই সে পিছনে ফিরেছিল।

সত্যিকার বিপ্লবী ফাঁসিকাঠের সামনে হাসিমুখে দাঁড়ায়! তার দাদা ভয় পেয়েছিল। দাদাকে সে অনায়াসে ঘৃণা করতে পারে।

ভয় পেয়েছে এই স্বপন বোস। তাকেও সে ঘৃণা করে।

আর রিমি—রিমিও তাই। রিমিকেও সে নিঃসঙ্কোচে ঘৃণা করছে।

এই তিনজনকে বড়জোর করুণা করা যায়, আঘাত করা যায় না। এদের আঘাত করলে নিজের দুটো হাত অপমানিত হয়। এদের ভালবাসলে নিজের কাছে নিজে প্রচণ্ড লজ্জা পেতে হয়।....

রিমি কী বলতে যাচ্ছিল এতক্ষণে, সেইসময় হঠাৎ গৌতম উঠে দাঁড়াল। হেঁটে যেতে থাকল। রিমি ব্যস্ত হয়ে বলল, ' কোথায় চললে ওদিকে? দিদিরা খুঁজছেন তোমাকে।'

গৌতম জবাব দিল না। একইভাবে হাঁটতে থাকল।

রিমি রেগে গেল এবার। ...'তুমি কী পাগল' গৌতম, আমি সত্যি বলছি— ভীষণ, ভীষণ ইয়ে করব কিন্তু! এই গৌতম!'

গৌতম কোন জবাব দিল না।

রিমি দৌড়ে এসে তার সামনে দাঁড়াল। গৌতম তাকে পাশ কাটিয়ে চলতে থাকল হনহন করে।

রিমির চোখ ফেটে জল এল এবার। সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল, নদীর চড়ার ওপর দিয়ে সোজা প্রতাপগড়ের দিকে চলেছে গৌতম। রিমির গায়ের ওপর দিয়ে একটা ঘূর্ণী এসে জলে নামল। জল পেরিয়ে সেটা পাড়ের ঝোপঝাড় নাড়া দিতে দিতে পাহাড়ের দিকে চলে গেল।...

জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে গৌতম ভাবল, একবার সুদীপ্ত সেনকে বলে যাওয়া দরকার যে, সে চলে যাচ্ছে হঠাৎ।

ঘর থেকে বেরিয়ে চঞ্চলভাবে সে সুদীপ্ত সেনের বাংলোয় পৌছল।

সুদীপ্তবাবু একা ছিলেন। তখন প্রায় দুপুর বারোটা। সবে খেয়ে একটু গড়িয়ে নিচ্ছিলেন, খবর পেয়ে বেরিয়ে এলেন। পরক্ষণে অবাক হলেন।..... 'কী ব্যাপার? আপনাদের পিকনিক এরি মধ্যে হয়ে গেল? ওরা সব কই?'

গৌতম আস্তে বলল, 'আমি চলে এলুম মিঃ সেন।'

' সে কী! কেন?' ..... পরক্ষণে হো হো করে হেসে উঠলেন। ....'আমার শালীর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে নির্ঘাৎ!'

'না, আমি কলকাতা ফিরে যাচ্ছি।'

'কলকাতা ফিরে যাচ্ছেন? তার মানে?' সুদীপ্ত সেনের মুখ গম্ভীর এবং উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। ...'এনি ব্যাড নিউজ?'

গৌতম একটু হাসল। ....'নাঃ! এমনি চলে যাচ্ছি।'

'এমনি চলে যাচ্ছি! আশ্চর্য পাগল তো মশায় আপনি! দিব্যি সব পিকনিকে গেলেন আনন্দ করতে। হঠাৎ একা ফিরে এসে বলছেন—' হঠাৎ ওর কাঁধ ধরে টেনে ঘরে নিয়ে গেলেন।....'সীট ডাউন হিয়ার। নিশ্চয় কিছু ঘটেছে বুঝতে পারছি। কিন্তু যাই ঘটুক আমি আপনাকে এখানে রেখেছি—কাজকর্মের দায়িত্ব দিয়েছি—আমি কিছু জানব না আর আপনি চলে যাবেন, দ্যাট লুকস অড! সে হয় না। ওরা ফিরে আসুক, তারপর যা করার আমি করব।' ·

গৌতম বসল না। বলল, 'বিশ্বাস করুন—কারো সঙ্গে কিছু হয়নি ওখানে। আমি অমনি চলে এলুম। আমার—আমার হঠাৎ সব খারাপ লাগল মিঃ সেন। আমার অসহ্য লাগল—'

'কী অসহ্য লাগল?'

গৌতম মুখ নামিয়ে যন্ত্রণার্ত স্বরে বলল, 'অসহ্য লাগল—সব কিছু। মানে এই আমি, চার্কবি—প্রতাপগড়—মানুষজন সবকিছু। সব ব্যাপারটা মনে হল ভুল, মিথ্যে, ভণ্ডামি আর আত্মপ্রতারণা। কী হয় এসব করে? কেন এসব সাজানোগোছানো সভ্যতা, পৃথিবী? আমি—আমি কারো ওপর রাগ করিনি মিঃ সেন। এ আমার নিজের ওপর নিজের রাগ।'

সুদীপ্ত সেন নিষ্পলক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বললেন, 'তুমি খুব আশ্চর্য ছেলে গৌতম। রিয়েলি! তোমাকে প্রথম দেখা অব্দি খুবই স্নেহ করি—নিজের ভাইয়ের মতো! তোমাকে বলতে আমার ইচ্ছা করছে—এ সেন্টিমেন্টাল ফুল! হ্যাঁ— দেয়ার ইজ সামথিং এ্যাবনরমাল ইন ইউ। পাগল, পাগল। কোথায় পালাবে তুমি এই ভুল, মিথ্যা, আর আত্মপ্রবঞ্চনায় ভরা পৃথিবী ছেড়ে? কোথায় পালিয়ে বাঁচতে চাও, ইয়ং ম্যান? তুমি সভ্যতাকে এ্যাবিউজ করছ। ওটা সহজ, ওটা সস্তা বুলি। আমরা কেউ আদিমতায় ফিরতে চাইনে। আদিমতা একটা ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক অবস্থা— জীবনের সবরকম অসম্মানের আখড়া সেখানে। ইতিহাস তাই আদিমতাকে ছেড়ে চলে এসেছে। যত দিন যাচ্ছে, আমরা চলেছি তার থেকে আরও উন্নত সভ্যতার দিকে। আসলে হয়েছে কী—আদিমতার বর্বর সত্তা যেটা— সে সঙ্গ ছাড়েনি এখনও। সেদিক থেকে দেখলে, এখনও আমাদের বর্বরদশা কিছুটা ঘোচেনি। গৌতম, ছেলেমানুষি চাপল্যে সভ্যতাকে তিরস্কার করা সহজ। কিন্তু ভুলে যেও না—এটুকু গড়ে তুলতেই কত কোটি কোটি মানুষের মেধা ও বাহুর চাতুর্য খরচ করতে হয়েছে! অসংখ্য মানুষের যুগ যুগ ধরে সেইসব শ্রমের ও বুদ্ধির শ্রেষ্ঠ ফসল পৃথিবীতে জড়ো হয়েছে। তুমি বলতে পারো, তবু কনট্রাডিকসান আছে। নিশ্চয় আছে। থাকবে। এ না থাকলে কোন ডেভালাপমেন্ট হয় না। কিন্তু একে দেখে অমনি ভয় পেয়ে ঘৃণা করতে শিখলে তোমার মতো দু-চারজনের চলতে পারে, অনেকেরই চলবে না। পৃথিবীটা মূর্খদের হাতে সঁপে দেওয়ার মতো মূর্খ আর কেউ নেই। তুমি জেনেশুনে সেইরকম মূর্খ হচ্ছো।'

সুদীপ্ত সেন ফের হাসতে লাগলেন। গৌতম মুখ নামিয়ে শুনছিল কিংবা শুনছিল না। বলল, 'আমি অতবেশি ভাবিনে—ভাবতেও চাইনে মিঃ সেন। আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই।'

'বেশ তো! তা চলে গেলে না কেন? আমার কাছে জানাতে এলে কেন?'

'ভদ্রতার জন্যে।'

'এ ভদ্রতা কিন্তু তোমার এই ভণ্ড পৃথিবীই তোমাকে শিখিয়েছে। এও তো এক ভণ্ডামি, ভাই।'

গৌতম জবাব দিল না।

'এই সভ্যতা, পৃথিবীকে তুমি ঘৃণা করছ—কিন্তু তার দেওয়া জিনিসগুলো কি ঘৃণা করতে পারছ?'

'পারছি বই কি।'

'পারছ? ইজ ইট?' সুদীপ্ত সেন এক মুহূর্ত ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন।...'তাহলে কেন ওই পোশাক পরে আছ? খুলে ফেলে দাও! ছুঁড়ে দিয়ে আগুন জ্বালো! গৌতম, অত সহজ হয়ে কিছু নেই আর পৃথিবীতে। আমরা এমন জায়গায় চলে এসেছি, এখন আর ফেরা যায় না কিংবা দলভ্রষ্ট হওয়া মানেই দা এ্যানিহিলেসান—বিনাশ। মৃত্যু। ফিজিক্যাল ডেথ। ডু ইউ ফিল ইট?'

গৌতম অস্ফুটকণ্ঠে বলল, 'কী বললেন?'

'দা ফুলস্টপ অফ ইওর একজিস্টেন্স!'

গৌতম তাকাল।

'হিপিরাও এই পৃথিবীর মানুষের সমাজের দরজায় ঘুরঘুর করছে। ভারতীয় সন্ন্যাসীরাও গৃহস্থ মানুষ ছাড়া বাঁচে না। হিমালয় পাহাড়ের নির্জন ভয়ঙ্কর গুহায় যিনি তপস্যা করেন, তাঁকেও নির্ভর করতে হয় অন্য মানুষ আর মানুষের সমাজের উৎপন্ন দ্রব্যাদির ওপর। কেউ পালিয়ে বাঁচে না। তুমি যদি সত্যি এ পৃথিবীকে অপছন্দ করো, জাস্ট লিভ ইট—অর মেক ইট এ্যাকরডিং টু ইওর চয়েস। দুটোর কোনটাই যারা পারবে না, তাদের চুপচাপ মেনে নেওয়া ভাল। আমি কি ভুল বলছি গৌতম? হয় মরো, নয় বদলাও—বদলাতে গিয়ে মরো!''

আশ্চর্য, দাদা ঠিক একথাই বলত। গৌতম মুখ নামাল। আস্তে আস্তে বলল, 'আমি অত ভাবিনি—কিন্তু আমার ভাল লাগে না। কোথাও ভালো লাগে না। আমি কী করব, বুঝতে পারছিনে—আমি...'

সুদীপ্ত সেন তার দুটো কাঁধ ধরে বললেন, 'তাকাও আমার দিকে। হঠাৎ তোমার মধ্যে এই জ্বালা বা ছটফটানি জেগে ওঠেনি গৌতম। হয়তো ছিল অনেক দিন ধরে সঞ্চিত— কোন একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে এটা ফেটে পড়েছে। আই ফিল ইউ। কী সে ঘটনা? বলো—আমি শুনতে চাই। হ্যাঁ—বলো....'

'আমি আজ সকালে একটা লোককে নিষ্ঠুরভাবে মেরেছি।'

'কে সে? কেন তাকে মেরেছ?'

'সে আমার দাদাকে খুন করেছিল। আর সম্ভবত রিমিকে খুন করতেই এখানে এসেছিল সে। আমি তাকে— '

'কে সে? কেন সে তোমার দাদাকে খুন করেছিল— কেনই বা রিমিকে খুন করতে চায়?'

'সে একটা বিপ্লবী দলের লোক। দাদা ট্রেটর ছিল—রিমিও নাকি একজন ট্রেটর।'

'আই সী। তুমি তাকে চিনতে?'

'হ্যাঁ। আমার দাদার বন্ধু ছিল সে।'

'তোমার কাছে কেন এসেছিল?'

'জানি না। বলছিল, পরিচয় গোপন করে এখানে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। ফেরারী। নগেন মিত্তির তাকে রেখেছে।'

'নগেন মিত্তির।'

'হ্যাঁ। নগেন তাকে একরাত্রি আমার মেসোমশায়ের বাড়ি লুকিয়ে রেখেছিল। পুলিশ ওকে পেলেই এ্যারেস্ট করবে।'

'তোমাকে কী বলল লোকটা?'

'বলছিল আমি ছাড়া মাত্র নগেন ওকে চেনে এখানে। আমি যেন ব্যাপারটা গোপন রাখি। কিন্তু আমি ওকে ভীষণ মারলুম—রক্তে ওর মুখটা ভেসে গেল। অসহ্য সে দৃশ্য। আমি কখনও কারও গায়ে আঘাত করিনি মি: সেন। এই প্রথম আমি একজনকে মারলুম—কিন্তু আশ্চর্য, সে এতটুকু রুখে দাড়াল না। চুপচাপ মার খেয়ে গেল—বিনা প্রতিরোধে!'....গৌতমের চোখ ফেটে জল এল।

সুদীপ্ত সেন ভুরু কুঁচকে অন্যদিকে তাকিয়ে ছিলেন।

গৌতম ফের বলে উঠল, ...'তার চেয়ে যদি সে রিয়েল বিপ্লবীর মতো—কিংবা যদি নিছক খুনী মানুষের মতোও পাল্টা আমাকে মারত, আমরা পরস্পর লড়াই করতুম। কিন্তু সে তা করল না! আর মাঝখান থেকে আমি নিজের হাতে নিজেকে চরম অপমান করলুম! ওর মুখের রক্ত আমার ওপর থুথুর মতো লেগে রইল। এই দেখুন, এই দেখুন—'সে কার্ডিগান তুলে জামার রক্তের দাগটা দেখিয়ে দিল।

সুদীপ্ত সেন মৃদু ভর্ৎসনার স্বরে বললেন, 'ছিঃ গৌতম! ডোন্ট বী এ সেন্টিমেন্টাল ফুল এগেন। আমি দেখি, কি করা যায়।'

'কী করবেন আপনি?'

'নগেন মিত্তিরকে জিজ্ঞেস করব। তারপর.. '

'আপনার খুসি। আমি যাই।'

'তুমি সত্যি চলে যাবে? আমার কথা শুনবে না?'

'আমায় ক্ষমা করবেন মিঃ সেন।'

'কিন্তু একজন তোমাকে ক্ষমা করবে না গৌতম।'

'জানি—রিমি। কিন্তু আমার কোন উপায় নেই।'

'রিমি—আচ্ছা, ঠিক আছে। এসো।' সুদীপ্ত সেন পাশের ঘরে চলে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে।

গৌতম বেরিয়ে এল। আবার হনহন করে হেঁটে সে নিজের ঘরে পৌঁছল। এখানে প্রথমে আসবার দিন যা সঙ্গে এনেছিল, শুধু তাই নিয়ে সে বেরোল। দরজাটা ভেজিয়ে দিল শুধু।

মেসোমশাইকে একবার জানিয়ে যাওয়া উচিত। তা নাহলে বাবাকে দীর্ঘ চিঠি ফেঁদে বসবেন। এবং ফের যাতে কোন নাটকীয় ঘটনা না ঘটে, সে একটা মিথ্যা অজুহাত তৈরী করে নিল।

মেসোমশাই ঘুমোচ্ছিলেন। শোভামাসীমা আর তাঁর মেয়েরা ভিড় করল গৌতমকে দেখে। গৌতম বলল, 'হঠাৎ খবর পেলুম—একটা ভাল চাকরির ইণ্টারভিউ পেয়েছি। আগামীকাল ডেট। তাই চলে যাচ্ছি।'

শোভামাসীমা অমনি লাফিয়ে উঠলেন, 'খুব ভালো—খুব ভালো বাবা সণ্টু! এ বদমাস জায়গা যত তাড়াতাড়ি ছেড়ে পালান যায়, ততো মঙ্গল। উঃ, আমরা কি কম জ্বালায় জ্বলে মরছি বাবা! ওগো, শুনছ? অবেলায় নাক ডাকিয়ে ঘুমিও না তো! ওঠ, ওঠ! শোন—সণ্টুর কী হয়েছে!'

ধুড়মুড় করে পাশের ঘরে উঠে বসেছেন মেসোমশাই। হয়তো ঘুমের ঘোরেই বললেন, 'কী হয়েছে, কার?'

'শোনই না এসে। সণ্টুর কী হয়েছে— শোন!'

বেসামাল লুঙ্গিটা জড়াতে জড়াতে হাঁফাতে হাঁফাতে এসে পড়লেন মেসোমশাই।......'এ্যা? কী হয়েছে সণ্টুর? সর্বনাশ! ওরে বাবা—'

'চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করো না। এই বয়সে ভীমরতি ধরেছে যেন। সণ্টু একটা ভাল চাকরি পেয়েছে কলকাতায়—অনেক মাইনে। কত ভালো হল বল তো! থুথু ফেলে চলে যাচ্ছে সেনসায়েবের গায়ে।'

গৌতম হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'না—চাকরির ইণ্টারভিউ।'

মেসোমশাই একটু দমে গিয়ে বললেন, 'ও—ইণ্টারভ্যু!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কবে? কখন? কোথায়?'

'কলকাতায়—আগামী কাল দুপুরে।'

'অ। তা ইয়ে—এখন কোথায় যাচ্ছ?'

'স্টেশনে।'

'তোমার মাথাখারাপ? এখন ট্রেন কোথায়? ট্রেন সেই রাত নটা সাতাশে। বসো। এলে—থাকলে, কিন্তু তেমন করে আদর-যত্ন খাওয়াদাওয়াও কিছু হল না গোলমালের মধ্যে। ইয়ে—ওগো, সকাল সকাল রান্না করতে পারবে না? আমি বরং এক্ষুনি বাজার ঘুরে আসি। নয়তো ওপারে আদিবাসীদের পাড়ায় যাব—মুরগী নিয়ে আসি। শিগগির চা বসাও।'... মেসোমশাই বাথরুমের দিকে গেলেন।

গৌতম বলল, 'আমি—বরং স্টেশনে যাই আগেভাগে।'

তার কাঁধ থেকে ব্যাগটা নামিয়ে নিল মঞ্জু।.....'কক্ষনো না। কদ্দিন চলে গেছে—এখানে আসবার নাম নেই। সহজে ছাড়ব ভেবেছ সণ্টুদা!'

মাসিমার বাহিনীটি ওকে প্রায় টানতে টানতে ঘরে নিয়ে গেল।...

মেসোমশাই সত্যিসত্যি মুরগী নিয়ে এলেন—তখন বিকেল পাঁচটারও বেশি। সাইকেল থেকে নেমে হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকে বললেন, 'কেটে নিয়ে এসেছি। তা ইয়ে—এক কাণ্ড ওদিকে। দেরী হয়ে গেল সেইজন্যে।'

মাসিমা প্রসন্নমুখে ব্যাগটা নিতে নিতে বললেন, 'কাণ্ড তো দুবেলাই লেগে রয়েছে প্রতাপগড়ে।'

রবীনবাবু বললেন, 'আরে, এ একটা সাংঘাতিক কাণ্ড! এ্যাদ্দিন প্রতাপগড়ে আছি, খুনখারাবি বিশেষ দেখিনি। তোমার মারামারি গুণ্ডামির কথা ছেড়ে দাও। আজ একটা খুন হয়ে গেছে!'

'খুন!' শোভা লাফিয়ে উঠলেন। ...' কে খুন হল? কে খুন করল? ওরে বাবা!'

রবীনবাবু বিরক্তমুখে বললেন, ' চেঁচিও না। সেদ্দিন নগেনশালা যে লোকটাকে আমার কোয়ার্টারে লুকিয়ে রেখেছিল, কলকাতার সেই খুনেটা নিজেই খুন হয়ে রাস্তায় পড়ে আছে। রক্তে ভেসে গেছে একেবারে। উঃ! সে এক সাংঘাতিক দৃশ্য!'

শোভা শিউরে বললেন, 'এ্যাঁ! বল কী?'

'বিস্তর লোক জড়ো হয়েছে। পুলিশ এসেছে। নদীর ধারে চড়ার ওপর বডি পড়েছিল—কারা দেখতে পায়। উপুড় হয়ে পড়ে আছে। একটা হাত ছড়ানো সামনের দিকে। বুঝেছ? হাঁচড়-পাঁচড় করে বুক ঘষটে জলের দিকে যাচ্ছিল মনে হচ্ছে। বালিতে বিস্তর আঁচড়ের দাগ রয়েছে। স্ট্যাব্‌ড হয়ে বোধ করি তেষ্টা পেয়েছিল ব্যাটার—বাপ্‌স্!'

গৌতম ঘর থেকে বেরিয়ে এসে একমুহূর্ত ওঁদের দিকে তাকিয়ে তারপর একলাফে বারান্দা থেকে. নামল। হনহন করে হাঁটতে থাকল রাস্তার দিকে।

পিছনে রবীনবাবুর কথা শোনা গেল—' যেও না সণ্টু। যেও না। তোমরা কলকাতার মানুষ খুন দেখে দেখে ভোঁতা হয়ে আছো। এ আর তেমন কী!'

গৌতম তার বাসার কাছাকাছি এসে একটা লোককে জিজ্ঞেস করল, ' কোথায় খুন হয়েছে শুনলুম—বলতে পারেন দাদা?'

লোকটা আঙুল তুলে নদীর দিকটা দেখাল।

গৌতম ঠিকই ধরেছিল। তার বাসার সামান্য দূরে একটা পোড়ো জায়গা আর জঙ্গল পেরোলেই নদী! স্বপন বোসের রক্তের ফোঁটা সরু পায়ে চলা পথের ধুলোয় বৃথা খোঁজবার চেষ্টা করল সে। আলো কমে গেছে। ছায়া ঢাকা পথে ভিড় করে মানুষ যাচ্ছে কিংবা আসছে নদীব চড়ার খুন দেখে। প্রতাপগড়ে নিহত মানুষ এখনও খুব বিস্ময় আর উত্তেজনার সৃষ্টি করে।

ধূসর বালিয়াড়ির ওপর পড়ে আছে 'পলাতক' স্বপন বোস। বালিতে ঘষটে যাওয়া আর আঁচড়ের চিহ্ন আছে। আর একহাত এগোতে পারলেই জল ছুঁত লোকটা। একহাত দূরে তিরতিরে হালকা একফালি স্বচ্ছ জলের স্রোত বয়ে চলেছে।

তার ভুরুর নিচে নাকের ওপরদিকে একটা একইঞ্চি চেরা দাগ—রক্ত সরে সাদা কি দেখা যাচ্ছে। চায়ের কাপটা ওখানেই ভেঙেছিল। তখন এতটা বোঝা যায়নি। এখন তো স্পষ্ট।

ভিড়ও তাই বলছে। একটা শক্ত কোন জিনিস দিয়ে কেউ আঘাত করেছিল, লোকটাব নাকের ওপর কেটে ঘিলু বেরিয়ে পড়েছে। তারপর আহত লোকটা একটু জলের আশায় বুকে হেঁটেছে বালিয়াড়িতে।

ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় সে টলছিল, গৌতম দেখতে পাচ্ছে এখনও। টলতে টলতে জঙ্গলের ধারে গিয়ে পড়ে গেছে। তারপর তৃষ্ণায় ছটফট করতে করতে এগিয়েছে নদীর দিকে। নদীটা সে চিনত। কিন্তু প্রকৃতি তাকে করুণা করেনি। কারণ, প্রকৃতিতে হত্যাও উদ্দেশ্যমূলক তাই প্রকৃতিতে কোন অনুশোচনা নেই, শোক নেই, জ্বালা নেই।

দিনের পর দিন অনিয়মিত খাওয়া, উদ্বেগ, অস্বস্তি, ত্রাস আর আত্মদ্বন্দ্ব একটা মানুষের শরীরকে রুগ্ন করে তুলবে— সেটা স্বাভাবিক। তার ফুসফুস আর হৃদপিণ্ড দুর্বল হয়ে পড়বেই তো। পৃথিবীর পথে ইতিহাসের ভারি চাকা উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দেবার জোর বাহু থেকে কমে যাবেই তো। এখন সে হয়ে পড়েছিল একটা অকারণ বস্তুপিণ্ড—একটা বাড়তি জঞ্জাল।

সে তাই প্রত্যাঘাতের শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল।

কিংবা তার বিবেক—তার সংস্কার রুখে দাঁড়িয়ে বলেছিল, এবার প্রায়শ্চিত্ত করো, বন্ধু! স্বপন বোস প্রায়শ্চিত্ত করেছে।....

আস্তে আস্তে ফিরে এল গৌতম। নিজের দিকে ভয়ার্ত চোখে তাকাতে তাকাতেই ফিরল। দা কিলার! খুনী! তার মধ্যে এক খুনী বাস করছিল। পলাতক এবং নির্বাসিত একজন ঘাতক।

আবার ছটফট করে উঠল গৌতম। ইচ্ছে হল, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলে, 'আমি খুন করেছি স্বপন বোসকে। তোমরা আমার বিচার করো!' কিন্তু গলা থেকে বুক অব্দি শুকিয়ে গেছে। সারা শরীরে পাথরের শীতল স্তব্ধতা এবং ওজন। মাথা ঝুলে যাচ্ছিল তার। দুটো হাত দুপাশে উদ্দেশ্যহীন দুলছিল।...

আস্তে আস্তে থানার প্রাঙ্গণ পেরিয়ে যায় গৌতম। কেউ তাকে কিছু জিজ্ঞেস করে না। ধাপগুলো পেরিয়ে উঁচু বারান্দায় ওঠে। বিশাল টেবিলের ওপাশে একজন পুলিশ অফিসার কিছু লিখছিলেন প্রকাণ্ড

রেজিস্টারে। মুখ তুলে বলেন, 'কী চাই?'

গৌতম একটু হাসে। টুলে বসে পড়ে। বলে, 'ধরা দিতে এলুম স্যার!'

'হোয়াট?' লাফিয়ে ওঠেন অফিসারটি।

'স্বপন বোস নামে একটা লোককে আমি খুন করেছি।'.... গৌতম চোখে জল নিয়ে বলতে থাকে। 'হ্যাঁ স্যার। আজ সকালে সে আমার কাছে একটা অদ্ভুত প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল। আমি তাকে সহ্য করতে পারিনি। তার নাকের ওপর চায়ের কাপটা ভেঙেছিলুম। তারপর তাকে...'

'একমিনিট, জাস্ট একমিনিট।' বলে অফিসারটি কাকে চেঁচিয়ে ডাকতে থাকেন।.

সুদীপ্ত সেন, রবীনবাবু, রিমি, আরও কেউ কেউ এলেন খবর পেয়ে, রাত তখন দশটা।

লোহার শিকের আড়ালে ম্লান আলোয় বসে মিটিমিটি হাসে গৌতম। কিছু বলে না। একবার রিমিকে খোঁজে। রিমি উঁকি মেরেই সরে গেছে বাইরে বারান্দায়। নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে আছে।

আর গৌতম মনে মনে তার উদ্দেশ্যে বলতে থাকে—রিমি, একটা গল্প বলি শোন। কলেজ স্ট্রীটের ফুটপাথে পুরনো বই খুঁজতে খুঁজতে পিছন থেকে একদিন কোন মেয়ে বলে উঠেছিল 'অনিন্দ্য, কেমন আছ?....অনিন্দ্য, তোমাকে খুঁজে খুঁজে সারা হয়েছি।' আর আমি পিছনে মুখ ঘোরাতেই সে 'সরি' বলে সলজ্জ হেসে কেটে পড়েছিল দ্রুত। এখানেই সমস্যা, রিমি। কেউ কেউ আমার মধ্যে তার প্রিয় মানুষটিকে আবিষ্কার করে বসে এবং ভুল করে ফেলে! ...মাই গুডনেস! হি ইজ নট দা রাইট ম্যান. .., যাকে বলে—হা পোড়াকপাল, এ তো সেই লোক নয়। রিমি, 'আই অ্যাম নট ইওব রাইট ম্যান—আই অ্যাম দা রং ম্যান'—আমি আসলে একজন ভুল মানুষ'!....মৌলালির মোড়ে থেমে থাকা বাসস্টপের জানালায় যে অচেনা মেয়েটি আমাকে দেখে হেসেছিল—রিমি, তোমাকে নিয়ে আমার মেলামেশা, ভালবাসার খেলাধুলো, চুমু খাওয়া ইত্যাদি সবকিছু মিলিয়ে তোমাব সঙ্গে সেই অচেনা মেয়েটির কোন ফারাক নেই। ভুল করে কাকেও চেনা মানুষ ভেবে 'এই যে কেমন আছেন'—এই কুশল প্রশ্ন তবু কি আন্তরিকতার দিক থেকে মিথ্যে? মোটেও না, রিমি। কলেজ স্ট্রীট ফুটপাথের মেয়েটির ওই খুঁজে খুঁজে সারা হওয়ার পর হঠাৎ অনিন্দ্যকে আবিষ্কারের আবেগটা তো মোটেও মিথ্যে ছিল না! মিথ্যে ছিল না বাসের মেয়েটির হাসি। তাই তোমার ভালবাসার আবেগ মিথ্যে নয়। কিন্তু এটাই মজার ব্যাপার যে আমি ঠিক সে নয়, যাকে তুমি দেখছিলে, নিজের সঠিক মানুষটি ভেবে বসেছিলে। আবার বলছি রিমি, আমি একজন ভুল মানুষ। আমাকে তুমি ক্ষমা করো। আমি যা কিছু করেছি, সবই করেছি তোমাকে অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়ার হাত থেকে বাঁচাতে। তোমার আবেগগুলো আচমকা রোধ কবে দিলে. তোমারও যে বড় কষ্ট হত রিমি। ......